প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং যে সহানুভূতি ও আদর তাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে তাহার পরিমাণ সামান্য নহে।

বর্ত্তমান বর্ষেও কথা-সাহিত্যই 'পঞ্চপুষ্পে'র প্রধান অবলম্বন হইবে। তদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও বিশিষ্ট প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি থাকিবে। বাঙ্গালার প্রাচীন মন্দিরসমূহ, পল্লীর কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির চিত্র ও পরিচয় এই বৎসরে 'পঞ্চপুষ্পে' প্রকাশিত হইবে। এজন্য 'পঞ্চপুষ্পে'র আকার বর্দ্ধিত হইল; কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি হইল না। তবে আকারবৃদ্ধিহেতু 'পঞ্চপুষ্পে'র ওজন বৃদ্ধি পাইল বলিয়া মাত্র ডাক-মাশুলের হার ছয় আনা বাড়াইয়া দেওয়া হইল।

অর্চ্চনা

শ্রীমতী চারুলতা দেবী

ধীরে ধীরে ঘনীভূত সান্ধ্য অন্ধকার,
অস্তমিত দিনান্ত-তপন,
শান্ত-সমাহিত-চিত্তে পূজা-উপচার
সাজাইল প্রকৃতি এখন।

কুসুমের অর্ঘ্য নহে, কিশলয়-দলে
পূর্ণ নয় আরতির ডালা;
ঝিল্লীরবে মধুগীতি আজি না উথলে,
গাঁথে নাই সুচিকণ মালা।

দিবা-অবশেষে যায় অতীতে মিশিয়া
আলোকের আনন্দ-ঝঙ্কার,
সেই মূর্চ্ছনার সাথে মিশিল আসিয়া
সুমধুর সঙ্গীত নিশার।

চেতনার তৃপ্তি আর স্বপ্ন সমাধির
লয়ে এই প্রীতি-উপহার,
বিশ্ব-দেবতার তরে আজি প্রকৃতির
বক্ষে জাগে শান্তি বন্দনার।

মলয় চিদম্বরম্

মদ্র প্রদেশের কোইম্বাটুর সহর হইতে দেড় ক্রোশ দূরে পেরুর গ্রামে প্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্থ মলয় চিদম্বরম্ অবস্থিত। শ্রীনটরাজই এই তীর্থের অধিষ্ঠাতা। সকল কলাবিদ্যার অধীশ্বর মহাদেব নৃত্য করিতেছেন—আর নির্ব্বাক্ বিস্ময় ও ভক্তি-ভরে ত্রিলোকবাসী সেই নৃত্য দর্শন করিতেছেন—শ্রীনটরাজের মূর্ত্তিতে ইহাই প্রকটিত। ইহা শিবের অন্য রূপ; এ রূপ—এ মূর্ত্তি কলাবিদের ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি—শ্রীনটনাথের মূর্ত্তি। নৃত্য, গীত, অভিনয়াদি ললিতকলার নায়করূপে স্বয়ং মহাশিব এই তীর্থে বিরাজিত। আজও দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরা এই মহাতীর্থে আসিয়া মহাদেবকে শ্রীনটরাজ বলিয়া পূজা দিয়া থাকে। ইহা শিব-পূজা, কি ললিত-কলা-পূজা তাহার বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। শিবকে যে নটরাজ ও নটনাথ বলিয়া কলাবিৎ হিন্দু অর্ঘ্য প্রদান করিয়া থাকে, মলয় চিদম্বরম্ তীর্থে উপস্থিত হইলে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

পেরুর মন্দিরের স্থাপত্য-কৌশল বিশুদ্ধ দ্রাবিড়ীয় আদর্শ সম্মত। মন্দিরের চূড়ায় কারু-কার্য্য; স্তম্ভে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত; কোথাও অসংখ্য প্রদীপ সুরক্ষিত; সিংহদ্বারে বিস্ময়কর শিল্পকার্য্য; স্তম্ভসমন্বিত নাট-মন্দির—এ সকলই দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য। পেরুর মন্দিরে দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণরূপে বিদ্যমান। এ সকল ব্যতীত মন্দিরের সঙ্গে পুষ্করিণী, উদ্যান, পবিত্র বৃক্ষরাজি আছে। মন্দিরকে সর্ব্বপ্রকারে সুদৃশ্য এবং সুবৃহৎ করিবার জন্য দ্রাবিড়ীয় মন্দির-নির্ম্মাতাগণ যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি করেন না।

অরসম্বলাভনর মন্দির

পেরুর সুন্দর গ্রাম—একটী ক্ষুদ্র নদী উহার অঙ্ক দিয়া প্রবাহিত। গ্রামটীর চারিদিকে পাহাড়। একটি পাহাড়ের নাম ভেলিন গিরি; অপর একটি পাহাড়ের নাম—মরুদয় মলয়গিরি। তীর্থযাত্রিগণ ভেলিন গিরিকে কৈলাসপর্ব্বত বলিয়া ভক্তি করিয়া থাকে।

যে থিরুমল নায়েক মাদুরার সুপ্রসিদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রাতা অলঙ্গেথি নায়েক প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে পেরুরের এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। যিনি প্রথম মন্দিরের পত্তন করিয়া-ছিলেন তাঁহার মূর্ত্তি মন্দিরের সিংহদ্বারে স্থাপিত আছে। নটরাজের মন্দির-সংলগ্ন বিশাল নৃত্য-শালার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য অতুলনীয় বলিলেই হয়।

পেরুর মন্দিরে দুইটী অদ্ভুত বৃক্ষ আছে। একটী 'অমর' তালীবৃক্ষ, অপরটী 'বন্ধ্যা' তিন্তিড়ী বৃক্ষ; দুইটী বৃক্ষই প্রাচীন।
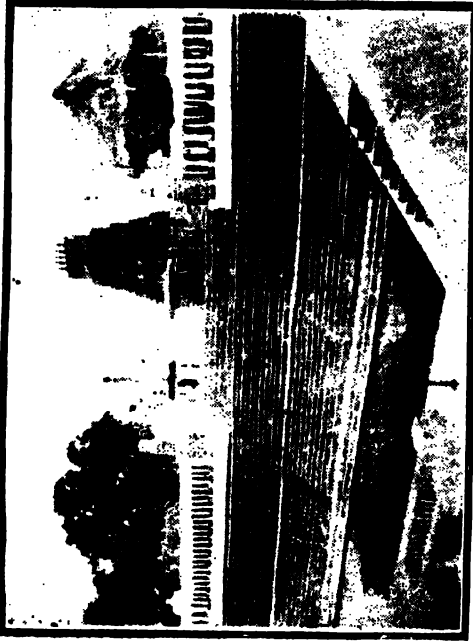
মন্দিরের পুষ্করিণী বা কুণ্ড ও প্রাচীন গোপুর
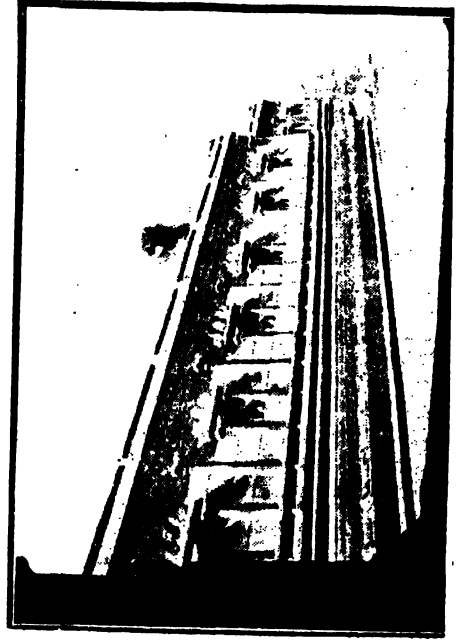
নৃত্য-শালা

স্বাস্থ্যনিবাসের প্রবেশপথ

পেচিনয়ক্কি অম্মল মন্দির

'অমর' তালীবৃক্ষ
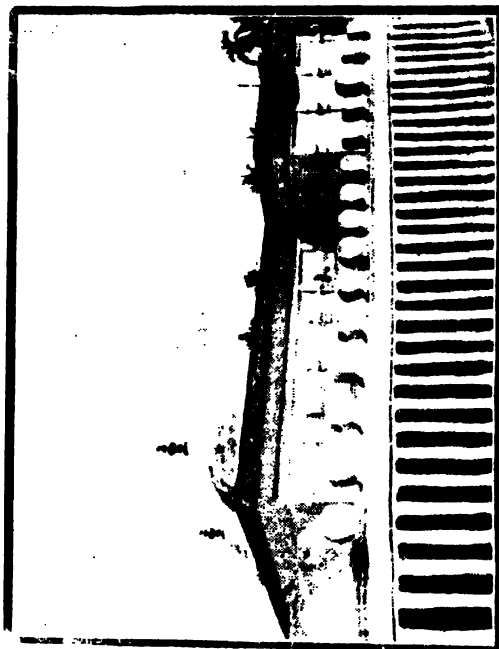
পাট্টি বিনায়কন্ মন্দির

গোপুর মধ্যস্থ মন্দির

গোপুর সিংহদ্বার

গাথা

শিশু বুদ্ধ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নৃপতি 'শুদ্ধোধনে',
'মহামায়া' আর 'মহাপ্রজাবতী'
বরিলেন শুভক্ষণে।
দোঁহে 'দেবদহ' রাজার দুহিতা,
আলো-করা যেন রূপের সবিতা,
আনন্দ-বানে অবগাহি' তাঁরা
থাকেন হৃষ্টমনে।

তথাপি চিত্তাকাশে,
ক্ষণে ক্ষণে এক দুখ-বরষার
কালো মেঘ ভেসে আসে।
সেদিন প্রভাতে সেই মেঘখানি
কোন ফাঁক দিয়ে পশিল' না জানি ?
ভেসে এল যেন আশার কাহিনী
ব্যাকুল সুরভি শ্বাসে !

উষার অস্ফুট-হাসি
চমকি' মিলায় নীলিমার গায়
নাশিয়া কুয়াসা-রাশি।
'শুক-তারকা'র মলিন আভায়
জানায়ে দিতেছে উষা যায়-যায় ;
স্বপনে সহসা উঠিল জাগিয়া
মহামায়া নিঃশ্বাসি'।

হ'বে কি সত্য তবে ?
এতদিন পরে বাঞ্ছিত ধন
আসিবে কি নিজ ভবে !
আয় ওরে মোর স্নেহের দুলালি
স্বপনের মাঝে কেন রে লুকা'লি ?
হ'য়েছেন যদি প্রসন্ন বিধি,
স্বপ্ন মিথ্যা হ'বে !

দিন পরে দিন যায়,
কালের লহরী মহাকাল-পানে
হেসে হেসে ফিরে চায়।
'কপিলা নগরে' মহা-কলরোল,
পুনঃ ফিরে এল' হাসির বাদল,
রাজার কুমার জনম লভিল
"লুম্বিনী" বন-ছায়।

সাধু-সন্ন্যাসী জনে,
হেরিতে আসিল নবীন কুমারে
নন্দিত নন্দনে !
পরাণ খুলিয়া নিঃশেষ ক'রে
কুমারে আশীর্ব্বচন বিতরে,—
হেরিয়া 'নয়ন-মণি'—পুরজন
উল্লাসে নর্ত্তনে।

ভিখারী-আতুর-প্রাণ
কুমারের নব-জনমে লভিল
আশার অধিক দান।
করতালি দিয়ে নেচে ওঠে তা'রা,
গানেরছন্দে প্রাণের ফোয়ারা,
পরশিয়া হৃদি-বেলা-বালুকায়
বাজে নব-জয়-গান !

শান্তির মহিমায়—
জীবন-জলধি উধাও ছুটেছে
দুরন্ত স্রোত-প্রায় !
মহামায়া-চিত উতরোল করি'
মানস-যমুনা লহরে বিহরি'—
সেই স্নেহ-মুখ-শতদল পানে
অবিরল ফিরে চায়।

কভু কম-কর-জোড়ে,
যাচে বিধাতার মঙ্গল-পদে,
'রেখো প্রভু স্নেহ-ডোরে।'
অঞ্চল-গল-লগ্ন আননে
নমিছে কভু বা বিপদ-বারণে,
ভকতি-প্লাবন নেমে আসে ঘন
হৃদয়ের নির্ঝরে!

হাসিয়া নাচিয়া কত
তা'দেরি সুখের সলিলে ভাসিয়া
পঞ্চ বরষ গত।
নন্দন-বন-ঝরানো কিরণে
কতবার অবগাহিয়া হিরণে,
শুনেছে শ্রবণ ভরি' অনুখন
কলমর্ম্মর কত!

কত বসন্তে হায়—
কত পাখী-ডাকা তরুর শিথানে
শ্যামল আঙ্গিনায়।
মধুকর-দলে মধুর গুঞ্জন,
করিয়াছে কত মনোরঞ্জন,
পরাণ ভরিয়া পুলক-ধারায়
স্নান করায়েছে তা'য়!

একদা শরৎ-সাঁঝে,
চলেন বুদ্ধ আপনার মনে
বাঁকা বন-পথ-মাঝে।
স্বর্ণ-আবীর সঙ্গে মাখিয়া
ঝর্ণা নাচিয়া গিয়াছে বাঁকিয়া—
তাহারি উদার বুকের উপরে
গোধূলির বাঁশী বাজে

নীড়ে-ফেরা পাখীগুলি,
ফিরিছে মৌন-নীরব কুলায়ে
সান্ধ্য-সমীরে দুলি'।
যাইতে যাইতে বিজন-বীথিতে,
হেরিল বুদ্ধ নয়ন-চকিতে,
একটি তরুণ-কান্তি হংস
লভেছে ধরার ধূলি।

বক্ষ-দুয়ারে তা'র,
তীক্ষ্ণ সায়কে বিদ্ধ-পরাণ—
কান্তি সে সুকুমার।
কোন্ অকরুণ নিষ্ঠুর হিয়া
বধিল ইহারে এমন করিয়া?
সহসা হেরিল দেবদত্তেরে
নিকটে আসিতে তা'র!

হাসিয়া সে খল্-খল্
কহিল এ হাঁস আমারি সায়কে
লভেছে ধরণীতল।
অনুসন্ধানি বহু বন-পথ
আজি মিলিয়াছে মম মনোরথ,
হংস আমায় দাও গো ত্বরায়,
কর' কেন এত ছল?

করুণায় বিহ্বলা—
কাতর নয়ন চমকি' খুলিয়া
চাহিলেন চিত-ভোলা!
চঞ্চল-আঁখি-তারারে ঘিরিয়া
জলের মুকুতা ঝরে শিহরিয়া,
চরণ-কমল সিক্ত করিয়া
দুলিল বেদনা-দোলা!

কহিলেন ক্ষণ-পরে,
অমিয়-মাখানো করুণ-কণ্ঠে
ভ্রাতা দেবদত্তরে।
এ মূক হংস নীরব ভাষায়
মিনতি করিছে মুক্তি-আশায়—
জল-ছল-ছল আনত-নয়নে
ভিখ মাগে সকাতরে।

করো গো করুণা করো,
ক্ষণেকের তরে নীরস-হৃদয়
সুধা-মধু-রসে ভরো!
বধির, আহত-হংস-পরাণ,
করো করো মোরে চির-তরে দান,
বিনিময়ে সখা রাজ-বেদিকার
রতন-মুকুট পরো!

ঘন-বন-বীথি ব্যাপি'—
ভোমরার মধু গুঞ্জন-গানে
কুঞ্জ উঠিছে ছাপি'।
পাতার প্রান্তে সহকার-শাখে,
লুণ্ঠিত-মধু পুষ্পের ফাঁকে,
প্রতিধ্বনিল সে স্বর-লহরী
তরু-মর্ম্মরে কাঁপি'!

* * *

আকাশের কোলে কোলে,
ফাগুন-মেলার রঙিন পরীর
জর্দ্দা-আঁচল দোলে!
আবীর-বুলানো রাঙা মুখখানি,
এল' ফাল্গুন-প্রতিমার রাণী,
সাঁতারি আমার নীল-পারাবার
সাথে লয়ে সখী-দলে।

এমন সুপ্রভাতে,
প্রাসাদ-নগর বন উপবন
নির্জ্জন-নিরালাতে।
অনুচরে করে অনুসন্ধান,
'কপিলা-নগরে' শোকের-তুফান,
চ'লে গেছে হায় কুমার কোথায়
কারেও না লয়ে সাথে!

মৌন-দ্বিপ্রহর—
কূজন-বিহীন কানন-কুঞ্জে
ফিরে রাজ-অনুচর।
কত সরু বাঁকা বনপথ দিয়া,
বালুকার রেখা চরণে আঁকিয়া,
খোঁজে নর-নারী 'নয়ন-জুড়ানো
নয়নে' নিরন্তর!

আঁকাবাঁকা নদী-নীর,
স্বচ্ছ-শ্যামল নিশ্চল ছায়া
নির্জ্জন বনানীর।
অদূরে ললিত গোলাপ পাতায়,
প্রজাপতিদলে কি কথা পাতায়?
তারি বামপাশে মৌন দুপুরে
বিরাজিত মন্দির।

কৃষ্ণ-কলির সার—
জীর্ণ-শীর্ণ প্রাকার আবরি'
উঠিয়াছে চারিধার!
তারি মাঝখানে নিমীল-নয়ানে,
স্বরগের জ্যোতিঃ মাখিয়া বয়ানে,
ধ্যান-নিশ্চল নির্ব্বাক্ স্থির
মূরতি সে মহিমার!

গল্প

স্নেহের দাবী

শ্রীজীবনভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় কাব্যালঙ্কার

১

সন্ধ্যাকালে দোকান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দিবাকর দেখিল, জননী শয্যায় পড়িয়া ছটফট্ করিতেছেন। শয্যাপার্শ্বে কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিশাকর গাঢ় নিদ্রামগ্ন। দিবাকরের গৃহপ্রবেশ-শব্দ পাইয়া তাহার জননী বলপূর্ব্বক আপনাকে একটু সংযত করিয়া লইয়া বলিলেন, "দিবা এসেছিস ?"

দিবাকর উত্তর করিল, "হাঁ মা ! এসেছি। মা ! এখন তুমি কেমন আছ, জরটা কি সকাল বেলার চেয়ে একটুও কমে নি ?"

"কমেছে বৈ কি বাবা ! তবে দেহে আজ একেবারে বল নেই। সেই জন্যে আজ রেঁধে উঠতে পারি নি। মঙ্গলা কাল চারটি মুড়কী দিয়ে গেছলো, তারি অর্দ্ধেকগুলি খোকাকে দিয়েছি, বাকী কটি ঐখানে আছে। কাপড় ছেড়ে মুখ হাত পা ধুয়ে, তাই খেয়ে আজকের রাত্তিরটা কাটিয়ে দে। কি করবো, সবই অদেষ্ট ! আজ এই দুবচ্ছর ধ'রে পোড়া জরেই আমায় খেলে। একদিনের তরে তোদের পেট পুরে খাওয়াতে পারলুম না ! যা বাবা ! দেরী করিস নে, দুটী মুখে দে। মঙ্গলা সন্ধ্যা দিয়ে গিয়েছে, গোবিন্দজীর শেতল-আরতিও কানাইকে ধরে দিয়ে নিয়েছি।"

দিবাকর মাতার কথায় ততটা মনঃসংযোগ না করিয়া শয্যাশায়িনী জননীর ললাটদেশ স্পর্শ করিবামাত্র চমকিত হইয়া উঠিল। ক্ষুব্ধস্বরে জননীকে বলিল, "ইস্ গা যে তোমার পুড়ে যাচ্চে মা ! আর তুমি কি না বলছিলে তোমার জর আজ কম আছে। আমি একবার কবরেজ মশাইকে ডেকে আনি, এত দুর্ব্বলতার ওপর প্রবল জর থাকা তো ভাল নয়।"

জননী একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "দিবা ! আগে হাত-পা ধুয়ে খেয়ে নিয়ে একটু ঠাণ্ডা হ, তার পর যা হয় করিস্, আমার কথা শোন্ বাবা ! আগে একটু কিছু খেয়ে নে।" দিবাকরের রুগ্না জননী বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, গৃহে গৃহে সন্ধ্যার দীপ প্রজ্জ্বলিত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার জীবন-দীপের চির-নির্ব্বাণের সময় অনতিদূরবর্ত্তী। পুত্রকে এখন কিছু খাওয়াইতে না পারিলে, কাল পর্য্যন্ত তাহার খাওয়া হইবে না। সন্তান-স্নেহ-কাতরা রোগিণীর রোগবিশুষ্ক, দীপ্তিহীন নয়নপ্রান্ত বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। আপনার বস্ত্রপ্রান্ত দ্বারা মাতার চক্ষু দুটি মুছাইয়া দিয়া দিবাকর বলিল, "তবে দুটি খেয়ে নিয়েই আমি কবরেজ মশাইয়ের কাছে যাচ্চি মা !" জননী একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

মাতৃ-আজ্ঞায় দিবাকর বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক মাতার সযত্ন-রক্ষিত, স্নেহসুধাভিষিক্ত মুড়কীগুলির ভোজন সমাপনান্তে জননীর নিকটে গিয়া বলিল, "মা ! খাওয়া হয়েছে, তা হলে এইবার একবার আমি কবরেজ মশাইয়ের কাছে যাই ?"

মাতা ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "দিবা! আগে একবার আমার কাছে বস্, আমার একটা কথা বলবার আছে, সেটা শোন্, তার পর যা হয় করিস্।" মাতৃ-আজ্ঞায় দিবাকর রোগিণীর শয্যার নিকটে উপবেশন করিলে মাতা বলিলেন, "আয় দিবা! আমার বুকের কাছে সরে আয়, আজ একবার জন্মের মত তোকে বুকে নি; এতে আমার বুক জুড়ুবে কিন্তু তোর বুক যে ফাটবে তা আমি বুঝতে পারচি। ভগবান তোর বুক এই ব্যথা সহ্য করবার উপযুক্ত হয়েছে বুঝেই আজ সেই ব্যথাটাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বড় সূক্ষ্ম বিচার তাঁর, তিনি অকারণ কোন কাজই করেন না। কবরেজ মশাইকে ডেকে আর কি করবে বাবা! আমার সময় হয়ে এসেছে, এখন আর অন্য বদ্যিতে কাজ নেই, একবার সেই ভবরোগহর বৈদ্য গোবিন্দকে ডাক। বাবা! তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস্ করব, তুই তার সত্যি উত্তর দিবি?" বিস্মিত হইয়া কাতরকণ্ঠে দিবাকর বলিল, "কেন মা! আজ তুমি আমায় একথা বলচ? আমি কি কোনও দিন তোমার সঙ্গে কিছু প্রতারণা করেছি? মা! তোমার কাছে বিশ্বাস হারানোর চেয়ে আমার যে মরণ ভাল মা!"

"ষাট্, ষাট্ তুই কেন অবিশ্বাসী হতে যাবি বাবা! অবিশ্বাসী আমার এই পোড়া মন। তাই তোকে হঠাৎ একথাটা বলে ফেলে তোর প্রাণে কষ্ট দিনু। বলছিনু কি জানিস্ বাপ! খোকা আমার নিতান্ত ছেলেমানুষ, কোনও জ্ঞানই ওর হয় নি। আমি মরে গেলে, যদি হতভাগা কোন দোষঘাট করে, তুই বাবা! সেগুলো ধরিস নি, আমার মতন তাকে মাপ করেই যাস। দুটি ভায়ে মিলে তাঁর নাম রক্ষে করিস্। জানি না মলে দেখতে পাওয়া যায় কি না, কিন্তু না দেখতে পেলেও আমি যেখানেই থাকি না কেন, সেইখানে থেকে তোদের আশীর্ব্বাদ করব।" রুগ্না জননী আর কিছু বলিতে পারিলেন না, চক্ষু দিয়া দরবিগলিত অশ্রু-ধারা প্রবাহিত হইল, রুদ্ধ আবেগে কণ্ঠস্বর বদ্ধ হইল। দিবাকর মরণোন্মুখী জননীর উত্তপ্ত বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার নয়ন-ধারায় জননীর জ্বরতপ্ত বুকখানি যেন শীতল হইল। ঐ অশ্রু-প্লাবনই তাহার আকাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের অনুকূল উত্তর প্রদান করিল বুঝিয়া মরণকাতর মাতার প্রাণে এক অপূর্ব্ব শান্তি-প্রস্রবণের সৃষ্টি করিল। রোগিণীর নিষ্প্রভ নয়নে মুহূর্ত্তের জন্য একটা দীপ্তির স্ফুরণ হইল, রোগপাণ্ডুর মুখে ক্ষণেকের জন্য লালিমার বিকাশ দেখা গেল। বক্ষস্থাপিত পুত্রমস্তকে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা দেবীর অভয়দ করযুগল স্থাপিত হইল। নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া দিবাকর যখন মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে ডাকিল, "মা", তখন দিবাকর জননীর প্রাণবায়ু কোন এক অজ্ঞাত প্রদেশে চিরদিনের জন্য প্রস্থান করিয়াছে! ভূমিশয্যা-শায়িত নিদ্রাতুর কনিষ্ঠের মুখের পানে কি এক কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া দিবাকর জননীর অন্তিম কৃত্যের আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

২

জননীর মৃত্যুকালে, দিবাকরের বয়স ছিল সপ্তদশ বর্ষ, এবং কনিষ্ঠ নিশাকর ছিল আটবৎসরের বালক। দিবাকর বাল্যে পিতৃহীন হইয়াছিল বলিয়া লেখাপড়ার সুযোগ পায় নাই। তাহার পিতা হরমোহন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। নির্লোভ ব্রাহ্মণ নিজ শিষ্য-যজমান হইতে প্রাপ্ত সামান্য বৃত্তিদ্বারা সংসার নির্ব্বাহ করিতেন, তদীয় পত্নীর সুগৃহিণীপণায়, তাঁহার জীবিতকালে এবং তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে পত্নীর দেহান্তর-প্রাপ্তি

পর্য্যন্ত একরূপে সংসার চলিয়া আসিয়াছে। মাতার মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে দিবাকর একটি সহৃদয় দোকানদারের দোকানে শিক্ষানবীশ কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত হইয়াছিল এক্ষণে সে উক্ত কারবারের একজন অংশীদার। বর্ত্তমানে তাহার মাসিক আয়ও প্রায় একশত টাকার উপর। অবশ্য আমরা এখানে তাহার মাতার মৃত্যুর ত্রয়োদশ বৎসরের পরের ঘটনা বিবৃত করিতেছি।

দিবাকর এক্ষণে বিবাহিত ও একটি পুত্র এবং এক কন্যার জনক। তাহার পত্নী সুলোচনা বাস্তবিকই পতির মনোবৃত্ত্যনুসারিণী মনোরমা ভার্য্যা। সেও দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরের সুরূপা কন্যা। এইরূপ স্বার্থশূন্যা অথচ সংসারের সর্ব্ববিধ কার্য্যনিপুণা পত্নীলাভ মানুষের যে সৌভাগ্যের পরিচায়ক ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। দিবাকরের পত্নীভাগ্য প্রশংসনীয়।

মাতার মৃত্যুর পর হইতে দিবাকর, তাঁহার স্বর্গগতা জননীর আদেশ ছত্রে ছত্রে পালন করিয়া কনিষ্ঠ নিশাকরকে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছে। পত্নীর আগ্রহে আজ তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে সে ভ্রাতার বিবাহ দিয়াছে।

নিশাকর বাল্যাবধি জ্যেষ্ঠের এবং পরে ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া উভয়ের স্নেহ আদরে ততদূর লেখাপড়া শিখিতে না পারিলেও মোটামুটি একটু ইংরাজী ও বাঙ্গলা লিখিতে পড়িতে পারিত। নিশাকরের শ্বশুর বেশ অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। কন্যার পাড়াগাঁয়ে বাস তাঁহার অনাভিপ্রেত ছিল বলিয়া, তিনি জামাতাকে লেখাপড়া শিখাইবার অছিলায় আপনার ভবনে আনিয়া রাখেন। শ্বশুরগৃহে বাস দিবাকরের সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরোধী হইলেও ভ্রাতার কলিকাতাবাসের আগ্রহাতিশয্য-দর্শনে এবং পাছে নিশাকর মনোভঙ্গ-জনিত কষ্ট অনুভব করে বলিয়া সে এ বিষয়ে বাধা দেয় নাই। বিশেষতঃ নিশাকরের পত্নী সুশীলাবালা বিবাহের পর যে দুই চারি বার শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছিল, তাহাতে তাহার হৃদয়ের মহত্ব, গুরুজন ও কনিষ্ঠবর্গের প্রতি তাহার সম্বন্ধানুরূপ ভক্তি-স্নেহের অকৃত্রিম ব্যবহার দেখিয়া দিবাকর বুঝিয়াছিল যে, এইরূপ মহিমময়ী সহধর্ম্মিণী স্বামীর পতন-পথের রক্ষাবিধাত্রী।

তরলমতি নিশাকর কখনও বিলাসের মধ্যে মানুষ হয় নাই বলিয়া ধনী শ্বশুরগৃহে বাসকালীন বিদ্যাশিক্ষার পরিবর্ত্তে বিলাসিতা এবং পল্লীভবনবাসের প্রতি ঘৃণা-পোষণ শিক্ষা করিয়াছিল। প্রথমে সে মাঝে মাঝে আপনাদের পল্লীভবনে,ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া, ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের সহিত দুই চারিদিন কাটাইয়া গেলেও অদ্য বৎসরাবধিকাল আর স্বভবনাভিমুখী হয় নাই।

বিলাসিতার মোহে এক্ষণে তাহার ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃবধূর প্রতি পূর্ব্ব ভালবাসার ব্যতিক্রম সংঘটিত হইয়াছে। সে আর দিবাকরের কোনও সংবাদই লয় না। দিবাকর ইহার জন্য মাঝে মাঝে পত্নীকে বলিয়া থাকে, "দেখ বড় বৌ! নিশা আমাদের খবর নেয় না বলে আমার একটুও দুঃখ হয় না। তবে বড় দুঃখ হয়, বুকটা ফেটে যায়, যখন মনে হয় সে কেন তার খবরটা আমাদের দেয় না। জান বড় বৌ! তার কাছে থেকে এখন আমার পাবার কথা, দেবায় কথা নয়। হতভাগা! আমার সংবাদ না নিস্ নাই নিলি! ওরে তুই কেমন আছিস দুটো ছত্র লিখে আমায় কেন জানাস্ নে?" এই বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া থাকেন। নিশাকর পত্রাদি না দিলেও সুশীলাবালা প্রায়ই সুলোচনাকে পত্র দিয়া থাকে।

৩

মাসাবধি প্রিয়বিরহবিধুরা পূর্ব্বদিকবধূর কাতর কোমল আননখানি নবকুঙ্কুমারুণে রঞ্জিত করিয়া

নিশানাথ চন্দ্র পূর্ব্বগগনে উদিত হইয়াছেন। বহুদিবস পরে প্রবাস-প্রত্যাগত দয়িতকে দর্শন করিয়া ভাব-বিমুগ্ধা সন্ধ্যা সতীর নিজ শ্বেত জ্যোৎস্না-মাখা নিচোলখানির অঞ্চল, কখন যে ধরণীবক্ষে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। আদরিণী সন্ধ্যা মেঘের বুকে মাথা রাখিয়া উৎফুল্লনয়নে প্রিয়-মুখ-দর্শনে মগ্ন। মধু মাসের সেই রূপ এক বাসন্তী সন্ধ্যায়, নিজ গৃহের অলিন্দে বসিয়া, অস্তগতশ্রম দিবাকর পত্নী সুলোচনাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "জান বড় বৌ! আজ বিকেল বেলায় নন্দী গাঁয়ের ঘোষাল মশাই বলছিলেন যে, এখন আমায় সুখের সংসার; লোকে আমার অর্থের স্বচ্ছলতা দেখে আমায় সুখী মনে করে। তারা আমার বাইরেটা দেখেই আমায় সুখী মনে করে কিন্তু আমার ভেতরটা তো তারা দেখতে পায় না। নিশা আমার বাইরে গিয়ে বাস করচে বলে আমার বুকের ভেতরটায় যে কি অসহ্য যাতনা হচ্চে, তা তো তারা বুঝতে পারে না। মা যে মরবার সময় তাকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে বলে গেছলেন যে, দুভাই একত্রে মিলে পিতার নাম বজায় রাখতে। বড় বৌ! অকৃতজ্ঞ সন্তান আমি, মাতৃবাক্য রক্ষা করতে পারলুম কৈ? বুঝি নিশাকে তেমন ভালবাসতে, তেমন করে যত্ন করতে পারিনে, তাই সে তার স্নেহহীন দাদার কাছে আসে না। বড় আশা বুকে নিয়ে তার হাসিমাখা মুখখানি দেখতে গেছি, সে ঘরে থেকেও আমায় দেখা দেয় নি, তবে আমার গৃহলক্ষ্মী ছোট বৌ মা, আমার বংশের দুলাল যদুনাথ এসে আমায় দেখা দিয়েছে, যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন ও শ্রদ্ধা-ভক্তি করেচে, তাইতেই নিরানন্দ প্রাণে কতকটা শান্তি পেয়েছি।"

"অশ্রুপূর্ণলোচনে সুলোচনা বলিল, "ঠাকুরপো লজ্জায় দেখা করেনি, তোমায় অবজ্ঞা করে নয়।"

উদাসভাবে দিবাকর সেই জ্যোৎস্না-পরিপ্লাবিত ধরণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "বড় বৌ! তার আমার কাছে আসতেও যদি লজ্জা বোধ হয়, তা হ'লে বোঝ, সে আমায় পর ভেবেছে, নইলে আমার কাছে আবার তার লজ্জা! সে যে আগে কত অন্যায় আবদার আমার কাছে করেছে, কৈ কখনও তো লজ্জা বা ভয় এসে তখন তাকে বাধা দেয় নি! দোষ তার নয় বড় বৌ! দোষ আমার এই পোড়া অদৃষ্টের।"

সুলোচনা স্বামীকে বলিল, "তুমি এত কাতর হচ্চ কেন? মার আশীর্ব্বাদ কি কখনও বিফল হতে পারে? ছোট বৌ আমাদের সতী লক্ষ্মী, ঠিক দেখে নিও, ভগবানের দয়ায় মা'র আশীর্ব্বাদে, তোমার টানে আবার ঠাকুরপো, স্ত্রীপুত্র নিয়ে এই সংসারেই ফিরে আসবে। আবার আমরা আমাদের সুখের দিন ফিরে পাব। পুরুষ মানুষ হয়ে তুমি এত অধীর হচ্চ? ঐ যে ঠাকুর-ঘরে আমাদের কালো ঠাকুরটি বসে আছেন, ওঁর মূর্ত্তি পাথর দিয়ে গড়া বটে কিন্তু ঐ পাথরের বুকের ভেতর যে করুণার বারি টল্ টল্ করচে তাকি দেখতে পাচ্চ না? ধ্বংসপ্রায় এই ব্রাহ্মণ পরিবারের সংসার ওঁর দয়াতেই কি রক্ষা পায় নি? সব আপদ-বিপদ থেকে উনিই কি আমাদের রক্ষা করচেন না? তোমার কথামত রোজই আমি ওঁকে জানাই, আর বেশ দেখতে পাই, ঠাকুরের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠে। তুমি দেখবে শীগগিরই ঠাকুরপো সবাইকে নিয়ে ফিরে আসবে।"

পত্নীর বাক্যে দিবাকরের দুই নয়ন বহিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। এ আঁখিধারা বেদনার কাতরাশ্রুময়, প্রেমপুলকাশ্রু। দিবাকরের হৃদয় এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বাহুপাশে পত্নীকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া তদীয় ভক্তি-দীপ্ত

লোচনযুগলের উপর নিজ অশ্রুসিক্ত নয়নদ্বয় স্থাপন করিয়া দিবাকর বলিলেন, "বড় বৌ! তুমি ধন্য, ঠাকুরকে তুমিই চিনেছ।

স্বামীর স্কন্ধে মাথা রাখিয়া সাধ্বী সুলোচনা বলিল, "সে চেনা তো তোমারই দয়ায়, তোমার ভেতর দিয়েই তো আমি গোবিন্দকে চিনেচি। তোমার চরণ-সেবার অধিকারই তো আমায় গোবিন্দ-ভজনাধিকার দান করেচে।"

মুগ্ধ দিবাকর নিজ হৃদয়ে গোবিন্দ-মূর্ত্তি ধ্যান করিতে লাগিলেন।

৪

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার একমাস পরে, মাধব মাসের এক জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনীতে দিবাকর যখন আহারাদি সমাপনান্তে ছাদে বসিয়া বিশ্রামসুখ ভোগ করিতেছিলেন, এমন সময় সুলোচনা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বামীর চরণতলে উপবেশন করিয়া হাসিতে হাসিতে সে বলিল, "আজ একটা সুখবর দিয়ে তোমার কাছ থেকে বকসিস্ আদায় করতে এসেছি, বল আমায় কি বকসিস দেবে?"

মৃদু হাস্য করিয়া দিবাকর বলিলেন, "আমি নিজেই তো তোমায় আত্মসমর্পণ করে রেখেছি, তোমায় দেবার আর আমার কি আছে বল? সংবাদটা কি সেইটাই একবার শোনাও।"

স্বামীর বাক্যে সুলোচনা বলিল, "কাল সকালে ছোট বৌএর একখানা চিঠি পেয়েছি। সে লিখেছে যে, তার বাবার মৃত্যুর পর থেকে তার ভায়েদের ভেতর ঝগড়া বিবাদ, এমন কি বিষয় নিয়ে মামলা মোকদ্দমা পর্য্যন্ত আরম্ভ হয়েছে। ছোট বৌএর আর ঠাকুরপোর দুজনেরই আর সেই অশান্তির সংসারে থাকতে ইচ্ছে নেই। ছোট বৌ আমায় জিজ্ঞেস করেছে যে, দিদি আমি গেলে কি তোমাদের বাড়ীতে একটু স্থান পাবো? ও পাড়ার নকড়ি ঘোষ রোজ কলকাতায় যাতায়াত করে, তারি হাত দিয়ে কাল আমি জবাব দিয়েছি যে, আমাদের ঘরের লক্ষ্মী তুমি, তুমি যখনি আসবে তখনি আমরা

বিশ্রাম নিরত দিবাকরের নিকট সুলচনার আগমন

তোমায় বরণ করে তুলে নব। তোমাদের মন্দির শূন্য পড়ে আছে, আবার সে মন্দিরে তোমাদের স্থাপন করতে পারলে আমরা যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হব, যদি বুক চিরে দেখাবার হ'ত, তা হলে দেখাতে পারতুম।"

পতি-পত্নীর কথোপকথনে বাধা পড়িল। হঠাৎ তাহাদের গৃহদ্বারে যেন একখানা গাড়ী আসার শব্দ শ্রুত হইল। দিবাকর ও সুলোচনা উৎকর্ণ হইয়া সেই শব্দের প্রতি মনোযোগ করিবামাত্র বহির্দ্বারে শিশুকণ্ঠে উচ্চধ্বনি উঠিল, "জ্যেঠামশাই দরজা খুলুন, আমি এসেছি।" বেগে ছাদ হইতে নামিতে নামিতে দিবাকর উচ্চকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "দাঁড়াও জেঠামশাই আমি যাচ্চি।" দিবাকরের সেই আনন্দ-বিক্ষুব্ধ স্বর-তরঙ্গে বাড়ী কাঁপিয়া উঠিল। আলোক-হস্তে সুলোচনা স্বামীর পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিল।

নিশাকর, সুশীলা ও যদুনাথ গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবামাত্র যদুনাথ দৌড়িয়া গিয়া তাহার জ্যেঠামহাশয়কে জড়াইয়া ধরিল। দিবাকর তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া অজস্র চুম্বনে ব্যস্ত করিল। পদতলে প্রণতা সুশীলাকে উঠাইয়া লইয়া বক্ষে ধারণপূর্ব্বক সুলোচনা কাঁদিয়া ফেলিল। সুশীলার চক্ষেও আনন্দ-বারিধারা। জ্যেষ্ঠের পদতলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিশাকর বলিল, "দাদা। আমায় কি তোমার এই পায়ে একটু ঠাঁই দেবে?" যদুনাথকে সুলোচনার কোলে দিয়া ভ্রাতাকে বক্ষে উঠাইয়া লইয়া দিবাকর বলিলেন, "না খোকা! তা তো আমি পারবো না, প্রাণ থাকতে তা আমি পারবো না। তোর স্থান তো ওখানে নয় ভাই! সে যে আরো উচ্চে, তোর দাদার এই ভাঙ্গা বুকের ভেতর।

"সে স্থান যে আমি ইচ্ছা করে খুইয়েছি দাদা!"—বলিয়া নিশাকর বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিল! দিবাকরও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কে বল্লে ভাই! তুই তা খুইয়েছিস? স্নেহের দাবী যে সে স্থান অধিকার করে বসে আছে!"

জীবন-চরিত

তরু দত্ত

শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম-এ, বি-এল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"দত্তদের পারিবারিক আল্‌বাম্"—The Dutt Family Album—বাঙ্গালীর লেখনী-প্রসূত এক অভিনব ইংরাজি কাব্য-গ্রন্থ। ১৮৭০ সালে ইহা লণ্ডনে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। রামবাগানের একাধিক দত্ত কবির রচনা এই কবিতা-পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। কবিদিগের নাম ইহাতে নাই, কোন্ সময়ে কবিতা রচিত হইয়াছিল তাহারও উল্লেখ নাই। আলোচ্য কাব্য-গ্রন্থের রচয়িতারা নিজেদের ব্যক্তিগত অস্তিত্বকে জাহির করিবার চেষ্টা করেন নাই। ১৮৭০ সালের পূর্ব্বে যে কবিতাগুলি রচিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ-মাত্র নাই। কবিতার সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ১৯৭; ইহার মধ্যে সনেট বা চতুর্দ্দশপদী কবিতা ও স্বল্পায়তন রচনার সংখ্যাই অধিক। রামবাগানের কবিদিগের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হরচন্দ্র দত্ত, গোবিনচন্দ্র দত্ত, গিরীশচন্দ্র দত্ত ও উমেশচন্দ্র দত্ত ব্যতীত অপর কোনও দত্ত কবির রচনা এই গ্রন্থে নাই। ইহারা সকলেই তরু দত্তের নিকট-আত্মীয়। এই কবিদের রচনাতে ভাব ও ভাষার আশ্চর্য্য ঐক্য দেখা যায়। রচনা-শিল্পে অল্প-বিস্তর পার্থক্য লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু এই কয়জন কবিই যে এক পাঠশালায় কবিতা রচনা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয় না। সেই পাঠশালার গুরু ছিলেন কলিকাতার হিন্দু কলেজের অধ্যাপক স্বনাম-প্রসিদ্ধ ক্যাপ্টেন্ রিচার্ডসন্। দত্ত কবিদের কাব্য-সংসার যদিও হরচন্দ্রের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী নয়, তাহা হইলেও তাঁহার যৎসামান্য দানের মূল্য নেহাত কম বলিয়া মনে হয় না। "ভারত" (India) নামে সনেটের প্রত্যেক অক্ষর হইতে দেশাত্মবোধের পবিত্র অগ্নিশিখা বাহির হইয়া কবির হৃদয়ের অন্তস্তলে আগ্নেয় গিরির জ্বালাময়ী সজীবতা সূচিত করিতেছে। হরচন্দ্রের রচিত এই কবিতা "আলবামে" নাই, মিঃ ডান্-সঙ্কলিত কবিতা-পুস্তকে আছে।

O Yes! I love thee with a boundless love,
Land of my birth; and while I lisp thy name,
Burns in my soul "an Aetna of pure flame"
Which none can quench nor aught on earth remove,
Back from the shrouded past, as with a spell,
Thy days of glory memory recalls,
And castles rise, and towers, and flanking walls,
And soldiers live, for thee dear land who fell;
But as from dreams of bliss men wake to mourn,
So mourn I when that vision is no more,
And in poor lays thy widowed fate deplore,
Thy trophies gone, thy beauteons laurels torn,

But Time shall yet be mocked,—though
these decay,
I see broad streaks of a still brighter day.

"মুমূর্ষু আকবরের আদেশ" (Akbar's Dying Charge) নামক পদ্যময় রচনায় শক্তিশালী নরপতির যাহা কর্ত্তব্য তাহা সুন্দরভাবে উক্ত হইয়াছে। হরচন্দ্রের রচিত এই কবিতাও "আলবামে" নাই, মিঃ ডান্‌-সঙ্কলিত উক্ত "কবিতা-পুস্তকে" আছে।

This is no time to weep, my son,
By weeping you do wrong,
But bear thee up manfully
And in God's love be strong !

* * *

Lovely and large thy heritage,
As lovely as a bride,
To keep her still thine own gird on
That bright sword by thy side.

* * *

See now it hangs on yonder wall
(For powerless is the hand
That wielded it in hunt or fray)
My own, my noble brand.

* * *

Read what is writ on either side,
And write it in your breast,
Those characters of gold shine clear :
'The merciful are blest.'

* * *

Upon the jewelled hilt and haft
The diamond-sparks bespeak
The grasp around it must be pure
Though not infirm or weak.

* * *

At honour's beck, in kingdom's cause,
Like lightening let it fall,
With power avenge the oppressed and
wronged,
A[illegible]y rule o'er all.

The blood-stains on the polished steel
At merey's fount make clean,
And may thy battle-fields right soon
With waving crops be green.

* * *

In all the triumphs, all the joys
Which thy good angel brings,
Forget not to give glory, son,
To God, the king of kings.

* * *

His blessing crave, his grace implore,
Alike in weal and woe,
Long be thy reign in this fair land,
I go where all things go.

"আল্‌বামে" রক্ষিত ১৯৭টি কবিতার মধ্যে হরচন্দ্রের রচিত কবিতার সংখ্যা ১১, উমেশচন্দ্রের কবিতার সংখ্যা ৯৩, গোবিনচন্দ্রের ৬৬ ও গিরীশচন্দ্রের ২৭টি মাত্র। বিষয়-সম্পদে এই কাব্যগ্রন্থ গরীয়সী। "আলবামে"র কবিরা মোগল-ভারতের ইতিহাস উত্তমরূপ পাঠ করিয়াছিলেন। উদ্ধৃত কবিতা ছাড়া হরচন্দ্রের রচিত "হুমায়ুনের পলায়ন" (The Flight of Humayun) ও অন্যান্য কবিদের রচিত এই শ্রেণীর একাধিক চিত্র এই আলোচ্য কাব্যাধারে আছে। উমেশচন্দ্র দত্ত-রচিত "মহম্মদ ঘোরির মৃত্যু" (The Death of Mohammed Ghori) ও "জাহাঙ্গীরের আক্ষেপ" (Jehangire's Lament) ব্যতীত অন্যান্য দত্ত কবিদের রচিত খ্যাতনামা অনেকগুলি মুসলমানের চিত্র "আলবামে" রক্ষিত হয় নাই। শেষোক্ত কবিতাগুলির অধিকাংশই রায় বাহাদুর শশীচন্দ্র দত্তের লেখনী-প্রসূত ও তাঁহার অন্যান্য পদ্যময় রচনার সহিত পৃথক কাব্য-গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল। "আলবামে" রক্ষিত হুমায়ুনের মূল চিত্র কবি হরচন্দ্র মিঃ ডাউ-লিখিত (Dow's Hindosthan) "হিন্দুস্থান" নামে ইতিহাস হইতে গ্রহণ

করিয়াছেন। অমরকোটাভিমুখে হুমায়ুন যখন অশ্বারোহণে পলায়ন করিতেছেন তখন তাঁহার বাহন পথিমধ্যে মৃত হওয়াতে তিনি একজন সহগামী দলপতিকে তাঁহার অশ্বটি দিবার জন্য অনুরোধ করেন। ত্রিদি বেগ এই অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। তাহার পর কোকা নামে জনৈক সৈনিক তাঁহার মাতাকে অশ্ব হইতে নামাইয়া সেই অশ্ব হুমায়ুনকে দিলেন ও উষ্ট্রপৃষ্ঠে মাতাকে বসাইয়া নিজে মাতার পার্শ্বে দৌড়াইয়া চলিলেন। হুমায়ুন রাজসিংহাসন লাভ করিবার পর কোকাকে পুরস্কৃত ও চারণগণ কর্তৃক কোকার রাজভক্তির কাহিনী বিঘোষিত করেন। "মহম্মদ ঘোরি"র মূল চিত্র এল্‌ফিন্‌ষ্টোন-লিখিত (Elphinstone) ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে গৃহীত। কবিতার শেষ শ্লোক দুইটিতে উৎকৃষ্ট রচনা-শিল্পের নমুনা পাওয়া যায়। "আলবামে" রক্ষিত ঐ কবিতার রচয়িতা উমেশচন্দ্র দত্তের নাম বঙ্গদেশের ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যে সুপরিচিত।

What shadowy forms approach the tent,
Converse in whispers low,
And spectre-like, with muffled steps
Flit noiseless to and fro ?
The monarch from his slumber starts,
And looks around with fear,
He knew not that his hour was come,
Th' avengers dread were near.

* * *

Ere he could rouse his trusty guard,
Or grasp his falchion true,
The glittering daggers of the foe
Quick from their scabbards flew :
A hurried prayer, a heavy fall,
A stifled sigh, a groan,—
The spirit to its God had fled,
The work of death was done !
(The Death of Mohammed Ghori)

জাহাঙ্গীরের মূল-চিত্রও ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে গৃহীত। চিত্রপটে অঙ্কিত পারিপার্শ্বিক দৃশ্য কিন্তু কবির রচনা। "আলবামে"র দত্ত কবিদের ব্যাক গ্রাউণ্ড রচনায় একটু পারিবারিক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। "হুমায়ুনের পলায়নে" রাত্রিকালের বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে,—

At midnight o'er the desert sands
The monarch fled alone,
And in the light of paly stars
His blood-stained armour shone.
Disbanded were his glorious ranks,
His bravest chieftains slain,
Yet o'er his wide ancestral realm
Once more he hoped to reign.
(The Flight of Humayun)

"জাহাঙ্গীরের আক্ষেপে" রাত্রিকালের বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে, —

'Twas night and round the royal tents
The imperial guards reposed,
And slumber o'er the weary world
Her dreamy wings had closed ;
On heaven's blue arch the wakeful stars
Their vigils kept on high,
And o'er those sleeping forms the wind
Passed with a gentle sigh.
(Jehangir's Lament)

"মুমূর্ষু আকবরের আদেশ," "হুমায়ুনের পলায়ন", "জাহাঙ্গীরের আক্ষেপ" ও "মহম্মদ ঘোরির মৃত্যু", আলবামের কবিদের রচিত এই চারিখানি ঐতিহাসিক চিত্রের তিনখানিতে রাত্রিকালের বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু সে বর্ণনায় চন্দ্রালোকের স্নিগ্ধ অনুভূতি পাঠকের মনে জাগিয়া উঠে না, তমসাচ্ছন্ন নিশার বিভীষিকাময়ী চিত্রই মানস-নয়নে ভাসিয়া উঠে। "মহম্মদ ঘোরির মৃত্যু" নামক চিত্রখানি নাটকীয় শিল্প-নৈপুণ্যে রাত্রিকালের দৃশ্যেও সজীবতা সঞ্চার করিয়াছে।

They stood beneath the spreading palm,
That brave and youthful band,
They closed in silence round their chief,
To hear his proud command.

* * *

True patriots they, who inly groan'd
Their country's woes to see,
All ready to lay down their lives,
Once more to make her free.

* * *

Out spake at last the hoary chief,
Stern were the words he said ;
Brethren, the hour at last is come
For which we long have prayed ;
To day we'll free our country from
A tyrant's hated reign,
Today we'll break, no more to wear,
Base thraldom's galling chain.

* * *

Oh can we e'er forget the year
The fierce invaders came,
And laid our proudest cities low
With vengeful sword and flame !
The maiden's tears, the mother's prayer,
The children's plaintive wail,
Were all in vain—can tears or prayer
With demons aught avail ?

* * *

They came as come the sweeping storm,
No power their course could stay,—
They came as come the raging wolves,
Fierce ravening for their prey ;
And fast our gallant brethren fell,
Beneath their murderous brand,—
Thus sanctifying with their blood
Their cherish'd fatherland !

* * *

Now by the love you bore to them,
By every sacred tie,
Swear to revenge their cruel death,
And strike for liberty ?
No answer made they, but his sword
Each from his scabbard freed,
And swore a deep and solemn oath,
To perish or succeed.

* * *

Soft blew the cooling evening breeze
O'er Indus' echoing shore,
The golden stars gemm'd one by one
Heaven's deep cerulean floor.
Hush'd was the sound of revelry,
The busy camp was still ;
And gathering darkness crept apace,
Enshrouding vale and hill.

কবিবর উমেশচন্দ্র দত্ত ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মান, ও ফরাসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তরু দত্ত ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তাঁহার সহিত পত্রের আদান প্রদান করিতেন। "আলবামে" রক্ষিত কবিতা-গুলির মধ্যে উমেশচন্দ্রের রচিত কবিতার সংখ্যা সর্ব্বাধিক। উৎকৃষ্ট চিত্র-রচনায় তিনি যে সুদক্ষ ছিলেন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

রামবাগানের দত্তবংশীয় হিন্দু কবি রায় বাহাদুর শশীচন্দ্র দত্তও একাধিক মুসলমানের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। দত্ত কবিদিগের মধ্যে রায় বাহাদুরের স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার রচিত "সুমেরুর স্বপ্ন" (A Vision of Sumeru) কবির সৃষ্টি-ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে। এই কাব্য ও রায় বাহাদুরের রচিত অন্যান্য কবিতার বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হইবে। এস্থলে তাঁহার ঐতিহাসিক চিত্রগুলিতে মুসলমান হিরোর কাহিনী উল্লিখিত হইবে। "ভারতের গাথা" (Indian Ballads) নামক নিবন্ধে এই শ্রেণীর কয়েকখানি চিত্র স্থান পাইয়াছে। "জেলালুদ্দীন খিলিজী"র চিত্রে কবি কাইকোবাদের হত্যাকারীকে রাজসিংহাসনে বসিয়া যেভাবে কপট

অনুতাপ করিতে শুনিয়াছেন তাহাতে দরিদ্র প্রজার প্রতি ঐশ্বর্য্যশালী নরপতির যাহা কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে নীতি-কথার সুন্দর আলোচনায় মুগ্ধ হইতে হয়।

1

I am a king, but why forget
That I am still a man ?
And why should gilded baubles lure,
And thoughts unclean, and deeds impure
Engross life's little span ?
Who in the pride and pomp of state
Hath ever found his spirit's rest ?
In Glory's thraldom who was blest ?

2

Why impious must the vassal bend
To me his supple knee ?
And wear for me a badge of scorn,
And curse the hour when he was born
A slave for life to be ?
Rather should I his cause befriend,
Protect from shame meek Poverty's child,
And guard his honour undefiled.

9

In chains they bring the guilty bound,
To take his hapless doom ;
He comes with hope, he comes with dread,
In wrath to singe his votive head
Shall mortal man presume ?
No, let him pass ; but all around
The lenient judgment disapprove ;
Still let him pass, for God is love !

"নাদির সাহে"র চিত্রে কবির তুলিকা প্রকৃতির রুদ্র মূর্ত্তি রক্ত বর্ণে অঙ্কিত করিয়াছে। এই কবিতা পাঠ করিতে করিতে পাঠকের মন নৃশংসতার দৃশ্যে অসাড় হইয়া পড়ে। কবিবর শশীচন্দ্র নাদির সাহের পুঞ্জীভূত পাপের পরিণাম যে কি তাহারও সুস্পষ্ট আভাস কবিতার শেষ শ্লোকে দিয়াছেন।

I

He came, as from the thunder-cloud
Bursts the lurid spark of death ;
He came ; the furies in his train,
Destruction in his breath.

II

Like wild tornado of the deep,
Or lava's burning wave,
Onward rush'd the impetuous tide
Of steel-clad heroes brave.

III

Their reeking blades were red and bare,
Ambition was their star ;
Horror strode from strand to strand,
Wherever roll'd the war.

IV

Rear the crimson banner high !
Unceasing ply the sword !
And blood in torrents cleaved the plains
At Nadir's awful word.

VI

Above the victor's shout arose
The agonizing cry
Of widow'd mother for her child,
Her only pride and joy.

VIII

There palsied age stands lone in fear,
Or suppliant kneels to Heaven,
Here virgin innocence stoops to death,
Or asks to be forgiven.

X

They grasp their spears, they light the torch,
Behold, the flames aspire !
Up to the sky the smoke-clouds rise ;
O cease your ruthless ire !

XII

The widows and the orphans plead—
They plead to Heaven with tears:
Look, victor ! look, what clouds obscure
The sunset of thy years !

XIV

The hour of vengeance passeth not—
Behold the daggers gleam !
Look, victor ! look ! behind—before !
Alas, it is no dream !

XV

And none to stay the assassin's hands !
Must Nadir's sun then set ?
The widows' and the orphans' tears
Are slowly trickling yet.

তৈমুরের প্রেতাত্মার উদ্দেশে কিন্তু যে কবিতা (The Requiem of Timour) রচিত হইয়াছিল তাহারই ক্ষীণ প্রতিধ্বনি আমরা "নাদির সাহে" শুনিতে পাই।

I

Sleep, perturbed spirit, sleep
Within earth's quiet breast !
Thy task of vengeance now is o'er
Rest, ruthless conqueror, rest !

III

The world aghast has quaked beneath
The terrors of thy frown ;
Thy footsteps, they have trampled o'er
The royal neck and crown.

VI

Let Turkish widows, maids, and wives,
Unfold the havoc done,
When on Angora's bloody field
The battle fierce was won.

VII

When vengeance, lust, and carnage fed
Upon the hostile plain,
And bow'd imperial Ilderim,
His haughty neck in chain.

X

From Kabool's rocks, thy crimson flag
Stream'd proudly to the air ;
Beneath were martial shields and spears,
And sabres red and bare.

XII

The Indus' stormy waters fail'd
To bar the victor's path ;
And Delhi's burning towers confest
The awful Scythian's wrath.

XII

A thousand terrors rode along
By Gunga's quaking shore ;
And hungry vultures scream'd above
Thy sacred shrine, Hurdwar.

XV

The sites where cities proudly rear'd
Their turrets to the sky,
Are only mark'd by piles of stone,
Since Timour pass'd them by.

XIX

Rest, perturbed spirit, rest !
Rest, thunder bolt of heaven !
The avenger's rod, the victor's might,
To thee conjoint were given.

"ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুশয্যা" (The Death-Bed of Aurungzebe) আর একখানি ট্র্যাজিক চিত্র। মুমূর্ষু সম্রাট ভয়াবহ স্বপ্নে দেখিতেছেন, দারা, সুজা, মুরাদ ও দারার পুত্রদ্বয় তাঁহাকে ঘিরিয়া রোষকষায়িত নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে।

XVI

Now darker dreams torment his soul,
And madness revels there ;
The victor crown, the peacock-throne,
Have melted in the air !

XIX

Around him servile courtiers prate
To soothe his dying ears ;
Abroad, throughout his vast domains,
A nation's curse he hears.

(ক্রমশঃ)

গল্প

নাস্তিক

শ্রীমতী কুলবালা দেবী

১

আজ অলকার বিবাহ।

রৌসন চৌকি-বাদক কড়ি কোমলে মিঠা মিলন-রাগিণীর আলাপ করিতেছিল কিন্তু বিরহীর বক্ষ মাঝে তাহা বেহাগের করুণ সুরে বিলাপের মত বাজিতেছিল—আর ত' আসিবে না, আর ত' হাসিবে না, আর ত' দিবে না সে ফিরিয়া দেখা গো!

জীবন-প্রভাতের নয়নারাম তরুণ অরুণালোকে এক অতর্কিত মুহূর্ত্তে যাহাকে সে হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠা করিয়া অহোরাত্র পূজা করিয়া আসিতেছে, সে আর আসিবে না।

যে তাহার অন্তরের নিভৃত প্রান্তরে কল্পনার নন্দন রচিয়া নিত্য নিরন্তর তথায় বিচরণ করিত আর তাহাকে সে দেখিতে পাইবে না।

ঊষার নিত্য সাথী প্রত্যুষে সাজি হস্তে মূর্ত্তিমতী দেববালার মত পুষ্পচয়নরতা থাকিয়া নিঃশব্দে তাহার স্তব-গাথা শুনিতে আর আসিবে না।

আজও নিয়মিত সময়ে সে আসিয়াছিল দেব-পদে পুষ্পাঞ্জলি দিতে। ঐ যে পথের ধূলায় তার চরণচিহ্নগুলি স্বপ্নভরা স্মৃতির মত অস্পষ্টভাবে এখনও বিদ্যমান। আর ক্ষণপরে দেব-দর্শনার্থীর সমাগমে উহা যে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে! তখন তার স্মৃতিপটে থাকিবে শুধু আজীবন অদর্শনের অসহ্য জ্বালা!

সে জ্বালা নয় গো, জ্বালা নয়, সেইটুকুই আমার জীবন-পথের পাথেয়—সান্ত্বনার অমোঘ মহৌষধি।

হা অদৃষ্ট! এ কোন্ রসাতলের অতল গর্ভে নামিয়া আসিয়াছে সে? বিরূপা নিয়তি দেবীর এ কি নির্ম্মম পরিহাস! সে ত কল্পলোকবাসী কাব্যের নায়ক নয়, বাস্তবের এক ক্ষুদ্র তুচ্ছ মানব সে, এই দেবালয়ের একজন পূজারী। এই দেবালয় যাঁহার প্রতিষ্ঠিত, অলকাদেবী তাঁহারই একমাত্র কন্যা। দেব-মন্দিরে শিবলিঙ্গ স্থাপিত ছিল, কুমারী অলকা কিশোর কাল হইতে ভক্তি-পূত চিত্তে মহেশ্বরের সেবা করিতেছে। তাহার একাগ্র সাধনা সর্ব্বসাফল্যমণ্ডিত হইয়া তাহাকে ধরা দিয়াছে, আজ তার নারীজীবনের পরম-সিদ্ধি। একটু পূর্ব্বে সন্ধ্যারতি শেষ হইয়াছে, দেবালয় ক্রমে জন-বিরল হইয়া আসিতেছে। মন্দিরাভ্যন্তর দীপমালায় আলোকিত, অগুরুচন্দনের পূতগন্ধে সুরভিত। স্থানটিতে গভীর নীরবতা বিরাজ করিতেছিল আর সেই নিঝুম নিস্তব্ধতার বক্ষে পাষাণময় পিণাকীর পার্শ্বে তপোমগ্ন ঋষির ন্যায় একাকী উপবিষ্ট—নবীন পূজারী বিপ্রদাস। বিপ্রদাসের হাত দুটি বক্ষ-সংবদ্ধ, নেত্র অর্দ্ধ-নিমীলিত, দেহ তার স্পন্দন রহিতপ্রায়। সাধনা-মগ্ন তাপসের মত ইন্দ্রিয়গ্রাম রুদ্ধ করিয়া সে বসিয়াছিল, অথবা অন্তরের গুপ্ত বেদনাভার লঘু করিতে অন্তর্যামীর পদে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করিয়া দিতেছিল কি না কে জানে?

"ঠাকুর নির্ম্মাল্য দিন"—সমাহিতচিত্ত বিপ্রদাসের কর্ণে এই মৃদু সংক্ষেপোক্তি প্রবেশ লাভ করিল না।

"নির্ম্মাল্য দিন ঠাকুর, অনেকক্ষণ এসেছি, আপনাকে ধ্যানস্থ দেখে চাইতে সাহস পাচ্ছি না।"

দীর্ঘ দুই বৎসর হইতে অলকাকে সে প্রত্যহ দেখিতেছে, অন্তর নিরালায় স্থাপন করিয়া নিশি-দিন পূজা করিতেছে, কিন্তু দিনেকের তরে সে অল-কার কথা শুনে নাই, প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে

উপযাচক হইয়া কোন দিন সেও বাক্যালাপ করে নাই, সুতরাং অলকার কণ্ঠস্বর তাহার অপরিচিত। সে স্বর তাহাকে চমকিত করিল না, বা নির্ম্মাল্য-প্রদানে ব্যগ্রও হইল না সে, চিন্তাজাল ছিন্ন হওয়ায় বরং বিরক্ত হইতে দেখা গেল। পশ্চাতে না চাহিয়া একবার শুধু বলিয়া উঠিল, "কে তুমি, কি চাও?"

"আমি অলকা, বাবার নির্ম্মাল্য নিতে এসেছি।"

য়্যাঁ অলকা! চমকিত বিপ্রদাস পশ্চাতে চাহিয়া বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল! আজ অলকার অপূর্ব্ব বেশ, বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে তাহার কমনীয় বপু সুসজ্জিত, মুখে পরিতৃপ্তির আনন্দ নীরবে ফুটিয়া রহিয়াছে। সদ্যস্নানে মুক্তকুন্তলা, পট্টবাস-পরিহিতা দেববালার মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া রাজরাজেশ্বরীর কল্যাণী মূর্ত্তি তাহার নেত্রসম্মুখে। বিহ্বল চিত্তে বিপ্রদাস অলকার প্রতি চাহিয়া রহিল। মুহূর্ত্তের জন্য বিপ্রদাস ভুলিয়া গেল কাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান সে, যাহাকে দেখিলে আবালবৃদ্ধবনিতা সম্ভ্রমে মস্তক নত করে, সেই জমিদার-নন্দিনী নির্জ্জন স্থানে একা আসিয়াছেন দেবতার নির্ম্মাল্য লইতে, এই সম্পূর্ণ ভয়শূন্য দেবমন্দিরে অলকা দিনে বা রাত্রে সব সময়ই একা আসিত, আজ বিপ্রদাসের নেত্রে কিসের যেন মাদকতা লক্ষ্য করিয়া অলকা অন্তরে একটু ভীত হইল, কিন্তু তখনই সে ভাব দমন করিয়া ঈষৎ রুক্ষস্বরে কহিল, "কি ঠাকুর, নির্ম্মাল্য দিতে পারবেন, না নিজ হাতেই তুলে নেব?"

জ্বালাময় কণ্ঠস্বরে বিপ্রদাসের বিহ্বলতা দূর হইল ও মুহূর্ত্তে আত্মস্থ হইয়া তীব্র চেতনায় শঙ্কিত হইয়া উঠিল। "ক্ষমা করুন দেবী, একটা অন্তর্যাতনায় অস্থির হয়ে নিজেকে প্রকৃতিস্থ রাখতে পারি নি।" মৃদুকণ্ঠে এই কথা কয়টি বলিতে বলিতে বিপ্রদাস নির্ম্মাল্যসহ হাতটি অলকার প্রতি আগাইয়া দিল।

কি ঠাকুর, নির্ম্মাল্য দিতে পারবেন, না নিজ হাতেই তুলে নেব?

দীপের স্তিমিত আলোকে অলকা নিরীক্ষণ করিল, বিপ্রদাসের গৌর মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ, ললাটে দুশ্চিন্তার গভীর রেখা অঙ্কিত, সমুজ্জল নেত্র দুটি

নিষ্প্রভ ও নমিত, সহসা কিছু বুঝা গেল না, তবে অলকা এইটুকুমাত্র বুঝিল, পূজারী সত্যই অসুস্থ। আত্মানুশোচনায় অলকার মন ভরিয়া উঠিল, আহা, অসুস্থ ব্রাহ্মণকে কতখানি মনঃপীড়াই না দিল সে, যে মিথ্যা সন্দেহটা তাহার অন্তরে ঘনায়মান মেঘের মত জমাট বাঁধিতেছিল আত্মগ্লানির ধিক্কারে তাহা নিমেষে উড়িয়া গেল, ভক্তিপূর্ব্বক নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিয়া অপরাধকুণ্ঠিত কণ্ঠে অলকা বলিল, "আপনি অসুস্থ সে কথা আমি জানতাম না, না জেনে বিরক্ত করলাম ক্ষমা করবেন।"

"না—না—আপনার দোষ কি, অসুস্থতার সংবাদ মন্দিরবাসীরাও অবগত নয়, ক্ষণপূর্ব্বে নিজে অনুভব কল্লেম, তা ও কিছু নয়, একটু পরেই সুস্থ হয়ে যাব," এই কথাগুলি বলিয়া বিপ্রদাস শ্রান্তভাবে পূজার আসনে বসিয়া পড়িল। অলকা প্রণতা হইয়া লজ্জাজড়িতকণ্ঠে বলিল, "আশীর্ব্বাদ করুন আজিকার রাত যেন আমার জীবনকে মহামঙ্গলের পথে নিয়ে যেতে পারে।" অতি অস্পষ্ট আশীর্ব্বচন বিপ্রদাসের মুখ হইতে বিনির্গত হইল,—"জয়স্তু"।

অদূরে দুইটি ভূত জীবনের মিলন-ক্ষণে যুগল শঙ্খ যখন বাজিয়া উঠিল বিপ্রদাস তখন দেবালয়-প্রাঙ্গণে বসিয়া উচ্ছ্বাসদৃপ্তকণ্ঠে আবৃত্তি করিতেছিল—

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
মর্য্যর্পিত মনো বুদ্ধির্যো মে ভক্তঃস মে প্রিয়ঃ॥

২

বৈচিত্র্যময় জগৎপ্রাঙ্গণে নিত্য নূতনের অভ্যুদয় লইয়া বর্ষের পর বর্ষ কাটিয়া চলিল, আর এই কাটার সঙ্গে কত যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া গেল তাহার ইয়ত্তা নাই। কত অসম্ভব সম্ভাবিত হইল, কেহ গৌরবের কিরীট মস্তকে ধারণ করিল, আর কোনও হতভাগ্য জীবনব্যাপী নির্ব্বাসনের কঠোর দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর এক প্রান্তে চলিয়া গেল। অপরিবর্ত্তিত রহিল শুধু বিধিবদ্ধ নিয়ম, যাহা সৃষ্টির আদিম কাল হইতে নির্ব্বিঘ্নে—অপ্রতিহতভাবে চলিয়া আসিতেছে। সেই ছয় ঋতুর সমভাবে আবির্ভাব এবং তিরোধান, সেই পুলকোজ্জ্বল জ্যোৎস্না ও ঘোর কৃষ্ণ অমার বিকট আঁধারের পক্ষান্তব্যাপী প্রতিযোগিতা, স্রোতস্বিনীর অবিরাম তরঙ্গভঙ্গিমা, রবি-শশীর উদয়াস্ত-স্রষ্টার নীরব ইঙ্গিতে এ সকলের তিলমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিল না। দেখিতে দেখিতে দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল।

আবাল্য ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর নিয়মে নিষ্ঠাবান্ আস্তিক ব্রাহ্মণযুবক যেদিন এই দেবালয়ে প্রথম পৌরোহিত্য গ্রহণ করিলেন সেই দিনই মন্দির এবং দেবতার প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠাযজ্ঞে আহুত হইয়াই বিপ্রদাস অবন্তীনগর হইতে আগমন করিয়াছিলেন। সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে যুবক পূজার আসন গ্রহণ করিলেন। অতীব সুন্দর পূজাপদ্ধতি, স্নান, ধ্যান, আবাহন ইত্যাদি মন্ত্রগুলি ত্রুটিশূন্য এবং ভক্তিমূলক। পূজারীর অন্তরের সমস্ত ঐকান্তিকতা যেন পবিত্রতায় মূর্ত্ত হইয়া শুদ্ধসত্তায় প্রাণময়। পূজাশেষে শিবস্তোত্র পাঠ—তাহাও অতি মধুর ও মনোজ্ঞ। সঙ্গীতের মত ললিত ছন্দে তরুণের সুকণ্ঠ-নিঃসৃত সুরঝঙ্কার দেবালয় এবং সমুদয় জন মণ্ডলীকে স্তব্ধ মুগ্ধ করিয়া বায়ুস্তরে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। এ সুর ত' সামান্য নহে, এ যেন কিন্নর-লোক হইতে ভাসিয়া-আসা কোন সমর্পিতপ্রাণ সাধকের উচ্ছ্বাসপূর্ণ অভিব্যক্তি! মুগ্ধ জনমণ্ডলীর মধ্যে উপবিষ্ট স্বয়ং জমীদার ও তাঁহার বালিকা কন্যা অলকা। শ্রদ্ধার পুলকে কণ্টকিত-দেহ জমীদার স্থাণুর ন্যায় বসিয়াছিলেন, ততোধিক বিহ্বলচিত্তে

কুমারী অলকা ব্রাহ্মণকুমারকে মনে মনে শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ করিতেছিল।

যখন স্তব-সমাপ্তিতে পূজারী আশীর্ব্বাদী দিতে প্রথমেই জমীদারের সম্মুখীন হইলেন, তখন তিনি আশীর্ব্বাদ-গ্রহণের পরিবর্ত্তে সেই প্রিয়দর্শন তরুণ পুরোহিতকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া হর্ষদীপ্তমুখে কহিলেন, "পূজারী আজিকার পূজার দক্ষিণাস্বরূপ এই শিবালয় এবং দেবোদ্দেশে প্রদত্ত ভূভাগ আপনাকেই দান করিলাম, ইহার সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী আপনি।" পিতার এই সন্তুষ্টির দানে বালিকা অলকা মনে মনে পরম প্রীতা হইয়াছিল। আর সেই সঙ্গে তাহার কোমল শুভ্র চিত্তপটে নিমেষমাত্রে যে অস্পষ্ট ছায়াপাত হইয়াছিল তাহা মুছিয়া নিশ্চিহ্ন করিবার প্রয়াসে তৎপর দিবস হইতেই অলকা দেবাদিদেব মহাদেবের নিত্য পূজারিণীরূপে প্রত্যহ প্রাতে শিবালয়ে আগমন করিত।

'হর' 'হর'—শব্দে যখন অলকা পিণাকীর মস্তকে কমণ্ডলুস্থিত জলধারা প্রদান করিত তখন তাহার প্রার্থনার মূলে চিত্তজয়ের দৃঢ় প্রচেষ্টা ব্যতীত অন্য কোন কামনা অন্তরে স্থান পাইত না। এই ঘটনাগুলির পর বিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে।

আস্তিকতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ বিপ্রদাস এক্ষণে ঘোর নাস্তিক। শিবালয় শ্রীভ্রষ্ট এবং জনপ্রাণী-বিরল। ভোগ-আরতির নামমাত্র নাই, এমন কি দিনান্তে মহাদেবের মস্তকে গণ্ডূষমাত্র গঙ্গাজলও পতিত হয় না। জমীদার স্বর্গগত, জামাতা অনাচারী উচ্ছৃঙ্খল, গ্রামবাসীর মন্তব্যে তিনি কর্ণপাত করেন না। আর উপায়ও কিছু ছিল না, শিবালয়ের সমস্ত স্বত্ব যে জমীদার পূজারীকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন, নচেৎ ধর্ম্মপ্রাণ গ্রামবাসী এখনই নাস্তিকটাকে গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে ক্ষণমাত্র ইতস্ততঃ করিত না।

শিবালয়ের পাদদেশেই পুণ্য-তোয়া জাহ্নবীর বিশাল তট। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলেই সেই তরঙ্গিণী-তীর সঙ্গীত-মুখর হইয়া উঠিত। সে গান ভগবদুদ্দেশে নহে, তাহা শুধু নিরাশ প্রেমিকের অন্তর্নিহিত বেদনা-ব্যাকুল উন্মাদনায় উচ্ছ্বসিত। যে দেবালয় সন্ধ্যার ক্ষণ-পূর্ব্ব হইতে আলোক-মালায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত তাহা এক্ষণে আঁধারের রাজ্য—সু-উচ্চ সৌধ বিকট দৈত্যের মত জাহ্নবী-তীরে দণ্ডায়মান।

বহু দিবস পরে অলকা পিতৃ-ভবনে প্রত্যাগত হইল তাহার হৃত-সর্ব্বস্ব রুগ্ন স্বামী-সমভিব্যাহারে। সমরেন্দ্র মদ্যপ এবং চরিত্রহীন, সুতরাং অলকার বিবাহিত জীবন এতদিন বিড়ম্বনায় অতিবাহিত হইয়াছে। পিতার অতুল বিভবের একমাত্র অধিকারী সন্তান ধূলি-মুষ্টির ন্যায় অর্থ নষ্ট করিয়া আজ সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় দুরারোগ্য ব্যাধি-কবলিত হইয়া স্ত্রীর পিত্রালয়ে আসিয়াছে। অলকার আগমনে বিষণ্ণ গ্রামখানি অনেকদিন পরে আবার একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু সে মাত্র কয়েক দিনের জন্য। তাহার পর হইতে আশু অমঙ্গল আশঙ্কায় গ্রামস্থ সকলে উৎকণ্ঠিতচিত্তে সময়াতিবাহিত করিতে লাগিল।

যথাসাধ্য চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় কোন ফলোদয়ই হইল না, সহসা একদিন অলকার স্বামী সাধ্বী স্ত্রীর কোলে মাথা রাখিয়া লোকান্তরে চলিয়া গেলেন।

৩

সেদিন শুক্লা চতুর্দ্দশী। জ্যোৎস্না-প্লাবনে ধরিত্রী প্লাবিতা। সবে মাত্র সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে; ইতি-মধ্যেই মনে হয় সমস্ত বিশ্ব যেন সুপ্তির ভিতরে ডুবিয়া রহিয়াছে। বায়ু পর্য্যন্ত যেন শোকার্ত্ত হৃদয়ের গভীর দীর্ঘশ্বাসের মত হা-হা রবে বহিয়া

গাইতেছে। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ, জন মানবের সাড়া-শব্দ নাই। গঙ্গাতীরে যেখানটিতে শিবালয়, তাহার কিয়দ্দূরে শ্মশান, সেই শ্মশানে একটি মাত্র চিতা ধূধূ জলিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত আলোকাকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, আর সেই চিতার সন্নিকটে শব-দাহক ব্যক্তি কয় জন নিঃশব্দে বসিয়া আছে। মন্দিরের বিস্তৃত অঙ্গনে বসিয়া নাস্তিক সেই জ্বলন্ত চিতার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। রুক্ষ তাহার কেশ, মলিন উত্তরীয় ও বসন, সর্ব্বপরি তাহার কঙ্কালসার দেহটা সহসা দৃষ্টে মনে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করে। সম্ভবতঃ গঞ্জিকাসেবনে চক্ষু আরক্ত, দৃষ্টি মাঝে কিন্তু জ্বালা ছিল না, ছিল নির্ব্বিকার চিত্তের গাঢ় প্রশান্তি। কতক্ষণ সে এই ভাবে বসিয়া আছে কে জানে, সহসা পশ্চাতে তীব্রকণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল, "শিবালয় অন্ধকার কেন পূজারী?"

চমকিত স্তম্ভিত বিপ্রদাস চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে এক নারীমূর্ত্তি।

উত্তর দিন, দেবালয়ের প্রকৃত স্বত্বাধিকারিণী আপনার সম্মুখে! পূজারী নীরব। কি উত্তর দিবে সে? কণ্ঠ যে তখন তাহার উচ্চারণ শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে।

কণ্ঠে অনল উদ্গার করিয়া নারী আবার বলিল, "দেবতার অবহেলায় যে মহাপাতক সঞ্চয় হয়েছে তার প্রায়শ্চিত্তভাগী হয়েছি আমি,—আপনি নয়, কিন্তু পূজারী ভাগ্যহীনা নারী সমস্ত অভিসম্পাতের বোঝা মাথায় তুলে নিয়ে আবার আপনারই কাছে ছুটে এসেছে আজ বিশ্বেশ্বরের দ্বারপ্রান্তে এতটুকু আশ্রয় ভিক্ষা করতে। উঠুন ব্রাহ্মণ, পৌছে দিন আমায় আমার অভীষ্ট পথে।" নারীর শেষের কথা কয়টি ব্যাকুলতাপূর্ণ।

"অলকা—না না, দেবী ক্ষমা করুন, এ নাস্তিক নিজেই সে পবিত্র পথের রেখা হারিয়ে ফেলেছে। আর আমায় ব্রাহ্মণ বা পূজারী বলে সম্বোধন করবেন না। আমি ভণ্ড,—ধর্ম্মের আবরণে পাপিষ্ঠের স্বরূপ গোপন ছিল—পুণ্যের প্রভাবে তা খসে গিয়েছে। এখন হতে অধার্ম্মিক নাস্তিক বলেই আমায় জানবেন।" বিপ্রদাসের কণ্ঠস্বরে অনুতাপের বেদনা সুপরিস্ফুট। ইহকাল স্বেচ্ছায় হারিয়েছেন বলে পরলোকেরও প্রত্যাশা রাখেন না? "না অলকা, সে অধিকারও আমার নাই, নাই কেন শুনবে? ঐ পাষাণ মূর্ত্তি জড়, ওতে কোন সত্তাই নেই দেখে আমি এখন চেতনের উপাসক, এই চেতনের মাঝেই আমি পূর্ণ সত্তা উপলব্ধি করেছি, তাই বিশ্ব-দেবতার কাছে আমার কোন কিছু প্রার্থনা নাই, সারা বিশ্বের কাছে আমি নাস্তিক হয়ে থাকতে চাই আর এই নাস্তিকতার মাঝেই আমি চেতনের পূজার বিপুল আয়োজন করে রেখেছি, এ হতে প্রত্যাবর্ত্তনের উপায় আর নাই।"

বিপ্রদাসের কথায় এমন একটা দৃঢ়তা ছিল, যাহা যুক্তি-তর্কের দ্বারা খণ্ডন করা অসাধ্য বিবেচনায় অলকা কিছুক্ষণ কোন কথা বলিল না। উভয়ের মাঝে তখন অসহ্য নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। ইহা যেন যুগ-যুগান্তব্যাপী ব্যর্থ সাধনার অসাফল্য। সহসা অসংখ্য দীপমালার সমুজ্জ্বল আলোক দেওয়ালীর আলোকোৎসবের ন্যায় সমস্ত দেবালয়কে প্লাবিয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে হর হর বোম্ বোম্ শব্দ সমুত্থিত হইয়া নাস্তিককে বিস্মিত চকিত করিয়া তুলিল। অস্ফুট-কণ্ঠে বিপ্রদাস শুধু বলিল, একি? আমারই আদেশে শিবালয়ে পূজারতির আয়োজন হয়েছে, সমস্ত প্রস্তুত, শুধু আপনারই প্রতীক্ষায় দেবতার অভিষেক-অনুষ্ঠান সমাধা হচ্ছে না। অলকা? বিপ্রদাসের অকম্পিত স্বরে যেন বহুদিনের একটা গোপন প্রচেষ্টা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু

অলকা তাহার উচ্ছ্বাসের মুখেই বাধা দিয়া বেশ শান্ত সংযত স্বরে বলিল, "অলকা আর এ পৃথিবীতে নাই পূজারী! তার মৃত্যু হয়েছে, ঐ দেখুন অলকার জলন্ত চিতা তার ইহলোকের সমস্ত দেনা পাওনা বুঝে নিয়ে গর্ব্ব-স্ফীত বুকে কেমন ধূ ধূ জলছে। ঐ মহান্-মধুর আলোর খেলার মধ্যে অলকার যথাসর্ব্বস্ব ভস্মীভূত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বেশ লক্ষ্য করে দেখলে বুঝা যায়, জলন্ত অঙ্গার অক্ষরে—যেন লেখা রয়েছে, এই চৈতন্যের পূর্ণ-বিকাশ, এই অনলকুণ্ডেই দেহ এবং দেহীর চিরন্তন সাধনা-সমাধি রচিত। আর জীবন? ওটা শুধু ব্যর্থতার ভস্মস্তূপ! ঐ তুচ্ছ ক্ষুদ্র স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে বিশ্বের শোভা সৌন্দর্য্য কিছুই লক্ষীভূত হয় না।"

"আসুন পূজারী, আর বিলম্ব করবেন না, ঐ পবিত্র চিতালোক আজ আমাদের প্রথম জীবনের নিমেষ-ভুলের সমস্ত অন্ধকার দূর করে যথাপথে পৌঁছে দেবে।"

প্রত্যূষে মঙ্গলারতি-শেষে পূজারী যখন মন্দির-বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন তাঁহার বিচিত্র বেশ। গৈরিক বস্ত্র উত্তরীয় পরিহিত স্বয়ং ব্রহ্মণ্য-দেব যেন সশরীরে দণ্ডায়মান। বক্ষে তাঁহার রুদ্রাক্ষ হার, ললাটে ভস্মের ত্রিপুণ্ড্র, নেত্রে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ। স্নান-শেষে সদ্য বিধবা বেশধারিণী অলকা সম্মুখে আসিয়া প্রণতা হইল এবং ভক্তি-গদগদ-কণ্ঠে বলিল, "নাস্তিকের অভ্যন্তরে এই প্রাণবন্ত পরম পুরুষকেই দেখতে চেয়েছিলাম, বিশ্বনাথ আমার আশা পূর্ণ করেছেন।"

"দেবী! অতি শুভমুহূর্ত্ত। আশ্চর্য্য হবেন না, আজ এই প্রভাত সময়েই এ মন্দির হতে আমার মহানিষ্ক্রামণ! আপনার সাক্ষাৎ-লাভের প্রতীক্ষায় একটু বিলম্ব হয়ে গেছে।"

বিস্ময়ে হতবুদ্ধিপ্রায় অলকা স্তম্ভিতভাবে পূজারীর প্রতি চাহিয়া রহিল। বিপ্রদাস সজল-কণ্ঠে আবার বলিল, 'ক্ষমা করবেন, এ অপরাধীকে, অসংযত চিত্তকে জয় করবার জন্য এখান হতে বিদায় হচ্ছি। যদি কোন দিন অনন্ত প্রেমময়কে অন্তর-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করে সাধনার মূলভিত্তি গড়ে তুলতে পারি, সেদিন আবার ফিরে আসব, নচেৎ এই আমার চিরবিদায়।' আর তিলার্দ্ধ কালক্ষেপ না করিয়া পূজারী পথে নামিয়া পড়িল।

যখন সে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল—অলকা তখন একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিল, "ওগো বিশ্ব-দেবতা, হতভাগ্যকে বিশ্ব-প্রেমের অধিকারী কর, নাস্তিকের ব্যাকুল নিবেদন অবহেলা ক'র না নাথ!"

গল্প

প্রায়শ্চিত্ত

শ্রীহেরম্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

"নলিনী কোথায় রে", বলিয়া প্রফুল্লমুখে একটি যুবক একজন সাধারণ গৃহস্থের বহির্ব্বাটীতে প্রবেশ করিল। অন্দরমহলে তার আগমন সংবাদটা কি ভাবে পাঠাইবে প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া একটু ভাবিল এবং বাহিরের ঘরে কাহাকেও পাইবার আশা করিয়া, সে ঘরে ঢুকিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে চমকিয়া উঠিল। একটি অতি কৃশ রুগ্ন যুবক একখানি তক্তপোষের উপর শায়িত,—সে যেন জীবনের সমস্ত হিসাব-নিকাশ শেষ করিয়া যাত্রা করিয়া রহিয়াছে; যে কোন মুহূর্ত্তে বাহির হইয়া পড়িলেই হয়।

আধক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া আসিয়া যুবকটি শ্রান্ত না হইলেও রুগ্ন লোকটিকে দেখিয়া, হঠাৎ একটা দুঃসংবাদ পাওয়ার মতই স্তব্ধ হইয়া রোগীর শিয়রে বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া, সুপ্ত নলিনীকে একটা ঠেলা দিয়া ডাকিল "এখনো যে শুয়ে আছিস্।"

যুবকের তন্দ্রা কাটিয়া গেল। নবাগতের মুখের উপর বিস্মিত দৃষ্টিখানি রাখিয়া সে বলিল, "এ যে আশাতীত ভাই; সুবোধ তোর আসাটা আজ আমার একান্ত প্রয়োজন ছিল; কিন্তু তুই যে আস্‌তে পারিস্ এ আমি কল্পনাও করতে পারি নাই। এই ভালই হ'ল যে, তোর হাতে আজ সব সঁপে দিতে পারব। চল্ ভিতরে।" কথাগুলি বলিয়া নলিনী উঠিয়া চলিল। কথাগুলির অর্থ ঠিক্ বুঝিতে না পারিয়া ও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া সুবোধ তাহার অনুসরণ করিল।

২

গোড়ার কথা। দরিদ্র পিতার একমাত্র পুত্র নলিনী, জমিদারের একমাত্র দুলাল সুবোধের সঙ্গে একই স্কুলে এবং একই কলেজে পড়িতে পড়িতে বি-এ, পাশ করিয়াছে। ভিন্ন গ্রামের হইয়াও পাঠশালাতে হঠাৎ কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে দুই জনের চোখোচোখি হইয়া গিয়াছিল যে, পরে তাহাদের এই বন্ধুত্ব গাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। এই ভালবাসার মধ্যেও কিন্তু একটু ফাঁক ছিল, নলিনী সকল সময়েই দারিদ্র্যের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিত। বি-এ, পাশ করিয়া নলিনী পিতামাতার আগ্রহে কলিকাতাবাসী এক ধনীর মেয়ে বিবাহ করিল, আর সুবোধ বিবাহ করিল এক দরিদ্রা বিধবার মেয়েকে।

পুত্রবধূ আনিয়া নলিনীর পিতামাতা যেন আড়াআড়ি করিয়া এই পারের বোঝা পুত্রের ঘাড়ে চাপাইয়া বছর না ঘুরিতেই ওপারে চলিয়া গেলেন। এই সময় বন্ধুর যাহাতে চাকুরী না করিয়াও চলিয়া যায় এইরূপ কিছু দিতে সুবোধের আপত্তি ছিল না। কিন্তু বন্ধু যে, তাহার এই দান গ্রহণ করিবে না তাহা তাহার অবিদিত ছিল না। সুতরাং সে ভাবিল বন্ধুকে যখন চাকুরী দ্বারা অন্নের সংস্থান করিতেই হইবে, তখন সে কেন তাহার ম্যানেজার হইয়া মাহিয়ানা গ্রহণ করিবে না। সে চিন্তা করিয়া নলিনীর কাছে এই কথা উত্থাপন করিল কিন্তু এই নিরীহ ভাল মানুষটি উত্তর দিল, "ভাই আমার জীবন-বীণা যে পর্দ্দায় বাঁধা আছে বলে আজ তোর সঙ্গে আমার সুর মিলে যাচ্ছে সেই পর্দ্দাটাকে চড়িয়ে দিতে গেলে শুধু যে বেসুরা বাজবে তাই নয়, ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে ষোল আনা। যদি ছিঁড়েই যায় তখন অত্যন্ত ক্ষতিটা আমারই হ'বে, কারণ জোড়া দিবার ক্ষমতা আমার নেই।"

অত ভাবিবার মত সূক্ষ্মবুদ্ধি সুবোধের ছিল না, সে তাকে ভালবাসিত ভাইয়ের মত এবং চেষ্টা করিত নিজের সমান করিয়া রাখিতে। ছেলে বেলা হইতে এইরূপ আঘাত সে না কি অনেকই পাইয়াছিল নলিনীর নিকট হইতে; আজিকার আঘাত সে আর সহ্য করিতে পারিল না, সে প্রতিজ্ঞা করিল, যতদিন বন্ধু তাহার নিকট হইতে ভাইয়ের দাবী গ্রহণ না করিবে, ততদিন সে আর তাহার সহিত কোন সংস্রব রাখিবে না, এমন কি তাহার কোন খবরও লইবে না।

এই ভাবে এক বৎসর সে তাহার প্রতিজ্ঞা অটুট রাখিয়াও যখন দেখিল যে, এই খামখেয়ালি বন্ধুটি না আসিল ভাইয়ের দাবী লইয়া, না আসিল তাহার সুখ দুঃখের সংবাদ লইয়া, তখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের মহাপাতক মাথায় করিয়াই আজ আসিয়াছে বন্ধুর খবর লইতে। বন্ধুর শরীরের অবস্থা দেখিয়া সুবোধ একেবারে "থ" হইয়া গেল।

৩

রাগে অভিমানে সুবোধের দুই চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিতে চাহিল। বাড়ীর মধ্যে আসিয়া সে কিছুক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া রহিল এবং অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে বলিয়া উঠিল, "নলি তোর কাছে আমি এমন কি অপরাধ করেছি ভাই? এই শরীর তোর তবুও আমাকে একটা খবর দিস্ নাই! তুই ভেবেছিস্ তোর চেয়েও প্রতিজ্ঞাটা আমার বড়? আমি তো ভাবতেও পারি নাই তুই নিষ্ঠুর হ'য়ে আমার উপর এতবড় একটা অত্যাচার করতে পারবি! ওঃ! মরতে বসেছে তবুও আমায় খবর দেওয়া নেই! বৌ কোথায় রে?"

"সে তো এখানে নেই।"

"এখানে নেই কি রে! কোথায় গেছে রে সে তোকে এ ভাবে ফেলে রেখে? কদ্দিন গেছে?"

"মা মরার পরই সে কলকাতায় তার বাপের কাছে গেছে একটু শান্তি পেতে। আমি তাকে যেতে নিষেধ করি নাই। চিরকাল সে সহরে লালিতা, গ্রামের বর্ব্বরতা যদি তার ভাল না লাগে, তা হ'লে তাকে এখানে আটকে রেখে কষ্ট দেওয়ার মহাপাতক আমি কি করে করি ভাই? পল্লীর পর্ণকুটীর যদি তার পছন্দ না হয়, তাকে দোষও তো দেওয়া চলে না ভাই।" কথা কয়টি বলিয়া নলিনী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

"সত্যি বল ভাই, আমি জানতে চাই, সে তোকে চায় কি না?"

"সহরে এবং গ্রামে যতটা তফাৎ আমাতে আর সুরমাতেও ঠিক্ ততটাই,—দেনা পাওনার গন্ধ তার মধ্যে আছে কি না জানি না তো ভাই। থাক্ ওসব কথা। দিন ত আর নেই ভাই, এবার বাড়ী ঘরের ভারটা তুই নিয়ে আমায় প্রায়শ্চিত্ত করতে দে।"

চোখের জল রুদ্ধ করিয়া সুবোধ প্রশ্ন করিল, "গত ছয়মাস তো নিজের হাতেই সংসারের কাজ কচ্ছিস্ দেখতে পাই, মাষ্টারীর টাকাগুলি কি করেছিস্? জমিয়েছিস্ কিছু?"

"না ভাই, জমার ঘরে কোন অঙ্ক পড়ে নাই। কি করে হ'বে,—আমার নিজের খরচটা বাদ দিয়ে যে ২৫৲।৩০৲ টাকা থাকে তা সুরমাকে পাঠিয়ে না দিলে তার হাত খরচ কি করে চলে? বিয়ে করেছি, তার সুখ-সুবিধা আমি না দেখলে কে আর দেখবে ভাই!"

"কি করেছিস্! একটা নারী, যে তোর মত স্বামীকে অবজ্ঞা করে, বিলাসে ডুবে আছে তাকে

তোর সমস্ত কিছু নিঃশেষে দিয়ে, হৃদয়ের শূন্যতায় দিন দিন ধ্বংসের পথে ছুটে চ'লেছিস্! যদি দিতেই পেরেছিলি নির্ব্বিকারচিত্তে, তা হ'লে কিছু ফিরে না পাওয়ার অভিমানে মরতে চলেছিস্ কেন ভাই ? তোর একটা খোঁজ নেওয়াও বোধ হয় সে দরকার মনে করে না ?"

"তাকে আমায় খবর দেওয়ার জন্য আমি তো ব্যস্ত নই ; তার আনন্দের মাঝে হঠাৎ এই নিরানন্দের বার্ত্তা দিয়ে আমার লাভের চেয়ে ক্ষতিই কি বেশী হ'বে না ভাই ? তার শান্তিটুকুও নষ্ট করব !"

কি ক্ষতি যে হইত সুবোধ তাহা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু এই ক্ষয় রোগের গোড়া যে কোথায় তাহা তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না। সে আর প্রশ্ন না করিয়া ব্যথিতস্বরে নলিনীকে বলিল, "তোর কথা আর আমার শোনবার দরকার নাই। সর্ব্বনাশের সব পথ যে তুই নিজের হাতেই কেটেছিস্ তা আমি বুঝতে পেরেছি। সবাই তোকে ফেলে চলে যেতে পারে, আমি তো আর ফেল্‌তে পারব না। আমার চেয়ে তুই এ খবরটা কম জানিস্ না, তবুও কি অভিমান তোর হ'য়েছে ভগবানই জানেন। যাক্ ঢের হ'য়েছে, এবার তোর কি কি সঙ্গে নিতে হবে ব'লে দে, আমি সব গুছিয়ে পাল্কি নিয়ে আসি।"

"কোথায় যাব ভাই ? শত চেষ্টা করেও হয় তো আমাকে রক্ষা করতে পারবি না, তবে এ ব্যর্থ প্রয়াস কেন ?"

"অনেক অত্যাচার করেছিস্ তুই আমার উপর। স্কুলের দিনগুলি হ'তে স্মরণ করে দেখ্, নিজের ভাইয়ের মত পেতে চেয়েছি তোকে—তুই রয়েছিস্ দূরে সরে। এমন কি একসঙ্গে আমার খাবারটিও খাস্‌নি, আমি বড়লোক বলে। তার পর সংসারে প্রবেশ মুখে—যাক্ সে কথা, এতেও কি বড়লোকের ঘরে জন্ম নেওয়ার শাস্তি আমার হয় নি ? আমার জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ ক'রে দিয়েছিস্, জানি সে আমার তোকে ভালবাসার প্রায়শ্চিত্ত। আজও যদি তোর সেবার ভার গ্রহণ করবার অধিকার হ'তে আমায় বঞ্চিত ক'রে তোর সুখ হয়, বেশ তাই হোক্। আসি—এই শেষ দেখা।" উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের রোলকে দমন করিতে না পারিয়া সুবোধ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরের দিকে পা বাড়াইল। নলিনী পড়িতে পড়িতে ছুটিয়া যাইয়া সুবোধকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল ; "ভাই এই পড়ো দেহখানি নিয়ে যদি তোর কোন কাজে লাগে, নিয়ে চল্। হয় তো ছেলে বেলা হ'তে তোর মনে কষ্ট দিয়েছি ব'লে—তোর ভালবাসার অমর্য্যাদা করেছি ব'লে, আজ আমাকে এতবড় শাস্তি পেতে হ'য়েছে। শেষ সময়ে তোর ইচ্ছার অপমান করে আর পাপের ভার বাড়াতে সাহস হয় না।"

* * *

৪

কলিকাতা নগরী। একটি সুপ্রশস্ত রাস্তার উপর আধুনিক রুচিসম্মত একখানি ত্রিতল বাটী, তাহারই একখানি সুসজ্জিত দ্বিতল কক্ষে, একটী শুভ্র শয্যার উপরে যৌবনলীলায়িত দেহখানি ঢালিয়া একটী ষোড়শী রূপসী তন্বী উপন্যাস পাঠে নিযুক্তা। তাহার চূর্ণকুন্তলগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পশ্চিম গগনের শেষ রক্তিম আভাটুকু গায়ে পড়ায় রমণীকে আরও সুন্দর দেখা যাইতেছিল। সুন্দরীর দীর্ঘশ্বাসে মনে হইতেছিল তাহার হৃদয়তন্ত্রীর কোথায় যেন একটু বিশৃঙ্খলা আছে,—ঠিক সুরে যেন বাজিতেছিল না। উপ-

ন্যাসের পাতায় মনটা ঠিক বাঁধা পড়ে নাই, এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছিল।

নীচ হইতে ডাক আসিল, "একবার নীচে নেমে আয় তো সুরমা।"

"যাই", বলিয়া সে শিথিল বস্ত্র সংযত করিয়া পুস্তকখানা রাখিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল। একটা বিরক্তির চিহ্ন যেন মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

"মা, নলিনীর এক বন্ধু এসে খবর দিয়ে গেল, নলিনীর বড্ড অসুখ, এখানেই কোথায় আছে সে; এই যে ঠিকানা। একবার যাওয়া উচিত নয় কি?" এই বলিয়াই মা মেয়ের মুখেব দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার এই মেয়েটি যে স্বামীকে একটুও ভক্তি-শ্রদ্ধা করে না তাহা সে জানিত। অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন দেখিল মেয়ের পরিবর্ত্তন অসম্ভব, তখন একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। কর্ত্তার সঙ্গে ইহা লইয়া সে ঝগড়াও কম করে নাই।

"তোমাদের যেতে হয় যেতে পার। আজ আমাকে থিয়েটারে যেতে হ'বে। অসুখ তাতে কি,—তাঁকে দেখবার তাঁর বন্ধুই আছে। এখনই ত কিছু হ'য়ে যাচ্ছে না,—একদিন যাওয়া যাবে।" উত্তর দিয়াই কন্যা হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। মায়ের চোখ দিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

৫

সুরমা কিন্তু সেদিন থিয়েটারে কিছুতেই মন দিতে পারিতেছিল না। কিসের একটা অতৃপ্তি জমাট বাঁধিয়া তাহার হৃদয়ে চাপিয়া বসিয়াছিল। মাথা ধরার অজুহাত দিয়া সে থিয়েটার শেষ হইবার পূর্ব্বেই চলিয়া আসিল। দুগ্ধফেননিভ শয্যা আজ কণ্টকের মত তাহার গায়ে ফুটিতে লাগিল। সে বারাণ্ডায় যাইয়া রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, কেন তাহার এ অস্বস্তি! এ কি কণ্টক তাহার হৃদয়ে! চাঁদের আলোতে আর সে মাধুর্য্য নাই। সমস্ত আলোক বাতাস যেন একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করিতেছিল। ভয়ে সে চক্ষু বুজিল। তাহার মনে হইতেছিল এসব কোন কিছুতেই তাহার প্রয়োজন নাই, যাহাকে তাহার প্রয়োজন এই সব উৎসবের সঙ্গে তাহার কোন সংযোগ নাই বলিয়াই যেন ইহার সমস্ত আনন্দ ব্যর্থ হইয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। ভয়ে আর সে চক্ষু মেলিয়া কোন দিকে চাহিতে সাহস করিল না। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ সে স্বপ্ন দেখিল, তাহার হৃদয়-দেউলে প্রেম-দেবতার আসনখানি শূন্য পড়িয়া আছে। পূজারী সে ধূপ ধূনা দেয় না, পূজার উপকরণ সাজাইয়া, শুচি বসন পরিয়া প্রেমপুষ্পে পূজা না করিয়া সে ভোগসায়রে ডুবিয়া আছে বলিয়া তাহার প্রেমের ঠাকুর আজ মন্দির ছাড়িয়া চলিয়াছে। সে দেবতার মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল; দেখিল মুখখানি তাহার অতি পরিচিত, অতি আপনার; অনেকক্ষণ দেখিয়া হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল, য়্যাঃ! এ যে তাহার স্বামী। সমস্ত চৈতন্য তাহার লুপ্ত হইতে চাহিল, সে বসিয়া পড়িল। তাহার স্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গেল। সে দিবালোকের মত স্বচ্ছ দেখিতে পাইল, ভোগের মধ্যে সে তৃপ্তি পায় নাই কেন? একটা বিরাট হাহাকারে হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অভিশপ্ত যৌবনের ব্যর্থতায় দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেলে সে জোর করিয়া আজ প্রথম স্বামীর কল্যাণ কামনা করিল, তাঁহার নিরাময়ের জন্য বুকের রক্ত দিতে প্রতিজ্ঞা করিল। সারারাত্রি কাঁদিয়া কাটাইল।

পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার সময় সুবোধ নিজে আসিয়া খবর দিয়া গিয়াছিল। আজও আবার আসিয়া,

সুরমা খুব ভোরে উঠিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে তাহার প্রতীক্ষায় সদরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সুবোধ যখন আসিল তখন বেশ বেলা হইয়াছিল, তাহার বিষণ্ণ মুখে কি দেখিল জানি না, সুরমা ছুটিয়া গিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিল, "ঠাকুরপো বেঁচে আছেন তো? একটিবার আমায় দেখাও ভাই। অনাদার করে আমি তাঁকে যমের হাতে তুলে দিয়েছি, নিস্তার যে আমার নেই আমি ভাল করেই জানি,—তবুও—তবুও—চাই তাঁর পা দুটো ধরে বলতে যে, যার জন্য তিনি মরণকে ডেকে এনেছেন, সে তাঁরই।" এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া ব্যথা-ভরা দৃষ্টিখানি সে সুবোধের মুখের উপর তুলিয়া ধরিল। সুরমার মা আসিয়া সুরমাকে কাপড়টা বদলাইয়া লইতে বলিলেন। সুরমা উত্তর দিল, "মা বাহিরের যে বিলাসিতাটা আমার অন্তরকে রিক্ত করে দিয়েছিল,—তাকে আর আমার দরকার নেই। আমি যে ভিখারী। চল ঠাকুরপো।"

বন্ধু-পত্নীকে লইয়া সুবোধ গাড়িতে উঠিল।

৬

সুরমাকে লইয়া সুবোধ যখন ফিরিল তখন অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে। তাহাকে পাশের ঘরে রাখিয়া সুবোধ নলিনীর ঘরে প্রবেশ করিল। সেবা-নিরতা সুবোধের স্ত্রী তাহাকে আসিতে দেখিয়া, ধীরে ধীরে রোগীর শিয়র হইতে উঠিয়া আসিয়া সুবোধের কানে কানে বলিল, "এই মাত্র ডাক্তার বলে গেল, আর আধ ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ হ'য়ে যাবে।" সুবোধ কতক্ষণ দাঁড়াইয়া মুমূর্ষুর পানে চাহিয়া রহিল। তাহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুর ধারা ঝরিতে লাগিল। স্ত্রী প্রশ্ন করিল, "সে অভাগিনী এসেছি কি?" "হাঁ, এসেছে, ঐ ঘরে আছে নিয়ে এস।" বধূ চলিয়া গেল। সুবোধ চক্ষু মুছিয়া বন্ধুর পাশে যাইয়া বসিল। অতি কষ্টে জোর করিয়া চক্ষু মেলিয়া, রোগী অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "বেশী সময় আর নেই ভাই। অনেক কষ্ট দিয়েছি, এ জীবন ভরে'; তার প্রায়শ্চিত্ত করতে তোকেই যেন আবার আমার কাছটিতে এমনি নিবিড়ভাবে পাই।"

"নলি একবার তোর বৌকে ডাকি?"

"তাকে আর—।"

"সে এবার খাঁটি সোণা হয়েই এসেছে। তুই আর তা দেখতে পেলি না,—এর চেয়ে বড় দুঃখ তো আজ আর ওর নেই। যাকে না পেয়ে আজ তুই মরতে চলেছিস,—সে তোকে পেতে তোরই কাছে এসেছে।" কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সুবোধের স্ত্রী সুরমাকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। টলিতে টলিতে সুরমা যাইয়া স্বামীর মৃত্যুশীতল পা দু'খানি বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া একটা করুণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "ওগো আমায় না ডেকে তুমি কোথায় চলেছ? আমি এসেছি, আমায় নিঃস্ব করে চলে যেও না;—তোমায় অবহেলা করবার এত বড় শাস্তি আমায় দিও না। আমার অপরাধ—।"

"তুমি তো কোন অপরাধ কর নি সুরমা, এ যে আকাশের চাঁদকে পেতে যাওয়ার প্রায়শ্চিত্ত আমার। আমার এতে দুঃখ নেই,—অভিমানের কথা নয় সুরমা, এটা হওয়াই স্বাভাবিক। আর আমার কিছু বলবার নেই। সুখে—থেক। উঃ! সু—বো—ধ—ভা—ই—"

একটা ক্রন্দনের রোলে নিদাঘের মধ্যাহ্নটা হাহাকার করিয়া উঠিল।

গল্প

স্বামি-শুদ্ধি

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ

১

হরগঞ্জের হারাধন মুখুজ্যের পত্নী জগৎতারিণীর মত দজ্জাল মেয়েমানুষ তাহাদের পাড়ায় কেন, সে গ্রামে বড় একটা কেহ আছে বলিয়া শুনা যায় না। কোঁদল করার আর্টটা সে এমনই কেতা-দুরস্ত ভাবে কায়দা করিয়া লইয়াছে যে, অপরাপর পাড়াকুঁদলীরাও তাহার কাছে হার মানিতে বাধ্য হইয়াছে। হারাধন মুখুজ্যে একজন ডাকসাইটে দেশবিখ্যাত বক্তা, বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইলে তাঁহার মুখ দিয়া খৈ ফুটিতে থাকে কিন্তু বাড়ীতে মুখরা পত্নীর নিকট সর্ব্বদাই তিনি তটস্থ, মুখ দিয়া বড় একটা কথা বাহির হয় না। জগৎতারিণীর ক্ষুরধার রসনার ভয়ে তিনি বাড়ী ছাড়িয়া অনেক সময়ে পলাইবার অবসর পাইলে মনে করেন--তাঁহার একটা ফাঁড়া কাটিয়া গেল।

হারাধন মুখুজ্যে একজন কর্ম্মী পুরুষ। সুবক্তা, দেশ-মাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক এবং হিন্দুয়ানীর পৃষ্ঠপোষক বলিয়া অনেকদিন হইতে তিনি বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। যখন যেখানে যে কোন সভা-সমিতি হয়, দলাদলির মীমাংসা-বৈঠক বসে, হিন্দুয়ানী রক্ষা, পতিতা উদ্ধার এবং অস্পৃশ্যতা পরিহারের আন্দোলন উপস্থিত হয়, সেই স্থানেই মুখুজ্যে মহাশয় অগ্রণী হইয়া উপস্থিত হন। বক্তৃতা করিতে না পারিলে তাঁহার গলা সুড়-সুড় করে।

এবার মহেশগঞ্জের বাজারে মহা ধুমধামে সর্ব্ববর্ণ সমন্বয় করিয়া সার্ব্বজনীন বাসন্তী পূজার আয়োজন হইয়াছে। হারাধন তাহার অন্যতম প্রধান পাণ্ডা। এই ব্যাপারে তিনি এতদূর মাতিয়া গিয়াছেন যে, বাড়ীঘর বলিয়া তাঁহার মনে নাই, এমন কি জায়া জগৎতারিণীর জ্বালাময়ী রসনার তীব্র ভৎর্সনাও তাঁহার স্মরণপথে উদিত হয় নাই। তিনি এখন মাথায় গামছা এবং কোমরে চাদর বাঁধিয়া দেশমাতৃকার সেবায় উন্মত্ত; দেশের হাড়ি, ডোম, চামার, চাঁড়াল, মেথর, মুদ্দফরাসকে লইয়া এক ফরাসে বসিয়া অস্পৃশ্যতার সপিণ্ডকরণ করিয়া সৎসাহসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া পরপদানতা, পদে পদে লাঞ্ছিতা ভারতমাতার উদ্ধার তথা তাঁহার মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন।

২

অদ্য পূজা। প্রাতঃকালে মুখুজ্যে মহাশয় যখন মহাব্যস্ত হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াই-তেছেন, সেই সময়ে হরগঞ্জের পদার পিসী তাঁহাকে একটু অন্তরালে ডাকিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কি কয়েকটী কথা বলিল। সুপ্তলোকের পায়ে তপ্ত অঙ্গার পড়িলে সে যেমন লাফাইয়া উঠে, মুখুজ্যে মহাশয়ের অবস্থাও তদ্রূপ হইল। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখখানায় কে যেন একপোঁচ কালি মাখাইয়া দিল। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আমোদে উন্মত্ত বিলাসকুঞ্জের দ্বারে খাড়া ওয়ারেণ্ট হাতে সহসা লালপাগড়ীর আবির্ভাবে আসামীর অবস্থাও বোধ হয় এতটা শোচনীয় হয় না। মুখুজ্যে মহাশয় তাহার মুখপানে ফ্যাল-ফ্যাল-নেত্রে চাহিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। পদার পিসী কহিল, —"খুড়ো ঠাকুর! এখনই বাড়ী যান, নইলে খুড়ী ঠাকরুণ পেলয়কাণ্ড করে বসবেন।"

হারাধন আজ পাঁচদিন বাড়ীছাড়া। বুঝিলেন, তাঁহার কাজটা বাস্তবিকই বড় অন্যায় হইয়াছে। গর্ভধারিণী জননী রোগশয্যায় শায়িতা। তাঁহার

জন্য বৈদ্যের বড়ি লইতে আসিয়া, বাড়ীঘর ভুলিয়া বারোয়ারি পূজায় মাতিয়াছেন। এ কয়দিন বাড়ীতে কি হইতেছে, বুড়া মা বাঁচিয়া আছেন কি না ;—তাহারও তত্ত্ব লইবার অবসর ঘটে নাই। আজকাল অনেকেই দুঃখ করিয়া বলেন, দেশোদ্ধার হইবে কিসে, দেশের কাজে নেতাদের ঐকান্তিকতা নাই, তাঁহারা তন্ময় হইয়া একনিষ্ঠভাবে কোন কাজ করিতে পারেন না, তাঁহারা নিশ্চয় হারাধনের সন্ধান রাখেন না। হারাধন আজ পাঁচদিন সংসার ধর্ম্ম, গৃহ-পরিবার, এমন কি পীড়িতা মাতার কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া নেতৃত্ব বা পাণ্ডাগিরির মোহে আচ্ছন্ন হইয়া এখানে পড়িয়া আছেন। এক্ষণে সেই কথা স্মরণ হওয়ায় অলক্ষ্যে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। কল্পনা-নেত্রে জগৎতারিণীর রুদ্রমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ কম্পিতকায় ছাগশাবকের মতই তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। মাথা চুলকাইয়া কহিলেন,—"হাঁ, চল যাচ্ছি।"

বারোয়ারির কর্ত্তাগিরি, অনুন্নতের উদ্ধার, সর্ব্ব-জাতির সমন্বয় আপাততঃ মুলতুবি রাখিয়া সভক্তি দেবীমূর্ত্তির চরণে মনে মনে প্রণাম করিয়া, হারাধন-বাবু বধ্যমঞ্চের দিকে অগ্রসর আসামীর মতই কাঁপিতে কাঁপিতে স্বভবনের দিকে অগ্রসর হইলেন।

৩

পথে যাইতে যাইতে হারাধন আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ-লাভের জন্য নানাবিধ উপায় কল্পনা করিয়া মনে একটু সাহস পাইলেন। ভাবিলেন যে লোক সভাস্থলে বাক্‌জালে সহস্র সহস্র লোককে বিমুগ্ধ করিতে পারে, সামান্য একটা স্ত্রীলোককে কথার কৌশলে ভুলান তাহার পক্ষে কিছুই নয়। তাঁহার অধরে একটু হাসি ফুটিল কিন্তু যতই স্বগৃহের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, ততই যেন তাঁহার স্বর বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, যুক্তিতর্কের সেইসকল হারাইয়া যাইতে বসিল। অবশেষে দ্বারদেশে উপনীত হইয়া, একটু থামিয়া আর একবার ভাল করিয়া দুর্গানাম জপ করিতে করিতে সভয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বাড়ীর মধ্যে পা দিতেই হারাধন কাঁপিয়া উঠিলেন। সম্মুখেই জগৎতারিণী প্রলয় ঝটিকা প্রবাহিত হইবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের মত নীরব নিথর স্তব্ধ গম্ভীর মূর্ত্তি ধরিয়া দাওয়ার উপর উপবিষ্ট। তাঁহাকে দেখিয়াই বজ্রাগ্নি বুকে প্রলয়ের কাদম্বিনী গর্জ্জিয়া উঠিল—প্রদীপ্ত আরক্তনেত্রে ইরম্মদের দীপ্তি ছুটিল। প্রিয়ম্বদা পত্নী প্রিয় সম্ভাষণে আরম্ভ করিলেন,—"এস তোমার ছরাদ করবার জন্যই বসে আছি।"

হারাধন কালমুখখানা আরও কাল করিয়া কি কৈফিয়ৎ দিতে যাইতেছিলেন কিন্তু ঝড়ের মুখে শুষ্ক পত্রের মত তাহা কোথায় উড়িয়া গেল। ব্রাহ্মণী হাত নাড়িয়া পুনরায় আরম্ভ করিলেন,—"কালামুখ, হাবাতে, হতছাড়া মিন্‌সে! আক্কেলের মাথা খেয়ে মরতে কোথায় গিয়েছিলে? ঘরে মা মরছে, তার ওষুধ নেই, পত্তর নেই, তার সেবা করা চুলোয় দিয়ে উনি গেছেন দেশ-মাতার সেবা করতে! বলি তোমার কোন্ শাস্ত্রে এমন বিধি আছে? বলি ও পোড়ার মুখ!"

তপ্ত খোলায় ধান দিলে যেমন খৈ ফুটিতে থাকে, ইঞ্জিনের "ভাল্‌ব" খুলিয়া দিলে যেমন রুদ্ধ বাষ্প ছুটিতে থাকে, তুবড়ীর মুখে আগুন দিলে সশব্দে যেমন ফুল কাটিতে থাকে, ক্রুদ্ধা ব্রাহ্মণীর মুখ-বিবর হইতে তেমনই অবিরাম অনর্গল অবাক্য, কুবাক্য এবং দুর্ব্বাক্য বাহির হইতে লাগিল। হারাধন দুই তিনবার বাধা দিবার

চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহা স্রোতের মুখে শৈবাল-গুচ্ছের মত কোথায় ভাসিয়া গেল।

হারাধন বরাবরই পত্নীর অসংযত রসনা-যন্ত্রটীকে একটু অধিক মাত্রায় ভয় করিতেন। কোন দিন তাঁহার ভর্ৎসনার প্রতিবাদ করিতে সাহস করেন নাই। চিরদিনই যখন বড়ই অসহ্য হইয়াছে, বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়াছেন, আজ কিন্তু তাঁহার কেমন দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল, বোধ হয় তাঁহার স্কন্ধে দুষ্ট সরস্বতীর আবির্ভাব হইল, তিনি আজ সহসা রাগিয়া উঠিলেন—স্বামীগিরির মরিচা-ধরা মেজাজ বাহির করিয়া শাসনের ভয় দেখাইলেন।

আর কি রক্ষা আছে! অগ্নিস্পর্শে ঘৃতের কলসী জ্বলিয়া উঠিল। "তবে রে হতভাগা মিন্‌সে"—বলিয়া ব্রাহ্মণী অদূরে পতিত ঝাঁটা গাছটা তুলিয়া লইয়া, কোমরে কাপড় জড়াইয়া প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। উঠানে চেলা কাঠ শুখাইতে-ছিল, তাহার একখণ্ড তুলিয়া লইয়া হারাধনও হুঙ্কার ছাড়ি-লেন। বীরপদভরে মেদিনী টলমল করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কলির কুরুক্ষেত্রে ভার্গবের মহারণের পুনরভিনয় আশঙ্কা করিয়া গৃহচূড়ে উপবিষ্ট বায়স-বায়সী ব্যোমপথে পলায়ন করিল।

কোন্দলের গন্ধ পাইয়া ইতিমধ্যে পাড়ার স্ত্রী-পুরুষ দুই চারিজন দরজার পাশে দাঁড়াইয়া উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছিল। ব্রাহ্মণীর বাক্যবাণের ভয়ে বড় একটা কেহ বাড়ীর মধ্যে পদার্পণ করিতে সাহস পাইতেছিল না। যুধ্যমান দম্পতি যখন

"এস তোমার ছরাদ করবার জন্যই বসে আছি।"

ঘৃতাক্ত হইয়া পায়তাড়া করিতেছিলেন এবং মুহুর্মুহু হুঙ্কার ছাড়িয়া পাড়া পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিতে-ছিলেন, সেই সময়ে পাড়ার পরেশ চক্রবর্ত্তী সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে, ব্যাপারটা কি জানিবার

জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। পাড়ার মধ্যে তিনি প্রবীণ ব্যক্তি, সকলেই তাঁহাকে সম্মান করে। ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া অগ্রসর হইয়া কহিলেন,—"বলি ও হারাধন, তুমিও কি পাগল হলে! ও করছ কি!"

হারাধন একটু থতমত খাইয়া দাঁড়াইলেন। জগৎতারিণী কিন্তু এত সহজে দমিবার পাত্রী নহেন। রণোন্মাদনায় এতক্ষণ দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান ঐ কৌতূহলাক্রান্ত লোকগুলির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়ে নাই। এক্ষণে সেইদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় তাহারা মজা দেখিতে আসিয়াছে ভাবিয়া তাঁহার গরম রক্ত আরও গরম হইয়া উঠিল। হাতের ঝাঁটা গাছটা দূরে নিক্ষেপ করিয়া, মাথার কাপড়টা ঈষৎ টানিয়া দিয়া তীব্রকণ্ঠে কহিলেন,—"এত লোক কিসের! বাড়ীর ভিতর আমাদের স্ত্রী-পুরুষের কোথা রসালাপ হচ্ছে, কি ঘর-সংসারের সুখ দুঃখের দুটো কথাবার্ত্তা হচ্ছে, তা শোনবার জন্য এত ভিড় কেন? এটা হাটও নও, রথতলাও নয়! লোকগুলো কি আক্কেলের মাথা খেয়েছে!"

গতিক দেখিয়া সকলেই পলাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বুড়া চক্রবর্ত্তী ত একেবারে হতভম্ব! অবসর পাইয়া হারাধনও কহিলেন,—"তাই ত লোকের কি অন্যায়! স্ত্রী-পুরুষের আলাপ শুনবার জন্যে লোকের এত মাথা-ব্যথা কেন?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"বাবাজী আমি বুড়া মানুষ, তোমাদের এটা রসালাপ তা আমি বুঝে উঠতে পারি নি। তোমার হাতে চেলা কাঠ, আর মা-লক্ষ্মীর হাতে ঝাঁটা দেখে আমার অন্য রকম ধারণা হয়েছিল।"

হাসিয়া হারাধন কহিলেন,—"ও কিছু নয় খুড়ো মশাই। আমি ব্রাহ্মণীর রন্ধনকার্য্যে সাহায্য করবার জন্যে কাঠের চেলা রান্নাঘরে এগিয়ে দিচ্ছিলাম আর তিনি ঝাঁটা ধরে উঠানটা ঝাঁট দিচ্ছিলেন।"

হাসিয়া চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—"বটে! তা হ'লে আমরা এসে ত বড় রসভঙ্গ করেছি। কিন্তু বাপধন! অমন করে ঝাঁটা আর কাঠ উঁচিয়ে আলাপ করতে আমি এই প্রথম দেখলাম।"

হারাধন হো হো করিয়া হাসিয়া কহিলেন,— "আমি কাঠ উঁচু করে কাক তাড়াচ্ছিলাম, আর উনি ঝাঁট দিতে দিতে গা-মোড়া দিচ্ছিলেন কি হাই তুলছিলেন। এবার বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন?"

"হাঁ জলের মত"—বলিয়া চক্রবর্ত্তী প্রস্থান করিলেন।

সকলে চলিয়া যাইলে, বোকা লোকগুলাকে খুব ঠকান গিয়াছে ভাবিয়া জগৎতারিণী দাওয়ায় উঠিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। পত্নীর মুখে হাসি দেখিয়া, আজিকার মত ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে ভাবিয়া, হারাধনও হাসিতে হাসিতে দাওয়ায় গিয়া বসিলেন।

হাসির বেগটা একটু থামিলে জগৎতারিণী কহিলেন,—"আচ্ছা তোমার আক্কেলটা কি রকম বল ত? মার অসুখ দেখে বদ্যি ডাকতে গেলে, তার পর আর দেখা নাই—মা ম'লো কি বাঁচ্‌লো তারও খবর নেওয়া নাই। তোমার মত যারা নিজের গর্ভধারিণী মা'র সেবা না ক'রে তাঁর দুর্দ্দশার একশেষ ক'রে, দেশজননীর সেবা করতে যায়, তাদের জল-খ্যাংরা দিয়ে বিষ ঝাড়িয়ে দিতে পারলে তবে আমার রাগ যায়।"

হারাধন আবার বিপদাশঙ্কা করিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন। ধীরে ধীরে কহিলেন,—"তুমি রয়েছ, মার সেবার ক্রুটী হবে না ভেবেই নিশ্চিন্ত ছিলেম। দেশের এখন বড় দুর্দ্দিন। দেশের জন্যে কত খাটছি জান? হিন্দু-মুসলমান দুই ভাই, তারা

মোহবশে মাথা-ফাটাফাটি ক'রে মরছে। তাদের মধ্যে যাতে চির-মিলনের দৃঢ় গ্রন্থি বেঁধে তাদের এক করতে--"

জগৎতারিণীর আর সহ্য হইল না, ঝঙ্কার দিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"থাম থাম, তোমার ভণ্ডামি রাখ! বিশ্বেরত্নের পেটে এত যদি বিদ্যে তবে বাড়ীর মধ্যে ঐ পাচিল উঠেছে কেন? নিজের মার পেটের ভাইকে পৃথক করে দিয়ে, উনি গেছেন হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে মিলনের গাঁটছড়া বাঁধতে! মরণ আর কি! ও সব কথা মুখে আনতে একটু লজ্জাও করে না!"

কথাটা চাপা দিবার জন্য হারাধন অন্য কথা পারিলেন। জিজ্ঞাসিলেন, "মেয়েটাকে তা হ'লে পাঠাই নি দেখছি! কি অন্যায় তাদের।"

জগৎতারিণী কহিলেন, "একটুও নয়। ক' বছর পুজোর তত্ব যায় নি তার ঠিক রেখেছ? এই তিন বছরের তত্ত্বের দরুণ একশ' টাকা গণে দিলে তবে তারা মেয়ে পাঠাবে।"

হারাধন আস্ফালন করিয়া কহিলেন,—"সাধ করে কি আর চীৎকার ক'রে মরি, না দেশে দেশ বক্তৃতা দিয়ে বেড়াই। স্বরাজটা একবার পেলে হয়, হিন্দুয়ানীটাকে একবার চাড়া দিয়ে তুলতে পারলে হয়, দেখবে এ সব অনাচার, অত্যাচার কিছু থাকবে না। মনের মতন করে আইন-কানুন গড়ে ঐ পাজী লোকগুলোকে সব সিধে করে দেব।"

এবার সত্য সত্যই জগৎতারিণী হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—"রাধাও নাচবে না, বার মণ তেলও পুড়বে না! স্বরাজ যদি কোন দিন আসে তোমাদের মত মহাপুরুষদের বক্তৃতার চোটে আসবে না। তার পর ও পোড়ার মুখে হিন্দুয়ানীর বড়াই আর [illegible]া না।"

এবার একটু রাগিয়া হারাধন কহিলেন,—"কেন আমরা হিন্দু নই?"

মুখের কাছে হাত নাড়িয়া জগৎতারিণী কহিলেন—"থাক আর ভণ্ডামির দরকার নাই। ছত্রিশ জাতের ছোঁওয়া অন্ন খাবে, আর বাড়ী এসে বামনাই ফলাবে, তা হবে না। ওঃ আমার কি খাঁটি হিন্দু গো! এদিকে ফোঁটাও কাটবেন, টিকিও নাড়বেন, আবার গোপনে গোস্ত পেলেও গোস্তাকি নাই, মুরগি-শূয়োরেও কোন দিন অরুচি ধরে না! এরাই হিন্দুয়ানীর পাণ্ডা! যাও আর বকিয়ে আমার রাগ বাড়িও না। এখন এ জামা-কাপড়গুলো কেচে, নেয়ে ধুয়ে এলে তবে ঘরে ঢুকতে পাবে।"

কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া হারাধন কহিলেন,—"তোমার শুচিবাই দিন দিন বেজায় বাড়ছে! জামা কাপড় না কাচলে চলবে না?"

ক্ষুদ্র একটী "না" বলিয়া শ্রীমতী মুখ বন্ধ করিলেন। হারাধন দেখিলেন আর বেশী ঘাঁটাইয়া কাজ নাই। কহিলেন—"মা বুঝি ও বাড়ীতে? আগে একবার দেখে আসি।"

ঝঙ্কার দিয়া জগৎতারিণী কহিলেন,—"থাক, আর দরদে কাজ নাই। সে তোমাদের বারোয়ারি তলার বাসন্তী প্রতিমে নয়, অশুচি দেহ-মন নিয়ে এ দেবী-দর্শনে যাওয়া চলবে না।"

হারাধন অবাক হইয়া কঠোরপ্রকৃতি মুখরা জায়ার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; পরক্ষণে ভক্তি এবং শ্রদ্ধায় তাঁহার অক্ষিপল্লব নত হইয়া পড়িল।

এত সহজে নিষ্কৃতি পাইয়া একটু প্রফুল্ল মনেই হারাধন গামছাখানা টানিয়া লইয়া খিড়কীর পুকুরে জামা-কাপড় কাচিয়া স্নান করিতে যাইবার জন্য দাওয়া হইতে নামিলেন কিন্তু তাঁহার দুর্ভোগ এখনও শেষ হয় নাই। তিনি পত্নীর দিকে পশ্চাৎ ফিরিবা মাত্র

জগৎতরাণী তাঁহার মাথায় দাওয়ার উপর হইতে হুড়্ হুড়্ শব্দে এক বাল্‌তি জল ঢালিয়া দিলেন। মুখ সিঁটকাইয়া, চীৎকার করিয়া হারাধন কহিলেন,—"রাম! রাম! এ যে গোবরগোলা জল! মুখে মাথায় থু থু! তোমার বড় বাড় বেড়েছে! থু থু!"

তাঁহাকে গঙ্গা-ফড়িঙের মত তিড়িং মিড়িং করিয়া লাফাইতে এবং বাহান্ন রকম মুখভঙ্গি করিতে দেখিয়া জগৎতারিণী মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসিতেছিলেন, সহসা গম্ভীর হইয়া কহিলেন,—"ঘরকন্নার জিনিস আঁস্তাকুড়ে কি নর্দ্দামায় পড়লে শুদ্ধ করে নেবার ব্যবস্থা আছে, আর স্বামীকে শুদ্ধ করে নেবার ব্যবস্থা নাই?"

জগৎতারিণী দারুণ শুচিবায়ুগ্রস্ত—সে রোগটা আজকাল আবার একটু বাড়িয়াছে। হারাধন দেখিলেন ঝগড়া করিয়া লাভ নাই—এ সব প্রেমের অত্যাচার মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়া যাওয়াই ভাল। তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সুবোধ বালকের মত সুড়্ সুড়্ করিয়া পুকুর-ঘাটের দিকে চলিলেন।

স্নান করিয়া আসিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণী একটা ঘটী হাতে করিয়া তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আবারও কি গোবরজল ঢালবে না কি?"

অধর টিপিয়া প্রেমময়ী পত্নী কহিলেন,—"না, এ গঙ্গাজল।" বাধা দিয়া লাভ নাই, হারাধন মাথা পাতিয়া দিলেন, ব্রাহ্মণী তাঁহার মাথায় গঙ্গা-জল ঢালিয়া দিলেন।

হারাধন কহিলেন,—"আর কিছু বাকি আছে?"

জগৎতারিণীর চোখে বিদ্যুতের দীপ্তি খেলিয়া গেল। কহিলেন,—"আছে, কানমলা আর নাকখৎ।"

হাসিয়া হারাধন কহিলেন,—"সে তো বিয়ে হয়ে অবধি দিচ্ছি, এখনও কি শেষ হয় নাই? দাও একখানা কাপড়।"—বলিয়া ঘরের দিকে যাইতেছিলেন, পথ রোধ করিয়া পত্নী কহিলেন—"ঘরে ঢুকনি বলছি। এই নাও, হাঁ কর, এইটুকু ঢুক্ করে খেয়ে ফেল।"

এই বলিয়া তাকের উপর হইতে একটা ছোট পাথর বাটী হাতে করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

হারাধন কহিলেন,—"এখনও যে গায়ত্রী জপ, আহ্নিক হয় নাই।"

স্বর কঠোর করিয়া জগৎতারিণী কহিলেন,—"আগে শুচি হও, দেহের পাপ কাটুক, তার পর সন্ধ্যা আহ্নিক যা করতে হয় ক'রো।"

হারাধনের মনটা পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া উঠি-বার উপক্রম করিতেছিল কিন্তু ভাবিলেন, অষ্টমীর মহাক্ষণে এ রণচণ্ডীকে আর ঘাঁটাইয়া কাজ নাই। বাটীতে বোধ হয় নারায়ণের চরণামৃত আছে, খাই-লেই যদি এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া যায়, আপত্তি করিয়া নূতন বিপত্তি ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন কি?

অগত্যা হারাধন দাওয়ায় বসিয়া হাঁ করিলেন, জগৎতারিণী অধর ওষ্ঠ সবলে টিপিয়া আলগোছে তাঁহার ব্যাদিত মুখে পাথর বাটীর মধ্যস্থ পদার্থটা ঢালিয়া দিলেন।

হারাধন ঢোক গিলিয়া বিকৃতমুখে লাফাইয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখের সে বিকট ভঙ্গী দেখিয়া হাসিতে হাসিতে জগৎতারিণী তাঁহার সম্মুখে এক ঘটী জল রাখিলেন। হারাধন তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন,—"দূর পাপিষ্ঠা! ও কি খাওয়ালি আমায়?"

জগৎতারিণী গম্ভীরমুখে কহিলেন,—"ভাল জিনিস। গোময় আর গোচনা। বামুনের ছেলে ছত্রিশ জাতের ছোঁয়া অন্নজল খেয়েছ, দেহটা অশুদ্ধ হয়েছে, তাই ঐ প্রাচিত্তিরের ব্যবস্থা করেছি। আমি যে তোমার ধর্ম্মপত্নী, তোমার যাতে ধর্ম্ম বজায় থাকে, হুজুগে মেতে যাতে গোল্লায় না যাও,

আমাকে দেখতে হবে বৈ কি? নইলে কিসের ধর্ম্মপত্নী! আর তোমরা যখন বাইরে শুদ্ধি আন্দোলন চালিয়ে যত অজাতকে জাতে তুলে নিতে পার, আমরা তখন আমাদের ঘরের জিনিস-গুলোকে অশুদ্ধ হয়েছে বলে ফেলে দিই কি করে? তাই অনেক শাস্ত্রপুরাণ ঘেঁটে এই শুদ্ধির ব্যবস্থা বার করেছি।"

ইহার পর, অন্ততঃ এই কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ভয়ে হারাধন আর কখনও কোন সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন কি না, কিম্বা হিন্দুধর্ম্মটাকে সংস্কৃত এবং সমুন্নত করিয়া ছত্রিশ জাতির সমন্বয় সাধনপূর্ব্বক জাতিভেদের মাথায় লাঠি মারিতে উদ্যত হইয়াছিলেন কি না, সে সংবাদ আমরা পাই নাই।

নারী

কবিগুণাকর শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি-এ

নারি! বিশ্ব বাঁধা তোমার পায়ে—
বিশ্বপতি তোমার পায়'—
ধরেছিলেন—নয় ক' মিথ্যা'—
নয় ক' কবির কল্পনায়।

ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ আদি
আছে তোমার চরণ ছাঁদি,—
যে জন ওগো নিতে জানে
চতুর্ব্বর্গ পায় সে পায়।

শিবের শিরে তোমার স্থিতি,
তোমার চরণ শিবের বুকে—
তাই ত সকল সিদ্ধি তিনি
বিলিয়ে থাকেন হাস্য-মুখে।

তোমায় নারি কেন্দ্র ক'রে
সিদ্ধি স্বস্তি শান্তি ঘোরে—
তাই ত কবি অর্ঘ্য নিয়ে
তোমার পানে ধায় গো ধায়।

নিঃস্ব তোমার শক্তি নিয়ে
হ'তে পারে বিশ্বজই—
কবি চরম সার্থকতা
পায় না তোমার শক্তি-বই!

কর্ম্মী চাহে তোমার মুখে—
তোমার প্রেমে দৃপ্তবুকে
যায় সে মেরু-আবিষ্কারে—
পাহাড় ঠেলি' ছুটতে চায়!

তোমায় নারি যমে ডরে,
সম্ভ্রমে সে নোয়ায় শির,—
মৃত পতি ফিরিয়ে দিয়ে
মুছায় সতীর অশ্রু-নীর।

সতী নারীর পরশ নিয়া
অনল ভোলে দাহন-ক্রিয়া—
তুহিন সম হয় সুশীতল,
কিংবা যথা মলয় বায়!

উপন্যাস

প্রত্যাবর্ত্তন

কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

কালীতারা সুরমাকে লইয়া বৈদ্যনাথে আসিয়াছেন, আসিবার সময় পিতামাতা কতকটা আপত্তি করিলেও কন্যার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সে আপত্তি টিকে নাই। সুরমার জননী গোপনে সুরমাকে লইয়া যাইতে নিষেধ করিলে, তেজস্বিনী কালীতারা বলেন, "ও যদি একান্ত জিদ ধরে, তা হ'লে না নিয়ে গিয়ে আমি থাক্‌তে পার্‌বো না, তোমরা বাপ-মা হয়ে যদি মেয়েকে আটকাতে না পার, তা' হলে আমার আর কি দোষ বল ?" এ কথা শুনিয়া হরশঙ্কর-গৃহিণী নিরুপায় হইলেন। যাইবার সময় সুরমা জনক-জননীকে প্রণাম করিয়া, নিজের ট্রাঙ্ক, বিছানা, বাক্স প্রভৃতি লইয়া দ্রুতপদে গাড়ীতে উঠিয়া কি একটা উৎকট অস্বস্তির হাত এড়াইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

বৈদ্যনাথ-মন্দিরের অনতিদূরে শিবগঙ্গা নামক দীর্ঘিকার তীরে একটি অট্টালিকার দ্বিতল কক্ষে কালীতারা সুরমাকে লইয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা একজন ব্রাহ্মণ পাচক ও একটি হিন্দুস্থানী পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়াছেন। কালীতারা নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণ মহিলা ; স্বপাক ভোজন করিতেন। ব্রাহ্মণ পাচক পাঁড়েজী সুরমার আমিষ-ব্যঞ্জনাদি পাক করিত। কিন্তু সুরমা অধিকাংশ দিনই পিসীমার হস্তপক্ক সুগন্ধি অন্ন-ব্যঞ্জনেই পরিতৃপ্ত হইত। কি আশ্চর্য্য, তাহার সকাল-সন্ধ্যার জল-খাবারের নিমিত্ত পিসী-ঠাকুরাণী বাজার হইতে স্বয়ং উৎকৃষ্ট পেঁড়া, গরম-জিলিপি, মুগের নাড়ু, কচুরি, নিমকি প্রভৃতি কিনিয়া আনিতেন, কিন্তু সুরমা এই তীর্থস্থানে আসিয়াও তাহার চা পানের অভ্যাসটা কিছুতেই ছাড়িতে পারিল না। পিসীমা কত বলিতেন—"সুরি এত ভাল ভাল মেওয়া মিষ্টি খাবার জিনিষ থাক্‌তে ঐ ত্রিফলা ভিজান গরমজলে একটু দুধ চিনি মিশিয়ে না খেলে কি তোর চলে না ? সকালে যতক্ষণ না ওটা খাস, ততক্ষণ যেন ছটফটিয়ে বেড়াতে থাকিস ! কি জ্বালা, ওটা ছেড়ে দিতে কেন চেষ্টা কর্ না ; ওটা কি এত ভাল জিনিষ যে, ওর জন্যে এমন নাকানি-চোবানি খেতে হবে ! আর ওটা হিঁদুর মেয়ের না খেলেই ভাল হয় !"

সুরমা হাসিয়া পিসীমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"দোহাই পিসীমা, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমার কথায় একটি হপ্তার জন্যে আমার সঙ্গে সকালে এক পাথর বাটী ক'রে চা খেয়ে দেখ ! তার পরে যদি আমায় চা ছাড়তে ব'ল, আমি দিব্যি ক'রে বল্‌চি, আমি বে-ওজরে একটি কথাও না ক'য়ে চায়ের সব সরঞ্জাম টেনে দূর ক'রে ফেলে দেব।"

সুরমা চায়ের কেটলি, টি-পট, পিয়ালা-পিরিচ, চামচে, ছেঁকনি প্রভৃতি যত কিছু চা-পানের সাজ-সরঞ্জাম—সব ট্রাঙ্কে ভরিয়া পিসীমাকে লুকাইয়া

আনিয়াছিল। সেগুলি বাহির করিবামাত্র পিসীমা চীৎকার করিয়া বাড়ী মাথায় করিলেন। বলিলেন, "ও সব এই পাণ্ডার বাড়ীতে কিছুতেই চল্‌বে না, তোল্ তোল্ শীগ্‌গির তোল্, তারা ও দেখ্‌লে এখুনি আমাদের অহিন্দু মনে ক'রে দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে।"

প্রথমে সুরমা দৃঢ়কণ্ঠে আপত্তি করিয়া কহিল, 'ইস্, অমনি আর কি? মগের মুলুক পেয়েচে না কি? বাড়ীতে কি মেহেরবাণী ক'রে থাক্‌তে দিয়েচে, ভাড়া নেয় নি?"

পিসীমাও জোর গলায় কহিলেন, "ও সব কথা আমলেই আন্‌বে না, এখুনি তোর টাকা নাকের ওপর ধরে দিয়ে, টুঁটি টিপে বিদেয় ক'রে দেবে। ওদের তেজ দেখিস ত তখন বল্‌বি, কল্‌কেতার গুণ্ডো কোথায় লাগে।"

পিসীমার কথা শুনিয়া এইবার সত্যই সুরমার মনে একটু ভয় হইল। চট্‌পট্ সেগুলা ট্রাঙ্কের মধ্যে পূরিয়া ফেলিয়া চিন্তিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা পিসীমা, তা' হলে আমার কি উপায় হবে? চা না খেলে ত আমি একদিনও বাঁচব না, খাওয়া-দাওয়া সব যে ঘুরে যাবে পিসীমা?"

পিসীমা ওষ্ঠাধর আকর্ণ-বিশ্রান্ত করিয়া হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, সে উপায় আমি কর্‌বো; তুই আগে বল দিকিন্ চা একদিন না খেলে কি ব্যাপার হয় শুনি।"

সুরমা আশ্বস্ত হইয়া কহিল, "ব্যাপার যে কি রকম হয়, তা আমি তোমাকে ঠিক্ বুঝিয়ে বল্‌তে পার্‌বো না; সে ক্ষমতা শুধু আমার কেন, কোন চা-খোরেরই নেই, তবে আমি তোমাকে সংক্ষেপে একটু আভাষ দিচ্ছি। তা থেকে ব্যাপারটা কতকটা ঠাওরে নিতে পার্‌বে। সকালে উঠে মুখ হাত ধুয়ে চা-খোর যদি চা না পায় ত বিষম অস্থির হয়ে ওঠে। চা'র জন্যে তার প্রাণটা নিস্‌পিস্ কর্‌তে থাকে। মুখ, জিব, গলা তিনটে শুকিয়ে ওঠে, চোক দুটো যেন ঠিক্‌রে পড়ে, পেটটা টেনে ধরে, প্রাণটা টা টা করে। চা আন্‌তে যতই দেরি হয় ততই সে রেগে ওঠে, কোন কাজেই তার মন লাগে না। এমন বিরক্তি বোধ করে যে, তার কিছুই ভাল লাগে না। শেষে চা এলে সব ঠাণ্ডা—যেমন আগুনে জল!"

সুরমার কথার ভঙ্গীতে পিসীমা হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিলেন, "থাম্ থাম্ আর ব্যাখ্যানায় কাজ নেই, হাস্‌তে হাস্‌তে পেটের নাড়ী ছিঁড়ে গেল!"

সুরমাও ছাড়িবার পাত্রী নয়, সে বলিল—"তবে শীগগির একটা উপায় কর।"

পিসীমা কহিলেন, "উপায় আমি তোর বলবার আগে স্থির করে রেখেচি, মাটির হাঁড়িতে জল গরম করে, কাঁসার গেলাসে চা খাবি; তোর মা'র কাছে শুনেচি, দার্জ্জিলিংয়ে নেপালী মেয়ে পুরুষে কাঁসার ডাঁটিওলা গেলাসে চা খায়; তাতে কোন দোষ হয় না; তা হ'লে আপদ চুকে গেল।"

সুরমা ইহা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল।

পিসীমার সঙ্গে প্রবাস-বাসে সুরমার দিনগুলি পার্ব্বত্য-তটিনীর ন্যায় মৃদু-প্রবাহে অতিবাহিত হইতেছিল। পিসীমার সঙ্গে সে কোনদিন নন্দন পাহাড়ে, কোনদিন তপোবনে, কোনদিন বনমধ্যে বেড়াইয়া আসিত। কিন্তু দুই সপ্তাহ অতীত হইবার পরেই তাহার মনের কোণে একটি স্মৃতির মেঘ উদিত হইল।

হেমন্তের স্নিগ্ধ-বাতাস বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিপ্রহরে উন্মুক্ত বাতায়নে বসিয়া সুরমা কর্ম্মহীন উদাস-অলস দিনের দীর্ঘসূত্রতায় আপনাকে বিজড়িত করিয়া বড়ই নির্জ্জনতা অনুভব করিত।

পিসীমা আহারান্তে নিদ্রার কোলে গা ঢালিয়া দিতেন। উঠিতে বেলা চারিটা বাজিত। সুরমা এই সময়টা কখন পুস্তক-পাঠে, কখন সঙ্গীতের মৃদুগুঞ্জনে, কখন বা এদিক ওদিক করিয়া কাটাইত। নিঃসঙ্গ জীবনের তিক্ততা অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে তাহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিত। সে অনিমিষনেত্রে বাতায়ন হইতে দূরবর্ত্তী ত্রিকূটের নীলাকাশস্পর্শী চূড়া দেখিত। বনের পর বন পত্রে পত্রে ছায়াচ্ছন্ন! পলাশ-বনে রাঙ্গা রাঙ্গা ফুলের উজ্জ্বল হাসি। শিবগঙ্গায় তরঙ্গায়িত জলে কমলদল দুলিতেছে। ধবল বলাকা-শ্রেণী শুভ্র পদ্মমালিকার ন্যায় দূর দিগন্তে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। এ সকল শোভা দেখিয়াও সুরমা চিত্ত স্থির করিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি পিসীমার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া সজাগ করিয়া দিল। পিসীমা ঠেলা খাইয়া চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া বলিলেন,—"কি লো সুরি, তোর হয়েছে কি? হঠাৎ ঠেলে তুল্‌লি কেন?"

সুরমা ব্যস্ত হইয়া কহিল, "বেলা যে পড়ে এল, আর কত ঘুমুবে? তোমার কুম্ভকর্ণের ঘুম যে ভাঙ্গে না; আজ যে কালীপুজো, তা কি মনে নেই? মন্দিরে কি যেতে হবে না?"

পিসীমা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কি লো? এখন থেকে তার কি বল্? সে ত রাত্তিরের ব্যাপার।"

সুরমা চট্‌পট্ জবাব দিল, "বলি, উদ্যুগ-স্যুযুগ ত চাই, অমনি ত কিছু হবে না; ঝি মাগীর এখনও পাত্তাই নেই; বাসন-কোসন সবই পড়ে আছে; মহারাজেরও নাক্ ডাক্‌চে—কখন যে কি হবে, আমি ভেবেই পাচ্ছিনে; আবার সন্ধ্যের পর দেয়ালী দেখতে বেরুতে হবে ত! তাই তোমাকে জাগাতে হ'ল।"

সুরমার এই আকস্মিক চাঞ্চল্যের হেতু বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া পিসীমা একটু বিরক্তির স্বরে বলিলেন, "কোথাকার ছট্‌ফটে মেয়ে রে তুই, সবেতেই তাড়াহুড়ো! ঝি ঠিক্ সময়েই আস্‌বে, মিছিমিছি আমার কাঁচা ঘুমটা ভাঙ্গিয়ে দিয়ে মাথা ধরিয়ে দিলি; যা নীচে গিয়ে গা ধুয়ে আয়; আমি উঠ্‌চি।"

এই বলিয়া পিসীমা আবার পাশমোড়া দিয়া শুইলেন।

সুরমা কাজটা যে একটা হঠকারিতার প্রভাবে করিয়া বসিয়াছিল, তাহা সে সহজেই বুঝিল। সুতরাং আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গা ধুইতে আস্তে আস্তে নীচে নামিয়া গেল।

আজ কালীপূজা। হেমন্ত-দিনান্তের স্নিগ্ধ মধুর সূর্য্যরশ্মি সিন্দূরচূর্ণ ছড়াইয়া মেঘের রং রক্তোজ্জ্বল করিয়া দিল। স্নিগ্ধ বায়ু বনফুল স্পর্শ করিয়া চারিদিক সুরভি-শীতল করিয়া বহিতে লাগিল। পশ্চিমদেশীয়া পুরবধূরা নানা রঙ্গিন বসনে ভূষিতা হইয়া, বাসন্তী ওড়না উড়াইয়া, বিবিধ পূজা-সম্ভার-সজ্জিত পাত্র লইয়া অলক্তক-রাগ-রঞ্জিত নূপুর-ঝঙ্কৃত পদে মন্দিরাভিমুখে গমন করিতেছে। তাহাদের দৃষ্টিতে সারল্যের স্নিগ্ধতা এবং তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত অধরে মাধুর্য্য লিপ্ত রহিয়াছে।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। দীপশ্রেণী সৌধে সৌধে যেন উজ্জ্বল হীরকহার পরাইতে লাগিল। আতস-বাজীর ক্রীড়া আরম্ভ হইল। বৈদ্যনাথদেবের প্রাঙ্গণে মূল-মন্দিরের চারিধারে মন্দিরমালা দীপালোকে অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত। কালী-মন্দিরেই আজ মহোৎসব। সদ্যফুল্ল রক্তজবার মালায় বিভূষিতা কালীমূর্ত্তি আরক্ত ভাস্বর ছটা

বিকীর্ণ করিতেছেন। বেদিকা-পরিবেষ্টিত দীপাবলীতে কক্ষ সমুজ্জ্বল। দেবীদর্শনে সমাগত পিপীলিকাশ্রেণীবৎ যাত্রীর দল মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবীদর্শনে কৃতার্থ হইতেছে। কালীতারা সুরমাকে লইয়া আসিয়াছেন; তাঁহার কণ্ঠে পদ্মবীজের মালিকা, পরিধানে শুভ্র গরদের বস্ত্র। পার্শ্বে সুরমা রক্তচেলী পরিয়া স্বর্ণকঙ্কণবেষ্টিত উজ্জ্বলতায় পিসীমার একটি হস্তধারণ করিয়া মন্দিরের বাহিরে একপ্রান্তে দণ্ডায়মানা। পরিচারিকা একটি থালায় নৈবেদ্য এবং আর একটি থালায় পুষ্প, চন্দন, দুর্ব্বা, বিল্বপত্র প্রভৃতি পূজোপকরণ লইয়া নিকটে উপস্থিত। কালীতারা জনতা লাঘবের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ দেখিলেন, একটি যুবক সন্ন্যাসী কিছু দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে উৎসুক দৃষ্টিতে দেখিতেছে। তিনি তাহার দিক হইতে সশঙ্ক-চিত্তে দৃষ্টি ফিরাইয়া মন্দির-প্রবেশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কি আপদ্! সেই সন্ন্যাসী আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার পানে জিজ্ঞাসু-নেত্রে চাহিতে লাগিল; যেন কথা কহিতে সমুৎসুক। বোধ হয় সুরমা থাকায় একটু বাধা বোধ করিতেছে। কালীতারা ফাঁপরে পড়িলেন। সঙ্গে যুবতী সুরমা, কি করিবেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না; মনে তেজ থাকিলেও বর্ত্তমান অবস্থায় ভীত হইলেন। ভাবিলেন কি করিয়া এই অসভ্য সন্ন্যাসীটাকে তাড়াইয়া দিবেন। ইত্যবসরে সেই অধৈর্য্য সন্ন্যাসী তাঁহার সম্মুখে আসিয়াই প্রণাম করিয়া কহিল, "আপনি আমাকে এখন কিছুতেই চিন্‌তে পারবেন না, কিন্তু আমি আপনাকে চিনেছি! এর আগেও এখানে একদিন দেখেছিলুম কিন্তু তখন একটু সন্দেহ ছিল ঠিক আপনি কি না? আজ আর আমার মনে কোন সংশয়ই নেই।"

কালীতারা উদ্বিগ্ন-ভাবে কহিলেন, "কে বাবা তুমি? আমি ত মোটেই তোমায় চিন্‌তে পাচ্ছি নে—কখন দেখেছি বলেও মনে হচ্চে না।"

সন্ন্যাসীকে কাছে আসিতে দেখিবামাত্রই সুরমা দাসীকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া চকিতে কিছু দূরে সরিয়া গেল।

সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া কহিল, "দেখেছেন কি না, সে কথা এখন বল্‌চিনে, আপনি ভিড়ের জন্যে মন্দিরে ঢুকতে পাচ্চেন না তা বুঝতে পাচ্চি। আপনার সঙ্গে কোন আত্মীয়া আছেন দেখছি—আসুন আগে আপনাদের মা কালীকে দর্শন করিয়ে আনি; পরে চেনা-পরিচয় হবে। আর কতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে হিমে কষ্ট পাবেন? আসুন আমার সঙ্গে আপনারা?"

কালীতারা তাহার অযাচিত ব্যাকুল আত্মীয়তায় বিস্ময়ে অভিভূতা হইয়া মন্ত্রচালিতবৎ সুরমাকে লইয়া নিঃশব্দে অগ্রসর হইলেন; যেন কতদিনের বিস্মৃত স্মৃতি তাঁহার মস্তিষ্ক বিলোড়িত করিতে লাগিল। সন্ন্যাসীর স্বরটা খুবই চেনা-চেনা বোধ হইতেছে, অথচ কাহার স্বর মাথা কুটিয়াও মনে আনিতে পারিতেছেন না। সন্ন্যাসী-যুবক দুইহস্তে সবলে ভিড় ঠেলিয়া পথ-পরিষ্কার করিয়া অতি সুশৃঙ্খলভাবে তাঁহাদিগকে কালীদর্শন ও পূজা করাইল। বাহিরে আসিয়া কালীতারা অতি ব্যাকুল-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার গলার স্বর খুবই জানা-জানা লাগছে, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পাচ্ছি নি বাবা, এমনি পোড়া মন! বল না বাবা কে তুমি? আর ধোঁকায় রেখ না!"

সন্ন্যাসী একটু উচ্চ হাস্য করিয়া ঈষৎ শ্লেষের স্বরে বলিল,—"মাসী মা, এমনি করেই কি ভুলে যেতে হয়? চোখের আড়াল হলে বন্ধু-বান্ধব, জ্ঞাতি-কুটুম্ব প্রভৃতি অপর লোক ত ভুলবেই;

তাদের কথা ধর্তব্যই নয়; কিন্তু মা-মাসীও যে ভুলে যায় তা আজ এই প্রথম দেখ্‌লুম—যাক্ এখন সে সব কথা—আমি সোমড়ার গিরীন।"

হঠাৎ যেন আকাশ হইতে পড়িয়া চকিতভাবে মুগ্ধ-নেত্রে কালীতারা গিরীনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; প্রথমটা তাঁহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। তিনি কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

হরিহরনাথের জননী কালীতারার বাল্য-সঙ্গিনী ছিলেন। তিনি বয়োঃজ্যেষ্ঠা হইলেও কালীতারার সহিত তাঁহার খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। যে গ্রামে হরিহরনাথের মাতুলালয় সেই গ্রামেই কালীতারার বিবাহ হইয়াছিল। পরস্পরে সহোদরা ভগিনীর ন্যায় দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধা ছিলেন। কালীতারা হরিহরনাথকে নিজ সন্তানের ন্যায় দেখিতেন এবং এই সূত্রে তিনি হরিহরনাথ ও গিরীন্দ্র—উভয়েরই মাসীমার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

বিস্ময়ের আবেগ কিছু মন্দীভূত হইয়া আসিলে তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন,—"কে গিরীন, অ্যাঁ! তোর এই মূর্ত্তি? তুইও কি বিবাগী হয়ে মা ভাইকে অগাধ জলে ভাসিয়ে দিয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্! কতকাল যে তোকে দেখি নি বাবা!" এই বলিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

গিরীনও ধীরকণ্ঠে উত্তর দিল—"মাসীমা, দাদার জন্যেই আমাকে এই ভেক ধর্‌তে হয়েছে। সন্ন্যাসী হবার জন্যে আমার এ বেশ নয়; আমি অনেক বৎসর ধ'রে দাদাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি; আর এই বেশেই বিদেশ বিভূঁয়ে ঘুরে বেড়ানই সুবিধা, তাই—"

কালীতারা বিক্ষিপ্তচিত্তে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হরিহরের সন্ধান পেয়েছিস কি না, সেই কথা আগে আমায় বল্, আমি আর কিছু শুন্‌তে চাই নে।"

গিরীন কহিল, "হাঁ, পেয়েছি তবে—"

হারান সন্তান ফিরিয়া পাইলে জননী যেমন মনের প্রথম আবেগে হৃদয়ের সমস্ত যন্ত্রণা-পরিতাপ বিস্মৃত হইয়া একেবারে উন্মত্ত-উৎক্ষিপ্তচিত্তে তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরেন, কালীতারা তেমনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া গিরীনকে বিহ্বলকণ্ঠে কহিলেন, "আঃ বাঁচলুম, মনের মধ্যে এত কাল ধরে যে কি ধড়ফড়ানি ছেল, তা আর মুখে কি বল্‌ব? তুই আজ আমাকে বাঁচালি! সে যে প্রাণে বেঁচে আছে, এই আমার পরম ভাগ্যি—আহা! অমন ছেলে কি আর হয়—বউটিও তেমনি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী—ঘরের আলো!" ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আবার উৎকণ্ঠিত স্বরে কহিলেন, "হরিহর এখন কোথায় আছে রে গিরীন?"

মাসীমার মনের এই গভীর উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য দেখিয়া গিরীন্দ্র বাস্তবিকই বিস্মিত হইল। পূর্ব্বে সে কোন বিষয়েই কালীতারাকে এরূপ অধীরা হইতে দেখে নাই। স্বভাবতই তিনি ধীরস্থির। আজ তাঁহার এ কি অসম্ভব পরিবর্ত্তন! নিরুদ্দিষ্ট প্রাণাধিক সন্তানের জন্য জননীর বা মাতৃকল্পা কোন স্নেহময়ী আত্মীয়ার মনে যে প্রচ্ছন্ন মর্ম্মদাহী বাড়বানল নিরন্তর প্রজ্জ্বলিত থাকে এবং সেই নিরুদ্দিষ্টের পুনরাগমন-সংবাদে সেই স্নেহার্দ্র নারী-হৃদয় মৃতকল্প আশাকে সঞ্জীবিত দেখিয়া হর্ষের উচ্ছ্বাসে ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় কিরূপ উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তাহা যদি গিরীনের ন্যায় একজন চিরকুমার যুবকের হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে সে কখনই তাঁহার অচিন্তনীয় অধীরতায় বিস্মিত হইত না।

গিরীন দেখিল, কথায় কথায় রাত্রি অধিক হইতেছে ; হরিহরনাথের কথা যত চলিবে ততই কালীতারার অস্থিরতা বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস পাইবে না। ইহা বুঝিয়া সে কহিল, "মাসী মা, আপনার ঠিকানা আমাকে বলুন, কাল যখন হয় আপনার বাসায় গিয়ে সব কথা হবে। রাত্তিরও অনেক হয়েছে।"

গিরীনের কথায় আশ্বস্ত হইয়া কালীতারা তাহাকে ঠিকানা বুঝাইয়া দিয়া কহিলেন,—"বেশ কথা, কাল যেতে ভুলিস্ নি যেন ; দেখিস্ বাবা তোর পিত্যেশে আমি আকুল হয়ে থাক্‌ব।"

'কখনো না" বলিয়া গিরীন কালীতারার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া, প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। হঠাৎ সুরমার কথা মনে পড়ায় কালীতারা চমকিয়া উঠিলেন। শশব্যস্তে এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, সুরমা পার্শ্বের মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া আছে। নিকটেই দাসী পল্‌তে কমাইয়া ক্ষীণ-রশ্মি লণ্ঠন লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পিসীকে দেখিয়াই সুরমা রোষক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "খুব যা হোক আক্কেলটা তোমার পিসীমা! বলি এমনি ক'রেই কি সবাই করে মার্‌তে হয়? একলা চুপটি ক'রে মুখ বুজে যে কতক্ষণ ধরে এখানে বসে আছি তার ঠিক নাই। ও সন্নিসিটি কোন মাসীর মা'র কুটুম যে কথা আর ফুরোয় না! এই আসে, এই আসে করে প্রাণটা হাঁফিয়ে কণ্ঠাগত হয়েছে ; তোমার সাড়া নেই ; বলি আজ কি এখানে থাকবে মনে করেছ? দেয়ালী দেখতে হবে না, না বাসায় ফিরবে না? দাসী মাগী ঘরে যাই যাই করে হেদিয়ে সারা হ'ল! বলি, তোমার কাণ্ডটা কি শুনি?"

পিসীমার চোখ দু'টি তখনও ভিজে-ভিজে এবং প্রাণটি ভার হইয়াছিল। তখনও মনের আবেগ প্রশমিত হয় নাই। সুরমা যে একলাটি তাঁহার প্রতীক্ষায় বহুক্ষণ বসিয়া আছে, ইহাতে তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি করুণস্বরে বলিলেন, "কিছু মনে করিস্ নি মা, একটা খবর শুনে এমনি আনমনা হয়ে পড়েছিলেম যে, তুই যে একলাটি আছিস, সে কথা মনে ছিল না। লক্ষ্মী মা আমার, রাগ করিস্ নি তোর বুড়ো পিসীর ওপর ; চল্ শীগ্‌গির দেয়ালী দেখে ঘরে যাই।"

পিসীমার কাতর স্বরে সুরমার মনটাও ভিজিয়া গেল। সে কেবল বলিল, "রাত হয়ে যাচ্চে দেখেই ভাবনা হচ্ছিল পিসীমা! তা তুমি কিছু মনে ক'র না। হ্যাঁ পিসীমা ওই সন্নিসিটির মুখে কি খবর শুনে তুমি এতটা আনমনা হয়েছিলে বল ত?"

কালীতারা ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলেন, "চল এখন বাছা, এর পরে শুনবি।" এই বলিয়া তিনি অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া সুরমাকে লইয়া মন্দির-প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

তার পর দিন বেলা এগারটার সময় মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় আসিবামাত্র গিরীনের সহিত কালীতারার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে দেখিয়াই গিরীন প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই যে মাসীমা, এখন ফেরা হচ্চে ; আজই বৈকালে আপনার ওখানে যেতুম, তা ভালই হ'ল, এখানেই দেখা হয়ে গেল। হ্যাঁ মাসীমা, আপনার সঙ্গে কাল উনি কে ছিলেন?"

কালীতারা গত রাত্রি হইতেই উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, গিরীনের কথা তাঁর কানেই ঢুকিল না ; তিনি ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "হরিহর কোথায় আছে আগে বল শুনি, তার পরে অন্য কথা।"

গিরীন্দ্র মাসীর ব্যগ্রতা দেখিয়া কহিল, "মাসীমা দাদার দিকে আপনার মনের এতটা টান আমি

আগে বুঝতে পারি নি; আপনি আমাদের চিরকালই ভালবাস্তেন জানি এবং আজও সেই ভালবাসা যে আপনার এতটা বুক জুড়ে রয়েচে, এটা আমাদের খুবই সুকৃতি বলতে হবে। দাদা এখানেই আছেন, মন্দিরেও প্রায় রোজই আসেন, আমি দূর থেকেই দেখি, কাছে ঘেঁসতে ভরসা হয় না, পাছে আবার হারিয়ে বসি।"

কালীতারা বিচলিত হইয়া কহিলেন, "অ্যাঁ তা একদিনও কাছে যাস নি, সে কি কথা!"

গিরীন বাধা দিয়া কহিল, "তাঁকে ত চেনেন মাসীমা, কি ধাতের লোক তিনি!"

কালীতারা তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, "চিনি বৈ কি, না চিন্‌লে আর এতটা হয় রে! এই বয়সে ত অনেককেই দেখলুম, কিন্তু ওর জুড়ি কি সংসারে আছে? হ্যাঁ রে গিরীন সে থাকে কোন্ খানে? আমায় এখুনি সেখানে নিয়ে চল্।"

মাসীমার কথায় গিরীন ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "মাসীমা, আপনার পক্ষে সেখানে যাওয়া অসম্ভব। এখান থেকে অনেকটা দূরে একটা ছোট পাহাড়ের ওপর সন্ন্যাসীদের আস্তানায় তিনি থাকেন। একদিন ঠিক এমনি সময়ে বাবার মন্দির থেকেই তাঁর পাছু নিয়ে ঠিকানা জেনে এসে সেই দিনই সন্ধ্যার পরে আবার গেলুম; সেখানেও মহাদেবের আরতি-দর্শন ভাগ্যে ঘটল; একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হ'ল। তিনি রাত্রিতে থাক্‌তে বল্লেন, কিন্তু পাছে দাদা ধরে ফেলেন সেই ভয়ে রইলুম না।"

কালীতারা চিন্তিত হইয়া কহিলেন, "সে যা হোক্, এখন তার সঙ্গে ত দেখা করা চাই, তা কি উপায় করা যায় বল্ দিকি।"

গিরীন একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "সোমবার দিন দাদা নিশ্চয়ই আস্‌বেন; তুমি বেলা আটটার পর এসো, আমিও উপস্থিত থাক্‌ব। সেই সময় তাঁকে ধরা যাবে। বাস্তবিক আর বিলম্ব করা উচিত নয়, বেশ বুঝ্‌চি। আমিও আর এ অবস্থায় থাক্‌তে পাচ্চি নে।

কালীতারা আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, "বেশ কথা, কালই ত সোমবার, আমি ঠিক সময় আস্‌ব। কাল দেখা কর্‌তেই হবে।" এই বলিয়া তিনি বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন।

সোমবার যথাসময়ে কালীতারা উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, গিরীন তাঁহার পূর্ব্বে আসিয়াই প্রাঙ্গণ-প্রান্তে অপেক্ষা করিতেছে। হরিহরনাথ আসিয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করায় গিরীন উত্তর দিল, "তিনি মন্দিরে ঢুকেছেন, এখনই বাইরে আসবেন।" বলিতে বলিতেই হরিহরনাথ মন্দির হইতে বাহিরে আসিলেন। গিরীন্দ্র আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া পুত্তলিকাবৎ বিদ্যুৎবেগে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পদধূলি মাথায় লইয়া কহিল, "দাদা, দাদা, আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনার দর্শন পেলুম; কতদিনের আশা আজ সার্থক হ'ল।"

হরিহরনাথ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ যৌগিক শক্তিবলে আত্মস্থ হইয়া, গিরীনকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন; আবেগ-উদ্বেলিত-কণ্ঠে কহিলেন, "ভাই তুমি কতদিন এখানে এসেছ? সংসারের সমস্ত মঙ্গল ত? তোমার এ বেশ কেন?"

গিরীনের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিল,—"দাদা আপনার জন্যেই আমার এ বেশ, বহুকাল আপনার সন্ধানেই ফিরিতেছি। আজ বহুভাগ্যে আপনার শ্রীচরণ স্পর্শ করলুম।"

হরিহরনাথ গম্ভীর অথচ স্নেহাপ্লুতকণ্ঠে কহিলেন, "ভাই, আমি ত তোমাকে আমার সন্ধান কর্‌তে বলি নি; সময় হলেই সাক্ষাৎ হ'ত;

তবে এত অধৈর্য্য হয়ে গৃহ পরিত্যাগ করলে কেন ?"

গিরীন অতিকষ্টে অর্দ্ধজড়িত স্বরে কহিল, "দাদা আপনি বিজ্ঞ, আর কি বলব দাদা, আপনার অভাবে সুখ-শ্রী আমাদের সংসার থেকে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয়েছে !"

গিরীনের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অতর্কিতে অরণ্য মধ্যে ব্যাঘ্রের সম্মুখীন পথিক যেমন তাহার অগ্নিদৃষ্টির সম্মুখে নিস্পন্দ ভাবে ভীতি-বিহ্বল নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া থাকে, গিরীনও তেমনি অপলক নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। হরিহরনাথ তাহার নিতান্ত অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করিয়া ব্যথিত হইলেন; সহানুভূতি-জ্ঞাপক স্বরে কহিলেন, "তুমি আশ্বস্ত হও ভাই; অতটা বিহ্বল হবার প্রয়োজন নাই; তোমার অবস্থা আমি বেশ বুঝতে পাচ্চি—তুমি এখানে আছ কোথায় ?" হরিহরনাথের কথায় গিরীনের ভয়-ভাবনা দূর হইল; একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "মন্দিরের অনতিদূরে একটি বাসায় থাকি।"

হরিহরনাথ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "তুমি একলা আছ, না আর কেহ তোমার সঙ্গে আছেন ?"

গিরীন কহিল, "আমি সেখানে একলাই থাকি, তবে বিদেশের একজন সঙ্গী আছেন; সম্প্রতি মাসীমা এখানে আসিয়াছেন।"

হরিহরনাথ কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "মাসীমা কে ?"

গিরীন কহিল, "জেঠাইমার—"

হরিহরনাথ তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও বুঝেছি আর বলতে হবে না।" অকস্মাৎ পূর্ব্ব-স্মৃতিতে তাঁহার চিত্ত বিলোড়িত হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় কোন সময়ে তাঁর দেখা পেতে পারি ? এখন কি তাঁর কাছে যাবার সুবিধা হবে ? আসবার সময় তাঁর শ্রীচরণ বন্দনা ক'রে আসতে পারিনি, সে ক্ষোভ এখনও আমার মনে আছে।"

গিরীন ধীরস্বরে কহিল, "দাদা আপনাকে আগেও কয়বার এই মন্দিরে দেখেছি, সাহস ক'রে কাছে ঘেঁসতে পারিনি; মাসীমাকে সে কথা বলায় তাঁরই আশ্বাসে আজ আপনার কাছে আসতে ভরসা পেয়েছি। তিনি এখানে আজ আপনার জন্যে অপেক্ষা করবেন।"

হরিহরনাথ ব্যগ্র-স্বরে কহিলেন, "কৈ ? কোথায় তিনি ?"

গিরীন অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে দেখাইয়া বলিল, "ঐ যে বসে আছেন ওখানে ?"

কালীতারা দুর্গা-মন্দিরের সোপানে বসিয়া অনিমেষ নেত্রে হরিহরনাথের দিকে তাকাইয়াছিলেন; তাঁহার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু গড়াইতেছিল, হরিহরনাথ সম্মুখে আসিয়াই চরণ- বন্দনা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মা সন্তানের অপরাধ গ্রহণ করবেন না, আমি আপনার শ্রীচরণে প্রকৃত অপরাধী। ভাগ্যবলে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আবার শ্রীচরণ-দর্শন ঘটল।"

কালীতারা আর আপনাকে সংবরণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। উদ্বেলিত মর্ম্মোচ্ছ্বাস রোধ করিয়া বদ্ধকণ্ঠে অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে কহিলেন, "বাবা হরিহর, বড় সুক্ষণে এ তীর্থে এসেছিলেম; আর যে কখনো তোমার দেখা পাব সে আশা ছিল না; গিরীনের মুখে তোমার কথা শুনে অবধি প্রাণটার ভেতর যে কি হচ্চে তা আর কি বলব ? বহু তপস্যা না থাকলে তোমার মতন সন্তান জন্মায় না। বাবা, দিদি বড়ই পুণ্যবতী ছিলেন, তোমাকে রেখে স্বর্গে গেছেন; আমি অভাগী তাই আমাকে

তোমায় এ বেশে দেখতে হ'ল।" এই বলিয়া তিনি অশ্রুমোচন করিলেন।

হরিহরনাথ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "মা আপনি অনর্থক দুঃখ করছেন; এ সংসারে প্রত্যেকেই স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মের ফলভোগ করে থাকে; আপনি বুদ্ধিমতী আপনাকে কোন কথা বলাই আমার ধৃষ্টতা। অখণ্ড ফলপ্রসূ প্রারব্ধ কর্ম্মের হাত থেকে কে কবে নিস্তার পেয়েছে?"

কালীতারা সজলচক্ষে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিলেন,—"বাবা, জানি সব বুঝিও সব, দেখছিও সব, কিন্তু তা বলে কি মায়ের মন প্রবোধ মানে! সংসারের এমনিই মায়া; বাবা হরিহর তুমি ত তোমার দুঃখিনী মাসীমাকে মায়ের চেয়ে কোন অংশে কম দেখ না; আমার সব কথাই ত রেখেছিলে; আজ একটী কথা মুখ ফুটে বলব, রাখবে ত বাবা?"

হরিহর কহিলেন, "বলুন কি কথা? আমি চিরদিনই আপনার আদেশ পালন করে এসেছি।"

কালীতারা স্নেহসিক্ত-কণ্ঠে কহিলেন—"তা ত করে এসেছ বাবা, তবে এখন ত আর সেদিন নেই, তাই বলতে ভরসা পাচ্চিনে হরিহর!"

হরিহর ভক্তি-উচ্ছ্বসিত-স্বরে কহিলেন, "কি এমন কথা মা যা আপনি আমাকে বলতে কুণ্ঠিত হচ্চেন? আপনি জানেন যে, এ সংসারে এখন আপনি সকলের চেয়ে আমার শ্রদ্ধার পাত্র। গৃহ-ত্যাগের পূর্ব্বে আপনার চরণ-দর্শন না করে আসাটা আমার সব চেয়ে বড় ত্রুটী। আপনি প্রসন্নমুখে মার্জ্জনা করলে তবে সে ত্রুটী সংশোধিত হবে।"

কালীতারা কহিলেন, "মায়ের কাছে আবার ছেলের ত্রুটী কি? মা'র কাছে ছেলের মার্জ্জনা ত সব সময়েই পড়ে আছে বাবা! আমি বলছিলুম কি, আমাদের সঙ্গে তোমায় দেশে ফিরতে হবে। তোমায় ছেড়ে আমি কখনই যাব না!"

এই পরম-স্নেহময়ীর হৃদয়ের বৈদ্যুতিক আকর্ষণে হরিহরনাথ কিছুক্ষণ অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি ধীরভাবে কহিলেন, "মা, আপনার কঠোর আদেশের কাঠিন্য আর নাই—আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য! আপনার বলবার পূর্ব্বেই আমি গুরুদেবের আদেশে গৃহাভিমুখী। আমাকে আরও কিছুকাল গৃহাশ্রমে থাকতে হবে। আপনি কবে দেশে রওনা হচ্চেন?"

হরিহরনাথের কথায় গিরীন্দ্র চমকিয়া উঠিল। সে যে উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছে, তাহা ভগবদিচ্ছায় এমন অসম্ভাবিতরূপে পূর্ণ হইবে, ইহা ত তাহার স্বপ্নাতীত। সে নীরবে মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

কালীতারা অপ্রত্যাশিত হর্ষের আবেগে আর কথা কহিতে পারিলেন না। অনেক কষ্টে কহিলেন, "যে সাধনা দেখে এসেছি তার ফল ভগবান্‌কে শত কাজ ফেলে আগে দিতে হবে।" হরিহরনাথ কালীতারার কথার গূঢ় অর্থ বুঝিলেন; কোন উত্তর দিলেন না। কালীতারা পুনরায় কহিলেন, "বাবা এই কার্ত্তিক মাসেই আমরা ফিরব।" হরিহরনাথ তাঁহার ঠিকানা জানিয়া, পুনরায় সাক্ষাতের সময় নির্দ্দেশ করিয়া আশ্রমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

পথে চলিতে চলিতে হরিহরনাথ ভাবিতে লাগিলেন—হে ভগবন্ আমার উগ্র উদ্দেশ্য-সৌধের প্রথম তল, কোন্ পাপে এরূপ শিথিল-ভিত্তি হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া গেল। আমার ভিত্তি-স্থাপনেই বিষম ত্রুটী হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম-মত্ততার প্রথম প্রখর আবেগে সেটা ধরিতে পারা যায় নাই। গুরুদেব আমার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া আমার ভ্রম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যখন সেই চিত্রকূটের নিভৃত-আশ্রমে সাধনায় নিমগ্ন ছিলাম তখন কে যেন ক্ষুদ্র একটি সজীব ছবি আমার চোখের সামনে আনিয়া ধরিত। সেই চিত্রে আমার চক্ষু ঝলসিয়া

দিত। আমি ভয়ে চক্ষু চাপিয়া ধরিলেও কে যেন সবলে আমার চক্ষুপল্লব উন্মুক্ত করিয়া সেই সজীব চিত্র সমধিক উজ্জ্বলবর্ণে ... ইত! উঃ কি জলন্ত জাগ্রৎ ... কি আশ্চর্য্য, এত বিষয় স্মৃতি-পটে সমু... কেবল মাত্র সেই স্মৃতিটি সকলগুলি ... পরাজিত করিয়া বাসুকীর ন্যায় সহস্র-শীর্ষে উত্থিত হ... । আসল কথাটা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতে ...তেছি না! কি ভ্রমই ঘটিয়াছে! গুরুদেব আদেশ, মাসীমার ইঙ্গিত, নিজের দায়িত্ব-বোধ, বিবেকের বজ্র-নির্ঘোষ পুঞ্জীভূত হইয়া আমার সমস্ত অভি-প্রায়, উদ্দেশ্য কি প্রচণ্ড ফুৎকারে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল! সে অপূর্ব্ব-স্মৃতি যে কিছুই লুকাইতে চায় না, সে ত লুকোচুরী খেলা জানে না, সে যে স্বতই সরল, স্বচ্ছ, নির্ম্মল; প্রভাতের শুভ্রতারকার ন্যায় হীরকোজ্জ্বল! কি আলোক-ছটাই উথলিয়া উঠিতেছে। রক্তপদ্মরাগের রক্তিম বিভায় চারিদিক রাঙ্গাইয়া তুলিয়াছে! সেই এতটুকু অঙ্কুরে এত ফুল ধরিয়াছে! স্মৃতির পরতে পরতে যেন সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার খুলিয়া দিতেছে! সেই এতটুকু কচি হাত দুইখানিতে আমার বুকের সমস্ত অস্থিমাংস যেন আঁকড়িয়া রহিয়াছে! তাহার প্রত্যেক স্পর্শে যেন কদম্ব-রেণুর প্রফুল্ল পুলক! যেন ফাল্গুনের স্নিগ্ধ মধুর মলয়-বাতাসে বনফুলের মৃদু সৌরভে সমগ্র চরাচর ভরপুর! অশোক ফুলের ছোট ছোট রাঙা রাঙা পাপড়ি-গুলি ঝরিয়া ঝরি... সমগ্র ধরিত্রীর পথটা যেন সিন্দূরে, আবীরে ... ছাইয়া ফেলিয়াছে! তাহার উপর প্রভাতের ফুল্ল আলোকে অতসী পুষ্পের মাধুর্য্য সুবর্ণের উজ্জ্বল ছটা বিচ্ছুরিত করিতেছে! অন্ধকার গুহায় যে সোনার প্রদীপ! ঘননীল মেঘবক্ষে দামিনী-দ্যুতি! এ যে মরুভূমির বালুকা-ধূসর বিরাট-নিস্তব্ধ বক্ষে চাঁদের আলো! শুষ্ক শূন্য নদীর চরে জলরেখা, হেমন্তের পত্রপল্লব-পরিশূন্য তরুশাখায় বিহঙ্গনীড়! অনেকদিন অনেক কথা ভাবিয়াছি, অনেক চিন্তা আমার নির্জ্জন স্মৃতি-মণ্ডপে বিকসিত হইয়াছে, কিন্তু ক্ষুদ্র একটি শিশুর শক্তি যে ব্রহ্মাণ্ড ওলট-পালট করিয়া তুলিতে পারে, নির্ম্মম নরহন্তা দস্যুর চোখের জলে ফোয়ারা ছুটাইয়া করুণার মুক্তাসার বর্ষণ করিতে পারে তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই! একটি ক্ষুদ্র কিসলয় সুদীর্ঘ বিশাল বনস্পতিকে হেলাইতে পারে তাহা বুঝি নাই! তাহার ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র কমল-কোরক করযুগলে কি দুর্জ্জয় অশনির বল! গগন-চুম্বী মহী-ধর যেন তাহার ক্ষুদ্র অঙ্গুলী-সঞ্চালনে টলিয়া পড়ে!

হরিহরনাথ আর নিজেকে সামলাইয়া রাখিতে পারিলেন না। পথিপার্শ্বে একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, নিজে কত স্থানে ধর্ম্মের, দর্শনের, মনস্তত্ত্বের কত বিশ্লেষণ করিয়াছেন, কত জটিল সমস্যার সমাধান করিয়াছেন কিন্তু আজ তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি ও সাধনার এ কি প্রতি-ক্রিয়া! কোন্ জন্মান্তরীণ অজ্ঞাত চিরবিস্মৃত মহা-মোহের এ কি অমোঘ প্রায়শ্চিত্ত! অন্তরের তীব্র আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণে এ কি অচিন্তনীয় অন্তরায়! দীর্ঘকাল আচরিত সন্ন্যাস-ব্রতের কি বিচিত্র পরিণাম!

[ক্রমশঃ]

"ওস্মান হস্ত হইতে একটি অঙ্গুরীয় মুক্ত করিয়া কহিলেন,—"এই অঙ্গুরীয় গ্রহণ কর, তুই একদিন মধ্যে কিছু সাধন হইবে না—কতলুখাঁর জন্মদিন আগতপ্রায়, সে দিবস বড় উৎসব হইয়া থাকে। প্রহরিগণ আমোদে মত্ত থাকে। সেই দিবস আমি তোমাকে উদ্ধার করিব।"—দুর্গেশনন্দিনী।

গল্প

পথের ধূলায় পদ্মরাগ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

১

সঙ্গীহীন সৃষ্টি-ছাড়া সুবল মনের মধ্যে আনন্দের পাহাড় গড়িয়া যে দিন পাশের গ্রামের মধুদুলের পনর বছরের মেয়ে পরীকে নিজের দেহের অর্দ্ধেক খানি বলিয়া ঘরে আনিল সে দিন পাড়ার লোকের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। এই মাতালটার বরাতে জুটিয়া গেল কি না সোনার বরণ বৌ,—আর মেয়েটারই কি অদৃষ্ট গা! ছোঁড়াটার হাতে মার খেতে খেতে অমন চাঁপা ফুলের মত গায়ের রং কালির মত হয়ে যাবে!

সুবল কিন্তু এই সব সমালোচনার বাহিরে থাকিয়া দিগ্বিজয়ের আনন্দে তাড়ির আড্ডায় দুটো ঝাঁপি শেষ করিয়া তাহার জ্ঞান বলিয়া জিনিষটাকে কোথায় যে পাঠাইয়া দিল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই।

বিবাহের ... তাহা অপেক্ষা লক্ষগুণ। ... সে তাহা... ...রের গ্রামেরই ফকির ... গ্রাস নিজের ...কে আনিতে পারিয়াছিল বলিয়া। বেচারা ফকির কোন বাল্যকাল হইতে জানিয়া আসিয়াছে পরী তাহার স্ত্রী। পরীও নিজেকে সেদিন পর্য্যন্ত ফকিরের স্ত্রী বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে আর হঠাৎ সে কেমন তাহাদের মাঝে পড়িয়া তাহাদের আশাকে আকাশকুসুমে পরিণত করিয়া দিয়া পরীকে নিজের বলিয়া ঘরে আনিল। দশগণ্ডা টাকা পণ বেশী, তাতে কি? তার রূপের কাছে আবার টাকা?

দিন কয়েক পরেই কিন্তু তাহার এই জয়ের আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইয়া গেল, যখন সে দেখিল তাহার এই কাজ প্রিয়তমা পরীর বুকের মাঝে কতখানি বিষের ঝড় বাহিয়া দিয়াছে, হয় ত বা তাহার দাপট ফুলের মত কোমল অন্তরে সে ... করিতে পারিবে না।

তাহার অ-গোছাল সংসারটা... করিয়া তুলিবার জন্য পরী তাহা... করে, স্বামীর সেবায় নিজেকে ডুবাই... ...ও সুবলের যেন মনে হয় বৌ সব ক... ...র বটে কিন্তু তাহার মধ্যে প্রাণ নাই, যাহা করে সেটা করিতে হয় বলিয়াই, কেমন একটা বেদনার পাষাণ ভার সুবলের অন্তরের মধ্যে যাতার ...রের মত বসিয়া গেল, যাহা হইতে সে নিজেকে কিছুতেই মুক্ত করিতে পারিল না।

সে দিন দুই স্বামী-স্ত্রী একই শয্যায় বিপরীত দিকে মুখ করিয়া বোধ হয় বা বিভিন্ন চিন্তার স্রোতেই নিজেদের ভাসাইয়া দিয়াছিল, হঠাৎ পার্শ্বপরিবর্ত... ...রিয়া সুবল পরীকে ... ...জাড়ের মধ্যে থাকি... ...ক হইবে!

পরী তাহার টানা চক্ষু দুটি স্বামীর মুখের উপর ফেলিতেই সুবল বলিল,—"আনন্দের নেশায় উন্মত্ত হয়ে তোমার বুকে যে ঘা মেরে বসেছি এখন বুঝছি কতখানি অন্যায় সেটা হয়ে গিয়েছে।"

উদাসভাবে পরী সুবলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, একটা কথাও বলিল না।

তাহার চুলগুলির মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে সুবল যেন অনুতপ্তের মত বলিতে লাগিল, —"পারবে না কি রাণি আমাকে তোমার আপনার বলে গ্রহণ করতে? আমি কিন্তু আমার সংসার, এমন কি আমাকে পর্য্যন্ত তোমার উপরিই নির্ভর করে দিলুম যা ইচ্ছে তোমার করো। আমার করা কাজের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমি সব সময়েই প্রস্তুত।"

পৃথিবী-জোড়া কান্না পরীর কণ্ঠনালি পর্য্যন্ত ঠেলা মারিয়া উঠিল, একটা কথাও সে বলিতে পারিল না, রাত্রির সমস্ত সময়টা সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইয়া দিল। ভগবান হৃদয়ে বল দাও, বিস্মৃতি পাঠিয়ে পূর্ব্বের কথা হরণ করে নাও দয়াময়! এতটুকু নির্ভরতার পরে আমার সবটুকুই যেন তাতে লীন করে দিতে পারি।

২

কাহার পুণ্য পরশে হঠাৎ একদিন পরীর নিদ্রার ঘোর টুটিয়া গিয়া তাহার চক্ষের সম্মুখে সারা পৃথিবীটা যেন নবারুণের আলোয় ভরিয়া উঠিল। কি শান্ত কি মধুর! এ আলোক-রশ্মি তাহার চক্ষের সম্মুখে একটা দিনের জন্যও প্রতিভাত হয় নাই! আজ তাহার মনে হইতে লাগিল এই আলোর ঝরণায় সারা জীবন যেন সে স্নান করিতে পায়।

[illegible]ক তাহার দৈনন্দিন কাজে বাহির [illegible] পরী বলিয়া উঠিল,—"এমন করে রোজ রোজ বেলা পর্য্যন্ত না খেয়ে থাকলে পিত্তি পড়ে অসুখ করবে, দুটো মুড়ি খেয়েও না হয় কাজে যাও।"

স্ত্রীর মুখে আজ এতবড় দরদের কথা শুনিয়া সুবল প্রথমটা নির্ব্বাক হইয়া গেল, তাহার পর বলিল,—"রোজের অভ্যেস অসুখ করবে কেন?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ করবে, তুমি সব জান কি না?" বলিয়াই পরী উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই পাত্র পূর্ণ মুড়ি ও বড় একটা ঘটিতে জল আনিয়া দিল।

তাহার এত খানি আব্দার উপেক্ষা করিবার ক্ষমতা সুবলের ছিল না, স্ত্রীর দেওয়া জিনিষের সদ্ব্যবহার করিতে সে বসিয়া গেল।

স্বামীর পাশে বসিয়া পরী বলিল,—"আমি কিন্তু আজ তোমার সঙ্গে যাব।"

সুবল বলিল,—"সে কি?"

হাসির লহর ছুটাইয়া পরী বলিল,—"দোষ কি? সবাই ত যায়, বাপের বাড়ী যখন থাকতুম—"

"তখন যেতে এই কথা ত! কিন্তু আমি সেটা সহ্য করতে পারব না রাণি! অমন রং পাক ঘেঁটে—"

দৃষ্টিতে আনন্দ মাখাইয়া পরী বলিল,—"যাও।"

"না—না—সত্যি বলছি রাণি বেঁচে থাকতে কিছুতেই আমি সেটা সহ্য করতে পারব না, আমি যা উপায় করব সবই তোমার হাতে এনে দেব, সংসারের ব্যবস্থা তুমি করে যাবে কিন্তু দোহাই ভগবানের বুকের ভেতর রাবণের চিতা জেলে রেখ না।"

পরীর ভাষা লোপ পাইয়া গেল, গম্ভীর ভাবেই সেইখানেই সে বসিয়া রহিল।

"অভিমান হ'ল?"—বলিয়া সুবল কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু বলা আর তাহার হইল না,

হঠাৎ মধুদুলে বাটীর প্রাঙ্গণে দেখা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি বাবাজি কি হচ্চে ?"

পরী মাথার অবগুণ্ঠন একটু টানিয়া দিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। সুবল আগ্রহের সহিত তাহাকে বসিবার আসন দিল।

একথা সে কথার পর মধু বলিল, "বাবাজি, পরীকে নিয়ে যাবা"—বাধা দিয়া সুবল বলিল, "যেদিন ইচ্ছে আপনার নিয়ে যাবেন, এসেছেও ত অনেকদিন।" বলিয়াই সে শ্বশুরের জন্য কলিকায় তামাক ভরিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিবার জন্য কতকটা দূরে সরিয়া গেল।

মধু কন্যাকে বলিল, "কাল তা হ'লে চল মা, ভাল দিন"—

লজ্জিত-হাস্যে পরী বলিল, "এখন ত যাওয়া হবে না বাবা।"

বিস্মিতভাবে কন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া মধু বলিল,—"কি করে মায়া কাটালি রে পরী ?" বলিতে বলিতে সম্মুখে সুবলকে দেখিয়াই বলিল, "মেয়ে যে আর যেতে চায় না বাবাজ! অথচ সেখানে"—

বিনীত ভাবেই সুবল বলিল, "আমি নিজেই একদিন নিয়ে যাব।"

আরও কিছুক্ষণ বসিয়া মধু চলিয়া যাইলে কুটিল-হাস্যে সুবল পরীকে বলিল, "বুঝতে পেরেছি রাণি, কেন তুমি যেতে চাও নি।"

পরী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বল দেখি ?"

"ফোক্‌রেকে ভোলবার জন্য ?"

স্বর্গীয়-হাস্যে মুখখানাকে ভরাইয়া পরী বলিল, "মরণের আগে পর্য্যন্ত তাকে কি ভুলতে পারব গা ? সে যে আমার দাদা !"

বিহ্বলভাবে সুবল ডাকিল, "রাণি !"

পরী জিজ্ঞাসা করিল, "কাজে যাবে কখন ?"

আনন্দোদ্বেলিত-কণ্ঠে সুবল বলিয়া উঠিল, "ধ্যেৎ তোর কাজ আজ আর যাব না।"

৩

একটু গোড়ার কথা বলি।

পরীর জ্যোৎস্নার মত রূপের কমনতা, তাহার শান্তস্বভাব, কমনীয় ব্যবহার দেখিয়া অনেকেই তাহাদের ঘরের বধূরূপে লইয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও বা বেশী পণ দিবার লোভ দেখাইলেও পরীর মা ফকিরের মাতার নিকট ফকিরের সহিত কন্যার বিবাহ দিবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ায় কেহই আর তাহাদের ইচ্ছাটাকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারে নাই।

স্ত্রীর প্রকৃতি নারীর মাধুর্য্যগুণে মণ্ডিত হইলেও মধুর প্রকৃতি কিন্তু ভিন্ন ধাতুতে গড়া, সে এই সব কথাবার্ত্তার প্রতিশ্রুতির বাহিরে নিজেকে রাখিয়া তাহার দিনগুলি কাটাইয়া দিতে লাগিল, কন্যার বয়স হইয়া যাইতেছে এখনও পর্য্যন্ত তাহার বিবাহ দিবার চেষ্টা না দেখিয়া সকলেই তাহাকে ব্যতি-ব্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল।

তাহাদের কথা মধু কানেই তুলিল না, সে কেবল পরীর বয়স বাড়াইয়া অধিক টাকার পণ পাইবার আশায় বসিয়া রহিল কিন্তু সকলের নিকট প্রকাশ করিত বিয়ের যখন সব ঠিকই হয়ে আছে তখন যাক না দিন কতক। ভদ্দর ঘরেও এত বড় মেয়ে ঢের ঢের থাকে গো !

পরী ও ফকিরও পরস্পরকে স্বামী স্ত্রী বলিয়াই জানিয়া আসিয়াছে বা হয় ত সেই চক্ষেই দেখিয়া আসিয়াছে, হয় ত বা লুকাইয়া তাহাদের মধ্যে দুটো হাসি-তামাসাও চলে।

পরীর মা মনে করিত, আহা এমন জোড়ের পায়রা,—কবে ইহাদের দুই হাত এক হইবে !

কিন্তু হঠাৎ যে দিন বেশী টাকা পণ লইয়া ঠিক পাশের গ্রামের সুবল ঢুলের সহিত মধু কন্যার বিবাহের স্থির করিল সেই দিন তাহাদের বাড়ী খানার মধ্যে যেন একটা প্রলয়ের ঝড় বহিয়া গেল —পরীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

বিবাহের পর স্বামীর সংসারটাকে নিজের সংসার বলিয়া গ্রহণ করিতে যাইয়া পরী অন্তরের মধ্যে কেবল ঘা খাইতে লাগিল, কিছু দিন যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সুবল যখন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পত্নীর উপর ছাড়িয়া দিল, স্ত্রীর এতটুকু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিতে উদ্যত হইল, তখন পরী আর স্বামীর গভীর প্রেমের কোনও দিক দিয়া অমর্য্যাদা করিতে পারিল না, সেও নিবিড় ভাবে স্বামীকে আঁকড়াইয়া ধরিল।

* * *

হঠাৎ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে সুবল ডাকিল—"রাণি!"

পরী তখন দাবার উনানে কি একটা তরকারি চাপাইয়াছিল। স্বামীর দিকে চাহিয়া স্মিত-হাস্যে বলিল,—"কি?"

পুলকোজ্জ্বল-মুখে সুবল বলিল, "ফক্‌রেকে আজ নিমন্ত্রণ করে এসেছি—সন্ধ্যা বেলায়।"

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পরী বলিল—"কেন?"

"কেন আবার কি?—আহা বেচারা! তার ওপর যে অবিচার আমি করেছি তার ফলে সে যে কি হয়ে গিয়েছে তা যদি তুমি দেখতে! এলে একটু বেশী করেই যত্ন কর তাকে, আমার কাজের প্রায়শ্চিত্ত আমাদের দু'জনকেই করতে হবে ত!"

ধমক দিয়া পরী বলিয়া উঠিল,—"কি বাজে বকছ?"

"বাজে কথা একটুও বলি নে রাণি, এলেই দেখতে পাবে কি ফক্‌রেই ছিল, আর কি হয়ে গিয়েছে।"

ব্যস্তভাবেই পরী বলিয়া উঠিল "বেলা অনেক হয়েছে নেয়ে এস ত আগে।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই পরী তেলের বাটী আনিয়া দিল।

স্নানের জন্য সুবল এতটুকুও আগ্রহ না দেখাইয়া আজ ফকিরকে দেখিয়া অন্তরের মধ্যে যে ব্যথা জাগিয়া উঠিয়াছিল, সেইটারই অপনোদনের জন্য স্ত্রীর নিকট অন্তরের কবাট পুনরায় অর্গলমুক্ত করিতে উদ্যত হইলে পরী আর সে সুযোগ না দিয়া তাহাকে তৈল মাখাইয়া একরূপ জোর করিয়াই স্নানে পাঠাইয়া রন্ধনে দ্বিগুণ মনোসংযোগ করিল।

কিন্তু স্বামী আহারে বসিয়া যখন তাহার এত যত্নে প্রস্তুত ব্যঞ্জন মুখে দিয়াই বলিল—"নুন দিতে ভুলে গিয়েছ রাণি!" তখন সে যেন আধমরার মত হইয়া গেল, লজ্জিত-হাস্যে বলিল—"একটু বসে খাও না নুন দিয়ে আর একবার ফুটিয়ে নিই।"

সুবল বলিল—"না—না, কিছু দরকার নেই, একটু নুন মেখে নিলেই চলে যাবে।"

৪

সন্ধ্যার জম জমাট অন্ধকারের বুক চিরিয়া ফকির যখন সুবলের সঙ্গে তাহার বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইল, পরী তখন কি একটা কাজে গৃহমধ্যে নিজেকে নিযুক্ত রাখিয়াছিল।

প্রাঙ্গণ হইতে সুবল বলিয়া উঠিল—"ফকির এসেছে গো!"

সহাস্য মুখে ফকিরকে অভ্যর্থনা করিতে যাইয়া পরী চমকাইয়া উঠিল—এই বৎসরখানেকের মধ্যে কতখানি বিশ্রী পরিবর্ত্তন ফকিকের, দেহের সেই

বাঁধুনি, মুখের সেই লালিত্য কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যেন জরায় আক্রমণ করিয়াছে।

তাহার অবস্থা দেখিয়া পরীর নয়ন দুটী জলে আর্দ্র হইয়া উঠিল। বুকের মধ্যে কান্নার রাশি যেন গুমরাইয়া উঠিতে লাগিল। স্বামী কেন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিল?

তাহাকে স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ওষ্ঠপ্রান্তে কান্নারই মত হাসি আনিয়া ফকির জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে পরী কি দেখছিস্?"

ব্যথাতুর-কণ্ঠে পরী বলিল, "তুমি এ কি হ'য়ে গিয়েছ ফকির দা?

তেম্‌নি হাসিয়া ফকির বলিল, বেঁচে আছি ত রে?"

কথাটা পরীর দেহের তন্ত্রীগুলা একটী একটী করিয়া যেন কাটিয়া দিল। কিন্তু সেটাকে চাপা দিয়া সহাস্য-কণ্ঠে বলিল, "বেঁচে থাকবে না ত কি ফকিরদা? কিন্তু নিজের শরীরটাকে এতখানি হেনস্থা করা—না—না এটার ওপরে এতখানি উদাসীন হয়ো না।"

সুবল বলিয়া উঠিল, "বস্‌তেই যায়গা দাও আগে।"

অপ্রতিভভাবে পরী তাড়াতাড়ি দাবার উপর একখানা মাদুর বিছাইয়া দিল।

তিনজনের মধ্যেই কত সুখ-দুঃখের কথা চলিতে লাগিল। তার পর আহারের আয়োজন।

তাহাদিগকে আহার করাইয়া পরী স্বামীর হাতে একটা পয়সা দিয়া বলিল, "এক পয়সার পান এনে দাও না।"

ফকিরকে বসিতে বলিয়া সুবল বাহির হইয়া গেল।

সুবল চলিয়া যাইলে পরী জেদ ধরিল, "তুমি বিয়ে করে সংসারী হও ফকির দা! তোমাকে এমন হতচ্ছাড়ার মত দেখে আমার বুকটা যে ফেটে যাচ্ছে।"

বিষাদ-জড়িত হাস্যে ফকির বলিল, "সেটা আর এ জন্মে হ'ল না পরী!"

"কেন হবে না শুনি?"

একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ছেলে-বেলা হ'তে যাকে ভালবেসে এসেছি এ জন্মে তাকে না পেলেও আর একটা জন্ম—"

তিরস্কারের সুরে পরী বলিল, "কি বলছ ফকিরদা! তোমার কি মাথা খারাপ হ'য়ে গেল?"

"হয় ত হ'য়েছে কিন্তু তার স্মৃতিটাই যে আমার আমরণের সঙ্গী হ'য়ে থাকবে সেটার কোনও ভুলই নেই। আচ্ছা পরী!"

পরী তাহার মুখের দিকে চাহিতেই ফকির বলিল, "ছেলেবেলার সেই ভাব সেই ভালবাসা কি করে ভুলে গেলি রে? মনে পড়ে—"

শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই পরী কাযের অছিলায় সেই যে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, সুবল না আসা পর্য্যন্ত আর বাহির হইল না। ক্ষণপূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে একটা সহানুভূতির মন্দাকিনী-ধারা তাহার প্রাণের মধ্যে খেলিয়া যাইতেছিল তাহার এই কথার পর সেটার পরিবর্ত্তে ঘৃণা ও ক্ষোভে তাহার সারা দেহ ভরিয়া গেল।

ফকির চলিয়া যাইলে সহানুভূতির সুরে সুবল জিজ্ঞাসা করিল,—"দেখলে রাণি, ফকরের চেহারা কি বিশ্রী হয়ে গিয়েছে! দেখলে বাস্তবিকই দুঃখ হয়, আর আমারও অনুশোচনা হয়, যখন মনে এই কথাটা জাগে যে, আমিই ইচ্ছে করে তার হৃদ-পিণ্ডটা বুঝি বা ছিঁড়ে এনেছি।"

ব্যথিতকণ্ঠে পরী বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা এমন করে আমার মনে ঘা না দিলে কি দিন কাটে না?"

"না—না রাণি, তা একেবারেই নয়, তোমার মনে এতটুকুও দুঃখ দেবার জন্যে আমি এ সব বলি নি কিন্তু অনুতাপের আগুন কি ভাবে বুকের মাঝে দিন-রাত জ্বলছে তা যদি দেখতে পেতে।"

"অনুতাপ কিসের জন্যে হবে বল ত?"—বলিয়াই পরী বলিল, "কাল হতে ওকে আর বাড়ীতে নিয়ে এস না।"

"সে কি!"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু আমি যে তাকে রোজই আসবার জন্যে বলে দিয়েছি।"

একটা বুক-ফাটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া পরী বলিল —"তা' হ'লে সে কথাটা নিজের মুখেই বলতে হবে।"

৫

সুবল মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া উপার্জ্জন করে আর পরী মনের আনন্দেই সংসারের ব্যবস্থা করিয়া যায়। স্বামীর ফিরিয়া আসিতে এতটুকু বিলম্ব হইলে সে ছট-ফট করিয়া বেড়ায় আর আসিলে ধমক দেয়—এত দেরীও করে! একটা অসুখ বিসুখই যদি করে ফেল!

হাসিয়া সুবল উত্তর দেয়—"যদ্দিন না ও দেহ সোনা দিয়ে মুড়তে পারছি রাণি, তদ্দিন যে সুস্থির হতে পারছি না আর সেটার জন্যে খাটুনিও আমার গায়ে লাগে না, বরং আনন্দ পাই—হাতীর বল গায়ে আসে।"

অবশ্য সুবল তাহাকে রূপার চুড়ি, রূপার পাঁচনল, কোমরে বিছা, নাকছাবি সবই দিয়াছিল।

সুবলের গলা জড়াইয়া পরী আব্দারের সুরে বলে—"আমার এ গয়নার কাছে আবার গয়না কি গা?"

এমনি ভাবেই তাহাদের দিনগুলি সুখের অমিয় হ্রদে স্নান করিতে করিতে কাটিয়া গেল। এই দুই স্বামী স্ত্রীর মিলিত সংসার তাহাদের পাড়ার একটা আদর্শ হইয়া উঠিল। অন্য সবাই তাড়ি খায়, মাতলামি করে, স্ত্রীর সামান্য ক্রটীতে তাহাকে ধরিয়া প্রহার করে কিন্তু পূর্ব্বের মাতাল সুবল পরীর পুণ্য-পরশে সে অভ্যাসটাকে একেবারেই দূর করিয়া দিয়াছে।

আরও দুইটী বৎসর কাটিয়া গেল।

শান্ত ধরিত্রীর বুকের উপর সর্ব্বনাশা ঝড়ের রুদ্র মাতন হঠাৎ যেমন সবই নষ্ট করিয়া দেয়, পরীর জীবনে ঠিক তেমনি একটা ওলট-পালট হইয়া গেল। মৃত্যু আসিয়া পরীর বুক হইতে সুবলকে ছিনাইয়া লইল। কালকূট-দংশন! কোনও ওঝাই আর তাহাকে বাঁচাইতে পারিল না। সবাই বলিল-- সাক্ষাৎ কালে খেয়েছে, বাঁচান যে শিবের অসাধ্য।

পরীর পিতা মাতা কাঁদিয়া বুক ভাসাইল। গ্রাম-শুদ্ধ লোক হায় হায় করিতে লাগিল কিন্তু পৃথিবীটা মসীময় হইয়া পরীর দিকে ঘুরিতে থাকিলেও তাহার চক্ষু দিয়া একবিন্দু জল ঝরিল না, মুখাগ্নি করিবার পূর্ব্বে কেবল স্বামীর পা দুইটা একবার দেহের সমস্ত শক্তিটুকু দিয়াই বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়াছিল।

সেইদিন হইতেই পরীর মনে হইল সংসারের বন্ধন যেন তাহার সবই ছিন্ন হইয়া গিয়াছে! আহারে রুচি রহিল না, শয়নের ঈপ্সা বোধ হয় ত্যাগই করিয়া বসিল।

কন্যার এই অবস্থা পিতা মাতার হৃদয়ে শক্তি-শেল হানিয়া দিল। দুঃখিতভাবে মাতা বলিল— "এখানে থেকেই বা আর কি হবে মা? চল আমাদের কাছে—যার জন্যে এখানে থাকা সেই যখন চলে গেল—"

বেশ শান্তভাবেই পরী বলিল—"তা কি করে হয় মা! এটা যে তাঁরই ভিটে—সন্ধ্যার প্রদীপ ত জ্বালতে হবে। আমার যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না।"

অশ্রুসিক্ত নয়নে মা বলিল—"তোকে যে এই অবস্থায় ফেলে আমরাও যেতে পাচ্ছি না মা—অথচ সেখানেও—"

বক্তব্যের অবশিষ্টাংশটুকু না শুনিয়াই পরী বলিল—"তোমরা যাও মা, পার যদি এক আধবার দেখতে এস।"

সেইরূপ ভাবেই মা বলিল—"তোর এই বয়সে তোকে একলা রেখেও যাওয়া যায় না পরী, চল্ তুই আমাদের সঙ্গে।"

মাকে যখন বুঝাইয়া কিছুতেই পারিল না তখন সে একটু দীপ্ত কণ্ঠেই বলিল—"কেন বার বার জ্বালাতন করছ মা,—আমি যাব না।"

কন্যাকে যখন কোনও দিক দিয়াই তাহাদের মতে আনিতে পারিল না তখন বাধ্য হইয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে তাহারা চলিয়া গেল।

পরীর চক্ষে পৃথিবীটা যেন মহাশূন্য বলিয়াই মনে হইতে লাগিল।

তাহার এই অনাসক্ত দিনগুলার মধ্যে ফকির এক এক দিন আসিয়া গল্প করিয়া যায়।

তাহার কথার কতক বা পরীর কানে যায় কতক বা যায়ও না।

একদিন ফকির ধরিয়া বসিল—"যা হবার তা হয়ে গিয়েছে পরী, মনটাকে বাঁধ, দেখ দেখি আমাকে, তোরই মত শূন্য প্রাণ নিয়ে কতদিন হতে ঘুরে বেড়াচ্ছি কিন্তু পাগল হয়ে যাই নি রে! বুক-খানার ভেতর শ্মশানের আগুন জ্বেলে রাখিস নি ভাই—আমার দিব্যি।"

পরী একটু হাসিল মাত্র।

ফকিরের মনে হইল, এ ত হাসি নয় এ যে জমাটবাঁধা কান্না। বিষণ্ণভাবে বলিল—"যেটার ওপর মানুষের হাত কোনও দিক দিয়েই নেই সেটার জন্যে এতখানি দুমড়ে পড়ে কি হবে বল? বরং মন বাঁধ তুই।"

পরী কিন্তু কোনও দিক দিয়াই বুক বাঁধিতে পারিল না কিন্তু লোকের সাম্‌নে খুবই গম্ভীর হইয়া থাকে, দিনের মধ্যে দুই তিনবার কোথায় বাহির হইয়া যায়!

পাড়ার লোকে বলে, আহা এমন মেয়ে—ভগবানের কি মার গা! শেষে না পাগল হয়ে যায়!

কেহ বা উত্তর দেয়—বাকীই বা কোন্‌খানটায় রইল?

৬

সুবলের মৃত্যুর পর পরীকে পাইবার জন্য ফকির পুনরায় পৃথিবী জোড়া আশা তাহার বুকের মধ্যে লইয়া সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। যাহাকে না পাইয়া পৃথিবীটা তাহার চক্ষে মহাশূন্যের মত দেখাইতেছে সেই তাহার সাধনার ধনকে পুনঃ প্রাপ্তির জন্যই বা ভগবান সুবলকে পৃথিবী হইতে অপসারিত করিয়া লইল। তাহাদের সমাজে যখন বাধে না তখন তাহাকে সাঙ্গা করিয়া দু'জনেরই মরু জীবনে আবার মরূদ্যানের সৃষ্টি করিয়া তুলিবে।

আশার রঙিন নেশায় মশগুল হইয়া সে যেন নবজীবন লাভ করিবার পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

পাড়ার কাহারও দ্বারা কথাটা মধু ডুলের নিকট উপস্থিত করিয়া যখন জানিতে পারিল সেও এইটাই স্থির করিয়া রাখিয়াছে, তখন আর তাহার আনন্দের সীমা রহিল না।

প্রত্যহই সে পরীর বাটী যাইতে লাগিল। যাই-বার সময় কোন দিন তেল, কোন দিন চাল, কোনও দিন কাপড় লইয়া যাইতে ভুলিত না।

পরী তাহার এই অযাচিত দান-গ্রহণে অসম্মতি জানাইলে সে দুঃখিতের ন্যায় বলিত—"ছেলেবেলার সে কথাগুলো কি ভুলে গেলি পরী! না নিস যদি তুই প্রাণের মধ্যে যে দুঃখ জেগে উঠবে—"

উদাসভাবে পরী বলিত, "তবে থাক ফকিরদা, তোমাকে অপমান করবার ক্ষমতা আমার কোনও দিন হয় নি, আজও নেই।"

এক এক দিন ফকিরের মনে হইত তাহার প্রাণের গোপন বাসনা পরীর নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলে কিন্তু তাহার মনের অবস্থা দেখিয়া কথাটা একটা দিনের জন্যও প্রকাশ করিতে পারিত না। বিপুল আনন্দ লইয়া যেমন সে তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইত তেমনি আবার না পাবার দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া ফিরিয়া যাইত।

কথায় কথায় ফকির পরীর প্রাণে হয় ত একটু শান্তি আনিবার জন্য বলিত—"জগতের চার দিকটা চেয়ে দেখ দেখি ভাই তোর অবস্থায় পড়ে কত লোক তাদের দিন কাটাচ্ছে।"

পরী উত্তর দিত—"আমিও ত দিচ্ছি ফকিরদা!"

"তা দিচ্ছিস, কিন্তু আকাশ পাতাল তফাৎ রে ভাই!"—বলিয়া ফকির বলিতে লাগিল—"আমার দিব্যি পরী তুই ওসব ঝেড়ে ফেলে দে, এই যে পাগলীর মত হয়ে উঠেছিস সে কি আর সেটা দেখতে আসছে, না তোর চোখের জল মোছাবার জন্যে এতটুকুও চেষ্টা করছে? মনে কর সে ছিল তোর শত্রু।"

পরীর যেন চমক ভাঙ্গিয়া গেল! ঠোঁট দুটী ফুলাইয়া বলিল—"কি বললে ফকিরদা?—শত্রু? তুমি দেখতে পাচ্ছ না কিন্তু দিন রাত সে আমার চার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি সে চমৎকার চেহারা ফকির দা, তা যদি দেখতে পেতে!"

সমবেদনার স্বরে ফকির বলিতে লাগিল, "ভুলে যাচ্ছিস কেন পরী গোড়া হতে কতখানি শত্রুতা সে সেধে এসেছে? একজনের বুক হতে তো ছিনিয়ে এনেও তার শত্রুতা মেটাবার সাধ মিটল না? মরেও জ্বালার ওপর জ্বালা বাড়িয়ে দিলে তোর কিন্তু কেন তুই এ জ্বালা সইবি বল?"

দীপ্ত কণ্ঠেই পরী বলিয়া উঠিল,—"ফকিরদা!"

শুনিবার অপেক্ষা না রাখিয়াই ফকির বলিতে লাগিল—"নিজেকে নষ্ট করে ফেলিস নি পরী, জীবনে নূতন আলো জ্বলে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে নিভিয়ে দিস নি! কেন নেভাবি? সে তোর কে? একটা জুয়াচোর তোর আমার সর্ব্বনাশ করে"—

বাধা দিয়া পরী জিজ্ঞাসা করিল—"কি বলতে চাও তুমি? কিন্তু মনে রেখ ফকিরদা তাকে অপমান করবার ক্ষমতা তোমার এতটুকুও নেই।"

মর্ম্মদগ্ধ ফকির অসহ্য মর্ম্মযাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া উত্তেজিতভাবে যতখানি প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল পরীর কথায় সেটার গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া সংশোধনের জন্য বলিল—"অনেক দুঃখে কথাগুলা মুখ দিয়ে বার হয় রে ভাই! তোকে আমার নিজের চেয়েও ভালবাসি পরী, তোর এতটুকু দুখে, তোর মনের এই ভাব আমাকে যে কোনও দিক দিয়েই স্থির থাকতে দেয় না, তাই ত বলে ফেলি!"

"কি করবে ফকিরদা সবই আমার অদৃষ্ট!"

কিছুক্ষণের জন্য দুই জনের মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না।

এই নিস্তব্ধতার মধ্যেই দুই জনের প্রাণের মধ্যেই বিভিন্ন চিন্তার স্রোত বহিয়া চলিল।

হঠাৎ ফকির ডাকিল, "পরী!"

পরী মুখ তুলিতেই ফকির আর নিজেকে ঠিক রাখিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "যে আগুন বুকের মধ্যে দিনরাত জ্বলছে সেটার জ্বালা কতদিন সইতে হবে আমাকে ?"

পরী জিজ্ঞাসা করিল,—"তার অর্থ ?"

"আমার আশা পূর্ণ হবার পথে যে বাধার প্রাচীর গড়ে উঠেছিল ভগবান যদিই সেটাকে ভেঙ্গে দিলেন—"

সহজ ভাবেই পরী বলিল,—"ফকিরদা !"

"কেন পরী ?"

"বাড়ী যাও তুমি।"

আকুল আবেগে ফকির বলিতে লাগিল—"সে ভালবাসা তোর কোথা গেল পরী ? মনে কর দেখি আগেকার কথাগুলো—তুই ভুলে গেলেও আমি যে এখনও—"

করুণকণ্ঠেই পরী বলিল,—"কিন্তু যে ভালবাসা আমি তার কাছে পেয়েছি ফকিরদা, সে ভালবাসার কাছে ভগবানের ভালবাসা কেমন না জানলেও বোধ হয় সেটাও মলিন হয়ে পড়ে ! তুমি বাড়ী যাও ফকিরদা ! বুকের ভেতর এতখানি কলুষিত ভাব নিয়ে আর কোনো দিন আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়িও না।"

উদ্‌ভ্রান্তভাবে ফকির ডাকিল,—পরী !

তাহার পায়ে মাথাটাকে ছোঁয়াইয়া পরী বলিল, —"আর কোনো কথা নয়, ফকিরদা বাড়ী যাও।" এই বলিয়াই সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

৭

প্রাণের মধ্যে অফুরন্ত হাহাকার দিবারাত্র লুটোপুটী খাইলেও কিছু দিনের মধ্যে পরী লোক-চক্ষের সম্মুখে নিজেকে এমনি ভাবে দাঁড় করাইল যেন এত বড় একটা দুর্ঘটনাও তাহার মনের মধ্যে এতটুকু দুঃখের রেখা টানিয়া দিতে পারে নাই।

পাড়ার লোক দূরের কথা, তাহার পিতা মাতা পর্য্যন্ত তাহার এই ব্যবহারে বিস্ময়ের অগাধ জলে ডুবিয়া গেল। দিনের মধ্যে যতবার সে বাটীর বাহির হইয়া যায় সেটা লোকচক্ষে ততখানি বিসদৃশ না হইলেও সন্ধ্যার পর বাটীর বাহির হওয়াটা তাহাদের চক্ষে যেন অতি বড় কদর্য্য বলিয়াই মনে হয়। এই পরী যৌবনে উছল রূপের লহর গায়ে মাখিয়া ভরা সন্ধ্যায়—

ছিঃ ছিঃ বৌটার ভেতরে ভেতরেও এত গা !

এই সমস্ত কথা তাহার কানে যাইতে বিলম্ব হয় নাই কিন্তু পরী সে সকলের একটারও প্রতিবাদ করিল না, সে তাহার চলা পথেই চলিতে লাগিল।

মধু দুলে একদিন আসিয়া পরীকে বলিল,— "এখানে আর তোর একটা দিনও থাকা চলবে না মা, এখুনি আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

বেশ শান্তভাবেই পরী বলিল,—"একটা দিন ত এ বাড়ী ছেড়ে আমি যেতে পারব না বাবা ! এটাকে আগলাবার জন্যেই—"

এ কথার পর মধু হঠাৎ কিছু বলিতে পারিল না। কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিয়া বলিল,—"বেশী দূর ত নয় মা—রোজ একবার আসিস না হয় কিন্তু থাকা এখানে চলবে না।"

"কেন বাবা ?"

"নিঃসঙ্গ অবস্থায় তোকে থাকতে দিতে পারিনে। মা এতদিন আমার নিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল কেবল তোর মুখের দিকে চেয়ে—"

"তবে হঠাৎ এতখানি জেদ কেন বাবা ?"

গম্ভীরভাবে মধু বলিল—"এ কেনর উত্তর তোর না শোনাই ভাল পরী। তবে যেতে হবে তোকে।"

"নিজের ঘর বাড়ী ছেড়ে ?"

"গেলেও তোরই থাকবে মা !"

"তবুও আমার যাওয়া হবে না বাবা !"

কন্যার কার্য্যাবলী যাহা এতদিন ধরিয়া মধু শুনিয়া আসিতেছিল, তাহাতে সে মনের মধ্যে উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেও এতক্ষণ কথাবার্ত্তার মধ্যে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সেটা প্রকাশ করিতে পারে নাই কিন্তু পরীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সেটা আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না, উগ্র প্রকাশ করিয়া বলিল, "তোকে খামখেয়ালির পাছুতে ছুটতে দেবার জন্য কিছুতেই আমি এখানে থাকতে দেব না। ভাল মন্দ বিবেচনা করবার ক্ষমতা তোর নষ্ট হলেও আমার যথেষ্টই আছে, ব্যবস্থাও আমাকেই করতে হবে।"

পিতার কথাগুলা পরীর অন্তরে এক একটা বন্দুকের গুলির মত আঘাত করিতে লাগিল। একটা কথাও না বলিয়া অশ্রুসিক্তনয়নে বিহ্বলের মত বসিয়া রহিল।

কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া মধু পুনরায় বলিতে লাগিল, "লোকের কথাগুলোও একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি নি মা, চল আমার সঙ্গে।"

"নিজের জেদটা না বজায় করে ছাড়বে না বাবা!"—বলিতে বলিতে পরীর চক্ষু দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

ব্যথিত-কণ্ঠে মধু বলিল, "তোর জন্যেই তোকে নিয়ে যেতে হবে পরী, তার জন্যে তোর কাকুতিতে গলে যেতে পারব না।"

মুহূর্ত্ত কয়েক কি ভাবিয়া পরী বলিল, "বেশ তাই হবে" তবে আজ আর নয় কাল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া মধু বলিল, "কতকগুলো জিনিষ-পত্তর তবে আজ দে নিয়ে যাই—রক্ষণাবেক্ষণ করবার যখন আর কেউ থাকবে না।"

উদাসভাবে পরী বলিল, "নিয়ে যাও।"

মধু চলিয়া যাইলে আকাশ-পাতাল চিন্তার মধ্যে পরী নিজেকে ডুবাইয়া দিল, সে চিন্তার শেষ নাই—সীমা নাই। অপরিচ্ছন্ন মাটির মেঝের উপর পড়িয়া চক্ষের জলে বুক ভাসাইতে ভাসাইতে আপন মনেই বলিতে লাগিল, "ওগো! তুমি থাকতে আমাকে এত বড় অপমান কেউ করতে পারে নি।"

তাহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্বেও তাহাকে পিতার সহিত পরদিন যাইতে হইল।

একদিন কানুর বাঁশী যেমন রাইকে উন্মাদিনীর মত কুলমানভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া বাটীর বাহির করিয়া আনিত, তেমনই কিসের আকর্ষণ যে পরীকে সময় অসময় বিবেচনা করিবার ক্ষমতা লোপ করিয়া ঘরের বাহিরে লইয়া যাইত, তাহা কেহ বুঝিতে পারিত না। স্বামীর ভিটায় থাকিয়া পরীর যে ব্যবহারের জন্য মধু তাহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিল এখানেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইল না, সেইরূপ ভাবেই বাহির হইতে লাগিল।

তাহার জীবনের ধারা বদলাইয়া ফেলিবার জন্য পরীর মা প্রথম উপদেশের ছলে মিষ্ট তিরস্কার এবং শেষে কড়া শাসন করিলেও নিজের চলা পথ হইতে পরী এক পাও ফিরিয়া আসিল না; বরং এমনই ধরণের শাসনের দিনে সে স্বামীর ভাঙ্গা বাড়ীখানার বুকে ছুটিয়া যাইত, শেষে মধু যাইয়া অনেক বুঝাইয়া তাহাকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিত।

সেদিন কবরীর চারি পাশে বনফুলের রাশ গুঁজিয়া যখন পরী বাড়ীর প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার মা আর কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না, গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল—"কালামুখী দিন দিন হচ্ছে কি তোর?"

উদাসভাবে পরী উত্তর করিল—"হবে আবার কি?"

"হবে কি ?—কুলত্যাগী শেষে ফুল পর্য্যন্ত মাথায় গুঁজে বাটীতে আসতে সাহস হয়েছে।"

তদ্গতভাবেই পরী বলিল—"পরিয়ে দিলে যে মা!"

তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও আর ক্রোধের আতিশয্যে বাহির হইল না। কিল চড় লাথি এমন কি সম্মার্জ্জনী পর্য্যন্ত তাহার পৃষ্ঠে পড়িতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে পরী বলিতে লাগিল—"আমায় যে ডাকে মা!"

হ্যারিকেন দিয়া দেখিল—পরীর দেহ হিম-শীতল।

এতখানি গর্হিত কার্য্যের পর স্বামী স্ত্রী পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, পরীর সাঙ্গা দিতে আর কোনও দিক দিয়াই বিলম্ব করা উচিত নয় এবং পরদিনই মধু পুরোহিত ডাকাইয়া ফকিরের সহিতই সাঙ্গার পাকা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল।

পরী যথেষ্টই আপত্তি করিল কিন্তু কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। সেই দিন হইতেই সে কিন্তু যেন আর একটা যুগের মানুষ হইয়া উঠিল, কেহ এ বিষয়ে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়া উত্তর দেয়, "বাবা যখন ব্যবস্থা করেছে তখন আর কি করব?"

সাঙ্গার দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতে লাগিল, পরী যেন ততই ভিন্ন প্রকৃতিতে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। তাহার সেই গম্ভীর ভাব, উদাসীনতা কোন যাদুকরের মোহন মন্ত্রে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল! সে যেন আনন্দের পুতুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

এ কথার পর মাতার পক্ষে ধৈর্য্য ধারণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়িল। সে তিজেল হাঁড়ির মত ফাটিয়া বলিল—"কিছু বলি নি ব'লে বুক তোর এতই বলে গিয়েছে যে, জঘন্য কথাটাকে আমাদের সামনে—"

ফকিরের শুষ্ক তরু আশায় মুঞ্জরিয়া উঠিতে লাগিল। এতদিন যাহাকে না পাইয়া সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করিতেছিল, তাহাকে পাইবার আনন্দ তাহাকে পাগলের মত করিয়া দিল—সে বলিল, "ভগবান সত্যই তুমি আছ।"

কোনও দিন পরীর সম্মুখে পড়িয়া যাইলে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছিস পরী ?"

পরীও অধরে হাসি আনিয়া বলিল, "নিজের জেদটা বজায় না করে ছাড়বে না ফকির দা।"

উছল আনন্দে ফকির বলিল—"ফকির দা কি রে ? এখন যে—"

পরী উত্তর দিল—"স্বভাবের দোষ ফকির দা—হয় ত বাসর-ঘরেই ঐ নামেই ডেকে—"

বাধা দিয়া ফকির বলিল—"যা ভারী দুষ্ট হয়েছিস তুই !"

কোনও উত্তর না দিয়া গম্ভীরভাবে পরী চলিয়া গেল।

ফকিরের প্রাণে মলয়ের বাতাস বহিতে লাগিল।

এইরূপ আনন্দে ফকির তাহার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিল।

বিবাহের পূর্ব্বদিন রাত্রে যখন সে তাহার আত্মীয়গণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল, তখন রাত্রি প্রায় একটা। শ্মশানের পাশ দিয়াই আসিবার পথ। সেইখানে আসিয়া ফকির ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। ফুলের অলঙ্কারে সারা দেহ ভরাইয়া, ফুলের রাশ স্বামীর চিতার উপর সাজাইয়া, পরী নিস্পন্দের ন্যায় পড়িয়া আছে—চঞ্চল কণ্ঠে ফকির ডাকিল—"পরী—পরী !"

পরীর নিকট হইতে কোনও উত্তরই সে না পাইয়া পুনরায় ডাকিল, পরী! তবুও উত্তর পাইল না।

ত্রস্তপদে তাহার নিকটে যাইয়া তাহাকে ঠেলিয়াও কোনও উত্তর পাইল না। হ্যারিকেনের আলোটা জোর করিয়া দিয়া তাহার সাহায্যে দেখিল—পরীর দেহ হিম-শীতল—উহা নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

গল্প

স্নেহের জোয়ার

শ্রীসান্ত্বনা গুহ

সরু গলি—লাগালাগি সব বাড়ী। বেশীর ভাগই পুরোণো লোণাধরা—চূণকাম নেই—সুরকি পর্য্যন্ত খসে পড়েছে।

বুড়ো মুসলমান—চুলে পাক ধরেছে। দাড়ি-গুলোরও সেই অবস্থা। মাথায় একটা ময়লা ছেঁড়া টুপি—গায়ে হাতকাটা ছোট জামা—পরণে হাঁটু পর্য্যন্ত একটা লুঙ্গী।

চাই বাজী—ফটকা, তুবড়ী চাই—হেঁকে চলেছে।

গাঁটকাটা—নাম রহিম। বুড়ো হয়েছে—নইলে আগে তার মত নামজাদা গুণ্ডা এ তল্লাটে আর কেউ ছিল না।

কলাবাগানে তার আড্ডা।

কাল সারাটা দিন তার বৃথায় গেছে। এক পয়সাও রোজগার হয় নি। শুধু কি তাই—আড্ডায় যেতে সবাই খেঁখিয়ে উঠেছে। পূজোর সময়—এখনও যদি দু'চারটা ট্যাক না কাটতে পারবি—তবে আর কি জন্যে ভাতজল দিয়ে তোকে পোষা!

চোখ দু'টো ঘোলাটে—গায়ের চামড়াও কুঁকড়ে এসেছে। হাতে ছোরা তুলতে গেলে থর্ থর্ করে কাঁপে। এই সেদিনও তার নামে সারা কোলকাতা সহর কেঁপেছে। নবাব বাদশার মতো সে দু'হাতে টাকা উড়িয়েছে। আর আজ সেই কি না দু'মুঠো ভাতের কাঙাল।

তাও ছেলেটা যদি থাকৃতো—সেই তাকে বসিয়ে খাওয়াতে পারতো। এমনি ভাবে অন্ধকার গলির মাঝে নিশাচর পশুর মত তাকে ঘুরে বেড়াতে হোত না।

ভাবে আর চোখ দু'টো জলে ভরে আসে। জামার হাতায় চোখটা মুছে নিয়ে আবার হাঁকে—চাই বাজি।

আকাশটা কালোয়—কালো। দুষ্টু মেয়ে যেন ধমক খেয়ে মুখ হাঁড়ী করে বসেছে। চোখের পাতায় জল ভরে এসেছে—আসন্ন-বর্ষণ-আশঙ্কায় টিপ টিপ করে বৃষ্টি সুরু হয়। পথ চলা ভার। রহিম একটা বাড়ীর আলিসার তলায় গিয়ে দাঁড়ায়। খালিহাতে আড্ডায় ফিরিবারও উপায় নেই। —দাঁড়িয়েই থাকে।

বাড়ীটা পড়ো বাড়ীরই সামিল—চূণ বালি কবে খসে গেছে তার ঠিক নেই। ইটগুলো যেন হাঁ করে গিল্‌তে আসে। মাঝে মাঝে শ্যাওলায় চূণ বালির প্রয়োজন মিটিয়েছে।

জানালা দরজাগুলো থুৎথুরে। ছুঁলেই ঢক্ ঢক্ করে ওঠে—চূণবালি একরাশ খসে পড়ে—যেন ফোক্‌লা বুড়োর খিল্ খিল্ হাসি।

ঘরের ভেতর তক্তাপোষের ওপর মায়ের কোলে ছেলে বসে রয়েছে। দুজনেই জেগে—মুখে চিন্তা ও উদ্বেগের ছায়া।

কোন্ সকালে তার বাবা চারটি খেয়ে কেরাণী-গিরির উমেদারীতে বেরিয়েছেন। এখনও ফিরেন নাই।

"মা, এত রাত্তির হলো—বাবা যে এখনও এলেন না?"

"আসবে মণি।"

"না মা—বাবাকে আমি বকবো। বাবা বড় দুষ্ট এত রাত্তির করেন কেন?"

মা চুপ করে থাকেন।

ছেলে আবার বলে—"আচ্ছা যদি চোর ডাকাত আসে—তবে কি হবে মা?"

"কি আর হবে? ভগবান আছেন—তিনিই দেখবেন।"

আবার চুপ। ছেলে মায়ের বুকে মাথা রেখে চোখ বুজে।

রহিম শোনে। ভাবে এই ত সুযোগ। জোরে হাঁকে—চাই বাজী—হরেক রকম বাজী।

ছেলে উঠে বলে,—"মাগো দুটো পয়সা দাও না, বাজী কিনবো।"

মা প্রমাদ গোণেন। হাতে মোটে কয়েক আনা পয়সা। বছরের শেষে ছেলে দুটো পয়সা চায়—না দিয়েও পারেন না। আঁচল খুলে দু'টো পয়সা দেন।

ছেলে ছুটে গিয়ে জানালা দিয়ে ডাকে,—"বাজী-ওয়ালা—ও বাজীওয়ালা, এ বাড়ীতে এসো।"

রহিম বলে,—"এই যে খোকাবাবু—আমি দরজায়।"

খোকাবাবু মার হাত ধ'রে দরজা খুলে দাঁড়ায়।

আকাশে বিদ্যুৎ খেলে যায়। রহিমের কানে কে বলে—এই ত সুযোগ। কিন্তু কি হলো আজ! প্রদীপের ক্ষীণ আলো ছেলের মুখে এসে পড়েছে। রহিম শিউরে ওঠে। হাতের ছোরা হাতেই রয়ে যায়।—ভাবে নিজের ছেলের কথা। এর মুখের পাশে তার কচি মুখখানা ভেসে উঠে। অনেক কাল আগের কথা মনে পড়ে যায়। চোখদু'টো ঝাপসা হ'য়ে উঠে।

ছেলের ডাকে চমক ভাঙ্গে—"ফুলঝুড়িটা কত?"

রহিম আবার জোর ক'রে ছোরার মুষ্টি ধরে। হাসে—নিজের ক্ষণিক দুর্ব্বলতায়। কি পাগল—এতো ছেলে বুড়ো খতম্ করে আজকে মায়া!

প্রাণপণ বলে ছোরা বাগিয়ে ধরে—কিন্তু মুখে কিছু বলে না।

ছেলে গিয়ে মাকে আঁকড়ে ধরে—মা ভয়ে কাঠ হোয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, মুখ দিয়ে কথা সরে না ভয়ে।

ঐ ছেলের মুখ! রহিমের সব দৃঢ়তা বানের জলে ভেসে যায়। শিথিল মুঠা থেকে ছোরা পাষাণে খসে পড়ে কেঁদে ওঠে।

———

উপন্যাস

অন্নপূর্ণার-মন্দির

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সকলের আকাঙ্ক্ষা একরূপ নহে, সুতরাং সকলেই সমান সুখী নহে। হীরার অদৃষ্টেও ঘটিয়াছিল তাই। সে কি চায়, কি পাইলে সে সুখী হয় তাহা সেই বলিতে পারে। তবে আমরা এটুকু বলিতে পারি, শেঠজীর আশ্রয়ে থাকিয়া কন্যার যত্নে পালিতা হইলেও নিরালায় দুই একটী দীর্ঘশ্বাস আর নির্জ্জনতায় চিত্তের বিষণ্ণতা যেন বলিয়া দিত যে বাহিরে আপাততৃপ্তির ভাব দেখাইলে তাহার প্রাণের ভিতরে যে একটা অস্ফুট হাহাকার ধ্বনি সর্ব্বদা সে শুনিতে পাইত তাহার যেন বিরাম নাই—নিবৃত্তি নাই—সমাপ্তি নাই—শান্তি নাই।

শেঠজীর কন্যা অমিয়া তাহাকে যেন সোদরা ভগিনীর স্নেহে বুকে তুলিয়া লইয়াছিল। শেঠজী ও তাঁহার পত্নী তাহার অবস্থানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সমস্ত বন্দোবস্তই করিয়া দিয়াছিলেন। হীরা ও অমিয়ার মধ্যে "সখীত্ব" সম্বন্ধ এতটা প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল—যেন তাহারা দুইজনে ঠিক একটী বৃন্তে সংলগ্ন ফোটা ফুল।

দুইজনে গল্পে, সংসারের ছোট খাট কাজে, সংগীতে, সরস আলাপে বেশ আমোদ-প্রমোদে তাহাদের দিনগুলি কাটাইত। দীনদয়াল তাহার স্বতন্ত্র পাকের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বলিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু হীরার পাছে কোন কষ্ট হয় এই ভাবিয়া করুণ-হৃদয় শেঠজী তাহার সম্মতি লইয়া একজন মহারাজীন্ নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠ কুলজাত ব্রাহ্মণের প্রস্তুত অন্নে তাহার আপত্তি না থাকায় তাহার নিজের সম্বন্ধে অনেকটা মেহনতের অংশও বাঁচিয়া গিয়াছিল। তবে সে বিধবার বেশ পরিত, নিরামিষ খাইত। শেঠজী এ সম্বন্ধে কোনরূপ আপত্তি করেন নাই।

আকবর বাদশার আমলে, সমগ্রভারতে সঙ্গীতের একটা বেশী চর্চ্চা হইত। এমন কোন বাড়ী ছিল না, যেখানে একটু না একটু গীত-বাদ্যের চর্চ্চা না হইত। শেঠজীর আদরিণী কন্যা অমিয়া বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগিণী ছিল। সে বাল্যে ও কিশোরে অর্থাৎ বিবাহের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত এক হিন্দু ওস্তাদের নিকট খেয়াল ধ্রুপদ, গজল দোঁহা সবই চেষ্টা করিয়া শিখিয়াছিল। রাত্রে সে হীরাকে তাহার আয়ত্ত করা গানগুলি শুনাইত। হীরারও কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট। সুতরাং অমিয়া বিশেষ জেদাজেদি করিয়া অল্প দিনের মধ্যে তাহাকেও সঙ্গীতের প্রথম পাঠ দিল। চতুরা মেধাশালিনী হীরা কণ্ঠস্বরের উৎকৃষ্টতার জন্য অমিয়াকে সঙ্গীত-স্বরমাধুর্য্যে ছাড়াইয়া উঠিল। অমিয়ার তাহাতে খুবই আনন্দ। মনে মনে গর্ব্বিতা ও আনন্দিতা, একজন শিষ্যা তৈয়ারী করিয়াছে।

অমিয়ার স্বামী তাঁহাদের বাসগ্রামে বেশ প্রতিষ্ঠাপন্ন একজন ছোট-খাট জমীদার। কার্য্যোপলক্ষে দিল্লীতে গিয়াছেন। প্রায় ছয় সাত মাস সেখানে থাকিয়া মোগলের রাজধানীতে একটী জহরতের নূতন কারবার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি বৈষয়িক কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গিয়াছেন বলিয়াই অমিয়া বাপের বাড়ীতে দুই চারি মাসের জন্য আসিয়াছে। তিনি তাঁহার নিজ বাসস্থানে ফিরিলেই অমিয়া আবার শ্বশুরবাড়ীতে চলিয়া যাইবে।

অমিয়ার এক সহোদর ছিল। যতদূর গণ্ডমূর্খ ও কুচরিত্র হইলে মানুষ আর মানুষের পর্য্যায়ে থাকিবার উপযুক্ত থাকে না তাহার সেই অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল। আগে সে এমন দুশ্চরিত্র ছিল না। শুনা গিয়াছে তার পত্নীবিয়োগের পর হইতেই অমিয়ার দাদার এ অধঃপতন ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে।

তাহার পিতা কারবারের কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত রাখিয়া এই গুণধর পুত্রকে শোধরাইবার জন্য তাঁহার প্রয়াগের গদীতে পাঠাইয়া ছিলেন। সে গদীর কর্ত্তা শেঠজীর কনিষ্ঠ সহোদর।

শেঠজীর পুত্রের নাম প্রয়াগপ্রসাদ। বন্ধুরা সকলে তাহাকে প্রসাদজী বলিয়াই ডাকিত।

প্রয়াগে আসিয়া প্রয়াগপ্রসাদ তাহার খুল্ল-তাতের কঠোর শাসনে অনেকটা ঠাণ্ডা ভাব ধারণ করিয়া বিষয়কর্ম্মে মনোযোগ দিল। তাহার খুল্লতাতও তাহার এ মনোভাব পরিবর্ত্তনে খুসী হইয়াছিলেন। সে চারি পাঁচ মাস অন্তর একবার করিয়া তাহার পিতা মাতাকে দেখিতে কাশীতে আসিত।

এই দীর্ঘ প্রবাসের প্রায় পাচ মাস পরে একবার দেশে পিতা মাতার কাছে ফিরিয়া আসার মূলে একটা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য ছিল। সেটা আর কিছু নয়, মাতার নিকট হইতে বাহানা করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করা। পিতার কাছে বেশী টাকা চাইতে গেলে, পাইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না; কারণ পিতা পুত্রের স্বভাব খুব ভালরূপই জানিতেন। অর্থের অস্বচ্ছলতাই তাহাকে পুনরায় সংযত ও সৎ-স্বভাবান্বিত করিবে কিন্তু দুষ্টলোকে রটাইত, প্রয়াগে গিয়াও প্রসাদ নিষ্ক্রিয় ছিল না। অতি গোপনে সে এক বাইজীর নিকট যাতায়াত করিত। আর তাহার জন্যই তাহার অর্থের প্রয়োজন। খুল্লতাতের প্রদত্ত মাসিক বৃত্তি, আর মাতৃপ্রদত্ত এই গুপ্ত দান হইতেই তাহার অপব্যয়ের খরচ-পত্র এক রকম চলিয়া যাইত। এই বিপত্নীক নষ্টচরিত্র প্রয়াগ-প্রসাদের সহিত শীঘ্রই আমাদের একবার সাক্ষাৎ হইবে এজন্য তাহার একটু পরিচয় মাত্র দিয়া রাখিলাম।

একদিন সন্ধ্যার পরে নিত্য প্রথামত সঙ্গীতা-লোচনার পর অমিয়াসুন্দরী হীরাকে লইয়া ছাদে আসিল।

ঠাণ্ডা ফুরফুরে হাওয়া। জ্যোৎস্না-প্লাবিত প্রফুল্লা প্রকৃতি। উপরে উদার অম্বর। নীচে অনন্ত দূরপ্রসারিণী ভাগীরথী। অসিঘাটে গঙ্গার উপরেই শেঠজীর বাড়ী। এই বাড়ীর অন্দরের ছাদের নিম্ন দিয়াই কল-কলনাদে, একস্রোতা গঙ্গা প্রবাহিতা। সেই গঙ্গাবক্ষে চঞ্চল নর্ত্তনশীল উর্ম্মিমালার সহিত চাঁদের কিরণ মিশিয়া যাওয়ায় তাহা যেন স্বপ্ন-রাজ্যের একটী মোহময় দৃশ্যের বিকাশ করিতেছিল।

অমিয়া ও হীরা গঙ্গাতীরবর্ত্তী অলিন্দের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। দুইজনই সুন্দরী। দুইজনই যুবতী। সুতরাং তাহাদের যৌবনের রূপ-প্রভাময় মুখের উপর পড়িয়া চন্দ্র-রশ্মি তাহা অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া দিতেছিল।

অমিয়া হীরাকে বলিল, "আচ্ছা—বহিন্! তুই আমায় এত ভালবাসিস্—কিন্তু একদিনও ত তোর সুখ-দুঃখের কথা আমায় বল্‌লি নি!"

হীরা মৃদু-হাস্যের সহিত বলিল, "এ দুঃখভরা জীবনে সুখের কথা কোথায় পাব বোন্! আমার দুঃখের কথা ত তোমায় অনেকই বলেছি।"

অমিয়া। আচ্ছা! তোর স্বামীকে কি মনে পড়ে?

হীরা। খুব!

অমিয়া। এখন কি তোর মনে তার অভাব জন্য ততটা কষ্ট হয়!

হীরা। কষ্ট যে হয় না তা নয়। সময়ের চিকিৎসায় বৈধব্যের কষ্ট নিবারণ হয় না। তবে তা না হ'লেও মনে যেন একটু একটু করে সহ্য করবার শক্তি জেগে ওঠে। সে কষ্ট সইবার সহিষ্ণুতা এসে দেখা দেয়। এই ভেবে একটু বেশী কষ্ট হয় যে, যদি আজ তিনি থাক্‌তেন—তা হ'লে আমাকে হয় ত এমন করে পরাশ্রয়ে থাক্‌তে হ'ত না। আমার নিজের ঘর-সংসারেই হয় ত আমি রাণীর মত থাক্‌তে পারতুম। এ সুখ ঐশ্বর্য্যের বদলে দারিদ্র্যই যেন আমার সুখময় ব'লে বোধ হত।

অমিয়া। আমি বা আমার বাবা ও মা কি তোকে পরের মত দেখি দিদি?

হীরা। না—সে কথা বল্‌লে আমার মহা-পাতক হবে। নরকেও আমার স্থান হবে না। তোমার পিতামাতাকে পেয়ে তাঁদের স্নেহ-যত্নে আমি আমার নিজের বাপমাকে ভুলে যাচ্ছি। তোমার বাপ ও মা আমার চোখে মানুষ নন—দেবতা!

এই কথা বলিতে গিয়া হীরার গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা বহিল। প্রস্ফুট চন্দ্রালোকে সে অশ্রুধারা যেন আগুনের মত জলিতে লাগিল।

বুদ্ধিমতী অমিয়া বুঝিল, তাহার স্বামীর কথাটা ও ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া সে বড় অন্যায় কাজ করিয়াছে। প্রসঙ্গটা অন্য দিকে ফিরাইবার ও হীরাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য সে বলিল, "তোকে ভাই আজ একটা নূতন খবর দিই।"

হীরা। কি খবর ভাই?

অমিয়া। আমার দাদা বোধ হয় দুই এক দিনের মধ্যে বাড়ীতে আস্‌বেন। প্রায় চার মাস বাদে তিনি বাড়ী আস্‌ছেন। আমার মা—দাদা আস্‌ছেন শুনে ভারী খুসী হয়েছেন! ভারী আমুদে আর সরলপ্রাণ লোক আমার দাদা।

প্রয়াগপ্রসাদের ভিতরের কথা, অমিয়া কিছু কিছু জানিলেও, তাহার মনের বিশ্বাস কাকার কঠোর শাসনের মধ্যে থাকিয়া তাহার দাদার স্বভাবটা পুরাপুরিই শোধরাইয়া গিয়াছে। সে বুদ্ধিমতী ঘরের কথা অপরের কাছে বলিতেই বা যাইবে কেন? সুতরাং অমিয়া তার দাদার পূর্ব্বের অধঃপতনের কথা, কিছুই বলিল না। আর হীরাও তাহার কিছুই জানিতে পারিল না।

হীরাকে আবেগভরে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া স্নেহময়ী অমিয়া হাস্যমুখে বলিল, "আর একটা খবর এই সঙ্গে তোকে শুনিয়ে দি ভাই। আজ থেকে আর একমাস বাদে আমার "তিনি"ও দিল্লী থেকে ফিরে আস্‌ছেন। কিন্তু সেটা যেন আমার পক্ষে পূর্ব্ব বিষাদের কথা হ'য়ে পড়েছে ভাই!

হীরা। কেন?

অমিয়া। তোকে ছেড়ে যাব কেমন করে! আচ্ছা—হীরাদিদি! তুইও আমার সেখানে চল্‌ না। তার পর তিনি দিল্লীতে চলে গেলে আমরা আবার এখানে ফিরে আস্‌ব।

হীরা হাস্যমুখে বলিল, "বহুৎ আচ্ছা ভাই। তা যখনকার কথা তখন হবে। যেতে হয় যাব। তোমাকে ছেড়ে ত এখানে একা থাক্‌তে পারব না। কাজেই ধরে নাও যেতেই হবে। কিন্তু তোমার সেই আপনার লোকটী রাজি হবে?"

অমিয়া বলিল—"ভাই! তার জন্য কোন ভাবনা নেই। লোকটা অতি বুদ্ধিমান ব'লে তার একটা খ্যাতি আছে। কিন্তু বুদ্ধির মূল্য এক কড়া কাণা কড়িও নয়। এই—এই, অমিয়াসুন্দরীর বুদ্ধিতে

সেই মাহুষটা চলে ! তোর কি বিশ্বাস যে পুরুষ-গুলোর নিজের একটা বুদ্ধি আছে ?

হীরা এই কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল।

এদিকে কথায় কথায় রাত্রি যে অনেক হইয়া গিয়াছে তাহা তাহাদের দুইজনে টের পায় নাই। সহসা কোন নিকটস্থ দেবালয় হইতে দ্বিপ্রহরের আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠায় দুইজনের হুঁস হইল।

হীরা বলিল—"চল বোন্—রাত অনেক হয়ে গেছে। মা আবার রাগ করবেন।"

তখন দুইজনে নীচে নামিয়া আসিল। হীরা আর অমিয়া একই কক্ষে একই বিছানায় শুইত। হীরা ইহাতে প্রথম প্রথম আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু অমিয়ার একান্ত নির্ব্বন্ধে সে আপত্তি ভাসিয়া গিয়াছিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে প্রয়াগপ্রসাদ মাতৃ-সন্দর্শনে আসিয়াছে। পিতা মাতা উভয়েই প্রবাসী পুত্রের আগমনে আনন্দিত। তবে মায়ের স্নেহ-প্রস্রবণের মুখ উন্মুক্ত—মুক্তধারা। পিতার অন্তরের মধ্যে স্নেহের ফল্গুপ্রবাহ এই একমাত্র পুত্রের জন্য উচ্ছ্বসিত হইলেও, বাহিরে তিনি তাহা কোন রূপেই প্রকাশ করিতেন না; কারণ তিনি পুত্রের স্বভাব জানিতেন।

প্রয়াগজী আহারে বসিয়াছেন। তার মা—কাছে বসিয়া ব্যজন করিতেছেন। অমিয়া আর হীরা দুইজনেই রন্ধনশালায় কার্য্যে ব্যস্ত। সে সব বাজে কাজ!

নানা কথা আলোচনার পর প্রসাদের জননী বলিলেন—"আমি একটী সুন্দরী মেয়ে ফাঁকতালে পেয়ে গেছি। বিশ্বনাথ আমার ঘরে তাকে এনে পৌছে দিয়েছেন। বড় সুন্দর মেয়েটী। সে দু মাস মাত্র এখানে এসেছে। কিন্তু অমিয়াতে আর তাতে এত ভাব—সে দেখলে মনে হয় ওরা যেন দুজনে এক মায়ের পেটের বোন।"

এই কথা বলিয়া শেঠ-গৃহিণী হীরার আগমন দিনের কথা, স্বামী দীনদয়ালের কথা, অদৃষ্টের কথা—সবই পুত্রের কাছে একে একে বলিয়া গেলেন।

প্রয়াগপ্রসাদ মায়ের মুখে এই অপূর্ব্ব ঘটনার কথা শুনিয়া সত্য সত্যই বিস্মিত হইল। তার পর বলিল—"তা তোমার এ নূতন মেয়েটী কোথায়? আমায় ত দেখালে না মা!"

গৃহিণী বারান্দায় আসিয়া অমিয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"অমি! তোর নতুন দিদিকে এখানে নিয়ে আয় তো। তোর দাদা দেখ্‌তে চাচ্ছে।"

হীরার অনিচ্ছা থাকিলেও এবং প্রয়াগপ্রসাদের সম্মুখে তাহার একটা সঙ্কোচ জন্মিলেও, অমিয়া তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া উপরে লইয়া আসিল।

লজ্জায় ও সঙ্কোচে হীরা মস্তকের অবগুণ্ঠনটা একটু টানিয়া দিয়া গৃহিণীর কাছে বসিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল—"আমায় কি ডেকেছেন মা?"

গৃহিণী বলিলেন—"এই তোমার প্রয়াগ দাদা। আমার একমাত্র পুত্র। তোমার কথা সবই ওকে বলেছি। তাই ও তোমাকে দেখ্‌তে চাইলে ব'লে আমি ডেকেছিলুম। ওর সম্মুখে তোমার লজ্জা কি মা! আমরা তোমার বোন—প্রয়াগ তোমার বড় ভাই।"

উন্মুক্ত গবাক্ষ-পথ দিয়া প্রবল বায়ু-স্রোত আসিতেছিল। এই বায়ু-প্রবাহই হীরার শত্রু হইল।

সেই বায়ুপ্রবাহে তাহার মাথায় অবগুণ্ঠন সরিয়া গেল। প্রয়াগপ্রসাদ বিস্মিতনেত্রে ক্ষণ

কাল মাত্র উন্মুক্তাবগুণ্ঠনা, রূপসী হীরার দিকে চাহিয়া যেন মন্ত্রবিমুগ্ধবৎ হইয়া পড়িল।

সে মনে মনে ভাবিল—"হাঁ রূপের মত রূপ বটে! ভগবান যেন ওকে আদর্শ সুন্দরী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আজ রূপের উপাসনায় আমার এ অধঃপতন কিন্তু এমন পবিত্র সুস্মিতা সুবিমলা দেবীমূর্ত্তি ত আর কখনও আমার চোখে পড়ে নাই। অতি অভিশপ্ত এই সুন্দরীর অদৃষ্ট। তা না হইলে আজ ইহার কপাল ভাঙ্গিবে কেন? এই প্রস্ফুটিত কোরক কীটদষ্ট হইবে কেন?

বলা বাহুল্য, হীরা ইতিপূর্ব্বেই তার উন্মুক্ত অবগুণ্ঠন যথাস্থানে তুলিয়া ধরিয়া সেই বাসন্তী সমীরণ-প্রবাহকে মনে মনে গালি দিল।

প্রয়াগপ্রসাদকে নিরুত্তর দেখিয়া তার মা বলিলেন—"কেমন? এ মেয়েটি কি দেবতার দান নয়?"

প্রয়াগপ্রসাদ একটু সঙ্কোচ ও লজ্জার মধ্যে পড়িয়া মুখ নীচু করিয়া আহার করিতেছিল। মায়ের কথায় তাহার চমক হইল। সে বলিল—"সত্যই মা এ দেবতার দান।"

পণ্যবাহী উষ্ট্রদল

লড়ায়ে মেড়া

মুক্তি

শ্রীনিধিরাজ হালদার

রঞ্জিত একজন ধনী ব্যবসায়ী, বয়স তার মাঝামাঝি। চেহারা সুন্দর, চুলগুলি তার কালো-কুচকুচে কোঁকড়ান। দোষের মধ্যে সে সব সময় মদে মশগুল হয়ে থাকত। যাই হোক সুন্দরীর সঙ্গে বের পর থেকেই নেশাটা তার একেবারে ষোল আনা থেকে এক আনায় নেমে এল। এখন সে কচিৎ কখনো মদ খায়।

ব্যবসায়ী লোক বাড়ীতে বসে থাকলে চলে না, তাই একদিন বাড়ীর সবাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরুবার চেষ্টা করছে কিছুদিনের মত বিদেশে। যাবার আগে সুন্দরী এসে বললে, "দেখ তোমার যাওয়া হবে না।"

রঞ্জিত। সে কি ব'লছ সুন্দরী।

সুন্দরী। না, আমি কি স্বপ্ন দেখেছি জান যে, ফেরবার সময় তোমাকে বুড়ো হয়ে ফিরতে হবে।

রঞ্জিত। প্রিয়ে সুন্দরী সে ত বেশ কথা, এতে আমার যাওয়ার বাধা কি হ'তে পারে?

সুন্দরী। না তুমি ভুল বুজছো, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি একটা আসন্ন বিপদ এসে তোমায় ঘিরে ফেলবে।

রঞ্জিত। না প্রিয়ে কোন ভয় নেই।

কোমল নারী-হৃদয়ের ভাব দেখে একটু মাত্র মুচকে হাসলে।

রঞ্জিত ব্যবসার খাতিরে গ্রাম ছেড়ে বিদেশে বেরিয়ে পড়ল!

জানুয়ারীর শীত। দিনের আলো সাঁঝের কোলে মুখ লুকিয়ে দিয়ে গেল। শুভ্র চন্দ্রমার হাসির ছটায় দিগন্তও হাসতে লাগল। পথের মাঝে দেখা হ'ল রঞ্জিতের বাল্য-বন্ধুর সঙ্গে। দুই বন্ধু শীতের রাতে কাছাকাছি একটা সরায়ে আশ্রয় নিলে রাত-টার মত। বহুদিনের পর দুই বন্ধু একসঙ্গে আহার করে পাশাপাশি দুটো ঘরে শুতে গেল। শোবার আগেই রঞ্জিত বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়েছিল। কারণ রাত থাকতে থাকতেই তাকে নিজের কাজে বেরুতেই হবে।

ভোরের তারাগুলো তখনও মিটমিট করে জলছে। চারিদিক ধোঁয়ায় ধোঁয়া, শুভ্র সৌদামিনীর সে হাসি আর নেই, পথ কালোয় কালো। ঠিক এমনি সময় রঞ্জিত বেরিয়ে পড়ল তার কাজে। পঁচিশ মাইল পথ পেরিয়ে আসার পর অতি ক্লান্ত-দেহে রঞ্জিত একটু বিশ্রাম লাভের আশায় পথের ধারে একটা অতি পুরাতন অশ্বত্থ বৃক্ষের ছাওয়ায় বসে প'ড়ল। হঠাৎ ঠিক সেই সময় একজন পুলিশ কর্ম্মচারী দুজন চৌকিদার সমেত তার সামনে এসে উপস্থিত হ'ল। কর্ম্মচারী তাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "তুমি কে এবং কোত্থেকে তুমি আসছ?" রঞ্জিত পরিষ্কার ভাষায় তাদের বুঝিয়ে দিলে যে, সে কে এবং কোথা থেকে সে আসছে। পুলিস কর্ম্মচারী বল্'লে, "কেন তুমি এত রাত থাকতে সরাই ছেড়ে চলে এসেছ? তোমার রাতের বন্ধুকে তুমি আর দেখেছ?" রঞ্জিত আশ্চর্য্য হয়ে গেল। অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "এত খোঁজে তোমাদের দরকার কি বাপু? আমি কে, কোথায় থাকি, কাউকে দেখেছি কি না—এত কথা তোমায় আমি বলতে যাবো কেন?"

"আমি কোন বিশেষ কারণে তোমাকে এত কথা জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হয়েছি। কারণ

---

* টলষ্টয়ের ছায়া অবলম্বনে

কাল রাত্রে তোমার বন্ধু নিহত হয়েছে। সেই হত্যা অপরাধে সন্দিহান হয়ে তুমি ধৃত ও বন্দী। এখুনি আমরা তোমার জিনিষপত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে চাই।" অনুসন্ধানের ফলে রঞ্জিতের একটা বড় ব্যাগ থেকে পুলিশ কর্ম্মচারী একটা বড় রক্তমাখান ছুরী টেনে বার করলে, এবং আনন্দে অধীর হয়ে চীৎকার করে বলে উঠল, "এই ত! এই ত! এ কার ছুরী?" রঞ্জিত উত্তর দিতে গেল কিন্তু সে পারলে না। অনাহুত একটা বেদনার জালায় তার সর্ব্বশরীর যেন দগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। তবু সে বল্লে, "আমি শপথ করে বলতে পারি যে, এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না। গত রাত্রে আহারের পর ছাড়া তার সঙ্গে আমার আর দ্বিতীয়বার দেখা হয় নি। আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।" তবু তারা তার কথা শুনলে না। বিচারে তার সশ্রম কারাদণ্ড হল। অচিরে এ সংবাদ তার বাড়ীর সবাই জানলে। রঞ্জিতের স্ত্রী তার দুটি শিশুপুত্র সঙ্গে নিয়ে তার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে এল। কিন্তু পুলিশের লোক তাকে প্রথমে তার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে দিলে না। শেষে সুন্দরী অনেক কাকুতি-মিনতি করবার পর স্বামীর সঙ্গে দেখা করবার হুকুম পেলে। সে তার স্বামীকে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ দেখে অজ্ঞান হয়ে মাটীতে পড়ে গেল। পরে তার জ্ঞান হ'তে দুচক্ষু দিয়ে মুক্তার ধারার মত অশ্রুর বন্যা বয়ে যেতে লাগল। সুন্দরীর সুন্দর বদনে হাস্যের রেখাটি পর্য্যন্ত নাই। কে যেন একটা কালির পোচ টেনে দিয়ে গেছে। সে তখন বাষ্প-বিজড়িত কণ্ঠে বলতে লাগল, "হে স্বামী, আমি পূর্ব্বেই জেনেছিলুম এরূপ একটা বিপদ ঘটবে তাই তোমায় বেরুতে বারণ করে ছিলুম। কিন্তু তুমি আমার নিষেধ শুনলে না। উচ্চ আদালতেও আমার আবেদন অগ্রাহ্য হয়ে গেল। তোমায় মুক্ত করতে আর আমার কোন কিছু উপায় নেই। তুমি আজ এই চুণের ঘরে বসে বল যথার্থই তুমি অপরাধী কি না?" নিজেকে রঞ্জিত আর সামলে নিতে পারলে না। তার ধমনীতে রক্তের স্রোত বন্ধ হয়ে এল। কারাগার তার কাছে আজ প্রাসাদ বলে মনে হল। পাগলের মত সে বলতে লাগল, "হে ভগবান আজ নিজের স্ত্রীও আমাকে সন্দেহ করছে।"

সেই সময় প্রহরী এসে সুন্দরীকে বাহিরে বার করে দিয়ে এল। "সুন্দরী সুন্দরী তোমার কাছেও আজ আমি অপরাধী! ঈশ্বর! জগতে তুমি বৈ আমার আর কেউ নেই! তুমিই জান কে অপরাধী"—বলে ঘৃণায় দুঃখে রঞ্জিত দ্বিতীয়বার আর কোন আবেদন করলে না। শুধু ভাবতে লাগল ঈশ্বরই তার একমাত্র ভরসা।

কারা-জীবনের দীর্ঘ আঠার বৎসর কেটে গেছে। তার সুন্দর সবল দেহ এখন মাটীর মত মেটে রঙ হয়ে গেছে। চর্ম্ম লোল হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি তার অটল, অক্ষুন্ন, কয়েদীরা সবাই তাকে ভালবাসে, ভক্তি করে। প্রত্যেক কাজে তাদের পাণ্ডা বলে মেনে নেয়। এমন কি জেল-কর্ত্তৃপক্ষও তার সাধু চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে তার প্রশংসা করতে কুণ্ঠিত হয় না কিন্তু তবু সে সাধারণ কয়েদী। ক'বৎসর হল বাড়ীর লোকেরাও আর খবর নেয় না। সময় সময় যখন সে এই সব ভাবে তার দুচক্ষু জলে ভেসে যায়। সে কেবলি বলে, "সত্যই কি আমি অপরাধী?" মাটীতে হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। সে রাত্রে তার আর ঘুম হয় না।

সেদিন প্রাতে কয়েক জন নতুন কয়েদীর আমদানী হয়েছিল। তারা রঞ্জিতকে ঘিরে বসে

সবাই সবাইয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে লাগল। তাদের মধ্যে তারই একজন দেশের লোক পেয়ে রঞ্জিত জিজ্ঞাসা করলে, "হ্যাঁ ভাই তুমি কি তোমার দেশের রঞ্জিতের নাম শুনেছ? তার স্ত্রীপুত্র সকলে বেঁচে আছে?"

"হ্যাঁ নাম শুনেছি বটে। সে একজন খুব ধনী বণিক ছিল। কিন্তু সে আমারই মত একদিন কয়েদখানায় আশ্রয় নিয়েছিল একজন বণিকের গলায় ছুরি বসিয়ে। সে অনেক দিনের কথা।"

রহিম বলে একজন রঞ্জিতকে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার অপরাধটা কি ওস্তাদ।"

রঞ্জিত বল্‌লে, "এই! না না সে আমি জানি না।" তখুনি সুন্দরীর সেই মুখ,—সত্য বল তুমিই কি অপরাধী—এই কথা তার মনে জেগে উঠল।

"ওকি ওস্তাদ তুমি অত অধীর হয়ে উঠছ কেন?"

"তবে শুনবে শোন। নির্দ্দোষ আমি, বণিকের হত্যা অপরাধে অন্যায় বিচারে আজ কারাবন্দী।"

তার পর রহিম তার জানু দুটো চাপড়ে বললে, "এাঁ, এাঁ!"

রঞ্জিত মনে মনে বলতে লাগল, 'তবে কি এই সেই হত্যাকারী?"

রহিম বললে, "তুমিই কি সেই রঞ্জিতজি?"

রহিমের উপর রঞ্জিতের সন্দেহ আরও দৃঢ় হ'য়ে উঠল। ধীরে ধীরে সে বল্‌লে, "রহিম তা হ'লে তুমি নিশ্চয়ই জান সে বণিকের হত্যাকারী কে?"

রহিম বল্‌লে, "কেন যার ব্যাগে সেই রক্তমাখা ছুরি পাওয়া গিছল—সে নয়?"

[illegible] ভাল লাগল না, অন্য স্থানে চলে গেল।

ইচ্ছা হতে লাগল নিজেকে সে হত্যা করে সব যন্ত্রণার হাত থেকে পরিত্রাণ পায়।

আরও পনের দিন কেটে গেল। রুদ্ধকারার লৌহদ্বারও যে তাকে সুন্দরীর মত আজ বল্‌ছে, "রঞ্জিত সত্যই কি তুমি অপরাধী?"

চল্‌তে চল্‌তে একটা মাটীর স্তূপ তার পায়ে ঠেক্‌ল। রঞ্জিত দেখতে পেলে তার ধারে একটা বৃহৎ গর্ত্ত। ঠিক এমনি সময় রহিম সেই গর্ত্তের ভেতর থেকে বেরিয়ে বল্‌লে, "ওস্তাদ সাবধান একটীও কথা ব'লো না। আমি তোমাদের পালাবার পথ বানাচ্ছি। যদি ঘুণাক্ষরে কেউ জান্‌তে পারে, তবে তোমায় খুন ক'রে আমিও মর্‌ব।"

রাগে রঞ্জিতের সর্ব্বশরীর থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগল। সে বল্‌লে, "ওরে নির্ব্বোধ আমি অন্যায় বিচারের ফল ভোগ কর্‌ছি। পালাবার আকাঙ্ক্ষাও কোন দিন মনে জাগে নি, পালাবার স্থানও নেই। আজ কারাই আমার বৈকুণ্ঠপুরী। আর মনে থাকে রঞ্জিত মৃত্যুর ভয় করে না। রঞ্জিতের অনেকদিন আগেই তোরই হাতে মৃত্যু হ'য়েছে।"

থপ্ ক'রে সে ব'সে পড়ল।

একদিন কয়েদীরা সবাই কাজে বেরিয়ে গেছে, তখন প্রহরী দেখলে একটা লোক মাটী তুলে জড় ক'র্‌ছে। অচিরে এ সংবাদ জেল-রক্ষকের কর্ণ-গোচর হ'ল। জেল-রক্ষক রঞ্জিতকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "কে করেছে বল?"

"মহাশয় মাপ ক'র্‌বেন। জান্‌লেও আমি ঈশ্বরের নামে ব'ল্‌তে পার্‌ব না।"

তার কাছ থেকে আর কিছু জান্‌বার নেই। কারণ সে খাঁটী লোক।

সে রাত্রে রঞ্জিতের ঘুম হ'ল না। শেষ রাত্রে যখন তার তন্দ্রা এসেছে, তখন সে জান্‌তে পারলে,

কে যেন তার মাথার কাছে এসে ব'সল। অন্ধকারের মধ্যেও সে রহিমকে চিন্‌তে পার্‌লে। তাড়াতাড়ি হুড়মুড়িয়ে উঠে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "এত রাত্রে তুমি আমার কাছে কি চাও?"

রহিম নির্ব্বাক হ'য়ে ব'সে রইল।

"কেন তুমি এসেছ? বল তোমার কি দরকার?"

রহিম তথাপি ঘাড় হেঁট করে ব'সে রইল। যখন প্রহরীকে রঞ্জিত ডাক্‌তে যাবে, তখন রহিম দুটো হাতজোড় করে ব'ল্‌তে লাগল, "ওস্তাদ তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

"তোমার কোন অপরাধে আমি তোমায় ক্ষমা ক'র্‌ব?"

"ওস্তাদ আমিই সেই অর্থলোভী, সেই বণিককে হত্যা ক'রে, সেই ছুরি তোমার ব্যাগে পূরে দিয়েছিলুম।"

জড়ের মত কিছুক্ষণ রঞ্জিত ব'সে রইল। সে যে কি উত্তর দেবে ঠিক ক'র্‌তে পার্‌লে না। পুনরায় রহিম তাকে বল্‌লে, "ওস্তাদ, ভগবানের নামে তুমি আজ আমায় ক্ষমা কর। আমি আমার দোষ স্বীকার ক'র্‌ব। অচিরে তুমি মুক্ত হবে।"

রঞ্জিত বল্‌লে, "রহিম আমার কাছে দোষ-স্বীকার করাটা হয় ত সহজ হবে। কিন্তু আমি তোমার জন্যই দীর্ঘকারাদণ্ড ভোগ ক'র্‌লুম। সুন্দরী হয় ত আর বেঁচে নেই, ছেলেরাও হয় ত চিন্‌তে পার্‌বে না। আমার এই কারা ছাড়া দ্বিতীয় স্থান আর নেই।"

রহিম মাটীতে মাথা খুঁড়তে লাগল, "রঞ্জিত তুমি আমায় ক্ষমা কর, রঞ্জিত তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

তার পর রহিম চেঁচিয়ে কাঁদ্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। আর সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জিতও কাঁদ্‌তে সুরু ক'রে দিল।

রঞ্জিত বল্‌তে লাগল, "আমি আমার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা ক'র্‌ছি। আমার আর দ্বিতীয় বাসনা নাই।"

ইহা সত্ত্বেও রহিম তার সমস্ত দোষ কারা-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট স্বীকার ক'র্‌লে এবং সেই যে এক্ষণে প্রকৃত বণিকের হত্যাকারী তা প্রমাণ হ'য়ে গেল। প্রহরী রঞ্জিতকে মুক্তি দিতে এল, কিন্তু অনেক আগেই তার স্পন্দহীন, অসাড় হিমদেহ কারাগারের এক কোণে প'ড়েছিল।

আলোয়ারের হস্তিশালা

প্রবন্ধ

সাহিত্যে উদ্দেশ্য

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত

যে কোন লেখকের যে কোন বহিই ধরা যাউক না কেন, তাহারই ভিতর হইতে কোন না কোন একটা উদ্দেশ্য টানিয়া বাহির করা কিছুমাত্র দুরূহ ব্যাপার নহে। এমন কি গ্রন্থকার যাহা কল্পনাও করেন নাই, তেমনতর ব্যাখ্যাও তাঁহার গ্রন্থের পক্ষে যে হওয়া সম্ভব, সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ দৃষ্টান্ত বড় দুর্লভ নহে। একেবারে নিরর্থক আবোল-তাবোল কোন লেখাই হইতে পারে না। নাটক উপন্যাসের তো কথাই নাই, এমন কি রবীন্দ্রনাথের 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা'র মত গানেরও একটা রূপক অর্থ বাহির হইয়াছিল। অতএব, যত বড়ই লেখক হউন না কেন, কেহই স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারেন না যে, তাঁহার লেখার ভিতরে কোন রকম একটা উদ্দেশ্য নাই—লক্ষ্য নাই—উহা একেবারেই নিরর্থক। আর যদিই বা কেহ এমন কথা বলিয়া বসেন এবং পাঠকের বিচারে সে কথা যদি সত্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়, তবে তেমন লেখা পাগলের প্রলাপের মতই ধীর-বুদ্ধি পাঠক কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হওয়াই উচিত!

বিষয়-বস্তু আর সেই বিষয়-বস্তুটিকে ফুটাইয়া তুলিবার কৌশল, এ দুইটা জিনিষ যে এক নহে, একথা সকলেই বুঝে। লেখার গুণে কটূক্তিও সরস হইয়া উঠে। কিন্তু তাই বলিয়া কেবল সরসতাটুকুই উপভোগ করিব, বক্তব্যটুকু বুঝিয়া দেখিব না,—মানব-মনের এমন অবস্থা যে কল্পনাও করিতে পারি না! গালাগালি দিয়া যদি কেহ বলে, আমার গালাগালির অলঙ্কারের ঘটা ও কথার বাঁধুনিটুকুই কেবল লক্ষ্য করিবার বিষয়, ভাব বলিয়া উহার কিছু নাই, তবে সে কথা কি লোকে হাসিয়াই উড়াইয়া দিবে না? লোকে কি ভাবিবে না, মানুষটা হয় পাগল, না হয় ভণ্ড? আর তখন সেই গালাগালির ভিতরে সত্য বলিয়া যদি কিছু থাকে, তাহার গুরুত্বও কি সেই সঙ্গে লঘু হইয়া যাইবে না?

কিন্তু এই উদ্দেশ্য না থাকার অজুহাত দেখাইয়া আজিকালিকার অনেক 'রাবিশ' লেখারও আহা-মরি সুখ্যাতি বাহির হইয়া থাকে।—যেন উদ্দেশ্য না থাকাটাই লেখার একটা মস্ত বড় গুণ।

শরৎচন্দ্র এ যুগের মস্ত বড় লেখক। সম্প্রতি তাঁহাকে তাঁহার প্রতিভার প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ যে সব অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হইয়াছিল, তাহার প্রায় সবগুলাতেই তাঁহাকে—'নির্য্যাতিত ও উপদ্রুত মানব তার দরদী-বন্ধু'—এই ধরণের কতকগুলা বিশেষণের দ্বারাই সম্বোধন করা হইয়াছিল। ইহা অতি ভক্তির অত্যুক্তিই হউক বা নিরপেক্ষের স্বরূপোক্তিই হউক—সে কথার বিচার করিতেছি না। এখানে শুধু এই কথাটাই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে যে উদ্দেশ্যের একটা উদ্দাম প্রেরণা দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার গুণ-মুগ্ধ ভক্তগণ যেন তাহার সন্ধান পাইয়াই ঐভাবে তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই ভাবেই মানুষ আবহমানকাল ধরিয়া সাহিত্যের বিচার করিয়া আসিয়াছে। বাহিরের রূপ যদি ভিতরের শিব-সুন্দরের প্রতিচ্ছবি না হইয়া উঠে, তবে তাহা জীবনের যথার্থ সত্যের ভিতরে সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। শরৎচন্দ্র যে প্রকৃত 'আর্টিষ্ট,'—একথা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে তো কেহ perfect বা পূর্ণ মনে করিতে পারেন না।

অথচ যে সব গ্রন্থ বহুকাল ধরিয়া লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছে, যেগুলি অতি সহজেই মানুষের মনের মন্দিরে স্থান পাইয়া আসিয়াছে—অর্থাৎ যাহাদিগকে আকাশে তুলিয়া ধরিবার জন্য মঞ্চের প্রয়োজন হয় নাই, যাহাদিগকে মৃত্যুর করাল-কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য সমালোচকের হেঁয়ালীপূর্ণ কথার জাল বুনিবার দরকার পড়ে না, দলবদ্ধভাবে যাহাদের জন্য বিজ্ঞাপনও দিতে হয় না, propa-gandaও চালাইতে হয় না, যাহাদের বুঝিবার জন্য মানুষের সহজ সরল বিবেক-বুদ্ধির আমূল পরিবর্ত্তন সাধনেরও আবশ্যকতা হয় না, এমন সব বহিও শুধু ঐ উদ্দেশ্য থাকার অপরাধে আজি কালিকার Mushroom বা হঠাৎ লেখকেরা এক কথায় তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতে-ছেন—Where angles fear to tread fools rush in! ইহা জাতির চিন্তা-দৈন্যের ও চিত্ত-চাপল্যের পরিচায়ক বলিয়াই মনে হয়।

যদি বলি, রামায়ণ-মহাভারতে আর আছে কি, কেবল কতকগুলা গাঁজাখুরি কল্পনা-প্রসূত আজগুবি গল্প আর সেই সঙ্গে কতকগুলা ভাল ভাল উপদেশ, তাহা হইলে সে সমালোচনার সত্যনিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সম্বন্ধে লোকের সন্দিহান হওয়াই কি স্বাভাবিক নহে? এ ভাবে আলোচনা করিতে গেলে বাল্মিকী-বেদব্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্র-শরৎ পর্য্যন্ত যে কোন প্রতিভাশালী কাব্যস্রষ্টাকেই অতি সহজে অনায়াসেই উপেক্ষার ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া চলে। অথচ গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' নাটকের এই রকম একটা ভাসা ভাসা আলোচনা করিয়া অর্ব্বাচীন লেখক ও অর্ব্বাচীন সমালোচকেরা বাহবা পাইয়াছে।

'প্রফুল্ল' নাটক সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিতে গেলে একখানা বৃহৎ গ্রন্থ লেখা চলিতে পারে এবং আশা করি শক্তিশালী সমালোচকেরা তাহার চেষ্টাও করিবেন। তবে, মূল কথার সঙ্গতি রাখিয়া ঐ নাটক সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। আমার মনে হয়, শুধু মদ্য-পানের অনিষ্টকারিতা দেখানো—অথবা কেবল পাপ-পুণ্যের জয়-পরাজয় দেখানোই—ঐ নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। অধিকন্তু, পাপ-পুণ্যের জয়-পরাজয় কথাটা আমরা পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন লোকেরা যে ভাবে সচরাচর ধরিয়া থাকি, ভারতীয় কবিরা ঠিক্ সে ভাবে উহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করেন নাই। যাহা অন্যায়, তাহা যে বহুকাল অপ্রতিহত গতিতে চলিতে পারে না—শুধু এইটুকু দেখানোর নামই পুণ্যের বা ধর্ম্মের জয়। মহাভারতের মূল কথা হইতেছে—'যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ'—কিন্তু স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে বলিতে হয়—কুরুক্ষেত্র সমরে ধর্ম্মের কি ভয়াবহ জয়ই না হইয়াছিল! এই ধরণের পুণ্যের জয় বড় লোভনীয় জয় নহে! কিন্তু ইহাই ভারতীয় আদর্শ—ইহাই ভারতীয় Tragedy ইহা বিধির বিধান—ইহা অবশ্যম্ভাবী। 'রোহিণী'র হত্যাকাণ্ডই বলুন, 'শান্তি কি-শান্তির' হত্যাকাণ্ডই বলুন আর 'রমেশে'র জেলে যাওয়ার কথাই বলুন—এ সমস্তই অতি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। এ ধরণের ঘটনা আমরা চোখের সাম্‌নে প্রায়ই দেখিয়া থাকি। কিন্তু এই জাতীয় পাপের পরাজয় গোবিন্দলাল, যোগেশ প্রভৃতির প্রাণে বড় আনন্দের সঞ্চার করে নাই। রমেশের পাপের প্রায়শ্চিত্তে যোগেশের শুকাইয়া যাওয়া 'সাজান বাগান' মুঞ্জরিত হইয়া উঠে নাই!

'প্রফুল্ল' নাটকে মদ্যপানের অনিষ্টকারিতা হয় ত দেখানো হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং মদ্যপান করিতে করিতে যে গ্রন্থ রচনা করিলেন, তাহার অভিনয়

দেখিতে দেখিতে হয় তো অনেকে মদ্যপান ত্যাগ করিয়াও থাকিবেন। কিন্তু শুধু এইটুকু দেখিলে গ্রন্থের নাট্য-সৌন্দর্য্যকে খর্ব্ব করাই হয় বলিয়া মনে করি। যে ঘটনা-স্রোতের আবর্ত্তে পড়িয়া যোগেশকে মদ ধরিতে হইয়াছিল, তাহার মর্ম্মান্তিক আঘাতটুকু যোগেশের হৃদয় লইয়াই অনুভব করিতে হইবে। মদের ঝোঁকে যোগেশ যাহা কিছু করিয়াছে সে সবটাই মদের প্রভাবে নহে। একরাশ বাড়াভাতে খানিকটা ছাই ঢালিয়া দিলে, মানুষের সমস্ত মনটা যেমন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠে, যোগেশের মদ্যপ-জীবনের সমস্ত কাজের মধ্যে সেই ভাবটাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বাচ্ছন্দ্যের সংসারে যখন আকস্মিক দৈব-দুর্ব্বিপাক আসিয়া পড়ে, একান্ত-নির্ভর যেখানে সেখানে হইতে যখন অপ্রত্যাশিত বিশ্বাসঘাতকতার নিদারুণ ধাক্কা লাগে, তখন তাহা মানুষের বুকে বাজের মত আসিয়াই বাজে। মনে হয়, যোগেশের সমস্ত মাতাল-জীবনটা এই নিষ্ঠুর আঘাতেরই একটা শোকাবহ প্রতিক্রিয়া।

আর একটা কথা বলিয়া প্রফুল্ল-প্রসঙ্গ শেষ করিব। 'সরলা' নাটকখানিতে বাঙ্গালী সংসারের গৃহবিচ্ছেদের যেমন একটা দিক দেখানো হইয়াছে, মনে হয় প্রফুল্ল নাটকেও উহার আর একটা দিকের ছবি তেমনি অতি উজ্জ্বল ভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে। সরলায় আছে—নারীর স্বার্থপরতা হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি কেমন করিয়া সোণার সংসারে আগুন জ্বালিয়া দিতে পারে; আর প্রফুল্ল নাটকে আছে পুরুষের নৃশংস স্বার্থপরতার এক অতি বীভৎস অতিকদর্য্য অথচ সুস্পষ্ট আলেখ্য। বাস্তবের দিক দিয়া দুইটা চিত্রই সত্য এবং জীবন্ত, আর সেই জন্যই ইহারা এতকাল ধরিয়া বাঙ্গালীর হৃদয়-ক্ষেত্র অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কাহারও কোন প্রকার গোঁড়ামী অতিভক্তি রুচিবিকৃতি ও ও সত্যনিষ্ঠার ভাণ সেস্থান হইতে ইহাদের আসন তিলপরিমাণ টলাইতে পারিবে না।

মূল কথাটা হইতেছে,—প্রত্যেক লেখকেরই লেখায় কোন না কোন একটা উদ্দেশ্য থাকিবেই—তা সে সমস্যার আকারেই হউক, অথবা মীমাংসার আকারেই হউক। যে লেখক সেই উদ্দেশ্যটা যতটা পরিস্ফুট ভাবে দর্শকের চোখের সামনে সজীব করিয়া ধরিতে পারিবেন, সেই পরিমাণেই তাঁহার শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইতে হইবে। অবশ্য উদ্দেশ্যের ব্যাপকত্ব ও মহত্ত্ব বিচার করিয়া দেখা উচিত। কারণ, ইহাও অতি উচ্চদরের কল্পনা শক্তির পরিচায়ক।

উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কে যে কবে কোন্ সাহিত্য রচনা করিয়াছেন, তাহার সংবাদ আমাদের ঠিক মত জানা নাই। যাঁহারা বলেন, আমাদের লেখার কোন একটু বিশেষ উদ্দেশ্য নাই, যাহা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, মনের উপরে তাহার ছাপ যে ভাবে পড়িয়াছে, যথাসম্ভব যথাশক্তি তাহারই ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছি, ইহার ভিতরে কেহ কোন উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত দেখিও না। তাঁহাদিগকে বলা যাইতে পারে ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় মানুষের মনে যে ভাবের ছাপ পড়ে তাহাকে রূপ দিবার চেষ্টার নামই তো সাহিত্য-সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এমন কি যে সকল রচনা কতকগুলা খাপছাড়া খাপছাড়া ছবি দেখাইয়া মনে একটা চমক লাগাইয়া দিবার চেষ্টা করে এবং ঐ চেষ্টাকে আর্ট বলিয়া বাজারে চালাইতে চায়, একটু তলাইয়া দেখিলে ঐ শ্রেণীর রচনার ভিতরেও একটা উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। সে উদ্দেশ্যটা এই যে, দেখ এই জগৎ সংসারটা কেমন কতকগুলা এলো-মেলো কার্য্য-কারণ সম্বন্ধবিহীন ঘটনা-সমষ্টির লীলা-নিকেতন।

কাজেই বলিতে হয়, ভিন্ন ভিন্ন লোকের সাহিত্য সৃষ্টির মূলে উদ্দেশ্যের পার্থক্য বা বিভিন্নতা থাকিতে পারে, কিন্তু আসল কথাটা হইতেছে, উদ্দেশ্য একটা প্রত্যেকেরই সাহিত্য-সৃষ্টির অন্তরালে লুকান থাকিবেই থাকিবে। কবিতা গান উপন্যাস নাটক কোন কিছুতেই একেবারে নির্গুণ ব্রহ্মের মত নির্ব্বিকার বা নির্ব্বিকল্প নহে।

গিরিশচন্দ্রের নাটক লিখিবার পদ্ধতি ছিল—একটা উদ্দেশ্যকে রূপসমন্বিত করিয়া তুলিবার জন্য প্রথমে একটা মূল চরিত্র কল্পনা করিয়া লওয়া; তাহার পর সেই চরিত্রটিকে সজীব করিয়া তুলিবার জন্য যত রকম আয়োজন ও উপকরণের প্রয়োজন আছে, কল্পনাবলে সেগুলাকে যথাযথভাবে সাজাইয়া যাওয়া। তিনি জোরজবরদস্তি করিয়া ধর্ম্মের জয় দেখানোর একেবারেই পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলিতেন, এ ভাবে ধর্ম্মের জয় দেখাইতে গেলে ধর্ম্মের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধাই বাড়িয়া যায়। তাঁহার মত ছিল—নাটক ও উপন্যাস হইবে—as if natural—সংসারে সচরাচর যাহা ঘটে কতকটা তাই। কলা-সৌন্দর্য্যের ভিতর কৌশলের কোন প্রকার প্রচেষ্টা—কোন প্রকার কৃত্রিমতা থাকিবে না,—ইহাই ছিল আর্ট সম্বন্ধে তাঁর অভিমত। এই সব কথা মানিয়া লইয়া তিনি বলিতেন,—সর্ব্ববিধ কলাবিদ্যার উদ্দেশ্য আনন্দের মধ্য দিয়া লোক শিক্ষা প্রচার করা। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় ইহারই নাম চিত্তবৃত্তির উন্নতি সাধন। ফলতঃ এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রে ও গিরিশচন্দ্রে একটা মিল দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই দিক দিয়াই উভয় কবির কাব্য-সমালোচনা বিধেয়। অথবা শুধু ইঁহাদিগেরই বা কেন, সকল কবির কাব্যই জনসাধারণ কর্ত্তৃক এই ভাবেই আদৃত ও উপেক্ষিত হইয়া থাকে। 'প্যাচোয়া' ভাষায় আবোল তাবোল বকিয়া বড় বেশী দিন মানুষের মনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারা যায় না!
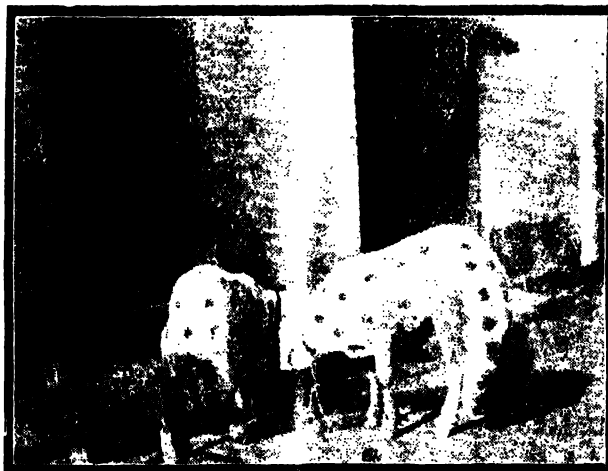
আলোয়ারের 'দুম্বা'

কথিকা

কবির প্রেরণা

এস, ওয়াজেদ আলি বি-এ (কেন্টাব) বার-এট-ল

কবি বসে বসে ভাবছে একটা কিছু লিখতে হবে, সুন্দর কবিত্বময় কিছু, যা পড়ে লোক বলবে হাঁ কবি বটে, প্রেরণা আছে। নিকটের বাঁশবনে একটা কোকিল কু কু রবে ডাকছিল, অবিশ্রান্ত, আবেগভরা তার সেই ডাক। কবি ভাবলে এই কোকিলের ব্যথার কথাই লিখি। লেখবার জন্য সে কলম তুলে নিলে। তা থেকে বেরুলো কিন্তু সেই মামুলি গৎ, হাজার হাজার কবি যা হাজার হাজার রকমে লিখেছে। নতুন কিছু বেরুল না। অসন্তুষ্ট কবি লেখা ছিঁড়ে ফেল্‌লে।

তার পর কবি ভাবলে বসন্তের এই আনন্দোজ্জল প্রভাতের বিষয় কিছু লিখি। পাখীরা তাদের আনন্দ-কাকলিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত ক'রছিল। [illegible] সমীর প্রাণে অব্যক্ত কত বাসনার সৃষ্টি করছিল। গাছের নতুন পাতা, নতুন ফুল প্রীতি-সম্ভাষণে পরস্পরের দিকে চাইছিল। কবি পদ-রচনা করতে সুরু করলে।

না, সেই মামুলি গৎ! কবিতার জন্ম থেকে কবিরা এই একই কথা লিখে এসেছে! অবজ্ঞায়, অভিমানে কবি তার অসমাপ্ত লেখা দূরে নিক্ষেপ করলে। মনে মনে বল্‌লে, না আমার দ্বারা লেখা-টেখা কিছু হবে না। যাই বাইরে একটু বেড়িয়ে আসি। প্রাণটা ঠাণ্ডা হবে। লেখার কথা ভেবে অনর্থক মাথা গরম করে লাভ নেই।

কবি বাইরে বেরুল। মাঠের পাশ দিয়া তার পথ। পথের দুই ধারে সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা; কি সুন্দর সেই ঘাস! কি চোখ-জুড়ানো তাদের রং। পরিচিত ছেলে-মেয়েরা এক জায়গায়

রেলের লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে ট্রেণের যাওয়া আসা দেখছিল। কবি তাদের দিকে চেয়ে হাসতেই তারা লজ্জা-কুণ্ঠা-প্রীতিভরা সর্ব্বজয়ী একটা হাসি হেসে ছুটে দূরে পালিয়ে গেল। কি সুন্দর এই শিশুরা, কি মধুর এদের হাসি! কবি চলতে লাগল। কতকগুলো তেলাকুচোর ফল একটা পানের বোরোজের গা থেকে ঝুলছিল। নধরকান্তি শিশুদের ওষ্ঠাধরের মতই তারা টুকটুক করছিল। বোরোজের জীর্ণ ধূসর গায়ে তাদের উজ্জ্বল হাসি-ভরা সেই মুখগুলি বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল—বৃদ্ধ ঠাকুরদার কোলে যেন নধরকান্তি নাতি-নাতিনীর দল! কবি আবার ভাবলে কি সুন্দর এই জগৎ! কি প্রাণ-বিমোহন এর জীবন-প্রবাহ!

বেড়াতে বেড়াতে কবি এল তাদের বাগানের পুরাণো ঘাটের কাছে। কত কি কারণে এক যুগ ধরে কবি এই ঘাটের কাছে আসে নি। যৌবনের উন্মেষের সময় কবি রোজই এই ঘাটে আসত তার বন্ধুদের সঙ্গে, আর এখানে বসে কত কথাই না কইত, কত খেলাই না খেলত! আশা, আনন্দ, প্রীতিভরা কি মধুর ছিল সে জীবন।

অনেক দিন পরে অতীতের স্মৃতি-ভরা এই ঘাটটী দেখে কবির প্রাণ পুলক এবং ব্যথা-ভরা অপূর্ব্ব এক ভাবাবেশে কেঁপে উঠল। অতীতের সেই স্নেহ-স্নিগ্ধ মুখগুলি তাদের প্রীতিভরা হাসি নিয়ে আবার তার চোখের সামনে জেগে উঠল। ক্ষণেকের তরে আত্মবিস্মৃত হয়ে সময়ের সুদূর ব্যবধান অতিক্রম করে কবি সেই অতীতের জগতে চলে গেল! হঠাৎ, নারকেল গাছের শুকনো একটা শাখা ধপ করে মাটীতে এসে পড়ল। কবির মোহ ভেঙ্গে গেল।

কোথা গেল রামধনুর বিচিত্র বর্ণে শোভিত জীবনের প্রভাতের সেই দিনগুলি! অতীতের অতল-স্পর্শ গহ্বরে তারা ডুবে গেছে! কোথা গেল সেই স্নেহ-স্নিগ্ধ মুখগুলি, একান্ত অন্তরঙ্গ সেই বন্ধুগুলি! কেউ জীবন থেকে চিরবিদায় নিয়েছে, কেউ সুদূর প্রবাসে চলে গেছে, কেউ একেবারে বদলে গেছে, অতীতের সঙ্গে তার যেন কোন সম্বন্ধ নেই! অতর্কিতে দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু কবির চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। তার পর এল—অনুশোচনা!

কবি ভাবলে—সৌন্দর্য্যমণ্ডিত অবিস্মরণীয় সেই অতীত জীবনকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য কি আমি করেছি? ক'জন বন্ধুর খবর নিয়েছি, ক'জনের সঙ্গে দেখা করেছি?

হঠাৎ লেখার কথা তার মনে এল। কবি বললে নিশ্চয়! নিশ্চয়! আমার বাণী যদি অক্ষম না হয়, সেই সুন্দর জীবনের স্মৃতি লুপ্ত হবে না। এই পুরাণো ঘাটই হবে আমার কবিতার বিষয়! আর অতীতের সেই মধুমাখা জীবনই হবে তার অমৃত সরোবর!

কিছুকাল পূর্ব্বের ভাবের ব্যর্থ সন্ধানের কথা কবির মনে পড়ল। কবি ভাবলে লেখার জন্য ভাবের সন্ধান করলুম, ভাব এল না। নিজেকে জীবনের সুখ দুঃখের প্রবাহের মধ্যে ছেড়ে দিলুম—ভাব তার মধ্যে থেকে আপনিই উথলে উঠল! কবিতা লেখবার জন্য কলম ধরে বসলে, কবিতা আসে না। জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিলে, কবিতা কলম থেকে আপনিই ঝরে পড়ে! লেখার জন্য ভাবের চর্চ্চা কিছু নয়, ভাবের অভিব্যক্তির জন্যই হচ্চে লেখার চর্চ্চা! যারা লেখার জন্য ভাবের চর্চ্চা করে তারা হল dilettante নকল কবি; আর যারা ভাবের অভিব্যঞ্জনার জন্য লেখে তারাই হল আসল কবি—বাণীর সন্তান।

প্রবন্ধ

নৃত্যের পরিণাম

শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা

'মেদিনীকোষে'র ব্যাখ্যানুযায়ী স্ত্রী-নৃত্যের সংস্কৃত আখ্যা হচ্চে 'লাস্য-নৃত্য'। তবে ভদ্র ও সম্ভ্রান্তবংশীয়া শিক্ষিতা কিশোরী বা তরুণীদের দ্বারা কলিকাতাস্থ প্রেক্ষাগৃহ-বিশেষে আজকাল যে 'Oriental Dance' দেখানো হচ্চে সে নৃত্যকে 'লাস্য-নৃত্য' বল্‌তে পারা যায় কি না আমরা জানি না; কারণ ঐ নৃত্য-প্রবর্ত্তনকারী কলিকাতাস্থ শিক্ষিত বাঙ্গালী মহিলা ও ভদ্রলোকেরা (ladies and gentlemen) উল্লিখিত ইংরাজী শব্দ-দু'টীর জন্য এখনও বিশেষ কোনো বাংলা প্রতিশব্দ জারি করেন নি। তাঁদের নিজ আদালতে হয় ত মামলাটী এখনও বিচারাধীন। সে অবস্থায় Until further orders আমরা হয় ত 'মেদিনীকোষে'র 'লাস্য-নৃত্য' শব্দটীকেই with benefit of doubt ব্যবহার করে যেতে পারি। তবে 'নৃত্য ত নৃত্য' আর তা'তে অঙ্গভঙ্গি থাক্‌বেই-থাক্‌বে; যেমন 'business is business', আর তা'তে জমা-খরচ থাক্‌বেই-থাক্‌বে। এখন দেখা যা'ক, যখন European‌দের মতে businessএর মনস্তত্ত্বটা হচ্চে অর্থাগমের দিকে, তখন তাঁদেরই মতে নৃত্যেরও মনস্তত্ত্বটাই বা কিসের দিকে! দেখা যাক।

"প্রণয়াকাঙ্ক্ষার ও যৌনমিলনের প্রধান উপায় হচ্ছে—নৃত্য। জীবরাজ্যের ভিতরে পাখী থেকে আরম্ভ কোরে মানুষের ভিতর পর্য্যন্তও এই নৃত্যের প্রথা বর্ত্তমান। আদিমজাতির ও মানব-সভ্যতার পুরাতত্ত্বের ভিতরেও নৃত্য দাম্পত্য-নির্ব্বাচনে প্রধান [illegible] করেচে।

যে প্রীতিকর অনুভূতি নৃত্যের দ্বারা উৎপন্ন হয় তা প্রণয়প্রকাশের আচ্ছাদিত বাহ্যাবয়ব। ক্রীড়ার বিশেষ প্রকার—এই নৃত্য, ইন্দ্রিয়-উত্তেজনার প্রধান কারণের মধ্যে একটী, যে উত্তেজনা খুব সহজেই কামের অন্তর্ভূত হ'তে পারে। শরীরগতির মাত্রা ও আন্দোলন আমাদের ততটা উত্তেজিত করে যতটা কোন উত্তেজক ওষুধ পারে। ধমনীর উচ্চ স্পন্দন, রক্তিম মুখাভা, দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস ও রক্তের উত্তাপ বাড়িয়ে দেয় হৃদয়স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গেই এবং নৃত্যের আনুষঙ্গিক ঘটনা এই জীবনের প্রকৃতত্ত্বের নিমজ্জন, এমন একটা মানসিক অবস্থা হয় যা দাম্পত্য উত্তেজনার সমজাতীয়। পরদেহের—সাধারণতঃ স্ত্রীপুরুষের স্পর্শন, সঙ্গীতের সুর, রূপ-বন্যা, পরিচ্ছদের ও কৃত্রিম ভালবাসার প্রলোভন—এ সকলই ঐ উত্তেজনার মন্ত্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করে—এমন কি এটা সর্ব্বসময়ে পরিষ্কারভাবে ঐ মন্ত্রশক্তিতে বশীভূত লোকরা বুঝতে না পারলেও। নৃত্যহ্রদে এই যে যৌন আকর্ষণের পেছু ধাওয়া—এটা তরুণীদের ভিতরে বিরল নয়। এঁদের মধ্যে অনেকে অতিরিক্ত উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে ক্লান্ত হন না বরং এতে তাঁরা এতটা স্বস্তি ও স্বচ্ছন্দতা অনুভব করেন যা প্রতি নাচের সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে ওঠে। এ সত্য কেবলমাত্র অবিবাহিত ও অবিবাহিতাদের ভিতরে খাটে না, উপরন্তু এটা বিবাহিত যুবক ও বিবাহিতা যুবতীদের মধ্যেও খাটে।

নৃত্য-দর্শকদেরও ভিতরে দাম্পত্য উত্তেজনার সৃষ্টি করে। অনেক নৃত্য, বিশেষতঃ যেগুলো সম্প্রতি চলিত হয়েছে—তাদের উৎপত্তি ও পরিণাম স্পষ্টতঃ যৌন আকর্ষণ—তাদের নৃত্যভঙ্গী নামমাত্র আচ্ছাদিত সঙ্গমক্রিয়ার প্রতিচ্ছবি।"

—Critic and Guide—(New York, May, 1919.)

"সামাজিক তরুণীদের উপর এটা অন্যায় নিন্দাবাদ হবে যদি আমরা ভেবে নি, তাঁরা জানেন যে ঐ সব যুবক যাদের সঙ্গে তাঁরা নৃত্য কোরেচেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরক্ষণে বারবনিতাদের কাছে যায়—তাঁদের নৃত্যজনিত ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা চরিতার্থতার জন্যে। যুবকচরিত্রের সম্বন্ধে এই অনভিজ্ঞতা নারীকে খুব উচু স্তরে রাখে,—যেখান থেকে সে আশঙ্কা কর্ত্তে পারে না যে, তার আবরণ-মুক্ত বক্ষ পুরুষদের কতটা বশীভূত করে—অবিশ্যি যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে বহুকালের এই সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করে।"

—The Contemporary Science Series (Sexual Ethics)
Edited by Havelock Ellis. *

America আর Europe আজকাল যখন পৃথিবীতে আধুনিক নৃত্যকলায়, আর civilization, fashion, taste, enlightenment ও culture প্রভৃতিতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে; আর বাঙ্গালীরা তা'দের যখন সামান্য camp-followers আর stragglers মাত্র, তখন প্রথমোক্তদের 'দেখে-শেখা ঠেকে-শেখা' মন্তব্যই, অন্ততঃ 'স্ত্রীনৃত্য' সম্বন্ধে, হচ্চে পাকা ও কাজের মন্তব্য, আর 'ধার করা'-culture. যুক্ত বাঙ্গালীদের মন্তব্য হচ্চে কাল্পনিক মন্তব্য, যা'কে এখনও cultured বাঙ্গালীরা test-tubeএ ফেলে দস্তরমত পরীক্ষা করে দেখেন নি। একটা চলিত প্রবাদ আছে কিন্তু,—ঐতিহাসিক ঘটনার দর্শন পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায় (history repeats itself)! কথাটা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে যতটা প্রযোজ্য, ততটা অন্য বিষয়েও অর্থাৎ ভদ্র ও সম্ভ্রান্তবংশীয়া কিশোরীদের নাচ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। Test-tubeএ ফেলে ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখ যে সময়-সাপেক্ষ, সে সময়ের পূর্ব্বেই যদি উল্লিখিত মনস্তত্ত্বের লক্ষণ দেখা দেয়, তখন যে ঐ নৃত্যকারিণীদের cultured পিতা-মাতাদের, বা অভিভাবকদের, বিয়ে দেবার হাঙ্গামার হাত হ'তে রেহাই পাবার, নগদে ও অলঙ্কারে যৌতুক দেবার ব্যাপারকে এড়াবার, আপন আপন পতি নির্ব্বাচন করে নেবার জন্য wardsদের উৎসাহ দানাদির আভ্যন্তরিক সঙ্কল্পগুলো 'নিশার স্বপন সম' বলে মনে হয়ে, স্বকৃত কর্ম্মের নিমিত্ত অনুশোচনার দাবানলে দগ্ধ হতে হবে তা'তে সন্দেহের অবকাশ মোটেই নেই। একদল cultured Europe-returned মহাশয় মহাশয়ারা বলেন যে, —history has not been kind to such prophecies বলেন বটে, কিন্তু প্রমাণসহ কেউ ও কথাকে সমর্থনও করতে পারেন না; কিন্তু 'history repeats itself' কথাটিকে প্রমাণসহ সমর্থন করা চলে। বিখ্যাত ও উচ্চশিক্ষিতা নর্ত্তকী Mrs. Langtry এক স্থানে লিখেছেন,—"Dancing by damsels touches the inner-most working of every young person towards carnal appetite. Any other claim that damsel's dancing is something else is camouflage; one need not be misled as to that," এটী তাঁর পরবর্ত্তী জীবনে ধর্ম্মীয়-প্রবণতা আসার দরুণ সত্য-প্রচারের সমুৎসুকতাজনিত ঘোষণা।

আলোকপ্রাপ্ত-প্রাপ্তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয় ত বল্‌তে পারেন যে, পাশ্চাত্য দেশ হ'তে প্রতিকূল quotations আমদানি করলে ত আর ভারতে প্রাচীনতর আর্য্য-যুগে নৃত্যের বহুল প্রচলনকে খণ্ডন করতে পারা যায় না।

* 'নাচঘর—২৯শে চৈত্র ১৩৩৫

কলিকাতাস্থ পণ্যাঙ্গনা-সংশ্লিষ্ট প্রকাশ্য রঙ্গালয়-গুলোতে অধুনা নৃত্য যে প্রণালী অনুসরণ করে করা হয়, ভদ্র ও সম্ভ্রান্তবংশীয়া তরুণীদের নৃত্যকে তার চেয়ে ঢের সভ্যভব্য নৃত্য ব'লে প্রচার করা হয়। কাজেই এই সভ্যভব্য নৃত্যের সহিত পাল্লা দেবার জন্য সভ্যভব্যতম দেশ হ'তেই quotations আমদানি করতে বাধ্য হ'তে হয়েছে। তবুও প্রাচীন আর্য্য-যুগের নৃত্য সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে গেলে স্বীকার করতেই হ'বে যে, সে যুগেও সম্ভ্রান্তবংশীয়া কিশোরীরা নৃত্য করতেন, যাকে তাঁরা 'দৃশ্য-সঙ্গীত' বলে নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু হাওড়া হ'তে প্রকাশিত 'পৃথিবীর ইতিহাস' নামক পুস্তকে লেখা আছে যে, প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত—বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থে বীজ-রূপে নিহিত আছে, আর পুরাণ-উপপুরাণে. রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতিতে তা'র সামান্য অঙ্কুর-পল্লবমাত্র পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং ভারতের ইতিহাস বিভিন্ন সংস্কার অনুযায়ী আর্য্য-ধর্ম্মের ইতিহাসমাত্র। অপরাপর বিষয়গুলোর অভ্যন্তরে তমিস্রার ঘনঘটা দৃষ্টি-গোচর হয়। ইতিহাস শব্দটীর অর্থ কি? ইতি-হ-আস—ইতিহাস। ইতি—ইহা, হ—নিশ্চয়, আস—হইয়াছিল। তাই ঘটনা সত্য না হ'লে কখনই তা'কে ইতিহাস বলা চলে না। বেদ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি ইতিহাস নয়; ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক অতিরঞ্জিত আখ্যান, অন্বাখ্যান, ব্যাখ্যান অনুব্যাখ্যান মাত্র। এখনও কি একখানা ইতিহাস-বলে-ইতিহাস তয়ের হয়েছে? মোটেই হয় নি। আর্য্য-হিন্দুরা অধ্যাত্মবাদী; তাই Max Mullerএর মতে তাঁরা ইতিহাস লেখেন নি, আর লিখতেও পারেন না। Max Muller লিখেছেন "Because Hindus had great regard for the truth, they did not therefore attempt to write history. According to them history is the prostitute of politics, on the lines of the historians of Christrian countries of the West." যদি Max Mullerএর মতবাদটী ঠিক হয়, তবে এ-রকম একটা উপসংহারে আসতে পারা যায় যে, আর্য্য-হিন্দুরা ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সত্যকে প্রচার করতেন, কারণ তা'তে কোনোরকম risk থাকতে পারে না বলে তাঁরা মনে করতেন। অন্য বিষয়ে কেলেঙ্কারী আছে বলে, সত্য-প্রকাশ সম্বন্ধে তাঁ'দের নৈতিক-সাহসটা আর সায় দিত না। এ-হেন অবস্থায় সম্ভ্রান্তবংশীয়া তদানীন্তন নৃত্যকারিণীদের মধ্যে হয়-ত জঘন্য কেলেঙ্কারীর কথা ছড়িয়ে পড়েছিল; তাই হয়-ত তাঁ'রা নৃত্যের প্রচলনের কথা লিখে গেছেন, কিন্তু নৃত্যের ফলস্বরূপ যা' কিছু কাল পরে প্রায়ই ঘটে, মানে কেলেঙ্কারী,—সে কেলেঙ্কারীর কথাগুলোকে ধামা চাপা দিয়ে গেছেন। এই ধামা চাপা দেওয়ার কাজটা হচ্চে কিন্তু politicsএর অন্তর্গত। তাই আর্য্য-হিন্দুরা politicsকে যে নেহাত ঘৃণা করতেন তা'ও মনে হয় না; যদিও politicsএর component parts হচ্চে—সত্য আর মিথ্যা দু'টোই। 'সত্য' নামক অংশটীর সম্বন্ধে politicianরা ধৈর্য্য হারাতে পারেন না, কারণ শব্দটী হচ্চে প্রীতিকর; কিন্তু 'মিথ্যা' নামক অংশের কথায় তাঁরা হয়-ত উষ্মা প্রকাশ করতে পারেন। Europeansরা নিজ politics জ্ঞান সম্বন্ধে বেজায় আত্মাভিমান প্রকাশ করেন; তাই মাছের তেলে মাছ ভাজলে 'মিথ্যা' নামক অংশটীর অস্তিত্বকে হয়-ত যৌক্তিকভাবেই সমর্থন করতে পারা যাবে মনে করে আমরা "Rise of the Christian power in India" নামক পুস্তক হ'তে কয়েকটী মতবাদ, fair commentএর

আদর্শকে অবলম্বন করে উদ্ধৃত করছি ; যথা :—
"The histories of India written by Englishmen are one-sided, because 'politics hath no conscience'."—Page V.

"English authors have spread erroneous views of Indian history, and in a way which pleases the taste of their countrymen and countrywomen, and that class of readers have accepted it, true or false."—Page VI.

এ রকমের মতবাদ ঐ পুস্তকখানিতে বিস্তর আছে। বাহুল্যকে এড়াবার জন্য আমরা আর মতবাদ উদ্ধৃত করলাম না। যাক্, sum up কর্‌তে গিয়ে ঐ পুস্তক-প্রণেতা একটী বেশ মজার কথা লিখেছেন ; সে-টী এই :—

"I believe it was a French King who, wishing to have some historical work, called to his librarian :—'Bring me my liar' !"—Page IX.

Niebuhr নামক একজন ঐতিহাসিক ভারতবর্ষীয় ঐতিহাসিকদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছেন :—

"We must try to separate fiction from falsification and strain our gaze so as to recognise the lineaments of truth liberated from those retouchings. Ancient Indian historians, if at all they can be styled as historians, never did so. It is unfortunate that no ancient Indians have written any complete and reliable history of their times".—উক্ত পুস্তকের VI অঙ্কিত পৃষ্ঠা দেখুন।

মোট কথা, ইতিহাসের লক্ষ্য সত্য-নির্দ্ধারণ, কিন্তু পৃথিবীর কোন ঐতিহাসিকই খাঁটি সত্য ইতিহাস লেখেন নি। প্রত্যেকেই একদেশদর্শী হয়ে পড়ে ভাবাবেশে ঘটনাগুলিকে বিকৃত করে দেখেছেন। আর ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা মোটেই বিজ্ঞানাভিমুখী নয় ; যদি 'ইতিহাস' বলে কিছু থাকেও ; অবশ্য তা নেই। যা একটু আধটু আছে তা কেবল আর্য্য-হিন্দু-ধর্ম্মাভিমুখী। কাজেই তা'তে ঘটনার বিবৃতি ত নে-ই, তখনকার মানবের সামাজিক ও নাগরিক অবস্থার বর্ণনা একটুকুও নেই। যা আছে, তা সত্য কি অসত্য—কেই বা বল্‌তে পারে ! সুতরাং তখনকার নৃত্যের আসরে সম্ভ্রান্তবংশীয়া কিশোরী, তরুণী, নবীনাদের চক্ষু মিনতি জ্ঞাপন ক'রে বা বাণ হেনে, চন্দনচর্চ্চিত আননখানি ললিত-লাবণ্য বিকশিত ক'রে, ভ্রূ-ভঙ্গি ফুল-ধনু সৃষ্টি ক'রে, তনুখানি যৌবনোচিত আন্দোলন-শোভা প্রকাশ ক'রে, প্রণয়-ভিক্ষু দর্শকদের হৃদয়ে দারুণ অনুরাগ, প্রবল আকাঙ্ক্ষা, উত্তেজনা, কামাদি রিপুর প্রাবল্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারত কি না,—কে জানে ! প্রেক্ষাগৃহের সবুজ কামরায় (green room) ঐ শ্রেণীর সবুজ-নট আর সবুজী-নটীদের একাকার হ'বার ফলটা কিরূপ দাঁড়াত,—কেই-বা জানে ! মানব-মানবী ত আর passion-proof নয় যে, সহজপ্রাপ্য ও করায়ত্ত (handy) রূপসীদের কানে কানে অন্ততঃ দু'টো প্রণয়-রসের কথারও কেরামতি না দেখিয়ে ভাল মানুষটীর মত সবুজরা সরে পড়তেন, নেহাত যদি আধুনিক য়ুরোপীয়দের Ball Danceএ বুকে বুকে জড়াজড়ি করবার সুযোগটা না-ও পাওয়া যেত ; —যদি চ "where there is a will there is a way" আর 'ছুরিত' নামক নৃত্যের will-powerএর প্রবণতাটা কু-প্রলোভনের দিকেই বেশী আর

wayর পথ-স্তম্ভটা (guide post) পথ-প্রদর্শন করে opposite to rightএর দিকেই বেশী ! তাই বুঝি ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যগণের দৈনিক জীবন-যাপন বিষয়কে লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে নির্ভীক ঋষি বাৎস্যায়ন লিখে রেখে গেছেন যে, ধনী নাগরিকগণ পূর্ব্বাহ্নেই বিলাসী-পোষাক পরে বারাঙ্গনা ও পরিচারক পরিচারিকাদের নিয়ে, অশ্ব-পৃষ্ঠে চেপে উদ্যান-প্রাসাদে গমন করতেন। সেখানে দৈনিক শরীর-যাত্রার ভালমন্দ কার্য্যাদি সেরে, কুক্কুট-যুদ্ধ, দ্যূত-ক্রীড়া, প্রেক্ষা (theatre) ইত্যাদি করে বা দেখে অপরাহ্নে বাটীতে ফিরে আসতেন। সে যুগের রাজারাও নানাপ্রকার উৎসব ঘোষণা করতেন। উৎসবগুলোর নাম ছিল নক্ষত্র-ক্রীড়া, সুরাক্ষণ, সর্ব্বরাত্রিবার, হস্তিমঙ্গল ইত্যাদি। তা'তে ভদ্র ঘরের স্ত্রীপুরুষ অবাধে দিনকয়েক সুরাপান করতেন, আর সুবসন, গন্ধ, মালা, অলঙ্কারাদিতে সেজে নর-নারীগণ নৃত্যও করতেন আর সঙ্গে সঙ্গে অবৈধ প্রেমে সংসক্তও হ'তেন। কুমার ও কন্যকারা পরস্পরকে বিবাহের জন্য অর্পণও করতেন। পুরস্থিতা রাণীরাও সে উৎসবে যোগ দিতেন আর বিবিধ রঙ্গরসে ও ক্ষণিক উত্তেজনাবশতঃ আমোদাদিতেও স্বাধীনভাবে মত্তা থাকতেন। তাই বুঝি "দশকুমার চরিতে" 'নাগরিক পুরুষ সমবায়' নামক এক সমবায়ের কথার উল্লেখ আছে ! দেখা যায় যে, সমবায়-ভবনে গিয়ে ভদ্রঘরের স্ত্রীপুরুষরা অবাধে মেলা-মেশা করতেন। সে যুগের এ-রকম যথেচ্ছাচারিতার, অমিতাচারিতার, নীতিভ্রষ্টতার, অসংযত চরিত্রের, অবৈধ-কামপ্রবৃত্তির অনেক তত্ত্ব, সমর্থনকারী আদি সংস্কৃত শ্লোক ও reference-সহ মেদিনীপুরের শাখা সাহিত্য-পরিষদের মুখপত্র 'কাদম্বরী'তে দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং এ রকম একটা উপসংহারের সমীপস্থ কখনই হ'তে পারা যায় না যে, যে হেতু বেদ, রামায়ণ, মহা-ভারত, আর অন্যান্য পুরাণ উপপুরাণাদিতে নৃত্যের কথা লেখা আছে, সে-হেতু নৃত্যর ভাবী ফল হচ্চে ভোগবিলাসিতা রোধক, ইন্দ্রিয়ভোগসুখ-পরায়ণতা-রোধক, কামুকতা-রোধক ইত্যাদি। বাস্তবিক যদি এ রকম কোনো একটা অলৌকিক ভাবী ফল পাওয়া যেত, তা হ'লে ধরার সকল পুরুষরাই তোফা বীর ও করুণাদি রসব্যঞ্জক হাবভাব দেখাতে দেখাতে "তা, দি, থুন্, না" বাদ্যের বোলের সহিত "বহুরূপ" ও "পেবলী" শ্রেণীদ্বয়ের নৃত্য করতে করতে, আর সকল নারীরাই খাসা কটাক্ষ, বাহু-যুগল, কটি ও উরু সঞ্চালনে "না কে টে না কে টে, তা কে ধে না কে টে" বাদ্যের বোলের সহিত, অতি কদর্য্য পাপাচরণকে—"ও বাঁদর তুই কলা খাবি,জয়-জগন্নাথ দেখতে যাবি"—বলে "যৌবত" ও "লাস্য" শ্রেণীদ্বয়ের নৃত্য করতে করতে যথা-সময়ে অতি সহজেই স্বর্গীয় পিতার সদনে গিয়ে হাজির হতে পারতেন। যাক্, পুরাকালের নৃত্যের ভাবি ফলের কথাকে আরও প্রসারিত করবার দরকার নেই।

এখন দেখতে হ'বে, ভদ্র ও সম্ভ্রান্তবংশীয়া কিশোরী বা তরুণীদের মস্তিষ্কে নৃত্য-phobiaটা প্রবেশ করবার জন্য দায়ী কে বা কাহারা। অবশ্য আমরা প্রচলিত অগ্রাভিমুখে-চলিষ্ণু চিন্তা, ধারণা, বিচ্ছায়া প্রভৃতির বিপক্ষবাদিনী মোটেই নই; তবুও আমাদের দেখে ত নিতে হ'বে—ঐ মনো-ভাবগুলোর মধ্যে কোন্ বিশেষ মনোভাবটা মন্দর দিকেই বেশী ভেসে যাচ্চে বা না যাচ্চে ! যদি আমরা বলি যে, উক্ত নৃত্য-সম্বন্ধীয় মনোভাবটায় তাড়িত হয়ে যাবার সম্ভাবনা মন্দর দিকেই বেশী, আর তখন কেউ যদি বলেন—না, তা হ'লে তোমরা অগ্রগমন-শীল-ধারণাযুক্তা নও, তোমরা অন্ধ গোঁড়া (bigot),

সে অবস্থায় আমরা এই প্রত্যুত্তর দিতে চাই যে, আমাদের সঙ্কীর্ণমনা হওয়া বরং ভাল, তবে গোঁড়ামীর অনুভূতি নিয়ে নয়, অন্ততঃ আমাদের দিকে আমাদের দায়িত্বকে বেছে নেবার জন্য। যাক, আমরা বিশেষ জোর দিয়ে বল্‌তে গিয়ে বোধ হয় ভিবৃমী যাব না যে, পূজ্যপাদ ও মাননীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ই এ-রকম নৃত্যের প্রবর্ত্তক ও পথ-প্রদর্শক, আর ঠাকুর-বংশীয়া মহিলা ও কিশোরীরাই তাঁর প্রভাবে প্রভাবান্বিতা হয়ে সকলকার আগেই নৃত্য করতে নামেন। ঠাকুর মহোদয় যে intellectual giant তা'তে একটুকুও সন্দেহ নেই, আর আদি-ব্রাহ্ম-সমাজটী অধুনা প্রায় তাঁরই আদর্শকে নিয়ে চালিত। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে ঐ সমাজটিই এই নৃত্য-phobia বিস্তার করবার জন্য দায়ী, কেন-না ঠাকুর পরিবারের ১৫-আনা ব্যক্তি শিক্ষাদীক্ষায়, অর্থশক্তিতে, সভ্যতায় ও জ্ঞানালোকে বাংলা দেশে সকলকা সেরা। কাজেই তাঁদের প্রচার-কার্য্যটী (propaganda) ভালমন্দ সকল বিষয়েই যে আধিপত্য লাভ করতে পারে, তা'তে কোনই সন্দেহ নেই। ইতিপূর্ব্বে বৎসর কয়েকের জন্য ঠাকুরমহোদয়কে আর তাঁ'র বোলপুর-শান্তিনিকেতনের ছাত্রদিগকে কলিকাতাস্থ আদি সমাজের মাঘোৎসবের ১১ই মাঘের সায়ং-বন্দনাতে যোগ দিতে দেওয়া হয় নি। প্রকাশ্য মহিলা-নৃত্যর ভাবী কুফলের বিষয়টীকে ভেবে বা অন্য কোনো অনৈক্য অমিলের জন্য উক্ত সমাজের অন্যান্য সদস্যরা ওঁদের সঙ্গে যোগ দিতে দেন নি, তা'র সঠিক কারণ আমরা কিছুই জানি না; পরে কিন্তু ঠাকুর মহোদয়ের প্রভাব বোধ হয় অন্যান্য সদস্যদের প্রভাবকে ছাপিয়ে উঠেছিল, তাই হয়-ত সদস্যদের মতবাদ কিছুদিন পরে টিকতে পেল না। ক্রমে আদি সমাজের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, নববিধান-ব্রাহ্ম-সমাজের আর সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজের সদস্যদের মধ্যে প্রায় ১২ আনা পিতা মাতা বা অন্য অভিভাবক তাঁদের কুমারী-Wardsদের প্রকাশ্য প্রেক্ষাগৃহে তাঁদের sectarian বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণী সভাতে আর নিছক সঙ্গীত club ইত্যাদির অভিনয়ে নাচবার জন্য পাঠাতে আরম্ভ করে দিলেন, আর এখনও পাঠান। বৎসর-কয়েক আগে সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজের এক মাঘোৎসবের committee-তে এক প্রশ্ন ওঠে যে, ঠাকুরমহোদয়কে সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজের honourary member করতে পারা যায় কি-না। পলিত-শ্মশ্রু প্রচারকরা বললেন—'না'। ঠাকুর-মহোদয়-প্রিয় যুবকরা বললেন—'হাঁ'। 'হাঁ'-বাদীরা কিশোরীদের প্রকাশ্য নৃত্যের ভাবী কুফলের আশঙ্কা সম্বন্ধে ভেবে দেখেছিলেন কি না, আমরা জানি না, কিংবা অন্য কোনো কারণ ছিল কি-না, যা'র দরুণ তাঁরা 'না'-র বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন, আমরা তা'ও জানি না। 'না'-বাদীরা রবি-বাবুর দ্বারা প্রবর্ত্তিত নৃত্যের ভাবী কুফলের সম্বন্ধে আশঙ্কা করেছিলেন কি না, কিংবা ঠাকুরমহোদয়কে member না করবার ইচ্ছার ভেতর তাঁদের অন্য কোনো দুঃখের কারণ ছিল কি না, আমরা তাও জানি না। তবে দু'টী কথা জানি। সে মাঘোৎসবে উল্লিখিত যুবকরা strike করে স্বর্গীয় দেবীপ্রসন্ন রায়-চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁদের মাঘোৎসবটী পৃথকভাবেই সম্পন্ন করেছিলেন। পরে যেমন সাধারণতঃ হয়ে থাকে, অর্থাৎ ধন ও সৌভাগ্যের প্রতিপত্তি যেমন সর্ব্বত্রই প্রবল হয়ে থাকে,—সে প্রতিপত্তির গঠনকারী-উপাদান যা'ই হ'ক-না-কেন,—কিছু কাল পরে পলিত-কেশ প্রচারকদের প্রায় বাধ্য হ'তে হ'ল তাঁদের 'না'-কে সরিয়ে সে পদে যুবকদের

'হ্যাঁ'-কে আরোপিত করতে। তার পরে নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজ! উক্ত দুই sectsএর মতন ঠাকুর মহোদয়কে নিয়ে এঁরা আর নাড়াচাড়া করলেন না। করবার দরকারও বোধ হয় হ'ল না; কারণ তাঁরা খৃষ্টান আদর্শবাদী আর ধন ও সৌভাগ্যের দিক দিয়ে দেখ্‌লে কোচ্‌বিহার রাজ-বংশের প্রায় সকলেই নববিধান-ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত ও ভুক্তা, এবং এঁরা ঠাকুর-বংশের শিক্ষাদীক্ষা, culture ও ধন সম্পদ ও সৌভাগ্যর তুলনায় নেহাত কম যান না! আর ঐ রাজবংশের অন্তর্গত 'সেন'-বংশীয়া কিশোরী ও তরুণীরাও এমন কি মহিলারাও ঠাকুর-বংশীয়াদের মত প্রায় সকলেই নৃত্য-অনুরাগিণী বলে শোনা যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ব্রাহ্ম-সমাজের তিনটী sectsই ভদ্র ও সম্ভ্রান্তবংশীয়া তরুণীদের, কিশোরীদের, নবীনাদের প্রকাশ্য প্রেক্ষাগৃহে 'যৌবত' ও 'ছুরিত' নৃত্যাদির জন্য দায়ী। অবশ্য 'দায়ী' শব্দটীর মধ্যে আমরা 'offender' বা 'agents-provoker' শব্দ-দু'টীকে উপস্থিত ধর্‌চি না, যে-পর্য্যন্ত না test-tueএ ফেলে ঐ নৃত্যের পরিণাম বিষময় কি না বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, যদিও আমরা বিশ্লেষণ করবার নিমিত্ত সময়টিকে পরিপক্কতা বা পূর্ণতা দিতে সম্পূর্ণ গর্‌রাজী; কারণ ইতিপূর্ব্বে দেখানো হয়েছে।

ঐ নৃত্যের জন্য Europe-ফের্ত্তা বাঙ্গালী ladies and gentlemenএর মধ্যে ১৫-আনা ব্যক্তিরাও দায়ী, যাঁরা খাওয়াদাওয়ায়, আমোদ-প্রমোদে, চাল-চলনে Europeanদের নকলনবীস, বে-থা'র বেলায় কিন্তু হিন্দু। এঁরা তাঁদের স্বর্গগত পূর্ব্ব-পুরুষদের সামাজিক নিয়মানুবর্ত্তিতাকে মোটেই আমলে আনেন না, অবশ্য Orthodox বা begot-ted বলে দুর্নাম হ'বার ভয়ে; অথচ পাশ্চাত্য তেজ ক[illegible]ষ্ঠা প্রভৃতি গুণাবলি-(virtues)কে কাজের মত ক'রে আত্মসাৎ করবার জন্য এতটুকুও চেষ্টা করেন না। এঁরা ভুল করেই অব্যবস্থিত আমোদ ও বাইরের ভড়কাল বিলাসিতাকে য়ুরোপীয় সভ্যতার মুখ্য সারাংশ বলে ধরে নিয়ে, সে সারাংশেই নিজেদের ডুবিয়ে রাখেন। সুতরাং এঁরা নকল-নবীস মাত্র, কাজের বেলায় কিন্তু ঢু-ঢু! যাক্‌, সামাজিক-নিয়মানুবর্ত্তিতাই যখন এদের মধ্যে এতই আল্‌গা, তখন ঐ নৃত্যের পরিণাম যে বিষময়—এ সমস্যা সহজেই মীমাংসিত হ'তে পারে। বলা বাহুল্য যে, যৌবন-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই নানা প্রকারের প্রলোভন কিছু কিছু জাগতে আরম্ভ করে, আর যৌবন স্বভাবতঃ উচ্ছৃঙ্খল, উদ্দাম, চঞ্চল। নৃত্যের মধ্যে যেসকল রস-বৈচিত্র্য বিদ্যমান থাকে সেগুলোকে জীবনের ঐ স্তরে শিক্ষা করে কাজে দেখিয়ে আসন্ন-যৌবনা, নবলব্ধা-নৃত্যাধিকারিণী তরুণীদের মনে এই রকম একটা ধারণ ত বদ্ধ-মূল হয়ে যেতে পারে যে, "আমরা ত রস-সৃষ্টি করবার কলাকে আর তা'র সঙ্গী সম্মোহক কলাকেও নাচের ভেতর দিয়ে বেশ অধিকার করে ফেলেছি; ব্যস্‌ এখন আর পায় কে আমাদের!" তা ছাড়া, যখন তারা বারকয়েক প্রেক্ষাগৃহে দর্শক-দের সম্মুখে সারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভিব্যক্তির দ্বারা ঐ কলা দু'টোর জাঁক দেখিয়ে করতালিসহ সুখ্যাতি পেয়ে নেবে, তখন তারা কমবেশী মরিয়াও ত হয়ে উঠতে পারে! মরিয়া হয়ে উঠলে তাদের অন্তরের বিদ্রোহই তাদের আজ্ঞা দেবে,—"এখন ঐ তোমা-দের 'পায় কে আমাদের' ধারণাকে কার্য্য-ক্ষেত্রের দিকে 'quick march' করাও দেখি! দেখবে কত অলিই-না এসে তোমাদের সাথে করবে আলাপন!" আমরা একটা বাজে বিভীষিকা-ময় চিত্র আঁকছি বলে মনে করে কথাগুলোকে নেহাত উড়িয়ে দিতেও পারা যায় না; কারণ ও

রকম অঘটন ঘটাও যে নেহাত অসম্ভব তা'ও তো কেউ জোর গলায় বলতে পারেন না। Napoleon বলে গেছেন "there is no such word as 'impossible' in French military vocabulary"। ঐ ১৫-আনা বিলাত-ফের্ত্তা সভ্যতাগর্ব্বীদের মনে থাকে যে, নৃত্যকলার কারখানাতেও শ্রীশ্রীমদন-দেবের গ্রীবাবেষ্টনী (neck-ties) তয়ের হয়; আর সে বেষ্টনীগুলোর আকর্ষণীশক্তি তাদের 'made in England' গ্রীবাবেষ্টনীগুলোর আকর্ষণী শক্তিগুলো অপেক্ষা ঢের বেশী।

উপন্যাস

কমলকুমারী

স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পৌষ মাস গেল, মাঘ মাস আসিল, খুব প্রবল-বেগে শীত আরম্ভ হইল, প্রাতে কুয়াসাতে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইল, আমের মুকুল দেখা দিল, বসন্ত আগতপ্রায় বুঝিয়া কোকিলেরা ঝঙ্কার তুলিল। প্রায় একমাস হইল, অনাথিনী কমলকুমারী স্বামী-গৃহ হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন, অরবিন্দের দেহের ও মনের ভীষণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সে রূপ নাই, সে কান্তি নাই, সে তেজ নাই; তাঁহার আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইতেন, জিজ্ঞাসা করিলে কোনও উত্তর পাইতেন না। অরবিন্দের কষ্ট কেহ বুঝিতে পারিত না, কমলকুমারীকে দেখিবামাত্র তাঁহার ভালবাসা জন্মিয়াছিল, তাঁহাকে পরস্ত্রী-জ্ঞানে উহা ঘটিয়াছিল, সেটা কেবল রূপের মোহমাত্র, চির-স্থায়ী নহে, পরে যখন জানিতে পারিলেন যে, সেই কমলকুমারী তাঁহার ধর্ম্মপত্নী ও সে তাঁহার পিতা-মাতা কর্ত্তৃক বিনাপরাধে বর্জ্জিতা ও অবশেষে সেই চিরদুঃখিনী আবার তাঁহা কর্ত্তৃকও পরিত্যক্তা তখন ভালবাসা ও স্নেহ উছলিয়া উঠিল, আবার যখন পরিচারিকা ক্ষমা ও রূপচাঁদের নিকট তাঁহার অসামান্য গুণের কথা শুনিলেন, তখন তাঁহার ভালবাসা দুর্দ্দমনীয় বেগে প্রবল হইয়া তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিল, কমলকুমারী তাঁহার ধর্ম্মপত্নী, এই পত্নী অপ্সরা-নিন্দিত সুন্দরী, আবার এই পত্নী অসামান্যা গুণবতী, যখন এই সকল জ্ঞান জন্মিল, তখন গুণজনিত ভালবাসা জন্মিল, ইহা অনন্তকালস্থায়ী এক্ষণে তপ্ত অঙ্গারের ন্যায় কমল-কুমারীর মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল।

একদিন মাঘমাসের অপরাহ্নে আকাশে মেঘ-সঞ্চার হইল। অরবিন্দের এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, আকাশে মেঘ দেখিলে বড় উদ্বিগ্ন হইতেন, কেন না তাঁহার আশ্রয়হীনা পত্নীর ঝড়-বৃষ্টি ও শীতে মৃত্যু হইতে পারে। রাত্রি হইল, পশ্চিমদিকে একবার মেঘগর্জ্জন শুনিতে পাইলেন, মুহুর্মুহু ছাদে আসিতেছেন ও মেঘ দেখিতেছেন। বড় অন্ধকার কিছুই দেখা যায় না, বোধ হইল যেন পশ্চিমের মেঘখানা সমস্ত গগন ব্যাপিয়াছে, কেন না একটিও নক্ষত্র দেখা যাইতেছে না। দুই একবার পশ্চিমদিকে

বিদ্যুৎ হাসিল, এইরূপে রাত্রি এক প্রহর অতীত হইল, তথাপি আহারাদি করিলেন না, উন্মত্তের ন্যায় রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন, যদি কমলকুমারীকে দেখিতে পান। কোথায় কমলকুমারী, তাঁহাকে এক মাস ধরিয়া দিন-রাত খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন, স্বয়ং খুঁজিয়াছেন, লোকদ্বারা খোঁজাইয়াছেন, কোথায়ও তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় নাই। অরবিন্দ রাজপথ হইতে আপনার শয়নকক্ষে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন, ক্রমে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল। বড় শীত, কার্পাস-নির্ম্মিত গাত্রাবরণ দ্বারা সর্ব্বশরীর আচ্ছাদিত করিয়া শয়ন করিলেন, নিদ্রা নাই। দেখিতে দেখিতে প্রবলবেগে হু হু শব্দে ঝড় উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। অরবিন্দের হৃদ্‌কম্প হইল, উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া কমলকুমারীকে ডাকিতে ডাকিতে শয্যা ত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন ও এক এক বার জানালা খুলিয়া ঝড় বৃষ্টি দেখিতে লাগিলেন। তৃতীয় প্রহর রাত্রে ঝড় বৃষ্টি থামিল, অরবিন্দ আবার শয্যায় শয়ন করিয়া লেপ মুড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এইরূপ কিছুক্ষণ পরে তাঁহার নিদ্রা আসিল, কিন্তু নিদ্রিত অবস্থাতে আর এক যন্ত্রণা উপস্থিত হইল স্বপ্ন দেখিয়া আবার চীৎকার করিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। স্বপ্নে দেখিলেন যে, নগরপ্রান্তে এক বিস্তৃত শ্মশানভূমিতে ভীষণ অন্ধকারে ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া কমলকুমারী দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন। অতি শীর্ণ দেহ, মলিন বর্ণ, পরিধানে একখানি ছিন্ন ও মলিন বসন, হস্তে এক এক গাছি শাঁখা, আলুলায়িত কেশে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন। সে রূপ নাই, সে মুখশ্রী নাই, সে লাবণ্য নাই, ভিখারিণীবেশে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন। মাথার উপর মুষলধারে বৃষ্টি [illegible], হু হু শব্দে ঝড় বহিতেছে, চারিদিকে বজ্রাঘাত হইতেছে, শবমাংসভুক্ পশুগণ তাঁহাকে ঘেরিয়া বেড়াইতেছে, যেন তাঁহার মাংস ভক্ষণ করিবে কিন্তু তিনি কিছুই লক্ষ্য করিতেছেন না। কেবল কাঁদিতেছেন। অবিশ্রান্ত কাঁদিতেছেন। এমন সময় একজন যোদ্ধৃবেশী আফগান সেস্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ধরিল, দৃঢ়মুষ্টিতে তাঁহার আলুলায়িত আর্দ্র কেশগুচ্ছ ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গেল। এইরূপ আক্রান্তা হইয়া কমলকুমারীর চমক হইল। অনাথিনী, নিরাশ্রয়া ভিখারিণী নিরুপায় হইয়া চীৎকার করিয়া স্বামীকে ডাকিল—"কোথায় তুমি স্বামী আমাকে রক্ষা কর, যবন-হস্ত হইতে রক্ষা কর, আমি অনাথিনী পথের ভিখারিণী, আমার তুমি ভিন্ন আর কেহই নাই—" স্বপ্নে কমলকুমারীর এইরূপ আর্ত্তনাদ ও আহ্বান শুনিয়া অরবিন্দ ক্ষিপ্তের ন্যায় শয্যাত্যাগ করিয়া নগরপ্রান্তে শ্মশানভূমির উদ্দেশে ছুটিলেন। তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল যে, ঘটনাটি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, তথাচ কমলকুমারীর জন্য তাঁহার মনের এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, উহা স্বপ্ন হইলেও ঘটনাটি যে সত্য তাহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। এজন্য তাঁহার রক্ষার্থ তিনি অতি দ্রুতপদে শ্মশানভূমির উদ্দেশে চলিলেন। কমলকুমারীর অন্বেষণে নগরের সকলস্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেজন্য শ্মশানভূমি জানিতেন। এক্ষণে ঝড়বৃষ্টি থামিয়াছে কিন্তু অন্ধকারে ভূমণ্ডল আচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ হাসিতেছিল। যখন শ্মশান-ভূমিতে আসিয়া পৌছিলেন তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, তথাপি চতুর্দ্দিক অন্ধকারময়, কোলের মানুষ দেখা যায় না। বিদ্যুদালোকে শ্মশানভূমি দেখিতে পাইয়া চমকিত হইলেন, যাহা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন তাহা সত্য বটে, কেন না ঐ ভূমিখণ্ডে প্রবেশমাত্রই দেখিলেন যে, এক যোদ্ধৃবেশী আফগান ও

আর একটী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। তিনি এই স্ত্রীলোকটীকে দেখিবা মাত্র চীৎকার করিয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ রমণীও তাঁহাকে দেখিবা মাত্র দৌড়াইয়া পলাইল। অরবিন্দ তাহার পশ্চাৎ দৌড়িলেন। আফগান তাঁহাকে আক্রমণ করিতে দৌড়িল। ইতিমধ্যে ঐ স্ত্রীলোক অন্ধকারে শ্মশানের একটী বাঁশ বাধিয়া পড়িয়া গেল, অরবিন্দ তাহাকে ধরিবার উদ্দেশে হাত বাড়াইলেন। কিন্তু পশ্চাৎ হইতে আফগান তাঁহার মস্তকে লাঠির আঘাত করাতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। যখন তাঁহার জ্ঞান হইল তখন সূর্য্যোদয় হইয়াছে। উঠিয়া ধীরে ধীরে চলিলেন, কেন না শরীর বড় দুর্ব্বল,। শ্মশানভূমির সম্মুখে এক প্রকাণ্ড প্রান্তর, উহার উত্তরে এক নিবিড় বন। দেখিলেন মধ্যে মধ্যে উষ্ণীষধারী আফগান ঐ বন হইতে দুই চারিজন নির্গত হইতেছে আবার প্রবেশ করিতেছে। তাঁহার সন্দেহ হইল যে, বৰ্দ্ধমান-আক্রমণ-অভিপ্রায়ে বিদ্রোহী রহিম সা ঐ বনমধ্যে সসৈন্য ছাউনি করিয়া আছে। এই সংবাদ শীঘ্র সুলতান আজিম হোসেনের নিকট পৌছান আবশ্যক, কিন্তু নিজে বড় দুর্ব্বল, চলচ্ছক্তিরহিত, কিরূপে ঐ সংবাদ পাঠাইবেন? আর কি প্রকারেই বা তিনি বৰ্দ্ধমানে ফিরিয়া যাইবেন? ইতিমধ্যে দেখিলেন ২।৪ জন সহিস সামান্য ঘোড়ার পৃষ্ঠে চড়িয়া ঐ মাঠে ঘাস কাটিতে আসিতেছে। তাহাদের একজনকে পুরস্কারের অঙ্গীকার করিয়া তাহার ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া বৰ্দ্ধমানে ফিরিলেন। মনে মনে এই স্থির করিলেন যে, বাটী যাইয়া আহারাদি করিয়া নবাবের সঙ্গে দেখা করিয়া সংবাদ দিবেন, কিন্তু বাটী যাইয়া আহারাদি করিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিতে যে বিলম্ব হইবে তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। এই ভাবিতে ভাবিতে নগরে প্রবেশ করিলেন। রাজপথে নবাবের একজন পারিষদের সঙ্গে দেখা হইল, তাহাকে দাঁড় করাইয়া ঐ সংবাদ দিলেন। সে ব্যক্তি অরবিন্দকে চিনিতে পারিল না। একটা ঘেসেড়ার ঘোড়ায় আরোহণে সামান্য বেশে অরবিন্দকে কে চিনিবে। সে ব্যক্তি "ঝুটা বাৎ—ঝুটা বাৎ" বলিতে বলিতে তাহার একটী মুসলমান-প্রণয়িনীর সম্ভাষণে চলিয়া গেল। অরবিন্দ নিরুপায় হইয়া বাটী পৌছিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অনতিবিলম্বে অরবিন্দ সুলতান আজিম উসেনের দরবারে পৌছিয়া বিদ্রোহীদিগের বৰ্দ্ধমানের সন্নিকটে আগমনবার্ত্তা শুনাইলেন। নবাব বিদ্রোহী-সেনাদিগের সংখ্যা ইত্যাদি জানিবার জন্য সৈনিক দূত প্রেরণ করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার পিতামহ বাদসা ঔরঙ্গজেব প্রাচীন হইয়াছেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু সম্ভব। তখন দিল্লীর তক্ৎথ খালি হইলে তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য কিরূপে সাধিত হইতে পারে, ঐ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দিল্লীর বাদসাহ হইবার বাসনা তাঁহার যৌবনকাল হইতে জন্মিয়াছিল, এক্ষণে উহা বড় প্রবল হইয়াছিল, তজ্জন্য মনে মনে স্থির করিলেন যে, আফগান বিদ্রোহী রহিমসাকে সসৈন্য বশীভূত করা আবশ্যক। এই স্থির করিয়া প্রধান প্রধান যোদ্ধদিগকে আহ্বান করিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন এবং তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, বিদ্রোহীরা অস্ত্র ত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারেন। সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইল, কেবল হিন্দু যোদ্ধা অরবিন্দ রায় অন্য মত প্রকাশ

করিলেন। তাঁহার মতে বিদ্রোহীদিগকে একা একা আক্রমণ করিয়া রহিম শাকে বন্দী করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁহার মত ভাসিয়া গেল, রহিম শাকে অস্ত্র ত্যাগ করিয়া নবাবের পদানত হইবার হুকুম জারি হইল। রহিম শা ঐ হুকুম তামিল করিতে স্বীকৃত হইল কিন্তু বলিল নবাবের প্রধান মন্ত্রী আনভার আমার শিবিরে গিয়া ঐরূপ আশ্বাস প্রদান করিলে আমি নবাবের শরণাগত হইতে পারি। পরদিন প্রত্যূষে নবাব তাঁহার প্রধান মন্ত্রীকে কতিপয় যোদ্ধার সহিত ঐ কার্য্যে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তিনি আর ফিরিলেন না, বিদ্রোহী রহিম শা তাঁহাকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে নবাবের শিবির আক্রমণ করিতে সসৈন্য বর্দ্ধমানের নিকট উপস্থিত হইল। সুলতান আজিম হোসেন যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, কেন না সন্ধি হইতেছিল, হঠাৎ বিদ্রোহী সেনা বর্দ্ধমানের নিকটে দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। কথিত আছে যে, তিনি হস্তীতে চড়িবার অবকাশ পাইলেন না, ইতিমধ্যে তাঁহার সৈন্য বর্দ্ধমানের পার্শ্বে একটা প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহীদিগকে আটকাইল, পরে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হামিদ খাঁ নামক একজন যোদ্ধাকে নবাবভ্রমে বিদ্রোহী রহিম শা আক্রমণ করিল এবং ঐ হামিদ খাঁর হাতেই তাহার প্রাণবিয়োগ হইল। হামিদ খাঁ তখন রহিম শার মুণ্ড তাহার বর্শার ফলকে তুলিয়া বিদ্রোহী সেনাদিগকে দেখাইল, তাহারা উহা দেখিবামাত্র আতঙ্কে পলাইল, অবশেষে নবাবের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার সৈন্যদলভুক্ত হইল। সুলতান আজিম হোসেনের আনন্দের সীমা রহিল না, তাঁহার দলপুষ্টি হইল, দিল্লীর তক্তারোহণের সোপান হইল। এই আনন্দেই তিনি অরবিন্দকে ভুলিয়া গেলেন, তিনি যুদ্ধে জীবিত আছেন কি মরিয়া গিয়াছেন, কোনও সংবাদ লইলেন না। অরবিন্দ আহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া আছেন, মুসলমান সেনারা আহত যবন যোদ্ধদিগের সেবা করিতেছে, কিন্তু হিন্দুদিগের নহে, তজ্জন্য অরবিন্দ বিনা সাহায্যে পড়িয়া রহিলেন। ক্রমে রাত্রি হইল, মশাল জ্বালিয়া আহত ও মৃত ব্যক্তিদিগের অনুসন্ধান লইতে লাগিল। ইতিমধ্যে কতিপয় স্ত্রীলোক মশাল লইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে অরবিন্দকে দেখিতে পাইলেন (পাঠক চমকাইবেন না) এবং তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের প্রান্তে একটী কুটীরে লইয়া গেলেন। ঐ কুটীরে এক ঘুঁটে কুড়ানী বুড়ি বাস করিত। সে অরবিন্দকে মৃত ভাবিয়া তাহার দেহ ঘরের ভিতরে রাখিতে দিল না, স্ত্রীলোকেরা ঐ দেহ বারান্দায় রাখিল এবং তাহাদের মধ্যে যিনি প্রধানা ও প্রাচীনা তিনি একপ্রকার শিকড় বাটিয়া অরবিন্দের ক্ষত স্থানে লেপন করাতে রক্তস্রাব বন্ধ হইল ও কিছুক্ষণ পরে অরবিন্দ নড়িলেন। স্ত্রীলোকেরা বুঝিল তাঁহার চৈতন্যলাভ হইয়াছে এবং ঐ বুড়ির হাতে মশাল ও রৌপ্য মুদ্রা দিয়া উঠিয়া গেলেন। কেবল একটী স্ত্রীলোক অরবিন্দের শয্যার উপর বসিয়া তাঁহাকে দেখিতেছিল। অরবিন্দ চক্ষু উন্মীলন করিলেন এবং জল চাহিলেন স্ত্রীলোকটী জল খাওয়াইয়া অঞ্চল দ্বারা তাহার মুখ মুছাইলেন। অরবিন্দ একদৃষ্টি ঐ স্ত্রীলোকটীর দিকে চাহিয়া রহিলেন কিছুক্ষণ পরে "না-না" করিয়া চীৎকার করিয়া দুই হস্তে চক্ষু ঢাকিলেন। স্বপ্নে শ্মশানভূমিতে তিনি যে মূর্ত্তি—শীর্ণ দেহ, পরিধানে একখানি ছিন্ন ও মলিন বসন, দুইহস্তে দুইগাছা শাঁখা দেখিয়াছিলেন, সেইমূর্ত্তি আলুলায়িত কেশে তাঁহাই শুশ্রূষা করিতেছেন। অরবিন্দ ভিখারিণীকে দেখিয়া "না না" করিয়া চক্ষু ঢাকিলেন কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকটী অন্যরূপ বুঝিলেন,

যেন তাহাকে দেখিয়া অরবিন্দ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এই ধারণায় তিনি তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইলেন। পণ্ডিতেরা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন কিন্তু সকল কার্য্যের কারণ নির্দ্দেশ করা সাধারণের পক্ষে বড় কঠিন, চিরপ্রচলিত "কর্ম্মফল" কথাটাতেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।

ইতিমধ্যে ঐ কুটীরে আলো দেখিয়া নবাবের অনুচরগণ উপস্থিত হইল এবং অরবিন্দকে চিনিতে পারিয়া লইয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অরবিন্দ শয্যাশায়ী, বড় দুর্ব্বল। দুইজন হকিমকে নবাব তাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত করিয়াছেন, রোগ কঠিন নয়, শরীরের ক্ষত শুকাইয়াছে, জ্বরত্যাগ হইয়াছে, তথাচ অরবিন্দ শয্যা ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না, হকিম দুই জন পরামর্শ করিয়া নানা প্রকার ঔষধ দিতেছে কিন্তু কিছুতেই অরবিন্দ সুস্থ হইতেছেন না। এতো শরীরের রোগ নয়, মনের রোগ, হকিমদিগের সাধ্য কি যে উহার প্রতিকার করেন। ভবদেব ঘোষাল প্রতিদিন জামাতার সংবাদ লইতে আসিতেন কিন্তু অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইত না। তিনি তাঁহার কন্যা বসন্তকুমারীকে অরবিন্দের সেবাশুশ্রূষার জন্য পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন, পিসী মৃণ্ময়ী ঐ প্রস্তাব অরবিন্দকে জানাইলেন কিন্তু তিনি বড় বিরক্ত হইলেন; কেন না বসন্তের নাম পর্য্যন্ত তাঁহার ভাল লাগিত না, বসন্তের মিথ্যা রটনার জন্য তিনি কমলকুমারীকে ত্যাগ করিয়াছেন, সে যদি সত্য ঘটনাগুলি তাঁহাকে জানাইত তাহা হইলে তাহার এ দুর্দ্দশা হইত না। যাহা হউক এই রূপ অবস্থাতে দিন কাটিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে একদিন সূর্য্যোদয়ে তাঁহার বাটীর পরিচারিকাগণ রাস্তায় একটা গোলমাল শুনিয়া কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দৌড়াইয়া গেল, অনতি-বিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া কানাকানি করিতে লাগিল। গৃহিণী মৃণ্ময়ী জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে? কি হইয়াছে?" কেহ উত্তর করিল না, মৃণ্ময়ী অতিশয় বিরক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে একজন বলিল "মা ঠাকরুণ! আর কিছু নহে, কা'দের একটি বউ বা মেয়ে পুকুরে জলে ডুবে মরেছে, তাহার লাস ভেসে উঠেছে তাই সকলে দেখতে যাচ্চে।" এই কথা শুনিবামাত্র মৃণ্ময়ীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কে?" দাসী উত্তর করিল "কি জানি মা।" এই কথা শুনিবামাত্র ক্ষেমা দৌড়াইয়া সেই পুষ্করিণীর তীরে আসিল, রূপচাঁদ বহির্বাটী হইতে ঐ কথায় দৌড়াইল, সেখানে যাইয়া উভয়ে দেখিল যে একটী যুবতী স্ত্রীলোকের লাস জল হইতে তুলিয়া সকলে দেখিতেছে। ক্ষেমা ভিড় ঠেলিয়া প্রবেশ করিল এবং ঐ দেহ দর্শনমাত্র চীৎকার করিয়া ভূমিতে পড়িল, রূপচাঁদের চক্ষে দোষ জন্মিয়াছিল, সে ক্ষেমার চীৎকারে বুঝিল ঐ দেহ কমলকুমারীর। সেও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাটী ফিরিল। তাহাদের উভয়ের কমলকুমারীর শোকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান রহিত হইয়াছিল, অরবিন্দ রোগশয্যায় শায়িত, এ অবস্থাতে কাঁদিতে কাঁদিতে বাটী প্রবেশ করিলে তিনি যে আসল কথা বুঝিতে পারিয়া আরও পীড়িত হইবেন সে বোধ ছিল না। যাহা হউক তাহাদের উভয়ের ক্রন্দন শুনিয়া মৃণ্ময়ী ভূমিতে লুটাইতে লাগিলেন। অরবিন্দ এই চীৎকারের কারণ তাহার একজন বালক খানসামাকে জিজ্ঞাসা করায় সে সত্য কথা বলিবা মাত্র তিনি মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলেন।

বেলা দ্বিতীয় প্রহরে তাঁহার চৈতন্য হইলে

মৃণ্ময়ী সকলকে উপদেশ দিলেন যে এই ঘটনাটি গোপন রাখে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে হকিমদ্বয় আসিয়া দেখিল অরবিন্দের অবস্থা বড় মন্দ, উভয়ে গোপনে পরামর্শ করিতে লাগিল কিন্তু অরবিন্দ তাহাদিগকে জবাব দিলেন অর্থাৎ হিন্দু চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইবেন এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। হকিমেরা আর আসিল না, নবাব প্রায় প্রতিদিন তাঁহার সংবাদ লইবার জন্য লোক পাঠাইতেন, অরবিন্দ তাহাদের বলিয়া পাঠাইতেন "ভাল আছি।" এইরূপ অবস্থাতে দুই মাস গেল, অরবিন্দের সকল আশা ভরসা ফুরাইয়াছে বটে, মনের শান্তি চিরদিনের জন্য লোপ পাইয়াছে বটে. কিন্তু যুবাপুরুষ স্বভাবের সাহায্যে কিঞ্চিৎ বল পাইলেন, এখন স্থির করিলেন, যে কয়েক দিন জীবিত থাকিবেন সেই কয়েক দিবস দেশে গিয়া পৈতৃক ভিটাতে বাস করিবেন, তাহার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

ভারতের প্রাচীন মুদ্রা

বাম হইতে দক্ষিণে

১ম পংক্তি—

তাম্র মুদ্রা খৃঃ পূঃ ৫০০ বৎসরের

ঐ খৃঃ পূঃ ১৬০ বৎসরের (বাকৃট্রিয়া)

ঐ খৃঃ পূঃ ৪৫০ বৎসরের

উজ্জয়িনীর মুদ্রা খৃঃ পূঃ ২৫০ বৎসরের

কণিষ্কের (কুশান) মুদ্রা ১০০ খৃষ্টাব্দের

অযোধ্যার মুদ্রা—১০০ খৃষ্টাব্দের

পার্থিয়ার মুদ্রা—খৃঃ পূঃ ৩০০ বৎসরের

মুদ্রা—খৃঃ পূঃ ১৭০ বৎসরের (বাক্‌ট্রিয়া)

মুদ্রা—খৃঃ পূঃ ২২০ বৎসরের (বাক্‌ট্রিয়া)

প্রাচান ভারতে রাজ্যাভিষেক

ইহা অজন্তা গুহার অঙ্কিত চিত্রের অনুলিপি। অনুমান ৫০০ খৃষ্টাব্দে নানা বর্ণসম্পাতে ইহা অঙ্কিত হইয়াছিল। উপরি ভাগের চিত্রে দেখানো হইয়াছে —রাজাকে সিংহাসনে বসাইয়া মন্ত্রপূত পবিত্র তৈল মৃৎকলস হইতে লইয়া তাঁহার অঙ্গে ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে এবং রাজা রাণী-প্রদত্ত উপহার-সামগ্রী স্পর্শ করিতেছেন। পার্শ্বে আরও তৈল আনয়নের চিত্র। তৎপার্শ্বে ভিক্ষুকদিগের ভিক্ষা চাহিবার দৃশ্য। রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে প্রদত্ত নরবলির নরমুণ্ড থালায় করিয়া সাজাইয়া পুরোহিতের নিকটে আনা হইতেছে—নিম্নে ইহারই চিত্র।

লক্ষ্য-ভেদ দ্বারা পত্নীলাভ

চীনের প্রাচীন রাজপ্রথা

প্রাচীন কালে চীনের কোনও কোনও রাজা লক্ষ্যভেদ করিয়া পত্নীলাভ করিতেন। সুই-রাজবংশের উচ্ছেদকারী লাই য়ুয়ান ৬১৮ খৃষ্টাব্দে চীনের সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি লক্ষ্যভেদ করিয়া সুন্দরী পত্নী লাভ করিয়াছিলেন। পত্নী লাভের সর্ত্ত ছিল এই— একটি চিত্রিত ময়ূরের দুই চক্ষু বাণ বিদ্ধ করিতে হইবে। লাই য়ুয়ান ময়ূরের দুই চক্ষু বিদ্ধ করিয়া পত্নীলাভ করেন। এই ব্যাপারে অপর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল কি না তাহার কোনও উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

২৪তলা মোটর গাড়ীর আস্তানা
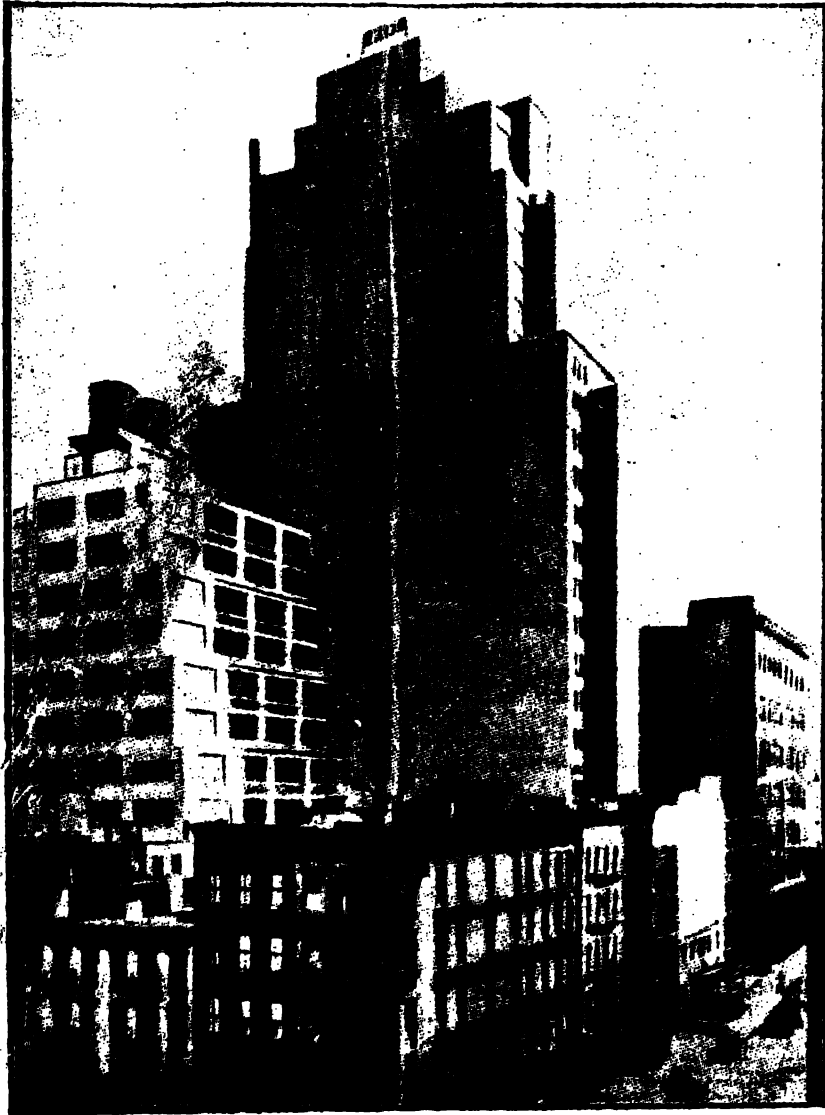
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সহরে ইষ্ট-ফর্টিথার্ড ষ্ট্রীটে একটি ২৪তলা ইমারত মোটর গাড়ীর গ্যারেজরূপে তৈয়ারী হইয়াছে। মোটর গাড়ী ইহার নীচের তলায় পৌছিবামাত্র মানুষকে আর [illegible] অঙ্গস্পর্শ করিতে হয় না, সমস্ত কার্য্য যন্ত্র-[illegible] সম্পন্ন হয়। মনে করুন, একটি মোটর-গাড়ী রাখিবার স্থান ১২ তলায়। ১২ তলার যে ঘরে উহা থাকে সেই ঘরের নম্বর গাড়ীতে থাকে। গাড়ীখানা Lift 'লিফট' বা উত্তোলন-যন্ত্রে রাখিবা মাত্র উহা বৈদ্যুতিক শক্তি-বলে যথাস্থানে নীত হয়। এই অদ্ভুত আস্তানায় এক হাজারের উপর মোটর গাড়ী থাকে।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত

১

"এসেছে সে? হ্যাঁরে সুশীলা দেখে এলি?—কথা বল্‌লে?—তার বৌ?—হ্যাঁরে সত্যি তার খুব রূপ?—আমার চেয়েও?—তার ছেলে? চুপ ক'রে রইলি যে—বল্‌বি নে? বল্‌ সে কি বল্‌লে?—তুই কি বল্‌লি?"

"আমি বল্লুম—দিদিমণি তোমায় ডেকেছে।"

"তাতে সে কি বল্‌লে?"

"সে বল্‌লে—"

"বল্‌ কি বল্‌লে,—গোপন করিস্‌ নে—"

"সে বল্‌লে—তোমার দিদিমণিকে—আমায় ভুলে যেতে বল গে—"

"সত্যি সে ও কথা বল্‌লে? সুশীলা!—তুই আবার যা—একটি বার। বল্‌গে—শোন্‌;—তুই তাকে একবারটী এখানে ধ'রে নিয়ে আয়।—যেমন করে পারিস্‌—"

"সে আস্‌বে না—

"পাঁচ টাকা! রাজ্যে-যাও লক্ষ্মীটি—"

সুন্দরী পান সাজিতে বসিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া পান সাজিল। পানের রাশি। বাহিরে জুতার শব্দ হইল।

"দিদিমণি! এসেছে—"

সুশীলার গালে হাসির কোঁচ।—সুন্দরী টিপিয়া দিল।

"আস্‌তে বল্‌ ভেতরে—যা শিগ্‌গীর—"

সুন্দরী বিছানা ঝাড়িতে লাগিল।

"সে আস্‌বে না। বল্‌লে—কি বল্‌বে বল।"

"যা না।—তুই তাকে টেনে নিয়ে আয়—"

সুশীলা তাহাই করিল।

রমেশ বলিল—"আমায় আবার কেন তুমি এখানে টেনে নি এলে?"

"ব'স, ঐখানে বিছানার ওপর।"

"আমার তাড়াতাড়ি।—তুমি কি বল্‌বে বল—"

"ব'স্‌বে না?—দাঁড়িয়ে থাক্‌বে?"

"বল, কি বলবে—"

সুন্দরী কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ কাঁদিল। রমেশ কহিল,—"আমি যাই—"

"সুশীলা!—দাঁড়াতে বল্‌—আর একটু।—বাইরে—"

বাহির হইতে রমেশ ডাকিল—"সুশীলা!"

"জিজ্ঞেস্‌ কর—পান খাবে কি না—"

রমেশ জানাইল—"আপত্তি নাই।"

সুন্দরী পানের ভিতর কি দিল।

"এই নে—জোড়া খিলি।"

"দিদিমণি, দোহাই তোমার!—ও আমি কিছুতেই পারব না।"

"দেখ সুশীলা!—আমরা বেশ্যা।—নে ধর—দিগে যা—"

সুশীলা হাতে পান লইল কিন্তু নড়িল না।

"যাবি নে?"
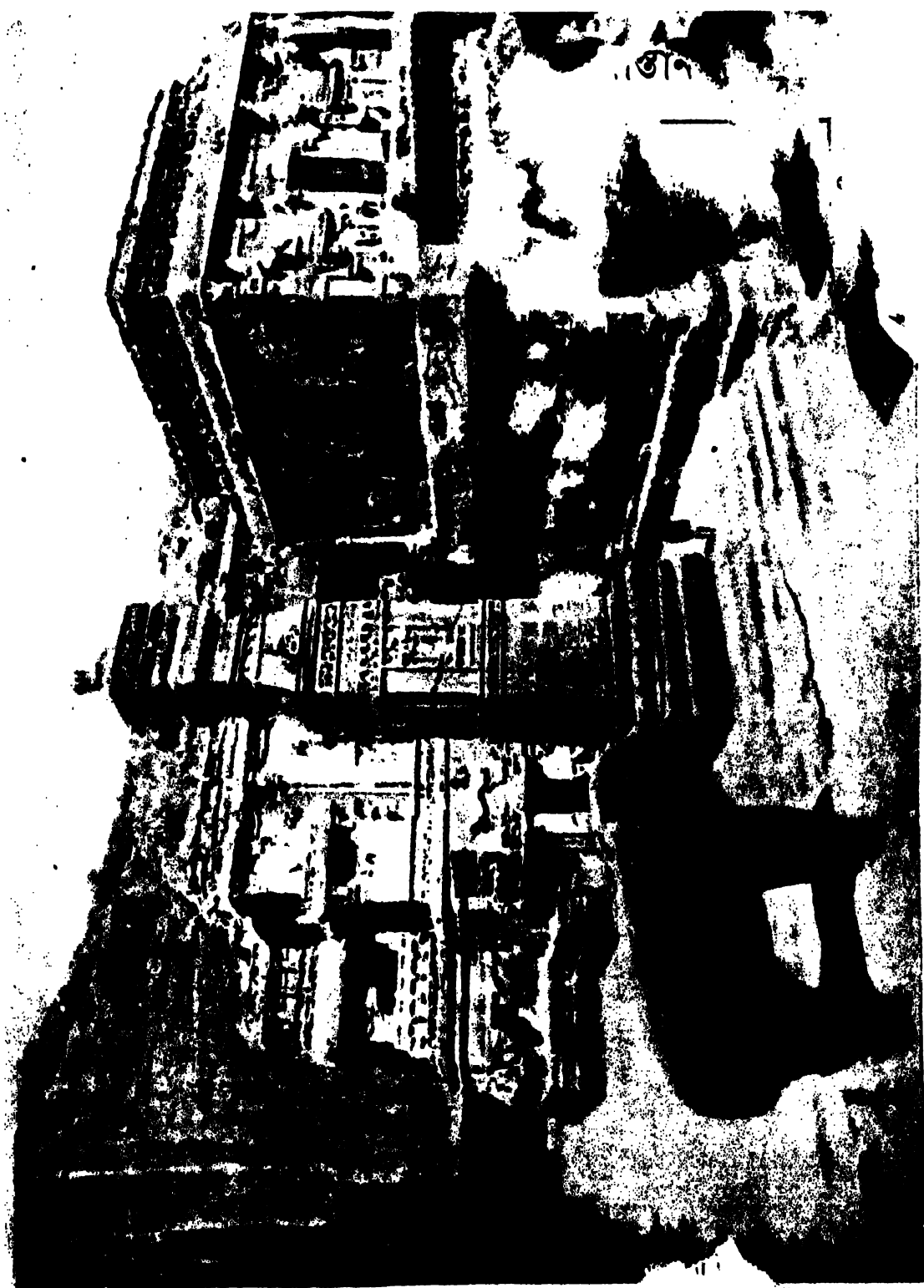
ইলোরার কৈলাস গুহা মন্দির—দক্ষিণ ভারত।

সুশীলা গিয়া রমেশকে পান দিল—এক খিলি, আর একখিলি লুকাইল। সুযোগ বুঝিয়া সুন্দরীকে খাওয়াইল। ভাবিল 'বিষে বিষক্ষয়।'

দু'দিন গেল।

সুন্দরী বলিল—"সুশীলা!—তুই যেন আমায় কিছু বল্‌তে চাস—সাহস পাচ্ছিস না। আজ দু'দিন তুই যেন কেমন হ'য়েছিস্।"

"আমি চল্‌লুম।"

"কোথায়?"

"যেখানে দু'চোখ যায়—"

"তুই কি বলছিস্ আমি বুঝতে পারছি না মোটে।"

"আমি দেশে যাব—"

"সেখানে তোর কে আছে?—কেন?"

"পরকালের ভাবনা পড়েছে এবার মাথায়—"

"তোর আবার পরকাল!"

"আজই—"

"এত বড় সহরে ঝির অভাব হবে না।"

সুশীলা জীবনে আর কলিকাতায় পদার্পণ করে নাই।

উর্ব্বশী রমেশকে ধম্‌কাইল—"কেন তুমি ফের সেখানে গিছলে? খবরদার,—আর কখনো যাবে না বল্‌ছি—"

রমেশ খালি তার আলো-করা মুখের দিকে চাহিল আর তার ভ্রমরের মত কালো চোখের দিকে।—এমনি সে রূপের শাসন!

খোকার ঠোঁট কাঁপিল—"বাবা!—মা তোমায় ব'কেছে?"

আদর করিয়া সে রমেশের চুমা খাইল।

মায়ের কোলে গেল—"মা তুমি বাবাকে বকেছ?"

মায়েরও চুমা খাইল!

ফুটন্ত গোলাপ! উর্ব্বশী ... [illegible] চা... ধরিল। তার পর ... [illegible] চুমা পর চুমা খাইল—কত যে ... নাই।

রমেশ সংসারের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে ডুব দিল।

২

সে একদিন—অনেক পরে—প্রায় এক বৎসর। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি বিবাহিত?"

রমেশ বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ!—একটি ছেলে—"

"কত বড়?—বয়েস?

"তিন চার বছর।"

"অন্যায় ক'রেছেন।"

ডাক্তারবাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা! আপনার বাবার কখনও—"

"আজ্ঞে না। দেব-চরিত্র ছিল তাঁর—"

রমেশ অধৈর্য্য হইল। "কি রকম বুঝছেন আপনি?"

"Leprosyর পূর্ব্বলক্ষণ—"

রমেশের মুখখানা কালো হইল। খুব কালো।

ডাক্তারবাবু নিজেই বলিলেন,—"ইন্‌জেক্‌সন নিতে হবে।"

"তবে আজ আসি—নমস্কার!"

"Hallo রমেশ! তুমি!"

"এঁ—হাঁ ভাই! এলে কখন? ভালো? আমি—বড্ড তাড়াতাড়ি—"

রমেশ কৃত্রিম হাসিয়া গাড়ীতে বসিল।

"কে—এ, শচীন যে!"

"আজ্ঞে হাঁ ডাক্তারবাবু! নমস্কার।"

"বেশ, বেশ! এলে কখন? খবর ভালো? ব'স, ব'স—"

"আজ্ঞে হাঁ—খবর ভালো, অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! আমি আজ অবাক ...

"কি রকম ?"

"কি সুন্দর চেহারা ছিল রমেশের—ঐ ছোক্‌রার! আমি ত' চিন্‌তেই পার্‌ছিলুম না মোটে।"

"ওঁর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে না কি ?"

ডাক্তারবাবু চেয়ারে বসিলেন।

"আলাপ! ও জমীদারের ছেলে—সে একটা History—আচ্ছা ও আপনার কাছে এসেছিল কি জন্যে ?"

"এসেছিল Blood Examine করাতে। সর্ব্বাঙ্গে ইরাপসন!"

"তাই না কি!—আমারও সেই রকম একটা কিছু মনে হয়েছিল।"

শচীন মনে মনে দুঃখ অনুভব করিতে লাগিল।

"আচ্ছা ওঁর স্বভাব-চরিত্র-সম্বন্ধে তুমি কিছু জানো ?"

"জানি না ? খুব জানি। স্বভাব-চরিত্র ওর ভালই ছিল! ওকে মাটী ক'রে ফেলেছে—একটা বেশ্যা; চেহারা তার তত মন্দ ছিল না। খুব রূপসী মেয়ে দেখে, বাড়ীতে ওর বিয়ে দিয়ে দেয়। শুনেছিলুম শুধরেচে।—হালের খবর বড় বেশী জানি না।"

"আচ্ছা তুমি ভেতরে যাও।—আমায় একটু বেরুতে হবে;—call আছে।"

ডাক্তারবাবু উঠিলেন, কম্পাউণ্ডার বলিল, "গাড়ী তৈরি—"

* * *

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলেও বেশ্যা। বিছানায় বসিতে ডাক্তার বাবুর ঘৃণা হইল। সুন্দরী সর্ব্বাঙ্গ খুলিয়া দেখাইতে লাগিল।

ডাক্তার বাবু হাসিলেন। কম্পাউণ্ডারের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"The same".

কম্পাউণ্ডারও একটু হাসিল।

"ডাক্তারবাবু!—ভালো হবে ?"

জোর গলায় ডাক্তারবাবু বলিলেন—"ইনজেক্‌সন নিতে হ'বে।"

"ডাক্তারবাবু! যেমন ক'রে হ'ক আমায় ভাল ক'রে দিন। যথাসর্ব্বস্ব আমার—কলকাতার বাড়ী—টাকা পয়সা যা কিছু—"

"একেবারে ভালো না হ'ক—ঠিক সময়মত ইনজেক্‌সন্‌ নিলে—আর বাড়বার ভয় থাক্‌বে না।"

"আজ তা হলে—"

"আজ আর হ'বে না!—কাল আসতে হবে।"

সুন্দরী ডাক্তারবাবুকে টাকা দিল।

"ডাক্তারবাবু!—রমেশ ব'লে কোন বাবু—জমীদারের ছেলে—কিছুদিনের মধ্যে সে আপনার কাছে—"

"রমেশ!"—ডাক্তারবাবু সুন্দরীর মুখের দিকে চাহিলেন।—ঘৃণায় তাঁহার নাসিকা কুঞ্চিত হইল।

সুন্দরী ব্যথা পাইল। কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া ভাবিল—"ডাক্তার!—তবু এত ঘৃণা!—একদিন কত ডাক্তার রাজা জমীদার সুন্দরীর পায়ে লুটিয়েছিল।—সুশীলা!—ঘুচিয়েছিস তুই আমায়—"

এবার জগতের লোকে তাহাকে ঘৃণা করিবে ভাবিয়া সুন্দরী শিহরিয়া উঠিল। সে কাঁদিতে লাগিল। একটা জঘন্য আশা তখন তাহার প্রাণকে শান্ত করিল—চিরদিন সে যাহাকে চাহিয়াছে—যাহার জন্য সে পাগলিনী, সর্ব্বাঙ্গ গলিয়া গেলেও হয় ত ইচ্ছা করিলে একদিন সে তাহাকে পাইতে পারিবে।"

৩

বাপের বাড়ীতে উর্ব্বশী, রমেশের 'দু'চার মাস পূর্ব্বেকার একখানা চিঠি খুলিয়া পড়িতেছিল।

চিঠিতে লিখিত নিম্নলিখিত কতকগুলা কথা তাহার মনে নানারূপ সন্দেহ জন্মাইতেছিল।

"——কিছুই ভাল লাগে না আর,—সংসারের সবই যেন বিষ বোধ হচ্চে।—মানুষের এমন সময়ও আসে যখন মরণটাও তার কাছে নেহাৎ সোজা ব'লে মনে হয়।—আজ আমার রূপ আছে তাই বল্‌ছ কত আরাধনা ক'রে তোমায় পেয়েছি;—কাল যদি সর্ব্বাঙ্গ আমার গলিত কুষ্ঠে ভরে যায়,—ঘৃণায় মুখ ফেরাবে;—বল্‌বে যে কত পাপ ক'রেছিলাম তাই এমন স্বামী হ'য়েছে।—তোমায় সতী সাধ্বী জেনে, সংসারের অন্তরালে কোথাও ব'সে চিরদিন তোমার কথা মনে মনে ভাবতে পারতুম, তা হ'লে বোধ হয় জীবনে সুখী হ'তে পারা যেত—। বিরহানলে চিরদিন জ্বালালে তবে প্রেম খাঁটী হয়। —সংসারের যা কিছু সব মিথ্যা।—সাধারণ মানুষে যা ভাবতে পারে না—তাই সত্য।—বাস্তবকে ভোলবার চেষ্টা করবে।—কয়েক ঘণ্টা মাত্র যে দেহ প্রাণহীন পড়ে থাক্‌লে পচে ধ্বসে যায় তার আবার ভাল মন্দ!—দেহ মনকে পৃথক না ভাবতে পারলে—বুঝি শান্তি নাই।—সংসারের সব কিছু মনে পড়ার আগে আমার খোকামণিকে মনে পড়ে;—তাকে ভুল্‌তে পারলেই আমার সংসারের সকল বাঁধন ছিঁড়ে যাবে—পূর্ব্বজন্মে অনেক পাপ করেছিলাম আমি। সর্ব্ব কার্য্যে সকল সময়ে শ্রীভগবানকে স্মরণ করবে, আমাকে আর সংসারে আবদ্ধ রাখবার চেষ্টা করো না—।

রমেশ ভাবিতেছিল—কতদিন আর এমন ক'রে গোপন ক'রে রাখব? একদিন ত ঐ অবস্থা হ'বেই—ঐ পথের কুষ্ঠী!—অমনি ঘৃণ্য!—আচ্ছা, ওকে কেন ঘৃণা করে সব? ওর কি অপরাধ?—আমাকেও একদিন ঐরূপ হ'তে হবে—সব সহ্য হবে কিন্তু উর্ব্বশী,—প্রিয়তমা উর্ব্বশী আমার,—সে আমায় ঘৃণা করবে;—আমায় স্পর্শ করতেও—। আত্মহত্যা?—না, অনেকে ত ভালও হয় শুনেছি। আমার ত তত খারাপ নয়—

"বাবা রমেশ!"

"মা?"

"দিবানিশি মন খারাপ ক'রে থেকো না;—মাণিক আমার!"

"মন কেমন ক'রে ভাল রাখব বল মা?"

"কেন বাবা, কি হ'য়েছে তোমার?—ভাবনা কিসের?—ও কিছু নয়। কত লোকের এমন হয়ে থাকে,—আবার ভাল হ'য়ে যায়। ডাক্তারেরা ব'লেচে—সব সেরে যাবে। ওরা না পারে আমি তোমার জন্যে বিলেত থেকে ডাক্তার নিয়ে আসব—"

"মা!—তুমি জান ত—এ ব্যাধি অসাধ্য। জগতের অস্পৃশ্য—"

আপন অশ্রু সংবরণ করিয়া মাতা, বস্ত্রাঞ্চলে পুত্রের চক্ষু মুছাইলেন।

"ছুঁয়ো না মা তুমি আমায়!—সকলকে পেরেছি তোমাকে পার্‌লুম না—"

মাতা রমেশকে বুকের ভিতর টিপিয়া ধরিয়া হো হো করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

একদিন রমেশ গভীর দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে মাতাকে কহিল—"মা!—সবাই জানুক আমি কুষ্ঠী,—কিন্তু আমার স্ত্রী পুত্র—"

উর্ব্বশী আসিয়া রমেশকে দেখিতে পাইল না;—শুনিল সে দার্জ্জিলিং গিয়াছে।

খোকা—ঝি চাকর সকলকে চাবুক লাগাইয়া বেড়াইতে লাগিল—"বল্‌ তোরা—আমার বাবা কোথায়?—"

সন্ধ্যা হইলে খোকা ঠাকুরমার কোলে বসিয়া তাঁহাকে 'বাবার গল্প' বলিতে বলিল।

"বাবা কোথায় গেছে ঠাকু' মা ?"

"বাবা তোমার,—দার্জ্জিলিং গেছে।"

"আমার বাবা কখন আসবে আবার ?"

"একমাস পরে।"

"একমাস কতদিন ঠাকু' মা ?"

"একমাস ?—একমাস বেশীদিন নয়—"

"আমার বাবা, কি নিয়ে আসবে ঠাকু' মা আমার জন্যে ?"

"তোমার জন্যে ঘোড়া আনবে, বল আনবে, সাইকেল আনবে—"

"আর কি আনবে ?"

"আরও কত কি আনবে।"

"ঘোড়ায় আমি চড়তে পারব না—বড্ডো লাথি মারে।"

"আচ্ছা তুমি বড় হ'লে ঘোড়ায় চড়ো।"

"হ্যাঁ ঠাকু' মা! সাইকেলে আমায় কে চড়িয়ে দেবে ?—বাবা চড়িয়ে দেবে ?"

উর্ব্বশী আসিয়া বলিল—"মা! আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার মনে হচ্চে যেন আপনারা আমায় কিছু গোপন করছেন। আমি আসছি শুনে কেন তিনি দার্জ্জিলিং চলে গেলেন ?"

উর্ব্বশী অভিমানে ফুলতে লাগিল।

শাশুড়ী আদর করিয়া, পুত্রবধূকে পার্শ্বে বসাইলেন। কতক গোপন করিয়া কতক প্রকাশ করিয়া ব্যাপার বলিলেন।

উর্ব্বশী বলিল—"বুঝেছি।"

উর্ব্বশীর মুখের ভঙ্গী দেখিয়া শাশুড়ীর ভাল বোধ হইল না!

"বুঝেছি মা,—তাই তাকে পরামর্শ ক'রে আপনারা সংসার থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন!"

"বৌ মা!"

"আমি যাব সেখানে। আজই আমায় পাঠিয়ে দিন তার কাছে। সবাই তাকে ঘৃণা করবে—সংসার থেকে বহু দূরে সে পড়ে থাকবে সকলের অস্পৃশ্য হয়ে; মা তোমার পায়ে পড়ি; ওগো আমায় সেইখানে নিয়ে চল। আমি থাকতে তার—"

রমেশকে সংবাদ জানান হইল—বৌমাকে সঙ্গে লইয়া মাতা শীঘ্রই তাহার নিকটে যাইতেছেন।

যাইবার আগের দিন বৃদ্ধ গোমস্তা দার্জ্জিলিং হইতে ফেরত আসিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে কহিল, "তিন চার দিন হ'ল দাদাবাবুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি কি এখানে এসেছেন ?"

দেখিতে দেখিতে রাজপুরীর মত ধপ্ ধপে সাদা প্রকাণ্ড বাড়ীখানা, শোকের কালো সমুদ্রে ডুবিয়া গেল।"

৪

আজ দশ বৎসরেও রমেশের কোন সন্ধান মিলে নাই। সবাই জানে সে মরিয়া গিয়াছে। আমি জানি—সে এই কিছুদিন পূর্ব্বেও জীবিত ছিল। কলিকাতা সহরে আমি তাহাকে দেখিয়াছি। কাল তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

রমেশদের বাড়ীর সামনে ফুটপাথের উপর যে একজন গলিত কুষ্ঠী বসিয়া থাকিত—হাতে পায়ে ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড জড়ানো—সেদিন কে একজন চাবুক লাগাইয়া তাহার পিঠ ফাটাইয়া দেওয়ায় সে যন্ত্রণায় তিন দিন গড়াগড়ি দিয়া চীৎকার করিয়াছিল; এই দু'দিন আগে তাহাকে কতকগুলা লোক জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া কুষ্ঠাশ্রমে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল সে-ই—রমেশ।

রমেশ স্ত্রী-পুত্রের মায়া কাটাইতে পারে নাই। সে আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ গলিয়া গিয়াছে; হাতের পায়ের আঙুল খসিয়া গিয়া, নাক কান ফুলিয়া তাহার চেহারা একেবারে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। তখন

তাহাকে চিনিবার কিছুমাত্র উপায় ছিল না; তখন সে সম্যকরূপে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, জীবনের তাহার আর বেশী দিন বাকি নাই।

নরক-যন্ত্রণা ভোগ যদি মানুষের ইহজীবনেই হইয়া থাকে এবং রমেশের ব্যাধি-যন্ত্রণাকে যদি পুৎ নামক নরক-যন্ত্রণা বলিয়া ধরা চলে, তাহা হইলে পুত্রের পুত্র নামের যাথার্থ্য কতটুকু তাহা কেবল এ সংসারে রমেশই বুঝিয়া গিয়াছে। শৈলেশকে দেখিয়া রমেশ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাধি, যন্ত্রণা সমস্তই ভুলিয়াছিল। দশ বৎসর ধরিয়া যে মনকে সে তাহার মুহূর্ত্তের জন্যও দেহ হইতে পৃথক রাখিতে পারে নাই, পঞ্চদশবর্ষবয়স্ক বালক পুত্রের কুসুম সুকুমার মূর্ত্তি তাহার সেই মনকে বুঝি চিরদিনের জন্যই দেহের কথা সম্পূর্ণ ভুলাইয়া দিয়াছিল। রমেশ প্রতিদিন বাতায়ন-পথে উর্ব্বশীকে দেখিতে পাইত, প্রতিদিন তাহার মনে হইত যেন তাহার অন্ধকারাচ্ছন্ন সংসার-আকাশে একটা নিবে যাওয়া পূর্ণিমার চাঁদ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। সে ইহাও কোনপ্রকারে জানিতে পারিয়াছিল যে তাহার মাতা এখনও জীবিত কিন্তু শয্যাশায়িনী।

বাড়ীর দরওয়ানেরা আসিয়া একদিন রমেশকে দূরে কোথাও সরিয়া যাইতে বলিল। রমেশ অনেক মিনতি করিল—তাহারা শুনিল না। একজন একটা চাবুক লইয়া আসিল। চাবুক তুলিয়া ভয় দেখাইয়া কহিল—"নিকালো শালা আভি হিঁয়াসে।"

শৈলেশ স্কুল হইতে ফিরিতেছিল। সে বলিল—"কে তোমাদের ওকে তাড়াতে ব'লেছে?"

দরওয়ানেরা কহিল—"মাইজী বোলা বাবু!"

রমেশ বুঝিল উর্ব্বশীর আদেশ।

শৈলেশ উর্ব্বশীকে ধমকাইয়া বলিল—"মা!—কেন তুমি ওকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে ব'লেছ? আমি খাব না কিছু।"

"বাবা! দিবানিশি আমার চোখে পড়ে—দেখে আমার মনে বড্ড কষ্ট হয়; তাই স'রে যেতে ব'লেছি।"

উর্ব্বশী শৈলেশের মুখের কাছে খাবার ধরিল।

"আমি খাবো না বলেছি।"

শৈলেশ খাবার লইয়া নীচে নামিয়া গেল। রমেশকে খাওয়াইল।

রমেশের চক্ষু দিয়া কেবলই জল ঝরিতেছিল। শৈলেশ ব্যথা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কাঁদছ কেন?"

"বাবা—ব্যাধির যন্ত্রণা।"

দুই হাত যতদূর সম্ভব বাড়াইয়া রমেশ পুত্রকে দেখাইল।

ইহার পর আর চার পাঁচ দিন মাত্র রমেশ বাঁচিয়া ছিল। হয় ত বা সে আরও কিছুদিন বাঁচিতে পারিত। যে কারণে তাহাকে এত শীঘ্র মরিতে হইল—সে কারণের উল্লেখমাত্রই যথেষ্ট হইয়াছে। মানুষ হইয়া মানুষের প্রতি কি ভীষণ নৃশংসতা! থাক সে সব। আমি শুধু এইটুকু বলিয়াই আজ আমার গল্প শেষ করিব যে, স্বেচ্ছা-সেবকেরা ঠিক সময়েই রমেশকে কুষ্ঠাশ্রমে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়াছিল, নতুবা সুন্দরীর বাসনা চিরদিনের জন্য অপূর্ণ থাকিয়া যাইত।

অতঃপর রমেশের কি হইল তাহা জানিবার কৌতূহল আমি দমন করিতে পারি নাই। প্রভাত না হইতেই আমি কুষ্ঠাশ্রমে হাজির হইয়াছিলাম। দেখিলাম, এখানে সেখানে অনেক কুষ্ঠী পড়িয়া ঘুমাইতেছে। রমেশও রহিয়াছে। রমেশের পাশে আর একটা কুষ্ঠী মেয়ে মানুষ রমেশের কাছ ঘেঁসিয়া ঘুমাইতেছে। সুন্দরীকে আমি চিনিতাম। এ সেই সুন্দরী। রমেশের দেহে তখন প্রাণ ছিল না।

গল্প

জন্মভূমি

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল

সর্দ্দার আলিবেগ মোগল সম্রাটের সেনা-নায়ক। বুঁদির প্রাচীরের বাহিরে নক্ষত্র-ভরা আকাশের তলে বহু দূর অবধি মোগল শিবির এক বিচিত্র শোভার সৃষ্টি করিয়াছিল। বুঁদির সহর-পরিখার প্রতি লোভ-লোলুপ দৃষ্টিতে অসংখ্য মোগল-কামান মুখব্যাদান করিয়া বসিয়াছিল। বাদশাহী লস্কর সদাই প্রস্তুত—সর্দ্দার আলি বেগের আদেশ পাইলেই বুঁদি আক্রমণ করিবে।

সর্দ্দারের মুখে বিরক্তি, মনে দুশ্চিন্তা। মেবার-অভিযান হইতে ফিরিবার সময়, অদম্য উচ্চাভিলাষ এই ক্ষুদ্র রাজ্যের তুচ্ছ স্বাধীনতাটুকু হরণ করিতে তাঁহাকে প্রণোদিত করিয়াছিল। হারাবংশীয় এক রাজকুমার ছিল তাঁহার বিভীষণ। কিন্তু বুঁদির প্রাচীরের উপর একপক্ষকাল গুলিবর্ষণ করিয়া সর্দ্দার যখন দেখিলেন, এই পার্ব্বত্য-দুর্গ এত সহজে মোগল করায়ত্ত হইবে না, তখন তিনি বিভীষণ কেশর সিংহের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। কোনও ছল করিয়া নিজের বাহিনীকে সসম্ভ্রমে সরাইতে না পারিলে পিছন হইতে মেবার-সৈন্যের আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। তখন অপর দিক হইতে বুঁদির বীরেরাও তাঁহাকে টিপিয়া ধরিবে। মোগল-বাহিনী জাঁতার মধ্যে পিষিয়া মরিবে—এই অশুভ কল্পনা সর্দ্দারকে আকুল করিল। তিনি কেশর সিংহকে ডাকিয়া বলিলেন,—"রাজকুমার! দিল্লী হ'তে সম্রাটের আদেশ এসেছে, কালই আমরা শিবির ভেঙ্গে আগ্রার পথে রওয়ানা হ'ব।"

কেশর কহিল,—"সে কি আগা সাহেব! কাল থেকে যে রাজপুতানা হোলির আমোদে মগ্ন হবে।"

"মানে মানে ঘরের ছেলে ঘরে ফেরবার সেই তো সুযোগ। পরে যখন আসব, বুঁদির ঐ আকাশ-চাওয়া কেল্লার উপর মোগল-ধ্বজা উড়িয়ে যাব।"

কেশর বলিল, "না সর্দ্দার সাহেব তা হ'তে পারে না। রাজপুত হোলির উৎসবে আত্মহারা হবে। তখন উত্তরের প্রাচীরের দিকে ভয় দেখিয়ে দক্ষিণ দিক দিয়ে অবলীলাক্রমে সহরে প্রবেশ ক'রতে পারবেন।"

বুঁদি সহর—উপত্যকায়

সর্দ্দার বলিল,—"এ যুদ্ধে আমার কোনও লাভ নাই—কুমার! আমার প্রভুরও নাই। সিংহ-শিকারে এসে রিক্তহস্তে না ফিরে ছুটো বন্য-বরাহ মারার মত এ আমার খেলা।"

"কিন্তু আমার পক্ষে এ জীবন-মরণের খেলা সর্দ্দার সাহেব! আমি স্বদেশ-দ্রোহী—স্বজাতি-দ্রোহী হয়েছি জীবন পণ করে"—

সর্দ্দার সাহেবের মুখে আসিতেছিল—"তোমার ব্যবস্থা তোমার রাজা ডালকুত্তার সাহায্যে করবেন।" কিন্তু আত্মসংযম করিয়া বলিলেন—"কুমার বাহাদুর! দেশে ফেরা আপনার পক্ষে অসম্ভব হয় তো দিল্লী চলুন। আপনি তো বাদসাহের চরণ-সেবায় আত্মনিয়োগ করতে রাজি হয়েছেন। বুঁদির সিংহাসনে বসে পরোক্ষভাবে সে কাজ না ক'রে সাক্ষাতেই করবেন।"

নৈরাশ্যের বিভীষিকা বিভীষণকে ব্যাকুল করিল। সে সাধ্য-সাধনা করিল, সর্দ্দারের পদধারণ করিল, রাজ্যের লোভে দেশত্যাগী হইয়া দেশের শত্রুর সঙ্গে মিশিয়াছে—আবার স্বার্থসিদ্ধির জন্য বাদসাহী পল্টনের ললাটে পরাজয়ের কলঙ্ক-কালিমা লেপিয়াছে। তাহার পক্ষে বুঁদি ও দিল্লী উভয়ই সমান; কাহারও কোলে তাহার স্থান নাই—দুইয়েরই আশা তাহার নষ্ট হইয়াছে। সে বলিল—"মাত্র একদিন সর্দ্দার সাহেব—মাত্র একদিন।"

সর্দ্দার বলিলেন—"আচ্ছা আমি পরশু প্রাতে শিবির ভাঙ্গব।"

কুমার বলিল—"আমি আজ ছদ্মবেশে বুঁদি প্রবেশ করব। আমি স্বচক্ষে দেখব প্রাচীরের প্রহরীদের। যদি কোনও দিকে সুবিধা থাকে, পরশু প্রাতে সে দিকে সহর আক্রমণ করব। আর যদি অসম্ভব বিবেচনা হয়, সংবাদ দিব, আপনি দিল্লী যাত্রা করবেন।"

"সংবাদ আনবে কে? মোগলকে নির্ব্বোধ ভাববেন না কুমার সাহেব! যদি আক্রমণ করতে হয়, আপনি আমার নিকটে থাকবেন, আপনার হিসাব ভুল হয়ে যদি মোগল ফৌজের একটি সৈনিকও নষ্ট হয় তা' হলে"—

"বুঝেছি। আমার প্রাণ দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। যদি আক্রমণ করতে হয় তো আমি স্বয়ং পথ-প্রদর্শক হব।"

"আর যদি আক্রমণ না করতে হয়—"

"সংবাদ পাবেন। নিজের পক্ষে বাহিরে আসা যদি সম্ভবপর না হয়—ঐ পাহাড়ের চূড়ার উপর ঠিক দুপুর রাতে একটা আগুনের শিখা দেখতে পাবেন। তখন থেকে শিবির ভাঙ্গতে আরম্ভ করলে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে রওয়ানা হতে পারবেন। আর যদি শিখা না দেখেন—অপেক্ষা করবেন। বান্দা প্রত্যাবর্ত্তন করবে।"

"বহুৎ আচ্ছা।"

২

নিশাচরের মত রাজকুমার কেশর সিংহ বুঁদির প্রাচীরের ছায়ার নীচে ঘুরিতেছিল। তাহার খুল্লতাত প্রতাপসিংহ তাহাকে পদাঘাত করিয়াছিল—সেই বিষের জ্বালায় সে জ্বলিতেছিল। আজ তাহার কাঠুরিয়ার সাজ—হাতে কুঠার, শিরে মলিন পাগড়ী। এই বেশে পুরী-প্রবেশ সম্ভবপর। কারণ সহর-তোরণের এক ক্ষুদ্র দ্বার হইতে বাহির হইয়া ঐ শ্রেণীর লোক অন্ধকারে কাঠ কাটিতে আসিত। মোগলও তাহাকে মারিত না—রাজপুতও প্রভাতে তাহাকে সহরে প্রবেশ করিতে দিত।

শিরে বাবলার মোট লইয়া কেশর সিংহ একদল কাঠুরিয়ার সঙ্গে মিশিয়া তোরণের বাহিরে রজনীর অবশিষ্ট অংশ যাপন করিল। তাহাদের কথাবার্ত্তায় যাহা বুঝিল তাহাতে কেশরের প্রাণ আশায় নাচিয়া উঠিল। জন্মভূমি অন্নাভাব-ক্লিষ্ট। বীরেরা আর পিঞ্জরাবদ্ধ থাকিতে চাহে না। দুই একদিনের

মধ্যেই তাহারা সহরের বাহিরে আসিয়া মোগল ফৌজের সম্মুখীন হইতে কৃত-সঙ্কল্প। তাহারই সাজ-সজ্জা চলিতেছিল।

সিংহের সম্মুখে পিঞ্জরাবদ্ধ মূষিক বাহির হইলে তাহার কি দশা হইবে তাহা ভাবিয়া আনন্দে কেশর সিংহের হৃদয় উৎফুল্ল হইল। খুল্লতাতের খণ্ডিত শির বর্শার ফলকে বিদ্ধ হইয়া তাহার মানস-পটে তা থিয়া তা থিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। হারা-বংশের গৌরব, তাহার উপর মোগলের সখ্য—রাজপুত রাজন্যবর্গের আক্রমণের আতঙ্কহীন রাজসিংহাসন যুবকের প্রাণে সুখের লহর তুলিতে লাগিল। কাঠু-রিয়াদের কথাবার্ত্তায় সে বুঝিল, এই মাসাবধি পরি-খার উপর হইতে মোগলের তোপের প্রত্যুত্তর দিয়া রাজপুতের বারুদের পুঁজিও ভীষণভাবে কমিয়াছে।

ভিতরে গিয়া স্বচক্ষে সকল অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শিবিরে ফিরিবে কিম্বা এখনই পলাইবে —সে তর্ক তাহার হৃদয়কে আলোড়িত করিতে লাগিল। রজনীরও অন্ত হইল। পূর্ব্বাকাশে কতকটা আলোক দেখা দিল। সতর্ক প্রহরী তোরণ-দ্বারে হুঙ্কার দিল। কাঠুরিয়ার দল "বম্ বম্ শিব শম্ভু" বলিয়া চীৎকার করিল। একটি ক্ষুদ্র দ্বার খুলিয়া প্রহরী সকলকে সহরের মধ্যে ডাকিয়া লইল—তাহাদের পরীক্ষা আরম্ভ হইল। কাঠের অন্তরালে প্রায় সবারই নিকট বস্তা-ভরা আটা। কেবল কেশর সিংহের শিরে শুষ্ক কাঠ। প্রহরী তাহাকে গালি দিল। ছিঃ! ছিঃ! সে কি রাজপুত নয়—দেশের এই দুর্দ্দিনে সে দেশ-দেশান্তর হইতে এক মোট আটা সংগ্রহ করিতে পারে নাই।

প্রভাতে রাজপুত-কুলবধূরা মন্দিরে মন্দিরে দেবার্চ্চনা করিতেছিল—সকলের মুখ গম্ভীর, সকলের মুখে দুশ্চিন্তার রেখা বুভুক্ষার ছায়া। কিন্তু ঐকান্তিকতা সকলের মুখে, দেশের কল্যাণের শুভ ইচ্ছা যেন নরনারীর চক্ষু ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

এইবার যেন কলঙ্ক গুমরিয়া উঠিতে লাগিল কুমারের অস্থি-মজ্জার ভিতর দিয়া। দেশাত্মবোধ তাহার মাতৃ-ভূমির গগনে পবনে একটি পবিত্র তরঙ্গের সৃষ্টি করিতেছিল। আত্ম-গ্লানিতে তাহার সারা প্রকৃতি ভরিয়া উঠিল। একজন সামান্য সৈনিক নিজের সুকুমার শিশুকে সস্নেহে মুখ-চুম্বন করিয়া বলিল,—কে জানে তোর পিতার ভাগ্যে কি আছে? সে হয় ত মাতৃ-ভূমির জন্য প্রাণ দিয়া দুইদিনের মধ্যেই স্বর্গবাসী হইবে।

কেশর তাহার আপনার পুত্রের কথা ভাবিল—চারি বৎসরের সিংহ-শিশু। সে তাহার শত্রুর কবলে। কে জানে তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া এত-দিন তাহার খুল্লতাত, শিশুর কি দুর্গতি করিয়াছে? প্রকাশ্য রাজপথে আর সে সাহস করিয়া যাইতে পারিল না, পরিখার তলে তলে সহরের ভিতর ঘুরিল। বুঝিল, সত্যই মোগলের আক্রমণের ভর সহিবে না তাহার স্বদেশ। কিন্তু সেই শ্মশানের রাজা হইয়া তাহার লাভ কি? সে ভাবিল—না, জন্মভূমির অমঙ্গল করিব না; পলাইয়া গিয়া মোগলকে বলিব—বসিয়া থাকা বৃথা, বুঁদি দখল হইবার নয়।

সে ফটকের দিকে গেল। বুঁদিতে তাহার স্থান নাই। সে পশ্চাতে চাহিল। কি বিড়ম্বনা! এ কাঠুরিয়া তাহার সঙ্গ ছাড়ে না কেন? তবে কি—? সে শিহরিয়া উঠিল।

সে পিছন ফিরিয়া বলিল,—"ভাই কোথা যাবে?"

কাঠুরিয়া বলিল,—"রাজপ্রাসাদে।"

"রাজপ্রাসাদে! কেন রাজপ্রাসাদে কেন?"

"রাজাকে সংবাদ দিতে।"

"কি সংবাদ ?"

"নরাধম বিশ্বাসঘাতক স্বদেশদ্রোহী কুক্কুর কেশর সিং আরও কি সর্ব্বনাশ করতে কাঠুরিয়ার বেশে দেশে ফিরছে।"

"ও: নরেন্দ্র সিং! ছদ্মবেশে তোমায় মানিয়েছে ভাল। চল।"

৩

আবার নূতন উত্তেজনা। বিভীষণ ধরা পড়িয়াছে। নরেন্দ্র সিংহ তাহাকে রাজ-দরবারে আনিয়াছে। কাঠুরিয়ার বেশে হাবা-বংশীয় রাজ-কুমার আজ মোগলের গুপ্তচর! কেহ বলিল শূলে দাও; কেহ বলিল, তুষানল; কেহ ব্যবস্থা করিল, করাতে চেরা।

রাজা স্বয়ং সেই সমস্যায় পড়িলেন—কিরূপ প্রাণদণ্ড এ বিভীষণের উপযুক্ত ?

কেশর সিংহ বলিল —"যদি আমার তিনটা অনুরোধ রক্ষা কর, আমি মৃত্যুর পূর্ব্বে বুঁদির কিছু উপকার করিব।"

বুঁদির দুর্গ

কে তাহাকে বিশ্বাস করিবে? সে বলিল—"যদি আমার প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হয়, আমার পুত্রের প্রাণ বধ করে তবে মোগলের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হ'ও।

সর্ত্তটা সকলে শুনিল। যদি কেশর সিংহকে বধ্যভূমি, মৃত্যুকাল ও মৃত্যুর প্রকার বাছিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে মোগলকে সরিয়া যাইতে বলিবে। যদি পরদিন প্রাতে মোগল শিবির না ভাঙ্গে, তবে বুঁদিবাসী তাহার পুত্রকে হত্যা করিতে পারিবে।

এ বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য রাজা তাহাকে বধ্যভূমি নির্ণয় করিতে দিতে স্বীকৃত হইতে পারেন, সে কি উপায়ে মরিবে তাহাও তিনি তাহাকেই স্থির করিতে দিতে পারেন, কিন্তু মৃত্যুকাল—

কেশর বলিল—"আমি কাল প্রভাতে আর সূর্য্য-দেবকে মুখ দেখাব না। কিন্তু রাত্রে যে কোন মুহূর্ত্তে মরিব।"

"তথাস্তু।"

সে বলিল—অগ্নি আর্য্যজাতির দেবতা; আমি চিতারোহণ করিব।

বিশ্বাস-ঘাতকের এ প্রকার মরণ—গৌরবের মরণ কিন্তু রাজা নাচার; রাজপুতের কথা ফিরিবার নয়।

"ভাল। বধ্যভূমি ?"

"শৈল-শিখর।"

"সময় ?"

"ঠিক মধ্যরাত্রি।"

"বেশ কথা! হর হর মহাদেব।"

কেশরের মনের বোঝা নামিল—জয় মহাদেব! এক চিতার পবিত্র অগ্নিতে তাহার পুত্র রক্ষা পাইবে—তাহার পাপ ভস্মীভূত হইবে—বিধর্ম্মী মোগল তাহার মাতৃ-ভূমির পবিত্রতা ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। চিতার অগ্নির সঙ্কেতে সর্দ্দার আলি বেগ শিবির ভাঙ্গিয়া চলিয়া যাইবে।

পল্লী-মঙ্গল

সেবা-ধর্ম্মের যুগপ্রবর্ত্তক

স্বামী বিবেকানন্দ

মনে রাখিবেন, গ্রামেই জাতির বাস।

আমাদের দেশ পল্লী-প্রধান। এখানে সহর ও নগরের সংখ্যা অল্প; গ্রামের সংখ্যাই অধিক। নানা কারণে আজ পল্লীর অবস্থা শোচনীয়। সে সকল কারণের আলোচনা বিস্তর হইয়াছে। পল্লীর কল্যাণ সাধন করিতে পারিলেই যে দেশের কল্যাণ সাধিত হয়—এ কথা এখন সর্ব্বজন-স্বীকৃত। সেই জন্য পল্লী-সংগঠনের কার্য্য দেশে আরম্ভ হইয়াছে। আরম্ভ ক্ষুদ্র—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এই ক্ষুদ্র সূচনাই যে একদিন বৃহৎ হইয়া উঠিবে—এ আশা দুরাশা নহে।

বাঙ্গালার যেখানেই পল্লীর হিতকর প্রতিষ্ঠান পল্লীর কল্যাণ-সাধনে ব্রতী হইয়াছে তাহারই কার্য্য-বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। আমরা দেখাইতে চাই—পল্লী-সংগঠন-কার্য্য দেশে কি ভাবে হইতেছে তাহার প্রকৃত চিত্র দেশবাসীর নিকট ধরিতে। ইহাতে ফল হইবে এই—পল্লীর কল্যাণেচ্ছু যাঁহারা তাঁহারা কার্য্যের ধারা অবগত হইতে পারিবেন।

ডায়মণ্ড হারবার—সরিষা গ্রামের রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম

এই আশ্রমটী পল্লীর একটি কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর পল্লীর উন্নতি-সাধনের জন্য স্থাপিত হয়। এই আশ্রম দরিদ্র-নারায়ণগণের শিক্ষা ও সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

এই মহৎ কার্য্যের সূচনা ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে। তখন আশ্রমের জন্য নূতন বাটী নির্ম্মিত হয়। আশ্রম ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই নূতন বাটীতে উঠিয়া আসেন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে আশ্রমের সেবকেরা একটি

রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষা মন্দির (বালক-বিদ্যালয়)

অবৈতনিক উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ৫টী ছাত্র লইয়া কার্য্যারম্ভ হইয়াছিল। গত ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের শেষে ছাত্রসংখ্যা হইয়াছিল—১৯৪। শিক্ষা-মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রদিগকে পুস্তক, কাগজ, কালি ইত্যাদি এবং জলখাবার দিয়া থাকেন। এমন অনেক অতি-দরিদ্র ছাত্র আছে যাহাদের দুই বেলা ভাত জুটে না। আশ্রমের শিক্ষামন্দির হইতে তাহাদিগকে চাউল পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। ছাত্রেরা লেখাপড়া শিখিবার সময় যাহাতে অন্নাভাব-ক্লেশ ভোগ না করে আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ সেদিকে খুব লক্ষ্য রাখেন। পূজার সময়ে কাপড়, শীতের সময়ে কম্বলও দরিদ্র ছাত্রদিগকে দেওয়া হয়।

ছাত্রেরা বিদ্যালয়ের সহিত সমবায়-পদ্ধতিতে একটী দোকান খুলিয়াছে; এই দোকানে বই, কাগজ, খাতা, কালি, কলম ইত্যাদি বিক্রয় হইয়া থাকে।

বিদ্যালয়ে বয়ন শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, ছাত্রগণকে স্বাবলম্বী করিবার দিকেও সেবকগণের দৃষ্টি আছে।

এই বিদ্যালয় ব্যতীত একটী নৈশ বিদ্যালয়ও আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ খুলিয়াছেন।

সরিষা গ্রামে রামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দির নামে একটি উচ্চ প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস হইতে খোলা হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত মানখণ্ড গ্রামেও একটি নিম্ন প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহাকে সরিষা গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়টীর শাখা বলা যাইতে পারে।

সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দির (বালিকা বিদ্যালয়)

সারদা মন্দির (মানখণ্ড)—বালিকা-বিদ্যালয়

শিক্ষা মন্দিরে ছাত্রগণকে জলখাবার দেওয়া হইতেছে

শিক্ষকগণ

রামকৃষ্ণ মিশন সরিষা—ডায়মণ্ডহারবার আশ্রম

প্রত্যেক স্বদেশ-হিতৈষী ব্যক্তি এই আশ্রমের কল্যাণ ও স্থায়িত্ব কামনা করিবেন।

গল্প

যমদূত

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ, এম-এ

১

যখন রামনগরের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত গাজনের ঢাকের শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং পাড়ার ছেলেরা সকলেই গাজনের আমোদে মাতিয়া উঠিল, তখন পঞ্চদশবর্ষীয় বালক লক্ষ্মী-প্রসাদ তাহার বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনী বিমলাসুন্দরীর রোগশয্যাপার্শ্বে বিরসবদনে বসিয়া রোগিণীর শুশ্রূষা করিতেছিল। গাজনের ঢাকের শব্দ তাহার কাণে পৌঁছিয়াছিল কি না, নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন।

তিন মাস পূর্ব্বে যখন সদ্যোবিধবা দ্বাবিংশতি-বর্ষীয়া বিমলা দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা লইয়া দিন-কয়েক "জ্বালা জুড়াইবার" জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে বিধবা মাতার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন সে দৃশ্য দেখিয়া পরম শত্রুও অশ্রু সংবরণ করিতে পারে নাই।

পিত্রালয়ে আসিয়া স্বামীর জন্য শোক-প্রকাশ এবং নিজের শরীরে অযত্ন, এই দুইটিই বিমলার প্রধান কার্য্য হইয়া দাঁড়াইল। নিজের বাটীতে থাকিলে ছেলেদের—বিশেষতঃ কনিষ্ঠ শিশু পুত্রটীর মুখ চাহিয়া তাহাকে নিজের শরীর সম্বন্ধেও একটু সাবধান হইতে হইত। কিন্তু এখানে আসিয়া সে ছেলেদের ভার সম্পূর্ণভাবে তাহাদের দিদিমার উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্তমনে শরীরপাতের আয়োজন করিতে লাগিল। সময়ে খায় না, রাত্রিতে না ঘুমাইয়া বসিয়া বসিয়া কাঁদে, 'ছোঁয়াচ পড়া'র ছুতা করিয়া প্রত্যহ ২।৩ বার পানা-পুকুরের জলে স্নান করে, ভিজা চুল শুকায় না, ভিজা কাপড় ছাড়ে না,—ক্রমাগত তিন মাস ধরিয়া এই সব অত্যা-চারের ফলে বিমলা আজ দুরারোগ্য ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত।" দুই দিকেই নিউমোনিয়া দেখা দিয়াছে,—রোগ যথাসম্ভব কঠিন আকার ধারণ করিয়াছে। তাহার উপর আবার ২।৩ ঘণ্টা অন্তর 'ফিট' হইতে আরম্ভ হইয়াছে; কিছু খাইতে গেলে ফিট, কাশিতে গেলে ফিট, পাশ ফিরিতে গেলে ফিট; আবার ফিট হইলে সহজে জ্ঞান হইতে চাহে না—আধ ঘণ্টারও অধিককাল অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকে। এক একবার মনে হয়, যেন আর কিছুই নাই—প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে। এই ভাবে ৭।৮ দিন কাটিল। রোগিণী ক্রমেই অধিকতর দুর্ব্বল হইতে লাগিল।

২

রাত্রি প্রায় ১টা। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি—ঘোর অন্ধকার। জগতের যাবতীয় জীব সুষুপ্তিতে নিমগ্ন। চতুর্দ্দিক্ নিঃস্তব্ধ—কেবলমাত্র বৈশাখের দাক্ষিণা বাতাস শন্ শন্ শব্দে বহিয়া সেই নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। এমন সময় বিমলার ছোট মামা গিরিজাভূষণ পাশের দালান হইতে ভীতকণ্ঠে "দাদা" "দাদা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

অহিভূষণ সবে মাত্র গিরিজাভূষণকে বিশ্রামার্থ অবকাশ দিয়া বিমলার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছে। গিরিজার চীৎকার শুনিয়া সে ব্যস্ত-সমস্তভাবে গিরিজার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে রে, গিরিজা?" গিরিজা হাঁপা-ইতে হাঁপাইতে বলিল, "দাদা, আজ একটা ভীষণ দৃশ্য দেখলাম। ও ঘর থেকে এসে হাতমুখ ধু'য়ে এক গ্লাস জল খেয়ে বিছানাটা ঝেড়ে নিয়ে শুতে যাব, এমন সময় দেখি, দালানের আলোটা জানালা দিয়ে গিয়ে উঠানের যেখানে পড়েছে, সেইখানে একটা খুব কালো বিকট চেহারাওয়ালা মানুষ—মাথায় ঝাঁকড়া চুল—দড়ির মত একগাছা কি পাকাচ্ছে। প্রথমে মনে করলাম, ঘুমের ঘোরে একটা অলীক দৃশ্য দেখছি। কিন্তু চোখে ভাল করে' জল দিয়ে, আলোটা সরিয়ে নিয়ে জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, তখনও অবিকল সেই দৃশ্য। আর আমার সন্দেহমাত্র রইল না। তাই ভয়ে আপনাকে ডাকলাম।" তন্মুহূর্ত্তে দুই ভ্রাতার আলো ও লাঠি লইয়া বাড়ীর উঠানে ও আশে পাশে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আসিল, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। সদর ও খিড়কীর দরজা যেমন বন্ধ ছিল তেমনই বন্ধ রহিয়াছে। তখন উভয়েরই মনে একটা অন্য রকমের আতঙ্কের সঞ্চার হইল—গা কাঁটা দিয়া উঠিল। বিমলার মা যখন এই কথা শুনিলেন, তখন মাথা চাপড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তবে আর আমার বিমলাকে বাঁচাতে পারলাম না রে।"

৩

গ্রামের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বিমলার চিকিৎসা করিতেছিলেন। গ্রামের অনেকেই বলিল, "নিউমোনিয়ায় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার কি করবে? ওটা ত পেটের অসুখেরই চিকিৎসা।" কিন্তু ইহার ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে বিমলার আর এক-বার ডবল্ নিউমোনিয়া হইয়াছিল, এবং তাহার ভগিনীর টাইফয়েড হইয়াছিল এবং উভয়েই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করিয়া-ছিল। সেইজন্য বিমলার মা ও মামা উভয়েরই বিশ্বাস ছিল যে, যদি বিমলার পরমায়ু থাকে, তাহা হইলে সে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাতেই ভাল হইবে,—চিকিৎসা পরিবর্ত্তন করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

একদিন সকালে বিমলাকে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার বেণীমাধব বাবু বলিলেন, "এত চেষ্টা করেও যখন রোগটাকে বশে আনতে পারছি না, তখন আর নিশ্চিন্ত থাকা ভাল দেখায় না। সহরের ডাক্তারকে একবার ডাক দেওয়া হউক।" পরের ট্রেণেই অহিভূষণ সহরে গিয়া বড় ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। কিন্তু গ্রামের ষ্টেশনে নামিয়াই সে শুনিল, একটু পূর্ব্বে তাহার নামে ডাক্তার আনিতে নিষেধ করিয়া টেলিগ্রাম গিয়াছে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া অহিভূষণ টেলিগ্রাফ আফিসে গিয়া ফাইল হইতে টেলিগ্রামের নকল দেখিল,—"Case hopeless. No need doctor." (অর্থাৎ, জীবনের আশা নাই; ডাক্তার নিষ্প্রয়োজন।) অহিভূষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া শুষ্কমুখে গিয়া ডাক্তারবাবুকে সকল কথা জানাইয়া পরামর্শ চাহিল। ডাক্তারবাবু বলিলেন, "যখন এ রকম টেলিগ্রাম গিয়াছে, তখন আর আমার যাওয়ার কোনও প্রয়োজন দেখি না। বোধ হয় এতক্ষণ সব শেষ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমি ফেরত ট্রেণে বাড়ী ফিরিয়া যাই।" অহিভূষণ ডাক্তারবাবুর পায়ের মিনতি করিল। ফী দিতে গেলে তিনি তাহা লইলেন না, বলিলেন, "রোগীই

দেখিলাম না, ফী লইব কোন্ লজ্জায় ?" ডাক্তার বাবুর উদারতায় অহিভূষণ মুগ্ধ হইল। ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে ইহারই চিকিৎসায় তাঁহার ভাগিনেয়ীদ্বয় আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। অহিভূষণ ডাক্তার বাবুকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়া এবং তাঁহার অনর্থক কষ্ট হইল বলিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া গৃহাভিমুখে ধাবমান হইল।

৪

ষ্টেশন হইতে বাটী প্রায় দুই মাইল। অহিভূষণ বাটীর যত নিকটে আসিতে লাগিল, ততই তাহার পা জড়াইয়া যাইতে লাগিল,—সে আর অগ্রসর হইতে পারে না। বাটীতে গিয়া সে কি দৃশ্য দেখিবে? হয় ত দেখিবে, বিমলার মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে, আর তাহার মা উন্মাদিনীর মত তাহার নিকট পড়িয়া আছাড়-কাছাড় করিতেছে। এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য কল্পনায় উদিত হইবামাত্র অহি-ভূষণের সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, সে রাস্তাতেই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অনেক কষ্টে আত্মসংযম করিয়া আবার অগ্রসর হইতে লাগিল। গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইয়া পাড়ার এক বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের বিমলা কেমন আছে জান?" বৃদ্ধা বলিল, "কি জানি বাবু, তা' ত জানি না।" অহিভূষণের সন্দেহ ও উদ্বেগ আরও বাড়িয়া গেল। সে কাণ খাড়া করিয়া চলিতে লাগিল, প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার মনে হইতে লাগিল, এই বুঝি ক্রন্দনের শব্দ। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোনও শব্দই সে শুনিতে পাইল না। যখন কম্পিতপদে বাটীতে আসিয়া প্রবেশ করিল, তখনও পূর্ব্ববৎ সমস্ত নিস্তব্ধ। উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, বিমলা কেমন আছে?" বিমলার মা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "একটু সামলেছে। ডাক্তার কই?" অহিভূষণ বলিল, "ডাক্তার আন্‌তে ত বারণ করে' পাঠিয়েছ। তিনি আমাদের ষ্টেশন থেকে ফিরে গেলেন।"

দিদি বলিলেন, "একবার ফিট্ হয়ে নাড়ী টাড়ী ছেড়ে গিয়ে এমন অবস্থা হ'ল যে ডাক্তারবাবু পর্য্যন্ত বল্‌লেন যে আর আশা নেই। তাঁর কথা-মতই তোমায় তার করা হ'ল। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় কিছুক্ষণ পরে আবার জ্ঞান হ'ল, এবং ডাক্তারবাবু বললেন, নাড়ীও একটু একটু পাওয়া যাচ্ছে। তখনই গিরিজাকে ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিলাম, যদি ডাক্তার বাবুর দেখা পায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। সে বোধ হয় অন্য রাস্তা দিয়ে গেছে, তাই তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি।"

আধ ঘণ্টা পরে একখানি ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া বাড়ীর দরজায় লাগিল। গিরিজা ডাক্তারবাবুকে লইয়া আসিয়াছে। ট্রেণ প্লাটফর্ম্মে আসিয়াছিল, ডাক্তারবাবুও ট্রেণে উঠিতে যাইতেছিলেন এমন সময় গিরিজা হাঁপাইতে হাঁপাইতে গিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া আসিয়াছে। আর এক মিনিট বিলম্ব হইলেই ট্রেণ ছাড়িয়া দিত। যাহা হউক, যখন রোগিণীর ছেঁড়া নাড়ী আবার যোড়া লাগিয়াছে, এবং ডাক্তারকে অসম্ভাবিতরূপে পাওয়া গিয়াছে, তখন অনেকেরই মনে আশা হইল, হয় ত বিমলা এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলেও যাইতে পারে।

৫

সহরের ডাক্তারবাবু আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া বেণী বাবুও আসিলেন। উভয় ডাক্তারে মিলিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া রোগিণীকে পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষান্তে সহরের ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আমার যতদূর মনে হয়, ফিটটা অন্য কিছু নহে—হিষ্টিরিয়া;

হিষ্টিরিয়ার চিকিৎসা করিলেই সব সারিয়া যাইবে। নিউমোনিয়া বা দুর্ব্বলতার জন্ত কোন ভয় নাই।" বেণীবাবু কিন্তু বরাবরই বলিয়া আসিয়াছেন, দুর্ব্বলতার জন্যই ফিট্ হইতেছে, হিষ্টিরিয়া নহে। এইখানে ছোট ডাক্তারে ও বড় ডাক্তারে মতভেদ হইল।

৪।৫ দিন সহরের ডাক্তারের চিকিৎসা চলিল, কিন্তু রোগের উপশম হওয়া দূরে থাকুক, বরং বৃদ্ধি হইল। পূর্ব্বে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ফিট্ হইতেছিল, এখন ঘণ্টায় ঘণ্টায় ফিট্ হইতে লাগিল। দুর্ব্বলতাও বেশী বলিয়া মনে হইল। শেষে সহরের ডাক্তারের ঔষধ বন্ধ করিয়া দিয়া গ্রামের ডাক্তারের উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে হইল।

আরও ২।৩ দিন এইভাবে অতিবাহিত হইবার পর একদিন সকালে বেণী বাবু বিমলার জিহ্বা পরীক্ষা করিয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, "আঃ এত দিনে বোধ হয় ভগবান্ মুখ তুলে চাইলেন।" অহিভূষণ জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম?" বেণীবাবু বলিলেন, "তোমাদের এই কেস্‌টার জন্যে কাল প্রায় সমস্ত রাতটাই বই নিয়ে কাটিয়েছি। মাত্র দু' ঘণ্টা ঘুমিয়েছি। একটা ওষুধের কথা আজ ২।৩ দিন ধরে ভাবছি,—ওষুধটার আর সব লক্ষণ মিলে যাচ্ছিল, কিন্তু জিভ্‌টা মিলছিল না; আজ জিভটাও মিলেছে। এখন মনে হচ্ছে সেই ওষুধটাতেই কাজ হবে।"

বেণীবাবু যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই হইল। নূতন নির্ব্বাচিত ঔষধটি দেওয়াতে এক দিনেই অনেক উপকার হইল,—ফিট কমিয়া গেল, রোগিণীর মুখ চোখের ভাবেরও অনেকটা পরিবর্ত্তন হইল। দ্বিতীয় দিনে ২।৩ বার মাত্র ফিট হইল, তৃতীয় দিনে ফিট একেবারেই হইল না। আরও ২।৩ দিনের মধ্যে অন্যান্য উপসর্গও প্রায় সবগুলিই কমিয়া গেল। জগদীশ্বরের কৃপায় বিমলা এযাত্রা বাঁচিয়া গেল।

গিরিজাভূষণ সেদিন রাত্রিতে যে ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়াছিল, সেটা তাহার শারীরিক অবসাদ, মানসিক দুশ্চিন্তা, এবং রাত্রিজাগরণজনিত তন্দ্রালসতার ফল, ইহাই অনেকের মনে হইতে লাগিল।

অহিভূষণের স্ত্রী দেবযানী প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে বাপের বাড়ী গিয়াছে। সেখানে সাত মাস পূর্ব্বে তাহার একটি কন্যা হইয়াছে। কন্যাটি অত্যন্ত রুগ্ন এবং তাহার মাতারও শরীর ভাল নহে, এই জন্য এতদিন তাহাদিগকে রামনগরে আনা হয় নাই। বিমলা যে দিন অন্নপথ্য গ্রহণ করিল, তাহার ২।১ দিন পরে অহিভূষণ তাহার স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া আসিল। অহিভূষণ তাহাদিগকে আনিতে যাইলে তাহার শ্বশুর মহাশয় ও শাশুড়ী ঠাকুরাণী অনেক বার করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মেয়ে ও নাতনী যে রকম রোগা, তাহাদিগকে আরও কিছু দিন সেখানে রাখিলে ভাল হইত। উত্তরে অহিভূষণ বলিয়াছিল, সে কথা সত্য; কিন্তু সাত মাসের মধ্যেই কন্যাটির অন্নপ্রাশন দিতে হইবে, সুতরাং লইয়া যাওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

সাতমাসের রুগ্ন শিশু বৈশাখের প্রচণ্ড উত্তাপে দীর্ঘপথ ট্রেণে আসার কষ্ট সহ্য করিতে পারিল না,—আসিয়াই রক্ত-আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইল। ইহার পূর্ব্বেও ২।১ বার তাহার এই অসুখ হইয়াছিল, এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাতেই সারিয়াছিল। এখন বেণীবাবুর উপর তাহার চিকিৎসার ভার পড়িল। বেণীবাবু ৭।৮ দিন ধরিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রোগের কিছুই কমাইতে পারিলেন না। অবশেষে পার্শ্ববর্ত্তী

গণ্ডগ্রাম হইতে এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনকে আনাইয়া ইন্‌জেকৃশন দেওয়া হইল। তাহাতে রক্তভেদ বন্ধ হইল বটে, কিন্তু পেট ফাঁপিতে লাগিল। ২।১ বার দাস্ত করাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করা হইল, কিন্তু সব বিফল হইল। যে দিন বেলা ৪টার সময় ইন্‌জেকশন দেওয়া হইয়াছিল, তাহার পরদিন বেলা ২টার সময় খুকীর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেল,—অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত গোলাপটি আতপতাপে শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িল,—খুকী যে অজানা দেশ হইতে আসিয়াছিল, সকলকে কাঁদাইয়া এত লোকের আকুল প্রার্থনা বিফল করিয়া, অভীপ্সিত অন্নপ্রাশন অনন্ত কালের জন্য স্থগিত রাখিয়া,—সেই অজানা দেশেই আবার চলিয়া গেল। সদ্যঃ শোকাতুরা সপ্তদশবর্ষীয়া বধূ দেবযানী হৃদয়ভেদী স্বরে "চলে গেলি মা?" বলিয়া চীৎকার করিয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়িল।

৭

গিরিজাভূষণ সে দিন রাত্রিতে যে বিকট চেহারাটা দেখিয়াছিল, সেটা যে সত্যসত্যই যমদূত সে বিষয়ে আর কাহারও কোনও সংশয় রহিল না।

গল্প

খেলার প্রশ্ন

শ্রীহেমনলিনী বসু

১

শৈশব

আমরা বেনারসে থাকি। জন্মাবচ্ছিন্ন দেখে আসছি, মা ছাড়া আমার কেহ নাই। বড় হয়ে মাকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছি, "মা! মতিরা মামার বাড়ী যায়, আমার মামার বাড়ী কোথায়? সন্তোষের কাকা কেমন পুতুল দিয়েছেন, আমার কাকা কৈ মা?" ছেলেবেলা দেখতাম, মার চক্ষু জলে ভরে আসছে, আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে বলতেন, "তোমার কেবল বিশ্বনাথ আছেন মা!" গত কল্য আমি মায়ের মুখে সকল প্রশ্নেরই উত্তর পেয়েছি, গোড়া থেকেই আরম্ভ করি:—

মা বাঙ্গলাদেশের সম্ভ্রান্ত ঘরেরই মেয়ে, খুব ছোট এমন কি ১০।১২ বছর বয়সেই বিধবা হয়েছিলেন, ব্রাহ্মণের বিধবা বয়সে ছোট হলেও, বিধবার সকল আচারই তাঁকে মেনে চলতে হ'ত, কিন্তু তরুণীর চপল মনে যৌবন-স্বপ্ন জেগে উঠেছিল, সে বয়সে পরের ঘরকন্না, দেবতা-ধর্ম্ম নিয়ে তৃপ্তি হয় নি, তাই তাঁর মন ব্যথার ব্যথী, ভালবাসার জিনিস খুঁজেছিল। প্রথমেই তিনি পিচ্ছল পথে পা দেন নি, অনেক প্রলোভন এড়িয়ে অবশেষে কোন সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত আত্মীয়ের প্রলোভন মাকে জয় করেছিল। বিধবার বিয়ে সমাজে খুব চলন হয় নাই, হ'লে হয় তো মাকে এ বিপদে পড়তে হ'ত না। ইচ্ছা থাকলেই যে সকল মেয়ে বিয়ের সুযোগ পায়, তা' পায় না। কত হতভাগিনীর সরল পবিত্র জীবন, এমনই পঙ্কিল পথে গিয়া পড়ে।

অবশেষে যখন আমার আগমনের সম্ভাবনা গোপনে পরিবারে প্রচার হ'ল, তখন তাঁহার ক্ষুব্ধ পিতা লোকলজ্জা ভয়ে মাকে কিছু দিনের জন্য বেনারসে পাঠাতে চাইলেন। আমার পিতা আগে থাকতেই বায়ু-পরিবর্ত্তনের ছলে বিদেশে চম্পট দিলেন। আমার দুঃখিনী মা অভিমানে অশ্রু-মোচন করিয়া বেনারসে আসিলেন।

আমি যখন ভূমিষ্ঠ হ'লাম, তরুণ যুবতীর মন তখন স্বর্গীয় স্নেহে আপ্লুত হ'ল। সেই এক অনাস্বাদিত অপূর্ব্ব সুখ মাকে আচ্ছন্ন করলে। সৃষ্টি পালনের জন্য প্রকৃতি নারীর অন্তরে মায়া দিয়েছেন! এই মায়া না থাকলে কে সন্তানের এত সেবা করত। লোকে আমায় জারজ বলে ঘৃণা করবে, কিন্তু মা সূতিকাগারে অশ্রুমাখা-নয়নে, আমার মুখ চুম্বন করে বার বার বলেছিলেন, "বিশ্বনাথ যদি দিলে, কেন এমন করে দিলে? কেন দেওয়ার মত দিলে না? বুক যে জুড়িয়ে যেত! এর পরিণাম এই নিষ্পাপ শিশু কি ভাবে ভোগ করবে? এর পিতা নাই, মাতা নাই, সমাজ নাই, অর্থ নাই, উপরন্তু চিরজীবন সাধারণের ঘৃণা সহ্য করবে!"

মা আসবার সময় মার শৈশবের ধাত্রী বুড়ো ঝি ও মাতামহের এক বৃদ্ধ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী মার সঙ্গে এসেছিল। মা সুস্থ হ'লে মাকে বাড়ী ফিরে যাবার হুকুম এল, আর আমাকে অনাথ আশ্রমে পাঠান হ'বে। কিন্তু মা তা'তে রাজী হলেন না। অনেক ভয় দেখিয়ে, অনেক মমতা জানিয়ে মাতামহের চিঠি এল, কিন্তু মা অটল, আমায় পরিত্যাগ করে ঘরে ফিরতে চাইলেন না, বরং বললেন জোর করে নিয়ে গেলে আত্মঘাতিনী হবেন। তখন বৃদ্ধ কর্ম্মচারী দেশে ফিরল, বুড়ো ঝি রয়ে গেল; কিন্তু মাতামহ যত দিন বেঁচে ছিলেন, নিয়মিত মাসহারা আসত।

আমাদের মত গৃহস্থ-ঘরের নারীরা স্বয়ং সন্তান-পালনে অক্ষম, ছেলের ঝিরাই ছেলেদের দুধ খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়, জামা পরায়, স্নান করায়, রাত-দিন নিয়ে থাকে। মা কিন্তু দাসীর হাতে আমায় দিলেন না; নিজে হাতে আমার সব কাজ করতেন। আমার অনেক নাম রাখলেন, "সবিতা, অশ্রুকণা, নির্ম্মাল্য, কিন্তু খেলা নামটাই বাহাল রইল; আমি সত্যই মার খেলানা, সর্ব্বস্বহারার একমাত্র লক্ষ্য—একমাত্র সুখ। আমাকে জড়িয়েই মা জগতের সব ভুলে রইলেন। এমন কি একটু বড় হয়ে যখন আমি বারান্দায় পিতলের ছোট ছোট হাঁড়িকুড়ি ও ডলি পুতুল নিয়ে খেলাঘর পাতলাম, তখন মা নিমন্ত্রিত হয়ে বালিকার মতই কাদার পরমান্ন ও পাতার লুচী মহাতৃপ্তির সহিত যেন খাইতে খাইতে রাবড়ী ও মাটীর ছানাবড়ার বায়না ধরতেন। আমার পুতুলের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়ে, বৌ নিয়ে যা'বার জন্য খুব ঝগড়া করতেন।

২

মিলন

ক্রমে বড় হয়ে মার কাছেই লেখাপড়া সুরু করলাম, বাঙ্গালা, সামান্য ইংরাজী, সামান্য সংস্কৃত আর শেলাই শিখলাম। মা গানবাজনা জানতেন না, কাজেই সেটা শিখি নাই। বিদ্যালয়ের বিভীষিকা অজ্ঞাত রহিল, বেত্র-আস্ফালন, নিঃসম্পর্কীয়া শিক্ষয়িত্রীদের নীরস কঠোর শাসন, স্কুলে যাবার সময়কার বুক-দুরদুরুণী সব থেকে দূরে থেকে, হাসি ও খেলার সহিত শিক্ষা মন্দ হ'ল না, বরং দ্রুত অগ্রসর হ'ল।

আমার পনেরো বছর বয়সের সময় মা বিয়ে দেবার জন্য পাত্র খুঁজতে লাগলেন। পাড়ার নিল-

কমল ঠাকুরদা, রামহরি দাদামশায় অনেক সম্বন্ধ আনলেন, লোকে বলে, আমি না কি "পরমাসুন্দরী," হবেও বা, মার অনেকটা সাদৃশ্য আমাতে এসেছিল, পিতৃ-সৌন্দর্য্যেরও কিছু কিছু পেয়েছিলাম। বড় হয়ে মাঝে মাঝে দেখতাম, মা আলমারী খুলে একখানি ফটো বের করে দেখতেন, আবার চোখের জল মুছে ফটোর পদতলে একটী প্রণাম করে তুলে রেখে দিতেন।

একদিন হঠাৎ আমি ঘরে এসে পড়েছিলাম। মা লুকাতে সময় পান নাই, চেহারার সাদৃশ্য দেখে আর জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, পিতার ফটো। তখন মনে করেছিলাম, বুঝি তিনি স্বর্গে গেছেন, এখন জানছি, তা' নয়। তিনি ধনে ধান্যে স্ত্রী পুত্রে পরিবৃত হয়ে সুখেই আছেন, আর দুঃখিনী মা আর আমি আজ ভিখারীরও অধম।

যাই হো'ক ঐ দাদামশায়দের আনীত সম্বন্ধ মার পছন্দ হয় নাই, ঐ সব পাত্র আমারি মত সমাজ-পরিত্যক্ত, বাল্যে আত্মীয়ের শাসন পায় নাই, বিদ্যা-শিক্ষার সুযোগ পায় নাই, কেহ বা ২০৲, ২৫৲ টাকার চাকরী করে, কারো বা তাও নাই, বেকার। অবশেষে একটী পাত্র মিলিল,—শ্রীমান যুবাপুরুষ, ভদ্রঘরের উপযুক্ত শিক্ষিত, ভদ্রলোকের মত। দেশে বিষয়-আশয় আছে বটে, কিন্তু শৈশবে মা-বাপের কাল হওয়ায় জ্ঞাতিরা বিষয় দেয় নাই।

মা এঁকেই পছন্দ করলেন। অবশেষে পঞ্জিকার নির্দ্দিষ্ট শুভলগ্নে তাঁর হাতে আমি হাত দিলাম। বিয়ের আগে মা তাঁকে নিজের ঘরে ডেকে গোপনে সকল কথাই বললেন, সরলা জননী এতবড় ব্যাপারটা চাপা দিয়ে বিয়ে দিতে পারেন নাই, সব কথা খুলে বললেন, তা'তে যা' হয় হ'বে।

আমার স্বামী বিংশ শতাব্দীর যুবক, তিনি শুনে বিরূপ হলেন না, বললেন, "তা'তে মেয়ের দোষ কি? আজকাল পতিতাদের পর্য্যন্ত ক্ষমা করা হচ্ছে, না হ'লে উন্নতি হ'বে কি করে? একবার পদস্খলন হলেই কি তাকে চেপে ধরতে হবে? আর আপনিও যথেষ্ট মনের জোরের পরিচয় দিয়েছেন, সমাজ যাই বলুক, মনুষ্যত্বের হিসাবে আপনাকেও শ্রদ্ধা করি।"

মার বিয়ের সময়ের ৫।৭ হাজার টাকার অলঙ্কার ছিল, তাই থেকে কিছু ভেঙ্গে চুরে আমার গহনা হ'ল হাজার টাকার। আর বাকী দিয়ে স্বামীকে একখানি কাপড়ের দোকান করে দিলেন, তাঁ'র সঙ্গে ঐ কথাই ছিল।

বিবাহিত জীবন সে কি মধুর! এক মাকে নিয়েই পনেরোটা বছর কেটে গেছে। অত স্নেহ পেয়েও, ইদনীং কেমন যেন কিসের একটা অভাব মনে হ'ত,—যেন কিসের একটা অভাব আছে! এখন এ কি তৃপ্তি, এ কি শান্তি! স্বামী যখন রাত্রে দোকান থেকে ফিরতেন, সে কড়া-নাড়াতেই কি মধু ঝরে পড়ত! অতীত যুগে ব্রজাঙ্গনা বুঝি বাঁশীর রবে এমনই মাধুর্য্য উপভোগ করতেন। কারণে অকারণে সে কি হাসি! মা তৃপ্তির সহিত আমার মুখপানে চেয়ে একটু একটু হাসতেন। তিনি দোকানে যা'বার সময় সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলে আমি গিয়ে জানলা দিয়ে দেখতাম, যতদূর দেখা যায়, তিনি মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে আমার পানে চাইতেন, আর আমি তাঁর পানে চেয়ে হাসতাম।

তিনি একখানি বেনারসী আমায় উপহার দিয়েছিলেন, কতবার গোপনে সেটীতে আমি চুমো খেয়েছি, তার সংখ্যা নাই। আমরা দুজনেই কি সুখী! সেই সুখের অঞ্জন চোখে মাখিয়ে দুজনেই দুনিয়াটাকে কি মিষ্ট দেখতাম!

বিয়ের পর এক বৎসর কাটল, একদিন রাত্রে

উনি এসে মাকে বললেন, তাঁকে একবার ৭ ৮ দিনের জন্য দেশে যেতে হ'বে, তাঁর কাকা এসেছেন নিয়ে যেতে, তিনি কিছু বিষয় ফিরে দিবেন। মা সম্মত হলেন, বুড় ঝিও বাজার করতে গিয়ে ক'দিনই দেখেছে, তিনি ক'দিনই দোকানে বসে থাকেন।

কিন্তু আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল। এক দিনও ছাড়াছাড়ি হয় নি, এখন আমি কি করে থাকব, আমিও যাব। রাত্রে তিনি আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললেন, "সেখানে আমাকেই পরের বাড়ী থাকতে হ'বে, তোমায় কোথায় নিয়ে যাব? ক'দিন ধৈর্য্য ধরে থাক, আট দিনে ঠিক ফিরব। বিদায়ের দিনে কি আমার কাতরতা! কোন কথা বলতে গেলেই ঠোঁট কাঁপছিল আর চোখে জল! তিনি সান্ত্বনা দিয়ে মুখচুম্বন করে বিদায় নিলেন। তখন বুঝতে পারিনি এখন পারছি, সে অভিনয়ে তাঁর কৃত্রিমতা ছিল, আর শীঘ্র শীঘ্র পালাবার জন্য কি একটা ব্যস্ততা। মাও চোখের জল মুছে বললেন, "৭।৮ দিনের বেশী দেরী করো না বাবা।" তিনি পৌঁছে যে চিঠি দেবার কথা ছিল, তা'ও পেলাম না, ৭।৮ দিনে এলেনও না, আমরা খুব চিন্তিতই হলাম, আমি তো পাগলিনীবৎ!

মা তাঁর নিজের জীবনে পুরুষের বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছিলেন, তার ফলে তাঁর মুখে চিন্তার ছায়া পড়লো। তিনি যে ঠিকানা দিয়ে গেছেন, তাতে চিঠি দেওয়া হ'ল—জবাব নাই। তখন নীলকমল ঠাকুরদা'কে ডেকে মা সকল কথা বললেন; তিনি একমাস পরে যা' খবর আনলেন, তা কি ভীষণ!—আমার স্বামী পূর্ব্ববঙ্গের এক জমীদারের ছেলে, বাপের সঙ্গে বিবাদ করে চলে এসেছিলেন। তাঁর বাপ এসেই ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন। এবং এর মধ্যেই তাঁর বিয়ে হয়ে গেছে। তিনি যে ঠিকানা আমাদের দিয়ে গেছেন, সে ঠিক নয়। এই বলে আমার শ্বশুরের নাম-ধাম লেখা একটু চিরকুট তিনি দিলেন।

সেদিন আর আমাদের জ্ঞান ছিল না, মাতা-পুত্রী অনাহারেই পড়ে রইলাম।

৩
জীবন্মৃত

আমি স্বামীকে চিঠি দিলাম, কোন জবাবই এলো না। আমার জীবনে এত বড় একটা ক্ষতি করে তিনি নির্ব্বিকার উদাসীন হয়েই রইলেন, যেন কিছুই হয় নাই। মার ও আমার দুজনের জীবনই নিষ্ঠুর পুরুষের হাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। মা আমার শ্বশুরকে চিঠি লিখলেন, তিনি জবাব দিলেন, "কুলত্যাগিনীর জারজ কন্যার সঙ্গে ভদ্রসন্তানের বিবাহ হ'তেই পারে না, মা যদি আদালতে খোর-পোষের দাবী করেন, তা' হ'লে তিনি আদালতে দাঁড়িয়ে মার সকল কথাই প্রকাশ করবেন।" মা তখন চিঠিখানা গোপন করেছিলেন, এখন দেখেছি।

পরদিন বুড়ো ঝি ঠাকুর দেখতে গিয়ে দেখে এল, আমাদের দোকান খোলা এবং একটী যুবা বেচাকেনা করছে। জিজ্ঞাসা ক'রে ঝি জানলে, স্বামী তা'কে দোকানের স্বত্ব বিক্রয় করে গেছেন। পুরুষ বুদ্ধিমান জীব বটে। আমাদের পয়সারও টানা-টানি হ'ল। মাতামহ মৃত, মামা চিঠি লিখলে টাকা তো দূরের কথা, জবাবও দেন না, তার জন্য তাঁকে দোষ দিতে পারি না। আমার পিতাকে মা কখনও চিঠিপত্র দেন নাই, তিনিও কখনও আমাদের খোঁজ করেন না। সেই ছেলেখেলার ফলে কে ভাসল, কে ডুবল, তা'র আবার খবর নিচ্ছে

হ'বে নাকি! হয় তো এখন তিনি নূতন নূতন শিকার লইয়া ব্যস্ত!

আমার মন বোঝে না—প্রায় দুই বৎসর প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত স্বামীকে চিঠি দিতাম, সে কি মিনতি! কি হৃদয়ভেদী প্রার্থনা! কিন্তু একখানারও জবাব পাই নাই।

ক্রমে কেমন ঘৃণা এল, আর চিঠি দিতাম না, কিন্তু এক একদিন "হিয়ার ভিতরে কাতরে পরাণ লুটায়ে লুটায়ে কাঁদে।" আর পারি না! দুঃখ, না ঘৃণা, না অভিমান, না অবসাদ—কি এ!

রোজ বিকালে বুড়ো ঝিকে নিয়ে দশাশ্বমেধ ঘাটে বেড়াতে যেতাম, কখনও কথকতা, কখনও কীর্ত্তন শুনতাম, কখনও বা বিদেশিনী আগন্তুকের পোষাক-পরিচ্ছদ দেখতাম। যে সব বৃদ্ধ শুনতে যেতেন তাঁরা সংসারের দেনাপাওনা চুকিয়ে কাশীবাস করতে এসেছেন; ঘরে কাজ নাই, সময়টাও কাটে, ধর্ম্মকর্ম্মও হয়, তাঁরা মন দিয়ে কীর্ত্তনাদি শুনতেন। আমার সব সময় মন লাগত না, কখনও কীর্ত্তনীয়ার মুখভঙ্গী দেখতাম, কখনও বা খোল-বাদকের বিষম মস্তক-চালনা দেখতাম, কিন্তু কৃষ্ণকথার রাধার বিরহ হৃদয়ের সুপ্ত তার ঝঙ্কৃত করত, চোখ দিয়ে দরদরধারে জল পড়ত।

একদিন কথা শুনতে শুনতে সম্মুখস্থ এক যুবা-পুরুষের দিকে চোখ পড়ল! কি সুন্দর চেহারাটী! তিনি আমার মুখপানেই চেয়ে আছেন, আমি চোখ ফিরালাম! বাড়ী ফিরবার সময় চোখে পড়ল। সেই চাহনি! সে চক্ষু যেন কি বলছে! হঠাৎ মনটায় কি যেন একটা আনন্দের সাড়া দিল! আমার দিকে তো কত লোকই চায়, তা'তে তো বরং বিরক্তিই হয়, আজ কেন ভাল লাগছে!

তার পর হ'তে তিন দিনই দেখলাম, তিনি সামনেই বসেন, আর চুরি করে চান। আমারো বিকালে বেড়াতে যেতে একটা আকর্ষণ হ'ল। একদিন আমরা যখন বাড়ী যা'বার জন্য উঠলাম, তিনিও উঠলেন, যেতে যেতে দু' একবার ফিরে চেয়ে দেখি, তিনি দূরে দূরে আসছেন, আমরা বাড়ী ঢুকলাম।

আমি উপরে উঠে ঘরে গিয়ে রাস্তার দিকে জানলায় এসে দাঁড়ালাম। দেখি তিনি ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে সতৃষ্ণনয়নে আমার পানে চেয়ে! আমি মুখপানে ভাল করে চাইতে পারছি না, কিন্তু কি মিষ্ট লাগছে! হঠাৎ দেখি, তিনি কি যেন একটা দেখে সভয়ে চলে গেলেন! আমি পিছন ফিরে দেখি, মা দাঁড়িয়ে! মার মুখ কি বিমর্ষ! লজ্জায় ভয়ে আমি বিবর্ণ হয়ে গেলাম, মুখে কথা নাই।

মা কিছু না ব'লে আমার হাত ধ'রে ঘরের সামনের ছাদে নিয়ে গেলেন। সন্ধ্যাবেলা আমরা সেইখানে বসতাম। চারিদিকে কয়েকটী টবে আমার ফুলগাছ ছিল। তা'তে কখনও ফুল হ'তে পেত না; বানরে সব ছিঁড়ে দিত। মাঝে একখানি গালিচা পাতা। আমরা দুজনে বসলাম। মা তখন তাঁর জীবনের ইতিহাসটী খুলে বললেন এইজন্য যে আমি যেন তাঁর মত ভুল না করি।

আমার এই মা'কে কে বলবে পাপী? মা যখন নিরাভরণ হাত দুটী জোড় ক'রে আলুলায়িত কুন্তলে বিশ্বনাথের পূজা করেন, আমি তো দেখি দেবীমূর্ত্তি। আমি লজ্জায় ক্ষোভে মার কোলে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগলাম। মা আমার মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন।

বুড়ো ঝি এসে বললে, "উনান ধরেছে, এস।" মা বললেন, "আমি আজ খাব না, ক্ষিধে নাই। তুই রাঁধ! কপির তরকারি, বেগুনভাজা ক'রে তো'র রুটী গড়ে নে। তার পর আমি গিয়ে খেলার জন্য

লুচী আর সুজির পায়েস করে নেবো'খন।" ঝি চলে গেল।

যত রাগ পড়ল গিয়ে আমার পিতার উপর। বললাম, "মা! তুমি কি না আবার সেই লোকটাকে নমস্কার কর। সে তো বিয়ে করতে পারত।" মা বললেন, "মানুষের প্রকৃতি আরামে থাকতে চায়, যার উপায় নাই, সেই দুঃখকে বরণ করে নেয়। বিয়ে করলে তাঁকে অনেক সহ্য করতে হ'ত।"

আমি মুখ ঘুরিয়ে বললাম, "তাকে আর অত সম্মান করতে হ'বে না। তুমি তো আমার মুখ চেয়ে দুঃখকে বরণ করে নিলে।" মা বললেন, "সামাজিক নিয়মে বিয়ে না হলেও একমাত্র তাঁকেই ভালবেসেছি, তাঁর সন্তান গর্ভে ধারণ করেছি, তিনিই স্বামী।"

আমি বললাম, "মা! আমি তাঁর অবৈধ সন্তান বলেই আমার এমন বুদ্ধি হয়েছিল! এ সব ছেলে ভাল হয় না—না, মা?"

মা বল্‌লেন, "কেন ভাল হ'বে না? ভগবান তো আর স্বামী স্ত্রী সৃষ্টি করেন নি, পুরুষ আর স্ত্রীলোক করেছেন। সমাজের শৃঙ্খলার জন্যই বিয়ের ব্যবস্থা। সমাজে থাকতে গেলে তা'র সমস্ত নিয়ম মেনে চলাই উচিত, না হলে সমাজ বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। দেখ, আমি যদি মেনে চলতাম, তা' হলে কি তোমার আমার আজ এত কষ্ট হ'ত? এই সব দুঃখ-কষ্ট নিরোধের জন্যই সমাজপতিরা এতটা কড়াকড়ি করেছেন। আমায় দেখে শিক্ষা কর মা, কখনও ও পথে পা দিও না।" আমি উচ্ছ্বাস-ভরে মাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, "না মা! কখনও দেব না।" মা আমায় বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

মা-বাপের দোষে আমার তো এই রকম জন্ম হ'ল। বাপ তো এখন মন্দির ক'রে, ফোঁটা-তিলক কেটে, বাড়ীতে সঙ্কীর্ত্তন বসিয়ে ধার্ম্মিক-চূড়ামণি! দুঃখিনী মা আমার মুখ চেয়েই কষ্ট পেলেন, না হলে তিনিও এখন কুঁড়োজালি হাতে, ফোঁটা-তিলক কেটে ব্রহ্মচারিণী হ'তেন! সমাজ তো এই সব নরনারীর কোন দণ্ড দেয় না। কিন্তু এই সব সন্তানের—আমাদের কি দোষে এ কষ্ট এ দণ্ড?

আপনারা বলবেন, তোমাদের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল; কিন্তু তারও তো প্রতিবিধান চাই। এই যে হাবাকালারা হয় তো পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু তবুও তো মনুষ্যত্বের অবদান তাদের অনেক দুঃখ লাঘব করছে। মানুষে জন্মের জন্য দায়ী হয় না, কর্ম্মের জন্য দায়ী হয়। কিন্তু আমরা যে কত হতভাগা-হতভাগিনী জন্মের জন্য কষ্ট পাচ্ছি!

সমাজপতিদের কাছে আমাদের প্রশ্ন—"আমাদের কি উপায় হ'তে পারে?"

নব বরষের গান

(রচনা—শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন মিত্র)

তোমারি বাসনা পূর্ণ হউক
আমার জীবন পরে ;
কুটীরের মাঝে ঠাঁই নাই মোর—
ঠাঁই প্রকৃতির ঘরে !

তোমারি আকাশ বড় ভালোবাসে,
আলোক দাঁড়ায়ে এই মোর পাশে ;
অই মেঘগুলি আমারি এ প্রাণে
কত শত খেলা করে !

তোমারি কুসুম হাসিয়া নাচিয়া
ফুল ফুটায়েছে প্রাণে ;
তোমারি তটিনী, তোমারি বিহগ
পাগল করেছে গানে !

তোমারি মলয় দিয়ে কি আভাষ,
আমারে এনেছে ছিঁড়ে মায়া-পাশ ;
বাহির করেছে জগতের পানে
এমন কি কাজ তরে ?

(সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা)

নট-মালা—একতালা

স্থায়ী।—নট।

```
     ০                  ১              ২´                    ৩
II {সা  নৃসা   ধা | সা   সা   সা I রা  -মগা  মা | রা   গা   গা ।
    তো  মা•   রি   বা   স    না   পূ   •র্    ণ    হ    উ    ক

     ০                  ১              ২´                    ৩
 । মা   রা   গা । রা   সা   সা I রা   -গা   -মগা । রা   -সা   -রসা} ।
   আ    মা   র    জী   ব    ন    প    •    ••    রে   •     ••

     ০                  ১              ২´                    ৩
 । {রা  গা   রা । -মগা  পা   পা I ধা  -পমা  গপা । -মগা  মা   -রগা ।
    কু   টী   রে   •র্   মা   ঝে   ঠাঁ   •ই    না•   •ই    মো   •র্

     ০                  ১              ২´                    ৩
 । পা  -রা   মগা । মা   রা   সা I রা   -মা   -গা । রা   -সা   -রসা} II
   ঠাঁ  •ই    প্র   কৃ   তি   র    ঘ    •     •    রে   •     ••
```

অন্তরা।—নট-মল্লার।

```
  •          ১          ২´          ৩
II {পা পা মা। ণা ধা -ণধনা I র্সা র্স না। র্সা র্সা র্সা।
   তো মা রি আ কা ••শ্ ব ড় ভা লো বা সে

  •          ১          ২´          ৩
। পা না -র্সর্রা। র্সা র্রা র্সা I ধধা ধা -ণপা। পা পা মা}।
  আ লো •ক্ দাঁ ড়া য়ে এই মো •র্ পা শে •

  •          ১          ২´          ৩
। পা -পা -ধনা। র্সা র্সা -ধপা I মা ধা পমা। পা মমা গা।
  অই যে •ঘ গু লি •• আ মা রি• এ প্রা ণে

  •          ১          ২´          ৩
। মা রা গা। রা পা মা I ধা -পা -মা। গা -মা -রসা} II
  ক ত শ ত খে লা ক • • রে • ••
```

সঞ্চারী।—নট-কিন্নর।

```
  •          ১          ২´          ৩
II {গা ধা না। ধা ধা -ধর্সা I র্সা র্স ধা। না ধা ধা।
   তো মা রি কু সু •ম্ হা সি য়া না চি য়া

  •          ১          ২          ৩
। পা -পমা গা। গা পা পা I মা -গা -মা। রা -া -সা}।
  ফু •ল্ ফু টা য়ে ছে প্রা • • ণে • •

  •          ১          ২´          ৩
। {গা পা পা। পা পা মা I গা মা রা। সা সা -সগা।
  তো মা রি ত টি নী তো মা রি বি হ •গ্

  •          ১          ২´          ৩
। গা গা -গপা। পা র্গা র্স I র্র -র্সা ধা। না -ধা -পমা}।
  পা গ •ল্ ক রে ছে গা • • নে • ••
```

আভোগ।—নট-নারায়ণ (বৃহন্নট)।

০ ১ ২´ ৩
। {সা ন্সা ন্। সা মা -। I মা গা পা। মা পা -। ।
তো মা • রি ম ল য় দি য়ে কি আ ভা ষ

০ ১ ২´ ৩
। মা পা না। ধা র্সা র্সর্রা I র্স নর্সধপাঃ মঃ। গা পমপমা -গমরসা} ।
আ মা রে এ নে ছে• ছিঁ ড়ে • • • মা য়া পা • • • • • শ•

০ ১ ২´ ৩
। র্স র্মর্গা র্মা। র্র র্স র্সা I ধা পা মপা। মা মা মা।
বা হি• র ক রে ছে জ গ তে• র পা নে

০ ১ ২´ ৩
। গা রা গমা। পা ধা -ধপা I মপা র্সধা -ধনা। পমা -গমা -রগা } II II
এ ম ন• কি কা • জ্ ত• • • • • রে• • • • •

উটের গাড়ী

কবিতা

বৈশাখের পথ চেয়ে

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

বৈশাখের পথ চেয়ে আছিল বিশাখা,
হায় বৃথা পথ চেয়ে থাকা,
এল যদি এতদিনে, সাথে নিয়ে এল সান্ধ্য ঝড়
মত্ত প্রভঞ্জন-শ্বাস, বৃষ্টি ঝর-ঝর,
বিদ্যুতের শাণিত বিদ্রূপ,
অট্টহাস ভীম বজ্ররূপ,
মেঘ-বুকে লুপ্ত চাঁদ বাঁকা ॥
হায় কোথা মল্লি-বল্লী ফুলের বাসর,
কোথায় মুরলি-সুধাস্বর ?
রক্ত-রাগ সন্ধ্যার ললাটে দীপ্ত তারকার টীপ,
পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদ সুবর্ণের নীপ,
সাহানায় লাস্যের আসর !
তাণ্ডব-বিমুগ্ধ মন মত্ত নটরাজ,
ওড়ে জটা প্রলয়ের সাজ,
সেই উগ্র রুদ্র রূপ বিশাখার চিত্ত-বিমোহন,
তারি পথ চেয়ে নব বর্ষ-আবাহন,
ঝড়ের প্রমত্ত এই দোলা,
বিদ্যুৎ-প্রভায় দৃষ্টি খোলা,
আচম্বিতে মুক্ত ভয় লাজ ॥

গল্প

মহাপ্রভু

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার

"জয় মহাপ্রভু" বলিয়া তিলক-নামাবলীধারী এক বৈষ্ণব দিগম্বরবাবুর বৈঠকখানার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দিগম্বরবাবু নিজের নামের উপযুক্ত সাজ-সজ্জা ভালবাসিতেন না। তিনি সর্ব্বদা বিলাতী অনুকরণে টুপী, পেণ্টালুন প্রভৃতি পরিয়া থাকেন। ঈশ্বর মানেন ত তাঁর অবতার মানেন না; অথচ তিনি জ্ঞানী বলিয়া সমাজের নিকট পরিচিত। রামহরি ভৃত্য, সে ঘরের আলমারীর বইগুলি ঝাড়িতেছিল। একজন বন্ধুর সহিত দিগম্বরবাবু চায়ের ব্যবসায়ের উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। সেই সময়ে "জয় মহাপ্রভু" শুনিয়া দিগম্বরবাবুর মেজাজ গরম হইল—বলিলেন, "উস্কো নিকাল দেও!" বাহিরে একটু গোলমাল হইল, দিগম্বরবাবু তত খেয়াল করিলেন না; সেই মুহূর্ত্তে সেই বৈরাগীবেশধারী বাবাজী সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। মুখে মৃদু হাসি, বর্ণ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, সুবিশাল বক্ষ, চক্ষু যেন ভাবাবেশে ঢলঢল। বাবাজীকে দেখিয়া দিগম্বরবাবুর বন্ধু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন, "বসুন, বসুন!"

"না বাবা, চেয়ারে দরকার নেই, একখানা কুশাসনই যথেষ্ট। তার চেয়েও ভাল জিনিষ মাটী। কারণ লোকে চেয়ারে বসুক আর যেখানেই বসুক, তার ভার মেদিনী ভিন্ন কেউ সহ্য করে না বাবা!"

দিগম্বরবাবুর একটু কৌতূহল হইল তিনি বলিলেন, "আচ্ছা না হয় চেয়ারে দয়া করেই বস্‌লেন, এই জানলেন কি না হিন্দু হ'লেও আসন-টাসনের বড়ধার ধারি নে!"

দিগম্বর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, আপনি কি ভিক্ষে করে বেড়ান?"

"যদি দশজনের সহানুভূতির নাম ভিক্ষে হয়, তা করি বটে! তবে সহানুভূতির নামকরণ আছে; রাজার উপর যে সহানুভূতি তার নাম রাজভক্তি, দরিদ্রের উপর—তার নাম দয়া!"

"আপনি কি দরজায় দরজায় ভিক্ষে করে বেড়ান খারাপ মনে করেন না?"

"যে কাজে দশের সহানুভূতি পাওয়া যায় তা কখন খারাপ হ'তে পারে না!"

"আপনি বিদ্বান অন্য উপায়ে জীবিকা অর্জ্জনের ব্যবস্থা করেন না, তার জন্য আপনার অকর্ম্মণ্যতাকে দোষ দিতে পারিনে কি?"

"জীবিকা অর্জ্জনের অনেক উপায় আছে, কেউ চুরি করে, কেউ শাসন করে, কেউ দাসত্ব করে; সব চেয়ে সেই পথ ভাল যে পথে কোনটাই করতে হয় না।"

"এ রকম ক'রে যদি ভিক্ষুকের দল বেড়ে যায়, তবে দীন-ভারতের কি হবে?"

"দেশের লোক যদি ভিক্ষুক সৃষ্টি করতে পারে তবে ভিক্ষুককে দেখে হতাশ হয় কেন? আমি সে রকম ভিক্ষুকের কথা বলি নে! দেশে এমন একদল ভিক্ষুকের প্রয়োজন—যারা মাত্র ভগবানে নির্ভর ক'রে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে দশের কাজে।"

"বুঝলাম আপনার উদ্দেশ্য মহৎ; কিন্তু আপনার ও গেরুয়া-তিলক-নামাবলীর ঢং কেন?"

"এ ঢংটুকু না থাকলে তোমরা ও আমরা যে ধর্ম্মে ও কর্ম্মে স্বতন্ত্র, তা কেমন ক'রে বুঝবে বল?"

"কিন্তু দেশের সমাজ যে ও ভণ্ডামি ঘৃণা করে!"

"এই মৃণায় পাত্র যেদিন জাগ্‌বে—সেদিন দেশ কতটা উন্নত হবে বাবাজী ?"

"সাধারণ বেশে কি দশের কাজ করা যায় না ?"

"সেবার কাজ ভিক্ষুকের মত সাজে, আপনাদের মত সাজ-সজ্জাধারী সাধারণের কি ততটা মানায় ?"

"সেবার কাজ বল্‌ছেন—আপনি কি রকম সেবা করেন ?"

"যাদের সেবা কর্‌বার ভার সাধারণের উপর নেই—ভগবানের উপর যাদের নির্ভর—তাদের সেবায় কাল কাটাই !"

"তার চেয়ে দেশে দেশে বক্তৃতা, লোকের মনে উত্তেজনার ভাব সৃষ্টি করাটা কি বর্ত্তমানের উপযোগী নয় ?"

"মোটেই নয়। তার জন্য দেশ লোক পেয়েছে। কিন্তু সেবার জন্য যে ভিক্ষুকের দরকার—সেবাব্রতধারী অসাধারণ ভিক্ষুকের প্রয়োজন বাবাজী ! জীর্ণ দেশ উত্তেজনা চায় না, আগে সেবা চায়—বাঁচতে চায়—নইলে উত্তেজিত হবে কে ?"

"শুধু আপনাকেই এ রকম দেখছি ; অন্যান্য বাবাজীর দলে ত রীতিমত রসচর্চ্চা দেখি ! এটা কি আপনাদের নিরীহ ধর্ম্মের দোষ নয় ?"

"রসচর্চ্চা ত বাবাজী সব ধর্ম্মের লোকদেরি আছে, তবে বাবাজীদের বেলায় চোখে পড়ে ; একদিন আস্‌বে যেদিন তারা এটা করবে না ! নারীর মাঝে শক্তি দেখেছিল এই বৈষ্ণবগণ, ভিক্ষুকগণ—ভোগের চোখে নয় বাবাজী—ত্যাগের চোখে। ধর্ম্ম কোন কালে ভণ্ড নয়, অবলম্বী ভণ্ড হ'তে পারে।"

"আপনি মুখে জয় মহাপ্রভু বললেন শুনেছি ; কেন মহাপ্রভু ত বৈরাগীর আদর্শ ; কর্ম্মের দেবতা নহেন—ভক্তির মূর্ত্তি।"

"কর্ম্মের মূলেও যে অনুরাগ আছে, ভক্তিহীন কর্ম্ম থাকিতে পারে না। সে একদিন এসেছিল—যখন দেশের লোক সাম্যের আশ্রয় খুঁজছিল, সেই সময়ে মহাপ্রভু আসেন। কিন্তু তিনি ধর্ম্মের ব্যাঘাত সহ্য করেন নি। সাম্য ছিল তাঁর উদ্দেশ্য, প্রেম ছিল তার ভিত্তি। জগৎ সাম্য চায় ; তাতেই তার শান্তি ফিরে আসবে—শান্তির উপকরণমাত্র প্রেম। সাধারণ ছিল তাঁর দাস, ধর্ম্ম আশ্রিত। কিন্তু এই সাধারণ যখন মানুষের অসাধারণ অত্যাচারে নিষ্পেষিত হ'তে আরম্ভ করে, তখন তাকে যে কঠোর হতেই হবে বাবাজি ! নিপীড়নকারীকে সরিয়ে দিতে হবে। যদি সে অনুনয় ভিক্ষা না মানে, যদি সে দাম্ভিক অর্ব্বাচীন হয়, যদি সে ভগবানের শক্তিকেও উপেক্ষা করে, তখন রুদ্র হতে হবে ; খোল-করতালকে ঢাল-তলোয়ার দিয়ে ঢাকতে হবে ; তার পর আবার গৈরিক পতাকা প্রতি দেশে বার্ত্তা দিয়ে বেড়াবে সেই সাম্যের, প্রেমের। তার জন্য অসাধারণ ভিক্ষুকের প্রয়োজন বাবাজী। যদি ভিক্ষুক বল্‌তে বাধে—তবে অসাধারণ ত্যাগী ও কর্ম্মী মানুষের প্রয়োজন।"

"খোল করতালটা একেবারে বাদ দিলে কি ভাল হয় না ?"

"না, তা দেওয়া হবে না ; তা হ'লে সে তার উদ্দেশ্য—কর্ত্তব্য ভুলে যাবে। সকলের মনে মহাপ্রভুর রূপ জাগাতে হবে, তাঁর তৃষিত অন্তর-বেদনা জানাতে হবে, তাঁর আহ্বান শুনাতে হবে। তাঁর মন্দিরের দ্বারে সারা ভারতের—সারা বিশ্বের প্রাণ হাহাকার করছে আর কোন অত্যাচারী দল তাঁর দ্বারে দাঁড়িয়ে তাঁর দর্শন পথ রোধ করবে—এ যে অসহ্য বাবাজী !"

"মহাপ্রভু মহাপ্রভু ত করছেন। তিনি ত সর্ব্বক্ষণ নিকটেই আছেন—তবে এ সব আয়োজন

কেন? যদি জন্মান্তর মানেন ত প্রতীকারের আয়োজন কেন—প্রতীকার বা মুক্তি ত আস্‌বেই।"

"তুমি যাকে ভালবেসেছিলে, সে না বাস্‌লেও মনটা কেমন করে—আর ভগবানের জন্য এতটুকু আকাঙ্ক্ষাও নেই? শান্তির জন্য এতটুকু তৃষ্ণাও নেই? তবে আমারই ভুল—শান্তির রূপ ত দেখ নি—মহাপ্রভুর রূপ ত দেখ নি—তা হ'লে উন্মাদ হ'য়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে! জগৎ তাঁর কাছে যেতে চায়, বাধা দেয় একদল অর্থলোলুপ অত্যাচারী; তারা ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামি জানে, ভোগের নামে বিলাসিতা জানে, ত্যাগের নামে রক্তদান জানে—কিন্তু শান্তির নামে প্রেম জানে না।"

"বুঝলাম শান্তির উপকরণ প্রেম, কিন্তু লোকদেখান প্রেমের কি দরকার? প্রণাম, পূজা—এ সবের কোনও প্রয়োজন নেই ব'লে মনে হয়।"

"তোমরা যে টেলিফোনে কথা বল, খুব মনোযোগের সঙ্গে কথা ... শেষ হ'লে নমস্কার বলবার সময় হাত তোল কি চোখ বন্ধ কর, সে ত খুব ...নেই হয়। আর ভগবানের সাথে একটু প্রাণের দেওয়া-দেওয়া হ'লে কি তার কান্না দেহে প্রকাশ পায় না? জানই ত, দেহের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। Brain is the organ of mind—কিন্তু Brain তার কতকটা action পায় শরীরের বাইরের উপকরণ থেকেও। যখন মন নত হয়, শরীর কি স্ফীত হ'তে পারে বাবাজী? তুমি যে এ দুঃখেও হাসালে!"

"যে কোনও দিন ভগবানের কৃপা পায় নি—যে কৃপা অনুভবও করে নি, সে কেমন করে চিন্তা করবে?"

"Knowing যা বলছ—সে জানে ভগবানের কৃপা পাওয়া যায়; feeling যা বলছ—সে বুঝতে পারে সে কৃপাপ্রার্থী। এইখানে সে দেহের কাজ করে—আনন্দ করে—অভিমান করে। সে চিন্তা করে ভগবানের কৃপা পাওয়ার—ভগবানের কৃপা কিরূপ—সে চিন্তা করে কি? যাই হ'ক ভগবানকে মানা—তাঁর পূজা করা—আরাধনা করা মানুষের স্বাভাবিক।"

"পূজা বা ধ্যানে রূপ প্রত্যক্ষে আসে?"

"তুমি আর আমি ব'সে আছি—একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় আমাদের ব্যবধানে বায়ু আছে। আর তিনি সর্ব্বত্র সমানভাবে আছেন—তাঁর অনুভূতি চিন্তার ধ্যানে আসে না?"

"কি রকম ক'রে ধ্যান করতে হবে?"

"একটু দৈন্য নিয়ে।"

"যাক—অনেক কথা হ'ল। আপনি কি ভিক্ষা করতে এসেছিলেন এখানে?"

"তোমার একটু অবসর।" বলিয়াই বাবাজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন!

হাসিয়া দিগম্বরবাবু বলিলেন—"আচ্ছা যেদিন চোখে ভগবানকে দেখব, সেদিন আপনাকে মনে পড়বে।'

"ভুল বাবাজী—ভুল বুঝেছ! চোখ যে জিনিষের সন্ধান করে চোখে তা পড়ে। কিন্তু মর্ম্ম দিয়ে যে জিনিষের সন্ধান চাও মনে তা দেখবে! চোখের কামনা আর মনের কামনায় প্রভেদ আছে। মন প্রভু—সে কামনা করে নিজের তৃপ্তির জন্য, চোখ ...—সে কামনা করে প্রভুর তুষ্টির জন্য।"

বাবাজী একটু হাসিয়া বলিলেন—"আশীর্ব্বাদ করি তোমার মনে তৃষ্ণা আসুক!" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। বিকাল বেলায় দিগম্বরবাবু অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু বাবাজীর সন্ধান কেহ দিতে পারিল না।

• • •

প্রবন্ধ

মহিলাশ্রম

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

দুই বৎসরকাল অতীতপ্রায়, একদিন কাশীধামস্থ হিন্দু-মহিলাশ্রমের বিশেষ অধিবেশনে ইহার সম্পাদিকা বিনোদিনী দ্বারা অনুরুদ্ধ এবং কতকটা ইঁহাদের কার্য্যদ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রীত হইয়াও বটে, আমি এই আশ্রমটীর সম্বন্ধে সাধারণের নিকট ইহাকে সমর্থন করিয়া কিছু বলিয়াছিলাম। হয় ত আজিকার এই সম্মিলনে সমুপস্থিতা মহিলাগণের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে সেদিনকার সেই অধিবেশনের স্মৃতি জাগ্রৎ আছে। সেদিন আমি আমার বক্তব্যের মধ্যে এক স্থানে বলিয়াছিলাম :—

"নবাগতকে স্বাগত জানাইতে আমাদের সূতিকাগৃহাবধিই কতই না আয়োজন করিতে হয়, তবেই না লোকে তাহার অভ্যাগমন-সংবাদ জানিতে পারে! প্রসূতি যদি তাঁর নবজাত শিশুটীকে আঁচল ঢাকিয়া কোলের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া দ্বারে শিকল আঁটিয়া লুকাইয়া রাখেন, তবে দুনিয়ার লোকে তার আগমনী তো জানিতেই পারিবে না, পরন্তু প্রকৃতিদেবীও তার অঙ্গের পুষ্টিসাধনে অসমর্থা হইবেন। তাকে বিশ্ব-সংসারের মধ্যে টিকিয়া থাকিতে হইলে, দেহ-মনের পুষ্টি-লাভেচ্ছা থাকিলে বিশ্বের মুক্ত আকাশ ও খোলা বাতাসের তলায় তাহাকে বাহির হইয়া আসিতেই হইবে। এর মধ্যে কোন দ্বিধা-সঙ্কোচের স্থান নাই। কারণ মানুষ যদি বাঁচিতে চায়, তবে তাকে বাঁচার নিয়মগুলা পালন করিয়াই বাঁচিতে হয় এবং যে কোন ছোটরই বড় হওয়া কালে তার অনন্তসহায় হওয়া চলে না, তাহাকে সহস্রের সংস্রবে আসিতেই হইবে।"

সেদিন আমি আরও বলিয়াছিলাম :—

"ছোট হওয়া কোন অপরাধ নয়। সকল জিনিষই একদিন ছোট থাকে, আবার তারাই ক্রমশঃ বড় হয়। আজিকার ঐ বিশাল বনস্পতি—সুবৃহৎ বিটপী-রাজ বটবৃক্ষও তো একদিন বীজ-গর্ভে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় গর্ভাবস্থায় ছিল। মাতৃগর্ভ-প্রসূত সদ্যোজাত অসহায় মানবশিশুই একদিন বিশ্ব-বিখ্যাত লোকপাল পুরুষসিংহরূপে সমুদিত হইয়া থাকেন; পর্ব্বতকুমারী ক্ষুদ্র নির্ঝর-ধারা সখী তরঙ্গিণীগণের সম্মিলনে মহাকায় স্রোতস্বিনীরূপে প্রবহমানা হইতেছেন। এমন কি, এই অসীম ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডও না কি একদিন ধ্বনিমাত্রাবস্থা হইতে ক্ষুদ্রতম অণু-পরমাণুপুঞ্জের স্নেহসম্মিলনে সম্মিলিত হইয়া এই সুবিশাল রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাই বলি ক্ষুদ্র বলিয়া কাহাকেও তুচ্ছ করিবার নাই। ক্ষুদ্রের মধ্যেই মহানের উদ্ভব। ক্ষুদ্রের মধ্যেই জগতের সমুদয় কঠিনতম মহত্তম ভবিষ্য-শক্তি সুনিহিত। কার মধ্যে যে কি আছে, তাহা কেহই জানে না। তবে এইটুকু দেখা উচিত যে, সেই ক্ষুদ্রতর বস্তুটী প্রাণবন্ত কি না, আর তাহাকে সুপথে পরিচালনের

প্রচেষ্টা হইতেছে কি না? তা যদি হয়, তবে যত ছোটই সে হউক, নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে মহত্তর পদপ্রাপ্তির যোগ্যতা সে অর্জ্জন করিবে।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তৎ তৎ দেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবম্ ॥"

জগতের যে কিছু ভাল কাজ তাহা যত ছোটই হোক তাহা তাঁহারই অংশ। তাঁহাকে আমরা সত্যং শিবং সুন্দরং রূপে পূজা করিয়া থাকি। যাহাই শিব অর্থাৎ মঙ্গল—তাহাই সত্য এবং তাহাই সুন্দর। ইহা ব্যতীত জগতে অপর কিছুই প্রকৃত সত্য বা সুন্দর নাই। এই মঙ্গলের মধ্যে তারতম্য অবশ্যই আছে। কিন্তু ইহার কণিকামাত্রকেও আমরা তুচ্ছ করিতে পারি না। কারণ সেই যে কণা, সে সেই মঙ্গলময়েরই অংশ। যে কেহ যে কিছু ভাল কাজের জন্য যত্ন করিয়াছে, চেষ্টা করিতেছে, সেই সত্য মঙ্গলেরই পূজার আয়োজন করিয়াছে এবং করিতেছে। হইতে পারে যে, আয়োজনে নানারূপ ত্রুটী আছে, উপচার-অর্ঘ্যাদি হয় ত পর্য্যাপ্ত নহে, নয় ত একান্তই তুচ্ছ—তথাপি ইহার অন্তস্তলে যে সেবা-উন্মুখ-চিত্ত বর্ত্তমান দেবারাধনার জন্য সেইটুকুই পর্য্যাপ্ত এবং সেই অধিকারেই তাহার প্রচেষ্টাকে আমরা তুচ্ছ করিতে পারি না। আশা করি, এরূপ মহিলাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আজকালকার দিনে আমাদের মধ্যে কাহারও মতভেদ নাই।

এই প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রথমতঃ অর্জ্জন করা চাই স্থানীয় মহিলাবৃন্দের সহানুভূতি।

দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত পাত্রীদিগের দ্বারা যথোচিতভাবে পর্য্যবেক্ষণ।

তৃতীয়তঃ সর্ব্বসাধারণের দ্বারা যথাসাধ্য অত্যাধিক অর্থসাহায্য।

এই তিনটীই প্রধানতঃ আবশ্যক।

ইহার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির উপায় উদ্ভাবন করা আজিকার এই সভার কার্য্য।

এই আশ্রমটী যেরূপ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল, নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। ইহাতে হয় ত অনেকেই দুঃখিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। কারণ সেদিনে ইহার প্রতি অনেকেরই স্নেহ-দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছিল, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু এই আশ্রমটী যেরূপ কঠিন বাধা-বিপত্তি ঠেলিয়া ও নানারূপ অভাব ও অভিযোগের ভিতর দিয়া আত্মরক্ষা করিয়া চলিয়াছে, তাহাতে আমি আর ইহার প্রাণশক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান নহি। গতবারেই আমি বলিয়াছিলাম যে, ক্ষুদ্র হইলেও ইহার মধ্যে জীবনী-শক্তির সন্ধান যেন আমি পাইয়াছি বলিয়াই আমার মনে হইয়াছিল। আর জীবিত বস্তুর ধর্ম্মই যে বর্দ্ধিত হওয়া তাহা বৈজ্ঞানিক সত্য। যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন প্রাণবন্ত বস্তু নিজের ক্ষুদ্রত্ব লইয়া নিশ্চল থাকিতে পারে না।

তাই আজও আমি আশা করিতেছি যে, যে ক্ষুদ্র শক্তি এতদিনের প্রতিকূল বাধা ঠেলিয়া নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে তাহার বৃদ্ধি হয় ত কোন প্রবল রোগশক্তির দ্বারা কিছু দিনের জন্য বাধা প্রাপ্ত হইলেও কখনই চিরবাধাগ্রস্ত থাকিতে পারিবে না। একদিন না একদিন এই সকল তমোশক্তিকে পরাভবপূর্ব্বক সে আ তার গতিপথে পরিচালিত হইয়া আপনাকে করিতে পারিবে। এই বড় হওয়ার জন্য উপযুক্ত সাধনার প্রয়োজন। কঠোরসাধনা ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না।

"উদ্যমেন হি সিদ্ধন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।"

আমি যতদূর বুঝি সাধনার অন্তরায় এই কয়টী—

১। শারীরিক অসুস্থতা বা অপটুত্ব।

২। সাধকদিগের মধ্যে লক্ষ্য স্থির না থাকা।

৩। হৃদয়-দৌর্ব্বল্য।

ইহাদের মধ্যে প্রথমটী আমাদের আয়ত্তের অনধীন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দুইটাই কতকটা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে।

সাধক বলিতে আমি যাঁহারাই এই সকল মঙ্গল কার্য্যের উত্তরসাধকরূপে ইহাদের সহিত স্বল্পমাত্র সংশ্লিষ্ট আছেন তাঁহাদের সকলকেই দায়ী করিতেছি। যেহেতু সাধারণের কার্য্য সর্ব্বসাধারণেরই চেষ্টাজাত। ইহা একের ঘাড়ে চাপাইতে গেলে তাহার পক্ষে 'বোঝা' হইয়া উঠে, পরন্ত পাঁচের হাতে তাহা লাঠির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে।

তাই বলিতেছিলাম যে, আমাদের আয়ত্তাধীন যেটী নহে তাহার সম্বন্ধে দৈবাধীন থাকিয়া আমাদের আয়ত্তের মধ্যে যে দুইটী উপায় আছে আমরা তাহা পালনে যেন অযত্ন না করি। আমার মনে হয়, দ্বিতীয়টী অর্থাৎ লক্ষ্য সম্বন্ধে স্থিরতা বিষয়ে এক্ষণে আর কেহই ভুল করিবেন না, যেহেতু এইরূপ আশ্রমের যে বহুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং দুইটী থাকিলে তিনটী আবশ্যক নাই, একথা বোধ করি আজ আর কেহই মনে করেন না। কারণ এদেশে নারীর অভাব যে কিরূপ প্রবল এবং এই জীবন-সংগ্রামের দিনে নিত্যই তাহা বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা নিতান্ত অনভিজ্ঞ ব্যতীত সকলেই জানেন। এজন্য অনাথাশ্রম, বিধবাশ্রমের সংখ্যা বৃদ্ধি বা বিভিন্ন প্রকারের রুচি, প্রবৃত্তি ও কার্য্য-প্রণালী পরিচালিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অভাবগ্রস্তাদিগের জন্য বর্ত্তমান থাকায় কাহারও আপত্তি হওয়া সম্ভব নহে।

তার পর তৃতীয় অন্তরায়টীর কথা।—এইটীই আমাদের সকল কার্য্যের মধ্যেই প্রায়শঃ উপস্থিত হইয়া আমাদের সকল কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে পারে, বা করে বা করিয়াছে, অথবা এখনও করিতেছে। উহারই দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা কাহাকেও একটুখানি বর্দ্ধিত হইতে দেখিলে তাহার 'বাড়' কমাইয়া ফেলিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠি। হয় ত শূন্য ভিত্তিতেও নিন্দার প্রকাণ্ড প্রাসাদ রচনাপূর্ব্বক ক্ষুদ্র ভিত্তিটুকুরও মূলোৎপাটন-চেষ্টা করি। আবার এই সকল হীনচিত্ত বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত ব্যক্তির পরশ্রীকাতর দুর্ব্বল-চিত্ততায় বিরচিত অলীক কুৎসার বিজৃম্ভনে বিড়ম্বিত হইয়া হয় ত বা আমরা আমাদের হৃদয়স্থিত হৃষীকেশের দ্বারা নিয়োজিত কার্য্যটুকুকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়া মিথ্যারই জয় ঘোষণা করিয়া থাকি। তবে এরূপ হওয়া নূতন বা বিচিত্র নহে। 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি'—এটা প্রাচীন প্রবচন। সৎকার্য্যহানির জন্য চেষ্টা সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালেই আচরিত হইয়াছে। যে কার্য্য যতটুকু বড়, তাহার সাধনপথের বিঘ্ন ততটুকুই প্রবল। জগতের চিরপূজ্য দেব-সদৃশ ব্যক্তিবৃন্দকেই কত বড় বড় প্রবল বাধা ঠেলিয়া সত্য-প্রচার করিতে হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত আপনারা জানেন, তাঁহাদের তুলনায় আমরা তো সমুদ্রসমীপে গোষ্পদতুল্য, এবং আমাদের কার্য্যও সমুদ্রকূলে বালুকণা। অতএব ভগিনীগণ! এস আমরা আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিহারপূর্ব্বক আমাদের যথাসাধ্য মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠানগুলিতে যোগ দিয়া যেন মনে করিতে পারি, আমার নিজের কর্ত্তব্যই আমি পালন করিতেছি। ইহা নিন্দুকের বৃথা নিন্দা-কুৎসা-গ্লানিতেও পরিত্যক্ত হইবার নহে। ইহা নিন্দিতের দোষ-সংশোধনের সহায়ক হইয়া তাহাকে পুনঃধৌত করিয়া ক্লেদমুক্ত করিবে, পরন্ত

একের দোষে সঙ্ঘের ক্ষতিকারক হইতে পারিবে না, যে হেতু ইহা আমারই কার্য্য, আমারই পূজা। সহস্র কর্ম্মী শত কার্য্যে শত দিকে নিরত থাকিলেও আমার কাজটুকু আমা ব্যতীত কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। জগতে সহস্র উচ্চ শ্রেণীর সাধক বর্ত্তমান থাকিলেও তাঁদের উপর ভার দিয়া আমরা কি আপনাপন ইষ্টার্চ্চনে বিরত হইয়া থাকি? না যথাশক্তি নিজ নিজ অভীষ্টের পূজা নিজেই করিয়া তৃপ্ত হই ও মনে করি—

"বিশ্ব তোমার চরণ পূজে তবু যেন মনে হয়;
আমি না করিলে পূজা—পূজা তব নাহি হয়।"

আসুন আমরা এই ভাব মনে রাখিয়া সাধ্যানুসারে সর্ব্বত্র হইতেই সমিধ-পুষ্প-পল্লবাদি গ্রহণ করিয়া পুরাতন ভগ্ন উপচারাদি আহরণপূর্ব্বক আবার নূতন করিয়া বিশ্বদেবতার প্রীত্যর্থ তাঁহারই পূজার আয়োজন সাজাইয়া তুলি। সে দিনের মত আজও আবার বলিতেছি,—স্বদেশ-প্রেমের জলন্ত আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দের এই অগ্নিময়ী বাণী আমাদের পূজার মন্ত্র হউক,—"লক্ষ লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাসরূপবর্ম্মে সজ্জিত হইয়া দরিদ্র, পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতি-জনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধিয়া সমগ্র ভারতে বিচরণ করুক। মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা দ্বারে দ্বারে ঘোষণা করুক।"

তাপ্তী নদী—খেয়াঘাট

কবিতা

সার্থকতা

শ্রীমানকুমারী বসু

(১)

আমি সদা ভাবি এক কথা
জীবনের কিসে সার্থকতা ?
প্রফুল্ল কুসুম-সম,
সোণার শিশুটী মম,
আননে মাখান যেন বিশ্বের মমতা,
সেইটুকু বুকে নিলে,
চাঁদ-মুখে চুমু দিলে,
স্বরগের সুখ মিলে—সে তো খাঁটি কথা
তাই কি গো জীবনের সত্য সার্থকতা ?

(২)

অথবা এ সংসার ছাড়িয়া
বেড়াইব সন্ন্যাসী হইয়া ?—
ক্ষুদ্র গৃহ পরিহরি,
বিশ্বেরে নিজস্ব করি,
আপনারে বিশ্বমাঝে দিব বিলাইয়া ?
তা হলে কি ভগবান !
সার্থক হইবে প্রাণ,
কি চাও আমাতে তাই দাও বুঝাইয়া।

(৩)

বুঝি ভ্রান্ত আমি গিয়াছি ভুলিয়া,
সুখে দিছি অসুখ মাখিয়া ;
নিঠুর নির্ম্মম স্বার্থ
করিয়াছে "অপদার্থ"
আনন্দ আরাম তাই গিয়াছে চলিয়া !
ভুলেছি কর্ত্তব্য, পুণ্য,
তাই হৃদি এত শূন্য,
সংসার সন্ন্যাস দোঁহে হাসিছে দেখিয়া !

(৪)

তবে কেন ?—প্রহেলিকা নয়,
প্রাণ যদি দেবতার হয় ;
তা'তেই সকলি পুণ্য,
সুখ-শান্তি পরিপূর্ণ,
সংসার সন্ন্যাস সবি সম সুধাময়।
খোকার সোণার মুখ
অথবা পরের সুখ
আমার বাঞ্ছিত সম—ছোট বড় নয়।
এত বিঘ্ন বাধা কিসে,
কেন জ্বলে মরি বিষে,
দেবের সন্তান আমি—সে তো যে নিশ্চয়,
জীবনের সার্থকতা তা' হলেই হয়।

জীবন-চরিত

তরু দত্ত

শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম-এ, বি-এল

পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কবিবর শশিচন্দ্র দত্তের চিত্র-প্রদর্শনীতে হাস্য-রসোদ্দীপক দুই একখানি মুসলমান-চরিত্রের চিত্রও আছে। "জবরদস্ত খাঁর গান" (The Lay of Zubberdust Khan) নামে যে কবিতা তিনি রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে কবির কৌতুক-প্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

"Ho !" said Zubberdust, speaking loud,
"Thus shall we reign, my minions, hear !
Whate'er I say, it must be done ;
Wrong you must make like right appear.

* * *

"Reports you must write in pure Kalmuck
I hate the nasty colour blue ;
Let it be red, the book large sized,
The accounts all flaring, though not true.

* * *

Thus Zubber acts ; thus Zubber thinks,
This Zubber means; that Zubber hopes ;
Such be the burden of your song,
Garnish'd with similes and tropes."

দত্ত কবিদের মধ্যে তরু দত্ত ব্যতীত প্রত্যেক কবিই ভারতে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। আমরা সেই জন্য "আলবামে" মুসলমান-চরিত্রের এত বেশী চিত্র দেখিতে পাই। তরু দত্তের কবি-হৃদয়ে মুসলমান-সভ্যতা রেখাপাত করে নাই বলিয়া মনে হয়। তাঁহার কাব্য-গ্রন্থে মুসলমান-শাসিত ভারতের উল্লেখ নাই। "আলবামে"র চিত্রাবলীর মধ্যে সেইজন্য এই শ্রেণীর কোনও রচনার প্রভাব তরু দত্তের রচিত কোনও পদ্য বা কাব্য গ্রন্থে আদৌ অনুভূত হয় না। তরু দত্তের ইংলণ্ডে অবস্থানকালে যে বৎসর (১৮৭০) "আলবাম" লণ্ডনে প্রকাশিত হইয়াছিল সেই বৎসর হইতে ফ্রান্সের জীবন্ত ইতিহাস তাঁহার উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা কোনও কালে লোপ পায় নাই।

"আলবামে"র কবিরা ঐতিহাসিক পন্থা অনুসরণ করিয়া কেবল যে মুসলমান সম্রাটগণের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন তাহা নহে। মুসলমান রাজত্বের সমকালে ভারতের হিন্দু রাজাদের, বিশেষতঃ রাজস্থানের নরপতিগণের যে বীরত্বের কাহিনী তরবারিমুখে বাহির হইয়া ইতিহাসে পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়াছিল, দত্ত কবিরা দেশাত্মবোধের সেই অপূর্ব্ব কাহিনী ইংরাজি কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভারতের বীর-নারীর অনেকগুলি সুন্দর চিত্রও তাঁহারা অঙ্কিত করিয়াছেন। এই শ্রেণীর "রাখী" (The Rakhi) শীর্ষক "আলবামে"র কবিতাটি হরচন্দ্র দত্তের রচিত।

Wear, wear this fillet round thy arm.
Thou brave and noble knight,
Thy gallant war-horse paws the ground,
Impatient for the fight.

* * *

A sister's love for thee hath wrought
This silken tie so fair,
That thou protected by the gods
The deadly fray may'st share.

* * *

Thy flashing eyes full plainly tell
Thou'lt not disgrace the band,
If e'er the impetuous tide of war
Roll where thy loved ones stand.

* * *

And sheath not, knight, thy gleaming blade
Till routed is the foe ;
And as the chaff before the wind,
Before thy ranks they go.

* * *

And when by glorious Victory crowned
Thou tread'st the bloody field,
Spare, by my tears, the wounded foe ;
Be thou their help and shield.

* * *

But hark ! the tocsin's quivering peal
Bursts on my ear from far
Mount, mount thy steed that proudly neigh
To join the ranks of war.

কবি হরচন্দ্র ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আর একজন রাজপুত বীর-নারীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই চিত্রের নাম "তারা বাঈ" (Tarra Baee)—

She set upon her palfry white
That damsel fair and young,
And from the jewelled belt she wore,
Her trusty rapier hung ;
And chieftains bold and warriors proud,
Around her formed a gallant crowd.

* * *

A helmet clasped her forehead fair,
A shield was by her side—
The helmet was of polished steel
The shield of bison's hide ;

And as she spoke, the evening air
Disported with her raven hair.

* * *

'From girlhood, I have shunned the sports
In which our sex delight,
And wield the falchion bright ;
To meet the tigress turned to bay,
And guide the war-horse in the fray.

* * *

'From girlhood, I have vowed a vow
Our honour to redeem
And make my noble father's name
Of every song the theme ;
To rescue Thoda from the slave
Who lives to fill a coward's grave.

* * *

'And till my life-blood's purple flow
Stands stagnant in my veins,
That early vow to see fulfilled
I'll spare nor strength, nor pains
To those who join me in the war
I'll be a radiant beacon star !

* * *

'My hand—'tis his who foremost scales
The ramparts of the foe,
And to the wicked Lilla deals
The dread avenging blow,
Go, warriors—these alone decide,
The man who wins me as his bride.

"রাজা ও জন্মভূমির জন্য" (For King and Fatherland) "আলবামে" রক্ষিত আর একখানি চিত্রের নাম। চিত্রাঙ্কনশিল্পে সিদ্ধহস্ত কবি উমেশ-চন্দ্র এই চিত্র রচনা করিয়াছেন।

It was a Rajpoot young and tall,
Upon whose neck his bride
Hung weeping, that the cruel wars
Should wrest him from her side.

'Nay, weep not, love ! high hopes are mine ;
Canst thou not understand
'Tis sweet to shed our heart's best blood
For King and Fatherland !'

* * *

And he has kissed her burning cheeks,
And said his last 'adieu' ;
And lightly vaulted on his steed,
And vanished from the view ;
'Away ! May God vouchsafe to me
Fresh strength to wield this brand,
To strive as best beseems a knight
For King and Fatherland !'

* * *

They met the foe, the patriot host
Fought gloriously that day—
Oh, broken was the Moslem shield,
Dispersed his proud array !
For who could stem the rushing tide,
Resist that fearless band,
Whose battle cry their purpose told,
'For King and Fatherland !'

* * *

Baek to the city, laurel-crowned,
The knight returned in state,
Before the lady of his love
He knelt with heart elate :
'My task is done, I come to thee'
(She clasped his manly hand),
'Our King is firm upon his throne
And free our Fatheland !

উমেশচন্দ্র দত্তের চোহান রাজপুত "রাণা সঙ্গের পলায়ন" (Thc Flight of Rana Sanga) নামে চিত্রখানি আর্স্কিন্-(Erskine's "India") লিখিত ভারতের ইতিহাস হইতে গৃহীত। বাবরের বিপুল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া রাজপুত বীরগণ যখন দেখিলেন যে, জয়ের আশা কিছুমাত্র নাই, তখন তাঁহারা রাণাকে পলায়ন করিতে নির্ব্বন্ধাতিশয্য সহকারে প্রার্থনা করিলেন। রাণা অনিচ্ছায় যুদ্ধস্থল হইতে চলিয়া গেলে তাঁহার সৈনিকগণ শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া রণাঙ্গণে প্রাণত্যাগ করিলেন। এই কবিতায় রাজভক্তি ও স্বদেশপ্রেমের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, সমরোত্থিত ভীষণ শব্দের প্রতিধ্বনিও তেমনি স্পষ্ট শুনা যায়। উমেশচন্দ্র দত্ত-রচিত আর একজন রাজপুত বীরের —The Chief of Pokurna—চিত্রও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। টড-(Tod's "Annals of Rajasthan") লিখিত "রাজস্থানের কাহিনী" হইতে এই চিত্রের মূল আদর্শ গৃহীত হইয়াছে। বর্ণনার মনোহারিত্বে এই কবিতা অনন্যকরণীয়।

Within the merry greenwood,
At dawning of the day,
Four-and-twenty armed men
In silent ambush lay.
They wait like couchant leopards,
Their eager eyes they strain,
And look towards the lonely glade,
Towards the distant plain.
Naught see they but the golden corn
Slow-waving in the sun,
Naught see they but the misty hills
And uplands bare and dun.
The rustle of the forest leaves,
The trampling of the dear,
The chirp of birds upon the boughs,
Are all the sounds they hear.

* * *

But hark ! they catch the thrilling notes
Of a distant bugle horn
Come pealing through the wild ravine,
By the morning breezes borne :
Lower they stooped, and anxiously
Their laboured breath they drew,
And clutched their brands with nervous hands—
Their quarry is in view,

Attended by a single squire,
Slow riding up the glen,
Unconscious that his path's beset
By armed and desperate men ;
A brave gerfalcon on his wrist,
The bugle on his breast,
The sunlight gleaming brightly on
His nodding plume and crest.

* * *

Not clad in steel, from head to heel,
In satin rich arrayed,
With his trusty sword, Pokurna's lord
Is riding through the glade,
To see his falcon proudly soar
And strike, he comes so far ;
In peaceful guise he rideth on,
Nor dreams of blood or war.
All sudden from their ambush
The treacherous foemen rose,
With vengeful eyes and glittering arms,
With spears and bended bows :
And ere the chief could draw his blade,
They hemmed him darkly round,
And plucked him from the frightened steed
And bore him to the ground.

মারবারাধিপতির রাজসভায় বন্দী নীত হইলে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। বীরগর্ব্বে বন্দী বলিলেন,—"আমার পুত্র ইহার প্রতি:শাধ লইবে।" গিরীশচন্দ্র দত্তের একখানি চিত্র—"Samarsi"—নির্ব্বাসিত রাণা প্রতাপের আদর্শে অঙ্কিত।

Samarsi the bold is the pride of his clan,
But he owns not an acre in broad Rajasthan ;
Samarsi the bold is the hope of the true,
But his sporran is empty, henchemen are few,
For the Moors o'er the Jumna in triumph have come,
And Samarsi the bold is our exile from home.

* * *

Though the Moslem now feasts in his hall and his bower,
And the crescent flag flutters from temple and tow.r,
Though the case and the forest, the pass and the height,
Are watched by the soldiers by day and by night,
Samarsi the bold is as merry as when,
His will was the law in his loved native glen.

* * *

For the roebuck still bounds by the dark haunted lake,
And the partridge still springs from the deep tangled brake,
And the perch and the salmon in silv'ry shoals gleam,
At morning and noontide in pool and in stream,
And spite of their warders on hill and on plain,
Samarsi can harry his father's domain.

* * *

Though an outlaw decreed by the chiefs of the foe,
Samarsi has homage from high and from low,
For the copsewood is heavy by Saloombra park,
And the vale of Banmora at noonday is dark,
And he's ready, aye ready, right firmly to stand
By the wood or the pass with his sword in his hand.

* * *

In the cave of Pokurna, beneath the green hill,
Where the throstle keeps time to the soft-crooning rill,

Samarsi at nightfall, unknown to the Moor,
Lights his watch-fire in peace, when his
labours are o'er,
And revels in freedom till morning again
Gives the signal to mount and ride down to
the plain.

গিরীশচন্দ্রের আর একখানি চিত্রে—"Sunjogta"—বীর-রমণী সংযুক্তা মহাদেবের নিকট "পৃথ্বীরাজের জয় হউক", ব্যথা-ভরা হৃদয়ে এই প্রার্থনা করিতেছেন।

But o'er that sea of waving silks one
glanced supremely tall,
And o'er those files of glimmering crests
one brighter shone than all,
And when by trysting-tree and scaur that
flag and crest swept by
With loud aclaim young Prithi's name
she heard people cry,
Her heart was sad, her spirits faint, and
fearful was the sight
Of spears in rest and prancing steeds and
men in armour dight,
But grief and fear she cast aside, and never
ceased to pray
To Gouri's lord, when rung that shout, to
guard her love alway.

স্বদেশ ও বিদেশে যে সকল স্থানে দত্ত কবিরা ভ্রমণের জন্য বা কার্য্যোপলক্ষে গমন করিতেন সেখানকার চিত্র তাঁহারা কবিতাকারে রচনা করিতেন। এই শ্রেণীর অসংখ্য চিত্র "আলবামে" ও গিরীশচন্দ্র দত্ত-প্রণীত "চেরী ষ্টোন্স" (Cherry Stones) ও "চেরী ব্লসমস্" (Cherry Blossoms) নামক কাব্য-গ্রন্থে আছে। এই চিত্রগুলির মধ্যে গিরিশচন্দ্রের রচিত কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য। "মাল্টা"র (Malta) "zig-zag ramparts" ও "villas white" কবির দৃষ্টিপথে আসিলেও এই দ্বীপ যে সেন্ট পল্ (St. Paul) রোমের পথে দর্শন করিয়াছিলেন কবির মনে সেই কথারই উদয় হইয়াছিল। "জিব্রলটার" (Gibraltar) নামক চিত্রখানি অতি সুন্দর!

The flag that here floats proudly in the air,
The silent warders on the ramparts white,
The guns that hide in sheltered nooks
from sight,

* * *

All speak of stern resolve, and watchful care,
For leagued in arms should Europe rise once
more,
To question on this steep the Lion's reign,
Swift must the deadly hail of battles pour—

"আবুকার" (Aboukir) ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জল-যুদ্ধের স্থূল নক্সা। "দূর হইতে এডেন্" (Off Aden) কবির তুলিকামুখে জীবন্ত দৃশ্যের চিত্র ফুটাইয়া বাহির করিয়াছে।

The helpful lascar scans with ravished eye,
The hardy fisher's unpretending cot,
On this stupendous coast where trees are not

* * *

And oft when leisure serves, he gaily notes
The simple implements that lie around
Its rough built walls—nets, jars, and
bamboo floats
With strips of pliant cane securely bound,
Or marks the thin smoke from its roof aspire,
Like a dull snake devoid of strength and fire.

"গোয়ার সন্নিকট" (Near Goa) সুপ্রাচীন রোমান কাথলিক গির্জ্জার অত্যুৎকৃষ্ট আলেখ্য।

I love this churchyard by the voiceful sea,
With its low wall, its heaps of mouldered
stone,
Its shattered urns, its effigies o'erthrown,
Its velvet turf, its gloomy banyan-tree,
Its timid bats that flit mysteriously,
Like ghosts at nightfall, and its bell
whose tone

Reminds the pilgrim as he plods alone,
That Time glides onward to Eternity.

বস্‌ফরাস্ (Bosphorus) হইতে স্তাম্বুলের (Constantinople) দৃশ্য যথার্থই মনোহারী।

A mighty thrill of rapture stirred my heart
When from the Bosphorus, arrayed in light,
The Sultan's city started up to sight;
Spire, column, terrace, street and crowded mart,
Seemed fairer far than aught enchanter's art
Called up in yore. Far off like sea-gulls white,
Winging through sun and shade their restless flight,
A hundred glancing sails appeared to meet and part:—

লণ্ডনের "smoke and defeating jars," বরিশালের কামান-গর্জ্জন, কলিকাতার কলেজ স্কোয়ারে খাঁ সাহেবের বাটী, নেপালী কৃষক, উইল্কি চিত্রশালা, কাঞ্চনগিরির দৃশ্য, বারাণসী, নাইনীতাল, ল্যাণ্ডর, কুলওয়ারের সন্নিকটে চিনি পাহাড়, তিস্তা উপত্যকা, শোণের উৎস-মুখ, সুন্দরবন, গিরিডীর এক দৃশ্য, তাজমহল, বরমগড় প্রভৃতি বিস্তর চিত্রে গিরীশচন্দ্রের রচনা-শিল্পে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত, "আলবামে" কালীঘাট, গঙ্গা-বক্ষে রাত্রি, ভিজাগপত্তম, এলিফাণ্টার গুহা, মান্দ্রাজ, কালাপাহাড়, রাত্রিকালে সমুদ্র, পুষ্পবাড়ী, সীতাকুণ্ড প্রভৃতি বহু স্থানের ও খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেলে উল্লিখিত কয়েকটি তীর্থের চিত্র আছে। এই সকল চিত্রের অধিকাংশ বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে রচিত। "আলবামের" কবিরা প্রায়ই সনেটের মাউণ্টে চিত্রগুলি আঁটিয়া রাখিয়া-ছেন। "গৌড়" নামে একখানি চিত্রে বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী কবি-কল্পনার সাহায্যে অকস্মাৎ পাঠকের মানস-নয়নে ভাসিয়া উঠিয়া সুদূর অতীতকে কি ভাবে যে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে তদ্বিষয় চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। রঙ্গমঞ্চে দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে পট-পরিবর্ত্তনের সহিত যে কৌশলে দর্শককে লইয়া যাওয়া হয় তদপেক্ষা ক্ষিপ্রতার সহিত কবি ধ্বংসাবশেষ হইতে উক্ত রাজধানী সৃষ্টি করিয়াছেন।

I gazed upon the ruins wrapt in thought:
Sudden they melted to my dreaming sight,
And in their place rose-moated castles bright,
Like the great temple, all in silence wrought.
The scene with deepest interest was fraught,
Banners unfurled like meteors melted the light,
And armour rich, prismatic colours caught,
As sentries slowly paced each guarding height.
The streets were peopled with a varied throng,
Brave men and bashful women half afraid,
Huge elephants forward urged by man and thong,
And snorting steeds in trappings rich arrayd,
In one continuous tide were borne along,
White martial music at a distance played.

এই সুন্দর কবিতা তরু দত্তের পিতা গোবিন্দচন্দ্র দত্তের রচিত। দত্ত কবিরা "আলবামে"র যুগে ইংরাজ-শাসিত শান্তিপূর্ণ ভারতের নানাস্থানে ও পাশ্চাত্যের বহু দেশে ভ্রমণ করিয়া দর্শনীয় যে সকল প্রাচীন ও আধুনিক জনপদের চিত্র অঙ্কিত করিয়া-ছিলেন, ভূ-পৃষ্ঠে অনন্ত বৈচিত্র্যময় বাহ্যপ্রকৃতির যে সকল দৃশ্য দেখিয়া তাহার বর্ণনা কবিতার আকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, "আলবামে"র আধারে তাঁহারা তৎসমুদয় সাজাইয়া রাখিয়া বিগত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল প্রকারান্তরে তাহার

ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। গৃহকোণের বাঙ্গালী "আলবামে"র আসরে বিশ্ব-পর্য্যটকরূপে প্রকট। পাশ্চাত্যের সংস্রবে আসিয়া তাহার সৌন্দর্য্যদৃষ্টি পৃথিবীর সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত। বাস্তবিক "আলবামে"র আলোকে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ইতিহাস সমুজ্জ্বল। বাঙ্গালার সুসম্পূর্ণ আধুনিক ইতিহাস যদি কেহ লিখিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তিনি "দত্তদের পারিবারিক আলবামে" তাহার উপযোগী বিস্তর উপকরণ যে পাইবেন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। পর্য্যটকের বহুদর্শিতা ও কবি-কল্পনার সংমিশ্রণে যে অভিনব কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহার তুলনা সেইজন্য ইংরাজি বা বঙ্গভাষায় বাঙ্গালীর লিখিত কোনও কাব্য-গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

রামবাগানের দত্ত কবিরা অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার বাহ্য-প্রকৃতির অধিকার হইতে বিস্তর মনোরম চিত্র সংগ্রহ করিয়া কবিতার আকারে সেই চিত্রগুলির বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আলোচ্য "আলবামে" রক্ষিত এই চিত্রগুলির মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তরু দত্তের ১৮৭০ সালে লণ্ডনে অবস্থানকালে "আলবাম" লংম্যান্স গ্রীন্ এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। প্রাচ্য-প্রকৃতির রহস্য-লীলা, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের চিত্রাবলীর অন্তর্নিহিত ভাবরাশি কিশোরী তরু দত্তের সুকুমার কল্পনাকে যে সুদূর প্রবাসে বিচলিত করিয়াছিল তাহার জন্য "আলবামে"র কবিরাই দায়ী। "আলবামের" আলোচ্য চিত্রাবলীর আলোকে তরু দত্তের রচিত "হিন্দুস্থানের গাথা ও কাহিনী" পাঠ করিলে বুঝা যাইবে, এই মহিলা কবির চিত্রকলা স্বজনগণের নিকট কতটা ঋণী। তরু দত্ত ও "আলবামে"র কবিদের মধ্যে ভাষা ও ভাবের ঐক্য শুধু বাহ্যপ্রকৃতির বর্ণনায় লক্ষিত হয় না, মূল আদর্শ তাঁহারা সকলেই যে ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতির রাজ্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। "বাগমারি" ও "ঝাউ বৃক্ষের" (Casurina) চিত্রকর যে তাঁহার চিত্রাঙ্কন-শিল্পের উপকরণ "আলবাম্" হইতে আহরণ করিয়াছিলেন তাহার অকাট্য প্রমাণ গোবিনচন্দ্র দত্ত-প্রমুখ কবিদিগের রচিত বহু কবিতায় পাওয়া যায়। "আলবামে"র সর্ব্বপ্রথম কবিতা "গৃহ" (Home) গোবিনচন্দ্র দত্তের রচিত।

No picture from the master hand
  Of Gainsborough or Cuyp may vie
With that which at my soul's command
  Appears before mine inward eye
In foreign climes when doomed to roam—
  Its scene my own dear native home.

* * *

What though no cloud-like hills uprear
  Their serried heights sublime afar !
What though the ocean be not near,
  With wave and wind in constant war !
Nor rock nor sea could add a grace,
  So perfect seems the hallowed place.

* * *

Casuarinas in solemn range
  At distance look like verdant hills,
And winds draw from them music strange
  Such as the tide makes when it fills
Some shingle-strown and land-girt bay
  From men and cities far away.

* * *

And round, as far as eye could reach
  What vivid piles of foliage green !
Mango and shaddock, phim and peach,
  And palms like pillars tall between
And emerald sea surrounds the nest,
  A sea for ever charmed in rest.

* * *

What roses blossom on the lawn !
What warblers on the bamboo boughs,
Lithe and elastic, swing at dawn,
And pour their orisons and vows !
What dew upon the greensward lies !
How lovingly look down the skies !

* * *

And at high noon when every tree
Stands brooding on its round of shade,
And cattle to the shelter flee
And there, in groups recumbent laid,
Gaze ruminant—what deep repose
Lies on the landscape as it glows.

* * *

But most at evening's gentle hour
The reign of Peace is clearly read,—
In the blue mists which hail her power,
Pavilions rich and banners spread,—
While 'mid the hush is heard the tone
Of night's sweet minstrel—hers alone.

* * *

As star by star leaps out above,
As twilight deepens into night,
As round me cluster those I love,
And eye meets eye in glances bright,
I feel that earth itself may be
Lit up with heaven's own radiancy.

উদ্ধৃত কবিতার রচয়িতা গোবিনচন্দ্র যখন ইংলণ্ডে তরু ও অরুর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়ে যে তিনি বঙ্গ-প্রকৃতির সৌন্দর্য্যরাশি চিত্রাকারে অঙ্কিত করিয়া ইংরাজি ভাষার ক্রমে গ্রথিত করিয়াছিলেন তাহা সুনিশ্চিত। তরু দত্তের একাধিক গদ্য ও পদ্যময় রচনায় এই কবিতার প্রতিধ্বনি শুনা যায়। "আলবামে"র কবি মানব-হৃদয়ের বিবিধ ভাব উদ্ভিদের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া প্রকৃতিকে অনুভূতিময় করিয়া তুলিয়াছেন। সন্ধ্যা-সমাগমে কবি মলয় পবনকে সম্বোধন করিয়া একটি কবিতায় বলিতেছেন,

"কোথায় তুমি ?" "তোমার মৃদু মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিবার জন্য প্রকৃতিদেবীর হৃদয় অধীর হইয়া উঠিতেছে! তবু তুমি সমুদ্রবক্ষে আনন্দোৎসবে মাতিয়া বিচরণ করিতেছ ?"

"What keeps thee from us ? Wherefore this delay ?
The rose is yearning for thee, holding up
With a reproachful air her incense-cup,
And the pale lotus wafts in sighs away
Her virgin heart, and that still paler flower,
The eldest born of eve, and fairest far
Of all her children, which unbidden blooms
In every thicket where the queen of night
Pours forth her golden shower,
Hangs down her head in sorrow like a star
New-fallen on earth and mourning 'mid its glooms
For regions, where it dwelt of endless light.
The shades of evening deepen. Veil on veil
Falls on the landscape. Rising from the stream,
Whose sluggish waters now more sluggish seem,
Faint mists—as faint as gauze—on ether sail
And spread their haze the palm's tall plumes around,
On which the fire flies sparkle. Silence steals
Where late the feverish pulse of life beat high—
A silence that expects thee, bids thee speed,
A silence most profound !
And now the rising moon the tank reveals
Where cattle drank : its waveless waters lie
Reflecting but the sky and bending reed.

Hark ! from the distant roofs the
Bramin's bell !
That well-known summoner with its
silver tone.
Again—again—canst thou that spell disown
And linger yet upon the billow's swell ?
No ! No ! I hear thee rustling 'mid the
boughs,
Weary of earth thou sought'st the restless
sea,
But back returnest—yes, thou com'st at last
Like a kind angel on a mission kind ;
I feel thee on my brows,
And my heart leaps to greet and welcome
thee,
Thou that recallest with thy voice the past,
And giv'st new life to body and to mind.
—(The Southern Wind)

তরু দত্তের পিতা গোবিনচন্দ্রের রচিত "গঙ্গা বক্ষে যামিনী" (Night on the Ganges) নামে কবিতায় প্রকৃতিদেবী জল, স্থল ও আকাশে যাহা কিছু আছে সকলকেই জাগাইয়া তুলিয়াছেন।

How beautiful the glorious night would be,
How much more lovely than the garish day
If thus for ever she arrayed herself !
The moon is up high on the cloudless sky,
Over the towering moat she brightly gleams,
Pale, like a lady sick with silent grief,
Showering her beams on everything around
And clear defining every rope and spar
Of this our gallant bark, whose shadow falls
Enormous, on the smooth reflecting wave.
Naught now disturbs the stillness of the
scene—
The holy stillness—save the cricket's song
That hails each weary sense to pleasant
sleep
By shrill monotony, and the night-bird's lay
That comes so faint upon the weary wind
From distant bank, that scarcely one can
know
Whether the he-bird carols to his mate
To wile away the idly-pacing hour,
Or young one's cry aloud for evening food
In weak and hungry accents tremulous.
Anon that lay is hushed. The fishes leap
Up in the clear moonlight from out the
wave,
Then fall again and raise a sullen splash ;
The huge unwieldy porpoise rolling out,
Sinks down immediate. Sudden from
the glade,
A spectral, hollow, long-repeated cry
Of wild ducks in alarm comes loud and
shrill,
Blent with the famished jackal's harsher
voice,
As ruthlessly that tyrant's steps pursue
These harmless dwellers of the tanled
brakes,

* * *

Soft spread the dews upon the fragrant
earth,
Beading with orient pearls the silken grass;
And emerald leaves of trees upon the banks
That bound with green the dim horizon's
verge,
On every side, save that in which the stream
Loses itself amid the bending sky.
How pleasant now, at ease relieved to mark
The sombre shadows of each varying tree!
The mangoe here, with countless leaves
adorned,
Casts densest shade, and there the
towering palm
Mirrors its length. The scented baubool
next
With fragrant yellow flowers and
clust'ring leaves,

Bends o'er the wave to see its image fair
One mass of green the trees far off appear
And cast no shadows on the flood below.

* * *

* * * At this time,
The spirit of eternal peace seems thrown
On every object and the rudest breast
Is filled with pure and and unimpassioned thoughts.

ভাবুক কবির হৃদয় বহির্জগতের শান্তিতে কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছে! তরু দত্তের খুল্লতাত কবিবর গিরীশচন্দ্র দত্তও বাহ্য প্রকৃতির অসংখ্য বৈচিত্র্যময় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তিস্তা নদীর তীরে একটি গোফার চিত্র কেমন সুন্দর!

How sweet 'twere here an anchorite to dwell.
Here in the presence of this white cascade
To muse at noon beneath this grateful shade,
With bead and crucifix to haunt this cell ;
Fresh wholesome fruits to gather in the dell,
At early morn what time broad lights in—vade
The dew-gemmed coverts of the peaceful glade,
And listening silence broods o'er rock and fell ;
With solemn cheer to mark at eve on high
The stars leap forth, to lie on this smooth stone
Strewed with crisp leaves, and hear the owlet's cry
Borne on the breeze from crag and cavern lone,
Or close in balmy sleep the languid eye,
Lulled to the deep voiced Teesta's sooth ing tone.

কাঞ্চনগিরির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কবি লিখিয়াছেন,—"a great temple built to Nature's God,"—হিমালয় পর্ব্বতের নানাস্থানের কবিত্বময় বর্ণনা গিরীশচন্দ্র একাধিক সনেটে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সৌন্দর্য্য ও শান্তি, গাম্ভীর্য্য ও নির্জ্জনতা কবির অন্তর্জগতের সবটা অধিকার করিয়া লইয়াছে,—"lonely poet lost in mazy dream,"—নয়নীতালের নিকটে প্রকৃতিদেবী পশু-পক্ষীর অন্তরেও শান্তির ছায়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন;—"How calm the cattle lie—how motionless!" তুষারাবৃত গহ্বর হইতে গঙ্গা-প্রপাত অতীব সুন্দর দৃশ্য!

From a deep rift in slate 'mid Ankhee's snows,
Gunga leaps up indignant to the light,
A boisterous torrent, decked with foam-balls white
In endless clusters on her dauntless brows

তরাই প্রদেশের বর্ণনায় চড়াই উতরায়ের বৈচিত্র্যময়তায় কবি যে সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিয়াছেন তাহার তুলনা হয় না।

A dip ! a rise ! clean vanished mist and shade,
A blissful Eden swam, at once to sight;
Clear tops of distant hills, a smiling glade,
And modest farms, blue skies, and pastures bright,
And terraced slopes with grass and flower inlaid,
Bathed in a flood of autumn's golden light.

[ক্রমশঃ]

প্রবন্ধ

"কবিরাজ"

রাজশেখর

শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য

রাজশেখরকে সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের একজন দিক্‌পাল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

উপোদ্‌ঘাত

" বালরামায়ণ ", " বালভারত ", "বিদ্ধশালভঞ্জিকা" ও "কর্পূরমঞ্জরী" —তাঁহার এই চারিখানি রূপক (drama) প্রায় সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া সংস্কৃতজ্ঞ সুধীসমাজের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে। অথচ বাঙ্গালার সাধারণ কাব্যামোদী পাঠকগণের নিকট রাজশেখর, কালিদাস বা ভবভূতির মত তেমন বিশেষভাবে পরিচিত নহেন। অবশ্য সংস্কৃত কাব্যজগতে রাজশেখরের স্থান কালিদাস ভাস অথবা ভবভূতির নিম্নে হইলেও, তাঁহাকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রথম শ্রেণীর কবি বলা যাইতে পারে ; কারণ, তাঁহার রচনায় এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যাহার জন্য সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই রাজশেখরকে উচ্চসম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কবিবর রাজশেখর সম্বন্ধে সাধ্যমত যৎকিঞ্চিৎ বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

১

বহিরঙ্গ আলোচনা

রাজশেখর স্বকৃত "কাব্যমীমাংসা" গ্রন্থে নিজেকে **"যাযাবরীয়"** (অর্থাৎ "যাযাবর"বংশে জাত) বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন (১)। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের কবিগণের কাব্যে তাঁহাকে শুধু "যাযাবর" নামে উল্লিখিত হইতে দেখা

কবিবরের বংশ-পরিচয়

যায়। "ধনপাল" তাঁহার "তিলকমঞ্জরী"র প্রারম্ভে রাজশেখরের নাম দিয়াছেন—"যাযাবর কবি" (১)। লাটদেশীয় কবি "সোড্‌ঢল" (২) তাঁহার "উদয়সুন্দরী"র অষ্টম উচ্ছ্বাসে উঁহাকে কেবল "যাযাবর" নামে অভিহিত করিয়াছেন (৩)।

এখন দেখা যাউক, কবির স্বরচিত গ্রন্থাবলী হইতে তাঁহার বংশপরিচয় কতদূর পাওয়া যায়।

কবি তাঁহার উচ্চ বংশের জন্য যথেষ্টই গর্ব্ব অনুভব করিতেন ; বিশেষতঃ, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে যাঁহারা কাব্যচর্চ্চাদি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের গৌরবে তিনি নিজেকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত বোধ করিয়াছেন (৪)। তাঁহার প্রপিতামহ **"অকালজলদ"** একজন সুবিখ্যাত কবি ছিলেন (৫)। এই অকালজলদের রচিত শ্লোক বেমালুম আত্মসাৎ করিয়াই কবি

(১) "যাযাবরীয়ঃ সংক্ষিপ্য মুনীনাং মতবিস্তরম্‌" ।
(—কাব্যমীমাংসা, বরোদাসংস্করণ, পৃঃ ২।১১)
"পঞ্চমী সাহিত্যবিদ্যা' ইতি যাযাবরীয়ঃ" ।(—ঐ, পৃঃ ৪।১৪)

(১) "সমাধিগুণশালিন্যঃ প্রসন্নপরিপক্তিমাঃ ।
যাযবরকবের্বাচো মুনীনামিব বৃত্তয়ঃ ।।"৩৩ (—তিলকমঞ্জরী)

(২) ইনি একজন "বালভ" কায়স্থ ছিলেন। আন্দাজ ১০৫০ সংবতে বৎসরাজের রাজত্বসময়ে ও কোঙ্কণাধিপতি মুম্মুণিরাজের পৃষ্ঠপোষকতায়, বাণভট্টের "হর্ষচরিতে"র অনুকরণে ইনি "উদয়সুন্দরী" নামক চম্পূকথা রচনা করেন।

(৩) "যাযাবরঃ প্রাজ্ঞবরো গুণজ্ঞৈরাশংসিতঃ সূরিসমাজবর্য্যৈঃ ।
নৃত্যত্যুদারং ভণিতে গুণস্থা নটীব যস্যোড়রসা পদশ্রীঃ।"
—(উদয়সুন্দরী ৮ম উচ্ছ্বাস)

(৪) "স মূর্ত্তো যত্রাসীদ্‌গুণগণ ইবাকালজলদঃ
সুরানন্দঃ সোঽপি শ্রবণপুটপেয়েন বচসা ।
ন চান্যে গণ্যন্তে তরলকবিরাজপ্রভৃতয়ো
মহাভাগস্তস্মিন্নয়মজনি যাযাবরকুলে ।।"
(বালরামায়ণ—১।১৩)

(৫) "অকালজলদেন্দোঃ সা হৃদ্যা বচনচন্দ্রিকা ।
নিত্যং কবিচকোরৈর্যা পীয়তে ন চ হীয়তে ।।"
(সূক্তিমুক্তাবলীধৃত রাজশেখরের শ্লোক)

"কাদম্বরীরাম" নাট্যকাররূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। (তখনকার দিনেও plagiarismএর অভাব ছিল না!) (১)। এই বংশেই "সুরানন্দ" "তরল" ও "কবিরাজ" নামক আরও তিন জন কবির জন্ম হয়। সুরানন্দ চেদিরাজ্যে প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হ'ন (২)। কাব্যমীমাংসায় স্থানে স্থানে তাঁহার মত উদ্ধৃত দর্শনে অনুমান করা যায় যে, তিনি খুব সম্ভবতঃ অলঙ্কারশাস্ত্রের উপর এক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তরলেরও কাব্য-জগতে বেশ একটু নাম ছিল (৩); কিন্তু এই কবিরাজ যে কে ছিলেন সে সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত ঠিক কিছুই জানা যায় নাই। রাজশেখরের পিতা "দুর্দ্দুক" (অথবা "দুহিক") ছিলেন একজন মহামন্ত্রী ও তাঁহার মাতার নাম ছিল "শীলবতী"।

কবীন্দ্রের জাতি-নির্ণয়

রাজশেখরের জন্ম যে যাযাবরবংশে, তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি; কিন্তু ইহা হইতে তাঁহার জাতি-নির্ণয়ের কোনই সম্ভাবনা নাই। তিনি নিজেকে রাজা "মহেন্দ্রপালে"র উপাধ্যায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; ইহাতে এক একবার মনে হয়—বুঝি বা কবি ব্রাহ্মণই ছিলেন। আবার তাঁহার "রাজশেখর" এই নাম ও "চাহ-আণকুল-মৌলি-মালিকা রাজশেখর-কবীন্দ্রগেহিনী অবন্তিসুন্দরী"র বর্ণনা দেখিয়া তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া বিশ্বাস করিতেই ইচ্ছা হইয়া থাকে। সহৃদয় পাঠকবর্গ যদি পারেন ত' এ সমস্যার সমাধান করিয়া লইবেন।

কবির সাম্প্রদায়িক ভাব ছিল না

রাজশেখররচিত "হরবিলাস"-পাঠে বোধ হয় যে, তিনি খুব নিষ্ঠাবান্ (গোঁড়া) শৈব ছিলেন। কিন্তু কাব্যমীমাংসায় (পৃঃ ৪২।৪৩) উদ্ধৃত বিষ্ণুর মহিমাব্যঞ্জক শ্লোকগুলি পড়িলে তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। আবার হরবিলাসের মঙ্গলশ্লোক হইতে বেশ বুঝা যায় যে, তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অভেদকল্পনা বিশ্বাস করিতেন। "সোমদেব" তাঁহার "যশস্তিলক-চম্পূ"তে (চতুর্থ আশ্বাসে) বলিয়াছেন যে, রাজশেখর যথাকালে জিনগণের স্তুতিরচনায়ও পশ্চাৎপদ হ'ন নাই। ইহাতে বোধ হয় যে, রাজশেখরের মনে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকভাব ছিল না।

কবীন্দ্রগেহিনী

রাজশেখর কাব্যমীমাংসার তিন স্থলে স্বীয় সহধর্ম্মিণী "অবন্তিসুন্দরী"র মত উদ্ধৃত করিয়াছেন (১)। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, কবীন্দ্রগেহিনী-বিরচিত অলঙ্কারশাস্ত্রের কোন গ্রন্থ এককালে নিশ্চয়ই বিদ্যমান ছিল। অন্ততঃ, তিনি যে সুশিক্ষিতা ছিলেন ও অলঙ্কারশাস্ত্রের বিষয়-বিশেষে স্বাধীন মত পোষণ করিতেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। পত্নীর আগ্রহেই রাজশেখরকৃত প্রাকৃতভাষায় 'সট্টক' (minor drama) কর্পূরমঞ্জরী প্রথম অভিনীত হয়।

---

(১) "অকালজলদশ্লোকৈশ্চিত্রমাত্মকুটৈরিব।
জাতঃ কাদম্বরীরামো নাটকে প্রবরঃ কবিঃ॥"
(সূক্তিমুক্তাবলীধৃত রাজশেখরের শ্লোক)

(২) "নদীনাং মেকলসুতা নৃপাণাং রণবিগ্রহঃ।
কবীনাঞ্চ সুরানন্দশ্চেদিমণ্ডলমণ্ডনম্॥" (ঐ)

(৩) "যাযাবরকুলশ্রেণেহারযষ্টেশ্চ মণ্ডনম্।
সুবর্ণবর্ণরচিতস্তরলস্তরলো যথা॥" (ঐ)

(১) (১) "ইয়মবস্তির্ন পুনঃ পাক" ইত্যবন্তিসুন্দরী (কা মী পৃঃ ২০); (২) "বিদগ্ধভণিতিভিনিবেশ্যং বস্তুনো রূপং ন নিয়তস্বভাবম্" ইতি অবন্তিসুন্দরী (কা মী পৃঃ ৪৬); (৩) কাব্যমীমাংসা, পৃঃ ৫৭

রাজশেখরের রূপকগুলির প্রস্তাবনা হইতে জানা যায় যে, তিনি কনৌজরাজ মহেন্দ্রপালের উপাধ্যায় ছিলেন। মহেন্দ্রপালের পুত্র মহীপালও সিংহাসন লাভ করিয়া রাজশেখরের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। Siydoni শিলালেখদর্শনে বুঝা যায় যে, মহেন্দ্রপাল খ্রীষ্টীয় ৯০৩ ও ৯০৭ অব্দে এবং মহীপাল খ্রীষ্টীয় ৯১৭ অব্দে রাজ্যশাসন করিতেন (১)। মহেন্দ্রপালের উল্লেখের কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্য উপায়ে রাজশেখরের সময় নির্ণয় করা যাইতে পারে। তিনি কাব্যমীমাংসায় "গৌড়-বহো"-প্রণেতা "বাক্‌পতিরাজে"র (২) ও কাশ্মীরাধিপতি "জয়াপীড়ে"র (খ্রীঃ ৭৭৯—৮১৩) সভাপতি 'উদ্ভটে'র (৩) নাম করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি "আনন্দবর্দ্ধনের মতও স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিতে ছাড়েন নাই (৪)। আনন্দবর্দ্ধন

কবির আবির্ভাবকাল

(১) Epigraphia Indica, Vol. I, p. 171.

(২) "ব" ইতি বাক্‌পতিরাজঃ—কা মী পৃঃ ৬২

(৩) "তস্য চ ত্রিধা অভিধাব্যাপার" ইত্যোদ্ভটাঃ (কামী পৃঃ ২২ ও ৪১)

(৪) "প্রতিভাব্যুৎপত্ত্যোঃ প্রতিভা শ্রেয়সী" ইত্যানন্দঃ (কা মী পৃ ১৬)

কাশ্মীররাজ অবন্তিবর্ম্মণের (খ্রীঃ ৮৫৭—৮৮৪) সমসাময়িক সোমদেব যশস্তিলকচম্পূতে রাজশেখরের নাম করিয়াছেন; যশস্তিলকচম্পূ খ্রীঃ ৯৬০ অব্দে রচিত হয়। ইহা ছাড়া সোড্ডলও (খ্রীঃ ৯৯০ অব্দ) রাজশেখরের প্রশংসায় শতমুখ। ইহা হইতে বোধ হয় যে, কবি আন্দাজ ৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৯২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন।

কর্পূরমঞ্জরীতে রাজশেখর আপনাকে (১) **"কবিরাজ"** বলিয়াছেন—মহাকবি বলেন নাই। কাব্যমীমাংসার মতে (পৃঃ ১৯) কবির দশবিধ অবস্থা। ষষ্ঠ অবস্থায় পৌছাইলে কবি **"মহাকবি"** আখ্যা প্রাপ্ত হন; আর সপ্তম অবস্থায় **"কবিরাজ"**ত্ব-প্রাপ্তি। অতএব কবিরাজ মহাকবি অপেক্ষা একধাপ উচ্চতর। রাজশেখর বলেন যে, এ পর্য্যন্ত জগতে মাত্র কতিপয় কবিরাজ আবির্ভূত হইয়াছেন। যিনি বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন নিবন্ধরচনায় ও বিভিন্ন রসসৃষ্টিতে স্বতন্ত্র, তাঁহাকেই কবিরাজ বলা যাইতে পারে। এরূপ শক্তিমান্ পুরুষ সত্যই কাব্যজগতে বড় বিরল।

কবিরাজ রাজশেখর

[ক্রমশঃ]

(১) "বালকই কইরাও" (—কর্পূরমঞ্জরী ১।৯)

ফতেপুর সিক্রী

গল্প

হারানিধি

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

১

"না বাপু! আর তো পারা যায় না এ মানুষকে নিয়ে, দেখে গেল ছেলেটার অসুখ তবু হুঁস্ নেই, এত রাত অবধি কোথায় যে আড্ডা দেওয়া হচ্ছে—জানি না।"

স্বামীর আগমন-প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিতা হিমানী বিরক্তি-তিক্তচিত্তে আপন মনে বকতে বকতে পথের দিকের জানালায় এসে দাঁড়াল। সংসারের কাজ-কর্ম্ম সমস্তই চুকে গেছে। বাড়ীতে থাকবার মধ্যে ছোট দুটী ছেলে-মেয়ে, তারাও হাসি খেলা ও কান্না ভুলে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। কোথাও সাড়া শব্দটী নেই, নিস্তব্ধ ঘরে স্বামীর অপেক্ষায় জেগে বসেছিল শুধু হিমানী।

রাত্রি তখনো গভীর হয় নিই, কিন্তু পাহাড়-গুলির এদিক্ ওদিক্ ছড়ানো—স্বল্প বিরল বাড়ী ক'খানি এরি মধ্যে নিশীথের গাঢ় নিস্তব্ধতায় যেন নিঝুম হ'য়ে পড়েছে। শুক্লাষষ্ঠীর বাঁকা চাঁদখানি তার ক্ষীণ পাণ্ডুর জ্যোৎস্নাটুকু নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে সম্মুখে গিরিচূড়ার অন্তরালে ধীরে ধীরে অদৃশ্যমান। পাহাড়ের ঘন কুয়াসার ধূসর আবরণে মুখ লুকিয়ে ম্লানদীপ্তি তারাগুলি যেন লাজনম্রা অবগুণ্ঠিতা বালিকাবধূর মত উঁকি-ঝুঁকি মারছিল। জানালার নীচেই রাস্তা প্রায়ান্ধকার—দূরে একটা কেরসিনের অনুজ্জ্বল আলো—সেই পথিকশূন্য স্তব্ধ পথখানিতে ছায়ালোক রচনা ক'রে—মাতালের চক্ষুর মত ক্রমশঃ ঘোলা হ'য়ে আসছিল।

সেই নির্জ্জন পথের দিকে হিমানী উৎকর্ণ উন্মুখ হ'য়ে কতক্ষণ নিষ্পলকে চেয়ে রইল, চেয়ে চেয়ে দৃষ্টি ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল, চক্ষু জ্বালা ক'রতে লাগ্‌ল। তার উদাস অন্যমনস্ক মনকে সচকিত করে কোথায় একটা নিশাচর পক্ষী তীব্র কর্কশ-স্বরে ডেকে উঠল,—জানালাটা ত্বরিতে বন্ধ ক'রে দিয়ে হিমানী বিছানায় ফিরে এল।

দিবসব্যাপী কঠোর শ্রমে তার দেহ মন তখন গভীর ক্লান্তিতে যেন ভেঙ্গে পড়ছিল, শীতও করছিল। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল। ইচ্ছে করছিল ওই সুখসুপ্ত শিশু দুটীর পাশে তার ক্লান্ত দেহখানা এলিয়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম করে নেয়, কিন্তু বিশ্রাম নিতে গিয়ে যদি হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে —স্বামীর আহ্বানে যদি সে ঘুম না-ই ভাঙ্গে, তবে এই শীতে মানুষটা যে কষ্ট পাবে বাইরে দাঁড়িয়ে—

হিমানীর শোওয়া হ'ল না, বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে সে ঘুমন্ত ছেলের গায়ে সন্তর্পণে হাত দিয়ে দেখলে—নাঃ! গাটা এখন ঠাণ্ডা আছে, ঘাম হচ্ছে, জ্বরটা ছেড়ে গিয়েছে বোধ হয়। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে খোকার গায়ে লেপটা টেনে দিয়ে হিমানী তখন আলোর কাছে সেলাই নিয়ে বসল—স্বামীর প্রতীক্ষায় জেগে থাকবে বলে।

নিজের একটা পুরানো ছেঁড়া গরম সেমিজ—সেইটে কেটে তার খুকী 'ডলি'র জন্যে একটা ফ্রক তৈয়ার করছিল। গরীবের সংসার, ডা'নে আনতে বাঁ'য়ে কুলোয় না, এমনি করে জোড়া-তাড়া দিয়েই কোনো রকম চলছে। মাসকাবারে পঞ্চাশটী টাকা মাত্র ভরসা, পাহাড়ের খরচ সুতরাং অবস্থা সংসারের অভাব-অনাটন হিমানীর কাছে দিনের দিন সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠছিল। নিজের কষ্ট সে তুচ্ছ ক'রতে পেরেছিল অনায়াসে,—কিন্তু এই স্নেহের পুতুল দুটী—যাদের খাইয়ে পরিয়ে

যত্ন ক'রে কিছুতেই আশা মেটে না—তাদের কষ্ট যে অসহ্য!

সেই ছাই রংয়ের পুরোনো ফ্লানেলের ফ্রকে ছেঁড়া সাড়ীর লাল পাড়টুকু বর্ডারের আকারে বসাতে বসাতে হিমানীর জীবন-রক্ত, চাঁপার কলির মত, আঙুলগুলিতে একটা অতৃপ্তির ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস অজ্ঞাতে ঝরে পড়ল। হিমানীর সখী কমলার বোন রমলা,—ডলির কাছে সে কুরূপা বললেও অত্যুক্তি হয় না—সে মেয়ের সাজ-সজ্জা দেখলে 'তাক' লেগে যায়—আর তার অমন পদ্মফুলের মত ফুটফুটে মেয়ে—তার কি না এই পোষাক!—এই দীন বেশ!—সৃষ্টিকর্ত্তার একি রহস্যময় অবিচার! রূপের যেখানে সার্থকতা নেই, সেখানে রূপ দেবার দরকার কি—ভাবতে ভাবতে হিমানী হাতের কাজ স্থগিত রেখে চুপ করে বসে রইল অন্যমনস্ক হয়ে।

চিন্তামগ্না তরুণীর উদাস মুখে ল্যাম্পের উজ্জল আলোটুকু স্থির নিথর হয়ে পড়ল, সে মুখখানি নিশীথ পদ্মের মত বড় সুন্দর করুণ—বড় মধুর। সেই অপরিসর ক্ষুদ্র কক্ষের দীন-হীন গৃহসজ্জার সঙ্গে রূপসী তরুণী হিমানীর রাজ্ঞীর মত রূপশ্রী যেন মোটেই খাপ খাচ্ছিল না—এ যেন কর্দ্দমে কমল!

নিত্য নূতন অভাবগ্রস্ত সংসার ও ছেলে মেয়ে দুটীর ভাবনার মধ্যে হিমানীর আজ হঠাৎ মনে পড়ে গেল নিজ বাল্য-জীবনের কথা।

পিতা মাতার একমাত্র সম্বল সে—কত আদরের, কত আরাধনার ধন ছিল। মেয়েটীর অসামান্য রূপ ছিল বাপ মা'র আনন্দের—গর্ব্বের বস্তু। মেয়ের বিয়ের কথা কেউ বললে বাপ গর্ব্বের হাসি হেসে বলতেন, "এ মেয়ের বিয়ের ভাবনা নেই, হিমু আমার শুধু ঐ লক্ষ্মীর মত রূপের জোরেই রাজরাণী হবে দেখো"। তাঁর ভবিষ্যবাণী অসফল হয় নি। প্রজাপতির দয়ায়—ঠিক সময়ে—ঠিক রাজপুত্র না হলেও বাংলা দেশের এক ধনী জমীদার-পুত্র হিমানীর পাণিপ্রার্থী হয়ে এসেছিল। তার নাম সৌরেশকুমার। পশ্চিম-ভ্রমণে এসে হিমানী-দের বাড়ীতে অতিথি হয়ে এই রূপসী মেয়েটীকে সৌরেশের এতই পছন্দ হয় যে, বিনা পণে হিমানীকে গৃহলক্ষ্মী করে তার মেয়ে-জন্ম সার্থক আর মেয়ের বাপকে কন্যাদায় হতে উদ্ধার করতে সে সাগ্রহে সম্মত হয়েছিল, কিন্তু অবোধ হিমানী সেই অযাচিত পাওয়া সুখ-সৌভাগ্য হেলায় হারিয়েছিল, জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণটুকু সে স্বেচ্ছায় প্রত্যাখান করেছিল। কারণ পিতার সহকর্ম্মী ও বন্ধুপুত্র নির্ম্মলের সঙ্গে তার ছেলেবেলা থেকেই ভালবাসা। পাত্রহিসাবে নির্ম্মল ছেলেটী মন্দ নয়, সে বেশ সুশ্রী সচ্চরিত্র সদালাপী যুবক, কিন্তু বিদ্যা এবং অর্থ, যে দুটী জিনিষের অভাবে পুরুষের রূপ গুণ সব বৃথা হয়ে যায় সেই দুটী জিনিষেই নির্ম্মল বঞ্চিত ছিল। শুধু সেই কারণেই পিতা মাতা মেয়ের জন্য অন্য সুপাত্রের সন্ধান করছিলেন, সৌরেশ তাঁদের প্রার্থিত সুপাত্র কিন্তু প্রেম পাত্রাপাত্র বিচার করে না। সৌরেশের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রায় স্থির—তখন হিমানী কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিলে। সে ধরে বসল, নির্ম্মল ছাড়া আর কাউকেই পতিত্বে বরণ করতে সে কখনো পারবে না—তা' সে যত বড়ই রাজা মহারাজা হোক না কেন—নির্ম্মল তার অযোগ্যতার কথা বলতে হিমানী দৃঢ়কণ্ঠে স্পষ্টবাক্যে বলেছিল, বিত্তহীন নির্ম্মলের কুটীর-রাণী হওয়া সে রাজরাণী হওয়ার চেয়ে শত সহস্র গুণে বাঞ্ছনীয় মনে করে।

তাই হল, বাপ মার ঐ একটীমাত্র আদরের মেয়ে হিমানীর জেদই বজায় রইল। ঈপ্সিত দয়িত নির্ম্মলের কুটীর-রাণী হৃদয়রাণী হবে হিমানীর জীবনের সাধ—যৌবনের স্বপ্ন বাস্তবিকই সফল

পরিতৃপ্ত হয়েছিল—কিন্তু সে স্বপ্ন চিরস্থায়ী হল না। তরুণী হিমানী শীঘ্রই বুঝতে পারলে—সংসার বড় কঠিন ঠাঁই, শুধু প্রেমের রঙীন স্বপ্নে বিভোর হয়ে বাস করা এখানে চলে না।—আরো অনেক কিছুর দরকার।

পিতা মাতা ও শ্বশুরের আকস্মিক তিরোধান, এবং অনাটনের সংসারে দুটি নূতন প্রাণীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কুটীর-রাণীর বুকভরা প্রীতি, মুখভরা হাসি ম্লান হয়ে এল।

স্বল্পবিদ্যায় ভাল কাজ পাওয়া অসম্ভব, নির্ম্মল বহু চেষ্টায় সোলোন পাহাড়ে 'ব্রুয়ারী'তে এই চাকরীটুকু জোগাড় করে স্ত্রী পুত্রের জীবিকার সংস্থান করতে পেরেছিল।

অস্বচ্ছল সংসারের সকল 'ঝক্কি' হিমানীকেই পোহাতে হত—নির্ম্মল শুধু মাসান্তে মাহিনাটা স্ত্রীর হাতে এনে দিয়ে সকল দায়ে খালাস।

নির্ম্মল ছিল স্ফূর্ত্তিবাজ লোক—সংসারের অভাব অনাটন তুচ্ছ করে, পত্নীর আদর-অবজ্ঞা নির্ব্বিবাদে উপভোগ করে, খোকা-খুকী দুটীকে আদর-সোহাগ করে, দশটা পাঁচটায় আফিস করে, অবকাশ কালটুকু সহকর্ম্মী ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদে ব্যয়িত করে নির্ম্মলের দিনগুলো মিঠে কড়া ভাবে এক রকম কাটছিল মন্দ নয় কিন্তু স্বামীর অক্ষমতার চেয়ে এই সংসারে নির্লিপ্ততাই হিমানীকে কষ্ট দিত বেশী—স্ত্রীর দুঃখকষ্টে উদাসীন হয়ে যে স্বামী নির্ব্বিকারচিত্তে স্ফূর্ত্তি করে দিন কাটাতে পারে, তার পায়ে শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ থাকে কি করে?

তা ছাড়া হিমানীর অসুখী হবার আরও এক কারণ ছিল। নির্ম্মলের নির্ম্মল চরিত্রে ইদানীং একটু দোষ স্পর্শ করেছিল। সংসর্গে প'ড়ে ও বিয়ারখানায় কাজ ক'রে সে বিনা পয়সায় স্ফূর্ত্তি করবার লোভ কিছুতেই সম্বরণ করতে পারত না,—পুরুষ-চরিত্রের এই অবনতিটুকু অনেকে ধর্ত্তব্যের মধ্যে মনে করে না, কিন্তু হিমানী তার স্বামী—তার প্রিয়তমকে সম্পূর্ণ নিখুঁত নিষ্কলঙ্ক দেখতে চায়, তাই নির্ম্মলের এই অবনতিটুকু তাকে বড়ই ব্যথা দিত। স্বামীর সঙ্গে তার এই নিয়ে মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ মনান্তর হয়ে যেত কিন্তু দুর্ব্বল নারীর শক্তি কতটুকু?—দুঃখক্লেশ অন্তর্ব্যথা মুখ বুজে সহ্য করা ভিন্ন তার যে আর উপায় নেই!

চিন্তাবিষ্টা হিমানীকে চকিত ক'রে দিয়ে সিঁড়ির দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। হিমানী তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দিয়েই পেছু না চেয়ে ঘরে চলে এল। খোকার পাশ বালিসটা সরিয়ে সে নিজের শোবার জায়গা ঠিক করতে লাগল। নির্ম্মল সান্ধ্য-ভোজন শেষে বেড়াতে গিয়েছিল, এখন আর খাবার হাঙ্গাম নেই। গায়ের কাপড়খানা যথাস্থানে রেখে নির্ম্মল স্ত্রীর পাশে এসে দাঁড়াল কিন্তু হিমানীর ভ্রূক্ষেপ নেই, তখন সে বিছানা ঠিক করতে মহাব্যস্ত! স্বামীকে আজ যেন বলবার কইবার তার কিছুই ছিল না—এমনি অনাসক্ত ভাব—নির্ম্মল বুঝতে পারলে, এ মৌন আসন্ন ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ, এর চেয়ে বকুনী ঢের ভাল।

"খোকা কেমন আছে?—জ্বরটা তার এখনো ছাড়ে নি না কি?" বলে সে এগিয়ে এসে খোকার গায়ে হাত দিয়ে দেখতে গেল—তার উদ্যত হাতখানা ঠেলে দিয়ে হিমানী রুদ্ধ রোষে রূঢ় কণ্ঠে বলে উঠল—"থাক্ ঘুমুচ্ছে ঘুমোতে দাও না, ঠাণ্ডা হাত লাগিয়ে জাগিয়ে দিয়ে কাঁদাবার দরকার কি!" নির্ম্মল ত্বরিতে হাতখানা সরিয়ে নিয়ে অপ্রতিভের ভাবে বললে, "আজ বড় দেরী হয়ে গেছে না? কি করি, ওরা সবাই—" নির্ম্মলের কৈফিয়ৎটুকু শেষ করতে না দিয়েই হিমানী গম্ভীরমুখে বললে, "দেরী তো হবেই আজ যে শনিবার!"

"ওঃ! তুমি বুঝি তাই মনে করেছ! শনিবার হলেই বুঝি—না না, সে সব কিছু নয় হিমু! একবার চেয়ে দেখই না বাস্তবিক আজ বেশ সজ্ঞানে এসেছি।" স্বামীর সেই মিষ্ট বচনের উত্তরে হিমানী কিছুই বললে না, শুধু একবার বক্রদৃষ্টিতে তার হাসিভরা মুখের দিকে চেয়ে দেখলে—লোকটা বাস্তবিকই সজ্ঞানে আছে কি না? শনিবারে নির্ম্মলের মাত্রাধিক্য প্রায়ই ঘটত এবং তার জন্য হিমানীকে সময় সময় বিলক্ষণ অসুবিধায় পড়তে হত।

স্ত্রীকে চুপ করে থাকতে দেখে সাহস পেয়ে নির্ম্মল তার আরও কাছ ঘেঁসে এসে,—"বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা, মুখ শুঁকে দেখলেই তো বুঝতে পারবে আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে" বলে হাসতে হাসতে হিমানীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেল মনে একটা নির্ব্বাক সহজ সংক্ষিপ্ত সন্ধির গোপন অভিলাষ নিয়ে, কিন্তু হিমানীর মনের অবস্থা আজ মোটেই ভাল ছিল না, তাই সন্ধির প্রস্তাব নির্ম্মম ভাবে প্রত্যাখ্যান করে স্বামীর দিক থেকে মুখখানা সজোরে ফিরিয়ে নিয়ে সে বললে—"থাক্ থাক্! আর ন্যাকামী করতে হবে না, ঢের হয়েছে!"

অভিমানিনী পত্নীর হাতখানা নিজের মুঠোর মধ্যে ধরে নির্ম্মল মিষ্ট কোমলকণ্ঠে বললে, "সত্যি সত্যি রাগ করলে হিমু! লক্ষ্মী আমার! রাগ করো না। আজ একটা পরামর্শ হচ্ছিল—তাই রাত হয়ে গেল।" হিমানী এতক্ষণে স্বামীর দিকে মুখ তুলে চাইলে, বল্‌লে "কিসের পরামর্শ?" "কাল রবিবার ছুটী, তাই বড়বাবু ঠিক করেছেন—এক খানা 'লরি' ভাড়া করে সকলে মিলে 'কণ্ডাঘাটে' পিক্‌নিক্ করতে যাওয়া হবে—অফিসের সবাই তো যাবেই, তা ছাড়া আরো অনেক বন্ধু-বান্ধব দল ভারী করবেন।" "তুমি যাবে বলে এয়েছ তো?"—"না, ঠিক হাঁ বলি নি বটে, কিন্তু আমাকে যে রকম ধরেছেন,—কি জানো হিমু!—যে সে লোক তো নয়—অফিসের বড়বাবু—আমাদের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা—এতটা অনুগ্রহ করেন যে এই যথেষ্ট!" স্বামীর এতগুলো কথার উত্তরে হিমানী হাঁ না কিছুই বল্‌লে না, সে হাত খানা টেনে নিয়ে বিছানায় উঠে বসল। তার মৌন মুখের দিকে চেয়ে নির্ম্মল ইতস্ততঃ করে বল্‌লে, "খোকা যদি ভাল থাকে তবেই যাব, আর তুমি যদি রাগ করো তা হলে"—"রাগ করলে তো বয়েই গেল! তোমার যখন যেখানে খুসী যাও না—আমি কি কোন দিন বারণ করেছি?" অভিমান-রুদ্ধ-স্বরে কথা কয়টী বলেই হিমানী খোকার পাশটীতে ঝুপ করে শুয়ে পড়ল আপাদমস্তক লেপ ঢাকা দিয়ে।"

নির্ম্মল বুঝতে পারলে এ রাগ সহজে ভাঙ্গবার নয়—ওদিকে বারোটা বাজে, খোকা উস্‌খুস করছে, এ অবস্থায় পত্নীর মান-ভঞ্জনের বৃথা প্রয়াস না করে আলোটা কম করে দিয়ে সে তখন বুদ্ধিমানের মত নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

নির্ম্মল আর যাই হোক্ হৃদয়হীন ছিল না, স্ত্রী-পুত্রের প্রতি তার স্নেহ-মমতাও ছিল যথেষ্ট, কিন্তু দুঃখ কষ্ট জিনিষটা তার ধাতে মোটেই বরদাস্ত হয় না, তাই সাধ্যমত পাশ কাটিয়ে চলতে চেষ্টা করত।

২

স্ত্রীর অসন্তুষ্টির ভয়ে নির্ম্মল পিক্‌নিকের দলে যোগ না দেওয়াই সাব্যস্ত করেছিল কিন্তু সকাল বেলা যখন খোকা বেশ সুস্থ শরীরে হাসি-খেলা করতে লাগল আর বড়বাবুর চাকর এসে বন্দিগী জানিয়ে বল্‌লে, হুজুর তৈয়ার হুয়ে, বাবুজী ইন্তেজার

করছেন, তখন নির্ম্মল আর সম্বরণ স্থির রাখতে পারলে না। হিমানীকে সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করলে, "কি বল গো? যাব?"

হিমানী খোকাকে দুধ খাওয়াচ্ছিল, স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে মুখভার করে সে অনাগ্রহের ভাবে বল্‌লে, "যাবেই যখন স্থির করেছ, তখন আবার জিজ্ঞাসা করবার দরকার? তবে এত সাত সকালে খাওয়া দাওয়া না হলেই।" "এঃ। খাবার জন্যে ভাবনা নেই, সে সব ব্যবস্থা আগেই ঠিক করা আছে। এখন বেরুলে সন্ধ্যের আগেই ফেরা যাবে। যাই তা হলে?" "যাও না"—"যাও বলতে নেই লক্ষ্মী! বলো 'এসো'—" স্ত্রীর বিরক্তিভরা অপ্রসন্ন মুখের উপর একটা সহাস্য সপ্রেম কটাক্ষ নিক্ষেপ করে খোকাকে কুইনাইন দিতে বলে নির্ম্মল তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে চলে গেল।

"কি বল গো? যাব?"

হিমানী ভ্রূকুটী তুলে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল। এই তা'র স্বামী! তার ইহ-পরলোকের সর্ব্বস্ব! গরীব হয় অনেকেই কিন্তু এমন দায়িত্ব-জ্ঞান-বর্জ্জিত, এমন নিষ্ঠুর, অকরুণ! হপ্তায় এই একটী দিন মাত্র ছুটী, তা'ও ঘরে মন বসে না, ঘরের আনন্দ নিরানন্দ করে—নূতন আমোদের সন্ধানে এই যে বাইরে ঘুরে বেড়ানো—আঃ! জীবনে কত আশা নিয়েই হিমানী সংসারে বাসা বেঁধেছিল, তার যে একটীও সফল হ'ল না—কখনো হবেও না বোধ হয়!

একটা গাঢ় তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলে হিমানী খোকাকে দোলনায় শুয়ে দিলে। তিন বছরের মেয়ে 'ডলি' সেই সময় কোত্থেকে হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে আধ আধ স্বরে আবদার করে বল্‌লে, "আমাকে নিয়ে গেল না মা! আমি বাবাল্ ছঙ্গে বেলাতে দাব মা!"

"কোথায় যাবে যমের বাড়ী? তাই যেও না—আপদের শান্তি হয়ে যাক্!"

হিমানী বিরক্তি-তিক্তচিত্তে মেয়েটাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে খুব জোরে জোরে পা ফেলে রান্নাঘরে চলে গেল।

গৃহকর্ত্তা অনুপস্থিত, রান্নার আজ আড়ম্বর ছিল না। তাড়াতাড়ি দুটো ভাতে ভাত সিদ্ধ করে, রান্না খাওয়ার পাট সেরে, হিমানী যখন তার ক্ষুব্ধ ব্যথিত মনকে অন্যমনস্ক ক'র্‌তে একখানা বই নিয়ে বস্‌ল, তখন দশটাও বাজে নি। সেই সময় তার প্রতিবাসিনী সখী কমলা হঠাৎ এসে উপস্থিত। হিমানীকে একলাটী নিশ্চিন্ত হ'য়ে বই পড়তে দেখে সে হেসে বল্‌লে, "আজ এ কি বিপরীত দেখি সখী! রাধা যে কুঞ্জে একা? শ্যাম কোথায়?"

সখীর পরিহাসে হিমানী বিষণ্ণমুখে একটু হেসে বল্‌লে, "শ্যাম গেছেন চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে—" "না না, ঠাট্টা নয়, আজ যে রবিবার। নির্ম্মলবাবু বাজারে গেছেন বুঝি?" "ব'য়ে গেছে তাঁর বাজারে যেতে! তিনি গেছেন ছুটীর দিনটা আমোদে কাটাতে সদলবলে কণ্ডাঘাটে। সেখানে পিক্‌নিক্ করা হবে—সেই সন্ধ্যের আগে আর ফির্‌ছেন না বোধ হয়।"

"আহা! তাই না কি? বাড়ীতে তোকে একলাটী রেখে—ইচ্ছেও তো করে, সত্যি উনি কি রকম মানুষ ভাই?"

বন্ধুর কাছে এই সহানুভূতিটুকু পেয়ে অভিমানিনী হিমানীর চোখ দুটী ছলছলিয়ে এল। কিন্তু মনের ব্যথা গোপন করে, শুষ্ক অধরে জোর করে হাসি ফুটিয়ে সে বল্লে, "সবাই কি তোর বরের মত হয় ভাই? দুদিনের জন্যে বাপের বাড়ী পাঠিয়েছেন, তা চিঠির ওপর চিঠি দিয়ে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছেন, কিছুতে তর সইছে না।"

কমলার মুখখানি সলজ্জ সুখের আবেশে লাল হ'য়ে উঠল। সে মাথা নীচু করে মুচকে হেসে বল্‌লে, "সত্যি ভাই! ওঁর আবার সকলি বাড়াবাড়ি, এই তো সেদিন এসেছি, এরি মধ্যে তাড়া দিচ্ছেন কিন্তু এত শীগ্‌গীর মাকে বল্‌তেও তো লজ্জা করে।" "তা না হয়, তোর হ'য়ে মাকে আমিই বল্‌ব'খন, কিন্তু তুই চলে গেলে দিনকতক ভারী মন কেমন ক'র্‌বে কমল! এই যে এসেছিস—দুদণ্ড গল্প করে বাঁচব তবু, একলাটী ঘরের কোণে প্রাণটা যেন সত্যি সত্যি হাঁপিয়ে ওঠে"। কথাটার শেষে কি জানি কেন হিমানীর অন্তর থেকে একটা ক্ষুব্ধ দীর্ঘ-নিঃশ্বাস অতর্কিতে বেরিয়ে গেল। ছেলে-পিলে না থাক্‌লেও কমল প্রায় হিমানীরই সমবয়সী, কিন্তু তার প্রাণটা এখনো হিমানীর চেয়ে অনেক তরুণ ও সরস আছে, তার উদ্দাম অপ্রতিহত প্রেমের জোয়ারে হিমানীর মত, অকালে ভাঁটা পড়ে যায় নি।

কমলা, খোকাকে আদর ক'র্‌তে ক'র্‌তে সখীর ম্লান মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "আজ তোকে ঘরের কোণ থেকে টেনে নিয়ে যাব বলেই এসেছি ভাই! আজ যে আমরাও বেড়াতে যাচ্ছি— "সত্যি না কি? কোথায় বেড়ান হবে?"

"কাল্‌কার পিণ্ডোর গার্ডেন দেখতে যাব। এসে অবধি যাই-যাই ক'র্‌ছি, কিন্তু যাবার সময় হ'য়ে ওঠে না। যে রকম 'ডাক' আসছে, কোন্ দিন 'ফুট্' করে চলে যাব, আর কিছুই দেখা হবে না। তাই আজ মণ্টুদাকে ধরেছি, মা বোধ করি যেতে পার্‌বে না, আমি কমলা আর জিতু যাব, মোটরে ঢের জায়গা থাক্‌বে!"

"মণ্টুদা? সে আবার কে?" "মণ্টুদা আমার পিস্‌তুতো ভাই, আমার শ্বশুরবাড়ীর দেশের বাসিন্দা ওরা। শিমলেয় বেড়াতে গিয়েছিলেন,

ফেরবার পথে এখানে এসেছেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে, খুব ভাল মানুষ—"

"বউকেও এনেছেন ? না একা"—"বউ থাকলে তো আনবেন ? আহা ! বউটী বড় ভাল ছিল কিন্তু বিয়ের দু বছর পরেই মারা গেল, ছেলে পিলে কিছু হয়নি তার"—

"আবার বিয়ে করেন নি ? পুরুষের পক্ষে এটা যে বড় আশ্চর্য্য কথা !" কমলা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "না মণ্টুদা সে রকম পুরুষ নয়। বউকে উনি বড্ড বেশী ভালবাসতেন, তাই সে মারা যেতে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আর বিয়ে-থাওয়া করবেন না, সে প্রতিজ্ঞা ওঁর ভঙ্গ হয়-হয় হয়েছিল একবার পশ্চিমে বেড়াতে এসে কোথায় দিল্লীতে বুঝি একটী সুন্দরী মেয়ে দেখে কিন্তু বিয়ের সব ঠিক হয়েও হল না,—ভেঙ্গে গেল।"

হিমানী রুদ্ধনিঃশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলে, "কেন ?" "তা ঠিক বলতে পারি না, তবে শুনেছি সে মেয়েটী মণ্টুদাকে পছন্দ করলে না, আশ্চর্য্য কিন্তু পছন্দ তার ! অমন ছেলে—অত বড় জমীদার ওঁরা, মেয়ের বাপ মাই বা কেমন ? অমন পাত্র কি সহজে কেউ হাতছাড়া করে !"

হিমানী গম্ভীর মুখে সনিঃশ্বাসে বললে, "তা কি করবে ! ডাগর করে মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে, তার পছন্দ অপছন্দ বুঝে কাজ করাই সুবুদ্ধির কাজ।"

"সে যাই হোক, বেচারা মণ্টুদা তো সেই অবধি আর বিয়েই করলেন না। সে মেয়েটী ওর ভয়ানক পছন্দ হয়েছিল ? তার পর পাঁচ বচ্ছর হয়ে গেল, বাড়ীতেও বেশী দিন টিকতে পারেন না, কেমন উদাসীনের মত এদেশ ওদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পিসীমা কত দুঃখ করেন, ঐটী বড় ছেলে, অত বড় রাজার সম্পত্তি"। হিমানী নির্ব্বাক নিস্পন্দ হয়ে কমলার কথাগুলি শুনছিল—সে তখন ভয়ানক অন্যমনস্ক।

কমলা তার হাত ধরে ব্যগ্রতা করে বল্‌লে, "ওঠ্ না ভাই ! তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে চুলটা আঁচরে নে, তোর ছেলেমেয়েকে আমি কাপড় পরিয়ে দিচ্ছি। এই বেলা বেরুলে ফিরতেও পারব আমরা শীগগির।" হিমানী পুনরায় নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "আমাকে যেতেই হবে না কি ? খোকার কিন্তু কাল একটু গা গরম হয়েছিল—যদি তার ঠাণ্ডা লাগে।"

"না না, আমরা বেলাবেলি চলে আসব, ঠাণ্ডা লাগবে কি করে ? চল্ তুই না গেলে আমিও যাব না।" "কিন্তু উনি যে বাড়ী নেই—" "সে তো ভালই কথা—উনি থাকলে কি ছুটীর দিনে তোকে ছেড়ে দিতেন ?—বাড়ীতে তালাবন্ধ করে যাবি, দিন দুপুরে ভয় কি ?"

হিমানী ইতস্ততঃ করে বল্‌লে "ভয়ের কথা বলছি না, তবে মনে কর উনি যদি আমাদের আগেই ফেরেন, তা হলে—" "তা হলেই বা ক্ষতি কি ?—রাগ করবেন ?—ওঃ ! করুন না রাগ !—এত ভয় কেন ?—বেড়াতে বুঝি ওঁরাই জানেন—আমরা জানি না ?—সত্যি হিমু ! তুই অত ভাল-মানুষী করেই মাটী করেছিস আপনাকে, পুরুষ মানুষকে অত আস্কারা দিতে আছে কি ? ওরা 'নাই' পেলে যে মাথায় ওঠে। নে—আর দেরী করিস নি—ওঠ,—তোর কর্ত্তা আসবার অনেক আগেই আমরা ফিরে আসব।"

কথাগুলো হিমানীর মনে লাগিল। বাস্তবিক পুরুষরা যদি ঘর-সংসার ভুলে মজা করে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে পারে, তবে মেয়েরাই বা পারবে না কেন ? বার মাস ঘর আগলে—কোণ-ঠাসা হয়ে পচে মরে তাদের কি পরমার্থ লাভ হবে ? সে আর

দ্বিরুক্তি না করে উঠে পড়ল কমলার ভ্রমণের সাথী হতে।

৩

"মণ্টুদা! দেখেছ—এই আমার বন্ধু হিমানী—আমি তোমাকে এরি কথা বলছিলুম, সত্যি এমন সুন্দর মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না, যেমন রূপ তেমনি গুণ, ঐ তো অল্প আয়—ওরি মধ্যে সংসারটীকে কেমন গুছিয়ে রেখেছে কিন্তু হলে কি হয়—মা যে বলেন 'অতিবড় রূপবতী না পান বর, অতি বড় গুণবতী না পান ঘর'—ও বেচারীর ভাগ্যে ঠিক তাই হয়েছে।"

সরলপ্রাণা কমলা অতি সহজ সরলভাবেই কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে গল্—গল্ করে বলে গেল তার শ্রোতাদের মুখের দিকে না চেয়ে। কিন্তু হিমানীর সুন্দর মুখখানি ম্লান পাংশু হয়ে গেল—অপমানের দুঃসহ ব্যথায়। একজন অপরিচিত ধনবান্ পুরুষ—তার কাছে অতর্কিতে নিজের দীনতা হীনতা প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় সে যেন লজ্জায় সঙ্কোচে মরমে মরে গেল। অপমানাহত প্রাণের বেদনা গোপন করবার প্রয়াসে সে নতনেত্রে নতমুখে খোকার মাথাভরা কোঁকড়া চুলগুলো গুছিয়ে দিতে লাগল।

মণ্টুদার মুখেও কথা ছিল না, সে নির্ব্বাক নিষ্পলক হয়ে চেয়েছিল সঙ্কোচনতা লাজনম্রা তরুণীর দিকে—তার ভাব দেখে মনে হয়, সে যেন কোন বিস্মৃত স্মরণে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। এদের দুজনের এই মৌন কমলার কিন্তু অসহ্য হয়ে উঠল। নূতন লোক দেখায় কুণ্ঠায় জড়সড় ডলির হাত ধরে মণ্টুদার দিকে এগিয়ে এসে সে বল্লে, "মেয়েটীকে দেখেছ? কি সুন্দর! যেন মোমের পুতুলটী, ডলি নাম রাখা সার্থক হয়েছে ওর।" মণ্টু যেন চমক-ভাঙ্গা হয়ে ডলিকে আদর করে বল্লে, "সুন্দর তো হবেই, যার মা অমন চমৎকার!" বক্তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাণীতে বহুদিন পূর্ব্বে শ্রুত পরিচিত কণ্ঠস্বরের আভাস পেয়ে হিমানী চকিত হয়ে এতক্ষণ পরে কুণ্ঠানত দৃষ্টি তুলে সেই অপরিচিতের মুখের পানে চাইলে—এ কি! এ মুখ যে তার চেনা!—এ যে সেই সৌরেশবাবু দিল্লীতে যিনি হিমানীর পাণিপ্রার্থী হয়ে এসেছিলেন—এ সেই ধনী জমিদার-নন্দন সৌরেশ, যে একদিন অযাচিতে এসে, রূপসী হিমানীকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে রাজরাণীর সম্মান দিয়ে ষোড়শোপচারে তার রূপের পূজা করতে চেয়েছিল উপেক্ষিত শূন্য সিংহাসন নিয়ে—প্রত্যাখ্যাত ব্যর্থ পূজার অর্ঘ্য নিয়ে রিক্ত জীবনের গোপন বেদনা বহন করে যে আজও অনাগতা মানসী প্রতিমার ধ্যানে তন্ময় হয়ে আছে—যাকে পাবার আশা এ জীবনে নেই, যে তার প্রাণের পূজা পাষাণীর মত পায়ে ঠেলে সুখ-সম্পদ-ভরা অত বড় জীবনটাকে নিঃস্ব বঞ্চিত করে দিয়েছে!

হিমানীর কোমল নারীচিত্ত একটা অজ্ঞাত ব্যথা ও সশ্রদ্ধ সহানুভূতিতে ভরে উঠল—পুরুষের প্রেম কি এত গভীর এমন একনিষ্ঠ হতে পারে! সৌরেশের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই হিমানী আরক্তমুখে একটী ছোট্ট নমস্কার করে চকিত দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে কিন্তু সৌরেশের দৃষ্টি ফিরল না, বিস্মিত নির্ব্বাক অনিমেষ হয়ে সে চেয়ে রইল তার সেই পাঁচ বছর আগেকার দেখা—পাঁচ বছরের স্বপ্নে দেখা—অবিস্মৃত সুন্দর মধুর মুখখানির পানে—সে মুখ এখন পূর্ণ যৌবনে মধ্যাহ্নের স্থলপদ্মের মত পূর্ণ-বিকশিত, কিন্তু সৌরেশের মনে হ'ল যেন তার কোথায় একটুখানি বিষাদের ম্লান ছায়া পড়েছে—তার ক্ষুব্ধ অন্তর কম্পিত করে একটা ব্যথাভরা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস অতর্কিতে বেরিয়ে

এল। সে নিঃশ্বাসের শব্দে অবনতমুখী হিমানী চমকে উঠল। বেচারী কমলা ভেতরের খবর কিছুই জানত না, তাই এদের দুজনের মৌনভাব ও অকারণ সঙ্কোচ দেখে সে অধৈর্য্য হয়ে বল্‌লে—"তোমরা যদি এত বেশী লজ্জা করো মণ্টুদা! তা হলে একসঙ্গে যাওয়া হবে কি করে?—কেউ যদি কারুর সঙ্গে কথা না কও—"

সৌরেশ যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে অপ্রতিভের ভাবে বল্‌লে—"না না, আমার কাছে লজ্জা করবার কারণ তো কিছু নেই—ওঁকে নিয়ে চল।"

যত শীঘ্র ফেরবার কথা ছিল, কার্য্যতঃ তা ঘটে উঠলো না। দ্রষ্টব্য স্থানের খুঁটিনাটি তন্ন তন্ন করে দেখে, ফিরতে বেলা প্রায় শেষ হয়ে এল। মোটরে উঠেই কমলারা তিন ভাই বোনে এই মাত্র যে সব আশ্চর্য্য ও সুন্দর জিনিষ দেখেছে তারই সমালোচনা নিয়ে মহা তর্ক বিতর্ক জুড়ে দিয়েছিল। ডলিও এক একবার যোগ দিচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে তারা সৌরেশকে সাক্ষী মেনে জিজ্ঞাসা করছিল, এটা ঠিক, কি ভুল। সৌরেশ হুঁ করে সংক্ষেপে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিলে বটে কিন্তু সে আজ ভারী অন্যমনস্ক আত্মবিস্মৃত—তার মন তখন যেন কোন সুদূর স্বপ্নলোকে উধাও হয়ে গিয়েছে। হিমানীও বাক্যহীন।—ঘুমন্ত খোকাকে কোলে নিয়ে জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে সে উদাসনয়নে দেখছিল—চলন্ত মোটরের বিপরীত দিকে দ্রুত-ধাবমান বক্র, বন্ধুর পার্ব্বত্য পথের পারিপার্শ্বিক দৃশ্যগুলি—সবুজ শষ্পাবৃত কত ছোট বড় পাহাড় গায়ে গায়ে ঘেঁসে হেমন্ত-সায়াহ্নের স্বর্ণরবি-করদীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে যেন আনন্দে হাসছে। মধ্যে মধ্যে গভীর খাদ—যেন সাক্ষাৎ কৃতান্তের মত অন্ধকার করাল মুখ ব্যাদান করে রয়েছে। গাড়ীর চাকা যদি হঠাৎ পিছলে গিয়ে ওর মধ্যে পড়ে, তা হলে আর উদ্ধার নেই!—কথাটা মনে করতেই হিমানী আতঙ্কে শিউরে উঠল। হঠাৎ এক সময় সে জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল—"আর কত পথ বাকি—আমরা কখন পৌঁছুব?"

এ প্রশ্ন যাকে করা হল—সে তখন গল্পে মত্ত। কমলার হয়ে সৌরেশ উত্তর দিলে—"আর দেরী নেই—আধ ঘণ্টার পথ।" হিমানী একটা ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে—"এখনো আধ ঘণ্টা!"—হিমানীর উদাস মুখের দিকে চেয়ে সৌরেশ কোমল স্নিগ্ধ স্বরে বললে, "খোকাকে কোলে নিয়ে আপনার কষ্ট হচ্ছে বুঝি? তা হলে আমাকে"—"না না, কিছু কষ্ট হচ্ছে না—ও আমার খুব অভ্যাস আছে"—কথাটা বলবার সময় হিমানীর সৌরেশের সঙ্গে আর একবার চোখোচোখি হয়ে গেল। লজ্জায় লাল হয়ে সে তৎক্ষণাৎ চোখ দুটী নামিয়ে নিলে। সৌরেশের দিকে চাইতে, সৌরেশের সঙ্গে কথা কইতে হিমানীর এত লজ্জা, এত সঙ্কোচ যে কেন হচ্ছিল তা সে নিজেই বুঝে উঠতে পারছিল না। তার লজ্জার আধিক্য দেখে, সৌরেশের আর কথা বলতে ভরসা হল না—হিমানীর লজ্জারুণ আনত মুখখানির দিকে স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করে নীরবে বসে রইল।

ট্যাক্সির ড্রাইভার তখন হেমন্তের শেষ-বেলায় সোনার আলো আর ঈষৎ শীত-কণ্টকিত ফুর-ফুরে বাতাসে উৎফুল্ল হয়ে গান ধরেছিল—

"অগর্ প্যারী সুরত তুম্‌হারি না হোতি
মুলাকাৎ তুমসে হমারি না হোতি
অগর্ খোয়াব্ মে হম্—জেরা দেখ্ লেতে
তো দিল্ মেঁ ইস্ কদর্—বে-করারি না হোতি"

গায়কের কণ্ঠ তেমন মধুর না হলেও গানখানি সৌরেশের মনে বড় লাগল। তার ভাব-নিমগ্ন

চিত্ত একটা অজানা ব্যথায় ব্যথিত হয়ে উঠল। একটা ক্ষোভের নিঃশ্বাস ফেলে সে মনে মনে বললে, এ প্যারী সুরত যে খোয়াবে দেখাই ছিল ভাল—মুলাকাতের দরকার তো ছিল না!—স্বপ্নময়ীকে আজ জাগ্রতে প্রত্যক্ষ দেখে এ চিরতৃষিত প্রাণের বে-করারি (ব্যাকুলতা) ছাই-চাপা আগুনে ফুঁ দেওয়ার মত প্রবল উদ্দাম হয়ে উঠল যে, কি করে উপশম করা যায়? হায় রে নিষ্ঠুর ভবিতব্য!—এখানে সে কেন এসেছিল? এ ক্ষণিকের দেখা না হওয়াই যে তার পক্ষে মঙ্গল ছিল—

সে গানের প্রভাব হিমানীর স্বপ্ন-মুগ্ধ প্রাণে মোহের সৃষ্টি করেছিল কি না, তা বোঝা গেল না। ঘুমন্ত খোকাকে পরম আগ্রহে বুকের ভেতর চেপে সে নতমুখে স্থির স্তব্ধ হয়ে বসেছিল—যেমন ভূতের ভয়ে ভীত ব্যক্তি দুর্ব্বল মনে শক্তি লাভের জন্য রক্ষাকবচ ধারণ করে।

৪

বাসায় এসে হিমানী যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল; নির্ম্মল তখনো ফেরেনি। সংসারের কাজ কর্ম্ম তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে সন্ধ্যার দীপ জেলে উদ্‌গ্রীব উন্মুখ হয়ে রইল সে স্বামীর প্রতীক্ষায়। হিমানীর বিক্ষিপ্ত চিত্তের চাঞ্চল্য তখনো শান্ত হয় নি—সে যেন আজ স্বপ্নের ঘোরে পথ হারিয়ে ফেলেছিল—ক্ষণিকের ভুলে—সেই হারাণোর ব্যথাটা তার ক্ষুব্ধ অন্তরে তখনো ফোটা কাঁটার মত খচ্ খচ্ করছিল।

স্বামীর জন্য এত ব্যাকুলতা, এত উৎকণ্ঠা সে অনুভব করেনি, অনেক দিন। কিন্তু সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত হয়ে পড়ল—নির্ম্মলের তখনো দেখা নাই। তার আসতে যত দেরী হচ্ছিল হিমানীর মন সংশয়ে শঙ্কায় ততই অধীর হয়ে উঠছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফেরবার কথা, তবে এত দেরী হচ্চে কেন? হয় তো সে হিমানীর আগেই ফিরেছিল, বাড়ী বন্ধ দেখে রাগ করে চলে গেছে—বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে হয় তো অনেক রাতে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় বাড়ী ফিরবে—মাতাল স্বামীর শুশ্রূষায় তাকে রাত জেগে ব্যতিব্যস্ত হতে হবে কিন্তু হিমানী এবার আর তা করছে না! অবিবেচক অকরুণ স্বামীর অত্যাচারের প্রতিদানে যত্ন আদর দিয়ে তার নির্লজ্জপনার প্রশ্রয় সে আর দেবে না। কমলা ঠিক কথাই বলেছে—পুরুষের জাত নাই পেলে মাথায় ওঠে।

কিন্তু পথে যদি কোন বিপদ-আপদ ঘটে থাকে—পাহাড়ী রাস্তা যে দুর্গম! শেষ কথাটা মনে করতেই হিমানীর অন্তরাত্মা শিউরে উঠল—না না, ভগবান কি তাই করবেন!—হিমানী কি সত্যিই এমন মহাপাপ করেছে! দারুণ দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগে অধীর কাতর হয়ে হিমানী বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদনকে স্মরণ করতে লাগল।

কতক্ষণ এইভাবে যম-যন্ত্রণা ভোগের পর, সিঁড়িতে কার পদশব্দ শোনা গেল। কিন্তু এক-জনের নয়, দুজনের। হয় তো নির্ম্মলের মত্ত অবস্থা দেখে সঙ্গীরা কেউ তাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে এসেছে। যাক্ যেমন অবস্থায় হোক্—একবার সে ঘরে আসুক তো—হিমানী আজ একটা হেস্ত নেস্ত করবে—আজ তার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবে!

হিমানী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল,—'হট্' করে দরজা না খুলে সে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে—"কে?" অপরিচিত বামা কণ্ঠে উত্তর এল, আমি বহুজী!—শম্ভুর মা—আপনি একা আছেন বলে লালাজী আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।" শম্ভুর মা—হিমানীর নিতান্ত অপরি-

চিতা নয়, সে বড়বাবুর বাড়ীর ঝি। কিন্তু এত রাত্রে ঝিকে পাঠিয়ে দেওয়া—লালাজীর এত অনুকম্পা কেন? সন্দিগ্ধভাবে দোরটা খুলে হিমানী দেখলে শুধু শম্ভুর মা নয়, বড়বাবুর পাহাড়ী চাকরটাও লণ্ঠন নিয়ে সঙ্গে এসেছে—আজ ব্যাপার কি?

সে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলে—"লালাজী কি কণ্ডাঘাট থেকে ফিরেছেন, দাই?" "হাঁ এই যে ফিরলেন মটার গাড়ীতে—ফেরবার পথে ভারী একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে—বহুজী!"

হিমানীর বুকের ভেতর যেন সজোরে হাতুড়ীর ঘা পড়ল। বুকখানা দু' হাতে চেপে ধরে সে ভীত ত্রস্তকণ্ঠে বলে উঠল, "অ্যাঁ! কি হল কি? কি রকম দুর্ঘটনা ঘটেছে দাই?" "বলছি আগে ঘরে চলুন।" চাকরকে বাড়ী ফিরে যেতে বলে শম্ভুর মা ভীতিবিহ্বলা ব্যাকুলা হিমানীকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে এল। হিমানীর শঙ্কাকাতর করুণ মুখখানি দেখে তা'র বড় মায়া হচ্ছিল! আহা! এই কাঁচা বয়স—এমন রূপ! এত বড় ভয়ানক দুঃসংবাদ তাকে শোনাবে সে কেমন করে? কিন্তু এ খবর তো লুকোনো থাকবে না। দুর্ভাগিনী হিমানীর মাথায় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত করে শম্ভুর মা বললে, "ফেরবার সময় যখন মাত্র পাঁচ মাইল পথ বাকি, তখন হঠাৎ একটা গরুর গাড়ীর ধাক্কা লেগে বাবুদের 'লরি' রাস্তার ধারে কাৎ হয়ে পড়ে; সেই দিকেই ছিল প্রকাণ্ড পাহাড়ে 'খড্', সে 'খড্' যে কত গভীর, কোথায় তার শেষ হয়েছে, তার ঠিকানা নেই। ড্রাইভারকে পড়তে পড়তে চাপরাসী ধরে ফেলেছে, তার মাথায় জখম ভয়ানক। বাবুরাও অল্প-বিস্তর চোট খেয়েছেন কিন্তু হিমানীর স্বামী—নির্ম্মলবাবুর পাত্তাই পাওয়া গেল না—খোঁজ-তল্লাস করা হয়েছিল যতদূর যে অবস্থায় সম্ভব কিন্তু"—"উঃ"!—হিমানী আর শুনতে পারল না, তার দুই কানে যেন কে গলানো সীসে ঢেলে দিলে। সে আর কিছুতেই স্থির থাকতে না পেরে, দুচক্ষে অন্ধকার দেখে মাথা ঘুরে অচৈতন্য হয়ে পড়ল।

মূর্চ্ছাহতা হিমানীর লুপ্ত সংজ্ঞা যখন ফিরে এল, তখন রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ধীরে ধীরে চোখ মেলে সে দেখলে, ছেলে মেয়ে দুটী তার পাশে শুয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে—কিন্তু স্বামীর শয্যা শূন্য। তিনি কি এখনো আসেন নি?—কিম্বা এসেছিলেন, বেহুঁস হিমানীর সাড়া না পেয়ে ফিরে চলে গেছেন?—উঃ! কি কাল ঘুমেই আজ ধরেছিল তাকে! খোকাকে দুধ পর্য্যন্ত খাওয়ানো হয় নি—বাছা তবু কাঁদেনি—কি লক্ষ্মী ছেলে সে!—হিমানী ধড়মড় করে উঠে বসতেই মূর্চ্ছার অবসাদ ও দুর্ব্বলতায় তার আপাদমস্তক ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল। খাটের পাশেই মাটীতে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল সেই বড়বাবুর দাই—তার দিকে দৃষ্টি পড়তেই হিমানী সর্পাহতের মত ভয়ানক চম্‌কে শিউরে উঠল—চকিতে দুঃস্বপ্নের মত মনে পড়ে গেল আজিকার অভাবিত অতর্কিত দারুণ দৈব দুর্ঘটনার কথা—এ কি স্বপ্ন না সত্যি? সত্যিই কি অভাগিনী হিমানীর কপাল ভেঙ্গেছে?—তবে সে বেঁচে আছে কেমন করে?—এই বিদেশে বিভূঁয়ে অসহায় নিরাশ্রয় হয়ে—জীবনের সকল সুখ-সাধে জন্মের মত জলাঞ্জলি দিয়ে অনাথ শিশুদুটীকে বুকে নিয়ে—সে এখন যাবে কোন্ অকরুণের রাজ্যে?—ওঃ! ভগবান্!—তোমার এ কি অন্যায় অবিচার প্রভু! এই দুর্ব্বিষহ নিদারুণ শাস্তি তা'র কি পাপে?—তরুণী-হৃদয়ের সেই ক্ষণিকের বিস্মৃতি—মুহূর্ত্তের সেই দুর্ব্বলতাটুকুও ক্ষমা করতে পারলে না!—তুমি না দয়াময়—ক্ষমাময়?—তবে এ লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিলে কেন ঠাকুর!

বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত মুহ্যমান হয়ে হিমানী কতক্ষণ নীরবে নিঃসাড়ে বসে রইল—তার কাঁদবার শক্তিও তখন ছিল না, দাম্পত্য-জীবনের সুখ ও দুঃখের কত শত চিত্র, বায়স্কোপের ছবির মত তার বিভ্রান্ত-বিহ্বল চিত্তে একে একে ফুটে উঠছিল, সেই ভালবাসার মধুর মান-অভিমান, প্রাণ-গলানো আদর-সোহাগ,—সেই বিরহের ব্যথাভরা ব্যাকুলতা মিলনের স্বপ্নমদির বিপুল পুলকোচ্ছ্বাস—ওঃ! আজ সে সমস্তই কি শেষ হয়ে গেল!—তবে এ ভাগ্যবতীর বেশ—হিমানীর সুগৌর নিটোল হাত দুখানিতে সোনা-বাঁধানো শাঁখার কোলে লাল টুকটুকে 'কড়' দুগাছি নারী-সৌভাগ্যের নিদর্শন নিয়ে তখনো জল্ জল্ করছিল, হিমানীর ইচ্ছা হল সে দুগাছা এখনি পাথরে আছড়ে ভেঙ্গে গুঁড়ো করে ফেলে। আধ ময়লা সাড়ীর চওড়া লাল পাড়টুকু তার সারা অঙ্গে যেন অগ্নিশিখার মত জড়িয়ে ধরেছিল, সেই পাড়ের ফাঁস তৈয়ার করে হিমানী যদি এ যমযন্ত্রণার অবসান করতে পারত—আঃ!—তাই করুক না—কিন্তু ঐ যে ছেলেমেয়ে দুটো মুক্তিপথের কণ্টক তার—

হিমানী উদ্‌ভ্রান্ত বিপর্য্যস্ত দেহ-মন নিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল—সুমুখেই দড়ির আলনায় ঝুলছিল নির্ম্মলের ময়লা কামিজ, যাবার সময় সে ছেড়ে গিয়েছিল, কামিজটা টেনে নিয়ে হিমানী তার বিদীর্ণপ্রায় বুকের ওপর সজোরে চেপে ধরল, এ যে সেই প্রিয়স্পর্শ—মধুগন্ধ জামাটায় এখনো মাখানো রয়েছে!—কিন্তু সে এখন কোথায়?—কোন্ করাল, গভীর নিভৃত গিরিকন্দরের অতল তলে তার চিরসমাধি—উঃ! —কি ভয়াবহ মর্ম্মান্তিক মৃত্যু!—নিয়তির কি নিষ্ঠুর লিখন!

হিমানীর বুকের পাঁজরে ছুরির আঘাতের মত মনে পড়ল স্বামীর বিদায়কালের সেই হাসিভরা মধুর স্নেহ-সম্ভাষণ—"যাও বলতে নেই লক্ষ্মী—বলো এস—" "না বুঝে যাও বলেছিলুম—তাই কি তুমি রাগ অভিমান করে চলে গেলে? একবার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবার অবকাশও দিলে না গো!"—বলে হতভাগিনী মর্ম্মাহতা হিমানী শরবিদ্ধা কুরঙ্গিনীর মত অসাড়ে লুটিয়ে পড়ল। এতক্ষণ পরে তার শুষ্ক জ্বালাময় চক্ষুদুটী আর্দ্র করে তপ্ত অশ্রুজল অগ্নিস্রাবের মত নিঃশব্দে ঝরে পড়তে লাগল। সে অশ্রু আর এ জীবনে শেষ হবার নয়।

হঠাৎ বাইরে কিসের একটা শব্দ হল, মৃদু অস্পষ্ট, তবু হিমানী সেইটুকুতেই চমকে উঠল। কিসের একটা ভ্রান্ত আশা মনে নিয়ে, মূর্চ্ছাতুর অবসন্ন দেহখানা কষ্টে বহন করে সে ঘর থেকে বেরিয়ে খোলা ছাদে এসে দাঁড়াল—কৈ! কেউ তো নেই সেখানে—সমস্তই নিস্তব্ধ। শুধু ধূসর দিগন্তে উষার অগ্রদূত শুকতারা উজ্জ্বল কোহিনূরের মত দপ্ দপ্ করে জ্বলছিল, হেমন্ত-নিশান্তের হিম-ঝরা শীতল বাতাস হু হু করে ছুটে এসে—হিমানীর শক্তিহীন অবসন্ন দেহখানাকে কম্পিত কণ্টকিত করে তুলছিল। তবে কি এ ভ্রান্তি—শুধুই ভ্রান্তি? আর কিছু নয়? সে কি তবে আসে নি? আর আসবে না?—যার সঙ্গে জীবন-মরণের সম্বন্ধ সে কি একবার শেষ দেখা দিতেও—ও কি ও! সিঁড়ির খোলা দরজার কাছে—অন্ধকারে—ও কার ছায়া দেখা যায়? এসেছ? এস এস এস গো! হিমানী পাগলিনীর মত সেই দিকে ছুটে গেল কিন্তু দু'পা না এগোতেই মূর্চ্ছা এসে তাকে নিশ্চল অনড় করে দিলে।

মোহের ঘোরে হিমানী যেন স্বপ্ন দেখছিল নির্ম্মল এসেছে—সত্যিই এসেছে। হিমানীর ধূলি-

লুণ্ঠিত লাঞ্ছিত শির কোলে তুলে নিয়ে সে কত আদর করছে, কত কাতর হয়ে ডাকছে হিমানী! হিমু! ওঠো,—চোখ খোলো, —অমন করে ভয় দেখিও না লক্ষী সোনা আমার!

না, এ তো স্বপ্ন নয়—ভ্রান্তি নয়! সেই চিরপরিচিত সুখময় প্রিয়স্পর্শ—সেই মধুর প্রিয়সম্বোধন যে হিমানী তার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করছে! মূর্চ্ছাতুর দুর্ব্বল দেহ-মনের জড়তা কষ্টে কাটিয়ে হিমানী ভয়ে ভয়ে চোখ খুলে দেখলে তার এ স্বপ্ন মিথ্যে নয় সত্যি—স্বামীর কোলে মাথা রেখে সে শুয়ে আছে ভাগ্যবতীর মত—আঃ! এমনি করেই আজ যদি সে মরতে পারে! তাকে চোখ মেলতে দেখে আশ্বস্ত হয়ে নির্ম্মল বললে,—"ভয় পেয়েছে হিমু? ভয় নেই আর আমি এসে গেছি।" হিমানী তার ক্লান্ত ব্যাকুল বাহু দুটীতে স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করে কম্পিত রুদ্ধ স্বরে বললে, "সত্যিই তুমি এসেছ? ও গো! বলো—এ কি স্বপ্ন নয়?" "না হিমানী! সত্যিই আমি এসেছি—নবজীবন লাভ করে—প্রেতাত্মা নয়!"—কম্পিতা বেপমানা হিমানীকে উচ্ছ্বসিত আবেগে গভীর প্রেমে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে নির্ম্মল তার সকল ব্যথা-তাপ এক নিমেষে মুছে দিলে।

* * *

নির্ম্মল তার এই পুনর্জ্জন্ম-রহস্য বন্ধুদের কাছেও প্রকাশ করে নি, কিন্তু স্ত্রীকে সে অকপটে সমস্ত ঘটনাই জানিয়েছিল।

নির্ম্মলের দলবল যখন পিক্‌নিক্ শেষ করে ফেরবার জন্যে একে একে লরিতে এসে বসে, তার মধ্যে নির্ম্মলও ছিল, কিন্তু 'মাত্রাধিক্য' ঘটায়—শরীরটা তার কেমন যেন ঝিম্ ঝিম্ করছিল, মনটাও কেমন 'মিইয়ে' গিয়েছিল, তাই সে অবসাদ-গ্রস্ত শরীর ও মন তাজা করবার ওষুধ আর এক 'ডোজ্' খেয়ে যাত্রা করবে বলে হোটেলে যায়—হোটেল খুব কাছেই, পাঁচ মিনিটের পথও নয়। কিন্তু হয় তো তার একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল, বেশ একটু 'চাঙ্গা' হয়ে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি হোটেল থেকে বেরিয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দেখলে 'লরি' অন্তর্দ্ধান। সম্ভবতঃ নির্ম্মলের অনুপস্থিতি সঙ্গীরা কেউ লক্ষ্য করে নি, তখন ট্রেনেরও সময় ছিল না, আর আসল কথা "ওষুধে"র গুণে নির্ম্মলের নড়ন-শক্তিও তেমন ছিল না, তাই সে বুদ্ধিমানের মত হোটেলে খানিক বিশ্রাম করে সুস্থ হ'য়ে শেষ রাত্রে তবে বাড়ী এল।

* * *

এই দৈবদুর্ঘটনায় কিন্তু দম্পতির কোনই ক্ষতি হয় নি বরং শাপে বর হয়েছিল। নির্ম্মল স্ত্রীর গায়ে হাত দিয়ে সেই যে শপথ করেছিল সেই অবধি মদ আর সে জীবনে কখনো স্পর্শ পর্য্যন্ত করে নি।

আর হিমানী শুধু তার হারানিধি স্বামীকেই পায় নি, হারানো স্বামীর সঙ্গে সে ফিরে পেয়েছিল কঠোর সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষীয়মাণ ক্ষুণ্ণ মন্দীভূত প্রেম—যে প্রেমে আত্মহারা হয়ে সে উন্মেষিত তরুণ যৌবনে—পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে রাজ-ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ করে বিত্তহীন নিঃস্ব নির্ম্মলের কুটীররাণী হতে পেরেছিল।

———

গাথা

অনুযোগ

কবিগুণাকর শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি-এ,

—'কি হেতু দরিদ্র নিত্য করে অনুযোগ ?'—
সুধাইল ধনীর কুমার ;
—'আসুন আমার সাথে'—কহিলাম ধীরে
—'আমি দিব উত্তর তাহার।'

দারুণ পউষ-সন্ধ্যা, পড়েছে তুহিন
অঙ্গে বায়ু হানিছে সায়ক,—
বাহিরিনু পথে দোঁহে ঢাকি শীতবাসে
আমাদের আপাদ-মস্তক।

হেরিনু সমুখে এক বৃদ্ধ শুভ্রকেশ,
নগ্নকায় কম্পিত শরীর,
সুধাইনু—'এ দারুণ শীতের সন্ধ্যায়
কেন বৃদ্ধ হয়েছ বাহির ?'

কহিলা সে ক্ষীণকণ্ঠে—'খিদের জ্বালায়'—
কতবার বেধে গেল কথা—
—'এককণা দানা আজ পড়ে নাই পেটে,
—কে বুঝিবে গরীবের ব্যথা !'

পথে যেতে যেতে পুনঃ দেখিলাম হায়
দুখিনী বালিকা একজন—
সুধাইনু—'এ দারুণ শীতের সন্ধ্যায়
পথে তার কিবা প্রয়োজন ?'

শুনিলাম—পিতা তার অসুখ-শয্যায়,
পথ্য বিনা আছে উপবাসে—
হয়েছে বাহির তাই অনন্ত-উপায়
খাদ্য কিছু পাইবার আশে।

কিছু দূরে নারী এক বসি তরুতলে—
দুই কাঁখে শিশু দুইজন,
—পরিধানে ছিন্ন চীর—তাহারি খানিক
হয়েছে শিশুর আচ্ছাদন।

থাকি থাকি শিশু দুটি উঠিছে কাঁদিয়া,
জননীর চক্ষে বহে নীর,
সুধাইনু—'এ দারুণ শীতের সন্ধ্যায়
গৃহ ছাড়ি কেন মা বাহির !'

কহিলা সে—'অল্পদিন হয়েছি বিধবা,
—নাই মোর আত্মীয়-স্বজন,
—তাই সারাদিন মেগে ফিরি পথে পথে
—অভাগীর অদৃষ্ট যেমন।'

ধনীর সন্তানে শেষে কহিনু সম্বোধি,
দাঁড়া'ল সে চলিতে চলিতে,
—'কি হেতু দরিদ্র নিত্য করে অনুযোগ
এখন কি হইবে বলিতে !'

খেয়ালী

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত

১

অন্য দিন অপেক্ষা অধিক আদরে ও যত্ন-সহকারে চা ও খাবার লইয়া আসিয়া বাণী স্বামীর হাতে দিলে, দেবেশ নেহাৎ অন্যমনস্কভাবে তাহা লইয়া সম্মুখস্থ টেবিলের উপর নামাইল। দেবেশের মুখাকৃতিতে ইহা বেশ স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছিল যে, তাহার মন অত্যন্ত খারাপ। বাণীর ইচ্ছা হইল—বক্ষের আবরণ উন্মোচন করিয়া, প্রাণকে বাহির করিয়া, স্বামীর বুকে রক্ষাকবচের মত বুলাইয়া দিয়া তবে সে আজ পিত্রালয়ে গমন করে! ধীরে ধীরে আসিয়া সে দেবেশের খুব কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। অন্তর তাহার ফাটিয়া যাইবার উপক্রম করিল। কত আরাধনা করিয়া পাওয়া—মনের মতন স্বামী তাহার, সেই সদা-প্রফুল্ল, শান্ত সুকুমার মুখ আজ বিশুষ্ক মলিন!—কি দুঃখে!—কিসের অভিমানে সে!—

প্রিয়ার স্নিগ্ধ পরশ—প্রতিদিন সর্ব্বদা যাহা দেবেশের সর্ব্বাঙ্গে মহানন্দ-শিহরণ জাগাইয়া রাখিত, আজ যেন তাহা তাহার অনুভূতির মধ্যেই আসিল না। বাণীর সর্ব্বাঙ্গের সে মন্দার-গন্ধ, আজ যেন তাহার বিচ্ছেদের দীর্ঘশ্বাসে কোথায় উড়াইয়া লইয়া গেল। খাবার খাইয়া, চায়ের কাপে চুমুক লাগাইতেই দেবেশ দেখিল— মনোহর সাজে সজ্জিতা বাণী, মহারাণীর মত তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া। সম্মুখস্থ বড় আয়নাটায় তাহাদের উভয়ের মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়াছিল।

তথাপি দেবেশ কোন কথা বলিল না দেখিয়া, বাণী প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া কহিল—"কি ভাবছো? মন বড্ড খারাপ হয়েছে? আমি না হয় তবে যাবো না আজ—"

চা পান শেষ করিয়া দেবেশ বাণীকে কোলের কাছে, বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া সাদরে কহিল, —"বাণী! কাকাবাবু তোমার, তোমাকে খুব ভালবাসেন—তাঁর জন্যে তোমার খুব মন কেমন করে নয়?"

বাণীর চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল গড়াইল। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া সে কহিল—"সংসারে যদি দেওয়া-নেওয়াই ভালবাসা হয়—তা হলে তিনি আমায় ভালবাসেন না। তবে যদি প্রাণের সহিত মানুষের স্নেহ-ভালবাসার কোন সম্বন্ধ থাকে, তা হ'লে তিনি আমায়—"

"আচ্ছা, তিনি তোমার চেয়ে কত বড়?"

"প্রায় সমবয়স্ক! দু' এক বছরের বড় হবেন।"

"তুমি ত তা হ'লে খুব অকৃতজ্ঞ! তিনি তোমায় এত ভালবাসেন, আর তুমি এতদিনের মধ্যে একটী বারও তাঁকে চোখের দেখা দেখ্‌বার ইচ্ছা প্রকাশ কর নি?"

"সে তোমারই জন্তে! তুমি মনে করো না যে মেয়েরাও তোমাদেরই মত—প্রিয়া পেলে আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বোন সমস্ত ভুলে যায়! স্বামী

তুমি, পাছে তোমার সুখের কোনও রূপ ব্যাঘাত ঘটে, পাছে তুমি—"

"আচ্ছা, তুমি ত ইচ্ছা করলেই তাঁকে লিখতে পারো; তিনি মাঝে মাঝে এখানে এসে কিছুদিন ক'রে কাটিয়ে যেতে পারেন।"

"তিনি আসবেন না। কেনই বা তিনি আসবেন এখানে? কি দাবী তাঁর এখানে? তাঁর নিজেরও ত একটা মান-ইজ্জত আছে। অন্য যাই হ'ক; ও সব বিষয়ে তিনি খুব কড়া লোক।"

"দাবী না থাকলে কি আর আস্‌তে নাই? সেরূপ যদি তিনি মনে করেন, তা হ'লে আমি তাঁকে কোনক্রমেই ভাল বল্‌তে পারি না।"

"তোমার ভাল বলা, না বলায় তাঁর সামান্যই আসে যায়—"

"তোমার বাবাও ত শুনেছি তাঁদের কোন খবর রাখেন না। তোমার ঠাকুরমারও ত বয়স হ'য়েছে—"

"তার জন্যে বাবাকে দোষ দেওয়া যায় না। মা-ই—"

দেবেশ বাণীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—"কি বল্‌ছ তুমি বাণী! মেয়ে হ'য়ে—"

"হোক না সে মা! তা ব'লে সত্যি যা তা কারুর কাছে গোপন কর্‌তে ব'লো না। ঐ জন্যে মায়ের সঙ্গে আমার মোটেই বনে না। বাঙ্গালীর আজ এত অধঃপতন, আমার মনে হয় ঐ মায়ের মত মেয়েগুলোর জন্যে। তারা যদি প্রকৃত শিক্ষা পেত! ইংরাজী শিক্ষা নয়; ধর্ম্মের ভেতর দিয়ে, মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত পড়ে যে শিক্ষা পাওয়া যায়—তা হ'লে বোধ হয় বাঙ্গালার গৃহস্থ-সংসার আবার সজীব হ'য়ে উঠ্‌তো।"

"গৃহস্থ-সংসারের উপর একটা জাতির উন্নতি অবনতি নির্ভর করে না।"

"গাদা গাদা ইংরাজী কেতাব পড়ে, পাশ ক'রে ঐ শিক্ষাই হ'য়েছে বটে।"

বাণীর শ্লেষবাক্য হজম করিয়া, দেবেশ কথা পাল্টাইয়া লইয়া কহিল,—"আচ্ছা তোমার কাকাবাবুর এখনও বিয়ে হয় নি কেন?"

"বিয়ের বয়স তাঁর, এখনও পার হ'য়ে যায় নি। তোমার চেয়ে বয়স তাঁর অনেক কম।"

"এম-এ পাশও ত করেছেন। চাক্‌রী-বাক্‌রী করেন না কেন?"

"জীবিকা অর্জ্জনই তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য নয়।" বলিয়া বাণী তাড়াতাড়ি আপনার কক্ষে গিয়া, একখানা প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্র লইয়া আসিল। একটা কবিতা বাহির করিয়া তাহা দেবেশকে পড়িতে দিল।

দেবেশ অনেকক্ষণ ধরিয়া কবিতাটী পড়িল। পাঠকালীন তাহার মুখের নানারূপ ভাব-পরিবর্ত্তন ও শেষ কালের দীর্ঘশ্বাসে কবিতাটী যে করুণ-রসাত্মক তাহাই প্রকাশ পাইল।

বাণী কম্পিতকণ্ঠে কহিল মাত্র—"সেই তরুণ বুকে এত দুঃখ, এত ব্যথা কিসের!"

এখন সন্ধ্যা হইয়াছিল। বাহিরে ফটকে আসিয়া মোটর লাগিতেই বাণী একটু চঞ্চল হইয়া পড়িল। সমস্তই প্রস্তুত ছিল। দেবেশ উঠিয়া গিয়া বাণীকে মোটরে তুলিয়া দিল। পাঁচ বৎসর পরে বাণী পিত্রালয় যাত্রা করিল।

এখানে বাণীর পিত্রালয়-গমনের অর্থ—বাণীর পিতা সহরেরই একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, দীর্ঘ দিবসের ছুটী লইয়া তিনি স্বদেশ যাত্রা করিতেছেন। কন্যাও সঙ্গে যাইবে।

২

বাণী আসিয়া মাতার নিকট হইতে জানিতে পারিল—তাহাকে মাতুলালয়ে যাইতে হইবে।

মাতা বহুদিন পূর্ব্বে একবার শাশুড়ীর সহিত ঝগড়া করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, জীবনে তিনি তাঁর শাশুড়ীর মুখদর্শন করিবেন না। সে কথা এখনও তাঁহার মনে আছে। বাণীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সে কহিল,—"তা হ'লে আমাকে নিয়ে আসা হ'ল কেন? তোমার বাপের বাড়ী তুমি যাবে—জানলে আমি কখনো আসতুম না। আমি আমার নিজের বাপের বাড়ী যাবো ব'লে এসেছি—যেখানে আমার কাকা আছেন, যেখানে আমার বাবার মা আছেন—"

"তুই বড্ড লম্বা কথা বলতে শিখেছিস। তোর বড্ড গরব হয়েছে, একটুখানি মুখ সামলাবি।"

"হ'য়েচে ত হ'য়েচে গরব। কেন তুমি আমাকে আগে বল নি? যাবো না আমি তোমার বাপের বাড়ী। এই আমি ফিরে চললুম—"

মাতা একটু নরম হইয়া গিয়া অথচ আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া কহিলেন,—"তোর বাবার ভারী বাড়ীটা কি না। সেই ত কুঁড়ে ঘর। ভাঙ্গা পচা বাড়ী। এই বর্ষায় আমি সেখানে গিয়ে কাদা ঘেঁটে মরতে পারবো না। তোর ইচ্ছা হয়, তুই সেখানে যা না—"

"যাবই ত! গেলে সেইখানেই যাব। তোমার বাবার অট্টালিকায় কেন যেতে যা'ব? আমার বাবার কুঁড়ে ঘরই ভালো। বলতে একটু লজ্জা করে না—সেই কুঁড়ে ঘর ভিন্ন যে গতি ছিল না। আজ যদি বাবার চাকরী যায় তো কালই আবার সেই কুঁড়ে ঘরে ছুটতে হবে।"

"তুই ত তাই চাস। তুই চাস তোরই বরের চাকরী থাক; আর সবার চাকরী যাক—"

"তা কখনো আমি চাই না। আমি এমন তোমার মত নই।"

"তোর এত রাগ কেন শুনি? তোরও যেমন বাবার বাড়ী, আমারও তেমনি।"

পিতা আসিয়া মাতাপুত্রীর ঝগড়া থামাইলেন। বাণীকে তিনি কহিলেন,—"রাগ করিস নে মা বাণী। ও যখন বলছে তখন ওরই কথা থাক্। ওরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হক। তুই তখন সেখানে দুদিন থেকে তার পর তোর ঠাকুরমায়ের কাছে যাস্।"

বাণী আরও রাগিয়া গিয়া কহিল,—"তুমিও বাবা তেম্‌নি। আমি কোথাও যাবো না। আজই আমি ফিরে যাচ্ছি—"

"পাগ্‌লা মেয়ে কোথাকার" বলিয়া পিতা আসিয়া কন্যার মাথায় হাত বুলাইলেন। স্নেহ-ধারায় বাণীর রাগ সব ভাসিয়া গেল! সে আর কোন কথা বলিতে পারিল না।

৩

বাণীর সমবয়স্কা মাসীমাতা কল্পনা আসিয়া কহিল, "বাণী! তুই যেন কেমন হয়েচিস। সব তাতেই যেন বিরক্ত! কি ব্যাপার বল দেখি?"

বাণী নাক সিঁটকাইয়া কহিল,—"ভাল বর—চাকরে বর হয়েছে—তাই গরব হয়েছে।"

"তাই কি আমি বলচি না কি? জানি নে বাবা তোমাদের ও সব কেমন ধারা কথা।"

"কেমন ধারা কথা কি রকম? তুমি যেমন জিজ্ঞাসা করছ! এরির মধ্যে সব তাতে তুমি আমায় বিরক্ত হতে কখন দেখলে?"

"বেশ বাবা চুপ কর। আমারই না হয় অন্যায় হ'য়েচে! মাপ চাইছি আমি তার জন্যে তোমার কাছে"—বলিয়া কল্পনা মুখ গোঁজ করিয়া চলিয়া গেল।

কল্পনার মাতা আসিয়া কহিলেন—"হ্যাঁ লা বাণী! তুই না কি আমার মেয়েকে গালাগাল

দিয়েচিস্! আর যাই হক বাবা, তুই কিন্তু ভাই ভারি ঝগড়াটে—"

বাণী অবাক হইল। সে কহিল,—"তোমাদের বাড়ীতে এসেছি—অসহ্য হচ্চে তা স্পষ্ট বলে ফেল না। এত কথার দরকার কি!"

"হ্যাঁ, অসহ্যই ত হচ্চে। তোরা আমার পর! তোর মা যে আমার পর।"

"মা পোড়ারমুখীর জন্তেই ত আমার এখানে আসা। নইলে—"

"তোমার সঙ্গে কথায় ত পারবো না ভাই! মেয়েটার না হয় বিয়েই এখনও না হয়েচে! তা বয়সই বা তার আর এমন কি বেশী! তোরই ত সমবয়স্ক! তোর বিয়ে দিয়েচে বলেই তাই। নইলে তোকে কি আর এখনও রাখা চল্‌তো না? গিয়ে দেখ পড়ে পড়ে কাঁদচে—"

"কারুর যদি কান্না পায় তা আমি কি করবো? বিয়ের কথা তার সঙ্গে মোটেই হয় নি আমার। আর তাই যদি হয়, তোমরা তার বিয়ে দাও নি কেন? বয়স ত আর দিন দিন কমচে না। আমিই কি আর কচি খুকী না কি; কুড়ী বাইশ বছর বয়স হল—"

"কি মা, কি হ'য়েছে—" বলিয়া বাণীর মাতা আসিয়া সেখানে প্রবেশ করিলেন।

"হয় নি কিছু। এই তোর মেয়েকে দু'ট কথা বল্‌ছিলুম। কল্পনার সঙ্গে কি হ'য়েচে?—সে গিয়ে কাঁদা কাটা করচে!"

"কি করি মা! আমি এমন মেয়ে নিয়ে? কোথাও আমার সোয়াস্তি নেই। এমন মেয়ে যেন সংসারে কারুর না জন্মায়!"

"তোমার খুবড়ো বোনটী খুব ভালো। এর পর সংসারে সকলের তারই মত যেন মেয়ে জন্মায়।" বলিয়া বাণী রাগে গর গর করিতে করিতে চলিয়া গেল।

৪

পরের দিন নীচে, বারাণ্ডায় বাড়ীর মেয়েদের একটা প্রকাণ্ড মজলিস বসিয়াছিল। কল্পনাও সেখানে ছিল। বাণী আসিতেই সে উঠিয়া চলিয়া গেল। কল্পনারই বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতেছিল, কল্পনার মাতা কহিতেছিলেন,—"ছেলেটী ত ভাল। বয়সও তত বেশী নয়—পাশও করেছে। কল্পনারও বোধ হয় পছন্দ। কিন্তু তাই বলে জেনে শুনে কেমন করে মেয়ে দিই! তখন দিয়েছিলুম—বেহাই তখন বড় চাকুরে ছিলেন; জামাইও চাকরীতে ঢুকেছে। জমী-জায়গা বল্‌তেও এখন তেমন কিছুই নাই, বেহাইও কিছু নগদ রেখে যেতে পারেন নি। বেয়ান সেদিন নিজেই বলে পাঠিয়েছিলেন, তা অমত করতে হ'ল। বাড়ী-ঘর-দুয়ারেরও অবস্থা—"

বাণী বুঝিতে পারিল তাহার কাকাবাবুর কথা হইতেছে। সে কিছু দূরে সকলের কথায় কান রাখিয়া অন্য দিকে চাহিয়া একটা জানালার উপর বসিল।

"এদিকে মেয়েকেও ত আর রাখা চলে না।"

বাণীর মাতা, যেন মায়ের কথাবার্ত্তায় তখনও তাঁহার দেবরের হাতে কন্যা সমর্পণের ইচ্ছা লুকাইয়া রহিয়াছে দেখিল। সে তাড়াতাড়ি গলার সুর উচ্চে তুলিয়া কহিল—"আমি থাকতে কখনো তা হতে দেব না। তাতে কল্পনা চিরদিন আইবুড় থাকে তাও ভালো। কি আছে ওদের? মেয়েকে কি শেষে জলে ফেলবে?—"

বাণী আর থাকিতে না পারিয়া কহিল,—"কি নাই তাদের? তোমাদের কি আছে? তাদেরই বা আর কি বলবো! ফের তোমাদের বাড়ীর মেয়ে বাড়ীতে ঢোকাতে চায়। ভারী মেয়েটা কি না।"

বাণী কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল।

মাতা ধমকাইয়া কহিলেন—"তুই উঠে যা এখান থেকে।"

বাণীও চোখ লাল করিয়া বলিল—"হ্যাঁ যাব! এখুনি যাব এখান থেকে। দাও গাড়ী ডেকে। তার পর তোমাদের ঐ টেঁসো মেয়ে কেমন সুপাত্রে পড়ে তাও দেখব, আর আমার কাকাবাবুরই কেমন পাত্রী জোটে, তাও দেখা যাবে।"

দুই ঘণ্টার মধ্যেই বাণী সমস্ত ঠিক করিয়া লইয়া মাতুলালয় ছাড়িয়া, পিত্রালয়ে কাকাবাবুর নিকট গমন করিল।

৫

পিতৃপুরুষগণের বাস্তুভিটা না কি বাঙ্গালীর তীর্থস্থান। বাণী যে গৃহটায় আসিয়া পদার্পণ করিল, অন্য কেহ হইলে ভ্রমে পড়িত—হয় ত বা কোন বাঘ-ভালুকের আড্ডায় আসিয়া পড়িয়াছে। বাণীর যদিও সেরূপ কিছুই মনে হইল না, তথাপি তাহার হৃদয়-মনে সে স্থানের চারিদিকের নিস্তব্ধতা কেমন যেন একটা বিষণ্ণতার ছাপ মারিয়া দিল। চারিদিক জঙ্গলে পরিপূর্ণ, প্রাচীরবিহীন কর্দ্দমাক্ত উঠানটার মাঝখানে আসিয়া বাণী দাঁড়াইয়া দেখিল, সম্মুখের সংস্কার-বর্জ্জিত কোঠাবাড়ীর স্যাঁতসেঁতে বারান্দায় একটা ছেঁড়া মাদুর বিছানো রহিয়াছে।

সুধীর বাহিরে আসিতেই বাণী গিয়া তাহাকে প্রণাম করিল।

সুধীর অবাক হইয়া বাণীকে তুলিয়া ধরিলে বাণী কহিল—"ঠাকুরমা কোথায় কাকাবাবু?"

সুধীর কোন কথা বলিতে পারিল না। বাণীকে সঙ্গে লইয়া ঘরে ঢুকিল।

বাণী দেখিল—ঠাকুরমা তাহার শয্যাশায়িনী। কঙ্কালসার দেহ তাঁর যেন শয্যার সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। বাণীর মনে হইল যেন ঠাকুরমা তাহারই জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন।

"মা! বাণী এসেছে; চেয়ে দেখ—"

মাতা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বাণীকে চাহিয়া দেখিলেন। তার পর ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন—"এসো দিদি! বাণী! ভাই! আমার এই জীর্ণ বুকে তোর দিদিমা একটা বড় কঠিন আঘাত দিয়েছে—"

বাণী সমস্তই বুঝিতে পারিয়া সান্ত্বনার সুরে কহিল,—"ঠাকুরমা! তুমি সেরে ওঠো। আমি প্রতিজ্ঞা করছি একমাসের মধ্যেই কাকাবাবুর বিয়ে দোব। সোনার প্রতিমা বৌ এনে দেবো ঘরে তোমার।"

সুধীরের মুখে চোখে অধরোষ্ঠে একটা অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল। বাণী কহিল,—"একবার ছোট লোকের বাড়ীর মেয়ে এনে ঘরে ঢুকিয়ে জেনে শুনে—"

আজন্ম বিলাসিতার ক্রোড়ে প্রতিপালিত বাণী বহুবার মনে মনে ভাবিয়াছে—ভগবানের এত সুন্দর সৃষ্টি—সংসারের মধ্যে থাকিয়া মানুষ নিশি-দিন দুঃখ দুঃখ করিয়া চেঁচায় কেন! কেন তাহারা এত আনন্দ, এত প্রফুল্লতার মাঝে থাকিয়াও বিষণ্ণ মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়! দুঃখ আসিয়া সংসারের কোনও স্থানে যে নীড় বাঁধিতে পারে ইহা বাণীর ধারণার মধ্যেই ছিল না। দুই ঘণ্টা কাল এই স্থানে কাটিতে না কাটিতেই তাহার মনে হইতে লাগিল—যেন সে বিষাদের কালো সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছে।

৬

ঠাকুরমাকে দেখিয়াই বাণী বুঝিতে পারিয়াছিল—তাঁহার মৃত্যু সন্নিকট। ঐ কঙ্কালসার দেহটার ভিতর হইতে কেমন করিয়া যে কথা বাহির হইতেছে—ইহাই তাহার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছিল। তাহারই মধ্যে ঠাকুরমা একটু ভালো থাকিলে বাণী একদিন সন্ধ্যা বেলায় তাহার কাকা

বাবুর কক্ষে আসিয়া হাজির হইল। কক্ষটী কোঠা বাড়ীটীরই এক অংশ। যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আসবাবপত্রের মধ্যে সেখানে ছিল—একখানা কালো কম্বল, আর পার্শ্বেই দড়িতে ঝুলানো একখানা মোটা আধ-ময়লা কাপড়। সম্মুখে জানালার উপর একটা মিট্‌মিটে প্রদীপের আলো রাখিয়া সুধীর মাথা নোয়াইয়া কাগজ কলম লইয়া কি লিখিতেছিল। বাণীর আগমন জানিতে পারিয়া সে তাড়াতাড়ি কাগজ কলম রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"এখানটায় বড্ড গরম। তার চেয়ে চল বাণী! উঠানে গিয়ে আমরা একটু বসি। বেশ জ্যোৎস্না উঠেছে।" আসিবার সময় সুধীর দেখিয়া আসিল তাঁহার মাতা নিদ্রা যাইতেছেন।

উঠানের মাঝখানে, দুইখানা টুলের উপর দুই জনে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া মুক্ত আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। জ্যোৎস্না সেদিন যেন কাঁদিয়া বেড়াইতেছিল বাণী ও সুধীর দুজনারই মুখ বিষণ্ণ, চিন্তাক্লিষ্ট।

সুধীর কথা বলিল—"এই জ্যোৎস্না! ঐ চন্দ্র! ঐ স্বচ্ছ উন্মুক্ত আকাশ! ক্ষীণপ্রভ তারা সব! বাণী! এর মধ্যে কি কবিত্ব আছে জানি না। সবই সুন্দর, কিন্তু ও সৌন্দর্য্য যেন বিশ্বের কারুর জন্যে নয়! হয় ত বা আমারই বোঝবার ভুল! আমারও কিন্তু মাঝে মাঝে ভালো লাগে। আজও লাগছে। কিন্তু সে ভালো লাগার মধ্যে যেন তৃপ্তি নাই। যেন তার মধ্যে একটা কিসের দারুণ অভাব! যেন আরও সুন্দর উপকরণ একটা।"—

বাণী কহিল—"কাকাবাবু! শোক-দুঃখ সংসারে সকলেরই হ'য়ে থাকে। তার জন্যে একটা গভীর হতাশা বুকে নিয়ে থাকবার—আপনি শিক্ষিত।"

"তুই বুঝতে পারলি নে বাণী! কিম্বা হয় ত তুই ই ঠিক বুঝেছিস! তবে এরির মধ্যে জীবনে আমার হতাশা বলে একটা কিছু এসে পড়বে—মনে হয় না।" সুধীর স্থির হইয়া বুকের মধ্যে যেন একটা কোন অস্বাভাবিক স্পন্দন অনুভব করিবার চেষ্টা করিল। বাণী কি বলিতে যাইতেছিল। সুধীর যেন কতকটা অন্যমনস্কভাবে, কতকটা আপন মনে কহিতে লাগিল—

"পঞ্জর, মাংস, চর্ম্মের আবরণে শিরীষ কুসুমের মত কোমল একটা জিনিষ; তার উপর এরূপ ভীষণ আঘাত সয় কেমন ক'রে জানি না। ভগবানের কৌশল।"

"ও সব ভাববেন না কাকাবাবু! আপনার দুঃখ কিসের! ঠাকুরমা দেখবেন,—সেরে উঠবেন।"

"তুই মনে ক'রেচিস বুঝি মা ম'রে যাবে, তাই আমি ভেবে অস্থির হ'য়েচি?" সুধীর একটু শুষ্ক হাসি হাসিল। তার পর কহিল—"দেখ বাণী! মার বেঁচে থাকাটাই আমার বেশী দুঃখের কারণ। তিনি মরে গেলে শান্তি পাবেন, আমাদের তাতে বাধা দিতে যাওয়াটা তাঁর শত্রুতা করা নয় কি?

বাণীকে স্বীকার করিতে হইল—"কথাটা অবশ্য ঠিক! কিন্তু তার পর আপনার?"

সুধীর হো হো করিয়া হাসিল। বাণীর কর্ণে যেন তাহা মৃতের হাস্যের ন্যায় শুনাইল। তখনি গম্ভীর হইয়া সুধীর কহিল—"দেবতারা সমুদ্র মন্থন ক'রেছিলেন—সুধাপান ক'রে অমর হ'য়েছিলেন। আমিও অমর হ'ব রে বাণী! তাই এত আয়োজন! দুঃখ-সমুদ্র-মন্থনে আমার শান্তি-সুধা উঠবে"—

"আর তার কালকূট?"

সুধীর একটু থামিয়া পরে কহিল,—"সেটা এই সংসারে প'ড়ে থাকবে।"

বাণীর এ সব কথা ভালো লাগিতেছিল না। ভিতরের কথা সে আর কোন রকমেই চাপিয়া

রাখিতে না পারিয়া কহিল—"আপনি বিয়ে ক'রবেন না কাকাবাবু?"

দুঃখের সহিত সুধীর কহিল,—"বিয়ে করতে চাইলেই বা মেয়ে দেবে কে? কার এত মেয়ে সস্তা।"

"আপনি বিয়ে করতে রাজী তা হ'লে?"

"সবই ত শুনচিস্ মা! দেখচিসও ত সবই?"

বাণী একটু ইতস্ততঃ করিয়া পরে কহিল,—"কল্পনাকে কি আপনি ভালবাসেন কাকাবাবু?"

"বাণী! তুই মেয়েমানুষ; সে কথা আমি তোকে বোঝাতে পারবো না। তবে যদি জিজ্ঞেস করিস কল্পনা আমাকে ভালবাসে, তবে এইমাত্র বলতে পারি যে, বিশ্বে যদি তার ভালবাসবার কেউ থাকে"—

ক্ষণেকের জন্য বাণীর চোখমুখ লাল হইয়া গেল। মনে মনে কহিল—"পুরুষগুলা এমনি হতভাগা বটে।" তার পর প্রকাশ্যে কহিল,—"আপনি যদি মেয়েমানুষ হ'তেন কাকাবাবু, তা হ'লে এরূপ একটা বিশ্রী ভুল ধারণা কখনো হতে পারত না আপনার। আপনি জানেন না যে একটা মেয়েমানুষ—যে আপনাকে একদিন মুখের কথায় কত ভালবাসই না দান করেচে; সেই আবার অন্য দিন তার কত ভালবাসা অন্য আর একজনকে তার প্রাণের তাবায় দিয়ে ফেল্‌বে—যার হাতে তার পিতামাতা তাকে সঁপে দেবেন।"

সুধীরের প্রাণে যেন একটু খট্‌কা লাগিল। মাতার ক্ষীণ আহ্বান তার কানে আসিলে উভয়ে গাত্রোত্থান করিল।

৭

যে শুভ প্রভাতে সুধীরের মাতা সজ্ঞানে গঙ্গা যাত্রা করিলেন—সেইদিন অপরাহ্নে বাণীকে লইয়া যাইবার জন্য তাহার মাতুলালয় হইতে লোক আসিল। কল্পনার না কি বিবাহ স্থির। বাণী রূঢ়বাক্যে লোকটাকে বিদায় করিয়া দিতে যাইতেছিল। সুধীর আসিয়া বাধা দিল।

সুধীরের মুখে হাসি দেখিয়া বাণী আরও রাগিয়া গেল। চীৎকার করিয়া সে কহিল,—"কাকাবাবু! আপনি পাষাণ।" তাহার পর সে কাঁদিয়া ফেলিল।

সুধীর জীবনে বোধ হয় এই প্রথমবার কাঁদিল। মাতৃ-শোকের কান্না নয়। মাতৃক্রোড়ে স্তন-পানরত শিশুকে দেখিয়া মৃতবৎসা নারীর স্তন হইতে যেমন আপনা হইতেই দুগ্ধ ঝরে; বাণীর কান্নায় সুধীরেরও চক্ষু দিয়া তেমনি আপনা হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

লোকটী ব্যাপার বুঝিয়া গতিক খারাপ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

কল্পনার বড় বাড়ীতে বিবাহ হইয়া গেল।

৮

অশৌচান্তে একদিন সুধীর আপনার কক্ষে একাকী বসিয়া কল্পনার কথাই ভাবিতেছিল। এত দিন সংসারে তাহার বন্ধন বলিতে কেবল মাতাই ছিলেন। সে বন্ধনও ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় সুধীরের প্রাণ যেন খুবই হাল্কা হইয়া গিয়াছে। মনও চিন্তাশূন্য। অনন্ত শূন্যতায় মন যেন তাহার একখণ্ড শরতের মেঘের ন্যায় এখানে সেখানে উড়িয়া বেড়াইতেছে। মন প্রাণের এইরূপ অবস্থাটা লাভ করিবার জন্য সুধীরের প্রাণ পূর্ব্বে কতবার কতই না আকুলি-বিকুলি করিয়াছে! কতবারই না সে ভাবিয়াছে যে, সে অবস্থাটা কি সুখের! কতই না শান্তি তাহাতে ভরা আছে! কিন্ত আজ! যতবারই সে আপনাকে বলিতে চাহিতেছে—ওরে! তুই বন্ধনহীন—মুক্ত, ততবারই যেন প্রাণ তাহার শত বন্ধনের বেদন-সুখের জন্য হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। যতবারই সে তাহার মনকে

বুঝাইতে চাহিতেছে—ওরে! তোর সব গোলমাল চুকে গেছে! যে যার পাওনা নিয়ে সব দলে দলে পালে পালে আপনাদের নীড়ের পানে চলে গেছে—এবার বন্ধ ক'রে দে তোর তোরণ-দ্বার। ততবারই যেন তাহার অবুঝ মন বিশ্বের সমস্ত পথিককে দুহাত তুলিয়া ডাকিয়া ফিরাইতে চাহিতেছে। সব চিন্তা যেমন সে তাহার মন হইতে দূর করিয়া দিয়াছে, তেমনি আবার মনের সমস্ত শূন্যতা পূর্ণ করিয়া কল্পনার চিন্তা কল্পনার কল্পনা সেখানে আসিয়া হাজির হইয়াছে। কল্পনার বিবাহ হইয়া গিয়াছে—সুধীর কোন রকমেই সে কথা মনের মধ্যে স্থানদিতে পারিতেছিল না। কোন রকমেই যেন সে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। আবার কখনও বা ভাবিতেছিল—"সংসার এমনিই বটে! ভালবাসার এইরূপ প্রতিদান!"

বাণী বাহিরে বেড়াইতেছিল। মন তাহার অত্যন্ত চঞ্চল। গত একমাসের মধ্যে দেবেশকে সে তিন চারখানা পত্র লিখিয়াছে, কিন্তু একখানারও জবাব নাই। বেড়াইতেও যখন তাহার আর ভাল লাগিল না তখন সে আসিয়া সুধীরের নিকট বসিল।

কিয়ৎক্ষণ সুধীরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া বাণী বুঝিতে পারিল যে, কল্পনার বিবাহ হইয়া যাওয়ায় সুধীর দুঃখিত এবং সুখের বিষয় এই যে, কল্পনার প্রতি সুধীরের সমস্ত অনুরাগ কাটিয়া গিয়াছে,—এমন কি প্রতিশোধ লইয়াও, কল্পনাকে একটু শিক্ষা দিবার যদি কোনও উপায় থাকে, তাহা হইলে এখন সে উপায় গ্রহণ করিতেও সে কুণ্ঠিত নয়।

উঠিবার পূর্ব্বে সুধীর এ কথাও বলিল,—"বাণী তৃণ-কুসুমের মত সংসার থেকে চ'লে যাব রে!—কেউ জানবে না,—কেউ থাকবে না এক ফোঁটা চোখের জল ফেল্‌তে—"

পরদিন বাণী দেবেশের চিঠি পাইল:—

"বাণী!

তোমার চারখানা পত্রই পেয়েছি! যেখানে ছিলাম সেখানে খুব কলেরা বসন্ত হচ্ছে। আমি ছুটী নিয়ে আট দশ দিন হ'ল কলকাতায় এসে রয়েছি। দু'চার মাস থাক্‌তে হবে বোধ হয় এখানে। ওখানের খবর শুনে খুবই দুঃখিত। এখানে এসেও তোমাকে পত্র লিখতে না পারার কারণ—কয়দিন আমাকে অত্যন্ত ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে। অনেক ঘুরে কাকাবাবুর একটা চাকরীরও জোগাড় করতে পেরেছি।—মাসিক পত্রের সম্পাদকতা করতে হবে। আর যা যা সব লিখেছ, সমস্ত পরের পর ঠিক হ'য়ে যাবে—তোমাকে ভেবে আকুল হ'তে হ'বে না। আমি ২।১ দিনের মধ্যে যেতে না পারি,—তোমাকে নিজে আস্‌তে হ'বে—কাকাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে। আর কি লিখিব?—আমার ভালবাসা নিও। ইতি—

তোমার দেবেশ।"

বাণী আহ্লাদে আটখানা হইয়া গেল। সুধীরকে খবর জানাইলে সুধীর যেন অনিচ্ছাসত্বেও বলিল, "তাই চল্ বাণী—কিছু দিনের জন্যও অন্ততঃ একটু পরিবর্ত্তন দরকার।"

* * *

পূরবীকে দেখিয়া বাণী দেবেশের মুখের পানে চাহিল।

দেবেশ কহিল,—"শ্রীকান্ত বাবুর মেয়ে। ইণ্টার-মিডিয়েট পাশ ক'রেচে এ বছর। শ্রীকান্তবাবু একজন প্রবীণ সাহিত্যিক—ইউরোপ—ভ্রমণে বার হ'বেন শীগগির—ডাক এসেচে—"

পূরবী প্রতিদিন দেবেশকে তাগাদা দিতে লাগিল—"কৈ, সুধীরবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন না?"

সুধীর আপনার কাজ লইয়াই ব্যস্ত থাকিত। বাড়ীতে বড় একটা থাকিত না।

পূরবী একদিন সুধীরের গান শুনিল—"ব্যথায় কথা যায় ডুবে যায় যায় গো"— গানখানা তাহার অত্যন্ত ভাল লাগিল। সুধীরের সঙ্গে তাহার আলাপও হইল, কিন্তু দুতিন মাসের মধ্যেও আলাপ ভালরূপ জমিল না। সুধীর ছিল একটু বেশী গম্ভীর। পূরবীর সুধীরকে খুব ভাল লাগিয়াছিল।

পূরবী দেবেশকেই দিবানিশি জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিল, "সেই গানখানা আমায় শিখিয়ে দিতে বল্‌বেন চলুন না দেবেশবাবু!"

৬

প্রায় দুই বৎসর হইল, দেবেশ সস্ত্রীক কাশীতে রহিয়াছে। বাণী দেবেশকে সুধীরের কথাই বলিতেছিল—হঠাৎ তাঁহার এরূপ চুপচাপ থাকার কারণ কি? তিন মাসের মধ্যে একখানাও চিঠি নাই—কোন অসুখ বিসুখ করে নাই ত?

এমন সময় পূরবী আসিয়া হাজির। শ্রীকান্ত-বাবু দেবেশকে লিখিয়াছেন—

"দেবেশ!

হঠাৎ শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ায়, ইউরোপ ভ্রমণ অসম্পূর্ণ রেখে আমায় অর্দ্ধপথ থেকেই ফিরতে হ'য়েছে। পূরবীর বিয়েটা খুবই তাড়াতাড়ির ওপর সারতে হ'ল। সুধীর—আর দেরি করা চল্‌বে না—বল্‌লে। সেও তাড়াতাড়িতে তোমাদের কোন খবর পর্য্যন্তও পাঠাতে পারে নি। তার জন্যে সে খুবই লজ্জিত। পূরবীকে তোমার কাছে পাঠালুম। সুধীর জানে সে পুরী গিয়েছে। যতদিন দূরে দূরে থাক্‌তে পারে ততদিনই ভাল, আশা করি কুশলে আছ। ইতি"—

সুধীরেরও চিঠি আসিল। পুরাপুরী তিন পাতা লেখা। বাণীর নিকট সে ত্রুটী স্বীকার করিয়াছে, সে তাহাকে অনেক লজ্জা জানাইয়াছে; অনেক ভুলাইয়াছে। বাণী অভিমান করিয়া চিঠির জবাব দিল না! সপ্তাহে তিনখানা করিয়া চিঠি আসিতে লাগিল, তথাপি না।

সেদিন বাণী পূরবীকে লইয়া বেড়াইতে গিয়া, দুজনায় কি পরামর্শ করিল। বাড়ী ফিরিয়া বাণী দেবেশকে দিয়া চিঠি লেখাইল—"কাকাবাবু! আমার খুব অসুখ;—শীগগির আসুন।"

সুধীরের আসিবার দিন বাণী পূরবীকে লইয়া উপরের ঘরে অপেক্ষা করিতে লাগিল। সুধীর আসিয়া প্রবেশ করিতেই পূরবী মাথায় কাপড় টানিতে যাইতেছিল—বাণী বাধা দিয়া কহিল,—"আমার কাকীমা তুমি!"

পূরবী হাসিয়া ফেলিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে পূরবী ও সুধীরকে সঙ্গে লইয়া, বাণী আবার সেই স্থানে আসিয়া বসিল। দু'এক মিনিট কথাবার্ত্তার পর বাণী জানালার দিকে আঙ্গুল বাড়াইয়া সুধীরকে কি দেখাইল। সুধীর দেখিল, পাশেই একখানা ছোট, অপরিষ্কার স্যাঁত-সেঁতে খোলার বাড়ী। তাহারই বারান্দায় একজন মেয়ে মানুষ একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর একখানা ছেঁড়া কাপড় পরিয়া বসিয়া একটা ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিতেছে। সুধীর জিজ্ঞাসা করিল—"কে ও?"

বাণী কহিল—"কল্পনা"

সুধীর ভাল করিয়া দেখিতে গিয়া দেখিল—একটা মাতাল টলিতে টলিতে আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া, অস্পষ্ট ভাষায় কল্পনাকে দু'একটা কি কথা বলিয়াই,

জোরে তাহার পৃষ্ঠে এক লাথী বসাইল। কল্পনা গড়াইয়া পড়িল।

সুধীর জোর গলায় যেন বলিতে চাহিল—"বাণী, ওরে! এ আবার তোর কি খেয়াল?" কিন্তু পারিল না। সে নিশ্চল হইয়া চেয়ারে বসিয়া রহিল।

তাহার পর প্রায় চার পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে। কল্পনা আর ইহজগতে নাই। তাহারই দুঃখময় জীবনের ছায়া-অবলম্বনে রচিত, সুধীরের লিখিত উপন্যাস এখন* 'পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতেছে।

নদী-বক্ষে

গল্প
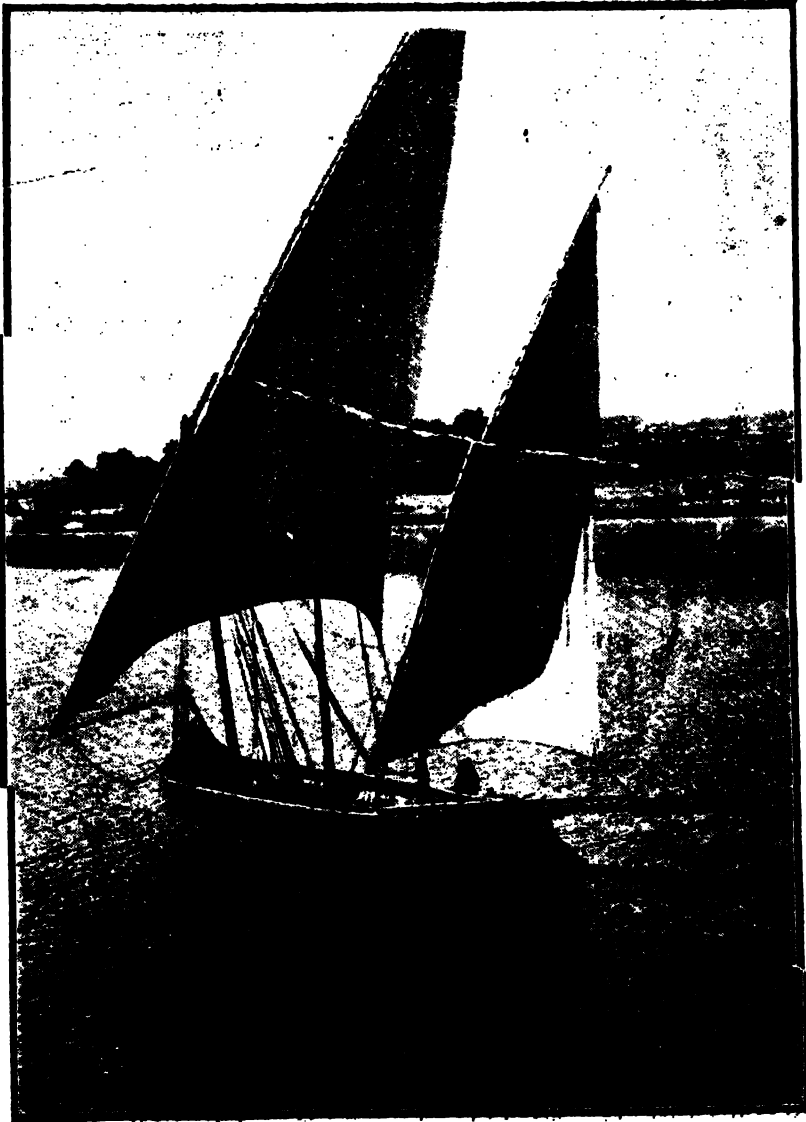
গল্পের প্লট

শ্রীপঞ্চানন দত্ত

কি একটা মুসলমান পর্ব্বের জন্য আফিস বন্ধ। জ্যৈষ্ঠমাস।

রৌদ্র যেন পৃথিবীকে ভস্মীভূত করিবার জন্য সর্ব্বনাশা শক্তিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। চারিদিকে কেমন একটা ভীত সন্ত্রস্ত ভাব—পশু পক্ষীটী পর্য্যন্ত নীরব নিস্তব্ধ।

জানালা কবাট বন্ধ করিয়া আমি ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া শুইয়াছিলাম। নিতান্ত অসময়ে গল্প লেখার খেয়ালটা আমাকে পাইয়া বসিল। শুইয়া শুইয়া কল্পনার মালা গাঁথিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কিন্তু বহু আয়াসেও কোন চিত্র মনোমধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে পারিলাম না। মনে হইতে লাগিল, দাসত্ব-কীট বোধ হয় আমার ভাবরাজ্য কুরিয়া খাইয়া ফোঁপরা করিয়া দিয়াছে, সেখানে আর কল্পনা-সৌধ গড়া চলিবে না।

দারুণ বিরক্তি ও হতাশ্বাসে মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। সর্ব্বহারার মত হাত পা মেলিয়া পড়িয়া রহিলাম। মন শুনিল না। ক্ষণকে দেখি সে বিপুল উদ্যমে ঘৃণিত পল্লীর দ্বারে দ্বারে, বস্তির অলিতে-গলিতে, ইডেন গার্ডেনে, পল্লীর কুটীরে কুটীরে ছুটাছুটি করিতেছে।

মিলিল। বহু যত্নে দুই চারিটা ছবি মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া লিখিতে বসিতেই মনে একটা ধাক্কা লাগিল, ইহা আমার নব প্রসূত কল্পনা নয়, ইতিপূর্ব্বে যেন এমনি কাহিনী কোন বিশিষ্ট মাসিকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অত্যন্ত তিক্তপ্রাণে কাগজ পেন্সিল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া অবসন্নদেহে শয্যায় এলাইয়া পড়িলাম।

* *

—খুট্—

কতক্ষণ কাটিয়াছে জানি না, ঘুমের আবেশে চোখের পাতা বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। দরজা খোলার শব্দে একবার চমক ভাঙ্গিল বটে কিন্তু সন্তর্পণে গৃহ প্রবেশের লোক আমার না থাকায় খেয়াল করিলাম না, পুনরায় ঢলিয়া পড়িলাম।

—বাবু!—

বামাকণ্ঠ!

মনে হইল, এইবার মগজের মধ্যে গল্প গজ্ গজ্ করিতেছে—নূতন—সম্পূর্ণ অভিনব!

না উঠিয়াই একখানা নিখুঁত ছবি মনে মনে আঁকিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

—বাবু দয়া করে আমাকে একখানা চিঠি লিখে দেবেন?

চমকিয়া পাশ ফিরিয়া চাহিতেই দেখি, পাশের বাড়ীর কালো ঝি-টা দরজার পার্শ্বে দণ্ডায়মান। তাহার হাতে পোষ্টকার্ড।

ধ্যেৎ!

মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। তবুও, নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেই, উঠিয়া বসিয়া বলিলাম—দাও পোষ্টকার্ড—কি লিখতে হবে শিগ্‌গির বল।

সে অতি ভদ্রভাবে দুখানা পোষ্টকার্ড আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া কহিল—একখানা লিখুন আমার দেওরকে—আর একখানা আমার মেয়ের জেঠ-শ্বশুরকে।

টেবিল হইতে দোয়াত কলম টানিয়া লইয়া বলিলাম—কি লিখতে হবে বল?—

ঝি বলিতে লাগিল—দু'জনকেই লিখুন যে আমি মেয়ের জন্যে দিনের দিন হতাশ হ'য়ে পড়ছি, অথচ তাদের কি ব্যাভার যে কথা দিয়েও তারা আজ অবধি আমার মেয়েকে এনে দিলে না। মেয়েকে পাবার আশায় তাদেরই কথা মত আমি আদালতে মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে এলুম—আর সেই পাপেই একটা ছেলেকে যমের মুখে তুলে দিলুম অথচ তারা কি না আজও আমার মেয়েকে দিয়ে গেল না!

ঝিয়ের কণ্ঠস্বর গাঢ় ও আর্দ্র হইয়া আসিল। সে আর কিছু বলিতে পারিল না।

আমি অবাক্-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া ছিলাম। সে নীরব হইলে বিস্মিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্যাপার কি ঝি? মনে হ'চ্ছে যেন এর ভেতর একটা রহস্য আছে।

দরজার পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া ঝি বলিল—সে বড় দুঃখের কথা বাবু—শুনলে কষ্ট পাবেন।

তাহার মুখের অবস্থা দেখিয়া ভাবিলাম, আর কিছু জিজ্ঞাসা না করাই উচিত, কিন্তু কিছুতেই কৌতুহল দমন করিতে না পারিয়া বলিলাম—যদি আপত্তি না থাকে বল না।

তবে শুনুন বাবু, আমরা যাদের আপনার জন বলে ভাবি তারা সময় বিশেষে কত বড় শত্রু হয়।

ঝি বলিতে লাগিল—মেয়েটাকে যে একটা শয়তানের হাতে তুলে দিলুম তা তখন জানতে পারিনি। দেওর অভিভাবক—দেখে শুনে যা কল্লেন তাই মেনে নিতে হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে যে সব গুণ প্রকাশ পেলে তা শুনে প্রাণ ফেটে গেল—জামাই বেতর নেশাখোর, ভয়ানক বদ্‌রোগী—মেয়েটাকে গো-বেড়ন করে। দেওরকে বল্লুম—তিনি বরাতের দোহাই দিয়ে চলে গেলেন।

একেই মনের অবস্থা খারাপ তার উপর দেওর ভিন্ন করে দিলেন। পেট চলে না—বাধ্য হ'য়ে দেশ ছেড়ে সহরে চাকরী করতে এলুম। কোলে তখন একটী পাঁচ বছরের খোকা। সেই থেকে মেয়ের সংবাদ তেমন পেতুম না। চিঠি দিয়ে দিয়ে এক মাস দু মাস অন্তর জবাব পেতুম।

হঠাৎ একদিন দেওর এসে হাজির—এখনি তোমায় যেতে হবে, মেয়েটাকে গুম্ করেছে।

মরি-বাঁচি করে ছুটলুম জামাইয়ের বাড়ী। যেতেই বেহাই—জামাইয়ের জেঠা বল্লেন—'তাড়ি খেয়ে এসে পিতে—জামাইয়ের নাম পিতাম্বর—বৌমাকে এমন মারে যে নাক মুখ দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়তে থাকে। বেচারা প্রাণের দায়ে আমার আশ্রয়ে ছুটে আসে, আর নিত্যি এমন শাসনের একটা কিছু বিহিত করতে আমার ধরে বসে। ভাইপো তেমন নয় বুঝে আমি তাকে জমীদারের বাড়ী নিয়ে যাই। তিনি সব শুনে এর সুবিচার করবেন আশ্বাস দিয়েছেন। বৌমা তাই এখন সেখানেই আছে—ও গুম্ করার কথাটা শত্রু পক্ষের মিথ্যে রটনা।'

মেয়ের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার কথা বলতে, বেহাই কত সদ্‌যুক্তি দিয়ে আমাকে বুঝিয়ে বাড়ী ফিরিয়ে দিলেন।

সপ্তাহ কাটলো না বাবু গ্রামে রাষ্ট্র হ'ল—মেয়ে আমার জমীদারকে দেহ বিক্রী করেছে—তার ধর্ম্ম নষ্ট হয়েছে।

কেঁদে মরি। আবার ছুটলুম সেই গাঁয়ে।

অরবিন্দ পৈত্রিক বাটীতেই বাস করিতে লাগিলেন, সর্ব্বদাই বসন্তকে দেখিতে যাইতেন। দুইজন প্রসিদ্ধ কবিরাজ বাটীতে রাখিয়াছেন, তাঁহারা বসন্তকে দিবসে ২,৩ বার দেখিয়া স্বহস্তে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইতেন। বসন্ত এইক্ষণে শয্যাশায়িনী, তাঁহার মাতা ও ক্ষমা পরিচারিকা তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিত। চিকিৎসা ও যত্নের অভাব ছিল না। কিন্তু বসন্ত দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন, বিছানায় মিশাইয়া পড়িলেন। পিতা মাতা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া অবিশ্রান্ত কাঁদিতেন, অরবিন্দের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে তাঁহার অনাদরেই বসন্ত মৃত্যু-শয্যাশায়িনী, এই একটা নূতন সন্তাপে তাঁহাকে তপ্ত অঙ্গারের ন্যায় দগ্ধ করিতে লাগিল।

একদিবস অরবিন্দ বসন্তের শারীরিক কষ্ট দেখিয়া তাঁহার বিছানায় বসিয়া কাঁদিতে ছিলেন, অঞ্চল দ্বারা তাঁহার চক্ষের জল মুছাইতে বসন্ত হাত তুলিলেন কিন্তু হাত কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেল, অরবিন্দ হাত ধরিলেন এই সময় বসন্ত বলিল, "তুমি আমার রোগের জন্য কেন কষ্ট পাইতেছ, তুমি কি মনে করিতেছ যে আমি তোমার অনাদরে পীড়িত হইয়াছি, তা নয় আমাদের এ পৈতৃক রোগ, আমাদের বংশে অনেকে এইরোগে মরিয়াছে, আমার কুষ্ঠীতে লেখা আছে আমি এই বয়সে এই রোগে মরিব, তুমি কি আমাকে বাঁচাইতে পারিবে, তবে কেন কষ্ট পাইতেছ—দেখ, আমি যখন মরিব আমার কাছে থেক—আমার এখন বড় সাধ যে তোমার কাছে সর্ব্বদা থাকি ও তোমাকে সর্ব্বদা দেখি, আগে এমন ছিল না, এখন এই সকল সাধ হইয়াছে—আর দেখ যখন আমি মরিব তোমার কোলে আমার মাথাটা রাখিও—আমার মরিতে বড় ভয় করে—তোমার কাছে থাকিলে ভয় করিবে না।" অরবিন্দ দরবিগলিতনয়নে বলিলেন, "বালাই তুমি মরিবে কেন? তুমি সারিয়া উঠিবে, আমার নিকট চিরকাল থাকিবে।" বসন্ত একটু মৃদু মধুর হাসিয়া বলিল, "আমার সে সাধ এখন আর নাই।"

ঐ দিবস রাত্রশেষে আদরের আদরিণী বসন্ত কুমারী স্বামীর কোলে মস্তক রাখিয়া দেহত্যাগ করিল।

ইহার দুইমাস পরে অরবিন্দ তীর্থ-পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে যাইল পিসী মৃণ্ময়ী, তাঁহার স্বামী, ও পরিচারিকা ক্ষমা ও রূপচাঁদ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

স্বধর্ম্ম-পরায়ণ ঐকান্তিক নিষ্ঠাবান হিন্দুরা একটা সামান্য উপলক্ষ পাইলে ধর্ম্মার্জ্জনে যত্নবান হন, বিশেষতঃ হিন্দু রমণী ও প্রাচীনেরা যদি একটা যোগ পাইলেন তাহা হইলে গঙ্গাস্নান, প্রায়শ্চিত্ত, দান ধ্যান নানাকার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকেন। এমন কি সংক্রান্তি পূর্ণিমা, অমাবস্যাতে গঙ্গাস্নান করিতে ত্রুটি করেন না। যেখানে গঙ্গা নাই, যদি একটা খাল থাকে আর ঐ খালের সহিত গঙ্গার যোগ থাকে তবে কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ ভক্তি-সহকারে ঐ খালে স্নান করিয়া গঙ্গার স্তব আওড়াইতে আওড়াইতে গৃহে ফিরিয়া যান।

একদিন আশ্বিন মাসে মহাতীর্থ কাশীধামে লোকে লোকারণ্য। দেশ দেশান্তর হইতে হিন্দুরা কোন যোগ উপলক্ষে আসিয়াছেন, যোগটা কি তাহা ঠিক স্মরণ নাই, বোধ হয় অর্দ্ধোদয় কি চন্দ্রোদয় কি সূর্য্যোদয় যোগ হইবে। যাহা হউক রাত্র ৮টার সময় চাঁদ দেখিয়া গঙ্গাস্নান করিতে হইবে, সন্ধ্যার পর সহস্র সহস্র লোক গঙ্গাতীরে চাঁদের প্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে, নীল কোমল আকাশে পূর্ণ চন্দ্র উদিত হইয়া পৃথিবী আলো

করিয়াছেন, কিছুক্ষণ পরে কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খ প্রভৃতি নানা প্রকার বাদ্যোদ্যম আরম্ভ হইল, সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকদিগের হুলুধ্বনি ও পুরুষদিগের আনন্দ-সূচক চীৎকারে একটা ভীষণ কোলাহল উঠিল, রাহু চন্দ্রদেবকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

গঙ্গাতীরে এইরূপ জনতা ও কোলাহলের মধ্যে নির্জ্জনে একস্থানে দুইব্যক্তি বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, একব্যক্তি একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে ও দ্বিতীয় ব্যক্তি ভূমিতে উপবিষ্ট ছিলেন; প্রথম ব্যক্তি সন্ন্যাসীবেশী, দীর্ঘশ্মশ্রু, মস্তকে জটাভার, দীর্ঘাকার, শুষ্কদেহ, মুখমণ্ডলে চক্ষুদুইটি এত উজ্জ্বল যে দর্শকেরা উহাকে দেখিবামাত্র আকৃষ্ট হয়, দ্বিতীয় ব্যক্তি একজন বঙ্গদেশীয় যুবা, সুন্দর কান্তি, এক-খানি উত্তরীয় দ্বারা গাত্র আবৃত, উহা আবৃত সত্ত্বেও তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ ফুটিয়া বাহির হইতেছে ও গলদেশে যজ্ঞোপবীত দেখা যাইতেছে, কিন্তু মুখমণ্ডলে এমন একটা গভীর দুঃখের ছায়া পড়িয়াছে যে, তাহা দেখিলে সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। ইনি অরবিন্দ রায় আর ঐ সন্ন্যাসী তৎকালের কাশীর প্রসিদ্ধ তোতারাম পরমহংস। অরবিন্দ যোড়করে সন্ন্যাসীকে কি বলিতেছেন, বহুসংখ্যক লোকের কলরবে আমরা তাহার সকল কথা শুনিতে পাই নাই তবে যাহা শুনিতে পাইয়াছি তাহা নিম্নে প্রকটিত করিলাম।

অ। দেব! আমার জিজ্ঞাস্য এই যে যদি জগদীশ্বরকে কোনও উদ্দেশ্যে ডাকি তিনি কি আমার কথা শুনিবেন না?

সন্ন্যা। হ্যাঁ, শুনিবেন, তিনি দয়াময়, দয়ার সাগর। তিনি কাতর ব্যক্তিদিগের ডাক শুনিয়া থাকেন।

অ। দেব! আমি বড় দুঃখী, দিবানিশি তাঁহাকে ডাকিয়া থাকি কৈ তিনি ত শুনেন না।

সন্ন্যা। আপনি কি উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ডাকেন, ঐশ্বর্য্য চান, মান চান, যশ চান, এই সকল উদ্দেশ্যে ডাকিলে তিনি শুনিতে পান না, কেন না জাগতিক ক্রিয়া সকল একটা অপূর্ব্ব নিয়মাধীনে নির্ব্বাহ হইতেছে, তাহা নিত্য, কখনও বিপর্য্যস্ত হয় না, ভগবান কখনও নিজে কোন কাজ করেন না, কাহাকেও নিজে ধন, মান, যশ বা দুঃখ দেন না।

অ। না না, আমি ঐ সকল কিছুই চাই না, আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ছিলাম, আমার মান ও যশ ছিল, এ সকল ত্যাগ করিয়া আপনার আশ্রয় লইলাম।

সন্ন্যা। তবে কি চাও?

অ। মনের শান্তি।

সন্ন্যাসী এই কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া বলিল, "তুমি কি ভগবানকে ডাকিয়া মনের শান্তি পাও নাই?"

অ। না, দিবানিশি ডাকিয়া থাকি তবুও পাই নাই।

সন্ন্যা। তবে তুমি ভগবানকে ডাকিতে জান না, যদি এমন ভাবে ডাকিতে পারিতে যে উহা তাঁহার কাণে পৌঁছিত, তাহা হইলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইত, তিনি অচিরাৎ তোমার মনের শান্তি দান করিতেন।

এই বলিয়া পরমহংস অরবিন্দের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "এস ভগবানকে কেমন করিয়া ডাকিতে হয় আমি তোমাকে শিখাই। প্রতিদিন প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া আমার আশ্রমে যাইবে, আমি শিক্ষা দিব, যদি কোনও গুরুতর পাপ করিয়া থাক, নরহত্যা করিয়া থাক কি তদনুরূপ আর কোনও গুরুতর পাপ করিয়া থাক তাহা হইলেও মনের শান্তি পাইবে।

অ। না না কোনও গুরুতর পাপ করি নাই, দেব! যদি আপনার কোন দিন অবকাশ হয় তবে আমার দুঃখের পরিচয় দিব।

পরমহংস তাঁহার দুঃখের কথা শুনিতে স্বীকৃত হইয়া অদৃশ্য হইলেন। এক্ষণে চন্দ্রদেবের মুক্তি লাভ হইয়াছে, অরবিন্দ ভিড় ঠেলিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ কাশীবাস করিতেন, সেজন্য একটি দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উহার সদর মহলে অরবিন্দ বাস করিতেন। অন্দর মহলে মৃণ্ময়ী স্বামীর সহিত বাস করিতেন। ইঁহারা সকলে অল্পদিন মাত্র এই মহাতীর্থে আসিয়াছেন, পরদিন প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিয়া পরমহংসের আশ্রমে অরবিন্দ উপস্থিত হইলেন ও পরমহংসকে নিজের দুঃখের পরিচয় দিলেন। তাঁহার চরিত্র পবিত্র বুঝিতে পারিয়া পরমহংস তাঁহাকে দীক্ষিত করিলেন, ও দিন দিন উপদেশ দিতে লাগিলেন, কিছু দিন পরে অরবিন্দের আহার ও বেশের কিছু পরিবর্ত্তন হইল। নিরামিষ ভোজন-প্রথা অবলম্বন করিলেন, গৈরিক বসন পরিধান করিলেন। এইরূপ ছয়মাস অতীত হইল, দীর্ঘশ্মশ্রু, দীর্ঘকেশ ও গৈরিক বসন পরিধানে অরবিন্দ বেড়াইতেন, দিবসে পরমহংস প্রদর্শিত প্রণালীতে ভগবানকে ডাকিতেন, সন্ধ্যার সময় মন্দিরে মন্দিরে দেবদর্শন করিয়া বেড়াইতেন, এইরূপ অবস্থায় ছয়মাস পরে তাঁহার কথঞ্চিৎ মনের শান্তিলাভ হইল, কিন্তু তাঁহার বাহ্যিক পরিবর্ত্তন এত বেশী হইল যে আত্মীয় বন্ধুরা তাঁহাকে দেখিলে চিনিতে পারিত না।

এক দিবস অপরাহ্নে অরবিন্দ গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া অপর তীরের প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন, বহুসংখ্যক সৈন্য কুচ করিয়া রাজধানী অভিমুখে গমন করিতেছে, তাহাই দেখিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি তাঁহার স্কন্ধে হস্তারোপণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বৎস! কি বুঝিলে, কোথায়ও কি যুদ্ধ বাধিয়াছে?" অরবিন্দ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন তাঁহার গুরুদেব তোতারাম পরমহংস ঐ প্রশ্ন করিতেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ নতশিরে উত্তর করিলেন, যুদ্ধ বাঁধে নাই বাধিবার সম্ভব।"

পর। কেন?

অর। বাদসাহ ঔরংজেব পীড়িত, তাঁহার মৃত্যু হইলেই দিল্লীর সিংহাসন লইয়া তাঁহার বংশধরদিগের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সম্ভব।

পর। বাদসাহ ঔরংজেব আরও কিছুকাল রাজত্ব করিবেন, এইক্ষণে তাঁহার মৃত্যু হইবে না। পীড়া সামান্য, শীঘ্র আরোগ্য হইবেন।

অরবিন্দ চমকিয়া উঠিলেন, তিনি শুনিয়াছিলেন যে বাদসাহ মৃত্যু-শয্যায়, পরমহংস অন্যরূপ বলিতেছেন কেন? পরমহংসের কথাই ঠিক দাঁড়াইল, বাদসাহ আরোগ্য লাভ করিয়া আর কয়েক বৎসর রাজ্যভোগ করিলেন।

পরমহংস চলিয়া গেলে অরবিন্দ একদৃষ্টিতে সৈন্যদিগের গতি দেখিতে লাগিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

উপরোক্ত ঘটনার দুই দিবস পরে অরবিন্দ গঙ্গাস্নান করিয়া নির্দ্ধারিত সময় পরমহংসের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে কক্ষে তিনি পরমহংসের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন সে কক্ষে তিনি নাই, তাঁহার আসনে একটী প্রাচীনা সন্ন্যাসিনী বসিয়া আছেন, অরবিন্দ তাঁহাকে যথাবিহিত অভিবাদন করিয়া নিজের আসনে বসিলেন। সন্ন্যাসিনী তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন, দৃষ্টি যেন কোপ

বিশিষ্ট তাহাতে অরবিন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! আমি কি কোনও অপরাধ করিয়াছি?"

স। আপনাকে আমি চিনি, আপনি সুলতান আজিমহোসেনের সৈন্যের একজন নেতা, গত বৎসর বর্দ্ধমান যুদ্ধে আহত হইয়া আপনি পড়িয়াছিলেন, আমরা কয়জন সন্ন্যাসিনী আপনার স্ত্রীর কাতরতা দেখিয়া রাত্রিকালে তাঁহাকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার অনুসন্ধান করি ও মশাল জ্বালিয়া একটি কুটীরে আপনাকে রাখিয়া আসিয়াছিলাম ও আপনার স্ত্রীর শুশ্রূষায় আপনার চৈতন্য লাভ হয়, আপনার সেই সাধ্বী স্ত্রী কোথায়? আপনি কি তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন না পুনরায় বর্জ্জন করিয়াছেন?

সন্ন্যাসিনীর এইরূপ ভর্ৎসনাসূচক বাক্যে অরবিন্দ দরবিগলিত ঘামিতে লাগিলেন, সহসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না, পরে বলিলেন, "তিনি জীবিতা নাই।"

স। কি প্রকারে, কোথায় মৃত্যু হইয়াছে?

অ। বর্দ্ধমানে একটা পুষ্করিণীতে জলমগ্ন হইয়া মৃত্যু হইয়াছে।

স। তবে সেই সাধ্বী আত্মহত্যা করিয়াছেন?

অ। বোধ হয়।

স। তবে আপনি স্ত্রীহত্যার পাতকী হইয়াছেন, ইহার প্রায়শ্চিত্ত করুন।

অ। তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ রূপ হইতেছে।

স। কি রূপ?

অ। গুরুতর আক্ষেপে দিন, রাত্র কাটিতেছে।

স। সর্ব্বত্যাগী হইয়াছ কি? শুনিয়াছি আপনি অনেক ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, ঐ ঐশ্বর্য্য ধর্ম্মার্থ দান করিয়াছেন কি?

অ। না এ পর্য্যন্ত করি নাই।

স। তবে আপনার প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই।

এই বলিয়া সন্ন্যাসিনী ক্রোধসহকারে গাত্রোত্থান করিয়া যে কক্ষে পরমহংস বাস করিতেন সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে, অরবিন্দ সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে সাহস করিলেন না। সন্ন্যাসিনী আর ফিরিলেন না, পরমহংস আসিলেন এবং অরবিন্দকে প্রতিদিন যেরূপ উপদেশ দিতেন সেইরূপ দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শিষ্যের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না বুঝিতে পারিয়া নিরস্ত হইলেন। অরবিন্দ উঠিয়া আসিলেন। তাঁহার স্ত্রীর আত্মহত্যার স্মৃতির পুনরুদ্দীপনে ও সন্ন্যাসিনীর তিরস্কারে পুনরায় গুরুতর অশান্তি আসিয়া তাঁহার হৃদয় প্লাবিত করিল। ধীরে ধীরে বাটি ফিরিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

অরবিন্দ এইরূপ মনের অবস্থায় ঘুরিতে ঘুরিতে বৈশাখ মাসের এক দিবস সন্ধ্যার পরে বিশ্বনাথের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, তখন আরতি আরম্ভ হইয়াছিল। মন্দিরের সর্ব্বস্থান আলোকে উজ্জ্বলিত, বহুজনে পরিপূরিত ও ভক্তদিগের হর হর শিব শঙ্কর চীৎকার ও নানাবিধ বাদ্যধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত। মন্দিরে প্রবেশমাত্র অরবিন্দের মনোমধ্যে ভক্তিপ্রযুক্ত ভয়ের সঞ্চার হইল। দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া গিয়া সন্ন্যাসীর উপদেশ বাক্য মনে পড়িল। ভক্তি সহকারে করযোড়ে আরতি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার অনতিদূরে কতিপয় স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া দেবদর্শন করিতেছিল, তন্মধ্যে একটী যুবতী চমকিত নেত্রে স্থির দৃষ্টিতে তাঁহাকেই দেখিতেছিল, কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই। আরতি শেষ হইলে গভীর গর্জ্জনে একবার মেঘ ডাকিল; সকলেই বুঝিল অচিরাৎ ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইবে। তজ্জন্য দ্রুতপদে মন্দির ত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিল। সে কারণে মন্দির মধ্যে জনতা বড় বেশি হইল,

সকলকেই ভিড় ঠেলিয়া যাইতে হইতেছে। ইতিমধ্যে আলো একে একে নির্ব্বাপিত হইতে লাগিল। এক স্থানে স্ত্রীলোকের ভিড় এত অধিক হইল যে, অরবিন্দকে দাঁড়াইতে হইল, স্থানটী ক্রমে অন্ধকারময় হইল, অরবিন্দ আকাশ প্রতি চাহিয়াছিলেন উহা নীল কাদম্বিনীতে ভীষণতর হইয়াছিল, এমৎ সময়ে তাঁহার কানে কানে অস্ফুটস্বরে কে বলিল "ছিঃ এ বেশ ত্যাগ কর, বসন্তকুমারী এ বেশ দেখে যে কেঁদে মরবে।" অরবিন্দ চমকিত নেত্রে এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, অন্ধকারে কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না, কণ্ঠস্বরে বুঝিলেন উহা কোন যুবতী স্ত্রীলোকের কিন্তু ইনি কে? তাঁহার পরিচিত স্ত্রীলোক ত এই কাশীধামে কেহই নাই। এই সময়ে একবার বিদ্যুৎ চমকাইলে দেখিলেন যে, কতিপয় স্ত্রীলোক তাঁহার নিকটে ভিড় ঠেলিয়া মন্দির হইতে নির্গত হইবার চেষ্টা করিতেছে। অরবিন্দ উহাদের মধ্যে একজনকে সন্দেহ করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ লইলেন, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতালোকে দেখিতে পাইলেন যে একদল স্ত্রীলোক তাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতেছে, যাইতে যাইতে একটী গলিতে প্রবেশ করিলেন, ক্রমে ক্রমে ঐ গলি এত সঙ্কীর্ণ হইল যে বাহু প্রসারণ করিলে উভয় পার্শ্বের অট্টালিকা স্পর্শ হয়। ক্রমে মেঘের গর্জ্জন বাড়িতে লাগিল, স্ত্রীলোকেরা ভীতা হইয়া দ্রুত যাইতে লাগিল, তন্মধ্যে একজন নিকটস্থ একটী ক্ষুদ্র অট্টালিকার গবাক্ষে করাঘাত করিলেন, ভিতর হইতে একজন ঐ গবাক্ষ উদ্ঘাটন করাতে গলির কিয়দ্দূর আলোকিত হইল, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একজন গবাক্ষ উদ্ঘাটনকারীকে বলিল যে, তাহারা আকড়াতলাতে যাইবে, সেই স্থানে তাহাদের বাটি কিন্তু পথ চিনিতে পারিতেছে না, তাহাদের পথ দেখাইয়া দিলে অথবা বলিয়া দিলে তাহারা বড় উপকৃত হয়। অরবিন্দ এই কণ্ঠস্বর শুনিবা মাত্র শিহরিয়া উঠিলেন, এই কণ্ঠস্বরে তাঁহাকে চুপি চুপি বলিয়াছিল, "ছিঃ এ বেশ ত্যাগ কর।" অরবিন্দ কণ্ঠস্বর চিনিলেন বটে কিন্তু স্ত্রীলোকটীকে দেখিতে পাইলেন না। গবাক্ষের আলোকে পাঁচজন মাত্র স্ত্রীলোক দেখিলেন, কিন্তু কে কি প্রকার তাহা কিছুই দেখিতে পাইলেন না, যাহা হউক তিনি বুঝিলেন, যে ইহারা পথ হারাইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতেছে। অরবিন্দের বাটি ঐ আকড়াতলায়। তিনি কহিলেন,—"আমার সঙ্গে আসুন। আমারও বাড়ী ঐ স্থানে।" তাঁহার এই আশ্বাস বাক্য শুনিয়া স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল। তন্মধ্যে একজন প্রাচীনা বিধবা তাঁহার সন্ন্যাসীর বেশ ও তাঁহার মুখশ্রী দেখিয়া বিশেষতঃ কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি বাঙ্গালির ছেলে কাশিতে বাস করিতেছেন?" অরবিন্দর উত্তরে সকলে তাঁহার সহিত যাইতে প্রস্তুত হইল। অট্টালিকার মালিকের নিকট একটি আলো ভিক্ষা করিলেন। তিনি উহা দিতে স্বীকৃত না হওয়াতে অরবিন্দ উহার মূল্য দিয়া লইলেন, স্ত্রীলোকদিগের ইহাতে তাঁহার প্রতি আরও বিশ্বাস জন্মিল। অরবিন্দ স্বহস্তে আলো লইয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন ও রাস্তা দেখাইতে লাগিলেন, এইরূপ কিছুক্ষণ পরে স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদের বাটি পৌঁছিলেন। এই সময়ে প্রচণ্ড বেগে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল, পূর্ব্বোক্ত বিধবা প্রাচীনা, অরবিন্দকে তাহাদের বাটিতে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং একটী কক্ষে এক খানি আসন পাতিয়া বসাইলেন, তিনি ও আর একটী সধবা

তাঁহার সম্মুখে বসিয়া তাঁহার সহিত কথপোকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাঁহার নাম ধাম ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার পরিচয় পাইয়া প্রাচীনা চমকিত হইয়া বলিলেন, "তুমি আমার কমলের স্বামী?"

অ। হাঁ আমিই তাহার স্বামী, আপনি কে?

প্রা। আমি তাহার মামী।

অরবিন্দ আরো চমকিত হইলেন। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে কমলকুমারী পিতৃমাতৃহীনা হইলে তাঁহার মাতুল দুর্লভরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে ঢাকা লইয়া যান, সেই স্থানে তিনি দশম বৎসর হইতে পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়োক্রম পর্য্যন্ত প্রতি-পালিত হন, তাঁহার মাতুলের মৃত্যুর পর হইতে তিনি ভবদেব ঘোষালের বাটিতে বাস করেন। এই বিধবা প্রাচীনা সেই দুর্লভরামের বিধবা স্ত্রী। অরবিন্দ ব্যগ্রতা-সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহাদের ত জলে ডুবিয়া মৃত্যু হইয়াছে, শুনিয়াছি কাশীধাম হইতে বাটি প্রত্যাগমনকালীন মুর্শিদা-বাদের নিকট এক স্থানে তাঁহাদের নৌকা রাত্রি-যোগে নঙ্গর করিয়াছিল, এমত সময়ে আফগান বিদ্রোহীরা নবাবের সৈন্যকর্তৃক তাড়িত হইয়া নৌকাতে আরোহণ করিয়া পরপারে পলাইতেছিল কিন্তু সৈন্যদিগের গোলাতে নৌকা ভাঙ্গিয়া ডুবিয়া যায় ও তাহাদের মধ্যে জন কয়েকের জলে ডুবিয়া মৃত্যু হয়। আমার মাতুলানী ও তাঁহার কন্যা জয়াবতীর মৃত্যু হয়।

প্রা। না আমার ও জয়াবতীর মৃত্যু হয় নাই। আমি মহাপাপিষ্ঠা তাই জীবিতা আছি ও বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি।

এই বলিয়া চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ সকলে নীরব হইয়া রহিলেন, পরে ঐ প্রাচীনা বলিলেন, "তোমার মামাশ্বশুর গোলমাল ও বন্দুকের শব্দ শুনিয়া ভিতর হইতে নৌকার বাহিরে আসিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে একটা গুলিতে আঘাত করাতে তিনি চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে গোলার আঘাতে নৌকা ভাঙ্গিয়া ডুবিয়া গেল, জয়াবতী বাল্যকাল হইতে পুকুরে সাঁতার দিত, সে জন্য সে ভালরূপ সাঁতার শিখিয়াছিল, আমিও কিছু কিছু জানিতাম, নৌকার একখানা তক্তা ধরিয়া সে আমাকে লইয়া সাঁতার দিয়া ও পারে চরে উঠিল। আমার দাদা এই পারে নবাব-সরকারে কি একটা চাকরী করিতেন। সমস্ত রাত্রি চরে থাকিয়া প্রত্যুষে গ্রামে যাইয়া দাদার বাটী জিজ্ঞাসা করিয়া সেই খানে আশ্রয় পাইলাম। পরদিন তিনি স্বয়ং অপর পারে যাইয়া দুই তিন দিন থাকিয়া তোমার মামা-শ্বশুরের ও কমলের অন্বেষণ করিলেন, কোন সংবাদ পাইলেন না। আমি জানিতাম যে, তোমার মামা-শ্বশুর যেরূপ গুলিতে আহত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার জীবন সংশয় হইয়াছিল, তিনি যে সাঁতার দিয়া কূলে উঠিয়া বাঁচিবেন, সে আশা করি নাই, তবে কমলের বাঁচিবার আশা করিয়া-ছিলাম বটে—

অ। শুনিয়াছি মামার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু আপনার ভাগিনেয়ীর (কমলকুমারীর) সে সময় মৃত্যু হয় নাই, পরে হইয়াছিল।

এই কথায় সকলেই বুঝিল যে, কমলকুমারীর কূলে উঠিয়া মৃত্যু হইয়াছিল। ইহার পর কিছুক্ষণ সকলে নীরবে রহিল। অরবিন্দ তৎপরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কতদিন কাশীতে বাস করিতেছেন?"

প্রা। দাদা আমাদের অবস্থা দেখিয়া চাকরী ছাড়িয়া ঢাকা সহরে যাইয়া তাঁহার ও তোমার মামা-শ্বশুরের বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া আমাদের লইয়া কাশীতে আসিয়া এই বাটিটী খরিদ করিয়া

বাস করিতেছেন, তাঁহার পুত্রসন্তান নাই, দুইটী মাত্র বিধবা কন্যা, ঐ তাহারা তোমার পিছনে বসিয়া আছে আর ইনি উহাদের মাতা, আমার ভাজ (যে সধবা প্রাচীনা সম্মুখে বসিয়াছিল তাহাকে দেখাইলেন) আমরা প্রায় মাস খানেক কাশীতে আসিয়াছি।"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, ইতিমধ্যে ঝড়-বৃষ্টি ক্রমে বাড়িতেছে দেখিয়া মামীশাশুড়ী বলিলেন, "অনেক রাত হইয়াছে তুমি এইখানে আহারাদি কর পরে যদি ঝড়-বৃষ্টি থামে, তবে বাটি যাইও।" এই বলিয়া তাঁহার কন্যা জয়াবতীকে বলিলেন, "তোমার ভগিনীপতির আহারের আয়োজন কর।" জয়াবতী অরবিন্দের পশ্চাত বসিয়াছিলেন. উঠিয়া গেলেন, ক্ষুদ্র দীপালোকে অরবিন্দ তাহাকে দেখিবা মাত্র শিহরিয়া উঠিলেন, যেন কমলকুমারীকে দেখিলেন, সেইরূপ ঈষৎ দীর্ঘায়তন, সেইরূপ ঈষৎ স্থূলাঙ্গী, সেইরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব, সেইরূপ ধীরে ধীরে পদচালন, কিন্তু তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না। অরবিন্দ কিছুক্ষণ মস্তক নত করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে ঝড়-বৃষ্টি কিছু হ্রাস পাইল। অল্পক্ষণ মধ্যে উহা একেবারে থামিল। অরবিন্দ বলিলেন, "বৃষ্টি ধরিয়াছে, আজ আসি আর একদিন আসিয়া আহার করিব।" মামী-শাশুড়ী তাহাতে সম্মতা হইলেন, কেন না জামাতার আহারোপযোগী দ্রব্যাদি ঘরে কিছুই ছিল না। অরবিন্দ দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আপনার বাটির তিনটা অট্টালিকার পরেই আমার বাটি, গঙ্গার ধারে ঐ যে সাদা কোটাটা দেখিতেছ ঐ আমার বাটি।" মামী-শাশুড়ী জয়াবতীকে ডাকিয়া বলিলেন, "জামাতার বাটি দেখিয়া রাখ।" জয়াবতী তাহার মামাত ভগিনীদ্বয়ের সহিত দ্বারদেশে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা রাস্তায় আসিয়া অরবিন্দের অঙ্গুলিনির্দ্দেশানুসারে বাটি দেখিলেন। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, জয়াবতী ভবদেব ঘোষালের পুত্র বামনদাসের স্ত্রী, সুতরাং অরবিন্দের দ্বিতীয়া পত্নী বসন্তকুমারী তাহার ননন্দা। বাটি দেখিয়া জয়াবতী অস্ফুটস্বরে অরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ননদ বসন্তকুমারী কি তোমার সহিত ঐ বাটিতে বাস করেন?"

অরবিন্দ ঐ কণ্ঠস্বর শুনিয়া আবার শিহরিয়া উঠিলেন। এখন বুঝিলেন যে, কেন তাঁহার শ্যালী জয়াবতী চুপি চুপি তাঁহাকে সন্ন্যাসীর বেশ ত্যাগ করিতে বলিয়াছিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া উত্তর করিলেন, "বসন্তকুমারী কিছুদিন হইল স্বর্গে গিয়াছেন।" ইহার পর আর কেহ কোন কথা কহিলেন না। কিছুক্ষণ পরে জয়াবতীর মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি একা ঐ বাটিতে থাক?"

অরবিন্দ কহিলেন,—"না আমার আত্মীয়-কুটুম্ব দুই চারি জন থাকেন, আর চাকর-দ্বারবান থাকে।

এই বলিয়া তাঁহার মামী-শাশুড়ীকে বলিলেন, —"আপনাদের সে কালের দ্বারবান রূপো দুলে ঐ বাটিতে থাকে, সে জলমগ্ন হয় নাই, আপনাদের ন্যায় সাঁতার দিয়া কূলে উঠিয়াছিল।"

ইহা শুনিয়া জয়াবতী ও তাহার মাতা আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বলিল, "একবার রূপচাঁদকে পাঠাইয়া দিও।" অরবিন্দ স্বীকার করিয়া চলিয়া আসিতে ছিলেন। ইতিমধ্যে অস্ফুটস্বরে জয়াবতী জিজ্ঞাসা করিল, "সন্ন্যাসীর বেশ কেন?"—ঐ কণ্ঠস্বর শুনিয়া অরবিন্দ আবার চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন সে সকল কথা একদিন বলিব, কিন্তু মামীর ঐ সকল কথা শুনিবার আবশ্যক তা নাই। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি কখন আমাকে দেখিয়াছ?

জ। হাঁ—দেখিয়াছি।

অ। কোথায়?

জ। তোমাদের দেশে তোমার বাটিতে?

অ। সে কি?

জ। বাল্যকালে পিসীর (কমলকুমারীর মাতা) বাটিতে গিয়াছিলাম, কমলের তখন তোমার সহিত বিবাহ হইয়াছে, তোমাদের বাটি সেই গ্রামে, আমার ভগিনীপতিকে দেখিবার বড় সাধ হইল। পিসীকে বলিলাম, তিনি এক জন দাসীর সহিত আমাকে পাঠাইয়া তাহাকে বলিলেন, "জামাই দেখাইয়া লইয়া আয়।" সে একদিন বৈকালে তোমাদের বাটির নিকট লইয়া গিয়া তোমাকে দেখাইয়া দিল, সেই দিন হইতে মধ্যে মধ্যে তোমাকে দেখিয়া আসিতাম।

অ। তোমার আমাকে মনে ছিল, যদি আমি পরিচয় না দিতাম তা হলে কি চিনিতে পারিতে?

জ। ঘরে উজ্জ্বল আলো থাকিলে চিনিতে পারিতাম।

ইহার পর অরবিন্দ চলিয়া আসিয়া বাটিতে প্রবেশ করিবামাত্র পিসী মৃণ্ময়ী ও রূপচাঁদকে তাঁহার মামী-শাশুড়ীর ও জয়াবতীর জলমগ্ন হইয়া যে মৃত্যু হয় নাই ও তাঁহাদের সহিত যে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, ইহা অবগত করাইলেন। রূপচাঁদ উহা শুনিবামাত্র চীৎকার করিয়া একটা লম্ফ দিল। তাহাতে মৃণ্ময়ীও চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আহারাদি করিয়া অরবিন্দ শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রাদেবী আজ রাত্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। সন্ধ্যার পর হইতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত রাত্রি তাহা আলোচনা করিতে লাগিলেন। জয়াবতীর মুখ দেখিতে পান নাই বটে, কিন্তু কমলকুমারীর ন্যায় গঠন ইত্যাদির সাদৃশ্যে বিশেষতঃ তাহার কণ্ঠস্বরে তিনি বড়ই বিস্মিত হইয়াছেন।

[ক্রমশঃ]

গরুর গাড়ী তিস্তা নদী পার হইতেছে

কবিতা

সজিনা ফুলের ব্যথা

শ্রীকৃষ্ণধন দে, এম-এ

(১)

দেহের ক্ষুধায় আছে মোর ঠাঁই,
প্রেমের ক্ষুধায় নাই ?
শুধু এ দেহের আস্বাদটুকু
পশুর মতন চাই ?
নারী-জনমের দেহখানি শুধু
লালসা-রসনা দিয়া,
যত রূপে তুমি উল্লাস-ভরে
নিতে চাও নিঙাড়িয়া ?
যৌবন শুধু চিনিয়াছ হায় !
নিটোল তনুর স্বাদে ?
বুঝিলে না কবি, অন্তর তার
কোন্ বেদনায় কাঁদে ?

(২)

বেণীটী বাঁধিয়া নব ফাল্গুনে
কত না যতন করি'
রাখিলাম কবি প্রণয়ের মধু
কামনা-পাত্র ভরি'
অশোক বকুল সাথে সাথে আমি
দাঁড়া'লাম তা'রি পথে,
আসিবে হেথায় প্রাণের দেবতা
কখন কুসুম-রথে !
আমের মুকুল সেও দিয়ে গেল
কণ্ঠে বরণ-মালা,
মোর বুকে শুধু রয়ে গেল আঁকা
শত 'পমান-জ্বালা !

(৩)

দেবতার পূজা আমাতে না হোক,
না হোক বিলাস-হার,
শুধু দাও মোরে একটী ভিক্ষা—
জীবনে একটী বার—
শুধু মোরে আজ ফুটিবারে দাও
প্রাণের পূর্ণতায়,
ফাল্গুন-রাতে দক্ষিণ বাতে
ঢল ঢল জ্যোছনায় !
দেহের ক্ষুধার কয়ো না কো দাসী
ছিঁড় না কো ফুল আর—
প্রাণের সুধার ভাগ লও তুমি
দুর্লভ উপহার !

প্রবন্ধ

দেশবন্ধু-স্মরণে

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, এম-এ

আমাদের জাতীয় জীবনের চিরপুরাতন ধারাটি যখন স্বদেশীর যুগে নূতন ভাববন্যায় উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাহার প্লাবন বাংলাদেশ অতিক্রম করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাংলার সে গৌরবময় যুগ কালক্রমে যে রক্তরাগ-রেখায় রঞ্জিত হইয়াছিল তাহা নিশাশেষে নবারুণের রক্তিমাভাস কিম্বা বিধাতার রোষবহ্নির রুদ্রদীপ্তি তাহা আমরা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। তার পর মহাত্মা গান্ধি-প্রচারিত নূতন ভাব ও আদর্শের তরঙ্গ আসিয়া বাংলার বুকে এমনই প্রবল বেগে আঘাত করিল যে, তাহাতে সকলে বিভ্রান্তভাবে পথের সন্ধানে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তখন শুধু আমাদের এই বাংলাদেশেই ভাব-সংঘর্ষের একটা নূতন সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ভারতের আর কোথাও এমন ব্যাপারটা ঘটে নাই; তাহার কারণ বহুপূর্ব্ব হইতেই বাংলার সাহিত্যে ও সমাজে, শিল্পে ও সঙ্গীতে, ধর্ম্মে ও রাজনীতিতে যে নব ভাবের প্রেরণা আসিয়াছিল তাহার তুলনা আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। তাই মহাত্মা যখন দেশের কর্ণে তাঁহার অহিংসা-মন্ত্র ঢালিয়া দিলেন তখন বহুদিন পর্য্যন্ত এই বঙ্গদেশ

বাহিরে আসেনি ছুটে,
উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে
শুভ শঙ্খনাদ।

সুরেন্দ্র-রবীন্দ্র-অরবিন্দের বাণী যাহাদের কর্ণে তখন ধ্বনিত হইতেছিল তাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে এই নূতন মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে নাই। আমাদের জাতীয় জীবন যখন এইরূপে লক্ষ্যহারা হইবার উপক্রম হইতেছিল তখন দেশের অন্তস্তল হইতে এই প্রার্থনা ভগবচ্চরণে লুণ্ঠিত হইতেছিল :—

"এই কল্লোলের মাঝে নিয়ে এস কেহ
পরিপূর্ণ একটি জীবন,
নীরবে মিটিয়া যাবে সকল সন্দেহ,
থেমে যাবে সহস্র বচন।
তোমার চরণে আসি মাগিবে শরণ
লক্ষ্যহারা শত শত মত,
যেদিকে ফিরাবে তুমি দু'খানি নয়ন,
সেদিকে হেরিবে সবে পথ।"

এমনই সময়ে দেশের এই মর্ম্মকামনা সফল করিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পরিপূর্ণ একটি জীবনের মূর্ত্ত আদর্শরূপে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। অসীম প্রেম, অলৌকিক ত্যাগ, অমিত পরাক্রম, দুর্জ্জয় সাহস, প্রোজ্জ্বল জ্ঞান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি —একাধারে তাঁহাতে এত গুণের সমাবেশ দেখিয়া দেশ মুগ্ধ হইল, আর অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হইল। নীরবে মিটিয়া গেল সকল সন্দেহ, থেমে গেল সহস্র বচন। সিদ্ধার্থের ন্যায় অতুল সম্পদ ধূলিমুষ্টির ন্যায় অকাতরে ত্যাগ করিয়া যিনি প্রেমের ও কর্ম্মের সন্ন্যাসী সাজিলেন, ভারতব্যাপী দুঃখদৈন্যব্যাধিমৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম

করিবার জন্য যিনি মুক্তির বার্ত্তা প্রচার করিতে লাগিলেন, সঙ্ঘগঠনের অদ্ভুত শক্তি দেখাইয়া যিনি শক্ররও বিস্ময় ও ভীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহার চরণে আসিয়া যে লক্ষ্যহারা শত শত মত শরণ মাগিবে তাহা ত বিচিত্র নহে। কিন্তু দেশবন্ধু শুধু রাজনৈতিক নেতামাত্র ছিলেন না। ভারতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ভোগের সহিত ত্যাগের, সন্ন্যাসের সহিত কর্ম্মের আদর্শ—তাঁহাতে যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে যুগাবতার-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ভোগী না হইলে প্রকৃত ত্যাগী হওয়া যায় না। তাঁহার ন্যায় ভোগী কয়জন ছিল? কিন্তু তাঁহার সে ভোগ ত্যাগের মাহাত্ম্যে মহিমান্বিত হইয়া রহিয়াছে। কয়জন ভোগী তাঁহার ন্যায় সর্ব্বস্ব দান করিয়াছে? 'ত্যাগেন ভুঞ্জীথা'—ত্যাগী হইয়া নিষ্কামভাবে ভোগ করিবে, উপনিষদের এই উপদেশ তাঁহার জীবনে জাজ্বল্যমানরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাই যখন সময় আসিল, তখন তিনি অক্লেশে ভোগৈশ্বর্য্য চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়া ভিখারীর বেশে সকলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার এই ত্যাগ, এই সন্ন্যাস কিসের জন্য? অনেকে ধর্ম্মের জন্য নিজেকে নিঃশেষে রিক্ত করিয়া জগতে ত্যাগের উদাহরণ দেখাইয়াছেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ একদিন যেমন বলিয়াছিলেন যে, দেশে যতদিন একটীও লোক অনাহারে মরিবে ততদিন তিনি নিজের মুক্তি কামনা করেন না, দেশবন্ধুও তেমনই স্বদেশকে শৃঙ্খলিত রাখিয়া স্বীয় মুক্তির জন্য উৎসুক ছিলেন না। তাঁহার এই ত্যাগ 'সমুদায় আপনারে দিতে একেবারে স্বদেশের পায়ে বিসর্জ্জন।' তিনি দেশকে বড় বেশী ভালবাসিয়াছিলেন, তাই তাহার জন্য এত বড় ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন। প্রেমের লক্ষণই ত আত্মদান।

তিনি মহাত্মাজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেও বাংলাদেশ তাঁহাকেই মহাত্মা গান্ধীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ১৯২০ সালে এদেশে যে অসহযোগের ঝড় উঠিয়াছিল তাহার মূলে ছিল তাঁহারই প্রভাব, যদিও মন্ত্রদাতা ছিলেন গান্ধীজি। তিনি যে শুধু ধ্বংসের কাজেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহা নয়, গড়িবার শক্তিও তাঁহার অতুলনীয় ছিল। ফলে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে শুধু বঙ্গদেশে কেন সমগ্র ভারতে তাঁহারই প্রতিভা ক্রমশঃ জয়যুক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার প্রমাণ এই যে, যখন তিনি গান্ধী-প্রদর্শিত পন্থা অংশতঃ বর্জ্জন করিয়া ভারতব্যাপী শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট স্বরাজ্যদল গঠন করিলেন তখন দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের অনেকেই তাঁহার মুক্ত সমুন্নত পতাকাতলে আসিয়া সমবেত হইলেন। আজ তিনি নাই; কিন্তু তাঁহার হাতে-গড়া এই স্বরাজ্য দল তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য-অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ইহাই এখন দেশের মধ্যে একমাত্র সুগঠিত, সুসম্বদ্ধ, শক্তিসম্পন্ন রাজনৈতিক সঙ্ঘ, যদিও তাঁহার অভাবে ইহার পূর্ব্বগৌরব অনেকটা ম্লান হইয়া পড়িয়াছে।

দেশের ভাগ্যাকাশে আজ বড় দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। ভাই ভায়ের বুকে অসংকোচে ছুরি বসাইতেছে; ধর্ম্মের নামে ঘোর অধর্ম্মের পৈশাচিক তাণ্ডব সহস্র বিভীষিকার সৃষ্টি করিতেছে। স্বার্থান্ধ সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ-বিষে জাতীয় জীবন জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ সাধনায় জাতি-ধর্ম-নির্ব্বিশেষে আমরা দেশজননীর যে প্রসাদটুকু লাভ করিয়াছিলাম আজ তাহা নিঃশেষে হারাইতে বসিয়াছি। নৈরাশ্যের গভীর অন্ধকারে দিশাহারা বাঙ্গালীর দুঃখদীর্ণ হৃদয় হইতে কেবলই

এই প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে—'কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো?' কে ইহার উত্তর দিবে?

এই দুর্দ্দিনে কেবলই মনে হইতেছে দেশবন্ধুর কথা। আর তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে বলিতে ইচ্ছা হইতেছে—Thou shouldst be living at this hour! India hath need of thee. তিনি বাঁচিয়া থাকিলে হয় ত দেশের অবস্থা অন্যরূপ হইত। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা তাহা নয়। আমাদের অতীত জীবনের পুঞ্জীভূত পাপের বুঝি প্রায়শ্চিত্তের সময় আসিয়াছে; তাই এই দুঃখের দহন। যে আগুন জ্বলিয়াছে তাহাতে যদি আমাদের পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়, সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির পথে কল্যাণ নাই—এই জ্ঞানালোক যদি আমাদের হৃদয়ের কোণে কোণে যত লুকানো আঁধার আছে সে সমস্ত বিনষ্ট করিয়া দেয়, দেশমাতৃকার যে পবিত্র বিগ্রহ আমরা ঘৃণার দ্বারা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিতেছি তাহা যদি আবার সমগ্র সম্মিলিত জাতির হৃদয়মন্দিরে প্রেমের পাদপীঠে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেই বুঝিব দেশবন্ধুর আত্মবলিদান ব্যর্থ হয় নাই—তখনই তাঁহাকে আন্তরিকভাবে পূজা করিবার সময় আসিবে আর ভারতভাগ্যবিধাতার চরণে প্রণিপাত করিয়া বলিব—

এই করেছ ভালো নিঠুর, এই করেছ ভালো,
এমনি করে' হৃদয়েতে তীব্র দহন জ্বালো।

জোড়া খেয়া-নৌকায় মোটর গাড়ী—তিস্তা নদীবক্ষে

গল্প

ভাই

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঐ নেলী পোড়ারমুখী আস্‌ছে সাবুর বাটি নিয়ে, এক্ষুণি সবটুকু না গিলিয়ে ছাড়বে না। কি জ্বালা! এ অভাগীর মরণও হবে না ছাই, আর ওরাও ছাড়বে না! এই তো দিব্যি রোগ-শয্যায় শুয়ে আছি—জানালার ফাঁক দিয়ে 'সেণ্ট্রাল-এভিনিউ'এর চওড়া রাস্তার বুকখানা দেখতে পাচ্ছি। বৈকালের সূর্য্যের রক্ত আভা পিচের ওপর প'ড়ে বেশ এক একবার চক্ চক্ ক'রে উঠছে। রাস্তার দু'পাশে নানা রংবেরংএর লোকজনের যাওয়া আসার ভিড়, ক্রমেই বেড়ে উঠছে; মোটর গাড়ীগুলো সান্ধ্য ভ্রমণের সৌখিন যাত্রীদিকে নিয়ে তাদের জয়ভেরী বাজাতে বাজাতে ছুটেছে! ওই এক জোড়া কালো ওয়েলারের ঘোড়ার ফেটন্ টপ্ টপ্ ক'রে ছুটে গেল।—বাঃ, বেশ ফুটফুটে মেয়েটি তো! পাশে যে যুবক বসে রয়েচে তার চোখের চশমার কাঁচের ওপর সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু প'ড়ে ঝক্ ঝক্ ক'রে উঠছে!

এ ছোঁড়ার মজা দেখ! ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে আমার মুখের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে চলেছে! এ মুখে কি আছে রে হতভাগা মিন্‌ষে! কি তীব্র দৃষ্টি! মাগো যেন হাঁ ক'রে খেতে আসছে! হে হরি! ওই সাদা মোটারটা যায় ওর গায়ের ওপর দিয়ে চলে। এই—এই—এই যা!

বাপ রে! বাঁচা গেল, ভাগ্যিস ফস্ ক'রে সরে পড়েছে!

রিক্‌শাওয়ালা ঘুমুর বাজিয়ে ঝুমুর ঝুমুর করে ছুটে চল্‌লো!—

এদিকে সাবু যে ঠাণ্ডা জল হয়ে গেল দিদি, খেয়ে নাও না?—বেরো বল্‌ছি হতভাগী, আমি ওসব খাব না। ব'লে টান মেরে নেলীর হাত থেকে সাবুর বাটিটা জান্‌লা গলিয়ে ফেলে দিলুম।

নেলী রাগে গস্ গস্ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বলে গেল,—তোমার আদুরে ভাইটিকে ডেকে দিচ্ছি দাঁড়াও, কেমন ক'রে না খাও, দেখছি।

—ডাকিস না বল্‌ছি নেলী, আমার মাথা খাস।—

ডাকলেই বা! ধীরেন কি আমায় ধ'রে বেঁধে খাওয়াতে পারবে কিছু! ভালবাসি ব'লে তাকে কি আমি সব অধিকারটুকুই ছেড়ে দিয়েছি না কি! আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কইবার কে সে? মা, বাপ, ভাই, বোন, কেউ নেই তার—রাস্তায় কেঁদে কেঁদে ফিরতো, তাই দয়া করে ঘরে স্থান দিয়েছি। এই তো! আমার নিজের ভাই নেই বলেই দুধের সাধ ঘোলে মেটানো! না কিছুতেই না। সে হাজার বল্লেও আমি কিছু খাব না। আমি মরব;—না খেয়ে মরব, তাতে তোমাদের মাথাব্যথা কেন বাপু!—বেশ তো দেখছিলুম,—সব এলো-মেলো হয়ে গেল!

—আ মর্! এ আবার কি না? পুঁটুলি-বাঁধা বস্তার মতন লাল নীল সাড়ীগুলি ছ্যাক্‌রা গাড়ীর ভেতরে বোঝাই হ'য়ে যাচ্ছে! ও,—পর্দ্দানসীন্ বাঙ্গালী মেয়েরা বোধ হয় থিয়েটারে যাচ্ছেন।—ওই রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলেছে, আহা, এ বেচারী হয় ত আফিসের কেরাণী! ওই যে জরাজীর্ণ ছাতাখানি হাতে নিয়ে প্যানেলা জুতো পায়ে, মলিনমুখে বাড়ী ফির্‌ছে! বাড়ী ফিরে হয় ত দেখবে রাত্রে আহারের বন্দোবস্ত নেই। এদিকে গয়লার দুধের দাম বাকী, সে পয়সা আদায়ের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে; মুদি তাগাদা করতে এলো বলে,—ধোপারও সন্ধ্যায় আসবার কথা। ছেলেটার জ্বর হয়েছে, ডাক্তার ডাক্‌তে হবে, অথচ হাতে একটি পয়সা নেই! চারিদিকের ঝঞ্ঝাটে আর পাওনাদারের তাগাদায় ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে হয় ত রাত্রে হতাশ হয়ে শুয়ে শুয়ে ভাববে আর তার স্ত্রী কোলের ওপর মাথাটি তুলে নিয়ে, রুখু চুলের ফাঁকে আঙুল দিয়ে কইবে—অত ভেবো না লক্ষ্মীটি, দিনরাত্রি ভেবে ভেবে—দূর ছাই! কি সব সাত ভূতের চিন্তা যে মনের মধ্যে এসে প'ড়ে তোলপাড় করে তোলে!—

মেয়েদের স্কুল-ফের্‌তা গাড়ীটা ঘর্ ঘর্ ক'রে চলে যাচ্ছে!—মেয়েটির মুখখানি তো বেশ ঢল্‌-ঢলে! চোখের চাউনিটি কেমন যেন উদাসিনীর মতন! মনে হচ্ছে,—কি যেন কার কথা হঠাৎ তার মনে পড়ে গেছে। বোধ হয় কয়েক দিন আগে শেখা—রবীন্দ্রনাথের একটা গানের সুর! ছায়ানট কি পূরবী, এমন একটা কিছু হবে! না আর কিছু?—যাক্!...এই রে! পাশের মেয়েটা কি চঞ্চল! রাস্তার এক ছোক্‌রার গায়ে থুথু দিয়ে দিলে। আবার মুখ টিপে টিপে হাসিও হচ্ছে! হাঁ, এই তো ঠিক্! আর একজন মেরেছে তার গালে এক চড়! বা-রে!

দেখ্, মেজ্‌দি, তোমার ধীরেন আমায় ফের্ সেই কথাটা—

হো হো করে এক গাল হেসে ধীরেন ঘরে ঢুকেই বল্‌লে,—কি বল্ না নেলী, কি কথাটা! বল্—বল্ না কি বলেচি।—বলেই আবার হাসি!

মুখ ফিরিয়ে বল্‌লুম, আঃ কি হচ্ছে কি? ওকে আবার রাগালি কেন ধীরেন?

কাকে রাগিয়েচি?

ওই রণচামুণ্ডাকে!

জিজ্ঞেসাই কর না দিদি, আমি ওকে কি বলেচি।—সুরটা একটু নরম করে বল্‌লে,—কি বলেচি জান?—সেই, সেই গল্‌দাচিংড়ি!

রাগে নেলীর গাল দুটো যেন জবাফুলের মত রাঙা হ'য়ে উঠেছিল; ধীরেন তার মুখের পানে তাকিয়ে দুষ্টু হাসি হাস্‌তে লাগলো।

গল্‌দাচিংড়ি ব'লে ডাকলে ওর্ যদি রাগ হয়, তা হ'লে বল্লিস্ কেন ধীরেন?—বল্ আর বল্‌বি নে, আমার পা ছুঁয়ে তিন সত্যি ক'রে বল্।

নেলীর সুমুখে তার এ পরাজয় স্বীকার কর্‌তে লজ্জা হ'লো; বল্‌লে—ওকে এখান থেকে দূর করে দাও আগে।

আচ্ছা নেলী, তুই যা, ও আর বল্‌বে না। বল্‌তেই নেলী আপন মনে বিড়্ বিড়্ ক'রে বক্‌তে বক্‌তে বেড়িয়ে গেল।

ধীরেন ধীরে ধীরে দিদির কোলের কাছে মাথাটা রেখে বল্‌লে,—দিদিমণি, তুমি না কি বলেচো, কিছু খাবে না—নেলীর হাত থেকে সাবুর বাটি জান্‌লা গলিয়ে ফেলে দিয়েচ?

এই যা! সব গোলমাল হ'য়ে গেল! এতক্ষণ কারো কথা শুনব না ভাবছিলুম কিন্তু এবার কি বলি? এ দস্যি ভাই তো ছাড়বে না। বললুম,—না ধীরেন, আমি তো খাব না বলি নি।

একটু গরম দুধ এনে দেব?—বল খাবে?

হ্যাঁ, খাব।—রাত্রি তখন প্রায় আটটা।

ডাক্তার বলে গেল, আমি ভাল আছি। ধীরেন পা টিপে টিপে আমার বিছানার শিয়রের কাছে এসে বসলো। আমার হাতটা তার হাতের মুঠোর মধ্যে ধ'রে বললে—দিদিমণি, আজ একটি সত্যি কথা বলবে?

কি কথা ধীরেন?

সেদিন আমার জামা কাপড় জুতো কিনতে যে টাকা দিলে, সে টাকা কোথায় পেয়েচো বলতে পার?

বুকটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো। বললুম,—কেন কি হ'য়েচে, আর চাই?

হ্যাঁ আরো চাই বৈ কি! যাও—আমি সব জানি।—ও বাড়ীর নীলিমার কাছে হাতের চুড়ি বাঁধা দিয়ে টাকা এনেচো?

এই চুপ্‌ চুপ্‌! মা যেন না জানতে পারে। তুই কেমন করে জানলি ধীরেন?

যাও! তোমার সঙ্গে আর কথা কইব না আমি! বলে, ধীরেন তাড়াতাড়ি উঠে চ'লে গেল যেন একটু রাগ করেই।

আঃ! বুকের ভেতরটা বেদনায় টন্‌ টন্‌ করে উঠলো। আমি যে তোর দিদি হয়েচি ভাই!

একদিন মা হঠাৎ জানতে পারলেন, আমি চুড়ি বন্ধক রেখে টাকা খরচ করেছি। কি জন্যে এবং কখন, সে খবর তিনি পেলেন না। আর যায় কোথা! গালাগালি আরম্ভ হলো—অত বড় ধাড়ি মেয়ে,—দুদিন পরে বিয়ে হবে, একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই;—চুড়ি বেচে—যা নয় তাই, অনেক কিছুই শুনতে হোল।

নেলীর মারফত ধীরেনের কানে সে সংবাদ গিয়ে পৌঁছলো। দিনের বেলা তার খাওয়াই হলো না। সমস্তটা দিন ঘরে খিল্ বন্ধ করে বসে সন্ধ্যার কিছু পরেই ধীরেন আমার ঘরে ঢুকে ডাকলে—দিদি!

সমস্তটা দিন গালাগালি খেয়ে মনটা ভারী খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তাই মেঝের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। চেয়ে দেখি ধীরেন। আমার হাতে একটা কাগজে বাঁধা পুঁটুলি দিয়ে বললে,—এই নাও দিদি, তোমার চুড়ি। কেমন টেরটা পেয়েচো। একটা পাতানো ভাইয়ের ওপর ভারী দরদ দেখাতে গিয়েছিলেন!

মনে করলুম, জিজ্ঞেস করি, কেন সে এমন কাজ করলে এবং টাকাটাই বা পেলে কোথা, কিন্তু আমার মুখ থেকে কোন কথা বেরোবার আগেই ধীরেন বাইরে চলে গেল। ডাকলুম,—ধীরেন! ধীরেন!

কোন সাড়া পেলুম না।

দিন পাঁচ ছয় পরে সে এক মহাহুলুস্থুল কাণ্ড! ধীরেন আর্ট স্কুলে পড়তো। একদিন স্কুল থেকে খবর এলো—সে না কি নোট জাল ক'রে পাঁচখানি দশ টাকার নোট্ চালানোর অপরাধে পুলিসের হাতে ধরা পড়েচে।

কথাটা শুনে আমার মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে ঘুরতে লাগলো—হাত পা অবশ হয়ে এলো—চোখে তারা দেখতে লাগলুম। এ অভাগীর জন্যে তুই এমন কেন করতে গেলি ভাই! তোদের তরে যে কত কঠোর নির্য্যাতন সইতে পারি

আমরা, সে কথা তুই কেমন ক'রে জান্‌বি ধীরেন ?

আমার যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে তোকে ফিরিয়ে আন্‌ব —আয়, আয়, ভাই, ফিরে আয় ! পঞ্চাশটি টাকার জন্যে আমার চোখের সুমুখ দিয়ে তোকে বন্ধ করে কয়েদীর গাড়ীতে নিয়ে চ'লে যাবে—আর আমি নিজের চোখে তাই দেখ্‌ব ? এত বড় পাষাণ দিয়ে এ নারী-হৃদয় তো তৈরী করতে পারি নি আজও। সে দৃশ্য দেখ্‌বার আগে আমার মৃত্যু হোক্ ভগবান ! ধীরেন, ধীরেন ! লক্ষ্মী ভাইটি আমার !

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। ও মা ! এ যে স্বপ্ন !
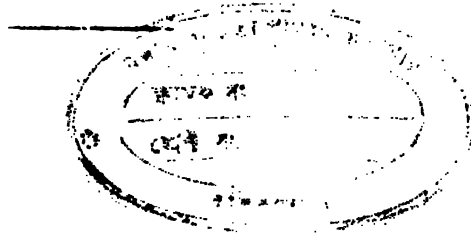
অদ্ভুত বংশ-সেতু—তিস্তা নদী-বক্ষে

গল্প

ত্যাগের পথ

শ্রীঅমরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, বি-এ

এক

"ও সন্ন্যাসী ঠাকুর !"

দূরে স্নানার্থী নরনারী হরিশ্চন্দ্রঘাটে অবগাহন করিতেছিল। কেহ উঠিতেছিল, কেহ নামিতেছিল।

ছোট মেয়েটী একাই আসিয়াছিল,—স্নান করিতে নয়, সন্ন্যাসীর কাছে।

সে আবার ডাকিল,—"ও ঠাকুর !"

চোখ মেলিয়া স্বামীজী কহিলেন,—"কি মা ?"

মেয়েটী উত্তর দিল,—"কি আবার কি ? মানুষ বাঁচাতে জান না ? এত ভেল্কী দেখালে—হট্ যন্তি ফট্ যন্তি !"

"না।"

"না ত না !"—মেয়েটী রাগিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল।

সন্ন্যাসী ডাকিল—"শোন। কার অসুখ ?"

"আমার—যাবে ?"

মেয়েটীর কথা শুনিয়া হাসি আসিতেছিল।

উঠিতে উঠিতে স্বামীজী কহিলেন,—"যাব ত, কি খেতে দেবে ?"

"খেতে ? নাড়ু আছে, মোয়া আছে—"

দুই

ছোট গলি। ছোট বাড়ী। তার একতলায় একখানা ঘর।

সন্ধ্যাবেলায় কে একটা প্রদীপ রাখিয়া গিয়াছে। কেহ নাই।

ইতস্ততঃ করিয়া সন্ন্যাসী ডাকিল,—"খুকী !"

হাসিয়া মেয়েটী বলিল,—"ওদিকে বুঝি !"

গৈরিকের আঁচল ধরিয়া সে তাঁহাকে আর এক ঘরে লইয়া গেল।

বিধবা। গলায় আঁচল দিয়া তাঁহার পায়ের উপর পড়িল। আঙুল দিয়া শয্যা দেখাইয়া দিয়া ক্রন্দন-বেগ রোধ করিতে করিতে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

রোগশয্যায়—সুকুমার, টুলটুলে মুখ। স্বামীজী গিয়া বসিলেন।

"আমার তেষ্টা পেয়েছে !"

তিনি জল দিলেন, ঔষধ দিলেন বলিলেন,—"ভাল হয়ে যাবে, বাবা।"

"বাবা ! বাবা কৈ ? বাবা ! এল না ?"

"ঘুমোও। আসবে !"

মাঝে মাঝে দুই একবার খুকী আসিয়া সন্ন্যাসীকে নাড়ু ও মোয়ার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে ও বলিয়াছে, খোকা সেরে উঠলে নতুন দি খড়ম দেবে, আসন দেবে। মহিলাটি আর আসেন নাই। বোধ হয় সন্তানের রোগ-পরিচর্য্যার পাছে কোনও ব্যাঘাত হয়।

দুরন্ত বিসূচিকা হইতে বালক রক্ষা পাইল।

দুই দিন নিয়ত রোগ-শয্যার পাশে থাকিয়া সন্ন্যাসী না জানাইয়া উঠিলেন।

তিন

সেই হরিশ্চন্দ্রের ঘাট। সন্ন্যাসী সেইখানে তেমনি বসিয়া আছেন।

গঙ্গায় নৌকা বহিয়া চলিয়াছে—দূরে, দূরে।

সন্ন্যাসীর মন চলিয়া গিয়াছে তাহারও কত দূরে !

"আমায় গ্রহণ কর।"

স্বামীজী চম্‌কিয়া উঠিলেন। কে ? সে কি

ফিরিয়া আসিল। যৌবনের স্বপ্নময়ী প্রতিমা, সে ত কতদিন—কতদিন ডুবিয়া গিয়াছে। আবার উঠিবে!

সন্ন্যাসী তাহার মুখের দিকে নিরবলম্ব দৃষ্টি ফেলিয়া কাহাকে অনুসন্ধান করিতেছিলেন।

নারী পুনরায় কহিল,—"তোমার দয়া নেই, তোমার ক্ষমা নেই? এতজনের প্রায়শ্চিত্ত আছে, আমার কি তা'ও নেই?"

স্বামীজীর মনে তরঙ্গ বহিল,—"কে? কার প্রায়শ্চিত্ত? মানসময়ী প্রতিমার ত শুনিয়াছি, বিসর্জ্জন হইয়াছে বহুদিন। আবার প্রায়শ্চিত্ত কার? নারায়ণ! নারায়ণ!"

দূরে মন্দিরগুলির কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী চোখ বুজিলেন। মহিলা বলিল,—"তোমার দুলালকে ত বাঁচালে, আমায় নেবে না?"

সন্ন্যাসীর চোখের পাতা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, হৃদয় নাচিয়া উঠিল। সেও একটী দুলাল লইয়া কোথায় মিশাইয়া গিয়াছে—কত মাস। বনবাসের পর গৃহে ফিরিলে সবাই যে বলিয়াছে—এ জগতে সে কি আর আছে হে! তবে—তবে—ফিরিল! না, না,—না না! নারায়ণ, নারায়ণ! এ যে বিধবা!

মুখ ফুটিয়া তিনি বলিয়া ফেলিলেন,—"তুমি কি চাও?"

নারী উত্তর দিল,—"অভাগীকে চিনতে পারলে না। আমি ত তোমায় ঠিক চিনেছি—জটা, দাড়ি সত্ত্বেও।"

সন্ন্যাসী শিহরিয়া উঠিলেন,—সিঁথিতে সিঁদুর! কি রহস্য! কিন্তু না, সে নয়।

তিনি প্রশ্ন করিলেন,—"তুমি কে বল ত?"

"তোমার বন্ধুর সঙ্গে পাঠিয়েছিলে বিশ্বনাথ দর্শনে—"

"তার পর—বল।"

"দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যাবেলায় সে এসে—সে এসে বললে—বৌ বোঝই ত।"

"যাও। ফিরে যাও।"

"না—ওগো না সে আমায় স্পর্শ করে নি, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি। আমি প্রাণপণে চীৎকার করেছিলুম। সেই যে বেরু'ল সে, আর ফেরে নি। একা কেমন ক'রে যে কাটাচ্ছি ক'মাস! গয়নাগুলো নিয়ে আতঙ্কে সারা হয়েছি—কত চিঠি তোমায় রোজ লিখেছি—চোখের জলে বুক ভেসেছে—"

"না। তা হ'লে কিনারা হত, ঠিকানা ভুল করেছ।"

"ভুল! না—গোঁসাই লেন, পনেরো নম্বর। ভগবান অভাগীর দিকে চেয়েই খোকাকে ফেললেন। আর পায়ে ঠেলো না।"

"ফিরে যাও। দু'দিন ভাবতে দাও। আমি সন্ন্যাসী। দু'দিন ভাবতে দাও।"

নারী কাঁদিয়া ফিরিয়া গেল।

সে তাঁহাকে ভুল চিনিয়াছে বুঝিয়া সন্ন্যাসী হাসিলেন।

চার

দুইদিন পরে। কাশী নয়—

মেয়ে আসিয়া বলিল—"চল না মা যাই। ছোড়দার হাত দেখছেন একজন গণকার।"

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রৌঢ়া বলিলেন—"পোড়া দশা। ম'রব কবে জানতে?"

"যাঃ!—চল না, মা।"—

নামিয়া আসিয়া হাতটা বাড়াইয়া দিয়া তিনি কহিলেন—"দেখুন ত বামুনঠাকুর, কি দেখবেন।"

"আপনার মনটায় খুব অশান্তি মা, না?"

"আর বাবা বুড়ো হয়েছি, কোথায় আমি মর'ব, তা না টপ করে এমন্ লক্ষ্মীর মত বৌটা কলেরায় চলে গেল—উঃ!—"

"হুঁ!—বড় বৌ না?—বড়ছেলেটি কোথায়?"

"জজকোর্টে। মন্‌মরা হয়ে থাকে, শুকিয়ে যাচ্ছে, বাবা। জানি না কি কপালে আছে!"

"নাম কি মা?"

"কুমুদরঞ্জন বোস্ বাবা।"

"আচ্ছা, এখন চল্'লাম।"

"কেন ঠাকুর? হাত দেখ'বে না?"

"সন্ধ্যাবেলায় আসব মা। আপনার বড়ছেলের হাতটা দেখব একবার।" সন্ন্যাসী রাস্তায় নামিয়া পড়িলেন। অসহায়া অপরিচিতা নারীর কাতর-রোদনধ্বনি তাঁহার কানে সেই সন্ধ্যাবধি প্রতিনিয়তই বাজিতেছিল।

কুমুদ উকীল-লাইব্রেরীতে কাগজ পড়িতেছিলেন। আকস্মিক বিরহের গভীর রেখা তখনও বেশ ফুটিয়া রহিয়াছে।

সন্ন্যাসী ডান হাতটী তাঁহার মাথার উপর রাখিলেন। কুমুদ তাঁহার দিকে অবাক হইয়া চাহিল।

স্বামীজী বলিলেন—"আপনার বাড়ী হাত দেখতে গিয়েছিলুম খানিক আগে। হাতটা দেখি আপনার।"

কিছু না বুঝিয়াও তিনি হাতটা বাড়াইয়া দিলেন।

এধার ওধার মাথা সঞ্চালন করিতে করিতে সন্ন্যাসী বলিলেন—"আপনার স্ত্রী? বেঁচে আছেন। আপনি কাশী যান পাবেন।"

"স্বামীজী!—স্বামীজী!—"

"হ্যাঁ। ভাববেন না।"

"না—অরুণ ফিরে এসে যে বলেছিল, বলেরা হয়ে করুণা খোকা দুজনেই—"

"আপনি আমায় চোখ দিলেন—আমার গুরু।"

"বিশ্বাস হচ্ছে না?"

"না না! স্বামীজী, দীনের ওপর নিজে থেকে এত দয়া কর'লেন, যদি দু'একদিনের জন্য—"

"তা পারি। কবে যাবেন?"

"আজই।"

পাঁচ

কাশীতে পৌঁছিয়া এ গলি সে গলি করিয়া স্বামীজী দুইঘণ্টা কাটাইলেন। মাঝে মাঝে কুমুদ জিজ্ঞাসা করিতেছিল—"কোন আশা হয় পাবার, স্বামীজী?" প্রশ্ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল, যদি উত্তর আসে —'না'।

একটী বাড়ীর দরজায় দণ্ডায়মান এক ভদ্র-লোককে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—"দেখুন, পাশের বাড়ীতে কে থাকেন বল'তে পারেন?"

"আজ্ঞে, ঠিক বল'তে পারি না। ঝির মুখে শুনেছি, একজন বিধবা আছেন।"

স্বামীজী বলিলেন—"কুমুদবাবু এই বাড়ীই, চলুন।"—

বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতে কুমুদের সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। না জানিয়া শুনিয়া কাহার বাড়ীতে তিনি ঢুকিতেছেন? গণনা যদি মিথ্যা হয়? গণকারেরই যদি কোন দুরভিসন্ধি থাকে?—

দ্বিপ্রহর। নীচে কেহ নাই।

স্বামীজীর পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া কুমুদ চীৎকার করিয়া উঠিল—"করুণা!—করুণা!"

যন্ত্রচালিতের মত ছুটিয়া আসিয়া তাহার পা জড়াইয়া করুণা কাঁদিয়া উঠিল।

চোখ মুছিতে মুছিতে কুমুদ প্রশ্ন করিল— "খোকা—খোকা!"

নীচু গলায় করুণা বলিল—"ঘরে ঘুমচ্ছ।"

"তবে যে অরুণ গিয়ে—"

"তাকে আবার বাড়ী ঢুকতে দিছলে? সে—"

"সেও বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছে?"

"করে নি, চেষ্টা করেছিল।"

"এত মাস একলা রয়েছ, চিঠি দাও নি কেন?"

"একখান!—দিনের পর দিন যে দিয়েছি!"

"এঁ্যা! চিঠিও লুকিয়েছে!"—

কুমুদ মেজে হইতে করুণাকে হাত ধরিয়া তুলিতেই সন্ন্যাসীর চরণে সে মস্তক রাখিল। কুমুদের মাথাও আনত হইয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিল।

পবিত্র মিলনের রাগে সন্ন্যাসী দেখিলেন যেন তাঁহার গৈরিকখানি রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে।

মাথা তুলিয়া করুণা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কহিল— "আপনি আমার চোখ দিলেন—আমার গুরু।"

কম্পিত স্বরে কুমুদ বলিল—"আপনার ঋণ শোধ করব কি দিয়ে, বাবা?"

স্বামীজী হাসিয়া উত্তর দিলেন, "গণকারের পাঁচ পয়সা।"

উপন্যাস

প্রত্যাবর্ত্তন

কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

একবিংশ পরিচ্ছেদ

নীচের তলায় রান্নাঘরে বসিয়া মাছের ঝোলে সরিষাবাটা দিতে কেবলই ভুলিয়া যায় বলিয়া সুরমা মহারাজকে ক্রুদ্ধকণ্ঠে ভৎ'সনা করিতেছিল; নির্ব্বিকার পাড়ে ঠাকুর নির্ব্বাক; সে বেশী কথা কহিত না; দুএকটি কথায় জানাইয়া দিত যে, এবার রসুই খুব বড়িহাই বনিবে। কিন্তু কার্য্যকালে সে তাহার রন্ধনের সনাতন রীতি অনুসারে মিরচাই ও হরদির শ্রাদ্ধ করিতে এতটুকু গাফেলি করিত না। কালীতারা ঠাকুরাণী এই পাচকটীকে কেবল সুরমার আমিষ রন্ধনের জন্যই নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তাঁর নিজের কোনই প্রয়োজন ছিল না। তাহার কাজ কর্ম্মের হেফাজত সুরমাকেই করিতে হইত। তাহার অনবরত ত্রুটীর নিমিত্ত সুরমার নিকট হইতে যখন তখন ধমক খাইত; প্রত্যহই তাহার ডিস্মিসের পরওয়ানা বাহির হইত; কিন্তু মহারাজের চিত্ত-বৈক্লব্যের কোন লক্ষণই পরিলক্ষিত হইত না। জলন্ত উনানে জল ঢালার ন্যায় সুরমাকে রোষাগ্নি অনেক সময়ে হাসির ফোয়ারায় নিবাইতে হইতে।

কালীতারা ব্যস্তসমস্ত হইয়া বাটীতে ঢুকিলেন; তাঁহাকে দেখিয়াই সুরমা কহিল, 'আচ্ছা এক আপদ জুটিয়েছ পিসীমা, এই নিরেট ছাতুখোরের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা গেল; বল্লুম ত একটু মাছের হাঙ্গামা, তা আমি নিজেই সেরে নিতে পারব এখন; তা তুমি কিছুতেই শুন্‌লে না, বল্‌লে কি না আগুণ তাতে রং ময়লা হয়ে যাবে; আহা কি কুসুম ফুলের রংই পেয়েছ!—আর এ গয়ার পাপ যেন গয়াসুরের মতন জমি নিয়েচে; নিজে ত নড়বেই না, তাড়ালেও যাবে না।'

কালীতারা ঠাকুরাণীর মনটা আজ খুবই প্রফুল্ল! তাহার মনের ভাব অনেকটা লঘু হইয়া গিয়াছে; তিনি হাসিয়া পুলকিতকণ্ঠে কহিলেন,—'হাতী কি নিজের চোখে তাহার কান দেখতে পায় লো; তা তুই তেমনি চাঁপার কলি, কি কুসুম ফুল, কি টুক্‌টুকে গোলাপ, তা জান্‌বি কি কোরে; নিজের রং নিজেও ঠিক বোঝা যায় না, আর আরসীতেও তেমন ফোটে না,'—সুরমা উত্যক্তকণ্ঠে বাধা দিয়া কহিল, 'থাম থাম পিসীমা আর রূপের ব্যাখ্যানায় কাজ নেই, এখন যাতে 'মুস্কিল আসান' হয় তারি উপায় করো, এ আপদকে নিয়ে আর ত বাঁচি নে।" পিসীমা তেমনি সরল-স্নিগ্ধ-কণ্ঠে কহিলেন 'মাসের আর কটা দিন বই ত নয়। এই কটা দিন একটু ক্ষেমাঘেন্না করে চালিয়ে নে, তার পর,—' সুরমা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল; 'তার পর গুরুঠাকুর যাবেন কোন্ চুলোয়?' পিসীমাও ক্ষিপ্রকণ্ঠে কহিলেন, 'যেখানে ওর দু'চোখ যায়, যেখানে খুসী। আমরা বড় জোর ও মাসের দোসরা, নয় তেসরা দেশে রওনা হচ্চি।' কালীতারার কথায় সুরমা চমকিয়া উঠিল। এরি মধ্যে তাঁহার মতিগতি

পরিবর্ত্তন হইল কিরূপে! এত শীঘ্র সে দেশে ফিরিবে কিরূপে? পিতামাতা তাহার স্বেচ্ছাচারিতায় বিরক্ত ও ক্ষুণ্ণ হইয়া তাহাকে কোন পত্র লেখেন নাই। সে উপেক্ষা তাহার অভিমান-ক্ষুব্ধ-হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন হইয়াই ছিল। পিসীমার নিকটেও মনোভাব প্রকাশ করে নাই। এ বিষয়ে সে দৃঢ় সতর্ক ছিল। পিসী তাহার একান্তই পরমাত্মীয়া; কিন্তু আত্মজনের উপেক্ষায় দুর্ব্বল হৃদয়ের ক্ষোভ প্রকাশ করিবার পাত্রী সে ছিল না। শ্বশুরালয়ের নিমিত্ত তাহার মনের অবস্থারও পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল, সে সম্বন্ধেও সে পিসীর নিকট অতি সাবধান ছিল। দৈব-বিপাকে সে এমন পথে আসিয়া পড়িয়াছে—যাহার দুইটা দিকই বন্ধ। মধ্য হইতে যদি একটী সরু গলি-পথ বাহির হইয়া যায় ত সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে।

স্বরমা—তোমার মুখখানা এত হাসি হাসি কেন?

পিসীমার আনন্দের আতিশয্য ও সত্বর স্বদেশ প্রত্যাগমনের সুতীব্র আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া সে প্রকৃতই বিস্মিত হইল। ইহার পূর্ব্বে দেশে ফিরিবার কথা একদিনও উঠে নাই। এ আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ কিছুতেই তাহার মাথায় আসিল না। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া, স্থির প্রোজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ বিস্ময়ের স্বরে কহিল, 'সে কি পিসীমা! এই ত সেদিন এসেচি, এরি মধ্যে তোমার মত বদলে গেল কি কোরে? তোমার কাশী বৃন্দাবন মথুরা যাবার মতলব ঘুরে গেল কিসে? ব্যাপারটা কি, কেন ফিরতে চাও শুনি?' পিসীঠাকুরাণীর আজ স্ফূর্ত্তির সীমা নাই; বাস্তবিক মনের হর্ষোচ্ছ্বাস তিনি কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না। হরিহরনাথের সহিত কথোপকথন ও সাক্ষাতের ফলে তাঁহার এই পুলক-প্রবাহ উচ্ছ্বসিত।

সুরমা পিসীর এই আকস্মিক প্রফুল্লতা দেখিয়া কহিল, 'তোমার মুখখানা এত হাসি হাসি কেন

—সারা গায়ে আনন্দ যেন উছলে পড়ছে,—আসল ব্যাপারটি কি খুলে বল দেখি ? এত হাসি খুসী মেখে কোত্থেকে এলে ? সাপের পাঁচ পা, কি ডুমুরের ফুল আস্তে আস্তে হঠাৎ দেখে ফেল নি ত ?”

পিসীমা একটু বিরক্তির স্বরে কহিলেন, ‘থাম বাপু, একটু থাম, সব কথাতেই আর বাচালপনা করিস নি।’

সুরমা পিসীমার ভাব দেখিয়া চুপ করিয়া রহিল।

পিসীমা মনে মনে খুসী হইলেন আর কোন কথা বলিলেন না। তাঁহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সুরমা পুনরায় কহিল, ‘বল এইবার শুনি ?’ পিসীমা তখন বেশ শান্ত হইয়া ধীর স্বরে কহিলেন, “বুঝলি সুরমা, বাবা বৈদ্যনাথের কৃপায় আমার অনেক দিনের আশা আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার হারান ছেলে আবার আমার কোলে ফিরে এসেছে। বুঝি এতদিনে ভগবান তার পানে মুখ তুলে চাইলেন।”

সুরমা উৎকণ্ঠিতচিত্তে সোৎসুকদৃষ্টিতে পিসীর চোখের উপরে চোখ রাখিয়া কহিল, “তুমি কি বলছ পিসীমা ! আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না, কে ফিরে এল ? কার কথা বলছ ?” পিসীমা উচ্চ কণ্ঠে উত্তর দিলেন—‘তোর নন্দায়ের কথা ; যে হরিহরনাথ অনেককাল বিবাগী হয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেছল, আজ মন্দিরে তার দেখা পেয়েছি, তাকে নিয়েই ত আমরা শিগ্‌গীর দেশে যাব।’

সুরমা শিহরিয়া উঠিল ; ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বিষম বিস্ময়-জড়িত-স্বরে শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিল,—‘অ্যাঁ ! কি বলছ পিসীমা !’ সুরমা আবার নীরব হইয়া গেল ; কি যেন একটা অজানা উল্লাস-আতঙ্কের ভাব-স্রোত তার শিরায় উপশিরায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। মনোরমার বিরহ-বিধুর সকাতর অব্যক্ত ক্রন্দন সে বহুদিন ধরিয়াই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছে ; সেই মহা-নৈরাশ্যের ঘনীভূত অন্ধকারে এতদিনের পর যে আশার রশ্মি-সম্পাতের উপক্রম হইয়াছে ইহা ভাবিয়া তাহার নিজের বিড়ম্বনা-মথিত হৃদয়ে তুমুল কল-কল্লোল উত্থিত হইল ! সুরমা নিতান্ত করুণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন করে তাঁর সঙ্গে দেখা হ’ল পিসীমা ? তুমি কেমন করে তাঁকে চিন্‌তে পারলে ? বড় ঠাকুরঝি এতকাল আমাদের বাড়ীতে ছিল তবুও একদিনের জন্যে তাঁর কথা তার কাছে মুখ ফুটে বলতে পারি নি। আমায় তাঁর কাছে নিয়ে চল পিসীমা, নিয়ে চল, একবার দূর থেকে দেখে আসি—সেই এক লোক দেখে ছিলুম !” সুরমার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল।

ভ্রাতুষ্পুত্রীর এই অচিন্তনীয় কমনীয়তায় কালী-তারা বিস্মিত হইলেন। হরিহরনাথের প্রতি এত খানি অকৃত্রিম অকপট শ্রদ্ধা ও প্রীতি যে তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলে নিহিত ছিল, ইহা ত তাঁহার স্বপ্নের অগোচর ! ইহা কি বর্ত্তমান ঘটনাসমূহের সুকঠোর প্রতিঘাতে চিত্তের সাময়িক পরিবর্ত্তন ! না, তাহা নহে ! ইহা প্রকৃতই গুণমুগ্ধ হৃদয়ের স্বাভাবিক স্বতঃ-নিঃসৃত ভাবের উচ্ছ্বাস-প্রবাহ ! তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রীর মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন যে, প্রভাতের পদ্মপত্রে সঞ্চিত শিশিরবিন্দুর ন্যায় উজ্জ্বল অশ্রুকণা টলমল করিতেছে ! উদ্বেগ-মথিত জিজ্ঞাসু-নেত্র উৎসুক-ব্যাকুল-দৃষ্টিতে তাঁহার উত্তর প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিয়াছে। তিনি ধীরকণ্ঠে একে একে হরিহরনাথের সহিত সাক্ষাতের বিষয় আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। সুরমা যেন নিদাঘ মরুর পিপাসাদীর্ণকণ্ঠে তাঁহার কথাগুলি বারিকণাবৎ শোষণ করিয়া ফেলিতে লাগিল। কালীতারার কথা শেষ হইলে, সুরমা শুষ্কজড়িত

কণ্ঠে, অর্দ্ধোচ্চারিত বিহ্বল-স্বরে কেবলমাত্র কহিল, 'কবে যাবে পিসীমা!'

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

কার্ত্তিক মাস। বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। বাঙ্গালার ছায়াঘেরা পল্লীগ্রামে শীত অগ্রেই অনুভূত হয়। গ্রামের অধিবাসীরা দিবসের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অপরাহ্ণে বিশ্রাম উপভোগ করিতেছে। বৃদ্ধের দল চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তাস, দাবা প্রভৃতি ক্রীড়ায় নিমগ্ন। থাকিয়া থাকিয়া আম্রোদ্যানে কোকিলের মধুর কূজন শ্রুত হইতেছে।

মনোরমা তাহার গৃহের সম্মুখে দরদালানে চুল এলাইয়া আঁচলখানি বিছাইয়া তাহার উপর শুইয়া আছে। নলিন স্কুলে গিয়াছে, এখনি আসিবে। হঠাৎ 'মা' 'মা' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া নলিন বাটীতে প্রবেশ করিল। তাহার এই অত্যধিক ব্যস্ততায় মনোরমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে নলিন, অমন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলি কেন রে?" নলিন আর আবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিল না; এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল "মা, স্কুল থেকে আসছিলুম, ও বাড়ীর ঠাকুরমা আমাকে ডেকে বল্লেন, ওরে নলিন তোর গিরিন কাকা চিঠি লিখেছে যে, দু' এক দিনের মধ্যে বাড়ী ফিরবে। তোর এক ঠাকুমা, মামী আর তোর বাবাও সেই সঙ্গে আসবে। আমি নিজেই গিয়ে খবরটা তোর মাকে দিয়ে আসতুম, কিন্তু জানিস্ ত বাবা বুড়োমানুষ এক পা নড়তে পারি নি। দেখিস্ যেন বলতে ভুলিস্ নি। তাই আমি দৌড়ে আসছি।"

মনোরমা স্বামীর সংবাদ পূর্ব্বে পিত্রালয়েই গিরীন্দ্রের পত্র হইতে পাইয়াছিল। কিন্তু তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইতেছেন—এই সংবাদে আত্মহারা ও নির্ব্বাক হইয়া গেল।

যে হৃদয়-দেবতার ধ্যানে সে এত কাল তন্ময় হইয়া নিমগ্ন রহিয়াছে, তিনি যে সহসা মূর্ত্ত-জাগ্রৎ হইয়া দেখা দিবেন, এ যে কল্পনারও অতীত। মনোরমার এই ভাব-বৈপরীত্য লক্ষ্য করিয়া নলিন কহিল, "মা, বাবা যখন বাড়ীতে ফিরছেন, তখন তুমি অমন চুপ করে রইলে কেন?" হায় রে অবোধ বালক! কি যে প্রলয়ঙ্করী ঝঞ্ঝা তুই তোর জননীর বুকের মধ্যে একটি কথায় ছুটিয়ে দিলি আর তোর জননীর তাহার বেগ সহ্য করিবার শক্তি কতখানি তা যদি তোর বুঝিবার সাধ্য থাকিত, তাহা হইলে ওরূপ কথা কখনই তোর মুখ হইতে বাহির হইত না। প্রাণের অবিশ্রান্ত-বাহিনী চিন্তা-তরঙ্গিণী কি প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে তোর জননীর বক্ষের মধ্যে উথলিয়া উঠিয়াছে তাহার বেগ ধারণ করিয়া রাখিতে যে কি মহাশক্তির প্রয়োজন, তা তুই তোর অতটুকু ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা বুঝিবি কিরূপে?

বহুকষ্টে আত্মদমন করিয়া মনোরমা অর্দ্ধরুদ্ধ স্বরে কহিল,—"বাপ আমার, যাঁর কথা আমি তোকে কোন দিন ভাল করে বলতে পারি নি, যাঁর কথা তোর মুখে শুনলে আমার বুকটা চৌচির হয়ে যেত, যিনি এত কাল তোকে ছেড়ে, তোকে ভুলে, তোর মায়া ত্যাগ করে বিবাগী হয়ে আছেন, তাঁর কথা আমি কেমন ক'রে তোকে বুঝাতে পারব বাবা! আজ লক্ষ্মীনারায়ণের ইচ্ছায় তিনি নিজেই তোকে দেখতে আসছেন—তোকে যে না দেখে তিনি কেমন করে এতকাল স্থির হয়ে থাকতে পেরেছেন, এ সব কথা মনে করতেই আমার জিভ জড়িয়ে আসছে! আমি তোর কথার জবাব কি দেব! তোর মুখেই তাঁর আসার কথা শুনে আমার

যেন লক্ষ-জন্মের ক্ষুধিত তৃষিত আশা ফণা ধরে জেগে উঠল! আমি যে কোন কথা বল্‌বার ভাষাই খুঁজে পাচ্চিনে।" নলিন জননীকে কাতরা দেখিয়া অশ্রুরোধ করিতে পারিল না। আকুলকণ্ঠে কহিল, "মা! তুমি স্থির হও! তোমার মনের ব্যথা আমি অনেক দিন থেকে বুঝেছিলুম বলে তোমায় আর বাবার কথা জিজ্ঞাসা করতে ভরসা করতুম না।"

নলিনের এই ব্যথা-ভরাক্রান্ত কাতরোক্তিতে মনোরমা আরও অধীরা হইয়া উঠিল। এই স্বামি-পরিত্যক্তা বিরহিণী নারী-হৃদয়ের যাবতীয় কমনীয়তায় অভিমান উত্তেজনা কাহাকে বলে জানিত না, চিরব্যথাতুরা নিঃসঙ্গ জীবন নীরবে একান্তে বহন করিয়া আসিতেছিল। পৃথিবীর কোন সুখৈশ্বর্য্যের প্রতি কখনও নেত্রপাত করে নাই। নিস্পৃহতার চির-নির্জ্জন নিলয়ে মাতৃ-স্নেহভরা ব্যাকুল হৃদয়ে তাহার একমাত্র অঞ্চলের নিধি শিশু-পুত্রটিকে পক্ষপুটসমাবৃত বিহঙ্গ-শাবকের ন্যায় বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তাহারই মঙ্গলের নিমিত্ত আকুল স্বরে দেবতার দ্বারে কতই কাতর প্রার্থনা করিয়াছিল। জন্মশোধ একবার স্বামীর অঙ্কে পুত্রকে তুলিয়া দিয়া, সে সেই অপূর্ব্ব প্রাণস্পর্শী দৃশ্য নির্নিমেষচক্ষে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইবে, সেই করাল তৃষ্ণাজড়িত প্রতীক্ষায় এই দুর্ব্বহ বেদনা-লুণ্ঠিত জীবন-ভার অমিত ধৈর্য্যে বহন করিয়া আসিয়াছে; দেবতার পাষাণ-বধির কর্ণকুহরে এতদিন সেই অন্তরের প্রার্থনা পৌঁছিয়াছে। দেবতা মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, তাই অকস্মাৎ-উদ্ভূত বিস্ময়ের আতিশয্যে দুঃখিনী মনোরমা একেবারে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। সে আত্মহারা হইয়া ধরা গলায় কহিল, "তোকে না দেখে কি তিনি তার কোথাও থাকতে পারেন? আমি এতদিন সাহস ক'রে মুখটি ফুটে বলতে পারি নি বাবা, কিন্তু মনে মনে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তোকে তাঁর কোলে একদিন তুলে দিয়ে যেতে পারব। তা না হ'লে যে মরণেও শান্তি লাভ করতে পারব না। বাবা, বুকের রক্ত জল করে অর্দ্ধাহারে অনশনে যে তাঁকে আমি দিবারাত্র ডেকেছি। দারুণ দুর্ভাবনা প্রচণ্ড নদীর ভাঙ্গন-ধরা পাষাণতটের মত হৃদ-পিণ্ড দু'খান করে ফেলেছে। তিনি পায়ের লোহার বেড়ী ভেঙ্গে খান-খান ক'রে ফেল্‌তে পারেন তা আমি বেশ ভাল করেই জানি, কিন্তু প্রাণের নাড়ী মানুষ হয়ে ছিঁড়ে ফেল্‌তে পারেন কি?" মনোরমার স্বরবদ্ধ হইয়া আসিল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "কোন্‌ দিন আসবেন তা কি তোর গিরীন কাকা লিখেছে?"

নলিন বলিল, "তা ঠিক করে লেখেন নি কিন্তু ঠাকুমা বললেন যে, দু'এক দিনের মধ্যেই।"

মনোরমার বক্ষ আবার সংশয়ে শঙ্কায় দুলিয়া উঠিল।

হেমন্ত-সায়াহ্নের রক্তিম রবি পশ্চিম-দিগন্তে মুখ লুকাইয়াছে। শুক্লা-ত্রয়োদশীর স্বচ্ছ নীলিমায় রৌপ্য-শঙ্খ-শুভ্র সমুজ্জ্বল চন্দ্র ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে। গ্রাম্য দেবতার আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি ক্রমে ক্রমে নৈশাকাশে মিশাইয়া যাইতেছে।

মনোরমা একাকিনী তাহার নিভৃত-কক্ষে বসিয়া আছে। নলিন তাহার পাঠগৃহে পাঠাভ্যাসে নিরত। এমন সময়ে একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া তাহাদের বাটীর অনতিদূরে দাঁড়াইল। নলিন গবাক্ষ হইতে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিল, গাড়ী হইতে দুইজন পুরুষ ও দুইটি স্ত্রীলোক অবতরণ করিলেন। গাড়ীর চালে ট্রাঙ্ক, বিছানা, ব্যাগ প্রভৃতি কতকগুলি মোটঘাট রহিয়াছে। অবতরণ-কারীদিগের মধ্যে একজন লণ্ঠন-হস্তে অগ্রবর্ত্তী

হইয়া তাহাদের বাটীর অভিমুখে আসিতেছে। লণ্ঠন-ধারী আগন্তুক তাহাদেরই দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং তৎসঙ্গে আগত একটি অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা যুবতী অগ্রে বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়া করুণকণ্ঠে ডাকিল, "নলিন—নলিন কোথায় আছিস্ রে, একবার শীগ্‌গির বাহিরে আয়।" নলিন তৎপূর্ব্বেই ঘরের বাহির হইয়াছিল; যুবতীর আহ্বানে শশব্যস্ত হইয়া নিকটে আসিয়া তাহার মুখ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল; তাহার মুখ দিয়া বাক্য-নিঃসরণ হইল না। পরে বিস্ময়ের ঘোর কাটিতেই প্রণাম করিয়া তাহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া কহিল, "এ কি! মামীমা যে, এস এস, আসবার কথা জানতুম, তবে এখুনি এসে পড়্‌বে সে কথা ভাবি নি। এস এস, যাই মাকে গিয়ে বলি গে।" যুবতী ক্ষিপ্রকণ্ঠে কহিল, "আর খবর দিতে হবে না, চল্ আমিই যাচ্চি।"

ইতিমধ্যে হরিহরনাথ গিরীনকে দ্রব্যাদি লইয়া তাহার বাটীতে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া কালীতারাকে কহিলেন, "মা, আমি এখন গিরীনের ওখানে গিয়ে বসি, আপনি গিয়ে ওদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে নিন্; আমার হঠাৎ উপস্থিত হওয়াটা ঠিক নয়; আপনি আগে যান।" এই কথা বলিয়াই হরিহরনাথ অন্তরাল হইতে নলিনের দিকে চকিত বিদ্যুৎ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মুখ ফিরাইলেন; তাঁহার সমগ্র দেহ বাত্যাহত বনস্পতির ন্যায় কাঁপিয়া উঠিল। সমাহিত হইয়া তিনি সরিয়া গেলেন।

সুরমা মনোরমার সম্মুখে উপস্থিত হইতেই সে অধীরকণ্ঠে কহিল, "এস এস বৌ, এস এস—কতদিন হ'ল তোমায় দেখি নি, সেই বাপের বাড়ী গেলে, তার পর থেকেই আর উদ্দেশ নেই।" পরক্ষণেই চক্ষু পালটিতে কালীতারাকে দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া অস্থির ব্যগ্র-স্বরে কহিল, "এই যে' মা এসেছেন, আপনাদের আসবার কথা আজই নলিনের মুখে বৈকালে শুনিছি—মা আমাকে মনে করে যে এখানে এসেছেন, তা ভেবেই আমি স্থির হ'তে পাচ্ছিনি—বসুন—আমি পা ধোবার জলটল এনে দিই।"

কালীতারা সজলনয়নে মমতা-মাখা কণ্ঠে কহিলেন, "ঘরে ফিরে এসে ঘরের লক্ষ্মীকে আপনার ঘরে দেখ্‌ব, এই আশাতেই বুক বেঁধে এতটা পথ এসেছি মা! তা নারায়ণ মনোবাঞ্ছা ভাল করেই পূর্ণ করেছেন। আমাদের জন্যে তোমার ব্যস্ত হবার দরকার নেই, আমরা নিজেই সব ঠিকঠাক্ করে নিচ্ছি, এ কি আমার পরের ঘর মা!"

সুরমা কহিল, "ঠাকুরঝি তুমি যে এখানে চলে এসেছ, এ কথা আমরা বৈদ্যনাথেই শুনেছিলুম; পিসীমার যে কি দুঃখ তোমাদের জন্যে তার আর কি বল্‌ব? যে দিন তোমার গিরীন ঠাকুরপোর সন্ধান সেখানে পেলেন, সেই দিন থেকেই দেশে ফেরবার জন্যে পাগল হয়ে গেলেন। আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন যাবার কথা ছিল, আর তাঁকে নে যায় কে? এখানে না এসে কিছুতেই থাক্‌তে পারলেন না।" মুগ্ধা মনোরমা সুরমার কথা শুনিয়া ভাবিল, এই কি তাহার সেই ভ্রাতৃবধূ—মুখরা অভিমানিনী সুরমা? সংশয়াকুল বিস্ময়ে সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া ধীরস্বরে কহিল, "বৌ গিরীন ঠাকুরপো কোথায় গেলেন, কে তোমাদের নিয়ে এল?"

সুরমা কহিল, "হ্যাঁ তাঁর সঙ্গেই এসেছি। তিনি বাড়ীতে জিনিস-পত্তর রাখ্‌তে গেছেন—এখুনই বোধ হয় আস্‌বেন।"

মনোরমা নলিনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "নলিন তুই ঠাকুরমাকে প্রণাম কর্‌লি নে?"

নলিন থতমত খাইয়া তখনি কালীতারাকে

প্রণাম করিয়া কহিল, "মা, ওঁকে ত আমি কখন দেখি নি, তাই চিন্‌তে পারি নি,—আমি—"

কালীতারা বাধা দিয়া কহিলেন, "তা কেমন করে জানবে দাদা আমার, সেই এক বছরের সোনার পুতুলটিকে দেখেছিলুম; মামার বাড়ীতে গিয়ে একরত্তি বেড়েছ, সেই থেকে ত আর দেশে আসি নি ভাই; চিন্‌বে কেমন করে!" কালীতারা অজস্র আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ক্রমে তাঁহাদের পরস্পরে আরও নানা কথা হইল। কিন্তু কথা প্রসঙ্গে কি সুরমা, কি কালীতারা কাহারও দ্বারা হরিহরনাথের আগমন-সংবাদ উল্লিখিত হইল না। মনোরমাও অন্তরের উত্তাল তরঙ্গোচ্ছ্বাস চাপিয়া সে কথা কিছুতেই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। বর্ষাবারি-প্রহত নদীতটের ন্যায় তাহার হৃদয় পরতে পরতে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। নলিন যদিও দুইজন পুরুষকে গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়াছিল, তন্মধ্যে একজনকে 'গিরীন' বলিয়া উল্লিখিত হইতে শুনিয়াছিল; অপরটি যে কে, এই চিন্তা তাহার মনের মধ্যে তুমুল ঝটিকা সমুত্থিত করিলেও সেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া নির্ব্বাক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। অন্যতম প্রশান্ত উজ্জ্বল মূর্ত্তি তাহার মানস-পটে এমনি একটি গাঢ় ছাপ মারিয়া দিয়াছে যে, পাঠ-গৃহে আসিয়া সে কোনমতেই পাঠে মনোনিবেশ করিতে পারিল না। যতই মন দিতে চেষ্টা করে, ততই দীর্ঘাকৃতি সৌম্যদর্শন ব্যক্তিটি কি তাহার পিতা, এই প্রশ্নই নিরন্তর উত্থিত হইয়া তাহার হৃদয়-দ্বারে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল। সরল বালক এ কথা জিজ্ঞাসা করিবে কাহাকে?

নিস্তব্ধ নিশীথ; বিক্ষিপ্ত-চিত্ত পিতৃচিন্তা-নিরত কিশোর বালক এই অভিনব ঘটনার অভিঘাতে বিহ্বল আচ্ছন্নের মত আবেগ-উদ্বেলিত হৃদয়ে গবাক্ষ-পথে চাহিয়া বসিয়া আছে। জ্যোৎস্নালোকে তরুলতা রজত-শ্রী ধারণ করিয়া হাসিতেছে। পাপিয়া থাকিয়া থাকিয়া ফুকারিয়া নৈশ-নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল। জানালার ধারে কয়টি চম্পক-বৃক্ষের চম্পকরাজির গন্ধে গৃহ ভরপুর। সহসা ভেজান কবাট ঠেলিয়া গিরীন্দ্র ডাকিল, "নলিন!" নলিন বিস্ময়-জড়িত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?"

"আমি তোমার গিরীন কাকা. তুমি যখন খুব ছোট, তখন আমি তোমাকে কত কোলে পিঠে করেছি! তোমার মার কাছে আমার নাম শুনে থাকবে?"

নলিন তৎক্ষণাৎ তক্তাপোষ হইতে নামিয়া গিরীনকে প্রণাম করিল। ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল, "আপনার কথা মার মুখে আমি অনেকবার শুনেছি কাকা, আসুন—বসুন।"

গিরীন কহিল, "আমাদের আসবার কথা তোমার ঠাকুমার মুখে আগেই শুনে থাকবে।"

নলিন উৎকণ্ঠাকুল স্বরে কহিল, "হ্যাঁ কাকা আজ বিকেলেই শুনেছি।" ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া স্থির দৃষ্টিতে গিরীনের মুখের পানে চাহিয়া সংশয়ে ভয়ে কম্পিত হইয়া অর্দ্ধরুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কাকা! বাবারও ত আপনাদের সঙ্গে আস্‌বার কথা ছিল, তিনি?"—"এই যে বাবা আমি"—বলিয়া হরিহরনাথ চকিতে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দীর্ঘ-ভুজ প্রসারিত করিয়া একেবারে পুত্রকে জড়াইয়া ধরিয়া বক্ষে তুলিয়া লইলেন। অপলকনেত্রে তাহার মুখের পানে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া ঘন ঘন মুখ-চুম্বনে তাঁহার প্রাণের চির-জলন্ত তৃষা মিটাইতে লাগিলেন। এ যে যুগ-যুগান্তরের তীব্র বিশুষ্ক-মরুভূর আকাঙ্ক্ষা-জড়িত মর্ম্মচ্ছেদী তৃষা! এ কি এত সহজে নিবৃত্ত হয়? পুত্রালিঙ্গন-লুব্ধ চির-

বুভুক্ষু বক্ষ একমাত্র সন্তানকে বাহু-নাগপাশে সহস্র উদ্দাম-বেষ্টনে জড়াইয়া ধরিয়াছে। চুম্বন-লোলুপ চির-তৃষাতুর অধর পুত্রের কুসুম-পেলব অধরোষ্ঠ স্নেহার্ত্ত চুম্বনে ভরিয়া দিতেছে। পুত্রমুখ-দর্শনোৎসুক চিরজাগ্রৎ নয়ন একান্ত দৃষ্টিতে সেই মুখ মুহুর্মুহু দেখিয়াও পলক ফিরাইতে পারিতেছে না। অগ্নি-জ্বালাপীড়িত দীর্ঘসন্তপ্ত হৃদয় সেই ক্ষুদ্র বুকে বক্ষ মিলাইয়াও পার্থক্যের বিরাট ব্যবধান বিস্মৃত হইতেছে না। নলিন স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় অভিভূত হইয়া পিতৃবক্ষে স্তব্ধ, মৌন, স্থির, নিশ্চল হইয়া রহিল। গিরীন্দ্র গৃহপ্রান্তে দাঁড়াইয়া এই স্বর্গদৃশ্যে স্তম্ভিত ও বিমোহিত হইয়া গেল।

যে জন্ম-জন্মান্তরের উৎকট বাসনা অতৃপ্ত ও অপূর্ণ রাখিয়া হরিহরনাথ গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন, আজ ঐশ্বরিক বিধানে তাঁহার সে বাসনা চরিতার্থ হইল। তীব্রতৃষা মনোবলে চাপিয়া তিনি যে ভিন্ন পথাবলম্বী হইয়াছিলেন সেই প্রচ্ছন্ন দলিত বাসনা অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া তাঁহাকে তাঁহার উপযোগী গন্তব্য-পথে ফিরাইয়া দিল। অনিবৃত্ত উদগ্র কামনাকে প্রাণপণ শক্তিতে দূরে ঠেলিয়া দিয়া, তিনি যে প্রতিকূল স্রোতে অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা যে ঠিক নহে, তাহা সে আজ বাসুকীর ন্যায় সহস্র ফণা তুলিয়া বেশ স্পষ্ট করিয়াই বুঝাইয়া দিল। [ক্রমশঃ]
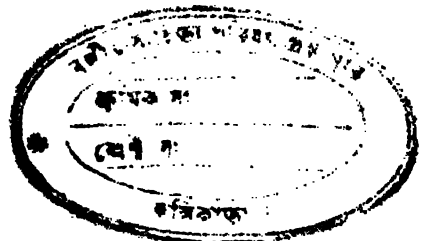
আলোয়ারের রাজ-হস্তী

গল্প

কলঙ্ক-মোচন
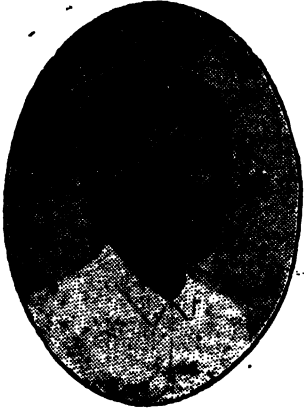
শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ, এম-এ,

১

গ্রামের বহির্ভাগে নির্জ্জন প্রান্তরে একটি মন্দির। মন্দিরের অভ্যন্তরে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রী৺মুক্তকেশী মাতা বিরাজমানা। প্রত্যহ গ্রাম হইতে পুরোহিত আসিয়া দেবীর পূজা করেন।

একদিন পুরোহিত মহাশয় পূজা করিতে আসিয়া দেখিলেন, মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে অন্যূন ৫০ জন নীচজাতীয় স্ত্রী ও পুরুষ বসিয়া কলরব করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি সাঁওতাল ও কতকগুলি বাউড়ীজাতীয়। তাহাদের সকলেরই মুখে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার ভাব লক্ষিত হইতেছিল। পুরোহিত মহাশয় অনেক দিন দেবীর পূজা করিতেছেন, কিন্তু পূর্ব্বে কখনও মন্দিরের নিকট এ জাতীয় লোকসমাবেশ দেখেন নাই। সেইজন্য প্রথমে তিনি একটু বিস্মিত ও ভীত হইলেন। পরে সাহস সঞ্চয় করিয়া ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন; "তোমরা কোথাকার? কি চাও?" তৎক্ষণাৎ জনতা নিস্তব্ধ হইল এবং জনতার মধ্য হইতে একজন বাউড়ী-জাতীয়া যুবতী রমণী কট্‌ মট্‌ করিয়া চাহিতে চাহিতে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার রক্তবর্ণ ভাঁটার মত চোখ দুইটা যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া পড়িতেছিল। রমণী মন্দিরের দ্বারে বার কয়েক দুম্‌ দুম্‌ করিয়া মাথা ঠুকিয়া পুরোহিতের দিকে বিস্ফারিত-নয়নে চাহিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল, "ঠাকুর, আমি বাউড়ীর মেয়ে, আমার নাম মোহিনী। এখান থেকে আধক্রোশ দূরে ঐ যে বন দেখতে পাচ্ছ, ঐ বনের ধারে আমাদের ঘর। আমার পরম শত্রু আমার প্রতিবেশী ঐ হীরালাল; ও বিনাদোষে ফুকন সাঁওতালের সঙ্গে আমার অপবাদ দিয়েছে। জান ত ঠাকুর, মেয়ে মানুষের সুনাম কত সহজেই নষ্ট হয়। ওর কথায় বিশ্বাস করে আমার জাতভাইরা আমাকে একঘরে করেছে। ত্রিসংসারে আমার আর কেউ নেই। তাই আমি আজ এসেছি মায়ের কাছে আমার দুঃখ জানাতে। দেখি মা এর বিচার করেন কি না।" এই বলিয়া রমণী আরও জোরে জোরে হাঁপাইতে লাগিল এবং চোখ কপালে তুলিয়া দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইতে লাগিল।

পুরোহিতের বড় কৌতূহল হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা কি করে' এর বিচার করবেন, মোহিনী?"

মোহিনী বলিল, "কেন ঠাকুর, তুমি বেশ ভাল করে' ভক্তি করে' মায়ের পায়ে জবা-বেলপাত চাপাও, তার পর সেই জবা বেলপাত আর মায়ের স্নানজল আমার হাতে আর ঐ দুষমন হীরালালের হাতে দাও, আমরা দুজনেই মায়ের নামে শপথ করে ফুল আর স্নানজল নিই। যদি আমি অসতী হই, তা' হ'লে ঠিক তিন দিনের মধ্যে আমার ওলাউঠা হ'বে, আর যদি আমি সতী হই, তা হলে তিন

দিনের মধ্যে হীরালালের মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে। এ যদি না হয়, তা হলে ঠাকুর দেবতা সব মিথ্যে।"

অশিক্ষিতা অন্ত্যজজাতীয়া রমণীর সরল বিশ্বাস দেখিয়া শিক্ষিত বিপ্রকুলোদ্ভব পুরোহিত স্তম্ভিত হইলেন। এও কি কখনও সম্ভব হয়? যদি এ উপায়ে সত্য মিথ্যা নির্ণীত হইত, তাহা হইলে ত আইন-আদালতের কোনও প্রয়োজনই থাকিত না। যাহা হউক, তিনি মোহিনীকে এই ভীষণ সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে কহিলেন, "মোহিনী, আমি বলছি, তুমি ঘরে যাও। ঠাকুর দেবতার ফুল হাতে নিয়ে কি শপথ করতে আছে? তা'তে পাপ হয়। তুমি যদি নির্দ্দোষ, তা হলে দুদিন পরে লোকে তা' বুঝতে পারবে এবং মা আপনা থেকেই দোষীর দণ্ডবিধান করবেন।"

মোহিনী এই কথা শুনিয়া অধিকতর উত্তেজিত হইয়া বলিল, "না ঠাকুর আমি কোন কথা শুনব না। পাপপুণ্য আমি বুঝি না। আমাকে যদি চোর বলত, বা আর কোন অপবাদ দিত, তা হলে আমি হয় ত সে অপবাদ মুখ বুজে সহ্য করতে পারতাম। কিন্তু মেয়ে মানুষের যথাসর্ব্বস্ব তার সুনাম। সেই সুনামের উপর অপবাদ আমি এক দণ্ডও সহ্য করতে পারব না। আমার জীবনের উপর এতটুকুও মায়া নেই, আমি মরিয়া হ'য়ে এসেছি। ঠাকুরের ফুল আমায় দিতেই হ'বে। না দিলে মায়ের সুমুখে তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব।"

পুরোহিত দেখিলেন, এ রমণী নিরস্ত হইবার নহে। সুতরাং তিনি যথাশক্তি মায়ের পূজা করিয়া চরণের পুষ্প ও স্নানজল আনিয়া মোহিনীর ও হীরালালের হাতে দিলেন। তাহারাও শপথ করিয়া ঐ দুইটি জিনিষ গ্রহণ করিল। পুরোহিত লক্ষ্য করিলেন, পুষ্প প্রভৃতি গ্রহণ করিবার সময় মোহিনীর হস্ত ও কণ্ঠস্বর অকম্পিত রহিল, কিন্তু হীরালালের হস্ত ও কণ্ঠস্বর দুই-ই কম্পিত হইল।

২

তিন দিন পরে। পূর্ব্বোক্ত পুরোহিত কালী-মন্দিরে পূজা করিতে আসিয়া দেখিলেন, মন্দিরের সম্মুখে লোকারণ্য; অন্যূন দেড়শত সাঁওতাল ও বাউড়ী স্ত্রী পুরুষ কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যূপকাষ্ঠের নিকটে একটি যুবক অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। নিকটে গিয়া দেখিয়াই চিনিলেন, লোকটি সেদিনের সেই হীরালাল। তাহার মুখের নিকট মাটীর উপরে রক্তের চিহ্ন। দেখিয়া যতদূর বুঝিলেন, তাহাতে মনে হইল, অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই হীরালালের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে।

জনতার দিকে চাহিয়া পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি বল দেখি?"

একজন বৃদ্ধ কাঁদিতে কাঁদিতে অগ্রসর হইয়া বলিল, "কি আর বলব বাবাঠাকুর, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে। আমার একমাত্র ছেলে ছিল এই হীরালাল। আজ আমি নির্ব্বংশ হ'লাম। ছেলেটা বরাবরই বড় গোঁয়ার ছিল। আমি সেদিন কত ক'রে তাকে বারণ করলাম, 'ওরে, ঠাকুরের ফুল হাতে করিস্ নি। তার চেয়ে বরং মোহিনীর পায়ে ধরে' ক্ষমা চাইগে, আর বলগে, মোহিনী, যে মুখে আমি তোমায় অসতী বলেছি, সেই মুখে গোবর খাচ্ছি, তুমি আমায় ক্ষমা কর।' ছেলেটা কিন্তু কিছুতেই সে কথা শুনলে না। তাই বুদ্ধির দোষে প্রাণটা খোয়ালে।"

একটু থামিয়া বৃদ্ধ ভারী গলায় আবার বলিতে লাগিল, "কাল রাত এক প্রহরের সময় বাছা আমায় বললে, 'বাবা, আমার বুকটা কেমন করছে।' ক্রমেই বুকের যাতনা বাড়তে লাগল, ছেলে আমার

'বুক যায় বুক যায়' বলে' ছট্‌ফট্ করতে লাগল। বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কখন একটু ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না। ঘুম ভাঙ্গলে দেখি, হীরালাল ঘরে নেই। তখনও বোধ হয় এক প্রহর রাত ছিল। হীরালাল, হীরালাল বলে' চীৎকার করে' কত ডাকলাম, চারিদিকে কত খোঁজ তল্লাস করা হ'ল, কিন্তু রাতের মধ্যে হীরালালকে খুঁজে পাওয়া গেল না। একটু বেলা হ'লে একজন গিয়ে খবর দিলে, ওগো, তোমাদের হীরে কালীতলায় উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। ছুটে এসে দেখি, সব শেষ হয়ে গেছে। ওরে, তোর বুড়ো বাবাকে ফেলে রেখে কোথায় গেলিরে"—বলিয়া বৃদ্ধ আবার কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময় মোহিনী ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া হাঃ হাঃ করিয়া বিকট হাস্য করিয়া হীরালালের মৃতদেহের দিকে কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া বলিতে লাগিল, "এই যে, কে বলে মা নেই? না থাকলে এখনও চন্দ্রস্যিয্যি উঠবে কেন? মা আমার ঠিক বিচার করেছেন। দেখ বাবা, সতীকে অসতী বলার কত মজা।"

৩

পুরোহিত মহাশয় হীরালালের শোকসন্তপ্ত পিতাকে যথোচিত সান্ত্বনা দিয়া ২.৩ জন লোক সঙ্গে দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। হীরালালের আরও কয়েকজন আত্মীয় তাহার মৃতদেহ উঠাইয়া লইয়া সৎকার করিতে গেল। এদিকে ফুকন সাঁওতালও নিরপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তাহার জাতভাই সকলে আনন্দে তাহাকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া গেল।

মোহিনীর অসাধারণ সতীতেজ এবং অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী পুরোহিত মহাশয়কে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিল। তিনি মোহিনীর জীবনের ইতিহাস জানিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহলান্বিত হইয়া মোহিনীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে মোহিনী, ব্যাপারটা খুলে বল্‌ত। হীরালাল শুধু শুধু তোর নামে অপবাদ দিতে গেল কেন?"

মোহিনী এতক্ষণে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল। সে বলিল, "আচ্ছা, তবে বলি বাবাঠাকুর, শোন।" মোহিনী বলিতে লাগিল :—

"হীরালালের বাড়ী আমাদের পাড়াতেই। সে আমার চেয়ে বয়সে ২।১ বছরের বড় ছিল। ছেলেবেলায় আমাদের দু'জনের খুব ভাব ছিল,—এক সঙ্গে বেড়াতাম, এক সঙ্গে খেলা করতাম। মা'র ইচ্ছা ছিল, হীরালালের সঙ্গে আমার বিয়ে দেন। কিন্তু হীরালাল বড় গোঁয়ার বলে' বাবা মত করলেন না। আর একজনের সঙ্গে আমার বিয়ে হ'য়ে গেল। কিন্তু বিয়ের এক বছর পরেই আমি বিধবা হ'লাম। তখন আমার বয়স ১৪ বছর। আমার শ্বশুরবাড়ীতে আর কেউ ছিল না বলে' বাবা আমাকে নিয়ে এসে বাড়ীতে আশ্রয় দিলেন।

"আমি বিধবা হওয়ার পর হীরালাল আমায় নিকা করবার ইচ্ছা করলে। আমার বাপমায়ের একটু একটু মতও হ'ল। কিন্তু আমি কিছুতেই মত করলাম না। আমার মনে হ'ল, যত অল্পদিনের জন্যই হোক, যখন একজনকে মনে প্রাণে স্বামী বলে' জেনেছি, তখন আর একজনের ঘর করব কি করে? হীরালাল আমাকে কোন কথা বলতে এলে আমি ছুটে পালাতাম, সুতরাং সে আমাকে কোন কথা বলবার সুযোগ পে'ত না। তার যা' কিছু বলবার, তা' আমার মা বাপের কাছেই বলত। কিন্তু আমার মা বাপ আমায় পীড়াপীড়ি করে' ধরলেই আমি বলতাম, 'দেখ তোমরা যদি আমায় ওরকম করে' জ্বালাতন কর

তা' হ'লে হয় আমি বিষ খেয়ে মরব, না হয় দেশ-ত্যাগী হ'ব।' সুতরাং তাঁরাও নিরস্ত হ'লেন, এবং হীরালালের আশায়ও ছাই পড়ল।

"এই রকম করে' ৩৪ বছর কেটে গেল। তার পর আমার বাবা একদিন আমাদের সকলকে কাঁদিয়ে স্বর্গে চলে' গেলেন! তার তিন মাস পরে স্নেহময়ী মাও সেই পথে গেলেন। আমার চেয়ে দু'বছরের ছোট আমার একটি ভাই ছিল, সেই ভাইটিকে নিয়ে কোন রকম ক'রে সংসারে রইলাম। কিন্তু দারুণ বিধির তাও সইল না। মা যাওয়ার ঠিক এক বছর পরে তিনি ভাইটিকেও কেড়ে নিলেন। আমি একেবারে নিরাশ্রয় হ'লাম।

"ফুকন সাঁওতাল ছিল আমার ভাইএর সমবয়সী। দুজনে একসঙ্গে বেড়াত, এক সঙ্গে খেলা করত, এক সঙ্গে বনে বনে শিকার করত। দুজনে যেন হরিহর-আত্মা। আমার ভাই যেদিন মারা যায়, সেদিন ফুকনের কি কান্না! সমস্ত দিন তা'র কান্না আর থামে না। আমার ত মায়ের পেটের ভাই, কিন্তু আমিও অত কাঁদতে পারি নি। আমি যখন আছাড় খেয়ে প'ড়ে বললাম, 'আমার কি হ'বে রে ভাই ফুকন, আমার যে আর কেউ নেই, কে আমায় দেখবে?' তখন ফুকন আমায় সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'ভয় কি দিদি, আমি তোকে দেখব।' সেই থেকে ফুকন আমায় ঠিক ভাইএর মত দেখাশুনা ক'রে আসছে। ফুকনকে দেখতেও অনেকটা আমার ভাইএর মত, তাই তার উপর আমারও কেমন একটা মায়া ব'সে গেল।

"আমাকে একলা পেয়ে হীরালাল কতদিন কত রকম লোভ দেখিয়ে, কখনও বা ভয় দেখিয়ে, আমার সর্ব্বনাশ করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ফুকনের নাম ক'রে আমি সব সময়েই তা'র হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। ফুকনকে সে যমের মত ভয় করত। এক দিনের ঘটনা বলি। আমি বনে কাঠ ভাঙ্গছি, এমন সময় হঠাৎ হীরালাল কোথা থেকে টলতে টলতে এসে বললে, 'মোহিনী, অনেক দিন আমায় ঠকিয়েছিস, কিন্তু আজ আমি কিছুতেই তোকে ছাড়ছি না। দেখি, কে তোকে রক্ষা ক'রে?' এই ব'লে হীরালাল আমায় ধরতে এল। তা'র মুখে ভয়ানক তাড়ির গন্ধ বেরুচ্ছে, চোখ দুটো লাল হয়েছে, কথাগুলো বেঁকে গেছে। তা'কে দেখেই ত ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। আমি অনেক কাকুতি-মিনতি করলাম; 'হীরে, আমি তোর বোন্ হই, আমার গায়ে হাত দিস্ নি।' কিন্তু সে কোন কথা শুনলে না, আমায় ধরবার জন্যে হাত দুটো বাড়িয়ে দিলে। আমি ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠলাম—সঙ্গে সঙ্গে আমার মূর্চ্ছা হ'ল, আমি ঘুরে প'ড়ে গেলাম।

"যখন আমার জ্ঞান হ'ল, তখন দেখি ফুকন আমাকে তার কোলে শুইয়ে আমার চোখে মুখে জল দিচ্ছে, আর একটা ডাল ভেঙ্গে নিয়ে হাওয়া ক'রছে। জ্ঞান হতেই উঠে বসলাম—তখনও আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে। ফুকন বল্লে, 'দিদি, বড় ভয় পেয়েছিস্, না?' আমি বল্লাম, "হাঁ, ভাই।' ফুকন বল্লে, 'আর কোন ভয় নেই দিদি, এই দেখ্, তোর শত্রুর কি দশা করেছি।" এই ব'লে সে হীরালালের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে। দেখলাম, হীরালাল উপুড় হ'য়ে মরার মত প'ড়ে আছে, তার কাঁধে একটা তীর বেঁধা, আর সেই তীরের গা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে প'ড়ে খানিকটা মাটি ভিজে গেছে। আমি দেখে শিউরে উঠলাম। ফুকন একটু হেসে বল্লে, 'ভয় নেই দিদি, হীরে মরে নি। ইচ্ছা ক'রলে ওকে এক কাঁড়েই শেষ ক'রে দিতে পারতাম, কিন্তু তা' ক'রব না। তাই একটু জখম করেই ছেড়ে দিলাম।

ওর যদি প্রাণের মায়া থাকে, তা হ'লে ও আর তোর ত্রিসীমানায় আসবে না।'

"এতক্ষণ পরে হীরালাল কথা কইলে, বল্লে, 'একটু জল।' তৎক্ষণাৎ ফুকন কোথা থেকে জল এনে তাকে খাওয়ালে। সে একটু সুস্থ হ'লে আমরা দুজনে তাকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে গিয়ে তার বাড়ীতে রেখে এলাম। ফুকন হীরালালের বাপকে সমস্ত ব্যাপার খুলে বল্লে। বুড়া সব শুনে বল্লে, 'যেমন কর্ম্ম, তেমনই ফল! ঠিক হ'য়েছে।"

"হীরালাল তিনমাস বিছানা থেকে উঠতে পারে নি। তিন মাস পরে ফুকনের মুখেই শুনলাম, হীরালাল সেরে উঠেছে। আমরা মনে করেছিলাম, হীরালালের যথেষ্ট আক্কেল হ'য়েছে। কিন্তু তা' হয় নি। সে যখন দেখলে, ফুকন থাক্‌তে সে আমার কিছুই ক'রতে পারবে না, তখন হিংসায় জ্বলে উঠে, আমাদের দুজনেরই সর্ব্বনাশ করবার চেষ্টায় ঘুরতে লাগল। শেষে আর কিছুই ক'রতে না পেরে ফুকনের সঙ্গে আমার বদনাম রটিয়ে দিলে। আরে ছিঃ, ছিঃ, ফুকনকে যে আমি ছোট ভাইএর মত দেখি, শয়তানটা তা' বুঝতে পারলে না। ফুকন রোজই আমাদের বাড়ী আসত, আমি একলা বনে কাঠ ভাঙতে গেলে পাছে কোন বিপদে পড়ি এইজন্যে সেও আমার সঙ্গে গিয়ে আমার হ'য়ে কাঠ ভেঙ্গে দিত,—এই সব দেখে শুনে পাড়ার পাঁচ জনেরও সন্দেহ হ'ল যে, হয় ত হীরালালের কথা সত্যি। তাই তা'রা আমাকে একঘরে ক'রে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার মতলব ক'রলে। তা'র পর যা' ঘটেছে, তা' ত' আপনি নিজের চোখেই দেখলেন, বাবাঠাকুর! আমার বড় ভাগ্যি, মা জগদম্বা আমার মুখ রেখেছেন। আশীর্ব্বাদ করুন ঠাকুর, যেন এই সুনামটা নিয়ে মরতে পারি।"

এই বলিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া মোহিনী চলিয়া গেল।

সেদিন মায়ের পূজা করিয়া পুরোহিত মহাশয়ের যেরূপ তৃপ্তি হইল, সেরূপ তৃপ্তি বোধ হয় আর কখনও হয় নাই।
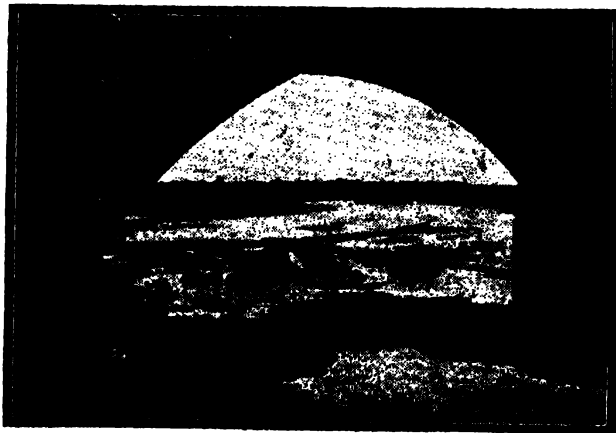
রাঁচির পথে সেতু-তলবর্ত্তী দৃশ্য

গল্প

পরাজিত

শ্রীমতী কুলবালা দেবী

প্রভাত

ঘন বনানীর শ্যামল ছায়াঞ্চলে ঢাকা একটি ছোট গ্রাম। সে গ্রামের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই প্রস্তর-শিল্পী। গৌরদাস ভাস্করের বৃহৎ শিল্প-শিক্ষালয় দেশ-বিশ্রুত। বহু শিক্ষার্থী এখানে ভাস্কর্য্য শিক্ষা করিতে আসিত। ছাত্রদের আহার এবং বাসস্থানেরও সুচারু ব্যবস্থা ছিল।

গ্রামবাসীদের অবস্থা স্বচ্ছল না হইলেও দুঃখ-দৈন্য তাহাদের ছায়া স্পর্শ করিতে পারিত না। তাহার কারণ, তাঁহাদের মোহন-মধুর কল্পনা-কাননে কলালক্ষ্মী নিরন্তর বিচরণ করিতেন। দেবীর ভক্তগণও তাঁহাদের হৃদয়-হ্রদে প্রস্ফুটিত শত শত রক্ত-কোকনদে আরাধ্যার পূজা করিয়া ষড়ৈশ্বর্য্য-ভোগের তৃপ্তি অনুভব করিত।

কলাদেবীর একনিষ্ঠা সাধিকা ছিল এক তরুণী; নাম তাহার সুভদ্রা। সে ভাস্করাচার্য্য গৌরদাসের পালিতা কন্যা। দেশ-বিখ্যাত শিল্পী গৌরদাসের আপনার বলিতে সংসারে কেহ ছিল না। বহুদিন পূর্ব্বে একবার তাঁহাকে প্রবাস-বাস করিতে হইয়াছিল। সেইখানে এই মাতৃ-পিতৃ-হারা স্বজন-পরিত্যক্তা মেয়েটীকে তিনি আশ্রয় দিয়াছিলেন। তখন হইতে সুভদ্রা গৌরদাসের আশ্রয়ে প্রতি-পালিত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে তাহার বয়স প্রায় আঠারো। যৌবনের উচ্ছল ললিত ছন্দে তাহার সর্ব্বাঙ্গ লীলায়িত; তাহার সু-বঙ্কিম ভ্রূর তলে কৃষ্ণায়ত নেত্রদ্বয়ে প্রতিভার সমুজ্জল দীপ্তি এবং ক্ষুদ্র শুভ্র ললাটপটে একাগ্র সাধনার সুস্পষ্ট লক্ষণ। সুভদ্রার রূপে বিলাসের আভাস ছিল না; সংযম-নিষ্ঠার পুণ্য-জ্যোতিঃ তাহাকে অসামান্য সৌন্দর্য্যশালিনী করিয়াছিল।

সুভদ্রার শিক্ষা শেষ হইলে প্রতিপালক তাহার বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু সুভদ্রা অনুনয় করিয়া বলিল,—শুধু প্রাণহীন পাষাণ-পুত্তলী নির্ম্মাণ শিক্ষা করিয়াছি, শিল্প-মাধুর্য্যের উৎকর্ষ সাধনই আমার জীবনের লক্ষ্য। সে লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। অগত্যা গৌরদাস বিবাহের চেষ্টা করিতে ক্ষান্ত হইলেন।

কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করিবার ফলে সুভদ্রার নারীজনোচিত কোমল চিত্তবৃত্তি এমন উগ্র হইয়াছিল যে, বিশেষ প্রয়োজন সত্ত্বেও কেহ তাহার সম্মুখীন হইতে সাহস করিত না। তরুণ শিক্ষার্থীর দল এই সুন্দরী কলাবতী তরুণীর সামান্য একটি কটাক্ষের জন্যও উদগ্রীব হইয়া থাকিত এবং আপনাদিগকে ধন্য মনে করিত। কিন্তু সুভদ্রা কোনও দিন কাহারও দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টি করে নাই। উহার দৃষ্টিতে এমন একটি স্পর্দ্ধার ব্যঞ্জনা ছিল যে, তাহার মুখের দিকেও কেহ তাকাইতে সাহসী হইত না। অনেক সময় তরুণ ছাত্রদিগকে বলিতে শুনা গিয়াছে,—বড় অহঙ্কারী, সব সময় নিজের প্রাধান্য প্রকাশ ক'রে আর সকলকে হেয় করাই উহার উদ্দেশ্য, কিন্তু এত তেজ থাকিবে না, কথায় আছে অতি দর্পে হতা লঙ্কা। শিক্ষার্থী জয়ন্ত, কিন্তু এই দলভুক্ত ছিল না। সে সুভদ্রাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত। সুভদ্রার তেজোদীপ্ত মুখে চোখে বিজয়শ্রীর স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সে মুগ্ধ হইয়া যাইত। মনে মনে বলিত, হাঁ, ইহাই ঠিক, কঠোর ঐ গাম্ভীর্য্যের মধ্যেই সিদ্ধি চৈতন্যরূপে বিদ্যমান। জয়ন্ত মনে মনে সুভদ্রাকে প্রীতির অঞ্জলি

প্রদান করিত, কিন্তু প্রকাশ্যে মনোভাব ব্যক্ত করিত না। জয়ন্ত প্রায় এক বৎসর কাল এই শিক্ষালয়ে ভাস্কর্য্য শিক্ষা করিতেছে।

জয়ন্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ, কর্ম্মপটু, বিনয়ী, এবং স্বল্পভাষী। তাহার সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। কেবল এক জন তাহাকে দেখিতে পারিত না—সে সুভদ্রা। সুভদ্রার মনে হইত, এই সর্ব্বজনপ্রিয় সুদর্শন যুবকটিই বুঝি তাহার অভীষ্টলাভের পথে অলঙ্ঘনীয় বাধা। জয়ন্তের আগমনের পর হইতেই সুভদ্রা মনশ্চক্ষে দেখিতেছে, তাহার অন্তরের অন্তঃপুরে যে ব্যক্তি ঘুমাইয়া রহিয়াছে, তাহার প্রতিকৃতি যেন জয়ন্তেরই অনুরূপ। এমনই এক জনকে তাহার জীবন-পথের সাথী করিতে তাহার চিত্ত যেন উন্মুখ আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে। কিন্তু না—ছি! একি মোহের যূপ-কাষ্ঠে সে মস্তক সমর্পণ করিতে উদ্যত হইতেছে? ধিক্ তাহার শিক্ষা-গৌরবে, ধিক্ তাহার আত্ম-প্রতিষ্ঠার নির্ভরতায়। আজীবন কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া অতঃপর অন্তরস্থিত ঐ নিদ্রিত মানবটিকে সে চিরনিদ্রায় অভিভূত রাখিতে সচেষ্ট থাকিবে; পারিবে না কি? নিশ্চয় পারিবে। আবার এ কি, অন্ধকার হৃদয়-গুহাভ্যন্তরে উজ্জল জ্যোতিষ্করূপে কাহার সুচারু মূর্ত্তি দেদীপ্যমান হইয়া তাহার সঙ্কল্পের দৃঢ় বন্ধন এমন নিষ্ঠুরভাবে ছেদন করিতেছে? পবিত্র যজ্ঞানুষ্ঠান সময়ে চিত্ত-তপোবনে সহসা আকাঙ্ক্ষারূপী দানবের একি নির্ম্মম উপদ্রব! বৎসরাধিককাল উৎক্ষিপ্ত মনের সহিত অবিশ্রাম সংগ্রাম করিয়াও যখন তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিল না, তখন অক্ষমতার গ্লানিতে ক্ষুব্ধ অন্তর তাহার ধূমায়িত অগ্নির ন্যায় জ্বলিতে লাগিল, এবং সেই বিদ্বেষবহ্নির সমুদয় আঁচটা লাগিতেছিল বেচারা জয়ন্তের গাত্রে।

কি একটা পর্ব্বোপলক্ষে সে দিন শিক্ষাগার বন্ধ ছিল। অলস দ্বিপ্রহরে ছাত্রগণ স্ব স্ব আবাসে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছিল। কেবল নিরলস জয়ন্ত আরব্ধ কর্ম্ম-সম্পাদনে রত। হঠাৎ একটি প্রয়োজনীয় যন্ত্র আবশ্যক হওয়ায় তাহাকে গৌরদাসের কক্ষে যাইতে হইল। কিন্তু মুক্ত কক্ষ-দ্বার-পথে দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র তাহাকে দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল। সবিস্ময়ে জয়ন্ত দেখিল, কক্ষে সুভদ্রা একাকিনী, আর তাহার সম্মুখে সদ্য-সমাপ্ত বোধিসত্ত্বের বিরাট মূর্ত্তি। আনন্দ-বিস্ময়ে বিমুগ্ধ জয়ন্ত উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—অতি সুন্দর! এ ত, স্বপ্ন-রাজ্য নয়, বাস্তবের জাগ্রৎ বক্ষে এ যে ধ্যানাতীত পরিকল্পনা! সত্যই সে শিল্প অনুপম। স্নিগ্ধ লাবণ্যোজ্জ্বল, আলুলায়িত-কুন্তলা পার্ব্বতী স্বয়ং যেন তপোমগ্ন ধূর্জ্জটীর পদবন্দনা করিতেছেন। জয়ন্ত আনন্দের আতিশয্যে স্থান, কাল, পাত্র ভুলিয়া একেবারে সুভদ্রার সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রীত-মুখে বলিল,—"সার্থক আপনার শিক্ষা! যে প্রাণবন্ত পরম পুরুষ ঐ পাষাণের বুকে আত্মগোপন ক'রে আছেন, মনে হয় তাঁরই পূর্ণ সত্তা আ"—

"শুধু ভাস্কর্য্য শিক্ষা করেন না আপনি, কাব্য-কলায়ও দেখ্‌ছি আপনার খুব অধিকার আছে, কিন্তু কবি, আপনার ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয়।"

জয়ন্তের উচ্ছ্বাস-মুখে বাধা দিয়া তীব্র শ্লেষ-মিশ্রিত-স্বরে কথা কয়টি বলিয়া সুভদ্রা উপেক্ষা-ভরে মুখ ফিরাইয়া লইল।"

জয়ন্ত নির্ব্বাক্! কেন—সে করিয়াছে কি,—যে তাহাকে এতটা লাঞ্ছিত হইতে হইল? সে ধীরকণ্ঠে বলিল,—"আমি ত' আপনার কোন অনিষ্ট করতে আসি নি।"

"ইষ্টানিষ্ট বোঝবার শক্তি থাকলে এমন নির্জ্জন দুপুরে আপনি নারী-শিক্ষাগারে প্রবেশ করতে

সাহসী হতেন না। তা ছাড়া এও বলছি, আপনার মত অসংযমী পুরুষের পক্ষে এ শিক্ষাশ্রম উপযুক্ত স্থান নয়, এ পবিত্র সাধনাক্ষেত্র শুধু সাধকের জন্য।” শেষের কথা কয়টা জয়ন্ত আর শুনিতে পাইল না। তাহার শ্রবণ-বিবরে তখন ঘোর-রোলে বজ্র নিনাদিত হইতেছে—তাহার মনে হইতেছে—উঃ, ধরণী দ্বিধা হও, এ কি সঙ্কীর্ণচিত্তা নারী এ? যাহাকে দেবী-জ্ঞানে এত দিন পূজা করিয়া আসিয়াছে সে, তাহার মধ্যে দানবীয় অকরুণ বীভৎসতা কোথায় আত্মগোপন করিয়াছিল? জয়ন্ত মুহূর্ত্ত মাত্র তথায় না দাঁড়াইয়া অপমানাহত চিত্তে চলিয়া আসিল, আসিবার সময় তাহার অভ্যাস-গত অভিবাদন-বাণীও মুখ দিয়া বাহির হইল না।

জয়ন্তের প্রস্থানের পর সুভদ্রা মনে মনে লজ্জিত হইয়া ভাবিতেছিল, এতটা বাড়াবাড়ি ভাল হয় নাই। সত্যই ত তার অপরাধ কতটুকু? না,—হাঁ, অপরাধ আছে বৈ কি! তাহার মধুরোজ্জল স্নিগ্ধ জীবন—প্রভাতকে সহসা বাসনার তপ্ত মধ্যাহ্নে পরিণত করিয়া, নিষ্কলঙ্ক নারীত্বকে কলঙ্ক-গ্লানিতে মলিন করিয়া দিয়াছে সে! ইহাই কি যথেষ্ট অপরাধ নয়? জয়ন্তের লাঞ্ছনাপীড়িত মুখ-খানা সুভদ্রার অন্তরমধ্যে একবার উঁকি দিল, কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য, তখনই আবার মনের চতুর্দ্দিক হইতে বিদ্রোহ ঘোষিত হইল, না,—না সে ক্ষমার অযোগ্য, তাহার সহিত রূঢ় ব্যবহারই সমুচিত হইয়াছে।

মধ্যাহ্ন

প্রতি বৎসরের মত এবারেও রাজপ্রাসাদে ভাস্কর্য্য-প্রদর্শনী বসিয়াছে। দেশ-বিদেশের ভাস্কর-গণ নিজ নিজ শিল্প-কৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন-মানসে বিবিধ বিচিত্র সামগ্রী-সকল প্রদর্শনীতে আনয়ন করিয়াছে। কলালক্ষ্মীর প্রসাদ কাহার উপর পতিত হয় সকলেই সে জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। অপরাহ্নে বৃদ্ধ গৌরদাস প্রদর্শনী দেখিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। বাটীতে প্রবেশ করিয়াই গৌরদাস সস্নেহে ডাকিলেন, “সুভদ্রা মা কোথায় গো?” “কেন বাবা”—বলিয়া সুভদ্রা গৌরদাসের নিকট আসিল। তাহার মুখে চোখে অবশ্যম্ভাবী গৌরবের সমুজ্জ্বল দীপ্তি।

সুভদ্রা-প্রদত্ত কাষ্ঠাসনে বসিয়া গৌরদাস বলিলেন, “এবার কিন্তু মা-লক্ষ্মীকে পরাজয় মানতে হয়েছে।”

সুভদ্রার মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। পরাজয়! কেন? তাহার আবাল্য সাধনার শিক্ষা-গৌরব সহসা কে অপহরণ করিয়া লইল? ম্লানমুখে সুভদ্রা বলিল, “আমার বুদ্ধ-মূর্ত্তির গঠন-প্রশংসা সকলেই ত শতমুখে করেছে বাবা?”

“আমিও ত করেছিলুম রে বেটী! কিন্তু জয়ন্তই যে সব মাটী করে দিলে।”

বৃদ্ধের কথাগুলির প্রতি ছত্রে স্নেহের নীরব সাড়া ফুটিয়া উঠিল। গৌরদাস আবার বলিলেন, ‘জানলি মা তোর বুদ্ধমূর্ত্তির প্রশংসা যখন সবার মুখে মুখে প্রকাশ পাচ্ছে, সেই সময়ে জয়ন্তটা এক মূর্ত্তি নিয়ে মেলায় হাজির হ’ল। লক্ষ চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল তার পাথরে কোঁদা ‘অনন্তশয্যা’র অতুলনীয় শিল্পকৌশল আর সৌন্দর্য্য দেখে। বিখ্যাত ভাস্করদের দর্প চূর্ণ করেছে আজ জয়ন্ত! ষাট বছর বয়সে আমাকেও পরাজিত হতে হ’ল এবার!” একটু থামিয়া হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে গৌরদাস বলিলেন,—“বাস্তবিক ‘অনন্ত শয্যা’ শিল্পীর গৌরব।”

ছাত্রের সাফল্য যে শিক্ষককে সার্থকতার দক্ষিণায় গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছে, ভদ্রা আজ

ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল এবং সে জন্য মনে মনে ঈর্ষ্যান্বিতাও হইল। জয়ন্ত—জয়ন্ত তাহার যশোলক্ষ্মী আত্মসাৎ করিয়া আজ তাহাকে পরাস্থিত করিয়াছে। গৌরদাসের স্নেহরাজ্যে তাহারই ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্ব আধিপত্য, সেখানেও আজ জয়ন্তের পূর্ণ প্রভাব। তদুপরি আবার দেশব্যাপী খ্যাতি। সকল দিক দিয়াই জয়ন্ত বিজয়-লক্ষ্মীর পর্য্যাপ্ত আশীষ কুড়াইয়া লইয়াছে। আর সে? সুভদ্রা আর ভাবিতে পারিল না, কাজের অছিলায় গৌরদাসের নিকট হইতে সরিয়া গেল।

রাত্রিতে গৌরদাস জয়ন্তের কক্ষে গিয়া তাহার সহিত [illegible] সাক্ষাৎ করিলেন। গৌরদাস জয়ন্তকে সাদর [illegible] করিয়া বলিলেন,—"জয়ন্ত! তুমি আমার [illegible] ছাত্র, আশীর্ব্বাদ করি, ভারতীর প্রিয় সন্তান হ'য়ে তুমি দেশের মুখ উজ্জ্বল কর। আমি তোমার গুরু [illegible]র একটি অনুরোধ আছে।"

জয়ন্ত বিনা[illegible]ণ্ঠে বলিল,—"অনুরোধ বলছেন কি? আদেশ বলুন [illegible]রু-আজ্ঞা শিষ্যের নির্ব্বিকারে পালনীয়।"

"সুখী হলেম তোমার যোগ্য উত্তর শুনে। আমার ইচ্ছা সুভদ্রার পাণিগ্রহণ ক'রে তুমি আমার শিল্পকীর্ত্তির উন্নতি সাধন কর। নিশ্চয় জেনো, সুভদ্রা তোমার যোগ্যা স্ত্রী হবে। আচ্ছা, এখন চল্লেম আমি, তুমি বিশ্রাম কর।"

গৌরদাস চলি[illegible] গেলে জয়ন্ত বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল। সে কি শুনিল! সুভদ্রাকে বিবাহ করিতে হইবে? সেই দাম্ভি[illegible] যে একদিন তাহাকে বিনা দোষে অপমানি[illegible]? সেই দুর্ব্বিনীতা সুভদ্রাকে সে আ[illegible]র সঙ্গিনী করিবে? না, তাহা সম্ভব নহে। সুভদ্রার নিকট লাঞ্ছিত হইয়া অবধি, সে একরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, জীবনে সে নারী-সান্নিধ্য বর্জ্জন করিয়া চলিবে, দেবী-জ্ঞানে নারীকে পূজা করিবে, দূর হইতে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া তৃপ্ত হইবে, কিন্তু নারীর সমীপস্থ কে কখনও হইবে না। তাহার মনের এই সঙ্কল্প গুরুকে নিবেদন করিবে; ইহাতে ক্ষমা মিলে উত্তম, না মিলে সত্বর এ স্থান ত্যাগ করিবে। মনে মনে এই যুক্তি স্থির করিয়া জয়ন্ত শয়ন করিল। প্রভাতের সোণালি রৌদ্রে চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছে। গৌরদাস তখন তাঁহার সখের সব্জী-বাগানে বেড়াইতেছিলেন। এমন সময় বিদায়-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া জয়ন্ত তথায় উপস্থিত হইল। গৌরদাস বিস্ময়-ভরে বলিলেন, "কোথাও যাচ্ছ না কি জয়ন্ত?"

"হাঁ, আপনার কাছে বিদায় নিতে এসেছি। আপনার আদেশ পালন করতে পারলেম না, সে জন্যে দাসকে ক্ষমা করবেন।" কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গেই জয়ন্ত শিক্ষকপদে প্রণাম করিয়া নতমস্তকে প্রস্থান করিল। গৌরদাসের নেত্রদ্বয় একবার জ্বলিয়া উঠিল, পরক্ষণেই গভীরকণ্ঠে গাঢ়স্বরে উচ্চারিত হইল—'অকৃতজ্ঞ'!

সন্ধ্যা

তার পর কয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

দাক্ষিণাত্যে সম্প্রতি একটি মন্দির-সংস্কার আরম্ভ হইয়াছিল। মন্দির-সম্মুখবর্ত্তী পুরাতন ভাস্কর্য্যগুলি একেবারেই ভাঙ্গিয়া খসিয়া বিনষ্টপ্রায় হইয়া গিয়াছে। এইগুলি অতি সূক্ষ্ম ও সুচারু শিল্প। যাহার তাহার দ্বারা যে এই গুলির সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হইবে না—সেখানকার রাজা তাহা জানিতেন। সেই জন্যই গুজরাট হইতে নিপুণ ভাস্কর জয়ন্তকে তিনি আনাইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জয়ন্ত, যে অষ্টসখীপরিবৃতা রাধার মূর্ত্তি খোদাই করিয়াছে রাজার তাহা পছন্দ হয় নাই। নারী মূর্ত্তি-

গুলির মুখে চোখে কোমলতার অভাব, উপরন্তু একটা রুক্ষ পরুষ কঠোর ভাব মুখগুলিকে লালিত্য ও শ্রীহীন করিয়াছে। মূর্ত্তিগুলির অবয়বের কারুকার্য্য প্রশংসাযোগ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু মুখশ্রী নারী-সুলভ কোমলতাবর্জ্জিত হইয়াছিল বলিয়া শিল্পীর কৃতিত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। দুই তিন বার ভাঙ্গা গড়া করিবার পরও যখন জয়ন্ত অকৃতকার্য্য হইল তখন রাজা তাহাকে অপর কার্য্য দিয়া বলিলেন, "আপনি এইগুলা করুন, অন্য ভাস্কর আনাইয়া নারীমূর্ত্তি গঠন করাইব।" জয়ন্ত নতমস্তকে পরাজয় মানিয়া অন্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইল।

পরাজয়-জনিত অবসাদে ও অতিরিক্ত পরিশ্রমে জয়ন্তের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার চির-শ্রম-সহিষ্ণু দেহ ক্রমেই অক্ষম অবশ হইয়া পড়িতেছিল। উদ্যানের নিভৃত অংশে বসিয়া জয়ন্ত একটী নক্সা মনোযোগ সহকারে দেখিতেছিল, এমন সময় তাহার সহকারী নিতাইচাঁদ তথায় আসিয়া বলিল, "ওহে রাজা এবার একজন ওস্তাদ ভাস্কর আনাচ্ছেন, যে আমাদের সবার দর্প চূর্ণ করবে। তুমি এ খবর শুনেছ কি?"

জয়ন্ত নক্সা হইতে মুখ না তুলিয়াই উত্তর দিল—"না।"

"তবে শোন, ইনি হচ্ছেন জয়পুরবাসী—না না বাসিনী, অর্থাৎ স্ত্রীলোক। পর্দ্দানশীন কি না জানা নেই, তবে ঘেরা-টোপ ঢাকা পাল্কী ক'রে আনবার ব্যবস্থা হয়েছে শুনলাম। সহরে প্রবেশের সময়ে তাঁকে সসম্মানে আনতে অনেকেই যাবে, আমরাও ব, তুমি যাবে?"

"আপত্তি ছিল না, তবে শরীরটা আজ বড়ই অসুস্থ বোধ হচ্ছে।" এই বলিয়া জয়ন্ত দুই হাতে পাগটা টিপিয়া জানাইল যে, তাহার মাথা ভারী এবং কপালে যন্ত্রণা হইতেছে। নিতাই জয়ন্তের গায়ে হাত দিয়া চমকিয়া উঠিল; বলিল—"ইস্, তোমার যে বেশ জ্বর হয়েছে হে। যাও যাও, শুয়ে পড়গে, গায়ে বাতাস লাগিও না।" জয়ন্তও আর বসিতে পারিতেছিল না। নিতাইয়ের সাহায্যে কোনও রকমে তাহার কক্ষে আসিয়া শুইয়া পড়িল। তখন হইতে সে চৈতন্য-হারা। জয়ন্ত যে কতদিন বিকারঘোরে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আছে তাহার তাহা মনে পড়ে না। তবে এই টুকু মাত্র তাহার জ্ঞান ছিল—স্বপ্নঘোরে যেন সে দেখিত একটি তরুণী মন-প্রাণ দিয়া তাহার পরিচর্য্যায় রত। কিন্তু তাহার মুখাবয়ব অবগুণ্ঠনাবৃত থাকায় জয়ন্ত তাহাকে চিনিতে পারিত না। এমন কি সে তখন বুঝিতেও পারে নাই [illegible] কোন দেশীয়া রমণী। যে দিন হইতে তাহার [illegible] চৈতন্য সঞ্চার হইতে লাগিল, সে দিন হইতে [illegible] তরুণী অদৃশ্য।

কয়েক জন পরিচারক ব্যতীত জয়ন্ত অপর কাহাকেও তাহার ক[illegible] দেখিতে পাইত না। নিতাইচাঁদ ছিল জয়ন্তের প্রবাস-সঙ্গী। নিতাইও জয়ন্তের রোগ-শয্যায় অনেক সেবা করিয়াছে। একদিন জয়ন্ত নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই আমি যখন অজ্ঞানাবস্থায় ছিলাম, তখন মনে হইত, একটি তরুণী আমার অক্লান্ত সেবা করতেন। তিনি কে জান?"

"জানি! তিনি সামান্য স্ত্রীলোক নন জয়ন্ত, তিনি দেবী। এইটুকু পরিচয় জেনেই সন্তুষ্ট হও ভাই, এর বেশী বলতে [illegible] নিষেধ করেছেন।" বলিয়া নিতাই [illegible] জয়ন্তের নিকট হইতে উঠিয়া গেল। মনের [illegible] দমন করিয়া জয়ন্ত সদ্য-রোগ মুক্ত দেহটাকে শয্যা হইতে টানিয়া তুলিয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িল। তখন অপরাহ্ণ। যষ্টিতে ভর দিয়া জয়ন্ত ধীরে ধীরে মন্দিরসম্মুখে আসিয়া

মস্তক অলঙ্কৃত করিয়া দিব। ঐ নিরাভরণা মূর্ত্তিকে —বিষাদ-প্রতিমাকে আমি রাজরাণী করিব। তুমি আমার সঙ্গে এলাহাবাদে চল। আমি সেখানে গিয়া তোমায় শাস্ত্রমতে পত্নীরূপে গ্রহণ করিব। আমি তোমার উপর অত্যাচার করিতে আসি নাই—তোমায় পীড়ন করিতে আসি নাই—তোমার করুণা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। তুমি সম্মতি দাও—তার পর কি উপায়ে আমরা দু'জনে এস্থান ত্যাগ করিব তাহা তোমায় জানাইব।"

হীরা ভাবিল,—বাড়ীতে যখন কেহ নাই, তখন এ পাষণ্ডকে উত্তেজিত করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। ইহার সহিত ধীরভাবে কথা কহাই উচিত। সাহস হারাইলেই মরিব। এই সব ভাবিয়া হীরা একটু প্রসন্নমুখে বলিল,—"আপনার অসীম অনুগ্রহ দেখিতেছি আমার উপর শেঠজী! কিন্তু আপনি বোধ হয় জানেন না—যে আমি হিন্দু বিধবা। বিধবার কি আবার বিয়ে হয় শেঠজী!"

শেঠজী হীরার কাছে এতটা অনুকূল উত্তর লাভ করিবে—এতটা ভাল ব্যবহার পাইবে তাহা সে প্রত্যাশা করে নাই সুতরাং সে মহোৎসাহে বলিল,—"কে বলিল বিধবা বিবাহ হয় না? আমার অর্থের অভাব নাই। সমাজ যদি জানিতে পারে তাহা হইলেও আমার কিছু করিতে পারিবে না। আর তুমি যে বিধবা তা আমার পরিজনবর্গ ছাড়া আর কেহই জানে না। তুমি এটা স্থির জানিও পিও। ...নমাল ...কমাত্র সন্তান আমি। এক আজন্ম-রুগ্না, ...না।" ...ক লইয়া আমি জীবনের সকল সুখ হারাইয়াছি...বামার এ অধঃপতন কেবল তাহার দোষেই হইয়াছে। তোমার রূপ দেখিয়া আমি ভুলিয়া মনে মনে তোমায় যথেষ্ট ভালবাসিয়াছি। সমাজ আমার কি করিবে? সমাজ ত অর্থের ক্রীতদাস। তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও, কেবলমাত্র মুখে বল যে, তুমি আমার বিবাহিত পত্নী হইতে স্বীকৃত। তার পর যাহা করিতে হয় তাহা করিব।"

হীরা মনে মনে কি ভাবিল। সে এই বিরাট অন্ধকারের মধ্যে একটু যেন পথ দেখিতে পাইল। সে প্রসন্নমুখে বলিল,—"শেঠজী! যথার্থই কি আপনি আমায় ভালবাসেন? ধর্ম্মপত্নী করিতে রাজি আছেন?"

প্রয়াগপ্রসাদ মহোৎসাহের সহিত বলিল, "সে বিষয়ে সন্দেহ কর না কি? তাহা না হইলে আমি এতটা অগ্রসর হইয়া, নির্জ্জন অবসরে তোমার কাছে আসিতে সাহস করিতাম না।"

হীরা। তাহা হইলে এক কাজ করুন!

প্রয়াগপ্রসাদ। বল কি করিতে হইবে?

হীরা। আমায় তিন দিন সময় দিন। ব্যাপারটা একটু ভাবিয়া দেখাও ত আমার উচিত।

প্রয়াগপ্রসাদ নিশ্চয়ই—আমি তিন দিন পরে তোমার সঙ্গে আমাদের উদ্যানের চাঁদনীতে দেখা করিব।

হীরা। ভাল। কিন্তু আমার সহিত দেখা করিবার পূর্ব্বে আপনাকে আর একটা কাজ করিতে হইবে। আপনার পিতামাতার এ সম্বন্ধে কি মত তাঁহাদের মুখ হইতেই আমি শুনিব। আপনি আমার সম্মুখে তাহাদের কেবল জিজ্ঞাসা করিবেন মাত্র। আমি সেইখানে উপস্থিত থাকিব। নচেৎ কেবলমাত্র আপনার কথায় আমি স্বীকৃতা হইতে পারি না।

প্রয়াগপ্রসাদ কি ভাবিল। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—"ভাল তাহাই হইবে।"

সুবুদ্ধিমানের মত সে তখন আর বেশী কোন কথা না বলিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। আর হীরা তার কক্ষের দ্বারটী অর্গলবদ্ধ করিয়া মাটীতে

বসিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে যুক্তকরে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে বলিল,—"এ আবার কি নূতন বিপদ ঘটাইলে দয়াময়! আমি কি তোমার চরণে এতই অপরাধিনী? না—এ আমার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল।"

এমন সময় শেঠী-কন্যা আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিয়া ডাকিল—"সই! সই!"

হীরা দ্বার খুলিয়া দিল। তাহার সই জিজ্ঞাসা করিল,—"ঘুমিয়ে পড়েছিলি বুঝি ভাই?"

একটু আগে যাহা কিছু ঘটিয়া গিয়াছে তৎসম্বন্ধে হীরা তাহার প্রিয়তমা, স্নেহময়ী সইকে কিছুই বলিল না। বলিবার কোন প্রয়োজনই সে বুঝে নাই। আর বলিলেও একটা মহা কলঙ্ক।

মুহূর্ত্তে সে স্থির করিয়া লইল, এ বাটীতে থাকা তার পক্ষে আর নিরাপদ নয়। নরাধম প্রয়াগপ্রসাদ তাহাকে তিনদিন সময় দিয়াছে। এই তিন দিন পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই যখন সে এ বাটী হইতে গোপনে চলিয়া যাইবে, তখন এ সম্বন্ধে তাহার সইকে কোন কিছু বলাও নিষ্প্রয়োজন।

সত্যই দ্বিতীয় দিন গভীর রাত্রে সমস্ত সংসারের লোক যখন নিদ্রার ঘোরে অচেতন তখন সে কাহাকে কিছু না বলিয়া—একবস্ত্রে শেঠজীর বাটী ত্যাগ করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

দুঃখ যার চির-সঙ্গী—বিপদ প্রতিপদে যাহার দুঃখময় জীবনের গতিবিঘ্ন ঘটাইতেছে—সে বিপদকে বড় একটা গ্রাহ্য করে না বা বিপদ ঘটিলে ততটা অভিভূত হয় না।

হীরা শেঠজীর বাটীর বাহির হইয়া আসিয়া একটু দিশাহারা হইয়া পড়িল। কারণ একে অন্ধকারময় গভীর রাত্রি, তাহাতে কাশীর আঁকাবাঁকা আলোকহীন রাজপথ। চারিদিকেই অন্ধকার। নিরুপায় হইয়া সে অন্ধকারের বুকে আত্মসমর্পণ করিল।

সে কেবল বিশ্বনাথের মন্দিরের পথই জানিত। দিনের বেলা হইলে শেঠজীর বাড়ী হইতে একাকিনী বিশ্বনাথ-দর্শনে আসা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু রাত্রে, গভীর অন্ধকারে সে পথভ্রান্ত হইল। সে বিশ্বনাথ-মন্দিরের সম্মুখের পথে না গিয়া, পশ্চাতের পথ ধরিল। ভাগ্য তাহাকে বিপথে চালিত করিল।

সহসা সে পিছনে যেন কাহার পদশ[illegible]তে পাইল। এতটা পথ এতক্ষণ ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে তবুও সে সদর সড়কে আসিয়া পৌঁছাইতে পারে নাই। নির্জ্জন পথে পদশব্দ পাইয়া সভয়চিত্তে সে এক ভগ্ন দেবমন্দিরের পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

আর কোন শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল না। হীরা সেই দেবালয়ের পার্শ্ব হইতে বাহির হইয়া আবার পথ চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর সে বুঝিল, কে যেন দ্রুতপদে তাহার পশ্চাতে আসিতেছে।

যে আসিতেছিল—সে সহসা হীরাকে ধরিয়া ফেলিল। হীরা, বায়ু-বিতাড়িত শরপত্রের মত ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। লোকটার মুখ হইতে মদিরার গন্ধ বাহির হইতেছে।

লোকটা জড়িতস্বরে বলিল,—"বড় কষ্টটা দিলে তুমি! তার পর ব্যাপারটা কি দেখি! এই নিশুতি রাতে, এ[illegible] [illegible]থায় [illegible] তোমার মতলবটা কি?"

হীরা ভয়ে মুখের [illegible]ন টানিয়া দিল।

আক্রমণকারী স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না। তাহার স্বর জড়িত। বাক্যকথনভঙ্গী অসংলগ্ন। এই আক্রমণকারী আর কেহই নহে—

আমাদের পূর্ব্বপরিচিত, অশেষগুণশালী শেঠপুত্র প্রয়াগপ্রসাদ। সে তত রাত্রে তাহার আড্ডা হইতে এই অবস্থায় ফিরিতেছিল। পথে এক যুবতী স্ত্রীলোককে একা দেখিয়া সে তাহার অনুসরণ করিয়াছিল। সে জানিত না যে, সে হীরা। সুতরাং অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া হীরা ভাহই করিয়াছিল।

প্রয়াগপ্রসাদ এক অদ্ভুত ঘটনাচক্র-চালিত হইয়া অন্য যুবতী নারী-বোধে হীরার অনুসরণ করিয়াছিল। সে জানিতে পারে নাই যে, এই যুবতী হীরা—আর হীরাও অন্ধকারে ধরিতে পারে নাই, যে বাঘের ভয়ে সে পলায়ন করিয়াছে ঘটনাচক্রে আবার তাহারই কবলিত হইয়াছে।

প্রয়াগপ্রসাদ জড়িতস্বরে বলিল—"স্বামিগৃহ ত্যাগ করিয়া পলাইতেছ? চল—আমি তোমায় সেখানে রাখিয়া আসি।"

হীরা বলিল—"না আমি তোমার সঙ্গে যাইব না। তুমি আমার পথ ছাড়িয়া দাও। নচেৎ আমি চীৎকার করিব।"

প্রয়াগজী বলিল—"তোমার চীৎকার শুনিবে কে?"

হীরা। যিনি আমাদের মত অভাগিনীর কথা চিরদিন শুনিয়া থাকেন তিনিই শুনিবেন।

একে মাতাল। তাহাতে নির্জ্জন পথের মধ্যে যবতীর সন্ধান-লাভ। প্রয়াগজী বলিল—"ভাল ... আমার সঙ্গে এস। যদি হিত চাও ত—গো। ...রিও না, আমি তোমার কোন অনিষ্ট করিব না।

হীরা "না—তোমার সঙ্গে যাইব না" বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। সেই পাষণ্ড অন্ধকারে দৌড়িয়া গিয়া তাহার হাত ধরিল। হীরা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল।

সেই চীৎকার শুনিয়া কে একজন সহসা ঘটনাস্থলের বিপরীত দিকের এক বাড়ীর দরজা খুলিয়া সেইখানে উপস্থিত হইল। ব্যাপার কি বুঝিতে তাহার বেশী কষ্ট হইল না। সে তৎক্ষণাৎ সেই দুরাচারের গ্রীবা ধরিয়া তাহাকে দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তার পর সেই পাপিষ্ঠের কবল-উন্মুক্ত হীরাকে বলিল—"তোমার কোন ভয় নাই। আমার সঙ্গে এস?"

সেই ভগবৎ-প্রেরিত হীরার উদ্ধারকারী হতভাগিনী হীরাকে সঙ্গে লইয়া নিজের বাটীতে প্রবেশ করিল। সদর দরওয়াজা বন্ধ করিয়া সে উপরের কক্ষে আসিয়া বলিল,—"কে তুমি? ব্যাপার কি?"

হীরা অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে প্রস্ফুট দীপালোকে সেই মুখ দেখিয়া তাহার উদ্ধারকারীকে তখনই চিনিল। বলিল,—"তুমি!" সে তখনই তাহার অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেলিল। এ যে হেমন্তলাল!

হেমন্তলাল বিস্মিত-চিত্তে বলিল,—"তুমি? এ রাত্রে কোথায় যাইতেছিলে? এ কাশীতে কি করিয়া আসিলে?"

হীরা তখন কথা হেমন্তলালকে বলিল। তাহা শুনিয়া হেমন্তলাল বুঝিল, হীরার অদৃষ্ট-চক্র অতি কুটিল। তখনও গ্রহগণ তাহার উপর বড়ই প্রতিকূল।

হেমন্তলাল সমস্ত কথা শুনিয়া বলিল,—"আমি রাজা বিন্দুমাধবের কোন কাজে কাশীতে আসিয়াছিলাম। সম্ভবতঃ তুমি কাশীতে আসিতে পার, ইহা ভাবিয়া এই পনর দিন ধরিয়া নানাস্থানের দেবমন্দিরে তোমারই সন্ধানে অনেক ঘুরিয়াছি তবুও তোমার কোন সন্ধান পাই নাই। আজ এক অদ্ভুত ঘটনাচক্রের মধ্যে ফেলিয়া ভগবান

তোমাকে মিলাইয়া দিয়াছেন। যাক্—আমি যে তোমার এ বিপদের সময়ে একটুও কাজে লাগিতে পারিয়াছি, এজন্য বড়ই সুখী।"

তার পর দু'জনে অনেক কথা হইল। তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিবার পর হইতে হীরার অদ্ভুত জীবনকাহিনীর অনেক কথাই, হেমন্তলাল উপন্যাসের কাহিনীর মত শুনিতে লাগিলেন।

হীরার কথা শেষ হইলে হেমন্তলাল বলিল,—"আমি কাল প্রভাতেই এ স্থান ত্যাগ করিব আর সেইজন্যই এত রাত জাগিয়া নিজের জিনিসপত্র গুছাইতেছিলাম। এইজন্য জাগিয়া না থাকিলে হয় ত তোমার চীৎকার শুনিতে পাইতাম না। যাই হক ভগবান বিশ্বনাথ তোমায় আজ অসম্ভব উপায়ে রক্ষা করিয়াছেন। এখন তুমি কি সঙ্কল্প করিতেছ? আবার শেঠীর বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবে কি? না আমার সঙ্গে যাইবে?"

হীরা দৃঢ়স্বরে বলিল—"শেঠজীর বাড়ীতে আর আমার যাওয়া হইবে না। তোমায় ত সেই দুর্ব্বৃত্ত প্রয়াগপ্রসাদের ব্যাপার সবই বলিয়াছি। শেঠ-বাড়ীতে আমি এক মুহূর্ত্তও নিরাপদ নই।"

হেমন্ত। তাহা হইলে—

হীরা। তোমার সঙ্গে যাইব। তুমি পূর্ব্বজন্মে আমার কেউ ছিলে হয় ত। ঠেকিয়া শিখিয়া-দেখিয়া ভুগিয়া এখন বুঝিয়াছি তোমার আশ্রয় অপেক্ষা নিরাপদ স্থান আমার আর নাই।

"তবে তাই হউক। তোমাকে এরূপ ভয়ানক বিপদের মুখে ফেলিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। জান ত এখন আমি রাজার পুরী-রক্ষী সেনাদলে প্রবিষ্ট হইয়াছি। আমার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে বলিয়াই আমি এই গৌরব-হীন কাজে নিযুক্ত হইয়াছি। আমি রাজপুরীতেই স্বতন্ত্র আবাসে থাকি। তুমি ইচ্ছা করিলে আমার সঙ্গে যাইতে পার। তোমার কাহিনী ত সব শুনিলাম, এখন পথিমধ্যে তোমায় সকল কথাই বলিব।"

বলা বাহুল্য, হেমন্তলাল ও হীরা সেই দিনই কাশীধাম ত্যাগ করিল। আর প্রায় একমাস পরে রাজমহলে পৌঁছিল।

পরদিন প্রভাতে শেঠ-বাড়ীর সকলেই জানিল যে, হীরা পলায়ন করিয়াছে। শেঠজী সারা সহরটা ঘুরিয়া লোক লাগাইয়া হীরার অনেক সন্ধান করিলেন। কিন্তু কোন সংবাদই মিলিল না। সকলের অপেক্ষা মর্ম্মাহত হইল প্রয়াগপ্রসাদ। সে হীরাকে শত শত অভিসম্পাত করিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

"হীরা!"

"তুমি এখনও আমায় হীরা বলিয়া ডাকিবে? আমাদের সেই সুখের দিনের—আদরের নামটী কি ভুলিয়া গিয়াছ।"

"আবার সুখের দিন আসুক, তখন তোমায় পূর্ব্ব নামেই ডাকিব।"

"কবে আসিব?"

"যেদিন তুমি কাজ উদ্ধার করিবে।"

সম্বোধিত হীরা একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহাতেই যেন তাহার মনের সকল কথাই প্রকাশ পাইল।

গভীর নিশীথে হেমন্তলাল ও হীরা এক নির্জ্জন কক্ষের দ্বার বন্ধ করিয়া এই ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল।

হীরা কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "সর্দ্দারের সঙ্গে তোমার দেখা হইয়াছিল কি?"

"হাঁ"

"কবে?"

"পরশু রাত্রে।"

"কি বলিলেন তিনি ?"

"যত শীঘ্র হয় কাজ উদ্ধার করিতে ?"

"তাঁর কাছে তুমি আমার কোন পরিচয় দিয়াছ কি ?"

"দিয়াছি।"

"কি পরিচয় দিয়াছ ?"

"তুমি একজন নর্ত্তকী। রাজা চন্দ্রমাধবের কাছে তোমার যে পরিচয় দিয়াছি, তাহাই সর্দ্দারকে বলিয়াছি। তুমি আগরার একজন বিখ্যাত গায়িকা।"

কথাটা শুনিয়া হীরা মনে মনে একটু হাসিল। হেমান্তলালের কাছে সে তাহার জীবন বিক্রয় করিয়াছে। হেমন্তলাল কলের পুত্তলীর মত তাহাকে নাচাইতেছে—সে যাহা বলিতেছে সে তাহাই করিতেছে। তাহারই প্ররোচনায় সে আজ রাজ-অন্তঃপুরে গায়িকার অভিনয় করিতেছে। কিন্তু যে আশার ছলনায় সে আগুন লইয়া খেলা করিতেছে সে আশা তার পূর্ণ হইবে কি ? রাজা চন্দ্রমাধব যদি ঘুণাক্ষরে ভিতরের কথা জানিতে পারেন, তাহার ছলনা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে—নিশ্চিত মৃত্যু। গুপ্ত কক্ষে গুপ্তহন্তার হাতে নিষ্ঠুর শোচনীয় পরিণাম। সে শোচনীয় পরিণামের কথা কেহই জানিবে না। তাহার ভরা যৌবনে, এই উদ্দাম কামনাময় বুকের লুকানো সাধগুলি তার শোচনীয় অকাল মৃত্যুর সঙ্গে শেষ হইয়া যাইবে।

কক্ষমধ্যে একটী দীপ জ্বলিতেছিল। সে দীপালোকে হেমন্তলালের সুন্দর মুখখানা বড় সুন্দর দেখাইতেছিল।

হীরা সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে একবার হেমন্তলালের মুখের দিকে চাহিল। হেমন্তলাল সেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টির মর্ম্ম বুঝিল।

সহাস্যমুখে হীরার চিবুকখানি তুলিয়া সুমিষ্ট স্বরে বলিল, "আমায় অবিশ্বাস করিতেছ হীরা ?"

"না"

"তবে কি ভাবিতেছ ?"

"ভাবিতেছি—"

"থামিয়া গেলে কেন ? তোমার মনের কথা স্পষ্ট করিয়া আমায় বল। যদি আমার কথায় তোমার বিশ্বাস না হইয়া থাকে, আমার কাছে তাহাও গোপন করিও না। এ পর্য্যন্ত এই বিপদের পথে যতদূর অগ্রসর হইয়াছি তাহাই যথেষ্ট। এইখান হইতেই ফিরিয়া যাওয়া উচিত। আমি কেবল আমার পিতার দারুণ অপমানের প্রতিশোধের জন্যই এই কাজ করিতেছি। অথচ যাহার বিরুদ্ধে এই প্রতিশোধের আয়োজন—সে তাহার কিছুই জানে না—আমায় এ পর্য্যন্ত কোন সন্দেহই সে করে নাই। যেদিন হইতে তোমাকে তাহার কাছে গায়িকারূপে পরিচিত করিয়াছি—সেইদিন হইতেই আমি তাহার প্রধান রক্ষী।"

হীরা তখন একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, —"আমি কি ভাবিতেছিলাম হেমন্তলাল তাহা তুমি শুনিতে চাও। হত্যা করিতে—আমি ইচ্ছুক নই। অতটা পাপ আমার সহিবে না। নারীর হৃদয় বড় চঞ্চল। হয় ত কাজ করিবার ঠিক মুহূর্ত্তেই আমায় পিছাইয়া যাইতে হইবে। তোমার অনুরোধে আমি অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি; আর সাহস হয় না। জান নিজের নারীত্ব রক্ষার জন্য আমি সর্ব্বদা বিষ ও ছুরি সঙ্গে রাখি।"

হেমন্তলাল কি ভাবিয়া বলিল,—"আমি ত তোমায় হত্যা করিতে বলিতেছি না। আমি চাই সেই প্রয়োজনীয় চিঠিপত্রগুলি সর্দ্দারের হাতে দিতে পারিলে তিনি তাহা মহারাজ মানসিংহের হাতে দিবেন। তাহা হইলে এই বিলাসপরায়ণ,

দাম্ভিক অত্যাচারী ভ্রাতৃহত্যাকারী রাজার কি পরিণাম হইবে সহজেই বুঝিতেছ। তখন তোমার আর আমার অদৃষ্ট ফিরিয়া যাইবে। পুরস্কাররূপে আমরা প্রচুর অর্থ পাইব। আমার পিতা যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে এই রাজার হাতে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন তাহারও প্রতিশোধ—"

সহসা হীরা হেমন্তলালের মুখ চাপিয়া ধরিল। তাহার কানে কানে বলিল—"কাহারও যেন পদ শব্দ শুনিলাম।"

হেমন্তলাল কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "না—কিছুই ত আর শোনা যাইতেছে না! তোমার শুনিবার ভ্রম।"

হীরা বলিল—"না বোধ হয় তা নয়। আজ আমি অসুস্থতার ভাণ করিয়া রাজার কাছে বিদায় লইয়া আসিয়াছি। হয় ত তাঁহারই আদেশে কোন প্রহরী আমার কক্ষের কাছে দাঁড়াইয়া আছে।"

এইকথা বলিয়া হীরা তৎক্ষণাৎ এক ফুৎকারে প্রজ্জলিত বর্ত্তিকা নিভাইয়া দিয়া কক্ষ অন্ধকারময় করিয়া দিল।

দুইজনে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর হেমন্তলাল বলিল—"যখন তোমার মনে একটা সন্দেহ হইয়াছে তখন তাহার একটা নিরাকরণ করিয়া আসা উচিত।"

এই কথা বলিয়া হেমন্তলাল কটিদেশ হইতে শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া কক্ষের অর্গলটী খুলিয়া সম্মুখের দালানে বাহির হইয়া পড়িল। চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া সে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তার পর সে সেইরূপ সাবধানতার সহিত কক্ষমধ্যে ফিরিয়া আসিয়া অতি মৃদুভাবে পূর্ব্ববৎ দ্বার বন্ধ করিল।

হীরা উৎসুকচিত্তে বলিল—"কাহাকেও দেখিতে পাইলে কি?"

হেমন্তলাল মৃদু হাস্যের সহিত বলিল—"কেবল চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার। মানুষ ত কেহই নাই। যাই হ'ক আমাদের কথাটা শেষ করিয়া ফেলা যাক। বেশীক্ষণ দুইজনে এই ভাবে বসিয়া থাকাও নিরাপদ নয়।"

হীরা। বল—তাহা হইলে কি করিতে হইবে আমাকে। হত্যা করা ছাড়া যদি আর কোন উপায় থাকে, আর সে উপায় যদি অতি দুঃসাহসিক হয়, আমার হাতে-নাতে ধরা পড়িবার কোন সম্ভাবনা না থাকে, বল আমি তাহা করিতে প্রস্তুত।"

হেমন্তলাল কি চিন্তা করিয়া বলিল—"একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব কি? রাগ করিবে না ত?"

হীরা। না—তোমার কোন কথায় কখনও কোন দিন রাগ করি নাই, আজ করিব কেন?

হেমন্ত। তুমি কি রাজাকে ভালবাস?

হীরা। একটুও না। আমাদের দুজনের মধ্যে বয়সের অনেক তফাৎ। যৌবনের সাধ আকাঙ্ক্ষা অনেক। আমি দরিদ্রা হইলেও সামান্য অর্থের লোভে একজনকে ভালবাসিতে বা আত্ম-বিক্রয় করিতে পারি না। তোমার জন্যই আজ আমি এই ভাণের অভিনয় করিতেছি। শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে রাজা এ পর্য্যন্ত আমার অঙ্গস্পর্শ করিতে পারেন নাই। তাহাকে আমি বলিয়াছি কি জান—"আমি আপনার সম্পূর্ণ অযোগ্য। থাকিবার মধ্যে আছে আমার এইরূপ আর যৌবন, আপনি যদি শাস্ত্রমতে বিবাহ করিয়া আমায় রাণী-রূপে সকলের সমক্ষে রাজদরবারে আপনার পাশে বসাইতে পারেন—তাহা হইলে হয় ত আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি। আপনার

পরিচর্য্যা করিবার জন্য হেমন্তলাল আমায় আনিয়া দিয়াছে। যে স্নেহ এখন দেখাইতেছেন তাহাই এ অধিনীর পক্ষে যথেষ্ট।

হেমন্তলাল বলিল—"বটে! যাহা কখনও হওয়া সম্ভব নয়, সেই প্রস্তাবই তুমি করিয়াছ। বাহাদুর তুমি। রাজা একথা শুনিয়া কি বলিলেন?"

হীরা। হয় ত মনে মনে ভাবিলেন সবুরে মেওয়া ফলে। আমার সন্তোষের জন্য বলিলেন—ভাল—কথাটা আমায় ভাবিয়া দেখিতে দাও?

হেমন্ত। তিনি কি নিত্য সেরাজী পান করেন? আর তোমার গান শোনেন?

হীরা। সেরাজীর নেশায় মস্‌গুল হইলে গান বন্ধ করিয়া দেন। একটু বাতাস করিলে ঘুমাইয়া পড়েন। আমিও সরিয়া পড়ি।

হেমন্তলাল হাসিয়া বলিল—"আমার কথাটা ঠিক বিশ্বাস হইতেছে না। অতি বড় শয়তান সে। সে যে তোমার সঙ্গে এতটা সরল ব্যবহার করে, ভদ্রতা দেখায় ইহা আমি কল্পনায় ভাবিতেও পারি না।"

হীরাও মৃদু হাস্যের সহিত বলিল—"তুমি যদি একথা বিশ্বাস না করিতে চাও, আমি তোমায় বিশ্বাস করাইব। কাল আমি যখন রাজার কাছে থাকিব—তখন তুমি গুপ্তভাবে আমাদের কার্য্য-কলাপ লক্ষ্য করিতে পার।"

হেমন্তলাল এতটা করিতে প্রস্তুত ছিল না। রাজা যে কক্ষে থাকিতেন সেটা অন্দর-মহলের কক্ষ। প্রধান শরীররক্ষী হইলেও তার গতিবিধির একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল, সুতরাং সে বলিল—"না—হীরা, তোমার কথায় আমি অবিশ্বাস করিতেছি না। যাই হ'ক তুমি কি দুই এক দিনের মধ্যে কাজটা হাসিল করিতে পারিবে না?"

হীরা। চেষ্টা করিয়া দেখি কতদূর হয়। তুমি সর্দ্দারকে অধীর হইতে বারণ করিও।

বলাবাহুল্য—এ সর্দ্দার আর কেহই নয়। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ভৈরব।

রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া হেমন্তলাল অতি সন্তর্পণে হীরার কক্ষ হইতে নিজের ডেরায় চলিয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বরাত্রে হীরা অসুখের ছলনা করিয়া রাজার নিকট হইতে একটু সকাল সকাল চলিয়া গিয়াছিল।

সুতরাং পরদিন রজনীর প্রথম যাম উত্তীর্ণ হই-বার পর, মোহিনীবেশে হীরা যখন রাজকক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে কুর্ণীস করিয়া বলিল—"বন্দেগী মহারাজ! দাসী হাজির।"

তখন রাজা চন্দ্রমাধব সেরাজী পান করিয়া একটু উল্লসিতচিত্ত ছিলেন। দেশে যে যখন রাজা হয়, তাহাদের চালচলন অনুকরণ করা তখন দেশের বড় লোকদের মধ্যে একটা রেওয়াজ হইয়া দাঁড়ায়। মোগল আমীর ওমরাহেরা যেরূপ ভাবে পোষাক পরিচ্ছদ পরিতেন, যেরূপ কায়দায় চলিতেন, সে কায়দাটা বাঙ্গালার জমীদারেরাও দেশকাল-সময়োপযোগী ভাবিয়া তাহার অনুকরণ করিয়াছিলেন। সবই যদি অনুকরণের মধ্যে আসিয়া পড়িল, তখন সেরাজিই বা বাদ যায় কেন?

রাজা চন্দ্রমাধব হীরাকে তাঁহার কাছে বসাইয়া সস্নেহে বলিলেন,—"তুমি আজ কেমন আছ? তোমার বিলম্ব দেখিয়া তোমার অভ্যর্থনার জন্য আমি নিজের হাতে পাত্র পূর্ণ করিয়া একটু সেরাজী পান করিয়াছি।"

"ভালই করিয়াছেন জনাব! সে দিন আপনি আদেশ করিয়াছিলেন—হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের মত

পোষাক পরিয়া আসিতে। এই সাজগোজের জন্যই আমার দেরী হইয়া গেল।"

রাজা সহাস্যমুখে বলিলেন,—"আজ সত্যই তোমাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছে! সে দিন কবে হইবে হীরা যে দিন আমি তোমাকে সম্পূর্ণরূপে আপনার করিয়া লইতে পারিব ?"

হীরা, একপাত্র সেরাজী ঢালিয়া মহারাজের সম্মুখে ধরিয়া বলিল,—"সে ত জনাবের মরজি! আমার যা মনের কথা—তা তো আপনাকে প্রথমেই বলিয়াছি।"

রাজা সহাস্যমুখে বলিলেন,—"হাঁ—হাঁ ঠিক্—ঠিক! আমার সব কথা সব সময়ে মনে থাকে না। বিশেষতঃ যখন, তোমায় দেখি, তখন অনেক কথাই ভুলিয়া যাই। যাই হ'ক হীরা আজ তোমায় একটী নূতন জিনিস দেখাইব!"

বলিয়া রাজা উঠিয়া নিকটস্থ একটী লৌহসিন্দুকের চাবি খুলিলেন। তাহার মধ্য হইতে একটী সুন্দর বাক্স বাহির করিলেন!

এই সিন্দুক খোলার ব্যাপার দেখিয়া হীরা মনে মনে চমকিয়া উঠিল। হেমন্তলাল এই সিন্দুকের কথাই তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিল। চাবিটী রাজা একটী সরু স্বর্ণ-শৃঙ্খলে নিজের গলায় ঝুলাইয়া রাখিতেন। সুতরাং চাবি কোথায় থাকে হীরা আজ তাহা প্রথম দেখিল।

বাক্সটী আনিয়া অতি সন্তর্পণে খুলিয়া রাজা হীরাকে বলিলেন,—"দেখ দিকি এই রত্নহার ছড়াটী কেমন দেখিতে ?"

হীরা রাজার প্রদত্ত রত্ন-হারটী লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিল,—"আমরা ইহার কি কিম্মত কি করিয়া বুঝিব মহারাজ! আমি ত এ সব জিনিস এ পর্য্যন্ত চোখেই দেখি নাই।"

রাজা সহাস্যে বলিলেন,—"চিরদিন চোখে দেখিবে, তোমার ঐ কম্বুগ্রীবায় এই হার চিরদিন শোভিত হইবে, তাহার জন্যই এই হার নির্ম্মিত হইয়াছে। এ হার তোমার! কণ্ঠে পরিধান কর দেখি, কেমন দেখায় দেখি।"

হীরা সেই হীরামতির হার পরিল। তাহার কণ্ঠশোভা, বসনের শোভা, অঙ্গের শোভা যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ভক্তিভরে রাজা চন্দ্রমাধবের চরণ স্পর্শ করিয়া করজোড়ে তাঁহাকে একটী প্রণাম করিল।

রাজা বলিলেন,—"আর এক পাত্র সেরাজী দাও। আর তোমার সেই গানটী "নিঠুর সামরিয়া না মারো পিচকারী" সেই গানটী গাও।

হীরা মনে মনে ভাবিল,—"আজই আমায় সব কাজ শেষ করিতে হইবে। কৃতজ্ঞতা অকৃতজ্ঞতা বিচার রাখিলে চলিবে না। হেমন্তলাল আমার সর্ব্বস্ব। তাহার দেহস্পর্শ করিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা পূর্ণ করিব।" সে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে একবার সেই খোলা সিন্দুকটীর দিকে চাহিল।

তার পর সে পাত্র পূর্ণ করিয়া রাজাকে সেরাজী দিল। রাজা পানপাত্র শেষ করিয়া সিন্দুকের চাবিটী ঠিক করিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। চাবিটী আর গলায় না রাখিয়া বালিসের নীচেই রাখিলেন। হীরা তাহা লক্ষ্য করিল। তাহার মুখমণ্ডল হর্ষপূর্ণ হইল।

হীরা আর একপাত্র সেরাজী ঢালিল; রাজা জানিতেন, হীরা সেরাজী পানে অনভ্যস্তা। হীরাই এ কথা তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিল।

রাজা বলিলেন,—"এইবার সেই গানটী গাও।"

হীরা। এ পাত্রটী আপনি শেষ করুন। তার

পর আমি আপনার পদ সেবা করিতে করিতে গান গাহিব।"

পাত্র শেষ করিয়া রাজা বলিলেন—"হীরা তুমি কত সুন্দর! আমার প্রাণে কত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তোমারই জন্য। একটা প্রদেশের মালিক আমি। তুমি এই কয় দিনেই আমাকে তোমার গোলাম করিয়া ফেলিয়াছ! জানি না হীরা, জানি না প্রিয়তমে—কবে তুমি আমার আশা পূর্ণ করিবে?"

হীরা তখন গান ধরিয়াছে। সেরাজীর মোহ, সঙ্গীতের স্বর, পুষ্পপাত্রে ন্যস্ত সুগন্ধি পুষ্পের উন্মাদনা,—ইহাতে রাজার স্বর জড়াইয়া আসিল।

রাজা জড়িতকণ্ঠে বলিলেন,—"আর একপাত্র সে-রা-জী! বড় ঘুম পাচ্ছে!"

হীরা আর একপাত্র সেরাজী দিল। রাজা চান্দ্রমাধব শয্যার উপর ঢলিয়া পড়িলেন। রাজবাড়ীর ঘণ্টা ঘর হইতে দ্বিপ্রহরের ঘড়ি বাজিয়া গেল।

রাজাকে নিদ্রিত দেখিয়া হীরা বুঝিল এই সুযোগ। সে দুই একবার রাজার পা ধরিয়া মৃদুভাবে নাড়া দিয়া ডাকিল,—"মহারাজ ঘুমাইলেন কি?"

সেরাজীর নেশায়, সুন্দরী রমণীর সাহচর্য্য ও সেবায় মসগুল, রাজা চন্দ্রমাধব তখন সত্য সত্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

হীরা তখন কক্ষদ্বারটী ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়া, উপাধানতল হইতে, সে স্বর্ণ শৃঙ্খলাবদ্ধ চাবিটী বাহির করিয়া সিন্দুক খুলিল। অতি সতর্ক দৃষ্টিতে দেখিল, তাহাতে অনেক বহুমূল্য রত্নালঙ্কার রহিয়াছে। সে তাহার কিছুই লইল না। সেই সিন্দুকে একটীমাত্র শীলমোহর করা লেফাফা ছিল।
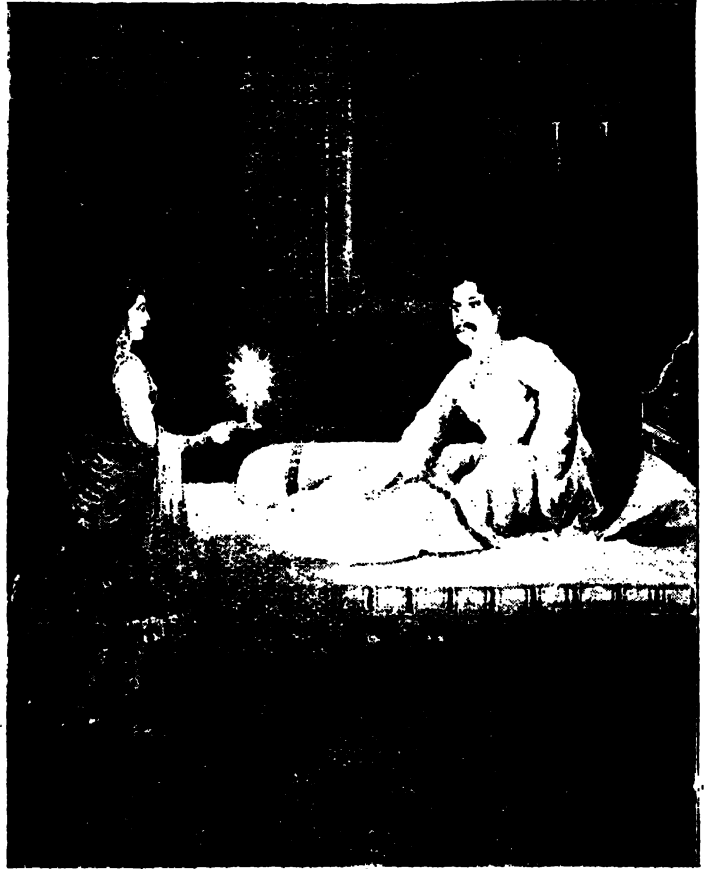
"এই যে মহারাজ আমি।"

হীরা সেইটী লইয়া তাহার বক্ষ বসনের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল। তার পর চাবিটি পূর্ব্বের মত উপাধানতলে রাখিয়া দিল।

এই সময়ে রাজা স্বপ্নের ঘোরে চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"হীরা! হীরা!"

বর্ত্তিকাটি হাতে লইয়া হীরা তাহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিল,—"এই যে মহারাজ আমি।"

সহসা উঠিয়া বসিয়া জড়িত-স্বরে রাজা বলিলেন, "রাত্রি কত।"

হীরা। দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

রাজা চোখ বুজিয়াই বলিলেন,—"না তুমি যাও। তোমার অসুখ করবে। বাদীকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ে যে-ও।"

হীরা চলিয়া গেল। যাইবার সময় সে প্রধানা পরিচারিকাকে অবশ্য ডাকিয়া দিতে ভুলে নাই।

রাঁচির পথে—দামোদরের উপর সেতু

রাঁচি—হানড্রু জল-প্রপাত

গল্প

রিক্সাওয়ালা

শ্রীবিমল মিত্র

এক

কিছু না হোক্ সারাদিন রিক্সা চালাইয়া রামজান মিঞা রোজ একটাকা, পাঁচসিকা উপায় করিত। সকালে ভোর পাঁচটা হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা দুইটা পর্য্যন্ত রিক্সা টানিয়া বাড়ীতে গিয়া দুইটা ভাত মুখে দিয়া, আবার তিনটা হইতে রাত বারোটা পর্য্যন্ত টানিত। এমনি করিয়া রামজান মিঞা মাসে বেশ কিছু জমাইতে লাগিল, এবং বস্তির মধ্যে তাহার মত পয়সাওয়ালা লোক খুব কমই ছিল।

প্রায় বছর খানেক হইল রামজান মিঞার স্ত্রী একটি কন্যা প্রসব করিয়াই মরিয়া যায়। রামজানের ইহাতে কম দুঃখ হয় নাই! সত্যিই রামজান তাহাকে বড়ই ভালবাসিত কিন্তু খোদার উপর ত' আর কাহারও হাত নাই। সুতরাং রামজান হাজার চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তবু ছোট শিশুটিকে কোলে করিয়া সে কতকটা বেদনা ভুলিতে চেষ্টা করিত। তাহার মৃত স্ত্রীর শেষ দান মনে করিয়া তাহাকে খুব আদর করিত। কিন্তু পেটের দায়ে তাহাকে সারাদিনই বাহিরে থাকিতে হইত! কন্যাকে দেখিবার যতটুকু সুযোগ পাইত সেই সুযোগটিরও সদ্ব্যবহার করিতে ভুলিত না।

রামজানের বৃদ্ধা ফুফুই সমস্ত কাজ করিত! সংসারে ওই বৃদ্ধা না থাকিলে কি যে হইত তাহা খোদাই জানেন! ছোট খুকিটির লালন-পালনের ভার তাহার উপরই পড়িয়াছিল। বৃদ্ধা সমস্ত শক্তি দিয়া ভাইপো'কে যত্ন করিত। ছোট খুকিটির উপর তাহার অত্যন্ত মায়া জন্মাইয়া গিয়াছিল; কিন্তু হাজার হউক বয়েস হইয়াছে ঢের, প্রায় ষাট হইতে চলিল—কাজকর্ম্ম কি ওই বয়সে পারা যায়? তাই মাঝে মাঝে বৃদ্ধা বলিত—রামজান আর একটা বিয়ে টিয়ে কর! ছোট মেয়েটারও যত্ন হবে—তুইও সুখে থাকবি! এই সারাদিন খেটে-খুটে এলি এখন একটা বউ থাকলে তবু একটু দেখবে শুনবে! আমি কি আর এই বয়সে ওসব পারি?

রামজান বলিত—কাজ কি ফুফু! বেশ আছি; তবে তোমার বড্ড কষ্ট হয়! কিন্তু ভয় হয় যদি সে এসে মেয়েটাকে 'অছেধ্যা' করে। ওর কষ্ট হ'লে আমি আর বাঁচব না! নইলে ত' উজীর আলি প্রায়ই বলে—ওর মেয়েটাকে বিয়ে করতে—সে দেখতেও বেশ খাপসুরৎ। আমি মত দিই না শুধু ওই ছোট মেয়েটার কষ্ট হবে বলে; হাজার হোক পর কি আর পরকে নিজের মত করে নিতে পারে?

ফুফু বলে—তা' রামজান, আমি বলি তুই মত দিয়ে দে। সে শুনিছি না কি বেশ দেখতে; তা, যদিই সে এই মেয়েটাকে না দেখতে পারে, আমি রয়েছি, আমি দেখব!

রামজান আর কোন উত্তর দেয় না;—মনে মনে মৃত স্ত্রীর মুখখানা ভাবিতে চেষ্টা করে। ভাবিয়াই শিহরিয়া ওঠে! সত্যিই ত'! তাহারই জায়গায় নূতন আর একজনকে বসাইবে, ইহাতে তাহার মৃত স্ত্রীর প্রতি কি অবিচার করা হয় না? রামজান এক একদিন তাহার স্ত্রীর কবরটা দেখিতে যায়। সেখানে গিয়াই তাহার চোখ দিয়া হু হু করিয়া জল ছাপাইয়া উঠে—বুকের ভিতর যেন রি রি করিতে থাকে—কলিজা যেন খসিয়া যাইতে

চায়। কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া ভাবে—তাই ত'! বুদ্ধা ফুফু আর কতদিন বাঁচিবে—কিছুদিন বাদেই তাহার দেহ কবরের ধূলায় মিশিয়া যাইবে! তাহার পর? তাহার পর যে কেমন করিয়া দিন কাটিবে রামজান তাহা ভাবিয়া পায় না।

একবার ভাবে ফুফুর কথামত উজীর আলির মেয়েকে বিয়ে করাই উচিত, কারণ তাহা হইলে হয় ত মেয়েটার একটু সুরাহা হইবে—কিন্তু সে যদি ছোট মেয়েটাকে নিজের মেয়ের মত না যত্ন করে? ভাবিতেও ভয় হয়!

উজীর আলির মেয়ের নাম সরীফান। সরীফান দেখিতে বেশ, গোলগাল দেহটা লইয়া সরীফান যখন হেলিতে দুলিতে পাড়ায় বেড়াইতে যায় রামজান তাহার প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে! একগাল পান চিবাইতে চিবাইতে ঠোঁট লাল করিয়া সরীফান তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতে থাকে:—রামজান চোখ ফিরাইয়া লয়! মৃত স্ত্রীর মুখটা কোথা হইতে চোখের সামনে ভাসিতে থাকে।

রামজান প্রায়ই দেখিত সরীফান ওপাশের তেতালা বাড়ীর মালিক বনমালী বাবুর বাগানের পুকুরে গিয়া অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় সাবান মাখিতেছে, আর তারই বিপরীত দিকের নারিকেল গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া শোভন মিঞা তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে, কত কি ইঙ্গিত করিতেছে। রামজানের মনে হইত লাঠি মারিয়া শোভনের মাথাটা গুঁড়া করিয়া দেয়—কিন্তু খামকা মারামারি করিয়া লাভ কি? আর সরীফানেরই বা কি আক্কেল? একটু লজ্জাও কি নাই!

শোভন মিঞা ছিল পাঁড় মাতাল;—পাড়ার বউ মেয়েদের প্রতি সে একটু বিশেষ রকমে নজর দিত! রাত্রে কোনদিন বাড়ী ফিরিত না, তবে আজকাল দিনে কোথাও যায় না পাড়াতেই থাকে। তাহার কারণ সরীফান। শোভন শুনিয়াছিল রামজানের সহিত সরীফানের বিবাহের কথা হইতেছে, তাই পাছে হাতছাড়া হইয়া যায়, সেই জন্য সে সরীফানের উপর একটু কড়া নজর রাখিয়াছে; সরীফান কিন্তু রামজানকেও বড় ভাল নজরে দেখিত না—তবে সে তাহাকে একটু ভয় করিয়া চলিত।

রামজান জানিত সরীফান শোভন মিঞার প্রতি আকৃষ্ট! এবং শোভন মিঞাও একথা ভাল রকম জানিত;—সরীফান আকার-ইঙ্গিতে ইহা শোভনকে অনেকবার বুঝাইয়া দিয়াছে। কিন্তু প্রধান বাধা হইতেছে সরীফানের বাপ, মা; তারা কিন্তু ঐ মাতালটাকে মোটেই আমল দেয় না।

সরীফান এই ক'দিনের মধ্যে শুনিয়াছিল রামজানের সহিত তাহার বিবাহের কথা হইতেছে; তবে রামজানকে তা'র একেবারে অপছন্দ হয় নাই! তা'র বাপ, মা যদি জোর করিয়া রামজানের সঙ্গেই বিবাহ দিয়া দেয় তাহা হইলে তাহাকে বাধ্য হইয়া রামজানের স্ত্রী হইয়া থাকিতে হইবে!—তবে সরীফান যে শোভনকে পছন্দ করে তাহা শুধু শোভনের দেওয়া নূতন নূতন উপহারের খাতিরে। এই দু'একমাসের মধ্যেই সরীফান প্রায় দশ বারো টাকার সাবান, কাঁটা, ফিতা আরও সাদা সাদা গুঁড়োর মত মুখে মাখিবার সব গন্ধওলা জিনিস, শোভনের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইয়াছে!

দুই

সেদিন রাত্রে উজীর-আলি স্ত্রীকে ডাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল—ওগো শুনছ! তাহার স্ত্রীর নাম হামিদা; হামিদার তখন ঘুমে চোখ জুড়িয়া আসিয়াছে; কোনও রকমে মুখ দিয়া বাহির হইল!—হুঁ!

উজীর আলি আবার বলিল—শুনছ!

হামিদা জোর করিয়া বলিয়া উঠিল—এখন জ্বালাতন কোর না—সারাদিন খেটে খুটে রাত্তিরে একটু আরাম করে' ঘুমোব তারও যো নেই!

উজীর আলি না দমিয়া বলিল—কাজের কথা বলছি শোনই না ছাই!

হামিদা মুখ ঝাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল—তোমার কোন্ কথাটা অকেজো?—সবই ত দেখি কাজের!

উজীর আলি বলিল—না না এটা সত্যিই কাজের কথা!—বলছিলাম কি, রামজানের সঙ্গে সরী'র বিয়ে দিলে কেমন হয়?

হামিদার তখন ঘুম চটিয়া গিয়াছে! সরীর বিবাহের কথা কাজের কথাই বটে!—স্বামীর কথায় বিস্মিত হইয়া হামিদা বলিল,—ও আমার পোড়া-কপাল!—একথা আমি ত' তোমায় হাজার বার বলেছি তা' তুমি কি তখন কান দিয়েছ?

উজীর আলি বলিল—না না তা' নয়; তবে এখন সরীর বয়েস হয়েছে তাই বলছিলুম।—

হামিদা বলিল—এতদিন কি চোখের মাথা খেয়েছিলে যে দেখতে পাও নি?

উজীর আলি বলিল—আহা চট কেন!—আস্তে আস্তে যা' বলি শোনই না!—রামজান মিঞার সঙ্গে বিয়ে দিলে সরী'র কোন কষ্ট হবে না—বেশ আরামেও থাকবে আর রামজানের পয়সাও আছে।

হামিদা বলিল—সে ত আমি হাজার বার বলেছি!—তুমি ত' ভেতরকার খবর জান না, ওই শোভনটার সঙ্গে ছুঁড়িটা ঠাট্টা তামাসা করে—আর শোভনও কত ফিতে, কাঁটা, আলতা ওকে দেয়!—সে সব ত' আর জান না! এই বেলা বিয়ে দিতে না পারলে কোন্ দিন শোভন সরীকে নিয়ে স'রে পড়বে!—এ আমি আগে থেকে ব'লে রাখছি!—

উজীর বলিল—তা' যাক্! আমি কালই রামজানের কাছে গিয়ে সমস্ত বলে আসব!—রামজানের আবার একটা ছোট মেয়ে আছে—তা' থাক্!—ওতে কি আসে যায়!—কি বল?

হামিদা বলিল—তা' ত বটেই!—এই দেখ না তোমায় আমায় যখন বিয়ে হয়—তখন ত' তোমার একটা দু'বছরের ছেলে ছিল;—সেদিন না হয় সেটা মরল, কিন্তু বিয়ের সময় ত' সেটা ছিল!—ওসব ভাবতে গেলে চলে না!

উজীর পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল,—আচ্ছা কালই আমি রামজানের কাছে যাব।

হামিদা বলিল—তাই যেও।

খানিক পরেই উজীর আলির নাকডাকার শব্দ শ্রুত হইল—হামিদাও তার পর ঘুমাইয়া পড়িল।

রামজানের সঙ্গে সরীফানের বিবাহের সম্বন্ধ একেবারে ঠিক হইয়া গিয়াছে।—সরীফান তাই খুব সাজিয়া বেড়ায়, রামজানের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তেমনি করিয়া হাসে—এক একদিন রামজান বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলে সরীফান রামজানের বৃদ্ধা ফুফুর কাছে গিয়া গল্প করে;—ছোট মেয়েটিকে কোলে করে, গালে চুমু খায়;—বৃদ্ধা ফুফু দেখিয়া খুবই সন্তুষ্ট!—দিন কতক বাদেই ত' সরীফান রামজানের স্ত্রী হইয়া আসিবে তাই আগে হইতেই ছোট মেয়েটীর সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতেছে!

শোভনের দিন কিন্তু ভাল যাইতেছে না; সরীফান আর তাহার দিকে চাহিয়া তেমন করিয়া হাসে না—শোভনের দামী দামী উপহার তাহার সামনেই সরীফান ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়!—শোভন শুনিয়াছিল রামজানের সহিত সরীফানের বিবাহের কথা একেবারে পাকা হইয়া রহিয়াছে। শোভন

অনেক ভাবিয়াও কেমন করিয়া যে এ বিয়ে ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় তাহা ঠিক পায় নাই!

এক উপায় আছে! রামজানকে যদি এ জগৎ হইতে একেবারে সরাইয়া দেওয়া যায়—তাহা হইলে হয় ত সরীফানকে পাইবার আশা কতকটা আছে;—

কিন্তু তাই বা কেমন করিয়া সম্ভব হয়?

তিন

শোভন রোজই প্রস্তুত থাকে! একবার সুযোগ পাইলেই হয়!—একেবারে রামজানের মাথায় লাঠি মারিয়া সরীফানকে বিবাহ করা ঘুচাইয়া দিবে।

কিন্তু রামজানের গায়েও খুব জোর। এক সময় একটা আস্ত পাটি সে একাই খাইয়াছে; একথা বস্তির কে না জানে। রামজান একটু একটু জানিত যে, শোভন তাহাকে মারিবার সুযোগ খুঁজিতেছে, তাই সব সময়েই রামজান অন্য কিছু না পাইয়া একটা লোহার হাতুড়ী সঙ্গে রাখিয়া দিত!—কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রিতে সেদিন বস্তিটা নিঝুম নিস্তব্ধ! বস্তিটা সহর থেকে অনেক দূরে! কাছাকাছি একটু বনও ছিল।

সেই সময়ে রামজান তাহার রিক্সাটা লইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল! বাঁ হাত দিয়া ঝুমঝুমিটায় ঠুন্ ঠুন্ আওয়াজও করিতেছিল।

কিছু দূর আসিয়াই যেন পিছনে কাহার পায়ের শব্দ হইল; রামজান একবার থামিল। পিছনে ঘন অন্ধকার, অনেক চেষ্টা করিয়াও কাহাকে দেখিতে পাইল না।

আবার হাঁটিতে যাইতেছে, এমন সময় আবার সেই শব্দ!

রামজান চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—কোন হ্যায় রে?

সমস্ত বন কাঁপাইয়া সেই কথাটির প্রতিধ্বনি উত্থিত হইল,—রামজান আবার আপন মনে পথ চলিতে লাগিল।

খানিক দূর গিয়াছে আবার সেই শব্দ; এবার রামজান দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ ভাবিল; কি মনে করিল। তার পর যে দিক থেকে শব্দটা আসিতেছিল সেই দিকে রিক্সাটা লইয়া পিছাইয়া আসিল।

আবার সমস্ত—স্তব্ধ;—

রামজান নিজের মনের ভুল ভাবিয়া চলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ পাশের ঝোঁপ্ হইতে হুড়মুড় করিয়া শব্দ করিতে করিতে একটি মোটা লাঠি রামজানের মাথায় পড়িতে পড়িতে নিকটস্থ একটি গাছের ডালে আট্‌কাইয়া গেল!

রামজান বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, একটি লোক ঝোঁপের ভিতর দাঁড়াইয়া আছে! লোকটি যেমন লাঠিটি টানিয়া লইয়া রামজানের মাথা লক্ষ্য করিয়া মারিতে উদ্যত হইবে, রামজান তৎক্ষণাৎ দু' পা পিছাইয়া গিয়া রিক্সা হইতে ভারী হাতুড়ীটি তুলিয়া লইয়া লোকটির দিকে সজোরে নিক্ষেপ করিল।

হাতুড়ীটি লোকটির হাতে গিয়া এমন ভাবে লাগিল যে তাহার মুখ দিয়া একটি বেদনাসূচক শব্দ উত্থিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে হাতের লাঠিটিও পড়িয়া গেল।

রামজান ক্ষিপ্রহস্তে রিক্সাটা রাখিয়া লাঠিটি তুলিয়া লইয়া বলিল,—কে রে বেইমান!

লোকটি আস্তে আস্তে হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে বলিল,—আমি রে ভাই আমি!

রামজান গলার শব্দতেই চিনিতে পারিল লোকটি শোভন! শোভন তখন পলাইবার চেষ্টা করিতেছে।

রামজান তাহার হাতটা সজোরে টান মারিয়া

বলিয়া উঠিল—চুপ কোরে দাঁড়া! এক পা নড়বি ত' খুন ক'রব!

ভীরু শোভন আর কোন কথা না বলিয়া মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার মুখ দিয়া তখন ভর্ ভর্ করিয়া মদের গন্ধ বাহির হইতেছে; হাত দিয়াও ঝর্ ঝর্ ধারে রক্ত পড়িতেছিল!

রামজান বলিল;—এই ঝোঁপের মধ্যে এত রাত্রে কি করছিলি বল্!

শোভন কোনও কথা বলিতে পারিল না। ঠিক তেমনি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

রামজান বলিল,—আমাকে মারবার জন্য তুই লাঠি তুলেছিলি কেন? সত্যি বল্!

শোভন দুই হাত জোড় করিয়া বলিল,—কসুর কর ভাই! মদ খেয়ে মাথার ঠিক ছিল না! আর কখনও ক'রব না; এবার ছেড়ে দাও ভাই!

রামজান তাহাকে এক পদাঘাত করিয়া বলিল, যা, এবার ছেড়ে দিলুম তোকে, আর যদি কখনও এমন কাজ করিস্, তোকে জেলে দেব! যা এবারকার মতন যা!

শোভন বাঁশের লাঠিটি লইয়া আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতে লাগিল,—রামজানও রিক্সাটা তুলিয়া লইয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

খানিক দূর গিয়াছে এমন সময় রামজান শুনিল, শোভন দূর হইতে চেঁচাইয়া বলিতেছে,—মনে থাকে রামজান, এর একদিন প্রতিশোধ নেব!

রামজানের মুখ দিয়া অস্পষ্ট স্বরে বাহির হইল, আসল বেইমান!

চার

ঠুন্—ঠুন্—ঠুন্—ঠুন্—

রামজান রাত বারোটার সময় রিক্সাটা লইয়া আস্তে আস্তে চলিয়াছিল; আজ বায়োস্কোপে কি একটা ভাল বই আছে, তাই অনেক লোক আসিয়াছে।

রামজান বায়স্কোপের বাড়ীটার সামনে গিয়া দাঁড়াইল, সেখানে আরও ট্যাক্সি ঘোড়ার গাড়ী রিক্সা রহিয়াছে। রামজান তাহাদেরই মধ্যে গিয়া রিক্সাটা রাখিয়া তার হাতলের উপর বসিয়া গামছা দিয়া গলা ও পিঠের ঘাম মুছিতে লাগিল। রামজান এই জায়গাটিতে রোজ আসে, এখানে সোয়ারী বেশ মেলে।

একটু পরেই বায়স্কোপ ভঙ্গ হইল; দলে দলে লোক বাহিরে আসিতে লাগিল; সকলেই নিজের নিজের গাড়ী আগাইয়া লইয়া আসিল, যাহাতে লোকে তাহাদের গাড়ীতেই উঠে।

ক্রমে ভিড় কমিয়া গেল, স্থানটা একরকম নিস্তব্ধ হইল কিন্তু রামজানের তখনও কোনও সোয়ারী মিলিল না।

রামজান ক্ষুন্নমনে ফিরিয়া আসিতেছিল; হঠাৎ দূর হইতে একজন মোটা গলায় ডাকিল—এ রিক্সাওয়ালা।

রামজান রিক্সা লইয়া লোকটির কাছে গেল। লোকটির মাথায় খুব বড় এক পাগড়ী রহিয়াছে, গালে চাপ দাড়ী, জাতে হয় ত পাঞ্জাবী। লোকটির সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক! স্ত্রীলোকটি পাঞ্জাবী নয় বাঙ্গালী; তবে স্ত্রীলোকটি যে ভদ্র ঘরের নয় তা তাহার বেশভূষা ও চোখের চাহনি দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়।

লোকটি বাঙলাতে বলিল—চিৎপুর যেতে কত নিবি?

রামজান পাঞ্জাবীকে এমন খাঁটি বাঙলা বলিতে দেখিয়া প্রথমটা বিস্মিত হইয়াছিল; আর গলার স্বরটাও যেন চেনা চেনা বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু তাই বা কেমন করিয়া হয়? রামজানের সঙ্গে

কোনও পাঞ্জাবীরই আলাপ নাই। হয় ত মনের ভুল।

রামজান বলিল—আট আনা নেব বাবু!

আচ্ছা চল্। বলিয়া পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি পাশের মেয়ে মানুষটিকে বলিল—চল ক্যান্ত! ওঠ; বড় দেরী হয়ে গেছে।

দুজনেই গাড়ীর ভেতরে বসিল। রামজান টানিতে লাগিল; লোকটি একবার বলিল, একটু জলদি জলদি নিয়ে যাবি, বখশিস্ দেব।

রামজান বখশিসের লোভে আরও জোরে টানিয়া লইয়া চলিল।

রামজান মেয়ে মানুষটির প্রতি চাহিয়া দেখিয়াছিল। সুন্দরী তত নয় তবে গা ভরা গয়না। রামজান চিৎপুর, প্রভৃতি জায়গা খুবই ভাল রকম চিনিত; ও সব অঞ্চলে সোয়ারীও অনেক মিলিত। তাই কোথায় কোন গলি রামজানের ইহা অজ্ঞাত ছিল না।

রামজান এ কয়দিন খুব খাটিতেছে। সরীফানকে মনের মত গয়না দিবে এইটা রামজানের খুবই সাধ ছিল; তাই ভোর চারিটা হইতে রাত ১টা পর্য্যন্ত রিক্সা টানে; কোন কোন দিন বাড়ী গিয়া ভাত খাইবারও সুযোগ হয় না, রাস্তায় হোটেলেই খাইয়া লয়।

ফুফু বলে—অত খাটলে কি তোর জান থাকবে রামজান? শেষকালে কি হ'তে কি হবে?

রামজান বলে—চিরকাল কি আর এই রকম খাটবো ফুফু—এই ক'টা দিন; বিয়েটা হ'য়ে যাক, তার পর খাটুনি কমিয়ে দেব।

ফুফু চুপ করিয়া যায়; রামজান, বিবাহ হইয়া গেলে তাহার দিনগুলি যে কেমন ভাবে কাটিবে তাহাই ভাবিতে থাকে।

চিৎপুর পৌঁছাইতে তখনও অনেক দেরী; খানিক দূর আসিয়া ভিতরকার লোকটি বলিল—এই রিক্সাওয়ালা এখানে কোথাও সরবতের দোকান খোলা আছে?

রামজান জানিত এই সময় কোন সরবতের দোকান খোলা, বলিল—একটু আগেই আছে বাবু! চলুন নিয়ে যাচ্ছি!

কিছু দূর গিয়া রামজান একটি দোকানের সামনে আসিয়া থামিল; রামজান বাবুর নিকট হইতে পয়সা লইয়া একগ্লাস সরবৎ আনিয়া বাবুর হাতে দিল—বাবু সরবতের গ্লাসটি হাতে লইয়া মেয়েলোকটিকে দিয়া বলিল—নাও ক্যান্ত, খাও, ভীষণ গরম পড়েছে।

খাওয়া হইয়া যাইবার পর রামজান গ্লাসটি আবার দোকানে গিয়া ফিরাইয়া দিয়া আসিল—তার পর রিক্সাটা লইয়া ঠুন্ ঠুন্ করিতে করিতে চলিতে লাগিল!

সারা কলিকাতা সহর তখন নিঝুম; দু'একটি কুকুর ক্বচিৎ চীৎকার করিতেছে! গ্যাসের আলো সারি সারি জ্বলিতেছে; একটিও দোকানে সাড়া শব্দ নাই, শুধু রাস্তার মোড়ে মোড়ে একটি করিয়া পুলিশ দাঁড়াইয়া ছিল; এই সব দেখিয়া মনে হয় না যে এই সহরই আবার দিনের বেলায় লোকজনপূর্ণ কোলাহলময় হইয়া উঠিবে।

রামজান আপন মনেই চলিয়াছিল; তাহার ক্লান্তিও নাই; হাতের ঝুমঝুমিটি মাঝে মাঝে বাজাইতেছে আবার মাঝে মাঝে থামাইতেছে; রাতের নির্জ্জনতা তাহাকে যেন মোহাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে—সে নিজের মনে কি ভাবিতেছে কে জানে? এই সহরকেই সে ভোর চারটার সময় ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিতে দেখিল—আবার এই সহরকেই সে এখন নিদ্রিত দেখিতেছে; ইহারই মাঝে যে কি রহস্য গুপ্ত রহিয়াছে রামজানের কাছে

তাহা গোপন থাকে না—হয় ত এই জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তাও এমনি করিয়া নিজচক্ষে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় একই সঙ্গে দেখিতেছেন।

অনেক দূর আসিয়াছিল; আর বেশী দেরী নাই চিৎপুর পৌঁছাইতে; হঠাৎ ভিতরের লোকটি বলিয়া উঠিল—ও হোঃ, হোঃ! বড় ভুল হ'য়ে গেছে ত'। বায়োস্কোপ দেখতে গিয়ে ছাতিটা হারালুম! ও রিক্সাওয়ালা থাম থাম। ছাতিটা ফেলে এসেছি সেখানে; যাই সেখানে একবার; কালকে গেলে আর কি পাওয়া যাবে? নগদ পাঁচ টাকা দিয়ে কাল কিনলুম আর আজ কি না—

ভদ্র লোকটি নামিয়া পড়িল! রামজান বলিল—কি বাবু চিৎপুর যাবেন না?

লোকটি বলিল—না না আমার আর যাওয়া হোল না; ছাতিটা সেখানে ফেলে এসেছি। তুমি এই স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে যাও—চিৎপুর রোডে যেতে প্রথম যে গলিটা পড়ে সেই গলির ভেতরে পনেরো নম্বর বাড়ীতে একে নামিয়ে দেবে। ও এখন ঘুমুচ্ছে,—দেখো বেশী নাড়া চাড়া কোর না, আস্তে আস্তে নিয়ে যাও—আমি ছাতাটা খুঁজে নিয়ে আসছি।

রামজান বলিল—বাবু ভাড়াটা কে দেবে?

লোকটি বলিয়া উঠিল,—ও এই নাও, বলিয়া ব্যাগ হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া দিল—তার পর বলিল—আট আনা বখশিস্ দেব বলেছিলুম—আর আট আনা ভাড়া।

লোকটি চলিয়া গেল, রামজান দেখিল তাহার হাতে কিসের একটি পুঁটুলি রহিয়াছে।

তার পর আস্তে আস্তে রিক্সার ভিতরে দেখিল স্ত্রীলোকটি ঘুমাইতেছে; রামজান আর কিছু কথা না বলিয়া রিক্সা টানিয়া লইয়া চলিল।

চিৎপুর জায়গাটায় ভিড়টা একটু বেশীই হইয়া থাকে; কিন্তু সে সময়টা একেবারে স্তব্ধ।

রামজান দেখিয়া দেখিয়া গলিটার ভিতর ঢুকিল; ঘেঁসাঘেঁসি বাড়ীগুলির নম্বর খুব কষ্ট করিয়া দেখিতে লাগিল; নিশাচরদের যে জায়গাগুলি অতি প্রিয় এই স্থানটি তাহার অন্যতম! কিন্তু তখন কাহারও সাড়া-শব্দ নাই; গান বাজনার বিকট সুরও আর শোনা যাইতেছে না—প্রতি বাড়ীর সম্মুখে যেখানে একপাল বিলাসিনীর দল রোজ সন্ধ্যাবেলা বসিয়া বসিয়া পথিকের মন আকৃষ্ট করে, সেখানে এখন কেহই নাই—যে স্থানটি এক সময় প্রেতভূমি অপেক্ষাও ভীষণ মনে হয় সে স্থানটি এখন সাধারণ বলিয়াই মনে হইল। বাড়ীগুলি যেন শূন্য পড়িয়া আছে—বাস করিবার কেহই নাই।

রামজান ইহারই পাশ দিয়া চলিতে লাগিল; এখানে সে অনেকবার আসিয়াছে তবু যেন আজ তাহার ভয় করিতে লাগিল।

নির্দ্দিষ্ট বাড়ীটির সামনে আসিয়া রামজান রিক্সা নামাইল; সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের স্ত্রীলোকটি হুড় মুড় করিয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িল।

রামজান প্রথমে চমকাইয়া উঠিয়াছিল; মনে করিয়াছিল তাহার তাড়াতাড়িতেই হয় ত স্ত্রীলোকটি ভার ঠিক না রাখিতে পারিয়া পড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু যখন দেখিল সে নড়িতেছে না—কথাও বলিতেছে না তখন রামজান তাহাকে ধরিয়া তুলিতে গিয়া ভয়ে লাফাইয়া উঠিল! তাহার গা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা; এঁ্যাঃ মৃত! তবে সে এতক্ষণ শবদেহ বহন করিয়া আনিতেছে।

রামজান ভাবিল তাই ত। এখন কি করা যায়। এখন লোকে তাহাকেই সন্দেহ করিবে? রামজান বুঝিল সেই পাঞ্জাবীটারই এই কাণ্ড! কিন্তু

সে কেমন করিয়া হত্যা করিল। রামজান বার বার স্ত্রীলোকটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিল কিন্তু কোথাও ত' ক্ষত চিহ্ন নাই! তবে হয় ত—ও এইবার ঠিক হইয়াছে, লোকটি যখন সেই সরবৎ হাতে করিয়া লয়—সেই সময় হয় ত তাহাতে বিষ মিশাইয়া দিয়াছে!

রামজানের গা শিহরিয়া উঠিল; উঃ এত বড় পাজী সেই শয়তান।

রামজান সেখানে আর দাঁড়াইতে পারিল না। রিক্সাটা হাতে লইয়া চলিয়া আসিতেছিল। এমন সময় একটি লোক পিছন হইতে 'চোর চোর, ডাকাত' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে সেই দিকে আসিতে লাগিল।

রামজান পলাইল না, সেইখানেই কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

লোকটি তখনও সেই রকম চীৎকার করিতেছে; রামজান একবার ভাবিল,—পলাইবে কি দাঁড়াইয়া থাকিবে? সে ত' সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী —কিন্তু সে যদি সকলের সাম্‌নে তাহা বলে— কেহ কি তাহার কথায় বিশ্বাস করিবে? আর রামজান যে, স্ত্রীলোকটির গয়না চুরি করিবার জন্য তাহাকে হত্যা করিয়াছে—এ ত' সকলেই বলিবে; রামজান স্ত্রীলোকটির দিকে চাহিয়া দেখিল—তাহার গায়ে একটিও গয়না নাই; তবে রামজান যে সেই পাঞ্জাবীটাকে পুটুলি হাতে করিয়া নামিতে দেখিয়াছে—সেই পুটুলির ভিতর হয় ত সমস্ত গয়না ছিল।

যে লোকটি এতক্ষণ চীৎকার করিতেছিল সে এখন কাছে আসিয়া পড়িয়াছে—তাহারও হাতে একটি পুটুলি রহিয়াছে; রামজান চিনিল লোকটি শোভন! রামজান এখন সমস্ত ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল; তবে শোভনই রামজানকে দোষী করিবার জন্য পাঞ্জাবী সাজিয়া ওই স্ত্রীলোকটিকে হত্যা করিল; উঃ এত বড় শয়তান? একদিন যে শোভন বলিয়াছিল প্রতিশোধ লইবে, আজ সে সেই প্রতিশোধ লইল।

লোকটির চীৎকারে পাড়ার সকলে আসিয়া জুটিয়াছিল; দেখিতে দেখিতে স্থানটি স্ত্রীলোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল; শোভন হাত মুখ নাড়িয়া সকলকে পুটুলিটি দেখাইতে লাগিল এবং রামজান যে ওই স্ত্রীলোকটিকে বিষ খাওয়াইয়া গয়নাগুলি লইয়া পালাইতেছিল ইহা তৎক্ষণাৎ প্রমাণ হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরেই লালপাগড়ী দেখা দিল; রামজান হাজার বার বলিল,—বাবু আমি ওকে মারি নি—কিন্তু তাহার কথা তখন কে শোনে! শোভন মিঞা জোর গলায় বলিল,—তুই মারিসনি ত' কি আমরা মার্‌তে গেছি! এখানে খুন ক'রে পালাবার যো' নেই! এ বাবা ইংরেজ রাজ্য, যেমন কাজ তেমনি শাস্তি!

স্ত্রীলোকের দল এ কথায় সম্পূর্ণ সায় দিল; কেহ বলিল, ভাগ্যিস্ তুই ছিলি শোভন, নইলে লোকটা পালিয়ে যেত!

শোভন এ কথায় কৃতার্থ হইয়া বলিল,—এ মিঞা নেই, এমন জায়গাই নেই; হুঁ বাবা ওরা ঘোরে ডালে ডালে আর আমি ঘুরি পাতায় পাতায়!

ততক্ষণ পুলিশের বড় সাহেব আসিয়া পড়িয়াছে; বড় সাহেব শবদেহ পরীক্ষা করিয়া স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্য নোটবুকে লিখিয়া লইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে রামজানের হাতে হাতকড়া পড়িল।

• • •

বিচারে রামজ্জানের ফাঁসির হুকুম হইয়া গেল; কালই ফাঁসির দিন। ঠিক কালই রামজানের বিবাহের দিন ঠিক হইয়াছিল, কিন্তু খোদার কি বিধান? যে দিন বিবাহ ঠিক হইয়াছিল, সেই দিনই তাহার ফাঁসি! রামজান সরীফানের কথা ভাবে—হয় ত শোভনের সঙ্গেই তাহার বিবাহ হইবে! হয় ত কেহ সন্দেহও করিবে না যে এ ফাঁসির জন্য শোভন দায়ী; হয় ত সরীফানও এ কথা বিশ্বাস করিবে—করুক! কাল ত' তাহার শেষ দিন! সমস্ত চিন্তা, সমস্ত আশা, সব ব্যথা কালই ফুরাইয়া যাইবে! কিন্তু শুধু একটি ইচ্ছা তাহার এখনও আছে—তাহার দুই বছরের ছোট মেয়েটাকে যদি একবার শুধু একবার দেখিতে পাইত! একবার তাহাকে শেষ চুমা খাইয়া লইত! রাত্রে জেলের ভিতর বসিয়া রামজান এই কথাই ভাবিতেছিল, আর তাহার চোখ দিয়া দু' এক ফোঁটা জলও গড়াইয়া পড়িয়েছিল!

শান্তির নিলয়

গল্প
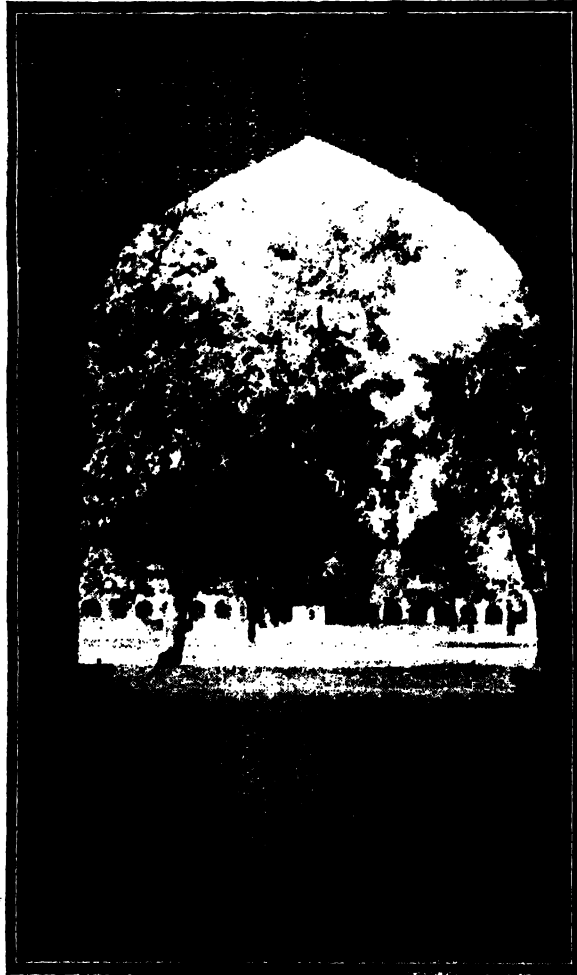
কুলির মেয়ে

শ্রীমতী সুবাসিনীবালা বসু

ক

"পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয়,—ঐ দেখ সাহেব।"

ভীতভাবে রমণীগণ পশ্চাতের দিকে চাহিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘোমটা টানিয়া যে যেদিকে পারিল দ্রুতপদে পলায়ন করিল। কেবল একটা নিটোল-যৌবনা যুবতী পলাইল না। সে ধীরে ধীরে আপনার দেহ ভাল করিয়া আচ্ছাদন করিয়া, আর্দ্র বস্ত্রখানি হাতে লইয়া, কুলি-ব্যারাকে প্রবেশ করিল। কয়েক মুহূর্ত্তে কলতলা জনশূন্য হইল। সাহেব এক-দৃষ্টে যুবতীর গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যুবতী দৃষ্টির অন্তরাল হইলে, সাহেব আরদালি রামজানকে তাহার পরিচয় লইয়া আসিবার জন্য আদেশ করিলেন।

কিছুক্ষণ বাদে রামজান ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মেয়েটা সুরযমলের বিধবা কন্যা।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুরযমল কে?"

রামজান উত্তর দিল, "সুরযমল একজন পাহাড়ী কুলি। পনেরো নম্বর কুঠুরিতে থাকে। প্রায় ছ'মাস হ'ল এখানে কাজ ক'রছে।"

সাহেব আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। তিনি আজ ভাল করিয়া কুলি-ব্যারাক দেখিয়া শুনিয়া, প্রায় এক ঘণ্টা পরে বাংলায় ফিরিলেন।

তার পর সাহেবকে প্রায় কাজে-অকাজে, সময়ে অসময়ে ও কারণে-অকারণে কুলি-ব্যারাকে দেখা যাইতে লাগিল। যখন কুলিরমণীগণ কলতলায় জল ভরিতেছে বা কাপড় কাচিতেছে, হঠাৎ সেই সময়ে সাহেব সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। কুলিরমণীগণ আপনাদের কাজ ফেলিয়া ব্যস্তভাবে পলায়ন করে। এখন হইতে তারাও সময় বুঝিয়া কলতলায় আসিতে লাগিল।

কুলিগণ রোজ সাহেবকে ব্যারাকে আসিতে দেখিয়া, ভীত ও বিস্মিত হইল। কিন্তু তারা অধিকতর আশ্চর্য্য হইল, যখন সাহেবকে দীর্ঘসময় ধরিয়া নবাগত কুলি সুরযমলের কুঠুরির সামনে দাঁড়াইয়া, তাহার সঙ্গে কথা কহিতে দেখিল। এই ভাবে দুই মাস কাটিল।

খ

সে দিন সুরযমলের মাহিনা যখন পনেরো হইতে একেবারে পঁচিশে গিয়া উঠিল, তখন সে দিন অন্যান্য কুলিরা তত আশ্চর্য্য হইল না।

সুরযমল গৃহে ফিরিয়া কন্যাকে এ সু-সংবাদ জানাইল। কিন্তু কন্যা সুখিয়ার মুখে একটু আনন্দের লেশ দেখা গেল না, বরং ক্রমে ক্রমে তার সুন্দর মুখখানি গাঢ় অন্ধকারে ছাইয়া গেল। হঠাৎ কন্যা পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ছাড়া আর কারো মাইনে বেড়েছে কি?"

পিতা উত্তর দিল, "না—আর কারো মাইনে বাড়ে নি।"

কন্যার মুখের ভাব ও কথাবার্ত্তার ভঙ্গি দেখিয়া সুরযমলের সমস্ত উদ্যম অর্দ্ধেক পথে থামিয়া গেল।

সে দিন কলতলায় একটা মুখরা বউ স্পষ্ট করিয়া সুখিয়াকে জানাইল যে, তাহারি জন্য তার পিতার মাহিনা বাড়িয়াছে। এই তো তাহাদের বাড়ীর লোকেরা আজ দশ বৎসর হইতে ঐ একই মাহিনায় চাকরি করিতেছে,—কৈ আজ পর্য্যন্ত তো এক পয়সা মাহিনা বাড়ে নাই।

সুখিয়া এ কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না, কেবল নীরবে নতমস্তকে ঘড়া উঠাইয়া লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

সে দিন ছুটীর সময় যখন সাহেবের আরদালি আসিয়া সুরযমলকে ডাকিয়া লইয়া গেল, তখন সকলে আশ্চর্য্য হইল। সুরযমল কম্পিত-চরণে ও স্পন্দিতবক্ষে সাহেবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সাহেব তাহাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুরযমল আর তো তোমার কোন কষ্ট নেই?"

সুরযমল কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "না হুজুর—আর কোন কষ্ট নেই। দুটো কুটুরি পেয়েছি।"

সাহেব অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সুরযমলকে জানাইল যে, তিনি শীঘ্র তাকে জমাদার করিয়া দিবেন, মাহিনা প্রায় ত্রিশ টাকা হইবে; আর তখন কাজ-কর্ম্ম করিতে হইবে না।

সুরযমল প্রথম মনে করিল, সে স্বপ্ন দেখিতেছে। সাহেব তাহার ভাব দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সুরযমল চমকিয়া উঠিল; কিন্তু পরক্ষণেই কতকটা আশ্বস্তও হইল। সে যে কি বলিয়া সাহেবের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে, তাহার ভাষা খুঁজিয়া পাইল না। কেবল নীরবে তার চোখ হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "দেখ তোমাকে আরো নগদ পাঁচ শ' টাকা দেব, যদি—"

তার পর সাহেব যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া সুরযমলের মাথা ঘুরিয়া গেল; তাহার বুদ্ধি যেন লোপ পাইল; সে তাহার নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সাহেবের কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইল,—"রাজি আছ?"

সুরযমল কাঁপিতে কাঁপিতে মাথায় হাত দিয়া সেখানে বসিয়া পড়িল। তাহার মনে হইল—পৃথিবী যেন বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতেছে। সাহেব বলিলেন, "সুরযমল নগদ পাঁচ শ'—"

তখন সুরযমলের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। রাগে ও অপমানে সে স্থান কাল ভুলিয়া গিয়া উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া উঠিল, "না—না,—কখনো না।"

সাহেব ধীরে ধীরে বলিলেন, "এখন তুমি বাড়ী যাও—ভাল করে ভেবে দেখো,—নগদ এক হাজার টাকা।"

৫

শীতকালের বেলা। সবে মাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। কিন্তু মনে হইতেছিল রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে। এক একটী কুঠুরিতে দশ বার জন কুলি আগুন পোহাইতে পোহাইতে তামাক খাইতেছিল। তামাকের উগ্রগন্ধে ও ধূমে সমস্ত কুলি-ব্যারাক পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কোন কোন কুঠুরিতে কয়েকজন কুলি মিলিয়া তাড়ি খাইয়া তাণ্ডব নৃত্য ও বিকট স্বরে গান সুরু করিয়াছে। সেই বীভৎস শব্দ পথিককে ভীত করিতেছিল। সুখিয়া রান্না-বান্না করিয়া সন্ধ্যা জালিয়া পিতার জন্য অনেকক্ষণ হইতে চিন্তিতভাবে অপেক্ষা করিতেছিল।

এমন সময় সুরযমল টলিতে টলিতে কুঠরিতে ফিরিল। তাহার চক্ষু তখন রক্তবর্ণ। হস্ত মুষ্টিবদ্ধ। সুখিয়া তাহাকে দেখিয়া প্রথম ভীত হইল। কিন্তু পরক্ষণে পিতার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা তোমার কি অসুখ করেছে ?"

সুরযমল অতি তীব্রকণ্ঠে বলিল, "হাঁ—যমে ধরেছে, এই বার মরবো।"

তার পর ঘরে ঢুকিয়া নিস্তেজভাবে বিছানায় শুইয়া পড়িল।

প্রথমে সুখিয়া বিস্মিত হইল। সে ভাবিতে লাগিল, পিতার কাছে আজ সে এমন কি অপরাধ করিয়াছে, যার জন্য পিতা তাহাকে এমন তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করিল। অনেকক্ষণ ভাবিয়া সে নিজের কোন দোষ খুঁজিয়া পাইল না। সে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ঘরের মধ্য হইতে সুরযমল ডাকিল, 'সুকিয়া !"

সুখিয়া অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে উত্তর দিল, "কেন ?"

সুরযমল এতক্ষণে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়াছিল। সে বলিল, "চল মা আমরা কালই দেশে ফিরে যাই। এখানে আমার আর ভাল লাগছে না।"

সুখিয়া বিস্মিত হইয়া পিতার দিকে চাহিয়া রহিল। পিতা কন্যাকে দুই হাত দিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া, মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "চল মা আমরা কালই দেশে ফিরে যাই, সাহেবগুলো বড় বদ্‌মাস,—"

সুরযমল মুহূর্ত্তমধ্যে আপনাকে সামলাইয়া লইল কিন্তু সুখিয়া একটী কথায় সব বুঝিয়া লইল। তার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। "তবে কি বাবাকে সাহেব আমার সম্বন্ধে—"

"বড় ক্ষিদে পেয়েছে—ছুটো খেতে দে মা।"

পিতার কণ্ঠস্বর কানে আসিতেই সুখিয়ার চিন্তা-সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। পিতাকে খাবার দিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

পিতাপুত্রীতে আহার করিতে বসিল। দুই-এক গ্রাস খাইয়া "আর ক্ষিধে নেই"—বলিয়া সুরযমল উঠিয়া গেল। সুখিয়া এতক্ষণ ভাত লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছিল, "এখন পর্য্যন্ত এক গ্রাসও খায় নাই। পরমুহূর্ত্তে সেও ভাত ফেলিয়া, চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। সুরযমল সব দেখিল কিন্তু কন্যাকে আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিতে সাহস হইল না।

সকাল বেলা সুরযমল একেবারে সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল। সাহেব তাহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বলিল, "তা হলে তুমি আমার কথায় রাজি আছ ?"

সুরযমল যেন সে কথা শুনিতে পায় নাই এমনি ভাবে বলিল, "হুজুর আমি দুমাসের ছুটী চাই।"

সাহেব বলিল, "বেশ তো ছুটী দেব এখন, কিন্তু"—

সুরযমল গর্জ্জিয়া বলিল "না—না, কখনো না—হাজার টাকা তো অতি তুচ্ছ, লাখ টাকা দিলেও না।"

সাহেব প্রথমে এতই আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন যে, কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার মুখ হইতে একটী কথাও বাহির হইল না। তার পর তাঁর চোখ যেন হিংস্র জন্তুর মত জ্বলিয়া উঠিল। গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "এখন ছুটী পাবে না—কাজে যাও।"

সুরযমল অবনতমস্তকে প্রস্থান করিল।

প্রায় সন্ধ্যার সময় কুলিগণ আপন আপন চা মাপিয়া জমাদারের নিকট জমা দিতেছিল, সাহেব দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। কিছুক্ষণ বাদে সুরযমলের পালা আসিল। সে আগে সরিয়া

আসিয়া জমাদারকে চা মাপিয়া দিল। সাহেব তার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "তুমি দিনভরে এতটা কাজ করেছে—শুয়ারকা বাচ্চা কেবল পয়সা লিয়ে যাবে, কুছ কাম করে না।"

সাহেব দণ্ডায়মান সুরযমলকে লক্ষ্য করিয়া, সরোষে সশব্দে পদাঘাত করিল।

"মর গিয়া" বলিতে বলিতে দুই হাতে বক্ষ চাপিয়া, সুরযমল সেখানে বসিয়া পড়িল।

অন্য কুলিরা ভীত হইল।

৯

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সুখিয়া ভীতচিত্তে পিতার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কেন যে তার আজ এত ভয় করিতেছিল, তাহা সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

কিছুক্ষণ পরে দুইজন কুলির কাঁধে ভর দিয়া সুরযমল গৃহে ফিরিল। পিতার নিমীলিত চক্ষু ও কম্পিত দেহ দেখিয়া সুখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুরযমল একবার চোখ খুলিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। সে কুলিদের সাহায্যে পিতাকে বিছানায় শয়ন করাইয়া দিল।

একজন কুলি বলিল, "সুখিয়া তুই সুরযকে ছাতিমে একঠো গরম কপড়া বাঁধি দে—সাহেব উসি ঠাঁই বড়া জোরে লাথি মেরেছে;—একঠো হড্ডি টুটে গিয়েছে।"

কুলিগণ আপন আপন কুঠরিতে চলিয়া গেল। সুখিয়া চোখ মুছিয়া পিতার কপালে হস্তস্পর্শ করিয়া শরীরের তাপ পরীক্ষা করিতে লাগিল। সুখিয়ার শীতল করস্পর্শে সুরযমল একবার নড়িয়া উঠিল।

কন্যা পিতার বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অশ্রুভারাক্রান্তকণ্ঠে ডাকিল, "বাবা—ও বাবা—বাবা গো।"

কিন্তু পিতা কন্যার আহ্বানের কোন সাড়া দিতে পারিল না। কেবল তাহার ঠোঁট দুটী বার কয়েক নড়িয়া থামিয়া গেল। সে চোখ মুছিয়া পিতার রুক্ষ চুলের মধ্যে আঙুল চালাইতে লাগিল।

রাত্রি ক্রমে ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া আসিতে লাগিল। মাতাল কুলিদের নাচ-গানের আওয়াজ ক্রমে থামিয়া আসিল। সমস্ত পল্লী নীরব নিস্তব্ধ; কেবল সুখিয়া মুমূর্ষু পিতার শিয়রে বসিয়া আছে, নিদ্রায় তাহার চোখ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। যদি নিদ্রিত হইয়া পড়ে, এই ভয়ে কখন বা পিতার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল, আবার কখন বা বুকের ব্যাণ্ডেজটা ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিতেছিল। ঘরের মধ্যে কেবল প্রদীপের শিখা চঞ্চল বাতাসে ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠিতেছিল।

এই সময়ে বাহিরে হঠাৎ কাহাদের পদশব্দ ও মৃদু কথোপকথনের ধ্বনি সুখিয়ার কানে আসিয়া পৌঁছিল। সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল,—কতকগুলো লোক নিঃশব্দে চোরের মত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। সে যেন সম্ভাবিত একটা বিপদের জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। কাজেই ভয়-বিহ্বল না হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু হঠাৎ তিন-চার জন লোক একসঙ্গে তাহাকে চাপিয়া ধরিল। একজন বলিল, "চেঁচাবি তো এই—"

এই বলিয়া লোকটী একখানি ছোরা তার সামনে ধরিল। মুহূর্ত্তমধ্যে অন্য লোকেরা তাহার হাত-পা-মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। তার পর যখন সকলে তাহাকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল; সেই সময় সুরযমল নিদ্রিত অবস্থায় কি স্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "সুখিয়া! ও সুখিয়া!"

লোকগুলো ততক্ষণে সুখিয়াকে লইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সুখিয়া

মনে মনে ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম করিতে করিতে মৃত্যুপথযাত্রী রুগ্ন, দুর্ব্বল ও অত্যাচারিত পিতাকে তাঁহার অসীম করুণার উপর ছাড়িয়া দিল।

এই সময় সুরযমল চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরেও সুখিয়া জেরা পানি দে রে,—বড়া পিয়াস—"

সুখিয়া যাইতে যাইতে সব শুনিতে পাইল। সেই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে তার চোখ দিয়া অশ্রু-বিন্দু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। একবার ইচ্ছা হইল, লোকগুলার কাছে একটু সময় ভিক্ষা করিয়া পিতার মরণকালে তৃষ্ণার জল দিয়া আসে কিন্তু পরমুহূর্ত্তে মনে হইল, যাহারা এই গভীর নিস্তব্ধ, নির্জ্জন রজনীতে এক অসহায়া দুর্ব্বল-নারীর উপর এমন ভাবে অত্যাচার করিতে পারে, তাদের কাছে ভিক্ষা চাওয়া বৃথা।

৬

রাত্রি প্রায় একটা বাজিয়া গিয়াছে। সাহেব আপনার বাংলোর বারাণ্ডায় পদচারণা করিতে ছিলেন। তিনি এবার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন, টেবিলের উপর রক্ষিত মদের গ্লাসটা তুলিয়া এক চুমুকে সবটা পান করিলেন। তার পর তিনি টলিতে টলিতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আবার পায়চারি করিতে লাগিলেন। এই সময় রামজানের সহিত কতকগুলো লোক সুখিয়াকে বাঁধিয়া লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল! সে আগে অগ্রসর হইয়া সাহেবকে নত হইয়া সেলাম করিয়া বলিল, "হুজুর কাম ফতে।"

সাহেব জড়িতস্বরে বলিলেন, "কাল তুমি লোগকো বকশিস মিলেগা, ঘরমে লে আও।"

সাহেব কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রামজানও সুখিয়াকে সঙ্গে লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে তার বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বাহির হইতে শিকল বন্ধ করিয়া দিল।

অসংযত উচ্ছৃঙ্খল শেতাঙ্গ যুবক সুখিয়াকে ঘরের মধ্যে একাকিনী পাইয়া যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সে বিকৃতকণ্ঠে, "বি-বি" বলিতে বলিতে সুখিয়াকে ধরিতে উদ্যত হইল।

সুখিয়া পশ্চাতে হটিয়া গিয়া বলিল, "সাহেব তুই আমার পিতা আছিস, আমাকে মাপ কর।"

সাহেব বিকট হাস্য করিয়া বলিল, "না হি বি-বি—"

সাহেব আবার তাহাকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল।

সুখিয়া এবার সাহেবের পদপ্রান্তে নতজানু হইয়া বলিল, "সাহেব তু হামারা জান লে,—মান লিস্ না।"

সাহেব কোন কথা কানে না তুলিয়া সুখিয়ার হাত ধরিয়া ফেলিল। সাহেবের করস্পর্শে তার শরীর কাঁপিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে এক ঝটকা দিয়া হাত ছাড়াইয়া, দরজার নিকট আসিয়া বাহিরে যাইবার জন্য দরজা ধরিয়া টানিল। কিন্তু দরজা খুলিল না। সাহেব হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে স্তব্ধ হইয়া প্রস্তর-মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। সাহেব টলিতে টলিতে অগ্রসর হইয়া, তাহার হাত ধরিয়া ঘরের মাঝখানে লইয়া আসিল। এবার যেন তার চোখ জ্বলিতেছিল। সে বলিল, "হামি পাহাড়ী মেয়ে আছি,—হামারা নিজের ইজ্জত রাখতে জানে। শুন্ সাহেব, যদি তু না মানে তো, হাম তুহারা জান লেবে।"

সাহেব বলিল, "তু তো হামারা জান লে লিয়া।"

মুহূর্ত্তমধ্যে সাহেব তাহাকে দুই হাত দিয়া বেষ্টন করিয়া আপনার বক্ষের দিকে টানিল,—কিন্তু পর-মুহূর্ত্তে হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ করিয়া, তাহাকে

ছাড়িয়া দিয়া চার-পাঁচ পা পশ্চাতে হটিয়া গেল। তখন তাহার পৃষ্ঠ হইতে অজস্রধারে রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছিল। সে পুনরায় ছোরা লইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। সেই ভীষণ রণচণ্ডী মূর্ত্তি দেখিয়া সাহেবের নেশা ছুটিয়া গেল। ভীতভাবে টেবিলের পরপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। পলকে আপনার জামার পকেটে হাত চালাইয়া গুলিভরা পিস্তল বাহির করিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "বদ্‌মাস—"

সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হইল গুড়ম এবং সেই মুহূর্ত্তে একটী গুরু পদার্থ মেজেতে পতনের শব্দ হইল। তার পর একটি আর্ত্তনাদ হইল—"উঃ—"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সশব্দে দরজা খুলিয়া রামজান ও কয়েকজন লোক হঠাৎ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা সুখিয়াকে রক্তাক্ত-কলেবরে মেজের উপর লুটাইতে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল।

সাহেব বলিল, "দেখো মর গিয়া ?"

রামজান কিছুক্ষণ সুখিয়াকে পরীক্ষা করিয়া বলিল, "হুজুর গোলী শির ফোড়কে গিয়া,—জান নিকাল গিয়া।"

সাহেব বলিল, "বড়া জবরদস্ত আওরাত হয়।"

রামজান বলিল, "হাঁ হুজুর পাহাড়ী আওরত বড়া জবরদস্ত হোতা হয়।"

সাহেব বলিল, "দেখো হাথারে পিঠমে পট্টি বাঁধকে রাতহিমে লাস গাড় ডালো।"

খেজুর গাছে শিউলি

কবিতা

দেবঘর

শ্রীমতী চারুলতা দেবী

পুরাকালে পিতৃমুখে পতিনিন্দা শুনিয়া দুহিতা,
পিতার শোণিতজাত শরীর ত্যজিল শুচিস্মিতা।
সেই সতীদেহ লয়ে আদর্শ প্রণয়ী পতি তাঁর,
ত্রিভুবনে ভ্রমিলেন পাসরিতে বিরহ প্রিয়ার।
নিয়ন্ত্রিত নিয়মের ব্যতিক্রম দেখি নারায়ণ,
সুদর্শনচক্র দিয়া সেই দেহ কাটিলা তখন।
পড়িল একান্ন খণ্ড দিকে দিকে বক্ষে বসুধার,
পুণ্যময় তীর্থস্থান "পীঠ" বলি' হইল প্রচার।
ধরার ধারণাতীত সুপবিত্র হৃদয় মাতার,
আসিয়া পড়িল যথা সেই তীর্থ প্রণম্য সবার।
এই সেই "হার্দপীঠ"—"দেওঘর" আখ্যায় প্রখ্যাত,
প্রকৃতি আনন্দময়ী নিশিদিন শ্যামশোভা-স্নাত।
সমুন্নত গিরিশ্রেণী শোভিতেছে দূরে—দূরান্তরে,
জলদের ধূসরিমা ঘনায়িত করিছে তাহারে।
প্রকৃতি বিরূপ যথা নাই তথা চিহ্ন শ্যামতার,
কঙ্কর-ধূসর গিরি শোভে ওই "নন্দন পাহাড়"।
একদিকে "ডিগরিয়া"—অন্যদিকে "ত্রিকূট" ভূধর,
মধ্যে শোভে "দেওঘর" প্রকৃতির চিত্র মনোহর।

সিকতার নিম্নস্তরে বহিছে "দারোয়া" অন্তঃশীলা,
প্রবাহ অধিক যথা সেখানেই সলিলের লীলা।
নাশিয়া লঙ্কেশ-কীর্ত্তি "কর্ম্মনাশা" নদী বয়ে যায়,
"মানসরোবর" রাজা মানসিংহে স্মরণে জাগায়।
বহিছে শীকরশূন্য সুরভিত গিরি সমীরণ,
শ্যামল পল্লবদলে শোভিতেছে তরু অগণন।
"জয়দুর্গা" মহামায়া—"বৈদ্যনাথ" আখ্যাত শঙ্কর,
পাশাপাশি শোভা পায় উভয়ের মন্দির সুন্দর।
চিরমিলনের চিহ্ন ক্ষৌমসূত্র শীর্ষে বিলম্বিত,
শিবজলা "শিবগঙ্গা" মন্দিরের পার্শ্বে প্রবাহিত!
"হরিলাজুড়ীতে" আর কিছু দূরে নন্দনচূড়ায়;
"বাহান্ন বিঘায়" দেখি শিবলিঙ্গ যত্নে শোভা পায়।
"ত্রিকূটে""ত্রিকূটেশ্বর"—"তপোবনে" "তপোনাথ শিব,
হার্দপীঠে দেবতার শোভিছে প্রতিমা চিরজীব।
মায়ের এ বাসভূমি—ভুলিয়াছে অভাগাকুমার,
দিকে দিকে হেরি তাই প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি দেবতার।
না করিলে নয় তাই পূজা হয় মায়ের এখন,
"বৈদ্যনাথ" পদতলে লুটিতেছে ভক্ত অগণন।
ভোগীর প্রাসাদ আর সন্ন্যাসীর পবিত্র আশ্রম,
শোভিছে পুণ্যের আলো অন্যদিকে বিলাস-বিভ্রম।
দিক্‌চক্রবাল-কোলে দাঁড়াইলে মলিনা উষসী,
প্রকৃতির চারু অঙ্গে ফুটে ওটে শ্রান্ত শোভা রাশি!
আরতির শঙ্খ বাজে, দীপ জলে প্রতি ঘরে ঘরে,
পুণ্য আর শান্তি যেন ব্যাপিয়াছে বিশ্ব চরাচরে।
প্রভাতে আসিয়া রবি হাসিমুখে যখন দাঁড়ায়,
কুলায় ছাড়িয়া পাখী বৈতালিক গান যবে গায়।
তখন সম্ভ্রমে নত হয়ে পড়ে মানবের প্রাণ,
আপন অলক্ষ্যে হয় দেবতার দ্বারে নীয়মান।
মধ্যাহ্নে প্রতপ্ত ধরা পড়ে থাকে উদাসিনী প্রায়,
উষর ধূসর ভূমি ম্লানমুখে ঊর্দ্ধপানে চায়।
উদাস আনন-ছবি তখন হেরিয়া প্রকৃতির,
বিমুগ্ধ নরের প্রাণে জেগে ওঠে বৈরাগ্য-গভীর।

দেবতার পুণ্য-ভূমে রাজিতেছে শান্তি আশীর্ব্বাদ,
ব্যথিত আসিলে হেথা ক্ষণতরে ভুলিবে বিষাদ।
জননি! চাহিয়া দেখ, পদতলে দুহিতা তোমার,
স্বাস্থ্য নাই শক্তি নাই বক্ষে জাগে ব্যর্থ হাহাকার।
নিয়তির পরিহাসে আশাহত জীবন আমার,
শান্তির আশায় তাই আসিয়াছি নিকটে তোমার।
যে শক্তি প্রভাবে তুমি স্বামি-নিন্দা শুনিলে না কানে
সেই শক্তি-কণা আজ ভিক্ষা মাগি তোমার চরণে।

বুন্দীর নগর তোরণ

গল্প

বৈজ্ঞানিক

শ্রীগৌরমোহন সী

ছোট একটী ভাঙ্গা ঘরে স্বামী স্ত্রীতে থাকে। স্বামী বৈজ্ঞানিক। ঘরে আস্‌বাবের মধ্যে রাশি রাশি জার—তা'তে কত রকম রঙের জলীয় পদার্থ—টেষ্টটিউব, শিশি বোতল সব থরে থরে সাজান।

এইখানে বৈজ্ঞানিক দিন রাত এটা জ্বালে—ওটা নিবোয়—মাথা নাড়ে, থেকে থেকে জিনিষগুলো হাতে করে উদাস-নয়নে এধার ওধার চেয়ে চেয়ে কি ভাবে—আবার মাথা নাড়ে। খেতে চায় না—শুতে ভুলে যায়; খাবার সময় স্ত্রী এসে পাশে চুপটী করে দাঁড়িয়ে থাকে, চেঁচিয়ে ডাকে না—হাত ধ'রে নাড়া দেয় না; যদি চোখে চোখ প'ড়ে যায় ত' ইসারায় বলে—"ওগো উঠে এসো, বেলা হ'লো।"

বৈজ্ঞানিকের সে চাহনিতে ভাবনার পর্দ্দা ফেলা না থাকে ত' একটু হেসে উঠে পড়ে—থাকলে তার চাহনি ঘুরে গিয়ে আবার সাম্‌নে রাখা শিশিগুলোর দিকে আবদ্ধ হ'য়ে যায়।

খেতে বসে—ইস্! মানুষে এ খেতে পারে? কেন শুদ্ধ মোটা মোটা ভাত—আর পাশের ডোবা থেকে স্ত্রীর খুঁটে আনা কলমীশাক সিদ্ধ। মুঠ মুঠ ভাত মুখে দেয়। থালায় এককণা ভাত থাকে না—শেষে থালায় একটা ছোট ডাঁটা নিয়ে আঁক কাটতে থাকে—থেকে থেকে মুছে আবার আঁকে। হাতের কাছে জলের গাড়ু আর গামছা এগিয়ে দেয়, মুখ ধোয়। ভাবে না—দেখে না একবারও স্ত্রীর ভাত আছে ত'—সে কি খেলে—কি খাবে। চ'লে যায় তার ঘরটীতে।

সেই পাতে স্ত্রী তার ভাত বাড়ে—আর একটা গাছের লঙ্কা—বেশ খায়; খেয়ে আবার সংসারের কাজ করে।

বৈজ্ঞানিক কি পরীক্ষা ক'রতে ক'রতে দেখে তার একটা জিনিষ নেই। কিন্‌তে হবে যে—না হ'লে তার পরীক্ষা হয় না—অধৈর্য্য ভাবে ছুটে যায় স্ত্রীর কাছে। কাজের শেষে দাওয়ায় আঁচল বিছিয়ে সে তার উপর ঘুমিয়ে পড়ে। তাকে জোরে জোরে নাড়া দিতে দিতে বলে—"ওগো! শুনচ'—"

ধড়মড়িয়ে উঠে ভয়ব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বলে—"কি?"

"আমায় কিছু সালফিউরিক এসিড কিন্‌তে হবে পয়সা দাও।"

ছোট ছোট ছেলেরাও এমন ক'রে বায়না করে না। স্ত্রীর মুখ দিয়ে বেরুতে চায়—"পয়সার সঙ্গে সম্বন্ধ ত' আজ বিশ বছর ছেড়েছ, চাও কি ব'লে?" মুখ ফুটে বলে না! ঘোষেদের ধান কুটে দেয়—তারি পাওয়া পাঁচটী পয়সা দিতে যায়।

রাগ ক'রে বৈজ্ঞানিক বলে—"পাঁচটা পয়সা! ওতে কি হবে! আমার যে দুটো টাকা চাই। তোমার বাক্স খুলে দাও না—আমি কালই দেবো।"

স্ত্রী বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে থাকে—ভাবে 'পাগল ত' হয় নি? এক পয়সা যে উপায় ক'রতে পারে না—করে না—সে বলে কালই দেবো।'

হেসে বলে—"দিচ্ছি দাঁড়াও—" ঘরের ভিতর গিয়ে ডানহাতের সোণার পাত দেওয়া শাঁখাটী খুলে এনে ধরে দেয়—বৈজ্ঞানিক আশ্চর্য্য হ'য়ে বলে—"এ নিয়ে কি ক'রবো?" অবিচলিত স্বরে তেমনি হেসে স্ত্রী বলে—"বাজারে বিক্রি ক'রে যা পাবে—তাতেই তোমার জিনিষ কিনে এনো।"

উৎফুল্ল হয়ে ছোট ছেলের মতন হাস্‌তে হাস্‌তে লাফিয়ে লাফিয়ে সে বাজারে চ'লে যায়।

মরণোন্মুখ ছোট ছেলের মুখে হাসির কথা শুনে মায়ের বুকে যতটা বাজে ততটা ব্যথা নিয়ে স্বামীর চ'লে যাওয়া মূর্ত্তিটীর দিকে চেয়ে চেয়ে—পাণ্ডুর মুখটী তার ক্ষীণ হাসিতে ভ'রে উঠে।

ঘরে কিছু ছিল না। পাড়ার প্রতি ঘরে এক কুনৃতে দুকুনৃকে ক'রে চাল ধার করা আছে; আর ত' চাওয়া যায় না। কিন্তু কি আজ স্বামীর পাতে দেবে! ভাবতে ভাবতে তার মাথা থেকে থেকে চন্ চন্ ক'রে উঠে। বুকের ব্যথাটা যেন সজোরে দুপাশ থেকে বিঁধে ধরে।

৯টা বেজে গেছে, আর ত চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌লে চলে না। উঠে দুটী থালার মধ্যে একটী নিয়ে রায়দের বাড়ীর দিকে চ'লে যায়।

বৈজ্ঞানিক বুঝলে—তার স্ত্রী যেমন রোজ আসে আজিও এসেছে তাকে ডাক্‌তে,—তাকে যে খেতে হবে। তাড়াতাড়ি উঠে চ'ললো, খেতে যেতে দরজার পাশে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে যাওয়া স্ত্রীর রক্তহীন বিবর্ণ মুখের দিকে আপনার উদাস দৃষ্টি মিলে দেখে, দেখতে—দেখতে কি ভেবে তার বুকটা ফুলে ফুলে উঠে, চোখ দুটো ঝাঁপসা হ'য়ে আসে।

হঠাৎ তার ল্যাবোরেটারীর ভিতর কি একটা শব্দ হ'লো। ব্যস্ত হ'য়ে ঘরে ছুটে যায়। গিয়ে দেখে একটা গোল শিশি মেঝেয় প'ড়ে, ভাবে বুঝি এমনি ক'রে না, তার আশা গুঁড়িয়ে যায়। কাছে গিয়ে হর্ষোৎফুল্ল-কণ্ঠে বলে—"যাক্! এটা আমার কোন বিশেষ কাজে লাগত' না।"

ভাত খাওয়ায়,—ছোট ছেলেটীর মতন তাকে ব'লে দিতে হয়—"ওগো রাত হ'লো, শোবে না?" দুবার তিনবারের পর—তার চৈতন্য হয়। শুতে যায়। শুয়ে শুয়ে অন্ধকারে কি বিড় বিড় ক'রে বকে—আর আঙুলের পাব গণে।

পাগল হবে না ত'? কান্নায় বুজে আসা স্বরে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করে, "হ্যাঁ গো! আর কত দিনে তোমার কাজ শেষ হবে?"

হেসে বৈজ্ঞানিক বলে—"বোধ হয় এ জন্মে নয়!" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স্ত্রী ভাবে—"এ জনম ত' —; কিন্তু যদি আর—জনমেও এমনি ধারা হয়—"

শিউরে উঠে তার শীর্ণ হাতটী দিয়ে ঘুমিয়ে পড়া স্বামীর দেহটী জড়িয়ে ধরে।

সকালে বিছানা ছেড়ে উঠতে যায়—পারে না। বুকটা যেন কে জগদ্দল পাথর দিয়ে চেপে ধরে—মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে। ঘুম ভেঙ্গে উঠে যেতে যেতে স্বামী বলে, "এত ঘুমোও কি ক'রে—?"

বেলা বেড়ে চলে,—স্বামীর ঘর থেকে শিশিতে শিশিতে লেগে ঠুন ঠুন আওয়াজ হয়—ভাঁড়ার ঘরে হাঁড়ি সরা উল্টানর ঘট ঘট শব্দ উঠে।

বোধ হয় কোন বিড়াল হাতড়ে দেখে—কিছু যদি পায়। উঠবার সামর্থ্য নেই শুয়ে শুয়ে সব শুনে—অধৈর্য্য হয়ে উঠে। বেলা আরও বেড়ে চলে—ক্ষুদগুলো কে সিদ্ধ ক'রে দেবে।

বড় জল তেষ্টাও পায়। ডাকতে চায়—ভাবে, না থাক্ যদি তার ব্যাঘাত হয়।

চেতনা ফিরে আসে! জড়িয়ে ধরা চোখের পাতা টেনে খুলে দেখে—স্বামী তার মুখের দিকে চেয়ে ব'লছে—"সুধি! এখনও ঘুমুচ্ছ—আমায় খেতে দেবে কে?" তাই ত ধড়মড়িয়ে উঠতে যায়, বুকটা যেন কে ছেঁচে দেয়—মাথাটা ঘুরে পড়ে।

"বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে যে।"
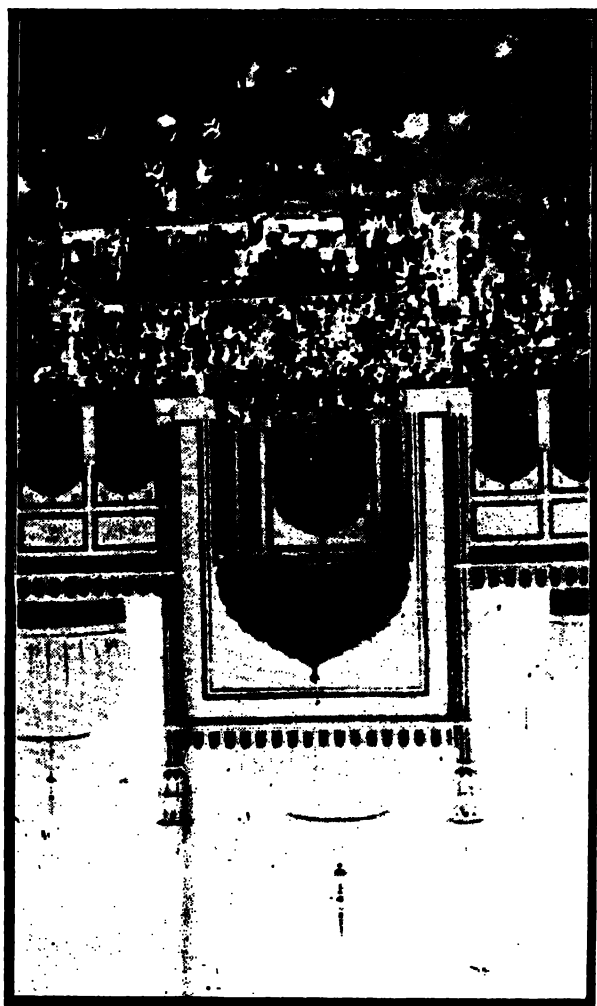
যাকে দুবেলা ডেকে এনে খাওয়াতে হয়—আজ

সে নিজে এসে ডাকে, সে আবার উঠতে চায়—পারে না।

বুকটা ধক্ ধক্ ক'রে হঠাৎ থামে।

ছট্ ফট্ করা ক্ষীণ দেহটী গড়িয়ে বৈজ্ঞানিকের দিকে পিছন ফিরে—হঠাৎ থেমে গিয়ে অনড় হলো।

আপনার ঘরে যেতে যেতে বৈজ্ঞানিক বলে—"সকাল বেলাই এত ঘুম ত ভাল নয়!"

দিল্লী—আলি মস্‌জিদ

গল্প

ভুলের বোঝা

শ্রীনন্দলাল মুখোপাধ্যায়

"মণি! কৈ সে ত' এলো না! ডাক না লক্ষীটী ভাই, আর একটিবার ডাক না তাকে। বলিস, শুধু চোখের দেখা একটীবারের জন্যে দেখে যাও তুমি। আর কিছু বেশী আশা করি না আমরা তোমার কাছে। কেবল একটীবার।"

"না, না। আমি আর যাব না—কিছুতেই না। সে যখন বল্‌তে পেরেছে তার কথা মন থেকে মুছে ফেল্‌তে—তখন আমি কখনই যাব না।"

"তবে কি আমি এমনি করেই—।"

"না—তাও হবে না। সে আমি কিছুতেই হতে দেব না। তোমার তাকে মন থেকে মুছে ফেলতেই হবে ভাই! সে যদি মুছতে পারে, তুমিই বা কেন তা পারবে না।"

"কৈ পারি ভাই! বুকের ভেতরে যে নির্ম্মল স্নেহের আসনখানিতে তাকে স্থান দিয়েছি, আজ সেখানি খালি করতে গেলে প্রাণটা হাহাকার করে ওঠে যে!"

"কিন্তু সে ত' তা বোঝে না ভাই! কত করে ত' বল্‌লাম তোমার কথা। যেন কা'কে বলছি—কানেই তুললে না।"

"আচ্ছা, আর একবারটী যাও ভাই! তোমার বন্ধুর এই শেষ অনুরোধটী রাখ দাদা আমার। হয় ত' আর খানিক পরে আমি আর অনুরোধ করতে আসবো না। হয় ত' কেন—কতক্ষণই বা আর বাকি! বড় জোর ঘণ্টাখানেক তার পর তোমার নলিন দা'র কোন সাড়াই থাকবে না। যাও ভাই লক্ষীটী আমার।"

মণির প্রাণটা ভিজে গেল।

"আর একটীবার আমার মিনতি জানিয়ে শুধু একটী কথা শোনবার জন্যে ডেকে আন ভাই! ঐ দেখ, দুকূল-ছাওয়া গঙ্গার জলে ভাঁটা পড়ে আসছে, তার কলতানে তেমন ঝঙ্কার নেই। জানলাটা আর একটু খুলে দাও—হাঁ থাক্। ঐ দেখ, মৃদুল বাতাসে পাল-তোলা নৌকাগুলো দিনের দীপ নিভে যাবার ভয়ে পারের ঘাটে এসে ভিড়ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীর দল দিগন্তের বুক চিরে আপনাপন বাসায় ফিরতে সুরু করেছে। সারাদিনের কাজের বোঝা বওয়া পৃথিবীর মুখখানি যেন ক্লান্তিতে ভরা। আহা, আর যেন পারে না বেচারা। দিনের শেষে আকুল হয়ে চেয়ে আছে শান্তিময়ী সন্ধ্যারাণীর আশায়। এখুনি সে আসবে, চোখের নিমিষে কতই না সোহাগে বুকে নেবে ওকে।"

দু' ফোঁটা জল নলিনের দীপ্তিহীন চোখের কোল থেকে টপ্ টপ্ করে ঝরে পড়লো।

"আবার যদি আমাকে অপমান করে।"

"ফিরে এসো, শুধু বলে এসো—এত বড় বোঝাটা নিয়ে সে যেতে পারছে না বলেই তোমার সাহায্য চাইতে এসেছি।"

হারাবার আশঙ্কায় মণির বুকখানা আবার কেঁপে কেঁপে ফুলে ফুলে উঠলো। ওগো এই নলিন দা যে তার সব! জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়-স্বজন-হারা হয়ে সে যে এই বিশ্বের বুকে তারই মত একটী একক—নলিনদাকে আঁকড়ে ধরেছিল। তারই আদর-যত্নে একটী বোঁটায় দু'টী ফুলের কুঁড়ির মত ধীরে ধীরে চোখ মেলে চেয়েছিল। এমনি আদরের নলিনদা তার!

ওঃ কি কুক্ষণেই একটা দিন তার কলকাতায় পরীক্ষা দিতে যাবার দিনে পড়েছিল যে, সেই ছোট দিনটুকুর মধ্যে মিনতি, মুখপুড়ী রাক্ষসী, কালামুখী

মিনতি তার প্রাণটাকে চুরি করে নিলে। এমন বিষের চাউনি-হানা হেনে দিয়ে গেল—যার ঘা সহ্য করবার ক্ষমতাই রইল না তার।

যদি এতই মনে ছিল, তবে কেন এসেছিলি পিশাচী তোর ঐ রূপের জাল দিয়ে খেয়ালের ফাঁদ পাততে। ব্রাহ্মই যদি হয়ে যাবি, বেণী দুলিয়ে—আঁচল উড়িয়ে—পুরুষের হাতে হাত দিয়েই যদি বেড়াবি, তবে কেন—কেন এসেছিলি এই পবিত্র দেবতা পূজার নির্মাল্যটীকে নষ্ট করতে, শয়তানী! এত আক্রোশ কেন আমার উপর? নলিনদা ছাড়া আমার আর কেউ নেই বলে?

* * *

ছ'টার ভোঁ বেজে গেল। কারখানার পথে ভিড় জমে উঠলো।

ক্ষীণকণ্ঠে নলিন ডাকলে "মণি!"

চমক ভাঙলো। "হাঁ যাই" বলে মণি বেরিয়ে গেল।

থালার মত তপনখানি পাটে বসছে। আজ সে এখনও ধবধবে সাদা, পূর্ণিমার চাঁদ বলে যেন ভ্রম হয়। রঘু ঘরে বাতি জেলে দিয়ে গেল। মিনিট পনের হবে—তার পরই খোলা জানলার ফাঁক দিয়ে চাঁদের কিরণ এসে ঘরের একদিকে বেশ আপন মনেই খেলা সুরু করে দিয়েছে। ফুরফুরে হাওয়া কাগজপত্রগুলিকে উড়িয়ে ছুলিয়ে দিচ্ছেল, আলো-টীকে পেয়ে তার যেন আনন্দ বেড়ে গেল। একটা ভয় দেখানের খেলা জুড়ে দিলে তার সঙ্গে, সে কেঁপে উঠলো।

বাঃ কি সুন্দর! অন্ধকারের অন্তর থেকে বাহিরের জ্যোৎস্না ধোয়া জগৎখানি কি সুন্দর দেখাচ্ছে! সব যেন রূপোতে মোড়া। সত্যই যদি এমনি সব জিনিস রূপার হতো, তা হলে কি ভালই না হত! গাছ-পালা, স্থল-জল, সবই যেন রূপায় জড়ানো। অতি সুন্দর—এমন শোভা যেন আর কখন হয় নি। দু' পারে বড় বড় গাছের সার, আজ যেন তারা আনন্দোদ্দীপ্ত শিরে মুক্তাবসানো ওড়নাগুলির আঁচল উড়িয়ে রঙ্গমঞ্চের নটী সেজে সার বেঁধে চলেছে আর পল্লবে শতেক আঙ্গুল নেড়ে যেন নাচের তালে তালে তাকে ইসারায় ডাকছে "আয় রে আয়, আর দেরী করে মিছে ব্যথার বোঝা বাড়াস নি। আমাদের সঙ্গে আয়—তবু তোর শেষ যাবার পথটুকু আমাদের আনন্দ-গানের মধ্যে শান্তিতে কাটবে।" ঐ যে জলের ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঢেউয়ের বুকে আজ লাখে লাখে, থাকে থাকে হাজার টুকরা হীরা চিক্‌মিকিয়ে উঠছে, ওরাও বলছে "এখনো কেন অপেক্ষা করিস রে পাগল! সময় বয়ে গেল—আয় চলে আয় মোদের সাথে।" কি প্রাণ-মাতানো ডাক, কি আকুলতা-মাখা চাউনি! "এই যে যাই ভাই। তোরা এগিয়ে চল আমি যাচ্ছি ঠিক পেছনে পেছনে। বেশী নয়—একটু পরেই। শুধু সে এলে মণির ভারটা তার উপর দিতে যা দেরী—বাস্! ভাই ভাই ছিলুম তার বদলে ভাই-বোনও যদি হয় তা হলে মণি আমার বুক বাঁধতে পারবে। তাই ত' কৈ? এখনও ত' এলো না। মণিও না—ওঃ একটু জল—মণি—ভাই!"

"এই যে নলিনদা! এনেছি ধরে।"

"এসেছ, আ—বস, ঐ চেয়ারখানা টেনে নিয়ে, জানালার ধরে হাওয়ায় বস। বসলে না—ওঃ রাগের মাত্রা একটুও কমে নি দেখছি। মুখখানি তেমনি তম্ তমে করে রেখেছ। কেন—কোন রকমের দোষ কি করেছি তোমার কাছে?"

মিনতি ছলছলে চোখদু'টী ফিরিয়ে নিলে। কে যেন তার গোপন অন্তরের ভেতর থেকে কেঁদে কেঁদে বলছিল—"দেখতেই হবে তো'কে। [illegible]

দেখ, রূপের আগুনের ছোঁয়াচ লাগিয়ে কি কুকাজই করেছিস দেখ রাক্ষসী! একদিন যার বুকে তুই বিনা বাধায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতিস, তোরই আগুনে পুড়ে আজ সে কি হয়েছে, দেখ! খাঁটী সোনা—আর তুই একেবারে খাদে ভরা। সাহস হয়! কাছে যেতে সাহস করিস, শয়তানী।

কান্না আগল খুলে বা'র হতে চাইলে।

নলিন বল্লে, "ওঃ কতদিন—সে কতদিন হল, জীবনের সেই প্রথম উদয়ের দিনে দেখা—আর আজ এই অস্ত যাবায় বেলায়! ঈশ্বর! এই দু'টী দিন শুধু অভাগার চোখের সামনে শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত ভাসিয়ে রেখে দাও। মণি! বাতিটা একবার জাল তো ভাই! এই দিকে নিয়ে আয়—আমার সামনে,—হাঁ থাক্।

মিনতি নীরব। অশ্রুভরা মুখখানা আলোর আড়ালে নামিয়ে নিলে।

"মিনু।" সেই একদিনের আদরের ডাক!

বিদ্যুতের শিহরণ খেলে গেল মিনতির সারা দেহের প্রতি শিরায়। চাইতে পারলে না তার দিকে।

"বাসনার দৃষ্টি নয়, আকাঙ্ক্ষার দৃষ্টি নয়, প্রেমের দৃষ্টি নয়, লজ্জা বা ঘৃণার দৃষ্টিও নয়,—দয়ার—একটী মাত্র দয়ার দৃষ্টি। আর কিছু নয়। এখুনি হয় ত এ দু'টী চক্ষু মুদে যাবে, বলা হবে না। আর তোমার ঐ শ্রবণ-শক্তিটুকু একবারের জন্য আমার পানে ছেড়ে দাও, দু'টি কথা—মাত্র দু'টি কথা শোনাব তোমাকে। বড় দরকারী কঠিন কথা নয়, ভয়ের কথা নয়, লজ্জার কথা নয়, খুব দামী কথা—কর্ত্তব্যের কথা। যাবার আগে বলে যাবার মত কেউ নেই আমার, তাই তোমাকে বারবার অপমানিত হয়ে ফেরা সত্বেও তোমাকে ডেকেছি মিনু। খুবই বিরক্ত করেছি, না! উত্তর দেবে না! কথা কইবে না। কি করব বল—এই শেষ সময়-টুকুতে একটু বিরক্তই না হয় হলে। আজকের দিনটার মধ্যে বৈ ত নয়! কাল থেকে আর কোন বালাই থাকবে না।" ম্লান নিষ্প্রভ হাসি দিয়ে কথা শেষ হল।

মিনতি চাইলে। অশ্রুটলমলে সে চাউনি। চারটি চোখের মিলন হল।

"মিনু"

"বল"—স্বর কাঁপলো।

"চল্লুম। বংশে বাতি দিতে কেউ নেই আমার—যাক্। তা নাই থাক্। তাতেও আপশোষ নেই, তবে মণি আমার আজীবনের সঙ্গী, আমার চির অকৃত্রিম বন্ধু মণিকে আজ অসহায় রেখে যেতে বড় কষ্ট হচ্ছে তাই তোমার কাছে একটু দয়া—একটু না—বেশী বেশী—অনেকখানি দয়া চাইছি—পাব কি? আমার মণিকে একটু আশ্রয় দেবে কি তুমি! সে যেন তার নলিনদার অভাব বুঝতে না পারে—এইটুকু ব্যবস্থা করতে পারবে কি মিনু।"

নিরুত্তর। দুটী চক্ষু বেয়ে কান্নার বান ডেকে এলো।

"মিনু।"

"কেন?"

"এই আমার বিদায় বেলাতেও কি কিছু বলবার মত কথা তোমার মনে হচ্ছে না? থাক্—নাই হোক্। বল—পারবে কি মিনু। শেষ হয়ে এল আর কি! বল, এইটুকু উদ্বেগ দূর হলেই আমি চলি আর কি?"

আরও—আরও কি মানুষের সহ্য হয়! তার চোখের সামনে তারই বুকের দেবতা অভিমান-ভরে চ'লে যাবে আর আজন্ম পিয়াসী সে চোখের সামনে তাই কি দাঁড়িয়ে দেখতে পারে গো!

ছোট বয়সের চঞ্চল মনের জন্যে একটা চকিতের ভুল ক'রে ফেলেছিল, খেয়ালের বশে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেছিল মাত্র। সে ক'টা দিনই বা—তাও একদিনও সে ধর্ম্মের নিয়ম মেনে চলে নি, সে অসংযত আচার প্রথার অঙ্গ স্পর্শও করে নি। নিজের ভুল বোঝবার সঙ্গে সঙ্গেই সমাজ তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে, তার প্রাণের দয়িতকে মিথ্যায় ভুলিয়ে দিয়েছে, তাই না সে আজ বুকের জ্বালায় পথের কাঙ্গালিনী। চির আপনারকে আজ প্রাণের কাছে টান্‌তে অক্ষম। শুধু তাই নয়—সে আজ তারই মত অকালে ঝরে পড়তে চলেছে—জীবনের এই ভরা জোয়ারে ভাটার টান লেগেছে। মিনতির মাথার ভেতরটা ঝিম্‌ঝিম্‌ ক'রে উঠলো। অসহ্য যাতনায় অধীর হ'য়ে সে তার পায়ের কাছে আছড়ে পড়লো, বল্লে,—"ওগো! যেও না—যেও না তুমি। দু'টী পায়ে ধরে তোমার মিনতি ভিক্ষা চাইছে আজ যে, তুমি বেঁচে থাক! আমার দূর থেকে দেখার আশাটাতেও বাদ সেধো না। অভিশপ্তা পাপিনী আমি—পাছে কাছে এলে তোমার উপরও সমাজের পীড়ন হয় সেই জন্যেই এতদিন আস্‌তে সাহস করি নি। কিন্তু আর যে পারি না—আর যে সহ্য হয় না—তাই বলছি, তুমি শোন গো—দেশের, দশের চোখে আমি ধর্ম্মত্যাগিনী হ'লেও আমি তোমার—তোমার দাসীর দাসী। আমায় বিশ্বাস কর, তোমারই সুখের আশায় তোমাকে ছেড়ে এক পাশে পড়ে আছি। দিবানিশি স্মৃতির দুয়ারে তোমার এই মোহন-মূর্ত্তির অর্চ্চনা করে এসেছি। দেবতা আমার! প্রিয়তম আমার!! অভিমান করো না আমার উপর—ভুল বুঝো না আমাকে।

স্বরহীন মুখ থেকে উত্তর এলো না।"

মিনতি চীৎকার করে কেঁদে উঠলো—"মণি রে—দাদু আমার।"

ব্যাকুল আর্ত্তনাদ হাসিভরা জগতের বুকে ছড়িয়ে পড়ে একটা উপহাসের প্রতিধ্বনি এনে ফিরিয়ে দিলে!

"দ্বিজেন্দ্রলাল"

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত, এম-এ।

(১)

নাট্যরাজ্য চক্রবর্ত্তী, মহিমা তোমার অপরিমেয়
'ভারতবর্ষ' জন্মপ্রদাতা সুরমূর্চ্ছনা-জ্ঞান-অজেয়।
ভারতে নেহারি লুপ্ত ঐক্য,
জাগিয়া উঠিল মহাচাণক্য ;
বুঝিল বিশ্ব দ্বিজগণ কভু নহেক ক্ষুদ্র, নহেক হেয় !

(২)

মেবারে উড়িল ধ্বংসপতাকা বিজয় আশার না হেরি লেশ,
বীর্য্যধর্ম্মে আছিল যাহাই অপার-অসীম-অমেয়াশেষ।
কল্যাণীবাণী কহিল কর্ণে,
"সত্য ইহাই বর্ণে বর্ণে—
'মানুষ হোস্ রে আবার তোরা, দুঃখ নাই কো, যাক্ সে দেশ ।"

(৩)

দেশের লাগিয়া চলিল প্রতাপ তেয়াগি রাজ্যসিংহাসন,
'ম্যারাথন' সনে 'থার্ম্মোপাইলি' হেরিল ভারতে বিশ্বজন,
বিধি ও কর্ম্মে লাগিল দ্বন্দ্ব,
প্রাক্তন-গতি বাধাল ধন্ধ,
ফিরিল না আর চিতোর-স্বর্গে দিল সে জীবন বিসর্জ্জন !

(৪)

চকিত-চাহনি-চপল চাতকী যাচিল কাতরে প্রণয় ভিক্ষা,
রূপজ-মদনে মনপ্রাণ সঁপি' রহিল দাঁড়ায়ে করি' প্রতীক্ষা ;
জীমূতমন্দ্রে কহিল বন্দী,—
চিরকাল রব প্রতিদ্বন্দ্বী,—
ক্ষত্রধর্ম্ম-প্রয়াসী ভারতে দেখা'ল যতীর পরম শিক্ষা।

(৬)

ভ্রাতার রক্তে প্লাবিয়া রাজ্য স্বকরে ধরিল নৃপতি দণ্ড,
কারাগারে ফেলি পুত্র পিতায় সাজিল আপনি কপট ভণ্ড।
ময়ূর-আসন টলিল স্বননে,
জলদের জাল ঢাকিল গগনে,
অন্তদশায় হানিল কুঠার আপন চরণে ভীরু পাষণ্ড।

(৬)

স্বদেশ প্রেমিক, গাঁথিলে যতনে বাণী-প্রাণ-সম্ম-পুষ্প মালা,
ভরিল বিশ্ব গানে ও গন্ধে, ভাসিল ভারত চরণভালে।
এস দ্বিজেন্দ্র, বাঙ্গলা-গরিমা,
সাজাও জাগিয়া স্বদেশ-প্রতিমা,
মাতাও মানস বিমলানন্দে, নিত্য নূতনে নাট্যশালা।

কবরী-ভূষণ ও শঙ্খ

খৃষ্টীয় ৫০০ শতাব্দীতে নারীরা কবরীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য যেরূপ দ্রব্য এবং বাজাইবার জন্য যেরূপ শঙ্খ ব্যবহার করিতেন, অজন্তা গুহায় তাহার চিত্র বিদ্যমান আছে। এই ছবি তাহারই অনুলিপি।

যমুনা-শতদ্রু খাল

এই বৃহৎ খাল সম্রাট ফিরোজ সাহ টোগলক খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাটাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য ইহাতে কৃষি কার্য্যের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে।

রোমক-ভাস্কর্য্যে নীল নদ

রোমক ভাস্করগণ কোনও কোনও ক্ষেত্রে গ্রীক ভাস্কর্য্যের অনুসরণ যে করিত এরূপ প্রমাণ তাহাদের ভাস্কর্য্য-শিল্পে পাওয়া যায়। রোমক ভাস্করের খোদিত রূপক মূর্ত্তির পরিচয় এখানে দেওয়া হইল। এই দীর্ঘ ও বলিষ্ঠকায় পুরুষটীকে নীল নদের প্রতীকস্বরূপ খোদিত করা হইয়াছে। এ পুরুষ-মূর্ত্তিকে যে সকল শিশুমূর্ত্তি আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে—তাহারা হইল জাতির প্রতীক। পার্শ্বে যে দ্রাক্ষাগুচ্ছ রহিয়াছে তাহা লক্ষ্মীশ্রীকে বুঝাইতেছে।

পাহাড় কুঁদিয়া মন্দির
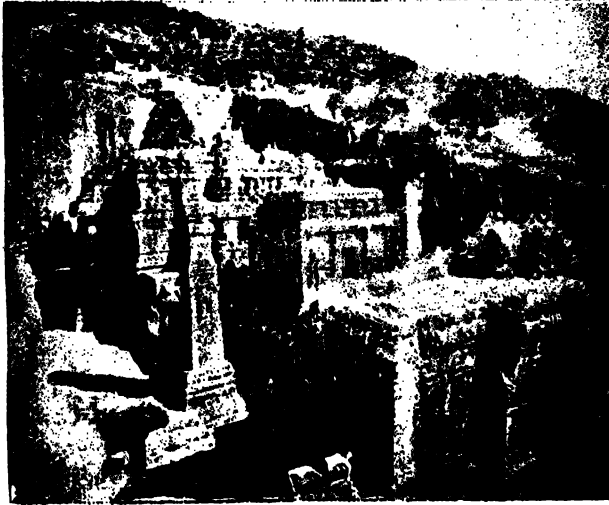
বড় বড় পাহাড় কুঁদিয়া মন্দির-নির্ম্মাণ হিন্দু শিল্পীদিগের বিরাট কীর্ত্তি। দাক্ষিণাত্যে ইলোরা নামক স্থানে এরূপ একটি মন্দির আছে। হিন্দু শিল্পীরা একটি আস্ত পাহাড় কুঁদিয়া এই মন্দির তৈয়ারী করিয়াছে। ৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রকূট নরপতি প্রথম কৃষ্ণের রাজত্বকালে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এরূপ শিল্পের নিদর্শন ভারতবর্ষে একাধিক আছে।

দ্বিতীয় বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৩৬ | তৃতীয় সংখ্যা

পুষ্পাঞ্জলি

[শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ, বি-এল]

হৃদয়-নদী শুকায় যদি, না চলে প্রেমে চঞ্চলি',
যাত্রা-পথে হারাই রথের সারথী,—
চরণ-তলে নয়ন-জলে দিব মা তবে অঞ্জলি,
সে পূজা মোর ঠেলো না পায়ে, ভারতি !
এমনি গানে ভরিব ধরা বিরহ-ভরা উচ্ছ্বাসে
প্রেমিক প্রাণ উঠিবে শুনি' চমকি,
বেসুরে তার বাজিবে বাঁশী, রবে না হাসি উল্লাসে,
ভাবিবে 'ভবে মিলন তবে ভ্রম কি !'
স্মরণে আনি' জননী-মুখ জিনিব জরা-মরণে,
সশোক হৃদি **অশোক** হ'য়ে ফুটিবে রাঙা-চরণে।

হৃদয় যবে মলিন হ'বে, শোধিব সমল চিত্তকে—
তব নয়ন-করুণা-বারি সিনানে,
ভুলিব না ত তুমিই মাতঃ দীনের পরম বিত্ত যে
জননী বিনা তনয়ে আর কি জানে ?
এমনি গান গাহিবে প্রাণ মরম-বীণা ঝঙ্কারি',
সকল প্রাণী মনের গ্লানি নাশিবে,
সঞ্জীবনী সে সুধা-রসে নবীন জীবন সঞ্চারি,
ধরণী ভরা দৈন্য জরা শাসিবে ;
অশ্রু-আঁকা জননী-আঁখি আনিয়া আমি স্মরণে,
শিশির-মাখা **শেফালী** সম ঝরিব তব চরণে।

হৃদয় যবে আন্দোলিবে ছন্দোহারা তরঙ্গে,
ধরণী যবে হেরিব ঘন-বরণী,
ভগ্ন হালে, ছিন্ন পালে অন্ধ ঝড়ের ভ্রূভঙ্গে,
ছুটবে তরী লক্ষ্য করি' মরণই;
এমনি গান গাহিবে প্রাণ জীবন-মরণ সঙ্কটে
তোমার বাণী তোমারি সুরে ভরিয়া,
জানিবে সবে চরণ তব সত্য-সনাতন বটে,
মরণ-ভয় করিবে জয় স্মরিয়া ;
জননী-চরণামৃত পিয়ে জীবন পাব মরণে,
অপরাজিতা কুসুম হ'য়ে রাজিব রাঙা চরণে।

হৃদয় যবে জর্জ্জরিবে হিংসা-ফণী দংশনে,
গরল স্বাদ পাইব যবে অমৃতে,
করাল ছায়া পড়িবে যবে মনের মায়া-দর্পণে,
সত্য বলি' ভাবিব যবে অনৃতে,
তখন যেন তোমায় হেরি সদ্য পাতক-হন্ত্রী মা,
চরণ-ধ্বনি শুনি গো বুকের শোণিতে,
ছিন্ন-তার বীণারে মম পরাই নূতন তন্ত্রী, মা—
তোমারি করে থাকে সে যেন রণিতে ;
মায়ের অট্ট-হাসির ছটা ঘুচাবে মনের কালিমা,
উৎপাটিয়া মর্ম্ম-**জবা** চরণে দিব ডালি মা।

হৃদয় যবে শান্ত হ'বে চরণ-পাওয়ার আনন্দে,
চিত্ত-সরে তবেই কমল ফুটিবে,
গুঞ্জরিবে ভৃঙ্গ কত শতদলের সুগন্ধে,
বার্ত্তা তাহার দিগ্বিদিকে ছুটিবে.
বীণায় মম তোমারি বাণী উঠিবে তবে ঝঙ্কারি'
সে গানে প্রাণের সকল জ্বালা জুড়া'বে,
মরুর মাঝে মিলিবে বারি, মিটাবে তৃষা সংসারী,
কাঁটার বনে অমৃত-ফল কুড়া'বে
তখন মোরে করুণা করে' শুন গো সরোজ-আসনা,
চরণ-তলের **কমল** করো' এই মা দীনের বাসনা

নিবেদন

বঙ্গ-সাহিত্য আজ যাঁহার কৃপায় বিশ্ববরেণ্য হইয়াছে, জগতের সম্পৎশালী ভাষাগুলির ভিতর আপনার ন্যায্য স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে, সেই প্রতিভার বরপুত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ-ভাষার উন্নতির জন্য যাহা করিয়াছেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া পাঠকের ধৈর্য্য-চ্যুতি করিব না। তিনি পিতৃপুরুষের সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ কেবল মাত্র সংস্কৃত ভাষার নিকট ঋণী থাকিয়া ভাষা-জননীর সৌষ্ঠব-সাধন করেন নাই। তিনি মৃতকল্প অনাদৃত ভাষাজননীর ভিতর সঞ্জীবনী-মন্ত্রে প্রাণের চেতনা আনিয়াছেন। তিনি মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিম চন্দ্র-প্রমুখ পূর্ব্বসূরীদের পথ অনুসরণ করিয়া জগতের ভাব-রাজ্য হইতে ভাব সমাহরণ করিয়া, নূতন নূতন ভাবের সন্ধান দিয়া ও সেই সকল ভাবকে নিজস্ব করিয়া নূতন মূর্ত্তিতে আমাদের সমক্ষে ধরিয়া দিয়াছেন। নূতন সৃষ্টি করিয়া জগদ্বাসীর নিকট নিজেও বরেণ্য হইয়াছেন, বাঙ্গালীকেও ধন্য করিয়াছেন। জগদ্বাসী নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে সে সকল সৃষ্টির সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তা দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছে। প্রতিভা আপনার পথেই চলিয়া থাকে সত্য, সে উদ্দাম গতিতে পার্ব্বত্য নদীর ন্যায় সকল বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া নিজের পথ তৈরী করিয়া লয়। দ্বিজেন্দ্রলাল যখন আমাদের সহিত 'ভারতবর্ষ' প্রচারে ব্রতী হ'ন, তখন বজ্রনির্ঘোষে উক্ত হইয়াছিল, 'প্রতিভা পুরাতনের রূপে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহে না—সে মুক্ত বাতাসে পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িতে চাহে। প্রতিভা পুরাতন আদর্শে আবদ্ধ থাকে না, পুরাতন ও নূতনে মিশাইয়া নূতন আদর্শ সৃষ্টি করে।' আমাদের বাল্যাবস্থায় এমন এক দিন ছিল যখন সংস্কৃতের আলোচনা না করিয়া কেবল মাত্র মাতৃ-ভাষার সেবা করিলে কর্ত্তাদের নিকট হইতে তিরস্কৃত হইতে হইত। গতানুগতিকের ফলে তাঁহারা এরূপ করিতেন মাত্র—অবশ্য অত্যুৎকট স্বাদেশিকতার ফলে যে তাঁহারা এরূপ করিতেন তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয় এইরূপ করিবার কারণ বাঙ্গালা ভাষায় তখন নূতন ভাবের কোন সন্ধান পাওয়া যাইত না। যাহা হউক সে সুর পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কালের বিচিত্র গতিতে এখন বাঙ্গালী আর বাঙ্গালা ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করিতে ঘৃণা বোধ করে না—সে ইংরেজী আদব কায়দার অনুকরণ করিয়া হাঁচে না, কাশে না, ইংরেজীতে স্বপ্নও দেখে না। আত্ম-বিস্মৃত বাঙ্গালী আপনার ভুল বুঝিয়া সত্য পথে চলিতে শিখিয়াছে; বুঝিয়াছে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি ছাড়া তাহার জাতীয়-জীবনের উন্নতির আর অন্য পথ নাই - বাঙ্গালী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছে জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া মাতৃভাষার সেবা দ্বারাই প্রকৃত জাতীয়তা রক্ষা করা যায়। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চাই 'নূতন ও পুরাতনে মিশিয়া নূতন আদর্শ সৃষ্টি করা'—অমর দ্বিজেন্দ্রলালের ভবিষ্যদ্বাণী সফল করা। শুধু পুরাতনকে সাগ্রহে ধরিয়া থাকিলেও চলিবে না—চাই নূতন ও পুরাতন ভাবের সম্মিলনে নূতন ভাবের প্রতিষ্ঠা। এরূপ ভাব-প্রতিষ্ঠা সাহিত্যে, ধর্ম্মে, সমাজে বহুবার হইয়া গিয়াছে। কোন নূতন ভাবের ভগীরথ আসিয়াও সেই ভাবকে পুরাতনের খাতে প্রবাহিত করিয়া না দিতে পারিলে কখনও কৃতকার্য্য হন না। তাই বলিতেছিলাম—এখন চাই নূতন ও পুরাতনের সম্মেলন।

এ কথা যে শুধু ভাব-রাজ্যের কথা লইয়াই বলিতেছি তাহা নয়। প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন লোক লইয়া ভাবের আদান-প্রদানের যেমন একটা সাধারণ বৈঠক চাই, তেমনই প্রাচীনের কর্ত্তব্য সংসারে অনভিজ্ঞ যুবকদিগকে তাহাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের বিষয় জানান। যাত্রাপথে যা কিছু বাধা-বিঘ্ন তাঁহারা পাইয়াছেন তাহার যথাযথ বর্ণনা। এ পথে অগ্রসর হইতে যে সকল সত্য তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন, সে গুলিরও সন্ধান তাহাদিগকে অকুণ্ঠিত চিত্তে দান করা। অবশ্য আদর্শ লইয়া প্রাচীন ও অর্ব্বাচীনের ভিতর পার্থক্য যে একটু না হইতে পারে তাহা বলি না; কিন্তু এ কথাও বলি, সে পার্থক্য দূর করা সহজেই তো

হইতে পারে। যতই নবীনেরা মুখে বলুন না কেন তাহারা বাস্তবের উপাসক, আদর্শের উপাসক নন ; কিন্তু সে কথা তাঁহারা বুকের উপর হাত দিয়া বলিতে পারেন না। এককালে এ দেশটা অতিমাত্রায় যে সংরক্ষণশীল ছিল—তাহা সত্য ; কিন্তু সময়ের গুণে সে সংরক্ষণশীলতার মাত্রা একটু কমিয়া আসিয়াছে। দেশের ও দশের জন্য যাহা কর্ত্তব্য উভয় দলের ভিতর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তাহা কি করা যায় না? আমরা বলি খুবই যায়। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র ১৩২২ সালের ফাল্গুন মাসের 'মানসীও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় 'নববর্ষ' প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন—'ভারত ভাবুকতার দেশ সত্য, কিন্তু বাস্তবকে অবহেলা করিলে তো চলিবে না। * * ভাবুকতা চাই বাস্তবের কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য—ভাবুকতা চাই কর্ম্মে-প্রেরণা আনয়ন করিবার জন্য—ভাবুকতা চাই কর্ম্ম করিবার জন্য। শুধু বাস্তবতা বা শুধু ভাবুকতাকে ধরিয়া থাকিলে চলিবে না। বাস্তবের পূজা করিয়া 'অতি মানুষের'দেশ পাশ্চাত্য জগতে কি ভয়ঙ্কর প্রলয় কাণ্ডের সূচনা করিয়াছে। আবার প্রাচ্য জগতে চীন ও ভারতবর্ষ ভাবুকতার মাদকতায় বিভোর থাকিয়া উন্নতির কতদূর নিম্নে আসিয়া পড়িয়াছে? ভাবুকতা ও বাস্তবতার অপূর্ব্ব সম্মেলনে বঙ্গ সাহিত্যে নবপ্রয়াগের সৃষ্টি হউক।' বাস্তবিকই আমরা কি চাই না এই ভাবুকতা ও বাস্তবতার অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিতে? প্রাণে প্রাণে আমরা তাহাই চাই—তাই আজ আমরা নবীন ও প্রবীণদিগের সম্মিলন-প্রয়াসী হইয়া 'পঞ্চপুষ্প'কে উভয়পন্থী চিন্তাশীল লেখকদের রচনা-সম্ভারে সজ্জিত করিবার চেষ্টা পাইব। পঞ্চপুষ্প বঙ্গসাহিত্যে নবীন-প্রবীণের মিলন-কেন্দ্র হউক। আমরা যে প্রবীণ—আমরা তো নবীনকে ছাড়িয়া চলিতে পারি না—বর্জ্জন করা তো প্রাচীন ভারতের নীতি নয়—গ্রহণই যে তাহার নীতি। সেই নীতি অনুসরণ করিয়াই আমরা চলিব। নবীনের হাতেই যে আমাদের ভবিষ্যৎ--তাহারা যে আমাদেরই আশা-ভরসা স্থল। তাঁহাদের উৎকট ব্যক্তিত্বের ও ভাবের আমরা তীব্র সমালোচনা করি সত্য ; কিন্তু আমরা সত্যই তাহাদিগকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি—তাহাদিগকে বিপথগামী হইতে দেখিলে প্রাণে ব্যথা পাই—তাই সময়ে সময়ে তাহাদিগকে দু'একটা কথা বলি। শিক্ষা-দীক্ষার দোহাই দিয়া কিছু বলি না—বলি, বয়সের অভিজ্ঞতার দিক্ দিয়া, প্রাচীন ভারতের আদর্শের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার দিক দিয়া, ভারতবাসীর বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া কথা বলি। নবীনদেরও মনে রাখা উচিত প্রাচীনেরা তাহাদের শত্রু নয়, তাহাদের পরম মিত্র ; সত্য, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের পথে চালিত করিবার জন্যই আমাদিগকে দু'একটা অপ্রিয় কথা বলিতে হয়। রোগ যেখানে দুরোরোগ্য বা ভীষণ আকার ধারণ করে, সেখানে তিক্ত ঔষধের ব্যবস্থা তো করিতেই হয়। পুত্র যদি বিপথগামী হয় তবে তাহাকে তো শিক্ষা দিবার জন্য সকল শাসনপদ্ধতিই অবলম্বন করা বিধেয়। আবার প্রাচীনদিগকে মনে রাখিতে হইবে সহানুভূতির সহিত শিক্ষা না দিলে শিক্ষা সাফল্য-মণ্ডিত হয় না। আরও একটা কথা তাহাদের মনে রাখা উচিত—যৌবন-সুলভ চাপল্য-দোষ সহজেই দূর হইতে পারে ও হইয়া থাকে। নিজ নিজ যৌবনের সময়টার কথাও একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। আবার নবীনদিগকে বলি প্রবীণের মান সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া কথা বলাও তাঁহাদের, উচিত। আসল কথা হইতেছে—উৎকট ব্যক্তিত্ব-বাদের মোহে পড়িয়া আপনাকে 'অতি-মানুষ' রূপে দাঁড় করান কাহারও উচিত নয়। যে যাহা বলিতেছে তাহা যুক্তিযুক্ত কি না তাহা বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। "দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ"—শুধু এই প্রবচনের উপর নির্ভর করিয়াই যে আমরা সকলকেই 'পঞ্চপুষ্পে'র সেবার জন্য আহ্বান করিতেছি তাহা নয়--আমরা নবীনদের নিকট হইতে চাই ভাবের সজীবতা, প্রবীণদের নিকট হইতে চাই ভাবের গভীরতা ও স্থিরতা। উভয়ের বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বলে-মধুরে মিলন দেখিতে চাই। কোন দিনই আমি সাহিত্যকে সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতর ফেলিয়া কোন মাসিক পত্রিকাকে কোন দলের মুখপত্র করি নাই। আজও তাহা করিতে চাহি না।

সকলে মিলিয়া তো কার্য্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইব স্থির করিলাম, কিন্তু কি কাজ করিব? এ জীবনে ছোট-বড় অনেক মাসিক পত্রের ভারই আমার উপর পড়িয়াছিল, সে ভার আমি কেমন করিয়া বহন করিয়াছি—কর্ত্তব্যের পথে কি ভাবে চলিয়াছি তাহা মাসিকপত্রসেবি- মাত্রেরই নিকট অপরিজ্ঞাত নয়। এ বয়সে যে আবার আমাকে

দেশের ও দশের সেবার জন্য মাসিক পত্র সম্পাদনের গুরুভার লইতে হইবে তাহা কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নাই। সে দিন প্রাতঃকালে যখন এই প্রস্তাব লইয়া আমার নিকট পঞ্চপুষ্পের কর্ম্মকর্ত্তা কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ দাস মহাশয় আসিলেন, সে দিন তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সম্মত হইয়া পড়িলাম। সাহিত্য-সাধনাই আমার জীবনের একমাত্র যে লক্ষ্য তাহা সরল প্রাণে স্বীকার করি; কিন্তু যে হস্ত বহু মাসিকপত্র-সম্পাদনে পূর্ব্বে নিয়োজিত ছিল সে হস্তের কি এখন তেমন শক্তি আছে যে, আবার নূতন করিয়া কোন কিছু লিখিতে পারিব। বয়োধর্ম্মে হস্ত তো দুর্ব্বল হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মনও কি দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে না? এমন হাত ও মন লইয়া কি করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইব তাহা ভাবিয়া বিব্রত হইয়া পড়িলাম—নিজের উপর ধিক্কার আসিল—কি দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে স্বীকার করিয়া ফেলিলাম। যাঁহাদের সহায়তায় পূর্ব্ব পূর্ব্ববারে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলাম, যে সকল শ্রদ্ধেয় বন্ধু-বান্ধব ও কল্যাণভাজনদের অক্লান্ত পরিশ্রমে কতকটা যে সফল হই নাই তাহা বলি না; তাঁহাদিগের পরামর্শ চাহিলাম। তাঁহারা একবাক্যে আমায় উৎসাহিত করিলেন—প্রাণে আবার উৎসাহের বান ডাকিল। ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলাম।

তাই বলিতেছিলাম কি করিব—দেশের ও দশের সেবা করিতে হইলে সত্য, শিব ও সুন্দরের পথে চলিতে হইবে। হৃদয়ের পরতে পরতে সত্যকে উপলব্ধি করিতে হইবে—সুধু উপলব্ধি করিলেই চলিবে না, ভাষার সাহায্যে দেশের সম্মুখে তাহাকে উপস্থাপিত করিতে হইবে। দেশ যাহাতে মঙ্গলের পথে চলিতে পারে তাহাই করিতে হইবে। এমন সত্য আদর্শ উপস্থাপিত করিতে হইবে যাহা দেখিয়া দেশবাসী নূতন ভাবে জীবন গঠিত করিবার সুযোগ ও সুবিধা পান। সাহিত্য তাহাই—যাহা হিতের সহিত অন্বিত—যাহা মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধান মানিয়া চলে। যাহাতে দেশের মঙ্গল হয় তাহাই সাহিত্যের কাজ। আর সাহিত্যিকের আর একটা বড় কাজ হইতেছে—সত্য ও শিবকে সুন্দরের ভিতর দিয়া প্রকাশ করা। ধ্যান-ধারণায় চির-সুন্দরের মূর্ত্তি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে না পারিলে সুন্দরের যথার্থ পরিকল্পনা হয় না। জগতে অসুন্দরের স্থান আছে সত্য, কিন্তু তাহার কারণ অসুন্দর সুন্দরের সন্ধান দেয়। লোক-লোচনের কাছে অসুন্দরের স্থান কতটুকু, না,—যতটুকু অসুন্দরের চিত্র দেখিয়া অসুন্দরের প্রতি ঘৃণা জন্মে—অসুন্দরকে সুন্দর করিবার, শোভন করিবার চেষ্টা না আসে—ততটুকুর স্থান আছে মাত্র। যেখানে অসুন্দরকে সুন্দরের আবরণে চিত্রিত হইতে দেখিব সেই খানেই আমরা তাহার তীব্র সমালোচনা করিতে কুণ্ঠিত হইব না। অসুন্দর রোগের পরিচয় জানিবার জন্য ভিষক্ যেমন রোগীর নিকট হইতে অবস্থার কথা জানিয়া লন, সেইরূপ জানিবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু জানিয়া লইয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাস্তবতার দোহাই দিয়া ন্যক্কারজনক চিত্র অঙ্কিত করিলে চলিবে না। আজকাল আবার সাহিত্যে অসুন্দরের প্রকাশের নূতন এক পন্থা বাহির হইয়াছে, সেটা হইতেছে যৌন-সম্মিলনের চিত্র। এ বিজ্ঞানের যাহারা ক, খ, পর্য্যন্ত জানেন না তাহারাই এ বিষয়ে শিক্ষা দিতে অগ্রসর হন। যৌন-সম্মিলনের চিত্র অঙ্কিত করিবার অধিকারী তিনিই যাঁহার এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শাস্ত্রসমূহ যিনি পাঠ করিয়াছেন, সর্ব্বোপরি যাঁহার ভাষার উপর সংযম আছে। গ্রাম্যতা দোষে যিনি দুষ্ট নন। ভাষার নগ্ন আবরণে যিনি কথ্য ভাষার প্রচার করেন তাঁকেই আমরা অশ্লীলতা দোষ-দুষ্ট বলিয়া অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হইব না। এ বিষয়ের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি প্রচার করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়; আর সাধারণ পত্রিকায় যদি প্রচারই করিতে হয় তাহা হইলে অশ্লীলতাদোষ যাহাতে কোনরূপেই ভাষায় প্রবেশাধিকার করিতে না পারে সে দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই অশ্লীলতা প্রচার করিবার আর একটা নূতন পথ বাহির হইয়াছে—সেটা হইতেছে আলোচনার ব্যপদেশে ন্যক্কারজনক চিত্রের বহুল প্রচার। এ সব আলোচনাকারীদিগকে মাত্র এই কথা বলিতে চাই, নগণ্য পত্রিকার দু-চার জন পাঠকের চোখে যাহা পড়িয়াছে তাহা সাধারণের মনে ঘৃণার উদ্রেক করিবার জন্য উদ্ধার করিবার প্রয়োজন কি? এ শ্রেণীর আলোচকদের উদ্দেশ্য যে অসাধু তাহা বলি না—কিন্তু ফলশ্রুতিতে দাঁড়ায় কি? অল্পমতি যুবক-যুবতীরা এই সকল পত্রিকার ঐ সকল স্থান গুলি পড়িবার

জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ে। বায়স-শিশু যখন নূতন বিষ্ঠার আস্বাদন করে তখন সে যেমন যেখানেই বিষ্ঠা পায় সেখানেই ছুটিয়া থাকে, যৌবনের প্রারম্ভে যুবক-যুবতীরা কাল-ধর্ম্মোপযোগী ভাবের সন্ধান যেখানে পায় সেই খানেই ছুটিয়া যায়। এ পথ যাঁহারা খুলিয়া দিতেছেন তাঁহাদের পদ্ধতিকে শুভদায়ক কখনই বলিতে পারি না। এ গুলি পড়িয়া দু-এক জনের চক্ষু খুলিতে পারে—কিন্তু বহু যুবক-যুবতীর ইহাতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা কি বেশী নয়?

কার্য্য-পদ্ধতির ইঙ্গিত করিলাম মাত্র—কি করিব না করিব তাহার ফিরিস্তি দিতে চেষ্টা করিব না—তবে এই মাত্র বলি, ভারতের তথা বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে আমাদিগকে উন্নতির পথে লইয়া যাইবার যাহা সহায় হইবে, তাহাই আমরা পত্রস্থ করিব। আমাদের ও আমাদের জাতীয়-জীবন গঠিত করিতে হইলে যে সকল উপাদান আয়ত্ত করা চাই, যে সকল জাতির আদর্শ লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে কর্ত্তব্যের পথে চলিতে হইবে, সে সকল পথ-নির্দ্দেশক প্রবন্ধাদি আমরা সাদরে প্রকাশ করিব। পুরাতন ভারতের কাহিনী ও নূতন ভারতের বাণী প্রচার করাও পঞ্চপুষ্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। কোনরূপ রাজনীতির কথা ইহাতে থাকিবে না। শ্রীভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যেন ভারতের বিশিষ্ট আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সত্য শিব সুন্দরের পথে চলিয়া দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য কার্য্য করিতে পারি। মঙ্গলময় আমাদের এই কার্য্যে সহায় হউন। পরিশেষে বাগ্দেবীর নিকট প্রার্থনা করি যেন আমাদের যাত্রাপথ শুভ হয়—শুভদে বরদে মা আমার! যদি কোন দিন বিভ্রান্ত হইয়া বিপথে চলিতে যাই, সেই মুহূর্ত্তে যেন তুমি জ্ঞানের বর্ত্তিকা লইয়া আমাদিগকে সত্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিও।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

ভরতের নাট্যশাস্ত্র

[মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম·এ, ডি-লিট্, সি-আই·ই]

ভরতের নাট্যশাস্ত্র ছাপা হইয়াছে। ইংরেজি ১৮৯৪ সালে কাব্যমালায় ছাপা হইয়াছে। আর ১৯২৬ সালে গায়কোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজে ছাপা হইয়াছে। কিন্তু ইহা চার খণ্ডে পূরা হইবে, এক খণ্ড মাত্র ছাপা হইয়াছে। ইহার সহিত অভিনবগুপ্তের টীকা আছে এবং ১০৮ রকম নাচের মধ্যে ৯৮ রকম নাচের ছবি আছে। চৌখাম্বা হইতেও ইহার আর এক সংস্করণ বাহির হইয়াছে। কাব্যমালার সংস্করণের সম্পাদক ২খানি মাত্র পুঁথি পাইয়াছেন, তাহাতে অনেক পাঠ ছিল না; অনেক জায়গায় পোকায় খাওয়া ছিল। সে সকল বাদ দিয়া তাঁহাকে ছাপাইতে হইয়াছে। গাইকোয়াড়ের বই পুঁথি দেখিয়া ছাপা হইতেছে। তাহার সঙ্গে টীকার পাঠও আছে। চৌখাম্বায় মূল মাত্র, কিন্তু সে মূল কাব্যমালার মূল অপেক্ষা অনেক ভাল।

ভরত-নাট্যশাস্ত্র বাহির হওয়া অবধি অনেকেই এই নাট্যশাস্ত্র পড়িতে ছিলেন এবং বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। পুরাপুরি বুঝা অসম্ভব ছিল। কারণ, কাব্যমালার নাট্যশাস্ত্রের পাঠই ঠিক হয় নাই, আর যেখানে ১০৮টা লক্ষণ থাকিবার কথা সেখানে হয় তো ৯৫টা বই নাই। সে বুঝিয়া ওঠা কঠিন। নেপালের একখানি হাতের লেখা পুঁথির সহিত কাব্যমালার পাঠ মিলাইতে গিয়া আমি দেখি প্রায় ১০ অংশের এক অংশ নাই। গাইকোয়াড়ের নাট্যশাস্ত্র বাহির হওয়ায় বুঝিবার অনেক সুবিধা হইয়াছে। পাঠের সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ নাই। টীকাও ভাল। কিন্তু টীকা অভিনবগুপ্তের লেখা, বড় গাঢ়। কিন্তু সে তো ৭ অধ্যায় বই বাহির হয় নাই। বাহির হইবার জন্য লোকে অত্যন্ত ব্যস্ত আছে। তাহার উপর

আবার রামচন্দ্র কবি সম্পাদক লিখিয়াছেন, শেষ ভাগ যখন বাহির হইবে তখন ইংরেজিতে একটা প্রকাণ্ড ভূমিকা লিখিবেন। তাহাতে আমাদের উৎকণ্ঠা বাড়িয়া গিয়াছে। রামচন্দ্র কবি কি করিবেন না করিবেন, আমরা এখনও জানি না। কিন্তু তিনি ১ম ভাগের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত এবং তিনি অনেক বৎসর ধরিয়া নাট্যশাস্ত্রে মজিয়া আছেন। তিনি যে একটা খুব চমৎকার জিনিস লিখিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার বই বাহির হইতে এখনও বোধ হয় আট বছর লাগিবে। এই আট বছরের জন্য পাঠকদিগের কতকটা তৃপ্তি যাহাতে হয় সেই উদ্দেশে আমি আজ ভরত-নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে দু'চারটা কথা বলিব।

ম্যাক্সমূলর সাহেব বলিয়া গিয়াছেন বেদের পুঁথিগুলি চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম ছান্দস, দ্বিতীয় মন্ত্র, তৃতীয় ব্রাহ্মণ, চতুর্থ সূত্র। এ চারি শ্রেণীরই লিখিবার ভঙ্গী স্বতন্ত্র, রীতি স্বতন্ত্র, বিষয় স্বতন্ত্র, আরম্ভ স্বতন্ত্র, শেষ স্বতন্ত্র। ইহার মধ্যে শেষ শ্রেণী সূত্র। বেদের সূত্রগুলি গদ্যে লেখা। আমাদের এখনকার সূত্রের মতন অত ঠাস গাঁথুনি নয়। সূত্রকার যদি আধটা অক্ষর কমাইতে পারেন তাহা হইলে তিনি পুত্র-জন্মের ন্যায় আনন্দ ভোগ করেন। বৈদিক সূত্রকারগণ তত আনন্দ ভোগ করিতেন না। তাঁহাদের লেখা সোজাসুজি সংস্কৃতে যাহাকে প্রাঞ্জল বলে। তাঁহাদের প্রতি অধ্যায় এবং প্রতি অংশে (Section) ভবিষ্যৎ কালের উত্তম পুরুষের বহুবচন থাকেই; যথা, ব্যাখ্যাস্যামঃ, অভিধাস্যামঃ, বক্ষ্যামঃ ইত্যাদি এবং শেষে প্রায়ই একটা বাক্য দুইবার করিয়া বলা থাকে তাহাতে বুঝিতে হয় ইহা শেষ হইয়া গেল। অনেক সূত্র ভাষ্য শুদ্ধই লেখা থাকে এবং ছাপা হয়। আবার অনেক স্থলে ব্যাখ্যা ও কারিকা থাকে।

ম্যাক্সমূলর বলেন যে, সূত্র লেখা শেষ হইয়া গেলে পর ব্রাহ্মণেরা শ্লোকচ্ছন্দে লম্বা লম্বা পুঁথি লিখিতে আরম্ভ করে এবং তাহার ভাষ্য বেদের ভাষ্য হইতে অনেক স্বতন্ত্র, সহজ এবং পানিনি-সম্মত। আমি আরও দেখিতে পাই যে, এই সকল লম্বা লম্বা শ্লোক ছন্দের পুঁথি প্রায়ই এক জন মুনি বলিতেছেন আর অন্য মুনিরা শুনিতেছেন এবং মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই জিজ্ঞাসা ও উত্তরের নাম **সংবাদ**। শেষ দাঁড়াইয়াছিল, ষট্-সংবাদ না হইলে তাহা প্রমাণ বলিয়া মনে করা যায় না। সেইজন্য পুরাণে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় এক জন ঋষি বলিতেছেন, আর এক জন শুনিতেছেন। যিনি বলিতেছেন তিনি আবার আর দুই জনের কথা বলিয়া সে সকল কথা উল্লেখ করিতেছেন। সে দু জনের মধ্যে আবার যিনি বলিতেছেন তিনি আরও প্রাচীন দুজনের কথাবার্ত্তার উল্লেখ করিতেছেন। ভরতনাট্যশাস্ত্র কিন্তু এরূপ ষট্সংবাদ নয়। ইহাতে একই সংবাদ। ভরত মুনি বলিতেছেন এবং অন্য ঋষিরা শুনিতেছেন মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিতেছেন। কাহারও নাম নাই। ইহাতে নাটকের উৎপত্তির কথা আছে। কেমন করিয়া থিয়েটারের বাড়ী তৈয়ার করিতে হয় তাহার কথা আছে। থিয়েটারের বাড়ীর কত ভাগ হয় তাহার কথা আছে। ইহাতে থিয়েটারের অর্দ্ধেকটা প্রেক্ষকদিগের জন্য থাকিত। ইহাতে দোতলা ষ্টেজের কথা আছে। ইহার সিন্‌গুলা নাড়া চাড়া করা যাইত না। সিনের চারি পাশে আঁকা থাকিত। পাশ দিয়া পাত্র প্রবেশ হইত না। ভিতর দিক্ হইতে দু-পাশে দুটী দরজা থাকিত তাহাতে পরদা দেওয়া থাকিত। সেই পর্দ্দা সরাইয়া পাত্র-প্রবেশ হইত। এ বইয়ে ষ্টেজের উপর নাটক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অনেক জিনিস করিতে হইত। সেগুলিকে পূর্ব্বরঙ্গ বলিত। পূর্ব্বরঙ্গে সূত্রধার আসিয়া প্রথমেই জর্জ্জরের পূজা করিত।

জর্জ্জর একটা ছেঁচা বাঁশ। তাহার ছেঁচা অংশ বাদ দিয়া ছয়টা পাব থাকিত, প্রত্যেক পাবে ভিন্ন ভিন্ন রং থাকিত। এক এক পাবের এক এক জন দেবতা থাকিত। এই জর্জ্জর হইলেন থিয়েটারের দেবতা। সূত্রধার জর্জ্জরের পূজা করিতেন। তার পর জর্জ্জরকে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইত। তার পর সূত্রধার ষ্টেজের উপর নানা ভঙ্গীতে পায়চারি করিতেন, তাঁহার নাম "চারি" আর "মহাচারি"। তার পর নান্দীপাঠ।

সূত্রধার সুস্বরে নান্দীপাঠ করিতেন। নান্দীতে ৮টা কি ১২টা বাক্য (Sentence) থাকিত। অথবা ১২টা শ্লোক থাকিত অথবা শ্লোকের ১২টা চরণ থাকিত। এক একটা বাক্য পড়া হইলে পাশে দু জন লোক দাঁড়াইয়া থাকিত। তাহারা বলিত "এই হউক"। নান্দীতে দেবতাদের

স্তুতি থাকিত, ব্রাহ্মণদের স্তুতি থাকিত, রাজারও স্তুতি থাকিত। দেশের লোকের মঙ্গলকামনা হইতে, থিয়েটারের মঙ্গল-কামনা করা হইত। নট-নটীদের মঙ্গল-কামনা করা হইত। তাহাতে কেবল মঙ্গলের কথাই থাকিত, অমঙ্গলের কথা কিছু থাকিত না। নান্দীপাঠের পর পাত্র-প্রবেশ। এখন যেমন হইয়া থাকে তেমনই হইত। কিন্তু সূত্রধার পাত্র-প্রবেশ করাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িত। মধ্যে অর্থাৎ নান্দীর পর এবং পাত্র প্রবেশের মধ্যে সূত্রধার প্রেক্ষকদিগের বেশ একটু তোষামোদ করিতেন। কবির গুণের কথা বলিয়া দিতেন এবং দু একটা গান গাহিতেন।

থিয়েটারের এই বইয়ে নাচের সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। নাচের তিন অঙ্গ। প্রথম **অঙ্গহার,** ২য় **করণ,** ৩য় **নাট্য**। ললিত অঙ্গভঙ্গীর নাম অঙ্গহার। দুই তিন অঙ্গ ভঙ্গী এক সঙ্গে করিলে তাহার নাম হইত **করণ**। অনেকগুলি করণ একত্র হইলে **নৃত্য** হইত।

থিয়েটারের এই বইয়ে কিরূপ পাত্রকে রাজা করিতে হইবে, রাণী করিতে হইবে, বিদূষক করিতে হইবে, চাকর করিতে হইবে, তাহার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপ বিবরণ দেওয়া আছে। তার পর রং করার কথা আছে। শক, যবন, পারদদের সাদা রং দিতে হইত। দ্রাবিড় অন্ধ্র দেশের লোকদের কালো রং দিতে হইত। বাঙ্গালীদের রং অত কালো হইত না। কাশ্মিরী ও পাঞ্জাবীদের রং দুধে-আলতার মত হইত। নানা দেশের লোকের নানা রকম রং করিতে হইত। মূল রং তো চারিটা কি পাঁচটা, সেইগুলি মিশাইয়া ২০।২৫ রকম রং তৈয়ারি করিত এবং তাই ফলাইত।

নাটকের প্রকৃতি বলিয়া একটা জিনিস ছিল। কোন দেশের লোক নাটকের নাচ দেখিতে ভাল বাসিত। কোন দেশের লোক গান শুনিতে ভাল বাসিত, কোন দেশের লোক অভিনয় ভাল বাসিত। কোন দেশের লোক বক্তৃতাকেই ভাল বলিত। **বৃত্তি** বলিয়া নাটকের আর একটা জিনিস ছিল। সেটা লেখার ভঙ্গী, অভিনয়ের ভঙ্গী, কিরূপ [illegible] ব্যবহার করিতে হইবে তাহার ভঙ্গী। কোথায় [illegible] সমাস করিতে হইবে, কোথায় করিতে হইবে [illegible] কেহ সোজা কথায় লিখিত, কেহ বাঁকা কথায় লিখিত, কেহ শক্ত কথায় লিখিত, কেহ দুরূহ কথায় লিখিত। ছন্দের উপর ভরতের খুব দৃষ্টি ছিল। তিনি পিঙ্গলের ছন্দগুলি অনেক ভাঙ্গিয়া লইয়াছেন। নাট্যশাস্ত্রের সব শেষ অধ্যায়ে আছে **সিদ্ধির** কথা ও **ঘাতের** কথা। **ঘাত** মানে যাহাতে রসভঙ্গ হয়। আর **সিদ্ধি** মানে যাহাতে রস জন্মে। ঘাত—যেমন অভিনয় করিতে আসিয়া রাজার মুকুটটা খসিয়া গেল। কোন নট যাহা বলা উচিত তাহার উল্টা কথা বলিল। থিয়েটার হইতেছে এমন সময় পিঁপড়ের পাল উড়িল অথবা সবুজে পোকা আসিয়া পড়িল, তাহাও ঘাত; অথবা চোর ডাকাত আসিয়া পড়িল। আর সিদ্ধি যখন রস জমিয়া উঠে, করুণ রসে হা হুতাশ করে অথবা হাস্যরসে হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে। দেবতার আশীর্ব্বাদ হইলে 'হরিবোল হরিবোল' বলিয়া উঠে। সিদ্ধির পরই নাট্যশাস্ত্র একরকম শেষ হইয়া গেল। এইটীই ভরত-নাট্যশাস্ত্রের ২৭ অধ্যায়। ২৮ হইতে বাজনার কথা আরম্ভ হইল। বাজনা কয় রকম, কোন্ রসে কোন্ বাজনা ভাল লাগিবে, কোন্ সময়ে কোন্ বাজনা লাগাইতে হইবে,—তার গানের কথা, সুরের কথা, পুরা দস্তর সঙ্গীত-শাস্ত্রের কথা। ৩৬ ও ৩৭ অধ্যায়ে নাট্যশাস্ত্রের নট ও নটীদের, উৎপত্তি ও বিবরণ-নাট্যশাস্ত্রের একটু ইতিহাস এবং শেষ ফলশ্রুতি।

এইতো নাট্যশাস্ত্রের যত সংক্ষেপে সম্ভব একটু কথা বলিলাম। কিন্তু আজ আমার আসল কথা আর একটা। এই যে লম্বা শ্লোক ছন্দের বই ইহার ভিতরে আর দু'খানি বই আছে। সে দু'খানি লম্বাও নয়, শ্লোক ছন্দে লেখাও নয়। সে দু'খানি পুরা দস্তর সূত্র-শ্রেণীর পুঁথি বা তাহার কোন অংশ। প্রথম খানি নাট্যশাস্ত্রের ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়ে, ২য় খানি ২৮, ২৯, ৩০ অধ্যায়ে। এক খানি রসের ব্যাখ্যা, আর এক খানি গানের ব্যাখ্যা। রসের ব্যাখ্যার যে সূত্রগুলি আছে তাহা কিন্তু নটসূত্রের অন্তর্গত। কেন না, তাহার প্রত্যেক কথাতেই কিরূপ করিয়া সেই রস বা ভাব অভিনয় করিতে হইবে তাহার সূক্ষ্ম উপদেশ দেওয়া আছে। ২য় খানি সঙ্গীত-সূত্র। এখানি নট-সূত্রের অন্তর্গত কি না তাহা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু এখানি সূত্র লিখিবার কালের পুঁথি সে বিষয়ে

সন্দেহ নাই। দুখানি পুঁথিতেই নূতন কথা ধরিবার সময় 'ব্যাখ্যাস্যামঃ' বলিয়া আরম্ভ করা আছে। তবে রস-সূত্রগুলির ভাষা গাঢ়, তাহার মধ্যে দুদশটা আর্য্যা ছন্দে ও শ্লোকছন্দে কারিকা থাকিলেও শ্লোকছন্দে লম্বা জিনিস লেখা নাই। কিন্তু সঙ্গীত-সূত্রে শ্লোকছন্দের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। গদ্য অংশ আছে—বড় কম। ভরতমুনিকে ঋষিরা পাঁচটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ৫টী প্রশ্ন এই—যারা নাট্যশাস্ত্রের সমঝদার তারা রস বলিয়া একটা কথা কয়, রস কাহাকে বলে এবং কি হইলে রস হয়; ভাব কাহাকে বলে এবং তাহাতে কি ভাবাইয়া দেয়; সংগ্রহ কাহাকে বলে, কারিকা কাহাকে বলে, নিরুক্ত কাহাকে বলে। এই পাঁচটী কথা শুনিয়া ভরতমুনি তাহাদের উত্তর দিলেন। সে উত্তরটী ৫এর শ্লোক হইতে ৩২এর শ্লোক পর্য্যন্ত; তাহার পরই নটসূত্রের মধ্যে রসসূত্র আরম্ভ।

ভরতমুনি বলিলেন, নাটক এমন প্রকাণ্ড ব্যাপার যে তাহার অন্ত পাওয়া যায় না। কেন না, ভাব অনন্ত, জ্ঞান অনন্ত এবং শিল্প অনন্ত। ইহাদের একটারও শেষ পাওয়া যায় না। সুতরাং সমস্ত ভাব সমস্ত জ্ঞান সমস্ত শিল্প সমুদ্রের মত। তাহার পারে যাওয়া বড় কঠিন। সেই জন্য আমি সংক্ষেপ করিয়া সেই কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিব, অতি সংক্ষেপ কিন্তু।

সূত্র এবং ভাষ্যে যে সকল জিনিস বিস্তার করিয়া বর্ণনা করা আছে সংক্ষেপে সেই সকল কথা বলার নাম 'সংগ্রহ'। রস, ভাব, অভিনয়, পাত্র, বৃত্তি, প্রবৃত্তি, সিদ্ধি, স্বর, বাজনা, গান—এই হইল রঙ্গের সংগ্রহ। অর্থাৎ এই সকল কথাই নাট্যশাস্ত্রে আছে।

কারিকা কাহাকে বলে? সূত্র এবং ভাষ্যে যে জিনিস বিস্তার করিয়া লেখা আছে সেই জিনিস ছোট করিয়া ১টী বা ২টী শ্লোকে বলার নাম কারিকা। এইখানে বলিয়া রাখি রসসূত্রে দুই রকম কারিকা আছে—কতকগুলি শ্লোকছন্দে, কতকগুলি আর্য্যাছন্দে। কিন্তু এই গুলি একজনের লেখাও নয় এক কালের লেখাও নয়। কারণ, অনেক স্থলে কারিকাগুলিতে আর্য্যাছন্দের কারিকাও তোলা হইয়াছে এবং শ্লোকছন্দের কারিকাও একত্রে তোলা হইয়াছে।

নিরুক্ত কাহাকে বলে? নিরুক্ত শব্দের অর্থ ব্যুৎপত্তি। ধাতুর উত্তর প্রত্যয় করিয়া যে শব্দ-সাধন হয় তাহার নাম ব্যুৎপত্তি, তাহারই নাম নিরুক্তি। কিন্তু এখানে নিরুক্ত বলিতে আরও একটু বেশী বুঝায়। ইহাতে কতকটা ব্যাখ্যা বুঝায়, কতকটা সিদ্ধান্ত বুঝায়, কতকটা অন্য অন্য প্রমাণ দেওয়াও বুঝায়।

এইরূপে সংগ্রহ কারিকা ও নিরুক্ত এই সম্বন্ধীয় তিনটী জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়া ভরতমুনি সংগ্রহটা আর একটু বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন। রস কতগুলি, ভাব কতগুলি, তাহাদের নাম করিয়াছেন, ভাবের ভিতর স্থায়ী কতগুলি, ব্যভিচারী কতগুলি, সাত্ত্বিক কতগুলি, অভিনয় ক'রকম, পাত্র ক'রকম, বৃত্তি ক'রকম, প্রবৃত্তি ক'রকম, সিদ্ধি ক'রকম, স্বর কত, বাজনা কত রকম, কেমন করিয়া রঙ্গমঞ্চে আসিতে হয়, যাইতে হয়, থাকিতে হয় তাহার কথা কিছু আছে, তাহার পর গান, এই সঙ্গে থিয়েটার ঘর ক'রকম—সংগ্রহের মধ্যে এই সকল কথা বলিয়া ভরতমুনি বলিতেছেন, "অতঃপরম্ প্রবক্ষ্যামি সূত্রগ্রন্থবিকল্পনম্—" ইহার পর আমি সূত্র ও গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিব।' এই গ্রন্থ শব্দের অর্থ অভিনব গুপ্ত ভাষ্যে লিখিয়াছেন। মর্ম্ম এই হইল যে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ৩২টী শ্লোকের পর ভরতমুনি সূত্র ও ভাষ্য মিলাইয়া এবং তাহার সহিত নিরুক্ত ও কারিকা দিয়া একখানি সূত্র গ্রন্থ এইখানে বসাইয়া দিয়াছেন।

বৈদিক সূত্রে শুধু সূত্রগুলি থাকিত। বেদের মত সে সূত্রগুলিও ব্রাহ্মণে মুখস্থ করিয়া লইত। ব্যাখ্যা মুখে মুখেই থাকিত। ব্যাখ্যাটা চলিত সংস্কৃতে দিত। চলিত সংস্কৃতের নাম ছিল ভাষ্য। সেইজন্য সূত্রকে ভাষায় ব্যাখ্যা করার নাম ভাষ্য। কৌটিল্য সূত্রের সঙ্গে ভাষ্য যোগ করিয়া এক রকম নূতন প্রণালীর আবির্ভাব করেন। তিনি যদিও বলেন যে সূত্র ও ভাষ্য এক করিয়া দিতেছি, তথাপি তিনি মাঝে মাঝে নিরুক্তও দেন এবং কারিকাও দেন। সেইরূপ এই যে সূত্রগ্রন্থ ইহাতেও সূত্রভাষ্য ছাড়া অনেকজায়গায় নিরুক্ত এবং সব জায়গায় কারিকা দেওয়া আছে। ৩২শ্লোকটা বলিয়া ভরতমুনি গদ্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। গদ্যের প্রথম কথা এই—"রসানেব তাবদ্ আদৌ অভিব্যাখ্যাস্যামঃ নহি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ত্তত ইতি—"

তত্র বিভাবানুভাবব্যভিচারসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ'

এইরূপ গদ্য অংশ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত এবং সমস্ত ৭ম অধ্যায়। এই যে লেখা আছে "তত্র বিভাবানুভাবব্যভিচারসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ" ইহার মধ্যে 'সংযোগাৎ' ও 'নিষ্পত্তি' এই দুটী শব্দের অর্থ লইয়াই অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রধান বিচার। এই লইয়াই কাব্যপ্রকাশে অনেক মতামত সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই সংযোগ শব্দের অর্থ কেহ বলেন অনুমান, কেহ বলেন ভোগ, কেহ বলেন সাধারণীকরণ এবং সর্ব্বশেষে অভিনব গুপ্ত বলেন যে সমঝদারদের ইহা দ্বারা একটা কিছু নূতন প্রকারের অনুভব-শক্তি হয় তাহারই ভোগ হয়। সেই সকল কথা আজ আমাদের নয়। এই যে সূত্র-গ্রন্থের এক অংশ ভরত-নাট্যশাস্ত্রে গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে ইহার সম্বন্ধেই কয়েকটী কথা বলিয়া অদ্যকার বক্তব্য শেষ করিব। আমার বিশ্বাস এটী কোন নটসূত্রের অংশ। কারণ, ইহার প্রত্যেক স্থলেই প্রত্যেক রসের, প্রত্যেক স্থায়িভাবের, প্রত্যেক ব্যভিচারিভাবের, প্রত্যেক সাত্ত্বিকভাবের, নট কি করিয়া সেই রস ও ভাব প্রকাশ করিবে তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ দেওয়া আছে। অনেক জায়গায়ই "অভিনেতব্যঃ" "অভিনয়ঃ কর্ত্তব্যঃ", "অভিনয়েৎ" এইরূপ কথা আছে। সুতরাং এই রস-ভাবের বর্ণনা দার্শনিক ভাবে হয় নাই। থিয়েটারের অনুরূপ করিয়াই করা হইয়াছে। একটা উদাহরণ দিই। বড় লোকের হাসি কি করিয়া অভিনয় করিবে? একটু মুখ মুচকাইয়া হাসিবে। এমন কি তাহাদের দাঁতও দেখা যাইবে না। রাণী সখী মন্ত্রী ইহাদের হাসি দেখাইতে গেলে দাঁত বাহির হইবে কিন্তু শব্দ বাহির হইবে না। কিন্তু ছোট লোকে হাসি দেখাইতে গেলে হাঁ করিয়া উচ্চ শব্দ করিতে হইবে। আমি তো সংক্ষেপে বলিতেছি কিন্তু পুঁথিতে, ঢের বেশী আছে। এই সব রসে সব ভাবের অভিনয়ের ইঙ্গিত করা সহজ কথা নয়। কিন্তু নটসূত্রের এ অংশে সেটী করা হইয়াছে, যতদূর সাধ্য ভাল করিয়াই করা হইয়াছে।

এখন কথা হইতেছে নটসূত্র কাহাকে বলে। পাণিনি আপনার সূত্রে দুই খানি নটসূত্রের নাম করিয়াছেন। একখানি খানি "প্রোক্ত" অর্থাৎ কাহারও রচিত নয়, কৃত নয়। "প্রোক্ত" গ্রন্থের কথা কহিয়া তাহার পর পাণিনি "কৃত" গ্রন্থের কথা বলিয়াছেন। পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছিল, কোন ঋষি সেগুলি বলিয়া গিয়াছেন তাহার নাম "প্রোক্ত"। আর নিজের মাথা থেকে রচনা করা হইয়াছে যাহা তাহার নাম "কৃত"। পাণিনি যে দুখানি নটসূত্রের কথা বলিয়াছেন দুখানিই "প্রোক্ত", অর্থাৎ ঐ সকল কথা অনেক দিন ধরিয়াই বলিয়া আসিতেছিল, ঋষিরা সেইগুলি সাজাইয়া গুছাইয়া বলিয়া আসিয়াছে। আমরা আর এক খানি নটসূত্র ছিল বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। কারণ, কালিদাস বিক্রমোর্ব্বশীর দ্বিতীয় অঙ্কের বিষ্কম্ভকে বলিয়াছেন ভরত মুনি একজন নটসূত্রকার। তিনি স্বর্গে লক্ষ্মীস্বয়ংবর নামে এক নাটক লিখিয়াছিলেন এবং নিজে তাহার অভিনয় শিখাইয়াছিলেন। উর্ব্বশী সেই নাটক অভিনয় করিতে গিয়া "ভাত" করিয়া বসেন,—'নারায়ণ' বলিতে গিয়া "পুরূরবা" বলেন। তাই ভরতমুনি শাপ দেন, তুমি পৃথিবীতে গিয়া থাক। সুতরাং ভরতের এক খানি নটসূত্র ছিল বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি। ভরতের আরও একখানি সূত্র ছিল। সেখানির কথা ভবভূতি উত্তররামচরিতের ৬ষ্ঠ অঙ্কের বিষ্কম্ভকে বলিয়া গিয়াছেন। সেখানির নাম "তৌর্য্যত্রিকসূত্র" অর্থাৎ বাজনার সূত্র।

ভরতনাট্যশাস্ত্রে যে দুইখানি সূত্র আছে বলিয়া আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহা বোধ হয় এই ভরতের লিখিত নটসূত্র ও তৌর্য্যত্রিকসূত্র। একখানিতে নটেদের শেখান হইতেছে, আর এক খানিতে বাজনদারদের শেখান হইতেছে।

একজন নবীন লেখক বলিয়াছেন পাণিনির ব্যাকরণে দুইটী নটসূত্রের নাম আছে। কিন্তু তাহাতে কি আছে না আছে তাহা আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু আমাদের এমনই মন্দ ভাগ্য যে ঐ যে নটশব্দ আর সূত্রশব্দ আছে উহা হইতেই আমরা ইতিহাস অনেকটা অনুমান করিয়া লইতে পারি। নট বলিতে একটা পেশা বুঝায়। একটা পেশা থাকিলেই নাটক যে তখন অনেক ছিল এ কথা অনুমান করিয়া লইতে পারি। তাহা হইলে এ কথা আমরা বলিতে পারি যে পাণিনির অনেক পূর্ব্বেও নট বলিয়া একটা পেশা ছিল এবং বহুসংখ্যক

নাটক লেখা হইয়াছিল। আরও কথা আছে, যখন পাণিনির ঐ সূত্রেই নটসূত্র বলিয়া সমাস করা আছে, তখন একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে এই পেশাদার লোকদের শিক্ষা দিবার জন্য তখন সূত্রগ্রন্থ লেখা হইয়া গিয়াছিল এবং 'প্রোক্ত' হইতে আমরা বুঝিতে পারি, যিনি লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন তাঁহার পূর্ব্বেও নটদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল এবং নানারূপ চেষ্টা হইয়াছিল। সেই চেষ্টাগুলিকে একত্র করিয়া শিলালী ও কৃশাশ্ব সূত্রগ্রন্থ বলিয়া গিয়াছেন।

এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি নাটক আমরা গ্রীকদিগের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম এ কথার মূল্য কি? পাণিনি তো খৃষ্ট পূঃ ৫০০ বৎসরের এধারে আসিতে পারেন না। সূত্রগ্রন্থ তাহার অন্ততঃ ১০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রোক্ত হইয়াছিল। দুজন প্রোক্ত করিয়াছেন। সুতরাং দুজনকে ২০০ বৎসর দিতে হয়। তাঁহারাও আবার নিজের কথা লেখেন নাই, পুরাণো কথা লিখিয়াছেন। তাহার আগেও নাটক ছিল। কেন না, নট বলিয়া একটা পেশাই হইয়া গিয়াছে। তখন আমাদের নাটকের আদি কোথায়?

মেঘদূত

পূর্ব্ব মেঘ

[অধ্যাপক শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত]

কর্ম্মে অবহেলা　যক্ষ করি' লভে　প্রভুর অভিশাপ　প্রচণ্ড
প্রেয়সী বিচ্ছেদ　পূর্ণ বরষের,　বিনত শিরে লয়ে　এ দণ্ড,
রহিল রামগিরি　শিখরে প্রিয়াহীন　বিগত-গৌরব　বিহ্বল,
স্নিগ্ধ তরু যেথা　বিতরে শীত ছায়া,　সীতার স্নানে জল　নির্ম্মল।

*　　*

মাসের পরে মাস　কাটায় গিরি পরে　বিরহ-ঘোরতাপে　বিষণ্ণ,
শীর্ণ দেহভার,　বলয় খসি' পড়ে,　শুষ্ক হ'ল মুখ　প্রসন্ন।
আষাঢ় মাস এল,　প্রথম দিনে তার　গিরির সানু ঘিরি'　দুর্ব্বার
আসিল ভীম মেঘ　পাগল করী যেন　ভাঙিতে শিলা মাতে　আরবার।

*　　*

যে-মেঘ হেরি' সদা　হৃদয় নাচে সুখে,　যক্ষ তারি আগে　নিশ্চল
দাঁড়ায় হতবাক্　গভীর ভাব-গত　দমিয়া শোকাবেগ　উচ্ছল।
হেরিয়া জলধর　সুখীরও চিত্ত যেন　কেমন করি' উঠে　চঞ্চল;
প্রেয়সী দূরে যার　তাহার কিবা দশা　বুঝাতে এ লেখনী　দুর্ব্বল।

*　　*
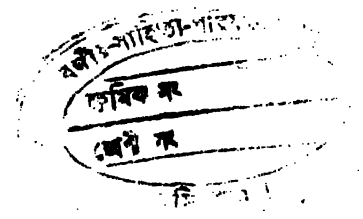
শ্রাবণ সমাগত হেরি' সে প্রেয়সীর বিরহ বিদূরিতে উন্মুখ,
ত্বরিত মেঘমুখে কুশল আপনার প্রেরিয়া প্রেয়সীরে দিতে সুখ,
কুরচি ফুল তুলি' অর্ঘ্য করি' করে নীরদে নিবেদিয়া উল্লাস
প্রকাশে আপনার, মধুর প্রীতিভরে "স্বাগত" বলি' করে সম্ভাষ।

* *

সলিল, বায়ু, জ্যোতি, ধূম্রে জাত যেই এযে সে জলধর নিষ্প্রাণ,
কুশল প্রেরিবারে চাহি যে পটু প্রাণী, এ সব যক্ষের নাই জ্ঞান,
জড় সে জলধরে ভিক্ষা আপনার জানায় নতিভরে প্রমত্ত ;
বিরহী জন যেই চেতন অচেতনে বুঝিতে ভেদাভেদ অশক্ত।

* *

যক্ষ বলে তারে—জনম তব, মেঘ, আবর্ত্তক আর পুষ্পক,
জনমে যেই কুলে সে কুলে ধরাখ্যাত, ইন্দ্র-অনুচর নর্ত্তক
বিবিধ রূপ ধর, আমার তাপ হর, দৈবে বধূ করে দূরে বাস ;
মহতে মাগি দয়া, না পেলে নাহি দুখ, অধমে নহে যদি পূরে আশ

* *

তাপিত প্রাণে তুমি শীতল স্নেহ দাও, আমি যে বড় তাপী সদয় হও,
প্রভুর কোপানলে হয়েছি প্রিয়াহারা, প্রিয়ার সুখদায়ী বার্ত্তা লও।
যক্ষ করে বাস পুরী সে অলকায়, রহেন উদ্যানে শঙ্কর,
তাঁহার শিরোলীন চন্দ্রে গৃহশির উজলে, সেথা পাবে মোর ঘর।

* *

উঠিলে নভে তুমি পথিকবধূ কত, ঘটিবে পতি সনে সাক্ষাৎ
ভাবিয়া কেশভার সরায়ে মুখ হ'তে করিবে তব প্রতি দৃক্‌পাত।
আমার সম যেই তাড়িত পরাধীন যাপিছে ঘোর দুখে দিন হায়,
সে ছাড়া কেবা আর ছাড়িয়া প্রিয়তমা থাকিতে বল চায় বর্ষায় ?

———

কোন্ পথে

[মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ]

১

বাঁধ ভাঙ্গিলে পরিপূর্ণ বিশাল হ্রদের জলরাশি যখন দুর্নিবারবেগে নীচের দিকে ছুটিতে আরম্ভ করে এবং ভীষণ বন্যা-বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া সাত শত সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রাম ও পল্লী ভাসাইয়া চারিদিকে ধ্বংসের তাণ্ডব নৃত্য সৃষ্টি করিতে থাকে, কোন বিধি বা নিষেধের বাধার প্রতি ক্ষণকালের জন্যও ভ্রূক্ষেপ করে না, তখন কেহই বলিতে পারে না যে, ঐ বিক্ষুব্ধ জলরাশি কোন্ নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া কোন্ দিকে চলিবে। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের অবস্থাও প্রায় এই প্রকারই হইয়া দাঁড়াইতেছে, বহুকাল হইতে প্রচলিত সর্ব্বসাধারণ্যে অবিসংবাদিতভাবে পরিগৃহীত আচার-পদ্ধতির একটানা অভ্যাসে যেরূপ সংস্কার ও জ্ঞান বাঙ্গালার হিন্দুসমাজের মনোরাজ্য অধিকার করিয়া জমিয়া বসিয়াছিল সেই সংস্কার ও জ্ঞান এখন আর শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দুর নিকট পূর্ব্বের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন নাই। নূতন ধারণা নূতন জ্ঞান ও নূতন সংস্কার দিন দিন নূতন বল লাভ করিয়া তাহার মনোরাজ্য অধিকার করিয়া বসিতেছে। প্রাচীন ধারণা প্রাচীন জ্ঞান ও প্রাচীন সংস্কারের প্রাচীন বাঁধ অতি দ্রুতভাবে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে, প্রাচীন ভাবকে প্রাচীন কালের ন্যায় দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে আমরা এ সংসারে আর বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না, এই ধারণা ক্রমশই শিক্ষিত ব্যক্তিনিবহের মধ্যে প্রগাঢ়ভাবে জমিয়া বসিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে নূতন জীবন লাভ করিয়া নববলে বলীয়ান্ হইয়া নূতন নূতন শক্তি সঞ্চয়ের উপযোগী কার্য্যক্ষেত্রকে চারি দিকে প্রসারিত করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য সবল ঐশ্বর্য্যসমন্বিত সভ্যজাতি সমূহের সমকক্ষ হইবার বিরাট্ আকাঙ্ক্ষা উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদনা ও আবেগময়ী কল্পনা সমুচ্ছ্বসিত হইয়া আজ বাঙ্গালী-হৃদয়ে যে ভাব-বন্যার সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার প্রতিক্ষণে বর্দ্ধনশীল তীব্রবেগ বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজে অচিরকালমধ্যে কিরূপ ভীষণ প্লাবনের সৃষ্টি করিবে ও তাহার পরিণামই বা কি হইবে, তাহার চিন্তা অতি অল্প লোকই করিয়া থাকেন।

প্রাচীন আচার-পদ্ধতি ও সংস্কারের বাঁধ যাহাতে একবারে ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ না হইয়া যায়, দেশ, কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সকলই তাহার প্রতিকূল হইলেও তাহাকে প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে সজীব করিয়া রাখিবার জন্য এক দল প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, সেই দলের নাম প্রাচীনপন্থী। অন্যদিকে আর এক দল মাথা তুলিয়া সদর্পে ঘোষণা করিতেছে প্রাচীন আচার, প্রাচীন সংস্কার ও প্রাচীন ভাব-ধারা যাহা করিতে আসিয়াছিল সে কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহার বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। প্রত্যুত তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা আত্মহত্যার চেষ্টা ছাড়া বর্ত্তমান যুগে আর কিছুই নহে। যত শীঘ্র পার উহার পূতিগন্ধময় অন্ধকারাবৃত জীর্ণ প্রাসাদকে ভাঙ্গিয়া চুরমার কর; নব-জীবনের অনুকূল নূতন উপাদান সংগ্রহ কর, সেই উপাদানে যে অভিনব সমাজরূপ মহাপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে, তাহার সমুন্নত শীর্ষে বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইয়া তাহাতে জলন্ত অক্ষরে লিখিয়া রাখ **স্বাধীনচিন্তা, সাম্য ও স্বরাজ।**

নব্যপন্থী জাতিভেদ উঠাইতে চাহেন; কারণ তাঁহাদের বিবেচনায় এই উচ্চনীচ-ভাব-কলুষিত জন্মগত অধিকার-বৈষম্যের উৎপাদক ও পরিপোষক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হিন্দু-সমাজের সর্ব্বনাশের হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার করাল কবল হইতে হিন্দুসমাজের আত্যন্তিক উদ্ধার না করিতে পারিলে, হিন্দু স্বরাজ-সাধনায় কখনও সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে না—কখনও বিরাট্ শক্তিশালী হইয়া দুরন্ত জীবন-সংগ্রামে বিজয় লাভ করিতে পারিবে না।

হিন্দু-সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল অতীতের স্বপ্নরাজ্যে বিহরণ-শীল প্রাচীনপন্থী দল নব্যপন্থীর এই প্রকার উক্তিকে উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া উপহাস করিয়া এখনও পর্য্যাপ্তরূপে আত্মতৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকেন—প্রাচীনপন্থীর মতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অবসাদই হিন্দুজাতির অধঃপাতের প্রধান কারণ—জন্মগত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ছাড়িয়া দিলে হিন্দু-সমাজের বৈশিষ্ট্যই লুপ্ত হইবে। ফলে হিন্দুজাতিই একেবারে বিলুপ্ত হইবে; সুতরাং জন্মগত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার ধ্বংস করিবার প্রয়াস হিন্দুর পক্ষে আত্মনাশেরই প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নহে।

এই প্রকার পরস্পর-বিরুদ্ধ মতের সমর্থন করিতে বদ্ধপরিকর প্রাচীন পন্থী ও নব্যপন্থী দল বর্ত্তমান যুগে যে বিরোধ সৃষ্টি করিতেছেন তাহা দ্বারা বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজ ক্রমশই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস হারাইতেছে; ঈর্ষ্যা ও ক্রোধের তীব্র বহ্নি উত্তরোত্তর উদ্দীপ্ত হইয়া যে ভয়ঙ্কর উত্তাপ ও অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে তাহা যে পর্য্যন্ত প্রশমিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত সংঘবদ্ধভাবে মিলিত হইয়া বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ স্বজাতি ও স্বদেশের কোন প্রকার হিতকর অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবে, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে, ইহা কে অস্বীকার করিবে?

এই বিরোধ-শান্তির একমাত্র উপায় হইতেছে উভয় পক্ষের অবলম্বিত পথের মাঝা-মাঝি একটা পথ অবলম্বন করা, সে মাঝা-মাঝি পথ কি হইতে পারে তাহার নির্ণয় করিবার জন্য উভয়পক্ষকেই বাস্তবিকতার প্রতিকূল কল্পনার মোহিনী মূর্ত্তির উপাসনা পরিত্যাগ করিতে হইবে; কঠোর সত্যের সম্মুখীন হইয়া নতশিরে তাহাকে অঙ্গীকার করিতে হইবে, তদনুসারে আবশ্যক হইলে পুরাতনকে বর্জ্জন করিতে হইবে, নিঃসঙ্কোচে নূতনকে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতিষ্ঠা, ঐশ্বর্য্য, আরাম ও সুবিধার অন্তর্নিহিত লোলুপ-দৃষ্টির পরিহার করিতেই হইবে, তিরস্কার, অপমান, আর্থিক হানি, স্বজন-বিদ্বেষ ও নানা অসুবিধার বিভীষিকাকে আদর করিয়া মাথায় বরণ করিয়া লইতে হইবে, সত্যের অনুসন্ধানের জন্য যথার্থ ইতিহাসের শরণ লইতে হইবে, সহস্র বৎসর হইতে সমাগত দাসোচিত মনোবৃত্তির উচ্ছেদ করিয়া বাস্তব প্রমাণসমুত্থিত প্রজ্ঞা ও বিবেকের শরণাগত হইতে হইবে, এক কথায় বলিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে আপনা হইতেও স্বজাতিকে ভালবাসিতে হইবে।

যত দিন পর্য্যন্ত এই প্রকার ভাবের বন্যা আমাদের সামাজিক জীবনে খরতরভাবে বহিতে আরম্ভ না করিবে ততদিন কি প্রাচীনপন্থী কি নবীনপন্থী কোন দলই হিন্দু-সমাজের কোন প্রকার উল্লেখযোগ্য উপকার বা সংস্কার-সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, ইহা আমার মনে হয় না।

সত্যই মানবের বল। সত্যের নাম করিয়া মিথ্যার আশ্রয় করিলে সমাজের পতন ও ধ্বংস যে অবশ্যম্ভাবী তাহা সকল সাধু পুরুষই একবাক্যে অনাদিকাল হইতে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। সেই সত্য দ্বিবিধ, এক বাস্তব সত্য, দ্বিতীয় ব্যাবহারিক সত্য। কোন দেশে কোন কালে কোন অবস্থা-বৈষম্যে যাহা পরিবর্ত্তিত হয় না, যাহা সর্ব্বদা একরূপ, তাহাই বাস্তব বা পরমার্থ সত্য। এই বাস্তব সত্যকে লইয়া ব্যবহার করা চলে না। ইহা যোগিগণের, বিবেকিগণের, জ্ঞানিগণের রাগ-দ্বেষ-বিনির্ম্মুক্ত বিশুদ্ধ চিত্তেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। ইহার অনুভূতি নিরবধি আনন্দ-প্রাপ্তির কারণ বলিয়া সকল অধ্যাত্ম শাস্ত্রে একবাক্যে উদ্ঘোষিত হইলেও সংসারী মানবের পক্ষে ইহার অনুভূতি ও তজ্জনিত অসীম আনন্দলাভ কখনও সম্ভবপর নহে, এ কথা প্রাচীনপন্থী ও নব্যপন্থী সংসারী মানব উভয়েই স্বীকার করিতে বাধ্য ও স্বীকার করিয়া থাকেন; সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সেই ধ্রুব সত্যের নির্দ্ধারণের জন্য মাথা ঘামাইবার কোন আবশ্যকতা নাই। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের বিপ্লব-সমস্যা সমাধান করিবার জন্য তাহাকে লইয়া টানাটানি কেহই করিতেছে না। টানাটানি করিলেও তাহা যে কাহারও করায়ত্ত হইবে তাহারও সম্ভাবনা নাই। তোমার সমাজ উন্নতই হউক বা অধঃপাতে যাউক না কেন, তাহার তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। জগতের আদিতেও তাহা যেমন ছিল এখনও তাহা তেমনই আছে আবার এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের আত্যন্তিক বিলয়ের পরও তাহা তেমনই থাকিবে।

বাকী রহিল ব্যাবহারিক সত্য, যে সত্য লইয়া তুমি আমি সকলেই ব্যবহার-রাজ্যে সাংসারিক সুখের অর্জ্জনে সমর্থ হইতে পারি, আসন্ন সম্ভাবিত বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি, তাহাই তোমার আমার বা সকলের পক্ষে ব্যাবহারিক সত্য। এই সত্য ব্যবহারের ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল মানুষের প্রকৃতি দেশ কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত এই সত্যের রূপও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরেও ইহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে আজ এই কলির সন্ধ্যায়ও ইহার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। চরম কলিতেও ইহার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, ইহা কে অস্বীকার করিবে?

বর্ত্তমান সময়ে সুতরাং আমাদের প্রকৃতি দেশ কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে বিশাল হিন্দু-সমাজের পক্ষে সুখের ও দুঃখ-নিবৃত্তির সাধনস্বরূপ কোন্ ব্যাবহারিক সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাই হইতেছে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রত্যেক হিন্দু সামাজিকের বিবেচ্য। এই প্রকার বিবেচনা করিবার পূর্ব্বে এই সিদ্ধান্ত সকলকেই মানিতে হইবে যে, শরীর রক্ষার অনুকূল অন্ন, পান, বাসস্থান ও বস্ত্র-সংগ্রহের জন্য সামর্থ্য অনুসারে সকলের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবার অধিকার আছে। সেই অধিকারকে সঙ্কুচিত করিতে কেহই চাহে না। যদি কেহ সেই অধিকার জোর করিয়া ক্ষুণ্ণ করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সমাজ-শক্তি তাহার প্রতিকূল আচরণ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজে এই ব্যক্তিগত জীবিকা-অর্জ্জনের স্বাভাবিক অধিকারের সঙ্কোচ করিবার জন্য প্রাচীনপন্থিগণ যে সকল চেষ্টা করিতেছেন তাহা দ্বারা দেশের মধ্যে ঘোর অশান্তির দাবানল জ্বলিয়া উঠিতেছে, এবং তাহাই এক্ষণে হিন্দু সমাজের সংঘশক্তি গঠনের পক্ষে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনের জন্য যাঁহারা বদ্ধপরিকর বলিয়া আজকালকার হিন্দু-সমাজে সুপরিচিত তাঁহাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনই বর্ণাশ্রমের কঠোর নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহেন না। শুধু তাহাই নহে সুবিধা বোধ করিলেই বর্ণাশ্রমের সকল নিয়ম কার্য্যতঃ ভাঙ্গিতে অনুমাত্রও দ্বিধা বোধ করেন না। বর্ণাশ্রমের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান বর্ণ হইলেন ব্রাহ্মণ এবং ত্রৈবর্ণিকের পক্ষে প্রথম আশ্রম হইল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। ব্রাহ্মণের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপন। এই বিশাল বঙ্গের বিরাট্ ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্যে এক জন ব্রাহ্মণও যথাকালে যথাবিধি উপনীত হইয়া আচার শিক্ষা করিয়া পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট ব্রত-পালনপূর্ব্বক গুরুগৃহে বাস করিয়া বেদজ্ঞ আচার্য্যের নিকট যে বেদ অধ্যয়ন করেন না তাহা কাহারও অবিদিত নহে। বেদজ্ঞ বেদাঙ্গ সমূহে সুনিষ্ণাত এক জন আচার্য্যও আমাদের বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজে নাই তাহাও আমরা সকলেই জানি; সুতরাং ব্রাহ্মণের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন তাহা বহু শত বর্ষ হইতেই বঙ্গদেশে বিলুপ্ত হইয়াছে, মনু বলিয়াছেন—

> যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
> স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশুগচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বেদের অধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয়ে পরিশ্রম করে, সে এই জন্মেই সবংশে শীঘ্রই শূদ্রত্বলাভ করে।

দ্বিজাতির অবশ্য কর্ত্তব্য বেদাধ্যয়ন। কোন ব্রাহ্মণই এখন করেন না, করিবার সামর্থ্য বা ইচ্ছাও কাহারও নাই। ছাপার পুস্তকের সাহায্যে যথাসম্ভব ব্যুৎপত্তির সাহায্যে বেদ পাঠ বৈধ বেদ পাঠ নহে, বৈধ বেদার্থ জ্ঞানও নহে—এহেন বেদবিরহিত প্রত্যেক ব্রাহ্মণই কিন্তু ব্রাহ্মণের জন্মগত অধিকার অনুসারে প্রাপ্য অধিকার সম্মান ও সুবিধা প্রাপ্তির জন্য লালায়িত, রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। এ অধিকার, এ সম্মান ও এ সুবিধার অন্যায্যতা যে দেখাইতে সাহসী হয়, সেই বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মণগণের নিকট দেশদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী, সমাজদ্রোহী ও নাস্তিক বলিয়া ঘৃণা ও বিদ্বেষের পাত্র হইয়া দাঁড়াইতেছে। শুধু তাহাই নহে জ্ঞান লাভের জন্য বৃত্তির জন্য, ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য, সমাজের হিত সাধন করিবার জন্য, যদি উপনয়নসংস্কাররহিত তথাকথিত নিম্নবর্ণ তাঁহাদেরই ন্যায় অবিহিত উপায়ে বেদাধ্যয়ন বা বেদানুশীলন করিতে উদ্যত হয় বা করে সেও সমাজদ্রোহী দেশদ্রোহী ধর্ম্মদ্রোহী ও নাস্তিক; সুতরাং হিন্দু-সমাজ হইতে বিতাড়িত হইবার যোগ্য,

এ কথা সভা সমিতি করিয়া সংবাদপত্রের সাহায্যে বার বার উদ্‌ঘোষিত করিতে এখনকার আস্তিক ব্রাহ্মণ-সমাজ অনুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় কিন্তু এই যে এই প্রকার অনুপনীত বেদাধ্যয়নকারী তথাকথিত নিম্ন বর্ণের বাটীতে বিবাহে ও ব্রতপ্রতিষ্ঠাদি কার্য্যে এই ব্রাহ্মণগণই পৌরোহিত্য করেন, বিদায় গ্রহণ করেন। সে সময় তাঁহারা হিন্দু সমাজের রক্ষক বলিয়া শত ব্রাহ্মণের মুখে প্রশংসিত হইয়া থাকে, এরূপ প্রশংসা করিতে কোন আস্তিক ব্রাহ্মণই অনুমাত্র সংকোচ বোধ করেন না। ইহার নাম মিথ্যা ব্যবহার। ইহা ব্যাবহারিক সত্যের প্রতিকূল। এইরূপ মিথ্যা ব্যবহার জানিয়া শুনিয়াও কোন ব্রাহ্মণই পরিত্যাগ করিতে সাহসীও নহেন প্রস্তুতও নহেন; কারণ ইহার সহিত জীবিকার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ও নিতান্ত অপরিহার্য্য। এই প্রকার মিথ্যা ভিত্তির উপর কোন ধর্ম্ম বা সমাজ কখনও সুস্থিত হইতে পারে না এখনও পারিতেছে না। এই অপ্রিয় সত্যকে সত্য বলিয়া অঙ্গীকার যে পর্য্যন্ত বাঙ্গলার হিন্দু সমাজ না করিতেছে, সে পর্য্যন্ত প্রাচীনপন্থিগণের প্রাচীন সমাজ রক্ষা করিবার জন্য যত কিছু আন্দোলন যত কিছু আস্ফালন সকলই অরণ্য-রোদন মাত্রেই যে পর্য্যবসিত হইবে, তাহা প্রত্যেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি এখন বুঝিতে পারিয়াছেন।

ছাত্রমণ্ডলীর স্বাস্থ্য ও খাদ্য

[রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি-আই-ই, এম-বি, এফ-সি-এস]

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বাঙ্গালী ছাত্রদিগের আহার সম্বন্ধে তাহাদিগের অভিভাবক ও শিক্ষকদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। "ছেলে মানুষ করা"র জন্য অভিভাবক ও শিক্ষক উভয়েই তুল্য ভাবে দায়ী। বালকের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি পরস্পর পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়া যাহাতে স্বাধীনভাবে যথোচিত বিকাশলাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে অভিভাবক ও শিক্ষক উভয়েরই সবিশেষ লক্ষ্য রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। যথোচিত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শরীর ও মন উভয়েই নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা সকলস্থলেই ব্যক্তিগত ও জাতিগত নৈতিক বলহীনতার একটি প্রধান কারণ।

আমাদিগের ছাত্রদিগের খাদ্যের মধ্যে পেশীগঠক (Muscle forming) খাদ্যের অভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, দাল প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য পেশীগঠক খাদ্যের অন্তর্ভূক্ত। দুধের মধ্যে যে ছানা থাকে, তাহা মাছ মাংসের ন্যায় পেশীগঠক খাদ্য। পেশীগঠক খাদ্যকে আমরা বাঙলায় "ছানাজাতীয় খাদ্য" বলিব। ইহার ইংরাজী নাম প্রোটীন্ (Protein)। শ্বেতসার (Starch), চিনি, ঘৃত, তৈল, চর্ব্বি প্রভৃতি ভিন্ন জাতীয় অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে কোনটাই মাংসপেশী বা শারীরিক অন্যান্য উপাদান বা যন্ত্রাদির গঠনকার্য্যের সহায়তা করে না। শারীরিক গঠন ও পুষ্টির জন্য যথোচিত পরিমাণ ছানা জাতীয় উপাদানের একান্ত আবশ্যক।

ছাত্রজীবনের মধ্যেই (২৩৷২৪ বৎসর) শরীরের গঠনকার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়। এই সময়ে ছাত্রদিগের দৈনিক খাদ্যে যদি যথোচিত পরিমাণ ছানাজাতীয় উপাদানের (Protein) অভাব হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের দেহ উপযুক্ত মাল-মসলার অভাবে পূর্ণভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না এবং সারাজীবন তাহারা সেই অসম্পূর্ণতার

কুফল ভোগ করিতে বাধ্য হয়। দুর্ব্বল পিতামাতার সন্তান সন্ততি দুর্ব্বল ব্যতীত কখনই সবল হইতে পারে না, সুতরাং ছাত্রজীবনে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ভবিষ্যৎ বংশাবলীর দৈহিক বিকাশ ও শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে মহা অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে। সময় থাকিতে ইহার প্রতিকার সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য।

শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বহু পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, একজন সুস্থ সবল সহজ পরিশ্রমী যুবা-পুরুষের দৈনিক খাদ্যে অন্ততঃ ১½ ছটাক (৩ আউন্স বা ৯০ ড্রাম) নির্জ্জল ছানা-জাতীয়, ১ ছটাক (২ আউন্স বা ৬০ ড্রাম) মাখম-জাতীয় এবং ১৭ ছটাক শ্বেতসার বা শর্করা-জাতীয় উপাদান থাকা একান্ত আবশ্যক। ঐ পরিমাণ খাদ্য হইতে সে দিবসে ২৮০০ ক্যালরি (Calarie) পরিমাণ তাপ ও কার্য্য করিবার শক্তি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। ছানা-জাতীয় উপাদান যেমন শরীরের গঠন-কার্য্যের সহায়তা করে, সেইরূপ মাখম-জাতীয় খাদ্য (মাখম, ঘৃত, তৈল, চর্ব্বি ইত্যাদি) এবং শর্করা-জাতীয় খাদ্য (চাউল, ময়দা, চিনি, গুড় প্রভৃতি) শারীরিক তাপ ও শক্তি উৎপাদনের সহায়ক। আমাদিগের ছাত্রদিগের দৈনিক খাদ্যে এই রকম শর্করা-জাতীয় উপাদান অত্যন্ত অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করিতে দেখা যায়, কিন্তু ছানাজাতীয় ও মাখম-জাতীয় উপাদানের অভাব সবিশেষ লক্ষিত হয়। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে দুই একটী ব্যতীত আমাদের প্রায় সকল ছাত্রাবাসেই ছাত্রদিগের খাদ্যের যে ব্যবস্থা আছে, তাহাতে তাহারা কেহই এক ছটাকের অধিক ছানা-জাতীয় উপাদান দিবসে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না এবং ১ ছটাকেরও কম মাখম-জাতীয় উপাদান ঐ খাদ্য হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে সকল ছাত্র আপনারা মেস্ (Mess) করিয়া থাকে অথবা যাহাদের অভিভাবকেরা সামান্য অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, তাহাদের খাদ্যে ইহা অপেক্ষাও কম পরিমাণ ছানা ও মাখম-জাতীয় উপাদান থাকে। অবস্থাবৈগুণ্য হেতু তাহারা যথোচিত পরিমাণ মাছ, মাংস, দুধ ও ঘি সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হয়, সুতরাং অধিক পরিমাণ অন্নভক্ষণ করিয়া উহা হইতেই তাহারা খাদ্যস্থিত অন্যান্য সার পদার্থ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করে। ইহার ফলে তাহাদের দৈনিক খাদ্যে শর্করা-জাতীয় উপাদানের (Carbohydrates) পরিমাণ অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়ে; ছানাজাতীয় ও মাখম-জাতীয় উপাদানের সহিত শর্করা-জাতীয় উপাদানের যে সামঞ্জস্য থাকা উচিত, তাহা মোটেই থাকে না। এরূপ অব্যবস্থিত খাদ্যকে ইংরাজীতে ill-balanced diet কহে। ইহা স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল নহে।

খাদ্যের মধ্যে ছানাজাতীয় উপাদান কম থাকিলে মাংসপেশী সুদৃঢ় হয় না এবং শরীর জীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অধিক পরিশ্রমজনিত কার্য্য করিবার শক্তি কমিয়া যায়, অধ্যবসায়ের অভাব হয়, অল্প পরিশ্রমেই শ্রান্তি ও ক্লান্তি জন্মে এবং কোন কার্য্যে উৎসাহ ও প্রবৃত্তি থাকে না। খাদ্যে যথোচিত পরিমাণ ছানাজাতীয় উপাদানের অভাব কিছু দিন ব্যাপিয়া ঘটিলে আমাদের দেহমধ্যে সংক্রামক রোগ প্রতিষেধ করিবার যে স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে, তাহা হ্রাস প্রাপ্ত হয়; ইহার ফলে আমরা সহজেই নানাবিধ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ি। বর্ত্তমানকালে এই সকল দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ আমাদের জাতির মধ্যে অধিকভাবে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। আমাদের ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে এখন যক্ষা রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যাইতেছে। সম্যক্ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই ইহার একটী প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। অপর সকল দিক্ হইতে খরচ বাঁচাইয়া আমাদিগের দৈনিক খাদ্যে মাছ, মাংস, ডিম, দাল, ঘৃত ও দুধের পরিমাণ যাহাতে কিছু অধিক পরিমাণে থাকে, তদ্বিষয়ে আমি অভিভাবকদিগের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

ছানাজাতীয় উপাদান (Proteins) ব্যতীত আমাদিগের ছাত্রদিগের (কেবল ছাত্র নহে, বাঙ্গালী মাত্রেরই) খাদ্যে বর্ত্তমান সময়ে "এ (A)" জাতীয় ভাইটামিনের অভাব সবিশেষ পরিলক্ষিত হয়। দুধ, মাখম, ডিম, এবং সবুজ শাক শব্জির মধ্যে এই জাতীয় ভাইটামিন্ যথেষ্ট পরিমাণে অবস্থিতি করে এবং আমাদের দৈনিক খাদ্যে এই জাতীয় খাদ্য সামগ্রীরই যথেষ্ট অপ্রতুল ঘটিয়াছে। মহার্ঘতা হেতু আমারা দুধ, মাখম, ঘৃত, ডিম প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য যথোচিত পরিমাণে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই না এবং সবুজ শাক শব্জিও অখাদ্য বলিয়া

অবজ্ঞার সহিত পরিহার করিয়া থাকি। সুতরাং আমাদের খাদ্যে "এ" জাতীয় ভাইটামিনের পরিমাণ যে কম হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? খাদ্যের মধ্যে "এ" জাতীয় ভাইটামিনের পরিমাণ কম হইলে শারীরিক বৃদ্ধি স্থগিত হয় এবং সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করিবার স্বাভাবিক শক্তি কমিয়া যায়। আমাদের দেহ যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষে (Cell) নির্ম্মিত, "এ" জাতীয় ভাইটামিনের দ্বারা তাহাদিগের পুষ্টিসাধন হয়। শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য শিশু, বালক ও যুবকদিগের খাদ্যে ইহার অবস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয়।

আমাদিগের ছাত্রদিগের খাদ্যে প্রোটীন্ ও "এ" ভাইটামিনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে মোটামুটী নিম্নলিখিত কয়েকটী উপায় অবলম্বন করা উচিত :—

(১) একবেলা ভাতের পরিবর্ত্তে যাঁতা ভাঙ্গান আটার রুটীর ব্যবস্থা।

(২) নানা রকমের দাল কিছু বেশী পরিমাণে ব্যবহার করা।

(৩) খাদ্যে মাছ, মাংস, ডিম, ছানা বা দুধ প্রভৃতি যে কোন প্রাণীজ খাদ্যের পরিমাণ এবং মাখম বা ঘৃতের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি করা।

(৪) কোন না কোন সবুজ শাকসবজি প্রত্যহ ব্যবহার করা। পালংশাক, বাঁধা কপি, বিলাতি বেগুন প্রভৃতি তরকারির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ "এ" ভাইটামিন্ থাকে। সাহেবদের মত কিছু শাকসবজি (Salud) সেলোড্ কাঁচা অবস্থায় ভক্ষণ করিলে যথেষ্ট ভাইটামিন্ সংগ্রহ করিবার সুবিধা হয়।

(৫) প্রত্যহ প্রাতে অঙ্কুরিত ভিজা ছোলা বা মুগ, গুড় বা আদার সহিত খাইলে আমাদের খাদ্যে প্রোটীন্ ও ভাইটামিনের অভাব কতক পরিমাণে দূর হইয়া যায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানের জন্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটী কমিটী গঠিত হইয়াছিল। কলিকাতার অনেক কলেজের ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য যথারীতি পরীক্ষা করিয়া কমিটী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে আমাদের দেশের ছাত্রদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬৬ জন কোন না কোনরূপ সামান্য বা কঠিন ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত। কমিটী ছাত্রাবাস সমূহের খাদ্যাদি পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে ছাত্রদিগের দৈনিক খাদ্যের মধ্যে (১) পুষ্টিকর দ্রব্যের পরিমাণের এবং (২) উহাদিগের সামঞ্জস্যের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। সাধারণ ছাত্রদিগের আর্থিক অবস্থার উপর লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের জন্য একটী দৈনিক খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত করিবার ভার আমার উপর অর্পিত হয়। আমি সকল বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ছাত্রজীবনে দেহবৃদ্ধি ও সহজ পরিশ্রম ও পরিমিত ব্যায়ামের উপযোগী যে খাদ্যের ব্যবস্থা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলাম, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। কমিটী এই তালিকা গ্রহণ করিয়া কলেজের অধ্যক্ষগণের নিকট ইহা প্রেরণ করিয়াছেন এবং যাহাতে বিভিন্ন ছাত্রাবাসে এই তালিকা-নির্দ্দিষ্ট খাদ্য প্রচলিত হয়, তাহার চেষ্টা করিতেছেন। অবস্থাবিশেষে এবং সময়ে সময়ে তালিকা-নির্দ্দিষ্ট খাদ্য-সমূহের মধ্যে যেরূপ পরিবর্ত্তনের আবশ্যক, তাহা তালিকার নিম্নে মন্তব্য-অংশে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই তালিকাভুক্ত খাদ্য প্রাতে, অপরাহ্নে ও সায়াহ্নে, তিনবারে যথাপরিমাণ ভাগ করিয়া ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। আজকাল অনেক শিক্ষক ছাত্রাবাসে ছাত্রদিগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকেন। যাহাতে ছাত্রাবাস-সমূহে তালিকা-নির্দ্দিষ্ট খাদ্যের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে আমি তাঁহাদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। যে সকল ছাত্র নিজ নিজ গৃহে বাস করে, তাহাদিগের অভিভাবকদিগের প্রতিও এবিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমার বিশ্বাস যে তালিকা-নির্দ্দিষ্ট খাদ্যের নিয়মিত ব্যবহারে আমাদের দেশের ছাত্রগণ অল্পদিনের মধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণ শারীরিক মানসিক ও নৈতিক উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। তালিকা-নির্দ্দিষ্ট খাদ্য সংগ্রহ ও প্রস্তুত করিবার খরচ মাসে ১৫৲ টাকার অধিক হইবে না। আমি পুনরায় বলিতেছি, যে সামান্য অবস্থার গৃহস্থগণ অন্যদিক্ হইতে খরচ বাঁচাইয়া পুত্রকন্যাগণের স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া খাদ্য হিসাবে কিছু বেশী খরচ করিলে তাঁহারা সবিশেষ লাভবান্ হইবেন।

তালিকা

এই পরিমাণ খাদ্য দিবসে গ্রহণ করিলে ইহা হইতে প্রায় ৩ আউন্স ৯০ গ্র্যাম্ ছানাজাতীয়, ২ আউন্স ৬০ গ্র্যাম্ মাখম জাতীয়, ১৭ আউন্স ৪৭৫ গ্র্যাম্ শর্করা জাতীয় এবং ২৮০০ ক্যালরি পরিমাণ তাপ ও শক্তি আহরণ করিতে পারা যায়।

[১ আউন্স = ১ ছটাক ; ২৮·৩৫ গ্র্যাম্ (Gramme) = ১ আউন্স]

খাদ্যদ্রব্য	দৈনিক পরিমাণ (আউন্স)	ছানাজাতীয় উপাদান (গ্র্যাম্)	মাখমজাতীয় উপাদান (গ্র্যাম্)	শর্করাজাতীয় উপাদান (গ্র্যাম্)	কার্য্যকরী শক্তি (ক্যালরি)
চাউল	৬	১২·৫	০·৭২	১৩৮·০	৫৭৪
আটা (১)	১০	৩৬·০	৮·৭	২০১·০	১০০০
দাল	৩	১৮·০	২·৪	৪৬·০	২৭৬
মাছ (২)	৫	২০·০	১১·০	......	২৭৮
আলু	৬	০·৫	৩·০	৩৬·০	১৫০
অন্য তরকারী (৩) ...	৮	৩·০	......	২০·০	৮০
ঘৃত	½	......	১৪·৫	......	১১১
সরিষা তৈল ...	১	......	২৯·০	......	২২২
চিনি	১	......	......	২৭·৩	১০৯
লবণ	১	......	......	......	......
মসলা	যথা পরিমাণ				
মোট	৪১½	৯০·০	৬৯·৩২	৪৬৮·৩	২৮০০

মন্তব্য।—(১) চাউল অপেক্ষা আটার মধ্যে দ্বিগুণ পরিমাণ ছানাজাতীয় উপাদান এবং বেশী ভাইটামিন্ থাকে ; তজ্জন্য ভাতের পরিবর্তে যাঁতাভাঙ্গা আটার রুটী একবেলা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

(২) যাঁহারা নিরামিষাশী, তাঁহারা মাছের পরিবর্তে প্রত্যহ আধসের দুধ অথবা আধপোয়া ছানা এবং আধ পোয়া দধি ব্যবহার করিবেন। খাদ্য পরিবর্ত্তনের জন্য মাছের পরিবর্তে মাঝে মাঝে মাংস, ডিম বা দুধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। সমপরিমাণ মাংস, আধসের দুধ বা দুইটা ডিম মাছের পরিবর্তে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

(৩) অন্য তরকারির মধ্যে সবুজ শাকসব্জি যথেষ্ট পরিমাণে থাকা আবশ্যক। প্রত্যহ প্রাতে অঙ্কুরিত ছোলা বা মুগ, গুড় বা আদার সহিত গ্রহণ করা স্বাস্থ্য-রক্ষার অনুকূল।

(৪) কিছু আটার পরিবর্তে সুজির মোহনভোগ করিলে বৈকালে জলযোগের সুবিধা হইবে।

হারাণো মেয়ে

(গল্প)

[শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ, বার-এট্-এল]

১

বহুকাল পশ্চিমে সমরবিভাগে চাকরি করিয়া ৫৭ বৎসর বয়সে সারদা বাবু পেন্সন লইলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, জীবনের শেষ বৎসর কয়েকটা পিতৃপিতামহের ভিটায় কাটাইয়া দিবেন।

সপরিবারে দেশে ফিরিয়া, ঘর দুয়ার কতক কতক মেরামৎ করিয়া, নিজ গ্রামে তিনি বসবাস আরম্ভ করিলেন, কিন্তু মনও টিকিল না, তাহার উপর ম্যালেরিয়ার জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। তখন সারদা বাবু গ্রামের বাস উঠাইয়া, কলিকাতায় আসিয়া, ভবানীপুরে একটা দ্বিতল বাটী খরিদ করিয়া স্থায়ী হইয়া বসিলেন।

তাঁহার দুই পুত্র তিন কন্যা। বড় ছেলেটী লাহোরে চাকরি করিতেছে এবং সপরিবারে সেখানেই আছে। ছোট ছেলে লাহোর কলেজে বি-এ পড়িতেছে। বড় মেয়েটীর বিবাহ হইয়াছে, সে নিজ শ্বশুরালয় লক্ষ্ণৌয়ে থাকে। ছোট মেয়েটী চৌদ্দ বৎসরে পড়িয়াছে, তাহার বিবাহ এখনও দিয়া উঠিতে পারেন নাই, সে জন্য সারদা বাবু গৃহিণীর নিকট নিত্য গঞ্জনা লাভ করেন।

ভবানীপুরে আসিয়া সারদা বাবু উৎসাহের সহিত আদি গঙ্গায় প্রাতঃস্নান আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই সূত্রে পাড়ার আর কয়েকজন গঙ্গাস্নানার্থী ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়া গেল। তাঁহারাও সারদা বাবুর মতই নিষ্কর্ম্মা ও পরিণত-বয়স্ক। ক্রমে পরস্পরের গৃহে যাতায়াত এবং পরিণামে সারদা বাবুরই বৈঠকখানায় আড্ডা স্থাপন হইল। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর বন্ধুরা একে একে আসিয়া উপস্থিত হন। সারদা বাবু পশ্চিমে ছিলেন, টাকাও রোজগার করিয়াছেন বিস্তর, দিল্ ছিল দরিয়ার মত বিস্তৃত, আতিথ্য-বিষয়ে চিরদিন মুক্ত-হস্তই ছিলেন। এখানেও চা চুরুট তামাক বিতরণে কার্পণ্য করা তাঁহার ধাতে সহিল না।

যে বন্ধুগুলি সংগ্রহ হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে একটীর প্রতি সারদা বাবুর মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল। তাঁহার নাম ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। বয়স তাঁহার, সারদা বাবুর চেয়ে দুই এক বৎসর বেশীই হইবে। তিনিও গভর্ণমেণ্টের পেন্সন-ভোগী। ঠিক পাড়ায় নয়, একটু দূরেই তাঁহার গৃহ। তথাপি এই আড্ডায় আসিয়া প্রায়ই তিনি হাজিরা দেন।

এখন, ইঁহার প্রতি সারদা বাবুর বিশেষ আকর্ষণের কারণটা খুলিয়া বলি। ভগবতী বাবুর একটী পুত্র আছে, বছর ২৫ ২৬ তার বয়স। তাহার নাম কুলদাচরণ, সেই ভগবতী বাবুর একমাত্র পুত্র। বছর পাঁচেক পূর্ব্বে কুলদার বিবাহ হইয়াছিল, আজ এক বৎসর কাল সে বিপত্নীক। প্রথম সন্তান প্রসব করিবার কালেই কুলদার স্ত্রী মারা যান, একটী ছেলে হইয়াছিল; সেটী সাতদিন মাত্র জীবিত ছিল। কুলদা আই-এ পাশ করিয়া আপিসে ঢুকিয়াছিল, এখন ৭৫৲ টাকা বেতন পায়। আপিস ভাল, উন্নতির আশা আছে, ছেলেটী দেখিতেও ভাল, তার উপর বেশ বুদ্ধিমান্ ও সচ্চরিত্র। ভবানীপুরে আসিয়াও সারদা বাবু মেয়ের জন্য পাত্রের সন্ধান করিতেছিলেন সুবিধা মত অন্য কোনও পাত্র যদি না-ই পাওয়া যায়, তবে কুলদার সঙ্গে কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ করিবেন ইহাই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়।

কিন্তু ভগবতী বাবুর সাক্ষাতে এখনও এ কথা তিনি পাড়েন নাই। আরও ভাল পাত্র যদি পাই, এই আশায় কিছুদিন কাটাইলেন। কিন্তু তেমন মনের মত পাত্র

জুটিতেছে না দেখিয়া, অবশেষে ভগবতী বাবুর কাছে তিনি কথাটা পাড়িলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় ঘটনাক্রমে অন্য কোনও বন্ধু সারদা বাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত ছিলেন না। ভৃত্য আসিয়া দুই পেয়ালা চা দিয়া গেল। চা পান করিতে করিতে সারদা বাবু ভগবতী বাবুকে বলিলেন, "চাটুয্যে মশাই, আপনার বৌমা তো প্রায় একবৎসর হ'ল গত হয়েছেন, ছেলের বিয়ে দিচ্চেন না কেন? আমার ছোট মেয়েটিকে আপনি দেখেছেন তো! মেয়ে বড় হয়েছে, সাজবেও ভাল আপনার ছেলের সঙ্গে। যদি মত করেন—"

ভগবতী বাবু বলিলেন, "মেয়ে ত আপনার খাসা মেয়ে। কিন্তু হ'লে হবে কি! ছেলের বিয়ে আমি কি ইচ্ছে ক'রে দিচ্চিনে সারদা বাবু? ছেলে রাজি হয় কৈ?"

"কেন, রাজি হয় না কেন? কিই বা তার বয়স! ও বয়সে কত লোকের তো প্রথম বিবাহই হয় না।"

ভগবতী বাবু বলিলেন, "তা সে বোঝে কৈ বলুন! আমার ধরুন ঐ একটী ছেলে। ও যদি আর বিয়ে না করে তা হ'লে তো বংশটাই লোপ হ'ল। কত ভাল ভাল সম্বন্ধ এল, ও কিছুতেই রাজি হয় না। আমি কত বোঝালাম, ওর গর্ভধারিণী কত কান্নাকাটি করলেন, কিছুতেই কিছু হ'ল না। দেখে শুনে আমরা তো একরকম হালই ছেড়ে দিয়েছি মশাই। অদৃষ্ট! অদৃষ্ট! সবই অদৃষ্ট!"—বলিয়া ভগবতী বাবু চা পান শেষ করিয়া পান মুখে দিলেন।

সারদা বাবু বলিলেন, "সে বউয়ের শোকটা বড্ড বেশী লেগেচে বোধ হয় ওকে।"

"তা লেগেছে বটে। বউমা যাওয়ার পর থেকে ও মাছ-মাংস ছেড়ে দিয়েচে, আতপান্ন ধরেছে, একবেলা মাত্র খায়,—বলে, আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেছি। ব্রহ্মচর্য্য করছে, আর পদ্য লিখ্‌ছে।"

"পদ্য লেখে না কি?"

"হ্যাঁ, বউয়ের নামে রাশি রাশি পদ্য লিখেছে। ফি রবিবারে, খেয়ে দেয়ে, খাতা পেন্সিল নিয়ে, ষ্টিমারে গঙ্গা পার হয়ে শিবপুরে কোম্পানির বাগানে যায়, সেই খানে গাছতলায় বসে' বসে' না কি বউয়ের জন্যে কাঁদে, আর পদ্য লেখে। এ কথা তার বন্ধুদের মুখেই আমি শুনেছি।"

সারদা বাবু বলিলেন, "ও রকম তো কতই শোনা গেছে। ঐ রকম ব্রহ্মচর্য্য-টর্য্য বেশী দিন তো টেকে না—শেষ কালে হয় নিজেই খুঁজে পেতে আবার বিয়ে করে, না হয় একটা কেলেঙ্কারি করে' বসে।"

উভয়ে নীরবে তামাক টানিতে লাগিলেন। অন্যান্য বন্ধুগণও একে একে আসিয়া সভাস্থ হইতে লাগিলেন।

২

উপরে বর্ণিত ঘটনার মাসখানেক পরে, এক রবিবারে কবি-ব্রহ্মচারী কুলদাচরণ, আহারাদি সারিয়া যথানিয়মে খাতা পেন্সিল লইয়া, শিবপুর যাত্রা করিল।

বৃক্ষতলে নির্জ্জন স্থানে বসিয়া, কবিতার খাতা খুলিয়া কুলদা কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত। আজ এক ঘণ্টার উপর এই ভাবে সে বসিয়া আছে, মোটে পাঁচটী লাইন লেখা হইয়াছে, ষষ্ঠ লাইনটী দুই তিন বার লিখিয়া কাটিয়াছে, কিছুতেই আর মনের মত হইতেছে না, এমন সময় অদূরে কোনও রমণীর ক্রন্দনধ্বনি তাহার শ্রবণপথে প্রবেশ করিল।

কুলদা চমকিয়া উঠিল। এখানে, এ সময়ে, কে স্ত্রীলোক কাঁদে? খাতা ও পেন্সিল পকেটে ভরিয়া সে চট্ করিয়া উঠিয়া পড়িল, এবং যে দিক্ হইতে শব্দ আসিতেছিল, সেই দিকে ছুটিল।

দুইটা মাত্র বৃক্ষের অন্তরাল পার হইয়া কুলদা দেখিল, বৃক্ষতলে একটা বাঙ্গালীর মেয়ে বসিয়া, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। মুখখানি সে দেখিতে পাইল না, হাত দুখানির রঙ বেশ ফর্সা, বস্ত্রাদি ভদ্রলোকের মেয়ের মতই। আকার দেখিয়া, মেয়েটী বালিকা না যুবতী তাহা কুলদা ঠিক ঠাহর করিতে পারিল না।

নিকটে গিয়া বলিল, "এখানে ব'সে আপনি কাঁদ্‌ছেন কেন? কি হয়েছে আপনার?"

শুনিয়া মেয়েটী মুখ হইতে হস্তাচ্ছাদন খুলিয়া, একবার মাত্র আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিল। আবার সে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল. তাহার কান্নার বেগ বাড়িয়া গেল।

মেয়েটীর তরুণ মুখখানি দেখিয়া কুলদা অনুমান করিল, ইহার বয়স বড় জোর ১৩।১৪ বছর, সুতরাং স্থির

করিল, ইহাকে আপনি বলার কোনই প্রয়োজন নাই। আবার সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন তুমি কাঁদছ বল না। তোমার কিছু ভয় নেই, কি হয়েছে বল। যদি তোমার কোনও উপকার আমার দ্বারা সম্ভব হয়, তা নিশ্চয়ই আমি করবো।"

তবু মেয়েটী মুখও খোলে না, উত্তরও করে না। কুলদা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে, মেয়েটী অবশেষে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল, "আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমি হারিয়ে গেছি।"

কুলদার প্রশ্নের উত্তরে নিজের ইতিহাস মেয়েটী যাহা বলিল তাহা এই। জন্মাবধি পিতামাতার সহিত সে পাঞ্জাবে ছিল, জলন্ধরে কন্যা-মহাবিদ্যালয়ে পাঠ করিত। তাহার নাম কমলা। সম্প্রতি পিতার সহিত সে কলিকাতায় আসিয়াছিল। আজ বেলা দশটার পর ষ্টীমারে পিতা তাহাকে এই বাগান দেখাইতে আনিয়াছিলেন। বেড়াইয়া বেড়াইয়া তাহার অত্যন্ত ক্ষুধা পায়; তাই পিতা তাহাকে এইখানে বসাইয়া, খাবার কিনিতে বাজারে গিয়াছেন। তিন ঘণ্টা অতীত হইয়াছে, এখনও তিনি ফিরিলেন না, নিশ্চয়ই তাঁহার কোন অভাবনীয় বিপৎপাত হইয়াছে।

কুলদা মনে মনে বলিল, "দেখ দেখি একবার আক্কেল লোকটার! মেড়োর দেশে থাকে কি না—কত আর বুদ্ধি হবে? এই সোমত্ত মেয়েটাকে এখানে একলা ফেলে বাজারে গেছেন খাবার কিনতে! বাজার কি এখানে?"

মেয়েটা আবার কান্নার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া কুলদা বলিল, "তুমি কিছু ভয় কোরো না, নিশ্চয়ই তোমার বাবা আর বেশী দেরী করবেন না, এইবার ফিরবেন।" চল বরঞ্চ আমরা ফটকের কাছে গিয়ে বসে থাকি। তিনি আসছেন দূর থেকেই আমরা দেখতে পাব। তিনিও বাগানে ঢুকতেই তোমায় দেখতে পাবেন। এস আমার সঙ্গে কিছু ভয় নেই তোমার। তোমাকে তোমার বাবার হাতে জিম্মে ক'রে দিয়ে তার পর আমি যাব এখান থেকে।"

মেয়েটী কাঁদিতে কাঁদিতে কুলদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। যাইতে যাইতে বলিল, "সন্ধ্যে অবধি অপেক্ষা করেও বাবার যদি দেখা না পাই তা হলে কি হবে আমার?"

কুলদা বলিল, "তোমার কোনও চিন্তা নেই। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এখানে অপেক্ষা করেও যদি তাঁর দেখা না পাওয়া যায়, তোমাকে ভবানীপুরে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাব, তার পর তোমার বাবার সন্ধান করবো। জলন্ধরে তোমার মাকে চিঠি লিখবো, তোমার আত্মীয় স্বজন যে যেখানে আছেন চিঠি লিখবো।"

বসিয়া বসিয়া সন্ধ্যা হইল, মেয়েটীর পিতা কিন্তু ফিরিল না। কুলদা তখন শেষ ষ্টীমারে তাহাকে কলিকাতায় আনিল, এবং বাড়ী আসিয়া তাহাকে নিজ জননীর নিকট সমর্পণ করিয়া সমস্ত অবস্থা তাঁহাকে জানাইল।

৩

ভগবতীবাবু, হারাণো মেয়েটির পিতার খোঁজ করিবার ভার কুলদার উপরেই দিয়াছেন। এক সপ্তাহ কাটিল, কিন্তু মেয়েটীর পিতার কোন সন্ধান কুলদা করিতে পারিল না।

কুলদা আপিসে গেলে, দ্বিপ্রহরে সারদা বাবু ও তাঁহার স্ত্রী প্রায়ই এই হারাণো মেয়েটাকে দেখিতে আসেন।

আরও এক সপ্তাহ নিষ্ফলে কাটিয়া গেলে কুলদার মাতা বলিলেন, "কমলার বাপের কোনও খোঁজ যখন পাওয়াই গেল না, কি আর করা যাবে! হাজার হোক ব্রাহ্মণের মেয়ে ত, ফেল্‌তে ত পারবো না, এখানেই ও থাকুক। আমার তো মেয়ে নেই, ওর দ্বারাই আমার মেয়ের অভাব পূর্ণ হবে। পরে তখন একটি পাত্র দেখে শুনে ওর বিয়ে দিয়ে দিলেই হবে।"

কন্যা-মহাবিদ্যালয়ে কমলা হিন্দী ও সংস্কৃত ভালই শিখিয়াছিল। বিদ্যালয়ে সংস্কৃত নাটকাভিনয়ে সে একটী মেডেল পর্য্যন্ত পাইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গলা সে ভাল রূপ শিখিবার সুযোগ কখনও পায় নাই। জননীর অনুরোধে কুলদা তাহাকে বাঙ্গলা পড়াইতে প্রবৃত্ত হইল। অন্য দিন আপিস থাকায় বেশী সময় কমলাকে সে দিতে পারে না, রবিবারে বেশীক্ষণ পড়াইয়া পোষাইয়া লয়। শিবপুরের বাগানে যাওয়া সে ছাড়িয়া দিয়াছে।

শিক্ষক ও ছাত্রীর মধ্যে যথেষ্ট অন্তরঙ্গতাও স্থাপিত হইয়াছে বেশ দেখা গেল। আপিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া ছাত্রীকে না দেখিলে কুলদার পিপাসিত চক্ষু চারিদিকে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়। আর, কমলার রান্না পাঞ্জাবী ব্যঞ্জনগুলি তাহার মুখে লাগে যেন অমৃত!

মাস খানেক পরে কুলদার জননী একদিন কথায় কথায় তাহাকে বলিলেন, "উনি কমলার একটা সম্বন্ধ স্থির করছেন। বরের বয়স কিছু বেশী হয়েছে—তৃতীয় পক্ষে বিয়ে করবে, টাকা কড়ি বিশেষ কিছু লাগবে না।"

কুলদা জানাইল, অমন সুন্দরী ভাল মেয়েকে ও রকম পাত্রের হাতে কিছুতেই দেওয়া যাইতে পারে না। তার চেয়ে না-হয় অগত্যা নিজেই সে উহাকে বিবাহ করিবে।

উত্তম কথা। দিন স্থির হইল।

বিবাহের মাত্র তিন দিন পূর্ব্বে কমলার পিতারও সন্ধান পাওয়া গেল। আশ্চর্য্য কথা! তিনি এই ভবানীপুরেই বাসা ভাড়া করিয়া রহিয়াছেন এবং এ বাড়ী হইতে অধিক দূরেও নহে। জলন্ধর হইতে তাঁহার স্ত্রীও আসিয়াছেন।

কমলাকে তিনি স্বগৃহে লইয়া গেলেন। যথা দিনে শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল।

প্রাচীন-পঞ্জী

রসিকতা

অনেক কবি দার্শনিক, এবং অন্যান্য মহাত্মাগণ "সুখ কি?" এতদ্বিষয়ের মীমাংসার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়াছি যে, রসিকতা প্রকাশ করাতেই মনুষ্যের সুখ। নচেৎ রসিকতা করিবার জন্য লোকে এত অস্থির হইবে কেন? ধনের চেষ্টায় সকলেই ব্যস্ত বটে, কিন্তু আমরা স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছি যে রসিক বলিয়া নাম কিনিবার জন্য লোকে যেমন উদ্যোগী, ধনী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবার জন্য কেহ তত নহে। অনেকেই স্বীকার করে, "আমি নির্ধন।" আমি গরিব—আমি দিতে কোথায় পাইব?"—আমি কাঙ্গাল, আমার উপর এ দৌরাত্ম্য করিও না," এই রূপ কথা কাহার মুখে শুনিতে না পাওয়া যায়? কিন্তু কে কোথায় কবে কাহার কাছে স্বীকার করিয়াছে যে, "মহাশয় আমি অরসিক?" কে কোথায় কবে বলিয়াছেন, মহাশয়, আমি অরসিক, আমার সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করিবেন না,—কে কোথায় কবে ভাবিয়াছে যে, আমার কথায় রস নাই—আমি আর রসিকতা ছড়াইবার চেষ্টা করিব না? কেন না উপযুক্ত লোক দেখিলেই আপনার রসিকতার পরিচয় দিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়? কেহ কাহার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলে, আপনার ঐশ্বর্য্যের বা বিদ্যাবত্তার, বা যশস্বিতার বা অন্য গুণের পরিচয় দিবার জন্য তাদৃশ ব্যস্ত হয় না, কিন্তু রহস্য উত্থাপন করিয়া রসিকতার পরিচয় দিবার জন্য রক্তোষ্ঠে [illegible]।

অধুনাতন বাঙ্গালী মহলে রসিকতার অত্যন্ত দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইয়াছে। "তামাসা ঠাট্টা" "ইয়ারকি" "রং" "মজা" ইত্যাদি বিবিধ নামে, রসিকতা বঙ্গদেশে একাধিপত্য করিতেছে। বরং কথোপকথনে কিছু নিস্তার আছে। সম্বন্ধ বিরুদ্ধ লোকের কাছে বা শোকদুঃখাদির সময়ে, বা বিষয় কর্ম্মের সময়ে অনেক বাঁচাইয়া চলেন। কিন্তু লেখকদিকের নিকট কিছুতেই নিস্তার নাই। সুসময়ে, অসময়ে; সৎকথায়, কুকথায়; যেখানে সেখানে; যখন তখন, রসিকতা করা আজি কালি, কতকগুলিন লেখকের ব্যবসায়।

এমত বলি না যে, সকল লেখকই রসিকতা-ব্যবসায়ী। কতকগুলিন লেখক বড় বিজ্ঞ। রসিকতার প্রতি বড় অপ্রসন্ন। তাঁহাদের ধারণা আছে, যে পুত্রশোকাতুরের ন্যায় অনবরত মুখ দীর্ঘীকৃত করিয়া রাখাই পাণ্ডিত্য। রসিকতার সংস্পর্শ মাত্র দুরপনেয় কলঙ্কের কারণ। তাঁহাদের কাছে রসিকতার নাম গ্রাম্যতা। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। অধিকাংশ সাপ্তাহিক লেখক এই সম্প্রদায় ভুক্ত।

অপর সম্প্রদায়ের অন্য কাজ নাই; কেবল প্রাণপণে রসিকতা করাই কাজ। প্রথম সম্প্রদায় কৃষ্ণযাত্রার মুনি গোঁসাই, দ্বিতীয় বাসদেব। এক সম্প্রদায় শ্বেতশ্মশ্রু, জটা এবং বিজ্ঞতা লইয়া ব্যস্ত, রসিকতার বড় বিরক্ত। কিন্তু দ্বিতীয় সম্প্রদায় তাহা মানে না; নিয়ত রসিকতা করিবার জন্য অস্থির, সুতরাং মুনি গোঁসায়ের বিজ্ঞতা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া

যায়। বাসদেবদিগের রসিকতা সকল সময়ে সরস হয় না,—না হউক—রসিকতা করিতে হইবে। রচনা সরস হউক বা নীরস হউক—তাহাতে কেহ হাসুক বা না হাসুক—তাহারা রসিকতা করিবেন। রসিকতার কথার অনুরোধে সত্যকে মিথ্যা করিতে হয়. তাহাও স্বীকার; নিন্দনীয়কে পূজা করিতে হয়, বা পূজ্যকে নিন্দা করিতে হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই; রসিকতার স্রোতঃ না মন্দ পড়ে। পূর্ব্বে এ শ্রেণীর লেখক এদেশে সচরাচর দেখা যাইত না। পাঁচালি এবং কবিওয়ালা ও যাত্রার দলে ইঁহার প্রাদুর্ভাব ছিল। কুক্ষণে হুতোম পেঁচার নক্‌সা এদেশে প্রচার হইল। সেই পর্য্যন্ত এই লেখকগুলির রসিকতায় দেশ প্লাবিত হইতেছে!

রসিকতা, বাচনিক হউক বা লিখিত হউক, সর্ব্বত্র সমান প্রকৃতি দেখা যায়।

প্রচলিত রসিকতা নানা প্রকার।

প্রথম, প্রাচীন রসিকতা। কেহ কাহাকে সম্বন্ধ নিষিদ্ধ কোন দোষারোপ করিতে পারিলেই আপনাকে রসিকতায় পারদর্শী বিবেচনা করেন। এই প্রকার রসিকতা প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিশেষ আদৃত। বৃদ্ধ গাঙ্গুলি মহাশয়, যদি কোন প্রকারে ইঙ্গিত করিতে পারিলেন, যে রাম শাশুড়ে, কি সত্য বটেও. তবেই তিনি সে দিনের মত রসিকতার জয়-পতাকা বাঁধিলেন।

ইহারই সম্প্রসারণে দ্বিতীয় প্রকারের রসিকতার সৃষ্টি। কেহ কাহাকে যে কোন প্রকারে গালি দিলেই মনে করেন যে, আমি বিশেষ রসিকতা করিলাম। পরের মাতৃ পিতৃ প্রভৃতি সম্বন্ধে কদর্য্য কথা বলিতে পারিলেই এরূপ রসিকতার চরম হইল: সুতরাং গ্রাম্য বালকেরা এই রূপ রসিকতায় সর্ব্বাপেক্ষা সুপণ্ডিত! হুতোমপেঁচার অনুকরণে ব্রতী লেখকেরা প্রায় তাহাদের কাছে কাছে যান।

তৃতীয় শ্রেণীর রসিকেরা রসিক চূড়ামণি। অশ্লীলতাই তাঁহাদের কাছে রসিকতা। কোন ক্রমে অনুচ্চার্য্য কোন কথা ব্যক্ত করিতে পারিলেই তাঁহারা রসিকতার একশেষ করিলেন। যাহা ভদ্রের অশ্রাব্য বা অপাঠ্য, এবং সুনীতির বিনাশক, তাহাই তাঁহাদের কাছে রসিকতা। কথাগুলি স্পষ্ট বলিতে পারিলেই তাঁহাদের মনের মত রস ছড়ান হয়, কিন্তু আইনের দৌরাত্ম্যে কেবল ইঙ্গিতে রসিকতা করিয়াই অনেককে ক্ষান্ত থাকিতে হয়।

আর এক প্রকারেরর রসিকতা কেবল চাপল্যমাত্র। গ্রাম্য ইতর ভাষায় তাহার নাম "ঝাপাই ঝোড়া।" অনবরত মুখভঙ্গী, নিয়ত হস্ত পদ সঞ্চালন, দিবারাত্র হাসিবার এবং হাসাইবার নিষ্ফল উদ্যম, এই রসিকতার সামগ্রী। যাত্রার "ভুলুয়া" এবং "নটক্স" এই সকল শ্রেণীর রসিকদিগের আদর্শ। যে ব্যক্তি মুখে মুখে এই রূপ রসিকতা করিবার জন্য কষ্ট করে, তাহার দুঃখ দেখিয়া দুঃখ হয়, রাগ হয় না। কিন্তু যে সকল লেখক এইরূপ ভুলুয়া গিরিতে প্রবৃত্ত, তাহাদের রসিকতা অসহ্য। আধুনিক নাটক লেখকদিগের মধ্যে অধিকাংশ, এবং হুতোম সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে এই শ্রেণীর রসিক। রসিকতা করিবার জন্য তাঁহারা অত্যন্ত অস্থির; দন্ত সর্ব্বদাই বহিষ্কৃত; অঙ্গ-ভঙ্গীর বিরাম নাই; চক্ষুর নানা রূপ বিকৃতি; কিন্তু রসিকতার উপকরণের মধ্যে কতকগুলিন নীরস, অসংলগ্ন, অর্থশূন্য ইতর কথা। তাঁহাদের গ্রন্থে একটু একটু তাড়ি-খানার গন্ধ থাকে।

বঙ্গদর্শন, প্রথমবর্ষ—১২৭৯।

বানরচরিত

*   *   *   *   *

বানরদিগকে কেবল উপহাস করিবার কোন কারণ নাই। ডারুইন সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মনুষ্য বানর বংশসম্ভূত। এ কথায় যিনি হাস্য করিবেন, তিনি ডারুইন সাহেবের গ্রন্থ পড়েন নাই, বা বুঝিতে পারেন নাই, বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে সম্যক অধিকারী নহেন। সেই আশ্চর্য্য গ্রন্থের সম্যক আলোচনা করিলে এ বিষয়ে অল্প সংশয় থাকে।

অতএব পূর্ব্বকালিক বানরেরা মনুষ্যজাতির পূর্ব্বপুরুষ, এবং বর্ত্তমান বানরেরা আমাদের কুটুম্ব। ভরসা করি, ভবিষ্যতে ক্রিয়া কাণ্ডে তাহা-দিগের নিমন্ত্রণ হইবে। আমরা নিশ্চিৎ বলিতে পারি, অনেক মনুষ্য কুটুম্ব অপেক্ষা তাহারা সুসভ্য। সুন্দরী পাঠকারিণীদিগকে স্মরণ করিয়া দিই, যে ইহাদিগের সহিত তাহাদের ভাই সম্বন্ধ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন ভুল না হয়।

রহস্য ত্যাগ করিয়া আমরা পাঠকদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে' যিনি সক্ষম, তিনি ডারুইনের বিস্ময়কর গ্রন্থ যদি না পড়িয়া থাকেন, তবে পাঠ করিবেন। যাঁহারা সক্ষম নহেন, তাহাদিগকে আমরা অবকাশ ক্রমে তদ্বিষয়িণী সমালোচনা উপহার প্রদান করিব, ইচ্ছা আছে। এক্ষণে আমরা তাহার স্থূল মর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, তাহার আনুষঙ্গিক কথা হইতে বানরদিগের স্বভাব সম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রসঙ্গ সঙ্কলিত করিলাম।

মনুষ্যদিগের যে সকল পীড়া হয়, তাহার দুই একটি কোন২ পশুরও হইয়া থাকে—যথা বসন্ত। কিন্তু অনেকগুলি মানুষিক পীড়াই অন্য পশুর হয় না। সে রূপ পীড়া কতক২ কেবল বানরদিগেরই হইয়া থাকে। রেঙ্গর দেখিয়াছেন যে, আমেরিকা নিবাসী এক জাতীয় বানরের (*Cebus Azaroe*) "সরদি" হয়। মনুষ্যের মত অহার পৌনঃপুন্যে যক্ষ্মাদি হইয়া থাকে। মৃগী, অন্ত্রপ্রদাহ, ও চক্ষে ছানিও উহাদের রোগ। 'দুধে দাঁত' পড়িবার সময়ে ঐ জাতীয় অনেক বানর-শাবক জ্বররোগে মরিয়া যায়। মনুষ্য ব্যবহার্য্য ঔষধে তাহারা আরোগ্য লাভ করে।

অনেক জাতীয় বানর, চা কাফি এবং মদ্য ভালবাসে। ডারুইন সাহেব স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে, বানরেরা তামাকু সেবন করিয়া সুখ বোধ করে। ইহা পড়িয়া আমাদিগের বড় দুঃখ হইয়াছে। না জানি, এই তামাকু প্রিয় বাবুরা হুঁকা কলিকা তামাকু এবং টিকার অভাবে বনমধ্যে কতই কষ্ট পান! যাঁহারা দানশৌণ্ড, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি, বৎসর২ কিছু২ হুঁকা, কলিকা, টিকা ও তামাকু বনমধ্যে প্রেরণ করিবেন। অধিক বেতন দিলে খানসামাও নিযুক্ত হইতে পারে।

সে যাহা হউক, এই বানরেরা যে অনেক বি, এ, এম, এ প্রভৃতি পাণ্ডিত্যাভিমানী মনুষ্য অপেক্ষা বিজ্ঞ, এবং সুসভ্য, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সংশয় নাই।

*　　*　　*　　*　　*

বানরেরা মন্বাদি স্মৃতি অধ্যয়ন করিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু তাহারা পৌষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। মাতৃ-পিতৃহীন বানর শিশু অন্য বানর বানরী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

এক সদাশয়া বানরীর চরিত্র বিশেষ কৌতুকাবহ। সে কেবল অন্য জাতীয় বানর শিশু পালন করিত, এমত নহে; কুকুর এবং বিড়ালের শাবক চুরি করিয়া আনিয়া লালন পালন করিত এবং পৃষ্ঠে বহন করিয়া বেড়াইত। এইরূপে দত্তক গৃহীত একটী মার্জ্জার শিশু দৈবাৎ এই স্নেহময়ীকে আঁচড়াইয়াছিল। স্নেহময়ী তাহাতে বিস্মিতা হইয়া কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন যে মার্জ্জার শাবকের নখ আছে। সে এইরূপ কৃতঘ্নতায় আর দূষিত না হইতে পারে, এই আশয়ে তাহার নখ গুলি দংশন করিয়া ছিন্ন করিয়া দিল। মনুষ্যের পৌষ্যপুত্রের দৌরাত্ম্য নিবারণের এরূপ কোনও উপায় হয় না?

*　　*　　*　　*　　*

বানরেরা ক্ষেপাইলে ক্ষেপে। লণ্ডনের পশু নিবাসোদ্যানে একটী বানর ছিল, তাহাকে কিছু পড়িয়া শুনাইলে সে বড় রাগ করিত। পত্র বা গ্রন্থ পাঠে তাহাকে ক্ষেপিতে ডারুইন স্বয়ং দেখিয়াছেন। একবার এমন রাগিয়াছিল, যে আপনার চরণ দংশন করিয়া রক্তপাত করিল। ইহাতে বানরটিকে দোষ দেওয়া অন্যায়। গ্রন্থবিশেষ পাঠ করিলে, অনেক মহাশয়ই এইরূপ রাগ করিয়া থাকেন। মেঘনাদ বধ পড়িয়া অনেক অধ্যাপককে এইরূপ বানর করা যায়।

বানরেরা যুদ্ধ-পটু। একদা ডুাক অব কোবর্গ-গথা অনুচরবর্গ সমভি-ব্যাহারে আবিসিনিয়া প্রদেশে মেন্সা নামক পার্ব্বত্য পথ আরোহণ করিতে ছিলেন, এমত সময়ে বানরেরা দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার পথ অবরোধ করিল। রেঙ্গর সঙ্গে ছিলেন। তখন নর বানরের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সাহেবেরা বন্দুক চালাইলেন, বানরেরা শিলাখণ্ড বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রথমে বানরেরাই জয়ী হইয়াছিল। শেষে কি হইতে, তাহা ইতিহাসে লেখে নাই। লঙ্কায় রাঘবী সেনার কীর্ত্তি নিতান্ত অমূলক না হইবে।

*　　*　　*　　*　　*

পাঠকদিগের বিরক্তির আশঙ্কায় আমরা আর অধিক লিখিলাম না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, বানর বলিলে গালি হয় কেন? বানরদিগের যদি ভাষা থাকে, তবে তাহারা পরস্পরকে মনুষ্য বলিয়া গালি দেয়, সন্দেহ নাই।

—বঙ্গদর্শন, ১ম বর্ষ—১২৭৯।

বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রামাণিক সংস্করণ

মুখবন্ধ

বিদ্যাপতির পদাবলী মূলে প্রাচীন মৈথিল ভাষায় রচিত হইলেও, বাংলার বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে প্রাচীনতা ও উৎকৃষ্টতার জন্য যে, শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা শিক্ষিত পাঠকবর্গের অবিদিত নহে। বাংলা দেশে ইতিপূর্ব্বে কতিপয় সুপণ্ডিত ব্যক্তির দ্বারা বিদ্যাপতির পদাবলীর যে, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কয়েকটী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে, ঐ সংস্করণগুলির মধ্যে স্বর্গ-গত সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে সুপণ্ডিত ও সুলেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত ও বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ দ্বারা প্রকাশিত সংস্করণটী যে প্রায় সর্ব্ব-বিষয়েই শ্রেষ্ঠ, অভিজ্ঞ পাঠকবর্গের ইহাও অবিদিত নহে। আমরা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মাসিক অধিবেশনগুলির মুদ্রিত কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, ইদানীং স্বর্গ-গত নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চণ্ডীদাসের সংস্করণ ও বিদ্যাপতির এই সুবৃহৎ ও উৎকৃষ্ট সংস্করণটী নিঃশেষিত হওয়ায় সাহিত্য-পরিষৎ উহাদের নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন এবং ইতি মধ্যেই কয়েক জন অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা একটী সম্পাদক-সঙ্ঘ গঠিত করিয়া, আপাততঃ চণ্ডীদাসের পদা-বলীর সম্পাদন-কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। সম্ভবতঃ সাহিত্য-পরিষৎ সত্বরই বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদনেরও

একটা ব্যবস্থা করতে প্রবৃত্ত হবেন। এ অবস্থায় আমাদের জীবনের প্রায় চল্লিশ বৎসর-ব্যাপী আলোচনা ও অনুশীলনের ফলে আমরা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এই সংস্করণটী "অন্যান্য সংস্করণ গুলির অপেক্ষা প্রায় সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট হইলেও উহাতে (১) পদ-নির্ব্বাচন (২) পদ-বিন্যাস (৩) পাঠ-নির্ণয় ও (৪) অর্থ-নির্ণয় সম্বন্ধে যে সকল ভ্রম ও প্রমাদ লক্ষ্য করিয়াছি সে বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিলে বিদ্যাপতির পদাবলীর একটা যথাসম্ভব শুদ্ধ ও প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশের কার্য্যে কিছু সহায়তা হইতে পারে বিবেচনায়, রুগ্ন ও জরাজীর্ণ দেহ লইয়াও আজ সম্পাদক মহাশয়ের সাদর অনুরোধে আবার সাড়া না দিয়া পারিলাম না। উল্লিখিত বিষয়গুলির সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে, আমরা আমাদিগের ক্ষুদ্র শক্তি ও অপ্রচুর সুযোগ অনুসারে বিদ্যাপতির পদাবলীর উক্ত ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শন জন্য ইতিপূর্ব্বেও যে কিছু চেষ্টা করিয়াছি, এখানে সংক্ষেপে উহার একটু উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। সহৃদয় পাঠকগণ দয়া করিয়া আমাদের এই বিবরণটী আত্ম-প্রখ্যাপনের চেষ্টা বলিয়া মনে না করিয়া, ইহাকে আমাদের অতীত জীবনের অকৃতকার্য্যতারই একটা শোচনীয় কৈফিয়ৎ বলিয়া গ্রহণ করিলে এবং উহা হইতে নিজেদের ভবিষ্যৎ সফলতার উপযোগী সূত্রের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলেই আমরা কৃতার্থ হইব।

স্বর্গগত জগবন্ধু ভদ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সারদাচরণ মিত্র মহাশয়দিগের সংস্করণ গুলির পরে স্বর্গগত কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ মহাশয়ের অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী সম্পাদকদিগের প্রতি অনুচিত তীব্র মন্তব্য পূর্ণ সংস্করণ যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন বিদ্যাপতির পাঠক-সমাজে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। আমরা যথা-সময়ে উহার এক খণ্ড বহি সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণগুলির সহিত মিলাইয়া অনেক দিন ধরিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া জানিতে পারি যে, অনেক প্রাচীন বাংলা পদাবলীর পুঁথির সাহায্যে উহাতে পূর্ব্ব সংস্করণগুলির বহুসংখ্যক পাঠ ও অর্থের মারাত্মক ভুল সংশোধিত হইয়া থাকিলেও উহাতেও শতাধিক স্থলে পাঠ ও অর্থের ভুল রহিয়া গিয়াছে। আমরা "সমুত্থান" নামক নূতন সাপ্তাহিক বাঙ্গালা পত্রিকার স্তম্ভে কাব্য-বিশারদ মহাশয়ের সংস্করণের ঐ সকল ভ্রম প্রমাদের আলোচনা করিতে আরম্ভ করি; কিন্তু অল্প কয়েক সংখ্যার পরেই ঐ পত্রিকার প্রচার বন্ধ হওয়ায়, আমাদের ঐ আলোচনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। সে সময় 'বঙ্গবাসী' 'হিতবাদী' 'সঞ্জীবনী' প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। "বঙ্গবাসী" ও "হিতবাদী" পত্রিকার সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু ও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়দিগের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মসী-যুদ্ধ চলিতেছিল। আমাদিগের মত অজ্ঞাত ও অপরিচিত লেখকের প্রতিবাদ ছাপাইয়া "বঙ্গবাসী" নিশ্চিতই হিতবাদীর সহিত শক্রতা বাড়াইতে রাজি হইবেন না, এবং বিদ্যাপতির তথা-কথিত অশ্লীলতা-পূর্ণ পদাবলীর আলোচনা নিশ্চিতই সঞ্জীবনীর মত ব্রাহ্ম-সমাজের পত্রিকায় বর্জ্জনীয় বলিয়া গণ্য হইবে—এই বিবেচনায়ই আমরা "বঙ্গবাসী" ও "সঞ্জীবনী"তে প্রতিবাদ না পাঠাইয়া বন্ধুবর স্বর্গগত অম্বিকা চরণ উকিল মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত সমবায় সূত্রে গঠিত সংবাদ-পত্র সমিতির 'সমুত্থান' পত্রিকায় প্রতিবাদ-প্রবন্ধ ছাপাইয়া আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে উহার সহকারিতা করিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু ঐ পত্রিকার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বিদ্যাপতির আলোচনাও বন্ধ হইয়া গেল। সে সময়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা' প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। "প্রবাসী" "ভারতবর্ষ" প্রভৃতির ন্যায় বৃহৎ আকারের মাসিক পত্রিকাও তখন ছিল না এবং ভারতীয়-গ্রন্থ-প্রচার সমিতির পক্ষ হইতে আমরাও তখন পদকল্পতরু গ্রন্থের একটা ভব্য সংস্করণের সম্পাদন-কার্য্যে বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়ায়, সংবাদ-পত্রে বিদ্যাপতির আলোচনা চালাইবার জন্য আর কোন চেষ্টা করি নাই। মনে আশা ছিল যে, ভারতীয়-গ্রন্থ-প্রচার সমিতির প্রকাশিত ঐ পদকল্পতরুর পরিশিষ্ট ভাগে উক্ত গ্রন্থে ধৃত বিদ্যাপতির পদাবলীর পাঠ-বিচার প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে যথা সম্ভব আলোচনা করিব, কিন্তু ডবল-ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মার আকারের প্রায় ২২০০শত পৃষ্ঠায় ৩ খণ্ডে ঐ গ্রন্থের মূল মুদ্রিত ও প্রকাশিত হওয়ার প্রায় অব্যবহিত পরেই অনিবার্য্য কারণে উক্ত সমিতি উঠিয়া যাওয়ায়, আমাদিগের সেই বাঞ্ছাও ফলবতী হয় নাই। ইহার অনূন ১০ বৎসর পরে আমরা সাহিত্য-পরিষৎ-

পত্রিকায় "প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ" শীর্ষক ধারা-বাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া অকারাদি-ক্রমে বৈষ্ণব কবি ও তাঁহাদিগের পদাবলীর সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে আরম্ভ করি। পরিষৎ পত্রিকা এই জাতীয় প্রবন্ধ প্রকাশের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী হইলেও এবং আমরা তদানীন্তন পরিষৎ সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকট হইতে আশাতীত উৎসাহ পাইলেও, ত্রৈমাসিক ও নাতিবৃহৎ পরিষৎ-পত্রিকায় এরূপ ব্যাপক বিষয়ের আলোচনা সুদীর্ঘ-কাল-সাপেক্ষ বলিয়া অসুবিধাজনক মনে করি। ফলতঃ ১৩১৫ সালের পরিষৎ পত্রিকায় উক্ত আলোচনা আরম্ভ করিয়া ১৩২৫ সাল পর্য্যন্ত কতকগুলি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াও আমাদের অকারাদি-ক্রমিক আলোচনা "জ্ঞানদাস" অপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ১৩১৯ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পদকল্পতরুর কয়েক খানা হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি অবলম্বনে ঐ গ্রন্থের একখানা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন প্রামাণিক সটীক সংস্করণের সম্পাদন-ভার আমাদের প্রতি অর্পিত করায়, ৩।৪ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে আমরা ঐ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া পরিষদের নিকট অর্পণ করি এবং ১৩২২ সালে "প্রবাসী" পত্রিকার আকারে কিঞ্চিৎ অধিক চারি শত পৃষ্ঠায় ঐ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। গত ১৩৩৫ সালে চারি খণ্ডে আন্দাজ দেড় হাজার পৃষ্ঠায় বিষয়-সূচী, পাঠান্তর সংক্ষিপ্ত পাঠ-বিচার ও টীকা সহ উক্ত গ্রন্থের মূল-ভাগ সম্পূর্ণ হইয়াছে। পদ-সূচী, পদ-কর্ত্তৃ-সূচী, পদ-কর্ত্তৃ-গণ ও তাহাদিগের পদাবলীর আলোচনা-পূর্ণ ভূমিকা ও শব্দ-সূচীতে আন্দাজ চারি শত পৃষ্ঠায় উহার পঞ্চম অর্থাৎ ভূমিকাভাগ প্রকাশিত হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরিষদের পদকল্পতরুর এই সুবৃহৎ ও প্রামাণিক সংস্করণটীর প্রকাশ দ্বারাও বিদ্যাপতির পদাবলীর সংশোধন-কার্য্য বড় বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত নগেন্দ্র বাবুর সংস্করণে মোটে ৯৩৫টী পদ বিদ্যাপতির নামে উদ্ধৃত হইয়াছে। যদিও ইহার মধ্যে বহুসংখ্যক পদ বিদ্যাপতির রচিত নহে, কিন্তু রায় শেখর, চম্পতি, ভূপতি, হরিবল্লভ প্রভৃতি অন্যান্য কবির রচিত বলিয়া নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তথাপি বিদ্যাপতির খাঁটি মৈথিল ও অল্লাধিক পরিমাণে বিকৃত তথা-কথিত ব্রজ-বুলী পদাবলীর সংখ্যা ৮০০ শতের কম হইবে না। ইহার মধ্যে 'কবিরঞ্জন', 'নবকবিশেখর', 'কবিশেখর' ও 'বিদ্যাপতি'—ভণিতা যুক্ত ১৭৭টী পদ মাত্র পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদ গুলির প্রামাণিক পাঠ ও বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থলে সংক্ষিপ্ত পাঠ-বিচার পদকল্পতরুর পরিষৎ-সংস্করণে সন্নিবেশিত হইয়া থাকিলেও বাকি পদগুলি পদকল্পতরুর বহির্ভূত বলিয়া, সেগুলির সম্বন্ধে মূল গ্রন্থে কোন আলোচনাই করা যাইতে পারে নাই। বিষয়টা এতই প্রয়োজনীয় যে, বিস্তৃত ভাবে বিদ্যাপতি-বিচার-প্রবন্ধাবলি লিখিত ও প্রকাশিত করার অনিবার্য্য বিলম্ব ঘটিলেও এ সম্বন্ধে আমাদিগের দীর্ঘকাল-ব্যাপী গবেষণা ও আলোচনার ফল আর অপ্রকাশিত না রাখিয়া অন্ততঃ সূত্রাকারেও আমাদের সিদ্ধান্তগুলি অবিলম্বে প্রকাশিত করার জন্য আমাদের কতিপয় শ্রদ্ধেয় বন্ধু অনুরোধ করায়, আমরা আমাদের সঙ্কলিত ও প্রকাশিত "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলীর" ভূমিকার ॥৶০—১॥৴০ পৃষ্ঠায় একরূপ অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই নগেন্দ্র বাবুর সংস্করণ অবলম্বনে বিদ্যাপতির পদ-নির্ব্বাচন, পদ-বিন্যাস, পাঠ-নির্ণয় ও অর্থ-নির্ণয় সংক্রান্ত ভুলের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। এই আলোচনা যে অতি সংক্ষিপ্ত এবং আলোচ্য বিষয়ের বিস্তার ও গুরুত্বের তুলনায় মোটেই পর্য্যাপ্ত নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। দরভাঙ্গার মহারাজার অর্থানুকূল্যে প্রয়াগের ইণ্ডিয়ান্ প্রেস হইতে প্রকাশিত নগেন্দ্র বাবুর বিদ্যাপতির পদাবলীর হিন্দী সংস্করণ অবলম্বনে দরভাঙ্গার হিন্দী পুস্তক-ভাণ্ডার কর্ত্তৃক প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রামবৃক্ষ শর্ম্মা বেনীপুরী মহাশয়ের সম্পাদিত বিদ্যাপতির সচিত্র ও সুদৃশ্য সংক্ষিপ্ত হিন্দী সংস্করণটী ইদানীং প্রয়াগের হিন্দী-সাহিত্য সম্মেলন কর্ত্তৃক সম্মেলনের সর্ব্বোচ্চ হিন্দী-সাহিত্যের উপাধি-পরীক্ষার অন্যতম পাঠ্যরূপে স্বীকৃত হওয়ায়, ঐ সংস্করণটী উক্ত উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে কত দূর অনুকূল এবং সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বারা সঙ্কলিত বিদ্যাপতির সংক্ষিপ্ত হিন্দী সংস্করণটী উক্ত সাহিত্য-সম্মেলন সম্মেলন-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত করিয়া মুদ্রণপূর্ব্বক উক্ত উপাধি-পরীক্ষার পাঠ্য নির্দ্ধারিত করা সঙ্গত কি না, সে সম্বন্ধে আমাদের বিস্তৃত

অভিমত প্রয়াগের হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন জানিতে ইচ্ছুক হওয়ায় বিদ্যাপতির উক্ত হিন্দী সংস্করণ গুলিতে পদ-নির্ব্বাচন ইত্যাদি পুর্ব্বোক্ত আলোচ্য বিষয়ে যে সকল ভ্রম-প্রমাদ আছে, উহার একটা দিগ্দর্শন স্বরূপ সোদাহরণ আলোচনাত্মক প্রবন্ধ হিন্দীভাষায় প্রকাশিত করিলে, হিন্দী সাহিত্যসেবীদিগের উপকার হইতে পারে এবং তাঁহারা আমাদের প্রস্তাব অনুসারে মৈথিল ও হিন্দুস্থানী কতিপয় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের দ্বারা এতদর্থে "বিদ্যাপতি সঞ্জীবনী সমিতি" নামক একটা সমিতি গঠিত করিয়া বিদ্যাপতির পদাবলীর অনুসন্ধান, আলোচনা ও গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে বিদ্যাপতির পদাবলীর একটা প্রামাণিক সংস্করণ সঙ্কলিত করার প্রায় অসাধ্য কার্য্য-টাও সময়ে অনেক পরিমাণে সুসাধ্য হইতে পারে বিবেচনায়, আমরা "বিদ্যাপতিকে উপর হিন্দী-সংসার কা অনাদর ঔর উস্কে সংশোধন কা উপায়" শীর্ষক একটা প্রবন্ধ লিখিয়া গত ১৩৩৪ সালের চৈত্র মাসে রাজপুতানার ভরতপুরের নিখিল ভারতবর্ষীয় হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে ঐ প্রবন্ধের কিয়দংশ পাঠ করি এবং বিদ্যাপতি-সঞ্জীবনী সমিতি সংগঠনের প্রস্তাব ও উপস্থাপিত করি। ঐ প্রবন্ধ প্রয়াগ হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন দ্বারা পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করা হইবে, সভা-স্থলেই এরূপ নির্দ্ধারণ হওয়ায়, সভা-ভঙ্গের ২।৩ঘণ্টা পুর্ব্বেই আমাদিগকে জোয়ালাপুর (হরি-দ্বার) মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নরদেব শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত বিশেষ প্রয়োজনে ভরতপুর পরিত্যাগ করিয়া জোয়ালাপুর রওনা হইতে হয়। সুতরাং "বিদ্যাপতি-সঞ্জীবনী সমিতি" সম্বন্ধে সম্মেলনের অধিবেশনে কি প্রস্তাব গৃহীত হইল, উহা তৎ সময়ে জানিতে পারি নাই। ইহার ৫।৬ মাস পরে প্রয়াগ হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের ভূতপূর্ব্ব সাহিত্য-মন্ত্রী মহাশয়ের স্বাক্ষরিত এক খানা পত্র পাইয়া জানিতে পারি যে, প্রয়াগ হিন্দী-সাহিত্য সম্মেলনের জন্যে আমরা বিদ্যাপতির পদাবলীর একটা প্রামাণিক সংস্করণ সঙ্কলিত ও সম্পাদিত করিয়া দিতে স্বীকৃত হওয়ায় হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন তজ্জন্য আমাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। বাঙ্গালায় গ্রাম্য-কথায় একটা প্রবাদ-বাক্য শোনা যায়—"জাগে যে, পাতা কাটে সে।" অতন্দ্রিত ভৃত্যের উপর নিরুপায় প্রভুর অপরিহার্য্য পাতা-কাটা কাযের ফরমায়েশ তত-টা অসঙ্গত নাও হইতে পারে; কিন্তু একটা প্রবন্ধ লিখিয়া বিদ্যা-পতির প্রচলিত সংস্করণ গুলির ভুল দেখাইয়া দেওয়া এবং কতিপয় মৈথিল ও হিন্দুস্থানী পণ্ডিতের দ্বারা গঠিত "বিদ্যাপতি-সঞ্জীবনী সমিতির সমবেত অনুসন্ধান ও আলোচনার সাহায্যে প্রকাশিত বিদ্যাপতির এক খানা শুদ্ধ ও প্রামাণিক সংস্করণ দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করার অমার্জ্জনীয় অপরাধে, এই জীর্ণ-শীর্ণ অক্ষম বৃদ্ধটার উপরেই যে হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন এই প্রায় অসাধ্য কর্ম্মটার ভার অর্পিত করিবেন এবং এত কাল পরে বিদ্যাপতির একটা সদ্গতি করিলেন বলিয়া বাহাদুরী লইতে যাইবেন,—ইহার সমীচীনতা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য মনে হইল। "বিদ্যাপতি-সঞ্জীবনী-সমিতির" কর্ত্তব্য সুসম্পাদিত করা এবং দুই এক জন বিশেষজ্ঞের কার্য্য নহে; আমাদের প্রস্তাবিত বিদ্যাপতি-সঞ্জীবনী সমিতিকে সাধ্য অনুসারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিলেও আমরা নানা কারণে এই কার্য্যের ভার গ্রহণে অক্ষম; আমাদের অনুপস্থিতি-কালে আমাদের প্রবন্ধের লিখিত প্রস্তাবের সম্পূর্ণ অন্যথায়—সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক ঐ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে; সুতরাং উহার যথোচিত সংশোধন হওয়া আবশ্যক, আমরা সাহিত্য-মন্ত্রী মহাশয়কে অগত্যা এই বিষয়গুলি জ্ঞাপিত করিতে বাধ্য হই। ভরতপুর সাহিত্য-সম্মেলনে হিন্দীর শ্রেষ্ঠ কবি সুরদাসের পদাবলীরও একটা প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশিত করার প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছিল। জানিতে পারিয়াছি যে ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার জন্য এ যাবৎ প্রয়াগের হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন কোন উল্লেখ যোগ্য চেষ্টাই করেন নাই। হিন্দীর নিজস্ব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি সুরদাসেরই যখন এই দশা তখন আধুনিক হিন্দীর শুদ্ধ আদর্শ অনুসারে কিছু হিন্দী, কিছু বাঙ্গালা ও কিছু মৈথিলী মিশ্রিত বিদ্যাপতির অদ্ভুত "খিচুড়ী ভাষা"র পদাবলীর প্রতি সাধারণ হিন্দী-সাহিত্যিক-দিগের যে কতটা দরদ্ হইবে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। দরদ্ না থাকুক, দরদ নাই—এই কথাটা কিন্তু আমাদের হিন্দুস্থানী ভ্রাতৃগণ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাই আমাদের ঐ হিন্দী পুস্তিকা মুদ্রিত হইয়া উহার দুই চারিখণ্ড আমাদের নিকট প্রেরিত ও বৃথা সময়ে উহা

আমাদের হস্তগত হওয়ার পরেই দেখিতে পাইলাম যে হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন আমাদের প্রদত্ত আপত্তি-জনক (?) নামের পরিবর্ত্তে আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে ও অমতে বাহিরের মলাটের উপরে "বিদ্যাপতি পদ্য-সংগ্রহ" ও ভিতরে "বিদ্যাপতি ঔর উন্‌কী কবিতা"—এই সার্থকতা-শূন্য নাম দিয়া পুস্তিকা খানা প্রকাশিত করিয়াছেন। সে যাহা হউক, আমরা বাঙ্গালী শিক্ষিত পাঠকবর্গের দৃষ্টি ঐ পুস্তিকা * খানার প্রতি আকর্ষণ করিতেছি। বিদ্যাপতির সম্বন্ধে এরূপ দিগদর্শনই যথেষ্ট নহে, তাঁহার পদাবলীর আপত্তিজনক ও সন্দিগ্ধ পাঠ ও অর্থের একটী একটী করিয়া বিস্তৃত আলোচনা করা আবশ্যক বিবেচনায় গত ১৩৩৩ সালের আষাঢ় মাস হইতে আমরা স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ যোগেন্দ্র চন্দ্র বিদ্যাবিনোদ ভায়ার দ্বারা সম্পাদিত ও শাইস্তাগঞ্জ পোষ্ট (শ্রীহট্ট) হইতে প্রকাশিত "শ্রীশ্রীসোণার গৌরাঙ্গ" নামক মাসিক বৈষ্ণব পত্রিকায় "বিদ্যাপতি-বিচার" শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধ নিয়মিত-ভাবে প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। শ্রীপত্রিকার আকার নাতি-বৃহৎ বলিয়া "বিদ্যাপতি-বিচার" শেষ হইতে যে আরও বহু কাল গত হইবে উহা বলাই বাহুল্য। এ যাবৎ শ্রীপত্রিকায় যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছে পাঠকদিগের সুবিধার জন্য সে গুলি সত্বরই "বিদ্যাপতি বিচার" প্রথম খণ্ড নাম দিয়া স্বতন্ত্র পুস্তকের আকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করা হইবে। আমাদের বর্ত্তমান আলোচনা বিদ্যাপতি বিষয়ক হইলেও উহা উল্লিখিত হিন্দী পুস্তিকার ন্যায় সংক্ষিপ্ত কিংবা "বিদ্যাপতির বিচার" প্রবন্ধাবলীর ন্যায় বহু বিস্তৃত হইবে না। বিদ্যাপতির পদাবলীর একটী শুদ্ধ ও প্রামাণিক সংস্করণে পদ-নির্ব্বাচন, পদ-বিন্যাস, পাঠ ও অর্থের সংশোধন বিষয়ে কি প্রণালী কিরূপ সতর্ক বিচারের সহিত অবলম্বন করা আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সূত্র গুলির সোদাহরণ নির্দ্দেশ দ্বারা বিদ্যাপতির ভবিষ্যৎ সম্পাদক দিগের কার্য্যের কিঞ্চিৎ সহায়তা বিধানই আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের এই বিনীত কৈফিয়ৎ ও বর্ত্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য-বিবৃতি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। আমরা অতঃপর প্রকৃত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

* "বিদ্যাপতি-পদ্য-সংগ্রহ"। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারের ৬২ পৃষ্ঠা; সাহিত্য-মন্ত্রী, হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন, এলাহাবাদ (ইউ, পি) ঠিকানা হইতে তিন আনা মূল্যে প্রাপ্তব্য।—লেখক

বুদ্ধি ও বোধি

[শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম-এ, বি-এল]

এই বুদ্ধিমানের দেশে বুদ্ধির "বড়াই" সঙ্গত ও স্বাভাবিক। আমরা অনেকেই সুবুদ্ধি; কদাচ এক আধ জন দুর্ব্বুদ্ধি অতি বুদ্ধির নিন্দা রটান বটে, কিন্তু কে না জানে "বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য"? ঐ সার কথা। বুদ্ধির সমান কি আছে? দেহরথে আত্মা যদি রথী হন, তবে বুদ্ধি তাঁর সারথি—বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ—উপনিষৎ (এখানে বিজ্ঞান—অর্থে বুদ্ধি)। সাংখ্য-পরিভাষায়, মনঃ অহংকার ও বুদ্ধি—এই ত্রিবিধ অন্তঃকরণ (অন্তঃকরণং ত্রিবিধম্) (বৈদান্তিক ইহার উপর চিত্ত সংযোগ করিয়াছেন)। সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন, ইন্দ্রিয়-সকল দ্বার—অন্তঃকরণ দ্বারী এবং তাহাদের মধ্যে বুদ্ধিই প্রধান। কারণ, বুদ্ধিই সমস্ত বিষয়কে অবগাহন করে—সান্তঃকরণা বুদ্ধিঃ সর্ব্বং বিষয়মবগাহতে—এবং প্রদীপকল্প ইন্দ্রিয়বর্গ সমস্ত পুরুষার্থকে প্রকাশিত করিয়া বুদ্ধির নিকটই উপনীত করিয়া দেয়।

কৃৎস্নং পুরুষস্যার্থং প্রকাশ্য বুদ্ধৌ প্রযচ্ছন্তি। এ হেন বুদ্ধির দোহাই না দেওয়া মূঢ়তার কার্য্য নহে কি?

বুদ্ধির কৃতিত্বও কম নহে। বুদ্ধির সাহায্যেই মানুষ বিজ্ঞানশাস্ত্র (Science) ও তর্কশাস্ত্র (Dialectic) রচনা করিয়া জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করিয়াছে এবং চিন্তার

স্রোতঃ পরিস্ফুত করিয়াছে। তাহার ফলে অজ্ঞানপূর্ব্ব প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহ মনুষ্যের আয়ত্ত হইয়াছে ও হইতেছে এবং ব্যবহার-ক্ষেত্রে তাহাদের সুপ্রয়োগ দ্বারা মানব জীবন ও মানবীয় সভ্যতা স্বচ্ছন্দ ও সমৃদ্ধ হইয়াছে। অতএব যদ্যপি বিজ্ঞানকে আমাদের পরম হিতকারী বলি এবং বিজ্ঞানের সাফল্যে চমৎকৃত হইয়া তাহার শির জয় মাল্যে মণ্ডিত করি, তবে কি অনুচিত আচরণ হয়? আর তর্ক শাস্ত্র?—বিশেষতঃ আমাদের দেশের পঞ্চাবয়ব ন্যায়? বুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বের যত দূর নির্ণয় হইতে পারে, তৎপক্ষে তর্কশাস্ত্র কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। কাওয়েল সাহেব নব্য ন্যায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, ঐ জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টায় পাশ্চাত্য মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হয়—makes European head dizzy। পাশ্চাত্য কেন, এরূপ প্রাচ্যও বিরল, যিনি অবাধে এই সকল নিশিত-বুদ্ধি-ভেদ্য তর্কারণ্যে প্রবেশ করিয়া অক্ষত মস্তিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন। অতএব তর্কশাস্ত্রকে "ধন্য ধন্য" বলাতে কাহারই আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে—বিজ্ঞান ও বিতর্ককে সর্ব্বস্ব করিয়া যদি আমরা তত্ত্ব নির্ণয়ে অগ্রসর হই, যদি একমাত্র বুদ্ধিকেই সত্যের মানদণ্ড তত্ত্বের কষ্টি পাথর রূপে প্রতিষ্ঠিত করি, যদি দম্ভ করিয়া বলিতে যাই—"যাহা কিছু বুদ্ধির দ্বারা নির্ণেয় নহে, যাহা বৈজ্ঞানিক বিচারসহ নহে, যাহা হেতুবাদের সহিত সমঞ্জস নহে,—Consonant with Reason নহে, এই Rationalistic (হেতুবাদের) যুগে আমরা তাহা মানিতে বাধ্য নহি—আমরা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করি, তবে কি বিজ্ঞের কার্য্য করা হয়? বুদ্ধির কৃতিত্বে স্ফীত হইয়া যখন আমরা গর্ব্বের তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করি, তখন মনে রাখা মন্দ নহে যে, বিজ্ঞান ও বিতর্ক—Science ও Dialectic—এক কথায় বুদ্ধি চরম আর্য্য সত্য (Ultimate Truth) নির্দ্ধারণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে—সে জন্য "বোধি" চাই। বোধি কি? বুদ্ধি—Intellect, বোধি—Intuition। বুদ্ধিজন্য জ্ঞান—বিজ্ঞান (বোধ), বুদ্ধিজন্য বিজ্ঞান—প্রজ্ঞান (প্রতিবোধ)। বোধের উপর প্রতিবোধ, বিজ্ঞানের উপর প্রজ্ঞান, বুদ্ধির উপর বোধি। সেই জন্য 'বোধিসত্ত্ব' শাক্যসিংহকে 'বোধি'দ্রুমতলে সমাসীন হইয়া 'সম্বোধি' অর্জ্জন করিতে হইয়াছিল, ঋষিদিগকে জপ্রোধ মূলে ধ্যানস্থ থাকিয়া 'প্রজ্ঞান'বলে সেই 'প্রতিবোধ-বিদিতং'কে প্রত্যক্ষ করিতে হইয়াছিল। প্রজ্ঞানেনৈনম্ আপ্নুয়াৎ। কিন্তু এখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। বোধি, প্রজ্ঞান, প্রতিবোধ ভাষা হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। আমাদের বাংলায় তাই দেখা যায়, বোধ আছে প্রতিবোধ নাই, বিজ্ঞান আছে প্রজ্ঞান নাই, বুদ্ধি আছে বোধি নাই। ইহা বিচিত্র নহে—অনাবশ্যক বস্তুর বিলোপ স্বাভাবিক। যাহারা যজ্ঞকে 'জগ্‌গি' করিতে পারে, মহোৎসবকে 'মচ্ছব' করিতে পারে, তাহাদের অসাধ্য কিছু আছে কি? তথাপি এই বোধির বিষয়ে আমাদের আলোচনা করিতে হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে, বুদ্ধিকে সম্বল করিয়া, বিজ্ঞান ও বিতর্ক দ্বারা কেন চরমতত্ত্ব নির্ণয় সম্ভব নহে তৎসম্পর্কে কিছু আলোচনা করিব।

প্রথম বিজ্ঞান বা Scienceএর কথা।

বিজ্ঞানের প্রণালী কি? Observation, Experiment and Inference—এ দেশের ভাষায় সমীক্ষা, পরীক্ষা ও অন্বীক্ষা। বৈজ্ঞানিক প্রথমতঃ প্রাকৃতিক সংঘটনা (যাহাকে Phenomenon বলে)—তা' সে সংঘটনা বহির্জগতেরই (external) হউক বা অন্তর্জগতেরই (internal) হউক—ধীরভাবে লক্ষ্য করেন*—ইহাকে 'সমীক্ষা' বলে। সময়ে সময়ে সংস্থান, সন্নিবেশ ও সজ্জা ভিন্ন হইলে ঐ সকল সংঘটনার কি বিপরিবর্ত্ত ঘটে, কি ভাবান্তর রূপান্তর, বা অবস্থান্তর হয়, কৃত্রিম উপায়ে তাহার 'পরীক্ষা' করেন। অবশেষে সেই সকল সমীক্ষা ও পরীক্ষালব্ধ সংঘটনার যোগবিয়োগ করিয়া, গুণভাগ রচিয়া, নিখুঁত নিকর্ষ ধরিয়া অন্বীক্ষা বা Inference দ্বারা সত্যের, তত্ত্বের, বিধি-নিয়মের (Natural Laws) আবিষ্কার করেন। এই রূপে ধীরে ধীরে জ্ঞানরাজ্য বিস্তৃত হয়—নিসর্গ নিজের প্রকৃতির মধ্যে লুক্কায়িত রহস্যনিচয় উদ্ভেদন করিতে বাধ্য হয়।

অতএব দেখা গেল বিজ্ঞানের বলাবল মূলতঃ সমীক্ষা ও পরীক্ষার উপর নির্ভর করে। সমীক্ষা ও পরীক্ষা যদি দোষযুক্ত হয়, যদি তাহার মধ্যে ভ্রম, প্রমাদ ত্রুটি-বিচ্যুতি

* সেই জন্য অধ্যাপক ক্লিফোর্ড Sublime patience of Scienceএর কথা বলিয়াছেন।

রহিয়া যায় তবে অন্বীক্ষা বিশুদ্ধ হইতে পারে না। চক্ষু-কর্ণ ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই সমীক্ষাও পরীক্ষা করিতে হয়; কিন্তু এই সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও সামর্থ্য কতটুকু? সূক্ষ্ম বস্তু আমরা দেখিতে পাই না। মৃদুতর শব্দ আমাদের শ্রুতি গোচর হয় না। সুকুমারতর সৌরভ আমরা আঘ্রাণ করিতে পারি না ইত্যাদি। সেই জন্য বৈজ্ঞানিকেরা ইদানীং অদৃশ্য আলোক (Invisible-light) ও অস্ফুট শব্দের (Inaudible soundএর) কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই যে ইন্দ্র ধনুতে কিম্বা কাচের দুল—(prism)—সম্পৃক্ত বর্ণচ্ছেদে রক্ত, পীত, নীল, হরিৎ প্রভৃতি সপ্তবর্ণের প্রকাশ হয়, তাহার এপারে ও ওপারে সততই অপর বর্ণের তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হইতে থাকে—যাহাকে ultra violet ও intra red বলে। কিন্তু এই সকল বর্ণ আমরা চর্ম্ম-চক্ষে কোন দিন প্রত্যক্ষ করিতে পারিবনা। তা' ছাড়া এমন সূক্ষ্ম (অণু, কোষাণু প্রভৃতি) পদার্থ আছে এবং এমন বিপ্রকৃষ্ট বস্তু লক্ষ কোটী যোজন দূরে ব্যবস্থিত আছে (যেমন অতি দূর-স্থিত তারকা পুঞ্জ) যাহা আমাদের লক্ষ্য ইন্দ্রিয় শক্তির চিরদিন অগোচর রহিবে। (সেই জন্য বৈজ্ঞানিকেরা তিগ্ম, তীক্ষ্ণ ও সুকুমার যন্ত্র পাতির উদ্ভাবন করেন (instruments and apparatus of the most exquisite and delicate character)—যেমন অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, তৌলদণ্ড (Microscope, Telescope, Balance) ইত্যাদি। ইহা দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়ের গ্রহণ সামর্থ্য বর্দ্ধিত হয় এবং যাহা সহজ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ছিল তাহা গোচরীভূত হয়। কিন্তু যন্ত্র পাতির তীক্ষ্ণতা ও তিগ্মতার তো সীমা আছে। এমন সকল তারা আছে যাহা প্রখরতম দূরবীক্ষণের দ্বারাও দৃষ্ট হয় না। অধ্যাপক ডলবেয়ার (Dolbear) বলিয়াছেন যে উৎকৃষ্ট-তম অনুবীক্ষণের তীক্ষ্ণতা যদি একশ-নয়গুণ বর্দ্ধিত করিতে পারা যায়, তবে পরমাণু (Atom) আমাদের দৃষ্টি গোচর হইবে। অথচ গত পঞ্চাশ বৎসরের চেষ্টায় অনুবীক্ষণের তীক্ষ্ণতা মাত্র ছয়গুণ বাড়িয়াছে। এ' সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-প্রবর স্যার অলিভার লজ একস্থলে লিখিয়াছেন, 'A portion of substance consisting of a billion atoms (i. e. a million millions) is barely visible with the highest power of a microscope and a speck of granule in order to be visible to the naked eye must be a million times bigger still.' সেই জন্য কাশীর সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডাঃ রিচার্ডসন (Dr. Richardson) একবার লিখিয়াছিলেন, "Thus Science is daily approaching more nearly to the boundary of its present field of work in the physical plane বৈজ্ঞানিক শিরোমণি লর্ড কেলভিনের মন্তব্য আরও তীব্রতর; তিনি বলিয়াছেন 'The word failure is written in all the efforts made by Science during the last fifty years!' সেই জন্য কোন কোন আধ্যাত্মিক-ভাবাপন্ন বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের উচ্চতর সমস্যার সমাধানের পক্ষে যন্ত্র-পাতির আপেক্ষিক ব্যর্থতা লক্ষ্য করিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, বৈজ্ঞানিকের নিজের অভ্যন্তরে যে করণ (দৃষ্টিশক্তি শ্রুতিশক্তি প্রভৃতি) অস্ফুট ও অব্যক্ত আছে তাহাকে প্রস্ফুটিত করিয়া দিব্য-দৃষ্টি, (Clarvoyance) দিব্যশ্রুতি, (Clarodiance) psychometry telepathy প্রভৃতি শক্তির সাহায্যে সমীক্ষার ও পরীক্ষার পরিধির পরিসর বাড়াইয়া বিজ্ঞানের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ কর। অবশ্য অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক ঐ সম্ভাবনাকে অবাস্তর কল্পনা মনে করেন। কিন্তু যদিইবা বৈজ্ঞানিক দিব্যদৃষ্টি, দিব্যশ্রুতি লাভ করিয়া এই ভাবে উন্নততর শক্তিধর হইতে পারেন, তবে বুদ্ধি দ্বারা অন্বীক্ষা করিয়া তিনি কি কোন দিন চরম সত্যের নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন? বিজ্ঞান যখন সমীক্ষা ও পরীক্ষা ছাড়িয়া অন্বীক্ষার উচ্চতম গ্রামে আরোহণ করেন তখন তাঁহাকে দর্শনের ত্রিসীমায় উপনীত হইতে হয়। বুদ্ধির সাহায্যে আমরা যে দার্শনিক গবেষণা করি তাহার প্রণালী কি? উহার প্রণালী তর্ক, বাদ ও বিচার—কখনও কখনও বিতণ্ডা। এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়া প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে অনেক দার্শনিক বুদ্ধির সাহায্যে দর্শন রচনার প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু সে চেষ্টা প্রায়শঃই ব্যর্থ হইয়াছে এবং তাঁহাদের রচিত দর্শন (কবি মিল্টনের ভাষায়) 'Vain Philosophy'তে পরিণত হইয়াছে। এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ, জীব, জড় ও ব্রহ্ম এই তত্ত্বত্রয় সম্বন্ধে First Principles

নির্দ্ধারণ করা, কিংবা দার্শনিকপ্রবর হেগেল যাহাকে rethinking the thoughts of creation—সৃষ্টি-রহস্তের বিলোম ক্রমে 'প্রতি অর্পণ' বলিয়াছেন—বুদ্ধি দ্বারা যে ব্যাপার নিষ্পন্ন করা সম্ভব নহে। *

দর্শনের যাহা প্রধান বেদ্য সেই ব্রহ্ম বস্তু যাহাকে গীতা "জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং" বলিয়াছেন, মহাভারত আবার যাহার সম্বন্ধে 'বেদ্যংসর্প পরংব্রহ্ম'! বলিয়াছেন—সেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে বুদ্ধি-কৃত আলোচনার প্রতি লক্ষ্য করিলে বুদ্ধির অক্ষমতার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁহারা ব্রহ্মের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা বুদ্ধির নিকট প্রহেলিকা ও প্রলাপ বাক্য বোধ হয়। কারণ, তাঁহারা ব্রহ্মকে সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মে—অন্বিত করিয়াছেন, সমস্ত বিরুদ্ধ লক্ষণে লক্ষিত করিয়াছেন। তিনি হন the supreme unity of all contradictions. ব্রহ্ম অণোরণীয়ান্—অণু অপেক্ষা অণু, অথচ মহতো মহীয়ান্—মহতের অপেক্ষা মহান্। তিনি দূর হইতে সুদূরে অথচ নিকট হইতে নিকটতরে (দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ) (closer than our hands and feet—Newman) তিনি একাধারে স্থাবর অথচ যযাবর, স্থিতিশীল অথচ গতিশীল, static অথচ dynamic, absolute motion অথচ absolute rest (তদ্ এজতি তন্নৈজতি, আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বত। তিনি নিমেষ অথচ কল্প —নিমেষ এব কঃ কল্পঃ কঃ কল্পোপি নিমেষকঃ তিনি পরঃ ত্রিকালস্য অথচ eternal Now (ভূত ভব্য ভবাত্মক)! তিনি চেতন অথচ পাষাণ (কশ্চেতনোপি পাষাণঃ) চিৎ অথচ জড় তিনি মদামদ (কন্থং মদামদং দেবং); তিনি আনন্দ অথচ নিরানন্দ। তিনি অদুঃখং অসুখং ব্রহ্ম। তিনি সৎ অথচ অসৎ (অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম, ন সৎ তৎ নাসদ্ উচ্যতে)। অধিকন্তু তিনি—তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ একাধারে বিশ্বানুগ ও বিশ্বাতিগও (Immanent ও transcendent)। এইমর্ম্মে একজন সুফি সাধক বলিয়াছেন 'First and last, End and Limit of all things, incomparable and unchangeable, always near yet always far' * * এ সম্পর্কে, ধ্যানরসিক সেণ্ট অগষ্টাইনের প্রাণের উক্তি প্রণিধান যোগ্য।

"What art thou, then my God? Highest, best, most potent (i. e. dynamic), most omnipotent (i. e. transcendent), most merciful and most just, most deeply hid and yet most near. Fairest, yet strongest, steadfast, yet unseizable, unchangeable yet changing all things; near new, yet never old. Ever busy, yet ever at rest, gathering yet needing not: bearing, filling, guarding; creating nourishing and perfecting. seeking though thou hast no wants. What can I say, my God, my life, my holy joy? Or what can any say who speaks of thee?'—Confessions, Book I, Ch. IV.

এই সকল লক্ষ্য করিয়া এবং সর্ব্বদেশের ঋষিদিগের অপরোক্ষ অনুভূতির প্রতিধ্বনি করিয়া মিস্ আণ্ডারহিল (Underhill) তাঁহার Mysticism গ্রন্থে কয়েকটী সুন্দর কথা বলিয়াছেন :—

Man's true Real, his only adequate God must be great enough to embrace this *Sublime paradox*, to take up these apparent negations into a higher synthesis.

* * *

He is best known as that Unity where all these opposites are lifted up into harmony, into a higher synthesis.

* * *

At once static and dynamic, above life and in it, all love—yet all law, eternal in essence though working in time—this vision resolves the contravies which tease those who study it from without.

যাঁহারা অভেদে ভেদদর্শী (who study it from without) বুদ্ধির দ্বারা যাহারা তত্ত্ব নির্ণয় করিতে প্রয়াসী, তাঁহারা এই আপাত বিরোধের গহনারণ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হইবেন, বিচিত্র কি? (ক্রমশঃ)

---

* অধ্যাপক জেমস্ তাঁহার Varieties of Religious Experiences গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে দার্শনিকের এই গতক্রমকে লক্ষ্য করিয়া [illegible] করিয়াছেন।

* সেইজন্য 'in mystical literature such self contradictory phrases as "Dazzling obscurity, whispering silence" 'teeming desert' are continually met with—William James' Variety of Religious experience, p. [illegible]

বিদ্যাসাগর-স্মৃতি

[অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম বসু, বি-এ]

বিদ্যাসাগর মহাশয়-সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই জানেন, আর বলা হয়েছেও অনেক। চণ্ডীবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকাণ্ড জীবন-চরিত বার করেছেন, তাতে অনেক কথাই তাঁর সম্বন্ধে বিশদভাবে বলা হয়েছে। তবে তাঁর "আটপৌরে" জীবনের দু'একটা কথা আজ পাঠকদের কাছে আমি বল্‌তে চেষ্টা করব।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে কথা কইতে গেলে অনেক অবান্তর কথা এসে পড়্‌বে, সেগুলো না বল্‌লে চল্‌বে না—কারণ সেগুলো আনুষঙ্গিক কথা।

আমার বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে অনেকেই আমাকে এই সমস্ত কথা ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যাপার-গুলো যা' আমার জানা আছে,—তা প্রকাশ করতে বলেন বটে, কিন্তু আমার শক্তি ও সামর্থ্যের উপর আস্থা নাই, লিপিকুশলতার উপরও বিশ্বাস নাই ব'লে, এত দিন হ'য়ে ওঠে নি। আজ তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হ'লাম।

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখ্‌বার সুযোগ আমার প্রথম হয়েছিল, যখন তাঁর বয়স আন্দাজ ৫০।৫২ বৎসর হবে। তখন আমি Duff Collegeএ পড়ি। তবে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করবার অবসর পেয়েছিলাম তাঁর শেষ জীবনের ১৬।১৭ বৎসর মাত্র, কেন না তিনি ১৮৯১ সালে মারা যান; আমি ১৮৭৪ কি ৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার প্রথম অবসর পাই, তখন তাঁর বয়স আন্দাজ ৬৪ কি ৬৫ বৎসর হবে। তাঁকে প্রথম দেখি আমাদের পঠদ্দশায়। সে সময়ে Calcutta Reading Room বলে এক পাঠাগার ছিল। সেখানে নানা সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রাদি থাকৃত। ভৈরব বাঁড়ুজ্যে ম'শায় তার সম্পাদক ছিলেন। সেখানে এক দিন এক অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি Mr. W. C. Bonnerjee নামে বিশেষ পরিচিত, তিনি সে সভায় ছিলেন। তিনি এক জন সুপরিচিত বক্তা ছিলেন। ইংরাজী ভাষা তাঁর বিশেষরূপে আয়ত্ত ছিল, তাঁর ভাষার নৈপুণ্যও ছিল। তিনি অনর্গল সাধুভাষায় এমন বক্তৃতা দিতে পারতেন যে, অনেক সাহেব তাঁর বক্তৃতার সুখ্যাতি করতেন। শুধু বক্তৃতা কেন, ইংরাজী চলন-বলনও বেশ নিখুঁতভাবে অনুকরণ করেছিলেন। তাঁর বন্ধু শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু ম'শায় বলেছিলেন, "ইংরাজী ধরণ এমন সম্পূর্ণভাবে নিতে, বাঙ্গালীর মধ্যে আর কেউ পারে নি। রুমালে নাকঝাড়াও দস্তুর মত ইংরাজী কায়দায় করতেন। বিলাতে জন্মানর অধিকারে অধিকারী করবার জন্য তিনি এমন সব পন্থা অবলম্বন করতেন যাতে তাঁর সন্তান বিলাতে ভূমিষ্ঠ হয়। বাস্তবিক পক্ষে তখন সাহেবিয়ানারই যুগ ছিল। আমাদের ছাত্রজীবনে আমরা তখন ইংরাজী ছাড়া বাঙলা একরকম বলতামই না। কোথাও কিছু বল্‌তে হলে সকলে মুখস্ত করে যেত, অন্য অন্য বই থেকে চুরি করে সকলে ব'ল্‌ত। তাতেই খুব বাহবা পাওয়া যেত। অনেকেই অবশ্য নিজে নিজেই কিছু বল্‌তে পারতেন। এ হেন ইংরাজীয়ানার যুগের অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন—বিদ্যাসাগর ম'শায়। আমরা সব ইংরাজী-নবীশের দল সেখানে ছিলাম। আমরা আশা করেছিলাম বিদ্যাসাগর ম'শায়ের কাছ থেকেও ইংরাজী শুনব। কিন্তু তিনি সবাইকে সেখানে হাসাতে লাগলেন। এক এক জনের বক্তৃতা হয়ে যায় আর তিনি অন্য এক জনকে উদ্দেশ করে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "এইবার তুমি একটু বল বাবা, বল তুমি একটু বল!" তাঁর বল্‌বার এমনি ভঙ্গিমা যে প্রতি কথায় হাসির ধূম পড়ে যেতে লাগল। তাঁর জন্য তামাক এল, তিনি মুহুর্মুহু তামাক খেতেন। আমার কিন্তু খুব বিরক্তিকর হয়েছিল। মনে হ'ল, ইনি পাগল না কি? সেই পোযাক, থেলো হুঁকো হাতে, উড়ের মত মাথা কামান, আর সেই লোক-

হাসাবার ধূম। এমন কি Mr. W, C. Bonnerjeeও বাঙ্গালী রকমে হাসতে লাগ্‌লেন। আমার কিন্তু তখন আশাভঙ্গ হয়েছিল, খুব নিরাশ হ'য়ে ফিরে এসেছিলাম।

এ ঘটনার এক বৎসর পরে "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্"-এর বিদ্যাসাগর ম'শায়ের সংস্করণের এক খানি বইয়ের জন্য তাঁর এক নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে গিয়ে, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি অনেক কথার পর একটী দিন ঠিক করে আমাকে আস্‌তে বলে দিলেন। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে গিয়ে দেখি তিনি অনেক লোকের সঙ্গে বসে গল্প-গুজব করছেন। আমি সেটা উপযুক্ত সময় না বুঝে, অন্য এক দিন দেখা করলাম। তাঁর কিন্তু স্মরণশক্তি এমন ছিল যে আমি সেই নির্দ্দিষ্ট দিনে কেন আসি নাই সে কথা আমাকে দেখেই জবাব চাইলেন। আমি সব কথা বল্‌তে আমায় বল্‌লেন, "বোকা ছেলে, কাজ হারাতে আছে কি ? দেখা কর্‌লেই তখনই তোমার বই পেতে।"

তার পর বি-এ পাস করার পর এক দিন Metropolitan Schoolএর এক জন শিক্ষক অনুপস্থিত হওয়ায় তাঁর জায়গায় কাজ করতে যাই। তখন সেখানে ছেলেদের মারবার নিয়ম ছিল না। আমি 4th Class কি 5th Classএ অঙ্ক কষাচ্ছি। এক ছেলে বড় গণ্ডগোল কর্‌ছিল; আমি হাতের বই খানা ছুঁড়ে তাকে মার্‌লাম। ছেলেটীও বেঁকে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "আমাকে আপনি মার্‌লেন ?" আমি বল্‌লাম, "তোমায় মার্‌লাম ?—না বই খানা ছুঁড়ে দিলাম ?" এ সময় তাঁর সঙ্গে এক আধবার দেখা হত।

যখন আমি এম-এ পড়ায় নিযুক্ত, সে সময় আমার পিতৃবিয়োগ হয়। তখন একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, কষ্টে পড়েও পড়া-শুনা ছাড়িনে বলে'। এই সময়ে Metropolitan Collegeএ এক জন শিক্ষকের বসন্তরোগে মৃত্যু হয়। আমি সেই পদে নিযুক্ত হলাম। F.A, Classএ ইতিহাস মনোবিজ্ঞান, ও তর্ক-শাস্ত্র পড়াতে হ'বে। আমি কাজ নিলাম ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ তারিখে। তখন ৬০৲ টাকা মাহিনা ছিল, ক্লাসে ১০০।১৫০ ছেলে পড়ত। অনেকের বয়স আমার চেয়ে বেশী ছিল। অত ছেলেদের কাছে ইংরাজীতে সব বল্‌তে হচ্ছে, আমার ত খুব ভয় হচ্ছে। পড়াতে পড়াতে শুনতে পেলাম একটী ছেলে আমাকে লক্ষ্য করে বল্‌লে "গলাটী বেশ।" যাই হক', সে কালে দু'চার কথা আমাদের বলা অভ্যাস ছিল ব'লে, ক্লাসে ইংরাজীতে পড়াতে বিশেষ অসুবিধা হ'ত না। সে সময়ে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (তখন তিনি বিশ্ববিশ্রুত সুরেন্দ্রনাথও হন নি, Sir উপাধিও পান নি) এখানে সাহিত্য পড়াতেন, ২ঘণ্টা করে'। এখান থেকে তিনি তখন পেতেন ২০০৲ টাকা। ঠিক সময়ে তিনি রোজ গাড়ী করে আস্‌তেন,—যেন ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া —ছুটে Libraryতে যেতেন, Webster's Dictionary সঙ্গে নিয়ে ছুটে ক্লাসে যেতেন। তিনি খুব ভাল রকম ইংরাজী বল্‌তে পারতেন, আমাদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারও খুব ভাল ছিল। আদৌ অহঙ্কার ছিল না। কোনও বানান সন্দেহ হ'লে আমাদের কাছে "এটা কি হবে, ওটার কি বানান" এ রকম জিজ্ঞাসা করতে দ্বিধা করতেন না। আমরা তাঁকে নেতা বলে মেনে নিতাম। সকলেই তাঁর মুখের কথা শুন্‌বার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। ছেলেদের সভা-সমিতির অধিবেশনে তিনিই সভাপতি হতেন। একটী ছেলে খুব মেধাবী ও প্রতিভাসম্পন্ন ছিল। শ্যামপুকুর স্কুল থেকে সে প্রথম স্থান অধিকার করে' এখানে কলেজে পড়তে আসে; তার নাম ছিল দুর্গাচরণ সরকার; ছেলেটী একটু রোগা, একটু ময়লা ছিল। তারও বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা অদ্ভুত ছিল। সুরেন্দ্রনাথের নীচেই তার স্থান দেওয়া হ'ত। দু'জনেরই বাক্যস্রোত অনর্গল ব'য়ে যেত।

এই সময়ে Metropolitan College F. A. তে প্রথম স্থান অধিকার করলে। তার ফলে রাশি রাশি ছেলে এসে কলেজে ভর্ত্তি হতে লাগল। তখনও B. A. পড়ান এখানে হ'ত না; কেন না বাঙ্গালী দ্বারা B. A. ক্লাস চালান তখন এক রকম অসম্ভব ছিল। বিদ্যাসাগর মশায় কিন্তু Free B. A. Class খুল্‌লেন। ছেলে এল ৩২জন। অনেক বড় বড় ছেলে এল ও ভর্ত্তি হ'ল। আমার চেয়ে ১০ বছরের বড় ছেলেকে পড়াতে বাস্তবিকই হৃৎকম্প হ'ত! তা ছাড়া আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার এম-এ, পরীক্ষার জন্য বিষয় নির্বাচনে [illegible]

Evidence of Christianity. ফলে পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হলাম। অথচ বি-এ ক্লাশের জটিল বিষয় পড়াবার ভার আমার উপর ন্যস্ত থাকায় খুবই ভয়ে ভয়ে কাজ করতে হ'ত। বড় বড় ছেলেদের পড়াতে হ'ত বলে খুবই সশঙ্কিত হয়ে থাকতে হ'ত। তা' ছাড়া বিদ্যাসাগর মশায়ের এই ব্যবস্থা ছিল,—সেটা তাঁর দোষই বলুন আর গুণই বলুন—যে প্রত্যেক শিক্ষককে তিনি মাঝে মাঝে বলতেন তাঁর ক্লাসের দুটী ভাল ছেলেকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে। তিনি বাদুড়বাগানের বাড়ীতে তাঁর Libraryতে ছেলে দুটীকে নিয়ে গিয়ে নানা কথার মধ্যে কোন্ শিক্ষক কি রকম পড়ান, তাঁর দোষ গুণ কি—এই সব ছেলেদের কাছ থেকে সব খুঁটি-নাটি— জেনে নিতেন। এক দিন আমি ঘটনাক্রমে সেখানে গিয়ে পড়ে দেখি একটী ছেলে আমাদের নামে নানান্ খানা করে বসে' আমাদের ভিটন্থ ঘুঘুস্থ করছে। সে দম্‌বার ছেলে নয়, আমাকে সেখানে থাকতে দেখেও সে যে সুরে গান গাইতে আরম্ভ করেছিল সেই সুরেই গেয়ে যেতে লাগল? এমন কি N. Ghose মশায়েরও পরিত্রাণ ছিল না! সে ছেলেটীর নাম আর প্রকাশ করবার দরকার নাই। কিন্তু যাই হ'ক বিদ্যাসাগর মশায় আমাকে তাঁর ছেলের চেয়েও ভালবাসতেন।

বিদ্যাসাগর মশায়ের Library তাঁর বড় প্রিয় জিনিস ছিল। তিনি অনেক বহুমূল্য এবং অনেক দুষ্প্রাপ্য বই বিলাত থেকে বাঁধিয়ে নিয়ে এসে যত্ন করে Libraryতে রাখতেন। এক দিন এক জমিদারের ছেলে তাঁর সঙ্গে এই Libraryতে বসে কথাবার্ত্তা কইছেন, এমন সময় এক খানা বইয়ের বাঁধা লক্ষ্য করে খুব সুখ্যাতি করতে লাগলেন। বিদ্যাসাগর ম'শায় বললেন, "হাঁ, এটা মরক্কো চামড়া দিয়ে বিলাত থেকে বাঁধিয়ে এনেছি, বাঁধাই খরচা ১০৲ টাকা পড়েছে।" ভদ্রলোকটী একটু অবাক্ হয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তা বইখানা বাঁধাতেই যখন ১০৲ টাকা পড়ল, তখন বইখানার দাম কত?" বিদ্যাসাগর মশায় বললেন, "বইখানার দাম ৫৲ টাকা।" লোকটী তখন বল্লেন, "দেখুন, অনেককে বলতে শুনেছি আপনার একটু পাগলামি আছে, এখন দেখছি কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। এক খানা বই বাঁধাতেই খরচ করলেন ১০৲ টাকা অথচ বইখানারই দাম মোটে ৫৲ টাকা!" বিদ্যাসাগর মশায় তখন তাঁর সঙ্গে এ-কথা সে-কথা কইতে কইতে হঠাৎ এক টুকরা মোটা দড়ী কুড়িয়ে নিয়ে ভদ্রলোকটীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, বল ত বাপু এই দড়ীর টুকরাটার দাম কত হ'তে পারে?" তিনি বললেন, "ওর আর দাম কি হ'বে, এক টুকরো দড়ী বৈ ত নয়?"

বিদ্যাসাগর মশায় বললেন, "তবুও চারটে পয়সা দিলে এ-রকম এক টুকরা দড়ী পাওয়া ত' যেতে পারে? আচ্ছা বেশ। আর তোমার ঐ ঘড়ীর চেইন ছড়ার দাম কত হবে, ৫০০৲ টাকা? তা হ'লে বাপু, যে কাজ চার পয়সায় খুব হতে পারে তার জন্যে ৫০০৲ টাকা খরচ করতে তুমি কুণ্ঠিত নও! তা হ'লেই বেশী পাগল কে হ'ল বাপু?"

তাঁর আর এক স্বভাব ছিল—সময়ে অসময়ে তিনি পাল্কী করে' কলেজে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে শিক্ষকদের পড়ান নিজে শুনতেন। এমনি করে এক দিন আমার পড়ান শুনছেন, আমি জানতে পারি নি। হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "পড়াচ্ছ, না ছেলেদের দাবাড়ী দিচ্ছ?" আমি চীৎকার করে পড়াচ্ছিলাম, অনেক ছেলে কি না।

তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা তাঁকে প্রায়ই বলতেন, "বি-এ ক্লাস খুলেছ, কিন্তু তেমন ভাল লোক কই? শেষকালে কি মুখ হেঁট হ'বে?" তিনি ছেলেদের জিজ্ঞাসা করতেন, "কি রে পড়া শুনা কেমন হচ্ছে? এম-এ টেনে এনে দেব?" বাস্তবিক তখন বি-এর পাঠ্য এক হিসাবে শক্ত ছিল। ছেলেরা কিন্তু আমাকে ভালবেসে বলেছিল, "ওঁর কাছেই পড়্‌ব।"

সে বার কলেজ থেকে ৩২টী ছেলে বি-এ পরীক্ষা দিতে যায়। বিদ্যাসাগর ম'শায় বললেন, "দেখ, পরীক্ষার ফল যদি ভাল না দাঁড়ায়, তা হ'লে সার্কুলার রোড ধরে বাগবাজার হ'য়ে ষ্ট্রাণ্ড রোড দিয়ে সেই যে কর্ম্মাটারে চলে' যাব, কল্‌কাতায় আর মুখ দেখা'ব না!" দায়িত্ববোধ আমার খুবই ছিল। যা' হ'ক পরীক্ষার ফল যখন প্রকাশ হ'ল, তখন দেখা গেল ৩২ জনের মধ্যে ১৯ জন ছেলে পাশ হ'য়েছে। এর মধ্যে "A" Courseএ ২২ জন ছেলে আর "B" Courseএ ১০ জন ছেলে ছিল। তা' দেখা গেল শুধু Philosophyতে "A" Courseএর

২২ জনের মধ্যে ২১ জন পাস হয়েছে! আমার আনন্দও খুব হয়েছিল, তাঁর নজরেও পড়েছিলাম। কিন্তু তখন আমার বেতন ছিল ৮০৲ টাকা মাত্র। আমি বেতন বৃদ্ধির জন্য কথা তুলেছিলাম। বিদ্যাসাগর মশায় তাতে মুখে বলেছিলেন, "১০০৲ টাকা দিতে হবে না কি?" এখন কিন্তু সে কথা মনে হ'লে লজ্জা করে। তাঁর কাছে এ সম্বন্ধে কিছু উত্থাপন করা খুবই আমার পক্ষে অশোভনীয় হয়েছিল, কেন না মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে আমার বেতন অনবরত বেড়ে বেড়ে অচিরে ২৮৫৲ টাকা হয়েছিল।

পরের বৎসর "A" Courseএ ৬৪ জন ছাত্র পরীক্ষা দিতে যায়, তার মধ্যে Philosophyতে ৬২ জন পাস করে। পরিশ্রম করে যত্ন নিয়ে পড়ালে ছেলেরা যে পাস করতে পারে এ কথা একেবারে মিথ্যা নয়। আমাদের এখানে বাস্তবিক পক্ষে তেমন পড়ান হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্দোবস্তও সব সময়ে সব বিষয়ে ভাল বলে' মনে হয় না। টাকা জমা দেওয়া থেকে আরম্ভ করে যায় পরীক্ষার ফল বাহির হওয়া পর্য্যন্ত প্রায় ৬ মাস কেটে যায়। তাতে ছাত্রদের অনেকটা সময় হাঙ্গামা হুজুক আর উৎকণ্ঠায় কেটে যায়।

যা হ'ক এই সময় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়ম হ'ল, ছেলেরা বি-এ পরীক্ষায় Honoursএ পরীক্ষা দিতে পারবে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে আমাদের কলেজ থেকে একটী ছেলে (নাম তার যোগেন্দ্র কুমার সিংহ) বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞানে প্রথম স্থান অধিকার করে। আর সেই একটী মাত্র ছাত্রই সে বিষয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। আমার তাতে খুব উৎসাহ বেড়ে গেল। কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন "গফ" সাহেব—১৫০০৲ দেড় হাজার টাকা তাঁর বেতন। তিনি নিজের কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ইস্তাহার দিলেন যে তাঁর দেওয়া মনোবিজ্ঞানের "নোট" আর বাহিরে যেতে পাবে না। সকলে যেন সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকে। যেন ব্যাপারটা এই হচ্ছে এক বে-সরকারী কলেজ যখন প্রথম হ'ল তখন তাঁর Note নিশ্চয়ই Out হয়েছে। কেন না তাঁর Noteএর উপর নির্ভর না করে' [illegible] স্থান অধিকার করতে পারে না।

এই সময় Students Associationএর আনন্দমোহন বসু মহাশয় সিটি কলেজ খুলতে মনস্থ করেন। সুরেন্দ্রবাবু সেখানে ১ ঘণ্টা করে পড়াবেন বন্দোবস্ত হয়। বেতন পাবেন মাসিক ১০০৲ টাকা। বিদ্যাসাগর ম'শায় কিন্তু এ কথা শুনে তাঁর কলেজের অধ্যক্ষ বৈদ্যনাথবাবুকে বলে' দিলেন, "সুরেনকে বলো সিটি কলেজে সে পড়াতে পারবে না; আমি তাকে ৩০০৲ টাকা করে দেব। আর তা যদি না হয় আমার এখানে কাল থেকেই আসা বন্ধ করতে বল।" তাঁর নিজের শক্তি, ক্ষমতা ও কৃতিত্বের উপর এই রকমই বিশ্বাস ছিল। সুরেনবাবু কিন্তু এ কথা শুনে একটু আম্‌তা আম্‌তা করে বলেছিলেন, "তিনি এ কথা বল্‌লেন, তাই ত—কিন্তু আনন্দমোহনের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব আছে—তাকে কথা দিইছি—তাই ত।"

সুরেনবাবু চ'লে যাবার পর আমরা কিন্তু বড়ই মন-মরা হ'য়ে গেলাম। ছেলেরা ত যেন মরে রইল। তাঁর জায়গায় এলেন সূর্য্যকুমার আচার্য্য মশায়—তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিভুক্ ছিলেন, মনোবিজ্ঞান তিনি পড়াতে লাগ্‌লেন। আমাদের সকলেরই কিন্তু তাঁকে ভাল লাগ্‌ত না, ছেলেদের ত কথাই নাই। বিদ্যাসাগর মশায় কিন্তু বল্‌লেন, "এই কলেজে সুরেন্দ্র কতটুকু represent করে? সে যা পড়াত তাতে হিসাব ক'রে দেখ্‌লে, যে কটা paper হয় একজামিনের জন্যে তাতে সে মাত্র $\frac{1}{10}$th represent করে। তা এতে করে যদি সুরেন্দ্র না হ'লে কলেজ না চলে, তা' হ'লে বল্‌তে হবে আমি কেউ নই, আমি তা' হলে মরে গেছি! ছেলেদের বলে দাও সুরেন না থাক্‌লে যারা এ কলেজে থাক্‌তে না চায় আমি তাদের সকলকে Certificate দেব।" এমনিই তাঁর নিজের উপর বিশ্বাস ছিল।

তখন বড়লাট রিপণ সাহেবের আমল। দেশ স্বায়ত্ত-শাসনের হুজুগে খুব মেতে গেছে। সহর আলোতে-বাজিতে জমজমাট হ'য়ে উঠ্‌ল'। সুরেনবাবু তাঁর নামে তখন রিপণ কলেজ খুলে দিলেন। বিদ্যাসাগর মশায় এ কথা শুনে বলেছিলেন, "সুরেনকে জিজ্ঞাসা কর, আনন্দমোহনের প্রতি Sentiment এখন কোথায় গেল?"

একবার মেমারি ষ্টেশনে নেমে ৪ ক্রোশ দূরে এক জায়গায় যাবার দরকার হয়। [illegible]

শুন্‌লেন তারা ৮৲ টাকা চায়। তিনি এক জন মুটে সঙ্গে নিয়ে সমস্ত রাস্তা হেঁটে সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে এক জন নৈয়ায়িক ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বিদ্যাসাগর মশায়ের আসার কথা শুনে তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে এসে ছিলেন। বিদ্যাসাগর মশায় কিন্তু "আমি তর্ক টর্ক করতে জানি না বাপু" বলে' ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বড় আশায় নিরাশ করেছিলেন। সেখানে একটী ব্রাহ্মণের ছেলে ঘর পুড়ে যাওয়াতে তাঁর কাছে এসে দুঃখ জানায়। সে কতদূর পড়েছে, তার কে আছেন ইত্যাদি সব খবর নিয়ে তাকে কলকাতায় নিয়ে এসে সংস্কৃতের টাইটেল পরীক্ষা দেওয়ান ; পরে স্কুলে তাকে একটী ৩০৲ টাকার কাজ করে দেন।

চন্দননগরে একবার তিনি পথে দেখ্‌তে পান একটী পাগল ছেলে কেবল হাস্‌ছে। আর রাস্তার যত সব লোক তাকে নিয়ে খুব হাস্‌ছে। বিদ্যাসাগর মশায় কিন্তু ছেলেটীর অবস্থা দেখে নিজেকে সংবরণ করতে পার্‌লেন না। তাঁর চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল, বুক ভেসে গেল। উপস্থিত লোকেরা এই দেখে রং-তামাসা বন্ধ করে' সব স্তম্ভিত হয়ে গেল! লোকের দুঃখে তাঁর প্রাণ এমনি করে' চিরকালই কাঁদ্‌ত। তিনি সেই ছেলেটাকে কলকাতায় নিজের বাড়ীতে এনে বিধি-মতে চিকিৎসা করিয়েছিলেন।

একবার চন্দননগর থেকে আস্‌বার সময় আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। হাওড়া ষ্টেশনে নেমে দেখলাম খুব ভিড় হয়েছে! বাদুড়বাগানে আস্‌বার জন্ত এক খানা গাড়ী ভাড়া করতে গেলাম—তা ১৷৹ টাকা ভাড়া চাইলে। বিদ্যাসাগর মশায় কিন্তু অযথা খরচ করতে বড়ই নারাজ ছিলেন, এ ত সকলেরই জানা আছে। যা হ'ক লোকের ভিড়ের মধ্যেই গাড়ীর জন্ত দর কসাকসি হচ্ছে এমন সময় তাঁকে আর দেখ্‌তে পেলাম না। ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে তিনি হারিয়ে গেলেন খুঁজে পেলাম না। অনেক খুঁজলাম, "বিদ্যাসাগর মশায়" বলে চীৎকার করে' ত সেই ভিড়ের মধ্যে তাঁকে ডাকতে পারি না। তাঁকে খুঁজে না পেয়ে আমি অগত্যা একা বাদুড়বাগানে চলে এলাম। এসে দেখি বিদ্যাসাগর মশাই সেখানে হাজির [illegible]। তিনি আমায় বল্লেন—"তুমি যে আগেই তা আমি জান্‌তাম। কি জান—যখন ১৷৹ টাকা ভাড়া চাইতে লাগল তখন তোমাকে কিছু না বলে, আমি আস্তে আস্তে সরে পড়লুম। পুলটা পার হয়ে এসে ছয় আনা পয়সা দিয়ে এক খানা গাড়ী ভাড়া করে' বাদুড় বাগানে চলে' এলুম।"

এক দিন দেখি সার্‌কুলার রোড দিয়ে তিনি আস্‌ছেন, চাদরটী উঁচু হয়ে আছে।—আমাকে বল্‌লেন—"এই শেয়ালদার ও দিকে গিয়েছিলুম, তা সেখানে কপি সস্তায় পেলুম, নিয়ে যাচ্ছি—গেরস্থালি ত করতে হয়। ওখানে (বাদুড়বাগানে) এগুলো ১৲ টাকা কি বারো আনা দাম হবে ; কত'য় এনেছি জানো?—চার আনায়।"

আমার একবার পেটের ব্যায়রাম হয়েছিল। ব্রজেন বাঁড়ুয্যে, প্রতাপ মজুমদারদের ওষুধও ঠিক লাগ্‌ছিল না। বিদ্যাসাগর মশাই আমাকে দেখ্‌তে এসে বল্‌লেন— "থাকবে?—না যাবে?" (বেঁচে থাক্‌তে চাও, না মর্‌তে চাও?) আমি একটু হাস্‌লাম। তিনি বই খুঁজে খুঁজে আমাকে ওষুধ দিলেন। ২।৩ বার খেয়েই সুস্থ হলাম। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার চর্চ্চা তিনি বিশেষ রকমেই করেছিলেন। মহেন্দ্র ডাক্তারকে (মহেন্দ্রলাল সরকার) ত তিনিই এক রকম হোমিওপ্যাথিতে হাতে খড়ি দেন। লালবিহারী মিত্রের (দে?) এক সময়ে লিভার এব্‌সেস্ হয়। মহেন্দ্র ডাক্তার দেখে শুনে ওষুধ দিয়ে গেলেন। তার পর বিদ্যাসাগর মশাই এসে রোগীকে দেখে সে ওষুধ আর দিতে দিলেন না। তিনি নিজে দেখে শুনে ওষুধ খাইয়ে তাঁর দুরারোগ্য রোগ সারিয়ে-ছিলেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় দেড় হাজার-দু হাজার টাকার বই সংগ্রহ করেছিলেন। বড় বড় ওষুধের বাক্‌সো তাঁর ছিল।

আমাকে এক সময়ে তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিখ্‌তে পরামর্শ দেন। আমার জন্ত বই আর ওষুধে দেড়শ' টাকার এক ফর্দ্দ করেন। আমার সেটা বড় বিরক্তি-কর বোধ হচ্ছিল। এক রকম করে' সংসার চালাই, তাতে আমার মিছি মিছি দেড়শ' টাকা খরচ মোটেই ভাল লাগ্‌ছিল না। তিনি যেন আমার মনের ভাব বুঝে বল্‌লেন—"টাকার জন্যে ভাব্‌ছিস? আচ্ছা, তুই টাকা নিয়ে যা। দশ টাকা করে' কিস্তিতে শোধ দিস।" তাঁর মুখের

উপর ত আর কথা বল্‌তে পার্‌লুম না। কিন্তু তিনি দেড় শ' টাকা দেনা ঘাড়ে চাপালেন—এটা তখন বড়ই অপ্রীতিকর হয়েছিল। এখন কিন্তু মনে হয়—কি উপকারই তিনি করে' গিয়েছিলেন! এলোপ্যাথিক ডাক্তারখানায় আমার বাড়ীর জন্য এখন বছরে যদি ২০৲ টাকার বিল হয় ত খুব বেশী। আমি হোমিওপ্যাথিকেই বাড়ীর ছোট খাটো রোগ সারাই। আমার ছেলে হিরণ যার বয়স ২৫।২৬ হবে, এই গত বছরে মাত্র প্রথম এলোপ্যাথিক ওষুধ খায়।

চিকিৎসা-বিষয়ে লোককে তিনি সাহায্য ত কর্‌তেনই, আবার দুঃস্থ লোকদের সাহায্য করবার জন্যে মাসে মাসে দেড় হাজার টাকা গুণে দিতেন।

কর্মাটাঁরে আমরা সাত আট ঘর বাঙ্গালী ছিলাম। তা আমরা সেখানে মাছ খেতে পেতাম না। বিদ্যাসাগর মশাইও এক সময়ে মাছ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন—এমন কি দুধ, সন্দেশ, ঘিএর জিনিসও খেতেন না, কেন না দুধটা বাছুরকে বঞ্চিত করে' নেওয়া হয় বলে'। তিনি মুড়ি, নারকেল, গুড় এই সব খেতেন। যা হ'ক, কর্মাটাঁরে আমরা যখন তাঁকে বল্লুম—আমরা মাছ খেতে পাই না, তখন তিনি সেখানে খোঁজ নিলেন, নিয়ে শুনলেন যে, বাবুরা দাম দেয় না বলে' এ-দিকে জেলেরা মাছ বেচে না। তখন থেকে তিনি নিজে মাছ কিনে নিয়ে ভাগ করে' বাড়ী বাড়ী পাঠাতেন। এই ব্যবস্থাটা এমন নিয়মমত হয়ে গিয়েছিল যে, বাড়ীর ছেলেরা সকাল সকাল ভাত খাবার জন্যে বায়না নিলে তাদের বলা হ'ত—ঈশ্বরে জেলে এখনো মাছ দিয়ে যায় নি, ভাত দোব কি? সেখানে পুজোর সময় সাঁওতালদের ৩।৪শ টাকার কাপড় কিনে দিতেন, বাঙ্গালীদের ত প্রত্যেকের জন্যেই কাপড় দিতেন। কলকাতায় এসে নিজে এ সব কিন্‌তেন। পূজার সময় এক দিন এক দোকানে কাপড় কিন্‌তে এসে বসে তামাক খাচ্ছিলেন, এমন সময় রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সেখান দিয়ে গাড়ী করে' যাচ্ছিলেন। বিদ্যাসাগরকে দেখতে পেয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'য়ে যতীন্দ্রমোহন বল্‌লেন—"আপনাকে আমরা এত সম্মান করি, আর আপনার এই রকম খোলার ঘরে বসে তামাক খাওয়া যেন কি রকম কি রকম ঠেকে।" বিদ্যাসাগর মশাই বল্‌লেন—"দেখ, ওদের নিয়েই আমাদের ঘরকন্না, ওদের কাছে তেল-নুন কিন্‌তে আস্‌তে হয়, কাপড় কিন্‌তে আস্‌তে হয়, রাজা-মহারাজাদের নিয়ে ত আর আমাদের ঘরকন্না নয়। তা যদি বল ত না হয় তোমার ওখানে আর যাব না। তোমাদের ছাড়্‌তে পারি কিন্তু ওদের ছাড়্‌তে পারি না!"

বাড়ীর চাকর-বাকরদের প্রতিও তাঁর আলাদা ব্যবহার ছিল না। তাদের জন্যে চাল কখন আলাদা কিন্‌তেন না, সবাই যা খেত তারাও তাই খেত। এক চাকরের একবার বসন্ত হয়েছিল, তিনি নিজে তার সেবা-শুশ্রূষা করেছিলেন। তাঁর ঐ বাড়ী এখন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, দেখ্‌লে কষ্ট হয়। ওটা তীর্থস্থান হওয়া উচিত ছিল। আমাদের দেশের কিন্তু কি দুর্ভাগ্য!

তখন কলেরা চিকিৎসার Cold packingএর ব্যবস্থা ছিল। তিনিও এ ব্যবস্থা গ্রহণ কর্‌তেন। একবার কিন্তু তাতে বিফল হওয়ায় তিনি এ ব্যবস্থা ত্যাগ করেন।

একবার বর্দ্ধমানে ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রকোপ হয়। উলো, দ্বারবাসিনী প্রভৃতি গ্রাম একেবারে উজাড় হয়ে যাবার মত হয়। বিদ্যাসাগর ম'শাই সেখানে গিয়ে ছ' মাস থেকে চিকিৎসা করেন। গভর্ণমেণ্ট হাঁসপাতালে কেউ বড় যেত না, কেন না এঁর কাছে লোক টাট্‌কা ওষুধ পেত আর রোগীর প্রতি ডাক্তারের যে যত্ন সেটা খুবই পেত। কথাটা হচ্ছে এই যে, হাঁসপাতালগুলো হয়েছে নামকে-আস্তে, কামকে-আস্তে নয়।

তিনি লোকের বিপদে-আপদে সর্ব্বদাই সাহায্য কর্‌তেন বটে, কিন্তু লোকের কাছ থেকে পেতেন অকৃতজ্ঞতা। অবশ্য সব ক্ষেত্রে যে তাই, তা নয়। কিন্তু তা এত বেশি যে তিনি এই জন্যে মনে আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি বল্‌তেন যে আমাদের দেশের লোককে দুটো বিশেষণ দেওয়া যেতে পারে—গরুজে আর বেহায়া।

একবার তিনি শুন্‌লেন যে, সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বলেন যে,—"বিদ্যাসাগর মশাই না থাকলে আমি ডাক্তার হতে পারতুম না।" তিনি তাতে আশ্চর্য্য হয়ে বলেছিলেন,—"আমি আশা করি নি যে, সে এ কথা বল্‌বে।" তাঁকে যদি বলা হ'ত—অমুক লোক তাঁর নিন্দে কর্‌ছে তা হলে তিনি বল্‌তেন—"কই আমি ত কখনো তার উপকার করিনি যে, সে আমার নিন্দে করবে।"

দেশে লোকের অকৃতজ্ঞতা পেয়ে পেয়ে তাদের প্রতি তাঁর এমনি বিতৃষ্ণা জন্মেছিল।

তিনি দান কর্‌তে কাতর হ'তেন না বটে, কিন্তু অপাত্রে দান পছন্দ কর্‌তেন না।

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর খুব যোগ ছিল। অক্ষয় দত্ত যখন তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক ছিলেন, তখন এই পত্রিকার সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল। পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় চলে আসেন। তিনি যে কেবল পণ্ডিতী ভাষা লিখেছেন তা নয়, কথ্য ভাষায়ও তিনি লিখে গেছেন। "কস্যচিৎ ভাইপোস্য" নামক বই খানি তার নিদর্শন। "প্রভাবতী-সম্ভাষণ" তাঁর আর একটী বই, তার ভাষা অন্য ধাঁজের; এটী রাজকৃষ্ণ বাবুর মেয়ে প্রভাবতীর মৃত্যু উপলক্ষ্যে লেখা, তাকে তিনি খুব স্নেহ কর্‌তেন। সহজ সরল বাঙ্‌লাও তিনি লিখে গিয়েছেন—ছেলেদের বই—প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা তার উদাহরণ।

তাঁর ধর্ম্মজীবন-সম্বন্ধে এই বলা-যায় যে, তাঁর ধর্ম্মজীবন কর্ম্মগত ছিল। কাজই তাঁর কাছে ধর্ম্ম। তিনি একেশ্বর-বাদী ছিলেন, বোধোদয়ে আমরা তার নিদর্শন পাই। কিন্তু তিনি প্রথম বই লেখেন—"বাসুদেব-চরিত।" প্রতিমা-পূজা তিনি লৌকিকভাবেই দেখতেন। কেন না বাড়ীতে ত কোন পূজা হ'তে দেখি নি। মোটের উপর মনে হয় তিনি Agnostic (সংশয়-বাদী) ছিলেন। তিনি বল্‌তেনও—"যেটা পার্‌বি সেইটে কর্।" লোক-সেবাই তাঁর ধর্ম্ম ছিল। তাঁর নীতি ছিল লোককে না ঠকানো। তিনি বল্‌তেন—"দুনিয়ার মালিক যদি অনন্ত-দয়ালু হ'ত ত এত কষ্ট সংসারে থাক্‌ত? লোকে এত কষ্ট পাচ্ছে, যন্ত্রণা পাচ্ছে,—দয়াময় হরি আছেন, আর ভাবনা কি?" আবার তাঁকে এও বল্‌তে শুনেছি—"যীশুখৃষ্টের ধর্ম্ম ভিন্ন-জায়গায় গিয়ে পড়েছে, ওটা আমাদের ধাতে ঠিক মিশ খেতো। ইউরোপে গিয়ে পড়ে, এক রকম অপাত্রে পড়েছে।"

এক সম্প্রদায়ের উপাসনা দেখে এসে তিনি বলে-ছিলেন—"তারা বল্‌ছে শুনলুম আমরা—মুশারও পায়ের ধূলো নিচ্ছি, ঈশারও পায়ের ধূলো নিচ্ছি, শ্রীচৈতন্যেরও পায়ের ধূলো নিচ্ছি;—আরে বাপু, ঈশা মূশা শ্রীচৈতন্য মরে' ত ভূত হয়ে গিয়েছে—পায়ের ধূলো কি রে বাবা?" আর এক সময় তিনি বলে ছিলেন—"বয়স ঢের হয়েছে, ঈশ্বরবিশ্বাসী লোক একটা দেখি নি। সকলেই নীচের দিকে তাকায়, উপরের দিকে কেউ তাকায় না।" কেশববাবু বলেন যে, তাঁতে ভক্তির দিক্‌টা কম ছিল।

অনেক দিন এমন কেটেছে যে বিকেল থেকে ঠায় ধরে বসে গল্পগুজব হ'তে হ'তে রাত হ'য়ে গেছে, সেই খানেই খাবার টাবার এল, সকলের সঙ্গে তিনিও খেলেন, সন্ধ্যা-আহ্নিক কর্‌তে ত দেখি নি।

শেষ জীবনে গার্হস্থ্য-ব্যাপারে মতের অমিল হওয়ায় স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে দূরে থাক্‌তেন। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুকালীন অসুখের সময় যথেষ্ট শুশ্রূষা করেন ও তাঁর মৃত্যুতে মুষ্‌ড়ে পড়েছিলেন। স্ত্রীর চতুর্থী শ্রাদ্ধের দিন আমরা গিয়ে তাঁর চেহারা দেখে বুঝ্‌লাম যে, তাঁর মনে বেশ আঘাত লেগেছে। খেতে বসে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল যে, কি রকম লাগ্‌ছে, তিনি বল্‌লেন—"রকম আর কি, ছাই ছাই লাগ্‌ছে। দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণে "কান্না যাবে, অন্ন খাবে অনায়াসে।"

তিনি বল্‌তেন—"ইংরেজের সভ্যতা আমাদের দেশে তিনটী খারাপ জিনিস এনেছে—সওদাগর, এটর্ণি আর পাদ্রী।"

এক সময়ে কোন মকদ্দমার সাক্ষী হিসাবে তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। তাঁর কাছ থেকে কথা আদায় কর্‌তে হ'লে তাঁকে চটিয়ে দিলেই ঠিক হ'বে—এই মতলবে জেরার সময় ব্যারিষ্টার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—"আপনাকে চেনে কে?" তাতে তিনি বলেন,—"উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, দক্ষিণে কুমারিকা, পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ এবং পশ্চিমে বিন্ধ্যপর্ব্বত ইহার অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থানের যাবতীয় ব্যক্তি আমাকে চেনে। ভারতবর্ষে এমন কোন রাজা-মহারাজা নেই যার মাথায় আমার এই চটি-জুতো না বসাতে পারি।" এমনি তাঁর আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান ছিল।

তাঁর পোষাকের মধ্যে ছিল দড়ি-বাঁধা জামা—বেনিয়ান্। তাঁর পোষাকি আর আটপৌরে বলে' আলাদা কিছু দেখি নি—সেই মোটা চাদর আর চটি।

"যৌবন-ভিক্ষা"

[শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বি-এ]

পুরু। কহ দেব! কি লাগিয়া করিয়াছ দাসেরে স্মরণ?
কোন্ আজ্ঞাক্রমে তাত! অজ্ঞ পুত্র আপন মনন
করি' লবে নিয়ন্ত্রিত?

যযাতি। লহ মোর আশীর্ব্বাদ! দূরে কেন?—এস মোর পাশে,
দৃষ্টিহীন, শক্তিহারা, অথর্ব্ব এ জরা-কাল-গ্রাসে,—
মুনিশাপে ক্ষিন্ন দেহ। এসো তোমা করি পরশন,
লভি তৃপ্তি, শান্তি পা'ক আজি এই উদ্বেলিত মন!
ভাবে পিতা, আত্মা মোর পুত্রমাঝে লভিয়া আশ্রয়
ঘোষে শুধু অহর্নিশ স্বপ্ত মহামানব-বিজয়!
তাই তোমা হেরি' সুখী। কিন্তু রসে প্রবঞ্চিত আমি,—
অশ্রুভারে, মনস্তাপে, দীর্ঘশ্বাসে জাগি' ব্যথা-যামী,
নিলয় রচেছি মনে।—বিশ্বে আজি গৃহ মোর নহে,
মুক্ত নীলাকাশতলে বায়ু কোনো বার্ত্তা নাহি কহে—
আমি যেথা বাস করি, সেথা আলো পশেনি চঞ্চল,—
গান নাহি, হাসি স্তব্ধ, শুষ্ক তৃণ-মঞ্জরীর দল;—
বিথারিছে মৃত্যুব্যথা ক্রন্দনের বন্দনা গাথায়,
পঙ্গু আমি কর্ম্মস্রোতে, আলোধর্ম্মী আঁধার সভায়!
দূর দূরান্তরে ভাসে, ব্যর্থগান যত হাহারব—
প্রতিহত মনঃকক্ষে ঘুরি' ফিরে সান্ত্বনা-গরব?
আশা মোর মিটে নাই, ভোগতৃষ্ণা তুলিছে কল্লোল,
মিটে নাই কোনো' সাধ, বসন্তের উন্মাদ হিল্লোল
কাঁপায়ে তুলিছে প্রাণ। আমি রহি জাগি' নিশিদিন
অতৃপ্ত প্রেতাত্মা সম, বক্ষভারে সান্ত্বনাবিহীন—
দূর হ'তে দূরান্তরে, ঝঞ্ঝাভারে বেদনা-পিয়াস
মিটাইতে গগন-সীমায়!

পুরু। অধম সন্তান তব, হায় পিতঃ! হেরে নিশিদিন
অভিশপ্ত অসহায় বেদনার জ্বালা ভাষাহীন
দেবতার মৌন আর্ত্তনাদ!

যযাতি। আর্ত্তনাদ?—হয় নাই পৃথিবীতে আজো কোন' ভাষা,
কভু সৃষ্টি এর লাগি, দেখেছ কি অব্যক্ত হতাশা,
বালু মাঝে রচে পান্থ, তৃষ্ণাতুর ব্যাকুল অন্তর,—
খোঁজে বারি—বারিকণা, জোড়হস্তে যাচে আর্ত্ত-স্বর,
জল—জল। তার পর? ক্ষীণপ্রাণ ঠোঁটে অসহায়—

মরুদাহে দীর্ঘশ্বাস, অট্টহাসে বাতাসে হারায়
মৌন অস্তরবি শুধু। সীমারুদ্ধ কামনা-চঞ্চল,—
শরীরের ভগ্নস্তূপে রচে তৃষা যজ্ঞ-হোমানল!
তার লাগি ভাষা আছে। অতৃপ্ত এ মানস-কামনা,
দেহ সনে যুক্ত নহে; চিতাভস্মে এই ব্যথা-কণা
জেগে রহে যুগে যুগে। কি কুহকে অধীর যৌবনে—
আপনারে ভাবে নিতি, বিকলাঙ্গ আকুলিত মনে!

পুরু। চির রীতি তবু এই! বসন্তের কামনা-চঞ্চল,
না লভে নির্ব্বাণ কভু, সুগঠিত শরীর-শৃঙ্খল,
ভেঙ্গে পড়ে নিত্য ক্রমে। মানবের যৌবন-বন্ধন,—
পুত্র হ'তে পৌত্রে ক্রমে। বংশধরে করিছে সৃজন!
তাই দিয়ে ভুঞ্জে ভোগ, তাই তার যৌবন অশেষ,
যুগে যুগে ধরণীর বক্ষজোড়া কামনা-বিশেষ
নিজ মধ্যে টানি' লহে; এই তার গৌরব-অক্ষয়--
গ্রহে গ্রহে ঘোষে নিতি, মানবের অনন্ত বিজয়!

যযাতি। সত্য পুত্র, সত্য মানি মানবের ভোগের বন্ধন—
যুগধারা রক্ষি' চলে। আকাঙ্ক্ষার উন্মাদ-ক্রন্দন
নিঃশেষিয়া নাহি মেটে। করেছ কি কভু দরশন
নবীন বৃক্ষের শাখা করি' দিলে নিদয়ে ছেদন,
পার্শ্বদেশে জন্মে পুনঃ। বৃদ্ধ বৃক্ষে নহে সেই রীতি—
ক্রমে ক্রমে ক্ষয়ে' আসে, মুঞ্জরিত দৃপ্ত বনবীথি!
জীবন-সন্ধ্যায় শেষে! যৌবনে আমার জরারাশি —
বেঁধেছে অশেষ জালে; মরে নাই দৃপ্ত, শোভা, হাসি—
মিটে নাই প্রেমতৃষ্ণা, কামনার অযুত বিলাপ,
ঢেকে' শুধু রেখে দেছে, মায়াজালে, লক্ষ অভিশাপ!

পুরু বুঝিলাম সত্য এবে, কিন্তু পিতঃ নিয়তি-বন্ধন—
জগতের কেহ আজো পারে নাই করিতে ছেদন;
তারপর তৃষ্ণা, ব্যথা, কামনার লালসা-সম্ভার
পিষ্ট হয়ে ক্রমে ক্রমে রুদ্ধ করে' দিবে আপনার
গরল-দহন-স্রোতঃ।

যযাতি মিথ্যা পুত্র! মিটিবে না ভোগ বিনা তৃষ্ণার বেদন—
যদি তাহা বল পুনঃ—বোঝ নাই মানব সৃজন
কেমনে সম্ভব আজ।—সুখের বাসনে দেহ-পথে
রক্তের মিলনে জাত। করেছে কি কেহ কোনমতে
পুত্র লাগি' পুত্র লাভ? ঘুচাইতে ব্যথা-হাহাকার—
নারীর যৌবনরূপে, পশু ধর্ম্মে দেছে আপনার
সৃষ্টির শক্তিরে বলি। ভেবেছে কি কেহ কোন দিন

স্রষ্টা আমি— গর্ব্ব মোর মানব-গৌরব জ্ঞানহীন ;—
পুত্র লভে অনিচ্ছায়। যৌবনের রভসে আকুল—
চঞ্চলি' যে রক্তকণা, তার মাঝে জাগে কি বিপুল
বৈরাগ্য-যোগের ধারা ? বল পুত্র, সে রক্ত-ভাণ্ডারী
পারে কি যৌবন-যজ্ঞে অর্পিবারে নির্ব্বাণের বারি
চাপি তীব্র হলাহল ? তাই পুত্র আদিম জগতে—
প্রথম দম্পতি-যজ্ঞে, আলিঙ্গনে, আকর্ষণ-রথে
নামিয়াছে মানবের অতৃপ্তি, লালসা।

পুরু। ক্রমে জ্ঞান হ'ল পিতঃ! কিন্তু হায়, কেমনে বিলীন
হবে তব তৃপ্তি-তৃষা ? স্পষ্ট বল, পারে কি এ দীন,
আত্মার অর্পণ করি' মিটাইতে পিতার তিয়াস
কোন' ক্রমে এতটুকু ?

যযাতি। পার বৎস, পার বৎস! যদি শুধু দাও হাস্যমুখে,
তোমার যৌবন-অংশ, তৃপ্তিযজ্ঞে পূর্ণাহুতি সুখে
ভিক্ষুক পিতার লাগি'। বল পুত্র, দিবে সে আমায় ?
সবাই ফিরায় মুখ, হাসি উঠে' অযুত গাথায়—
প্রলাপ মনন করি'; কে বুঝিবে আমার বেদন,
হাহাকারে লুটে' পড়ে, দাও; দাও! তোমার যৌবন
লুটে' নিই, শুষে নিই, ধ্বংস করি লালসা-তাণ্ডবে
আত্মার অতৃপ্ত সাধ। মায়াস্বপ্ন ডাকে কলরবে,
"ভোগ কর—ভোগ কর! তৃপ্ত কর জন্মান্তর-ক্ষুধা,"
পাখী বলে, বায়ু কহে, নদী গাহে, "পূরে' নাও সুধা
সমস্ত পরাণ ভরি' "—সব কথা কলকলে ছাপি'
জেগে ওঠে—তৃপ্তি চাই, ভোগ চাই শুধু, কাঁপি কাঁপি!—
দাও, দাও, পুত্র! দাও, যৌবন জাগ্রত আজ দ্বারে,—
যদি বা ফিরাও মুখ, তৃষ্ণা সম এসে বারে বারে,
প্রত্যেক প্রাণীর বুকে, জ্বালাতাপে লভিবে নির্ব্বাণ ;—
কাঙাল করিবে ধরা! পিতা পুত্র গাবে এক গান,—
তৃপ্তি চাই—ভোগ চাই! কিবা স্নেহ—কোথা দয়ামায়া ?—
গা'বে বায়ু—গা'বে নদী—গা'বে পাখী, চাই শুধু কায়া!
বুদ্ধি যাবে, শান্তি যাবে—বল পুত্র, বল একবার—
দিবে কি না, কিংবা লবে, জন্মে জন্মে পাপের সম্ভার
নিষ্কলঙ্ক মাথে তব ? বল পুত্র। দাও একবার—
শুধু দিন কত তরে, অনাবৃত যৌবন তোমার,
আমাতে লভুক্ প্রাণ!

পুরু। সকল বিশ্বের ক্লান্তি, গ্লানি-তাপে তোমার পিয়াস—
আমার যৌবন-বিশ্বে, তৃপ্তি ধারে লভুক্ বিকাশ!

সভ্যতার সূচনায়

প্রাচ্যে ধর্ম্ম-প্রণালী ও উপাসনা-পদ্ধতি

[অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম-এ]

১

এখন হইতে প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে সভ্যতার আলোক বোধ হয় আফ্রিকার কিয়দংশে ও এশিয়া মহাপ্রদেশের অর্দ্ধাংশেই সীমাবদ্ধ ছিল; এই সময়ে বা ইহার পূর্ব্বে পৃথিবীর আর কোন স্থান সভ্যতালোক পায় নাই। মিশর বা ইজিপ্ট, * চীন ও ভারতবর্ষ মাত্র এই তিনটী দেশে তিনটী বিভিন্ন জাতি তখন সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই তিনটী জাতির মধ্যে কোন্‌টী সমধিক পুরাতন তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে; আর এ বিষয়ে যখন আমরা নিশ্চিতরূপে কিছু জানি না তখন এ সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। (ডাঃ অবিনাশচন্দ্র দাস মহাশয়ের মতে বৈদিক সভ্যতা সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। খৃষ্টের ২৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে ইহার সূচনা।) আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন রোমের জন্মই হয় নাই, গ্রীস তখন তমসাচ্ছন্ন এবং হয় তো ক্রীট্, আসিরিয়া ও হিব্রুদের প্যালেষ্টাইন তখনও নিদ্রোত্থিত হয় নাই। (অবশ্য এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মধ্যে মতের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এ সময়কার ধারাবাহিক পৌর্ব্বাপর্য্য বা Chronology সম্বন্ধে যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা *Cambridge Ancient History* Vol. I এর অন্তর্গত Chronology নামক চতুর্থ পরিচ্ছেদটী পড়িতে পারেন ও প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার ব্যাবিলোনিয়ার সুমের জাতি-সম্পর্কীয় ইতিহাস দশম অধ্যায়ে পাঠ করিতে পারেন।) হয় তো ইরাণীয়গণ ও ভারতীয় আর্য্যগণ তখনও একেবারে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হন নাই; হয় তো, আর্য্য বলিতে যাঁহাদের আমরা বুঝি, তখনও তাঁহারা পরস্পর সম্বন্ধ একেবারে ত্যাগ করেন নাই। তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটীস নদীদ্বয়ের মধ্যস্থিত মিতান্নি * আর্য্যগণ তখন তাঁহাদের ভারতীয় আর্য্য-ভ্রাতৃগণের সহিত কিরূপভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন; ইরাণীয় আর্য্যগণ তখনও অসুর † নামে পরিচিত হইয়াছিলেন কি না; 'অসুর' শব্দটী তখনও ভারতীয় আর্য্যগণ মর্য্যাদা ও শক্তিসূচক অর্থে ব্যবহার করিতেন কি না; (ঋগ্বেদের বহু স্থলে 'অসুর' শব্দটী অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাগণের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে।) ভৃগু,

* Egyptএর প্রাচীন অধিবাসিগণ নিজেদের দেশকে Kem ও Nile নদীকে Hapi বলিত। Kem শব্দটী সংস্কৃত কুমুৎ বা কৃষ্ণ মৃত্তিকা ও Hapi শব্দটী সংস্কৃত অপ্ বা জল এবং গ্রীকগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত Aigyptos শব্দটী আগুপ্ত ও Nilos শব্দটী নীল শব্দের অপভ্রংশ কি না তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। পক্ষান্তরে Egyptএর আরব নাম মিসর সংস্কৃত মিশ্র শব্দের অপভ্রংশ কি না তাহাও এখনও স্থির হয় নাই। প্রাচীন Egyptএর উপর ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব সম্বন্ধে ডাঃ অবিনাশচন্দ্র দাস যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। তৎপ্রণীত *Rigvedic India* ১৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

* মিতান্নি (Mitanni)—মিত্র বা সূর্য্যের উপাসক এক শ্রেণীর আর্য্যজাতি। ইঁহাদের দশরথ (Dushrutta or Tushrutta) নামক একজন রাজা Egyptএর তৃতীয় Amenhotep (1411—1375 B. C.) ও Ikhnaton (1375—1358 B. C.) এর সমসাময়িক ছিলেন। সুপণ্ডিত Havellএর মতে (*Aryan Rule in India* p.p. 4—5 দ্রষ্টব্য) মতে, খৃঃ পূঃ প্রায় ২০০০ বৎসর আগে মিতানীয় আর্য্যগণ ভারতীয় আর্য্যগণকে পঞ্চনদ তীরে উপনিবেশ স্থাপন করিতে সহায়তা করিয়াছিলেন এরূপ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নহে। *Cambridge Ancient History* (Vol. 1 p.p. 311—312) পাঠেও জানা যায় যে ইন্দ্র, মিত্র বরুণ ও নাসত্যদ্বয়ের উপাসক মিতান্নি আর্য্যগণের অভ্যুদয় খৃঃ পূঃ ২০০০ এর কাছাকাছি। *Cambridge History of India* Vol 1 p. 320 ও দ্রষ্টব্য।

† Rev. K. M. Banerjee লিখিত *Arian Witness* নামক অধুনা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থে অসুর জাতির নামকরণ সম্বন্ধে অনেক গবেষণার কথা আছে। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "অসুর জাতি" (মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩) নামক একটী প্রবন্ধে অনেক শিক্ষণীয় কথা বলিয়াছেন।

অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋগ্বেদোক্ত আদি ঋষিগণ এ সময়ের কত পূর্ব্ববর্ত্তী, ও বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভারতীয় ঋষিগণ এ সময়ের পরবর্ত্তী কি না—কৌতূহলোদ্দীপক এই সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে প্রত্নতত্ত্ববিশারদ পণ্ডিতগণ এখনও অক্ষম। তবে, এ সময় এশিয়া মহাপ্রদেশের আর্য্য, সেমেটিক্, সুমেরিয়ান্, তুরাণিয়ান্ ও মঙ্গলয়েড্ জাতিগুলির মধ্যে যে অল্প বিস্তর আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ ছিল, তাহা তাঁহাদের পুরাণান্তর্গত প্রাচীন ঘটনাবলীর সাদৃশ্য দর্শনেই প্রতীয়মান হয়। ভারতবর্ষের মনু ও জলপ্লাবনের কথা, মিশরের Menes নামক রাজার অব্যবহিত পূর্ব্বে জলপ্লাবনের কথা, Old Testamentএ লিখিত Noah ও জলপ্লাবনের কথা এত পরস্পরের সদৃশ; ঋগ্বেদোক্ত বল, তুর্ব্বশ, দেবক, সম্বর প্রভৃতি ব্যক্তিবাচক শব্দগুলির অনুরূপ শব্দ আসিরিয়ার Cuneiform inscriptions * গুলিতে এত অধিক পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে; বৈদিক 'যাহ্ব' শব্দের সহিত হিব্রু 'yahweh' (ইংরেজী বাইবেলের Jehovah) শব্দের এত অর্থগত মিল দেখিতে পাওয়া যায় ('Jehovah' ও 'যাহ্ব' শব্দদ্বয়ের সম্বন্ধ লইয়া *Arian Witness* নামক গ্রন্থে K. M. Banerjee মহাশয় অনেক কথা বলিয়াছেন); ভারতীয়, আসিরিয় ও হিব্রু ঋষিগণ-বিবৃত সৃষ্টি-রহস্যের ব্যাখ্যার মধ্যে এত সাদৃশ্য দেখা যায়; প্রাচীন ইজিপ্সিয়ান, কস্‌সাইট্, হিটাইট্ লিডিয়ান্ প্রভৃতি জাতিগণের দেবদেবীর নামে ও প্রকৃতিতে এত মিল দেখা যায়—যে একসময়ে এই প্রাচীন জাতিগুলি যে পরস্পরের নিকট কতকটা পরিচিত ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু এরূপ আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ-নির্ণয়ের সহায়ক মধ্যস্থিত শৃঙ্খলগুলি লুপ্ত হইয়া যাওয়ায় এরূপ তুলনামূলক আলোচনা এখনও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পর্য্যবসিত করা সম্ভবপর হয় নাই (এ সম্বন্ধে ডাঃ অবিনাশচন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার *Rigvedic India* নামক গ্রন্থে যথেষ্ট আলোচনা করিয়া প্রচুর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সব সিদ্ধান্ত সকল সময় মানিয়া লওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নহে)। আবার আলোচ্য জাতিগুলির আবাসভূমিগুলির আয়তন, ভৌগোলিক সংস্থান, জল হাওয়া, শাসনপ্রণালী প্রভৃতির পার্থক্য থাকাতে তত্রত্য ধর্ম্মসংস্কার ও সামাজিক রীতিগুলি কালক্রমে এত রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল যে অতি প্রাচীনকালের সেই সাদৃশ্যগুলি অবশেষে বৈসাদৃশ্যে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। উপস্থিত প্রবন্ধে এ বিষয় আলোচনা না করিয়া আনুমানিক ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার মিশর, চীন ও ভারতের ধর্ম্মসংস্কার ও উপাসনা-পদ্ধতির যৎকিঞ্চিৎ আভাষ দিতে চেষ্টা করিব।

২

প্রথমে প্রাচীন মিশরের কথা বলিব। সুবিখ্যাত মিশরতত্ত্ববিদ্ (Egyptologist) ও ঐতিহাসিক Breasted সত্যই বলিয়াছেন, "As among all other early peoples, it was in his surroundings that the Egyptian saw his gods". বস্তুতঃ দেশের আয়তন, ভৌগোলিক গঠন ও প্রাকৃতিক অবস্থানের উপর প্রাথমিক ধর্ম্ম-পদ্ধতি, সামাজিক সংস্কার ও শাসনপ্রণালী অনেকটা নির্ভর করে। গ্রীসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও ভৌগোলিক সংস্থান, তাহার অগণিত পর্ব্বতশৃঙ্গ, প্রায় চতুর্দ্দিকে উন্মুক্ত সমুদ্রের অস্তিত্ব গ্রীক সভ্যতার প্রথম যুগে যে ধর্ম্মজগৎ রচনা করিয়াছিল, তাহার Zeus, Poseidon, Athene, Diana, Venusএর যে মূর্ত্তি আদিম গ্রীকের মানসপটে অঙ্কিত করিয়াছিল এবং উত্তরকালে তাহাদের যে রূপ অপরূপ ভাস্কর্য্যে ফুটাইয়া অমর করিয়া তুলিয়াছিল,—তাহা নীলনদতীরবাসিগণের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। আবার শুভ্র হিমাচলকিরীটিনী, বিন্ধ্যমেখলা ভারতমাতার আদিম আর্য্যসন্তানগণ উন্মুক্ত আকাশের তলে, সপ্তসিন্ধুতীরে দাঁড়াইয়া যে ধর্ম্ম-জগতের রূপ কল্পনা করিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন তাহা একনদবিধৌত, মরুমধ্যস্থিত, প্রলম্ব উপত্যকা প্রদেশের আদিম অধিবাসিগণের

---

* Cuneiform inscriptions—প্রাচীন যুগে পারস্য, ব্যাবিলোনিয়া, আসিরিয়া প্রভৃতি দেশের ইষ্টকের উপর খোদিত লেখমালা। উৎকীর্ণ অক্ষর গুলির গতি দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে। অক্ষর গুলির শীর্ষদেশ কোণবিশিষ্ট (wedge-shaped) বলিয়া cuneiform নাম হইয়াছে। এই অনুশাসনগুলির পাঠোদ্ধার কার্য্য অতি দুরূহ ছিল। কতক গুলি Bilingual অর্থাৎ উভয় ভাষায় লিখিত অনুশাসন হইতে পাঠোদ্ধার-প্রণালী আবিষ্কৃত হয়। অনুশাসনগুলি Assyriologistদের নিকট বড়ই মূল্যবান।

ধারণার অতীত ছিল। তাই বুঝি মিশরের Isis-Osiris ভারতের সাবিত্রী-সত্যবান্ (ডাঃ অবিনাশচন্দ্র দাসের মতে "Osiris and Isis are identical with Siva and Sakti" *Rigvedic India* p. 280), ব্যাবিলনের Ishtar-Tammaz ও গ্রীসের Orpheus-Eurydiceর অনুরূপ হইয়াও এতটা বিভিন্ন। সত্য বটে মিশরের পৌরাণিক ঘটনার সহিত ভারত, গ্রীস, ব্যাবিলন প্রভৃতির পৌরাণিক ঘটনার কতকটা সাদৃশ্য আছে; কিন্তু এইরূপ সাদৃশ্য সুদূর Iceland, Norwayর পুরাণেও দুর্লভ নহে। ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীন জাতির পৌরাণিক দেবতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এমন কতকগুলি সংস্কার আছে যাহা মানব-জাতির সাধারণ সম্পত্তি। আদিম যুগে একটা জলপ্লাবনের (Deluge) কল্পনা, * একটা অণ্ড হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব-কল্পনা, চন্দ্রসূর্য্যকে দেবতা বলিয়া জ্ঞানের কল্পনা, পবিত্র প্রেমের কাছে যমরাজের পরাভবের কল্পনা—বোধ হয় মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি। এইরূপ কল্পনার সৌসাদৃশ্য আলোচনা Comparative Mythologyর খোরাক যোগাইবে সন্দেহ নাই। হয় তো বা তাহা কতকগুলি জাতির মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদানেরও কিছু কিছু সাক্ষ্য দিবে, কিন্তু তাহা হইতে কোন একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিতে গেলেই বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে। এরূপ বিপদের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। মনুর সহিত অনুর ও নু বা Noahর অভিন্নত্ব প্রমাণ করিতে যাইয়া রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় সুপণ্ডিতও এরূপ ভ্রম করিয়াছেন। এই অভিন্নত্ব (identity) প্রমাণ করিবার আগ্রহের আতিশয্যে তিনি ভুলিয়া গেলেন মনুর বহুপরে অসুরগণের আদিপুরুষ ও উপাস্য অসুর জন্ম। অধ্যাপক De Lacouperieর মত সুপণ্ডিতও চীনে ব্যাবলোনিয়ান্ উপনিবেশের প্রমাণ উল্লেখ করিবার সময় চীনের তৃতীয় রাজা Huangtiর সহিত ব্যাবিলনের রাজা Kader Nakhuntiর অভিন্নত্ব লইয়া এইরূপ প্রমাদে পড়িয়াছেন।

চীন, মিশর, আসিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধারকারী প্রত্নতত্ত্ব-মহারথগণও যে সব সিদ্ধান্ত করিতে গিয়া পরস্পরের চক্ষে ভুল ভ্রান্তি করিয়া বসিয়াছেন,সেরূপ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে করিব না। ইহা আমার বিদ্যার-গণ্ডীরও বাহিরে। যদি এরূপ কোন সিদ্ধান্ত অবশ্যম্ভাবীরূপে এ প্রবন্ধ পাঠ করিতে করিতে পাঠকের মনে স্বতঃ উদয় হয় তাহা হইলে তিনি সেটাকে উপস্থিত যেন নিজের মনোমধ্যেই রাখিয়া দেন।

যাক্। মিশরের কথা বলিতে গিয়া অনেক অবান্তর কথা বলিয়া ফেলিলাম। আমরা সময়ে সময়ে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া সহসা কোন কোন সিদ্ধান্ত করিয়া বসি। পাঠকগণকে এ প্রকার সিদ্ধান্তের হস্ত হইতে সতর্ক করিবার জন্যই এত কথা বলিয়াছি। এখন একটু কাজের কথা বলি। মিশরের ভৌগোলিক সংস্থান ও প্রাকৃতিক অবস্থান তাহার আদিম ধর্ম্মপদ্ধতি ও উপাসনাপ্রণালীর মূলে নিহিত ছিল ইহাই বলিতে গিয়াছিলাম। বৃষ, গাভী জলহস্তী, শৃগাল, বাজপক্ষী প্রভৃতি জীবগণের যে উপাসনার কথা মিশরের প্রাচীন ধর্ম্মের কথা বলিতে গেলেই মনে পড়ে (ইহাকে কেহ কেহ totemic ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করেন) তাহাকে মিশরের প্রথম যুগের ধর্ম্ম বলিয়া অনেক পণ্ডিত বিশ্বাস করেন না। এই সব পণ্ডিতগণের মতে জীবোপসনা মিশরে আগে প্রচলিত ছিল না, পরে তাহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। Breasted মহোদয়ের মতে সুদূর অতীতে নীলনদতটের কৃষকগণ তাহাদের দীর্ঘ, প্রলম্ব উপত্যকা-প্রদেশের অনুযায়ী পৃথিবীর কল্পনা করিত। আকাশকে তাহারা পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এমন একটা বিশালকায় গাভী বলিয়া কল্পনা করিত, যাহার সম্মুখ ও পশ্চাতের পদচতুষ্টয়ের মধ্যদেশে পৃথিবী অবস্থিত ও যাহার উদরদেশও বক্ষঃস্থল নক্ষত্র-খচিত হইয়া নভোমণ্ডলের সৃষ্টি করিয়াছে। (আকাশকে একটা বিশাল জলাশয় বলিয়া কল্পনা এবং এই জলাশয় ও নাইল নদীরূপ পার্থিব জলাশয়ের সংযোগের কল্পনাও তাহাদের মধ্যে অপ্রচলিত ছিল না।) পৃথিবীকে তাহারা অধোমুখে শয়ান একটা পুরুষ বলিয়া কল্পনা করিত। এই পুরুষের পৃষ্ঠদেশ শস্য-শ্যামল ও জীবজন্তু কর্ত্তৃক অধ্যুষিত। সৃষ্টির প্রাক্কালে

* ঋগ্বেদের ঋষিগণ, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাসের মতে, কিন্তু এই Delugeএর কোন কথা বলেন নাই। অতএব তাঁহার মতে বৈদিক সভ্যতা Delugeএর অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী।

এই পৃথিবীর অস্তিত্বই ছিল না। তখন এক বিরাট্ সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই বর্ত্তমান ছিল না। এই সমুদ্রে একদা এক অণ্ড (কাহারও কাহারও মতে এক পদ্ম) উদ্ভূত হইল। এই পদ্ম হইতে সূর্য্যের উদ্ভব ও সূর্য্য হইতে Shu, Tefnut, Keb ও Nut নামক তাঁহার চারি সন্তানের জন্ম হইল। ইহার কিছু কাল পরে Shu ও Tefnut নামক দেবতাদ্বয় এক কাণ্ড বাধাইয়া বসিল। তাহারা Kebর গায়ে পা দিয়া দাঁড়াইল ও Nutকে মাথার উপর তুলিল। এই প্রকারে Keb ও Nut যথাক্রমে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলে পরিণত হইল। কালক্রমে Keb ও Nutএর সংযোগে Osiris, Isis, Nepthys ও Set নামক চারি জন সন্তান জন্মিল। এইরূপে সূর্য্যদেব ও তাঁহার পুত্র-পুত্রী, পৌত্র-পৌত্রী লইয়া নয় জন আদি দেব-দেবীর সৃষ্টি হইল।

Osiris ও Isis গ্রীস-রোমের Jupiter-Junoর ন্যায় যুগপৎ ভাই-ভগিনী ও স্বামি-স্ত্রী *। Osiris (অনেক পণ্ডিতের মতে Osiris-সংক্রান্ত দেবতত্ত্ব অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইহা সম্ভবও বটে ; কিন্তু Osiris-এর উল্লেখ প্রথম যুগের pyramid গাত্রে উৎকীর্ণ আছে।) পরম পিতা সবিতার নিকট হইতে পৃথিবীর শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন এবং Isis এর সহিত আনন্দে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অবিমিশ্র সুখ কাহারও অদৃষ্টে নাই। জগতের হিতসাধন ও প্রকৃতিপুঞ্জের অশেষ ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াও তিনি তাঁহার ভাই Setএর বিরাগ ও ঈর্ষার হাত হইতে রক্ষা পাইলেন না। Set তাঁহাকে পথ ভুলাইয়া লইয়া হত্যা করিল। অনেক সাধ্য-সাধনার পর সতী-স্ত্রী Isis তাঁহার দেহটী পাইলেন এবং ভূগর্ভের শেয়ালমুখো দেবতা Anubisএর সাহায্যে তাঁহাকে সংরক্ষিত (embalm) করিয়া তাঁহার উদ্দেশে মন্ত্র গান করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে Osiris পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন কিন্তু জীবলোকে আর তাঁহার স্থান হইল না। এখন হইতে তিনি মৃত লোকের অধীশ্বর হইলেন। Osirisএর ঔরসে Isisএর গর্ভে Horus নামে এক পুত্র জন্মিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া Horus Setকে পরাজিত করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিলেন কিন্তু দুষ্ট ও চক্রী Set তাঁহাকে জারজ বলিয়া রটাইল। ধর্ম্মের কল কিন্তু বাতাসে নড়ে। ধর্ম্মের প্রভাবে Horusএরই শেষে জয় হইল। পরন্তু Horus নরলোকে পূজা ও শ্রদ্ধার অধিকারী হইলেন। (ডাঃ অবিনাশ চন্দ্র দাস Osirisএর সহিত অসুর্য্যের, Isisএর সহিত উষার, Sebএর সহিত শিবের, Nutএর সহিত নক্ত বা রাত্রি বা কালীর, Raর সহিত হরের, Shekhetএর সহিত শক্তির, Mutএর সহিত মাতার সাদৃশ্য লইয়া অনেক কথা বলিয়াছেন। তাঁহার *Rigvedic India*র ১৩শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মিশরের আদি দেবতা নয় জন। কালক্রমে আরও অনেক দেব দেবীর (যথা Anubis, Horus, Hathor, Neit, Ptah) আবির্ভাব হইতে লাগিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা শুধু উপকথায় স্থান পাইলেন, কেহ কেহ আবার সৌভাগ্যবশতঃ জনসমাজে পূজিত হইলেন। সূর্য্যের উপাসনা মিশরের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য জিনিস। পরম পিতা স্বয়ম্ভূ সবিতা রূপে যিনি আগে পূজিত হইতেন, তিনিই Re বা Ra নামে পরে মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিলেন। Nile নদীর তীরে On নগর (Greekদের Heliopolis) তাঁহার প্রধান পীঠস্থান হইয়া উঠিল। Osirisএর উপাসনা ও সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল ও Dedu, Abydos প্রভৃতি স্থানে তাঁহার মন্দির রচিত হইল। এই রূপে Shmun বা Hermopolis নগরে চন্দ্র ও Sais প্রভৃতি স্থানে আকাশের আদি দেবী Nut গাভী মূর্ত্তিতে Hathor নামে পূজিত হইতে লাগিলেন। একই দেবতা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন নামে ও মূর্ত্তিতে পূজিত হইতে লাগিলেন। প্রকৃতি-পরিচায়ক আদি দেবতাদের সঙ্গে ক্রমে অন্যান্য দেবতাও আবির্ভূত ও পূজিত হইতে লাগিলেন। Memphis নগরে Ptah ইঁহাদের মধ্যে অন্যতম। কালে অসংখ্য দেব-দেবী ও

---

* ভ্রাতা—ভগিনীতে এইরূপ সঙ্গম গ্রীক পুরাণে বিরল নহে। (In saturn's reign such mixture was not held a stain"—Milton) প্রাচীন মিশরে শুধু দেবদেবীর পক্ষে ইহা নির্দ্দোষ ছিল না। ঐতিহাসিক যুগে রাজ-পরিবারেও ইহা পবিত্র সম্বন্ধ বলিয়া পরিগণিত হইত ও ইহার অবাধ প্রচলন ছিল। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে প্রসিদ্ধ যমযমীর কথোপকথনে কিন্তু, যমের মতে, ইহা অন্যায় যদিও, এই সূক্তে, পরে ইহার প্রচলন হইবে এইরূপ ভবিষ্যবাণী আছে। (১০।১০)

অসংখ্য মন্দির মিশরকে ছাইয়া ফেলিল। (সুপণ্ডিত অধ্যাপক Petrie মহোদয় প্রাচীন মিশরের দেবতত্ত্বের ইতিহাস আলোচনা-কালে ছয় শ্রেণীর দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন। যথা (১) বানর, ভেড়া প্রভৃতি দেব-পশুগণ (২) মিশরে ব্রহ্মা-রূপে পূজিত Khnumu, শৃগাল-দেবতা Anubis প্রভৃতি জন্তু-মুখো দেবতা (৩) Osiris, Isis প্রভৃতি মনুষ্যমূর্ত্তি দেবতা (৪) Ra বা সূর্য্য প্রভৃতি Cosmic বা জাগতিক দেবতা (৫) সৃষ্টি-কর্ত্তা Ptah, সত্যের দেবতা Maat প্রভৃতি গুণ-বাচক দেবতা ও (৬) Bes, Baal, Ashtorath বা Ishtar প্রভৃতি বিদেশী দেবতা।)

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক T. E. Peet মহোদয়ের (*Cambridge Ancient History*, Vol I ch IX দ্রষ্টব্য) মত উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মতে অতি প্রাচীন কালে মিশরের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন tribe বা উপজাতিগুলির মধ্যে পরস্পর হইতে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। এই দেব-দেবীগুলির মধ্যে অধিকাংশেরই মূল "totemic" অর্থাৎ সেগুলি প্রকৃতির পরিচায়ক কোন বিশেষ জীব বা বস্তুর উপাসনা। এই উপজাতিগুলির পরস্পরের প্রতি সদ্ভাব ছিল না। পরন্তু তাহারা পরস্পরের সহিত বিবাদ ও যুদ্ধ-রত থাকিত। এইরূপ যুদ্ধের ফলে যেমন একটী উপজাতি আর একটী উপজাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল, অমনই বিজেতার ধর্ম্মপদ্ধতি ও আরাধ্য দেবতাগুলি পরাজিতের উপর অধিষ্ঠিত হইতে লাগিল, তবে বিজেতার ধর্ম্মও যে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইল না তাহা নহে। এই রূপে এক উপজাতির ধর্ম্মপদ্ধতিও আরাধ্য দেবতা আর এক উপজাতির উপর ন্যস্ত হইতে হইতে যখন কালক্রমে মিশরেবর রাষ্ট্রীয় একীকরণ (political unification) সম্পন্ন হইতে লাগিল, তখন সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পরাক্রমশালী উপজাতির উপাস্য দেবতা গুলি সমগ্র দেশের আরাধ্য হইয়া উঠিল এবং অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল উপজাতির দেবতা গুলি লোপ পাইল। Peet মহোদয় এ প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, মিশরের আদি ধর্ম্মপদ্ধতি আলোচনা করিলে মনে হয় যে এখানকার দেব-দেবীগণকে চারিটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কতকগুলি দেব দেবীর উৎপত্তি হইতেছে "totemic," যেমন Thoth, Anubis, Sabek ও Horus যথা ক্রমে সারসজাতীয় Ibis নামক পক্ষী, শৃগাল, কুম্ভীর ও বাজপক্ষীর রূপান্তর। কতকগুলি আবার প্রকৃতিপরিচায়ক, যথা Re বা সূর্য্য, Nun বা সমুদ্র (স্ত্রী), Shu বা বায়ু। কতকগুলি আবার নর-নারীর উচ্চ সংস্করণ, যথা Isis ও Osiris। ইহা ছাড়া আরও এক শ্রেণীর দেবতা দেখা যায়—যাঁহারা কোন গুণ-বিশেষের মূর্ত্তিমান্ প্রতীক পুরুষ বা স্ত্রী (personification), যথা সত্যের মূর্ত্তিমান্ প্রতীক Maat, বুদ্ধির Sia, ইত্যাদি। এই সকল দেব দেবী মূলতঃ "totemic" হইলেও পরে তাঁহারা "Cosmic" শ্রেণীতে উন্নত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ মূলে বিভিন্ন প্রদেশের জীব-মূলক উপাসনা-প্রথা কালে বিশ্বের সৃষ্টি-তত্ত্বের ব্যাখ্যা-মূলক উপাসনা-প্রথায় প্রায় পরিণত হইয়াছিল। ইহাই, সংক্ষেপে, Peet সাহেবের মত। (Breastedএর মত কিন্তু জীবোপসনা মিশরের প্রথম যুগের বৈশিষ্ট্য নহে। তাঁহার মতে ইহার প্রচলন পরে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাঁহার মতের বিশদ আলোচনা ইতি পূর্ব্বেই করিয়াছি।)

মিশরের-ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আগাগোড়া ইতিহাস লেখা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। (অতএব Old kingdom, Middle kingdom, First Period of the Empire, Second Period of the Empire প্রভৃতি বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগগুলিতে ধর্ম্মের বিকাশ, পরিবর্ত্তন, বিবর্ত্তন ইত্যাদি অনুসন্ধান করিতে যে সব পাঠক ইচ্ছুক তাঁহারা Maspero-প্রণীত *Dawn of Civilization in the East*, Hall-লিখিত *History of the Near East*, Breasted-প্রণীত *History of Egypt* ও *Development of Religion and Thought in Ancient Egypt* প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থ সকল পাঠ করিতে পারেন। James Hastings-সম্পাদিত *Encyclopaedia of Religion & Ethics* Vol. V. p.p. 236—250 ও Bury প্রভৃতি পণ্ডিতগণ-সম্পাদিত *Cambridge Ancient History*, Vol. I.এর কয়েকটী অধ্যায়ও এ বিষয়ে পাঠককে অনেক সংবাদ দিবে। *Encyclopaedia Britanica*র 11th Edition Vol IX এ Egypt-শীর্ষক প্রবন্ধটীতেও এবিষয়ের একটী সংক্ষিপ্ত

(mortuary texts) লইয়া উত্তরকালে "Book of the dead" নামক একখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল; ইহা হইতে মিশরবাসীদিগের "শ্রাদ্ধতত্ত্ব" সম্বন্ধে আমরা অনেক কথাই জানিতে পারি। এ সম্পর্কে প্রাচীন মিশর-বাসীদিগের মত তাঁহাদের সমসাময়িক চীনা ও ভারতীয়গণের মতের সহিত তুলনা করিয়া দেখা উচিত। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত অন্ত্যেষ্টিকালীন সূক্ত-গুলি * ও চীনদেশের "Book of Odes" নামক গ্রন্থ মিশরের এই সকল প্রাচীন 'mortuary texts'এর পাশা-পাশি রাখিয়া তুলনা করিবার জিনিস।

(*) ১৪, ১৬, ১৮, সূক্ত। ১৪ সূক্তে পারলৌকিক সুখের বর্ণনা আছে ও সেই সুখবিধানকর্ত্তা পুণ্যকর্ম্মের পুরস্কারদাতা যমের উল্লেখ আছে। গ্রীক যমের 'Cerberus'এর তুল্য বৈদিক যমের দুইটী প্রহরী স্বরূপ হিংস্র কুক্কুরের উল্লেখ আছে। (৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র দেখাইয়াছেন যে Kerberos সংক্রান্ত mythটী "Universal all over the world") ১৬ সূক্তে মৃতদেহ দাহ করিবার সময় অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া যে মন্ত্র উচ্চারণ করা হইত তাহার উল্লেখ আছে এবং মৃতব্যক্তির চক্ষু কোথায় গমন করিবে, শ্বাস কোথায় মিশিবে ও একেবারে ভস্ম না করিয়া, উত্তমরূপে পক্ব করিয়া মৃতব্যক্তিকে অগ্নি কোথায় লইয়া যাইবেন, তাহার উল্লেখ আছে। মৃত্যুর পর পরলোক গমনের কথাও এই সূক্তে আছে। ১৮ সূক্তে মৃতদেহ মৃত্তিকায় স্থাপন করিবার প্রথার উল্লেখ আছে ও মৃতব্যক্তির স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়া পুনরায় গৃহে গমন করিতে উপদেশের কথা আছে। সতীদাহ বা সহমরণ প্রথা তো দূরের কথা, এই সূক্তে বরং বিধবাবিবাহের ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে হয়। ইহার অন্তর্গত—

"ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাং জনেন সর্পীষা সং বিশং তু।
অনশ্রবো হনমীবাঃ সুরত্না আ রোহংতু জনয়ো যোনিমগ্রে।"

ঋক্‌টী অতিশয় জ্ঞাতব্য ও বিশেষ করিয়া প্রণিধান করিবার বিষয়। সুপণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন,—"এই সকল নারী বৈধব্যদুঃখ অনুভব না করিয়া, মনোমত পতি লাভ করিয়া অঞ্জন ও ঘৃতের সহিত গৃহে প্রবেশ করুন। এই সকল বধূ অশ্রুপাত না করিয়া, রোগে কাতর না হইয়া উত্তম উত্তম রত্ন ধারণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে গৃহে আগমন করুন।" এই ঋক্‌টীর অনুবাদও পাঠ সম্বন্ধে কিন্তু মতান্তর আছে। এই ঋকের 'অগ্রে' শব্দটীর পরি-বর্ত্তে কেহ কেহ 'অগ্নেঃ' শব্দ পাঠ করিয়া সতীদাহের প্রমাণ স্বরূপ এই ঋক্ ব্যবহার করেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও Colebrookeএর পাঠে অগ্নে আছে। পক্ষান্তরে সায়ণাচার্য্য Wilson, Maxmuller প্রভৃতি অনেকে 'অগ্রে' এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।) এ সম্পর্কে আর একটী কথা কিন্তু বিচার করা উচিত। ইহার বিচার পূর্ব্বে কেহ করিয়াছেন কি না আমার জানা নাই। কথাটী এই, যেখানে মৃতদেহ মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে মাত্র সেইখানে বিধবাদের এই ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত কেহ যদি করেন যে, 'মৃতদেহ দাহ করিবার পরিবর্ত্তে যে স্থলে তাহা মৃত্তিকায় সংস্থাপিত করা হয়, সেই স্থলে মৃতব্যক্তির বিধবা স্ত্রীর এইরূপ ব্যবস্থা—তাহা হইলে কি হয়? এই কথাটী বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখকের মনে অনেকবার উদয় হইয়াছে; ইহা ভাবিবার কথাও বটে।

গুহা-মন্দিরের যাত্রী

[শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ এম-এ, বি-এল]

১

সে আজ ত্রিশ বৎসরের পূর্ব্বের কথা। কলেজের পড়া-শুনা শেষ করিয়া দেশ-ভ্রমণে বাহির হই। তখন রাজপুতানা হইতেই দেশে ফিরি। তাহার পর দেশ-ভ্রমণের নেশা ততটা ছিল না। আমার বাল্যবন্ধু ও বৈবাহিক দিনাজপুরের কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় মহাশয়ের সাহচর্য্যে আবার এ নেশা কয়েক বৎসর হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে। ফলে, প্রতি বৎসর পূজার ছুটিতে আমরা উভয়ে দুই মাস দেশ ভ্রমণ করিতেছি।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের পূজাবকাশের সময় আমার কর্ম্মস্থল পাটনা হইতে কলিকাতা যাইলাম। তথায় বন্ধুবর গঙ্গা-তীরে তাঁহার সুন্দর বাড়ীতে অধিকাংশ সময় বাস করেন। সেখানে স্থির হইল যে পশ্চিম ভারত যাইতে হইবে। ১৩৩২ সালের ২৭এ ভাদ্র কুমার শরদিন্দু-নারায়ণ ও আমি একসঙ্গে পাটনা আসিলাম। কুমারের অতিশয় পুষ্প-প্রীতি। নূতন পাটনাতে অনেক বাড়ীতেই সুন্দর ফুলবাগান আছে। কুমারকে কতকগুলি দেখাই-লাম—দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। পাটনায় আরও দেখাইলাম,—মহারাজ অশোকের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ (যাহা এত দিন ভূগর্ভে প্রোথিত ছিল) ও পাটনার 'গোলঘর'। এই 'গোলঘর' শস্যশালার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল ও একটু শব্দ হইলে ইহাতে যেরূপ উপর্য্যুপরি প্রতিধ্বনি হয়, এক মিলান্ সহরের গির্জ্জা ব্যতীত আর কোথায়ও না কি সেরূপ হয় না। সেই দিনই রাত্রিতে তিন জন ভৃত্যসহ আমরা পাটনা ত্যাগ করিলাম ও প্রাতে মির্জাপুর পঁহুছিলাম। আমার নিয়ম, ট্রেণে দূরে যাইতে হইলে কষ্ট করিয়া যাই না, প্রাতঃকালে সুবিধা মত স্থানে নামিয়া স্নানাহার করিয়া লই। মির্জাপুরে সেইজন্যই আমরা নামি। গঙ্গাস্নানের পর মির্জাপুরের অধিবাসী আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জৈস-ওয়ালের বাড়ী যাইলাম ও পরে আসিয়া দুপ্রহরে ট্রেণে এলাহাবাদ রওয়ানা হইলাম। এলাহাবাদে আমাদের নূতন কিছুই দেখিবার নাই, আমি কয়েকবার তথায় গিয়াছি ও আমার বন্ধু সেখানেই এম-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। ষ্টেশনেই বিশ্রামগৃহে জিনিসপত্র ও লোক জন রাখিয়া বৈকালে একবার সহর বেড়াইয়া আসিলাম। রাত্রের ট্রেণে জব্বলপুর রওয়ানা হইলাম। তথায় প্রাতে পঁহুছিয়া ষ্টেশনের নিকটেই রাজা গোকুলদাসের ধর্ম্মশালায় যাইলাম। ইহা সুবৃহৎ দ্বিতল সুন্দর ধর্ম্মশালা। সম্মুখে রাজা গোকুল দাসের মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। দোতালায় আমরা একটী কক্ষ লইলাম। নিকটেই কলের জল-ই প্রভৃতি থাকায় সুবিধা হইয়াছিল। ধর্ম্মশালাতেই এক-কিজ ব্রাহ্মণ আট আনা পয়সা লইয়া ভাত, দাল, রুটি ও নিরামিষ তরকারী খাওয়াইলেন। আমি নিরামিষাশী। তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলাম।

জব্বলপুর বিস্তৃত ও সুদৃশ্য সহর। সহর দেখিয়া বৈকালে ধর্ম্মশালার স্থাপয়িতা রাজা গোকুলদাসের পুত্র দেওয়ান বাহাদুর জীবনদাসের সহিত আমরা সাক্ষাৎ করিলাম। রাজা গোকুলদাসের বংশ মধ্যপ্রদেশের এক প্রধান ধনিবংশ বলিয়া খ্যাত। ইঁহাদের বিস্তৃত জমিদারী আছে ও তদ্ভিন্ন প্রকাণ্ড ব্যবসা আছে। দেওয়ান বাহা-দুরের পুত্র শেঠ গোবিন্দদাস মধ্যপ্রদেশের স্বরাজপক্ষের অন্যতম নেতা ও ইনি এসেম্ব্লির মেম্বার। জব্বলপুরে ইঁহাদের অনেক কীর্ত্তি। বাড়ীর সম্মুখেই ইঁহাদের মার্ব্বল পাথরের মন্দির। দেওয়ান বাহাদুর আমাদিগকে যত্ন-পূর্ব্বক আপ্যায়িত করিলেন—মন্দির দেখাইলেন ও তাঁহার পুষ্প-বাটিকা ভাল করিয়া দেখাইবার জন্য কর্ম্মচারীকে আদেশ দিলেন। ইহা জব্বলপুরের একটী দ্রষ্টব্য স্থান। সুন্দর বাগান, সুন্দরগৃহ; নানাবিধ মূল্যবান্ আসবাবে উহা পরিপূর্ণ।

পর দিন প্রাতে প্রাতঃকৃত্যের পরই ১৪ মাইল দূরে নর্ম্মদা দর্শনে চলিলাম। টঙ্গায় বা ট্যাক্সিতে যাওয়া

(mortuary texts) লইয়া উত্তরকালে "Book of the dead" নামক একখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল; ইহা হইতে মিশরবাসীদিগের "শ্রাদ্ধতত্ত্ব" সম্বন্ধে আমরা অনেক কথাই জানিতে পারি। এ সম্পর্কে প্রাচীন মিশর-বাসীদিগের মত তাঁহাদের সমসাময়িক চীনা ও ভারতীয়গণের মতের সহিত তুলনা করিয়া দেখা উচিত। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত অন্ত্যেষ্টিকালীন সূক্ত-গুলি * ও চীনদেশের "Book of Odes" নামক গ্রন্থ মিশরের এই সকল প্রাচীন 'mortuary texts'এর পাশা-পাশি রাখিয়া তুলনা করিবার জিনিস।

"ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাং জনেন সর্পীষা সং বিশং তু।
অনশ্রবো হনমীবাঃ সুরত্না আ রোহংতু জনয়ো যোনিমগ্রে।"

ঋক্‌টী অতিশয় জ্ঞাতব্য ও বিশেষ করিয়া প্রণিধান করিবার বিষয়। সুপণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন,—"এই সকল নারী বৈধব্যদুঃখ অনুভব না করিয়া, মনোমত পতি লাভ করিয়া অঞ্জন ও ঘৃতের সহিত গৃহে প্রবেশ করুন। এই সকল বধূ অশ্রুপাত না করিয়া, রোগে কাতর না হইয়া উত্তম উত্তম রত্ন ধারণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে গৃহে আগমন করুন।" এই ঋক্‌টীর অনুবাদও পাঠ সম্বন্ধে কিন্তু মতান্তর আছে। এই ঋকের 'অগ্রে' শব্দটীর পরি-বর্ত্তে কেহ কেহ 'অগ্নেঃ' শব্দ পাঠ করিয়া সতীদাহের প্রমাণ স্বরূপ এই ঋক্ ব্যবহার করেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও Colebrookeএর পাঠে অগ্রে আছে। পক্ষান্তরে সায়ণাচার্য্য Wilson, Maxmuller প্রভৃতি অনেকে 'অগ্রে' এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।) এ সম্পর্কে আর একটী কথা কিন্তু বিচার করা উচিত। ইহার বিচার পূর্ব্বে কেহ করিয়াছেন কি না আমার জানা নাই। কথাটী এই, যেখানে মৃতদেহ মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে মাত্র সেইখানে বিধবাদের এই ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত কেহ যদি করেন যে, 'মৃতদেহ দাহ করিবার পরিবর্ত্তে যে স্থলে তাহা মৃত্তিকায় সংস্থাপিত করা হয়, সেই স্থলে মৃতব্যক্তির বিধবা স্ত্রীর এইরূপ ব্যবস্থা—তাহা হইলে কি হয়? এই কথাটী বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখকের মনে অনেকবার উদয় হইয়াছে; ইহা ভাবিবার কথাও বটে।

(*) ১৪, ১৬, ১৮, সূক্ত। ১৪ সূক্তে পারলৌকিক সুখের বর্ণনা আছে ও সেই সুখবিধানকর্ত্তা পুণ্যকর্ম্মের পুরস্কারদাতা যমের উল্লেখ আছে। গ্রীক যমের 'Cerberus'এর তুল্য বৈদিক যমের দুইটী প্রহরী স্বরূপ হিংস্র কুকুরের উল্লেখ আছে। (৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র দেখাইয়াছেন যে Kerberos সংক্রান্ত mythটী "Universal all over the world") ১৬ সূক্তে মৃতদেহ দাহ করিবার সময় অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া যে মন্ত্র উচ্চারণ করা হইত তাহার উল্লেখ আছে এবং মৃতব্যক্তির চক্ষু কোথায় গমন করিবে, শ্বাস কোথায় মিশিবে ও একেবারে ভস্ম না করিয়া, উত্তমরূপে পক্ক করিয়া মৃতব্যক্তিকে অগ্নি কোথায় লইয়া যাইবেন, তাহার উল্লেখ আছে। মৃত্যুর পর পরলোক গমনের কথাও এই সূক্তে আছে। ১৮ সূক্তে মৃতদেহ মৃত্তিকায় স্থাপন করিবার প্রথার উল্লেখ আছে ও মৃতব্যক্তির স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়া পুনরায় গৃহে গমন করিতে উপদেশের কথা আছে। সতীদাহ বা সহমরণ প্রথা তো দূরের কথা, এই সূক্তে বরং বিধবাবিবাহের ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে হয়। ইহার অন্তর্গত —

গুহা-মন্দিরের যাত্রী

[শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ এম-এ, বি-এল]

১

সে আজ ত্রিশ বৎসরের পূর্ব্বের কথা। কলেজের পড়া-শুনা শেষ করিয়া দেশ-ভ্রমণে বাহির হই। তখন রাজপুতানা হইতেই দেশে ফিরি। তাহার পর দেশ-ভ্রমণের নেশা ততটা ছিল না। আমার বাল্যবন্ধু ও বৈবাহিক দিনাজপুরের কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় মহাশয়ের সাহচর্য্যে আবার এ নেশা কয়েক বৎসর হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে। ফলে, প্রতি বৎসর পূজার ছুটিতে আমরা উভয়ে দুই মাস দেশ ভ্রমণ করিতেছি।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের পূজাবকাশের সময় আমার কর্ম্মস্থল পাটনা হইতে কলিকাতা যাইলাম। তথায় বন্ধুবর গঙ্গা-তীরে তাঁহার সুন্দর বাড়ীতে অধিকাংশ সময় বাস করেন। সেখানে স্থির হইল যে পশ্চিম ভারত যাইতে হইবে। ১৩৩২ সালের ২৭এ ভাদ্র কুমার শরদিন্দু-নারায়ণ ও আমি একসঙ্গে পাটনা আসিলাম। কুমারের অতিশয় পুষ্প-প্রীতি। নূতন পাটনাতে অনেক বাড়ীতেই সুন্দর ফুলবাগান আছে। কুমারকে কতকগুলি দেখাই-লাম—দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। পাটনায় আরও দেখাইলাম,—মহারাজ অশোকের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ (যাহা এত দিন ভূগর্ভে প্রোথিত ছিল) ও পাটনার 'গোলঘর'। এই 'গোলঘর' শস্যশালার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল ও একটু শব্দ হইলে ইহাতে যেরূপ উপর্য্যুপরি প্রতিধ্বনি হয়, এক মিলান্ সহরের গির্জ্জা ব্যতীত আর কোথায়ও না কি সেরূপ হয় না। সেই দিনই রাত্রিতে তিন জন ভৃত্যসহ আমরা পাটনা ত্যাগ করিলাম ও প্রাতে মির্জাপুর পঁহছিলাম। আমার নিয়ম, ট্রেণে দূরে যাইতে হইলে কষ্ট করিয়া যাই না, প্রাতঃকালে সুবিধা মত স্থানে নামিয়া স্নানাহার করিয়া লই। মির্জাপুরে সেইজন্যই আমরা নামি। গঙ্গাস্নানের পর মির্জাপুরের অধিবাসী আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জৈস-[illegible] বাড়ী যাইলাম ও পরে আসিয়া দ্বিপ্রহরে ট্রেণে এলাহাবাদ রওয়ানা হইলাম। এলাহাবাদে আমাদের নূতন কিছুই দেখিবার নাই, আমি কয়েকবার তথায় গিয়াছি ও আমার বন্ধু সেখানেই এম-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। ষ্টেশনেই বিশ্রামগৃহে জিনিসপত্র ও লোক জন রাখিয়া বৈকালে একবার সহর বেড়াইয়া আসিলাম। রাত্রের ট্রেণে জব্বলপুর রওয়ানা হইলাম। তথায় প্রাতে পঁহুছিয়া ষ্টেশনের নিকটেই রাজা গোকুলদাসের ধর্ম্মশালায় যাইলাম। ইহা সুবৃহৎ দ্বিতল সুন্দর ধর্ম্মশালা। সম্মুখে রাজা গোকুল দাসের মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। দোতালায় আমরা একটী কক্ষ লইলাম। নিকটেই কলের জল, আলো প্রভৃতি থাকায় সুবিধা হইয়াছিল। ধর্ম্মশালাতেই এক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ আট আনা পয়সা লইয়া ভাত, দাল, রুটি ও নিরামিষ তরকারী খাওয়াইলেন। আমি নিরামিষাশী। তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলাম।

জব্বলপুর বিস্তৃত ও সুদৃশ্য সহর। সহর দেখিয়া বৈকালে ধর্ম্মশালার স্থাপয়িতা রাজা গোকুলদাসের পুত্র দেওয়ান বাহাদুর জীবনদাসের সহিত আমরা সাক্ষাৎ করিলাম। রাজা গোকুলদাসের বংশ মধ্যপ্রদেশের এক প্রধান ধনিবংশ বলিয়া খ্যাত। ইঁহাদের বিস্তৃত জমিদারী আছে ও তদ্ভিন্ন প্রকাণ্ড ব্যবসা আছে। দেওয়ান বাহা-দুরের পুত্র শেঠ গোবিন্দদাস মধ্যপ্রদেশের স্বরাজপক্ষের অন্যতম নেতা ও ইনি এসেম্ব্লির মেম্বার। জব্বলপুরে ইঁহাদের অনেক কীর্ত্তি। বাড়ীর সম্মুখেই ইঁহাদের মার্ব্বল পাথরের মন্দির। দেওয়ান বাহাদুর আমাদিগকে যত্ন-পূর্ব্বক আপ্যায়িত করিলেন—মন্দির দেখাইলেন ও তাঁহার পুষ্প-বাটিকা ভাল করিয়া দেখাইবার জন্য কর্ম্মচারীকে আদেশ দিলেন। ইহা জব্বলপুরের একটী দ্রষ্টব্য স্থান। সুন্দর বাগান, সুন্দরগৃহ; নানাবিধ মূল্যবান্ আসবাবে উহা পরিপূর্ণ।

পর দিন প্রাতে প্রাতঃকৃত্যের পরই ১৪ মাইল দূরে নর্ম্মদা দর্শনে চলিলাম। টঙ্গায় বা ট্যাক্সিতে যাওয়া

চলে। আমরা টঙ্গা লইয়াছিলাম। জব্বলপুর পূর্ব্বে গোন্দ-জাতীয় রাজাদের রাজ্য ছিল। এই সব রাজাদের নির্ম্মিত পথিপার্শ্বস্থ অনেকগুলি বৃহৎ সরোবর দেখিলাম। কতকগুলিতে পদ্ম ফুটিয়াছে, কতকগুলি বা পানিফলে পরিপূর্ণ। নর্ম্মদাতীরে নামিয়া প্রায় আধ মাইল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডে পূর্ণ রাস্তা অতিক্রম করিয়া নর্ম্মদার ভারত-

কৈলাস-মন্দিরের সম্মুখ দ্বারের দ্বারপাল—ইলোরা

বিশ্রুত জলপ্রপাতে উপনীত হইলাম। কি সুন্দর দৃশ্য! নর্ম্মদার স্রোত নদীগর্ভে প্রস্তরে বাধা পাইয়া কিঞ্চিৎ নিম্নেই ভীষণ বেগে পতিত হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে জল-রাশির এক অংশ লক্ষধা বিভিন্ন হইয়া জলকণাতে পরিণত হইয়া দূর হইতে কুজ্ঝটিকার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। জলকণার উপর প্রাতঃসূর্য্যের রশ্মি বিকীর্ণ হইয়া রামধনুর শোভা হইতেছে; জলের অপর অংশ ফেনিল, শুভ্র তুষার-বৎ। এ দৃশ্য নয়নমোহকর, কখনও ভুলিবার নহে। অনেক-ক্ষণ এ দৃশ্য দেখিয়া আমরা নর্ম্মদাতীরে পর্ব্বতোপরি অবস্থিত চৌষট্টি যোগিনীর কারুকার্য্যবিশিষ্ট প্রস্তরমন্দির দেখিয়া আসিলাম। উহা মুসলমান আমলে নষ্ট হইয়াছে। তখনই ঘাটে ফিরিলাম। ঘাটের নাম ভেড়িঘাট; শুনিলাম ইহা ভৃগুঘাট নামের অপভ্রংশ। নিকটে কয়েকটী পাণ্ডার বাড়ী আছে। আমরা বিশ্রাম ও ভোজনের জন্য তাঁহাদের এক জনকে পাণ্ডা বলিয়া স্বীকার করিলাম। নর্ম্মদা নদীকে জলশুদ্ধির সময় আহ্বান করিতে শুনিয়াছি, পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই বা ইহাতে স্নান করি নাই। এখন নর্ম্মদার স্নিগ্ধ সলিলে স্নান করিয়া পরম তৃপ্ত হইলাম। নর্ম্মদা এখানে পর্ব্বত মধ্যে প্রবাহিতা, অল্পপরিসর কিন্তু অতিশয় গভীর। পাণ্ডা মহাশয়ের গৃহে ভোজন ও বিশ্রামের পর নৌকাযোগে উজান বহিয়া একটু দূরেই "মার্ব্বলরক্‌স" বা মার্ব্বলপাহাড় দেখিতে চলিলাম। ক্রমেই নদীর পরিসর কম হইতে লাগিল। বর্ষাশেষে ভীষণ স্রোত; তাহার পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত নৌকা অত দূর যাইত না। অতিকষ্টে মাঝিরা গন্তব্যস্থানে নৌকা লইয়া গেল। সেখানে আমরা নৌকা হইতে নামিয়া পর্ব্বতগাত্রে উপবেশন করিয়া সেই সুন্দর চিত্ত-বিমোহন অপরূপ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিলাম। দুই দিকে মর্ম্মরশৈল; নীচে অতি সঙ্কীর্ণ স্থলমধ্যে প্রবাহিতা বেগ-বতী নর্ম্মদা। সে কি দৃশ্য! আমরা যেখানে নৌকা হইতে নামি, তাহার একটু উপরেই নর্ম্মদাগর্ভ অতি সঙ্কীর্ণ; সে স্থানের ইংরাজি নাম Monkey Leap—বানর না কি উহা লাফাইয়া পার হইতে পারে। বৈকালে জব্বলপুর অভিমুখে পুনর্যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পথিপার্শ্বস্থ এক পর্ব্বতোপরি প্রাচীন গোন্দ-রাজাদের রাজপুরী দেখিতে গাড়ী হইতে নামিলাম। ইহার নাম মদনমহল। জঙ্গলের ভিতর দিয়া পাহাড়ে উঠিলাম; এ পাহাড় ৫০০ ফুট উচ্চ হইবে। উপরে জল আছে। প্রাচীন প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বীর রমণী রাণী দুর্গাবতী ও গোন্দ জাতির কথা ভাবিলাম। ইহারা অনার্য্য জাতি; পরে আর্য্য-সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া [illegible]

দিন পুনরায় সহর দর্শনে বাহির হই। সৌজন্যের অবতার দেওয়ান বাহাদুর জীবনদাস সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন ও ফলাদি উপঢৌকন পাঠাইলেন। অবশেষে তৃতীয় দিবসে বৈকালে জব্বলপুর ত্যাগ করিলাম।
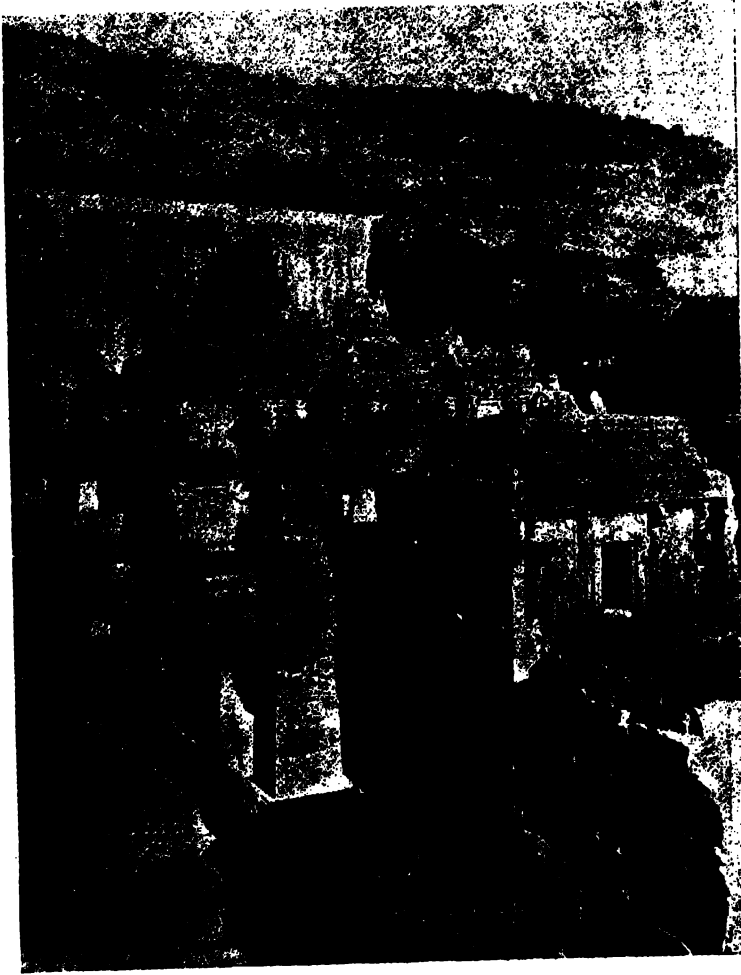
কৈলাস-মন্দির—ইলোরা

পর দিবস মন্মাদ জংসন ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। মন্মাদ একটী গণ্ডগ্রাম। ষ্টেশনের বাহিরেই মান্দ্রাজের ব্যবসায়ী ও ভূতপূর্ব্ব সেরিফ দেওয়ান বাহাদুর গোবিন্দদাস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ত্রিতল প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা আছে; আমরা তথায় উপস্থিত হইলাম। বাঙ্গালী মৎস্যভোজী, সুতরাং অস্পৃশ্য মনে করিয়া ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষ আমাদিগকে ধর্ম্ম-[illegible] ভিতরের কক্ষেও স্থান দিলেন না। বাহিরে রাস্তার ধারে একটা ঘর খুলিয়া দিলেন। তাহাতে একটী মাত্র দুয়ার, গৃহমধ্যে রাত্রে বাস করা কঠিন। সম্মুখে দুর্গন্ধময় পয়ঃ-প্রণালী। নিকটেই এক ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য-নদীতে স্নান করিয়া আমরা এক "খানাবলে" ভোজন করিলাম। মন্মাদ মহারাষ্ট্রদেশে নাসিক জেলায়। মহারাষ্ট্রে সাধারণ ভোজনাগার বা হোটেলকে "খানাবল" বলে; গুজরাট ও মালবে উহাকে "ভিসি" বলে। সব খানাবল বা ভিসিতেই খাদ্য প্রায় একরূপ। এ সব দেশে উচ্চ জাতির সকলেই নিরামিষাশী; সুতরাং নিরামিষ খাদ্যই তথায় পাওয়া যায়, আমার তাহাই প্রয়োজন। হোটেলগুলি ক্ষুদ্র কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আতপ চাউলের ভাত, উরিদ কিংবা অড়হরের দাল, স্লুপ শাকের একটা সুপ, একটা আলুর তরকারী ও অন্য একটা পাঁচমিশালি তরকারী ও যথেষ্ট রুটি আট আনাতে খাইতে দেয়। দুগ্ধ বা দধি দোকান হইতে কিনিয়া লইতে হয়। আহারের পর আমরা সামান্য জিনিস ও এক জন চাকর সঙ্গে লইয়া নিজামের রেলপথে আরাঙ্গাবাদ রওয়ানা হইলাম। অবশিষ্ট জিনিসপত্র ও দুই জন ভৃত্য মন্মাদে রহিল। আরাঙ্গাবাদে বেলা চারিটায় পঁহুছিলাম। আরাঙ্গাবাদ নিজাম রাজ্যের একটী জেলা। ষ্টেশন হইতে টঙ্গায় সহরে যাইলাম, রাস্তায় এক স্থলে রাজকর্ম্মচারীরা বাণিজ্যশুল্কের জন্য সমস্ত জিনিসপত্র খুলিয়া দেখিয়া কিছু না পাইয়া অবশেষে অব্যাহতি দিল।

আমাদের গন্তব্য ইলোরার গিরিগুহা। ইলোরা যাইতে হইলে তিন স্থান হইতে যাওয়া চলে। প্রথম আরাঙ্গাবাদ

দ্বিতীয় দৌলতাবাদ; তৃতীয় ইলোরা রোড ষ্টেশন। আরাঙ্গাবাদ সহর, তথায় মোটর ও টঙ্গা সর্ব্বদাই মিলে। ইলোরা এখান হইতে ২০ মাইল দূরে, তবু যানের সুবিধা হেতু আরাঙ্গাবাদ হইতেই ইলোরা যাওয়াই সুবিধা। দৌলতাবাদ হইতে ইলোরা ১২ মাইল ও ইলোরা রোড ষ্টেশন হইতে ৮ মাইল। ইলোরা রোডে যানাভাব; দৌলতাবাদে কখনও কখনও টঙ্গা পাওয়া যায়। আরাঙ্গাবাদ মোগলসম্রাট্ আরঙ্গজেবের নামানুসারে হইয়াছে। এই খানেই বৃদ্ধ সম্রাট্ বিজাপুররাজকে ও মারাঠাদিগকে দমন করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যে যাইয়া জীবনের শেষ অংশ যাপন করেন। কার্য্যতঃ ইহাই তখন মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানী। আমরা আরাঙ্গাবাদে বাণিজ্যশুল্কের হাঙ্গামা হইতে অব্যাহতি পাইয়া এক খানি মোটরগাড়ী ভাড়া করিলাম; তখনই যাইয়া ইহা পর দিন দ্বিপ্রহরে ইলোরা হইতে ফিরিবে। ২৫৲ টাকা ভাড়া স্থির হইল। আরাঙ্গাবাদের প্রান্তেই আরঙ্গজেব-পত্নী রবিয়া বেগমের কবর দেখিলাম। আরাঙ্গাবাদেই ইঁহার মৃত্যু হয়। আরঙ্গজেব-পুত্র তাঁহার কবরের উপর জগদ্বিখ্যাত তাজমহলের অনুকরণে সুদৃশ্য সৌধ নির্ম্মাণ করান, কিন্তু তাহাতে তাজের সে অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ফোটে নাই। এ সৌধ ইষ্টক নির্ম্মিত; উপরে শঙ্খের চুণের কাজ।

মহারাষ্ট্র দেশমধ্যে ইলোরা; মহারাষ্ট্র মালভূমির উপর অবস্থিত। এই উচ্চ মালভূমিতে স্থানে স্থানে পাহাড় আছে, তাহা কোথায়ও এক হাজার, কোথায়ও দুই হাজার ফুট উঠিয়াছে। মহারাষ্ট্রের অনেক পাহাড়েরই বিশেষত্ব দেখিলাম যে এ গুলি কতক দূর পর্য্যন্ত ঢালু অবস্থায় উঠিয়াছে, পরে উপর অংশ সোজা দেওয়ালের মত। সেই জন্য এ গুলির উপর দুর্গস্থাপন করা সুবিধা-জনক হইয়াছিল ও ছত্রপতি শিবাজী ও পরবর্ত্তী মারাঠা-রাজগণ শত শত পর্ব্বতশৃঙ্গে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই এই দৃশ্য দেখিতেছি। ইলোরা এইরূপ একটী বিস্তৃত পর্ব্বতের উপর অধিষ্ঠিত। পথে দৌলতাবাদের বিখ্যাত দুর্গ দেখিলাম। এ দুর্গের কথা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। ইহাই প্রাচীন হিন্দু রাজাদের দেওগিরি। প্রায় ৭০০ ফুট উচ্চে পর্ব্বতশৃঙ্গে এই অভ্রভেদী বিখ্যাত দুর্গ অবস্থিত। মহারাষ্ট্রের পর্ব্বত

বুদ্ধোপাসনা-মন্দির—ইলোরা

সমূহের ন্যায় এ পর্ব্বতেরও কতক অংশ প্রায় ১৫০ ফুট, প্রাচীরের ন্যায় সমভাবে উঠিয়াছে। নৈসর্গিক সুবিধাহেতু ও তদুপরি নির্ম্মাণ-কৌশলে এ দুর্গ অজেয় বলিয়া পরিগণিত ছিল। মুসলমানগণ কৌশলে ইহা পূর্ব্বকালে হিন্দু রাজার নিকট জয় করেন। পরবর্ত্তী কালে দিল্লীর

পর্ব্বত কাটিয়া তৈরী গর্ভগৃহ—ইলোরা

বাদশাহ্ মহম্মদ তুগলক্ দৌলতাবাদে রাজধানী স্থাপন করিয়া দিল্লীর সমস্ত অধিবাসীকে দৌলতাবাদে যাইতে ও অল্পকাল মধ্যেই তাহাদিগকে আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য করেন। ইহাতে বহু সহস্র ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দৌলতাবাদ ত্যাগ করিয়া একটু পরেই আমাদের মোটর পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। উপর হইতে দৃশ্য মনোরম। এই পর্ব্বতের পূর্ব্বাংশে খুলদাবাদ বা রৌজা, পশ্চিমাংশে ইলোরার গুহামন্দিরগুলি। খুলদাবাদে গাড়ী হইতে নামিলাম। ইহা একটী গণ্ডগ্রাম বা ক্ষুদ্র সহর, এখানে ৩০০০ অধিবাসী। এ স্থানের নাম খুলদাবাদ কিন্তু আরবী ভাষায় বিশিষ্ট লোকের কবরকে 'রৌজা' কহে, এখানে সম্রাট্ আরঙ্গজেবের, গোলকণ্ডারাজ বিলাসপ্রিয় তনাসাহের, প্রথম নিজাম আসফজার ও আরও প্রায় ১৫০০ কবর আছে বলিয়া ইহা রৌজা নামে খ্যাত। প্রথমেই একটী প্রকাণ্ড চত্বরে একটী মাদ্রাসা দেখিলাম, তাহারই সংলগ্ন এক স্থলে ভারত-সম্রাট্ আরঙ্গজেবের সামান্য কবর। আরঙ্গজেব কঠোর ব্রতধারী বিলাসপরিশূন্য সম্রাট্, তাই, তাঁহার কবরে কোনও সমৃদ্ধির চিহ্ন ছিল না; অধুনা কবর-সম্মুখে নিজাম বাহাদুর মার্ব্বল পাথরের জাফরি লাগাইয়া দিয়াছেন। খোলা জায়গায় এ কবর, উপরে ঘাস; আর দেখিলাম, ভাগ্যচক্রে তাহার উপর এক তুলসীগাছ হইয়াছে। আরও দুই তিনটী সুন্দর কবর দেখিয়া আর বিলম্ব না করিয়া তখনই আমরা পর্ব্বতের পশ্চিম দিকে যাইলাম। পর্ব্বতশৃঙ্গে প্রায় ৩০০ ফুট উচ্চ নির্জ্জন স্থানে নিজামের অতিথিভবন আছে; ইলোরার গুহামন্দির-যাত্রিগণ সাধারণতঃ সেইখানেই থাকেন; আমরাও পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম তথায় থাকিব, কিন্তু আরাঙ্গাবাদ যাইয়া শুনিলাম যে ইলোরা তীর্থস্থান, অনেক পাণ্ডা আছেন, তাঁহাদের গৃহে থাকা সুবিধা। সুতরাং আমরা সে জনমানবহীন পর্ব্বত-শিখরে অতিথিভবনে রাত্রিবাস না করিয়া পর্ব্বতের পশ্চিম অংশে সানুপ্রদেশে অবস্থিত ইলোরা গ্রামে যাইলাম।

এই ইলোরা গ্রাম ইলোরার গুহামন্দিরগুলি হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত। কাশীর বিশ্বনাথ, ঝাড়খণ্ডে

বৈদ্যনাথ, সেতুবন্ধে রামেশ্বর, হিমালয়ে কেদার, গুর্জ্জরে সোমনাথ প্রভৃতি যে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ মহাদেব ভারতে আছেন, ইলোরায় প্রতিষ্ঠিত ঘৃষ্ণেশ্বর মহাদেব তাঁহাদের অন্যতম। পূর্ব্বে এ কথা আমরা জানিতাম না। এই মহাদেবের অবস্থিতি হেতুই ইলোরা তীর্থস্থান ও তীর্থস্থানের আনুষঙ্গিক পাণ্ডাও এখানে আছেন। মহারাষ্ট্রে এ মন্দিরের খুব খ্যাতি, অনেক যাত্রী আছে। বর্ত্তমান মন্দির প্রাতঃস্মরণীয়া, হোলকার-রাণী, স্বনামধন্যা অহল্যাবাঈ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। বিস্তৃত প্রাঙ্গণমধ্যে সুউচ্চ প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির। নিকটেই পাণ্ডাদের বাড়ীগুলি উচ্চ প্রাচীরে ঢাকা, দেখিলে যেন দুর্গ বলিয়া বোধ হয়। শুনিলাম এ বাড়ীগুলি না কি বিখ্যাত মহারাষ্ট্র-মন্ত্রী নানা ফার্ণাভিস্ নির্ম্মাণ করাইয়া পাণ্ডাদিগকে দান করেন। আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে উপস্থিত হইলাম। সেখানে অনেকগুলি পাণ্ডা বসিয়াছিলেন। বন্ধুবর কুমার সংস্কৃতে পারদর্শী। তিনি বলিলেন, পণ্ডিত পাণ্ডা করিবেন। এক জন সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডা পাওয়া গেল। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া তাঁহাকেই পাণ্ডা স্থির করা হইল। তাঁহার নাম আম্বালাল বামন কৌশিক। তিনি নিজে সপরিবারে একটী ক্ষুদ্র দোতালা বাড়ীতে থাকেন, আর গলি রাস্তার অপর পার্শ্বে আর একটী ক্ষুদ্র দোতালা বাড়ী তাঁহার যাত্রী-আবাস। আমরা সেই যাত্রী-আবাসে স্থান পাইলাম। তথায় অন্য কেহ ছিল না। মুখ হাত ধুইয়া এক আবিল জলকুণ্ডের জলস্পর্শ করিয়া মহাদেব দর্শন করিয়া আসিলাম। রাত্রে পাণ্ডার গৃহে উত্তম আহার হইল। ঘরে গরু ছিল, গোদুগ্ধও

বাহিরের দিকের দর-দালানের উৎকীর্ণ কারুকার্য্য—কৈলাস-মন্দির—ইলোরা

সীতা-নাহানি—ইলোরা

পাইলাম। খাঁটি গরুর দুধ। এবার পশ্চিম ভারতে আর কোথায়ও ইহা ভাগ্যে যোটে নাই। সর্ব্বত্রই মহিষের দুধ, গরুর দুধ বলিয়া যাহা বাজারে বিক্রয় হয়, তাহাও মহিষের দুধের সঙ্গে মিশান। পয়সা দিয়াও গরুর দুধ পাওয়া কঠিন। দুধও যাহা পাওয়া

ইন্দ্রসভায় ইন্দ্রাণীমূর্ত্তি—ইলোরা

যায়, তাহাও বিষম আক্রা। পাণ্ডা-গৃহিণী পরিবেষণ করিলেন। দাক্ষিণাত্যে পর্দ্দা-প্রথা নাই। এদেশের রমণীদের পর্দ্দানসীন স্ত্রীলোকের ন্যায় সঙ্কোচ ভাব নাই, কিন্তু নারী-সুলভ সলজ্জ ভাব আছে।

প্রত্যুষে কূপোদকে স্নানাদি শেষ করিয়া আমরা পুনরায় ভগবদ্দর্শন করিলাম ও তখনই গিরিগুহা দেখিবার জন্য মোটরে উঠিলাম। এ গুহাগুলি সমতল ভূমি হইতে প্রায় দুই শত ফুট উচ্চে। রাস্তা অতি সুন্দর। অর্দ্ধ ক্রোশব্যাপী

তিনথাল—১১ সংখ্যক গুহা—ইলোরা

এই মন্দিরগুলিতে সর্ব্বত্রই মোটরে যাওয়া যায়।

যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা ভুলিবার নহে, এ অপূর্ব্ব। বাস্তবিক ইলোরার কৈলাস মন্দিরের তুলনা নাই। তাজের সৌন্দর্য্যে মানবের মন মুগ্ধ হয়, কিন্তু ইহা কৈলাসের ন্যায় অত আশ্চর্য্য বস্তু নহে। রেল কোম্পানি যাত্রী সংগ্রহের জন্য ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। এক খানির লেখক ভারতের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা স্যর জন মার্শাল। তিনি পুস্তকের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, "যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে যে প্রাচীন ভারতের সর্ব্বপ্রধান স্মৃতিচিহ্ন কোন্ গুলি, তাহা হইলে আমি দ্বিধা না করিয়া উত্তর দিব যে, "হিন্দুশিল্পের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন ইলোরার কৈলাস মন্দির ও কোণার্কের সূর্য্যমন্দির; বৌদ্ধশিল্পের নিদর্শন, অজন্তার চিত্রশোভিত গুহা-মন্দিরগুলি ও সাঞ্চির

তোরণসমূহ এবং মুসলমান শিল্পের নিদর্শন আগ্রার তাজমহল।"

ইলোরা, অজন্তা প্রভৃতি যে সব স্থলে গুহা-মন্দির আছে, সেখানে পর্ব্বতগুলিতে মাটির ভাগ কম, অনেক স্থলে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তরময়; সে প্রস্তরও আবার প্রাচীন যুগের কঠিন নিস নামক প্রস্তর। এই সব বিশাল প্রস্তর-খণ্ড খোদিত করিয়াই সাধারণ গুহা-মন্দিরগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু চতুর্দ্দিকের প্রস্তর নিঃশেষে অপসারিত করিয় কৈলাস-মন্দির গঠিত হইয়াছে।

বাঙ্গালী পাঠক অনেকেই বৈদ্যনাথের মন্দির দেখিয়াছেন। এই বৈদ্যনাথ-মন্দিরের চতুর্দ্দিকে যেরূপ বিস্তৃত প্রাঙ্গণ আছে, পাথর কাটিয়া ফেলিয়া কৈলাস-মন্দিরের চতুর্দ্দিকে এইরূপ প্রাঙ্গণ হইয়াছে। মধ্যস্থলে অন্তর্নিহিত প্রস্তরগুলি অপসৃত করিয়া উপরের আবরণটী রক্ষিত হইয়াছে, তাহাই এই কৈলাস-মন্দির। কৈলাস-মন্দিরের প্রাঙ্গণ এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রায় ৩০০ ফুট লম্বা। মন্দিরটী ১৬৪ ফুট লম্বা, ১০০ ফুটেরও অধিক চওড়া ও প্রায় ১০০ ফুট উচ্চ; সুতরাং ইহা বৈদ্যনাথের মন্দিরের অপেক্ষা অনেক বড়। ইহা অপূর্ব্ব কারুকার্য্যবিশিষ্ট প্রস্তরগাত্রে খোদিত চিত্রাবলী-বিভূষিত ও ত্রিতল। এক স্থলে মন্দিরগাত্রে খোদিত চিত্র দেখিলাম, রাবণ মহাদেবকে লঙ্কায় লইয়া যাইবার জন্ত কৈলাস পর্ব্বত স্কন্ধে তুলিবার চেষ্টায় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়াছে। অপর স্থলে দেখিলাম, মহিষাসুর বধের দৃশ্য। মন্দির-গাত্রে বহু মূর্ত্তি। অধিকাংশই শিবমূর্ত্তি, কতক বিষ্ণুমূর্ত্তিও আছে। শিবের তাণ্ডব-নৃত্যের দৃশ্য অতি সুন্দর।

কৈলাস-মন্দিরের অন্তর্বর্ত্তী মন্দির—ইলোরা

প্রাঙ্গণের পার্শ্বে পর্ব্বতগাত্রে খোদিত গুহাদি, বিরাট্ স্তম্ভসমূহ, প্রকাণ্ডকায় হস্তি-মূর্ত্তি ও বহুসংখ্যক দেব-দেবীর মূর্ত্তি আছে। এ মূর্ত্তিগুলির অনেক অংশই ধর্ম্মান্ধ বিধর্ম্মী কর্ত্তৃক বিধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু তবু এখনও যাহা আছে তাহা কত সুন্দর।

শিল্পকলার অপূর্ব্ব নিদর্শন এই কৈলাস। কথিত আছে, শত বৎসরে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূটরাজ কৃষ্ণের রাজত্বকালে অষ্টম শতাব্দীতে এই মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। ইহার একটী পাথরও গাঁথা নহে, সবই খোদাই। সে যুগে ডিনামাইট ছিল না, ছেনি বা তজ্জাতীয় যন্ত্র দ্বারাই যখন এই বিশাল
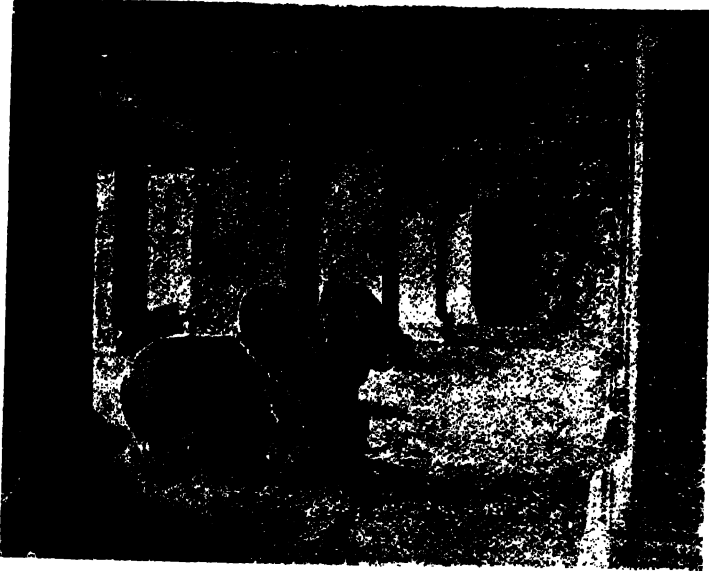
নন্দীশ্বর--ইলোরা
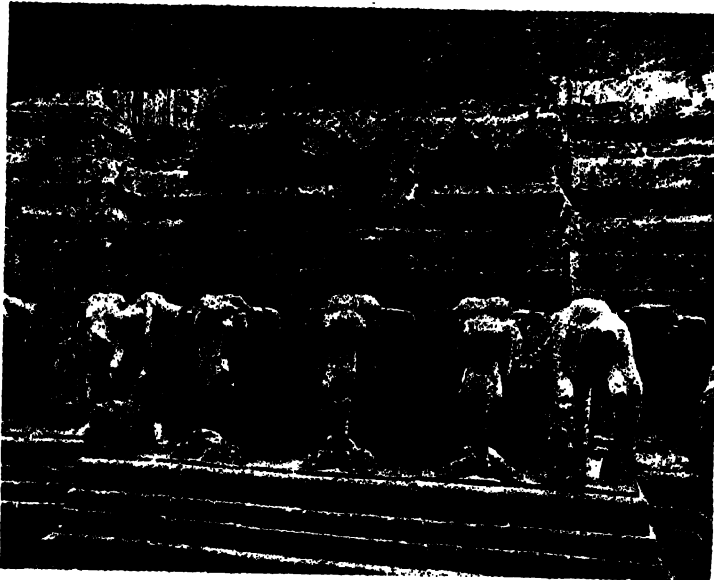
প্রধান মন্দিরের স্তম্ভপাদ-পীঠ—ইলোরা

কঠিন প্রস্তররাশি ভেদ করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল, তখন কত পরিশ্রমই না এই গুহা-মন্দির গুলির জন্য করিতে হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। কি কঠোর সাধনা! কি অগাধ বিশ্বাস! নতুবা এ গুহা-মন্দিরগুলি, যাহা জগতে এক অনন্য-সাধারণ বস্তু তাহা কখনও নির্ম্মিত হইত না। ভারত-স্থাপত্য-কলার বিখ্যাত লেখক ফার্গুসন বলিয়াছেন, "এই কৈলাস-মন্দির ভারতের গুহা মন্দির মধ্যে সর্ব্বাংশে বিরাট্ ও সুন্দর এবং এ দেশে যে শত শত স্থাপত্য-শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন আছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

কৈলাস-মন্দিরের স্তম্ভপাদ-পীঠের হস্তীগুলি যেন সজীব হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এখান-কার সম্মুখ দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটী দ্বারপাল দ্বার রক্ষা করি-তেছে। ইহারা কাল-ভৈরব। একটীর চিত্র এখানে প্রদত্ত হইল। কৈলাস-মন্দিরের অন্ত-র্বর্ত্তী মন্দিরের গঠন কার্য্য ও খোদাই কার্য্যের নমুনা প্রধান মন্দিরের খোদাই কার্য্য অপেক্ষা কোন অংশে যে হীন নয়, তাহা চিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

ইলোরায় প্রায় ৩০টী গুহা-মন্দির আছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মা-

বলভীদের, বৌদ্ধদিগের ও জৈনদিগের মন্দির আছে। তন্মধ্যে জৈন-মন্দিরগুলি সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা কম; ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক। বৌদ্ধ-মন্দিরগুলি দক্ষিণাংশে, জৈন-মন্দির গুলি উত্তরাংশে ও হিন্দু-মন্দিরগুলি মধ্যস্থলে অবস্থিত। বৌদ্ধরাই প্রথমতঃ এই গুহা-মন্দিরগুলি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন, সম্ভবতঃ খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতকে সর্ব্বপ্রাচীন মন্দিরটী নির্ম্মিত হয়। অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দু ও বৌদ্ধ-মন্দিরগুলি নির্ম্মিত হয়। জৈন-মন্দিরগুলি উহার পরবর্ত্তী কালের।

কৈলাস-মন্দির দেখিয়া আমরা অন্যান্য হিন্দু-মন্দিরগুলি দেখিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ গুলি পর্ব্বত-গাত্রে খোদিত। কৈলাস-মন্দির ব্যতিরেকে আরও চারিটী হিন্দু-মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ গুলি দশাবতার, নীলকণ্ঠ, সীতা-নাহনি ও তিন-থাল নামক মন্দির। শেষোক্তটী ত্রিতল বিরাট্ মন্দির। দশাবতার মন্দির দ্বিতল। এই মন্দিরে দশাবতারের মূর্ত্তি খোদিত আছে; এ মূর্ত্তিগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ। সপ্তম শতকের রাষ্ট্রকূট নৃপতি-দের নামোল্লেখ এই মন্দিরে
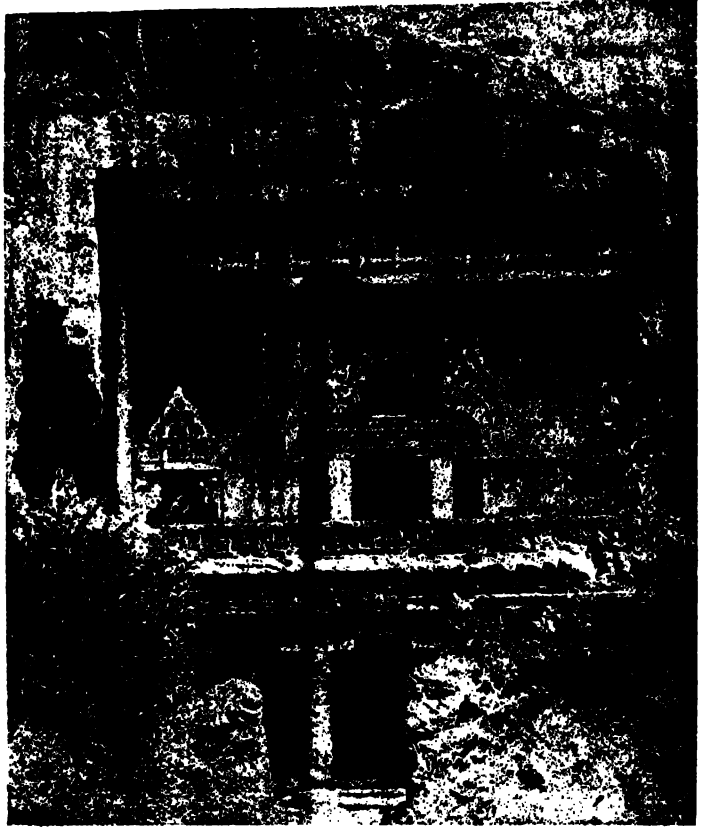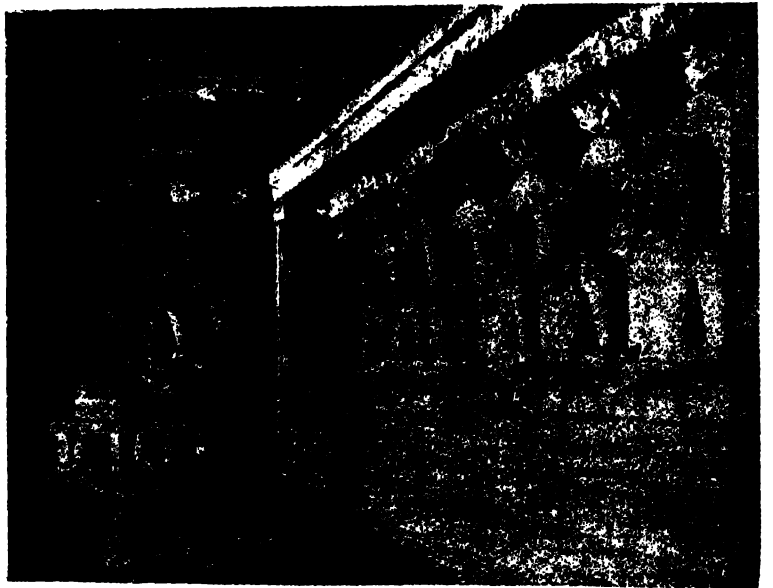
সূত্রধরের কুটীরের বহির্ভাগ—ইলোরা

১২ সংখ্যক গুহার বুদ্ধমূর্ত্তি—ইলোরা

অজন্তার খোদিত স্তম্ভ

সংখ্যক গর্ভগৃহের প্রাচীরোপরি চিত্র—অজন্তা

রাণীর প্রসাধন—অজন্তা
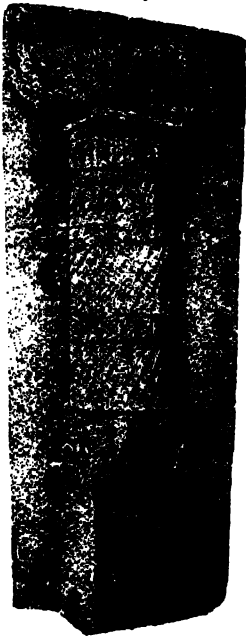
আছে। দ্বিতল ও ত্রিতল মন্দিরগুলির উপরের অংশ বহুবিধ কারুকার্য্য-পূর্ণ; ইহাতে বুঝা যায়, উপর হইতেই ক্রমে ক্রমে এগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে।

সীতা-নাহনি নামক যে গুহা-মন্দিরটী আছে, সেটী বহুসংখ্যক স্তম্ভবিশিষ্ট ও বিস্তৃত। তাহার অবস্থানও মনোরম। পার্শ্বেই পর্ব্বতগাত্র বহিয়া একটী জলপ্রপাত আছে; সেই জল এই গুহা-মন্দিরের পার্শ্বেই পতিত হইতেছে ও তথায় একটী সুন্দর হ্রদ সৃষ্টি করিয়াছে। সেই জলের কতক অংশ স্রোত বহিয়া নিম্নদেশে চলিয়া যাইতেছে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, সীতাদেবী বনবাস-কালে এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন ও এই হ্রদে স্নান করিতেন।

১৯ সংখ্যক গর্ভগৃহে খোদিত মূর্ত্তি—অজন্তা

বিশ্ববিশ্রুত বোধিসত্ত্ব—অজন্তা

বৌদ্ধ-মন্দিরগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বিশ্বকর্ম্মা মন্দির। ইহা একটী অপূর্ব্ব সামগ্রী। ইহা দ্বিতল প্রকাণ্ড একটী সৌধ। এমন ভাবে নির্ম্মিত যেন ইহা কাষ্ঠনির্ম্মিত বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। ছাদে যেন কাঠের কড়ি; অবশ্য সবই পাথর। যে হল ঘরটী ইহাতে আছে, সেটী ৮৫ ফুট লম্বা, ৪৩ ফুট প্রশস্ত ও ৩৪ ফুট উচ্চ।

যেখানেই বৌদ্ধ গুহামন্দির দেখিয়াছি, সেখানেই অন্ততঃ একটী চৈত্য-মন্দির আছে। ইলোরায় ত এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। চৈত্য-মন্দিরগুলিই বৌদ্ধদিগের উপাসনা-স্থান। ইলোরায় একটী মন্দিরের অভ্যন্তরে একটী ক্ষুদ্রাকৃতি চৈত্য বা স্তূপ রক্ষিত। সেখানেই ভিক্ষুরা গৃহিগণকে উপদেশ দিতেন। চৈত্য-মন্দিরগুলির নির্ম্মাণ-কৌশল অতি সুন্দর। শ্রোতাদের বসিবার জন্য স্থান হলের মধ্যে ও উপরে আছে। এ চৈত্য-মন্দিরগুলি প্রাচীনযুগের খৃষ্টীয় গির্জ্জার ন্যায় দেখিতে। সূর্য্যালোকের জন্য সম্মুখের দ্বারের উপর বিস্তৃত প্রবেশপথ আছে।

জৈন মন্দিরগুলি সংখ্যায় পাঁচ ছয়টী হইলেও এ গুলি একটী মন্দিরেরই সমষ্টি। সবগুলি পরস্পর সংলগ্ন ও এক ঘর হইতে যেমন অন্য ঘরে যাওয়া যায়, সেইরূপ এ গুলিরও একটী হইতে অন্যটীতে যাওয়া যায়। এ গুলি সূক্ষ্ম কারু-কার্য্য-বিশিষ্ট; পর্ব্বতে যেন জীবন্তমূর্ত্তি শিল্পীর কৌশলে সৃষ্ট হইয়াছে। জগন্নাথ-সভা, ইন্দ্র-সভা ও পরশুরাম-সভা নামক তিনটী জৈন মন্দির প্রধান; তন্মধ্যে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র-সভা।

এই মন্দির গুলিতে সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুদের বাসের জন্য পর্ব্বতগাত্র হইতে গৃহ খোদিত হইয়াছিল। যাহাতে অনেকে বসিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে পারেন, তজ্জন্য বড়

বড় হল-ঘর তৈয়ার হইয়াছিল, সে গুলি এখন শূন্য অবস্থায় আছে। সন্ন্যাসীদের জন্য সুন্দর জলের ব্যবস্থা। কয়েক স্থলেই দেখিলাম ঘরের মধ্যেই এক কোণে নির্ম্মল জলের কূপ।
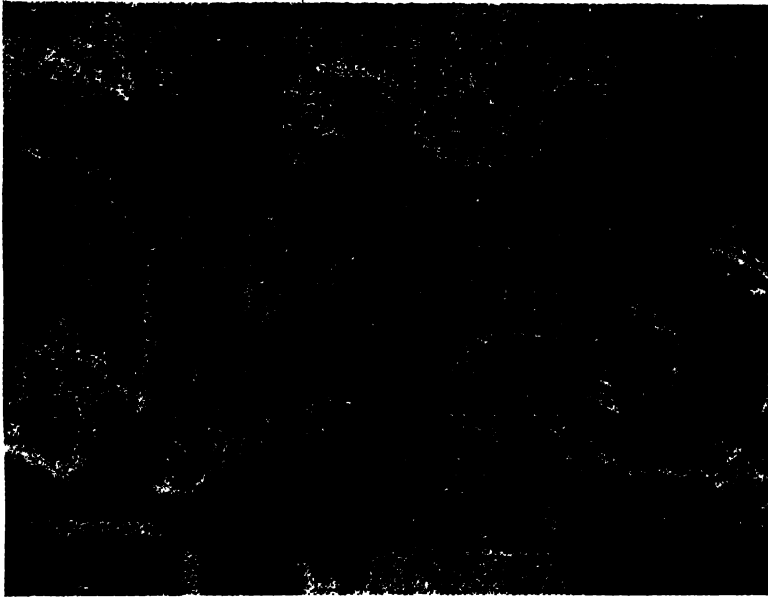
বারান্দার অঙ্কিত চিত্র—অজন্তা (১৭ সংখ্যক গুহা)

ইলোরার গুহা-মন্দির গুলির খোদিত কারু-কার্য্য জগতের শিল্পী ও সৌন্দর্য্য-পিপাসু লোকদিগকে প্রতি বৎসরই আনয়ন করিয়া থাকে। এ চিত্রগুলিকে শুধু চোখের দেখায় দেখিলে চলেনা—প্রাণের অনুভূতির সাহায্যে দেখিতে হয়। এগুলি দর্শকের ধ্যান-ধারণার সামগ্রী হওয়া চাই। কতশত বৎসর পূর্ব্বে এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের নরনারী তাহাদের ইষ্টদেবতা সুন্দর শ্রীভগবানের পূজার্চ্চনাদির জন্য যে বিরাট্ কল্পনা করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ধর্ম্মপ্রাণ শিল্পীরাও ভক্তের বাসনার অনুরূপ মন্দির ও গুহা গঠন করিয়া চিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন। সূক্ষ্ম-তক্ষণ-কার্য্যের নমুনা হিসাবেও এগুলির মূল্য বড় কম নয়। যাহাদের ভাগ্যে এগুলি দেখিবার সুবিধা হয় নাই তাহাদের 'দুধের স্বাদ-ঘোলে মিটাইবার মত' আমরা কয়েক খানি চিত্রের প্রতি-

প্রবেশ-পথে অঙ্কিত চিত্রাবলী—অজন্তা

লিপি দিলাম। পর্ব্বত কাটিয়া তৈরী গর্ভগৃহের কারুশিল্প বাস্তবিকই মনোরম। সূত্রধর-কুটীরের বহির্ভাগ নন্দী মন্দিরে অবস্থিত বৃহৎ ষণ্ডটী সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের পরিচায়ক। বুদ্ধোপাসনার মন্দিরও ১২ সংখ্যক গুহার বুদ্ধমূর্ত্তি বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মপ্রাণতার যেমন পরিচয় দেয়, সৌন্দর্য্যের দিক্ হইতেও তেমনই অভিরাম।

অজন্তা ও ইলোরা ভারতের গৌরব-সামগ্রী। এ গুলি ধ্বংসের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল। লর্ড কর্জন ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি রক্ষা করিবার সুব্যবস্থা করিয়া, দেশের মহৎ উপকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই চেষ্টার ফলে নিজাম বাহাদুর তাঁহার রাজ্যস্থিত এই অপূর্ব্ব গুহা-মন্দিরগুলি ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

আমরা যখন গুহা-মন্দিরগুলির সম্মুখে প্রথম উপস্থিত হই, তখন এক জন লোককে গুহাগুলি দেখাইবার জন্য সঙ্গে লইলাম। দেখা শেষ হইলে তাহাকে সামান্য পারিশ্রমিক দিলাম; তাহাতেই সে সন্তুষ্ট হইল।

বেলা দশটার পর আমরা পুনরায় পাণ্ডা মহাশয়ের বাড়ী ফিরিলাম ও তথায় আহার করিয়া বেলা দ্বিপ্রহরে দৌলতাবাদ ষ্টেশনে আসিয়া মোটর ছাড়িয়া দিলাম। বেলা চারিটার সময় মন্মাদে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

মন্মাদে রাত্রে ধর্ম্মশালার বাহিরের বারান্দায় আমরা শয়ন করিয়া কতক্ষণ দুর্গন্ধ ভোগ করিয়া একটু নিদ্রা যাইতেছি, এমন সময় দ্বিপ্রহর রাত্রিতে দুই জন পুলিসের নামধাম লিখিয়া লইল। নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়াতে আমরা বড়ই বিরক্ত হইলাম ও নাসিক জেলার পুলিসের কর্ত্তার নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ করিয়া পত্র লিখিলাম। পাটনায় আসিয়া উত্তর পাইলাম যে, যাহারা আসিয়াছিল তাহারা তাহার লোক নহে, সম্ভবতঃ আবগারি বিভাগের বা রেলের লোক হইবে। কিন্তু ইহারা যে পুলিসের লোক, এ বিষয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ নাই। রাত্রি শেষে আমরা পুনরায় রেলে জব্বলপুর অভিমুখে প্রায় ১০০ মাইল যাইয়া জলগাঁও ষ্টেশনে প্রাতে নামিলাম। সঙ্গে এক জন মাত্র ভৃত্য

১ সংখ্যক গুহা—অজন্তা। [মধ্যবর্ত্তী মন্দিরের বুদ্ধমূর্ত্তি]

আফিস আদালত আছে। ষ্টেশনে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া আমরা নিকটেই সহরে গিয়া, অজন্তা যাতায়াত জন্য এক খানি মোটরকার ৩৫৲ দিয়া ভাড়া করিলাম। সহরে দেখিলাম, কেবলই উকীলের সাইনবোর্ড; "খানাবলে"র সংখ্যাও কম দেখিলাম না। অজন্তা হইতে সাড়ে তিন মাইল দূরে ফারদাবাদ নামক স্থান পর্য্যন্ত ভাল রাস্তা। মোটর ফারদাবাদ পর্য্যন্তই লইয়া যায়।

মন্দির ও বুদ্ধমূর্ত্তি (১৯ নং গুহার অভ্যন্তর)—অজন্তা

অজন্তা যাইতে হইলে তিনটী পথ। এক, জলগাঁও হইতে; এ পথে দূরত্ব ৩৮ মাইল, কিন্তু জলগাঁওতে যানের সুবিধা হেতু এই পথই সুগম। দ্বিতীয় পথ, জল-লাইন অজন্তা হইতে বার মাইল দূরবর্ত্তী জামনের নামক স্থানে গিয়াছে, সেই জামনের হইতে। তৃতীয় পথ, এই শাখা লাইনের পাহুর ষ্টেশন হইতে গিয়াছে; ইহার দূরত্ব আরও কম। জামনের ষ্টেশনে মোটর পাওয়া দুষ্কর, পাহুর ষ্টেশনে পাওয়া যায় না। জলগাঁও হইতে পথ জামনেরের মধ্য দিয়া গিয়াছে; দেখিলাম, তথায় টঙ্গা আছে।

জলগাঁও হইতে বাহির হইয়া কার্পাস ও বজরার ক্ষেত দেখিতে দেখিতে একটা অনতি-উচ্চ পর্ব্বত অতিক্রম করিলাম—ইহা বিন্ধ্যেরই অংশ। তাহার পর সমতল মাল-ভূমি। অবশেষে ফারদাবাদ পঁহু-ছিলাম। সেখানে অজন্তা-যাত্রীর জন্য একটী বাংলো আছে। তথায় একটী কার্পাসের জিনিং মিল বা কল দেখিলাম। যাত্রিগণ সাধা-রণতঃ এই বাংলোতে থাকিয়া গো-যানে সাড়ে তিন মাইল যাইয়া অজন্তা দেখেন। আমাদের ভাগ্যে এক ফোর্ড মোটর গাড়ী জুটিল। জলগাঁও সহরের মথুরাবাসী কয়েক জন মিষ্টান্ন-বিক্রেতা এক খানি ফোর্ড লরী ভাড়া করিয়া অজন্তা দেখিতে গিয়াছিল, তাহাদিগকে ফারদাবাদে নামাইয়া দিল। আমরা ৫৲ টাকায় সেই লরী ভাড়া করিলাম। মোটর-চালক যুদ্ধের ফেরতা অসাধারণ কর্ম্ম-কুশল, গাড়ীও মোটর-শ্রেষ্ঠ ফোর্ড; নতুবা এই দুর্গম পথ দিয়া দুইটা প্রস্তরময় পার্ব্বত্য নদী অতিক্রম করিয়া আমরা অজন্তায় মোটর-যানে যাইতে পারিতাম না। যাহা হউক, অজন্তায় অবশেষে আমরা উপস্থিত হইলাম।

অজন্তার যে পর্ব্বতগাত্রে গিরিগুহাগুলি খোদিত

উচ্চ সিঁড়ি বহিয়া উঠিয়াই গুহামন্দিরে পহুছিলাম। তাহার উপরে আরও কিছু দূর পাহাড় আছে। স্থানটী অতি মনোরম ও নির্জ্জন। তিন দিকে অশ্বক্ষুরের আকৃতিবিশিষ্ট পর্ব্বত; সেই পর্ব্বত-মধ্যে একটী জলপ্রপাত। প্রায় অর্দ্ধ মাইল ব্যাপিয়া মোট ২৯টী গুহামন্দির, কতক সমাপ্ত, কতক বা অসমাপ্ত অবস্থায় আছে। নিজাম বাহাদুর এ গুহামন্দির-গুলির রক্ষার সুব্যবস্থা করিয়াছেন। এক জন সজ্জন মুসলমান চিত্রশালাধ্যক্ষ (কিউরেটার) যাত্রিগণকে চিত্রাবলী বুঝাইয়া দেন। এগুলি সমস্তই বৌদ্ধমন্দির; খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তখন নিকটে নগর ছিল, এখন নাই। গুহা-মন্দিরগুলি নগরের অনতিদূরেই নির্ম্মিত হইত। তাহার কারণ যে সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুকগণ নগরে ভিক্ষা করিতে পারিবেন, অথচ নগরের বাহিরে থাকায় তাঁহাদের সাধনার ব্যাঘাত হইবে না। অজন্তা গুহামন্দির-গুলি প্রাচীন চৈনিক পরিব্রাজকগণ দেখিয়া গিয়াছিলেন। এগুলি ইলোরার গুহামন্দিরের ন্যায় অত সুন্দর নহে। অত উচ্চও নহে, অত শিল্পকৌশলও নাই এবং অনেক গুলিতেই বিনা আলোকসাহায্যে প্রবেশ করা যায় না। অজন্তার গৌরব কিন্তু তাহার অপূর্ব্ব সুকুমার চিত্রাবলী। সেই অতীত যুগে শিল্পীরা কি চিত্রকলাই না আঁকিয়াছেন, কালবশে তাহার অধিকাংশই ধ্বংস ও ম্লান হওয়া সত্ত্বেও উহা সমস্ত সভ্যজগতকে মুগ্ধ করিয়াছে। এই চিত্রাবলীই বর্ত্তমান বাঙ্গালার চিত্রপদ্ধতিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। জন্যই তিন বার ভারতবর্ষে আসেন ও অজন্তা সম্বন্ধে এক খানি মূল্যবান্ গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

যে ২৯টি মন্দির আছে, তাহার মধ্যে চারিটী চৈত্য-মন্দির ও পঁচিশটী বিহার। বিহারগুলি ভিক্ষুদের বাসের জন্য। বিহার মধ্যে অনেকগুলিই স্তম্ভবিশিষ্ট
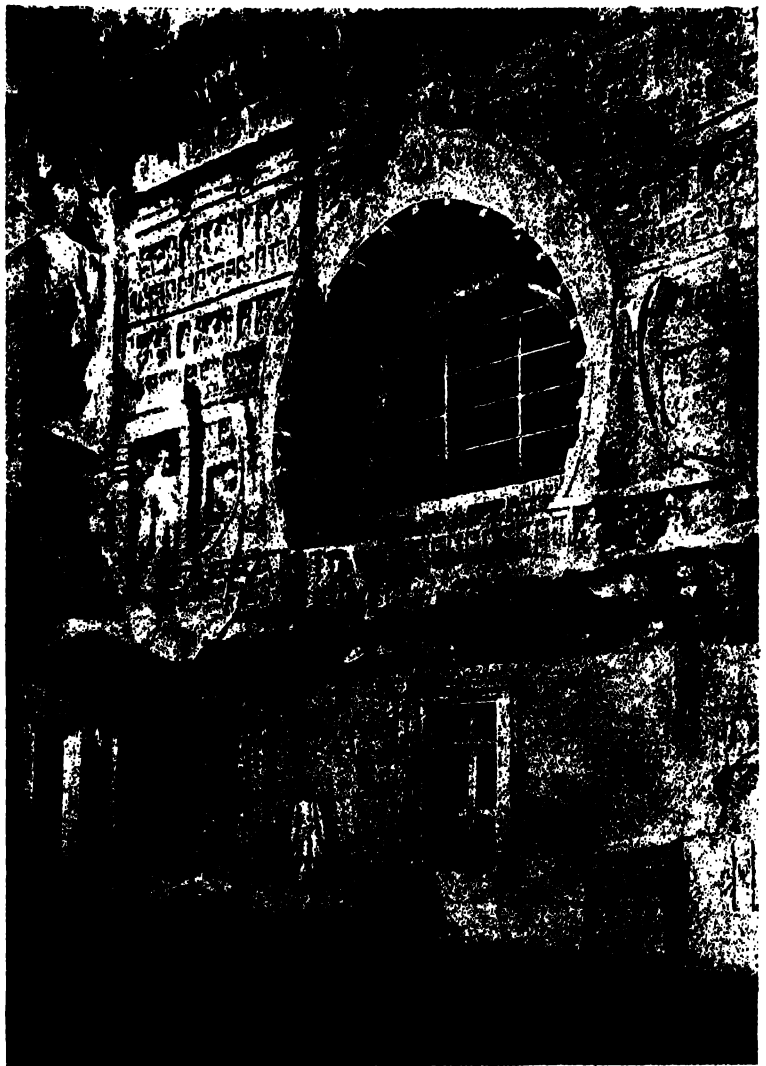
২৬ সংখ্যক গুহার সম্মুখভাগ—অজন্তা

বৃহৎ হলঘরের ন্যায়। এই সব বিহারে শত শত ছাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত হইত। একটী চৈত্য ও কয়েকটী বিহার অসমাপ্ত অবস্থায় দেখিলাম। অজন্তার সর্ব্বপ্রাচীন চৈত্য-মন্দিরটী ৯৬ ফুট লম্বা।
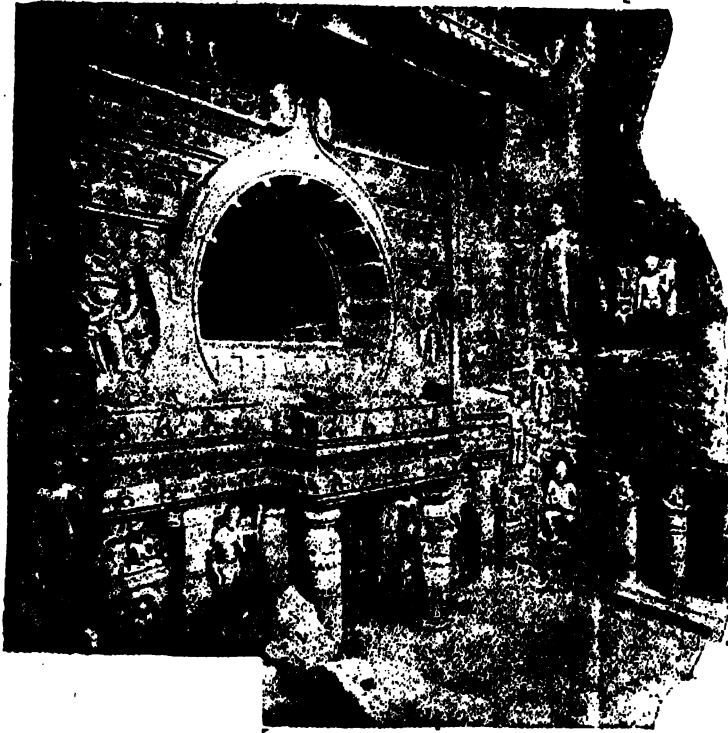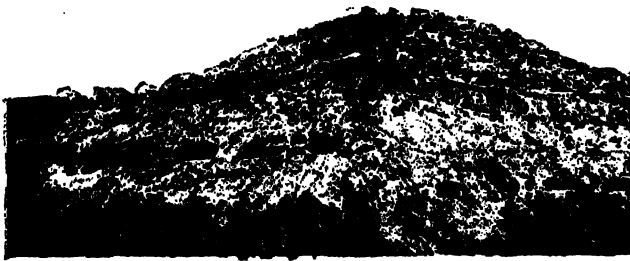
নাই। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর চিত্রাবলী ২, ১৬ ও ১৭ সংখ্যক মন্দিরে। শেষোক্ত দুইটী মন্দির পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তরাজগণের আমলে নির্ম্মিত। মন্দির অভ্যন্তরে প্রাচীর গাত্রে কি অপূর্ব্ব চিত্র। অনেক চিত্রেই বুদ্ধের জীবনের ঘটনা-সমূহ অঙ্কিত হইয়াছে। কোথায়ও বা জাতকের আখ্যায়িকা চিত্রাকারে অঙ্কিত। সর্ব্বপ্রধান চিত্র, বুদ্ধদেবের বিবাহ ও মার কর্ত্তৃক বুদ্ধদেবকে প্রলুব্ধ করিবার বৃথা প্রয়াস। একটী চিত্রে দেখিলাম পাটলীপুত্র নগর হইতে অশোকপুত্র মহেন্দ্র ও অশোককন্যা সঙ্ঘমিত্রার লঙ্কা-প্রয়াণ। অনেক অপূর্ব্ব চিত্রই চূণকাম করায় পূর্ব্বে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মানুষ ইহার বহুবিধ শত্রুতা করিয়াছে। আধুনিক কালে সন্ন্যাসিগণ বাস করিয়া ও গুহামধ্যে রন্ধন করিয়া অনেক ক্ষতি করিয়াছেন। ইংরাজ সৈন্য-মধ্যে কেহ কেহ চুরি করিতেও লজ্জা বোধ করে নাই। এক জন ইংরাজ কাপ্তান কতকগুলি ক্ষোদিত প্রস্তর লইয়া গিয়া সহস্র পাউণ্ডে বিক্রয় করেন; এখন না কি উহা মার্কিণে আছে।

এখানকার চিত্রের সূক্ষ্ম কারু কার্য্যের নমুনা দেখাইবার জন্য আমরা কয়েকটী চিত্র দিলাম। ইলোরার তক্ষণ কার্য্য সম্বন্ধে যে সকল অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে এখানকার তক্ষণ কার্য্য সম্বন্ধে তাহা সম-ভাবেই প্রযুজ্য।

১৯ সংখ্যক গর্ভগৃহের বহির্ভাগ—অজন্তা

অজন্তার দৃশ্য

গুহামন্দিরগুলি ও চিত্রাবলী ধ্বংসের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল। লর্ড কার্জনের যত্নে ও চেষ্টায় এ গুলি যথাসম্ভব রক্ষা পাইয়াছে। নিজাম বাহাদুর ইহার রক্ষার জন্য যথেষ্ট ব্যয় করিতেছেন। এ চিত্রগুলি কি অমূল্য, তাহা একটী ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। নিজাম বাহাদুর সামান্য একটু স্থানে লুপ্তপ্রায় চিত্রাবলীর পুনরুদ্ধার করাইয়াছেন। এ কার্য্য না কি এক জন ইতালীয় চিত্রকর ও এক জন বাঙ্গালী শিল্পী করিয়াছেন ও ইহাতেই শুনিলাম যে সত্তর হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। চিত্রের কি অদ্ভুত রং ছিল; সহস্রাধিক বর্ষেও ইহা একবারে লোপ পায় নাই।

চিত্রাবলী ব্যতীত অজন্তা গুহামন্দিরের প্রাচীরে এবং দ্বার ও স্তম্ভের উপর বহুবিধ মূর্ত্তি ও অন্যান্য প্রতিকৃতি ক্ষোদিত আছে। একটী চিত্রে দেখিলাম, শুইবার জন্য বিছানা ও বালিস। ইংলণ্ডে চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বালিসের ব্যবহার ছিল না, ভারতে ইহা কত কাল হইতে ব্যবহৃত হইতেছে। এই সব চিত্র ও মূর্ত্তি হইতেই প্রাচীন কালের ভারতের সভ্যতার ও ভারতের তৎকালীন সমাজের অনেক কথা জানা যায়। তখনকার আচার-ব্যবহার, বেশ-ভূষা, যানবাহন, খাদ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক তথ্যই ইহাতে জানা যায়। অনেক চিত্র যেন মূর্ত্তি। এক জন দিনেমার শিল্পী লিখিয়াছেন যে, "অজন্তায় প্রকৃত ভারত-শিল্পের পরা কাষ্ঠা; ইহার সমগ্র গঠন হইতে ক্ষুদ্রতম মুক্তা বা পুষ্পের চিত্র পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই গভীর শিল্প-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।"

এই সব গুহামন্দিরগুলি কোনটী বা কে রাজার দান, কোনটী রাণীর দান, আবার কোনটী বা কোনও ধনী শ্রেষ্ঠীর বা বণিক্‌সঙ্ঘের দান। দশ নম্বরের যে চৈত্য-মন্দিরটী আছে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; সেটী—বসতিপুত্র নামক এক জনের দান। চৌদ্দ নম্বরের গুহাটীর সম্মুখে প্রকাণ্ড বারান্দা আছে ও ১৫ নম্বর গুহাতেই অধিকসংখ্যক মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে।

আমরা যখন অজন্তায় ছিলাম, তখন দেখিলাম একটী ইংরেজ সিভিলিয়ান তাঁহার কন্যা-সহ অজন্তা দর্শন করিতেছেন। তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নিজ দেশে যাইতেছেন ও যাইবার পূর্ব্বে অজন্তা দেখিতে-ছেন। তিনি বলিলেন, পাঁচ দিন যাবৎ ফারদাবাদ হইতে

অজন্তার ২৬ সংখ্যক গর্ভগৃহের অভ্যন্তর
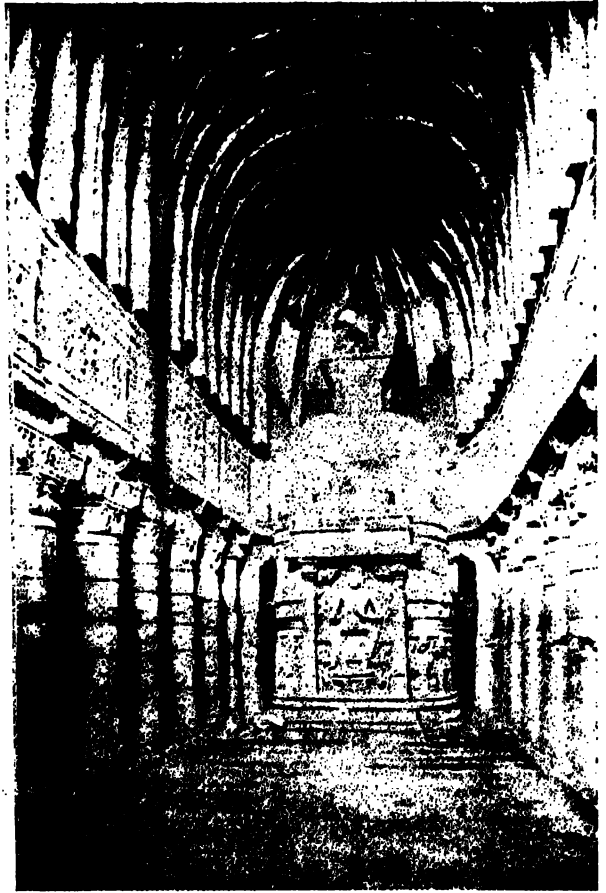
গো-যানে আসিয়া অজন্তা দর্শন করিতেছেন ও অজন্তার চিত্রাবলী বিশেষ-ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। দেখিলাম, ইনি বাস্তবিকই সৌন্দর্য্যের মন্দিরে তীর্থযাত্রী।

আর অজন্তার কথা বলিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাহি না। আমরা দ্বিপ্রহরের পর অজন্তা হইতে সেই প্রাচীন ফোর্ড গাড়ীতে ফারদাবাদ আসিলাম। তখনও স্নানাহার হয় নাই। জলগাঁও হইতে আমরা যে মোটর-

ফিরিলাম। তখন বেলা তিনটা। আসিয়া আমরা স্নানের পর কিছু ফল ও মিষ্টান্ন খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম; পরে সন্ধ্যার পর "খানাবলে" আহার করিয়া রাত্রেই মন্মাদ রওয়ানা হইলাম।

পাঠককে বারবার "খানাবল" বা স্বদেশী হোটেলের কথা বলিতেছি; তাহাতে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, এ সব স্থানে নিরামিষ ভোজনের কষ্ট স্বীকার করিয়া তাঁহারা অজন্তা বা ইলোরা দেখিতে যাইতে পারিবেন না। তবে তাঁহারা খাদ্যাদি সঙ্গে লইতে পারেন ও বড় বড় ষ্টেশনে রেলের হোটেলে ভোজন করিতে পারেন। তবে এ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া যাঁহারা দু চার দিন নিরামিষ ভোজনে কষ্ট বোধ করেন, আমি তাঁহাদের জন্য দুঃখিত।

পাঠক মনে করিতে পারেন আমরা মন্মাদ হইতে কেন পুনরায় ফিরিয়া জলগাঁও গিয়াছিলাম। মন্মাদ যাইবার পথেই তথায় নামিলেই হইত। পূর্ব্বে আমরা জানিতাম না যে জলগাঁও হইতেই অজন্তা যাইবার সুবিধা, সেইজন্যই পূর্ব্বে আমরা জলগাঁওতে নামিয়া অজন্তা যাই নাই।

গৌড়পতির ভৃত্য

(গাথা)

[রায় সাহেব শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ]

ক দীর্ঘকাল-লভ্যোধ্বা শাস্তে ভক্তিঃ ক চ প্রভৌ।
বিধাতুরস্তসাধ্যং তদ্যদ্ গৌড়ৈর্বিহিতং তদা।—রাজতরঙ্গিণী

(১)

কাশ্মীর হ'তে আইল ফিরিয়া গৌড়-পতির ভৃত্য।
কত নদনদী দুর্গম গিরি,
বন উপবন লঙ্ঘন করি
আসিল আবার রাজপুরে ফিরি
আহত পীড়িত ক্ষিপ্ত।
কাশ্মীর হ'তে একা সে ফিরিল গৌড়-পতির ভৃত্য

(২)

মৌন আজি রে গৌড়-নগর সবার নয়নে নীর।
নাহি বাজে তূরী, ভেরী নাহি বাজে,
রাজপথে কেহ নাহি ধায় কাজে,
হয় হাতী রথ কিছু নাহি সাজে—
আনত সবার শির।
হইল আঘাতে সে অশনির।

(৩)

"অতি দুরাচার কহি গো আবার নৃপতি ললিতাদিত্য!
দেবতার দেহ করি পরশন,
কাশ্মীরপতি করিলা যে পণ
রাজ-অতিথির দেহ মান ধন
রক্ষা করিব সত্য।"
কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল সভায় গৌড়-পতির ভৃত্য।

(৪)

"ত্রিগামে সেদিন নিদ্রিত পুরী আঁধারে ঢাকিল ধরা।
দুর্গম-পথ-শ্রান্তি-মগন
নিদ্রিত ছিনু অনুচরগণ
তুষার বহিয়া মত্ত পবন
ছোটে পাগলের পারা।
সত্য ভাঙিয়া হত্যা করিবে ভাবি নাই কভু মোরা।"

(৫)

"গৌড় সে দিন অনাথ হইল নিহত হইলা রায়।
দস্যুর মত প্রবেশিয়া পুরে
অসি ক্ষুরধারে কাটিল প্রভুরে
তবু রবি শশী পরিহাসপুরে
গগন উজলি ধায়।
প্রাণ বলি দিল অনুচর সবে, কাঁদিতে রহিনু হায়।"

(৬)

"চাই চাই চাই প্রতিশোধ চাই" গরজি উঠিল সবে।
চোখের পলকে খুলি' তরবার
হুঙ্কার করে বীর বাঙ্লার—
"উচিত দণ্ড দিব এইবার
চল জয় জয় রবে।
প্রাণ বলি দিয়া মান বাঁচাইব কীর্ত্তি রহিবে ভবে।"

(৭)

পরিহাসপুরে কেশব কি শব ? নতুবা বলিব কিরে ?
সেই দেবতায় প্রতিভূ করিয়া
অতিথির প্রাণ লইল হরিয়া
হিমগিরি তবু গেল না খসিয়া
পড়িল না বাজ শিরে ?
বঞ্চনা শুধু করে কি সেথায় দেবতায় আর নরে ?

(৮)

রুষিয়া উঠিল গর্জ্জন করি শতেক বঙ্গবীর।
"উপাড়িয়া তুলি' সেই নারায়ণ
গঙ্গা-সলিলে দিয়া বিসর্জ্জন—
করিব আমরা তবে তর্পণ
মুছিনু নয়ন-নীর।
কাঁদিবার তরে আছে বহুকাল ভূমিতে লুটায়ে শির।"

(৯)

কোথা বা গৌড় কোথা কাশ্মীর—পথের নাহিক শেষ।
কত নদী-গিরি কত সে কানন,
দুর্গম অতি অতি সে ভীষণ
হেলায় লঙ্ঘি' করিল গমন
ধরিয়া ছদ্মবেশ।
হৃদয়েতে জ্বালা নয়নে বহ্নি ছিল না শ্রান্তি-লেশ।

(১০)

সে দিনো আছিল ঘোর অমানিশা ঘন সে তিমিররাশি।
সে দিনো বহিল মত্ত পবন—
গম্ভীরে করে দেওয়া গরজন
পরিহাসপুরে নিদ্রা-মগন
কাশ্মীর দেশ-বাসী।
মন্দির-দ্বারে মিলিত হইল বঙ্গের বীর আসি।

(১১)

চকিতে তাহারা প্রবেশ করিল চূর্ণ করিয়া দ্বার।
অসিতে অসিতে বাদ্য বাজিল,
ভল্লে ভল্লে অগ্নি ছুটিল,
তপ্ত শোণিতে সিক্ত হইল
প্রাঙ্গণ দেবতার।
মন্দিরে যবে প্রবেশিল সবে ভাঙ্গিয়া তোরণ দ্বার ;

(১২)

লুটায়ে পড়িল কত যে মুণ্ড রত্নবেদিকা ঘিরে।
দেবের মুরতি রজতে গঠিত
চোখের পলকে করি চূর্ণিত
কাশ্মীর-অরি বধি শত শত
কেহ না আসিল ফিরে।
গৌড়-পতির ভৃত্য তাহারা মৃত্যুরে জয় করে।

———

কোটালিপাড়ার গ্রাম্য কবি

[অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম্‌-এ]

বিভিন্ন সংস্কৃত সূক্তিগ্রন্থ যেরূপ সংস্কৃত ভাষার ছোট বড় অনেক কবির কবিত্বের নিদর্শন বক্ষে ধারণ করিয়া তাহাদিগকে বিস্মৃতির অন্ধকার হইতে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছে, মধ্যযুগের বাঙ্গালা বৈষ্ণবপদসংগ্রহাত্মক গ্রন্থগুলিও সেইরূপ অনেক কবির কাব্যকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। কবিত্বের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে ইহাদের সকল গুলি কবিতাকেই যে উচ্চস্থান দেওয়া যায় তাহা নহে—তবে এই গ্রন্থগুলি হইতে আমরা যুগে যুগে দেশের চিন্তার ধারা, কাব্যের আদর্শ ও রচনার ভঙ্গীর ইতিহাস আলোচনা করিবার যথেষ্ট উপকরণ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয় বৈষ্ণব-পদাবলী ব্যতীত বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্য প্রকার রচনাভঙ্গীর নিদর্শনের কোনও সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রাচীনকালে সঙ্কলিত হয় নাই। রায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর মহাশয় সঙ্কলিত বঙ্গসাহিত্যপরিচয় নামক বিশাল গ্রন্থে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন প্রকারের রচনার নিদর্শন প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ভাল হউক মন্দ হউক আরও নানাজাতীয় রচনার পরিচয় আমরা বাঙ্গালার নানা স্থান হইতে পাইয়া থাকি।

এই সকল রচনা অনেক স্থলেই লিখিত পুস্তকাকারে জন-সমাজে প্রচার লাভ করে নাই। অথচ সঙ্গীত বা আবৃত্তির মধ্য দিয়া ইহারা নানা স্থানের জন-সাধারণের তৃপ্তি সাধন করিয়াছে। আমি এস্থলে কেবল অশিক্ষিত সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত গ্রাম্যসঙ্গীতাদির উল্লেখ করিতেছি এমন নহে। শিক্ষিত রসজ্ঞ সমাজে সুপরিচিত পুরাণ-কথকদিগের রচিত সঙ্গীতগুলিও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া, এমন কবিও অনেকে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন দুর্ভাগ্যবশতঃ যাঁহাদের রচিত কাব্য মুখে মুখে স্থানীয় জনসমাজে আদরলাভ করিয়া থাকিলেও লিখিত আকারে কোনও দিনই জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত হয় নাই। লিখিত প্রতিলিপির একান্ত অভাবে অথবা অপ্রাচুর্য্যে উপরিনির্দ্দিষ্ট রচনাসমূহ দিন দিন যে লোকের নিকট কেবল অপরিচিত হইয়া পড়িতেছে তাহা নহে—তাহাদের ক্ষীণস্মৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত-রুচি আধুনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। ফলে আমাদের সাহিত্যের পূর্ণ ইতিহাস প্রস্তুত হইবার সময় তাহাদের অতি অল্প পরিচয় প্রদান করাও ঐতিহাসিকের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইবে সন্দেহ নাই। সুতরাং ইহাদের সম্পূর্ণ সংগ্রহ সম্ভবপর না হইলেও অন্ততঃ আংশিক ভাবে ইহাদের পরিচয় সঙ্কলন করা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

এইরূপ কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা-বোধ দেশের অনেকের মধ্যেই জাগিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাহারই ফলে, বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় নানা স্থানের গ্রাম্য সঙ্গীত প্রভৃতি প্রকাশিত হইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সম্পাদকতায় পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম্য-সঙ্গীতের অতি সুন্দর সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম্‌-এ, মহাশয় সাধারণের নিকট অপরিচিত ভট্টপল্লীর সুকবি আনন্দচন্দ্র শিরোমণির দীর্ঘ বিবরণ ও কাব্যালোচনা 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন (মাসিক বসুমতী —১৩৩৩—অগ্রহায়ণ—পৃঃ ২৩৩ প্রভৃতি)। কিছু দিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঁকুড়ার পদকর্ত্তা রাজা লছ্‌মী নারায়ণের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন (ভারতবর্ষ ১৩৩৫—পৌষ—পৃঃ ১৬-২২)। ইনি ১৭১৬ শকাব্দে স্বীয় পদগ্রন্থ সমাপ্ত করেন। অবশ্য দুঃখের বিষয় এই যে, কার্য্য তেমন শৃঙ্খলার সহিত বিধিবদ্ধভাবে হইতেছে না।

মুখবন্ধ আর বিস্তৃত না করিয়া এখন আমি আমার প্রধান বক্তব্য আরম্ভ করিব।

ফরিদপুরের দক্ষিণ প্রান্তে ফরিদপুর ও বরিশালের সংযোগস্থলে অবস্থিত কোটালিপাড়া অতি প্রাচীনস্থান

বলিয়া ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন। মধ্যযুগে এই কোটালিপাড়া সমগ্র বাঙ্গালাদেশের সমাজ ও পাণ্ডিত্যের ইতিহাসে এক অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। সমগ্র ভারত-বিশ্রুত পণ্ডিতও জন্মগ্রহণ করিয়া এই কোটালিপাড়াকে পবিত্র ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন। কোটালিপাড়ার সংস্কৃত বিদ্যার তথা সেই পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের বিস্তৃত আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে করিবার ইচ্ছা আছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি কোটালিপাড়ার কয়েক জন সাধারণের অপরিচিত বা অল্প-পরিচিত গ্রাম্যকবির* পরিচয় প্রদান করিব। ইঁহাদের মধ্যে তিন জন পুরাণ-কথক এবং ইঁহারা সকলেই প্রায় সমসাময়িক। ইঁহারা সকলেই বঙ্গাব্দের ত্রয়োদশ শতকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সকলেরই রচনার রীতি অনেকাংশে এক প্রকারের। ইঁহাদের রচনায় অনুপ্রাস, শ্লেষ প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। সেই যুগের অন্যান্য বঙ্গীয় কবির রচনার মধ্যেও আমরা এই বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকি। ইঁহাদের অনেক কবিতাই আধ্যাত্মিক বিষয় লইয়া রচিত। এই আধ্যাত্মিক কবিতাগুলির ভাষা ও ভাবের উপর ভক্ত কবি রামপ্রসাদের প্রভাব অতি পরিলক্ষিত হয়। রামপ্রসাদের কবিতার ন্যায় এগুলির স্পষ্টরূপে মধ্যেও আমরা অনেক স্থলেই রূপকের আতিশয্য দেখিতে পাই। এরূপ রচনাও বোধ হয় সে যুগের একটা বৈশিষ্ট্য। ফলতঃ, রামপ্রসাদের রচনার রীতি ও গানের সুর পরবর্ত্তী আধ্যাত্মিক কাব্যের উপর যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার কথা ভাবিলে সত্য সত্যই বিস্মিত হইতে হয়।

একটা কথা এস্থলে বলা দরকার। আমরা যে কয়জন কবির বিষয় এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব তাঁহারা ছাড়া অন্যান্য কয়েকজন কবিও এই যুগে কোটালিপাড়ায় জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। খুব প্রাচীন না হইলেও তাঁহাদের রচনার কোনও নিদর্শন বহুচেষ্টা করিয়াও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও রচনা কবিত্বপূর্ণ হইলেও সামাজিক কুৎসা প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ থাকিত। তাহাদের দুই একটী নমুনা বৃদ্ধদের মুখে এখনও শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেগুলি সাধারণ্যে প্রচারের অযোগ্য। তবে অবসর মত অন্য কয়েকজন কবির বিবরণও ক্রমে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

রঘুমণি বিদ্যাভূষণ*

১২৩৫ বঙ্গাব্দে ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া পরগণার অন্তর্গত বান্ধল গ্রামে গৌতম-গোত্রীয় গঙ্গাগতি বৈষ্ণব মিশ্রের বংশধর ৵ পদ্মলোচন ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র রঘুমণি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি এক জন প্রসিদ্ধ পুরাণ-কথক ছিলেন। ইঁহার পিতা, পিতামহ প্রভৃতিও সুকথক এবং সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার রচিত সঙ্গীতগুলির অনেক গুলি সংস্কৃতে, কতকগুলি সংস্কৃত বাঙ্গালা মিশ্রিত। যথা—

কুরু ময়ি কাতরে করুণাদানং।
বিতর হে মুরহর! চরণে স্থানং॥
ত্রিতাপ বিষমজ্বরে তাপিত কলেবরে
তব নাম নিরন্তরে পরম রসায়নং॥ (২১নং সঙ্গীত)

যে গুলি বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় রচিত সে গুলির মধ্যেও নির্বিভক্তিক সংস্কৃত শব্দই বেশী।

যথা—

জয় শিব শূলী শশধর-ভালী
শবাস্থিমালা-মালক হে।
জয়াশুতোষক! জনগণপোষক!
পরমপ্রলয়-বিনাশক হে॥১॥
মদন-বিমর্দ্দক! শোভি-কপর্দ্দক!
ভবসাগরজন-তারক হে।

* একথা এস্থলে বোধ হয় না বলিলেও চলিতে পারে যে গ্রাম্য শব্দ আমি নিন্দার্থে প্রয়োগ করি নাই। যাঁহাদের কাব্যের পরিচয় এস্থলে প্রদত্ত হইয়াছে তাঁহাদের অনেকেরই কবিত্ব-খ্যাতি গ্রাম অতিক্রম করিয়া তেমন অধিকদূর বিস্তৃত হয় নাই। তাই আমি তাঁহাদিগকে 'গ্রাম্য' শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছি।

* বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পুত্র অধুনা পরলোকগত নীলরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'রঘুমণিকৃত-সঙ্গীত-সার' ; নামক গ্রন্থ হইতে এই বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। ১৩২১ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থের ভূমিকায় ইঁহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবার কথা ছিল, কিন্তু উহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

জয় গিরিজাবল্লভ! নিজজন-সল্লভ!
শঙ্কর! পাতক সংহর হে ॥ ২॥ (পৃঃ ৬৮)

তাঁহার গদ্যরচনায়ও সংস্কৃতশব্দের ও দীর্ঘসমাসের বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

শ্রীকৃষ্ণবর্ণনম্

নবীন-নীল-নীরদ-শ্যাম-সুন্দর নবনাগর, অরুণ-কিরণ চরণতল, শশধর-শোভাকর নখমণ্ডল, মুনিগণ-মনোহর নূপুরাঙ্কিতপাদপদ্মদ্বয়, তদূর্দ্ধে করিকর-ন্যক্কৃত শোভাতিশোভিত উরুযুগল, তদূর্দ্ধে মৃগরাজ-বিরাজিত মধ্যদেশ, হরিতালদ্যুতিহর পরিধৃত-নীলাম্বর, গুরুগভীর নাভি-সংরোবর, তদূর্দ্ধে শ্রীবৎসাঙ্কিত বনমালা কৌস্তুভ-বিরাজিত ভৃগুপাদপদ্ম-চিহ্নিত বক্ষঃ-স্থল (পৃঃ ৯২)

অন্যত্র—

বিকসিত-কোকনদ-বিনিন্দিত-ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-যব-সরোজ-ত্রিকোণ-স্বস্তিকাতপত্রাদিচিহ্ন-চিহ্নিত চরণতল, সংহতাঙ্গুলিসংস্থিত-জিতশশিমণ্ডল নখমণিমণ্ডল, চরণোন্মণি-মৌক্তিকাদি-জড়িত-কনকনূপুরাদিশোভিতপাদগ্রন্থি
(পৃঃ ৯১)

বর্ত্তমান সময়েও অনেক কথক প্রাচীন আদর্শে এইরূপ 'বৃত্তগন্ধি' সংস্কৃত-বহুল গদ্য ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১২৩৫—১৩০৯)

ইনি কোটালিপাড়ার অন্তর্গত পশ্চিমপাড়া গ্রামে ১২৩৫ কি ১২৩৬ সালে আশ্বিনমাসে মঙ্গলবার কৃষ্ণা প্রতিপৎ তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। ইঁহার বিবরণ ইঁহার স্বহস্তলিখিত স্বরচিত একখানি সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীগ্রন্থ হইতে কিছু কিছু প্রাপ্ত হইয়াছি। ইঁহার রচিত স্বহস্তলিখিত কিছু কিছু গ্রন্থ ও সঙ্গীতাদিও আমার হস্তগত হইয়াছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এগুলি ব্যবহারের জন্য আমার নিকট প্রদান করিয়াছেন।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহার আত্মজীবনীতে তাঁহার সাহিত্যিক জীবন অথবা রচিত গ্রন্থাদির কোনও বিবরণ নাই। তার পর তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির অনেকগুলি তাঁহার জীবদ্দশাতেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। ১৩০৩ সালে তিনি অনুসন্ধান করিয়াও তাহা পান নাই। তখন তিনি স্বরচিত যে গানগুলি তাঁহার স্মরণ ছিল তাহা একত্র সংগ্রহ করেন। তাঁহার কবিত্বের পরিচয় আমরা তাঁহার সেই সংগ্রহ হইতেই প্রাপ্ত হই। উহার ভূমিকা স্বরূপ তিনি লিখিয়াছিলেন—"১২৬৬ কি ৬৭ সনে উদ্ধবসংবাদ এবং তৎপরে নন্দ-বিদায় তৎপর কুরুক্ষেত্রমিলন এই তিনটী যাত্রার পালা এবং ভরত-আগমন নামক একটী পাচালিগানের পালা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ঐ সমস্ত গান ও পাঁচালির কোন বহি এক্ষণ তালাসে পাওয়া যায় না। ঐ পালার লেখা যে যে গান স্মরণ আছে তাহা ক্রমে লিখিতেছি।" গানগুলির উপরেও যে যে বই হইতে :তাহাদিগকে নেওয়া হইয়াছে তাহাদের নামোল্লেখ আছে। ইহা ছাড়া, তিনি শনির পাঁচালি ও সত্যনারায়ণের পাঁচালি নামে দুই খানি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সুদূর পল্লীতে বসিয়া যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এত গুলি পুস্তক লিখিয়াছিলেন—ইহা তাঁহার অসাধারণ সাহিত্যপ্রীতির নিদর্শন বই আর কিছু নহে।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বভাবকবি ছিলেন। লেখাপড়া তিনি তেমন বেশী কিছু করেন নাই বা করিবার সুযোগ পান নাই। তিনি আত্মজীবনীর মধ্যেই লিখিয়াছেন—"শিশুকালের অবস্থা স্মরণ নাই। দ্বিপচন্দ্র ধর এবং জগৎ মজুমদার সরকারের নিকট সামান্য বাঙ্গালা লেখাপড়া করিয়াছিলাম। অর্থের অভাব এবং এ দেশের তৎকালের প্রথা অনুসারে অন্য কোন বিদ্যাশিক্ষা কিংবা চাকরী করিতে কাহারও উৎসাহ ছিল না।" এই অনুৎসাহের কারণ যাহা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা সহজেই অনুমেয় হইলেও এ স্থানে উল্লেখ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। তিনি লিখিয়াছেন—"পূর্ব্ব হইতে লাগায়ত ১২৬৪ কি ১২৬৫ সন পর্য্যন্ত ধান্য এক টাকায় দশ কাঠা, ভাল চাউল ১৵৹ এক মোন ৷৵৹ আনা, তৈলের মোন ৩৲৹ টাকা, ঘৃত ১ টাকায় ৴৫ পাঁচ সের, খেসাড়ি ডাইল সের ৻৫ এক পাই, এবং ভাল ইক্ষু গুড় সের ৻১০ আধ আনা, ভাল দুধ পাকা সের ৻৫ পাই। মৎস্য বেড়ে (ডোবাতে), খালে, পুষ্করিণীতে অভাব ছিল না কাহারও খরিদ করিতে হইত না। আহারীয় সমস্ত

বস্তুই অতি সস্তা দরে খরিদ ও বিক্রয় হইত। দেশী সূতা দ্বারায় জোলার তৈয়ারী ধুতি ও সাড়ী ৵০ ঊর্দ্ধ ৵৴০ জোড়ার মূল্য ছিল। তাহা ৭।৮ মাস ব্যবহার করিতে কষ্ট হইত না। পূজার সময় কলের সূতায় তৈয়ারী ১খানি করিয়া ধুতি ও সাড়ী পরিবারগণের পরিধান করার জন্য দোকান হইতে আনার নিয়ম ছিল। বিলক্ষণ স্মরণ আছে ঐরূপ মূল্যে সকল বস্ত্র খরিদ করিয়াছি। কাজেই লোকের সংসারি ব্যয় অতি সাধারণ রূপ লাগিত বলিয়া সকলেই একরূপ শান্তিতে ছিল, কষ্ট স্বীকার করিয়া বিদেশে বিদ্যাভ্যাস কিংবা চাকরীর চেষ্টা অনেকে করিত না।" কালক্রমে অবস্থার বহু পরিবর্ত্তন হইলেও বর্ত্তমান কালেও দেখিতে পাওয়া যায় জীবিকার সংস্থান যাহাদের আছে তাহাদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার আগ্রহের একান্ত অভাব না হইলেও প্রাচুর্য্য নাই এ কথা সত্য। তবে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি একটু অতিশয়োক্তি-দোষদুষ্ট। কারণ, তৎকালে কোটালিপাড়ায় বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন—অনেক চতুষ্পাঠী ছিল—বঙ্গের নানাস্থান হইতে ছাত্রগণ আসিয়া সেখানে অধ্যায়ন করিত। ফলতঃ কোটালিপাড়া সংস্কৃতশিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। তবে, অন্যান্য স্থানের ন্যায় কোটালিপাড়ায়ও তখন বর্ত্তমান কালের ন্যায় সাধারণের মধ্যে লেখাপড়ার বহুল প্রচার ছিল না।

লেখাপড়ায় বিশেষ অভিজ্ঞ না হইলেও স্বভাব-কবি কালীচরণের কবিতার অতুল্য শব্দসম্পদ্দর্শনে মুগ্ধ হইতে হয়। তাঁহার রচনায় অনুপ্রাস ও শ্লেষাদি অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে কারণ 'কাব্যের কসরত' স্বরূপ এইগুলি কবির পাণ্ডিত্যই খ্যাপন করিয়া থাকে। আর একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সংস্কৃত শব্দ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিলেও কালীচরণ তাহাদের বিশুদ্ধ বর্ণ-বিন্যাসপদ্ধতি অবগত ছিলেন না বলিয়াই বোধ হয়। তাঁহার স্বহস্তলিখিত আত্মজীবনী ও তাঁহার সঙ্গীতগুলির মধ্যে বহুশঃ পরি-দৃশ্যমান অতি সাধারণ বর্ণাশুদ্ধিগুলিই তাহার প্রমাণ। তাঁহার বর্ণাশুদ্ধির দুই একটী নিদর্শন এস্থলে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি 'ব্যবহার' স্থলে 'বেবহার,' 'শান্তি' স্থলে 'শান্তী,' 'সিংহ' স্থলে 'সীংহ' প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা ছাড়া বাঙ্গালা শব্দগুলির স্থলেও তিনি এইরূপই করিয়াছেন। যথা—আমী, করিয়াছী ইত্যাদি।

কালীচরণের কবিতায় প্রথম লক্ষ্য করিবার বিষয় শব্দ-সম্পদ্ ও শব্দালঙ্কারের বাহুল্য। উদাহরণস্বরূপ তাঁহার শনির পাচালি হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইতেছে।

গ্রহগণ-পতি অগতির গতি
পতিতে করুণা কর।
দীন-দৈন্য অতি নাহি অন্য গতি
দাসের দুর্গতি হর॥
ওহে বিশ্বরূপ তব দৃশ্য রূপ
অপরূপ ধ্যানে ধরে।
অতি সুনির্ম্মল বরণ উজ্জ্বল
জিনি নীল জলধরে॥

এইরূপ সত্যনারায়ণের পাচালিতে—

নিবেদন শুন বিপদ-নাশন
ডাকিলে না শুন কানে।
হে পীতবসন শমন-শাসন-
বিনাশন বলে কেনে॥
হে বিশ্বব্যাপক ত্রিলোক-পালক
তুমি গোলোক-বিহারী।
শোক-বিনাশক দুঃখ-নিবারক
কাতর-তারক হরি॥
নীরদবরণ বিপদ-বারণ
ত্রিলোক-তারণ-কারি।
লৈয়েছি স্মরণ ভব-নিস্তারণ
বিতর চরণ-তরি॥

গুরু গম্ভীর শব্দ ব্যবহার না করিয়া এইরূপ সরল তর্ তরে ভাষার মধ্যে শ্লেষ, অনুপ্রাস প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহার বিশেষ নিপুণতার পরিচয় সন্দেহ নাই। আর স্থানে স্থানে শব্দবিন্যাসে এমন চাতুর্য্য আছে যাহাতে অর্থ-প্রতীতি হইবার পূর্ব্বেই হৃদয়ে অভিপ্রেত ভাবের উদয় হয়। শব্দ-বিন্যাসের সাহায্যেই এইরূপ ভাবের উদ্রেক করিবার সামর্থ্যও অল্পশক্তির পরিচায়ক নহে। সত্যনারায়ণের পাচালির মধ্যে এক স্থলে নৌকায় গমনের সংক্ষিপ্ত বিব-

রণের মধ্যে এই চাতুর্য্য বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যথা—

হরি স্মরি সদাগরি করিবারে যায়।
চলে তরি সারি সারি দাড়ি সারি গায়॥
পবন গমন হেন কখন না হয়।
জিনিয়া তড়িৎ তরি ত্বরিত চালায়॥
বহুদেশ ত্যজি শেষ হরিষ অন্তরে।
সদাগরে স্বসত্বরে উত্তরে সহরে॥

তাহার গানগুলির মধ্যেও এইরূপ সরল সচ্ছন্দ ভাষায় অনেক স্থলেই ভগবদ্-ভক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ একটী মাত্র গান এ স্থলে উদ্ধৃত হইল। যথা—

রাঃ আলেয়া—তাঃ একতাল।

কর করুণা করুণাময়।
হর স্বগুণে সম্প্রতি দীনের দুর্গতি
আমি মূঢ়মতি অতি দুরাশয়।
অগতির গতি ওহে সতীপতি পতিতে তা[illegible]বায়॥
তুমি স্বয়ম্ভু-সেবিত সংসারের স্বা[illegible]
স্তীর্য্য
সুরেন্দ্র-বন্দিত শম্ভু সর্ব্বগামী।
কে জানে তদন্ত ওহে অন্তর্য্যামী অনন্ত না অন্ত পায়॥
তুমি ত্রিপুরান্তকারী ত্রিলোক-তারণ
ত্রিসংসারসার ত্রিগুণ-ধারণ।
জনম মরণ কর নিবারণ যে জন স্মরণ লয়॥
ত্যজে মণিহার ফণিহার ধর
পীযূষ আর বিষ সদৃশ তোমার।
অধমে শঙ্কর ত্যজ্য নাহি কর নির্ভর সেই ভরসায়॥
কালী দীন বলে বৃথা গত দিবে
দিবে কর স্থতে যদি ফাকি দিবে।
সেব সদাশিবে অশিব নাশিবে না আসিবে পুনরায়॥

শুনা যায়, কালীচরণ খুব দ্রুত রচনা করিতে পারিতেন। সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বন করিয়া তিনি এই রূপ অতি দ্রুত কবিতা লিখিতেন। সমসাময়িক স্থানীয় ঘটনার ইঙ্গিত থাকায় সেগুলি সাধারণের বোধগম্য নহে। এইরূপ রচনার অনেকগুলির মধ্যেই সমাজের ব্যঙ্গ এবং হাস্যরসের বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান কালের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বর্ত্তমান বেশভূষার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার মধ্যে বেশ নির্দ্দোষ ব্যঙ্গ ও হাস্যরস অন্তঃস্যূত রহিয়াছে। তাহারই কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধার করিয়া কালীচরণ-প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

শুন পোষাকের নিয়ম বলি
ছিল তসর নামাবলি
ক্ষীরোদ গরদ চেলি
যে সব বসন।

(হইল) সমাগত শেষ কলি
ক্রমাগত সে সকলি
অসভ্যের লক্ষণ বলি
করে না গ্রহণ॥

উত্তম ধুতি চাদর
ভ্রমে কেহ করে না দর
কালক্রমে অনাদর
হয়েছে তাহার।

(হৈল) নব্য কল্প অল্পদিন
বাছা পোষাক কাছা হীন
ইকীন কোট পেন্টুলীন
সদা ব্যবহার।

(থাকে) কোট পীরনে শরীর আটা
পায় মুজা বুট হাতে ছোটা
সাহেবে ফ্যাসানে হাটা
অল্পে চটা মন।

মালা গলে ভালে ফোটা
হাল চলনে অচল ওটা
হিন্দুধর্ম্মে ভারী লেঠা
ঘটেছে এখন॥

(কিন্তু) এক বিষয় সাহায্য ভারি
নাপিতের নাই মাজুরি
ছাটা চুল গালপাটা দারি
খৌরি নাই মোটে।

কে হিন্দু কে মুসলমান
করা যায় না অনুমান
সেলাম কি করি প্রণাম
ভাবি সঙ্কট ঘটে॥

১৩০৯ সালের ১২ই মাঘ তারিখে কোটালিপাড়ার অপ্রসিদ্ধ কবি কালীচরণ রক্তামাশয় রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কৃষ্ণকুমার বিদ্যারত্ন*

(১২৬১—১৩২২)

ইনি কোটালিপাড়ার অন্তর্গত পশ্চিমপাড়া গ্রামে ১২৬১ বঙ্গাব্দে ১লা ফাল্গুন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা, জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতা সকলেই পণ্ডিত ছিলেন। ইনি নিজেও কলাপ ব্যাকরণ, সাহিত্য ও ন্যায়ের পক্ষতা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত-সাহিত্যে ইঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। কথকতায় ইনি বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এরূপ সুপণ্ডিত কথক সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। কথকতা-প্রসঙ্গে ইনি স্থানে স্থানে শাস্ত্রবিচারের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া নিজের অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ভারতের বর্ত্তমান সম্রাটের অভিষেকাবসরে ভারতে আগমন উপলক্ষে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার উদ্দেশ্যে ইনি সরল সংস্কৃতে কয়েকটী সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। 'শ্রীরাজভক্তি-কুসুমাঞ্জলি' নামে ইহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষায় ইনি বহু সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলি বিশেষ কবিত্ব-পূর্ণ। তবে দুঃখের বিষয় সেগুলি এখন আর একত্র কোথাও পাওয়া যায় না। নানাস্থানে নানালোকের মুখে বিচ্ছিন্ন ভাবে তাহাদের কিছু কিছু শুনিতে পাওয়া যায়। ইঁহার যে গানগুলি আমার হস্তগত হইয়াছে তাহাদের সকলই ঈশ্বরের মহিমাব্যঞ্জক। একটী গানে শ্লেষালঙ্কারের অপূর্ব্ব সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। গানটীর মধ্যে রাগ-রাগিণীর নামগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—কিন্তু ঐগুলি অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—

(মন) ভাব **মুলতানে**
তাকে বসাও **গৌরী**-সনে একাসনে॥
ভৈরব ভৈরবী যে ভাবে অন্তরে
আশাবরীর কৃপা হয় তার পরে।
তার কি ভাবনা যেতে **সিন্ধু**-পারে
দেশের মায়া রয় না মনে॥

ভগবানের অতুল মহিমা কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে কবি গাহিয়াছেন—

কেশব তব যে সব কর্ম্ম
তারি মর্ম্ম কে বা জানে।
তুমি কাকে হাসাও কাকে কাঁদাও
কাকে বসাও সিংহাসনে॥
জলেতে নিভাও অনল
রাখ অনল সেই জলে
বাড়বানল তাকে বলে।
দাবানল রাখ বনে
অনলে পোড়াও ইন্ধনে
রাখ অনল সেই জলে॥
এ সন্ধান কেবা জানে
এ জগতে তুমি বিনে॥
নাশিতে চকোরের ক্ষুধা
সুধাকরে দিলে সুধা
আকাশে বারি চাতকেরি পিপাসা নিবারণে।
তব মায়া কে জানিতে পারে
স্পর্শেতে মাতঙ্গ মরে
রূপেতে পতঙ্গ মরে
লোভে গন্ধে মীন মরে
রসের আশে ভৃঙ্গ মরে
(আবার) সঙ্গদোষে পুরুষ মরে
অঙ্গ নারীর পরশনে॥

বিদ্যারত্ন মহাশয় ১৩২২ সালের ১৪ই আশ্বিন পরলোকগত হন।

রাজকুমার কথক

উল্লিখিত কবিগণের পরবর্ত্তী—সুতরাং অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও ইঁহার রচিত পালা ও সঙ্গীত আমি বহু চেষ্টা করিয়াও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে কথক এবং কবি হিসাবে ইঁহার খ্যাতি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। তাঁহারই সুযোগ্য ছাত্র শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী কাব্যতীর্থ মহাশয় তাঁহার রচিত

* বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সাহিত্য-শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে আমি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বিবরণ ও তাঁহার কয়েকটী সঙ্গীত প্রাপ্ত হইয়াছি। এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

কতকগুলি সঙ্গীত আমাকে প্রদান করিয়া আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, সেজন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহার সঙ্গীতগুলির অনেক গুলিতেই ভণিতায় রচয়িতার নাম উল্লিখিত রহিয়াছে। কিন্তু তিনি এই সকল স্থলে নিজের নাম না দিয়া সহোদর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নাম প্রদান করিয়াছেন। নিজের জিনিস পরের নামে চালাইবার এরূপ দৃষ্টান্ত ভারতীয় সাহিত্যে দুর্লভ নহে। কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট শুনিলাম তিনি 'সীতার বনবাস,' 'দক্ষযজ্ঞ,' 'রাবণবধ,' 'বস্ত্রহরণ', 'অভিমন্যুবধ' ও 'কংসবধ' নামে কতকগুলি পালা রচনা করিয়াছিলেন। এ পালাগুলি তিনি কথকতার সময় স্বয়ং অভিনয় সহকারে গান করিতেন। বড়ই দুঃখের বিষয় কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও যে পালা গানগুলি সাধারণকে আনন্দরসে আপ্লুত করিত অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহা বিস্মৃতির অতলতলে ডুবিয়া যাইতে বসিয়াছে।

ইঁহার রচনায় বেশ একটা সারল্য ও গাম্ভীর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

ইঁহার রচনার অল্প যে কিছু নিদর্শন আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে ইনি একজন উঁচুদরের কবি ছিলেন।

ইঁহার রচনার কয়েকটী নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রাগিণী—আলেয়া।

তরু তুমি ভূমি-তলে দয়াবান্
লোকে গুণ করে গান,
নাহি তব প্রিয় দ্বেষ্য
সম বাস দ্বিজ বৈশ্য
বিশ্ববাসী কি হিন্দু কি মুসলমান।
ফলমূলদল যাতে রুচি যার
খাও নিয়ে যাও ফেল ভাঙ্গ কেউ না করে বাধা কার।
আছে অবিরত অবারিত দ্বার
বলিহারী যেন আনন্দ বাজার॥
কতজীব মলমূত্র পরিলগ্ন মূলপত্র
অণুমাত্র নাহি অপবিত্র জ্ঞান।

সামান্য একটী বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া এমন সুন্দর কবিত্বের প্রকাশ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

রূপকের সাহায্যে আধ্যাত্মিক বিষয় বর্ণনা করিবার প্রথা প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে চলিয়া আসিতেছে। কাব্যগ্রন্থের মধ্যেও এইরূপ রচনার ভূয়োনিদর্শন সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয়ত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। রামপ্রসাদের রচনায় ইহার বাহুল্য সকলের নিকটই সুপরিচিত। রাজকুমারের রচনা হইতে ইহার একটী উদাহরণ দিতেছি।

(আমার) অবশ মানস-ময়না
যামিনী দিবস
দিতেছি সুরস
সে রসে সে বশ হয় না।
সে যখনে যা চায় তখনি যোগাই
খাদ্য পানে বাধ্য থাকিতে না চায়
করে উড়ু উড়ু আমাকে না চায়
হরিপ্রণয়খাচায় রয় না॥
দেখি নেই এমন পাখী দুষ্ট খল
আমি যা শিখাই ভুলে সে সকল
করে অবিকল পরেরি নকল
ফল কথা হরি কয় না।
পেলে অবকাশ প্রণয় না গণে
উড়ি গিয়ে পড়ে বিষয়-বিপিনে
(তার) পাছে ছুটা ছুটি নিশি-দিনে
এ বিপিন-প্রাণ সয় না॥

ভাষা অতি সরল—অথচ ভাব অতি গভীর। ইহা কবির অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

সাথীর সঙ্গ

[শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, বি-এস্-সি]

১

রাঙ্গা কাঁকরের পথ; যেমনই দীর্ঘ তেমনই বিস্তৃত। পথের দুই ধারে বড় বড় গাছ,—গ্রীষ্মের প্রখর দ্বিপ্রহরে শ্যামল ছায়াদান করিবার নিমিত্ত যেন প্রত্যেক বাড়ী আগুলিয়া রহিয়াছে। বাড়ীগুলির অধিকাংশ একতলা এবং বসতিও তত ঘন নয়।

পথের যে ধারটায় বসতির শেষ হইয়া খোলা মাঠে পরিণত হইয়াছে, ঠিক তাহারই সম্মুখে,—পথের ওধারে,—ছোট্ট বাগান-ঘেরা একটী মাঝারি দোতলা বাড়ী। বাগানের বাহিরে, চারিধারের খানিকটা খোলা জায়গায় গুটিকতক নিম, তেঁতুল ও শিশু গাছ থাকিয়া স্থানটীকে একটী বিশিষ্ট শোভায় মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।

যে নিমগাছটা বাগানের বেশী কাছ ঘেঁসা, তাহারই কাছাকাছি অথচ গেট হইতে বেশী দূরে নয়, এমন একটা জায়গায় বৃদ্ধ হরিশঙ্কর চাটুর্য্যে খোলা মাঠের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আরাম কেদারায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় পড়িয়াছিল। মাঠটা বেশ বড়, মাঝে মাঝে দুইচারিটা বড় গাছ থাকিয়া অপর্য্যাপ্ত উন্মুক্ততার ক্লান্তি অপনোদন করিয়াছে। দূরে যেখানে মাঠের পরিসর খুব বাড়িয়া গিয়াছে,—সেখানকার গাছপালা খুব ঘন হইয়া আসিয়াছে, অনেকটা বন-জঙ্গল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বনের পিছনে নদী।

বৃদ্ধ হরিশঙ্কর প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় এইখানে বসিয়া মাঠের দিকে চাহিয়া কি ভাবিত। দৃষ্টিপথে দূরের অদূরের সব কিছু আসিত, কিন্তু কোনটাই তাহার লক্ষ্য আকৃষ্ট করিতে পারিত না; সুতরাং কিছুতেই তাহার মনের উপর রেখাপাত করিত না। পথ দিয়া লোকের আনাগোনা, পথিকের পায়ে চলার শব্দ পথের নির্জ্জনতা ভাঙ্গিয়া হরিশঙ্করকে চকিত করিয়া তুলিত, সে চোখ ফিরাইয়া ইহাদের যাওয়া-আসা দেখিত, কিন্তু এ দেখার সঙ্গে তাহার নিজের মনে কোন সাড়া প্রায়ই জাগিত না। মাঝে-মাঝে দু'এক জন পথিক তাহার উপর বক্রদৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বাঁকিয়া তাহারই বাগানের উত্তর দিকের সরু পথ দিয়া ক্লান্তচরণে ফিরিত। বৃদ্ধ হরিশঙ্কর তাহাদের যাতায়াত শুধু দেখিত মাত্র, চিনিয়া রাখার কোন প্রয়োজন বোধ করিত না। মাল বোঝাই-করা গরুর গাড়ী একটানা ক্যাঁচ্ ক্যাঁচানি শব্দ করিতে করিতে এই পথ দিয়া মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতে থাকিত। ক্রমশঃ আগাইয়া যাওয়ায় শব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইত। তারপর একেবারে নীরবতায় বিলীন হইয়া যাইত, বৃদ্ধ পড়িয়া পড়িয়া উদাসচিত্তে তাহা শুনিত; কিন্তু তাহার প্রাণের মধ্যে কোন স্পন্দন উঠিত না।

হরিশঙ্কর নিত্য দুইবেলা ইহাই দেখিয়া আসিতেছে। এইরূপ দেখা তাহার অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাই দেখা ও দৃষ্টবস্তুর অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া জানিবার এতটুকুও আগ্রহ তাহার হয় না এবং সে অর্থ তাহার কাছে এতই সুস্পষ্ট যে মনে আনার শ্রমটাকেও অনর্থক অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই মনে করা যায় না। তা' ছাড়া, এ বয়সটা এমনিই যে আপনা হইতে সমস্ত স্থির ও শান্ত হইয়া আসিতে থাকে এবং চিত্ত আকাঙ্ক্ষা-শূন্য হইয়া নিরুদ্বেগ হয়। তখন এই আলো-বাতাসের বিচিত্রলীলায় পরিপূর্ণ ধরণীর সঙ্গে নূতন করিয়া পরিচয় করিতে বসা তেমন সাজে না, আর সারা জীবনের পুঁজিপাটার হিসাব-নিকাশ লইয়া তর্কবিচার করিবার প্রবৃত্তিও হয় না; বরঞ্চ তখনও মনে বলে,—'চোখ দুটো এখনও চেয়ে থাকতে পারে,—চেয়েই থাকুক। যা' চোখের সামনে আসচে, তা' আসুক না কেন, আর যেটা এল না সেটা না এলেই ব্যস্, এই তো ভাল।" বসুন্ধরার সহিত যতখানি পরিচয় হইবার প্রয়োজন ছিল তাহা জীবন-প্রভাতে ও মধ্যাহ্নে হইয়া গিয়াছে, এখন এই সায়াহ্নে নূতন কোন পরিচয়ের সম্ভাবনা নাই এবং কোন দরকারও নাই। চেনা-শোনার পালা শেষ হইয়া গিয়াছে

গাছগুলি একা-একা উর্দ্ধমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঋতুর পর ঋতু আসিয়া ঋতু-উৎসবের অভিনব পরিচ্ছদে সাজাইয়া তাহাদের প্রাণবস্তলীলায় লীলায়িত করিতেছে। কিন্তু এমন একটা দিন তাহাদের আসিবে, যখন সে সব খোয়াইয়া, সব হারাইয়া নগ্ন-আড়ষ্টতায় অনন্ত আকাশের ঘন-নীলের দিকে শুধু তাকাইয়া থাকিবে; তার পর কোন্ এক কালবৈশাখীর ঝড়ের তাণ্ডবতার অন্তরালে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। এই তো,—এমনই হয়, এমনই হইতেছে, অনাগত ভবিষ্যতের কালো পর্দ্দার আড়ালে সকলই চিরকালের জন্য লুকাইয়া পড়ে।

কচি কচি সবুজ পাতাগুলি মুক্ত বাতাসের সঙ্গে মূর্ত্ত আনন্দের মত সব একাকার করিবার জন্য উৎগ্রীব আস্ফালনে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে; শীর্ণপাতা নির্ব্বাক্ বিধবার আকুল অশ্রুর মত খসিয়া পড়িয়া মাটির ধূলায় মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদে আপনাকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিতেছে। এই তো হয়! এর আবার মানেই বা কি খোঁজা!

হঠাৎ হরিশঙ্কর চম্‌কাইয়া উঠিয়া সোজা হইয়া বসিল। আপন মনে সে বলিতে লাগিল, "নারায়ণ! নারায়ণ! লীলাময়, এ তোমারই লীলা! তুমিই গড়্‌চ, তুমিই ভাঙ্‌চ। এ দুঃখ-কষ্ট, এ ব্যথা তোমার। তুমিই সব দয়াময়!"

বারংবার সে এই কথাগুলি মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিল, তবুও সে সান্ত্বনা পাইল না, মনের কোণে কিসের একটা বড় খোঁচা রহিয়া গেল।

চোখের সামনে দিয়া চার পাঁচ জন লোক চলিয়া গেল। সে এখন ইহাদের পূর্ব্বের মত অপরিচিত মনে করিতে পারিল না। সে দেখিল, ইহাদের মুখে সেই গড়িয়া তোলার তীব্র ক্ষুধা ফুটিয়া রহিয়াছে, চলার ছন্দ সেই অসীম স্পর্দ্ধাকে প্রকট করিতেছে। একটা গভীর বেদনায় তাহার বুক টন্ টন্ করিয়া উঠিল। ব্যর্থতার বিকট বিদ্রূপ যে তাহার কান্নার ছায়ার সহিত মিলাইয়া ধীর-গতিতে অনুসরণ করিতেছে, ইহারা কিন্তু তাহার কিছুই মানে না!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, হরিশঙ্কর চেয়ারের হাতের উপর একটু চাপ দিয়া ঘাড় ঈষৎ বাঁকাইয়া, খুব দূরে-পড়া বেলার নিস্তেজ রৌদ্র যেখানে গাছের ঘন ডালপালার ফাঁক দিয়া সোজা চলিয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছিল, সেইখানে প্রসারিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

উত্তর দিকের একটা বাড়ীর খিড়কীর দুয়ার খুলিয়া একটা ছোট্ট পাঁচ ছয় বছরের ছেলে সরু পথ দিয়া বাগানের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল এবং চুপ করিয়া এদিক্ ওদিক্ দেখিতে লাগিল। হঠাৎ বাগানের মধ্যে কতকগুলি লাল শাদা রং-এর ফুলের উপর নজর পড়িতেই সেই ফুল-গুলি চুপি চুপি সংগ্রহ করিবার মতলবে বাগানে ঢুকিবার পথ অনুসন্ধান করিতে সুরু করিল। গেটের সাম্‌নে তেঁতুল গাছের তলায় আসিতেই অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় হরিশঙ্করকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

"এ কে? লম্বা শাদা দাড়ীওয়ালা বুড়ো কে? আমাকে ধর্‌বে? কেন ধর্‌বে? আমি কি করেছি? একি খুব রাগী?"

আস্তে আস্তে তেঁতুল গাছের পাশ হইতে উঁকি মারিয়া মুখ বাড়াইয়া হরিশঙ্করকে নিরীক্ষণ করিয়া রাগীর লক্ষণ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিল।

"আমি তো লুকিয়ে ফুল তুল্‌তে এসেছি, কৈ আমাকে বক্‌লে না তো। এ দাদাবাবুর মতন খক্ খক্ করে কাশে না। দাদাবাবু ভারী দুষ্টু। পালিয়ে যাব! কেন পালিয়ে যাব? হাঁ, ধরলেই হ'ল।"

খানিকক্ষণ ধরিয়া দেখার পর সে বৃদ্ধকে ভয় করিবার মত কোন হেতু খুঁজিয়া পাইল না; সুতরাং অনেকটা নির্ভয় হইয়া দৃঢ় পাদক্ষেপে হরিশঙ্করের সম্মুখে আসিয়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি মুনি? এই বনে তপস্যা কর? এটা তো বন না!"

কচি গলার আওয়াজ পাইয়া হরিশঙ্কর চম্‌কাইয়া উঠিয়া এই ছোট্ট উৎসুক জিজ্ঞাসুর দিকে তাকাইল। তাহার বিশাল শুভ্র শ্মশ্রু ও স্থির গম্ভীর প্রকৃতি দেখিয়া ছোট ছোট বালক-বালিকারা কেন, যুবারা পর্য্যন্ত ভড়কাইয়া যাইত। ইহাকে নির্ভয়ে সপ্রতিভভাবে প্রশ্ন করিতে দেখিয়া হরিশঙ্কর বড়ই বিস্মিত হইয়া উঠিল। শুক্ল রাতে যেমন শাদা শাদা ছোট মেঘ চাঁদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিয়া চলিয়া যায়, তেমনি কতকগুলি পুরাতন স্মৃতি হরিশঙ্করের মনের উপর দিয়া লঘুপদে দ্রুত ভাসিয়া গেল; তাহার কোন উত্তর করা ঘটিয়া উঠিল না।

"তুমি যদি মুনি হও, তোমার জটা কৈ? জপের মালা কৈ? উহুঁ, তুমি মুনি নও—"

বালক প্রতিবাদকল্পে প্রবলভাবে মাথা নাড়িল। নিজের সন্দেহ নিজেই নিরাকরণ করার অপূর্ব্ব ভঙ্গী দেখিয়া হরিশঙ্করের মুখে ঈষৎ স্মিত হাসি ফুটিয়া উঠিল।

হরিশঙ্করের মুখে হাসি দেখিয়া বালক প্রশ্ন করিল, "তুমি কি খুব রাগী?"

এমন স্বরে সে প্রশ্ন করিল যে যাহার একমাত্র উত্তর হইতে পারে, "না, সে মোটেই রাগী নয়।" হরিশঙ্কর মাথা নাড়িয়া স্নিগ্ধনয়নে সেই ইঙ্গিত করাতে বালক আরও সাহস পাইয়া হরিশঙ্করের কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল এবং মৃদুমধুরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার চুল এত শাদা কেন? খড়ি মাখিয়ে দিয়েছে বুঝি?—মুছে দেব?" বলিয়া অনুমতির কোন অপেক্ষা না রাখিয়া মুছিয়া দিবার চেষ্টা করিল, অপারগ হইয়া কহিল, "যাঃ, উঠ্‌ল না।"

হরিশঙ্কর কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য মোলায়েম করিয়া কহিল, "বয়েস করেচে ভাই, এ উঠ্‌বে না, আর উঠ্‌বে না।"

"সে কে? আমাকে দেখিয়ে দিও, আমি তা'কে খুব করে' মারব।... ঈশ্‌ আমার সঙ্গে পারলেই হ'ল। আমার গায়ে এতো জোর—"

বালকের বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গীতে হরিশঙ্কর অত্যন্ত মুগ্ধ হইল। বালকের দুই হাত ধরিয়া কোলের কাছে আগ্রহভরে টানিয়া আনিল, তার পর দুই হাত দিয়া বালকের গাল দু'টী সস্নেহে মৃদু চাপিয়া ধরিয়া, স্নিগ্ধনয়নে মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিল, "তুমি বীর নও, তবে বীর কে? গায়ের জোর তোমাদের চাইতে কা'র বেশী? তোমরা সব জয় করতে পার—সব।"

এইরূপ আদরটা বালকের তত ভাল না লাগিলেও গায়ের জোরের প্রশংসা তাহার খুব ভাল লাগিল। হরিশঙ্করের হাত হইতে মুখ ছাড়াইয়া লইয়া আসে পাশে একটু গর্ব্বভরে তাকাইল। তার পর হঠাৎ হরিশঙ্করের হাত ধরিয়া বলিল, "তুমি কা'র দাদাবাবু হও বল না?"

হরিশঙ্কর চমকাইয়া উঠিয়া কহিল, "আমি? আমি কারুর দাদাবাবু হই না।"

হরিশঙ্করের চোখ দুটী ছল ছল করিয়া উঠিল। তাহারও এমনি নাতি, নাতিনী ছিল, আরও হইত। ছেলেটী হরিশঙ্করের এই পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিল না। সে বলিয়া যাইতে লাগিল, "আমার দাদাবাবু ভারী রাগী, কেবল খক্‌খক্ করে' কাশে আর আমাকে বকে! দাদাবাবুর কিন্তু তোমার মত দাড়ী নেই। ... ... দাড়ী কেন সবাইকার হয় না? মা'র একেবারে দাড়ী হয় নি; বাবার হয়, রোজ রোজ কামিয়ে ফেলে কি না, তাই কেউ বুঝতে পারে না। মা'র কেন দাড়ী হয় না?—"

"মেয়েদের দাড়ী হয় না।"

"কেন? হতে নেই বুঝি? শুধু ব্যাটাছেলেদের হয়, না?"

"হাঁ।"

বালক এমন ভাবে মাথা নাড়িল, যেন সে এই উত্তরে তাহার প্রশ্নের সম্পূর্ণ সমাধান পাইয়াছে। তারপর সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, তোমার মত আমার দাড়ী কবে হবে?"

"তুমি যখন আমার মত বড় হবে, তখন হবে।"

হঠাৎ বালকটী সাভিমানে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চাই না আমি দাড়ী! আমি বুঝি ছোট! হুঁ......"

হরিশঙ্কর সস্নেহে হাত ধরিয়া আদর করিয়া কহিল, "না, না, ভাই খোকন্, তুমি খুব বড়, খুব বড়।"

হরিশঙ্করের বলার মাঝখানে বালক বলিয়া উঠিল, "আমি বুঝি খোকন্! তুমি তো ভারী বোকা। আমার নাম সুকুমার, বাবা ডাকে সুকুবাবু।"

"তাই ত, সত্যি তুমি সুকুবাবু, এ কথাটা আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। সুকুবাবুকে খোকন্ বলে ডাকা আমার ভয়ানক অন্যায় হয়েছিল।"

সুকু একটু সলজ্জ আনন্দের দৃষ্টিতে হরিশঙ্করের মুখের দিকে তাকাইল। তার পর বাবা আর কাহাকে কি বলিয়া ডাকে, ছবি—তাহার বোন, কেহ তাহাকে ডাকিলেই বোকার মত সে চারিদিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া দেখে, দাদাবাবু কি রকম বক্‌বক্ করিয়া বেড়ায়, বাবা তাহাকে কত বেশী ভালবাসে ইত্যাদির ইতিহাস অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল। বৃদ্ধ হরিশঙ্কর ইহার পুষ্টকান্তি, কোমল কণ্ঠ, বিচিত্র মুখ-ভঙ্গিমা, চক্ষু-তারকার চঞ্চল নর্ত্তন সতৃষ্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিতেছিল। বালকের বক্তব্য সব ঠিক কাণে পৌঁছাইতেছিল না।

ভোরের বেলায় খোলা জানালার সাম্‌নে একটী ছোট্ট পাখী প্রভাতী কাকলীর সহিত শাখা হইতে শাখায় উড়িয়া বেড়াইতে দেখিলে যেমন একটা আনন্দ হয়, তেমনিতর একটা অপূর্ব্ব আনন্দে হরিশঙ্কর অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল। মনে হইতেছিল এম্‌নি একটা সাথীর সঙ্গ পাইলে শেষ বয়সে আর কোন অভাব থাকে না এবং জীবনটাও দুর্ব্বিষহ হইয়া ওঠে না। সন্ধ্যার সঙ্গে উষার অমিলটাই বেশী, তবুও যেটুকু মিল আছে, তাহার জন্য দুজনাকে পাশাপাশি মানায় বেশ।

সুকুর মনে কি একটা সন্দেহ হইল; সে বৃদ্ধের কোল ঘেঁসিয়া দাড়ী নাড়িতে নাড়িতে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমার কি হও বল না—"

বলিয়া সে বৃদ্ধের চোখের উপর তাহার নিষ্কলঙ্ক জিজ্ঞাসু-দৃষ্টি স্থাপন করিল। হরিশঙ্করের সর্ব্বদেহ যেন শিহরিয়া উঠিল, সে বালকটাকে প্রবল স্নেহে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কেন আমি যে তোমার লক্ষ্মী দাদাবাবু হই—"

সুকু তাহাকে মৃদু ধাক্কা দিয়া তীব্রকণ্ঠে কহিল, "না, দাদাবাবু না—"

"তবে কি হব?"

"দাদাবাবু বড্ড দুষ্টু, ভারী বকে। তুমি দাদাবাবু—কখ্‌খনো না। তা হ'লে কিন্তু আমি রাগ করব, আড়ি করে' দেব—"

"না, না, আড়ি কর্‌বার দরকার নেই। আমি কখ্‌খনো দাদাবাবু হব না।"

সুকুর সহিত তাহার দাদাবাবুর সম্প্রীতি না থাকার দরুণ এই মধুর সম্পর্কটার উপরও সুকুর বিন্দুমাত্র লোভ নাই, হরিশঙ্কর বুঝিল। অথচ এই সংসার-অনভিজ্ঞ ক্ষুদে-আলাপীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপন করিতে হইলে ঠাকুরদাদা-নাতি সম্বন্ধ ছাড়া অন্য সব সম্পর্কই তাহার চোখে বড় বিসদৃশ ঠেকিল। সে ভারী বিব্রত হইয়া উঠিয়া কহিল, "আমি তোমার জ্যেঠামশাই হই—"

"নাঃ—"

দাদাবাবু, জ্যেঠামশাই ইত্যাদি সব বড়, বকিবার অধিকার সকলেরই আছে, সেইজন্য বুঝি সেগুলির একটীও তাহার পছন্দ হইল না। বড়র দিকে অপছন্দ দেখিয়া হরিশঙ্কর ছোট'র দিকে চেষ্টা করিল, "আমি তোমার দাড়ীওয়ালা ছেলে হই।"

"তুমি আমার ছেলে হবে কি করে'? বাবা যে আমার ছেলে হয়।"

"তাই তো—" হরিশঙ্কর দাড়ীতে হাত বুলাইতে লাগিল। খানিক পরে একটু ভাবিয়া বলিল, "আমি তোমার বন্ধু হই—একটা বুড়ো দাড়ীওয়ালা বন্ধু। কেমন? এই ভাল, না?—হাঁ, ঠিক হয়েচে, আমি তোমার বন্ধু।"

সুকু কোন প্রতিবাদ করিল না। কিন্তু সন্দিগ্ধ-নয়নে একবার হরিশঙ্করের মুখের দিকে তাকাইল। তাহার ভরসা হইতেছিল না যে হরিশঙ্করের মত বুড়ো লোক রোজই তাহার বন্ধু হইতে স্বীকার করিবে।

"বেশ ভাই, তুমি আর আমি দুই বন্ধু, রোজ রোজ এখানে খেলা ক'রব। কেমন—ঠিক তো'?"

সুকু মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল, 'বেশ।' তার পর হরিশঙ্করের কোলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খেলা কোথায় ক'রবে? এই বাগানে?"

"হাঁ, এই বাগানে।"

"কেউ বক্‌বে না?"

"আমায় আবার কে বক্‌বে? কেউ বক্‌বে না।"

"তোমার বুঝি মা নেই?"

"না ভাই, আমার মা নেই। আমার কেউ নেই—"

বালকটীর দৃষ্টি সমবেদনায় ম্লান হইয়া আসিল। সান্ত্বনার ছলে বৃদ্ধের গায়ে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহ-মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আমার মা আছে। আমরা দু'জনে ভাগ করে নেব।"

হরিশঙ্করের নয়ন-কোণে দুই বিন্দু অশ্রু জমা হইতে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কাঁদ্‌চ কেন?"

এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যাইবার পর হঠাৎ ছিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়া যেমন রবিকর বাহির হইয়া পড়ে, তেমনি সজল হাসি হাসিয়া বৃদ্ধ হরিশঙ্কর কহিল, "না ভাই।"

তার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "এস আমরা একটু বেড়াই—চল খেলা করি গে।"

সুকু পরম উৎসাহে তাহার হাত ধরিয়া বাগানের ভিতর টানিয়া লইয়া গেল। এফুল ওফুল একটী একটী করিয়া তুলিল। তার পর কোন্ ফুলের কি নাম, কেন

সে নাম হইল, কাহার গন্ধ নাই, কেন নাই, কেন সব ফুল লাল হইল না, গাছে কেন ফুল হয়, গাছ কেন হয় ইত্যাদি বিচিত্র প্রশ্নে হরিশঙ্কর ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। সর্ব্ববিধ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া অসম্ভব বলিয়া হরিশঙ্কর অজ্ঞতা প্রকাশ করিল। বালক অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া অনবরত প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া চলিল।

অস্তগামী রবির শেষ বিদায় চাওয়া গগনপ্রান্তে মেঘের গায়ে রক্তরেখায় ফুটিয়া উঠিল। কুলায় ফেরা পাখীর অস্পষ্ট কলধ্বনি বাতাসে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। সুকু বলিল, "অন্ধকার হয়ে গেল, বাড়ী যাব কি করে?"

হরিশঙ্কর বলিল, "তাই তো ভাই, সন্ধ্যে হয়ে গেছে—"

"তুমি আমাদের বাড়ী চেন? আমি বাড়ী যাব। বাবার জন্যে মন কেমন ক'রচে।"

হরিশঙ্কর চিন্তিত হইয়া উঠিল। ছোট্ট ছেলে এখানকার পথঘাট কিছুই চেনে না, হয় তো কোন্ বাড়ীতে থাকে, তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিবে না। কি রকম বাপ মা, ছেলেকে একলা ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত-মনে বসিয়া রহিয়াছে! হরিশঙ্করের ভারী রাগ হইল।

"চল তোমাকে বাড়ী পৌছে দিয়ে আসি"—বলিয়া ছেলেটার হাত ধরিয়া বাহির হইল।

"তুমি কোন্ দিক্ দিয়ে এসেছিলে? এই দিক্ থেকে? ঐ দিক্ থেকে? চল।"

"এই যে সুকু! কোথায় গিয়েছিলি?" বলিয়া লণ্ঠন হাতে একটী ভদ্রলোক দ্রুত অগ্রসর হইয়া সুকুর হাত ধরিল।

সুকু ঝাঁপাইয়া ভদ্রলোকের কোলে উঠিয়া বলিল, "এই দেখ না, বাবা, কত ফুল—" বলিয়া তাহার পিতার কাণে মাথায় ফুল গুঁজিয়া দিতে সুরু করিল।

ভদ্রলোকটী হরিশঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, "আপনার ওখানে গিয়ে হাজির হয়েছিল বুঝি? ভারী দুষ্টু হয়েচে মশাই, কিছুতেই রাখা যায় না। সুকু তুমি বুঝি খুব দুরন্তপনা করছিলে।"

হরিশঙ্কর একটু ম্লান হাসিয়া বলিল, "সুকু ভাই ভারী লক্ষ্মী ছেলে—ভারী সুন্দর ছেলে! আজ তবে আসি সুকু ভাই।"

সুকু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ, এসো। তারপর মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কাল কিন্তু আরও ফুল চাই, আমি যাব।"

সুকুর বাবা বলিল, "আপনার সঙ্গে দেখ্‌চি খুব আলাপ জমিয়ে ফেলেচে। লোকের সঙ্গে ভাব করতে খুব পটু।"

হরিশঙ্কর প্রত্যুত্তরে একটু হাসিল। সুকুর দিকে তাকাইয়া ঘাড় নাড়িয়া বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া সে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া চলিল। সুকুর বাবা ধন্যবাদ দিবার কোন অবসর পাইল না; বৃদ্ধের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া সুকুকে কোলের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "সুকুবাবু তুমি দিন দিন ভারী দুষ্টু হচ্চ। ফের যদি আবার না বলে' কয়ে' একলা বেরিয়ে এস, তা হলে আমি খুব বকব।"

২

বাগানে ফিরিয়া হরিশঙ্কর একটু বিমনা হইয়া পড়িল। আকাশে তারাগুলি একে একে উঠিতেছে, চাঁদের আলোর উজ্জ্বলতা একটু একটু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। জাগরণের কোলাহলের উদ্দীপনা ক্রমশঃ নিবিয়া আসিতেছে, আরও কিছুক্ষণ পরে সুষুপ্তির কোলে ঘুমাইয়া পড়িবে।

এই আলোর-ছায়ায় মিশানো নীরবতা অতি সুন্দর; এ যেন একটা সুখ স্বপ্ন, মানুষ জাগিয়াই দেখে; এ যেন একটা সন্ধ্যাবেলার ফোটা রজনীগন্ধা, আপনাকে ঘিরিয়া রূপ-গন্ধের একটী ছোট্ট মায়াজাল বুনিয়াছে। দিনের আলোর তীব্রতায় এ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, গন্ধ মিলাইয়া যায়, ফুল ঝরিয়া পড়ে। দিনের আলো যে অতি সত্য—তীব্র, দীপ্ত ও ঋজু, আর এ আলো—এ তো ঠিক আলো নয়, এ একটা ছায়া,—সত্য-মিথ্যা একাকার করিয়া একটী সুচারু মায়ার অপূর্ব্বতা সৃষ্টি করিয়াছে। সত্য দেবতার, মানুষ সত্য ঠিক চায় না; সে দিনের আলোয় কর্ম্মের প্লাবনের মধ্যে শুধু এই ক্ষণটীরই প্রতীক্ষা করিতে থাকে, —কখন আসিবে, কখন তাহার অলস অঙ্গ এই সৌন্দর্য্যের মোহিনী সুষমার কোলে এলাইয়া দিবে।

হরিশঙ্করের দৃষ্টি বাগানের ফুলগাছগুলির উপর পড়িল। গাছগুলির কোন শ্রী কোন ছাঁদ নাই, হেলা ফেলার মধ্যে

কোনক্রমে বাঁচিয়া আছে। সে ক্রুদ্ধ হইয়া মালীকে ডাকিল।

"মালী, গাছগুলোর এ দশা কেন হ'ল? তুই মনে করেছিস্ কি? আমি কি তোকে মুখ দেখ্‌বার জন্যে মাইনে দি? গাছে কোন দিন জল দিস্? মনে করেছিস্ বুড়ো হয়েছি আর কিছুই দেখ্‌ব না—যেন আমি সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে মর্‌বার জন্যে বসে আছি। দেখ্ আমি বলে দিচ্ছি, কাল যদি গাছের এই অবস্থা দেখি, তা হলে' তোকে আর আস্ত রাখ্‌ব না। জবাব দিয়ে নতুন মালী রাখ্‌ব, এক পয়সা মাইনে দেব না—"

হরিশঙ্কর ঘরে ঢুকিল। তাহার সমস্ত শরীর দিয়া একটা উদ্বেগের উত্তেজনা বহিয়া যাইতেছিল।

মালী প্রভুর মতিগতির অকস্মাৎ পরিবর্ত্তনে রুষ্ট হইয়া উঠিল। গত চার মাসের মধ্যে এ বিষয়ে একটা কথাও হরিশঙ্কর মালীকে বলে নাই, আজ এখন চাই। তার পর সে ভাবিল, বুড়ো মানুষ, সব মরিয়া হাজিয়া গিয়াছে, একেলা পড়িয়া থাকে, তাই মেজাজ বেজায় রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। তা' সে যাহাই হউক, তাহাকে হুকুম তামিল করিতেই হইবে। আলো জ্বালিয়া, সে বাগানের হৃত শ্রী ফিরাইয়া আনিতে লাগিয়া গেল।

হরিশঙ্কর আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে তাকাইল। তার পর আপন মনে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "আমি যেন কি হয়েছি! একটা ছোট্ট ছেলে এসে আদর চাইলে, তাই তাকে একটু আদর কর্‌লুম। ব্যস্, তার পর আর কোনো কথা নেই।...... আমার অত মায়া মমতা নেই।"

ছয় মাস আগে তাহার পৃথিবীর সঙ্গে অন্য রকম সম্বন্ধ ছিল, এখন সে মমত্বের বন্ধন কাটিয়া গিয়াছে। সে এখন এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছে, এইটুকু মাত্র সম্বন্ধ। সে এখানকার মানুষকে চিনে না, আলো-বাতাসের খেলা বোঝে না। সে যে এখানকার মানুষ নয়, এ রক্তমাংসের মমতার সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

অন্যমনা হইয়া সে ভাবিতে লাগিল।

বক্কু ঠিক ইহার মত ছিল না, সে অনেকটা লাজুক কিন্তু ভারী অভিমানী ছিল; পান হইতে চুণ খসিলেই ঠোঁট দুটী ফুলিয়া উঠিত, চোখ বহিয়া টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িত। অনেকটা তাহার বাপের প্রকৃতিই পাইয়াছিল। গল্প শোনা তাহার একটা নেশা ছিল; প্রত্যহ সন্ধ্যায় দাদুর কোলে মাথা রাখিয়া অন্ততঃ একটা গল্প শোনা চাই, তা সে নূতনই হউক আর পুরাতন হউক। তাহার সব চেয়ে বেশী রাগ হইত রাক্ষসগুলোর উপর। সে বলিত, "দাদাবাবু, ভগবান্ রাক্ষসদের তৈরী করেন কেন? যদি রাক্ষসগুলো না থাক্‌তো, তা হ'লে রাজপুত্তুরের কিচ্ছু হ'ত না।"

তার পর যখন শুনিত, নিশীথ রাত্রে রাজপুত্র উঠিয়া একে একে রাক্ষসগুলিকে কাটিয়া ফেলিতেছে, তখন তাহার আহ্লাদের সীমা থাকিত না, বলিত, "কেমন জব্দ। রাজপুত্তুর যদি সব রাক্ষস কেটে ফেল্‌তে পারত, তা হ'লে একটা রাক্ষসও থাকতে পারত না।"

তাহার বিশ্বাস ছিল, এখনও পৃথিবীতে পাহাড়ে, জঙ্গলে, সমুদ্রের তলায় ও পাতালে অনেক রাক্ষস লুকাইয়া আছে। পরী-দিদি কিন্তু বক্কুর এই নিষ্ঠুরতা সহ্য করিতে পারিত না। সে বলিত, "দাদু ওদের কাটলে বুঝি লাগে না! তুমি সব রাক্ষসদের বাঁচিয়ে দাও তো'"

পরী-দিদি ছিল ঠিক পরীর মত। সে থুপ্ থুপ্ করিয়া মল বাজাইতে বাজাইতে আসিয়া চিমটী কাটিয়া বলিত, "দাদু, বড় পিঁপ্‌ড়ে।"

"তাই না কি পরী দিদি? পিঁপড়েগুলো তাড়িয়ে দাও তো দিদি, বড্ড কুট্‌স্ করে কামড়াচ্ছে।"

"কুট্‌স্—"

"উঃ বড্ড কামড়াচ্ছে পরী-দিদি, আমার তুমি থাক্‌তে আমাকে পিঁপ্‌ড়েয় কামড়ায়—"

পিঁপড়ে তাড়াইবার ছলে কিল্ চড় মারিয়া বলিত, "দাদু, সব পিঁপ্‌ড়ে মরে গেছে।"

"লক্ষ্মী দিদি আমার, অনেক কাজ করেচ। এস চুমো খেয়ে দাম দি।"

তাহার সব কাজের মূল্য ছিল আদর চুম্বন পাওয়া। এক এক দিন তাহার দাদুর চুল বাঁধিয়া দিবার ঝোঁক পড়িত। দাদুর মাথায় চুল নাই সে মানা সে মানিত না, বলিত, "তোমার দাড়ীতে খোঁপা বেঁধে দেব।"

চিরুণী, তৈল ও জলের সাহায্যে বিপুল প্রয়াসে নিপুণা গৃহিণীর মত খোঁপা বাঁধিতে বসিত। বাধা

লাগিত, কিন্তু সে ব্যথা পুলকের ব্যথা। এ স্বর্গীয় সুখ বুঝি সত্যকার স্বর্গেও নাই!

আর এক দিনের কথা। বকু আর পরী-দিদি এই দুই জনে মিলিয়া বুড়ো দাদুর দুই হাত ধরিয়া গলা ছাড়িয়া সুর করিয়া বলিতে সুরু করিল,—

"বল হরি হরিবোল
দাদুকে খাটে তোল।"

এই অপূর্ব্ব রসিকতার তৃপ্তিতে নিজেরাই হাসিয়া গড়াইতে লাগিল। বরুণ আসিয়া ছেলে মেয়েকে এমন ভাবে বকিল যে, তাহাদের সামান্য দুটো শিখানো কথার ফলে বুঝি তৎক্ষণাৎই তাহার বুড়ো বাপের গঙ্গা-যাত্রার ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। বকু চোখ দু'টী রগড়াইয়া রাঙ্গা করিয়া তুলিল, পরীর বড় বড় টানা চঞ্চল চোখে ম্লান ছায়া ঘনাইয়া আসিল। হাজার আদরেও তাহারা ঠিক আগের মত তেমন খুসী হইয়া উঠিল না। বরুণ বড় নির্ম্মম!

সত্যই, বরুণের কাহারও প্রতি বিন্দুমাত্র করুণা বা মমতা ছিল না; তাহা না হইলে বুড়ো বাপের ঘাড়ে সংসারের সব বোঝা চাপাইয়া যায়? বাপ ছেলে মেয়ে স্ত্রীর চেয়ে তাহার দেশ বড় হয়? আর অরুণ? সেই বা কি কম?

হরিশঙ্করের সহসা মনে হইল, তাহার হাত, পা সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া গিয়াছে, নড়িবার চড়িবার কোন শক্তি নাই। নিশ্চয় তাহার পক্ষাঘাত হইয়াছে। পক্ষাঘাতের কথা মনে আসিতেই তাহার নড়িবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। সমস্ত শক্তি দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেই মাথা ঘুরিয়া উঠিল, চক্ষে অন্ধকার দেখিল। তাহার মনে হইল, কে যেন তাহার বুদ্ধি ধারণার সব ক্ষমতা লুপ্ত করিয়া দিয়াছে। এই বুঝি মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়া যেন জগতের রূপ মুছিয়া দিয়া সব একাকার করিয়া লেপিয়া দিয়াছে। এই মৃত্যু! কথাটা মনে হইতেই তাহার সর্ব্বদেহ শিহরিয়া উঠিল। পরক্ষণেই সে অনুভব করিল; সে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার কিছুই হয় নাই।

তাহার মনে হইতে লাগিল, আজ সে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, দাঁড়াইবার সামর্থ্যটুকু বুঝি তাহার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এ ক্লান্তি তাহার উদ্বেগ কমাইল না বরং বাড়াইয়া দিল। নিকটস্থ একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া সে জোর করিয়া হাসিল, "আমার কি হয়েছে। যা তা সব ভাব্‌চি। ও সব পুরোণো কথা ভাব্‌ব আর কি? আমার ভাব্‌বার কিছু নেই।"

ভাবনার হাত হইতে কিন্তু সে কোনমতেই রক্ষা পাইল না—তাহার মনে হইল, পরলোকের অতি নিকটতম স্থান হইতে সে করুণাপূর্ণ নয়নে মর্ত্ত্যলোকের দিকে চাহিয়া আছে। সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, মানুষ খুব শক্ত করিয়া একনিষ্ঠভাবে তাহার ক্ষুদ্র নীড়টী বাঁধিতেছে। গড়ার আয়োজনে মানুষ তাহার সমস্ত শক্তি, সমস্ত চিন্তা নিয়োজিত করিয়াছে। মর্ত্ত্যভূমির সুখ-কুটীরে সুখস্বপ্নে অনন্ত কাল কাটাইবার ঐকান্তিক বাসনা তাহার আয়োজনের আড়ম্বরে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। সে পরিপূর্ণ সহানুভূতিতে কহিল, "ওরে তোরা এত করে' গড়চিস্, এক দিন ঝড়ে তা ভেঙে পড়বে। যাকে খুব আপনার বলে বুকে চেপে ধরেচিস্, তোর বুক আনন্দে, গর্ব্বে, আত্মপ্রসাদে ভরে উঠ্‌চে, এক দিন দেখ্‌বি সেই তোর সব সুখের ঘরে আগুন জ্বেলে দিয়ে চলে যাবে—কোথাও খুঁজে পাবি না। তোর সাধের ঘরের গাঁথুনির ইট এক এক খানি করে' খুলে পড়ে যাবে।"

হরিশঙ্কর স্পষ্ট দেখিল, কর্ম্মে ব্যস্ত মানুষ তাহার এ বাণী বিশ্বাস করিল না! কেহ অবিশ্বাসে মুখ বাঁকাইল, কেহ বিদ্রূপ করিল, কেহ হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সে বলিল, "বিশ্বাস হ'ল না! প্রথমে কেউ বিশ্বাস করে না, শেষে করে। গড় তোরা ভাল করে গড়।"

তাহার মনে পড়িল, সেও ইহাদের মত এক দিন ঘর গড়িয়া তুলিয়াছিল। সে? হাঁ, সে-ই গড়িয়াছিল বটে, কিন্তু গড়িবার তাহার একান্ত কামনা ছিল না। মানুষ হইয়া পৃথিবীতে চলা-ফেরা করিতে হইলে একটা আশ্রয়ের দরকার হয়; সে সেই আশ্রয়টুকু গড়িয়াছিল মাত্র, তাহাতে তাহার প্রাণের রক্ত মিশে নাই, সত্যি, এতটুকু অনুরাগ, এক-ফোঁটা ভালবাসা ছিল না। যদি থাকিত, তাহা হইলে কি সে তরুণ, বরুণকে অমন ভাবে ছাড়িয়া দিতে পারিত? তরুণের শেষ দেখা দেখিতে পাইল না; সাত সমুদ্র তের নদী পারে বিদেশে বিদেশীর

মধ্যে অযত্নে দারুণ রোগযন্ত্রণায় ভুগিয়া মরিল, আর সে ঘরে বসিয়া টেলিগ্রামে মৃত্যু-সংবাদ পড়িল। একবারও সে খোঁজ লইল না, সংবাদটা মিথ্যা কি না; তরুণই বাপের স্নেহ বেশী করিয়া আদায় করিবার জন্য এ মিথ্যা রটাইয়া পৃথিবীর কোনো প্রান্তে লুকাইয়া রহিয়াছে কি না কে জানে? তরুণের সেই আধ-আধ বুলি, যাহাকে সম্বল করিয়া সংসার-আশ্রমে সে কল্পনার স্বর্ণ-সিংহাসন গড়িয়াছিল, সেই তরুণের কথা, সে ভুলিল, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিল না বা করিবার চেষ্টা করিল না। তাহার কি স্নেহ আছে? বরুণের ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়া মরা সে নিষ্পলক-চক্ষে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছে। মৃত্যুর সহিত এমন করিয়া মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়া প্রসন্ন-আননে মরণকে সাদরে বরণ করিয়া লইবার অসাধারণ প্রশান্ততা চোখে আর একটাও পড়ে নাই; সুতরাং আজিও সে ভুলিতে পারে নাই—অন্তরের গভীর কন্দরে তাহারই প্রতিচ্ছবি এখনও তেমনই সুন্দর করিয়াই আঁকা রহিয়াছে। বরুণ যে বংশের গৌরব, তাহার নয়নের মণি! তবুও, কেহ কি বলিতে পারিয়াছে,—হরি চাটুয্যের প্রাণ বড় দুর্ব্বল, সে মেয়ে-মানুষের মত আকুল হইয়া কাঁদে? বরুণ বলিয়াছিল, "বাবা, আপনারা কেন এলেন? আপনারা এ দৃশ্য সহ্য করতে পারবেন না।"

সে তদুত্তরে বলিয়াছিল, "তুই যদি মরতে না ভয় পাস্, আমি তোর বাপ হয়ে তোর মরা দেখতে পারব' না?"

তবুও সে মিনতি করিয়া বলিয়াছিল, "আপনারা চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখবেন, একটুও ব্যাকুল হবেন না। শেষ মুহূর্ত্তে আমি তা হলে' শান্তি পাব না।"

সে ভুল বুঝিয়াছিল; মনে করিয়াছিল, তাহার নিষ্করুণ হত্যার দৃশ্যে বাপের বুক ফাটিয়া স্নেহের রক্তধারা ফিন্‌কি দিয়া ছুটিবে! হরিশঙ্কর তেমন নয়, অত কোমল, মায়া-মমতার ধাতুতে সে গড়িয়া ওঠে নাই।

তার পর বৌমা, ফাঁসীর পরে নিষ্পাপ, ধার্ম্মিক, স্বদেশ-প্রেমিক স্বামীর শেষ অনুজ্ঞা না মানিয়া বিষ খাইল, মেয়েটাকে পর্য্যন্ত কি করিয়া খাওয়াইয়া বসিল; সে দিন কি এই হরিশঙ্কর তাহাদের বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছে? ডাক্তার-বৈদ্য ডাকিয়াছে, সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছে অন্য পাঁচ জন, সে কিছুই করে নাই, সে বসিয়া রহিল নির্ব্বাক্ হইয়া। নির্ব্বিকারচিত্তে ভীষণ মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখিয়াছে, শবের সৎকারও দেখিয়াছে। এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে নাই। বকু-দাদু সাত দিনের জ্বরে ছাড়িয়া গেল; সে সাত দিন তাহার চোখের পলক পড়ে নাই বটে কিন্তু তাহাকে বাঁচাইয়া বুকে করিয়া ধরিয়া রাখিবার আগ্রহ আদৌ ছিল না। যাহা কিছু সে করিয়াছে, তাহা শুধু কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য ও স্নেহ-মায়া এক বস্তু নয়; কর্ত্তব্য বাহিরের, স্নেহ হৃদয়ের।

হরিশঙ্কর সোজা হইয়া বসিল। একটা অপূর্ব্ব অননুভূত তৃপ্তিতে তাহার সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

আপনার-হতে-আপনার জনদিগকে হারাইয়া আজ সে মুক্ত! কি আশ্চর্য্য, এত দিন সে মুক্তিকে বন্ধন ভাবিয়া ছুটিয়া বেড়াইয়াছে। অনাসক্ত, নির্ব্বিকার ও নির্লিপ্ত, সে যেখানেই থাকুক না কেন, সে মুক্ত পুরুষ। পৃথিবীর কোন অংশের সহিত তাহার যোগ নাই। সে বসিয়া আছে, এখনই ইচ্ছা করিলে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে, লঘু বাতাসের মত ভাসিয়া বেড়াইতে পারে। হরিশঙ্কর আবার সত্য সত্যই উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ঘুরিয়া বেড়াইতে সুরু করিল।

আকাশের দিকে নজর পড়িতেই সে আপনা হইতে বলিয়া উঠিল, "একি, ভোর হইয়া গেল! আর একটুও তো সময় নেই—" বলিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া সিঁড়ির দিকে ছুটিয়া গেল। বেলা কি খুব বেশী হইয়া গিয়াছে? আকাশটা সবে লাল হওয়া সুরু করিয়াছে বলিয়াই তো বোধ হইল। বেলা যদি বেশী হইযাই থাকে, তাহা হইলে কি গায়ে রৌদ্রের তাত লাগিত না? ঠিক কতটা বেলা হইয়াছে, তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া যাইবার জন্য পুনরায় ফিরিয়া আসিল। আকাশ তো রাঙা হয়ই নাই, ভোর হইতে এখন ঢের দেরী,—রাত্রিই বেশী হয় নাই।

"ভোর হয় নি, তবুও দেখ্‌লুম ভোর হয়ে গেছে—একেবারে স্পষ্ট। এর মানে কি? আমি কি পাগল হয়ে গেচি।"

নিজের কার্য্যকলাপ, এলো-মেলো চিন্তার ধারা সমস্ত একে একে মনের মধ্যে বিচার করিয়া দেখিল তাহাতে পাগলামির কোন লক্ষণ নাই।

সেই যে ছেলেটী মুকু আজ বৈকালে যে আসিয়াছিল, সে যাইবার সময়ে বলিয়াছিল, কাল সকালে ফুল লইতে আসিবে। সেই জন্য কি সে কল্পনায় ভোর হওয়া দেখিয়াছিল? যাহা হউক হরিশঙ্করের বড় হাসি পাইল।

চিন্তার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য হরিশঙ্কর ঘরে গিয়া শুইল। হঠাৎ মনে হইল রাত্রি বড় দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে। অনাবশ্যক ভাবনা কেন সে ভাবিয়া মরিতেছে? অন্য দিন তো বেশ কাটিত; নিরলস একটানা আলস্য, ঝিমাইতে ঝিমাইতে সন্ধ্যার শেষ রাগ-রেখার মত পলকে সময় কোথায় হারাইয়া যাইত। আজ যেন তাহার কি হইয়াছে! যত রাজ্যের ভাবনা চিন্তা তাহার মাথায় আসিয়া হাজির হইয়াছে, যেন আজ তাহাদের না ভাবিয়া লইলে আর অন্য কোন দিন ভাবা ঘটিয়া উঠিবে না। বোধ হয় মনে করিয়াছে, আজই বুঝি এই বুড়োর শেষ রাত্রি।

"আজই, এই রাত্তিরে আমি মারা যাব!"

এমনই রাত্রি; চাঁদের আলো বারান্দায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আর্দ্র পবনের মৃদু স্পর্শ—মা যেন সুপ্ত ছেলের গায়ে স্নেহের পরশ বুলাইয়া দিতেছে। অন্ধকার কায়া ক্রমশঃ বিরাট আকার ধারণ করিয়া সর্ব্বগ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই রাত্রিই তাহার শেষ-রাত্রি। অথচ, ভোরের আলো বাগানে উঁকি মারিয়া ফুলের কুঁড়ির ঘুম ভাঙ্গাইবে। হরিশঙ্করের অন্তর অপূর্ব্ব বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

"চাটুয্যে মশাই"—একটী প্রৌঢ়া বিধবা দুয়ারের কাছে আসিয়া ধীরকণ্ঠে ডাকিল।

হরিশঙ্কর চমকাইয়া উত্তর করিল, "আঁা—"

"আপনি কি ঘুমাচ্ছিলেন?"

"কে বিনু? এস, ঘরে এস।"

বিনোদিনী ঘরে ঢুকিল। সে সম্পর্কে হরিশঙ্করের শ্যালিকা। পতি-বিয়োগের পর হইতে সে পুত্রকন্যা লইয়া চাটুয্যে মহাশয়ের গলগ্রহ হইয়া রহিয়াছে এবং এই জন্য সে একটু সঙ্কুচিত হইয়া থাকিত, যদিও তাহার পুত্র-কন্যাগণ গলগ্রহ হওয়াটাকে ভ্রূক্ষেপের মধ্যে আনিবার প্রয়োজন বোধ করিত না।

"আজ আপনি কি খাবেন বল্লেন না তাই"—বলিয়া সে থামিল। হরিশঙ্কর বলিল, "আমি ভাই সেটা ঠিক্ বুঝ্তে পারছি না।"

"যদি লুচি খেতে চান, ময়দা মেখে রেখেছি, গরম গরম ভেজে দেব।"

"লুচি খাব?"

"শরীর খারাপ থাক্‌লে দরকার নেই। খৈ আছে, দুধ আছে। খৈ দুধ খাবেন?"

"শেষে খৈ-দুধ খাব? থাক্ দরকার নেই।"

"খাবেন না সে কি হয়। আপনি মন-মরা হয়ে পড়ে থাক্‌বেন, কারুর সঙ্গে দুটো কথা ক'বেন না; তাতে কি শরীর ভাল থাকে!"

"থাকে। আমি তো কথা কই, শোনে কে?" হরি-শঙ্কর হাসিয়া উঠিল। খানিকক্ষণ দুই জনে চুপ করিয়া রহিল। তার পর হঠাৎ হাস্যোজ্জ্বল নেত্রে হরিশঙ্কর বলিল, "বাসর ঘরে তুই আমার কাছাটা জানলার সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিলি, না? ওঃ তখন তুই কি দুষ্টুটাই না ছিলি—আবোল-তাবোল্ বকৃতিস্, ছুটোপাটি, মারামারি—একেবারে পেল্লায় কাণ্ড করে বেড়াতিস্।"

হরিশঙ্কর বালকের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিয়া উঠিল।

প্রৌঢ়ার মুখে ঈষৎ হাস্যরেখা দেখা দিল, সে বলিল, "হাঁ, চাটুয্যে মশাই আমি বুঝি তাই ছিলুম।"

"দেখ্ বিনু, বিয়ের রাত্তিরে আমি যদি এই রকম পাকা দাড়ী নেড়ে বল্‌তুম, বিনু চুপ করে দাঁড়া, তা হ'লে তুই কেঁদে ফেল্‌তিস্ না।"

বিনোদিনী হরিশঙ্করকে ঠিক্ বুঝিতে পারিল না। সে জোর করিয়া হাসিয়া সায় দিল।

"চল, তুই একটা করে লুচি ভেজে দিবি, আমি খাব। দেখি তুই কেমন লুচি ভাজ্‌তে শিখেছিস্।"

দুই জনে চলিল। হঠাৎ হরিশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "সতীন কোথায়? তাকে তো মোটেই দেখ্‌তে পাই না।"

প্রৌঢ়ার মুখ ম্লান হইয়া গেল। সে মৃদু-কণ্ঠে উত্তর করিল, "তাদের থিয়েটার হচ্ছে, সেইখানেই বুঝি আছে।"

হরিশঙ্কর একটু থামিয়া বলিল, "দেখ্ বিনু, তোর আর আমার সমান ভাগ্য। আমাদের কেন যে ভগবান্ বাঁচিয়ে রেখেছেন তা বল্‌তে পারি না। যাক্, আমার

শরীর ভয়ানক খারাপ বোধ হচ্চে। আমি খাব না।"

যাহার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত তাহার অতি সামান্যতে ব্যথা লাগে। বিনোদিনী বলিল, "রাতে না খেলে হাতীর পতন হয়, আর আপনি তো শোকা-তাপা মানুষ—না খাওয়াটা ঠিক্ হয় না চাটুয্যে ম'শাই—"

"আচ্ছা তবে চল? তোর কথা-মতই কাজ করে' দেখি।"

হরিশঙ্কর রান্নাঘরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিলে, বিনোদিনী বলিল, "যান্ আপনাকে আর যেতে হবে না, খাবার আপনার ঘরে নিয়ে আস্‌চি।" বিনোদিনী খাবার আনিতে গেল।

৩

ভোরের আলো দেখা দিতেই হরিশঙ্কর বাগানে আসিয়া হাজির হইল। রাত্রে তাহার ভাল ঘুম হয় নাই। নানান্ অকেজো ভাবনা-চিন্তায় তাহার মাথা গরম হইয়া গিয়াছিল। ভোরের ঝির্-ঝিরে স্নিগ্ধ হাওয়ায় তাহার মনটা একটু তাজা হইয়া উঠিল, কিন্তু গাছগুলির দুরবস্থা দেখিয়া তাহার মেজাজ তেমন প্রফুল্ল আর রহিল না। সে যাইয়া মালীকে ডাকিল।

মালী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে কহিল, "বাবু—"

হরিশঙ্কর মোলায়েম-কণ্ঠে কহিল, "কাল তোকে বাগানটা পরিষ্কার করে রাখতে বলেছিলুম আর তুই কিছুই করিস্ নি।"

"হাঁ বাবু কাল তো আমি করেছি।"

"কাল করেচ' আর আজ এক রাত্তিরের মধ্যে এই অবস্থা হ'য়ে গেচে। আয় আমার সঙ্গে আয় দেখ কি করে পরিষ্কার করতে হয়।"

মালী সশঙ্কিতচিত্তে প্রভুর আদেশ পালনে তৎপর হইল। হরিশঙ্কর মালীর সঙ্গে ঘুরিয়া ফিরিয়া যত সব আগাছা উপড়াইয়া ফেলিল। প্রত্যেক গাছের চারিধারে খানিকটা করিয়া মাটি খুঁড়িয়া দিল। শুকনো ডাল-পালা ছাটিয়া গাছের গোড়ায় ও আগায় জল ঢালিল। সদ্যস্নাত সবুজ পাতাগুলি রবিকরস্পর্শে ঝক্ ঝক্ করিতে উঠিতে দেখিয়া তাহার হৃদয় সফলতার আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, তাহার গত যৌবন বুঝি বা ফিরিয়া আসিয়াছে। কি সুন্দর! এত পরিশ্রমের সার্থকতা এই সুন্দরের প্রকাশ। মানুষ এমনি কষ্ট, এমনি পরিশ্রম করিয়া জীবন-ভূমি তরুলতায় পুষ্পিত করিয়া তোলে; তার পর এক দিন তরুলতা ঝরিয়া যাওয়াতে জীবনটা মধ্যাহ্নের মরুভূমি হইয়া ওঠে। এত রস কি করিয়া শুকাইয়া যায়? কেন যায়?

হরিশঙ্করের বার্দ্ধক্যজনিত অপটু দেহ এত পরিশ্রমে অনভ্যস্ত ছিল, তাই মানসিক অস্বচ্ছন্দতার সহিত শারীরিক ক্লান্তি অত্যন্ত অনুভব করিয়া আরাম-কেদারায় যাইয়া শুইয়া পড়িল। চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া দেখিতে লাগিল; একটু একটু করিয়া রৌদ্র চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

"বেলা তো বেশ হ'য়ে আস্‌চে, সুকু তবুও এখনও এলো না কেন? তাই তো তা'র অসুখ কর্‌ল না কি?"

অসুখ হওয়াটা বিচিত্র নয়। ভাবিতে ভাবিতে তাহার ধারণা হইয়া গেল, সুকুর অসুখ করিয়াছে। মানসপটে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, সুকু রোগ-যন্ত্রণায় কিরূপ কষ্ট পাইতেছে। সুকুকে দেখিতে যাইবার জন্য উঠিয়া থামিয়া গেল। ছেলেটার যে অসুখ করিয়াছে, তাহার প্রমাণ কি? ছোট্টছেলের সকাল বেলার দিকে একটু আরাম করিয়া ঘুমাইবার ঝোঁক একটু বেশী করিয়া হয়। বহু পুরাতন কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। তরুণ ও বরুণ দুইজনে এই রকম অনেক বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইত, কিছুতেই উঠিতে চাহিত না। তাহাদের মা অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া ঘুম ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিত, "তবে অনেক বেলা হয়ে' গেছে। দেখ-দেখি, কত রোদ্দ্‌ুর উঠেছে।"

তাহারা পাশ-বালিশ আরও জোর করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিত, "মা মা আর একটু ঘুমুই।"

"চোখ চেয়ে দেখ না, কত রোদ্দুর উঠেছে—রাত্তির নেই।"

"চোখ চাইলে ত রাত্তির পালিয়ে যাবে—"

কিছুতেই চোখ মেলিয়া তাকাইতে চাহিত না, পাছে চোখে দিনের আলো লাগিয়া রাত্রের আঁধারের মোহ কাটাইয়া দেয়। সে নিজেও না কি ছেলে বেলায় এই রকম ছিল।

তাহার ক্ষুদে বন্ধু-ভাইয়ের ঘুমাইবার ঝোঁক কাটিয়া গেলেই ছুটিয়া এই বাগানে তাহার সহিত ফুল তুলিতে আসিবে। যদি না আসে? এমনও তো হইতে পারে, যে সে তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে? অসম্ভব নয়। ছোট্ট শিশুর হৃদয় অধিকার করিবার মত কি তাহার কোন গুণ, চেহারার কোন কি বিশেষত্ব আছে? কিছুই তো নাই। তাহারা তাহাকে ভয় করে। এক দিন একটা ছোট মেয়ে বড়ই দুষ্টামী করিতেছিল, কাহারও বারণ মানিতেছিল না; মেয়েটীর অভিভাবক অদূরে দণ্ডায়মান হরিশঙ্করের দাড়ী আঙুলি দিয়া দেখাইয়া বলিল, "ওই দেখ্‌চিস্ তো বুড়ো জুজু, তোকে দাড়ীতে বেঁধে নিয়ে যাবে।"

মেয়েটী তাহাকে দেখিয়া এমনি তীব্র চীৎকার করিয়া চোখ মুদিয়া ফেলিল, নড়িতে কিংবা কাঁদিতে সাহস পর্য্যন্ত করিল না। সে ছেলেমেয়েদের কাছে বুড়ো জুজু, চেহারা অত্যন্ত কুৎসিত। তাহার নিজের উপর এইজন্যে রাগ হইল। সে তাহার সমগ্র অনুভূতি দিয়া বিশ্বাস করে, উহারাই পৃথিবীর গরিষ্ঠ সৌন্দর্য্য। তাই সে তাহার হৃদয় উহাদের জন্য সর্ব্বক্ষণ উন্মুক্ত রাখিয়াছে, উহারা আসুক, বুক জুড়িয়া বসিয়া খেলা করুক, উহাদের শুভ্র-শুচি অঙ্গস্পর্শে সরোবরের নীলজলে কমলদল ফুটিয়া উঠুক।

হরিশঙ্কর উঠিয়া ধীর-পদক্ষেপে সুমুখের পথ ধরিয়া দুই ধারের বাড়ীগুলিতে চকিত দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গেল; আবার তেমনি করিয়া ফিরিয়া আসিল। কোন জানালার ধারে একটীও ছোট্ট মুখের চঞ্চল নয়ন পথের দিকে তাকাইয়া বসিয়া নাই।

চঞ্চল রৌদ্রের তেজ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। হরিশঙ্করও অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। একটা ছোট্ট ছেলের জন্য সারাটা সকাল ধরিয়া প্রতীক্ষা করা তাহার মত বুড়ার সাজে না। ঘরে ঢুকিয়া একখানা বই খুলিয়া পড়িতে চেষ্টা করিল। সেই এক কথা জগৎ মিথ্যা, এই হাসি-কান্নার সুষমা মায়ার মোহিনী মরীচিকা। এই এক কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বারংবার বলা হইয়াছে। কেন? তাহারা অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করিত, ইহা মিথ্যা।

সে যে ছেলেটাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, তাহাকে তাহার মরণের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চাইই—এ কথাটা কখনই অসত্য নয়। তরুণ, বরুণ, বকুদাদা, পরী-দিদি এরা প্রত্যেকেই তাহার বুকের পাঁজরা একটা একটা করিয়া ভাঙ্গিয়া খসাইয়া লইয়াছে, সে ক্ষত হইতে এখনও টাট্‌কা রক্ত ঝরে—ইহা দিনের আলোর মত সত্য।

হরিশঙ্কর সর্ব্বাঙ্গে একটা অস্পষ্ট জ্বালা অনুভব করিল, মনটাও খুব অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার নিত্য নৈমিত্তিকের একঘেয়ে বিরল-বৈচিত্র্য দিনগুলির মাঝে সহসা ছোট্ট ছেলে অগ্নিশিখার মত আসিয়া সব লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া গিয়াছে।

দ্বিপ্রহরের দিকে হরিশঙ্কর ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া ঝিমাইতে সুরু করিল। হঠাৎ পিছন হইতে দুইটী ছোট্ট কোমল হাত নিবিড়ভাবে চাপিয়া ধরিতে সে চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "কে বকুদাদা এলি?"

হরিশঙ্করের হৃদ্‌পিণ্ড দ্রুততালে স্পন্দিত হইতে লাগিল, সেই কচি হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া, চোখ খুলিয়া সংশয় ভঞ্জন করিতে সাহস পর্য্যন্ত হইল না।

সুকু চোখ ছাড়িয়া দিয়া হাততালি দিয়া বলিল, "দুয়ো; বল্‌তে পারলে না—আমি।"

যাহার আসার প্রতীক্ষায় সারা সকাল বেলা কাটাইয়াছে সেই এখন আসিয়াছে, তবুও সে আনন্দ অনুভব করিতে পারিল না।

"কেমন ঠকিয়েছি!" সুকু উচ্ছ্বসিত হাস্যে ঘর ভরাইয়া তুলিল।

বালকের সরলতায় হরিশঙ্করের মনের মেঘ কাটিয়া গেল। সে অভিমান প্রকাশ করিয়া বলিল, "তুমি কেন সকাল বেলা এলে না? আমি রাগ করেচি, তোমার সঙ্গে কথা কইব না।"

"বেশ, বেশ, আমিও কথা কইব না। আড়ি, আড়ি, আড়ি—"

সুকু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল। হরিশঙ্কর তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিল। বালক একটু ঝঙ্কারের সহিত কহিল, "আমি তো তোমার সঙ্গে আড়ি করে দিয়েচি—"

হরিশঙ্কর তাহাকে বুঝাইল, সেইজন্যেই সে সাধিয়া ভাব করিতে আসিয়াছে। অনেক চেষ্টার পর স্বকুর অভিমান ভাঙ্গিল এবং সন্ধি স্থাপিত হইল এবং যে প্রসঙ্গে এই অভিমানের যুদ্ধ বাধিয়া উঠিয়াছিল, তাহা চাপা পড়িয়া গেল।

স্বকু ভাব করাইবার পদ্ধতিতে ভাব করাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তেঁতুলের আচার আছে?"

হরিশঙ্কর বিস্মিতভাবে বলিল, "তেঁতুলের আচার?"

"তেঁতুল দিয়ে যে আচার হয়। মা করেচে। আমি চাইলুম দিলে না।"

"খেলে অসুখ করে যদি—"

"না করবে না।"

নাছোড়বান্দা দেখিয়া হরিশঙ্কর তেঁতুলের আচারের সন্ধানে বাহির হইল। বহুকষ্টে আচার যোগাড় হইল, কিন্তু সেটা তেঁতুলের হইল না। যাহা হউক স্বকু তাহাতেই সন্তুষ্ট হইল।

হরিশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাকে কে সব চেয়ে বেশী ভালবাসে?"

"বাবা।"

"আমি তোমায় ভালবাসি না?"

স্বকু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, ভালবাস। তার পর বলিল, "মা আমায় ভালবাসে না, ছবিকে বেশী ভালবাসে। আমি একটু আচার চাইলুম, দিলে না। আমি আড়ি করে দিয়েছি তো। যাবও না, কথা কবও না।"

"মা যে কাঁদবে।"

"বয়ে গেল।"

বলিয়া সে ঘরের চারিদিক্ ঘুরিয়া ঘরে বিবিধ সামগ্রী পরীক্ষা করিতে সুরু করিল এবং প্রশ্নের দ্বারা সমস্ত বস্তুর তথ্য জানিয়া লইতে আগ্রহান্বিত হইল।

স্বকু টেবিলের ড্রয়ার ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে কতকগুলি পুরাতন ফটো আবিষ্কার করিয়া তাহাদের পরিচয় গ্রহণ করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া উঠিল। হরিশঙ্কর ফটোগুলি দেখিয়া একটু বিবর্ণ হইয়া গেল এবং বহু পুরাতন দিনের সুখময় স্মৃতি চোখের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সে প্রথম যে ফটোখানির পরিচয় দিল, তাহা তাহার নিজেরেই যুবাকালের প্রতিকৃতি,—তখন সে এই সুদীর্ঘ শ্মশ্রুবিবর্জ্জিত সুস্থ বলিষ্ঠ সদানন্দ যুবক।

স্বকু একবার সেই ফটোর সহিত হরিশঙ্করের চেহারা মিলাইয়া লইল এবং ভ্রূকুটী করিয়া কহিল, "বা রে, মিথ্যে কথা।"

হরিশঙ্কর সস্নেহে হাসিয়া কহিল, "হাঁ রে, সত্যি। তখন আমার দাড়ী ছিল না—কামিয়ে ফেল্‌তুম।"

"ঈস্, বল্‌লেই হ'ল কি না!"

বলিয়া প্রবলতর মাথা নাড়িয়া ঘোরতর অবিশ্বাস প্রকাশ করিল।

"তুমি যখন রায় একেবারে দিয়ে দিলে, আমি তখন নাচার। ও তা' হ'লে আর কারুরই ছবি কি বল?"

স্বকু হরিশঙ্করের বক্তব্যের স্পষ্ট অর্থ বুঝিতে না পারিয়া সন্দিগ্ধনয়নে তাহার দিকে তাকাইল, তার পর সে ছবিটী একদিকে রাখিয়া দিয়া অন্যান্য ছবিতে মনোনিবেশ করিল।

হরিশঙ্কর বালকের অনুজ্ঞা মানিয়া লইয়া অন্যান্য প্রতিকৃতির পরিচয় দিতে লাগিল। স্বকুর যতটা জিজ্ঞাসা করিবার আগ্রহ, জানিয়া রাখিবার আগ্রহ ততটা ছিল না এবং তজ্জন্য তাহার চপল কৌতূহল-প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া প্রশ্নোত্তরে নিঃসঙ্কোচে চলিয়া যাইতেছিল।

বকু-দাদা এবং বরুণ-তরুণের ও পরী-দিদির কিশোর বয়সের ছবি স্বকুর মনোযোগ অত্যন্ত আকর্ষণ করিল। পরিচয় পাইয়া সে স্পষ্ট ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল যে, সে উহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ঈর্ষা করে এবং তাহারও উহাদের মত জামা, কাপড় ও ছবি আছে। তার পর সে তাহার অসংখ্য গুণপনার কাহিনী বিবৃত করিতে করিতে সহসা এক অদ্ভুত প্রশ্ন করিয়া বসিল। হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কাকে বেশী ভালবাস? এদের, না আমাকে?"

হরিশঙ্কর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর করিল, "সব্বাইকে ভালবাসি।"

"সব চেয়ে বেশী?" স্বকু মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি তুলিয়া হরিশঙ্করের দৃষ্টির উপর স্থাপন করিল।

পরিপূর্ণভা.ব ভালবাসিবার জন্য এই আকুল আহ্বানকে উপেক্ষা করিয়া কোমল হৃদয়ে ব্যথা দিতে তাহার মন সরিল না, তেমনি অন্তরের সত্যবাণী এই সরল ও সহজলভ্য ক্ষুদ্র হৃদয়ের কাছে গোপন করিয়া যাওয়াও অসম্ভব মনে করিল। আর ইহাকে যে সে ভালবাসে না, চায় না, তাহাও সত্য নহে। তারতম্যের কথা বলা বড় শক্ত। ঠিক কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিবার জন্য সুকুর দাঁড়াইয়া থাকিবার ও তাকাইবার ভঙ্গীটুকু আগ্রহভরে লক্ষ্য করিল। তাহার মনে হইল, তাহার ভালবাসা বিশ্বচরাচরের সর্ব্বত্র সমানভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কোথাও কম-বেশী নাই। সে বলিল, "আমি ভাই সব্বাইকে সমান ভালবাসি— সব্বাইকে সমান।"

সুকু আব্দার করিয়া কহিল, "না আমায় একটু বেশী।"

হরিশঙ্কর সুকুকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া পরমস্নেহভরে গাল দুটী চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "তারা যে ভাই মরে গেচে, ভাল না বাসলে কি হয় ?"

"মরে গেল কেন ?"

প্রশ্নটী শুনিবামাত্র হরিশঙ্করের মধ্যে সুপ্ত রোষ দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে একটু উত্তেজনার সহিত বলিয়া উঠিল, "কেন ? আমি তো দিন রাত সেই কথা জিজ্ঞাসা করে' বেড়াচ্চি—কেন ? মানুষ কেন মরে ? কেনই বা জন্মায় ? কেন এই সব ভাঙ্গাগড়া খেলা ?—কেন ?"

সুকু হরিশঙ্করের সান্নিধ্য হইতে কিছু দূরে সরিয়া গিয়া ভয়ব্যাকুলস্বরে কহিল, "তুমি অমন কর্‌চ কেন ? আমার বড্ড ভয় কর্‌চে।"

"কেন কর্‌চি ? আয় কাছে আয়। এই বুকে হাত দিয়ে দেখ,—দেখ্ সেখানে কি সব লেখা রয়েচে।"

"আমার বড্ড ভয় করুচে। আমি বাড়ী যাব।"

সুকুর ভয়ার্ত্তস্বরে হরিশঙ্কর চমকাইয়া উঠিল। সে লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া সুকুর হাত ধরিয়া কহিল, "ভয় কি রে! আমি একটা মজা কর্‌লুম আর তুই ভয় পেয়ে গেলি ?—এঃ ছিঃ!—"

সুকুর ভয় কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু মনের মধ্যে কেমন একটা আশঙ্কাজনক সন্দেহের রেশ রহিয়া গেল।

হরিশঙ্কর বিব্রতভাবে চারিদিক্ তাকাইয়া বলিল, "কি চাই বল্ তো, কি নিবি ?—ছবি"—বলিয়া তাড়াতাড়ি দেয়ালে ঝুলান একটা বিজ্ঞাপনের ছবি খুলিয়া লইয়া সুকুর হাতে গুঁজিয়া দিল।

"কেমন ? ছবিগুলো ভাল না ? পছন্দ হয়েছে তো ?"

সুকু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হইয়াছে। তার পর কহিল, "আরও নেব।"

"আচ্ছা দেব।" একটু নীরব থাকিয়া সে বলিল, "এখন কি আর তেমন রোদ্দুর আছে ?—না রোদ্দুরের তেজ অনেক কমে গেছে। চল, আমরা বাইরে যাই। কেমন ? তাই ভাল না ?"

ঘর হইতে সম্মুখের বারান্দায় আসিয়া দুই জনে দাঁড়াইল। হরিশঙ্কর বলিল, "এখন বাগানে গিয়ে দরকার নেই, রোদ্দুর বেশ আছে, আমরা এখানে বসে খেলা করি।"

বিনোদিনী চাটুর্য্যে মশাইকে ডাকিতে আসিয়া তাহার সঙ্গে একটী ছোট ছেলে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "চাটুয্যে মশাই, এ ছেলেটী কে ?"

হরিশঙ্কর সকৌতুকে বিনোদিনীর দিকে চাহিয়া বলিল, "কেন বল তো ? ছেলেটীকে দেখে বড্ড লোভ হচ্চে, না ?"

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, "হাঁ, ভারি লোভ হচ্চে।"

"তুই বড্ড লোভী। তোর দিদির সুন্দর বর দেখে তোর ভয়ানক লোভ হয়ে গেল, শেষে হিংসেয় জ্বর করে বস্‌লি।"

"কার ছেলে চাটুর্য্যে মশায় ? বেশ ছেলেটী! তোমার নাম কি বল তো বাবা ?"

সুকু বিনোদিনীর দিকে তাকাইয়া উত্তর করিল, "আমার নাম সুকুমার—সুকুবাবু।"

বিনোদিনী সস্নেহে সুকুকে কোলে তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় থাক ?"

"বাবার কাছে।"

হরিশঙ্কর সাহাস্যবদনে বলিল, "সুকুবাবু আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েচে। দেখ দেখি কেমন সুন্দর আমার ছোট্ট বন্ধু। তোর এমনি বন্ধু আছে ?"

সুকু ঈষৎ গর্ব্বভরে বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিল, তার পর হরিশঙ্করের গা টিপিয়া অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ও কে ?"

বিনোদিনী শুনিতে পাইয়া বলিল, "আমি তোমার ছোট-দি।"

হরিশঙ্কর বলিল, "দেখ বিনু বড় ভাল কর্‌চিস্ না। আমার বন্ধু ভাঙ্গিয়ে নিচ্ছিস্—ভাল হচ্চে না। তুই মনে করচিস্, আমি হাস্‌চি। তা মোটেই না, আমি মনে মনে বেজায় চটে যাচ্চি।"

সুকু বিনোদিনীর কোল হইতে নামিয়া পড়িল।

বহু দিন পরে হরিশঙ্করকে তরল পরিহাসের মূর্ত্তিতে পাইয়া বিনোদিনী বড়ই খুসী হইল। সে বুঝিল, এই ছোট্ট ছেলেটী বৃদ্ধের শুষ্ক মরু-হৃদয়ে আনন্দের উৎস ছুটাইয়া দিয়াছে। সে হরিশঙ্করের পরিহাসের জবাব স্বরূপে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "আপনি যে চটে যাচ্চেন বুঝ্‌চি। চটে মটে একটু খেয়ে দেয়ে আমার অপকার করে দিন্ তো। সুকুবাবু এস।"

হরিশঙ্কর বলিল, "আমরা তোর ঘর থেকে আচার চুরি করে খেয়েচি।"

সুকু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ছোট-দি আমি চুরি করি নি—"

স্নেহের এই মধুর সম্বোধনে বিনোদিনীর হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

সুকুর এই প্রতিবাদ-ভঙ্গীতে হরিশঙ্কর ও বিনোদিনী উভয়ে হাসিয়া উঠিয়া বৈকালিক জলযোগ করিতে অগ্রসর হইল।

৪

দিন তিনেকে হরিশঙ্করের সহিত সুকুর ঘনিষ্ঠতা বেশ বাড়িয়া উঠিল। ঘনিষ্ঠতাকে নিবিড় আত্মীয়তাতে পরিণত করিবার জন্ম বিনোদিনীর সাগ্রহ প্রয়াস দেখিয়া সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল তাহার ঘা-খাওয়া নিরুদ্যম মৃত-প্রায় প্রাণকে সংসারের মায়া-মমতার বন্ধনে বাঁধিয়া বিনোদিনী পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। সে ভাবিয়াছে গভীর ক্ষতের উপর নিত্য স্নিগ্ধ প্রলেপ লেপিয়া দিতে পারিলে বুঝি কালে ক্ষত সারিয়া যাইবে।

নূতনের উপর বেশী মমত্ব-বোধ জাগিয়া উঠিলে, পুরাতনের প্রতি অনুরাগের গাঢ়ত্ব অনেকটা তরল হইয়া যায়। ইহার জন্যই বিপুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অপূর্ব্ব কারখানাটা এত দিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং তাহা না হইলে কোন্ দিন সব কাজ বন্ধ হইয়া সৃষ্টিটা লোপ পাইয়া যাইত। এই বিস্ময়কর সত্যটা উপলব্ধি করিয়া হরিশঙ্কর মনে মনে বেদনা অনুভব করিল। কি আশ্চর্য্য! মানুষ কি করিয়া তাহার নিজের রক্ত দিয়া সৃষ্টির ব্যথা ভোলে, ভুলিয়া হাসে!

চোখের সামনে যে সব জীবন্ত মানুষ ছিল, যাহারা হাসিত, খেলিত, ঘুরিয়া বেড়াইত হঠাৎ একটা বিরাট্ স্তব্ধ অন্ধকারে তাহারা অন্তর্হিত হইয়া গেল। পর দিনের প্রভাত-আলোকে সে সব চেনা মূর্ত্তিকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না—বিশ্ব এক নূতন অচেনা রূপ লইয়া দেখা দিল। রাত্রের সব ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে, প্রভাতে নূতন কুসুম-কোরক ফুটিয়াছে, গাছ বিস্ময়-বেদনায় মূক হইয়া চারিদিকে তাকাইতেছে।

প্রতি রাত্রের নির্জ্জনতায় সে বকুদাদা, পরী-দিদি, তরুণ-বরুণ সকলের ছায়া-মূর্ত্তিকে তাহার শয্যার আসে-পাশে ঘুরিতে দেখিত; তাহারা যেন মরে নাই। মানুষের স্নেহের কড়া শাসন এড়াইবার জন্য লুকাইয়া রহিয়াছে, নির্জ্জন হইলেই শুধু বুড়ো দাদুর সঙ্গে খেলা করিবার জন্য বাহির হইয়া আসে। তাহাদের কোমল অঙ্গের স্পর্শ তাহার সর্ব্ব দেহে ধূলার মত জড়াইয়া আছে। যখনই ইচ্ছা হয়, তখনই নিজের গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাদের কোমল স্পর্শের মাধুর্য্য অনুভব করে!

হরিশঙ্করের মনে হইল, সুকু কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া ইহাদের স্থান জুড়িয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছে; সুকুকে এমনি করিয়া পরী-দিদি, বকুদাদার স্থান জুড়িয়া বসিতে দিবার ইচ্ছা তাহার নাই, অথচ সে পারিতেছে না। ক্ষুদ্র তটিনীর তটের নিভৃতে তাহার একটী গোপন কুটীর ছিল, খরস্রোত তাহা গ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে ছুটিয়া আসিয়াছে।

হরিশঙ্কর মনের মধ্যে স্পষ্ট অনুভব করিল, সুকুর সাথীত্বে সে নিজেকে প্রায় হারাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। বকুদাদা, পরী-দিদির যে মধুর সঙ্গ-চিন্তায় এত দিন বিভোর ছিল, তাহাও সে এক দিন এমনই করিয়া চলিলে ভুলিয়া যাইবে। এই চিন্তায় সে বড়

ব্যথা অনুভব করিয়া মনে মনে ঠিক করিল, "না আর নয়।"

যে পথে সে চলিয়াছে, তাহার চেয়ে বড় অন্যায়ের পথ আর নাই। সে যে ভালবাসা যাহাদের জন্য ঢালিয়া দিয়াছে, সেই ভালবাসা তাহাদের ছাড়িয়া অপর কাহাকেও দান করার অধিকার তাহার কোথায়? এর মত অপরাধ, অবিচার এ জগতে আর কিছুই হইতে পারে না। তাই স্থির করিল তাহার অন্তরের কোণে যাহা কিছু সঞ্চিত এখনও আছে, তাহা সে যক্ষের ধনের মত আগুলিয়া বসিয়া থাকিবে, কৃপণের মত এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিবে না। তার পর যে দিন পরপারে দেখা হইবে, সে দিন সে সব উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিবে।

পরপারের দেশ বোধ হয় পৃথিবীর মতই একটা বিশাল জায়গা,—হয় তো ইহার চেয়েও রম্য ও বিচিত্র। এ পৃথিবীটা বিচ্ছেদের, বিরহের করুণ মর্ম্ম-বিলাপে পরিপূর্ণ এবং পরপারটা মিলনের, মিলনক্ষণের মিষ্ট নহবতের সুরে উৎফুল্ল। সে যে দিন ওপারে যাইয়া হাজির হইবে, সে দিন কালোর অন্তরালে আনন্দ-সমুজ্জ্বল প্রভাতে কিসের অননুভূতপূর্ব্ব সাড়া পড়িয়া যাইবে, হরিশঙ্কর আন্দাজ করিয়া উঠিতে পারিল না।

দেখা হইলে বকুদাদা ও পরী-দিদি দুই দিক হইতে ঝাঁপাইয়া তাহার কোলে আসিয়া হাজির হইবে। তার পর দুই দিক হইতে প্রশ্নের বর্ষণ চলিবে।

"দাদু তুমি কেন আমাদের সঙ্গে চলে এলে না?"

"তুমি ভারী দুষ্টু, তোমার উপর আমরা সবাই রাগ করেচি।"

"যাও, আড়ি—"

হঠাৎ পরী-দিদি মাথা লক্ষ্য করিয়া বড় বড় ডাগর চোখ তুলিয়া তাহার চোখের উপর স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, হাঁ, ঠিক খুকুরই মত "দাদু তোমার সব চুল সাদা হয়ে গেল কেন?"

বকু তাড়াতাড়ি উত্তর করিবে, "পরীটা এমনি বোকা! দাদু যে বুড়ো হয়ে গেছে।"

বকু একটু বড় সড় ও রোগা হইয়াছে। পরী-দিদি তাহার কাঁচা চুল দেখিয়াছে, তাই সে খুকুরই মত বিশ্বাস করিবে, পৃথিবীর কোন দুষ্ট লোকে দাদুকে ঘুমন্ত অবস্থায় পাইয়া চুণ অথবা এমনিতর কোন শ্বেত পদার্থ মাখাইয়া তাহার দাদুর চুল সাদা করিয়া দিয়াছে।

ছেলে মেয়েদের উচ্চ কলরব শুনিতে পাইয়া প্রসন্নময়ী তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিয়া দিতে দিতে বাহিরে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া নির্ব্বাক্-ভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিবে।

সে প্রবাসী; বহু দিন ধরিয়া প্রবাসে ছিল, হঠাৎ কোন সংবাদ না দিয়া প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। তার পর এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ; তাই কাহারও মুখে কথা ফুটিল না। অভাবনীয় সৌভাগ্যের উদয়ে প্রসন্নময়ীর চোখের কোণে দুইটা বড় বড় জলের ফোঁটা জমা হইয়া সপ্রেম অভ্যর্থনার দৃষ্টি অবরুদ্ধ করিয়া দিল।

তরুণ-বরুণ ছুটিয়া আসিয়া স্মিত-হাস্যে পাশে দাঁড়াইল। লঘুপদক্ষেপে ঘোমটা টানিয়া বৌমারা আসিয়া প্রণাম করিল।

তরুণের বৌ কেমন হইয়াছে? তাহার মুখ তো সে দেখিতে পাইল না। তরুণ তাহার আকুল নিষেধ না মানিয়া বিলাতী মেম বিবাহ করিয়াছিল। তার পরই না তরুণ মারা যায়? তাই বটে। সে ইচ্ছা করিলে সে বৌ আনিয়া ঘরে তুলিতে পারিত। অর্থের কোন অভাব হইত না, তবুও করে নাই। একটা তীব্র অনুশোচনায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল।

বিনোদিনীর দেখা পাইয়া সে ডাকিল, "বিনু, একটা কথা শুনে যা তো।"

বিনোদিনী কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

"শোন্, তোর সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে। বোস।"

"কি বলুন।"

"হাঁ বল্‌চি। তরুণ বিলেতে বিয়ে করেছিল, মনে আছে তো?—ঐ যে সেই—আমি 'চিঠি পেয়ে খুব রাগ করলুম, ত্যাজ্যপুত্তুর করব' বলে ভয় দেখালুম—মনে পড়েচে?—

বিনোদিনী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "খুব মনে পড়ে।"

"হাঁ, আমি সেই কথাই বল্‌ছিলুম। সেই বৌমার কথা।—তা আমি বল্‌ছিলুম কি বৌমার খোঁজ নিলে মন্দ হয় না। সে যদি এসে আমাদের সঙ্গে থাকে—মন্দ কি?"

"আপনি তো খোঁজ নিয়েছিলেন—"

"তাই না কি? আমি খোঁজ নিয়েছিলুম? তা হবে, জানি না, আমি ভুলে গেচি!"

"খবর এল, তাদের ঠিক বিয়ে হয় নি। তরুণ মারা গেল বলেই বিয়ে হ'ল না। তার পর সে তো অন্য কাকে আবার বিয়ে করেচে।"

"হাঁ, তাই হ'বে। তুমি যেতে পার।"

বিনোদিনী হরিশঙ্করের কথার ভঙ্গিমায় সবিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল, তার পর উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।

হরিশঙ্কর উঠিয়া আসিয়া ঘরের সম্মুখের বারান্দায় একটী চেয়ারে বসিয়া মাঠের দিকে তাকাইয়া রহিল। সেই পুরাতন মাঠ, সেই পুরাতন গাছ, সেই আলো, সেই বাতাস—বহু দিন ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছে। ইহার কোন অর্থ নাই, কোন বৈচিত্র্য নাই। একটা নিরর্থকতা সমস্তটা ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

জীবনের কোন সার্থকতা সে খুঁজিয়া পাইল না। জীবনটা একটা দুঃসহ বোঝা জন্মের সময় হইতে কে যেন ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছে, চিনির বলদের মত সারা জীবন ধরিয়া টানিয়াই আসা হইল, উপভোগ করা হইল না। ভোগের আয়োজনেই সব শক্তি ব্যয় হইয়া গেল, অথচ, কি যে আয়োজন করিল, তাহা সে স্পষ্ট না পারিল জানিতে, না পারিল বুঝিতে।

এই জীবনটার আগাগোড়া একটা মস্ত বড় প্রবঞ্চনা। মানুষ করে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আবেষ্টনী তাহার দ্বারা অনেক কিছুই করাইয়া লয়। প্রভাতের রৌদ্র-উজ্জ্বল স্নিগ্ধতা রঙীন স্বপ্ননেশায় মানুষকে মাতাল করে, মধ্যাহ্নের তপ্ততা মানুষকে উত্তেজনার খরস্রোতে উন্মাদ করিয়া তোলে, সায়াহ্নের গাঢ় ম্লান ছায়ায় অবসাদের দারুণ ব্যথা ফুটিয়া ওঠে। তার পর নিশীথের অন্ধকারের স্তূপে সবেরই সমাপ্তি। এটা কি ছলনা করিয়া বঞ্চনা করা নয়?

ভালবাসা একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা কথা, মানুষের খেয়ালের প্রবৃত্তির চরিতার্থতা। মানুষ কখনও সত্য করিয়া ভালবাসে না, তাহার ভালবাসা সত্যের ভাণ, একটা অভিনয়। তাহার নিজের জীবনটাই তো একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ! সারা জীবন ব্যাপিয়া একটা হাসি-কান্নার চমৎকার অভিনয়!

সুকুকে সে খুব ভালবাসিতে সুরু করিয়াছে, সেই এখন তাহার শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ের একমাত্র সান্ত্বনা, অনেকে ইহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। কিন্তু ইহাতে সত্যের লেশমাত্র নাই। সুকুকে সে কাল হইতে আসিতে বারণ করিয়া দিবে। সে যেমন একেলা নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিন কাটাইতেছিল, তেমনি কাটাইতে থাকিবে। বস্তুতঃ ছোট ছেলের সঙ্গ একটা বিশ্রী ঝঞ্ঝাট; এ ঝঞ্ঝাট পোহাইবার বয়স না প্রবৃত্তি তাহার নাই।

সে মালীকে ডাকিয়া বলিল, "মালী, ঐ যে ছোট্ট খোকাবাবু—সুকুবাবু—আমার কাছে যে রোজ আসে, কাল সে এলে বল্‌বি, আমার অসুখ করেছে, দেখা হবে না। কিছুতেই তাকে আস্‌তে দিবি না। ভারী চেঁচা-মেচি বিরক্ত করে। আমার ভাল লাগে না। আমার হুকুম, তাকে আস্‌তে দিবি না।"

হরিশঙ্কর পায়চারি করিয়া বেড়াইতে সুরু করিল। "ভুলিস নি আমি যা বলে দিলুম। মনে থাক্‌বে তো? হাঁ, যা—"

মালী চলিয়া যাইতে সে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিয়া আকাশের দিকে তাকাইল। আকাশটা তত পরিষ্কার নয়; কালো সাদা মেঘে অনেকটা আচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে ছিন্ন মেঘের ফাঁক হইতে ঘন নীলের অংশ উঁকি মারিয়া দেখা দিতেছে। সে ক্ষণকাল সেই দিকে চাহিয়া রহিল, তার পর ঘরে ঢুকিয়া পুরাতন প্রতিকৃতি লইয়া দেখিতে লাগিল।

সব চেয়ে বেশী দাগা দিয়া গিয়াছে বরুণ—তরুণকে হারাইয়া সে যে বরুণকেই বেশী করিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছিল কিছুতেই রাখিতে পারিল না। তরুণের বিয়োগব্যথা তাহার স্ত্রীর বুকেই বেশী করিয়া বাজিয়াছিল। মেয়েরা কিছুই সহিতে পারে না।

হরিশঙ্কর খোলা ছবিগুলির দিকে বহুক্ষণ ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার হৃৎপিণ্ডের গতি অতি দ্রুততালে বাড়িয়া যাইতেছে, সর্ব্ব অঙ্গ অবশ ও বিকল হইয়া আসিতেছে এবং কার্য্যের সামর্থ্য ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে।

ক্ষণকাল পরে ছবিগুলি তুলিয়া রাখিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর আস্তে আস্তে বিনোদিনীর

ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "বিনু, তারা মনে ক'রত আমি তরুণকে ক্ষমা করি নি। মরার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে সেই বিশ্বাস নিয়ে গেল। আমি তরুণকে ক্ষমা করি নি। রোজ রাত্তিরে কেঁদে কেঁদে বলেচি তরুণ, বাবা, আয় ফিরে আয়! সে কথা কেউ জান্‌লে না। আমার বাইরেটাই দেখ্‌লে বুকের মধ্যে কি আছে বুঝলে না।"

যে গভীর ব্যথা বুকের মধ্যে গোপন রাখিয়া লোকের কাছে হরিশঙ্কর অতি সহজ ও সাধারণ লোকের মত চলাফেরা করিত, সহসা আজ তাহা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অসাধারণ ভাবে প্রকটিত হইয়া উঠিতেছে। বিনোদিনী কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া হরিশঙ্করের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

হরিশঙ্কর বলিতে লাগিল, "আমি কঠিন নই, আমার বুক পাষাণ নয়। আমি আর চুপ করে থাক্‌তে পারচি না।"

"চুপ করে থাকা ছাড়া আর কি গতি আছে চাটুয্যে মশাই?"

"খুব শক্ত তো ছিলুম, সহ্য করতেও খুব পার্‌তুম—করেচিও। এখন যেন সব কি রকম হয়ে যাচ্চে। অনেক কথা বুক ঠেলে বেরিয়ে আস্‌তে চাচ্চে। আমি ঠিক্ বুঝতে পারচি না।"

"দরকার নেই। আপনি উঠুন, আমাকে একটু রামায়ণ পড়ে শোনাতে হবে। উঠুন।"

"হাঁ"—

"চলুন। আপনাকে আর একলা চুপ করে বসে থাক্‌তে দেব না। আমাকে এবার থেকে রোজ রামায় পড়ে শোনাতে হবে। শুধু পড়ে শোনালে চল্‌বে না বুঝিয়ে দিতে হবে।"

"আমাকে তুই হাসাতে পারিস বিনু? খুব করে? অনেক দিন হাসি নি। তারা বেশ বেঁচে গেচে, তাকে বেশী কিছু ভোগ করতে হয় নি।"

হরিশঙ্কর একটী বুকভরা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

এমন সময়ে সহসা একটী ভৃত্য আসিয়া হাজির হইয়া বিনোদিনীকে সংক্ষেপে জানাইল যে তাহার বাবুরা সপরিবারে দুই তিন দিনের জন্য কলিকাতায় যাইতেছেন, আজ রাত্রের গাড়ীতে যাইতে হইবে, সুতরাং সুকুকে তাহার মাতাঠাকুরাণী পাঠাইতে পারিলেন না।

ভৃত্যটী চলিয়া গেলে হরিশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, —"কে?"

"সুকুদের চাকর। সুকুকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম, তাই আস্‌তে পারবে না খবর দিয়ে গেল।"

"সুকুকে কেন?"

"এম্‌নি—"

"এম্‌নি? যাক্‌গে—" বলিয়া ত্বরিতপদে হরিশঙ্কর উঠিয়া চলিয়া গেল।

বিনোদিনী মৌনভাবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল সমগ্র মানুষের ইতিহাস কত দুর্ভাগ্যের কাহিনী দিয়াই না লেখা!

৫

পর দিন সন্ধ্যার পর হইতে হরিশঙ্কর অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করিতে লাগিল। সারা দিন ধরিয়া সে একটা বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করিয়া সগর্ব্বে চলাফেরা করিয়াছিল; এখন সন্ধ্যার গাঢ় ম্লান ছায়ার পরিব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সতেজগর্ব্ব ভাঙ্গিয়া লুটিয়া পড়িতে চাহিল। একটা প্রকাণ্ড অবসাদের আকস্মিক আক্রমণে তাহার শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য লুপ্ত হইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে।

সারা দিনটা কাটিয়াছিল এক রকম,—বেশ সুন্দর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিনোদিনীর সহিত যখন তখন রসিকতা করিয়া প্রচুর হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়া নিজেকে সরস ও হাল্কা করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে, যেখানে সেখানে ইচ্ছামত ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়াছে। যখনই যে ইচ্ছা হইয়াছে, তখনই সে তাহা করিয়াছে, কোন বাধা পায় নাই। আপন খোস-খেয়ালের খুসীতে মনটা সকল সময় ভরপুর ছিল। এখন সে হাজার চেষ্টা করিয়াও খুসী হইতে পারিতেছে না,—যেন প্রদীপের সব তৈল জ্বলিয়া নিঃশেষ হইয়া পুড়িয়া গিয়াছে, আর কিছুতেই আলো জ্বলিবে না।

সময় আর কাটে না। যৌবনে,—যেখানে সময়ের অপ্রাচুর্য্য বেশী করিয়া অনুভূত হয়, সেখানে প্রাচুর্য্যের

অভাব চিরকালই দারুণ অভাব থাকিয়া যায়; আর বার্দ্ধক্যে,—যেখানে সময়ের লেশমাত্র প্রয়োজন নাই, সেখানে সময় যেন অগাধ জলধি-জল—ফুরাইয়াও ফুরায় না। এই তো সবে সন্ধ্যা, ইহার পর সুদীর্ঘ একটানা রাত্রি পড়িয়া রহিয়াছে, কখন্ যে অবসান হইবে, কে জানে! আর হইলেই বা,—একটা রাত মাত্র! আরও এমনি কত শত রাত্রিই তাহার ললাটে ভোগ লেখা আছে। এ বুড়া হাড় —একেবারে ঝুনো হইয়া গিয়াছে, মরণ কাহাকে বলে সে জানে না। জানিবেও না!

অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করায় সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, অথচ উঠিয়া সে কি কাজে নিজেকে আবদ্ধ রাখিবে, তাহাও সে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। সে ভাবিয়া দেখিল, মনঃপূত কিছু পাওয়া এখন অসম্ভব। ইহাতে সে যেমনি বিরক্ত তেমনি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল।

অকস্মাৎ বিনোদিনীর দুর্ভাগ্যের কথা তাহার স্মরণ হওয়ায় সে চোখ মুদিয়া বিনোদিনীর সহিত তাহার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের ইতিহাস তুলনা করিতে সুরু করিল। বিনোদিনী তাহার মতই দুর্ভাগ্য লইয়া জন্মিয়াছে, কিন্তু তার ভোগের মাত্রাটা অনেক বেশী, কারণ সে পুরুষ মানুষ; তাহাকে সহ্য করিবার শক্তি ও বুদ্ধি দিতে বিধাতা কার্পণ্য করেন নাই এবং স্মৃতির জ্বালা এড়াইবার সহস্র পথ তাহার পক্ষে উন্মুক্ত আছে। কিন্তু নারীর তো কোন উপায়ই নাই—অশনে বসনে স্মৃতির আগুন বুকে জ্বালাইয়া রাখিতে হয়। তবুও বিনোদিনী খায়-দায় ও হাসে এবং প্রয়োজন হইলে তাহাকেই সান্ত্বনা দেয়।

আশ্চর্য্যের বিষয় কেমন করিয়া এই নারী সব ভাঙ্গার আঘাতে পাষাণের মত অচল ও অটল থাকিবার মত করিয়াই নিজেকে গড়িয়াছিল। সে জানিত, সংসারটা ভাঙ্গা-গড়ার অপরূপ লীলাক্ষেত্র; কিন্তু আজ সেই জানাটাই তাহার কাছে একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য হইয়া উঠিল। কি অদ্ভুত এই জীবনটা। এখনকার এই নিঃসঙ্গ, অবসাদভঙ্গ মরণোন্মুখ জীবন, যৌবনের সৃষ্টি-রসে পূর্ণ ভবিষ্যৎ জীবনের কল্পনার স্বপ্নকে নিষ্ঠুর পরিহাসের কটু ব্যঙ্গোক্তিতে তিক্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাহার ইচ্ছা হইল সে চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলে, "ওগো মানুষ, তোমরা হেস না, হাসিটী দেওয়া ভগবানের ভুল হয়েচে। কান্না—শুধু কান্নাই আমাদের জীবন।"

কোন দিনও চোখ ফাটিয়া যাহার এক বিন্দু তপ্ত অশ্রু ঝরে নাই, আজ তাহারই বুক ঠেলিয়া কান্নার প্রবল উচ্ছ্বাস ছুটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে, অঝোর নয়নে কাঁদিতে পারিলে সে যেন বাঁচে। যে ক্রন্দনকে সে অপৌরুষেয় বলিয়া হেয় মনে করিয়া আসিয়াছে, আজ, তাহার কাছে তাহাই একান্ত বরণীয় হইয়া উঠিল। অথচ, চোখ হইতে এক ফোঁটাও জল ঝরিল না।

হরিশঙ্কর ডাকিল, "বিনু"—

বিনোদিনী বাহিরে আসিয়া আকাশের নক্ষত্রমালার দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। হরিশঙ্করের গলার সাড়া পাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্‌চেন, চাটুয্যে মশাই?"

হরিশঙ্কর উত্তর পাইয়া চমকাইয়া বলিল, "কে? বিনু? তুই কখন এখানে এলি?"

"খানিকক্ষণ! ঘরে বড্ড গরম, তাই বাইরে হাওয়ায় একটু এলুম।"

"আজ বড্ড বিশ্রী গরম পড়েছে"—

"কি রকম বিশ্রী গুমোট্। ভাল করে' মেঘও হবে না, বিষ্টিও হবে না। হাওয়াও কিছু নেই।"

হরিশঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

"যতীন আসে নি?"

বিনোদিনী অনুচ্চস্বরে অতি সংক্ষেপে উত্তর দিল, "না।"

হরিশঙ্কর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "আমার শরীরটা আজ কেমন যেন দুর্ব্বল হয়ে' পড়েচে, ঝিমঝিম্ কর্‌চে। মনে কর্‌চি সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে ঘুমোবো।"

"এক্ষুনি দেবো?"

"এক্ষুণি? না, আর একটু পরে।"

বিনোদিনী একটু দূরে সরিয়া যাইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিল। অমাবস্যার রাত্রি, আকাশে চাঁদ নাই। এক খানা কাল মেঘ একটু একটু করিয়া অতি নিঃশব্দে পক্ষ বিস্তার করিতেছে। বহু দিনের কথা, এমনিতর এক রাতে তাহার সিঁথির সিঁদুর চিরজন্মের মত ঘুচিয়া গিয়াছে। বুকে সঞ্চিত পুঞ্জীভূত বেদনা চোখের কোণে অশ্রু আকারে ঝরিল, বিনোদিনী আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিল।

হরিশঙ্কর বলিল, "চ', আমায় খেতে দিবি। খেয়ে দেয়ে আজ ঘুমোব—আর ভাল লাগ্‌চে না।"

বিনোদিনী ভিজা গলায় উত্তর করিল, "চলুন।"—বলিয়া সে অগ্রসর হইল।

রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় হরিশঙ্কর এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিল।

সে একটী ঘরে খাটের উপর শুইয়া আছে। তাহার খাটের উল্টা দিকে দেওয়াল-ঘেঁসা একটা টেবিলের উপর একটী বাতিদানে আলো জ্বলিতেছে। আলোর তেমন ঔজ্জ্বল্য নাই, তাহা হইলেও সে ঘরের পক্ষে পর্য্যাপ্ত। ঘরের জিনিসগুলি বেশ পরিপাটীর সহিত গোছান; যেখানে যেটী থাকার প্রয়োজন সেইখানেই সেটী বিরাজিত, কোনরূপ বিশৃঙ্খলা নাই। হরিশঙ্কর খাটে সোজা হইয়া শুইয়াছিল, ঘাড় ঈষৎ বাঁকাইয়া দেখিল, টেবিলের পাশে অপর ঘরে যাইবার দুয়ারটা খোলা এবং খোলা দুয়ার দিয়া আলোকরশ্মি আসিতেছে।

হরিশঙ্করের বারংবার মনে হইতেছিল, এই ঘরটা পূর্ব্ব-পরিচিত, অথচ, কোন স্থানেই পূর্ব্ব-পরিচয়ের চিহ্ন আবিষ্কার করিতে পারিতেছিল না। এইজন্য সে মনে মনে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিল এবং চারিদিকের অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা তাহার অস্বাচ্ছন্দ্যকে বাড়াইয়া তুলিল।

এ যেন ঠিক রোগীর ঘর। রোগীর ঘরে রোগী নিদ্রিত হইলে যেরূপ আলো জ্বলিতে থাকে, এ আলোও সেইরূপ জ্বলিতেছে এবং সুপ্ত রোগীকে ঘিরিয়া যেরূপ নীরবতা বিরাজ করে, এ ঘরে সেই রকমই নীরবতা। দূরে অস্পষ্ট, দুর্ব্বোধ্য কোলাহল-শব্দ; কাছের নিস্তব্ধতা যেন দূর হইতেই তাহাকে ঠেলিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। এ যেন মরণ-বাঁচনের তুমুল নিঃশব্দ যুদ্ধ চলিয়াছে এবং সকলে নির্ব্বাক্ আতঙ্কে ফলাফলের প্রতীক্ষা করিতেছে।

হরিশঙ্কর মনে মনে প্রশ্ন করিল, এই মরণ-উন্মুখ রুগ্ন ব্যক্তিটী কে? সে? তাহার এত বড় কঠিন ব্যাধি, অথচ সে জানে না এবং যন্ত্রণাও অনুভব করিতেছে না! সে বিস্ময়ে কিরূপ ব্যাধি পরীক্ষা করিবার জন্য উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু একটা অলস ক্লান্তি তাহার সর্ব্বাঙ্গ এমনই করিয়াই ছাইয়া রহিয়াছে যে সে কিছুতেই উঠিতে পারিল না।

সহসা শিয়রের কাছে একটী কোমল নারীকণ্ঠে শুনিতে পাইল, "ওগো শুন্‌চ?"

এ স্বর যৌবনের প্রারম্ভ হইতে শুনিয়া আসিয়াছে এ কি কখনও ভুল হয়? একটা অপরিসীম বিস্ময় ও পুলকে তাহার সমগ্র অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

সেই নারীকণ্ঠ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া, পুনরায় সুধাইল, "ওগো শুন্‌চ?"

হরিশঙ্কর অত্যন্ত সহজভাবে, পূর্ব্ব-ঘরকন্নার কাজে যেরূপ উত্তর করিয়া থাকিত, সেইরূপ উত্তর করিল, "কি?" এইরূপ সাধারণ উত্তর তাহাকে কম বিস্মিত করিল না।

"বকুর জ্বর হয়েচে।"

হরিশঙ্কর সাশ্চর্য্যে কহিল, "বকুর জ্বর হ'ল!"

"হাঁ গো, সন্ধ্যে থেকে বকু শীত শীত করছিল; বৌমা বল্‌লে গা গরম। যাই, দেখে আসি।"

তাহার চোখের সাম্‌নে দিয়া অতি লঘু পদক্ষেপে নারীমূর্ত্তিটী সম্মুখের ঘরে চলিয়া গেল। হরিশঙ্কর সেই দিকে চাহিয়া শুইয়া পড়িয়া অনুভব করিল, সেই নারী-মূর্ত্তিটী অতি ধীরে বকুর ললাট স্পর্শ করিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিল, গায়ের কাপড় টানিয়া ভাল করিয়া বকুর দেহ ঢাকিয়া দিল এবং পার্শ্বে উপবিষ্টা বধূকে অনুচ্চস্বরে কিছু বলিল। তার পর উঠিয়া জানালার পাখীগুলি পরীক্ষা করিয়া আলো ঈষৎ কমাইয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং একেবারে তাহার সম্মুখে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইল।

"জ্বর অনেকটা কম। এখন বেশ ঘুমুচ্চে।"

হরিশঙ্করের সব চেয়ে বেশী বিস্ময়কর ঠেকিল, বকুর জন্মাইবার দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রসন্নময়ী ইহলোকের সব দেনা-পাওনা চুকাইয়া শেষ করিয়া দিয়াছে। সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, "তুমি?"

তাম্বুলরাগ-রঞ্জিত ওষ্ঠাধরে স্মিত হাসির রেখা ফুটাইয়া প্রসন্নময়ী কহিল,—"সে কি গো? আমাকে তুমি দু দিনেই ভুলে গেলে? হাঁ করে' দেখ্‌চ কি?"

"তোমাকেই দেখ্‌চি?"

হাঁ, প্রসন্নময়ীই বটে। সিঁথিভরা উজ্জ্বল সিন্দুর-রেখা, কপালে সিন্দুরের টীপ। বর্ণ সেই রকমই আছে, তাহার উপর সামান্য মাত্র ম্লান ছায়া পড়িয়াছে। দেহের পরি-পূর্ণতা এখন যেন অনেকটা [illegible]

"তুমি এত আশ্চর্য্য হচ্ছ কেন ?"

হরিশঙ্কর প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি না মরে' গিয়েছিলে ?"

"হাঁ তা তো গিয়েছিলুমই। হয়েচে কি ?"

"আমি তোমায় নিজের হাতে চিতেয় তুলে দিয়েচি, দাহ দেখেচি, গঙ্গাজলে চিতে নিবিয়েচি, আর তুমি—," হরিশঙ্কর তাহার বক্তব্য সম্পূর্ণ করিতে পারিল না।

প্রসন্নময়ী বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া তরল পরিহাসের কণ্ঠে হাসিয়া কহিল, "তুমিই না বল্‌তে আমায় বড় ভালবাস ? আমায় আগুনে পুড়ে মর্‌তে দেখে তোমার এতটুকু কষ্ট হয় নি ?"

হরিশঙ্কর ইহার কোন উত্তর দিতে পারিল না, পরিপূর্ণ বিস্ময়ে প্রসন্নময়ীর কৌতুকাবৃত মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। প্রসন্নময়ী হাসিয়া—যেন হরিশঙ্করের বিস্ময় ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য কহিল, "তুমিই তো বুঝিয়েছিলে মানুষ মরে না, তাই মরি নি। মর্‌বার ভাণ করে' তোমার সঙ্গে একটু খেলা করেছিলুম।" বলিয়া কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। তার পর সহসা হরিশঙ্করের বুকের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া প্রবল উচ্ছ্বাসাবেগে কাঁদিয়া উঠিল, "তুমি আমার তরুণকে ফিরিয়ে এনে দাও।—তরু-বাপ, ফিরে আয় রে। তরু—তরুরে—"

সে কি ফুলিয়া ফুলিয়া কান্না—

ক্রন্দনের গুপ্তফল্গুর উচ্ছ্বসিত প্রবাহের আকস্মিকতা হরিশঙ্করের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; তাহার সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইয়া পড়িল। সে ধ্যানমগ্ন যোগীর মত তন্ময় হইয়া রহিল।

আবেগ কিছু প্রশমিত হইলে হরিশঙ্করের মুখ হইতে দীর্ঘশ্বাসের মত বাহির হইয়া গেল, "বরুণও নেই। তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসী দিয়েচে।"

"বরুণ নেই!—তাকেও তুমি রাখ্‌তে পার নি—" প্রসন্নময়ী হরিশঙ্করের বুকের উপর মুখ ঘসিয়া প্রবলভাবে কাঁদিতে সুরু করিল।

হরিশঙ্করের মুখ হইতে পুনর্ব্বার বাহির হইল, "বৌমা বিষ খেয়ে মরেচে। পরী দিদিকে বিষ খাইয়ে মেরেচে।" সে স্পষ্ট অনুভব করিল, এ বলার উপর তাহার কোন হাত নাই; মুখ আপনা হইতেই এই শব্দগুলির উচ্চারণ করিয়া যাইতেছে।

"তুমি করেচ কি!—ওঃ—"

প্রসন্নময়ী তাহার কঠিন বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া মূর্চ্ছা গেল। তাহার জরাজীর্ণ বুক দুই খানি কোমল বাহু শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছে। হাত দুটী সরাইয়া লইয়া মূর্চ্ছিতা নারীর মুখ দেখিতে এবং মূর্চ্ছা অপনোদন করিতে সাহস হইল না। তাহার মনে হইল, একটা বিশাল পাষাণভারে তাহার শ্বাস প্রশ্বাস বুঝি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

এই অবস্থা হরিশঙ্করের অসহ্য বোধ হইল; সামান্য একটু বাতাস, সামান্য একটু আলোর স্পর্শের জন্য তাহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। বহু কষ্টে সে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল।

ক্ষণকাল পরে সুপ্তির মধ্যে হরিশঙ্করের বোধ হইল, চারিদিকে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। প্রসন্নময়ী সেই ঘনীভূত তিমিরের দুর্ভেদ্যতার মধ্যে কোথায়, কখন্ কিরূপে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়া গেল, তাহা সে কোনক্রমে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। একটা অদ্ভুত রহস্য যেন ক্রমশঃ নিবিড় হইয়া আসিতেছে। এমন সময়ে কে যেন কোমল হস্ত মাথায় রাখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিল "হরি।"

হরিশঙ্কর চক্ষু মেলিয়া তাকাইয়া দেখিল, তাহার মা। সে উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলিয়া উঠিল, "মা!" শিশু যেমন মায়ের কোলে একান্ত নির্ভরতার আনন্দে হাসে, তেম্‌নিতর নিঃশঙ্ক নির্ভরতার প্রশান্তিতে তাহার সমগ্র অন্তর পূর্ণ হইয়া গেল।

"কাঁদিস্ নে হরি। তোর কোন ভয় নাই।"

মায়ের সান্ত্বনা হরিশঙ্করের নিকট অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য ঠেকিল। কিসের ভয়, কিসের জন্য ক্রন্দন? সে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মা মাথায় হাত বুলাইয়া হাসিয়া কহিলেন, "তুই যে ভেবে ভেবে দেখ্‌চি চুল দাড়ী সব পাকিয়ে ফেলেচিস্। তোর এত ভাবনা কিসের ?"

হরিশঙ্কর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "ভাবনা কিসের ? আমার বুকের সব ক'খানা পাঁজরা ভেঙ্গে দিয়ে গেছে মা।" ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, "তরুণ গেল, প্রসন্ন ছেড়ে গেল। বরুণকেও রাখতে পারলুম না, মনে করেছিলুম,

বকুদাদা পরীদিদিকে বুকে জড়িয়ে ধরে রেখে দেব, তাদেরও কেড়ে নিল—"

হরিশঙ্কর পারিবারিক-জীবনের দুর্ঘটনার তালিকা একে একে তাঁকে দিল; কিন্তু সাশ্চর্য্যে লক্ষ্য করিল, তাহার নিদারুণ সংবাদ মায়ের মনে কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিল না। বরঞ্চ মা হাসিয়া কহিলেন, "তুই কি সব অলক্ষুণে কথা বল্‌চিস হরি? তারা সবাই যে ওঘরে বসে।"

"তরুণ মরে নি?"

"না।"

"বরুণ ফাঁসী যায় নি?"

"না।"

"বৌমা বিষ খায় নি? পরীদিদিকে খাওয়ায় নি?"

"না।"

"বকুদাদু বেঁচে আছে?"

"হাঁ।"

"তোমার বৌমা?"

"সে তো তোর জন্যে ভেবে ভেবে সারা হচ্চে।"

"তবে যে দেখলুম তারা সবাই একে একে—ছেড়ে গেল। সেটা কি দুঃস্বপ্ন?"

"দূর, কি ছাইভস্ম সব তুই বল্‌চিস। ওদের ডাকব?"

হরিশঙ্করের মনে হইল, বুদ্ধি শুদ্ধি সব তাহার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই মরজগতের এইরূপ অভাবনীয়, অভূতপূর্ব্ব পরমাশ্চর্য্যজনক কাণ্ডের সম্ভাবনা তাহার বুদ্ধি-ধারণার সম্পূর্ণ অতীত অথচ মায়ের এই গভীর আশ্বাস-বাণী অস্বীকার করার কোন উপায় বা হেতুও ছিল না। তার পর তাহার বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রহিল না, যখন দেখিল রোগে শীর্ণ তরুণ, গলায় গভীর কালো দাগ লইয়া বরুণ, বৌমার কোলে তার পরীদিদি, ক্রীড়াচঞ্চল বকুদা, তাহার চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার সর্ব্বদেহ দুঃসহ পুলকে বারংবার শিহরিয়া উঠিল। এ কি সত্য!

সে যেন একটা মায়াপুরীতে আসিয়াছে। এ অপূর্ব্ব পুরীর সমস্তই দুর্ব্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয় অথচ সত্য,—মিথ্যার লেশমাত্র নাই।

ভাবিতে ভাবিতে সে তাহার বকু-দাকে নিবিড় আলিঙ্গনে চাপিয়া ধরিল, চুম্বনে চুম্বনে তাহাকে বিব্রত করিয়া দিতে লাগিল। অকস্মাৎ তাহার সমগ্র চেতনা লুপ্ত হইয়া গেল। তার কতক্ষণ পরে হরিশঙ্কর জানে না কখন্, সে চক্ষু অর্দ্ধ উন্মীলিত করিয়া দেখিল, কেহই নাই। দারুণ হতাশে হাত ছাড়িয়া দিতেই সে অনুভব করিল, কি যেন শয্যাপ্রান্তে নিঃস্পন্দভাবে পড়িয়া গেল।

স্কু তাহার স্নেহালিঙ্গনের চাপে মরিয়া গিয়াছে। তাহার অজ্ঞাতে কখন্ তাহার পাশে আসিয়া স্কু শুইয়াছিল, স্বপ্ন-ঘোরে তাহাকেই সে এমনি করিয়া চাপিয়া ধরিয়াছিল। হরিশঙ্করের মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া অব্যক্ত অসীম ভয়ে তাহার দেহের প্রতি কণাটী পর্য্যন্ত কাঁটা দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল। ব্যাপারটার আকস্মিকতা এবং অভাবনীয়তা তাহাকে এম্‌নি করিয়া আহত করিল যে, দুঃসহ তৃষ্ণায় আকণ্ঠ কাঠ হইয়া গেল, এবং উঠিয়া এক গেলাস জল গড়াইয়া খায়, এ সাহস পর্য্যন্ত হইল না।

অভিভূতির মোহ কাটিয়া যাইবা মাত্র সে শয্যার উপর ত্রস্তভাবে উঠিয়া বসিল এবং হাতড়াইয়া স্কুর মৃত দেহের অনুসন্ধান করিতে সুরু করিল। কিছুই পাইল না, তবুও তাহার সংশয় ঘুচিল না।

হরিশঙ্করের বোধ হইল, ঘুমান অসম্ভব। সে হাঁটুর উপর কনুই রাখিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল।

বাহিরে নিস্তব্ধ প্রকৃতি। দৈত্যাকার ঘনকৃষ্ণ তিমিরের পাষাণভারে সমগ্র মর্ত্ত্যভূমি অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিতেছে। দূরের গাছ পালাগুলি যেন জমাট-বাঁধা মূর্ত্ত অন্ধকার, হাওয়ায় গাছের পাতাগুলি হেলিতেছে দুলিতেছে।

হরিশঙ্কর আর পারিল না, শুইয়া পড়িল। শুইয়া শুইয়া তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, তাহাকে ঘিরিয়া একদল শিশু নাচিতেছে এবং গানের সুরে বলিতেছে,—

"বল হরি হরি বোল্
দাদুকে খাটে তোল্
বল হরি হরি বোল্
বুড়োকে খাটে তোল।

৬

"বিনু, এবার সব ঠিক্ হয়ে গেচে। তোমাকে আর ভাব্‌তে হবে না।"

বিনোদিনী সাশ্চর্য্যে হরিশঙ্করের মুখের দিকে তাকাইল।

"বুঝতে পারলি না? দূর বোকা; কাল যে ওরা সবাই এসেছিল; কথাবার্ত্তা সব হয়ে গেছে।"

বিনোদিনী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হরিশঙ্করের আপাদ-মস্তক দেখিয়া লইল। এ কেমন যেন সব দুশ্চিন্তার বোঝা নামাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়ার ভাব! চোখের চাওয়ায় সেই বিষাদের কালো ছায়া আছে, অথচ তাহা আজ কি যেন আনন্দে চঞ্চল হইয়াছে। বিনোদিনী প্রশ্ন করিল, "কাল রাত্তিরে ঘুমোন্ নি?"

হরিশঙ্কর তৎক্ষণাৎ এক গাল হাসিয়া উত্তর করিল, "ঘুমোব কি করে? তারা এল সবাই আর আমি ঘুমোব? সকাল বেলা থেকে ছেলেরা সবাই যে কোথায় গেল, আমি খুঁজে পাচ্ছি না।"

বিনোদিনী হরিশঙ্করের দুর্ব্বোধ্য বাক্যজাল ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া কহিল, "যান্ আপনি স্নান করে আসুন। আমি সরবৎ করচি, খেয়ে দেয়ে একটু ঘুমুন।" বিনোদিনীরও রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই। অনেক রাত পর্য্যন্ত সে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিয়াছে।

হরিশঙ্কর বিনোদিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি রকম আলো বল্ দিকি? আগে কোন দিন তো দেখি নি।"

বিনোদিনী হরিশঙ্করের এই অসম্বদ্ধ কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিল না। সে মনে করিল, গতকল্যের মত আজও রসিকতা করিবার অদ্ভুত খেয়াল চাপিয়াছে। সে হাসিয়া উত্তর করিল, "সে সব পরে হবে। যান আপনি আগে স্নান করে আসুন।" বলিয়া সে নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত হইল।

হরিশঙ্কর দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, ছেলেদের দলটী কোথায় লুকাইল। বাগানে? অন্ধকারে তাহাদের সকলকেই যেন সে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল, সহসা কোথা হইতে এক রাশ অপরিচিত আলো আসিয়া তাহাদের জমাটী খেলাটী ভাঙ্গিয়া দিল

বাগানে আসিয়া চতুর্দ্দিকে সে তাহার ছেলেদের দলটীর অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইল কিন্তু কোথায়ও সন্ধান মিলিল না। গেটের কাছে আসিয়া আরাম কেদারাটী দেখিতে পাইয়া বসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ বসিয়া সে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইল। গাছ-গুলি দেখিয়া মনে হইল, তাহারা এক বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে। দেখিয়া সে মুগ্ধ হইল।

সম্মুখের রাঙা কাঁকরের পথ দিয়া একটী ভদ্রলোককে মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতে দেখিয়া হরিশঙ্করের সহসা ইচ্ছা হইল, লোকটাকে ডাকিয়া সে ক্ষণকালের জন্য আলাপ করে। ইচ্ছা হইবা মাত্র সে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ও মশাই, একটা কথা শুনে যান।"

ভদ্রলোকটী ডাক শুনিয়া একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া আপন গতিতে যে দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

হরিশঙ্কর তাহা দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া ডাকিতে লাগিল, "ও মশাই, একবার শুনুন। এই দিকে একবার দয়া করে' আসুন।"

ভদ্রলোকটী হরিশঙ্করের ডাকে অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তিনি কাছে আসিলে হরি-শঙ্কর বলিল, "আপনার সঙ্গে গোটা দুই কথা আছে।"

ভদ্রলোকটী বিনীতভাবে বলিলেন, "বলুন।"

হরিশঙ্কর কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া কহিল, "মশাই, আমার একটা ছেলে ছিল। তার নাম বরুণ। সে স্বদেশী ছিল বলে সরকার তাকে ধরে ফাঁসী দিয়েচে। সরকার কার হুকুমে ফাঁসী দেয়?"

ভদ্রলোকটী আদৌ এরূপ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া তিনি বলিলেন, "কিছু দোষ অবশ্য তিনি করেছিলেন; না হ'লে শুধু শুধু তাঁর ফাঁসী হবে কেন?"

হরিশঙ্কর জোর করিয়া বলিল, "হাঁ মশায়, শুধু শুধু! আমার ছেলে, আমি তাকে জানি না!"

ভদ্রলোকটীর ধারণা হইল, লোকটা নিশ্চয় পাগল, তাই এড়াইবার চেষ্টা করিল, "তা বটে।"

"দেখুন রাজার আইনে আছে, লোককে খুন করতে পারবে না। সরকার আমার ছেলেকে খুন করেচে। আমি এই নিয়ে মকদ্দমা করতে পারি।"

ভদ্রলোকটী ব্যস্তভাবে উত্তর করিলেন; "হাঁ মশাই খুব পারেন।"

"সরকারের ফাঁসী হবে?"

ভদ্রলোকটী বিনা দ্বিধায় উত্তর করিলেন, "নিশ্চয়ই।"

হরিশঙ্কর গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "যান।"

ভদ্রলোকটী অব্যাহতি পাইয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, দ্রুতপদে গন্তব্যপথ ধরিয়া চলিলেন, এবং ভুলিয়াও পশ্চাতে দৃক্‌পাত করিলেন না।

বৈকালে চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল, হরিশঙ্কর চাটুয্যে নামে যে প্রভূত বিত্তশালী পক্ককেশ বৃদ্ধটী বাগান-ঘেরা দোতলা বাড়ীতে বাস করিত, সে পাগল হইয়া গিয়াছে। সেই সঙ্গে তাহার পাগলামীর সম্বন্ধে কতকগুলি অদ্ভুত গল্পও রটিল।

যতীন সংবাদটা পাইয়া, তাহার এই দূর-সম্পর্কিত মেসোর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির কোন প্রকৃত উত্তরাধিকারী না থাকার দরুণ সে অধিকারী হইতে পারার কোন সম্ভাবনা আছে কি না, জানিবার একান্ত আগ্রহে আইনজ্ঞ বন্ধুর পরামর্শের সন্ধানে বাহির হইল।

বিনোদিনী এখন বুঝিল, প্রাতে হরিশঙ্করের কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারে নিতান্ত অসংলগ্নতা কেনই বা সহসা প্রকাশ পাইল। পূর্ব্বেই সে সন্দেহ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে সে মনে স্থান দিতে অত্যন্ত কুণ্ঠা বোধ করিয়াছিল। এখন দেখিল, ইহা সত্যই, কল্পনার আতিশয্য ইহাতে মোটেই নাই। তাই সে বড় চিন্তিত হইয়া উঠিল; মনে মনে অন্তর্য্যামী দেবতার পায়ে মাথা কুটিয়া জানাইল, "ঠাকুর, তুমি মানুষের বুকে কেন এত স্নেহ দাও? যদি দাও, তাহা হইলে স্নেহের জিনিস অসময়ে কেন কাড়িয়া লও? তুমি কি মানুষের সুখদুঃখ এতটুকু বোঝ না? তুমি এতই নির্ম্মম, নিষ্করুণ?"

সুকুরা কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই, এই পরম দুঃসংবাদটী পাইল। সুকুর পিতা দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিল, "সুকুকে বুড়ো বেজায় ভাল বাসত। সুকু কাছে থাক্‌লে হয় তো বুড়ো এত শীগ্‌গীর পাগল হ'ত না। আহা বেচারী!"

সুকুর মায়ের প্রাণ নানা আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কে জানে, পাগলের মনে কখন কি যে খেয়াল উঠবে, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। যদি তাহার সুকুকে খেয়ালের বশে গলা টিপিয়াই ধরে। হউক না কেন অগাধ ভালবাসা—প্রাণভরা স্নেহ, গলা টিপিয়া ধরা পাগলের পক্ষে আদৌ বিচিত্র নয়। সুকুর মা সুকুর বাহিরে যাওয়া বন্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, তাহার উপর কড়া খরদৃষ্টি সর্ব্বক্ষণ রাখিল।

সুকুদের প্রত্যাবর্ত্তনের পর দিন প্রাতে হরিশঙ্কর নিশীথ রাত্রের স্তব্ধ অন্ধকারে দুষ্ট ছেলের দলের অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রথম দিনে সে বাগানে খুঁজিয়া খোঁজা শেষ করিয়াছিল; পর দিন হইতে পথে পথে খোঁজা সুরু করিয়াছে।

সুকুদের বাড়ীর সম্মুখে কতকগুলি ছোট ছোট বালক একত্র মিলিয়া খেলা করিতেছিল। সুকু পথে নামিবার হুকুম পায় নাই এবং অনেক কাঁদা-কাটি করিয়াও পাইবার কোন ভরসা ছিল না। তাই, একান্ত লক্ষ্মী ছেলের মত ঘরেই থাকিয়া খোলা জান্‌লা হইতে চীৎকার করিয়া খেলার সঙ্গে যোগ রাখিতেছিল। যদিও ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া শুধু চীৎকার করিয়া স্বাধীনভাবে খেলার আমোদটা তেমন উপভোগ করা যায় না, তথাপি তাহার আগ্রহ, উৎসাহ আস্ফালনের অন্ত ছিল না। একটী ছোট ছেলে দূর হইতে হরিশঙ্করকে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওরে ভাই, সেই পাগলা বুড়োটা আস্‌চে।"

সকলে খেলা থামাইয়া স্তব্ধ হইয়া তাকাইয়া দেখিল, বৃদ্ধ হরিশঙ্কর মন্থর পাদক্ষেপে হাস্যোজ্জ্বল নেত্রে অগ্রসর হইতেছে। তাহাদের মধ্যে এক জন সহসা বলিয়া উঠিল, "ঐ রে, ধর্‌লে।"

ধরিবার সম্ভাবনা থাকুক বা নাই থাকুক, তাহারা তিলার্দ্ধমাত্র বিবেচনা না করিয়া খেলা ফেলিয়া যে যেদিকে পারিল, সে সেইদিকে লম্বা দৌড়ে মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল। হরিশঙ্কর চীৎকার করিয়া পলায়মান খেলুড়েদিগকে ডাকিল, "ওরে, তোরা পালাস্‌নে। আমি তোদের সঙ্গে খেলব। আয়, তোরা গা—বল হরি হরিবোল্—"

দু' একটা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বালক দূরে আত্মগোপন করিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া প্রতিধ্বনি করিল, "হরিবোল্।"

সুকুর খেলার সাথীদিগের সভয় ঊর্দ্ধশ্বাস পলায়ন বড়ই বিস্ময়জনক ঠেকিল। পাগল কি অদ্ভুত ভয়ঙ্কর বস্তু তাহা জানিবার এবং দেখিবার আগ্রহের পরিসীমা ছিল না, অথচ শঙ্কায় সে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে

সাহস করিল না। কিছু দূরে সরিয়া গিয়া পাগল জিনিসটা কি তাহা আবিষ্কার করিবার প্রয়াস পাইল।

একটী অতি দুঃসাহসী ছেলে পিছন হইতে এক মুঠা কাঁকর লইয়া হরিশঙ্করের পিঠে ছুঁড়িয়া মারিতে মারিতে কহিল, "এই পাগ্‌লা ধর দেখি—" বলিয়া সে প্রাণপণ শক্তিতে সম্মুখের দিকে দৌড়াইতে সুরু করিল।

হরিশঙ্কর করুণ দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে তাকাইয়া কাতরস্বরে বলিল, "ওরে, তোরা আমায় মারিস্ নে। আমার বড্ড লাগে। আমি তোদের সঙ্গে খেল্‌ব বলেই এসেচি। আমি তোদেরই মত—আমায় মারিস্‌নে।"

বালকেরা হরিশঙ্করের কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করিল না। বরং এইটীকে একটা অতি উপাদেয় খেলা মনে করিয়া পরমোৎসাহে লাগিয়া গেল।

সুকু দূরে হরিশঙ্করকে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ও বন্ধুভাই—বন্ধুভাই, আমি এইখানে। এই যে আমাদের বাড়ী।"

হরিশঙ্কর খুব পরিচিত কণ্ঠের মধুর আহ্বান শুনিয়া ব্যাকুল ভাবে অর্থহীন দৃষ্টিতে চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল। কে তাহাকে এমন মধুর করিয়া ডাকে! কেহ তো তাহাকে ডাকে না, তাহার ডাক শুনে না, দূরে সরিয়া পলাইয়া যায়। অকস্মাৎ তাহার মনে পড়িল, বরুণ-তরুণ দুই নয়নের মণি তাহার ছিল, বকুদা, পরী-দিদি তাহার বুক জুড়িয়া খেলিত, শেষ বয়সে সে সুকুকে তাহার সাথীরূপে পাইয়াছিল; তার পর যে কি হইল, সে কিছুই মনে করিতে পারিল না। পিছন ফিরিয়া সুকুকে দেখিতে পাইয়া তাহার মুখে চোখে একটা বিপুল হর্ষোল্লাসের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। সে ছুটিয়া জানালার কাছে গেল এবং জানালার ভিতর দিয়া শীর্ণ হাত দুইটা বাড়াইয়া দিয়া কহিল, "সুকু ভাই, এসেচিস্, এসেচিস্।"

ক্ষণকালের জন্য তাহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না, পরে প্রবল উচ্ছ্বাসে কহিল, "আমি মনে করেছিলুম তুই বুঝি আর সবাইয়ের মত হারিয়ে গেলি। খেলার সাথী জুটেছিল অনেক, একে একে সবাই খেলা ভেঙে চলে গেল, পড়ে রইলুম আমি বাকী। সুকু রে, আমার যে কেউ নেই—"

সুকু পিতাকে ডাকিয়া বলিল, "বাবা, বন্ধুভাই এসেচে, শীগ্‌গির দরজা খুলে দাও।"

সুকুর পিতা বাহিরে আসিয়া দেখিল, জানালার ধারে হরিশঙ্করের বিষন্ন মূর্ত্তি আকুল দৃষ্টিতে সুকুর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া তাহার চোখে জল আসিল। হায়রে, মানুষের দুর্দ্দশা! বৃদ্ধের লোল চর্ম্মের উপর একটা ম্লান কালিমা পড়িয়াছে এবং তাহা হইতে যেন একটা আর্ত্তনাদ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাড়াতাড়ি, দুয়ার খুলিয়া সে হরিশঙ্করকে ঘরে আনিয়া বসিবার জন্য একটা কেদারা দিতে, হরিশঙ্কর বসিল।

সুকু হরিশঙ্করের বুকের কাছে মুখ রাখিয়া তাঁহার দৃষ্টির উপর দৃষ্টি স্থাপন করিল। বুক-পিঠ ধূলা মাখা দেখিয়া সে সস্নেহে মুছাইয়া দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি সত্যি পাগল হয়ে গেচ? ওরা সবাই বল্‌লে।"

হরিশঙ্কর একটা তীব্র অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সুকু ভয় পাইয়া পিছাইয়া যাইয়া পিতাকে জড়াইয়া ধরিল।

"না ভাই, আমি পাগল হইনি ভাই। তুই আমায় পাগল মনে করিস্‌নি। আমার বাপ্ নেই, মা নেই; আমার তরুণ, আমার বরুণ—ছেড়ে গেল। ছোট ছোট দুটী বাপ্-মা হয়েছিল, তারাও ফেলে গেল। আমার কেউ নেই রে ভাই—কেউ নেই। উঃ! বুকে বড় ব্যথা—বড়; কেউ বুঝ্‌লে না।" হরিশঙ্করের দুই চোখ জলে ভিজিয়া উঠিল, দুই হাত দিয়া বুকটা চাপিয়া ধরিল।

সুকু কিছুই বুঝিল না, কাঁদিয়া ফেলিল। সুকুর পিতার চোখ বড় বড় অশ্রুর ফোঁটায় টল্ টল্ করিয়া উঠিল।

সহসা পিছন হইতে সুকুর মা আসিয়া গলায় বস্ত্র দিয়া হরিশঙ্করকে প্রণাম করিল এবং স্নেহগাঢ় স্বরে বলিল, "তোমার আর কোন দুঃখ নেই বাবা। আমি সব দিদির কাছে শুনেছি। আজ থেকে তুমি আমার ছেলে, তোমার সব ভার আমার—আজ থেকে আমি তোমার মা।"

হরিশঙ্কর এক গভীর পরিতৃপ্তিতে সুকুর মায়ের হাতটী টানিয়া লইয়া নিজের মাথার উপর রাখিয়া বলিল, "মা-আমার, আমায় যেন ছেড়ে যাস্‌নি আর।" তাহার দুই গণ্ড দিয়া দর দর ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

বৌদ্ধ গান ও দোহা

[পণ্ডিত শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য]

বিগত ১৩২৩ বঙ্গাব্দে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "বৌদ্ধ গান ও দোহা" প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার পর এই ১৩।১৪ বৎসর কাল যাবৎ ইহার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে এবং বঙ্গীয় ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ে এই বইখানি অতি উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এই গানগুলির প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কোনও আলোচনা হয় নাই। যাহা হইয়াছে, তাহাতেও ইহার অর্থ সুপরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আমার সামান্য বুদ্ধিতে এ বিষয়ে আমি যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, সুধীগণের অবগতির জন্য তাহা প্রকাশ করিলাম। বৌদ্ধদর্শনে আমার কোন জ্ঞান নাই। সেই জন্য অনেক স্থলে গানগুলি আমি ঔপনিষদিক জ্ঞানের সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। বলা বাহুল্য যে, অবান্তর বিষয়ে বিভেদ পরিদৃষ্ট হইলেও তত্ত্ব-বিষয়ে ঔপনিষদিক ও বৌদ্ধ জ্ঞানে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। বিষয়টী দুরূহ। সেই জন্য আপাততঃ কৃষ্ণাচার্য্যের যে কয়টী পদ উক্ত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে, তাহারই ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল। সময় ও সুবিধা হইলে অবশিষ্ট পদ-গুলির ব্যাখ্যা পরে করিবার ইচ্ছা আছে।

১ (৭)

আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা॥ ধ্রু॥
কাহ্নু কহিঁ গই করিব নিবাস।
জো মনগোঅর সো উআস॥ ধ্রু॥
তে তিনি তে তিনি তিনি হো ভিন্না।
ভণই কাহ্নু ভব পরিচ্ছিন্না॥ ধ্রু॥
জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবণাগবণে কাহ্নু বিমন ভইলা॥ ধ্রু॥
হেরি সে কাহ্নি নিঅড়ি জিনউর বট্টই।
ভণই কাহ্নু মো হিঅহি ন পইসই॥ ধ্রু॥

আক্ষরিক অনুবাদ

আলি ও কালি দ্বারা পথ রুদ্ধ হইল; তাহা দেখিয়া কৃষ্ণাচার্য্য বিশুদ্ধমনা হইলেন। কৃষ্ণাচার্য্য কোথায় গিয়া বাস করিবেন? [কেন না] মন ও ইন্দ্রিয়ে যে বিচরণশীল, সে [ত] দূরতর। সেই সকল [দূরতর বিষয়] তিন, সেই সকল [দূরতর বিষয়] তিন—[সেই] তিনও [আবার পরস্পর] ভিন্ন। [অতএব] কৃষ্ণাচার্য্য বলেন [যে] ভব [জগৎ] পরিচ্ছিন্ন। যাহারা যাহারা আসিল, তাহারা তাহারা চলিয়া গেল; এই আসা যাওয়া [দেখিয়া] কৃষ্ণাচার্য্য বিশুদ্ধমনা হইলেন। কৃষ্ণাচার্য্য দেখিতেছেন—জিনপুর নিকটেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। [কিন্তু] তিনি [কৃষ্ণাচার্য্য] বলেন,—আমার হৃদয়ে [তাহা] প্রবেশ করিতেছে না।

টীকা-সম্মত অর্থ ও ব্যাখ্যা

আলি—অ-আলি—অ-শ্রেণী অর্থাৎ চতুর্দ্দশ স্বর; কালি—ক-আলি—ক-শ্রেণী অর্থাৎ চৌত্রিশ ব্যঞ্জন বর্ণ। স্বর এবং ব্যঞ্জন, উভয় বর্ণের উৎপত্তিস্থল চিত্ত বা মন। মন প্রথমে ললাটকেন্দ্র হইতে ইন্দ্রিয়-সাহায্যে বাহিরে নিঃসৃত হয়; পরে বাহিরের বস্তুর আকার ও ধর্ম্ম মনে প্রতিফলিত হইয়া হৃদয়ে সেই বস্তুবিষয়ক একটা ভাব বা জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে—এই ভাব অব্যক্ত শব্দমূলক। ভাবের উদগমে যে শব্দ স্বরিত বা উচ্চারিত হয়, তাহা স্বরবর্ণ। অন্তরের অব্যক্ত শব্দমূলক ভাব, মাত্র স্বরবর্ণের দ্বারা অন্যের নিকট প্রকাশ করা যায় না—স্বরবর্ণের দ্বারা "আঃ! ঈঃ! ওঃ!" ইত্যাদিরূপে ভাব প্রকাশের চেষ্টা করা যাইতে পারে মাত্র। যে বর্ণমালা দ্বারা অন্তরস্থ ভাবের সম্যক্ ব্যঞ্জন বা প্রকাশ করা হয়, তাহা ব্যঞ্জন বর্ণ। সুতরাং দেখা যাইতেছে—মনের দুইটী প্রবাহ; একটা ইন্দ্রিয়সাহায্যে বাহিরের বস্তুবিষয়ক জ্ঞান আহরণ করে এবং অপর প্রবাহ সেই আহৃত জ্ঞানের ভাবে অনুভাবিত হয়। মনের এই প্রবাহদ্বয়ের সাহায্যেই লৌকিক জ্ঞান

ও লৌকিক ব্যবহার সম্পাদিত হয় এবং সেই লৌকিক জ্ঞান ও লৌকিক ব্যবহার সম্পাদনের অনুকূল আলি কালি বা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের উৎপত্তিও এই দুই প্রবাহ হইতেই হইয়া থাকে। এই জন্য আলি কালি অর্থে মনের এই দুইটী প্রবাহকে বুঝিতে হইবে। ইহার নাম চন্দ্রনাড়ী ও সূর্য্যনাড়ী। যোগশাস্ত্রে চন্দ্র ও সূর্য্য অর্থে মন ও প্রাণকে বুঝাইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত প্রথম প্রবাহ—যাহা বাহিরের বস্তুবিষয়ক জ্ঞান আহরণ করে, তাহা কেবলমাত্র মনের ক্রিয়া বলিয়া চন্দ্রনাড়ী এবং দ্বিতীয় প্রবাহ—যাহা বাহিরের আহৃত জ্ঞানের ভাবে অনুভাবিত হয়, তাহার সহিত প্রাণের সংস্পর্শ থাকে বলিয়া সূর্য্যনাড়ী নামে কথিত হইয়াছে। এই দুইটী প্রবাহই বহির্ম্মুখী বা দ্বৈতভাব-মূলক; সুতরাং নির্ব্বাণ-পথের বিরোধী। এই জন্য নির্ব্বাণ-কামীর পক্ষে প্রথম কর্ত্তব্য হইল—এই দুইটী প্রবাহের নিরোধ করা।

আলি কালি শব্দের যে অর্থ বলা হইল, সেই অর্থে—কি না, মনের উক্ত দ্বিবিধ প্রবাহে নিজ দেবতার সংযোগ সাধনপূর্ব্বক গুরুর নিকট বজ্রমন্ত্র জপের উপদেশ লাভ করিয়া, কৃষ্ণাচার্য্য সেই উভয় প্রবাহকে একীকৃত করিয়া, তাহাদের বহির্গমনের পথ দৃঢ়ভাবে রুদ্ধ করিলেন এবং সদ্গুরুর প্রসাদে মনের যাহা বিশুদ্ধ স্বভাব, তাহা প্রাপ্ত হইয়া বিশুদ্ধমনা হইলেন। তাৎপর্য্য এই যে, গুরুর নিকট জপের প্রণালী শিক্ষা করিয়া, সেই জপের সাহায্যে চন্দ্র ও সূর্য্য, উভয় নাড়ী-প্রবাহে নিজ দেবতা অর্থাৎ অহংপ্রত্যয়গম্য আত্মাকে সংযুক্ত করিতে হয়। উক্ত উভয় প্রবাহে যদি অহংজ্ঞানকে যুক্ত করিয়া দেওয়া যায়, তবে উক্ত প্রবাহদ্বয় যে দিকেই ধাবিত হউক না কেন, কোথাও গিয়া আর "ইদং" বা আত্মা হইতে দ্বিতীয় কোন প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন করিতে পারে না—সর্ব্বত্রই "অহং" বা "আমি" এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহাই উক্ত নাড়ীদ্বয়ের নিরোধ। অহংজ্ঞানের বাহিরে যাহা, তাহাই দ্বৈত পদার্থ। সর্ব্বত্র যদি অহংজ্ঞানই স্ফুরিত হয়, তবে দ্বৈত পদার্থের অভাবে ঐ প্রবাহ আর বাহিরের দিকে ছোটে না। ইহারই নাম দ্বৈতের ধ্বংস, ইহাই মনের বিশুদ্ধ রূপ। এইরূপ যিনি করিতে পারেন, তন্ত্রে তাঁহাকে বীর বলা হইয়াছে। যথা,—

অহমি প্রলয়ং কুর্ব্বন্ ইদমঃ প্রতিযোগিনঃ।
স বীর ইতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বাত্মা নন্দনি মন্ময়ীঃ॥

উপনিষদে ইহাকেই সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন বলা হইয়াছে। গীতার ভাষায় "সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ" ইহাই। এই উদার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেই যথার্থ অভেদ বা ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু উক্ত উভয় প্রবাহে অহং বা আত্মাকে তিনিই সংযুক্ত করিতে পারেন, যাঁহার অহংজ্ঞান মার্জ্জিত, পরিশুদ্ধ ও পরিপুষ্ট। স্থূল দেহের অতীত অহংজ্ঞানকে যিনি ধারণা করিতে পারেন না—এক কথায় যাঁহার অহংজ্ঞান দেহাশ্রিত অহঙ্কার মাত্র, তাঁহার এ বিষয়ে প্রয়াস বৃথা। এই জন্য বৌদ্ধগণ মৈত্রী, করুণা, মুদিতা প্রভৃতি শীলের অনুশীলন করিয়া অহংজ্ঞানকে মার্জ্জিত, পরিশুদ্ধ ও পরিপুষ্ট করিতেন এবং বেদপন্থী বর্ণাশ্রমিগণ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের কঠোর আচার ও নিয়মানুবর্ত্তিতা পালন করিয়া নিজ নিজ অহংকেই পুষ্ট, শুদ্ধ ও মার্জ্জিত করিতেন। পরে যথাকালে বিশ্বময় সেই "আমি"কে ছড়াইয়া দিয়া যথার্থ ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই আজকাল বৈদেশিক শিক্ষার প্রভাবে বর্ণাশ্রম-রূপ বেষ্টনী অগ্রাহ্য করিয়া আকালিক ঐক্য স্থাপনের প্রয়াসী। কিন্তু "আমি"র অপুষ্ট অবস্থায় তাঁহাদের এইরূপ ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা আত্মধ্বংসের প্রকারান্তর কি না, সুধীগণের এ বিষয়ে চিন্তা করা আবশ্যক হইয়াছে।

কৃষ্ণাচার্য্য এখন বিশুদ্ধচিত্তস্বরূপে অবস্থান করিয়া, পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহে তাঁহার যে অভিমান আরোপিত হইয়াছিল, অর্থাৎ আমি এই দেহাবচ্ছিন্নমাত্র, এইরূপ যে জ্ঞান তাঁহার পূর্ব্বে হইয়াছিল, তাহার খণ্ডনার্থ নিজেই নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—ওহে কৃষ্ণ! আমাদের এখন কোথায় গিয়া বাস করা কর্ত্তব্য? পূর্ব্বে যে দ্বৈতভাবমূলক দেহে বা জগতে তুমি ছিলে, সেখানে আবার যাইবে কি? সে জগৎ তো ব্যাপ্য ও ব্যাপকরূপ সুখে অর্থাৎ খণ্ড বা অল্পমাত্র সুখে ব্যাপ্ত। আর এখানে তো ব্যাপ্য-ব্যাপকহীন পরিপূর্ণ অখণ্ড সুখ। যে সকল যোগী মাত্র মন ও ইন্দ্রিয়ে বিচরণ করে—মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আহৃত বাহিরের জ্ঞানই যাহাদের

প্রধান অবলম্বন, তাহারা যে তোমার এই ধর্ম্ম হইতে অনেক দূরে অবস্থান করে ? সরহপাদও বলিয়াছেন,—

জাহি মণ-পবণ ন সঞ্চরই
রবি শশি নাহি পবেশ।
তহি বট চীঅবিসামকর
সরহেঁ কহি উবেস ॥

যেখানে মন ও প্রাণের সঞ্চার হয় না, সূর্য্য ও চন্দ্র যেখানে প্রবেশ করে না, সেইখানে যে বটবৃক্ষ, তাহাই চিত্তের বিশ্রামকর স্থান। আরও দেখ,—তোমার সেই জায়গা বাহিরে স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল এবং অন্তরে কায় বাক্ চিত্ত, এই তিন তিন ভাগে বিভক্ত। কিন্তু এখান হইতে চাহিয়া দেখ,—এই সকল ভিন্ন ভিন্ন লোক একমাত্র মহা-সুখস্বরূপ ব্যাপক সত্তা দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে ; সুতরাং ভেদ উপলব্ধির কোনই লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। পরমার্থবিৎ যোগিগণও এইরূপই দেখিয়া থাকেন। আবার আগমও এই কথাই বলিতেছেন,—

"স্বর্গমর্ত্তপাতালমেকমূর্ত্তির্ভবেৎ ক্ষণাৎ।"

স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল—এই তিন লোকই ক্ষণমাত্রে এক হইয়া যায়। চর্য্যাপদেও এই কথা উক্ত হইয়াছে,— 'আতেঁ তিসেঁ নবতিসিএঁ তিঅ মণ্ডল নাহি বিসেসে।' অন্তরে তিন হইতে, নব ত্রিশ অর্থাৎ উনচল্লিশ হইতে এবং তিন মণ্ডল হইতে কোনও বিশেষ অর্থাৎ ভেদ দেখা যায় না। অতএব কৃষ্ণ বলিতেছেন,—ভবসংসার পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ নানা ভেদ-জ্ঞানবিশিষ্ট অথবা ভবরূপ বিকল্পের আমরা পরিচ্ছেদক বা বিনাশকর্ত্তা।

বাহিরের জগতে বা নিজের মনে যে সকল ভাব উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সকল ভাবই বিলীন হইয়া গিয়াছে। গুরুর প্রসাদে এই সকল ভাবের উৎপত্তি ও ভঙ্গে সংবৃতি-সত্যের * স্বভাব পরিজ্ঞানের দ্বারা কৃষ্ণা-চার্য্যপাদ পরিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন। আগমেও এই কথা উক্ত হইয়াছে যে, ভবের সম্যক্ জ্ঞান হইলেই তাহা নির্ব্বাণ নামে কথিত হয়—"ভবস্যৈব পরিজ্ঞানে নির্ব্বাণ-মিতি কথ্যতে।"

হে কৃষ্ণ! মহাসুখের আলয় সেই জিনপুর নিকটেই বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখিতেছি। কাহ্নু বলেন, আমার হৃদয়ে তাহা প্রবেশ করিতেছে না। তাৎপর্য্য এই-যে, উপরে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে কৃষ্ণাচার্য্যের চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, ইহাই অবগত হওয়া যায়। বিশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তি অদ্বৈততত্ত্বের আভাস মাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন—অদ্বৈততত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন না। অদ্বৈততত্ত্বে প্রতিষ্ঠা ইহার পরেও বহু সাধন-সাপেক্ষ বলিয়া কৃষ্ণাচার্য্য বলিয়াছেন যে, জিনপুর এখনও আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে না। টীকায়ও—"উপায়ৈশ্চ সংবৃত্যৈ সোপানমিব নির্ম্মিতঃ ॥" নাগার্জ্জুনের এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া টীকাকারও এই কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

২ (৯)

এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড্ডিউ।
বিবিহ বিআপক বান্ধন তোড়িউ ॥ ধ্রু ॥
কাহ্নু বিলসঅ আসবমাতা।
সহজনলিনীবন পইসি নিবিতা ॥ ধ্রু ॥
জিম জিম করিণা করিণিরেঁ রিসঅ।
তিম তিম তথতা মঅ গল বরিসঅ ॥ ধ্রু ॥
ছড়ি গই সঅল সহাবে সুধ।
ভাবাভাব বলাগ ন ছুধ ॥ ধ্রু ॥
দশবল রঅণ হরিঅ দশ দিসেঁ।
অবিদ্যাকরি দমকুঁ অকিলেসেঁ ॥ ধ্রু ॥

আক্ষরিক অনুবাদ

একার ও বকাররূপ দৃঢ় স্তম্ভ মর্দ্দন করিয়া [এবং] বিবিধ ব্যাপক বন্ধন ছিন্ন করিয়া, আসব-মত্ত কৃষ্ণ, সহজরূপ নলিনী-বনে প্রবেশপূর্ব্বক নিবৃত্ত হইয়া ক্রীড়া করিতে-ছেন। যেমন যেমন করী করিণীকে ঈর্ষ্যা করে, তেমন তেমন [কৃষ্ণাচার্য্য] অজস্র তথতামদ বর্ষণ করিতেছেন। সকল ছাড়িয়া গিয়া [তাঁহার] স্বভাব শুদ্ধ হইল ; ভাব অভাব [কিছুরই] বালাগ্রমাত্র অপরিশুদ্ধ রহিল না। দশ দিকে [আমাদের] দশবলরতন আহৃত হইয়াছে। [তোমরাও] অবিদ্যা-হস্তীকে অনাসঙ্গ দ্বারা দমন কর।

---

* বৌদ্ধশাস্ত্রে দ্বিবিধ সত্য স্বীকৃত হইয়াছে—সংবৃতি সত্য বা লৌকিক সত্য এবং পারমার্থিক সত্য। সংবৃতি সত্য—বেদান্তের ব্যব-হারিক সত্য। সংবৃতিসত্যের স্বভাব জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান বা পরমার্থ জ্ঞান।

দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্ম্মদেশনা।
লোকসংবৃতিসত্যঞ্চ সত্যঞ্চ পরমার্থতঃ।

টীকাসম্মত অর্থ ও ব্যাখ্যা

এবংকার অর্থে একার ও বকার। একার বকার অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য বা রাত্রি ও দিবাজ্ঞান। চন্দ্র সূর্য্য বা রাত্রি ও দিবাজ্ঞানরূপ দুইটী দৃঢ় বাখোড় বা স্তম্ভকে বজ্রমন্ত্র জপ দ্বারা মর্দ্দন বা বিলয় করিয়া, এবং অনবধূতিরূপ বিবিধ প্রকার ব্যাপক বন্ধন ছেদন করিয়া—রাত্রি, দিবা ও অনবধূতি, এই ত্রিবিধ জ্ঞানের অনুপলম্ভ বা অপ্রাপ্তিরূপ আসব-পানে মত্ত হইয়া, জ্ঞানগজেন্দ্রস্বরূপ কৃষ্ণাচার্য্য সহজ-রূপ নলিনীবন বা মহাসুখ-কমলে প্রবেশপূর্ব্বক নিবৃত্ত অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পরূপে ক্রীড়া করিতেছেন। তাৎপর্য্য এই যে, চন্দ্র সূর্য্য—রাত্রি দিবা বা মন ও প্রাণ—প্রত্যেক মনুষ্যই এই উভয়কে অবলম্বন করিয়া নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। দিবা বা জাগরণকাল, রাত্রি বা স্বপ্নকাল—এই উভয়ের অতীত সুষুপ্তিক্ষেত্রে সাধারণতঃ মানুষের কোন কার্য্যকারিতা থাকে না। বাহিরে দিবা ও রাত্রি এবং অন্তরে প্রাণ ও মন, এই কয়টী আশ্রয় হইতে বিচ্যুত হইলেই মানুষ সুষুপ্তিতে নিজেকে হারাইয়া ফেলে। বাহিরের জগতে যেমন রাত্রি ও দিবা হইতে ভিন্ন অন্য কোনও অবস্থার কল্পনা করা যায় না, মনুষ্যের অধ্যাত্মক্ষেত্রেও তেমনি মন ও প্রাণকে ছাড়িয়া সাধারণতঃ কেহ নিজের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে না। মন ও প্রাণ যখন সুপ্ত বা ক্রিয়া করিতে বিরত হয়, তখন মানুষও নিজের অনস্তিত্বরূপ গভীর অন্ধকারে ঢলিয়া পড়ে। এই জন্য চন্দ্র সূর্য্য, রাত্রি দিবা বা মন ও প্রাণ, এতদুভয়ই সকল মনুষ্যের ধারক ও পোষক। কিন্তু সাধক যখন সাধনপথে অগ্রসর হইয়া ক্রমশঃ চিত্তের একতা অবগত হইতে থাকেন, তখন ঐ উভয়কে তিনি বন্ধন-স্তম্ভ বলিয়া অনুভব করিতে থাকেন। কেন না, বহু কাল যাবৎ ঐ উভয়ের আশ্রয়ে বাস করিয়া এমনই অভ্যাস হইয়া যায় যে, অনন্ত সুখের আধার অখণ্ড জ্ঞানে উপস্থিত হইয়া ইচ্ছা সত্ত্বেও সেখানে তিনি অধিক কাল থাকিতে পারেন না। ঐ মন-প্রাণরূপ দ্বন্দ্বের আকর্ষণে তাঁহাকে দ্বৈত জগতে ফিরিয়া আসিতে হয়। এই জন্য তিনি তখন মনে করেন যে, চন্দ্র সূর্য্য বা খণ্ডমন ও প্রাণের সমূলে উচ্ছেদ করিতে না পারিলে আমি নিরবচ্ছিন্ন সুখস্বরূপ অদ্বৈত জ্ঞানে বিশ্রাম লাভ করিতে পারিব না। কারণ, ইহারা যত দিন বর্ত্তমান থাকিবে, তত দিন আমাকে সেখান হইতে টানিয়া নামাইবেই। এইজন্য তিনি তখন ইহাদের বিলয়সাধনে যত্নপরায়ণ হন। বস্তুতঃ রাত্রি ও দিবা, পরস্পর বিপরীত এই দ্বন্দ্বই মনুষ্যের বন্ধন। ইহা ছিন্ন হইলেই দ্বন্দ্বাতীত ভূমা জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত হইয়া থাকে।

অবধূতী শব্দের অর্থ চিত্ত বা নাড়ীপ্রবাহ। বিরাট্ চিত্তই জগৎ ও অন্যান্য অনন্ত জীবরূপে আকারিত হয়। কিন্তু জগদাকারীয় চিত্তকে আমরা চিত্তরূপে না দেখিয়া জড় পদার্থরূপেই দর্শন করি। সুতরাং অনবধূতীরূপ বিবিধ ব্যাপক বন্ধন অর্থে এই জড়দর্শনরূপ বন্ধন বুঝিতে হইবে।

এ পর্য্যন্ত আমরা তিনটি বন্ধনের কথা জানিলাম। চন্দ্র সূর্য্য বা মন ও প্রাণ দুইটী এবং অনবধূতি বা জড়দর্শনরূপ একটী। কৃষ্ণাচার্য্য এই তিনটী বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া, এই তিনপ্রকার জ্ঞানের অনুপলম্ভ বা অপ্রাপ্তিরূপ মদ্যপানে মত্ত হইয়া অর্থাৎ চিত্তের যে অবস্থায় ঐ তিন রকম বন্ধন-জ্ঞান আর স্ফুরিত হয় না, সেই অদ্বৈত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সহজরূপ মহা-সুখ-পদ্মবনে অর্থাৎ স্ব-রূপে* প্রবেশ করিয়া নির্ব্বিকল্প বা শান্তভাবে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

তাঁহার এই ক্রীড়া কিরূপ, তাহা বলিতেছেন।—যেমন করী করিণীতে ঈর্ষ্যামদ বহন করে অর্থাৎ করী, করিণীর নিকট উপস্থিত হইলে করিণীর আসঙ্গলিপ্সা দমন করিবার জন্য করীর যেমন মদজল ক্ষরিত হইতে থাকে, তদ্রূপ ভগবতী নৈরাত্মা দেবীর সহিত একীভূত হইয়া চিত্তগজেন্দ্র কৃষ্ণাচার্য্য তথতা অর্থাৎ বুদ্ধত্বরূপ মদজল অজস্র বর্ষণ করিতেছেন। তাৎপর্য্য এই যে, তিনি নৈরাত্মার সহিত একীভূত হইয়া—সুতরাং বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া, বুদ্ধের যে সকল ঐশ্বর্য্য বা ধর্ম্ম, তাহাও লাভ করিয়াছেন। যেখানে আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মার অস্তিত্ব থাকে না অর্থাৎ যাঁহাকে লাভ করিলে জীব স্বীয় জীবত্ব ত্যাগ করিয়া, তাঁহার স্বরূপ হইয়া যায়, নিরাত্মা বা নৈরাত্মা অর্থে সকল জীবাত্মার আশ্রয়স্বরূপ সেই সগুণ

* তস্মাৎ সহজং জগৎ সর্ব্বং সহজং স্বরূপমুচ্যতে।
স্বরূপমেব নির্ব্বাণং বিশুদ্ধাকারচেতসা। —হেবজ্র।

ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে বুঝিতে হইবে। * এবং তিনি শক্তি-স্বরূপ বলিয়া এখানে দেবীরূপে কথিত হইয়াছেন। কোন কোন বৈদান্তিক সম্প্রদায় জগতের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্ম যেমন জগতের ত্রৈকালিক অসত্তা ঘোষণা করেন, বোধ হয়, নৈরাত্মবাদিগণও সেইরূপ জীবত্বের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্ম "জীবাত্মা নাই" এইরূপ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তাড়কপাদের "অপণে নাহি সো কাহেরি শঙ্কা"—আমিই যখন নাই, তখন আর আমার জন্ম-মৃত্যুর শঙ্কা কি? এই কথার দ্বারা ইহাই অনুমান হয়।

ইতিপূর্ব্বে অর্থাৎ কৃষ্ণাচার্য্যের জীবত্ব অবস্থায় অণ্ডজ, জরায়ুজ, উপপাদুক প্রভৃতি যে সকল ভাব বা জন্মপরম্পরা তিনি অনুভব বা ভোগ করিয়াছিলেন, প্রকৃতিতে নিহিত সেই সকল ভাব বা স্মৃতি ছাড়িয়া গিয়া অর্থাৎ সেই মদ-জল-বর্ষণে ধৌত হইয়া, তাঁহার চিত্ত স্বভাবতঃ পরিশুদ্ধ হইল; তাঁহার চিত্তে ভাব বা অভাব কিছুরই কেশাগ্র-মাত্রও অপরিশুদ্ধ রহিল না।

এখন তিনি পরিপক্ক কুশলের কথা বলিতেছেন যে, দশ দিক্ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত যে দশবলরত্ন অর্থাৎ বুদ্ধস্বরূপ জ্ঞানরত্ন, অনুভবের অভ্যাস দ্বারা আমরা তাহা আহরণ করিয়াছি। তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম জগতের সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে স্বপ্রকাশরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে অনুভব করিয়া সেই জ্ঞান-রত্ন লাভ করিয়াছি। অতএব তোমরাও আমাদের আহৃত সেই জ্ঞানরত্নের প্রভাবে অর্থাৎ আমাদের নিকট সেই পরম জ্ঞান বিষয়ে উপদেশ লাভ করিয়া আমাদের সাহায্যে অনাসঙ্গ দ্বারা অবিদ্যারূপ করীন্দ্রের দমন কর।

৩ (১০)

নগর বাহিরিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছই ছোই যাই সো বাহ্মনাড়িআ। ধ্রু ॥
আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ।
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ। ধ্রু ॥
এক সো পদমা চৌষঠ্ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী॥ ধ্রু ॥
হালো ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে।
অইসসি জাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ। ধ্রু ॥
তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চঙ্গতা॥
তোহের অন্তরে ছাড়ি নড়এড়া। ধ্রু ॥
তু লো ডোম্বী হাউঁ কপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী॥ ধ্রু॥
সরবর ভাঞ্জীঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ।
মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ॥ ধ্রু ॥

আক্ষরিক অনুবাদ

হে ডোম্বি! নগরের বাহিরে তোমার কুড়িয়া; [সেখান হইতে তুমি] ব্রহ্মনাড়ী ছুঁইয়া ছুঁইয়া যাইতেছ। ওহে ডোম্বি! তোমার সহিত আমার মেলা মেশা করা কর্ত্তব্য; [যে হেতু আমি] কৃষ্ণাচার্য্য [তোমার ন্যায়] নির্ঘৃণ উলঙ্গ কাপালিক যোগী। একটী পদ্ম—তার চৌষট্টিটী পাপড়ি। তাহাতে চড়িয়া ডোম্বি বাপুড়ী নাচিতেছে। ওহে ডোম্বি! তোমাকে আমি সদ্‌ভাবে জিজ্ঞাসা করি-তেছি—কাহার নৌকায় [চড়িয়া] ডোম্বি! তুমি আইস যাও? ডোম্বি! [তুমি] তন্ত্রী (তাঁত) আর চাঙ্গতায় (মাকুতে) [আমাকে] বিক্রয় কর নাই; [আমিও] তোমার জন্ম বাজীকরের ঝাপি (পেটক) ছাড়িয়াছি। ওহে! তুমি ডোম্বি, আমি কাপালিক; তোমার জন্ম আমি হাড়ের মালা গ্রহণ করিয়াছি। ডোম্বি! [তুমি] পদ্ম (সরবর) ভাঙ্গিয়া মৃণাল খাও; [আমি] ডোম্বি! [তোমাকে] মারিব [এবং তোমার] প্রাণ লইব।

টীকা-সম্মত অর্থ ও ব্যাখ্যা

হে পরিশুদ্ধচিত্ত নৈরাত্মা ভগবতি ডোম্বি! রূপাদি বিষয়সমূহরূপ নগরের বাহিরে অর্থাৎ অতীত ক্ষেত্রে মহাসুখের কেন্দ্রস্বরূপ, ইন্দ্রিয়ের অগোচর তোমার বাস-স্থান গুরুসম্প্রদায় হইতে আমি অবগত হইয়াছি। তুমি

* ন্যায়দর্শনের ব্যাখ্যায় উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ কর্ত্তৃক নৈরাত্ম্যবাদের খণ্ডন দেখা যায়। তাঁহাদের মতে নৈরাত্ম্যবাদ অর্থে আত্মার নাস্তিত্ববাদ। কিন্তু এখানে যখন নৈরাত্মা ভগবতী, এইরূপ উল্লেখ দেখা যাইতেছে, তখন তত্ত্বতঃ তাঁহাকে সগুণ ব্রহ্ম বলা ভিন্ন উপায় নাই। পরবর্ত্তী পদের ব্যাখ্যায় এ কথা পাওয়া যাইবে।

বিরমানন্দনামক প্রধান নাড়ী বা মণিমূল হইতে ব্রহ্মনাড়ী অর্থাৎ ব্রহ্মের সংকল্পরূপ বীজ হইতে উৎপন্ন যে চিত্ত—যোগিগণের নিকট যাহা বোধিচিত্ত বা বুদ্ধচিত্ত নামে কথিত, সেই ব্রহ্মনাড়ীকে ছুঁইয়া ছুঁইয়া যাইতেছ। তাৎপর্য্য—নাড়ী শব্দের অর্থ—চেতনশক্তির ত্রিগুণযুক্ত প্রবাহ। ইহার সংখ্যা তত্ত্বতঃ একটা এবং তিনটী গুণের তিন রকম ক্রিয়াবশতঃ তিনটা। এই মুখ্য তিনটী নাড়ী আবার অন্তর ও বাহির, উভয় দিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ক্রিয়াশীল হয় বলিয়া তন্ত্রে প্রধানতঃ ছয়টী নাড়ীর কথা বলা হইয়াছে। জীবের যখন বহির্ম্মুখী গতি প্রবল থাকে, তখন ত্রিগুণময়ী সুষুম্না নাড়ীর তমঃপ্রধান প্রবাহ জীবাত্মার বহির্ম্মুখী গতির ধারক বা স্থিতিসম্পাদকরূপে অন্তর্গতি রুদ্ধ করিয়া রাখে এবং ঐ সুষুম্নারই সত্ত্বপ্রধান বহিঃপ্রবাহ ইড়া নাড়ীরূপে জীবকে বহির্জগতে ক্রিয়াশীল করে, আর সুষুম্নারই রজঃপ্রধান বহিঃপ্রবাহ পিঙ্গলা নাড়ীরূপে সেই ক্রিয়াশীলতার প্রকাশ সম্পাদন করে। আবার সুষুম্নাপ্রবাহ মুক্ত এবং কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিত হইয়া যখন অন্তর্ম্মুখী গতির সূচনা হয়, তখন অন্তর্ম্মুখী গতি বা রজঃপ্রবাহের নাম বজ্রানাড়ী, সেই গতির প্রকাশক সত্ত্বপ্রবাহের নাম চিত্রানাড়ী এবং সেই প্রকাশের ধারক বা স্থিতিসম্পাদক তমঃপ্রবাহের নাম ব্রহ্মনাড়ী। একটীর প্রভাবে জীবাত্মা বহির্জ্জগতে আসিয়া জীবভাবে উদ্বুদ্ধ হয়; অন্যের প্রভাবে জীব স্বীয় অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সুষুপ্তি বা জীবত্বের অবসান-ভূমিতে স্বরূপে বা অস্মিতায় উদ্বুদ্ধ হয়। এই অস্মিতা বা অবিদ্যা-নির্ম্মুক্ত শুদ্ধ রূপই ব্রহ্মনাড়ী। এখানে যাঁহাদের আত্মবোধ উপসংহৃত হয়, তাঁহাদের অবিদ্যা নিবৃত্তি হয় বলিয়া, "ব্রহ্মই আমি" এইরূপ আভাস অনুভূতি হইয়া থাকে; এই জন্য ইহার অপর নাম বোধিচিত্ত। কিন্তু এখানে ব্রহ্মানুভূতি হইলেও ব্রহ্মের ধর্ম্মসমূহের সম্যক্ প্রকাশ বা মুক্তি এখানে হয় না। এই জন্য এখানে আসিয়া উপাসনা দ্বারা ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিতে হয় এবং এই কথাই পদে বলা হইয়াছে। বিরমানন্দরূপ মণিমূল হইতে ডোম্বী বা সগুণ ব্রহ্ম নৈরাত্মা, ব্রহ্মনাড়ী ছুঁইয়া ছুঁইয়া যাইতেছেন, ইহা দ্বারা ব্রহ্মনাড়ীতে অবস্থিত হইয়া, যোগীর ব্রহ্মোপাসনার কথাই বলা হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী পঙ্‌ক্তিগুলিতেও সেই উপাসনার কথাই পাওয়া যায়। *

ওহে ডোম্বি! তোমার সহিত আমি মিলিত হইব অর্থাৎ একাত্মতা লাভ করিব; কেন না, তুমি যেমন ঘৃণাদি দোষ-রহিত ও পরিশুদ্ধ, আমিও সেইরূপ উলঙ্গ অর্থাৎ সমস্ত সংসার-দোষনির্ম্মুক্ত কাপালিক যোগী। অতএব তোমার সহিত আমার পার্থক্য বিদূরিত করিয়া ব্রহ্মপ্রজ্ঞালাভের উপায়স্বরূপ যে মহামুদ্রাসিদ্ধি, তাহা আমি লাভ করিব।

নির্ম্মাণচক্র বা জগৎচক্ররূপ একটী পদ্ম, মহাকাল-স্বরূপ ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে অর্থাৎ মহাকালই এক দিকে আধেয়রূপে জগৎ আকার গ্রহণ করিয়াছেন এবং অপর দিকে আধাররূপে সেই জগৎ ধারণ করিতেছেন। চতুঃষষ্টি যোগিনী-শক্তি সেই জগৎপদ্মের চতুঃষষ্টি দলরূপে শোভা পাইতেছে। সেই পদ্মে ভগবতী নৈরাত্মা বা মহাকালের সহিত একরস বা অভেদভাবে—সুতরাং মহাপ্রেমের আনন্দে কৃষ্ণাচার্য্য নৃত্য করিতেছেন।

নৈরাত্মা—ঈশ্বর বা মহাকালের সহিত একাত্মতা লাভ করিয়া, কৃষ্ণাচার্য্য বলিতেছেন,—হে নৈরাত্মে! তোমার স্বরূপ বিষয়ে আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি কাহার সংবৃত্তি-বোধিচিত্তরূপ নৌকায় যাতায়াত কর? সংবৃত্তি-বোধিচিত্ত অর্থে যে চিত্ত নিজ স্বরূপ বিষয়ে বোধি লাভ করিয়াও বৃত্তির সম্যক্ নিরোধ করিতে পারে নাই। এইরূপ যোগী ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া মধ্যে মধ্যে ঈশ্বর-সারূপ্য লাভ করেন; কিন্তু চিত্তের বৃত্তি সম্যক্ নিরুদ্ধ না হওয়ায় পুনরায় ব্যুত্থিত হইতে বাধ্য হন। এই জন্য এবংবিধ যোগীর নিকট নৈরাত্মার যাতায়াত বা আবি-

---

* কেহ কেহ বলেন, মেঘ অপসারিত হইলে সূর্য্য দেখিতে যেমন অন্য কোনও উপায়ের আবশ্যক হয় না, ব্রহ্মজ্ঞানের আবরক অবিদ্যাশক্তি তিরোহিত হইলে ব্রহ্মজ্ঞান বা মুক্তিও সেইরূপ স্বতঃই উপস্থিত হইয়া থাকে,—তজ্জন্য ঈশ্বরের উপাসনা অনাবশ্যক। কিন্তু ঈশোপনিষদের "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে" এই মন্ত্রের সরল অর্থ গ্রহণ করিলে অবিদ্যা নিবৃত্তির পরে অমৃতত্ব লাভের জন্য ঈশ্বরের উপাসনাই শ্রুতির অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয় এবং এই পদেও ব্রহ্মনাড়ীতে অবিদ্যানির্ম্মুক্ত অবস্থায় ব্রহ্মপ্রজ্ঞালাভের জন্য নৈরাত্মা বা ঈশ্বর উপাসনার কথা পাওয়া যাইতেছে।

র্ভাব তিরোভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহার আবির্ভাব তিরোভাব কিছুই নাই; তিনি সর্ব্বত্র স্বপ্রকাশ-রূপে নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ইহাই কৃষ্ণাচার্য্যের বাক্যের তাৎপর্য্য।

তান্তি বা তন্ত্রী শব্দের অর্থ—জীবের যোনি বা উৎপত্তির কারণস্বরূপ অবিদ্যা। অবিদ্যা—আত্মার স্বরূপবিষয়ক অজ্ঞান। স্ব-রূপ বিষয়ে অজ্ঞান না হইলে নিত্য-বুদ্ধ আত্মা জীবরূপে প্রকাশ হইতে পারেন না। এই জন্য অবিদ্যাকে জীবের যোনি বলা হইয়া থাকে। আর 'চঙ্গতা' শব্দের অর্থ—সেই অবিদ্যার পল্লবস্বরূপ বিস্তৃত বিষয়াভাস। বিষয়াভাস বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বিষয়ের যাহা প্রকৃত স্বরূপ, সাধারণতঃ আমরা তাহা অবগত নহি। কেন না, বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপই হইতেছে পরম তত্ত্ব। কৃষ্ণাচার্য্য বলিতেছেন,—নৈরাত্মে ডোম্বি! অবিদ্যা এবং তাহার যে বিস্তৃত জড় বিষয়-বিস্তার, শ্রীগুরুর চরণ-প্রসাদে এই উভয়ের নিকট তুমি আমাকে বিক্রয় করা পরিত্যাগ করিয়াছ অর্থাৎ ইহাদের অধীনতা হইতে তুমি আমাকে মুক্ত করিয়াছ। সুতরাং আমিও তোমার জন্য বাজীকরের ঝাঁপির ন্যায় এই সংসার পরিত্যাগ করিয়াছি। বাজীকর তাহার পেটরা হইতে যেমন বহু বহু দৃশ্য-বৈচিত্র্যের বিস্তার করে, জন্মমৃত্যু-সঙ্কুল সংসাররূপ পেটরা হইতেও সেইরূপ অনন্ত সুখদুঃখ দৃশ্য-বৈচিত্র্যের উদ্ভব হয়। এই জন্য বাজী-করের পেটরার সহিত সংসার তুলনীয়। অতএব অবিদ্যা বা জীবত্বের কারণকে বিলয় করিয়া বিদ্যাশক্তিরূপ ঈশ্বরত্ব লাভ—সুতরাং জন্মমৃত্যু-সঙ্কুল সংসার হইতে মুক্তি, ইহাই নৈরাত্ম্য ধর্ম্মের স্বরূপ।

হে নৈরাত্মে ডোম্বি! আমি সদ্গুরুর প্রসাদে তত্ত্বতঃ তোমাকে ভাল করিয়া জানিতেছি। এবং সেই জন্য কাপালিক হইয়াছি। কাপালিক হইয়াছি অর্থাৎ সুখ-স্বরূপ তুমি—তোমার উপাসককে যে সুখ প্রদান করিয়া থাক, তাহা পালন অর্থাৎ ধারণ বা সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছি। "কং তব সুখং পালিতুং [অহং] সমর্থঃ।"—টীকা। অতএব অসীম সুখের দাতা তোমার জন্য আমি হাড়ের মালা গ্রহণ করিয়াছি অর্থাৎ চক্র, কুণ্ডল, কণ্ঠি-কাদি নিরংশুচর্য্যা ধারণ করিয়া বাহ্য মন্ত্র তন্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পঞ্চবর্ণরূপ পঞ্চ বিষয়ে বিহার করিতেছি।

তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ যোগী মহা প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের মহাপ্রেমে একান্ত মুগ্ধ হইয়া নিজের যাহা কিছু সমস্তই ঈশ্বরের প্রীতি উদ্দেশ্যে অর্পণ করেন। এমন কি প্রাচীন কালে ঋষিগণের মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বরপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া ঈশ্বর প্রীতির উদ্দেশ্যে নিজের দেহ পর্য্যন্ত অগ্নিতে আহুতি দিতেন বা পর্ব্বত হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দেহত্যাগ করিতেন। কৃষ্ণাচার্য্যের কথায়ও এইরূপ ভাবের সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। বিষয়কে বর্ণ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যোগী পুরুষ যে বিষয়ে বিচরণ করেন, তাহা আমাদের ন্যায় স্থূল বিষয় নহে। বিরাট্ ব্রহ্ম হইতে প্রথমতঃ শব্দ, শব্দ হইতে ভাব, ভাব হইতে বর্ণ এবং বর্ণ ঘনীভূত হইয়া স্থূল বিষয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বিষয়ের সূক্ষ্ম রূপ যে বর্ণ, তাহাতেই যোগিগণ বিহার করেন। সাধারণ জীবের ন্যায় বিষয়ের স্থূল বা জড় রূপ তাঁহাদের নিকট প্রতিভাত হয় না। এরূপ যোগীর পক্ষে বাহ্যতঃ কোনও মন্ত্রতন্ত্রের অনুষ্ঠান অনাবশ্যক। এ বিষয়ে একটী চর্য্যাপদ দৃষ্টান্তরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে—

> একুন কিজই মন্ত না তন্ত
> নিজ ঘরণী লই কেলি করন্ত।
> লঅ ঘরেঁ ঘরণী জাব ণ মজ্জই
> তাব কি পঞ্চ বাণ্ন বিহরিজ্জই॥

যোগী মন্ত্র তন্ত্র কিছুরই অনুষ্ঠান করেন না; মাত্র আত্ম শক্তিরূপা গৃহিণীকে লইয়া কেলি করেন। নব-দ্বার রূপ নয়টা গৃহে যত দিন আত্ম শক্তিরূপা গৃহিণী বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রবেশ না করে, তত দিন কি পঞ্চ বর্ণে বা পঞ্চ বিষয়ে কেহ বিহার করিতে পারে? তত দিন যে বিষয়ের অধীন হইয়া, তাহাদের মুখ চাহিয়া বিষয়ের তাড়নে ছুটাছুটি করিতে হয়।

ডোম্বিনী বা নৈরাত্মার দুইটী রূপ। এক দিকে তিনি বিশুদ্ধচিত্ত ঈশ্বর, অন্য দিকে তিনিই আবার অবিশুদ্ধচিত্ত জীব। শেষ দুই পংক্তিতে তাঁহার এই দ্বিবিধ ভেদের কথা বলা হইয়াছে। হে ডোম্বি! যাহারা গুরু সম্প্রদায়-হীন অর্থাৎ গুরুর প্রসাদে যাহারা তোমাকে জানিতে পারে নাই, তাহাদের নিকট তুমিই অবিশুদ্ধচিত্ত জীবরূপে প্রতি-ভাত হইয়া থাক। এবং তাহাদের শরীররূপ পদ্ম ভাঙ্গিয়া

সেই পদ্মের মূলীভূত মৃণাল অর্থাৎ বোধিচিত্তকে তুমি ভক্ষণ করিয়া থাক। কঠোপনিষদে মন ও প্রাণ, এই দুইটীকে ব্রহ্মের অন্ন এবং বাক্ বা জ্ঞানকে সেই অন্নের উপসেচন বা উপকরণ বলা হইয়াছে। অন্যান্য উপনিষদেও বাক্ প্রাণ ও মন, এই তিনটী অন্ন ব্রহ্ম তাঁহার নিজের জন্য সৃষ্টি করিলেন, এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়। এখানেও সেই ঔপনিষদ বাক্যেরই আংশিক পুনরুক্তি দেখা যাইতেছে। বস্তুতঃ যত দিন জীব স্বীয় ঈশ্বরতত্ত্ব পরিজ্ঞাত না হয়, তত দিন ঈশ্বর খণ্ডকালরূপে পুনঃ পুনঃ জীবের দেহ-ভঙ্গ এবং মহাকালরূপে সুষুপ্তিতে পুনঃ পুনঃ তাহাকে গ্রাস করিয়া থাকেন এবং বিরাট্ ক্ষেত্রেও প্রলয়কালে তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু ও সংহারকর্ত্তা মহাকালকে গ্রাস করেন। ইহাই "ব্রহ্মের তিনটী অন্ন" শব্দের তাৎপর্য্য। "দেহপদ্ম ভাঙ্গিয়া ডোম্বী তাহার মৃণাল ভক্ষণ করেন," এই কথা বলিয়া কৃষ্ণাচার্য্য উপরোক্ত ঔপনিষদ মহাজ্ঞানেরই আংশিক প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। কৃষ্ণাচার্য্য বলিতেছেন,—আমি সেই ডোম্বী বা অবিশুদ্ধ চিত্তকে মারিব অর্থাৎ বিলয় করিব এবং অবিশুদ্ধ চিত্তের প্রাণ বা কারণ স্বরূপ অবিদ্যার নিঃশেষভাব বিলয় করিব।

ধূলিকণা

শুধু বই পড়লে চলবে না। যেখানে যা সত্য পাবে আপনার জীবনে তাই ফোটাতে চেষ্টা করবে।

*　*　*

সর্ব্বদা দুঃখের জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে থাকবে। দুঃখ দেখে পিছিয়ে যেও না। সুখটাকে যেমন আদর করে' নাও তেমনি নিতে পারলে দুঃখের তীব্রতা কমে' যাবে।

*　*　*

সময়ে সময়ে নিজেকে খুব বড় ভাববে,—এত বড় যে, হিমালয় পর্ব্বতও বোধ হয় তত বড় নয়। ভাববে, যেন তোমার পায়ে জগতের ক্ষুদ্র কোলাহলগুলো এসে ভেঙে পড়ছে। আবার সময়ে সময়ে নিজেকে খুব ছোট ভাববে। পথের ধূলির দিকে চেয়ে সূক্ষ্মতম ধূলিকণার চেয়েও যে তুমি ছোট, তাই ভাববে।

*　*　*

সকলের চেয়েও বেশী ভয় করবে স্বার্থপর মানুষকে। সাপের চেয়ে, বাঘের চেয়েও তারা ভয়ঙ্কর।

*　*　*

জগতের কোন জিনিসকে অনাবশ্যক ভাববে না। সকলেরই এখানে কিছু-না-কিছু কাজ আছে।

*　*　*

মহতের গুণ বুঝতে হ'লে তোমাকেও গুণী হ'তে হবে।

*　*　*

জ্ঞানলাভ করতে হ'লে এ জগতে রোজ নিজেকে আগন্তুক বলে' মনে করবে। তা হ'লেই পুরাতনের মধ্যে অনেক নতুন জিনিস দেখতে পাবে।

*　*　*

নিজেকে প্রকাশ করবার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ো না। মানবের কল্যাণের জন্যই যদি তোমার সাধনা হয় তবে তো তা এক দিন প্রকাশ হবেই হবে।

*　*　*

যা'র তা'র কাছে নিজের সঙ্কল্প প্রকাশ করবে না।

*　*　*

জীবনটাকে অমূল্য ব'লে জানবে। বিশ্বের কাজ তোমার কাজের ক্রমবিকাশের অপেক্ষায় আছে।

*　*　*

মিষ্ট কথায় যত বেশী কাজ পাওয়া যায় বকাবকিতে তার সিকিও পাওয়া যায় না।

*　*　*

আমি যদি ধনী হই তা হ'লে বুঝতে হবে, যে পরিমাণ অর্থ আমার ঘরে জমা হচ্ছে, সেই পরিমাণে অপর অনেকে অর্থ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

*　*　*

আমরা যাকে বাঁচা বলি সেটাই মরা। প্রতিদিন আমরা বড় হচ্ছি, না মৃত্যুর দিকে এগুচ্ছি?

মন্ত্র

[ডক্টর শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য, এম-এ পি-এচ্-ডি]

প্রবন্ধের নাম শুনিয়াই কেহ যেন মনে না করেন যে এটা গল্প। যাঁহারা গল্পের আশায় প্রবন্ধ পড়িবেন তাঁহাদের নিরাশ হইতে হইবে। এস্থলে তান্ত্রিক মন্ত্রের বিষয় লিখিত হইবে এবং তাহাও বৌদ্ধতন্ত্রের অন্তর্ভূক্ত মন্ত্রাদির সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। মন্ত্র কি প্রণালীতে ব্যবহৃত হইত, তাহাদের ক্ষমতা কিরূপ ছিল, কি করিয়াই বা মন্ত্র বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতর প্রবেশলাভ করিয়াছিল এবং মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহারা কিরূপ ফললাভের আশা করিতেন এই সকল বিষয় বর্ণনা করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সকলেই বোধ হয় জানেন বৌদ্ধধর্ম্ম কালক্রমে নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া অবশেষে বজ্রযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মে পরিণত হইয়াছিল। তান্ত্রিক বৌদ্ধমার্গের পরিণত অবস্থায় মুসলমানগণ বিহার ও বাঙ্গালা অধিকার করেন এবং সেই সময়ে বৌদ্ধবিহারগুলি ধ্বংস করেন এবং ভিক্ষুদের সবংশে বিনাশ করেন। তাহাতেই ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের বিনাশ ঘটে। যাঁহারা পাজী-পুঁথি লইয়া হিমালয়ের দুর্গম স্থানগুলিতে আত্মরক্ষার্থে পলাইয়া গিয়াছিলেন তাঁহারাই বাঁচিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের চেষ্টায় আজিও নেপালাদি পার্ব্বত্য প্রদেশে ও সিকিম, ভূটান ইত্যাদি স্থলে বৌদ্ধধর্ম্মের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা না হইলে আজ বৌদ্ধধর্ম্মের সন্ধান কেবল তিব্বত, চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়ার মতন স্থানেই মিলিত

কি করিয়া পুরাতন বৌদ্ধধর্ম্ম তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মে পরিণতি লাভ করিয়াছিল এ সম্বন্ধে সঠিক খবর পাওয়া বড়ই দুরূহ ব্যাপার। তবে এইটুকু মনে হয় যে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মে একটু আধটু গলদ ছিল সেই সকল গলদ কালক্রমে বাড়িয়া যাওয়াতে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের সৃষ্টি হয় এবং বৌদ্ধদের ভিতর ব্যভিচারের মাত্রা বাড়িয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতন আরম্ভ হয়। এই অধঃপতনের শেষ পরিণতি হয় বজ্রযানে।

বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের প্রধানতঃ তিনটী কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ তাহাদের মুক্তিবাদ, দ্বিতীয়তঃ নানারূপ অস্বাভাবিক আইন-কানুনের প্রবর্ত্তন, তৃতীয়তঃ মহাযানের করুণাবাদ।

বুদ্ধদেব বলিতেন মানবজীবনের মোক্ষলাভ করাই চরম উদ্দেশ্য; অতএব সকলের উচিত কর্ম্ম ধ্বংস করিয়া নির্ব্বাণলাভ করা, তাহা হইলে আর পুনর্জন্ম হইবে না, আর পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট সহিতে হইবে না। কিন্তু নির্ব্বাণপদে প্রবিষ্ট হইলে তাহাদের অবস্থা কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধে তিনি কোনরূপ উচ্চবাচ্য করেন নাই। অশ্বঘোষ তাঁহার সৌন্দরনন্দ কাব্যে দেখাইলেন যেরূপ তৈল শেষ হইয়া গেলে প্রদীপ নিবিয়া যায় সেইরূপ ক্লেশের ধ্বংস হইয়া গেলে চিত্ত-প্রদীপ নিবিয়া যায়, আর তাহার পুনরাগমন হয় না। মহাযানের উদ্ভবের পর তাঁহারা এরূপ কথায় আস্থা রাখিলেন না এবং বলিলেন নির্ব্বাণলাভ হইলেই চিত্ত শূন্য হইয়া যায়, সেটা সৎও নয় অসৎও নয়, সৎ ও অসৎএর মিলনও নয়, আবার সৎ অসৎএর অমিলনও নয়, কাজেই সে এক অব্যক্ত অবস্থায় পরিণত হয়। এও এক দীপ নির্ব্বাণের মতই কথা তাই অন্যান্য পণ্ডিতেরা শুধু শূন্যে সায় দিতে পারিলেন না। তাহার পর আর এক দল পণ্ডিত বলিলেন, না, নির্ব্বাণ লাভ হইলেও কিছু থাকা দরকার এবং মোক্ষের পর যাহা থাকে তাহা বিজ্ঞান, অর্থাৎ চিত্তধারা নির্ব্বাণের পরও বজায় থাকে। শেষোক্ত দুইটি মত পর্য্যায়ক্রমে মধ্যমক ও যোগাচারের। নাগার্জ্জুন দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রথমোক্ত মতের প্রচলন করেন ও মৈত্রেয় ও অসঙ্গ তৃতীয় শতাব্দীতে দ্বিতীয়োক্ত মতের প্রচলন করিয়া যান। তাহার পর তান্ত্রিকেরা বলিলেন, না, তাহা নয়, নির্ব্বাণে শুধু যে শূন্য থাকে বিজ্ঞান থাকে, তাহা নহে, মহাসুখও থাকে। যখন বোধিচিত্ত মোক্ষলাভ করেন তখন তাঁহার চিত্তধারা

মহানন্দে বিভোর থাকে, কারণ শূন্য নৈরাত্মা দেবী তাঁহার চির আলিঙ্গনে বোধিচিত্ত আবদ্ধ হয়। সে আনন্দের ক্ষয় নাই, সে আনন্দের বিনাশ নাই, সে আনন্দ মর্ত্তের আনন্দের মত ক্ষণবিলোপী নহে। এই মহাসুখবাদ হইল বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের প্রথম কারণ, কারণ ইহারই উপর তান্ত্রিক শক্তিসাধনের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

বুদ্ধদেব যখন প্রথম ধর্ম্ম প্রচার করেন তখন বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের উপর খুব কড়া নজর রাখেন এবং কড়া নিয়ম কানুনের বশবর্ত্তী করেন, আর একটু নড়চড় হইলেই বিলক্ষণ সাজা দিতে আরম্ভ করেন। পৃথিবীর যত কিছু জিনিস মানব উপভোগ্য বলিয়া মনে করে তিনি তাহা সবই বন্ধ করিয়া দেন। মদ, মাংস, মাছ, স্ত্রীসঙ্গম ইত্যাদি এককালে পরিত্যক্ত হয়। বুদ্ধদেবের নৈতিক নিয়মাবলী সবই ভাল ছিল, কিন্তু তাহা যে কম বেশী অস্বাভাবিক ছিল ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এরূপ অস্বাভাবিক নিয়ম কানুন মানুষ কত দিন পালন করিয়া চলিতে পারে? বোধ হয় ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের মধ্যে কখনও কখনও এই বিষয় লইয়া নানারূপ বিদ্রোহের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সেজন্য বোধ হয় বহু ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে সঙ্ঘ হইতে বিতাড়িত হইতেও হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় এইরূপ একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং তাহার একটা বিবরণ বিনয়পিটকে দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি ভিক্ষু সংসার ত্যাগ করিবার পরও স্ত্রী, কন্যা, দাসী ও অন্যান্য স্ত্রীলোকের নিকট ফুলের মালা ও অন্যান্য উপহার দ্রব্য পাঠাইত, তাহাদের সহিত একাসনে বসিত, এক বিছানায়, এক মাদুরে, এক লেপের আবরণে শয়ন করিত, যখন তখন খাবার খাইত, মদ্যাদি উত্তেজক পানীয় পান করিত, নাচ গান করিত ও সুরযন্ত্রাদি যখন তখন বাজাইত। বলা বাহুল্য এই সমস্ত ক্রিয়া-কলাপই বুদ্ধদেব নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। যখন খবর বুদ্ধদেবের নিকট পৌছিল তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের সমস্ত দলকে সঙ্ঘ হইতে দূরীভূত করিয়া দিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

এই তো গেল বুদ্ধদেবের সময়কার কথা। পরে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর ভিক্ষুদের ভয় কাটিয়া গেল এবং ধীরে ধীরে তাহারা নিয়ম-কানুনগুলি এক এক করিয়া ত্যাগ করিতে লাগিল। কিন্তু বহু দিন পর্য্যন্ত গোঁড়ার দলে প্রাধান্য বেশী ছিল বলিয়া তাহারা কিছু করিতে পারে নাই। সেই জন্য অনেকে গুপ্তভাবে দলবদ্ধ হইয়া গুপ্ত ক্রিয়াকলাপ চালাইতে লাগিল এবং যে সকল অস্বাভাবিক নিয়ম কানুন বুদ্ধদেব প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে একটা মত চালাইতে লাগিল। ইহাই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অধঃপতনের দ্বিতীয় কারণ বলিয়া মনে হয় এবং এই নূতন মার্গই ক্রমে তন্ত্র-মার্গ বলিয়া প্রচলিত হয়, এবং গুপ্ত সমিতি গুলিই 'চক্র' নামে অভিহিত হয়। পঞ্চ মকারের পাঁচটী মকারই বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছিল। বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা প্রধানতঃ এবং প্রথমতঃ এই পঞ্চ মকারেরই প্রচলন করিয়াছিলেন।

মহাযানে একটী নূতন মত ছিল তাহার নাম করুণা-বাদ। যিনিই মহাযানী হইবেন তাঁহাকেই এই পদ গ্রহণ করিতে হইত এবং প্রতিজ্ঞা করিতে হইত যত দিন না সংসারের সমস্ত প্রাণী মোক্ষলাভ করিবে তত দিন মোক্ষ-লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হইলেও মোক্ষ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। শুধু তাহাই নহে যাহাতে অপরের মোক্ষ-লাভের সহায়তা হইতে পারে তাহার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতে হইবে। লোকে সংসার যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত হইবে আর আমি মোক্ষলাভ করিব ইহা নিতান্ত স্বার্থপর না হইলে বলিতে পারে না। হীনযানীদের লক্ষ্য তাহাই ছিল তাই তাহারা হীনযানী, মহাযানীদের জগৎ উদ্ধারই লক্ষ্য বলিয়া তাঁহার মহাযানী হইলেন। কিন্তু এই করুণাবাদে কয়টা লোকে এইভাবে আপনাকে পৃথিবীর ভিতর বিসর্জ্জন দিতে পারে? আর তা ছাড়া বুদ্ধদেবের চেলা চামুণ্ডারা তো প্রায়ই নিরক্ষর গ্রাম্য লোক। তাহারা এ সকল জিনিসের অর্থ কি করিয়া গ্রহণ করিবে! তাই দু-চারটী শ্লোক আওড়ান ছাড়া তাহাদের আর অন্য গতি রহিল না। রোজই তাহারা জগৎ উদ্ধারের প্রতিজ্ঞাই মুখে আওড়াইতে লাগিল, কাজে কিছুই হইল না। যাঁহারা তন্ত্রমার্গের প্রচলন করিতেছিলেন তাঁহারা এই করুণাবাদে তাঁহাদের অভীষ্ট-সিদ্ধি করিবার পথ পাইলেন। তাঁহারা বলিলেন, বাপ্ রে বৌধিসত্ত্বের কষ্ট কি কম, তাহাকে সমস্তই বিসর্জ্জন দিতে হইতেছে, দুনিয়ার কোন জিনিস তাহার রাখিবার যো নাই সবই পরের জন্য। তাহাদের যদি একটু আধটু দোষ হইয়া যায় তাহা কি

ধরিতে আছে। এই একটু আধটু দোষ করিতে করিতে তাঁহারা বিনা বাধায় পঞ্চমকারের সব কয়টী ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং শেষ বুঝাইলেন—

কর্ম্মণা যেন বৈ সত্বাঃ কল্প কোটি-শতান্যপি।
পর্য্যন্তে নরকে ঘোরে তেন যোগী বিমুচ্যতে॥

"যে সকল কর্ম্ম করিয়া মানব শত কোটি কল্প নরকে বাস করিয়া থাকে সেই সকল কর্ম্ম করিয়াই যোগী মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে।" আবার বুঝাইলেন—

তন্নাস্তি যন্ন কর্ত্তব্যং জগদুদ্ধরণাশয়ৈঃ।

"জগতের উদ্ধার কল্পে যাঁহারা লাগিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের এমন কোন কাজই নাই যাহা তাঁহারা করিতে পারেন না।" আবার এক স্থলে বলিলেন—

সম্ভোগার্থমিদং সর্ব্বং ত্রৈধাতুকমশেষতঃ।
নির্ম্মিতং বজ্রনাথেন সাধকানাং হিতায় চ॥

"এই সমস্ত ত্রিধাতুস্থিত সমস্ত পদার্থ বজ্রনাথ সাধকদিগের সম্ভোগের জন্য এবং হিতের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। তাঁহারা এই সকলের ভিতর দিয়া দেখাইলেন বুদ্ধদেবের বিপক্ষে বিদ্রোহের ধ্বজা কত দূর উচ্চে উঠিতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে করুণাবাদ বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের তৃতীয় কারণ।

বৌদ্ধধর্ম্ম অধঃপতিত অবস্থায় বজ্রযানে পরিণত হইল। বজ্রযান মহাযান রহিল, যোগাচারের মত গ্রহণ করিল, তাহাদের উঁচু ধরণের দর্শন রহিল, করুণা রহিল। তাহারা দেবদেবী করিল, মন্ত্র তন্ত্র করিল, নানারূপ ক্রিয়া কলাপ প্রবর্ত্তন করিল এবং সকলের মন রাখিল। বৌদ্ধ-ধর্ম্মে আদ্যোপান্ত যাহা কিছু হইয়াছিল তাহারা সমস্তই গ্রহণ করিল, যোগ, সমাধিও বাকী রহিল না। যে যাহা চায় তাহাকে তাহাই দিয়া সন্তুষ্ট করিল। যাহারা নৈতিক নিয়ম কানুন চাহিল, স্নান, সন্ধ্যা, উপবাস, ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি চাহিল তাহাদের জন্য ক্রিয়াতন্ত্র চর্য্যাতন্ত্র, সৃষ্টি হইল। যাহারা শক্তি চাহিল পঞ্চ মকার চাহিল তাহাদের জন্য যোগতন্ত্র অনুত্তরযোগতন্ত্র সৃষ্টি হইল। যাহারা সহজে পয়সা কড়ি, শাস্ত্রজ্ঞান ইত্যাদি পাইতে চেষ্টা করিল তাহাদের মন্ত্র, ধারণী ইত্যাদি দেওয়া হইল। যাহারা দর্শন, শাস্ত্র ইত্যাদি চাহিল তাহাদের যোগাচারের দর্শন প্রভৃতি দেখাইয়া দেওয়া হইল। যাহারা দেব-দেবী, ধ্যান, ধারণা, উপাসনা চাহিল তাহাদের জন্য দেবদেবী দেওয়া হইল এবং মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইল। এমন মজার ধর্ম্ম কি আছে। দলে দলে লোক অন্য ধর্ম্ম ছাড়িয়া বৌদ্ধদের দলে মিশিতে লাগিল। হিন্দুরা প্রমাদ গণিলেন, কি করিয়া সনাতন ধর্ম্মকে টিঁকাইয়া রাখা যায় অনবরত চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন হিন্দু ধর্ম্মে তন্ত্র না ঢুকাইলে উপায় নাই। তাই হাজারটা গালি বর্ষণ করিয়া তাহারা অম্লানবদনে উহা গ্রহণ করিলেন এবং পাছে লোকে সহজে ধরিতে পারে তাই ঝাঁ ঝাঁ করিয়া হিন্দু-তন্ত্রে বৌদ্ধদের নামগন্ধ পর্য্যন্ত পুঁছিয়া ফেলিলেন; এবং মহাদেব, ভৈরব ইত্যাদির দোহাই দিয়া তন্ত্র লিখিতে লাগিলেন এবং হিন্দু ধর্ম্মের দফা শেষ করিলেন এবং সারা ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে কুসংস্কারের অন্তর্দ্ধারা প্রবাহিত করিলেন।

এখন দেখা যাক্ কি করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে মন্ত্র প্রবেশ লাভ করিল। যতদূর দেখা যায় বুদ্ধদেব মন্ত্রাদিতে বিশ্বাস করিতেন না। ব্রহ্মজালসুত্তে দেখা যায় তিনি অনেকগুলি তির্য্যকবিদ্যার নাম করিয়া সেগুলির নিন্দা করিয়াছেন এবং আপনার শিষ্যদিগকে উহা হইতে বিরত হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু মনে হয় তাঁহার সময়েও এমন লোক ছিল যাহারা তাঁহার উপদিষ্ট নির্ব্বাণের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কেবল ঐহিক সুখৈশ্বর্য্যের সন্ধানে ফিরিত। বুদ্ধ-দেবের শিষ্যদের ভিতরও যে এইরূপ লোক ছিল না তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এই সকল লোকের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিবার জন্য তিনি কোন না কোন ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। বুদ্ধদেবের সময়ে যে ভারতবর্ষের লোক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল তাহা না মনে করার কোন কারণই নাই। তাহা যদি না হইত তাহা হইলে অত যাগযজ্ঞাদির ব্যবস্থা থাকিত না আর পারত্রিক মঙ্গলের জন্য অত বেদপাঠাদির ব্যবস্থাও থাকিত না। উহা কুসংস্কার ছাড়া আর কি বলিব? কারণ কে বলিতে পারে যাগ-যজ্ঞের দ্বারা বা বেদ পাঠের দ্বারা তাঁহারা যাহা যাহা পরকালে হইবে বলিয়া বিবেচনা করিতেন তাহা হইত কি না। তার পর অথর্ববেদের কত রকম ক্রিয়া কলাপের কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা যাদুবিদ্যা বা ম্যাজিক ছাড়া আর কি হইতে পারে! বুদ্ধদেব যদি

তাঁহার ধর্ম্মে এই সকলের নিষেধ করিতেন তাহা হইলে তাঁহার ধর্ম্ম বেশী কাল টিকিত না। আর তিনি করিবেনই বা কেন? তাঁহার উদ্দেশ্য একটী জনপ্রিয় ধর্ম্ম গড়িয়া তোলা। বুদ্ধিমান সুগত এ সকল ব্যাপার বুঝিয়া নানারূপ বিধান নিশ্চয়ই করিয়াছিলেন। তিনি ঋদ্ধি মানিতেন। নৈসর্গিক ব্যাপারে যে সমাধিও যোগের দ্বারা হস্তক্ষেপ করা যায় তাহা তিনি মানিতেন এবং দুই এক জন শিষ্যকেও তিনি শিখাইয়াছিলেন। বিনয়পিটকে এক স্থলে দেখা যায় তিনি ভাবশ্রজকে ভর্ৎসনা করিতেছেন। তাহার অপরাধ জনসাধারণের সম্মুখে তিনি হাওয়ায় উড়িয়া গিয়া একটী অদ্ভুত কার্য্য দেখাইয়া তাহাদের বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। আরও দেখি কোন ভিক্ষু মড়ার মাথা, হাড় ইত্যাদি লইয়া ক্রিয়া-কলাপ করিত। আর এক জায়গায় দেখি কোন বৌদ্ধ-সংসারের সকলেই কোন না কোনরূপ অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল। এই সকল বিবরণ হইতে অনুমান হয়, বুদ্ধদেব শিষ্যদের মধ্যে অলৌকিক জ্ঞানলাভের জন্য এবং অলৌকিক ঘটনা ঘটাইবার ক্ষমতালাভের জন্য কোন না কোন মন্ত্র তন্ত্রাদির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের এক খানি গ্রন্থে এই বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বইএর নাম তত্ত্বসংগ্রহ, বৌদ্ধাচার্য্য শান্তিরক্ষিত কর্ত্তৃক রচিত হয় এবং তাহার টীকা তাঁহার প্রিয় শিষ্য কমল শীল কর্ত্তৃক বিরচিত হয়। এই পুস্তকে দেখি—

> যতোঽভ্যুদয় নিষ্পত্তির্যতো নিঃশ্রেয়সস্য চ।
> স ধর্ম্ম উচ্যতে তাদৃক্‌ সর্বৈরেব বিচক্ষণৈঃ॥
> তদুক্তমন্ত্রযোগাদিনিয়মাদ্বিধিবৎ কৃতাৎ।
> প্রজ্ঞারোগ্য বিভুত্বাদিদৃষ্টধর্ম্মোঽপি জায়তে॥

"বিচক্ষণেরা বলেন সেইই ধর্ম্ম যাহাতে ঐহিক সুখৈশ্বর্য্য মিলে এবং যাহাতে মোক্ষ লাভ হয়। তাঁহার (বুদ্ধদেবের) কথিত এবং বিধিবৎকৃত মন্ত্র, যোগ ইত্যাদি নিয়মের দ্বারা প্রজ্ঞা, আরোগ্য এবং বিভুত্ব আদি দৃষ্ট ফলও পাওয়া যায়।" এই শ্লোকে টীকা করিবার সময় কমলশীল বলেন "আদি" শব্দের দ্বারা মুদ্রা মণ্ডলাদির গ্রহণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই দুই বড় পণ্ডিতের কথায় মনে হয় বুদ্ধদেব মন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডলাদির উপরও উপদেশ দিয়াছিলেন এবং তাহা তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে বহুল প্রচার করিয়াছিলেন।

আর এক কথা। মঞ্জুশ্রীমূলকল্প নামক এক খানি বহু পুরাতন পুস্তক কয়েক বৎসর ত্রিবাঙ্কুর হইতে বাহির হইয়াছে। ইহা এক খানি বৈপুল্যসূত্র। বৈপুল্যসূত্রগুলি বহু প্রাচীনকালে লিখিত হইয়াছিল এবং তৃতীয়, চতুর্থ শতাব্দীতে কতকগুলির চীনা ভাষায় তর্জ্জমা হইয়াছিল। পঞ্চম শতাব্দীর পর হইতে আর বৈপুল্যসূত্র লেখা হয় নাই বলিয়াই পণ্ডিতদিগের ধারণা। এই মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে যে কত মুদ্রা, ধারণী মন্ত্রের কথা আছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। বইখানি প্রকাণ্ড, তিন খণ্ডে ছাপা হইয়াছে। ইহা পড়িলেই মনে হয় একেবারে এক সময়ে এত জিনিস তৈয়ারী হইতে পারে না। নিশ্চয় ঐ সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতে বৌদ্ধধর্ম্মে জিনিসগুলি বিদ্যমান ছিল। হয় ত বা বুদ্ধের সময়ই ছিল, তাহাই বা কে জানে? সাধনমালা নামক বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থে অনেক স্থলে বুদ্ধকেই মন্ত্রের উপদেষ্টা বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কার্ণ সাহেব বলিয়া গিয়াছেন বহু প্রাচীনকাল হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মে ধারণীর প্রভাব ছিল এবং হিউয়েন সাং তাঁহার গ্রন্থে বিদ্যাধর পিটক নামক এক খানি ধারণী সংগ্রহের নাম করিয়া গিয়াছেন।

সময়ে সময়ে মনে হয় বড় বড় সূত্রাদি গ্রন্থ যাহারা পড়িতে পারিত না কিংবা পড়িবার বা পড়িয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা ছিল না, তাহাদের জন্য সূত্রগুলি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া ধারণী ও মন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল। প্রজ্ঞাপারমিতার দেবীরূপে পরিণত হইবার ক্রম-বিকাশের বিবরণ দেখিলে এই ব্যাপার সত্য বলিয়াই মনে হয়। প্রথমে দেখি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা আটহাজার শ্লোকের এত বড় পুঁথি পড়িয়া পুণ্য সঞ্চয় করার সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই ছিল। সেই জন্য উহা কমিয়া এক শত শ্লোকে পরিণত হয়। তাহার পর প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয়সূত্র কয়েকটী শ্লোকে রচিত হয়। যাহারা ইহাও গলাধঃকরণ করিতে পারিল না তাহাদের জন্য প্রজ্ঞাপারমিতা ধারণী দু'চার লাইনে তৈয়ারী হইল, তাহা হইতে হইল মন্ত্র, তাহার পর বীজমন্ত্র এবং শেষোক্তটী হইতে হইলেন প্রজ্ঞাপারমিতা দেবী। তাঁহার মূর্ত্তি হইল, ফুলচন্দন দিয়া

তাঁহার পূজা হইল। বলা হইল যাহাই কর না কেন এটাই পড় আর ওটাই পড় প্রজ্ঞাপারমিতা পড়ার যত পুণ্য সমস্তটাই পাইবে। তিব্বতীয়েরা জিনিসটাকে আরও সোজা করিয়া লইল। সংস্কৃত তাহাদের পক্ষে উচ্চারণ করা শক্ত, ঠিক হইল কি না তাহাই বা কি করিয়া বুঝিবে; আর তা ছাড়া শীত-প্রধান জায়গায় লোকে বেশী কথাও কহিতে চাহে না। তাহারা শিল্পী ডাকাইয়া একপ্রকার চাকা তৈয়ারী করাইল। তাহার ভিতর এক খান বই কিনিয়া পুরিয়া রাখিল এবং তাহাই অবকাশ বুঝিয়া গান্ধীজীর চরকার মত ঘুরাইতে লাগিল। প্রতি চাকা ঘুরান'র সঙ্গে সঙ্গে পুণ্য বাড়িয়াই চলিতে লাগিল।

মনে হয় এই প্রকার অবস্থার ভিতর দিয়াই মন্ত্রের ক্রমবিকাশ হইয়াছিল এবং পর পর সকল অবস্থারই প্রমাণ কিছু না কিছু বৌদ্ধধর্ম্মে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু যখন দেখি হিন্দুধর্ম্মে হঠাৎ মন্ত্রের আবির্ভাব হইল, তাহার পূর্ব্বাবস্থাগুলি খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, তখন মনে হয় বুঝি বা হিন্দুমন্ত্র বৌদ্ধদের হইতে লওয়া বা হিন্দুতন্ত্র বৌদ্ধদের নিকট হইতে ধার করা। যতই এই বিষয়ে গবেষণা করিতেছি ততই এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে।

বৌদ্ধতন্ত্রশাস্ত্রেও নানা প্রকারের মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যথা বীজমন্ত্র, হৃদয়মন্ত্র, উপহৃদয়মন্ত্র, পূজামন্ত্র, অর্ঘ্যমন্ত্র, দীপমন্ত্র, ধূপমন্ত্র, নৈবেদ্যমন্ত্র, নেত্রমন্ত্র, শিখামন্ত্র, রক্ষামন্ত্র এবং এইরূপ আরও নানাপ্রকারের মন্ত্র পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য মাত্র যে তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতির মন্ত্রই প্রাণস্বরূপ। মন্ত্রগুলির প্রায়ই মানে থাকে না আবার সময়ে সময়ে কোন অজ্ঞাত পুরাতন ভাষার প্রমাণ বড় বড় মন্ত্রে পাওয়া যায়। সে ভাষা এখন আর বুঝিবার উপায় নাই, এবং তাহা ভারতবর্ষের কি অন্য কোন দেশের তাহা ঠিক করিয়া বলিবার যো নাই। এই মন্ত্রগুলির সহিত বৈদিক মন্ত্রের কোন সংস্রব নাই কারণ বৈদিকমন্ত্র যে ভাবেই উচ্চারিত হউক না কেন তাহার একটা-অর্থ ছিল; এবং বেদের মন্ত্রের অর্থ নানাপ্রকার টীকা-টিপ্পনীর ভিতর দিয়া এবং তুলনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান দিয়া বেশ ভাল ভাবেই করা যায়। কিন্তু তান্ত্রিক মন্ত্রের টীকাও চলে না আর এখানে ভাষাবিজ্ঞানের বড় কিছু করিবার নাই। বৌদ্ধতান্ত্রিকেরা দুই চারি জায়গায় মন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহা হইতে মনে হয় বুদ্ধদেব হইতেই বৌদ্ধমন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। নিম্নলিখিত দুই একটী বচন হইতে সেইরূপই প্রমাণিত হয়।—

প্রজ্ঞাদিসাধনমিদং সুগতোপদিষ্টম্।

(সাধনমালা—প. ৬৩৪)

স্বাহান্তঃ কথিতঃ স এষ সুগতৈর্ম্মন্ত্রঃ কবিত্বাদিভূঃ।

(সাধনমালা—প. ৬৩৫)

কথয়ামি চতুর্থং চ যথা বুদ্ধেন ভাষিতম্।

(সাধনমালা—প. ২৬১)

এই বচনগুলি দেখিলে মনে হয় যাহা বৌদ্ধপণ্ডিত শান্তরক্ষিত বলিয়াছেন তাহা সমস্তই সত্য। বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্মে তন্ত্র-মন্ত্র সম্বন্ধে কিছু কিছু রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং তাহাই পরে নানারূপ দুর্বিপাকবশতঃ পুরা মাত্রায় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম বা বজ্রযানে পরিণত হইয়াছিল।

বজ্রযানীরা বলিত মন্ত্রের ক্ষমতা অদ্ভুত এবং মন্ত্রের এই অদ্ভুত ক্ষমতায় তাহাদের অন্ধ বিশ্বাস ছিল। তাহারা বলিত যদি মন্ত্র ঠিক নিয়ম কানুন অনুযায়ী প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে সে মন্ত্র করে না এমন কাজই নাই। তাহারা বলে—

কিমসাধ্যাং মন্ত্রাণাং যোজিতানাং যথাবিধি।

(সাধনমালা—৫৭৫)

আবার এক স্থলে দেখি তাহারা বলিতেছে অনবরত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে এক রকম শক্তি জন্মে, যার বলে সমস্ত বিশ্বকে চমৎকৃত করিয়া দিতে পারা যায়। যথা,—

বিশ্ববিস্মাপনে শক্তিরস্মাদস্যোপজায়তে

(সাধনমালা—৩৩৪)

মন্ত্রশক্তির দ্বারা অনায়াসে বুদ্ধত্ব লাভ করা যায়। মহাকালের মন্ত্রের দ্বারা এত পুণ্য সঞ্চয় করা যায় যে, সমস্ত বুদ্ধেরা দিনরাত অবিচ্ছিন্ন ধারায় গণনা করিয়াও তাহার পরিমাণ করিতে পারেন না। বৌদ্ধদের পঞ্চ মহাপাতকের নাম 'আনন্তর্য্য'। এই আনন্তর্য্য কয়েকবার লোকনাথের মন্ত্র জপ করিলেই দূর হইয়া যায়। খসর্পণের মন্ত্র জপ করিলে বুদ্ধত্ব সামান্য বদরক ফলের ন্যায় করতলগত হইয়া যায়। যদি অবলোকিতেশ্বরের ধারণী পাঠ করা যায় তাহা হইলে গাধার মত লোকও অন্ততঃ তিন

শত শ্লোক মুখস্থ করিয়া রাখিতে পারে। যদি কেহ একজটার মন্ত্র পাঠ করে তাহা হইলে তাহার কোন বিপদ আপদ হয় না, তাহার অদৃষ্ট সর্ব্বদা সুপ্রসন্ন হয়, এবং নিঃসংশয়ে তিনি বুদ্ধদেবের ন্যায় ধার্ম্মিক হইয়া থাকেন। এইরূপ অসংখ্য টোপ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মে ফেলা হইয়াছে শুধু মূর্খ লোক ধরিবার জন্য। যাহার যাহা দরকার সে তাহারই জন্য পুরোহিতদের নিকট ছুটিত। পাছে কেহ সন্দেহ করে তাই তাহারা বলিত—

সংশয়ো নেহ কর্ত্তব্যো বিবিতা ভাবশক্তয়ঃ

(সাধনমালা—৩৩০)

কিন্তু এটা ঠিক, মন্ত্রের এত জোর থাকা সত্ত্বেও বজ্রযান আপনাকে টিকাইয়া রাখিতে পারিল না, বা মুসলমানের আক্রমণে বাধা দিতে পারিল না।

মন্ত্র পাঠ করিবার এবং তাহার তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের এতই ধরাকাট্ ছিল যে কোন নূতন শিষ্যেরই দ্বারা সে সব বিনা ভুল ভ্রান্তিতে পাঠ করিয়া পুরশ্চরণ করা সম্ভবপর হইত না। এবং ইহাই তাহাদের ফলপ্রাপ্তি না হইবার অন্যতম কারণ রূপে পরিগণিত হইত। সেই জন্য নবাগতদিগের মনে বিশেষ আশঙ্কা হইত। সাধনমালায় দেখি কুমুদাকর মতি নামক এক জন পণ্ডিত তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন, "আইন কানুন অনুযায়ী মন্ত্র প্রয়োগ করিতে পার না বলিয়া দুঃখিত হইও না। শুধু আত্মরক্ষা ও সীমাবদ্ধ করিয়া যতক্ষণ পার মন্ত্র জপ করিয়া যাইবে। নিজ নিজ ক্ষমতা এবং কর্ম্ম অনুযায়ী ফল কিছু না কিছু হইবেই। তন্ত্রের বচন অনুসারে এইরূপ এক জন সাধকই সমস্ত পৃথিবীর রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।" মন্ত্র পাঠ করিতে হইলে গুটিকতক জিনিসের উপর বেশ ভাল নজর রাখা চাই, যেন উচ্চারণ বেশী তাড়াতাড়ি না হয়, বেশী ধীরে ধীরে না হয়, মনে যেন কোনরূপ অসৎ কল্পনা না থাকে এবং মন যেন সর্ব্বদা মন্ত্রাক্ষরে ন্যস্ত থাকে এবং যতক্ষণ না কষ্ট হয় ততক্ষণই যেন মন্ত্র আওড়ান হয়।

বজ্রযানীরা মন্ত্র অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া মনে করিত এবং মন্ত্রের শুদ্ধতা বজায় রাখিবার জন্য তাহারা দুই চারিটি কল-কৌশলের সৃষ্টি করিয়াছিল। বৈদিক মন্ত্রের শুদ্ধতা যেমন পদপাঠ, স্বরপাঠ, ক্রমপাঠ, জটাপাঠ, ঘনপাঠ ইত্যাদির দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল, তান্ত্রিক মন্ত্রের শুদ্ধতা ঠিক সেই ভাবে রক্ষিত না হইলেও তাহাদের কলকৌশলগুলির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। যাহাতে মন্ত্রগুলি শুদ্ধভাবে মুখস্থ থাকে সেজন্য শ্লোক তৈয়ারী হইতে এবং মন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশ এই শ্লোকের ভিতরই নিক্ষিপ্ত থাকিত। একটী এই ধরণের শ্লোক নমুনা স্বরূপ তুলিয়া দিই—

আদৌ চক্রধরস্ততঃ পিচুযুগাৎ প্রজ্ঞান্বিতো বর্দ্ধনি
তস্মাচ্চ জলযুগ্মমস্য চ পরে মেধা পরে বর্দ্ধনি।
এতস্মাচ্চরমং ধিরিদ্বয় মতো বুদ্ধিস্তথা বর্দ্ধনি
স্বাহান্তঃ কথিতঃ স এষ সুগতৈর্মন্ত্রঃ কবিত্বাবিভূঃ॥

(সাধনমালা—প ৩৩৫)

শ্লোকে চক্রধর শব্দের অর্থ ওঁকার, কারণ চক্রধর হইতেছেন ধ্যানিবুদ্ধ বৈরোচন এবং তাঁহার বীজমন্ত্র ওঁকার। তাহা হইলে প্রথম অক্ষর হইল ওঁ, তাহার পর দুই পিচু, অর্থাৎ পিচু পিচু, পরে প্রজ্ঞাযুক্ত বর্দ্ধনি অর্থাৎ প্রজ্ঞাবর্দ্ধনি। ইহার পর জল জল এবং পরে মেধাবর্দ্ধনি, তাহার পর দুইটী ধিরি পরে বুদ্ধিবর্দ্ধনি, শেষে স্বাহা। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে এই শ্লোকটীতে একটী পুরা মন্ত্র বিবৃত হইয়াছে এবং সে মন্ত্রের স্বরূপ এই—

'ওঁ পিচু পিচু প্রজ্ঞাবর্দ্ধনি জল জল মেধাবর্দ্ধনি ধিরি ধিরি বুদ্ধিবর্দ্ধনি স্বাহা।' ইহাই বজ্রবীণা সরস্বতীর মন্ত্র। এই মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে কোন শাস্ত্র না পড়িয়াই পণ্ডিত হওয়া যায়, মুখ দিয়া কবিতা, বক্তৃতা অনর্গল বাহির হইতে থাকে এবং সভাসমিতিতে সকলেই তাঁহার সহিত তর্কে পরাস্ত হইয়া থাকে।

মন্ত্রের বিশুদ্ধতা আর এক প্রকারে রক্ষিত হইত। মন্ত্রের অক্ষর বিভক্ত করিয়া সেইগুলিকে প্রকারান্তরে বর্ণনা করিয়া পুনরায় যোগ করাই দ্বিতীয় প্রকারের কৌশল যথা সপ্তমস্য দ্বিতীয়স্থ ষষ্ঠমস্য চতুর্থকম্। প্রথমস্য চতুর্থেন ভূষিতং তং সবিন্দুকম্॥ সপ্তম বর্গ হইল অন্তঃস্থ তাহার দ্বিতীয় অক্ষর রকার, অষ্টম বর্গ উষ্ম তাহার চতুর্থ অক্ষর হ, প্রথম বর্গ স্বরের চতুর্থ হইল দীর্ঘ ঈ, বিন্দু হইল অনুস্বর; অতএব সবগুলি মিলাইলে বীজ পাওয়া গেল হ্রীঁ।

এইরূপে আর একটি উদাহরণ লওয়া যাক্। যথা—

হান্তং হুতাশনস্থং চ চতুর্থস্বরভেদিতম্।
বিন্দুমস্তকসংভিন্নং খণ্ডেন্দুসহিতং পুনঃ॥

এতদ্বীজং মহদ্বীজং দ্বিতীয়ং শৃণু সাম্প্রতম্।
তান্তং বহ্নিসমাযুক্তং পুনস্তেনৈব ভেদিতম্॥
পঞ্চবিন্দুসমাযুক্তং দ্বিতীয়ং ভবতি স্থিরম্।
তৃতীয়ং তু পুনর্বীজং কথয়ামি প্রযত্নতঃ॥
হান্তং ষষ্ঠস্বরাক্রান্তং নাদবিন্দু সমন্বিতম্।
এতদ্বীজবরং শ্রেষ্ঠং ত্রৈলোক্যদহনাত্মকম্॥
কথয়ামি চতুর্থং চ যথা বুদ্ধেন ভাষিতম্।
কান্তং শুদ্ধং স্বরেজ্যাদ্যং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্॥
শৃণু অর্দ্ধাক্ষরং সম্যক্ মন্ত্রনিষ্পত্তিকারণম্।
টান্তমবিহীনস্তু উচ্চারণে তু রক্ষণম্॥

প্রথম বীজে আছে হকার, হুতাশন অর্থাৎ রকার, চতুর্থস্বর ঈকার বিসর্গ এবং চন্দ্রবিন্দু। সকল গুলি মিলাইলে পাওয়া যাইবে হ্রীঁঃ।

দ্বিতীয় বীজে আছে তকার, রকার ঈকার এবং চন্দ্রবিন্দু সব মিলাইলে হইবে ত্রীঁ। তৃতীয় বীজে হকার, ষষ্ঠস্বর উকার এবং চন্দ্রবিন্দু থাকায় হইল হুঁ। চতুর্থে আছে ফকার এবং তৎপরে অকারবিহীন টকার দুইয়ে মিলাইয়া পাওয়া গেল ফট্। অতএব সমস্ত মন্ত্রটী হইল হ্রীঁঃ ত্রীঁ হুঁ ফট্। ইহাই হইল তারা, মহাচীনতারা বা একজটার মন্ত্র। এটী একটী সিদ্ধবিদ্যা। এক লক্ষ বার ইহার পুরশ্চরণ হইয়া থাকে এবং একবার সিদ্ধি হইলে সাধকের আর কোন ভাবনা চিন্তা থাকে না, তাঁহার ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হইয়া থাকে। তাহার শত্রুনাশ হয়, দিন দিন ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং সে বুদ্ধের ন্যায় পুণ্যাত্মা হইয়া থাকে। যাহার ইচ্ছা হয় লক্ষবার জপ করিয়া দেখিতে পারেন। বলা বাহুল্য এই মন্ত্রটী বৌদ্ধদের নিকট হইতে হিন্দুরা গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই মন্ত্রের অক্ষরের পরিবর্ত্তন করিয়া ৭টি আরও দেবতা করিয়াছেন, এবং তাহার মধ্যে কালী এক জন। তাহা হইলে দেখা যায় কালীর উৎপত্তি বৌদ্ধদের নিকট হইতে; এবং ইনি হিন্দু দেবতা নহেন বলিয়া বিশ্বাস করিবার নানাপ্রকার কারণ আছে।

এখন দেখান যাক্ মন্ত্র জপ করিয়া বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা কি কি আশা করিতেন। বলা বাহুল্য তাঁহাদের মতে মন্ত্রের দ্বারা হয় না এমন কোন জিনিসই দুনিয়ায় নাই। প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর বিরুদ্ধেই মন্ত্র তাঁহারা প্রয়োগ করিতেন। যথা একটি প্রকৃতির নিয়ম এই যে মানুষ উড়িতে পারিবে না, মন্ত্র দ্বারা তাঁহারা উড়িবার চেষ্টা করিতেন এবং গল্প শুনা যায় তাঁহারা না কি কৃতকার্য্যও হইতেন। ইহা আর একটী প্রাকৃতিক নিয়ম যে, জড়বস্তু অদৃশ্য হইতে পারে না, বা দূরের জিনিস বা ভূগর্ভে প্রোথিত জিনিস দেখিতে পাওয়া যায় না কিন্তু এই সকল অসাধ্য সাধন করাই তান্ত্রিকদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

মন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধি লাভ করা, যে উপায়ে সিদ্ধি লাভ করা যায় তাহাকে বলে সাধনা। সিদ্ধি নানা প্রকারের ছিল, কোথাও অষ্ট সিদ্ধি, কোথায় চব্বিশ সিদ্ধি, কোথাও বা চৌত্রিশ সিদ্ধির কথা শুনা যায়। ইহার ভিতর চির-জীবন লাভ করা, মরা মানুষ বাঁচান, জীবন্ত মানুষের প্রাণ আকর্ষণ করা, সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করা, বহ্নিস্তম্ভন করা, ইচ্ছামাত্রেই গন্তব্য স্থানে মুহূর্ত্তের ভিতর পৌছান, বায়ুর গতিরোধ করা, বাক্‌সিদ্ধ হওয়া মৃত ব্যক্তিকে পুনরায় আনয়ন করা, জলস্তম্ভন করা, ইত্যাদি অন্যতম।

যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিতেন তাঁহাদিগকে সিদ্ধ বলিত। তান্ত্রিকযুগে চৌরাশী জন সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাহারা পাল রাজাদের রাজত্বের সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত গল্প শুনা যায়, কতক কতক এত আজগুবি যে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

পতঞ্জল দর্শনে সিদ্ধি পাঁচ প্রকারের বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা জন্মজ, ঔষধিজ, মন্ত্রজ, তপোজ ও সমাধিজ। তাহার ভিতর মন্ত্রজ সিদ্ধির কথাই তন্ত্র শাস্ত্রে বেশীর ভাগ বর্ণিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধদের ভিতর দেখা যায় তাহারা রোগ অপনয়ন করিবার জন্য নানা প্রকারের মন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহার পর সাপের বিষ ঝাড়াইবার জন্যও নানাপ্রকার মন্ত্র তৈয়ারী করিয়াছিল। সাধনমালাতে একটী বেশ সুন্দর মন্ত্র দেওয়া আছে। সে মন্ত্রটী ১১৬৫ খৃষ্টাব্দের লেখা এক খানি পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে বলে যে নিম্নলিখিত মন্ত্রটী যে একবার পাঠ করিবে সে সাত বৎসর সর্প কর্ত্তৃক দষ্ট হইবে না। আর যে উহা মুখস্থ করিয়া রাখে তাহাকে যাবজ্জীবন সাপে কামড়ায় না। সে মন্ত্রটী এই—

ওঁ ইলিমিত্তে তিলিমিত্তে ইলিতিলিমিত্তে দুম্বে দুম্বালী এ তর্কে তর্করণে মর্ম্মে মর্ম্মরণে কশ্মীরে কশ্মীরমুক্তে অঘে অঘনে অঘনাঘনে ইলি ইলীএ মিলীএ হলিমিলীএ অক্যাই এ অপ্যাইএ শ্বেতে শ্বেতঙ্গে অনম্বরক্তে * স্বাহা। যেখানে সাপের ভারি উপদ্রব সেখানে মন্ত্রটী পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি ?

ইহার পর দেখি বৌদ্ধেরা লেখাপড়া শিখিবার কষ্ট না করিয়াই সকল শাস্ত্রে পারদর্শী হইতে চায়। এই কাজের জন্য তাহাদিগকে একগাদা মন্ত্র তৈয়ারী করিতে হইয়াছিল। তার পর ষট্‌কর্ম্ম এবং অষ্টমহাসিদ্ধির জন্য তাহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল এবং সেইজন্য প্রচুর মন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। তার পর কতকগুলি মন্ত্র আছে যাহা জপ করিলে একেবারে মোক্ষ পাওয়া যায় এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করা যায়। তান্ত্রিক বৌদ্ধদিগের আর একটী প্রবল ইচ্ছা ছিল, সেটী হিন্দু দেবতাগুলিকে চাকরের মত বাঁধিয়া রাখা এবং তাহাদের উপযুক্তরূপে খাটান। আর একটা মজার কথা দেখা যায় বিধর্ম্মীদিগের সহিত সভায় তর্কাতর্কিতে জয় লাভ করিবার ইচ্ছা। ইহার জন্য অনেক মন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহা হইতে মনে হয় সেকালে অর্থাৎ ৭ম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সভায় হিন্দু-বৌদ্ধের ঝগড়া লাগিয়াই থাকিত এবং এই সকল সভায় দুই দলই জিতিবার জন্য নানারূপ মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্য লইত। তিব্বতীয় পুস্তকাদিতে দেখা যায় পূর্ব্বে হিন্দু ও বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে রাজসভায় নানাপ্রকারের তর্ক উত্থিত হইত এবং যিনি হারিতেন তাঁহাকেই শিষ্যসহিত বিধর্ম্মীর ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইত। এইরূপে হাজার হাজার লোক হারিয়া গিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইত। ইহা ছাড়া তন্ত্রে নানারূপ অদ্ভুত অঘটন ঘটাইবার ইচ্ছাও দেখা যায় এবং তাহার জন্য মন্ত্রও ছিল। বোধ হয়, এইরূপ অদ্ভুত ঘটনা দেখাইয়া তাহারা তান্ত্রিকধর্ম্মে লোক আকর্ষণ করিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এত ক্ষমতা পাওয়া সত্ত্বেও তাহারা ভিক্ষা করিতে ছাড়িত না। তাহারা এক প্রকার তিলক করিয়া তাহাতে এরূপ মন্ত্র আওড়াইত যে, সে তিলক কপালে যেই-ই দেখিত সেই-ই মহা সমাদরে বাড়ী লইয়া গিয়া তাহাকে ভিক্ষা দিত।

তাহাদের ভবিষ্যতের সুখের কল্পনা বড় অদ্ভুত ছিল। তাহারা মন্ত্রের সাহায্যে এমন এক সিদ্ধি খুঁজিত যাহার বলে তাহারা চিরকাল অপ্সরোগণপরিবেষ্টিত হইয়া বিদ্যাধর স্থানে নানা সুখ অনুভব করিয়া থাকিতে পারে; তথায় স্বর্গের রাজা ইন্দ্র তাঁহাদের মাথায় ছাতা ধরিয়া থাকিবেন, ব্রহ্মা মন্ত্রিত্ব করিবেন, বেমচিত্রী সৈন্যাধ্যক্ষ হইবেন, হরি দরোয়ান হইবে এবং নর্ম্মাচার্য্য শঙ্কর নানারূপ ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা দিবেন। ইহা হইতেই বুঝা যায় বৌদ্ধেরা হিন্দু দেবতাদের কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন! বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা বিশ্বাস করিত মন্ত্র আওড়ালে টাকা কড়িও পাওয়া যায়, সেইজন্য জম্ভলের মন্ত্র সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার নানা রকমের রূপ সৃষ্টি হইয়াছিল ও নানাপ্রকারের ধ্যান, ধারণা ও সাধনা হইয়াছিল। এই গুলি দেখিলে মনে হয় গরীব ভিক্ষুগুলির টাকার লোভ বড় কম ছিল না।

* এই শব্দটীর অপর পাঠ "অনম্বরক্তে" এইরূপ পাওয়া যায়।

বাসোলির রাজপুত-চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি

[শ্রীঅজিত ঘোষ, এম-এ, বি-এল]

এই পদ্ধতির অভিজ্ঞান সম্বন্ধে পূর্ব্বসূরীদের অনভিজ্ঞতা

১৯১৮—১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সরকারী বিবরণে সর্ব্বপ্রথম বাসোলির চিত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় লাহোরের যাদুঘরে (museum) কয়েক খানি বাসোলির চিত্র ক্রয় করা হয় এবং চিত্রশালাধ্যক্ষ (Curator) মহোদয় এগুলি সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, প্রথমতঃ বাসোলির চিত্রগুলি সম্ভবতঃ প্রাক্-মুঘল-যুগের, দ্বিতীয়তঃ অধুনা তিব্বতী চিত্র বলিয়া বাজারে যে সকল চিত্র চলিতেছে সেগুলি পরবর্ত্তী কালের এই চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি অনুসারে অঙ্কিত (Report of the Archaeological Survey of India. 1918-19, pt. I, p. 13)। ঠিক এই সিদ্ধান্তগুলির পুনরুক্তি শ্রীযুক্ত এস, এন, গুপ্ত মহাশয় তাঁহার লিখিত "The Making of the Moghul School of Painting." প্রবন্ধে করিয়াছেন। Modern Review পত্রে [1921 Ocr, p. 475, (at p. 478)] জৈন চিত্রের উল্লেখ করিয়া লেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে, মুঘল-চিত্রের পূর্ব্বে পঞ্জাবের বাসোলি দেশে নূতন একরূপ চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির প্রচলন ছিল তাহাতে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ও সাধারণ চিত্র অঙ্কিত হইত। এই চিত্র-কলার বৈশিষ্ট্য এইরূপ ছিল যে, ইহা নেপালের চিত্র-পদ্ধতির অনুসারী এবং প্রকারান্তরে বলিতে চান যে এ চিত্রগুলি অজন্তা শিল্প হইতে উদ্ভূত। পঞ্জাব ও অন্যান্য স্থানের কৌতুক সামগ্রী বিক্রেতারা এই শ্রেণীর চিত্রকে তিব্বতী বলিয়া বিক্রয় করিত; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে নেপালী বা তিব্বতী চিত্রের সহিত এগুলির কোন সম্পর্ক নাই, কেবল মাত্র উত্তর দেশের চিত্রকলার ভিতর বর্ণ-সম্পাতের সাদৃশ্য আছে। প্রকৃত পক্ষে বাসোলির অবস্থান যে পঞ্জাবের মধ্যে নহে তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে। লেখকের উদ্ধৃত বাক্য হইতে তিনি যে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। বোধ হয় লেখক বলিতে চান, (ক) ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ও সাধারণ চিত্র বাসোলির চিত্রে পাওয়া যায়; (খ) এই বাসোলির চিত্রগুলি প্রাক্-মুঘল-যুগের; (গ) এই চিত্রগুলির সহিত নেপালের চিত্রের সাদৃশ্য আছে; (ঘ) এগুলি অজন্তা শিল্প হইতে উদ্ভূত; (ঙ) এই গুলিকে বিক্রেতারা তিব্বতী বলিয়া বিক্রয় করে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উভয় শ্রেণীর চিত্রের ভিতর কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। আর ইতিপূর্ব্বেই লেখক যে সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন, এ কথায় তাহা খণ্ডন হইতেছে; আর আমি স্বয়ং উভয় শ্রেণীর চিত্রের ভিতর কোনরূপ সাদৃশ্য দেখিতে পাই নাই, কিংবা নেপালী পুঁথিতে ছোট ছোট আকারে যে ছবি গুলি (miniature picture) আছে অথবা নেপালী পতাকায় যে সকল চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সহিতও কোনরূপ সাদৃশ্য দেখি না। (চ) বাসোলি, তিব্বতী ও নেপালী চিত্রের বর্ণ-সম্পাত একরূপ। গুপ্ত মহাশয় তাঁহার (খ), (গ), (ঘ), (ঙ), ও (চ) সিদ্ধান্তের পোষক প্রমাণ কিছুই উদ্ধৃত করেন নাই, লাহোর-যাদুঘরের চিত্র-সূচী (Catalogues of the Paintings in the Lahore Museum) যাহা স্বয়ং গুপ্ত মহাশয় সংকলন করিয়াছেন তাহাতেও প্রাচীন বাসোলির কোন চিত্র নাই। উক্ত সূচীতে কেবল মাত্র ছয় খানি চিত্রে (K. 39-44) বাসোলির চিত্রের উল্লেখ আছে। তিনি লিখিয়াছেন, এই চিত্রগুলিতে তান্ত্রিক দুর্গা মূর্ত্তির ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি প্রকটিত হইয়াছে। এই চিত্রগুলির সহিত নেপাল-চিত্রের বর্ণের সমতা দেখা যায়। এ গুলির প্রকাশের সময় নিরূপণ করা দুরূহ। ইহারা মুঘল-যুগের পরবর্ত্তী কালের চিত্র, কিন্তু মুঘল-চিত্রকলার প্রভাব-বর্জ্জিত। রেখাঙ্কনে বা বর্ণ-বিন্যাসে এগুলি মুঘল-চিত্র-পদ্ধতির অনুকরণ করে নাই। ইহাদের বৈশিষ্ট্য অলঙ্কারের ভিতর মণি-মাণিক্য প্রকাশের জন্য সবুজবর্ণ কাঁচ-পোকার পক্ষদেশ

ব্যবহৃত হইয়াছে। (Catalogues of the Paintings in the Central Museum, Lahore, p. 133)

বাসোলির চিত্রের এইরূপ উল্লেখ হইবার দশ বৎসরের অধিক পূর্ব্ব হইতে আমি বাসোলির চিত্র-সংগ্রহে মনোনিবেশ করি এবং তখন হইতেই যে সকল চিত্র পাইয়াছি সেগুলি অতি প্রাচীন। এ সম্বন্ধে আমার স্বাধীন মত যাহা ঠিক তদনুরূপ কথাই শ্রীযুক্ত রমেশ বসু মহাশয় ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসের মডার্ণ-রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ মহাশয়ের সংগৃহীত রাজপুত-চিত্র দেখিয়া মনে হয় ভারতীয় প্রাচীন চিত্রগুলির শ্রেণী-বিভাগের কিছু পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। 'পাহাড়ী' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত চিত্রগুলির কয়েকটীকে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ফেলা উচিত। অন্ততঃ এ শ্রেণীর অন্যান্য চিত্র হইতে বাসোলির চিত্রগুলির পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার জিনিস। ইহাদের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি রাজপুত-চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অনেকগুলি এ শ্রেণীর প্রাচীন মূল চিত্র আছে। অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে স্পষ্টই অনুমান করিতে পারা যায় যে, প্রাচীর-গাত্রাঙ্কিত চিত্র (fresco painting) হইতে এ চিত্র উদ্ভূত হইয়াছে। বাসোলির চিত্রের উন্নত যুগে অঙ্কিত গীত-গোবিন্দের চিত্রগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক। চিত্রগুলিতে গীত-গোবিন্দের পদও উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাদিগকে গীত গোবিন্দের একরূপ সচিত্র টীকা বলিতে পারা যায়। চিত্রকর তুলিকার সাহায্যে ও বর্ণ-বিন্যাসে গীত-গোবিন্দের ভাব-বিলাস সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

রমেশ বাবুর এই প্রবন্ধের অল্পকাল পরে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলিও তাঁহার "Master-pieces of Rajput Paintings"এ বাসোলি চিত্রগুলি ভিন্ন শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত উল্লেখযোগ্য; তিনি বলিয়াছেন, "কাঙ্গাড়ার নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য রাজ্য বাসোলির চিত্র কাঙ্গাড়া চিত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এক কালে বাসোলি বালোরিয়া-রাজদিগের রাজধানী ছিল। বাসোলির মূর্ত্তির আদর্শ কাঙ্গাড়ার আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বাসোলির অঙ্কন-পদ্ধতিতে বলবীর্য্যশালী পরুষ-ভাবের (ইহা অধিকাংশ স্থলেই রূঢ় কর্কশ ভাবের পরিচায়ক হইয়া উঠে) সহিত রমণীয় কোমলতা-পূর্ণ মার্জ্জিত-রুচি কাঙ্গাড়ার অঙ্কন-পদ্ধতির তুলনাই হয় না। পরিকল্পনায় ও বর্ণ-বিন্যাসে বাসোলির চিত্রগুলি কাঙ্গাড়ার ছোট ছোট ছবিগুলির মত তত চিত্তাকর্ষক না হইলেও উহাদের ভিতর শিল্পীর প্রতীতির গভীরতা এবং স্পন্দনের দৃঢ়তা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের ভিতর কোন নিয়মানুবর্ত্তিতা দেখা যায় না—কলা-কৌশলের মৌলিকতাই তাহাদের বৈশিষ্ট্য। উহাদিগকে রাজপুতানার প্রাথমিক যুগের চিত্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, কাঙ্গাড়া চিত্রের সহিত এমন কি জম্মুর চিত্র-পদ্ধতির সহিতও ইহাদিগকে একপর্য্যায়েও ফেলা যায় না। এই সকল কারণে রাজপুতানার বাসোলি চিত্রগুলিকে স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করা উচিত। (Gangoly O. C, "Masterpieces of Rajput Paintings" N. D. (1927), re Plate XIX.)

পাহাড়ী চিত্রের কুমারস্বামি-কৃত শ্রেণী-বিভাগ

'রাজপুত চিত্র' নামকরণের জন্য কুমারস্বামীর নিকট জগৎ ঋণী; তিনিই এ বিষয়ে গবেষণাকারীদের মধ্যে অগ্রণী। সর্ব্বপ্রথমে তিনি এই চিত্রগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন—উত্তরশ্রেণী বা 'জম্মু' চিত্র (এ গুলিকে 'ডোগ্‌রা' চিত্র বলিয়া অভিহিত করা হয়) এবং দক্ষিণ শ্রেণী বা কাঙ্গাড়া চিত্র। দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্র গাড়োয়াল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জম্মুর পূর্ব্বে অবস্থিত রাজপুত রাজ্যের ভিতর বাসোলি রাজ্যের নামের উল্লেখ ঘটনা-প্রসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকতর সন্তোষজনক শ্রেণী-বিভাগের উল্লেখ তাঁহার "History of Indian and Indonesian Art" পুস্তকের ১২৭ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার মতে পাহাড়ী চিত্রকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১ম) জম্মু চিত্র। শতদ্রু নদীর পশ্চিম সীমার অন্তর্গত সমুদায় পার্ব্বত্য প্রদেশে ব্যবহৃত হইত ও (২য়) কাঙ্গাড়া চিত্র। উক্ত নদীর পূর্ব্ব-সীমায় অবস্থিত পার্ব্বত্য জলন্ধর রাজ্যগুলিতে ব্যবহৃত হইত। জম্মু চিত্র সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"রাজস্থানের চিত্র হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্ অঙ্কন-পদ্ধতিতে অঙ্কিত এই চিত্রগুলির উদ্ভব পঞ্জাব-প্রদেশে হিমালয়ের সানুদেশে হইয়াছে। তাহার মধ্যে বিশেষতঃ আবার ডোগরা রাজ্যেই এ পদ্ধতি

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে প্রচলিত হয় এবং ডোগ্‌রা রাজ্যের ভিতর জম্মুই আর্থিক স্বচ্ছলতায় ও শক্তি-সামর্থ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এই অঙ্কনরীতি ছাড়া অমৃতসহরের চিত্র-বিক্রেতারা এগুলিকে সাধারণতঃ 'তিব্বতী' বলিয়া বাজারে চালাইত। ইহাদের উপর 'তাক্‌রী' অক্ষরে লিখিত বচন থাকিত (১৩০ পৃষ্ঠা)।

বোষ্টন যাদুঘরের রাজপুত চিত্রের তালিকায় ডাক্তার কুমারস্বামী লিখিয়াছেন, এই চিত্রগুলি সাধারণতঃ জম্মু ও কাঙ্গড়ার চিত্র এই দুই ভাগে বিভক্ত। এ বিভাগ সত্য হইলেও এই পাহাড়ী ছবিগুলির উদ্ভব যে যে স্থানে হইয়াছে, সেই সেই স্থানের সহিত সংযুক্ত করিয়া আরও কয়েকটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই স্থানে বলা যাইতে পারে অমৃত-সহরের চিত্র-বিক্রেতারা যে সকল চিত্র তিব্বতী বলিয়া বিক্রয় করে এবং যাহাদের উপর 'তাক্‌রী' অক্ষরে লিখিত বচন আছে সে গুলিকে 'জামোয়ালি' না বলিয়া 'বালৌরিয়া' (বাসোলি) বলাই অধিকতর সঙ্গত। যাহা হউক এ গুলি পাহাড়ী চিত্রের অন্তর্গত এবং সম্ভবতঃ পূর্ব্বতন কোন চিত্র পদ্ধতির অনুসরণে অঙ্কিত হইয়াছে (Coomaraswami A. K, Catalogue of the Indian Collections in the Museum of Fine Arts. Boston, Part V, "Rajput Paintings." 1926, p. 67)। ঐ পুস্তকের ৭ম পৃষ্ঠার পাদটীকায় তিনি লিখিয়াছেন, খুব সম্ভবতঃ এ শ্রেণীর চিত্র জম্মু চিত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। মুঘল ও রাজপুত চিত্র-বিশারদ Goetz সাহেব এ পর্য্যন্ত বাসোলী চিত্রকে স্বীকার করেন নাই। এই দুই শ্রেণীর চিত্রেই স্থান-সমস্যা, রেখা, ও বর্ণ-বিন্যাস একই আদর্শে পরিকল্পিত। এখন জিজ্ঞাস্য এই সকল সমতা কি আকস্মিক বলিয়া বিবেচিত হইবে ? না এই দুই শ্রেণীই এক বৃহৎ শ্রেণীর অন্তর্গত ? আর যদি তাহাই হয় তবে সে শ্রেণীর নাম কি ? আমার মনে হয় শতদ্রু নদীর পশ্চিম পার্শ্বের পার্ব্বত্য দেশ সমূহের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির নাম বাসোলি দেওয়া যাইতে পারে ; এবং আমি 'তিব্বতী' চিত্রগুলিকেও জম্মু শ্রেণীর ভিতর না ফেলিয়া বাসোলির ভিতর ফেলিতে চাই। ডাক্তার কুমারস্বামী ও যাহারা তাঁহার অনুবর্ত্তন করিয়াছেন তাঁহারা যে সকল চিত্রকে জম্মু শ্রেণী বলিয়া অভিহিত করিতে চান তাহাদের অধিকাংশ চিত্রকেই আমি বাসোলি চিত্র বলিতে চাই। ডাক্তার কুমারস্বামীর সহিত আমিও বলি যে, এই চিত্র পূর্ব্বের কোন চিত্র অনুসরণ করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এ প্রবন্ধে যে সকল বাসোলির প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি দেওয়া গেল তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, কুমারস্বামীর উদ্ধৃত পাহাড়ী চিত্রের প্রাচীন জম্মু চিত্রগুলি বাসোলি চিত্র ছাড়া অন্য নামে অভিহিত হইতে পারে না।

ইতিহাসে বাসোলি

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের মধ্যবর্ত্তী সময়ে পশ্চিম হিমালয়ের পার্ব্বত্য রাজ্য সমূহের মধ্যে বাসোলি রাজ্য স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল। রাজধানীর নামও বাসোলি ছিল। "ঊনবিংশ শতক পর্য্যন্ত বালোর বা বাসোলি রাজ্য জম্মুর জসরোটা জেলার বাসোলি তহশীলের অন্তর্গত ছিল ; কেবলমাত্র ভাদু ও মানকোট ইহার ভিতর ছিল না। আদিম রাজধানী 'ভল্লপুরা' বা বালোরে ছিল। বাসোলি হইতে ইহা ১২ মাইল পশ্চিমে এক উপত্যকায় অবস্থিত। এখান হইতে 'উঝা'র শাখা নদী 'ভিনি' দেখা যাইত। এই রাজ্যের উত্তরে ভদ্রওয়া, পূর্ব্বে চম্বা এবং নুরপুর, দক্ষিণে লক্ষ্মণপুর ও ও জসরোটা এবং পশ্চিমে ভাদু ও মানকোট।" (Hutchison, J. and Vogel, J. Ph, 'History of Basholi State" in Journal of the Punjab Historical Society, Vol IV, p 77). বালুরিয়া রাজারা পাণ্ডবদের বংশধর বলিয়া দাবী করেন। তাঁহাদের উপাধি 'পাল' এবং তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে প্রয়াগ হইতে এখানে আসেন। রাজধানী বালোর খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে স্থাপিত হয়। চম্বার তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায় যে, একাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া ইহা পরিগণিত ছিল ও ইহা এক জন স্বাধীন নরপতির দ্বারা শাসিত হইত। সম্ভবতঃ দশম শতকের মাঝামাঝিও এই রাজ্য স্বাধীনতা ছিল (ঐ, পৃঃ ৭৯)। রাজতরঙ্গিণীতে কাশ্মীরের অনন্তদেবের অভিযান-সম্পর্কে (১০২৮—১০৬৩) বালোর বা ভল্লপুরার প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (ঐ, পৃঃ ৭৮)। বালোর রাজ-পরিবার কুলু, ভাদু ও ভদ্রওয়ায় শাখা বিস্তার করিয়া রাজ্যস্থাপন করে। বালোর হইতে রাবী নদীর তীরবর্ত্তী

বাসোলিতে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ষোড়শ শতকে কিন্তু ইহাদের বংশাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে বলিতে হয় একাদশ শতকের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল। বহু দিন হইতে বাসোলির বালোরিয়া রাজারা জম্মুরাজদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে জম্মুর মহারাজা সর্ব্ব প্রথম এই রাজ্য অধিকার করিয়া আপনার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। অধুনা বাসোলি জম্মুর কাথুয়া জেলার একটী তহশীল মাত্র। রাজধানীর সে পূর্ব্বগৌরব কিছুই নাই, সামান্য পল্লীগ্রামে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু ভগ্নস্তূপ গুলির এক সময়ে যে ঐশ্বর্য্য ছিল তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। রাজপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ ইহার অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে।

চিত্র—১ রাগিণী শাবরী

[মেট্রোপলিটান মিউজিয়মে (নিউইয়র্ক) রক্ষিত চিত্র হইতে

প্রাচীন বাসোলি ও অর্ব্বাচীন জম্মু-চিত্র

বাসোলি তহশীলে সাধারণতঃ পাহাড়ী ভাষাই ব্যবহৃত হয় এবং জম্মুতে পঞ্জাবী ও পাহাড়ী ভাষার যোগসূত্র ডোগ্‌রী ভাষা সচরাচর ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে চিত্রের লেখাগুলি 'তাক্‌রী' ভাষায় লিখিত; কিন্তু এই ভাষার উৎপত্তি স্থল কোথায় তাহা নির্ণয় করা যায় না, কারণ 'ডোগ্‌রী' কথ্যভাষায় 'তাকরী' ভাষা ব্যবহৃত হয় (Linguistic Survey of India, Vol. I. p. 184)। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে 'তাকরী' ভাষা জম্মু ও বাসোলি উভয় স্থানেই ব্যবহৃত হয়। অনেক গুলি চিত্র, যে গুলিকে আমি বাসোলি চিত্র বলিয়া অভিহিত করিতে চাই সেগুলি বাসোলি হইতে কিংবা বাসোলির দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত নুরপুর হইতে পাইয়াছি। শেষোক্ত ক্ষেত্রে বাসোলি হইতে যে প্রেরণা আসিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই। প্রাচীনতম যুগের চিত্রগুলি বাদ দিলে এই শ্রেণীর প্রাচীন চিত্রগুলি সপ্তদশ শতকের। এগুলির কোনটী জম্মু হইতে পাই নাই, এমন কি এরূপ চিত্র জম্মুতে পাওয়াই যায় না। পার্ব্বত্য রাজ্য গুলির ভিতর জম্মুই "অর্থশালী ও শক্তিশালী" বলিয়াই কুমারস্বামী এই চিত্রগুলিকে 'জম্মু-চিত্র' আখ্যা দিয়াছেন। অনুসন্ধান করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, চিত্রকলায় জম্মুরও স্থান আছে বটে; কিন্তু সে চিত্রের উদ্ভাবন হইয়াছিল ঊনবিংশ শতকে। যখন জম্মু রাজ্য পার্ব্বত্য-জাতিদিগের ভিতর শক্তিমত্তায় সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল তখন বাসোলির ন্যায় অন্যান্য

রজ্যগুলিকে আপনার অধিকারে ও আয়ত্তের মধ্যে আনিয়াছিল এবং কাঙ্গাড়ার অনেক চিত্রশিল্পী জম্মুতে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হ'ন। তাহাদের মধ্যে অনেকেই কাঙ্গাড়ার রাজ-সরকারে কার্য্য পান এবং ঐ সকল শিল্পীর বংশ-ধরেরাও রাজ-সরকার হইতে সাহায্য ও আনুকূল্য পাইয়া শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার পর অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া শিল্পীদের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না কাজেই তাহারা পুনরায় কাঙ্গাড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। জম্মুতে ইহার পূর্ব্বে যে আর কোন হিন্দু-চিত্র-শিল্প প্রচলিত ছিল সে কথা বহু অনুসন্ধান করিয়াও আমি বাহির করিতে পারি নাই। পার্ব্বত্য চিত্রের কেন্দ্র ছিল তিন স্থানে—বাসোলি, কাঙ্গাড়া এবং গাড়োয়ালে। পাহাড়ী চিত্রকে প্রধানতঃ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত না করিবার কোনরূপ যুক্তিযুক্ত কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক অন্ততঃ জম্মুর স্থলে বাসোলির দাবী কেন যে স্বীকৃত হইবে না তাহা ভাবিয়াই পাওয়া যায় না। যে সকল প্রাচীন চিত্রকে জম্মু চিত্র বলা হয় সে গুলি প্রকৃতই কাঙ্গাড়া উপত্যকার ও বাসোলির শিল্পীদের অঙ্কিত। কুমারস্বামী বলিয়াছেন, বড় বড় রামায়ণের চিত্রগুলি জম্মুর রাজ-সরকারের চিত্রকরদিগের দ্বারা যে লিখিত তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু মাত্র কারণ নাই। (Rajput Paintings, Vol. I. p. 17) এই সকল রামায়ণের চিত্র সাধারণতঃ "লঙ্কা অবরোধ"-শ্রেণী নামে পরিচিত। এগুলি বোষ্টনের যাদুঘরে ও আমার সংগ্রহে আছে। প্রকৃতপক্ষে এ শ্রেণীর চিত্রগুলি গুলের হইতে পাওয়া গিয়াছে। আমি গুলের হইতেই ঠিক এই বিষয়ক অনেক চিত্র পাইয়াছি। এই সকল স্থান হইতে চিত্রগুলির উৎপত্তি-স্থানও যে নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় তাহাতে আশ্চর্য্য কি? স্থানের সহিত উৎপত্তি-স্থানের কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ যাহারা থাকিতে পারে না বলিয়া কথাটা উড়াইয়া দেন তাঁহাদের কথায় কি আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায়? কারণ প্রবাদ এই যে গুলের বা হরিপুর কাঙ্গাড়া চিত্রের একটা প্রসিদ্ধ কেন্দ্র রাজা রঘুনাথ সিং এর সময় পর্য্যন্ত ছিল। কয়েকটী চিত্রের তাকরী-লেখ হইতেও দেখিতে

চিত্র—২ শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ

[এ, ব্লেক আই, সি, এস্‌, মহাশয়ের সংগ্রহ হইতে

পাওয়া যায় যে, কানিংহাম-সাহেবের বিবৃত 'তাকরী' ভাষায় লিখিত শিলা-লেখ এখনও কাঙ্গাড়া রাজ্যে রহিয়াছে। সম্ভবতঃ এবং ইহা অসম্ভবও নয়, দোগ্‌রা পার্ব্বত্য রাজ্যগুলির মধ্যে বিত্তশালী-রাজ্যে চিত্রকরেরা প্রাচীন যুগে বাস করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা কাঙ্গাড়া বা বাসোলির চিত্রকরদের মত প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই এবং তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত এখনকার জম্মুবাসীরা [illegible]

কাশ্মীরে উনবিংশ ও অষ্টাদশ শতকে যে সকল চিত্রকর ছিল ও তাঁহাদের চিত্রের নমুনা হস্ত-লিখিত 'শা‌্নামা'য় পাওয়া যায় তাহাদের সহিত পাহাড়ী চিত্রের কোনরূপ সৌসাদৃশ্য নাই। রামায়ণ ও মহাভারতের বর্ণিত চিত্র-গুলির ছোট চিত্র অপূর্ব্ব পাতলা 'গোটান' কাগজে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলি কাশ্মীরে অঙ্কিত হইয়াছে। এই ছোট চিত্রগুলির সহিত পাহাড়ী চিত্রেরও কোনরূপ সাদৃশ্য নাই।

চিত্র—৩ বিষ্ণু ও গরুড়

চিত্র—৪ তাম্বুল-সেবা

প্রাচীন বাসোলি চিত্র

বাসোলি চিত্রের প্রাচীনতার নিদর্শন আমার চিত্র-সংগ্রহের পাঁচ খানি বিভিন্ন প্রকারের চিত্র দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। এগুলি পশ্চিম হিমালয়ের চিত্র-কলার প্রাচীন হিন্দু-রীত্যনুসারে অঙ্কিত। ঐ স্থানের ভিতর গতানুগতিক রীতির অনুসরণ আদৌ নাই। আছে অপ্রত্যাশিত জীবন্ত স্থূলভাবের চিত্রাঙ্কনের সহিত সাহসিক এমন কি দুঃসাহসিক গঠন-প্রণালীর অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। এই প্রাচীন বাসোলি চিত্রগুলি ষোড়শ শতকের প্রাচীন রাজস্থানী চিত্রকলার নিদর্শন রাগমালার চিত্র অপেক্ষা অধিকতর প্রাচীনত্বের দাবী করিতে পারে। সম্প্রতি কুমারস্বামী শেষোক্ত চিত্র-সম্বন্ধে যে সকল সুপ্রযোজ্য মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সে গুলি বাসোলি চিত্র-সম্বন্ধে অধিকতর প্রযোজ্য। "তাহাদের বৈশিষ্ট্য হইতেছে রেখাঙ্কনে (Drawing) ও বর্ণ-সম্পাতের জীবন্ত ভাবে; পূর্ব্বোক্ত চিত্র গুলি বিশ্লেষণাত্মক কিংবা মনঃ-কল্পিত, বাস্তব আকৃতিগত মূর্ত্তি নয়; কিন্তু শেষোক্ত প্রকারের চিত্র, মিনে-করা দ্রব্যের মত উজ্জ্বল এবং শিল্পীর প্রণালীবদ্ধ কৌশলে নির্ম্মিত। এখানে চিত্রকর দর্শকের মনে ভাবের উদ্রেক করিবার জন্য আদৌ ব্যগ্র নন, তিনি চান যথাযথ ভাবে ঘটনা ও বিষয়গুলির বর্ণন এবং ইঁহাদের সাহায্যে দর্শকের মনে ভাবের লহর তুলিতে। এ রীতি তীব্র অনুভূতিমূলক কিন্তু রস-প্রধান নয়। 'গঙ্গা-অবতরণ' চিত্রে কল্পনার লীলা ও ভাবের ব্যঞ্জনার অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতই ইহা শিল্পীর শক্তিমত্তার পরিচায়ক। ভয়ানক প্রচণ্ড ঘূর্ণীর জলস্রোত অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত অঙ্কিত

হইয়াছে। হর-পার্ব্বতীর পশ্চাতে বামদিকে দর্শকের দিক্ হইতে দূরে তীর্য্যগভাবে অবস্থিত কৈলাস পর্ব্বত আশ্চর্য্য রূপে অঙ্কিত হইয়াছে এবং দ্বারদেশ দেবাদিদেবের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেছে। এই চিত্রকরের ভিতর অমার্জ্জিত ভাব থাকা সত্ত্বেও আমরা ইহাকে প্রকৃত এক জন শিল্পী বলিব। অন্য এক খানি চিত্রে দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করিতেছেন। পূর্ব্বের মতই অঙ্কন-প্রতিভা ও বর্ণন-শক্তি এ চিত্রেও সম্যক্‌ভাবে প্রতিভাত। 'গরুড় পৃষ্ঠে বিষ্ণু' (৩য় চিত্র) ও 'কৃষ্ণের বংশী' চিত্রে এ সকল গুণ দেখা যায়। রামসীতার চিত্র সুন্দর এবং মার্জ্জিত ভাব ও রুচির পরিচায়ক। সম্ভবতঃ এই চিত্রটী পরবর্ত্তী কালের। এই কয় খানি চিত্রে জীবন ও গতির পরিচয় সুস্পষ্ট ভাবে পাওয়া যায়, সত্য বলিতে কি চিত্রগুলির প্রতি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহারা মনে অননুভূতপূর্ব্ব অনুভূতির সঞ্চার করে। ইহাদের গাঢ় বর্ণ, চিত্রাঙ্কনের সজীবতা এবং অপরিবর্ত্তনীয় লাল রঙের বিস্তৃত পটভূমি (back-ground) প্রাচীন প্রাচীর গাত্রের চিত্র হইতে গৃহীত। এই প্রাচীন চিত্র হইতে মুখমণ্ডলের যে আদর্শ পাওয়া যায় উহাই বাসোলি চিত্রের নর-নারীর বৈশিষ্ট্য-দ্যোতক। এই গুলি হইতে শেষোক্ত যুগের বাসোলি চিত্রেও একই রূপ রীতি অনুসৃত হইয়াছে।

বাসোলি চিত্র-কলার সংরক্ষণ

বাসোলির মুখমণ্ডলের চিত্র প্রাচীন রাজস্থানী রাগমালা চিত্রের মুখমণ্ডলের অনুরূপ। কপাল ক্রমশঃ পশ্চাদ্দিকে সরিয়া যাইতেছে, নাসিকা নিম্নদিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে, চক্ষুদ্বয় অত্যন্ত বৃহৎ, মুখ ছোট, চিবুক দূরাপসারী এবং রমণীদিগের গণ্ড পরিপূর্ণ। বাসোলির এই মুখমণ্ডল অঙ্কনের রীতি সমভাবেই সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এ ধরণ কাঙ্গাড়া বা গাড়োয়াল চিত্রে পাওয়া যায় না। অবশ্য শেষোক্ত দুই স্থানের রমণীদের সৌন্দর্য্যের আদর্শের

চিত্র—৫ বাসোলী রাগিণী

পার্থক্য স্পষ্টই লক্ষিত হয়। উভয় শ্রেণীতেই শিল্পীর মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায় এবং আদর্শ গুলিও তৃপ্তিপ্রদ। বাসোলি ও প্রাচীন রাজস্থানী রাগমালার চিত্রগুলির ভিতর মুখ-শ্রীর সমতা থাকা সত্ত্বেও ইহাদের পোষাক পরিচ্ছদের সমতাও দেখা যায়। উভয় শ্রেণীর ভিতরই ছোট চোলি, ঘাঘরা ও ওড়না একরূপ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ

দেখুন মালকা রাগের দক্ষিণ দিকের (Rajput Paintings Vol. II, Pl. IIIA.) ও বাসোলির রাগিণী চিত্র যাহা ৫ নং চিত্রে অঙ্কিত হইয়াছে তাহার সহিত মিলাইয়া দেখুন, দেখিবেন সমতা কত বেশী। উভয়েরই কলাপদ্ধতি অনুসারে অঙ্কিত বৃক্ষগুলির অসাধারণ সমতা দেখিতে পাওয়া যায়।

চিত্র—৬ যশোদা ও কৃষ্ণ-বলরাম

বাসোলি চিত্রের বিষয়

বাসোলির চিত্রকরদের প্রিয় বিষয় ছিল রাগমালার চিত্র অঙ্কিত করা। রাজস্থানী চিত্রকরেরাও এই সকল চিত্র অঙ্কিত করিতে ভাল বাসিত। কাঙ্গড়ার পাহাড়ী চিত্রে 'রাগে'র চিত্র বড় দেখা যায় না। নানাপ্রকার রাগমালার চিত্র বাসোলি চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। আমার চিত্র সংগ্রহের মধ্যে আদর্শ রাগ-চিত্র ৫ম চিত্রে প্রদর্শিত হইল। এই শ্রেণীর অন্তর্গত চিত্র বোষ্টন যাদুঘরের আহীরী রাগিণীর চিত্র। এখানে এক জন রমণী এক বাটী দুগ্ধ চারিটী গোক্ষুরা সর্পকে খাওয়াই-তেছে; উহারা দুইটী মৃৎপাত্র হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। কুমারস্বামীর মতে এ চিত্র সপ্তদশ শতকের। আমাদের বিশ্বাসও ঐরূপ। (Rajput Paintings, LXXVI, 17, 3219, Pl, XXXIV, p, 99) ঐ স্থলে রক্ষিত গুর্জ্জরি রাগিণীর একটী এই শ্রেণীর অন্তর্গত (Ibid, LXXIV, 17, 3200, P XXXIII, p98). ঐ সংগ্রহের অপর গুর্জ্জরি রাগিণীর সুন্দর প্রতি-মূর্ত্তিতে এক জন রমণী পায়ের উপর পা রাখিয়া এক জোড়া কৃষ্ণসারকে আদর করিতেছেন ও তাহার সহচর বীণা বাজাইতেছে। তাহার সংগীতে মুগ্ধ হইয়া নিকটস্থ বৃক্ষগুলি দুলিতেছে। প্রধান মূর্ত্তির মুখ বাসোলি চিত্রের অনুরূপ; কিন্তু দুঃখের বিষয় কুমারস্বামী ইহাকে জম্মু চিত্র বলিয়াছেন। (Ibid, LXXI 17, 3199, Pl XXXIII, p97) পূর্ব্বের চিত্রের

মত কুমারস্বামী উদ্ধৃত রামকেলি, দেবগান্ধারী, দেবগিরি রাগিণী, গম্ভীরা ও ভমরন্দ রাগের চিত্রের নারী মূর্ত্তি গুলির মুখ বাসোলি চিত্রের অনুরূপ (যথাক্রমে Ibid LXX, 17, 2791, Pl XXXII, p 97 ; Ibid LXXVIII, 17, 2789, Pl XXXII, p96 ; Ibid LXXIII, 17, 3116, Pl XXXIII, p98 ; Ibid, LXIX,

17, 2790, Pl XXXIII p97; Ibid, LXXIII, 17, 2788, Pl XXXIII p98; বাসোলির রাগিণী চিত্রগুলিতে মৌলিকতা বিশেষভাবেই পরিস্ফুট। রাজস্থানী রাগমালার চিত্র হইতে এগুলির পার্থক্য সহজেই ধরিতে পারা যায়। এগুলি মাধুর্য্যময় ও তৃপ্তিদায়ক। এই সকল চিত্রে সমসাময়িক চরিত্র ও রীতি-নীতির পরিচয় স্পষ্ট পাওয়া যায়। ইহাদের ভিতর দিয়া শিল্পীর কল্পনা-প্রবণতারও পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন চিত্র হিন্দুর দেব-দেবী লইয়া অঙ্কিত। এ গুলিতে কিন্তু প্রাচীন বিষয়ক মনোরম চিত্র। এ খানিও আমার সংগৃহীত। ৬নং চিত্র দেখুন। যশোদা দধিমন্থন দণ্ড ঘুরাইতেছেন, দণ্ডের উপর একটী ময়ূর ঘূর্ণনের সহিত তাল ঠিক রাখিয়া ভার সমান রাখিতেছে, এবং যখন তাঁহার মনোযোগ ময়ূরটীর দিকে আকৃষ্ট হইল তখন শ্রীকৃষ্ণ দধিভাণ্ডে এক হাত ডুবাইয়া অন্য হাতে মাখম তুলিতেছেন; যশোমতীর পশ্চাতে বলরাম একটী পদ্ম হস্তে দণ্ডায়মান। (এই দুই খানি চিত্র যথাক্রমে কুমারস্বামীর পূর্ব্বোক্ত পুস্তকের XXXVIII, 17,

চিত্র—৭ তান্ত্রিক দেবতার পূজা ও উৎসব

বাসোলি চিত্রের সজীবতা ও সম্পাদনেও বর্ণন-ভঙ্গীর সাহসিকতা নাই। বাসোলি চিত্রকরদের কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক চিত্র ও রামায়ণের ঘটনাগুলি অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এ গুলি তাহারা অসামান্য নৈপুণ্যের সহিত অঙ্কিত করিত। আমার রামায়ণ-চিত্রের সংগ্রহের মধ্যে যেখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেখানি বাস্তবিকই প্রাণ-স্পর্শী। যশোদা ও বালক শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম আর একখানি কৃষ্ণলীলা- 2769, Pl XVI, p85 ও CLXII, 17, 2794, Pl. XVII, p121). 'শ্রীকৃষ্ণ সুদামাকে অভ্যর্থনা করিতেছেন' চিত্রে (Coomaraswamy, A. K. Rajput Paintings, Vol II, Pl. XXIX), দেহ, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কার পূর্ব্বোক্ত যশোদা ও শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম চিত্রের অনুরূপ; যদিও যশোদার মুখশ্রী অধিকতর সুশ্রী ও শিল্পীর সুরুচির পরিচায়ক। সম্ভবতঃ চিত্রখানি সপ্তদশ শতকের।

দেউটীর ভিতর এই চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। রসিকপ্রিয় পুঁথির এক খানি চিত্রের বিষয়-বিন্যাস ঠিক পূর্ব্বোক্ত চিত্রের অনুরূপ (Ganguly, O. C. "Masterpieces of Rajput Paintings" Pl L. B)। বোষ্টনে রক্ষিত রাধা ও কৃষ্ণের আর এক খানি চিত্রে উভয়ের অবয়ব প্রভৃতিতে বাসোলি চিত্র-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের ছাপ স্পষ্ট দেখা যায় (Boston C. C. XXV, 17, 3201, Pl. LXV, p 146)। বাসোলি চিত্রের উন্নতির যুগের গীত-গোবিন্দের মনোরম চিত্রগুলির মধ্যে আমার সংগৃহীত চিত্রের এক খানি ত্রিবর্ণ চিত্র প্রদর্শিত হইল।

তথা-কথিত 'তিব্বতী' চিত্রের বিষয় হইতেছে নায়ক-দিগের তন্ত্রের দেবীদিগের চিত্র। (চিত্র নং ৭)।

তিব্বতী-চিত্র

পুরাতন বাসোলি চিত্রের পরবর্ত্তী কালের পরিণতি তিব্বতী চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে চিত্রখানিকে সুসজ্জিত করিবার জন্য কাচ-পোকার পক্ষের অংশবিশেষ কাটিয়া মণির ন্যায় দেখাইবে বলিয়া সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইত। কেবলমাত্র পঞ্জাবের বিক্রেতারা এই চিত্র গুলির নাম 'তিব্বতী' চিত্র দিয়াছিল। বাসোলি চিত্রের মধ্যে গীত-গোবিন্দের চিত্রাবলীকে সুসজ্জিত-করণের জন্য এই পদ্ধতি অনুযায়ী কাচ-পোকার পক্ষের অংশ বিশেষ-ভাবে কাটিয়া চিত্রে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীন বাসোলি চিত্রে সুসজ্জিত-করণের এ ব্যবস্থা না থাকিতে দেখিয়াও তিব্বতী চিত্রের নিয়মানুবর্ত্তিতা লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারা যায় যে, তিব্বতী চিত্রগুলি পরবর্ত্তী যুগের চিত্র। লাহোরের সেণ্ট্রাল মিউজিয়মে রক্ষিত তান্ত্রিক দুর্গা-মূর্ত্তিগুলি প্রকৃতপক্ষে তিব্বতী শ্রেণীর অন্তর্গত; কিন্তু যাদুঘরের তালিকায় এ গুলিকে বাসোলি চিত্রের অন্তর্গত করা হইয়াছে। এই চিত্রগুলিই প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের বিবরণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ঠিক এই শ্রেণীর তন্ত্রের দেবীর একরূপ চিত্র ৭ নং চিত্রে প্রকাশিত হইল। কুমারস্বামীর প্রকাশিত নায়কদের চিত্রগুলি তিব্বতী-চিত্রের অন্তর্ভুক্ত (Boston, Rajput Paintings. Part V. No. CCC—CCCVII এগুলি নায়ক-ভেদের চিত্র। এ গুলির বর্ণের ঔজ্জ্বল্য, চিত্রের চারি পার্শ্বে লাল রঙের পাড়, কাচ-পোকার ডানা দিয়া মণি-মুক্তার প্রকাশ, স্থাপত্য-রীতির বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক ক্ষুদ্র বুরুজ, চৌখুপী করা দ্বার, গবাক্ষ-জাল, স্তম্ভ-মূলের পরিসমাপ্তিতে কিম্ভূতকিমাকারের মস্তক (Ibid, p 170) তিব্বত-শ্রেণীর চিত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। কুমারস্বামী বিবেচনা করেন, এ-গুলি মুঘল-যুগের পূর্ব্বের চিত্র; কিন্তু আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে এগুলি বাসোলি চিত্রের রীতি হইতে সামান্য ভিন্নপথে চালিত চিত্র। এই সকল চিত্রে আকৃতির কোমলতা বা মাধুর্য্য নাই, মূর্ত্তিগুলির সর্পিল গতি বা ছন্দ নাই, আছে কঠোর আকৃতি, উগ্র মুখাবয়ব। কুমারস্বামী মনে করেন সর্ব্ব-জন-বিদিত 'বিরহিণী'র চিত্রখানি সেই শিল্পীর হাতের অঙ্কিত যিনি পূর্ব্বোক্ত নায়কদের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। (Ibid CCC VIII, 17,3113, OCXCVI. p, 174; "Rajput Paintings OCXXVII A; Gangoly, O. C. Masterpieces of Rajput Paintings. কিন্তু আমার মতে 'বিরহণী'র চিত্রখানি নায়কদের তিব্বতী চিত্রের অনুরূপ নয়, বাসোলি চিত্রের নায়িকার অনুরূপ। (Ibid, CCCX. 17,3203, p CXC VII, p 125 এবং এ চিত্রখানিই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। 'অভি-সারিকা নায়িকা' চিত্রের (Rajput Paintings, pl. XXVII B,) জম্মু-চিত্রের কোন চিত্রের সহিত তুলনাই হয় না। Goetz যে 'বৈছক শাখা'র চিত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা বাস্তবিক 'তিব্বতী' চিত্র; আমি ইহাদিগকে কুমারস্বামীর নির্দ্ধারিত বোষ্টনে রক্ষিত CCB—OCC VII চিত্রের সহিত সমপর্য্যায়ে ফেলিয়াছি। উভয়ের অঙ্কন-রীতি একই রূপ—একটী অপরটীর সদৃশ নয়। আমার মনে হয় এই চিত্র ও বোষ্টনের চিত্র-শ্রেণী একই চিত্রকরের অঙ্কিত। 'বাসক-শয্যা' ও গাঙ্গুলীর উদ্ধৃত 'বাসক শয্যা' (যাহা ১৯২৪ সালের 'রূপম্' পত্রিকার ১৩৮ পৃষ্ঠার সম্মুখে প্রকাশিত হইয়াছে) এই দুইটী চিত্রও বাসোলি-চিত্রের অন্তর্গত। তৃপ্তিপ্রদ মাধুর্য্যময় সজ্জী-করণের উপাদানে চিত্রিত যমুনা-তীরে বংশী-বাদন-রত শ্রীকৃষ্ণ চিত্র বাস্তবিকই মনোরম। যমুনার পদ্ম-কলি সকল প্রস্ফুটিত হইতেছে। রাখাল-বালকেরা গো

বৎস লইয়া তাহার দুই পার্শ্বে রহিয়াছে। বাক্-শক্তি রহিত পশুগুলি শ্রুতিমধু ধ্বনি-প্রবাহের মূর্চ্ছনায় অপরূপ ভাবের অনুভূতিতে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে! (Boston Pl.) এ চিত্রকেও আমি বাসোলি-চিত্রের অন্তর্গত মনে করি। এখানে কৃষ্ণের মুখ-শ্রী তথা-কথিত তিব্বতী চিত্রের অনুরূপ। রাখাল বালকগণের ও দেবগণের অবয়ব কাশ্মীরের নুরপুর ও ত্রিলোকনাথবাসীদের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহাদের কপাল উচ্চ ও আকৃতি ইহুদীদের মত (Kangara District Gazeteer, p 82) আর আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাসোলির অনেকগুলি চিত্র নূরপুর হইতে আসিয়াছে। কুমারস্বামী-প্রদর্শিত দুই খানি প্রসাধন-চিত্র (CCC I. 17,2000, Pl CVII p 203 and CCCXCIV, 17 2798, Pl CVII ... ...যুগের; তৃতীয় চিত্রখানি (Rajput Paintings, Pl XXXII) অধিকতর রীত্যনুসারী। ... ...র অন্তর্ভুক্ত। এ-গুলি বাসোলি শিল্পের তিব্বতী-শ্রেণীর পূর্ব্বতন যুগের চিত্র।

বাসোলির রেখা-চিত্র

বাসোলি চিত্রকরদের রেখা-চিত্রের নিদর্শন বড় একটা ... ...ষ্টন বা লাহোর যাদুঘরে এ শ্রেণীর রেখা-চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। আমার সংগ্রহ একখানি রেখা চিত্র আছে, যাহা দেখিয়া মনে হয় চিত্রকর ... অঙ্কিত করিতে জানেন, রেখার ধারা- ... তাহার জ্ঞান আছে, তিনি সুন্দর নক্সা-নবীশও ছিলেন। দুই জন গায়িকার নৃত্যের লীলাচঞ্চল আনন্দপূর্ণ গতি ও ভঙ্গী সুন্দরভাবে চিত্রে অঙ্কিত হইয়াছে। শিল্পের দিক হইতে এ খানির মূল্য বড় কম নয়, কিন্তু ইহার অন্য এক কারণে মূল্য খুব বেশী! এই চিত্রাঙ্কন হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তিব্বত-অঙ্কিত দেবতারা বাসোলির আদর্শ হইতে গৃহীত। এই চিত্রখানি ও আমার ... অপর একখানি চিত্র, যাহাতে তান্ত্রিক দেবী ... দুই খানি চিত্র ... গুলির শিল্পীদের ... হইয়াছিল।

অন্য বাসোলি চিত্র

বোষ্টনে রক্ষিত বাসোলির যে সকল চিত্রের বিষয় আমি ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি তদ্ভিন্ন অন্যান্য কয়েক শ্রেণীর চিত্রে বাসোলির চিত্রকরের তুলিকার পরিচয় বেশ পাওয়া যায়। মেট্রপলিটন মিউজিয়ম অব আর্টসএ রক্ষিত শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক প্রচারিত 'সাবিরী' (Shaviri) নামে বর্ণিত চিত্রখানি সম্বন্ধে একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি। ইহার বিষয় বোষ্টন-যাদুঘরে রক্ষিত বাসোলি চিত্রের বৈশিষ্ট্য-যুক্ত চিত্রের অনুরূপ। Coomaraswamy, A. K. Catalogue of the Indian Catalogues in the museum of Fine Arts, Boston. Rajput Paintings.) শেষোক্ত চিত্রে লাল পাড়ের উপর তাক্‌রী অক্ষরে লেখা আছে। চিত্রের বিষয় "রামকেলী রাগিণী, শ্রীরাগের পত্নী!" উভয় চিত্রে একটী বালিকার হস্তে একটী দুধের বাটী (বোষ্টন-চিত্রে দুই হাতে দুটী দুধের বাটী) যাহা সে গোক্ষুরা সাপকে আহারের জন্য বাড়াইয়া দিতেছে। তাহার দুই পার্শ্বে বৃক্ষের উপর তাহারা গুটাইয়া ছিল এবং তাহাকে দেখিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। মেট্রোপলিটন মিউজিয়মের চিত্রে বালিকার দেহভঙ্গী বেশ স্বাভাবিক রকমের; তাহার বিস্তৃত বাম হস্ত কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উত্তোলিত এবং তার সমস্ত দেহটাকে কিছু পশ্চাতে লইয়া যাওয়ায় বিষাক্ত গোক্ষুরা সর্প ভীতির প্রকাশ বড় স্বাভাবিক, কিন্তু তাহার কর্ত্তব্য হইতেছে ইহাদিগকে পান করান। রাগ-মালা চিত্রের সহিত বোষ্টন চিত্র ও আমার সংগৃহীত এক খানি চিত্র একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

লাহোরের সেন্‌ট্রাল মিউজিয়মে রক্ষিত বিপ্রলব্ধা নারীর চিত্রখানি শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয় ত্রিবর্ণে মুদ্রিত করিয়াছিল (Master-pieces of Rajput Paintings pl. XXII) শিল্পী কোন বর্ণের কি প্রতীক তাহা বেশ ভালরূপেই জানেন। এই চিত্রে পাঁচটী বৃক্ষের কাণ্ডের পশ্চাৎ হইতে প্রেমের ঠাকুর মদনদেব তাঁহার পঞ্চশর প্রণয়িনীর উপর নিক্ষেপ করিতেছেন। এখানে পঞ্চশর বিভিন্ন বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে এবং গাঙ্গুলী মহাশয় অনুমান করেন যে ইহারা মদনের "পঞ্চ-শায়ক।"

রিয়া-

যমনা-তীরে বংশী-বাদন-

যমুনার পদ্ম-

তেছে। রাখাল-বালকেরা গো-

বৃক্ষের সজ্জীকরণ (decorative treatment) আধুনিক ধরণের।

গুপ্ত ও গাঙ্গুলী উভয়ে আর এক খানি চিত্রকে বাসোলি চিত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এ-খানির নাম "পুষ্পচয়নরতা" (S. N. Gupta, Catalogue of the Indian Paintings, Lahore, p 132 and O. C. Gangoly "Master-pieces of Rajput Paintings," p XIX) এ দুখানিকে বাসোলি চিত্র বলা সঙ্গত কি না তাহা বিবেচ্য। দুইটী বালিকার চিত্র যদিও প্রাচীন রীতি অনুসারে অঙ্কিত, তথাপি বলিতে বাধ্য যে, এই দুইটী বালিকার চিত্র সাধারণ বাসোলি চিত্রের মত নয়—অন্ততঃ বামদিকের বালিকাটীর। যে চারাগাছটী হইতে তাহারা কুসুম চয়ন করিতেছে, বিশেষতঃ কুসুমের আকৃতি আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে মুঘল-চিত্রকলার শেষ সময়ে অর্থাৎ জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জহানের সময়ের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতিতে অনুসৃত কুসুমের উপাদান হইতে এ কুসুমের চিত্র যে গৃহীত হইয়াছে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ করিবার কারণ নাই। অধিকন্তু প্রস্ফুটিত সূর্য্যমুখী ফুলের অঙ্কন অন্য কোন বাসোলি চিত্রে নাই। পা-পর্য্যন্ত চোলি (বডিস্) ব্যবহার বাসোলি চিত্রে কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। কুসুম-পাত্র বা ঝুড়ি বোষ্টন মিউজিয়মে দেবগিরি রাগিণীর চিত্রের কুসুম-পাত্রের মত নয়। আর শেষোক্ত চিত্রকে আমি পূর্ব্বেই বাসোলি চিত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। পরিশেষে মেঘের চিত্র স্পষ্টই প্রমাণ করিয়া দেয় যে এ চিত্রখানি বাসোলি চিত্রকরের চিত্র নয়। অপর পক্ষে ইহা অস্বীকার করা যায় না যে এ চিত্রখানি বাসোলি চিত্রের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। এ চিত্রখানির গঠনে, অঙ্কনে, দক্ষিণ দিকের ক্রন্দনরতা উইলো চারার দোলনে, আর অন্ততঃ দক্ষিণ দিকের মূর্ত্তির পদ্মপত্রের মত চক্ষুর অঙ্কনে শিল্পী বাসোলি চিত্রের অনুকরণ যে করিয়াছেন তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

বাসোলি চিত্রে গঠন-মূলক চিন্তা, স্থাপত্যবিদ্যার পরিকল্পনারই মত। সৌসামঞ্জস্য এবং চিত্রের পরিকল্পনা ও চিত্রের বিভিন্ন অংশের সঙ্গতি রক্ষাই বাসোলি চিত্রের বৈশিষ্ট্য। আমার সংগৃহীত গীত-গোবিন্দের চিত্রাবলীকে দুই অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে; এক দিকে গাছের শ্রেণী দেখিতে স[illegible] (mass) মত, অপর দিকে "দূতিকা ও কৃষ্ণ[illegible] নের সৌসামঞ্জস্য ও সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছে; এবং এ[illegible] গুণই বাসোলির চিত্রকরদিগের সৌন্দর্য্যানুভূতির প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতেছে। আর ইহা প্রাচীন বাসোলি চিত্রে[illegible] যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, এই শিল্পের ক্রম-বিকা[illegible] স্তরে স্তরেও ইহা বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়াছে[illegible] দিকের বৃক্ষগুলি চিত্রের পরিপূরক নয় কারণ, [illegible] শিল্পীই এ গুলি পরিপূরকভাবে অঙ্কিত ক[illegible] সঙ্গতভাবেই অঙ্কন করিবেন; [illegible] চিত্রে এবং রাগিণী শাবিরী চিত্রে [illegible] প্রথম চিত্রখানি সর্ব্বাগ্রে ১৯২৫ সালে '[illegible] ১০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার পর [illegible] নিদর্শন স্বরূপ British Empire [illegible] প্লেট প্রকাশিত হয়। ইহার আর [illegible] কৃতি শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়ের "Masterpieces of Rajput Paintings. p lXX"এ প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে কেবল মাত্র লতাপাতা-সমন্বিত রীত্যনুসারে অঙ্কিত দুইটী বৃক্ষ ও কৃষ্ণ ও গোপীদের সমঞ্জসভাবে চিত্রের গঠনের সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছে। বামদিকের দুই জন গোপীর দাঁড়াইবার ভঙ্গী স্বাভাবিক ও গতানুগতিকভাবে অঙ্কিত হয় নাই, এবং তৃতীয় গোপীর আড়ষ্ট ভঙ্গিমার কারণও বেশ বুঝিতে পারা যায়, কারণ সে পশ্চাদ্দিকে তির্য্যক্‌ভাবে পড়িতেছে। সে যদি সোজাসুজি ভাবে থাকিত তাহা হইলে সিংহাসনে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ যখন মাঝে মাঝে তির্য্যক্‌ভাবে হেলিতেছেন দুলিতেছেন, সেই সময়ে তাহার উপর গিয়া পড়িতেন। এই সামঞ্জস্য রক্ষা করাতেই শিল্পীর কৃতিত্ব। গাঙ্গুলীর মতে তিন জন গোপীর মুখমণ্ডল ব্যক্তিগতভাবে ধরিলে [illegible] না, কারণ উহারা একরূপ; কিন্তু উহাদিগকে মুখের আদর্শ ধরিয়া দেখিতে হইবে; বাস্তবিকই এ কথা খুব খাঁটী কথা, এবং কেবলমাত্র বাসোলি চিত্র সম্বন্ধেই যে এ কথা প্রযোজ্য তাহা নয়, সমুদয় পাহাড়ী চিত্রের প্রকৃতিই [illegible]বিস্তর এইরূপ। আর ইহা দোষের মধ্যেই ধরিতে হইবে, কারণ, চিত্রিত মূর্ত্তির অবয়বের সমতা তৃপ্তিপ্রদ হয় না বরং 'এক ঘেয়ে' হইয়া পড়ে। এ কথা ব[illegible]

মতেই চলিবে না যে চিত্রগুলির বিষয়বস্তু ধর্ম্মবিষয়ক। এ সকল বিষয় চিত্রের সাহায্যে অঙ্কিত করিতে হইলে মূর্ত্তিগুলির অবয়বের সমতাই রক্ষিত হইবে, কিন্তু ইহাতে শিল্পীর কল্পনার ও সম্পাদনের দীনতাই প্রকাশ পাইবে। শিল্পী মৌলিক চিত্রাঙ্কনে যে অক্ষম ইহা তাহাই সূচিত করিয়া দেয়। যাহা হউক এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে গোপীদের ভক্তিভাব, অনন্য-শরণতার ভাব সুন্দররূপেই চিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সুন্দর চিত্রের বর্ণ-বিন্যাস সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে সমুজ্জল সবুজ বর্ণের পট-ভূমির (Background) উপর উজ্জ্বল পাকা সোনার মত হরিদ্রা বর্ণ এবং টকটকে গোলাপী রঙ যেন উজ্জ্বলে-মধুরে মিশাইয়াছে। এই চিত্রখানিকে গাঙ্গুলী মহাশয় যথার্থই বাসোলি চিত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; কিন্তু India Societyর প্রকাশিত পুস্তকে অনিশ্চিতভাবে ইহাকে "রাজপুত" বা "রাজস্থানী" চিত্র বলা হইয়াছে। এ খানি সপ্তদশ শতকের অঙ্কিত বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। ত্রিবর্ণে মুদ্রিত রসমঞ্জরী ও গীত-গোবিন্দের চিত্রাবলীতে বাসোলি চিত্র যে উন্নতির উচ্চতম শিখরে উঠিয়াছে তাহার সহিত কাঙ্গাড়ার ও গাড়োয়ালের চিত্রকরদের উৎকৃষ্ট চিত্রগুলির তুলনা হইতে পারে এবং রীতি ও সম্পাদনের মৃদুতা (Style and delicacy of execution)বিষয়ে উহাদের অপেক্ষা কোন মতেই হীন নহে। ভানুদত্তের রসমঞ্জরীর এক শ্লোকের ভাব প্রকাশের জন্য যে কয় খানি চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে সে গুলিতে দেশ-ঘন অঙ্কনের সুন্দর নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় (*Compact Composition which fills the Space admirably*)। এই চিত্রগুলি সপ্তদশ শতকের। দুইটী যুবতীর ব্যাকুল-করুণ মুখমণ্ডল ও প্রণয়াস্পদের বিবর্ণ মুখ সুন্দররূপেই তাহাদের অন্তরের ভাব প্রকাশ করিয়াছে; চিত্রের হস্তের বিস্তৃতি অপূর্ব্ব ভাব প্রকাশের সহায়তা করিয়াছে। রাজপুত চিত্রের আদিরসাত্মক ভাব-প্রকাশের ভঙ্গী, চিত্রের ছন্দ ও সমতা মুঘল চিত্রে এমন সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয় নাই। শিল্পীর নিপুণভাবে কল্পিত বর্ণ-বিন্যাস-প্রণালী এই ভাব-প্রকাশে কম সহায়তা করে নাই এবং ইহা দ্বারা শিল্পীর কলা-কুশলতার প্রকৃষ্ট পরিচয়ও পাওয়া যায়। বাসোলি চিত্রকরদিগের শিল্প-বিজ্ঞান রীত্যনুসারী অঙ্কন-নিপুণতা (technical skill) এই চিত্রে ও অন্যান্য কয়েকখানি চিত্রে যে ভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব। শিল্পী এ সকল স্থানে চিত্রিত নর-নারীর পরিচ্ছদের পার্থক্য দেখাইবার জন্য সমুজ্জল মিহি কাপড়ের যে আবরণ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা মূর্ত্তিগুলির ভাবের সহিত সুন্দর সমতা রক্ষা করিয়াছে এবং অস্পষ্ট পোষাক-পরিচ্ছদের উপর যে স্বচ্ছ আবরণী দিয়াছেন তাহাতেও মূর্ত্তিগুলির সুষমা ও লালিত্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। স্বচ্ছ আবরণীর সাহায্যে নর-নারীর সৌন্দর্য্য প্রকাশের অপূর্ব্ব কৌশল আয়ত্ত করিয়া রাজস্থানী, কাঙ্গাড়া ও গাড়োয়াল শিল্পীরা রমণীর প্রসাধন-চিত্র অঙ্কিত করিবার সময় সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়াছেন; কিন্তু এরূপ পরাজয়ের অপমান কখনও বাসোলি শিল্পীদের অদৃষ্টে ঘটে নাই। সূক্ষ্ম ওড়না বাতাসে উড়িতেছে কিংবা রমণীর রমণীয় পরিচ্ছদের ভাঁজে ভাঁজে হিল্লোলিত হইতেছে। অঙ্কিত নর-নারীর উপর স্বচ্ছ আবরণ দিবার প্রথা বাসোলি চিত্রে বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। শিল্পী ইচ্ছা করিয়া এরূপ করিয়া থাকেন—সৌন্দর্য্য প্রকাশের ইহা একটী উপায় মাত্র। আনন্দের সহিত চক্ষুদ্বয় চিত্রিত নর-নারীর রম্য সুষমা, সূক্ষ্ম লালিত্য, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভঙ্গী এবং অবয়বের সৌষ্ঠব ও আবরণীর সঙ্গতি দেখিয়া মুগ্ধ হয়।

নায়িকার কেশের চিত্র-অঙ্কন-পটু বাসোলির চিত্রকরদিগের তুলিকার কৃতিত্ব দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। নায়িকার মুখের উপর পতিত এক গাছি চুল বা বিক্ষিপ্ত কেশগুচ্ছ কি সুন্দর ভাবেই না চিত্রিত! এই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বর্ণনা সুসজ্জিত-করণ শিল্পীর সহজাত গুণ; কারণ বাসোলি শিল্পীরা সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বপ্রথমে এইরূপ শিল্পেই পারদর্শী ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা যে অন্তর্নিহিত ভাবের প্রকাশে অক্ষম ছিল তাহা নয়—এরূপ ভাব-প্রকাশ করিতে তাহারা সুদক্ষ ছিল। অংশ-বিশেষের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিত্রণ ছাড়াও তাহাদের চিত্রখানিকে ব্যাপক-ভাবে অঙ্কিত করিবার ক্ষমতাও তাহাদের অসীম ছিল। অঙ্কন-নিপুণতা (technique) সম্বন্ধে অতিমাত্রায় মার্জ্জিত রুচির পরিচয় দেওয়া সত্বেও

শিল্পীদের চিত্রে সরলতা ও সজীবতার সুস্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান। শিল্পী চিত্রের ব্যাপকতা ও সৌন্দর্য্য প্রকাশের জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। এই শ্রেণীর চিত্রে সম্পাদনের অপূর্ব্ব ছন্দ (marvellous rhythm of composition) মূর্ত্তিগুলির আবরণীর (drapery) সঙ্গতি (harmony), অবস্থিতির ভঙ্গী (pose), দেহ-ভঙ্গী (gesture) প্রত্যেক নর-নারীর সহিত সমগ্র চিত্রের সম্বন্ধ এবং সর্ব্বোপরি দীপ্ত বর্ণ-বিন্যাস চিত্রগুলিকে মনোরম করিয়াছে। অবশ্য রসমঞ্জরীর চিত্রাবলীর মত বাসোলির সকল চিত্রই এত উন্নত রীতির পরিচায়ক নয়। এই চিত্রে উৎকর্ষ ও অপকর্ষের যে নমুনা পাওয়া যায়, তাহা হইতেই এগুলিকে বাসোলি চিত্রের আদর্শ বলিয়া ধরিতে পারা যায়।

বাসোলির গীত-গোবিন্দ চিত্রাবলীর চিত্রকরেরা সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি বা চিত্তরঞ্জনী-বৃত্তির যে অসামান্য পরিচয় দিয়াছেন তাহা পাহাড়ী শিল্পের অন্যান্য স্থানের চিত্রকরদের চিত্রে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। চিত্রগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই কথাটা সহজ-বোধগম্য হইবে।

অন্যান্য পাহাড়ী চিত্রগুলির ন্যায় বাসোলি-চিত্র গীতি-কবিতার মত মধুর, এইরূপ দৃশ্যেই গীতি-কবিতার মোহকর সূক্ষ্মানুভূতি ও প্রাচুর্য্য সুস্পষ্ট প্রকাশ। কবির আধ্যাত্মিক স্বপ্ন জগৎকে চিত্রকর নূতন ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। দিন বাড়িতেছে—সূর্য্যের উজ্জ্বল-কিরণ এখনও রহিয়াছে—সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসে নাই। বায়ুমণ্ডল নিস্তব্ধ, গাছের পাতা নড়িতেছে না। গাছ-গুলি নিৰ্জ্জীব হইয়া পড়িয়া আছে। শিল্পী এই অবস্থা চিত্রে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

মূর্ত্তি-অঙ্কনে বাসোলীর চিত্রকরেরা যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। পর্য্যবেক্ষণে তিনি যত্নপর ও তাঁহার স্মরণশক্তি ও আছে। চিত্রগুলির ভঙ্গী স্বাভাবিক ও সরল; গম্ভীর ও প্রচলিত প্রথানুযায়ী অঙ্কিত ভঙ্গীর মত নয়। এগুলি যথাযথ-ভাবে বাস্তব রীতি অনুসারেই অঙ্কিত। রমণীদের বিভিন্ন রংয়ের রেশমী পরিচ্ছদের ঔজ্জ্বল্য, তাহাদের বসন-ভূষণের চিকণের সুন্দর কাজ, তাহাদের হার কর্ণভূষণ ও কঙ্কণ, তাহাদের মস্তকের কৃষ্ণ বর্ণের বৃহৎ পালকের ভূষণ দেখিয়া চিত্রগুলির অঙ্কনের সময় নিরূপণ করা সহজ। এই মস্তকের ভূষণগুলি কালে হ্রস্ব হইতে হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছিল। সামাজিক পার্থক্য শরীরের অবয়ব হইতে বড় ধরিতে পারা যায় না, যত পারা যায় রং ও পোষাক পরিচ্ছদ হইতে। প্রত্যেক চিত্রের মুখেই একটা চাঞ্চল্যের অনুভূতি ফুটিয়া আছে। সূক্ষ্ম ভাবানুভূতি-চিত্রণে এই সকল চিত্রকরেরা বড়ই আনন্দ পাইয়া থাকেন। উহারা গুরুতর গম্ভীর অনুভূতির (strong emotion) অঙ্কন করেন না। সুসজ্জীকরণের জন্যই তাঁহারা পল্লী-চিত্র বা নিসর্গ-চিত্র অঙ্কিত করেন। পত্রের আকৃতি, তাহাদের ভিতর দিয়া আলোকের খেলা এবং তাহাদের রঙ মিলিয়া দর্শকের মনে সুসজ্জীকরণের সূক্ষ্ম ভাব প্রকাশ করিয়া দেয়। শিল্পী পট-ভূমির উপর একেবারে অনাবশ্যক চিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ অঙ্কিত করেন না। দেশ বা স্থানের মূল্য তিনি বোঝেন। তিনি দর্শকের মনে কলানৈপুণ্যের দ্বারা কিরূপ ভাবের উদ্রেক করিতে পারিবেন তাহাই দেখিয়া থাকেন। তিনি সমগ্র পট-ভূমি গাঢ় হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত করিয়া সান্ধ্য নীল আকাশে টুকরা টুকরা মেঘের কিনারা আঁকিয়া অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের রক্তিমাভা দর্শকের কল্পনায় প্রতিভাসিত করিয়া তোলেন। এই শ্রেণীর চিত্রে অতি উচ্চ চক্রবাল-রেখা অঙ্কিত করা পদ্ধতির মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। শিল্পীরা স্থান (space) ও গভীরতা (depth) বুঝাইবার জন্য এইরূপ করিয়া থাকেন। রঙের পবিত্রতা ও সমন্বয় এবং ভাব-ব্যঞ্জনাপূর্ণ তুলিকার চালনায় এই শ্রেণীর চিত্র অন্যান্য চিত্র অপেক্ষা অধিক চিত্তাকর্ষক। এ-গুলি কেবলমাত্র আমাদের কল্পনাকে আকৃষ্ট করে না, আমাদের চিত্ত-রঞ্জনীবৃত্তিও আকৃষ্ট করে। এই সকল মূল্যবান রত্নে যদি মুঘল-চিত্রের দৃঢ়তা, সংযম কিংবা সমুন্নত গরিমা না থাকে তাহা হইলে কি এমন বিশেষ ক্ষতি হয়? যে সকল ভ্রান্ত-পথে পরিচালিত চক্ষু বাস্তব চিত্র দেখিতে না পাইলে ক্লেশ অনুভব করে সেইরূপ চক্ষু যাহা-দের আছে, তাঁহারাই এ সকল চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হন না।

বাসোলি চিত্র ও কাঙ্গাড়া চিত্রের পার্থক্য

নুরপুর, কাঙ্গাড়া ও গুলের চিত্রগুলির ভিতর পার্থক্য দেখান বড় সোজা না হইতে পারে, কিন্তু কেহই ব্য

চিত্রকে কাঙ্গাড়া চিত্র বলিয়া ভুল করিতে পারেন না। কাঙ্গাড়া শিল্প হইতে গাড়োয়াল শিল্প উদ্ভূত হইলেও এবং উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বে পার্থক্য ছিল সত্য, কিন্তু উনবিংশ শতক হইতে সে পার্থক্য মুছিয়া গিয়াছে। বাসোলি শিল্পের আদর্শ কাঙ্গাড়া বা গাড়োয়াল শিল্পের আদর্শ হইতে পৃথক্। প্রকৃত রাজস্থানী শিল্পের সহিত ইহার আত্মার সম্বন্ধ আছে। কাঙ্গাড়ার সহিত সেরূপ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না।

কাঙ্গাড়ার প্রাচীনতা, ধনৈশ্বর্য্য ও সভ্যতার প্রতি লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, এখানে মুঘল শিল্পের প্রচলনের পূর্ব্বে চিত্রশিল্পের উৎকর্ষও সাধিত হইয়াছিল, কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিদের আক্রমণে সে চিত্রের নিদর্শন ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে। আমি কিছুমাত্র বিস্মিত হইব না যদি গবেষণার ফলে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, রাগমালার চিত্রাবলী, যাহার সহিত প্রাচীনযুগের বাসোলিচিত্রের অপরূপ সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহা জয়পুর বা অর্চ্ছার চিত্র হইতে উদ্ভূত হয় নাই, পরন্তু কাঙ্গাড়ার চিত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। চিত্রগুলির পশ্চাদ্‌ভাগে যে সকল শ্লোক আছে তাহা দেখিয়া কুমারস্বামী মনে করেন এ গুলি বুন্দেলখণ্ডের চিত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ; কিন্তু শ্লোকগুলি যে পরবর্ত্তী কালে চিত্রের পশ্চাদ্‌ভাগে লিখিত হয় নাই তাহার প্রমাণ কোথায় ?

আজ পর্য্যন্ত যে সকল বাসোলি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া বাসোলি চিত্রের অন্ততঃ একটী বিশেষ লক্ষণ বুঝিতে পারা যায় মৌলিকতা। প্রত্যেক চিত্রটীতেই শিল্পীর মার্জ্জিত রুচি ও মনোরম আত্মাভিমানের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন বাসোলি চিত্রও অতি উচ্চাঙ্গের মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক, কাঙ্গাড়া চিত্রের মধ্যে পার্থক্য বড় সূক্ষ্ম নয়, স্থূল দৃষ্টিতেই বুঝিতে পারা যায়। শিল্পীর চিত্র সম্পাদনে, বর্ণে ও চিত্রাঙ্কন ব্যতীত এ পার্থক্য সহজেই ধরা যায়। একই উপাদন বিভিন্ন চিত্র উৎপন্ন করে ; উপাদনের বিন্যাসও পৃথগ্‌ভাবে হইয়া থাকে। নক্সা (*design*) ও আদর্শ পৃথক্। অঙ্কন বিভিন্ন রেখা-চিত্রের দ্বারা সম্পন্ন হয়। কেবল মাত্র উভয় শ্রেণীর ভিতর বর্ণের পরিকল্পনায় পার্থক্য যে আছে তাহা নয়, বর্ণের দীপ্তির মাত্রাতেও (Colour tone) পার্থক্য আছে। এই সকল পার্থক্যের ভিতরও সমতা আছে। উভয় শ্রেণীর শিল্পীরাই একই রকম কল্পনার অনুভূতিতে আকৃষ্ট হইয়া চিত্র অঙ্কন করিয়া থাকেন, উভয় শ্রেণীর শিল্পীরাই সরল, উভয়েই আলোক ও সুন্দর বর্ণ ভালবাসিয়া থাকেন। কাঙ্গাড়া শিল্প বাসোলি শিল্প অপেক্ষা অধিকতর মানসিক পর্য্যবেক্ষণ-শক্তিতে সমৃদ্ধ। কাঙ্গাড়া শিল্পের পরিণত অবস্থার শোভা-সমুজ্জ্বল দীপ্তিপূর্ণ ভাব-ব্যঞ্জনা পাহাড়ী শিল্পে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। রেখাগুলির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নিখুঁত অঙ্কন বাস্তবিকই নেত্র-তৃপ্তিকর। মনোহর লালিত্য এবং কমনীয় রমণীর মুখের পার্শ্বচিত্র ও বাণিশের স্বর্ণের মত ঔজ্জ্বল্য ও বর্ণের চাকচিক্য চিত্রগুলিকে অতীব রমণীয় করিয়াছে। বাসোলি চিত্রে প্রাচীর-চিত্রের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, কাঙ্গাড়া-চিত্রে নানাবর্ণ-চ্ছটা-মণ্ডিত ক্ষুদ্র-চিত্রের শোভা বিরাজিত। একের ভিতর সতেজ অঙ্কন-ভঙ্গী, অন্যের ভিতর মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। কাঙ্গাড়া শিল্পের কমনীয়তা, কঠোর দৃঢ়-রেখা-সমন্বিত বাসোলি চিত্রে পাওয়া যায় না। বাসোলি চিত্রে সর্পিল মূর্ত্তির ছন্দ থাকা সত্বেও মূর্ত্তিগুলি কাঙ্গাড়া শিল্পের মূর্ত্তির সহিত তুলনা হইতে পারে না। বাসোলির হাবভাব-লালসাপূর্ণ রমণীর অর্দ্ধাস্য চিত্র তেমন তৃপ্তি দেয় না যেমন কাঙ্গাড়ার রমণীর আদর্শ চিত্র দেয়। কাঙ্গাড়া ও গাড়োয়াল চিত্রের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য বাসোলি চিত্রে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক বহিঃপ্রভাবের ফলে কাঙ্গাড়া শিল্পের উন্নতি হইয়াছে ; কিন্তু বাসোলি শিল্পে বাহিরের প্রভাব আদৌ নাই—চিরাচরিত প্রাচীন অঙ্কন-পদ্ধতি অনুসারেই এগুলি চিত্রিত ! ভারতীয় চিত্রের দীনতাই প্রকাশিত হইত, যদি বাসোলি চিত্র আবিষ্কৃত না হইত। আমার এই বিষয়ক ইংরাজী প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবার সময় আমার মতের পোষক প্রমাণ হঠাৎ বন্ধুবর মিঃ হীরানন্দ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে পাই। বাসোলির এক খানি চিত্র যাহা পঞ্চম নিখিল-ভারত প্রাচ্য-সম্মেলনে প্রদর্শিত হইয়াছিল ও যে চিত্রের স্বত্বাধিকারী শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্র সেই চিত্রখানির

পশ্চাদ্‌ভাগে বাসোলি অক্ষরে চিত্রের নাম "চিত্ত-রস-মঞ্জরী" লিখিত আছে। এখানি বাসোলিতে ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত হইয়াছে। চিত্রকরের নামও ইহাতে আছে। এখানি বাসোলি শিল্পের এক খানি আদর্শ চিত্র। বোধ হয় ইহা লাহোর মিউজিয়মে রক্ষিত রসমঞ্জরী চিত্রাবলীর এক খানি চিত্র কিংবা আমার সংগৃহীত ঐ চিত্রাবলীর অন্যতম চিত্র।

সংগ্রহ

আমেরিকার কৃষি

[অধ্যাপক শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এস-সি]

আমেরিকা এক রকম কৃষি-প্রধান দেশ। এক সময় ওদেশে চাষ করিয়া অনেকে বিশিষ্ট ধনী হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে মানবের খাদ্যাদি বদ্‌লাইয়া যাওয়াতে এবং বোধ হয় আহার করিবার ক্ষমতাও কমিয়া যাওয়াতে এক্ষণে কৃষিজাত দ্রব্য প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী প্রস্তুত হইতেছে। ইহাতে কৃষকগণের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং বৈজ্ঞানিকগণ কৃষিজাত দ্রব্যের অন্য ব্যবহার আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শস্যে কেবলমাত্র বীজ হইতে মানবের খাদ্য প্রস্তুত হয় এবং পাতা শিকড় ডাঁটা প্রভৃতি সমস্তই পরিত্যক্ত হয়। উক্ত দেশের মধ্যে বৎসরে মোটামুটী ১৩০০০০০০০০ মণ শস্যবীজ উৎপন্ন হয় এবং ২৬০০০০০০০০ মণ খড় ফেলিয়া দেওয়া বা পুড়াইয়া ফেলা হয়। এই পরিত্যক্ত দ্রব্যও বহুরূপ ব্যবহারে লাগাইবার চেষ্টা হইতেছে।

শস্যবীজে বহু বিশিষ্ট রসায়নিক যৌগিক পদার্থ আছে যথা সেলুলোজ, ষ্টার্চ, শর্করা, প্রোটিন্ ও তৈল। এগুলি শিল্প বাণিজ্যে বহুপ্রকারে ব্যবহার করা যায়। শস্য বীজের শাঁস হইতে রন্ধনোপযোগী তৈল ও রবারানুকল্প প্যারাগন প্রস্তুত হইতে পারে এবং তাহার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা গো-মহিষাদির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। গড়ে ১০ পালি শস্য হইতে ৵৷৹ অর্দ্ধসের তৈল পাওয়া যায়।

শস্যের ডাঁটা হইতে প্রায় উহার এক তৃতীয়াংশ অতি উৎকৃষ্ট সেলুলোজ প্রস্তুত করা যায়। ইহা হইতে উত্তম কৃত্রিম রেশম, চলচ্চিত্রের ফিল্‌ম্ ডামভিল ও ইলিনয়স্ সহরে বহুপরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে।

শস্যের শীষের সমস্তটাই ফেলিয়া দেওয়া হইত, এক্ষণে দেখা গিয়াছে যে উহাকে বদ্ধ পাত্রে খুব গরম করিলে উহা হইতে এক প্রকার চট্‌-চটে পদার্থ নিষ্ক্রান্ত হয়। তাহার দ্বারা বহু দ্রব্য প্রস্তুত করা যায়,—যথা কলের গানের রেকর্ড, ধূম পানের নল, Loud speaker ইত্যাদি। ইহা কার্ব্বলিক এসিডের ন্যায় সংক্রমদোষ-শোধক; অতএব ইহা অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হইতে পারে, মূল্যবান্ বৃক্ষের ক্ষত পরিষ্কারাদি কার্য্যে ইহা বড় উপকারক, কারণ ইহা কাষ্ঠের ভিতর অতি সহজে প্রবেশ করে। চুরুটের সুগন্ধিরূপে উহা ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহাতে বহু দ্রব্য গুলিয়া যায় এবং ইহা অতি সহজে পদার্থের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে অথচ বিশেষ বিষাক্ত নয়, এজন্য রঙের

দ্রাবকরূপে, বার্ণিশাদির ব্যবসায়ে এবং চর্ম্ম-সংস্কার-কার্য্যে খুব ব্যবহৃত হইতে পারে। ১ পালি শস্য হইতে ৵॥৵০ ছটাক এই দ্রাবক প্রস্তুত করা যায়। এই কার্য্যের জন্য আমেরিকার দুইটী কারখানাতে প্রতি দিন ২৮০০০০ পালি শস্য ব্যবহার হয়। এই দ্রাবক প্রস্তুত করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাতে—প্রোটিনাঢ্য খাদ্যোপাদান প্রায় সমস্তই থাকিয়া যায়। এই চট্-চটে দ্রব্যটীর সংস্পর্শ মক্ষিকা সহ্য করিতে পারে না, এজন্য মক্ষিকা-নিবারকরূপে ইহা আজ কাল বেশ ব্যবহৃত হইতেছে।

বীজ শাঁসের ভিতর এলবুমেন-জাতীয় পদার্থ আছে, তাহাতে ষ্টার্চ আছে। ইহা হইতে ধোপার কলপ এবং শর্করা প্রস্তুত করা যায়। এক পালি শস্য হইতে ৵১৮ এক সের তিন পোয়া কলপ হইতে পারে।

শস্তের আবাদে এই ডাঁটা ও শীষ সমস্ত উৎপন্ন ফসলের প্রায় তিন চতুর্থাংশ।

শস্যবীজের বহিরাবরণ হইতে ফাইটিন (phytin) পাওয়া যায়। ইহা স্নায়বিক দুর্ব্বলতার ভাল ঔষধ। ইহাতে প্রোটিনও প্রচুর আছে, এক পালি শস্য হইতে প্রায় ৵৮ তিন পোয়া প্রোটিন পাওয়া যায়।

মিসৌরীর অন্তর্গত সেণ্ট জোসেফ সহরে একটী কারখানা হইয়াছে, সেখায় গমের খড় হইতে তড়িৎ-অপরিচালক (insulating) তক্তা প্রস্তুত হইতেছে।

তুলার বিচি বিষাক্ত, এজন্য উহা অতি সযত্নে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এক্ষণে উহা হইতে বিষের উপাদান বাদ দিয়া উত্তম গো-মহিষাদির খাদ্য প্রস্তুত হইতেছে। ইহাতে কৃষক প্রতি বস্তায় প্রায় ৪০৲ টাকা তুলার দাম বেশী পাইতেছে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে এই সূত্রে দেশের মধ্যে ৪৫ কোটী টাকা উঠিয়াছিল। রসায়নবিদ্ পণ্ডিতগণ দেখিয়াছেন যে ইহা হইতে এক প্রকার এসিড্ প্রস্তুত করা যায়, উহা বেশ সস্তায় বিক্রী হওয়া সম্ভব।

কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত করোনা নগরে একটী কারখানা হইয়াছে। সেখানে পরিত্যক্ত নেবু হইতে, নেবুর তৈল, সাইট্রিক এসিড্ প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। পরিত্যক্ত আঙুর হইতে প্রচুর পরিমাণে সস্তায় মাদক-দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে।

পূর্ব্বে কৃষক কেবল মাত্র মানব উদর-পূরণের ব্যবস্থা করিত, এক্ষণে বড় বড় কারখানার উপাদান প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণের বিদ্যা-বুদ্ধির সাহায্যে আমেরিকায় কৃষক আবার ধনসম্পদে বিভূষিত হইবে সন্দেহ নাই।

নূতন বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ

আমেরিকায় মোটরবাস্

মোটরবাসের আরোহীরা সর্ব্বদাই ভাবেন যদি চাকা ফাটিয়া যায় তাহা হইলে কত বিলম্ব হইয়া যাইবে। হঠাৎ যখন দ্রুতগামী বাসের চাকা ফাটে, বাস-চালকও বিপদে পড়ে, কারণ চাকাটী হঠাৎ নামিয়া পড়ে এবং সে সময় গাড়ী খুব দ্রুত চলিলে গাড়ীর গতি-রেখা ঠিক রাখা খুব শক্ত হইয়া পড়ে এবং অনেক সময় দুর্ঘটনাও ঘটিয়া যায়। এই সকলের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমেরিকায় এক রকম নূতন চাকা ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাতে দুইটী খাঁজ কাটা, একটীতে ফাঁপা হাল (tire) ও অপরটীতে নিরেট হাল লাগান থাকে। নিরেট হাল রাস্তার একটু উপরে থাকে, অতএব যখন ফাঁপা হাল ফাটিয়া যায় গাড়ীর ওই দিক্‌টা অতি সামান্য নামিয়া পড়ে ও নিরেট হাল দিয়া গাড়ী রাস্তায় চলিতে থাকে।

সুরাসার

কাঠের গুঁড়া বরফ ঢাকা দিবার জন্য খুব ব্যবহার হয়; আর কোন বিশেষ কার্য্যে লাগে না। এক্ষণে উহা হইতে সুরাসার প্রস্তুতের চেষ্টা চলিতেছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে কলিকাতার কলগুলি হইতে বৎসরে যে গুঁড়া ফেলা যায় তাহা দিয়া ৩৭৫০০০ গ্যালন সুরাসার প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন কচুরী পানা প্রভৃতি দ্রব্যও ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা চলিতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-মন্দিরে পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে এক টন কাঠের গুঁড়া হইতে সলফিউরিক্ এসিডের সাহায্যে ৩৩ হইতে ৩৯ গ্যালন পর্য্যন্ত এবং হাইড্রোক্লোরিক্ এসিডের সাহায্যে ৪৮ হইতে ৫৭ গ্যালন পর্য্যন্ত সুরাসার প্রস্তুত হইতে পারে।

বৈদ্যুতিক মেঝে পরিষ্কারক

বৈদ্যুতিক মেঝে পরিষ্কারক

বৈদ্যুতিক মোটর দ্বারা ঘুরে। যন্ত্রটী হাল্‌কা এবং ইহার ব্যবহার খুব সহজেই করা যায়। কেবল মাত্র একটী সুইচ টিপিয়া মেঝের উপর গড়াইয়া লইয়া যাইতে হয়।

বৈদ্যুতিক গাছ-ছাঁটা কল

আজকাল তড়িতের সাহায্যে সমস্ত কার্য্য করিবার চেষ্টা চলিতেছে; বৈদ্যুতিক মোটর-চালিত একটী গাছ কাটিবার কল প্রস্তুত হইয়াছে। উহার ফলাটী প্রতি মিনিটে ৫০০০ বার ঘুরে এবং সহজেই শাণ দেওয়া যায়। কলটী ওজনে ৴২॥০ সের আন্দাজ হইবে। উহার হাতলে একটী সুইচ আছে। উহা টিপিয়া অতি সহজে এবং অতি শীঘ্র মনোমত গাছ ছাঁটা যায়।

বায়ু শীতলকারক যন্ত্র

সম্প্রতি ফ্রিজিডেয়ার করপোরেশন এক অভিনব যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রকৃতি-দত্ত অশান্তি দূর করিবার জন্য বিজ্ঞান উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এই যন্ত্র ১ম চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। ২য় চিত্রে উহার অভ্যন্তর দেখান হইতেছে উপরিস্থিত পাখা (ক, ২য় চিত্র) যখন ঘুরিতে থাকে তখন বায়ু তলদেশ হইতে যন্ত্রের ভিতর প্রবেশ করে এবং "খ"-চিহ্নিত শীতলকারী কুণ্ডলীগুলির ভিতর দিয়া যায়; এই সময় বায়ু শীতল হয়। এই শীতল বায়ু পাখার দ্বারা ঘরে প্রবেশ করে। প্রতি মিনিটে ৪৫০ ঘন ফুট বায়ু এই পাখার দ্বারা ঘরের ভিতর প্রবেশ করান যায়; এবং অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ১০০ উষ্ণতা কমাইয়া দেওয়া যায়। এই যন্ত্রটী ৪´ ফুট উচ্চ এবং ওজনে প্রায় ২॥০ মণ।

বায়ু শীতলকারক যন্ত্র

শ্যামলাল বসু মল্লিক
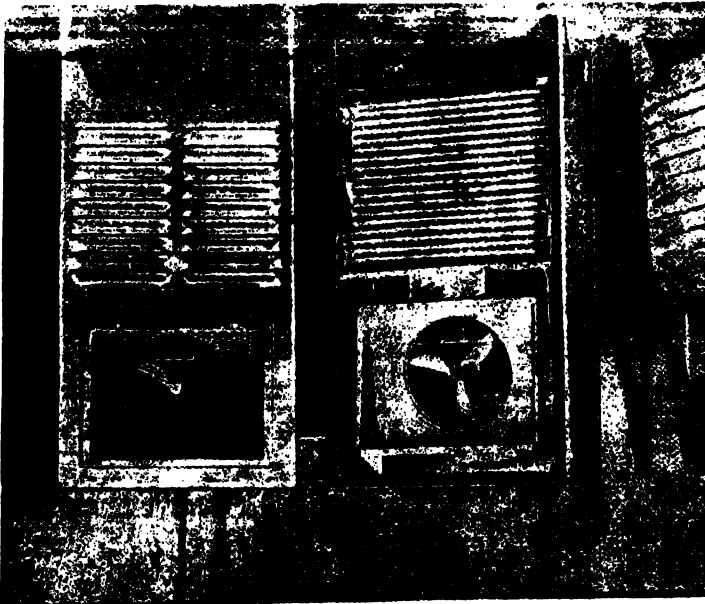
জগতের মধ্যে বৃহত্তম বাষ্পীয় রথ

নর্দান্ প্যাসিফিক্ রেলওয়ের জন্য আমেরিকান লোকোমোটিভ্ কোম্পানি একটী বাষ্পীয় রথ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার ৩৪টী চাকা আছে; তাহার মধ্যে ১২টীর উপর কয়লার গাড়ীটী স্থাপিত। ইহার ওজন জল ও কয়লা সমেত ১৭০০ মণের অধিক; ইহা ১৬',৪" উচ্চ ও ১২৫' লম্বা। অগ্নিকুণ্ডটী ২৮',৬" লম্বা ও ৯',৬" প্রস্থ। কয়লার গাড়ীতে ২২০০০ গ্যালন জল ও ২৭ টন কয়লা রাখিবার স্থান আছে।

জগতের মধ্যে বৃহত্তম বাষ্পীয় রথ

ইয়ুরোপে নবীনতা ও প্রাচীনতার সমাবেশ

[অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম-এ]

নূতন সভ্যতার নূতন আদর্শ ইউরোপের নানাদেশে নানাভাবে দেখা দিয়াছে সত্য, কিন্তু তবুও মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে প্রাচীনপন্থী ব্যক্তিবিশেষের বা ব্যক্তিসঙ্ঘের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। মহিলাদিগের নবীনতম বেশ-ধারণের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদের ক্ষীণ আভাসের ইঙ্গিত মাঝে মাঝে পাওয়া যাইতেছে তাহা সেই প্রাচীনতার প্রতি অনুরাগ বা রক্ষণশীলতারই নিদর্শন। সম্প্রতি এই রক্ষণশীলতার একটী চমৎকার কৌতুকোদ্দীপক বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। পুরাতন-বিধ্বংসী রুসের আদর্শের পার্শ্বে তাহা যেন এক অবিশ্বাস্য স্বপ্নরাজ্যের ঘটনা বলিয়া মনে হয়। রুস এখন ধর্ম্ম-ত্যাগ করিতে বসিয়াছে স্বর্গ হইতে ভগবান্‌কে নির্বাসিত করাই না কি তাহার সঙ্কল্প। এই সে-দিন মস্কোসহরে ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন সমিতির এক অধিবেশন হইয়া গেল। তাহাতে সর্ব্বসমেত আট শত প্রতিনিধি সমবেত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হইলেও তাঁহাদের বিশ্বাস তাঁহারা জনসাধারণের মধ্য হইতে ধর্ম্মের প্রভাব দূরীভূত করিতে পারিবেন। আবার লণ্ডন হইতে খবর আসিয়াছে—বিগত পার্লিয়ামেণ্টের নির্বাচনের সময় এক গির্জ্জায় নূতন ধরণের এক দল তপস্বিনীর (nun) অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে; তাহারা সকলেই ব্রতচারিণী—গির্জ্জার মধ্য হইতে প্রকাশ্যে বাহির হইবে না এই তাহাদিগের ব্রত। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আজ বিশ বৎসর যাবৎ এইরূপে সেই গির্জ্জার মধ্যে আপনাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদিগের ভোটগ্রহণের জন্য নিভৃতে তাহাদিগকে ভোট-গ্রহণ স্থানে আনিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য নবীন য়ুরোপে এই অতি প্রাচীন প্রথা সত্যই বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

আয়ুর্ব্বেদের মাহাত্ম্য

ভারতীয় সাহিত্য প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক আলোচনার ফলে বহু বিষয়ে ভারতের গৌরব আজ সমস্ত সভ্য-জগৎ একবাক্যে মানিয়া লইতেছেন। ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের এইরূপ গৌরব বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তির দ্বারা প্রমাণিত ও উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। ঔষধার্থে পারদের ব্যবহার ভারতেই সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়। অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় চিকিৎসাবিদ্যাও ভারত হইতেই আরবে নীত হয়। এ সকল বিষয় ইতঃপূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। সম্প্রতি Welcome Historical Medical Museumএর সম্পাদক জন্‌ষ্টোন্ সেণ্ট মহোদয় Royal Society of Artsএর ভারতীয় বিভাগে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে সংক্ষেপতঃ ভারতীয় চিকিৎসা-বিদ্যার কয়েকটী বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছেন। সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাতপূর্ব্ব না হইলেও পাঠকের রুচিকর হইবে বলিয়া এস্থলে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। তিনি বলিয়াছেন—"হার্বের জন্মগ্রহণের বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই হিন্দুগণ নরদেহে রক্তচলাচলের বিষয় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। হিন্দু অস্ত্র চিকিৎসকগণ নূতন কর্ণ ও নাসিকা প্রস্তুত কার্য্যে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। বুদ্ধদেবের চিকিৎসক জীবক বিশেষ দক্ষতার সহিত মাথার খুলির উপর অস্ত্র প্রয়োগ করিতে পারিতেন। হাঁপানী রোগে ধুতুরার ধূমপান ব্যবস্থা এবং পক্ষাঘাত ও উদরাময়ে কুচিলার প্রয়োগ-বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপেই ভারতীয়দিগের নিকট ঋণী। তুলার ব্যবহার সম্বন্ধেও অনেকাংশে সেই কথা প্রযোজ্য। হিন্দুদিগের লেখা হইতেও মনে হয় ধাত্রীবিদ্যা এবং বিশেষতঃ জননের পূর্ব্বকালীন চিকিৎসা সম্বন্ধে তাহাদের অতি সূক্ষ্ম ও চমকপ্রদ জ্ঞান ছিল।"

অবশ্য, কালক্রমে আমাদের মধ্যে যে সকল অবিসংবাদিত দোষ প্রবেশ করিয়াছে, বৈদেশিকদিগের প্রশংসায় মুগ্ধ হইয়া সেগুলির দিকে অন্ধ হইলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা সন্দেহ নাই।

মানব-মনের বৈচিত্র্য

(সঙ্কলন)

[অধ্যাপক শ্রীঅলোক সেন, এম-এস-সি]

মানসিক বিভিন্নতাই এখন মনস্তত্ত্বের প্রধান সমস্যা। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে "মানব মনোবৃত্তির অনুসন্ধান" প্রবন্ধে গাল্টন্ (Galton) মানসিক বিভিন্নতার কারণ কি এই প্রশ্নের সমাধান করিবার প্রথম চেষ্টা করেন—তিনিই বৈজ্ঞানিকদিগের ভিতর এই প্রশ্ন সর্ব্বপ্রথমে উত্থাপিত করেন। তার পর হইতে বিদ্যালয়ে, ব্যবসায়ক্ষেত্রে ও মনোবিজ্ঞান পরীক্ষাগারে এ বিষয় লইয়া আলোচনা সুরু হইল। আজকাল আমেরিকাতেই ২০০।৩০০ শত বৈজ্ঞানিক মানবের ব্যক্তিত্ব লইয়া অনুসন্ধানে ব্যস্ত আছেন এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদিগের পরিশ্রমলব্ধ আবিষ্কারগুলি সাধারণের যথেষ্ট ঔৎসুক্য আনিয়াছে।

এই আবিষ্কার যে অশ্রুতপূর্ব্ব ও কৌতূহলোদ্দীপক তাহা নিম্নলিখিত পরীক্ষিত সত্য হইতে সহজেই বুঝা যাইবে।

(১) 'ধীর অথচ নিশ্চিত', এবং 'ক্ষিপ্রতায় ক্ষয়', 'যে ধীরভাবে কাজ করে, তাহার ভ্রম হয় না' প্রভৃতি প্রবাদগুলি সত্য নহে। তবে এগুলি উত্তেজিত অবস্থায় দ্রুত কাজ করায় বটে।

(২) স্মরণ শক্তি যাহার আছে, বিচারশক্তি তাহার থাকিবেই।

(৩) অন্ধের শ্রবণশক্তি সাধারণ লোকের চেয়েও তীক্ষ্ণ নয়।

(৪) তাস খেলায় তাস মনে রাখিবার অভ্যাস যাহার আছে সে যে, লোকের নাম ও আকৃতি মনে রাখি.ব এমন কোন কথা নাই।

(৫) সবুজ থেকে লাল রং পৃথক করিতে শতকরা ৭৫ জন লোক পারে না। সাধারণতঃ স্ত্রী লাকের চেয়েও পুরুষদের এই দোষ বেশী।

(৬) ১৬ থেকে ২৫ বছর বয়সই শিখিবার ভাল সময়।

(৭) মানুষ যতই গুণবান্ ও কুশলী হউক না কেন তার মানসিক দোষ কিছু না কিছু থাকিবেই থাকিবে।

(৮) মস্তিষ্কের আকার ও পরিমাণের সঙ্গে ব্যক্তি-গত মানসিক শক্তির কোনও সম্বন্ধ নাই।

(৯) বিভিন্ন ব্যক্তির রক্তের রাসায়ণিক বৈসাদৃশ্যের সহিত মানসিক বৈসাদৃশ্যের বোধ হয় নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে।

(১০) ভোজনের পর যে ব্যক্তি ভাল বক্তৃতা দিতে পারে সে হয় তো ভাল চিঠি লিখিতে পারে না।

(১১) অপরে যতটা মনে করে, কলেজের অধ্যা-পকেরা ততটা বুদ্ধির ধার, ধারেন না।

(১২) কতকগুলি বিশেষ সুরের ধ্বনি ছাড়া কেউ কেউ খুব ভাল শুনিতে পায়।

(১৩) কোন কোন স্ত্রীলোকের ডান হাতে পুরুষ-দের চেয়ও তিনগুণ বেশী শক্তি আছে।

(১৪) সম্বন্ধহীন বালক-বালিকা অপেক্ষা ভাই-বোনের মানসিক সাদৃশ্য বেশী। ভাই-বোন অপেক্ষা আবার যমজের মানসিক সাদৃশ্য অনেক বেশী।

(১৫) পৃথিবীর দুইটী লোকের মানসিক গঠন সমান নহে।

(১৬) কোন ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ব্যক্তিগত বৈসাদৃশ্য উৎপাদন করিতে পারে বটে, কিন্তু ইহা তাহার কারণ নহে।

(১৭) সহরবাসী বালক-বালিকা অপেক্ষা পল্লীগ্রামের বালক-বালিকা শীঘ্র বাড়িতে থাকে।

(১৮) ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যে মানবের সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি বাড়িতে থাকে তাহা নয়; ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত এমন কি সময়ে সময়ে তার পরেও অনেকের সাধারণ বুদ্ধি বাড়িতে দেখা যায়।

(১৯) মানুষের অনুভব-শক্তি বয়সের সঙ্গে উন্নতি লাভ করে। ইহাতে সুবিধা অসুবিধা দুইই আছে। বয়-সের সঙ্গে যন্ত্রণা অনুভব করিবার শক্তি কমিয়া যায়।

(২০) পূর্ণবয়স্ক সাধারণ লোক অপেক্ষা কোন কোন শিশু সুরের সূক্ষ্ম তারতম্য বুঝিতে পারে।

(২১) বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক উন্নতি যে নিয়মিত ভাবে ও সমান ভাবে বর্দ্ধিত হয় তাহা নয়। এক বিষয়ে হয়ত উন্নতি হইল কিন্তু অন্য বিষয়ে কিছুই হইল না।

(২২) উচ্চাঙ্গের মানসিক উন্নতির পূর্ব্বে মানবের অনুভব শক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

(২৩) বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের কোষগুলি ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়।

(২৪) বয়সের সঙ্গে স্মরণশক্তি, মৌলিকতা ও ও অগ্রসর হইয়া কার্য্য করিবার শক্তি (initiative) ক্ষতি-গ্রস্ত হয়।

(২৫) অনেক পুরুষের অপেক্ষা সাধারণ স্ত্রীলোকের অনুভব শক্তি বেশী তীক্ষ্ণ। স্ত্রীলোকদের স্মরণ শক্তি সাধারণতঃ পুরুষদের অপেক্ষা বেশী।

(২৬) সাধারণতঃ বুদ্ধির অনুপাতে বালিকারা বালক অপেক্ষা অধিকতর মনীষাসম্পন্ন।

(২৭) স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষদের শক্তি বিভিন্ন হওয়া সম্ভব; অর্থাৎ পুরুষদের মধ্যে প্রতিভা ও "অবশ মস্তক" (numb-skull) বেশী পাওয়া যায়।

(২৮) সাদা চামড়ার লোক নিগ্রোদের অপেক্ষা বেশী বয়সে মস্তিষ্কের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

(২৯) বিশেষ বুদ্ধি না থাকিলেও লোকে যন্ত্র-চালিতের মত দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতে পারে।

(৩০) প্রতিভা ও বাতুলতার মধ্যে নিকট সম্বন্ধ নাই।

(৩১) পিতা মাতার বয়স শিশুর ভবিষ্যৎ ধীশক্তি নির্দ্ধারণ করে বলিয়া মনে হয় না।

(৩২) ক্ষুদ্র পরিবার অপেক্ষা বৃহৎ পরিবারের ছেলেরা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন হয়। বৃহৎ পরিবারেই কিন্তু প্রতিভাশালী ব্যক্তির জন্ম গ্রহণ করিবার সম্ভাবনা বেশী।

(৩৩) বংশের বড় ছেলে সাধারণতঃ বংশের বিশিষ্ট গুণের অধিকারী হয়।

(৩৪) কৃতী কৃষক অথবা রুটিওয়ালা হইতে হইলে শেষোক্ত কাজে বেশী বুদ্ধির দরকার হয়।

(৩৫) এক বিষয়ে কৃতী ব্যক্তি অন্য বিষয়ে সফল না হইতেও পারে। বিখ্যাত গণিতবিদ্ লাপলাস্ নেপোলিয়নের মন্ত্রীমণ্ডলীতে বিশিষ্ট পদের অধিকারী হইয়া অনুপযুক্ত প্রমাণিত হইয়াছিলেন।

*　　*　　*　　*

মনস্তত্ত্ব গবেষণায় প্রাপ্ত উপরোক্ত তথ্যগুলি হইতে বুঝা যায় যে মানবপ্রকৃতি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অনির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া থাকে।

এই পরিবর্ত্তনশীলতা ও বৈসাদৃশ্যের জন্য বৈজ্ঞানিকেরা মানব-প্রকৃতি-বিষয়ক গবেষণায় এত আমোদ পান।

পুরাকালের মনস্তত্ত্ববিদের অন্ধ বিশ্বাস ছিল যে, সকল মানুষই সমান এবং ঐ সকল বিশ্বাসেই অনেক মনস্তত্ত্বের বিধান প্রণয়ন করিয়াছেন। পুরাতন বিধানগুলির স্থলে, এখন এমন একটী বিধান চলিতেছে যে, দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তির মানসিক গঠন একেবারে সমান হইতেই পারে না।

প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজস্ব সত্ত্বা আছে আর সেটার জন্যে তাহাকে নিজেই যে নিয়ম গঠন করতে হবে সেটা মনে রাখা চাই কিন্তু সাধারণতঃ মানুষ তা না করে অনেক ক্ষেত্রে অপরের অনুকরণ করিতে ব্যস্ত। তাদের প্রধান কাজ হওয়া উচিত,—নিজেদের সত্ত্বা জানা এবং কাজে ও খেলায় নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করা।

অতএব

(গল্প)

[শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এল]

১

পাঁচ-সাত বৎসর নানা সভা করিয়া, বহু কাগজ পত্র লিখিয়াও যখন দেশের চেতনাকে দেশের কর্ত্তব্যের দিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিল না, তখন সহসা এক দিন অনিল বিবাহ করিয়া বসিল। বিবাহের মধ্যে একটু রোমান্স ছিল।

কাঁসাই-নদীর কূল ছাপিয়া ও-দিক্‌টা বন্যায় ভাসিয়া গেলে রিলিফ-সমিতির কার্য্য-ভার বহিয়া অনিল গিয়াছিল নন্দীগ্রামে; সেখানে রিলিফের কাজে কলিকাতার নারী-সভা হইতে সুনন্দা দেবী ভলান্টিয়ার আসিয়াছিলেন। সুনন্দা বি-এ ক্লাস অবধি পড়িয়া দেশের কাজে যোগ দিয়াছেন। রিলিফের কাজে আসিলেও তাঁর শান্ত নম্র ব্যবহারে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে, শত মহিলার মধ্যেও সুনন্দার এ বৈশিষ্ট্য অনিলের লক্ষ্য এড়ায় নাই। তার পর সম্প্রতি দলের মধ্যে দু'চার-রকম অশান্তি-উপদ্রবের সৃষ্টি হইলে অনিল আবার এক দিন বলিয়া বসিল—আমি ব্রতভঙ্গ করে ফিরে চল্লুম।

দু-চার জন প্রশ্ন তুলিল,—কি করবে ফিরে গিয়ে?

অনিল কহিল,—গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন ক'রব।

সকলে টিট্‌কারী দিল,—কাপুরুষ!

সুনন্দা দেবী আসিয়া নম্র বচনে কহিলেন—আপনি না কি চলে যাচ্ছেন?

অনিল কহিল,—হাঁ।

সুনন্দা দেবী নিমেষের জন্য চুপ করিয়া রহিলেন,—তার পর একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন, তার পর মুখ তুলিয়া মৃদু হাস্যে কহিলেন,—কোথায় যাবেন?

অনিল কহিল,—আপাততঃ বাড়ীতে। বোধ হয় বাড়ীর সঙ্গে নতুন করে পরিচয় স্থাপন করতে হ'বে।

মন টেঁকে, ভালো! না হ'লে বিপুল ধরণী-বক্ষে কোথাও উপনিবেশ স্থাপন করবো।

সুনন্দা দেবী আবার মুখ নত করিলেন। অতিকষ্টে একটা জবাবের সঙ্গে উদ্যত নিঃশ্বাস রোধ করিলেন।

অনিল সুনন্দা দেবীর পানে চাহিল,—সূর্য্যাস্তের সোণালি আভা সুনন্দা দেবীর মুখে পড়ায় চমৎকার তাঁর শ্রী ফুটিয়াছিল!

অনিল কহিল,—আপনিও চলুন না। এখানে এত দিন তো দেখলেন!

সুনন্দা দেবী কহিলেন—আমার যাবার স্থান নেই তো!

স্বর বড় করুণ; শুনিয়া অনিল সবিস্ময়ে কহিল—কেন?

সুনন্দা দেবী কহিলেন—মা বাপকে ছেলেবেলায় হারিয়েছি। এক মামা আমায় পড়াতেন—বি-এ পড়ার সময় তিনিও মারা যান্। সে সময় এদিক্ থেকে ডাক এল—আমিও ভবিষ্যতের কোন ঠিকানা না পেয়ে এধারে এসে পড়লুম—

অনিল কহিল—এসে এখানে ভবিষ্যতের কোনো ঠিকানা পেলেন?

সুনন্দা দেবী ধীরে ধীরে অনিলের পানে চাহিলেন—তাঁর চোখের পাতা কাঁপিতেছিল, মুখে লজ্জার রক্তিম আভা! অনিল দেখিল, ডাগর দুটী চোখ, কাজল-কালো তারা—আর সে চোখ বহিয়া রাজ্যের মিনতি যেন ঝরিয়া পড়িতেছে! সুনন্দা দেবীর মুখে কোন কথা ফুটিল না।

নন্দীগ্রামের তাঁবুর ধারে সেই এক অপরাহ্ণ-বেলার কথা মনে পড়িল—সেই শান্ত শ্রী, বেদনা-ভরা সেই করুণ দৃষ্টি অমনি চোখের সাম্নে ভাসিয়া উঠিল। সে ভাবিত, বোধ হয়, অনাথ গৃহহীনদের দুঃখে সমবেদনার ছায়া, তাই অমন করুণ! আজও আঁখির দৃষ্টি হইতে সে করুণ ছবি মুছিয়া গেল না?—এমন গাঢ় অতীত বেদনার সে স্মৃতি! এ করুণ দৃষ্টি-ভঙ্গীতে আজ অনিলের বুক দুলিয়া উঠিল। সে কহিল,—কিন্তু এখানে কি আপনি থাক্তে পারবেন? এই দলে?

সুনন্দা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না—না।

সুনন্দা দেবীর মনে পড়িল, এখানে ক'জন তরুণ তার প্রতি সহসা কি সুগভীর মনোযোগী হইয়া লাগিয়াছে, কোথাও বাহির হইবার সঙ্কল্প করিলে অমনি চারিদিক্ হইতে বিশ জন ছুটিয়া আসিয়া বলে—একলা যাবেন না—সঙ্গে যাচ্ছি। তাকে একলা দেখিলে, অন্তরঙ্গতার জন্য সব কতখানি লোলুপ হইয়া ওঠে! আর অনিল? তাকে দেখিলে চকিতে তারা সরিয়া যায়! তাই এই লোকটিকে দেখিয়া সুনন্দার ভয়াতুর মন এখানে থাকিবার সাহস সংগ্রহ করিয়াছে—সে অমন কত বার!

অনিল কহিল,—তা হলে আপনিও চলুন আমার সঙ্গে। আমার কাজে সাহায্য করতেও পারেন, অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

সুনন্দা দেবী আবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন। অনিলের দুই চোখে হাসির দীপ্তি! তিনি কহিলেন,—কি সাহায্য? বলুন।

অনিল কহিল,—মানে, আমি বৈরাগ্য ত্যাগ করছি। গার্হস্থ্য আশ্রমে—

সুনন্দা দেবী কহিলেন—এত দিন আপনার স্ত্রীকে দারুণ দুঃখে ফেলে রেখেছিলেন!

অনিল হাসিল, হাসিয়া কহিল—রামচন্দ্র! স্ত্রী কোথায় পাবো? স্ত্রী থাকলে তাকে দুঃখ দেবো, এ ধারণা আমার সম্বন্ধে আপনার হয়?

অপ্রতিভ ভাবে সুনন্দা দেবী কহিলেন—না, না—

অনিল কহিল—ধারণা যদি না হয়, তবে এটুকুও বিশ্বাস করতে পার্বেন বোধ হয় যে স্ত্রীকে আমি কোন দিনই দুঃখ দেবো না।

এ কথার অর্থ? সুনন্দা দেবীর বুকের মধ্যে কিসের একটা তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল।

অনিল কহিল—যদি অনুমতি পাই, তা হলে নিবেদন ..

সুনন্দা দেবীর বুক কাঁপিল।

অনিল কহিল—আপনার যদি আপত্তি না থাকে, মানে, আপনাকে পত্নীত্বে বরণ করবার সৌভাগ্য আমার—পায়ের নীচে মাটীটা হঠাৎ বিষম বেগে দুলিয়া উঠিল। সুনন্দা দেবী টলিয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন, অনিল হাত ধরিয়া ফেলিল।

সুনন্দা দেবী লজ্জা-রক্তিম মুখে মৃদু স্বরে কহিলেন—ছাড়ুন। আমার মাথা কেমন ঘুরে গেছলো!

অনিল হাসিল, হাসিয়া কহিল—সেক্সপীয়র পড়েছেন? কালিদাসও পড়েছেন, নিশ্চয়! এক্ষেত্রে দু' জনের যা psycho-physiology, তাও মেলে।

সুনন্দা দেবী প্রশ্ন-ভরা দৃষ্টিতে অনিলের পানে চাহিলেন।

অনিল কহিল—আপনাকে এখানে একা ফেলে গেলে আমার দুশ্চিন্তা কোন দিনই দূর হবে না। আবার আমার পক্ষেও গার্হস্থ্য আশ্রমে সঙ্গিনী বন্ধু বলে নতুন কোনো অপরিচিতাকে এ-বয়সে গ্রহণ করা কঠিন হবে। অতএব যদি আদেশ করেন...

সুনন্দা দেবী কোনো জবাব দিলেন না। ব্রতভঙ্গের কল্পনা কোনো দিন যদি তাঁর মনে জাগিত, তাহা হইলে এ লোকটিকে এখানে রাখিয়া যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব হইত! এই লোকটিই তাঁকে এ ব্রতে শক্তি যোগাইয়াছে। ইহাকে ছাড়িয়া এখানে থাকিয়া ব্রতপালন করা চলিবে কি না, সন্দেহ! অতএব—

২

বিবাহ হইল ভবানীপুরের পৈতৃক বাড়ীতে। খবরের কাগজে এ বিবাহ লইয়া স্বপক্ষে ও বিপক্ষে উভয়-বিধ আলোচনার ত্রুটি ঘটিল না। তার ফলে বিবাহের পরই বর ও বধূ পক্ষের বহু বন্ধু ও বান্ধবী আসিয়া বর-বধূকে অভিনন্দন করিল।

অনিলের বন্ধু সতীনাথ কোথায় ছিল সুদূর গেঁয়োখালিতে। সেখানে ক'বৎসর ধরিয়া ধীবর সম্প্রদায়কে লইয়া স্কুল-পাঠশালা খুলিয়া তাদের বুদ্ধিবৃত্তি-বিকাশে সে পরম যত্ন লইতেছিল। যখন কলেজে পড়িত, তখন এক প্রোফেসরের সঙ্গে তর্ক মাত্রা ছাপাইয়া হাত-হাতিতে পরিণত হয় এবং তারি ফলে 'রাষ্টিকেট' হইয়া সতীনাথ বিশ্ববিদ্যায় ইস্তফা দেয়। গেঁয়োখালিতে পৈতৃক ভিটা ছিল; তার সংস্কার করিয়া সেইখানেই সে বসিয়া গিয়াছে। খবরের কাগজে হাঁকডাক জাহির করে নাই, নিঃশব্দে কাজে লাগিয়াছে।

[illegible] আমি ভেবেছিলুম, দ্বীপান্তরে আছ, বুঝি! তা হঠাৎ মনে পড়লো যে!

সতীনাথ কহিল,—তুমি বিয়ে করচো, খপরের কাগজে দেখলুম। খপর পড়ে প্রথমটা অবাক্ হয়ে গেছলুম! ভাবলুম, বাজে কথা! তার পর মন বেজায় চঞ্চল হয়ে উঠলো! ভাবলুম, দূর-ছাই, দেখেই আসি। তা love at first sight—না কি?

অনিল হাসিয়া কহিল—Love at last sight বরং। অর্থাৎ যা করছিলুম, ভালো লাগলো না। ভালো ঢের করা যায়—তবে গর্জ্জন যত হয়, বর্ষণ তার অনুরূপ নয়। ঘটা খুব, দুঃখ এই যে ঘটার শিকিও ঘটনা ঘটে না। তা যাক্। আমার গৃহ-লক্ষ্মীর সঙ্গে আলাপ করো, খুশী হবে।

সতীনাথ কহিল,—বহুৎ আচ্ছা!

অনিল ডাকিল—সু—

সুনন্দা দেবী আসিলেন, আসিয়া কহিলেন—আমার এক বান্ধবী—

অনিল কহিল,—এসেছেন? বেশ। ইনি হচ্ছেন আমার বন্ধু, সতীনাথ। আমরা আশৈশব এক সঙ্গে দুটীতে বেড়ে উঠছিলুম—কথা, কাজ, সব একসঙ্গে বরাবর। তার পর উনি গেলেন গেঁয়োখালিতে, আর আমি পূর্ব্ববঙ্গে—

সুনন্দা দেবী সতীনাথকে নমস্কার করিলেন, কহিলেন,—আমাদের ভুলে যাবেন না।

সতীনাথ কহিল—নিজের চিন্তাও অনেক সময় ভুলেচি কিন্তু অনিলকে এক মুহূর্ত্ত ভুলি নি।

সুনন্দা দেবী কহিলেন—আমায় একটু ক্ষমা করবেন—আমার এক বান্ধবী—মিস্ নীতি সেন—মস্ত লিখিয়ে—নাম শুনেচেন বোধ হয়! ডেকে আনি—আলাপ-পরিচয় হোক!

মিস্ নীতি সেন আসিলেন। সুনন্দা দেবী পরিচয় করাইয়া দিলেন,—মিস্ নীতি সেন—

নীতি সেন কহিলেন—না, মিস্ নয়। শুধু নীতি। নীতি দেবীও চলতে পারে। মিস্ সেন বিলাতী—কাজেই আমার পছন্দ নয়।

সতীনাথ কহিল—আপনি লেখেন! নারী-জাগরণ সম্বন্ধে বুঝি?

সতীনাথের অপরাধ নাই। নীতি সেনের বেশ-ভূষা এমনি ব্যাপারের আভাষ দিতেছিল!

বাধা দিয়া নীতি সেন কহিলেন—মাপ করবেন। প্রথমে ওই নিয়ে লেখা সুরু করি। কিন্তু কাকে জাগাবো? আমাদের দেশে নারী ক'জন আছে? আঙুলে গোণা যায়—বাকী সব কাঠের পুতুল! মন নেই, প্রাণ নেই,—নিজেদের সত্বার কোনো পরিচয় জানে না, জানতে চায় না! তাদের জন্য খেটে মরা মিছে!

সতীনাথ অবাক্! অনিল স্তম্ভিত! নারী-বেশধারিণী এ যে সাক্ষাৎ অগ্নিশিখা! মিস্ মেয়োও বোধ হয় এত চড়া সুর তুলিতে পারে নাই!

সুনন্দা দেবী কহিলেন—এখন ইনি গল্প-উপন্যাসে যে হাত দিয়েচেন।

নীতি সেন কহিলেন—উদ্দেশ্য নিয়ে লিখচি। নারী আর পুরুষ দু-জনে এমনি দেখা হলো, অমনি প্রেমের সঞ্চার, তার পর হয় বিবাহ, নয় দীর্ঘনিঃশ্বাস—সে সব পচা কাহিনী নয়। মনস্তত্বের গভীর গবেষণা—আপনারা নিশ্চয়ই বেনাভেন্ত, গর্কি, ন্যুট হ্যামসন পড়েচেন?

সতীনাথ কহিল—পড়েচি। ইংরাজিতে যখন তর্জ্জমা মেলে, এবং ইংরাজী ভাষাও একটু-আধটু যখন জানি, তখন—

নীতি সেন কহিলেন—বেশ। তা হলে আমার উপন্যাস-গুলো পড়বেন ছাপা হলে। তাও বুঝতে পারবেন। অর্থাৎ আমি আপনাদের বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মত ছেলে ভুলোনো গল্প নিয়ে কারবার করতে চাই না। আমার এ উপন্যাসে যে সব নর-নারীর কথা বলচি, তাদের হয়তো আজকের বাঙলা দেশে দেখতে পাবেন না—এরা অনাগত কালের জীব—পাঁচশো বছর পরে যারা এই বাঙলা দেশে জন্মাবে, তাদের মনস্তত্বের পরিচয় পাবেন আমার বইয়ে।

অনিল ও সতীনাথ—দু জনেরই চক্ষুস্থির! বহু আশ্রমে ঘুরিয়া তারা বহু চরিত্র দেখিয়াছে—কিন্তু এমন—?

সুনন্দা দেবী কহিলেন—বিবাহ—ইনি বলেন, দুর্ব্বলের একটা বাজে ওজর! বিবাহের কোনো প্রয়োজন কারো থাকতে পারে না!

সতীনাথ কহিল—ঠিক! আমিও ঐজন্য বিবাহ করিনি। আর করবো বলে এখনো মনে হয় না!;

নীতি সেন কহিলেন—That's right. নর-নারী এমন কোনো সূত্রে আবদ্ধ হতে পারে না, যার দরুণ তার নিজের ব্যক্তিত্ব কোথাও একটু খর্ব্ব হয়! বিবাহ চিত্তে ক্ষুদ্রতা এনে দেয়। পরস্পরের মনে সামঞ্জস্য করতে হলে বহু কাটছাঁট করতে হয়; সমগ্র মনটি নিয়ে কেউ বাস করতে পারে না—তা কি স্বামী, কি স্ত্রী—

সতীনাথ কহিল—নিশ্চয়! স্বামী হয় তো বললেন—ওগো চলো আজ জু দেখতে। স্ত্রীর হয় তো তখন সাধ হয়েচে ইডন্ গার্ডেনে যেতে কিংবা ফুটবল ম্যাচ দেখতে। দু'জনে দু'দিকে গেলে মান-অভিমান রাগ-বিরাগ—এক জন যদি অপরের মতে সায় দিলেন, তা হলেই তো তাঁর ব্যক্তিত্ব সেখানে খর্ব্ব হলো!

নীতি সেন কহিলেন—আমারো ঐ মত। তা আমি তাই নন্দাকে বলছিলুম, মাস চারেক এখানে থাকবো। বিবাহিত জীবনটা কি—তার প্রতি নিমেষ আমি প্রত্যক্ষ করতে চাই। নারী আর পুরুষের মনে পলে পলে কি পরিবর্ত্তন আসে—কে কাকে উঁচিয়ে যায়! তার সুবিধা এখানে যেমন মিলবে, এমন আর কোথাও নয়। কারণ, নন্দাকে আমি দশ-বারো বছর ধরে জানি।

অনিল সতীনাথের পানে চাহিল, তার দৃষ্টির মধ্যে বহু প্রশ্ন জল্ জল্ করিয়া উঠিল! সতীনাথ তা লক্ষ্য করিল এবং বুঝিল; বুঝিয়া সে চোখের দৃষ্টিতেই ভরসা দিল, মাথা খারাপ করো না, বন্ধু! নীতি সেন আবার কহিলেন—তা ছাড়া নন্দাকে পেয়েচি বহুকাল পরে। ওর এই অনভ্যস্ত প্রথম বিবাহিত জীবনে হয় তো নন্দা তার বান্ধবীকেও পাশে চাইতে পারে—কাজেই, আমি স্থির করেচি, কিছুকাল এখানে থেকে যাবো!

অনিল কহিল—আপনার অনুগ্রহ! তবে আমার একটু নিবেদন আছে—

নীতি সেন কহিলেন—বলুন—

অনিল কহিল—আমরা দুজনে পরামর্শ করে স্থির করেছি যে দিন দশ-পনেরোর মধ্যেই আমরা পুরী যাবো। এই সহরের বদ্ধ বায়ুর চাপে আমাদের প্রথম জীবনের স্বপ্নগুলো পাছে [illegible]

নীতি সেন কহিলেন—চমৎকার! Just the idea! আমিও ঐ রকম একটা কোনো suggestion করবো, ভাবছিলুম! সে বেশ হবে। দশ-পনেরো দিন পরে তো—? আমার এদিক্‌কার পাবলিশারের সঙ্গে কতকগুলো কথা শেষ করে ফেলা দরকার, সেগুলো তা হলে সেরে নি ইতিমধ্যে। তার পর এক সঙ্গেই পুরী যাত্রা করা যাবে। বাঃ, আপনাকে ধন্যবাদ অনিলবাবু! আপনি আমার মনের কথা টেনে বলেচেন।

সুনন্দা লক্ষ্য করিলেন এ ব্যাপারটা অনিলের খুব মনঃপূত হয় নাই? তিনি তো জানেন, অনিলের কি-সব প্ল্যান আছে। তিনি কহিলেন,—এসো নীতি, দু-জনে একত্র হয়েচি, অনেক কথা জমে আছে। ওঁরাও ততক্ষণ গল্পটল্প করুন! তা হ'লে আমরা আসি সতীনাথ বাবু।

সতীনাথ কহিল—বেশ।

সুনন্দা ও নীতি চলিয়া গেলেন। সতীনাথ অনিলকে ঠেলা দিয়া কহিল—কি ভাবচো, বন্ধু?

অনিল একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—এ কি আপদ আবার!

হাসিয়া সতীনাথ কহিল—রবিবাবুর কবিতা মনে পড়চে,

ঐ আসে, ঐ ভৈরব হরষে—

অনিল কহিল—তোমাকে ছাড়চি না তা হ'লে। ঐ অনাগত পাঁচশো বছর পরের মনস্তত্ত্ববিদের পাল্লায় পড়লে আমাদের সব সোনার স্বপ্ন টুটে যাবে। তুমি থেকে যাও, বন্ধু—বন্ধুর কর্ত্তব্য করো।

সতীনাথ কহিল—এখন কিছুকাল বন্ধুকে ভালো লাগবে না ভাই! বিবাহের প্রথম আঘাত লাগে এসে বন্ধুত্বের গায়। দুটীতে এখন অখণ্ড মিলনে বিভোর থাকবে। তার মধ্যে বন্ধু এসে ডাকাডাকি করলে মিলনের রাগিণী চূর্ণ হয়ে যাবে, মনে বিরোধ জাগবে। আগে এ জীবনের মাধুরী কিছু সঞ্চয় করো, তখন বন্ধুকে প্রয়োজন হবে, সে সব কাহিনী শোনাবার জন্য—

অনিল কহিল—কিন্তু ওই নীতি সেন—

সতীনাথ কহিল—পুরী যাও। ইনি সঙ্গে যেতে চাইলে—মানা করো না বান্ধবীর মনে আঘাত লাগবে। তার পর প্রয়োজন বোধ করো, চিঠি দিয়ো,—যাবো।

অনিল কহিল—বেশ, এই কথাই রইলো তা হ'লে?

সতীনাথ কহিল—রইলো।

৩

পাঁচ-ছ'য় মাস পরের কথা।

সকাল বেলা পুরীর সমুদ্রতীরে একা বসিয়া অনিল,—বোধ হয় সমুদ্রের ঢেউ গণিতেছিল।

সতীনাথ আসিয়া ডাকিল,—অনিল—

অনিল চমকিয়া চাহিয়া দেখে, বন্ধু সতীনাথ। সে কহিল,—এসেচো? আঃ, কোথায় এসে উঠলে?

সতীনাথ কহিল,—কাল রাত্রে এসে ভিক্টোরিয়া বোর্ডিংয়ে উঠেচি।

অনিল কহিল,—কেন? বাঃ, আমার আস্তানা থাকতে—

সতীনাথ কহিল—এখন তোমার জীবনে এক নতুন অঙ্ক সুরু হয়েচে, বলেচি না? এখন বাহিরের কোন কলরব ঘরে এনো না। ছোটখাট মান-অভিমান, প্রণয়ের সহস্র লীলা—তৃতীয় ব্যক্তির সান্নিধ্য তার মধ্যে মস্ত বিরোধ আনবে।

অনিল কহিল—তা কেন! এই তো নীতি সেন এখানে এসে রয়েচেন।

সতীনাথ আশ্চর্য্য ভঙ্গীতে কহিল,—এসে রয়েচেন! তা হলে কথামত কার্য্য করেচেন তিনি, দেখচি! ভালো!

অনিল কহিল—তা, তিনি বেশ লোক। এত পড়া-শুনা আছে—সত্যি! স্ত্রীলোক যদি লেখাপড়া ভালো করে শেখেন, তা হ'লে—

সতীনাথ কহিল—থাক্, কপচানির এক্‌তিল অবসর ঘটতে দেন না—যা বলচো, তার ভাবার্থ এই তো?

অনিল কহিল—না—না—না।

সতীনাথ কহিল—ভাবার্থ থাক্। তুমি একা বসে যে? শ্রীমতীকে পাশে দেখচি না—এই সাগরাম্বুরাশির উদ্দাম নৃত্য—এর গানের তালে তাঁর "কণ্ঠের"স্বরটুকু—

অনিল কহিল—তিনি তাঁর বান্ধবীর সঙ্গে কি সব আলোচনা করচেন। সকালেই ওঁদের আলোচনা জমে উঠেচে, দেখে এলুম। নীতি সেন তাঁর উপন্যাসের চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ শেষ করেচেন কাল রাত্রে; তাই নিয়ে কি সব মনস্তত্ত্বের আলোচনা সুরু হয়েচে।

সতীনাথ কহিল,—ন চ শুভসূচিতমেতৎ! বিবাহের এই পঞ্চম মাস—এ সময় এমন রমণীয় স্থানে দু'জনের দু দিকে অবস্থান—এ যে পাঁচ বছর পরে ঘটবার কথা না! —আমার কথা শোনো বন্ধু—মধুযামিনী যাপনের জন্য বিজনবাসেই যখন আশ্রয় নিয়েছ, তখন ওঁর বান্ধবীকে সঙ্গে এনে ভালো করো নি!

অনিল কহিল,—না না, নীতি সেনের উপস্থিতিতে আমাদের সময় বেশ আনন্দেই কাটচে। একটা বৈচিত্র্য! তা ছাড়া প্রিয়া কি বলেন, জানো? সতীনাথ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অনিলের পানে চাহিল।

অনিল কহিল,—বলেন বিবাহ করেচি বলে বন্ধু-বান্ধবকে ত্যাগ করবো কেন!

সতীনাথ হাসিল, হাসিয়া কহিল,—there's the rub কিন্তু যথার্থ বলো তো—তোমার চিত্তাকাশে একখণ্ড মেঘের উদয় হয়েচে কি না? যখন তুমি প্রিয়ার সান্নিধ্য-কামনায় আকুল, তখন এসে দেখলে যে তিনি নীতি-সেনের সঙ্গে দার্শনিক আলোচনায় প্রমত্ত?

অনিল উদাস-নেত্রে সুদূর অসীম সাগরের পানে চাহিয়া রহিল,—এ কথার কোনো জবাব দিল না।

রৌদ্র বাড়িতেছিল। নুলিয়ারা আসিয়া বারবার বিরক্ত করিতেছিল,—স্নান করিবে না?

অনিল কহিল,—চলো আমার ওখানে। দেখা করবে না তোমার বান্ধবীর সঙ্গে?

সতীনাথ কহিল,—চলো।

দু'জনে উঠিল। কাছেই 'সুনীল-সায়র' বাঙলায় অনিলের আস্তানা। বাঙলায় ঢুকিয়া সতীনাথ দেখে, সামনের বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া দুই সখী। সামনে গোল টেবিলের উপর একরাশ কাগজ ও বই। নীতি সেন তখন শেকভের কথা বলিতেছেন—মাঝে মাঝে টুর্গেনিভের নামটাও সেই সঙ্গে—

সতীনাথ বিরক্ত হইল। সেই কবে পড়া স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের লাইনটা অকস্মাৎ মনে জাগিল—পুরুষ জ্যাঠা সহ্য যায়, মেয়ে জ্যাঠা বড় বালাই!

বাঙালীর মেয়ে দিবারাত্র শেকভ বেনাভেন্ত্ লইয়া থাকিবে! আর কি কোনো কথা নাই? এই যে স্বরাজ লইবার জন্য দেশের লোক ভাবিয়া সারা হইয়া যাইতেছে,—ডায়ার্কির মাকাল ফল গ্রহণ করিতে বিরূপতায় সকলের প্রাণ ভরিয়া গেল—সে সম্বন্ধে নয় একটা কথা তোলো! তা না—কেবলি শেকভ, বার্গশঁ, ইবশন, বেনাভেন্ত্, হ্যামশন্! এদের বাদ দিয়াও সংসার বেশ চলিতে পারে তো! সতীনাথকে দেখিয়া সুনন্দা দেবী অভ্যর্থনা করিলেন, কহিলেন,—কখন এলেন?

সতীনাথ অভিবাদনান্তে জবাব দিল—কাল রাত্রে।

সুনন্দা দেবী কহিলেন,—কোথায় এসেচেন?

অনিল কহিল,—ভিক্টোরিয়া বোর্ডিংয়ে।

সুনন্দা দেবী অভিমানের সুরে কহিলেন,—আমাদের এখানে কি আপনার এত বেশী কষ্ট হতো যে,—

সতীনাথ কহিল,—অত্যন্ত আরাম হতো—মানি। সেটা হয় তো সহ্য হতো না। তাই—তাছাড়া চলতি একটা প্রবাদ আছে—একে নিদ্রা, দুয়ে পাঠ, তিনে গোল, চারে হাট! তা তিনে গোল বেশ হচ্ছে, দেখচি—আমি এসে জুটলে চার পূর্ণ হ'য়ে একটা হাটের পত্তন হবে যে! কথাটা বলিয়া সতীনাথ হাসিল।

এ কথার শেষটুকু অনিল বুঝিল, সেও হাসিল! সুনন্দা দেবী বুঝিলেন না, কাজেই চুপ করিয়া রহিলেন। নীতি সেন কহিলেন,—আসুন সতীনাথবাবু, আমরা এক মস্ত সমস্যা নিয়ে পড়েচি—দেখুন তো আপনি যদি—

সতীনাথ কহিল,—মাপ করবেন, সমস্যা দেখলে চিরদিন আমি দূরে সরে যাই। বরং অনিলকে ধরুন—দেশের বহু সমস্যা নিয়ে ও বহু কাল বহু চর্চ্চা করেচে—

ঠোঁট ফুলাইয়া অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়া নীতি সেন কহিলেন,—তবেই হয়েচে!

অনিল কহিল, সতী এখানে এসেই থাকবে, সু—

সুনন্দা দেবী কহিলেন,—নিশ্চয়।

সতীনাথ কহিল,—কিন্তু—

অনিল কহিল,—এর মধ্যে কিন্তু নেই!

সুনন্দা দেবী কহিলেন,—থাকতে পারে না। তাছাড়া নীতি—এঁর সঙ্গে কথা কয়ে প্রচুর আনন্দ পাবেন। ইনি কাল এঁর 'হতাশ্বাসের হতাশা' উপন্যাসের চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ শেষ করেচেন। তার মধ্যে এত কথা, এত তর্ক তুলেচেন—

নীতি সেন কহিলেন,—কথা তোলা কি—আমি

কারাকক্ষে আয়েষা ও জগৎসিংহ : —দুর্গেশনন্দিনী।

রবীন্দ্রনাথের ethics একদম উল্টে দেবো। জোলা, ইবসেন্ কত বড় ধাপ্পা চালিয়ে গেছেন, সে সব ধরিয়ে দেবো।

কথা শুনিয়া সতীনাথ স্তম্ভিত! অনিল হতাশভাবে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

নীতি সেন কহিলেন,—আমরা ঘরে যাই চলো নন্দা— এঁরা কথাবার্ত্তা কবেন। আমাকে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদটা আজ লিখতেই হবে। তোমার সঙ্গে আলোচনা শেষ করে—

সুনন্দা দেবী মিনতি-ভরা দৃষ্টিতে সতীনাথের পানে চাহিলেন, এবং বিনীত স্বরে কহিলেন,—আমায় একটু মাপ করবেন, সতীবাবু। আপনি বোধ হয় বুঝতে পারচেন কি মস্ত কাজ আমি হাতে নিয়েচি। নীতির এ পরিচ্ছেদটুকু সুরু হলেই—আপনারা দুজনে ততক্ষণ একটু গল্প-সল্প করুন।

সতীনাথ কহিল—বেশ।

সুনন্দা দেবী টেবিলের উপর হইতে কাগজ-পত্র গুটাইয়া লইয়া ঘরের মধ্যে গেলেন, নীতি সেনও সেই সঙ্গে।

অনিল কহিল—ব্যাপার তো চক্ষে দেখলে। সু-কে যাদু করেচে যেন! কিন্তু এ কিসের মোহ? ছাই-পাঁশ লিখতে চাও, নিজে লেখো গে! সঙ্গে সঙ্গে সুকে টানো কেন?

সতীনাথ কহিল—সমুদ্রতীরে তোমায় একলা দেখে এবং নীতি সেন এখানে ডেরা নিয়েচেন শুনে আমি এর আভাস কতক যেন অনুমান করেছিলুম!

অনিল কহিল—আমায় উনি ভাবেন, একদম বর্ব্বর, বুনো! কি অবজ্ঞার চোখেই দেখেন! কারণ ওঁর লেখায় আমি কোনো উৎসাহ দেখাই না, এতটুকু চাঞ্চল্য তুলি না মনে! আগে আমাকেও পড়াতেন—আমি হাই তুলতুম। শুধু তো শোনা নয়, তর্ক চাই, তারিফ চাই। তর্ক জিনিষটা আমার ধাতে মোটেই সহ্য হয় না; তা ছাড়া ওঁর কি মত জানো, আমাদের মত নির্ব্বিকার পুরুষরা অর্থাৎ যারা লেখে না, এবং ওঁদের লেখার তারিফ করে না, তারা কুকুর-বেড়ালের সামিল! এখন বুঝচি না, কি [illegible] এ নাটকের যবনিকা পাত হবে অথচ যবনিকার [illegible] দেবী [illegible] বুঝচি।

সতীনাথ কহিল—কিন্তু একটু আগে তুমি যে তারিফ করছিলে—

অনিল কহিল—পাছে শুনে তুমি ভড়কে যাও, এবং এখানে না আসো, তাই। এখন তুমি এসেচো যখন, আমার গৃহটিকে শান্তির নীড় করে তোলো ভাই! সু-ও থেকে থেকে কি মিনতি-ভরা করুণ দৃষ্টিতে চায় আমার পানে, যেন সে কত বড় অপরাধী—অবশ্য নীতি সেনের অসাক্ষাতে! কিন্তু সে অবসরও মেলে খুব অল্প। বন্ধু-বান্ধবীর আগে কি স্বামীর স্থান নয়?

সতীনাথ কহিল—আমাদের দেশাচার তো তাই বলে। তবে, যদি হালের কথা ধরো—জানি না।

অনিল কহিল—বাজে কথা যাক্! সে দিন আমি একটা গান ধরে ছিলুম—গলা বা সুর আমার প্রতি সদয় নয় জানি, তবু মনে কেমন আনন্দ জেগেছিল, তাই! অমনি নীতি সেন এসে সগর্জ্জনে জানিয়ে দিলেন আমার বিশ্রী বেতালা আওয়াজে তাঁর নায়িকার চিন্তার খেই কেটে গেছে! সত্যই যদি তা কেটে থাকে, ও-ভাবে তা বলা কি উচিত ছিল? উনি আমার অতিথি। একটু "ভদ্রভাবে"—তার উপর চব্বিশ ঘণ্টা মুখের বুলি, শেকভ্ আর ইবশেন আর গ্যতিয়ে, আর রোমা রোলাঁ—

সতীনাথ কহিল—ওঁবা ভাবেন, শেকভ, ইবশেন ওঁরাই শুধু পড়বার সুযোগ পেয়েচেন! বিলাতী পাবলিশারদের কল্যাণে ইবশেন-গ্যতিয়ে যে আমাদের ঘরে ঘরে মাথায় বুকে ঢুকেচেন্ সেদিকে খেয়ালও থাকে না। তা তুমি রাগ করচো? আমার কিন্তু ভারী কৌতুক বোধ হচ্ছে।

অনিল কহিল—কারণ, তুমি আমার অবস্থায় পড়োনি—

আহারের সময় নীতি সেন ইবসেন লইয়া কথা তুলিলেন। Doll's Houseটা কি? না, নারী পুতুল মাত্র, পুরুষের হাতে খেলার বস্তু! বিবাহ করিয়া পুরুষ ঘর পাতে, আর সে ঘরে তার খেলা চলে নারীকে লইয়া। যেন নারীর প্রাণ নাই, মন নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই! নোরা তা বুঝিল, বুঝিয়া চলিয়া গেল। ছেলেপিলের ভার লইল না। কেন লইবে? ছেলেমেয়ে তো পুরুষের খেয়ালের বস্তু মাত্র।

সতীনাথ কহিল,—মানি না আমি। মাতৃস্নেহ বস্তটা তবে কি? যার বুকে অত-বড় নিঃস্বার্থ স্নেহ—মা স্বামীকেও অত ভালোবাসেন না, যত বাসেন ছেলে-মেয়েকে। সে স্নেহ…? যার পাশে নিজেকে একেবারে ছেটে ফেলেন?

নীতি সেন কহিলেন—ভুল! মাতৃস্নেহ কুসংস্কার মাত্র, অন্ধ কুসংস্কার। বিবাহ যদি কোন নারী একটা ভুলের বশে দৈবাৎ করে ফেলে তো তার উচিত মাতৃত্বের অধীন হয়ে দ্বিতীয় ভুল যেন না করে! মাতৃত্ব-প্রতিরোধ করাতেই তার সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব।

সতীনাথ জলিয়া উঠিল, কহিল—মাপ করবেন মিস্ সেন—

নীতি সেন বলিলেন—মিস সেন নয়। নীতি সেন বলবেন।

সতীনাথ কহিল—বেশ, নীতি সেনই। তা শুনুন, মাতৃত্ব প্রতিরোধ করার নাম জাতি-হত্যা। এত-বড় কুকথা আপনি প্রচার করতে চান? তাই নিয়ে উপন্যাস লিখচেন?

নীতি সেন কহিলেন—নিশ্চয়। নারীর সত্তা, নারীর হক, এ আমি জোর গলায় প্রচার করবো। আজ লোকে না শুনতে পারে—কিন্তু পাঁচশো বছর পরে—

সতীনাথ হাসিল, হাসিয়া কহিল—মাতৃত্ব-প্রেতিরোধ মন্ত্র লোকে নিলে পাঁচশো বছর পরে এই সুবিশাল বিশ্ব-ভূমি সাহারা মরুভূমিতে পরিণত হবে। আপনার উপন্যাস পড়ে আনন্দ-লাভের সৌভাগ্য-অর্জ্জনে পাঠক-পাঠিকার অস্তিত্বও থাকবে না।

অপরাহ্নে অনিল আবার সমুদ্র-তীরে আসিয়া বসিল। সমুদ্রের জল কালো হইয়া উঠিয়াছে। সতীনাথ কহিল,—কি ভাবচো?

অনিল কহিল,—আজ রাত্রে নীতি সেনের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ সুরু হবে। তার কল্পনা আর আলোচনা চলেছে। সু—চকিতের জন্য আমার কাছে এসেছিল, তার চোখে সেই মিনতি! নীতি সেন তখনি এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেল। আজ রাত্রে নীতি সেনের সঙ্গে জেগে বসে সু তাঁকে প্রেরণা জোগাবেন।

সতীনাথ কহিল—বলো কি! এ যে fit case for a matrimonial court– Wanted restitution of conjugal rights. এবং তোমার দেখচি অবিলম্বে আদালতের শরণ নেওয়া দরকার।

অনিল কহিল—তামাসা নয়। একটা উপায় স্থির করো—যাতে নীতি সেনের হাত থেকে সু-কে উদ্ধার করতে পারি।

সতীনাথ কহিল,—আর বান্ধবীর অপ্রীতি আমার উপর—?

অনিল কহিল—না, না। তাঁর চোখে, যে মিনতির দৃষ্টি তুমি ছাখোনি। তিনিও চক্রবর্ত্তীর মত বসে—দীর্ঘ-শ্বাস ফেলচেন। মুক্তি উনিও চান তবে রূঢ়তা না প্রকাশ পায়—শুধু এইটুকু—

সতীনাথ কহিল,—তা হ'লে তোমায় ওঁর প্রেমে পড়তে হয়—

অনিল কহিল—সুর সঙ্গে নতুন করে?

সতীনাথ কহিল—না, না। নীতি সেনের সঙ্গে। তামাসা নয়। বান্ধবী তায় নারী—ইবশেন প্রভৃতির চর্চ্চা যতই করুন, অস্থিতে-মজ্জায় এবং অন্তরে তিনি নারীই আছেন। বান্ধবীও নারী—এ ব্যাপারে সেই সনাতন ঈর্ষানল জলবে—তার পর—

অনিল কহিল,—জীবনটাকে তুমি বইয়ের পাতা বলে ভাবো?

সতীনাথ কহিল—ভাবি। বইয়ের পাতায়ও এত অঘটন ঘটে না—যত ঘটে জীবনে। আজগুবি-কৌতুকেরও অন্ত থাকে না জীবনে! শোনো, আজ চলে, যাবার সময় ফুলের তোড়া নিয়ে সুযোগ বুঝে নীতি সেনের হাতে সেটা ধরে দিয়ে বলো, আপনার রূপে মুগ্ধ পূজারীর পূজা-উপহার! খুঁটিনাটিটুকু পথে বলে দেবো।

অনিল কহিল—ধেৎ!

৪

সন্ধ্যার পর একটু সুযোগ ঘটিল। পুণ্যাঙ্কণ বলিয়া একটা কথা আছে। অনিল মন্দিরের ধার ঘুরিয়া আসিয়াছিল। জগন্নাথের মন্দির তাই চোখে পড়িয়াছিল। কাজেই—[illegible]

গৃহে ঘটনার বৈচিত্র্য! সুনন্দা দেবী হার্মোনিয়মের সুরে গান গাহিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গান—খুব আধুনিক। নীতি সেন তন্ময় হইয়া শুনিতেছিলেন। এমন সময় দুই বন্ধু আসিয়া ঘরে ঢুকিল। গান থামিলে অনিল কহিল,—বাঃ! নীতি দেবী গানে মশগুল! তার কথার সুরে একটা উন্মাদনা ছিল, আবেগের চাঞ্চল্য! এমন ঘটে না। সুনন্দা দেবী বিস্ময়ে স্বামীর পানে চাহিলেন। অনিলের সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই! সে নীতি সেনের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। সুনন্দা দেবী স্বামীর পানে আবার চাহিলেন, তার পর সতীনাথের পানে—সতীনাথ যেন কাঠের পুতুল দাঁড়াইয়া আছে! সুনন্দা দেবী ভাবিলেন, স্বামী কিছু—আশ্চর্য্য!

অনিল আবার কম্পিত স্বরে ডাকিল,—নীতি—নী—

নীতি সেন চমকিয়া তার পানে চাহিলেন। অনিল গদ্‌গদ্ স্বরে কহিল,—রূপসী তরুণী দেবী—নীতি দেবী, আপনার রূপে মুগ্ধ পূজারীর এই দীন পূজা নিয়ে—কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই প্রকাণ্ড ফুলের তোড়া সে নীতি সেনের কোলের উপর রাখিল।

বিনামেঘে বজ্রপাত, পথে সহসা সর্প দেখা—চমক দেখাইবার উপমায় এমনি কতক গুলো লাগসৈ কথা গল্পে উপন্যাসে চলিতে দেখা যায়! কিন্তু এক্ষেত্রে যা ঘটিল, তার সঙ্গে ও কথাগুলার সংযোগ করিলে ব্যাপারটা কাহাকেও সুস্পষ্ট বুঝানো যাইবে না! নীতি সেন চমকিয়া লাফাইয়া উঠিলেন,—Brute! Idiot!

অনিলের মুখ নিমেষে সাদা হইয়া গেল—যেন তার মুখে কে সজোরে চাবুক কষাইয়া দিয়াছে! সতীনাথ তাকে টানিয়া কহিল,—ছি! ছি! এ কি পাগল হলে তুমি! বলিয়াই অনিলকে লইয়া নিমেষে সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সুনন্দা দেবীর মনে হইল, পৃথিবীখানা বুঝি ধূমকেতুর ধাক্কায় ভাঙিয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, এবং তিনিও বাঁচিয়া নাই! কিন্তু সে মুহূর্ত্তের ভ্রম! ধূমকেতুর পৃথিবীর কাছে আসিবারও কোনো সম্ভাবনা যখন নাই—

সুনন্দা দেবী ক্রমে বুঝিলেন, পৃথিবী যেমন তেমনি এবং তিনিও বাঁচিয়া আছেন; এবং বুঝিয়া তিনি চোখ তুলিয়া চাহিলেন, চাহিতেই দেখিলেন, নীতি সেন ঘরে নাই। বাহিরে কাদের বাড়ী গ্রামোফোনে গান চলিতেছিল, মনের অবস্থা এমন নয়, কাজেই—

তিনি উঠিলেন,—বাহিরে আসিয়া দেখেন, নীতি সেন বাহিরের বারান্দায় সবেগে পায়চারি করিতেছেন। ভয়ে জড়োসড়ো হইয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। নীতি সেন ডাকিলেন,—নন্দা—

সুনন্দা দেবী কহিলেন,—মাপ করো নীতি!

নীতি সেন কহিলেন,—এ বেয়াদবি! একজন পুরুষমানুষের এমন স্পর্দ্ধা—

সুনন্দা দেবী কহিলেন,—কিছু মনে করো না ভাই।

নীতি সেন কহিলেন,—আমার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ টুকু আজ আর সুরু হবে না—সব গুলিয়ে গেছে। আমি একটু একলা বসে চিন্তা করবো—আমায় ডেকো না। নীতি সেন চলিয়া গেলেন।

সুনন্দা দেবী ভাবিলেন, কিসের চিন্তা? এ স্তব তাহা হইলে কি—সামনে জ্যোৎস্না-ভরা আকাশে কে কালি লেপিয়া দিল! সুনন্দা দেবী সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িলেন—তাঁর চোখে জল ছাপাইয়া আসিল। তিনি উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ! সহসা অঙ্গে কার এ স্নিগ্ধ করস্পর্শ! সুনন্দা দেবী অশ্রু-ভরা চোখ তুলিয়া চাহিলেন। অনিল কাঁপিয়া উঠিল সুনন্দা দেবী কহিলেন,—কেন ওঁকে ও কথা বল্‌লে?

অনিলের প্রাণে মমতা জাগিল। কিন্তু সতীনাথের ভ্রূকুটী ওদিকে! অনিল কহিল,—মনের আবেগে বলে ফেলেচি সু—একটা ক্ষণিকের মোহ!

সুনন্দা দেবী কহিলেন,—না।

সতীনাথ কহিল,—মনের আবেগ রোধ করতে পারে না, বন্ধুর এই তো মস্ত দোষ! না হয় নীতি সেনের রূপ ভালোই লেগেচে, তা বলে নিজের স্ত্রীর সামনে ও কথা তুলে স্ত্রীর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করা, এবং নীতি সেনকে লজ্জিত করা—

সুনন্দা দেবীর চোখে আবার জল ঠেলিয়া আসিল।

অনিল কহিল,—তোমায় তো অবহেলা করচি না সু—

সুনন্দা দেবী কহিলেন—না—

সতীনাথ কহিল—ওটা রোমান্সের অঙ্গ!

সুনন্দা দেবীর বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়িতেছিল! তিনি কহিলেন—অন্যায় করেচো—নীতি অতিথি।

সতীনাথ কহিল—এর অর্থ আমি বুঝেচি। আপনার সান্নিধ্য বুঝি বন্ধু এখন পাচ্ছেন না!—ঐ রূপ সামনে, যৌবনের উচ্ছল আবেগ—নিজেকে সম্বরণ করতে পারেনি. আর কি! বৈষ্ণব সাহিত্যে এবং আধুনিক সাহিত্যে এই পরকীয়া-প্রীতির প্রচুর-প্রগাঢ় ব্যঞ্জনা দেখবেন।—এ মনস্তত্ব!—তা তিনি কোথায় গেলেন?

সুনন্দা দেবী কহিলেন,—ঘরে বিশ্রাম করচেন। কারো সঙ্গে দেখা করবেন না।

অনিল কহিল—তাঁর উপন্যাসের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ?

সুনন্দা দেবী কহিলেন—আজ সুরু কর্‌তে পারবেন না।

আঃ! আঃ! অনিলের মনে হইল আনন্দের আবেগে সে প্রচণ্ড এক চীৎকার তোলে! কিন্তু না! তিনি ঘরে আছেন, বিশ্রাম করিতেছেন। গেঁয়োখালির সতীনাথের পরামর্শ ভিন্ন এক পা চলা নয়!

সকালে দুই বন্ধুর আবার আলোচনা সুরু সেই সমুদ্র-তীরে।

সতীনাথ কহিল—কালকের খপর কি, বলো?

অনিল কহিল—বহু মেঘলা দিনের পর সূর্য্যের আলো দেখলে মনে কি ভাব হয়? ঠিক তাই—মধু বাতা ক্ষরন্তি, চারিদিক মধুময়!

সতীনাথ কহিল—নীতি সেনের সাড়াশব্দ পাচ্ছি না তো!

অনিল কহিল—না। অর্থ?

সতীনাথ কহিল—ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মনস্তত্ব নিয়ে তেমন চর্চ্চা কখনো করিনি—তবে যদি re-action হয়?

অনিল কহিল—মানে?

সতীনাথ কহিল—ওদিক থেকে প্রেমের অর্ঘ্য-ভরা নৈবেদ্য—

অনিল কহিল—বলো কি! তা হলে তো আরো বিপদ।

সতীনাথ কহিল—অতএব এদিককার ঈর্ষানল আরো বেগে প্রধূমিত করা চাই। একখানা চিঠি লিখতে হবে। গোপন প্রণয়-লিপি—হলা অনসূয়ে—বাত্‌লে দেবো। তার পর তার অঙ্গবিভাগও নির্ণয় করে দেবো। তা ছাড়া ওঁর সঙ্গে দেখা হলেই তুমি ওঁর পানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইবে। অপাঙ্গ-ভঙ্গী প্রভৃতি জানো? না জানো, আমার কাছে কতকগুলো মাসিক পত্র আছে, তাতে ইণ্ডিয়ান স্কুলের আঁকা ছবিতে চোখের বহু ভঙ্গী দেখবে।

অনিল কহিল—বড় কঠিন হচ্ছে।

সতীনাথ কহিল—রোগের মত দাওয়াই চাই তো! সীতা দেবীকে উদ্ধার করতে শ্রীরামচন্দ্র বিপুল কপিসেনা নিয়ে গিয়ে লঙ্কা ছারেখারে দিয়েছিলেন—তুমিও তোমার প্রিয়ার উদ্ধারে লেগেচো। সে কথা মনে রেখো। নীতির হাত থেকে উদ্ধার কর্‌তে যে ব্যবস্থা উচিত হবে, তা তো করা চাই!

অনিল কহিল—কিন্তু এ যে দুর্নীতির প্রশ্রয় চলেছে!

সতীনাথ কহিল,—নিরুপায়! বিষে বিষক্ষয়!

বন্ধুর পরামর্শে অনিল অপাঙ্গ-ভঙ্গীর বিবিধ কৌশল-কশরৎ লইয়া মত্ত রহিল। নীতি সেন উত্যক্ত হইয়া বান্ধবীর কাছে কহিলেন,—আমি চলে যাবো। আমার এখানে লেখার সুবিধা হচ্ছে না।

অনিল বন্ধুকে কহিল—কৈ যাচ্ছে না তো। অথচ রোজ তিন বার করে নোটিশ জারি হচ্ছে।

সতীনাথ কহিল,—এইবার পত্র—

তাও লেখা হইল। সতীনাথ বলিল, এবং অনিল লিখিল,—

আপনি এ কি রূপের আগুন জ্বালিয়াছেন! আমি যে পলে পলে দগ্ধ হইতেছি! এ দাহ অসহ্য!

দেবী, আমি রূপের পূজারী। বিবাহে সুখ পাই নাই। বিবাহ মস্ত ভুল। আমার সে ভুল আমি বুঝিয়াছি। আমার মন আপনার প্রেমের কাঙাল। এ প্রেম কি নিরর্থক হইবে?

আপনার সখী? আদেশ করুন, আপনাকে লইয়া দেশান্তরে যাইব। এত বড় পৃথিবীর মধ্যে একটু নিভৃত কোণ বাছিয়া লইয়া আমরা দুটীতে প্রেমের কল-গানে সে কোণ মুখরিত করিয়া রাখিব। সে কোণে প্রেমের নন্দন রচনা করিব।

শুধু একবার বলুন,—চলো! এ দীন তখনি আপনাকে বক্ষে, তুলিয়া কোন প্রেমের অমরায় উড্ডীন হইবে। মন আর্ত্তস্বরে ফুকারিতেছে—তৃষিত তাপিত চিত প্রিয়া তুমি এসো, এসো!

অনিল হাসিয়া কহিল,—তুমি কি উপন্যাস লেখো না কি হে?

সতীনাথ কহিল,—লেখবার বাসনা রাখি। তাই অপরের লেখা উপন্যাস থেকে এই সব সরস বুকনি সংগ্রহ করে ফিরচি।

অনিল কহিল,—চুরি?

সতীনাথ কহিল,—সাহিত্যে চুরি বলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব আমি মানি না। ঐ হুঁকোর খোল-নলচে বদলা-বদলি বলে কথা আছে না? সাহিত্যে সেটা যেমন খাটে!—

অনিল কহিল,—বাঃ!

সতীনাথ কহিল,—ঐ চিঠিখানা তোমার বিছানায় ফেলে রেখো—যেন অন্যমনস্ক হয়ে ফেলে গেছ! তার পর বান্ধবীও হাতে নেবেন, তাঁর কৌতূহল জাগবে এবং অবশেষে—

অনিল কহিল,—কৈফিয়ৎ তলব? অশ্রু, মান? কিন্তু যদি হৃদয়-ভেদী ট্রাজেডি দাঁড়ায়?

সতীনাথ কহিল,—যে-স্ত্রী স্বামীকে ভালো বাসেন, তিনি স্বামীর অবহেলা দেখলে আত্মহত্যা করতে পারেন না কখনো! এ তুমি eternal সত্য বলে মেনো—

পরামর্শ-মত কাজ হইল। সতীনাথ সুনন্দা দেবীকে কহিল—আজ বন্ধুবরকে নিয়ে একটু ঘুরে আসি—ভুবনেশ্বরে কি আর কোথাও—ওর মনের গতি যদি ঘুরিয়ে দিতে পারি!

সুনন্দা দেবী ম্লান চোখে চাহিলেন। অবিশ্রাম কান্নায় তাঁর চোখের ফুলা তখনো সারে নাই!

সতীনাথ কহিল—ইনি কোথায়?

সুনন্দা দেবী কহিলেন—সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেছেন।

সতীনাথ কহিল—উনিও কি চঞ্চল হয়েচেন? ওঁর আবেগ— ?

সুনন্দা দেবী কহিলেন—উদাস ভাব যেন—! ভয় হচ্ছে।

সতীনাথ কহিল—তা হ'লে দু-ঠাঁই করা প্রয়োজন। উনি চলে যাবেন না?

সুনন্দা দেবী কহিলেন—জানি না।

সতীনাথ চিন্তিত হইল, কহিল—হুঁ।—তা, বেশ, দুজনকে দুজনের চোখের আড় করি।

সমুদ্রতীরে বসিয়া আবার দুজনে প্ল্যান খাটাইতে-ছিল—হাস্য-কৌতুকে সে প্ল্যান পরিপূর্ণ! সহসা কাছে উদাসিনীর বেশে—সর্ব্বনাশ—নীতি সেন! বুঝিয়াছেন? অনিল চমকিয়া উঠিল। সে ছুট দিল। নীতি সেন আসিয়া ডাকিলেন,—বন্ধু—তাঁর স্বর গাঢ়।

সতীনাথ ভড়কাইল; পরক্ষণে কহিল,—নেই।—

নীতি সেন কহিলেন,—এ হেঁয়ালির অর্থ?

সতীনাথ কহিল,—জানি না। আমরা বেড়াতে যাচ্ছি দু'জনে আপাততঃ ওয়ালটেয়ার। বোধ হয়, বন্ধুর অবসরের অভাব।

নীতি সেন কহিলেন—কৈফিয়ৎ চাই আমি আপনার বন্ধুর। সেই ফুল, ওই চাহনি—

সতীনাথ কহিল,—আমরা ফিরে আসি, তার-পর—সতীনাথ চলিয়া গেল।

নীতি সেন দাঁড়াইয়া রহিলেন,—যেন কোন্ পটুয়ার গড়া প্রতিমার কাঠামো!

পরের দিন আবার পুরী।—সেই বাঙলা।

অনিল বুকে উদ্বেগ বহিয়া ডাকিল,—সু—

কোনো সাড়া নাই! সে ঘরের মধ্যে ঢুকিল। সুনন্দা দেবী বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতেছেন। অনিল তাঁর কপালে হাত রাখিল, কপালে ঘাম! বক্ষস্পন্দন অনুভব করিল—ঠিক আছে! আঃ—ভয়ের কারণ নাই। তখন ধীরে ধীরে তাঁর সূক্ষ্ম রক্তিম ওষ্ঠপুটে—

চমকিয়া সুনন্দা দেবী উঠিয়া বসিলেন—তাঁর চোখের কোলে কালির রেখা! সারা রাত্রি কাঁদিয়াছেন!

অনিল কহিল—ইনি কোথায়? তোমার বান্ধবী?

সুনন্দা দেবী চিত্র-করা দুই চোখের দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিলেন! তাঁর অন্তরে অশ্রুর বাণ ডাকিল! এত জলও আছে সেখানে! নিমেষে সে জল চোখে আসিয়া দাঁড়াইল।

বাহির হইতে সতীনাথ ডাকিল—দেবী—

অনিল কহিল,—ছি, কেঁদো না—সতী আসচে।

কিন্তু চোখের জল কি তাহাতে বাধা মানে!

সতীনাথ কহিল—নীতি সেনকে দেখচি না যে! তার স্বরে কি আশ্বাস! তাকে দেখিয়া সুনন্দা দেবী বল পাই-লেন। তিনি কহিলেন—কাল রাত্রে চলে গেছেন।

—হঠাৎ ?

সুনন্দা দেবী কহিলেন—তিনি রাগ করেচেন খুব—বলেচেন, এ কৌতুক! একটা নারীর প্রাণ নিয়ে প্রেমের এ নির্লজ্জ অভিনয়! আমি কিছু বুঝি না? সেই Doll's House? ফুলের তোড়াটা এমনি কৌতুক করে দেওয়া?

সতীনাথ হাসিয়া কহিল,—তার পর?

সুনন্দা দেবী কহিলেন,—এটুকু তিনি বোঝেন, যে, তিনি রূপসী নন্। একটু সংশয় কাজেই—

সতীনাথ কহিল,—বন্ধুর আবেগটুকুকে তাই তিনি পরিহাস বলে ভেবেচেন? সে উচ্চহাস্য করিল।

সুনন্দা দেবী কহিলেন,—কিন্তু এঁর একটা চিঠি কাল—তাঁর দুই চোখে হু-হু করিয়া জল ঠেলিয়া আসিল।

অনিল কহিল—মাপ করো—ও রচনা আমার নয়—জানই তো ও রকম লেখা আমার আসে না। বিশ্বাস করো। তোমার সঙ্গে বিবাহের পূর্ব্বে কখনো অমন ভাষার ভঙ্গিমায় প্রণয় নিবেদন করেচি আমি? ও রচনা সতীনাথের।

সুনন্দা দেবী কৌতুক-ভরা দৃষ্টিতে সতীনাথের পানে চাহিলেন।

সতীনাথ কহিল—তাই, দেবী। আপনার ঈর্ষানল প্রজ্জ্বালিত করা ছাড়া বন্ধুকে আপনার কাছে এনে দেওয়ার অন্য উপায় ছিল না। আপনার সঙ্গ প্রতি নিমেষ মিলনের জন্য বন্ধুর চিত্ত হাহাকার করে ফিরছিল। আমার পরামর্শে তাই সেই প্রণয়-ফুল-নিবেদন পরে আমারি পরামর্শে সেই অপাঙ্গ-ভঙ্গীর ব্যায়াম-কৌশল এবং আমারি পরামর্শে অবশেষে এই লিপি-রচনা! এবং নীতি সেনের সমুদ্র-তীরে স্বপ্নভঙ্গ!

সহসা বিদ্যুৎ চমকিলে আঁধার যেমন কাটিয়া যায়, সুনন্দা দেবীর চিত্তে মেঘের ঘোর তেমনি কাটিল। তাই বটে? সুনন্দা দেবী ভাবিলেন, ঠিক,—তিনি তো তাঁর স্বামীকে জানেন—দেবীকে কি গভীর ভালোবাসেন। তাঁর কি এ—তিনি কহিলেন,—আমায় আপনারা ক্ষমা করুন। আমার মন এমন কালো হয়ে ছিল—

সতীনাথ কহিল—সংসর্গগুণে। তা তিনি গেলেন কি করে?

সুনন্দা দেবী কহিলেন—আমি তাঁকে বললুম, স্বামীকে হারাতে বসেচি—বান্ধবীকেও সেই সঙ্গে—

সতীনাথ কহিল,—তা নয়। নেপথ্যে আর একটা দৃশ্য যোজনা হয়েছিল সমুদ্র-তীরে—সেই দৃশ্যে তিনি অপাঙ্গ-ভঙ্গীর আসল অর্থ—সেটা পরিহাস ও কৌতুক জানতে পেরেই—না হলে উদাসিনী-বেশে ছিলেন তো—এই কৌতুকের জ্ঞান লাভ হবামাত্র পুরী ত্যাগ—psychologyর সঙ্গে খাপ খায়!

অনিল কহিল—অতএব,—আমি মার্জ্জনা পেয়েচি?

সুনন্দা দেবী হাসিলেন—যেন মেঘ-ফাটা আলোর ঝিলিক! তাঁর মুখে কথা ফুটিল না।

সতীনাথ কহিল—তাতে আর সন্দেহ নাস্তি!

তিনমাস পরে সুনন্দা দেবী একদিন অনিলকে একটা খপরের কাগজ দেখাইয়া কহিলেন,—ছাখো।

অনিল দেখিল,—কাগজে ছাপা আছে, বেঙ্গল ফিল্ম্সে বিদুষী মহিলা মিস্ নীতি সেন যোগ দিয়েছেন।

অনিল কহিল,—এ কি আমাদের নীতি সেন?

সুনন্দা দেবী কহিলেন—নিশ্চয়। তার উপর আরো একটু—তিনি শীঘ্র বিবাহ করবেন; বর,—ঐ ফিলম্স্ কোম্পানির ডিরেক্টর হরিদ্বরণ ত্রিপাঠী! এই যে—

কাগজটা টানিয়া লইয়া সংবাদের উপর দৃষ্টি রাখিয়া অনিল কহিল—বাঃ! The right lady at the right place.

নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল

প্রয়াণে

গত ১৮ই আষাঢ় মঙ্গলবার রসরাজ নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয় অমরধামে গমন করিয়াছেন। আজীবন সাহিত্য-সেবা যাঁহার ব্রত ছিল, সেই সদালাপী পুরুষের রসালাপ আর শুনিতে পাওয়া যাইবে না। [illegible] বাঙ্গালাদেশে অভিনয়ের জন্য সাধারণ থিয়েটারের প্রচলন করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বাঙলাদেশ যে কয়জন সুদক্ষ অভিনেতাকে বক্ষে ধারণ করিয়া গর্ব্বভরে দাঁড়াইতে পারে অমৃতলাল তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার নিকট বসিয়া তাঁহার রসালাপ শুনিবার যাঁহাদের সুযোগ ও সুবিধা হইয়াছে তাঁহারাই একবাক্যে স্বীকার করিবেন কি মাদকতাপূর্ণ ছিল তাঁহার বলিবার ভঙ্গিমা, কি হাস্যোজ্জল মধুর রসাল বাক্যাবলী অনর্গল তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইত—সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া সারারাত্রি ধরিয়া এমন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দদান করা বড় সহজ কথা নয়। সে সকল রচনা আগ্নেয়-গিরির অগ্নি-স্রাবের মত শ্রোতার হৃদয়কে দগ্ধ করিত না,—শ্লেষপটু অনুকরণকারী রসরাজের কথা বিদ্রূপাত্মক ছিল না। শালিকা দ্বারা তিনি মানবের ভুল ভ্রান্তি দেখাইয়া দিবার যে সুব্যবস্থা বাল্যকালে সহজজ্ঞানে আরম্ভ করিয়াছিলেন, পরিণত বয়সে প্রহসনাদি লিখিয়া ব্যক্তির ও সমাজের দোষগুণ দেখাইতে কোন দিনই পশ্চাৎপদ হন নাই। এইখানেই উঁহার সমালোচনাবৃত্তির সম্যক্ স্ফুরণ দেখিতে পাই। দেশ ও সমাজকে তিনি অন্তরে অন্তরে ভালবাসিতেন বলিয়া

দেশের লোক যখন বিপথগামী হইত, তখনই তিনি শিক্ষকের স্থান অধিকার করিয়া রসাত্মক বচনে দেশবাসীর ভ্রম দেখাইয়া দিতেন। তাঁহার নাটক, নক্সা ও প্রহসনাদিতে সৃষ্ট চরিত্রের সংখ্যাধিক্য না থাকিলেও যে সকল চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন সে গুলির চিত্র খাঁটী বাঙ্গালীর চিত্র। দেশ-জননী ও ভাষা-জননীর প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয় তাঁহার প্রত্যেক রচনায় দেখিতে পাওয়া যায়। এক হিসাবে অমৃতলালকে আমরা দেশের প্রকৃত শিক্ষক বলিতে পারি। তিনি হাস্যরস-সাহায্যে আমাদের ক্ষুদ্রতা, আমাদের নীচতা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। স্বদেশী-যুগে যাঁহারা তাঁহার গুরু-গম্ভীর বক্তৃতা শুনিয়াছেন তাঁহারাই জানেন সে বক্তৃতায় কতটা আন্তরিকতা ছিল। দেশকে তিনি কত না ভালবাসিতেন—এই দেশপ্রীতির ফলে তিনি দেশ-বাসীকেও ভালবাসিতেন, বংশানুক্রম-প্রভাবে তিনি আজন্ম শিক্ষক ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নট যখন তাঁহার নিকট অভিনয় শিক্ষা করিতে গিয়াছেন, তখনই তিনি অক্লান্তপরিশ্রমে তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছেন—স্কুল, কলেজের ছাত্রেরা সেক্সপীয়ার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাট্যকারের রচনার গূঢ় অর্থ যখন তাঁহার কাছে শুনিতে গিয়াছেন, তখন তাঁহাকে অধ্যাপকের মতই অনর্গল বলিয়া যাইতে শুনিয়াছে,—আবার যখন আবৃত্তি শিক্ষা করিতে তাঁহার নিকট কেহ গিয়াছেন তখনই তিনি আবৃত্তির রীতি নিয়ম তাঁহাকে শিক্ষা দিতে বসিয়াছেন, কোমল-মতি শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার তাঁহার পদ্ধতির একটু অভিনবত্ব ছিল। তিনি তাহাদিগকে তাহাদের মত করিয়া সহজ-বোধ্য ভাষায় শিক্ষা দিতেন—পড়ুয়ারা, শিক্ষকের গাম্ভীর্য্য দেখিতে পাইত না বটে, পাইত দাদামহাশয়ের সরল প্রীতি-সম্ভাষণ ও বিষয়ের সরল ব্যাখ্যা। সামাজিকতা-রক্ষার ত্রুটি করিতে কেহ কোনদিন তাঁহাকে দেখে নাই। শরীর ও মন যতই দুর্ব্বল হউক না কেন তিনি সামা-জিকতা রক্ষা করিতে কোন দিনই অবহেলা করেন নাই; কারণ তিনি জানিতেন ব্যক্তি যে সমাজের অঙ্গ—সমাজ ছাড়া ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য নাই। আভিজাত্য-[illegible] তাঁহার একেবারে ছিল না এ কথা বলি-[illegible] কোন নিম্নপদস্থ ব্যক্তিকে ঘৃণা করিতে তাঁহাকে দেখি নাই। মান-সম্ভ্রম সর্ব্বদিক্ দিয়াই তাঁহার উপর অযাচিতভাবে বর্ষিত হইয়াছে, কিন্তু এ সব কোন দিনই তাঁহাকে অভিমানের দাস করিয়া তুলিতে পারে নাই। যে ক্ষেত্রেই তিনি বিচরণ করিয়াছেন সেই ক্ষেত্রেই যশের মুকুট লাভ করিয়াছেন, অমৃতলালের নানাবিষয়িণী প্রতিভা সর্ব্ব দিক্ দিয়া অমৃতের সন্ধান দিয়া গিয়াছে—তাঁহার সহজ সরল সুন্দর কাব্য 'অমৃত-মদিরা'ও বাঙ্গালীর নীরস প্রাণে সরসতা আনিয়া দিয়াছে। সজীবতা ও সরসতা ছিল তাঁহার আজন্মের সাথী। জ্ঞানবৃদ্ধ অমৃতলাল ছিলেন চির-তরুণ, তাই তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের রচনাতেও তারুণ্যের পরিচয় বিদ্যমান। শেষ বয়সে তিনি সেকালের কথা যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা যেমনই শিক্ষাপ্রদ তেমনই নূতন জ্ঞাতব্য-বিষয়ে পূর্ণ। এ গুলিকে সে সময়ের বাস্তব আলেখ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালা দেশের যেখানেই কোন সাহিত্যিক অনুষ্ঠান আছে সেইখানেই হয় তিনি বক্তা, না হয় সভাপতির আসন কোন না কোন সময়ে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ছোট বড় কোন অনুষ্ঠানেই তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া যান নাই এরূপ অভিযোগ কেহ কখনও তাঁহার বিরুদ্ধে করিতে পারেন না। কর্ম্মবীর! জগতে তোমার কর্ম্মের এত দিনে অবসান হইল—যাও অমরধামে, অমৃতলোকে অমৃতবাণী শুনাইয়া অমরবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হও। তাঁহার বিয়োগ-বিধুর পরিবার-বর্গকে সান্ত্বনা দিবার জন্য এই মাত্র বলি যে, তাঁহারা যেন তাঁহারই চরণ শরণ করিয়া দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য যত্নবান্ হ'ন।

জীবনের কয়েকটা কথা

১২৬০ বঙ্গাব্দের (১৮৫৩ খৃঃ) ৬ই বৈশাখ রবিবার রামনবমীর দিন বেলা ১০টার সময় ৮৮নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে মাতুলালয়ে অমৃতলাল জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্য, কৈশোর এবং যৌবনের শেষাবস্থা পর্য্যন্ত তিনি বাস করেন তাঁহার পৈতৃক নিবাস ১৩৭নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে। কোন পারিবারিক কারণে অমৃতলাল এবং তাঁহার অপর দুই ভ্রাতা [illegible]

প্রৌঢ়বয়সে অমৃতলাল

বসু মহাশয়কে বিক্রয় করেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থে অমৃতলাল শালকিয়ায় একখানি বাটী ক্রয় করেন।

ইঁহার পিতা ৺কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় তখনকার কলিকাতার বিদ্বৎসমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতেন। প্রথমে তিনি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর শিক্ষকরূপে কার্য্য করিতেন। পরে কিছুদিন ঐ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকরূপে কর্ম্ম করেন। তার পর শিক্ষকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হ'ন। তাহাতে দু'পয়সা সঞ্চয়ও করেন। বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়; অমৃতলাল তখন বাল্য ও কৈশোরের সন্ধিস্থলে। তাঁহার বয়স তখন [illegible] বঙ্গবিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া ইনি কলিকাতা হিন্দুস্কুলে প্রবেশ করেন, সেখানে দুই বৎসর পড়িবার পর ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে চলিয়া আসেন। ওরিয়েণ্টালে পাঠকালে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি শালকিয়ার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় জয়রাম ঘোষের পৌত্রীকে বিবাহ করেন।

অতঃপর তিনি General Assembly's Institutionএ ভর্ত্তি হইয়া তথা হইতে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। তথায় কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়া কাশীতে একজন প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথের নিকট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা করেন ও কিছুকাল চিকিৎসা ব্যবসায়ও করেন। তার পর স্কুলমাষ্টারি প্রভৃতি কয়েকটা কার্য্য করিবার পর সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা ও অভিনয় কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। এ সম্বন্ধে প্রভূত পরিশ্রম ও আত্ম-নিয়োগের পরিচয় দেন। তখনকার রঙ্গমঞ্চের ও অভিনেতার আজকালকার ন্যায় আদর ও সম্মান ছিল না। তাই কয়টী "সহায়হীন যুবা" "মাটি হয়"। অমৃতলালকে রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করিতে যথেষ্ট খাটিতে হইয়াছে। অধ্যক্ষের কার্য্য হইতে বেয়ারার কাজ পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছিল। কবি অমৃতলাল নিজেই লিখিয়াছেন—

সাঁগুসে-দালানে ছিল পড়-পড় কড়ি।
ঝুল-ঢাকা ছিল তাতে ঝাড়-ঝোলা দড়ি॥
আমি আর ধর্ম্মদাস নিশীথ আঁধারে।
বাঁশ বেয়ে উঠিয়াছি চরি করিবারে॥
(কবিতা)

সেকালে ছিল না বেশী কুলি কি চাকর।
যারা ছিল কাজে যেতে একা পেত ডর॥
তাই দেখিয়াছে লোক লালদীঘি-ধারে।
প্ল্যাকার্ড ম'য়েতে উঠে' ভুনিবাবু' মারে॥

তারপর নাট্য-রচনা। "হীরকচূর্ণে" যে নাট্য-রচনার সূচনা, "যাজ্ঞসেনী"তে তাহার পরিসমাপ্তি।

বিগত ১৮ই আষাঢ় (৩রা জুলাই) মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৬টা ২৫ মিনিটের সময় লোক-শিক্ষক অমৃতলাল পরলোকে গমন করেন।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় দেড় বৎসর পূর্ব্বে—(১৯২৭ সালের ১৭ নভেম্বর তারিখে) মজঃফরপুরে শ্রীযুক্ত অতুলানন্দ সেন মহাশয়কে অমৃতলাল সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন সেই পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"আমার মনে হয়, আমাদের দেশে যে সকল প্রতিভাশালী লেখক জন্মিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয়—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি যত বই লিখিয়াছেন, যতদিন বঙ্গভাষা টিকিবে ততদিন সবগুলি টিকিবে কি না বলিতে পারি না, তবে অনেকগুলি টিকিবে সেটি নিশ্চয়, তাহার মধ্যে আবার বিবাহ-বিভ্রাটের আদর দিন দিন বাড়িয়া যাইবে।

আশ্চর্য্য অমৃত বাবুর ক্ষমতা। পচাত্তর বৎসর বয়স হইল এখনও রস ফুরায় না। তিনি এখনও নিমেদত্ত অ্যাক্ট্ করেন। সে দিন বসুমতীর বার্ষিকীতে একটী গল্প লিখিয়াছেন তাহাতে গাঁজায় দমটি দিয়াই এক বুড় বদমায়েস মরিয়া গেল। রস আর কাহাকে বলে!

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী'

আমরা নিম্নে অমৃত বাবুর রচনাবলীর একটী তালিকা প্রদান করিলাম।

গ্রন্থ

হীরক চূর্ণ	··· ···	১৮৭৫—১৭ই জুন
চোরের উপর বাটপাড়ী	··· ···	১৮৭৫
তিল তর্পণ	··· ···	১৮৮১—২১শে সেপ্টেম্বর
ডিসমিস	··· ···	১৮৮২—২৫শে ডিসেম্বর
চাটুয্যে বাড়ুয্যে	··· ···	১৮৮৩—২৫শে ডিসেম্বর
বিবাহ বিভ্রাট	··· ···	১৮৮৪—২২শে ডিসেম্বর
সরলা (রূপান্তরিত)	···	১৮৮৮—২২শে সেপ্টেম্বর
তাজ্জব ব্যাপার	···	১৮৯০—১লা জানুয়ারী
বাহ্বারাম	··· ···	১৮৯০—১৩ই সেপ্টেম্বর
তরুবালা	··· ···	১৮৯০—২০শে ডিসেম্বর
বিদ্যাসাগর-বিলাপ	···	১৮৯১—২২শে আগষ্ট
রাজা বাহাদুর	··· ···	১৮৯১—২৫শে ডিসেম্বর
কালাপানি	··· ···	১৮৯২—২৫শে ডিসেম্বর
বিজয় বসন্ত	··· ···	১৮৯৩—২৬শে আগষ্ট
বাবু	··· ···	১৮৯৪—১লা জানুয়ারী
একাকার	··· ···	১৮৯৪—২৫শে ডিসেম্বর
বৌমা	··· ···	১৮৯৭—১লা জানুয়ারী
গ্রাম্য বিভ্রাট	··· ···	১৮৯৭—২৫শে ডিসেম্বর
*হরিশ্চন্দ্র	··· ···	১৮৯৮—১০ই সেপ্টেম্বর
সাবাস আটাশ	···	১৮৯৯—২৩শে সেপ্টেম্বর
*সতী কি কলঙ্কিনী	···	১৮৯৮—নভেম্বর
যাদুকরী	··· ···	১৮৯৯—২৫শে ডিসেম্বর
আদর্শ বন্ধু	··· ···	১৯০০—২৮শে এপ্রেল
কৃপণের ধন	··· ···	১৯০০—২৬শে মে
অবতার	··· ···	১৯০০—২৫শে ডিসেম্বর
নবজীবন	··· ···	১৯০২—১লা জানুয়ারী
সাবাস বাঙ্গালী	···	১৯০৫—২৫শে ডিসেম্বর
খাস দখল	··· ···	১৯১২—৩০শে মার্চ্চ
নবযৌবন	··· ···	১৯১৩—২০শে ডিসেম্বর
ব্যাপিকা-বিদায়	···	১৯২৬—৯ই জুলাই
বন্দে মাতরম্	··· ···	১৯২৬—১০ই নভেম্বর
যাজ্ঞসেনী	··· ···	১৯২৮—৫ই মে

এ ছাড়া তাঁহার আর ছয়খানি পুস্তকের নাম—বিলাপ, বৈজয়ন্ত বাস, সম্মতি-সঙ্কট, নিমাই চাঁদ, বাহবা বাতিক, কৌতুক-যৌতুক।

প্রবন্ধাবলী ও অভিভাষণ

১। আত্মসমর্পণ—আশ্বিন ১৩২৯ (মাসিক বসুমতী)
২। চরকা—বৈশাখ " "
৩। বিদ্যা অমূল্য ধন—জ্যৈষ্ঠ " "

* এই বইখানির তিনি প্রকাশ[illegible]

৪। গো-গোলযোগ—চৈত্র ১৩২৯ (মাসিক বসুমতী)
৫। স্বরাজ-সাধনা—অগ্রহায়ণ „ (বড় প্রবন্ধ ; শেষ হয় নাই)
৬। চোখ গেল—মাঘ ১৩৩০ (মাসিক বসুমতী)
৭। বিষম সমস্যা—পৌষ „ „
৮। হত্যাতেও কাঁদি ফাঁসিতেও কাঁদি—ভাদ্র ১৩৩০ (মজলিস)
৯। বিসর্জ্জন—অগ্রহায়ণ „ (মাসিক বসুমতী)
১০। হিন্দুর নবনামকরণ—কার্ত্তিক „ „
১১। পুরাতন পঞ্জিকা—বৈশাখ ১৩৩১ (পুরাতন কথা শেষ হয় নাই।
১২। কলার ফিলজফি—অগ্রহায়ণ „ (মাসিক বসুমতী)
১৩। হেল্ অর্ডিনান্স—পৌষ „ „
১৪। আবোল্-তাবোল্—অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ „
১৫। ১৯১৫— আশ্বিন ১৩৩২ (বার্ষিক বসুমতী)
১৬। বিশ্বকর্ম্মা পূজা— „ ১৩২৯ (বঙ্গবাণী)
১৭। অকাল বোধন—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ (সোনার বাংলা)
১৮। গৃহিণী গৃহমুচ্যতে—(তারিখ জানা নাই) (মজলিস)
১৯। "তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে"— শ্রাবণ ১৩৩৫ (বাংলার কথা)
২০। বাংলার কথা— ১৩৩৪ „
২১। অন্নপূর্ণা পূজা— „ „
২২। সপ্তমীর রাত (পুরাতনী)—আশ্বিন ১৩৩৫ (নাচঘর)
২৩। প্রজানীতি— ১৩৩৫ (দৈনিক বসুমতী) বড় প্রবন্ধ
২৪। মহাসমিতি—পৌষ ১৩৩৫ (দৈনিক বসুমতী)
২৫। পৌষ-পার্ব্বণ— „ „ „
২৬। বৃটিশ বিদায়—মাঘ „ „
২৭। প্রকৃতির পরিশোধ—মাঘ „ „
২৮। স্বাধীনতার পথে— „ „ „
২৯। কচুরীপানা— „ „ „
৩০। ঘুষ ও ঘুষি— „ „ „
৩১। গ্রামদর্শন (ধান্যকুড়িয়া)—ফাল্গুন ১৩৩৫ (দৈনিক বসুমতী)
৩২। নূতন দমকল—চৈত্র ১৩৩৫ „
৩৩। মেদিনীপুর দর্শন—চৈত্র „ „
৩৫। লুচি সন্দেশ—ফাল্গুন „ (দৈনিক বসুমতী
৩৬। রান্নাঘর— „ „ „
৩৭। জাতির প্রস্থান ও দলাদলির প্রবেশ—বৈশাখ ১৩৩৬ „
৩৮। গ্রহণ „ „ „
৩৯। খেলাঘর „ „ „
৪০। নিতাইএর স্বপ্ন—জ্যৈষ্ঠ „ „
৪১। অভিভাষণ (কাঁঠালপাড়া)—শ্রাবণ ১৩৩০
৪২। সভাপতির সূচনাবচন (বীরভূম) চৈত্র ১৩৩২ (বসুমতী)
৪৩। বিহার সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণ চৈত্র ১৩৩৩ „
৪৪। ধলা বীণাপাণি সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণ ফাল্গুন ১৩৩৪ (বসুমতী)
৪৫। মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণ ১৩৩৫ „

সঙ্গীত—কবিতাবলী—জীবনস্মৃতিপূজা

১। আমের ধূমধাম আষাঢ় ১৩২৯ মাসিক বসুমতী
২। ইলিশ শ্রাবণ „ „
৩। কাঁঠাল আষাঢ় „ „
৪। বঙ্গীয় নাট্যশালার পঞ্চাশৎ বাৎসরিক জন্মোৎসব-সঙ্গীত—অগ্রহায়ণ „ „
৫। বাল্যের বেসাতি ভাদ্র ১৩৩০ „
৬। বৃন্দার আনন্দ বৈশাখ „ „
৭। আগমনী আশ্বিন ১৩৩১ „
৮। জাগো জাগো রাধানগরী বৈশাখ „ „
৯। আত্মাবোলে অমৃতলাল ফাল্গুন „ „
১০। আমার পূজা (প্রবন্ধ) শ্রাবণ ১৩৩২ „
১১। আশ্বিন-আবাহন (কবিতা) আশ্বিন „ „

১২। নিত্যজীবী ১৩৩২ মাসিক বসুমতী
চিত্তরঞ্জন (কবিতা) শ্রাবণ „ „
১৩। নিরব ভেরীর
রব (কবিতা) ভাদ্র „ „
১৪। হারাধন অন্বেষণে আষাঢ় „ „
(কীর্ত্তন)
১৫। কবির ভাব এসেছে অগ্রহায়ণ „ „
(ব্যঙ্গ কবিতা)
১৬। কবিতার কাতরতা ফাল্গুন „ „
(ব্যঙ্গ কবিতা)
১৭। শারদা-মঙ্গল (কবিতা) আশ্বিন ১৩২৯ „
১৮। পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়
(প্রবন্ধ) অগ্রহায়ণ ১৩৩০ „
১৯। সারস্বত ব্রতকথা
মধুসূদন (প্রবন্ধ) মাঘ ১৩৩১ „
২০। চুপি চুপি সারো পূজা
(কবিতা) আশ্বিন ১৩৩৩ „
২১। তেত্রিশের ত্রাস
(কবিতা) বৈশাখ „ „
২২। মাতৃপূজা (কবিতা) আশ্বিন „ „
২৩। অপরাধী (কবিতা) আশ্বিন „ „
২৪। সেকালের কথা
(প্রবন্ধ) চৈত্র ১৩৩২ ভারতী
(দ্বিজেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা)
২৫। বঙ্গের অশ্রুজল
(প্রবন্ধ) মাঘ ১৩৩২ মানসী ও মর্ম্মবাণী
(জগদিন্দ্রনাথের স্মৃতিপূজা)
২৬। বড়দিনের গান ডিসেম্বর ১৯২৬ দৈনিক বসুমতী
২৭। পাট্‌কেল (মিস্ মেয়ো) „ „
(ব্যঙ্গ কবিতা) (তারিখ জানা নাই)
২৮। ব্যুহদ্বারে (কবিতা) বৈশাখ ১৩৩৪ আত্মশক্তি
২৯। পৌষপার্ব্বণ পৌষ ১৩৩৫ মাসিক বসুমতী
৩০। বিড়ম্বনা কাব্যরথ কার্ত্তিক „ „
৩১। আক্ষেপ কার্ত্তিক „ „
৩২। এগ্‌জামিন „ „ „
৩৩। ফিঙের নাচন

নক্সা, গল্প ও উপন্যাস

১। ঘরের কথা (উপন্যাস) ১৩১৫ ভারতী
(শেষ হয় নাই)
২। শিরোমণির তীর্থযাত্রা (নক্সা) ১৩২৩ মানসী ও মর্ম্মবাণী (শেষ হয় নাই)
৩। কৌলিক দুর্গোৎসব (গল্প) আশ্বিন ১৩২৯ মাঃ বসু
৪। পতিত ডাক্তার (নক্সা) আষাঢ় „ „
৫। ষষ্ঠীর প্রভাত (গল্প) আশ্বিন ১৩৩০ „
৬। থিয়েটারে পিন্থু (নক্সা) আশ্বিন ১৩৩১ „
৭। নন্দের নবকলেবর (নক্সা) বৈশাখ ১৩৩২ „
৮। গজুর ভজন (বড় গল্প) কার্ত্তিক „ „
৯। রূপকথা (গল্প) চৈত্র „ „
১০। মাতৃভক্তি (গল্প) আশ্বিন „ „
(শরতের ফুল)
১১। হামিদের হিম্মৎ (উপন্যাস) শ্রাবণ ১৩৩৩ „
১২। যুবক-জীবন (উপন্যাস) অগ্রহায়ণ „ „
১৩। টুনটুনী (গল্প) আশ্বিন „ „
১৪। শুভদিন (নক্সা) আশ্বিন „ „
১৫। ব্যারন এণ্ড পিপলাই কোং
(নক্সা) আশ্বিন ১৩৩৪ „
১৬। ছুটীর বৈঠক (গল্প) „ (উড়ো খৈ)
১৭। মিঠে মিনিট্ (নক্সা) আশ্বিন „
(দৈনিক বসুমতী)
১৮। হোরি খেলা (উচ্ছ্বাস) ফাল্গুন ১৩৩২
(আনন্দবাজার)

1. Step Aside ... ... Aug. 1925
(Calcutta Review)
2. A Stroll in the Hogg Market Nov. 1927
(Municipal Gazette)
3. Christmas under Sunshine ... Dec. 1926
(Forward)
4. November and after („) Dec. 1927
5. Visarjan (an appreciation) ... Sept. 1923
(Indian Daily News.)
6. Ksherodeprosad, his contribution to Bengali Drama

7. Looking backward
(The Servant) .. 7-3-25
(Incomplete)
8. The Puja in the retrospective, Its social and festive aspect (Forward) ... 1926
9. Valmikipratibha (an appreciation) ... 1927
10. Calcutta as a I knew it once (Municipal Gazette) ... 1928

* * *

স্মরণে

বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বঙ্গীয় নাট্যমঞ্চের প্রধান পুরোহিত, নাট্য-কাব্যামোদী পাঠকের পরম পরিচিত, অভিনেতা, বাগ্মী, কবি, নাট্যকার রূপে জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত, একাল ও সেকালের সেতু-স্বরূপ রসরাজ অমৃতলাল আর ইহলোকে নাই। এই সে দিন মাত্র তাঁহার সপ্তসপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে সমবেত হইয়া আমরা তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া আসিলাম, আর আজ তিনি আমাদের ছাড়িয়া, বঙ্গজননীকে কাঁদাইয়া, ভারতবাসীকে শোক সাগরে ভাসাইয়া অমর-ধামে চলিয়া গেলেন। অমৃতলাল গেলেন বটে, কিন্তু ভাস্বরকীর্ত্তি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। যে ব্যক্তির এক দিনেরও জন্য তাঁহার নিকট বসিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, যিনি একদিনের জন্যও তাঁহার সরল অথচ সারগর্ভ বক্তৃতা শুনিয়াছেন, কয়েক ঘণ্টার জন্যও তাঁহার অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিয়াছেন বা তাঁহার এক খানি নাটকও যিনি পড়িয়াছেন, তিনি জীবনে অমৃতলালকে ভুলিতে পারিবেন না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অমৃত-ভাণ্ডার অমৃতলাল বঙ্গদেশে অমর, Satire রচনার উৎকর্ষে বিশ্বসাহিত্যে অমর।

আজ অমৃতলালের জীবনী লিখিয়া পাঠকের ধৈর্য্য নষ্ট করিতে চাই না, তাহা সকলের নিকট সুপরিচিত। অমৃতলাল সাধারণ রঙ্গমঞ্চে ও নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠায় যে অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণও এখানে করিব না। বহু নাটক, প্রহসন, কবিতা, প্রবন্ধ রচনা করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যে যে চিরস্মরণীয় স্থান অধিকার করিয়া গিয়াছেন, তাহার উল্লেখও এখানে করিব না; তাহা সকলেই জানেন। এখানে শুধু তাঁহার মহাপ্রয়াণে, তাঁহার স্মরণার্থে দুই এক বিন্দু অশ্রুপাত করিব।

এই সেদিন এই দীন প্রবন্ধ-লেখককে সাদরে কাছে বসাইলেন। অমৃতলাল হাস্যরস সম্বন্ধে ও তাঁহার নিজের কয়েক খানি গ্রন্থ সম্পর্কে যে অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন তাহা আজ বার বার স্মরণ হইতেছে। তাঁহার ও গিরিশচন্দ্রের রচনায় কতটা Local colour ও contemporary allusion আছে এবং তাঁহাদের পুস্তকগুলি তাঁহাদের যুগের কতটা পরিচায়ক, নাট্য-রচনায় তিনি ও গিরিশচন্দ্র কাহার কাহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী, তাঁহাদের satire গুলিতে ব্যক্তিগত ইঙ্গিত কতটা আছে তাহা তাঁহার নিজের মুখ হইতে ভাল করিয়া শুনিতে না শুনিতেই সব শেষ হইয়া গেল, ইহা ভাবিয়া আজ চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইতেছে ও তাঁহার মহাপ্রয়াণে কাব্য-সমালোচকেরও যে কতটা ক্ষতি হইল, বঙ্গীয় নাট্য-সংক্রান্ত জটিল রহস্য গুলির ভ্রম অপনোদনে কতটা যে বাধা পড়িল ইহা ভাবিয়া হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত হইতেছে।

অমৃতলালের হাস্যরস ও নাটকাবলী সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে একাধিক প্রবন্ধে প্রসঙ্গতঃ আলোচনা করিয়াছি। যাহা আমার নিকট সত্য বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহা লিখিয়া হয় তো তাঁহার মনে পীড়া দিয়াও থাকিতে পারি। এজন্য, তাঁহার আত্মার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। কিন্তু এক দিনের জন্যও অমৃতলাল এজন্য আমায় একটী কথাও বলেন নাই; বরং হাস্যরসের আলোচনায় আমায় যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছেন। ইহা তাঁহার মহানুভাবতার পরিচায়ক। ১৮ বৎসর পূর্ব্বে আমার এক পরমাত্মীয়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে শ্রাদ্ধ-বাসরে যে অমৃতলালের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়, আমার humour সংক্রান্ত প্রবন্ধ উপলক্ষ্যে বহু বৎসর পরে যে অমৃতলালের সহিত আলাপ আবার পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়াছি, যাঁহার রচনা

'বিবাহ-বিভ্রাট', 'খাস দখল' ও 'অমৃত-মদিরা' বহুবার পড়িয়াও আমার আশা মিটে নাই, সেই অমৃতলালের সাহিত্য আলোচনা ও নাট্যকার, humorist ও satirist রূপে তাঁহার স্থান বঙ্গ-সাহিত্যে ও বিশ্ব-সাহিত্যে কোথায় তাহা নিরূপণ করিবার ইচ্ছা উপস্থিত দমন করিয়া সাশ্রুনেত্রে আজ বিদায় লইলাম।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ

আলোচনা

বিগত আষাঢ় মাসে আমরা পর পর কয়েকজন মনীষীকে হারাইলাম। গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ আমরা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারাজীব হেমেন্দ্রনাথ সেনকে হারাইয়াছি। ইনি শ্রদ্ধেয় দেশহিতৈষী বৈকুণ্ঠনাথের কনিষ্ঠ সহোদর। জ্যেষ্ঠের মত দেশের ও দশের কার্য্যে ইনিও একজন অগ্রণী ছিলেন। স্বদেশী শিল্পের উন্নতিকল্পে যে সকল অনুষ্ঠান এ দেশে হইয়াছিল প্রায় সকলগুলির সহিত তাঁহার অল্প-বিস্তর সংশ্রব ছিল। বেঙ্গল-পটারি ওয়ার্কসের তিনি একজন কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন।

* * *

তার পর ৭ই আষাঢ় যাঁহার মৃত্যু ঘটে তিনি শুধু বাঙ্গালার নন—ভারতের একজন কৃতী সন্তান—শ্রদ্ধেয় ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী। প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব দেশ সেবক ও জন-গণ-নায়ক সুপণ্ডিত কর্ম্মবীর মনীষী ব্যোমকেশের ন্যায় তীক্ষ্ণধীশক্তিসম্পন্ন সন্তান বাঙ্গালায় বড় কমই জন্মিয়াছে। স্বদেশী-যুগে যাঁহারা তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছেন তাঁহারাই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন ইনি শুধু বাক্যবীর ছিলেন না,—ছিলেন একজন প্রকৃত কর্ম্মবীর। কোন্ পথে চলিলে দেশ আবার উন্নতির তুঙ্গ শিখরে উঠিবে হৃদয়ে তাহা অনুভব করিয়া তিনি শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্ত-নের চেষ্টা করেন। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের ভিতর তিনি অন্যতম ছিলেন। টাউন হলের এক বিরাট্ সভায় তিনি বজ্রনির্ঘোষে বলিয়াছিলেন, "এ দেশে প্রকৃত শিক্ষা হইতেছে না। আমি যখন কোনও কলেজে গণিত ও পদার্থ-বিদ্যার শিক্ষকতা করি, তখন একদিন আমাদের সাহিত্যের অধ্যাপকের অনুপস্থিতিতে ইংরাজ অধ্যক্ষ মহাশয় আসিয়া আমাকে অনুরোধ করেন সাহিত্যের বি-এ ক্লাসের ছাত্রদের অধ্যাপনা করিতে। আমি একার্য্য কিছুতেই করিতে পারিব না বলায় তিনি আমাকে বলেন, "মিষ্টার চক্রবর্ত্তী, তুমি বেশ খাঁটী ইংরাজীতে মনোভাব প্রকাশ যখন কর্‌তে পার, তখন ভাল রকমেই পড়াতে পার্‌বে,—যাও পড়িয়ে এস—নিশ্চয়ই পার্‌বে।" আমিও দিনের পর দিন কাজ চালাইয়া দিতে লাগিলাম। বিবেককে বলি দিয়া যেখানে কাজ করিতে হয় সেখানে কিরূপ কাজ হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই তিনি দেশের মঙ্গলের জন্য কাল ও পাত্রোপযোগী জাতীয় শিক্ষা দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। ব্যবসায়-বুদ্ধি তাঁহার অসাধারণ ছিল। দেশের শিল্পের উন্নতি না হইলে দেশ প্রকৃত প্রস্তাবে উন্নত হইতে পারে না একথা শুধু তিনি মুখে না বলিয়া কার্য্যে দেখাইয়া দিয়াছেন যে, বাঙ্গালীও বড় বড় দেশীয় প্রতিষ্ঠান করিয়া চালাইবার মত বুদ্ধি ধারণ করে। বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের তিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা। পূর্ব্বে যখন একবার এই ব্যাঙ্ক ফেল হইবার মত হইয়াছিল, তখন সর্ব্বস্ব পণ করিয়া এই কর্ম্মবীর ইহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলকে রক্ষা করিবার জন্য ইনি বহু পরিশ্রম করিয়াছেন ও সময় ও অর্থ দান করিতে কোন দিনই কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। কিছু দিন হইল এই দুইটী প্রতিষ্ঠানের যে সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে তাহার জন্য ঠিক তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। যাহাদিগকে পুত্রাধিক স্নেহ ও বিশ্বাস করিতেন তাহাদের অবিমৃষ্যকারিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাঁহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে—সুনামেও যে কলঙ্ক পড়ে নাই তাহা বলি না। তবে একথাও বলি এত কাজ তিনি করিতেন যে, সকল কাজ একজন কেন কয়েক জনের মিলিত শক্তিতেও সম্পূর্ণভাবে হয় কি না সন্দেহ। রাজনীতিতে এককালে তিনি [illegible]

নায়কেরা যখনই কোন বিপদে পড়িয়াছেন, তখনই তাঁহার সুপরামর্শ মত কার্য্য করিয়া দেশকে মঙ্গলের পথে লইয়া গিয়াছেন। দেশবাসীও তাঁহাকে যথোপযুক্ত সম্মান দান করিতে কোন দিন কৃপণতা করেন নাই। তিনি কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতিও হইয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্ম-সংরক্ষণে তিনি যত্নশীল ছিলেন। গত হিন্দু মুসলমানের বিবাদের সময়ও তিনি প্রতিমার পুরোভাগে থাকিয়া মিছিল চালাইয়া ছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষতঃ তন্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছিল।

* * *

তার পর গত ১৮ই আষাঢ় রসরাজ অমৃতলাল বসু মহাশয় পরলোক গমন করেন। তাঁহার সম্বন্ধে অন্যত্র আমাদের বক্তব্য বিবৃত হইয়াছে।

* * *

গত ২০শে আষাঢ় দ্বারবঙ্গের মহারাজাধিরাজ রামেশ্বর সিং বাহাদুরের মৃত্যু হয়। তিনি বিহারবাসী হইলেও বাঙ্গালাদেশের সকল সদনুষ্ঠানেই যোগদান করিতেন ও অর্থসাহায্য করিয়া সে গুলিকে বাঁচাইয়া কর্ম্মের পথে চালিত করিবার সহায়তা করিতেন। তিনি একজন স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রচারকল্পে তিনি তাঁহার শক্তি ও অর্থ অকুণ্ঠিতচিত্তে ব্যয় করিতেন। হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বহু অর্থ দান করিয়াছেন।

* * *

ঐ দিনে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু ললিতমোহন ঘোষাল মহাশয়েরও মৃত্যু হয়। স্বদেশী যুগে তাঁহার বক্তৃতা যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারাই জানেন তিনি কতবড় একজন বাগ্মী ছিলেন। এককালে সুরেন্দ্রনাথের তিনি দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। সাহিত্য-সাধনায়ও তিনি ব্রতী ছিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে ব্যবসাবাণিজ্য করিতে গিয়া তিনি ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন। স্বাস্থ্যও ভঙ্গ হইয়া পড়ে; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার অদম্য উৎসাহের হ্রাস দেখি নাই। নষ্টস্বাস্থ্যকে ফিরিয়া পাইবার জন্য কিছুদিন হইতে তিনি কাশীবাস করিতেছিলেন। গত ১০ই আষাঢ় কলিকাতায় [illegible] স্মৃতি-পূজায় যোগদান করিয়াছিলেন; হঠাৎ ২০শে তারিখে তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। তাঁহার একমাত্র কন্যা, শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী। ইনি নানাবিধ পিতৃগুণের অধিকারিণী হইয়াছেন—পিতার পথানুসরণ করিয়া তিনিও বক্তৃতা ও বাঙ্গালাভাষার সেবা করেন। তিনিও এখন কাশীতে। আমরা এই কয়জন দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তির বিয়োগে ব্যথিত। এরূপ ত্যাগী, দানবীর ও আদর্শকর্ম্মী আবার বাঙ্গালা দেশে কবে জন্ম গ্রহণ করিবে তাহা বিশ্ব-নিয়ন্তাই জানেন। ইঁহারা নিজ নিজ কর্ম্মের দ্বারা দেশকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শেষোক্ত ললিতমোহন ছাড়া সকলেই পরিণত বয়সে মারা যান সত্য, কিন্তু বাঙ্গালা দেশ যে এখন কর্ম্মীকে চায়, এমন লোক চায় যাঁহারা এই সকল কর্ম্মীর আরব্ধ কার্য্যকে সাফল্য-মণ্ডিত করেন। আমরা ভগবানের নিকট কায়মনো-বাক্যে প্রার্থনা করি ইঁহাদের আত্মা সদ্গতি লাভ করুক। ইঁহাদের শোক-সন্তপ্ত আত্মীয়দিগকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

* * *

আমাদিগকে আর একটি শোক-সংবাদ দিতে হই-তেছে। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ এম-এ, বি-এল মহাশয় তাঁহার পরিবারবর্গ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদিগকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া অকালে পরলোক গমন করেন। তাঁহার শেষ-রচনা 'গুহা-মন্দিরের যাত্রী' সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী যখন আমাদের হস্তগত হয় তখন জানিতাম না যে এত শীঘ্র আমরা তাঁহাকে হারা-ইব। তাঁহার ন্যায় অমায়িক, সরল-প্রকৃতি লোক বড় কমই দেখা যায়। ভগবান্ তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের মনে শান্তি দিন।

* * *

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু-সমাজ নানা কারণে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাব-স্রোতের আঘাতে বিপর্য্যস্ত। পুরাতন জীবনযাত্রা-প্রণালী কোথাও আদর্শের পরিবর্ত্তনের ফলে, কোথাও অনিবার্য্য অবস্থাবিপর্য্যয়ের ফলে পরিত্যক্ত হইতেছে। এক দিকে সংরক্ষক দল নির্বিচারে প্রাচীনকে আঁকড়াইয়া থাকিতে উপদেশ দিতেছেন—অন্য দিকে বিপ্লববাদিগণ

অতীতকে অগ্রাহ্য করিয়া জাতীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য না করিয়া ইচ্ছামত সংস্কারের পরামর্শ দিতেছেন। এই সঙ্কটে হিন্দু-সমাজে সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম কি ভাবে রক্ষিত হইতে পারে তাহা পক্ষপাতহীন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের নিকট একটী দুরূহ সমস্যারূপে প্রতিভাত হয়। এই শাস্ত্র-নির্ভরশীলতা, প্রাচীন প্রথা ও আচারের প্রতি মমতাবান্ হিন্দুকে তাঁহার সাধনার নিভৃত আশ্রম ছাড়িয়া বিশ্বের সম্মুখে মানুষের মত দাঁড়াইতে হইবে—অন্যথা তাহার শান্তি, কল্যাণ এমন কি জীবন পর্য্যন্ত আধুনিক জগতে অসম্ভব হইয়া পড়িবে। হিন্দু-সভ্যতা যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে বলিয়াই তাহা সনাতন। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ও ধর্ম্মশাস্ত্র ইহার স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করিতেছে। সুতরাং বর্ত্তমান সামাজিক সমস্যা সকলের সমাধান করিতে হইলে বিপুলভাবে, ব্যাপক দৃষ্টিতে শাস্ত্রালোচনা অত্যাবশ্যক। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজে যাহাতে এই জাতীয় আলোচনার আগ্রহ ও অভ্যাস জন্মে সেরূপ ব্যবস্থার নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ এখনও হিন্দুসমাজ বহুল পরিমাণে তাঁহাদের মুখাপেক্ষী। অথচ এই প্রকার শাস্ত্রালোচনার পরিবর্ত্তে তাঁহারা নিজ নিজ প্রদেশের নিবন্ধকারগণকেই অখণ্ডনীয় ও অলঙ্ঘ্য ধর্ম্ম-ব্যবস্থাপক জ্ঞান করিয়া থাকেন। এই অবস্থার প্রতীকার-কল্পে স্বনামখ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের চেষ্টায় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আমরা এই নবীন প্রতিষ্ঠানটীকে ইহার সঙ্কল্পিত সত্যানুসন্ধানের পথে, শাশ্বত ব্রহ্মণ্য-প্রতিষ্ঠার পথে, উন্নতি ও দীর্ঘজীবনের পথে আমন্ত্রণ করি। অস্পৃশ্যতা, শুদ্ধি, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি হিন্দুসমাজ সম্পর্কিত উৎকট সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে পরিষৎ বর্ত্তমান বর্ষে প্রায় ৩০টী বার্ষিক ৬০্ টাকা মূল্যের বৃত্তি দান করিবে। উদ্দেশ্য—বৃত্তিভোগী পণ্ডিতগণ শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্ম্মসূত্র, ধর্ম্ম-সংহিতা, পুরাণ, উপপুরাণ, এবং নিবন্ধ গ্রন্থ সকল হইতে নিঃশেষে অনুকূল ও প্রতিকূল প্রমাণ সকল একত্র সংগ্রহ করিবে। প্রমাণ সকল সংগৃহীত হইলে পরিষদের অন্তর্গত ব্যবস্থাপক সভায় তৎসমস্ত আলোচিত হইবে। এই প্রকার আলোচন-রীতি পণ্ডিত-সমাজে প্রচলিত হইলে শুধু যে সামাজিক প্রশ্ন সকলের মীমাংসার সুবিধা হইবে তাহা নহে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজের শাস্ত্রদৃষ্টির পরিধিও বিস্তৃত হইবে। আমরা এই নব প্রতিষ্ঠানটীকে আমাদের আন্তরিক স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি।

* * *

সময়াভাবে আমরা পঞ্চপুষ্পকে আমাদের মনোমত করিয়া বাহির করিতে পারিলাম না। মাত্র ২০ দিনের মধ্যে প্রবন্ধাদি সংগ্রহ করিয়া এত বড় কাগজ বাহির করিতে আমরা যত্ন ও পরিশ্রমের কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই। তথাপি দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় আমাদেরও প্রাণের সঙ্কল্পগুলি হৃদয়ে উত্থিত হইয়া বিলীন হইয়া গেল। এবারে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলাম না। কিন্তু আশা করি আমাদের এ দুঃখ অচিরে দূর হইবে। অমাদের কার্য্যে সাহিত্যিক বন্ধু-বান্ধবগণ যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন এরূপ প্রতিশ্রুতি পাইয়াছি। আশা করি পাঠক-পাঠিকাগণের চিত্ত-বিনোদন ও আনন্দদানের ব্যবস্থা শীঘ্রই করিতে পারিব।

ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	
২৫২৪		"সারথী" স্থলে "সারথি" হইবে।
২৯২	১৬	"সূর্য্যকুমার আচার্য্য" স্থলে "সূর্য্যকুমার অগস্তি" হইবে।
৩২৫	২৫	"হইল আষাঢ়ে অশনির" স্থলে "প্রথর গৌড় যৌন হইল আষাঢ়ে [illegible]

সিদ্ধার্থের বৈরাগ্য　　　শিল্পী—যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

(নাটোর মহারাজের সংগ্রহ হইতে)

দ্বিতীয় বর্ষ	শ্রাবণ, ১৩৩৬	চতুর্থ সংখ্যা

পুরাতনী

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী, বি-এ]

আমার কবিতা-বধূ—জানি আমি, নহেক সুন্দরী,
ভুলে যাহে নবীন নয়ন,
অপাঙ্গের দৃষ্টি তার প্রগল্‌ভেরে মন্ত্রাহত করি'
মুহূর্ত্তে হরিতে নারে মন;
নাহি তার কটাক্ষেতে সৃষ্টিজয়ী তড়িৎ-উল্লাস
মুখে তার নাহি বজ্রবাণী,
গতিতে হিন্দোল-ছন্দ-তরঙ্গের ফেনিল উচ্ছ্বাস
দুলায়না প্রমত্ত পরাণী;
অজানার [illegible] নাহি তার উৎকট উৎসাহ,
অচেনার উগ্র আকর্ষণ,
ভাষে বা অভাবে কভু অন্তরের বিদ্যুৎপ্রবাহ
ছাপায়না দেহের বন্ধন;
মানবের গৃহধর্ম্মে চিত্তবেগে দিয়া জলাঞ্জলি
অকূলে সে ভাসায়না ভেলা,
কুণ্ঠার অঞ্চল তার মন্দবাতে উঠেনা চঞ্চলি'
সীমার বন্ধনে করি' হেলা,

বাসনার বিষ তার বহেনাক নাসার নিঃশ্বাসে,
কৃষ্ণ কেশে কা[illegible] ফাঁস,
শ্রদ্ধাহীন তীক্ষ্ণবাণী মানুষের শাশ্বত বিশ্বাসে
হানেনা নিষ্ঠুর পরিহাস ;
মনের দোহাই দিয়ে আত্মারে করে না অপমান
দেহের হুয়ারে বাঁধি' হাট,
বিমূঢ় বচন-ছন্দে ভুলাইয়া তরুণের কান
রচেনা বিলাস-নাট্য-নাট।
আমার কবিতা-রাণী রূপধন্যা নহে স্বতন্তরা,
লুব্ধ আঁখি স্বৈরসরজনী,
অনন্ত আনন্দময়ী শুচিশুদ্ধ প্রশান্ত-অন্তরা
সে যে লক্ষ্মী চিরপুরাতনী ;
একাধারে মাতা ভগ্নী বধূ কন্যা দেবতা ও দাসী
পূজা প্রেম স্নেহ দিয়ে ভরা,
চিরন্তন নরচিত্ত তৃপ্তি যাহে লভে অবিনাশী
সুমঙ্গল সৌন্দর্য্য-প্রসরা ;
একই দেহে রমণীয় রমণী সে, বরণীয় নারী
গৃহ-আশ্রমের শকুন্তলা,
মূর্ত্তিমতী তপশ্চর্য্যা, অপূর্ব্ব প্রণয়ে মনোহারী
প্রিয়ংবদাকণ্ঠে-কথা বলা,
করুণার মধুমল্লী দৃঢ়তার স্বর্ণসূত্রে গাঁথা
স্নিগ্ধবাসে ভরে দেহ মন,
প্রদীপ্ত আঁখির পরে আয়ত উদার আঁখিপাতা,
মোহমুক্ত মানস-যৌবন ;
—অপূর্ব্ব সে মহাকাব্য—নহে ক্ষুদ্র দ্বিপদী চৌপদী
দুইছত্র কাব্য নামধারী,
কলঙ্ক-কুন্তলা কুন্তী পঞ্চপতি নহে সে দ্রৌপদী,
রাণী-শিরোমণি সে গান্ধারী ;
দীপ্তি যার দাহহীন, শক্তি যার সংযম-সুন্দর
দৃষ্টি যার অশ্রু-ভারানত,
জন্মান্ধ মানব-যাত্রী লভে যাহে সুচিরনির্ভর
বসুন্ধরা [illegible]।

অন্ন-সমস্যা

[আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র রায়]

শ্রীমান্ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ তাঁর সম্পাদিত 'পঞ্চপুষ্প' পত্রের জন্য আমার কাছে একটী প্রবন্ধ চান। আমি নানান্ কাজে ব্যস্ত, এখন আমার যে কিছুমাত্র অবসর নাই তা জেনেও তিনি প্রবন্ধ চান। না দিলে শ্রীমান্ মনঃক্ষুন্ন হইবেন, তবু স্পষ্টই বললাম, "দেখ্‌তে পাচ্ছতো সম্প্রতি রাসায়নিক পরীক্ষাগারে বিশেষ একটা কাজে ব্যাপৃত রয়েছি—অন্য কোন দিকে মন দিতে পারব না, তবে একটা বিষয়ে আমি সব সময়ে দু'চার কথা বল্‌তে পারি—বোধ হয় সে বিষয়ে বল্‌বার একটু যে অধিকার নাই তা নয়। আজ বিশ বছর ধরে বাঙ্গালী যুবকগণের অন্নসমস্যা ও তার সমাধান কি করে হতে পারে তা নিয়ে ক্রমান্বয়ে বক্তৃতা বাঙ্গালার নানা স্থানে দিয়ে বেড়াচ্ছি ও প্রবন্ধ লিখ্‌ছি। ঐ পুরাতন কথা যদি শুনতে চাও তবে অবসর না থাক্‌লেও এখানে বসে বসেই মুখে মুখে বলে যেতে পারি। তুমি লিখে নিতে পার।" অমূল্য বাবু রাজী হয়ে বল্‌লেন, "আপনি জগতের মধ্যে একজন বড় বৈজ্ঞানিক—রাসায়নিক, আপনি এমন কোন কথাই বলেন নাই যা আপনার স্বকপোল-কল্পিত। আপনার অভিজ্ঞতার ফলের কথাই আপনি বরাবর বলে এসেছেন। এই ধ্বংসোন্মুখ বাঙ্গালী জাতিটাকে বাঁচাবার জন্য আপনি কি কম চেষ্টাই না করছেন—এই বয়সে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়ে বেকার যুবকদের অন্নসমস্যার সমাধান করবার জন্য পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন—আপনি তো আরাম কেদারায় বসে যে সব রাজনৈতিক বা সমাজ-সংস্কারকরা দেশের কথা ভাবেন তাঁদের মত লোক নন—আপনার অভিজ্ঞতার কথা যে ভাবেই বলুন না তাতে শেখবার—জানবার—ভাববার কথা থাক্‌বেই থাক্‌বে। আর এ সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে গেলে আপনার পুনরুক্তি দোষ ঘটতে পারে—তা হলেই বা আমি জিজ্ঞাসা করি এ কথা কে অস্বীকার করতে পারে যে পুনরুক্তি করা টা দোষ হলেও অনেক সময়ে তার প্রয়োজনীয়তা পাঠকের মনে বদ্ধমূল, আর যুবকদের মনে ঐ ধারণাকে দৃঢ় করে অঙ্কিত করে রাখার জন্য মনস্তত্বের দিক্ থেকেও আছে। আপনি এখনকার বাঙ্গালার যুবকদের স্বাবলম্বী হবার জন্য চেষ্টার তো ত্রুটি করেন নি। এই অবসাদগ্রস্ত জাতির ভেতর চেতনা জাগিয়ে তোলবার জন্যে আপনি যা করেছেন, আজ দেশের লোক তা সম্যক্ বুঝে উঠ্‌তে না পারলেও ভবিষ্যতের ঐতিহাসিককে আপনার সম্বন্ধে অনেক কথাই বল্‌তে হবে। রাসায়নিক বলে' আপনার নাম চিরকালের জন্য অক্ষয় হয়ে না থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে, কিন্তু বাঙ্গালী জাতটাকে বাঁচিয়ে রাখবার উপায় উদ্ভাবন করে, কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিলেন বলে আপনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাক্‌বেন। আমার মনে হয় বাঙ্গালীকে বাঁচতে হলে—মানুষের মত মানুষ হয়ে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হলে তার প্রথমেই চাই অর্থ। এই অর্থ বিলাস ও ভোগ-বাসনা তৃপ্তির জন্য যে চাই তা বল্‌ছি না—চাই পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য ও দেশের ও দশের উপকারের জন্য। এখন 'অর্থমনর্থম্ ভাবয় নিত্যম্' বলে তো চুপ করে বসে থাক্‌লে চল্‌বে না। আর আমার মনে হয় বাঙ্গালী যুবকদের ভেতর ব্যবসা-বুদ্ধি জাগাবার জন্য আপনি প্রথমে ব্যবসা সম্বন্ধেই আলোচনা করেছিলেন। এখন বাঙ্গালীর পক্ষে সে পথে অগ্রসর হতে হলে যে রকম মূলধন ও যে সব গুণ থাকা চাই, সেরূপ অর্থবল বাঙ্গালীর নাই। অর্থ যাঁদের আছে তাঁরাও ব্যবসায়ে টাকা খাটাতে চান না; কারণ তাঁরা জানেন এদিক্ থেকে লাভের আশা তো নাই; অধিকন্তু নোকসান অনিবার্য্য। তাই বাঙ্গালার ধনীরা টাকা খাটাতে বড় নারাজ। এ ছাড়া বাঙ্গালার কয়েকটা প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালীর অবিমৃষ্যকারিতা ও ব্যবসা-বুদ্ধির অভাবের জন্য যে উঠে গেল, তাতে বাঙ্গালী ধনী ও নির্ধন অনেক লোকের অনেক টাকায় ঘা পড়েছে। তবে ব্যবসায়ী হতে হলে যে সব গুণ থাকা চাই সে সব গুণ সহজ-বুদ্ধির (instnict)

রণে না জন্মিলে ততদিন ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙ্গালী দাঁড়াতে পারবে না। আমার বোধহয় অন্যান্য কারণের মধ্যে এ সকল কারণের জন্যও এখন আপনি বাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে কৃষি নিয়ে পড়েছেন।

আর কথাতেই আছে—

"বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস
তার অর্দ্ধেক কৃষিকাজ—"

আপনি বিচক্ষণ বিজ্ঞ ব্যক্তি—দেশের সমূহ আপদ উপস্থিত দেখেই বোধ হয় আপনি অর্দ্ধেক ত্যাগ করে বাঙ্গলার যুবক-বৃন্দকে কৃষিকার্য্যে মন দিতে উপদেশ দিয়েছেন।"

উত্তরে আমি বল্লুম ঠিক বলেছ—এই কৃষিবিষয়ে যে প্রবচন আছে তাহার ভিতর সারবান্ অমূল্য সত্য নিহিত রয়েছে—

"খাটে খাটায় লাভের গাতি
তার অর্দ্ধেক হাতে ছাতি।
ঘরে বসে পুছে বাত
তাহার হয় সদাই হা-ভাত।"

বাঙ্গালী যুবকগণ এখন নিজ হাতে কোনরূপ শ্রমসাধ্য কাজ করতে নারাজ। একটা ইলিস মাছ ৷৹ আনা দিয়ে কিনবেন, কিন্তু তা বাজার থেকে বাড়ী বয়ে আনবার জন্যে ৵৹ আনা মুটে ভাড়া দেবেন। এরকম মানসিকবৃত্তি নিয়ে কৃষিকার্য্য বা কোন ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করা যায় না। এই কারণেই রেলওয়ে হবার পূর্ব্ব থেকেই মাড়োয়ারীরা লোটা কম্বল সম্বল করে দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর দুই চার পয়সার ছাতু খেয়ে এই বাঙ্গালা-দেশের অর্থ কতই না নিয়ে যাচ্ছে, অর্থনীতির হিসাবে এরা বাঙ্গালা-দেশকে জয় করেছে। এখন কেবল সহরে নয়—নিভৃত পল্লীর অঞ্চলেও এই সব মাড়োয়ারী দোকান খুলে চাল-ডাল, কাপড়-চোপড় প্রভৃতি বিক্রয় করে লাভবান্ হচ্ছে। কলকাতায় গোলদারি বা খুচরা চাল-ডাল প্রভৃতি নিত্য-ব্যবহার্য্যের দ্রব্য-বিক্রেতা এখন কয়জন বাঙ্গালী আছে? খাবারের দোকানও বাঙ্গালীর কয়খানা আছে। সকল দিক্ থেকেই বাঙ্গালী হঠে আসছে, এসকল দিকে বাঙ্গালী-যুবকদিগের মন কেন যে আকৃষ্ট হচ্ছে না তা বলতে পারি না। কৃষি সম্বন্ধে আমার পরামর্শ মত কাজ করে একজন আমার স্বগ্রামের ছাত্র কতদূর কৃতকার্য্য হয়েছে তা তার নিজের লেখা পত্র থেকে জানতে পারা যাবে; অপর পত্রখানির লেখক বোলপুর শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়। তাঁহার নিজ গ্রাম মূলঘরের জনৈক ভদ্রলোক স্বহস্তে চাষ করে যেরূপ ফললাভ করেছেন তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, উভয় পত্রের প্রথমেই আমি যে প্রবচন উদ্ধৃত করেছি তা যে খাঁটি সত্য তাই প্রমাণ করছে।

এখন বাঙ্গালার যুবকেরা যারা চাকরী চাকরী করে' সাহেব ও বড় বাবুদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন ও উমেদারী করে অকৃতকার্য্য হন ও ভাগ্যবশে যারা কাজ জুটাতেও পারেন তারা দুবেলা পেটের অন্ন যে জোটাতে পারেন না সে একরূপ ধ্রুব সত্য। বাঙ্গালার দুই জন ভদ্র লোকের পত্র ছাপলাম—এরূপ অনেক পত্র আমার কাছে আছে—যারা নিজ হাতে কাজ করে কৃষিকার্য্য থেকে বেশ লাভবান্ হয়েছেন। আমি বাঙ্গালার যুবক-দের মন এই দিকে আকৃষ্ট করতে চাই।

প্রথম পত্র

শ্রীচরণেষু

শ্রীমান্ হরবিত্ত অনেকদিন হইতে কৃষিকার্য্যে ব্রতী আছে। প্রথমে সে পটলের চাষ করে, কিন্তু তাহাতে সুবিধা করিতে পারে না, তাহাতে কৃষাণ খরচ অনেক বেশী, তার পরে আখের চাষ করে। আখের চাষে তাহার বিলক্ষণ লাভ হয়। খরচ-খরচা বাদে তাহার বিঘাপ্রতি ৩৫০। ৪০০ টাকা লাভ হয়। তাহা হইলে দুইবিঘা জমি থাকিলে বৎসর ৭০০৲ টাকা আয় হয় অর্থাৎ ৫০৲ টাকা চাকুরী অপেক্ষাও শ্রেয়; কেন না, ইহাতে অবকাশ থাকে প্রচুর। তার উপর স্বাধীনতা ও আনন্দ ত আছেই।

নানা কারণে উপযুক্ত জমি না পাওয়ায় তাহাকে আখের চাষ ছাড়িয়া দিতে হয়। গত ১৩৩৪ সাল হইতে সে পাণের চাষ করিতেছে। প্রথমতঃ ২ কাঠা জমি প্রস্তুত করে। বাঁশ ও বীজের দরুণ ৫২৲ টাকা খরচ পড়ে, কায়িক পরিশ্রম তাহার নিজের। কৃষাণদ্বারা কাজ করাইতে হইলে আরও ১০৲। ১২৲ টাকা দিতে হইত। এবৎসর সে পাণ বেশী বিক্রয় করিতে পারে নাই। তবুও প্রায় ৩০৲ টাকার কাছাকাছি পাণ বিক্রয় করিয়াছিল। পরবৎসর ঐ দুইকাঠা জমিতে তাহার সার ও বাঁশের জন্য প্রায় ১৮৲ টাকা খরচ পড়ে। কিন্তু সে পাণ বিক্রয় করে ১৫০৲ টাকার। বর্ত্তমান সালে তাহার খরচ পড়িয়াছে মোটামুটি ১০৲ টাকা, কিন্তু তাহার আয় অন্ততঃ ২০০৲ টাকা হইবে বলিয়া সে আশা করিতেছে। এই ২০০৲ টাকা সে সমস্ত খরচ করে নাই। জমি ক্রমে বাড়াইতেছে। এবৎসর তার নূতন জমির পরিমাণ প্রায় আরও দুই কাঠা হইবে। এই দুই কাঠা জমি করিতে তাহার খরচ ক্রমেই কম পড়িতেছে। বস্তুতঃ বরজ বাঁধার বাঁশ ও সারের জন্য খইল ভিন্ন তাহার আর কোন নূতন খরচ লাগিতেছে না। পরিশ্রম তাহার নিজের। বীজ তাহার নিজের বরজ হইতেই সংগ্রহ করিতে পারিতেছে। বীজের খরচই বেশী খরচ। প্রথম বৎসর ৫২৲ টাকার মধ্যে বীজের খরচই প্রায় ৩০৲ টাকা

গিয়াছিল। বাঁশের নল ব্যবহার করিলে খরচ অপেক্ষাকৃত কম হয়, কিন্তু প্রত্যেক বৎসর নলের দরুণ ব্যয় পড়ে। বাঁশ একবার দিলে আর তিনবৎসরের মধ্যে ব্যয় করিতে হয় না।

আমাদের গ্রামে কামিনীকান্ত ঘোষ নামে আর একটী সম্ভ্রান্ত-বংশের ছেলে চাষ-বাস করিতেছে। তাহার দুই রকম কৃষি আছে, ধান ও সবজী। ধানের ক্ষেতে বছর বছর একটী ফসল হয়। শ্রীমান্ কামিনী শ্রীমান্ হরবিত্তের ন্যায় একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় কৃষি আরম্ভ করে নাই। তাহার মূলধন আছে। সে চাষের বলদ কিনিয়াছে, হাল তাহার নিজের এবং মজুর দিয়াই কৃষি করায় নিজের হাতে কিছুই করে না, কিন্তু সর্ব্বদাই তদ্বির করিতে হয়। এবৎসর বেশ ফসল হইয়াছে তবে ধানের দাম নাই, তবুও সে ১৮ বিঘা জমিতে ৬৫০৲ টাকা আয় করিয়াছে। ঐ জমিতে তাহার ৫০৲ টাকার মত খরচ পড়িয়াছে; কিন্তু ৫০০৲ টাকার ভিতর বলদের দাম হইতেছে ১৫০৲ টাকা। মোটের উপর তাহার বিশ্বাস যে বিঘাপ্রতি ধানের চাষে এখানে ১৫৲ টাকা করিয়া পাওয়া যায়। সামান্য তদ্বির করিলে এ ফসলের মার নাই। অনাবৃষ্টিতে এজমির ফসল নষ্ট করিতে পারে না। * * * *

যদি Co-operative রীতি অনুযায়ী সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ভদ্রগৃহস্থের ছেলে ও ব্যবসায়ী চাষী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চকের মত আবাদ করে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমানা ছাড়িয়া দিয়া কলে জমি চাষের ও ধান কাটার ব্যবস্থা করে, তবে হয় ত চাষের আয় আরও বাড়িয়া যাইবে। ৫০৲।৬০৲ টাকার কেরাণীগিরি হইতে যে তাহা অনেক পরিমাণে শ্রেয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অরণ্যে রোদন শুনিবে কে? প্রণত

শ্রীনেপাল চন্দ্র রায়

দ্বিতীয় পত্র

আচার্য্য দেব!

কৃষিকার্য্যকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি আমার ভদ্রাসন বাটীর জমীর পরিমাণ ছিল মাত্র ৩/ বিঘা। মধ্যে কৃষি উপযুক্ত জমির পরিমাণ মাত্র দেড়বিঘা। শৈশবে আমার পিতৃমাতৃ-বিয়োগ হয়। এই দেড় বিঘা জমীর কৃষিকার্য্যের আয় আমার প্রধান অবলম্বন স্বরূপ ছিল। একবার আড়াই কাঠা জমীতে কপি করিয়া ৪০৲ টাকা লাভ করিয়াছিলাম, ঐ জমীতে মিঠা-কুমড়ার আয়ও ১০৲।১২৲ টাকা হইয়াছিল। একবার সামান্য জমীতে ৫০। ৬০ শাড় আক করিয়া ছিলাম। তাহাতেও ৩০৲ টাকার উপর লাভ হইয়াছিল। অথচ এই সব কাজ আমি নিজে করিতাম। লোক-জনের সাহায্য বড় লইতাম না! সাহায্য লইব অর্থ কোথায়! ৪।৫ জন লোক এই কয়েক বিঘা জমীর আয় হইতে কোনমতে চলিয়া যাইত। পৈতৃক ক্ষুদ্র একটী গাঁতি জমা ছিল, তাহার আয় মাত্র ৫০।৬০৲ টাকা; প্রজা সময়মত কর দিত না। মালেকের খাজনা বাকি পড়িয়া যাইত। বিরক্ত হইয়া পৈতৃক কালের টাট বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে আমার ভদ্রাসন বাটীর সংলগ্ন ১০/ বিঘা জমী ৮০০৲ টাকা মূল্যে খরিদ করি। ১৭/ বিঘা জমী হাতে পাইয়া বিশেষ যত্ন সহকারে কৃষিকার্য্যে মন দিলাম। বেশ একটু প্রাণে সাহসের সঞ্চার হইল। যে সমস্ত জমীতে আওলাত ছিল তার নীচে সুপারি গাছ বসাইলাম। গাছের গোড়ায় গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্ত ছাই এবং জঙ্গল পূর্ণ করিয়া মেটে আলু পুঁতিয়া দিলাম। বাগানের চারিদিকে প্রায় একহাজার আনারসের চারা বসাইলাম। আশে পাশে নারিকেলের চারা প্রায় ৫০।৬০টী পুঁতিয়া দিলাম, যে সমস্ত জমী সাদা এবং কৃষিকার্য্যের উপযুক্ত ছিল তার ভিতর বিঘা দুই জমী বাছিয়া, অবশিষ্ট জমীতে প্রায় ৪০০ ঝাড় কলা পুঁতিয়া দিলাম। বর্ত্তমান ৪০০ ঝাড় কলার আয় ৩০০৲ টাকার কম নয়। গাছের গোড়ায় গর্ত্ত করিয়া যে মেটে আলু লাগাইয়াছিলাম, প্রতি গর্ত্তে এক বৎসর অন্তর আয় ১৲ টাকার কম নয়। একহাজার আনারস গাছের আয় অন্যূন বার্ষিক ৪০।৫০৲ টাকা—৫০। ৬০টী নারিকেল গাছ ফল ধরিয়াছে—প্রতি গাছে ২৲ টাকা করিয়া নারিকেল বিক্রীর আয় বার্ষিক ১২০৲ টাকার কম নয়—সুপারি ৫০০ গাছে ধরুন, প্রতিগাছে ।০ আনার কম আয় হয় না। এই হিসাবে ৫০০ গাছের আয় বার্ষিক ১২৫৲ টাকা। ৪।৫ বছর পরে আর ১০০০ সুপারিগাছ ফলন্ত হইবে। আম, কাঁঠাল, লিচু, জামরুল, পেয়ারা ইত্যাদি হরেকরকম ফল বিক্রীর আয় বার্ষিক ৬০৲।৭০৲ টাকা হইতে পারে। বর্ত্তমানে আমার কৃষি জমীর পরিমাণ ২/ বিঘা রাখিয়া অবশিষ্ট জমী আওলাত করিয়াছি। নানারকম শাক-সজী, উচ্ছে, পটল, বেগুণ, শিম, লাউ আমার কিছুই কিনিতে হয় না, সবই ক্ষেতে জন্মে। মজুর খরচ বাদ লাভ যা হয় তাতে এই দুই বিঘা জমীর বার্ষিক আয় সংসার খরচ বাদ ১০০৲ টাকার কম নয়। গতবৎসর একটী লাউগাছ করিয়াছিলাম। মাছ ধোয়া -জল লাউগাছের উত্তম সার। মাছধোয়া জলের সারে লাউগাছের আয় আশাতীত হইয়াছিল। সংসার খরচ বাদ ১৫৲ টাকার লাউ বিক্রী হইয়াছিল। একবার ১/ বিঘা জমিতে পাটের চাষ করিয়া মজুর খরচ বাদ ৬০৲ টাকা লাভ হইয়াছিল। আদা বেশ একটী লাভবান ফসল। গাছতলার পতিত জমীতে হইয়া থাকে, বিশেষ কোন পাট নাই। আদার আয় প্রচুর। ।০ কাঠা জমিতে আমার আদা বিক্রী হইয়াছিল ৩০৲টাকার উপর। একটী পেঁপেগাছের আয় নিতান্ত কম নয়। বার্ষিক ২৲ টাকা। বাড়ীতে যে বাঁশ আছে তদ্দ্বারা বাড়ীঘেরা বাদে ২০৲ টাকার উপর বাঁশ বিক্রী হয়। এই জমীর ভিতর ২/ বিঘা জমির উপরে ছোট ছোট দুইটী পুকুর কাটিয়াছি। তাহার সংস্রে সংসারের অনেক আনুকূল্য হয়। বর্ত্তমান আমরা সংসারের—১২।১৪ জন লোক। ২/ বিঘা জমীতে শাক-সজী যা জন্মে আমারা এই সংসারের খরচ বাদে বৎসরে লাভ হয় ১০০৲ টাকার উপর। এদেশে বারুজীবি-সম্প্রদায় পাণের ব্যবসা করিয়া খুব লাভবান হইয়াছিলেন। বারুজীবী কোথাও গরীব নাই। অন্য ভূ-সম্পত্তি কিছুই তাদের নাই। একমাত্র পাণবিক্রী করিয়া তারা উন্নত এবং ধনী। আপনি পাণের বরজ করার বিশেষ পক্ষপাতী।—আপনার উপদেশ-বাক্য শুনিয়া আমিও পাণের বরোজ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। ৬মাসের আমার বরজের পাণ আপনাকে উপহার দিব।

নিজে দেখিয়া শুনিয়া লোকজন খাটাইয়া কৃষিকার্য্য করিলে কখনই লোকসান হয় না। এমন তৃপ্তি এবং নির্ম্মল আনন্দ আর কোন কার্য্যে নাই। আমি পঞ্চ কন্যার জনক। আমার কোন মেয়ের বিবাহ ১৫০০৲ টাকার কম হয় নাই। তারপর ধান জমিও ৫০।৬০ বিঘা অর্জ্জন করিয়াছি, তাহাতে ২০০০৲ টাকা খরচ হইয়াছে। এছাড়া আমার বাড়ী ঘর যা কিছু করিয়াছি সমস্তই কৃষিকার্য্যের আয় হইতে, অন্য আয় কিছু থাকিলেও প্রধান আয় হচ্ছে কৃষির এবং উদ্যান জাত ফলবিক্রীর।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

রক্ত-কমল

(আনাতোল ফ্রাঁস অবলম্বনে)

[রায় সাহেব শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ]

১

লেক রোডের উপর প্রকাণ্ড একটা চারিতলা বাড়ী। সেই বাড়ীর নির্জ্জন ড্রইংরুমের মধ্যে নানা বর্ণের কুসুম-স্তবকে পরিপূর্ণ কয়েকটা সুন্দর ফুলদানীর পাশে পাশে চা'র সরঞ্জামগুলি তখন টেবিলের উপর উজ্জ্বল ছায়ার মতই ঝক্ ঝক্ করছিল। টেবিলের চারি ধারে খান-কতক খালি চেয়ারের দিকে চাহিতে চাহিতে সাদা গোলাপের একটা পাপড়ী লইয়া লীলা একটু খেলা করিল, তার পরই গম্ভীর হইয়া একখানা বড় আয়নার দিকে তাকাইল।

ফিরোজা রংএর শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে দেহখানি কেমন করিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে খেলিতেছে—কেমন করিয়া সেই ক্ষীণ নীলের উপর বহুমূল্য হার ও কঙ্কনের ফুলগুলি দেহের গতির সঙ্গে সঙ্গে আকাশের তারার মত এক একবার ঝিক্-মিক্ করিতেছে—এদিকে-ওদিকে মুখ বাঁকাইয়া লীলা তাহাই দেখিতে লাগিল। নিজেকে আরো ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সে যখন দর্পণের কাছে সরিয়া আসিল, তখন মনে হইল উহা যেন খল্-খল্ করিয়া হাসিতেছে। যেন বলিতেছে—সুন্দরি! জান না তুমি, জীবনের পরম সুখই বা কোথায়, আর তার চরম দুঃখই বা কোন্ খানে!

একটা জানালার কাছে আসিয়া লীলা মখমলের পর্দ্দা একটু সরাইল। দেখিল, রক্তবর্ণ মলিন গোধূলি গাছের আঁধারে আঁধারে অগ্রসর হইয়া দূরে নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেছে। কিছুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া লীলা পর্দ্দাটা ফেলিয়া দিল এবং ফুলের প্রকাণ্ড একটা ঝাড়ের নীচে একখানা সোফার উপর বসিয়া পড়িল। রোজই লীলা এইখানেই বসিত। সোফার পাশে একটা ছোট গোল টেবিলের উপর বাঙ্গলা একখানা পুস্তক পড়িয়াছিল। তার গায়ে সোনার অক্ষরে লেখা ছিল—"গাঙের গান"। সেদিন যাদের চা-পানের নিমন্ত্রণ ছিল তখনো তারা আসিল না দেখিয়া লীলা আনমনে "গাঙের গানে"র পাতাগুলি উল্টাইতে লাগিল।

সে যে তখন কবিতার কোনো রস উপভোগ করিতে-ছিল তা' নয়। তার মন তখন কবি-বন্ধু বীণার চারিদিকে সেই সুদূর শ্রীনগরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বিলাত ছাড়িবার পর বীণার সঙ্গে যদিও লীলার বেশী দেখা হয় নাই, কিন্তু যখনই হইয়াছে বীণা তখনই আনন্দে লীলাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছে—তাহার গাল টিপিয়া দিয়াছে, কত প্রিয়-সম্ভাষণে তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে—পাখীর মত কল্-কল্ করিয়া তাহার সঙ্গে কত কথাই কহিয়াছে। বীণা যে সুন্দরী তা' নয়; বরং তাহাকে কুরূপা বলাও চলে—কিন্তু সে মনোহারিণী। বীণা পরিহাসপ্রিয়। একথা বলিতেই হইবে যে সৌন্দর্য্য-বোধটা তাহার খুব বেশীই ছিল। কাশ্মীরের নানা কাহিনী সংগ্রহ করিয়া বীণা কবিতা লিখিত। চিরসুন্দরের পূজারিণী বলিয়া বন্ধুদের মধ্যে বীণার খ্যাতি বড় কম ছিল না।

কাশ্মীরের শোভা ও ললিত-কলা বীণাকে এমনি ভাবেই পাইয়াছিল যে পিতার সঙ্গে শ্রীনগরে গিয়া সে সেখানেই রহিয়া গেল। পিতার মৃত্যুর পরও আর বাঙ্গালায় ফিরিল না। পিতৃত্যক্ত ধন-সম্পত্তি লইয়া সে কাশ্মীরেই শিব-সুন্দরের পূজায় ভুলিয়া রহিল।

সে দিনের ডাকে "গাঙের গানের" সঙ্গে সঙ্গে লীলা বীণার একখানা চিঠি পাইয়াছিল। বীণা লিখিয়াছিল—"ভাই দোহাই তোমার, একবার এসো। এলেই দেখতে পাবে, পৃথিবীর সকল শোভা এখানে জমা হ'য়ে আছে। অফুরন্ত সে ভাণ্ডার। কাশ্মীরে তোমার পা পড়লে, সে

শোভা যে শতগুণ সুন্দর হ'য়ে ফুটে উঠবে, তা' আমি জানি।"

চিঠিখানি পড়িতে পড়িতে লীলা আপন মনে বলিল —'না ভাই, তা' হয় না। আমি কি কাশ্মীরে যেতে পারি, আমি যে বাঁধা পড়েছি—এই কল্‌কাতায়।'

লীলা মনে মনে যাহাই বলুক, একথা ঠিক যে কাশ্মীরে গিয়া বীণাকে দেখার ইচ্ছাটা যে তা'র মনের কোণে এক একবার উঁকি দিতেছিল না, তা' নয়। "গানের গানে"র পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে লীলা একস্থানে পড়িল—

সেই কথা—আর কিছু নাহি চাই আমি,
চাই শুধু অন্তর তাহার করুণায় মাখা
আর চাই প্রেম তার, জীবনের সার।

সেইখানেই বইখানা বন্ধ করিয়া সহানুভূতি-মাখা স্নেহের সঙ্গে লীলা বলিল—"তাই তো! বীণা কি কাউকে ভালবাসে না কি?" লীলার মনে পড়িল, কাশ্মীরের এক জমীদার-পুত্র—কুমার অজয়সিংহ বীণার সব চাইতে বেশী ভক্ত। লীলা ভাবিতে লাগল—কি আশ্চর্য্য এই কাণ্ড! বীণা কুরূপা, অজয় সুপুরুষ। অজয় কবিত্বহীন সাদাসিধে মানুষ, আর বীণার কাছে প্রেম যেন স্বপ্নজালে-ঘেরা একটা মধুর লীলা। অজয় কি ভালবাসা দিয়া বীণাকে তৃপ্ত করিতে পারিবে!

লীলার চিন্তাস্রোতে হঠাৎ বাধা উপস্থিত হইল। নিমন্ত্রিতেরা একে একে দুইয়ে দুইয়ে আসিতে লাগিলেন। স্ত্রী ও পুরুষের কল-হাস্যে মৌন ড্রইংরুম একেবারে মুখর হইয়া উঠিল। উকীল, ব্যারিষ্টার, কবি, ডাক্তার, লাট-সভার মেম্বর, ক্লাইভ ষ্ট্রীটের ব্যাঙ্কার—এমনি নানা শ্রেণীর লোকের সম্মেলন লীলাদের বাড়ীতে প্রায়ই হইত। লীলার স্বামী মনে করিতেন লাট-মন্ত্রী হইবার ইহাই একটা প্রধান উপায়। লাট-সভা আর মন্ত্রিত্বের স্বপ্ন লইয়া তাঁহার দিন কাটিত, আর লীলার কাটিত এই সব সম্মেলনে গৃহলক্ষ্মীর অভিনয়ে। স্বামী-স্ত্রীতে তাই বড় একটা দেখাই ঘটিত না।

রাজনীতি, সমাজনীতি, থিয়েটার, সিনেমা—কাব্য, অলঙ্কার, চিত্র, ভাস্কর্য্য—দুনিয়ার যা কিছু—মহাত্মা গান্ধী হইতে লেজল'র দোকান পর্য্যন্ত সকল বিষয়ের হাস্য-মুখর আলোচনা করিয়া বন্ধুরা যখন একে একে বিদায় লইতেছিলেন, তখন চিত্রকর বন্ধু লীলাকে জিজ্ঞাসা করিল—

"তা অরুণকুমারকে কখন্ আস্‌তে বল্‌ব?"

সেই সন্ধ্যায় বন্ধু এই দ্বিতীয়বার কথাটা লীলাকে জিজ্ঞাসা করিল। নিত্য নূতন লোকের সঙ্গে বন্ধুতা করার ইচ্ছা লীলার বড় একটা ছিল না। একটু তাচ্ছিল্যের ভাবে লীলা কহিল—

"কার কথা বল্‌ছেন? ও—আপনার সেই ভাস্কর বন্ধুটী বুঝি! তা' বলবেন আস্‌তে যখন তাঁর সুবিধে হয়। কাল স্বদেশী মেলায় গিয়ে তাঁর তৈরি কয়েকটা পুতুল দেখেছি। ছোট বটে—কিন্তু সে গুলো বেশ! অত বড় মেলাটার মধ্যে ওই কটাই মনে হ'ল দেখবার যোগ্য। শুন্‌লেম মূর্ত্তি গড়া তাঁর ব্যবসা নয়—সখ করে' দু' চারটে গড়েন-টড়েন।"

বন্ধু বলিল—"অরুণের বাড়ীর অবস্থা যেমন, তাতে পুতুল-গড়া-ব্যবসা তাকে কখনো করতে হ'বে না। ......রূপ যে কোথায় তা' অরুণ টপ্ করে' ধরতে পারে। অরুণের গড়া মূর্ত্তিগুলো দেখলেই মনে হয়, সে যেন তাদের হাত থেকে নামাতে চায় নি। যতক্ষণ পেরেছে, অন্তরের সমস্ত স্নেহ মমতা দিয়ে তাদের জড়িয়ে রেখেছে। এখনকার মত এই নিঃসঙ্গ জীবন যদি তার আর না থাকে; তা হ'লে দেখবেন, শুধু বাঙ্গালার কেন—ভারত-বর্ষের মধ্যে তার জোড়া শিল্পী পাওয়া ভার। আমি তো ছেলেবেলা থেকেই অরুণকে জানি। দু' জনে এক-সঙ্গে কয়েক বছর ইটালিতেও কাটিয়েছি। অরুণের একটা দুর্ব্বলতা আছে—সে বড় মুখ-চোরা। নিজের মনকে খুলে দেখাতে পারে না, কিন্তু মনের ভেতর যে ধারণাটা একবার সে করে—সে তাকে প্রাণপণে আঁকড়ে বসে' থাকে। বাহিরের কোনো অলঙ্কারকেই তার মন চায় না। শিল্পকলাকে সে ধরতে চায় অত্যন্ত সহজ ভাবে—একেবারে অনাড়ম্বর হয়ে। আমার মনে হয়, ভাস্কর্য্যের চেয়ে কবিতা আর দর্শন হলেই তার পক্ষে হয় ভাল। সে এত পড়েছে শুনেছে যে একদিন যদি দেখেন—অবাক্ হ'য়ে যাবেন।"

লীলা কহিল—"তা বেশ তো, আনবেন একদিন সঙ্গে করে।"

বিধবা মিসেস ঘোষ নিকটেই বসিয়াছিলেন। তিনিও সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ ঠিক ঠিক। আমিও অরুণকুমারকে দেখেছি। মিষ্টার বসু যা' বল্‌লেন, তার একবর্ণও মিথ্যে নয়।"

মিসেস ঘোষকে সকলেই জানিত বালিগঞ্জের গেজেট বলিয়া! তাঁহার অগম্য স্থল সেখানে ছিল না। তিনি যখন যে কথার ভিতর পড়িতেন তখনই এমন জোরের সঙ্গে নিজের মতটা প্রকাশ করিতেন যে তিল মাত্র সন্দেহ করিবার অবসর কাহারও থাকিত না। অরুণ-কুমারের নানা প্রশংসা করিয়া তিনি যখন বিদায় লইলেন, তখন একটী দীর্ঘাকৃতি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকায় ভদ্রলোক ধীরে ধীরে সম্মুখে আসিয়া লীলাকে নমস্কার জানাইলেন। তাহাকে দেখিয়াই লীলা বলিল—"মিষ্টার বসু, আপনি বোধ হয় এঁকে জানেন। মিষ্টার মোহিনী মিত্র ডাক্তার।"

বসু একটু হাসিয়া কহিল—"খুব জানি। আপনাদের গোবরডাঙ্গার বাগানেই তো ওঁর সঙ্গে দু' তিন বার দেখা হয়েছে। উনি যখন লণ্ডনে ডাক্তারি পড়তেন তখনো দেখা হয়েছে।"

কিছুক্ষণ লণ্ডনের প্রাচীন গল্প করিয়া চিত্রকর বসু উঠিয়া পড়িলেন এবং বিনয়ের সঙ্গে বলিলেন—"তা হ'লে আপনার যদি অনুমতি হয়, অরুণকে একদিন আনব। তাকে দেখলে আপনার মত বিদুষী নারীর আনন্দের সীমা থাকবে না। সে তো মানুষ নয়—যেন একটা স্বপ্নের রাজ্য।"

বাধা দিয়া লীলা বলিল—"বলেছি তো আনবেন এক-দিন। স্বপ্নরাজ্যের আমি বড় ধার ধারি নে। তবে কি জানেন, যে মানুষ সাদাসিধে—মনে মুখে এক, তার সঙ্গ আমার বড় ভাল লাগে।"

বসু বিদায় লইলেন। ডাক্তার মিত্র উৎকর্ণ হইয়া তাহার পদ-শব্দ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। উহা যখন সিঁড়ির নীচে একবারে মিলাইয়া গেল এবং মোটরের একটা ভর্‌-ভর ভর্‌-ভর ধ্বনি উঠিল, তখন লীলার আরও কাছে সরিয়া আসিয়া ডাক্তার বলিল—

"লীলা, কাল তা হলে তিনটের সময় কুঞ্জকুটীরে? কি বল?"

"তুমি কি তবে এখনো আমায় ভালবাস?"

সে কথা কাণে না তুলিয়া ডাক্তার মিত্র নিজের প্রশ্নটার উত্তরের জন্যই বার বার জেদ করিতে লাগিল। সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া মায়ার জাল পাতিয়া লীলা বলিল—

"ওঃ আজ দেখ্‌ছি অনেক দেরি হ'য়ে গেছে। আর বোধ হয় কেউ এখন এদিকে বেড়াতে আস্‌ছে না। উনি আবার গেছেন ভোটারদের বাড়ী। বোধ হয় ফিরে আসবার সময় হ'ল।"

ডাক্তার মিত্র এ কথাও শুনিল না। সে জোর করিয়া নিজের প্রশ্নের উত্তরটাই শুধু চাহিতে লাগিল। তখন লীলা বলিল—"সত্যি কি তুমি তাই চাও? শোন তবে। কাল সারাটা দিন আমার হাতে। কোনো কাজই দেখ্‌ছি নে। তিনটের সময় কুঞ্জকুটীরে আমার দেখা পাবে। তার পর দুজনে একটু বেড়াতে বেরুব।"

ডাক্তারের চক্ষু দুইটী মুহূর্ত্তে অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিল। একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া এইবার ডাক্তার লীলার ঠিক সম্মুখে আসিয়া বসিল। বসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—'অরুণকুমারটী কে লীলা? তুমি যাকে আস্‌তে বললে।"

"কৈ! আমি তো তাকে মোটেই ডাকি নি। বসু বল্‌লে শুনলে না। নিজেই একদিন সঙ্গে করে' আনবে। অরুণকুমার একজন বিখ্যাত ভাস্কর। সেদিন স্বদেশীমেলায় তার তৈরি মূর্ত্তি তো দেখেছ?"

"বুঝেছি। পুতুল গড়ে সে! ওরা তো জানি কদাচিৎ ভদ্রলোক হয়। আচ্ছা লীলা নূতন নূতন বন্ধুর জন্য তুমি এত ব্যস্ত হও কেন, জান্‌তে পারি কি?"

লীলা মুখ তুলিয়া কহিল—"যা শুন্‌লেম, অরুণকুমারের মধ্যে ভাস্কর্য্য বড় বেশী নাই। তার না কি আছে—কাব্য। তা যাক্‌ গে। তুমি যখন চাও না, তখন তার সঙ্গে না হয় না-ই দেখা হ'ল।"

ডাক্তার বলিল—"তোমার যে সময়টুকু দয়া করে' আমায় দাও, তার একটা মিনিটও আর কেউ ছিনিয়ে নেবে, তা আমি সইতে পারব না।"

একটু হাসিয়া লীলা উত্তর দিল—"আমার সময়টা তোমায় না দিয়ে অন্যকে দিয়েছি, এ নালিশ তোমার মুখে মানায় না, জান তো, কাল রাত্রে আমি মূক-অভিনয় দেখতে [illegible]"

"না গিয়ে বেশ করেছ। সে বাড়ী তোমার মত [illegible] লীলা।"

[illegible] কেন নয়?

"শুনবে! যে সব মেয়েরা সেখানে যায়, খোঁজ করলেই দেখবে তাদের নামের পেছনে একটা করে কালিমাখা কাহিনী লেগেই আছে। শুনেছ ত কস্তুরী-বাঈ দুর্নীতির সাহায্য করতে মজবুত। তুমি বুঝি বিশ্বাস করলে না?"

ডাক্তার তখন নিজের কথাটাকে প্রমাণ করিবার জন্য গোটাকতক দৃষ্টান্ত দিতে লাগিল।

আপনার চেয়ারের উপর গা ঢা ম্যা দিয়া, চেয়ারের দুই হাতলে দুইখানি হাত রাখিয়া এক পার্শ্বে গ্রীবা হেলাইয়া লীলা তখন ফুলদানীর কুসুম-স্তবকের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে হইল যেন তাহার সকল চিন্তা শূন্যে উড়িয়া গিয়াছে। তাহার সেই ক্লান্ত ও বিমর্ষ মুখখানি তখন এমন দেখাইতে লাগিল, যেন তাহার মন আর মনে নাই—হারাইয়া গিয়াছে। অন্তরের সেই ঘুমন্ত অবস্থায় লীলা যেন আরো বেশী লোভনীয় এবং কাম্য হইয়া উঠিল।

ডাক্তার মিত্র জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভাবছ লীলা! অভিভূতের ভাব হইতে নিজেকে খানিকটা মুক্ত করিয়া লীলা কহিল—"দেখ তোমার যদি আপত্তি না থাকে তা' হলে কাল আবার সেইদিকে বেড়াতে যাব, যেদিকে দুঃখীরা তাদের জীবন নিয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। যে সব পথে দৈন্যের ছাপ পড়েছে আমি তাই দেখতেই ভালবাসি।"

লীলার এই অদ্ভুত খেয়ালটা চরিতার্থ করিতে ডাক্তারের যে কোন আপত্তি নাই তাহা সে জানাইয়া দিল বটে, কিন্তু প্রতিবাদ করিতে ছাড়িল না। সে ইহাও কহিল যে আগেও অনেকবার এইরূপ খেয়াল মিটাইতে গিয়া সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছে। ইহাতে যে বিপদ আছে তাহা সে লীলাকে জানাইয়া দিল। কহিল,—"দু জনকে অমন স্থানে এক সঙ্গে দেখলে লোকে তো নানা কথাই বলতে পারে।"

লীলা কিছু বলিল না। শুধু মাথাটা নাড়িল।

ডাক্তার কহিল,—"তুমি কি বলতে চাও, কেউ আমাদের নিয়ে কথা-বার্ত্তা কয় না? বাজে লোকের স্বভাবই তো এই। তারা কিছু জানুক আর না জানুক ঢোল পিটিয়ে বেড়ায়।"

লীলা স্বপ্নাবিষ্টের মত ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ডাক্তার বিস্মিত হইল। বুঝিল, কি যেন একটা লীলাকে মানসিক যন্ত্রণা দিতেছে, অথচ লীলা চায় তাহা গোপনে রাখিতে। সম্মুখে ঝুঁকিয়া লীলার সেই স্বপ্নমাখা নয়ন দুইটির দিকে ডাক্তার ব্যগ্র হইয়া চাহিয়া রহিল।

ডাক্তারকে নিরুদ্বেগ করিবার জন্য লীলা বলিল;—"লোকে আমাকে নিয়ে কোনো কিছু বলে কি না তা' আমি জানি নে। যদি তারা বলেই—বলুক না। তাতেই বা কি এমন একটা!"

এ আলোচনাটাকে আর বাড়িতে না দিয়া ডাক্তার বিদায় লইল। যতক্ষণ দেখা গেল, লীলা শান্তভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর আবার সে তাহার চিন্তার সাগরে ডুবিল।

২

লীলার আজ মনে পড়িল সেই তাহার কৈশোরের কথা—দিনাজপুরে সেই তাহাদের প্রকাণ্ড বাড়ী—বাড়ীর সেই বিস্তৃত উদ্যান, গাছে গাছে আলোক ও ছায়ায় মাখা, জলে-জলে সিক্ত। সেই উদ্যানে বসিয়া দুঃখের কত দীর্ঘ দিনগুলি লীলা ভাবিয়া ভাবিয়া কাটাইয়াছে। উদ্যানের মধ্যে সেই বড় একটা দীঘি। আজ তারই কথা লীলার মনে পড়িল। আর মনে পড়িল বড় একটা বাদামগাছের নীচে শ্বেত মর্ম্মরে-গড়া জলদেবীর নগ্ন মূর্ত্তিগুলি। আহা! সেইখানে একখানা পাথরের আসনে বসিয়া লীলা কত কাঁদিয়াছে। কতদিন ভাবিয়াছে, দীঘির ওই স্থির শীতল জলে মরি না কেন? কেন যে তাহার মন তখন অমন হইত এখন পর্য্যন্তও লীলা তাহা জানিত না। সেই সময়ে যখন তাহার সকল কল্পনা, সকল চিন্তা চারিদিকের বাঁধ ভাঙিয়া নদীর বন্যার মত ছুটিয়া যাইত, যখন তাহার দেহ নানা দিকে পরিপুষ্ট হইয়া কত শঙ্কা মিশ্রিত কামনার উত্তেজনায় তাহাকে আকুল করিয়া দিত—তখন কেন যে সে অমন করিয়া কাঁদিয়া ফিরিত তাহা সে তখনো জানিত

না, এখনো বুঝিত না। তখন তাহার কেবলই মনে হইত যে জীবনটা যেন শুধু একটা শব্দ—শুধু একটা আকাজ্ঞা মাত্র। আর এখন? এখন সে বুঝিয়াছে যে সে ব্যাকুলতা তাহার আর নাই। সেকালের সেই আশার মরীচিকাও শেষ হইয়াছে। জীবন যে একটা বৈচিত্র্যহীন অতি সাধারণ বস্তু, এখন ইহাই তাহার ধারণা হইয়াছে।

এমন যে হইবে ইহা তাহার আগেই জানা উচিত ছিল। হায় রে! আগে কেন সে একথা বুঝিতে পারে নাই। তবে কি সমস্ত জীবনটাই লীলা একটা ভুলের উপর দিয়া চলিয়া গেল!

লীলা আপন মনে কহিল—"মাকে তখন দেখেছি—কি মহৎ ও উদার ছিল তাঁর হৃদয়—কেমন সরল ও সহজ ছিল তাঁর চাল-চলন, বসন-ভূষণ সবই। কিন্তু তাঁকেও তো তেমন সুখী দেখি নি। তাঁর চিন্তার ধারা ছিল আমার ধারার বিপরীত। কেন এমন হ'য়েছিল? কে জানে কেন! আমার তখন মনে হ'ত—চারদিকের আকাশ বাতাস কেবলই আমায় উত্তেজনা দিচ্ছে। যখন মনে হ'ত এর চেয়েও তীব্র উন্মাদনা কি ভবিষ্যতে পাব না! তখন আমি অন্তরে অন্তরে কি চেয়েছি—কিসের আশায় তখন বুক বেঁধেছি; দুঃখটা যে চারদিকে ছড়িয়েই আছে এ সতর্ক বাণী তো মার মুখে অনেক দিনই পেয়েছি। কেন তা উপেক্ষা করেছিলাম?"

বড় লোকের ঘরেই লীলার জন্ম হইয়াছিল। তাহার পিতা তখন নিজের বাহুবলে বিপুল ধনের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার একটা এঞ্জিনিয়ারিং কার্য্যের সামান্য বেতনের একজন এঞ্জিনিয়ার লীলার পিতা—বিলাতী শিক্ষার গুণে সেখানে অল্পদিনের মধ্যেই এতই ধনবান্ হইলেন ও প্রতিষ্ঠা পাইলেন যে যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহারা অবাক্ হইয়া গেলেন। সেই অপরিমিত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বিলাতে লীলার জন্ম হয়। নিজের দিকে তাকাইয়া লীলার পিতা দৈবকে অবিশ্বাস করিলেন। বিশ্বাস করিলেন শুধু পুরুষকারকে। মানুষ ভোগের যত কিছু কল্পনা করিতে পারে লীলার পিতার তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। ধর্ম্মকে তিনি মানিতেন [illegible] স্বীকার করিতেন না। তিনি বলিতেন শুধু যোগ্যতা ও পুরুষকার। তাহারই বলে তিনি বসুন্ধরাকে ভোগ করিতে লাগিলেন।

লীলার মা ছিলেন ইহার বিপরীত। এত ভোগের মধ্যে বাঁধা পড়িলেও তাঁহার অন্তর শুধু ত্যাগের দিকেই তাঁহাকে টানিত! এত আড়ম্বরের মধ্যেও তিনি অনাড়ম্বরই রহিয়া গেলেন, এত সাহেবীয়ানার মধ্যেও লীলার মা রহিলেন হিন্দু বাঙ্গালীর মেয়ে। স্বামীর সঙ্গে এই ঘোর বিরোধটায় তাঁহার মন এমনই ভাঙ্গিয়া গেল। লীলার দিকে চাহিলেই তাঁহার দুইটী চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত। শেষে যে দিন স্বামীর মুখের উপর চোখ রাখিয়া তিনি স্বর্গে গেলেন, লীলার পিতা সেই দিন বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার সর্ব্বস্ব তিনি হারাইলেন।

লীলার এবং তাহার মাতে কোনো দিনই বেশ একটা নিবিড় স্নেহের সম্বন্ধ ছিল না। মা বুঝিলেন, মেয়ের ধাতু স্বতন্ত্র হইয়াছে। মেয়ের বুদ্ধি যে অতিশয় তীক্ষ্ণ, কামনা ও আবেগ যে একেবারে সংযমহীন—কোনো বাধাই মানে না, মা ইহা জানিতেন এবং লীলার জন্যই স্বামীর সঙ্গে নিয়ত তর্ক বিতর্ক করিতেন। তিনি মনে মনে বুঝিতেন, লীলা তাহার পিতার ধর্ম্ম পাইয়াছে, মায়ের মত হয় নাই; স্বামীর দেহ ও মনের অতি তীব্র আকাজ্ঞাগুলি যে নিজেকে আজীবন বড় দুঃখই দিয়াছে একথা লীলার মা বুঝিয়াছিলেন এবং সেই আগুনে শেষে পুড়িয়াই মরিলেন। তাঁহার বড় দুঃখ রহিয়া গেল যে মেয়েকে স্বামীর জন্যই নিজের মত করিয়া গড়িতে পারিলেন না। লীলা যে ভোগাকাঙ্ক্ষারই দাসী হইয়াছে, বিলাসলীলার পায়ে আপনাকে বিকাইতেছে। সেজন্য তিনি লীলাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, কিন্তু লীলার পিতাকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই।

লীলার পিতা যখন দেখিলেন, কন্যা ঠিক তাঁহার মতই হইয়াছে তখন আনন্দিত হইলেন। লীলা যেন ছিল একটা সাম্রাজ্য। কে তাহাকে জয় করিয়া লইতে পারে এই জন্য স্বামী স্ত্রীতে দিবা নিশি যুদ্ধ চলিত। লীলা যখন পিতাকেই আদর্শ বলিয়া মানিয়া লইল তখন তাহার পিতা মনে করিলেন, তাঁহার একটা এত বড়ই জয় হইয়া গেল যে স্বয়ং সেকেন্দর পর্য্যন্ত তেমন জয়ের গৌরব ও আনন্দ কখনো পান নাই।

আজ স্বামী মিষ্টার গুহের নীরব ড্রইংরুমে বসিয়া একাকিনী লীলা আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে দেখিতে পাইল যে তাহার সকল অতীতের পশ্চাতে তাহার পিতাই রাজ্যেশ্বররূপে দাঁড়াইয়া আছেন। তাহার বাল্য ও কৈশোরের সকল সুখ ও সম্ভোগের একমাত্র বিধাতা পুরুষ হইয়া শুধু তাহার পিতাই সমস্ত অতীতটাকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। আর কেহ সেখানে নাই, আর কিছু সেখানে নাই। আজও লীলার মনে হইতে লাগিল, পৃথিবীর কোনো কন্যাই এমন পিতা লাভ করিবার সৌভাগ্য পায় নাই।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর নিঃসঙ্গ হইয়া লীলার পিতা যখন কলিকাতার ধনাঢ্য ও ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের মধ্যে নিজেকে আনিয়া সম্পূর্ণরূপে নিক্ষেপ করিলেন, তখন অন্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া লীলা দেখিল, তাহার পিতার মত এমন পুরুষ আর নাই। প্রকৃতি যাহাকে এত গুণ দিয়াছে, যাহার পরিপূর্ণ মনের ও দেহের শক্তি অসাধারণ—তাহার মত পুরুষ লীলার চোখে শুধু তাহার পিতাকেই দেখিল। আর কাহাকেও খুঁজিয়া পাইল না। লীলা হতাশ হইল —ভাঙিয়া পড়িল। ভাবিল তেমন পুরুষ না মিলিলে সে আজীবন কুমারীই থাকিবে।

লীলা ভাবিল একরকম, ঘটিল অন্যরূপ। বিপত্নীক লীলার পিতা বয়স্থা কন্যাকে ঘাড়ে করিয়া আর চলিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, দিন দিনই লীলা একটা বোঝার মত হইতেছে। তিনি হঠাৎ একদিন সেই বোঝাটাকে নামাইয়া ফেলিলেন। লীলা জানিল, তাহার স্বামি-গ্রহণের কাল আসিয়াছে। লীলা কাঁদিল, কিন্তু পিতার কথায় প্রতিবাদ করিতে পারিল না। একদিন রাত্রে লীলার স্বামী তাহাকে গ্রহণ করিলেন বটে—কিন্তু লীলা সেই স্বামীকে আদৌ লইতে পারিল না!

লীলার পিতা আজীবন কেবল বাহিরটাই চিনিতেন। একদিন দেখিলেন মিষ্টার সতীশ গুহ বুনিয়াদি বংশের সন্তান। বিদ্বান্ ও কার্য্যক্ষম এবং লাটের সভায় বাক্-পটু। তাহার উপর আবার বিলাত-ফেরত। তাহার অর্থ সামান্যই আছে বটে—আর না থাকিলেই বা কি? লীলার তো ধনের অভাব নাই। পিতার যথাসর্ব্বস্বই তো তাহার। তিনি আর বেশী কিছু অনুসন্ধান না করিয়া গুহের হাতেই লীলাকে ও লেক্ রোডের উপর অট্টালিকার মত সেই বাড়ীখানা অর্পণ করিলেন। বেঙ্গলব্যাঙ্কে তাঁহার নামের পরিবর্ত্তে লীলার নামে হিসাব খোলা হইল। তিনি মনে করিতেন ভালবাসা জিনিসটা কিছুই নয়—সমাগত উষার সঞ্চরণশীল রক্তাভ আলোক। সে আলোক আকাশে থাকে ভালই—যদি না-ই থাকে তাহাতেই বা ক্ষতি কি। তাহাতে দিনটার যে বিশেষ কিছু আসে যায় তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। ধনের গর্ব্ব, সম্পদের অহঙ্কার, মানের গৌরব এবং কামনার পরিতৃপ্তি ইহাই ছিল তাঁহার নিজের জীবনের একমাত্র কার্য্য। এ সবই তো লীলার হইল। তাহার সুখের জন্য ইহার অধিক আর কিসের প্রয়োজন! বিবাহের পর কন্যা-জামাতার নিকট বিদায় লইয়া দীর্ঘদিনের জন্য ইয়ুরোপ ভ্রমণ করিতে বাহির হইবার পূর্ব্বে মন-মরা লীলাকে ডাকিয়া তিনি গোপনে এই কথাই বুঝাইলেন। লীলা শুনিল, বুঝিতে পারিল না।

পিতার মনের সেই অত্যন্ত স্বাভাবিক অথচ একান্ত ভ্রান্ত ধারণাটার কথা মনে হইবামাত্র আজ লীলার মুখে একটু হাসি আসিল। সে হাসি তীব্র শ্লেষ-মিশ্রিত বিষাদের হাসি। আজ একাকিনী বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে লীলা তাহার অতীতের যত চিত্রই দেখিতে পাইল তাহাদের মধ্যে তাহার বিবাহিত জীবনের ছয় বৎসরের স্থানটাই ছিল সব চেয়ে অল্প! সে চিত্রও আজ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তাহার অন্তরে দেখা দিল। এই ছয় বৎসরের মধ্যে স্বামীর সঙ্গে এমন কিছুই তো ঘটে নাই যাহা সে স্ত্রীর স্বাভাবিক প্রণয়োচ্ছ্বাসের সঙ্গে ভাবিতে পারে। শুধুই মনে পড়িতে লাগিল কতকগুলি অপ্রিয় স্ফূর্ত্তি—তাহাও আবার বাদলা দিনের আকাশের মতই মলিন ও ঝাপসা। বিবাহের পর অতি অল্প কয়েকটা দিনের মধ্যেই লীলার গার্হস্থ্য-জীবন ফুরাইয়া গেল। শুধু যে ফুরাইল তাহা নয়—সে দিনের সকল স্মৃতিও তাহার মন হইতে মুছিয়া গেল। ছয় বৎসরের পর লীলার আর মনেই পড়িল না যে কেমন করিয়া স্বামীর সঙ্গে তাহার যোগ-সূত্র ছিন্ন হইয়াছে। তাহার সেই স্বামী যিনি প্রেমহীন, আত্মসুখ-পরায়ণ, চিররুগ্ন এবং একেবারেই কাব্যরস-বর্জ্জিত—তাঁহার ক্লাইভ ষ্ট্রীটের লোহার গুদামের লোহার মতই নীরস তিনি, কি ভাবে যে লীলা তাঁহার

উপর জয়ী হইয়াছে এবং পৃথিবীকে জানিতে না দিয়া বন্ধনের শিকল কাটিয়া অনায়াসে মুক্তি লাভ করিয়াছে আজ আর লীলা সে কথা আদৌ মনে করিতে পারিল না।

লীলার স্বামী বিবাহের পূর্ব্বেও যেমন, পরেও তেমনি —তেমনিই বা কেন, অনেক বেশী, কারণ অর্থ চিন্তা তো আর ছিল না—রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার মরীচিকার পশ্চাতেই ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সেই দিক্‌টায় জয়ী হইবার জন্ত লীলাকে অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিতেও ক্রটি করিলেন না। তাঁহার বাকি সময়টা কাটিতে লাগিল শ্বশুরের দান সেই লোহা-লক্কড়ের কারবারের হিসাব-নিকাশের সঙ্গে। বাড়ীতে লীলার ক্ষুধিত তৃষিত ভোগাসক্ত হৃদয় যে প্রতি মুহূর্ত্তে কাঁদিয়া দীর্ণ হইতেছিল তাহা দেখিবার অবসর মিষ্টার গুহের ছিল না। তিনি যখন দেখিলেন, লীলার পিতার বিপুল অর্থ তাঁহার পদলগ্ন হইয়াছে এবং কণ্ঠলগ্ন লীলা ছিঁড়িয়া পড়িয়া কোন্ অন্ধকারে হারাইয়া গিয়াছে, তখন তিনি মনে করিলেন একটা দায় হইতে বাঁচিলাম। নোঙরটা খসিয়া গেল, তরী এখন যেদিকে খুসি বাহিতে পারা যাইবে। লীলাও মনে করিল, যাহাকে ছাড়িবার উপায় নেই সে যখন নিজেই ছাড়িল, তখন কি অন্তর কি আচার—কাহারো কাছেই আর তাহার দায়িত্ব রহিল না। তাহারা তখন লেক রোডের সেই একই ধর্ম্মশালায় দুই অচেনা-যাত্রীর মত বাস করিতে লাগিল। যে প্রেম-ক্ষুধা লীলার অন্তরকে নিত্য দহন করিতেছিল, লীলা তখন পথ চাহিয়া রহিল সেই অমৃত-ধারার দিকে যাহার স্পর্শে আগুন নিবিয়া যায়—জ্বলে না। লীলা তো জানিত না যে সে ধারা ত্যাগের পথে, ভোগের পথে নয়।

লীলা যদি ইহা না জানিত যে তাহার স্বামী ধূর্ত্তের একশেষ ও শঠ—ইহা যদি সে না জানিত যে যখনই টাকার প্রয়োজন, শুধু তখনই মিষ্টার গুহ লীলাকে ছলে ভুলাইয়া তাহার ব্যাঙ্কের চেকে সহি করাইয়া লন—তাহা হইলেও সে হয় তো স্বামীকে অন্ততঃ একজন নিকট বন্ধু বলিয়া ভাবিতে পারিত। কিন্তু গুহ সাহেব লীলাকে সে অবসরও দিলেন না! তবুও লীলা বাহিরটাকে এমনই পরিষ্কার ও সুশৃঙ্খল রাখিল এবং গুহও তাহাকে সে বিষয়ে এমনি তাহারা বাহারা করিতে লাগিল যে লোকে জানিতে পারিল না যে লীলা আর গুহের মধ্যে লক্ষ-যোজন পথ অন্তর হইয়াছে।

নিজের চিন্তায় আত্মহারা লীলা করের উপর চিবুক রাখিয়া এক দৃষ্টিতে ঘরের ক্ষুদ্র আলোটার দিকে চাহিয়া রহিল। মনে হইল, তাহার নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো দৈববাণী শুনিবার আশায় সে তন্ময় হইয়া বসিয়া আছে। হঠাৎ সে দেখিল ব্যারিষ্টার বিজনকুমারের মূর্ত্তি। বিজনের মার্জ্জিত রুচি ও মনোহর বাক্‌চাতুরী তাহাকে সকলের কাছেই প্রিয় করিয়া তুলিত। উহা বিজনকেও কখনো ভাবিতে দেয় নাই যে সে যৌবনের কোটা পার হইয়াছে।

বিজন যে দিন লীলার প্রেম-ভিক্ষা করিল, লীলা সে দিন ধরা না দিয়া ধরিবার খেলা লইয়াই ব্যস্ত ছিল। ভাবিয়াছিল, সমস্ত জীবনটা এই অভিনয় করিয়াই কাটা-ইয়া যাইবে। ছলনার যতগুলি জাল ছিল, বিজনকুমার একে একে সবগুলি সাজাইল, কিন্তু লীলা ধরা দিল না—অতি সহজেই নিজেকে বাঁচাইয়া চলিল।

ইহার পর দুই বৎসর কাটিয়া গেল। তখন খেলা চলিতেছিল বিলাত-ফেরত প্রসিদ্ধ ডাক্তার মিত্রের সঙ্গে। হঠাৎ লীলা একদিন দেখিল যে সে ডাক্তারের কাছে ধরা পড়িয়াছে। লীলা ইহা জানিত যে ডাক্তার মিত্র তাহার যৌবনের সকল অনুরাগ এবং অন্তরের সরলতা দিয়া লীলাকে পাইবার জন্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। ধরা যখন পড়িল, তখন লীলা বলিল—"সে আমায় ভালো বেসেছে বলেই তো আমি ধরা দিয়েছি। সে তো আসেনি বিজনের মত খেলতে!" কি একটা অজ্ঞাত অথচ প্রবল স্বাভাবিক প্রকৃতি সেই সময়ে লীলাকে উত্তেজিত করিতেছিল। অন্তরের সেই গুপ্ত শক্তির আদেশ অবহেলা করিবার শক্তি তো লীলা কখনো অর্জ্জন করে নাই। তাহাকে বাধ্য হইয়াই উহার দাসী হইতে হইল। এই ব্যাপারটা যে ঘটিয়া গেল তাহার মূলে ছিল লীলার অর্দ্ধ চেতন অন্তরাত্মা। লীলা চিরদিনই ছিল সরলতার দিকে, সেই সরলতা যেদিন তাহাকে সরল ভাবে জানাইয়া দিল যে ডাক্তার মিত্র তাহাকে ভালবাসে, সে আর তখন সেই প্রেমাঞ্জলি উপেক্ষা করিতে পারিল না। যখন লীলা দেখিল, ডাক্তারের প্রেম তাহাকে পাইবার জন্ত কোনো দুঃখকেই দুঃখ বলিয়া গণনা করে না—কোনো কিছুকেই

বাধা বন্দিনী মানে না—তখন আর লীলা নিজেকে সামলাইতে পারিল না—নিজেকে দান করিয়া ফেলিল—পঙ্কে ডুবাইল! সে দিন ঘৃণা-মিশ্রিত দারুণ একটা লজ্জায় এবং তপ্ত অনুতাপে তাহার মনটা পুড়িয়া গেল।

লীলা দেখিল, সেদিন তাহার জীবনে এমন একটা ভীষণ ব্যাপার ঘটিয়া গেল যাহা লইয়া তাহাকে চিরকাল লুকোচুরি খেলিতে হইবে। স্বৈরিণী নারীর কলঙ্কের গান চারিদিক্ হইতে গুঞ্জন করিতে করিতে আসিয়া সে দিন লীলার কাণে প্রবলভাবে বাজিতে লাগিল! কিন্তু লীলা ছিল দাম্ভিকা ও অভিমানিনী। তাহার দানের মূল্য যে কত তাহা সে ডাক্তার মিত্রকেও জানিতে দিল না। সেই মূল্যটা ডাক্তার নিজে নিজে যতটুকু পারে বুঝুক এই ভাবিয়া লীলা তাহার মনের দারুণ ব্যথাটা গোপন করিল। ডাক্তার মিত্র লীলার সেই মর্ম্মবেদনা বুঝিতে পারিল না। দলিত ধর্ম্মের কাতর কণ্ঠ ডাক্তারের কাণে বাজিল না এবং অল্পদিনের মধ্যেই সে কণ্ঠটাও রুদ্ধ হইয়া গেল; তাহার পর যাহা রহিল, লীলা মনে করিল উহা বেদনাবিহীন নিরুপদ্রব নিরবচ্ছিন্ন শান্তি।

ইহার পর তিন বৎসর চলিয়া গেল। তিন বৎসরেই লীলার মন এমন হইয়া উঠিল যে, সে আর কোনদিকেই তাহার কোন অপরাধই দেখিতে পাইল না। ক্রমেই তাহার ইহাই ধারণা হইয়া গেল যে সে যাহা করিতেছে তাহাই স্বাভাবিক ও দোষ-লেশহীন—অনুদার আচারের গণ্ডীটা যে পার হইতে পারে, সেই সুখী হয়। তাহার চরিত্র নির্দ্দয় ভাবে হানিতে পারে এমন তো তাহার আর কেহ ছিল না—পিতাও না; কাজেই লীলা দেখিল, অনুতপ্ত হইবার কোন কারণই নাই। লীলা তখন মনে মনে একটা পরিতৃপ্তি লাভ করিল। সে দেখিতে পাইল এই নূতন সম্বন্ধের ডোর তাহাকে এমন একটা সুখের সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছে যে তাহার চেয়ে বেশী সুখ সে আর কখনো পায় নাই। লীলা ভালবাসে এবং ভালবাসা পায়—আর তবে চাই কি? ইহাই ছিল লীলার সেই সুখ যাহার জন্য সে তাহার সর্ব্বস্ব হারাইল। মধ্যে মধ্যে লীলার মনে হইত বটে যে এতদিন কাব্যে নাটকে সে যে অসহ্য পুলকের পরিচয় পাইয়া তাহারই স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছে—কৈ? তাহার জীবনে তো তেমন ঘটিল না! তখনই তাহার মন সন্দেহে আকুল হইয়া বলিয়া উঠিত—সত্যই কি মানুষ কখনো সেই বিপুল হর্ষের স্বাদ পায়?—না, উহা শুধুই কবির কল্পনা?

লীলা শুনিয়াছিল, ডাক্তার মিত্র যদিও বিদ্বান্ এবং ভদ্র—কিন্তু সহজে সে তুষ্ট হয় না। কখন কখনো বা উদ্ধত হইয়া উঠে। লীলা ভাবিল, তা' হউক, সে তো লীলাকে অকপটেই ভালবাসে। কাজেই তাহাকে প্রেম পরিতৃপ্তি দান এবং তাহারই সুখের জন্য নিজেকে রূপসী সাজাইবার আনন্দ—ইহাই ছিল লীলার পক্ষে ডাক্তার মিত্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সূত্র। লীলার অন্তর তাঁহাকে বলিয়া ছিল যে ডাক্তার মিত্র তাহাকে নবজীবন দিয়াছে। সে জীবন কবিকল্পনার অসীম পুলকে একান্ত মনোহর না হইতে পারে, কিন্তু উহা যে অন্ততঃ চলন-সই এবং কখন কখনো প্রীতি-প্রদও বটে তাহাতে আর লীলার সন্দেহ ছিল না।

লীলার জীবন যখন নিঃসঙ্গ ছিল তখন একটা অস্পষ্ট সংশয় এবং অনির্দ্দিষ্ট দুঃখ তাহাকে নিয়তই সাবধান করিত বটে, কিন্তু তাহার অন্তরতম অন্তর সত্যই যে কি চায়, তাহার পক্ষে যোগ্য কি, কি করিলে লীলার স্বভাবের সহিত সঙ্গতি রক্ষা হয়—সে সাবধান বাণী এ সকল সমস্যা পূরণ করিতে পারে নাই। ডাক্তার মিত্র তাহা করিয়াছিল। ডাক্তারের ভিতর দিয়াই যখন লীলা প্রথমে নিজেকে জানিতে পারিল তখন লীলার এই আত্ম-পরিচয় তাহাকে এক আনন্দময় বিস্ময়ের রাজ্যে লইয়া গেল। সে তো আগে কখনো এমন করিয়া নিজেকে বোঝে নাই।

কাল সায়াহ্নেই যে ডাক্তারের সঙ্গে লীলার কুঞ্জকুটীরে দেখা হইবে এই কথা মনে হইতেই লীলার হৃদয়ে আনন্দের একটা তরঙ্গ খেলিয়া গেল। আজ তিন বৎসর ধরিয়া ডাক্তারের এই কুঞ্জকুটীরেই তাহাদের দেখা সাক্ষাৎ ঘটিত। অধৈর্য্যের সঙ্গে গ্রীবা হেলাইয়া লীলা আপন মনে বলিল—"শুধু একটু ভালবাসার ভিখারিণী আমি—আর তো কিছু চাই নে।"

ক্রমশঃ

বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রামাণিক সংস্করণ

[শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ]

(২)

(পদ-নির্ব্বাচন)

প্রাচীন পদাবলীর প্রামাণিক সংস্করণ করিতে গেলে পদ-নির্ব্বাচন লইয়াই প্রথমে গোলযোগ উপস্থিত হয়। যদিও প্রাচীন পদ-কর্ত্তারা প্রায় সকলেই পদের শেষে ভণিতা দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু গায়ক ও লেখকদিগের ভ্রমপ্রমাদহেতু অনেক পদেই ভণিতা পাওয়া যায় না। আবার অনেক পদে প্রকৃত পদ-কর্ত্তার নামের পরিবর্ত্তে ভণিতায় অন্যের নামও দেওয়া হইয়াছে, দেখা যায়। এরূপ স্থলে বিশেষ প্রমাণের অভাবে প্রকৃত পদ-কর্ত্তা যে কে, তাঁহা স্থির করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে অশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ গায়ক বা লেখকদিগের ভ্রম-প্রমাদের দৃষ্টান্ত বিরল নহে; সুতরাং অনেক সময়েই বিশেষ বিচার ব্যতীত প্রাচীন পুঁথির লেখার উপর একান্ত নির্ভর করা যাইতে পারে না। বিদ্যাপতির পদের ভাষা মৈথিল। বাঙ্গালায় আসিয়া তাঁহার ভাষার অল্পাধিক বিকৃতি ঘটিয়া থাকিলেও, বাঙ্গালার তথাকথিত ব্রজবুলী-ভাষা হইতে উহার পার্থক্য ধরা যায়। এতাবৎ অন্যান্য বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তার পদ হইতে বিদ্যাপতির পদ বাছিয়া লওয়া অপেক্ষাকৃত সোজা হইলেও বিদ্যাপতির পদের বেলা, আর একটী গোলযোগের কারণ এই ঘটিয়াছে যে, বিদ্যাপতির 'কবিরঞ্জন' 'কবিশেখর' 'কণ্ঠহার' ইত্যাদি কয়েকটী উপাধি ছিল; সেইরূপ বাঙ্গালায়ও আবার 'কবিরঞ্জন'-নামা বিদ্যাপতি-উপাধিধারী পদ-কর্ত্তা ছিলেন; সুতরাং এই সকল নামের অনেক পদ যে একত্র মিশিয়া গিয়াছে, ইহা সহজেই অনুমেয়। বস্তুতঃ এরূপ কারণে বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে অন্যান্য পদ-কর্ত্তার রচিত অনেক পদ প্রবেশ করিয়াছে। বিশেষ সতর্ক বিচার দ্বারা ঐ সকল পদের নির্ণয় করিয়া, উহাদিগকে বিদ্যাপতির প্রামাণিক সংস্করণ হইতে বাদ দিতে হইবে।

নগেন্দ্র বাবুর সম্পাদিত সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণে ভ্রমবশতঃ রায় শেখর, বল্লভ, চম্পতি, ভূপতি প্রভৃতি পদ-কর্ত্তাদিগের বহুসংখ্যক পদ এবং অজ্ঞাত পদ-কর্ত্তারও অনেক পদ বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। আমরা এক একজন পদ কর্ত্তার নাম ধরিয়া সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব। প্রথমে রায় শেখরের কথাই ধরা যাউক।

নগেন্দ্র বাবুর ২৬ সংখ্যক "পথ-গতি নয়নে মিলল রাধা কান" ইত্যাদি পদটীতে কবিশেখরের ভণিতা আছে। কবিশেখর যে, বিদ্যাপতির একটা উপনাম বা উপাধি ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার প্রাচীন বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তা রায় শেখরও যে, তাঁহার অনেক বাঙ্গলা ও ব্রজ-বুলীর পদে 'কবিশেখর' নামে ভণিতা দিয়াছেন, ইহাও সর্ব্ব-বাদি-সম্মত বটে। নগেন্দ্র বাবু ভ্রমবশতঃ বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তা রায়শেখর ওরফে কবিশেখরের অনেকগুলি ব্রজবুলীর পদ বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে অসঙ্গতরূপে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। নিম্নে ঐ সকল পদের সংখ্যা দেওয়া যাইতেছে, যথা—

নগেন্দ্র বাবুর সংস্করণের ২৬, ১২৮, ১৭৮, ১৮৭, ১৮৯, ১৯৩, ২৩৬, ২৪৯, ২৫২, ২৫৩, ২৫৫, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৭৫, ২৭৬, ২৯০, ২৯২, ৩০২, ৩১৬, ৪৩৬, ৫৪৫, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৫২, ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৯১ সংখ্যক পদ।

এই ২৮টী পদ যে, বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তা কবিশেখর অর্থাৎ রায় শেখরের রচিত উহার বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও আভ্যন্তরীণ (Internal) প্রমাণ আছে। আমরা নিম্নে সেই প্রমাণগুলির উল্লেখ করিতেছি।

(১) উল্লিখিত সকলপদ গুলিই রায় শেখরের রচিত অষ্ট-কালীয় লীলা-বিষয়ক "দণ্ডাত্মিকা" গ্রন্থে পাওয়া যায়। রায়শেখর কেবল স্বরচিত পদ-দ্বারাই ঐ গ্রন্থ সঙ্কলিত

করিয়াছেন, ইহাই বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রসিদ্ধি বটে। বস্তুতঃ দণ্ডাত্মিকা-গ্রন্থে 'রায়শেখর', 'শেখর', 'কবিশেখর' 'রায়' ইত্যাদি নামের ভণিতা পাওয়া যায় না। এই সকল পদের প্রায় পনের আনা পদ যে, রায়শেখরের রচিত সে বিষয়ে কোনও মতভেদ নাই ; এ অবস্থায় বাকি এক আনা পদ রায়শেখর কি জন্যে যে, 'কবিশেখর'-ভণিতা-যুক্ত বিদ্যাপতির পদ হইতে আত্মসাৎ করিবেন, তাহার কোনও কারণ দেখা যায় না। সুতরাং বিরুদ্ধ প্রমাণের অভাবে এই পদগুলি রায়শেখরের পদ বলিয়াই গ্রহণ করাই সঙ্গত।

(২) এই পদগুলির মধ্যে কোনও পদই মৈথিল 'রাগতরঙ্গিণী' কিংবা বিদ্যাপতির পদাবলীর তাল-পত্রের পুঁথিতে পাওয়া যায় নাই। এগুলি কবিশেখর-উপাধি-ধারী বিদ্যাপতির রচিত হইলে, ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ দুই চারিটা পদেরও মৈথিল রূপান্তর (Version) মিথিলায় অবশ্য পাওয়া যাইত।

(৩) এসকল পদের ব্রজবুলীর সহিত সাধারণতঃ বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষার কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা বিশেষজ্ঞদিগের পক্ষে একান্ত অসম্ভব নহে। নগেন্দ্র বাবু তাঁহার সংস্করণের ভূমিকায় বিশেষভাবে ২৫৩ ও ২৯০ সংখ্যক পদ দুইটীর রচনা বিদ্যাপতির ব্যতীত আর কাহারও বলিয়া মনে হয় না—এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম-ভাবে বিচার করিলে, ঐ পদ-দ্বয়কে যে, বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তার রচনা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তাহা আমরা অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী গ্রন্থের ভূমিকার ১৵—১৵০ পৃষ্ঠায় সবিস্তারে প্রদর্শিত করিয়াছি ; বিশেষ-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা অনুগ্রহ করিয়া পড়িয়া দেখিবেন। আমরা এখানে উহা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ বাড়াইব না।

(৪) বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তা রায় শেখর শ্রীমহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি সখীর অনুগা অভিমানে তাঁহার পদাবলীতে সেই অনুগার উপযোগী সে সকল সেবা-কার্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, বিদ্যাপতির পদে কুত্রাপি সেইরূপ সেবাকার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং ভাষা ও ছন্দোগত ৩য় প্রমাণের ন্যায় এই ভাবগত আভ্যন্তরীণ ৪র্থ প্রমাণ দ্বারাও নিঃসন্দেহে ঐ পদগুলি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ-ভুক্ত বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তার রচিত বলিয়াই জানা যাইতেছে। পাঠকদিগের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য আমরা উল্লিখিত পদগুলি হইতে সখীর অনুগার উপযোগী সেবা-কৌশলের কয়েকটা দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

(ক) "শেখর পন্থ পর মিলল যাই।
আনল নাগর ভেটল রাই॥"
[২৩৬ সং পদ।

(খ) "যতনহি নিঃসঙ্ক নগর দুরন্তা।
শেখর অভরণ ভেল বহন্তা।"
[২৫৩ সং পদ।

(গ) "শেখর বুঝি তব করি কত অনুভব
দুহুঁ সঙ্গ ভঙ্গ করায়॥"
[২৬৫ সং পদ।

(ঘ) "কহ কবিশেখর সুন্দরি রাহি।
ধৈরজ ধর হয় আনব যাহি॥"
[৩০২ সং পদ
ইত্যাদি।

(৫) উল্লিখিত পদ গুলির মধ্যে দুইটী পদের ভণিতায় স্পষ্টতঃ 'রায়' উপাধির উল্লেখ আছে, যথা—

"কহ কবিশেখর রায়।
ধরম সরম লাগি ও রস নিভায়॥"
[৫৯৭ সং পদ।

ভণিতার এক কোণে ক্ষুদ্র কিন্তু মিলের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য রায় শব্দটা যে লুকাইয়া ছিল বিদ্যাপতির নূতন পদ-সংগ্রহে আগ্রহাতিশয্য ও ব্যস্ততা হেতু নগেন্দ্র বাবু বোধ হয় উহা লক্ষ্য করেন নাই ; করিলে অবশ্যই তিনি অন্ততঃ এই পদটা বিদ্যাপতির বলিয়া গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন ; কেন না, 'কবিশেখর' বিদ্যাপতির উপনাম থাকিলেও তাঁহার যে, উহার উপরে আবার এক-টা "রায়" পদবী ছিল, ইহা আজ পর্য্যন্ত কেহ বলেন নাই।

নগেন্দ্র বাবুর ২৯০ সংখ্যক পদের ভণিতা 'পদ-কল্পতরু' ও 'পদরসসার' পুঁথি গুলিতে এইরূপ পাওয়া গিয়াছে, যথা—

"তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ
জিবন মঝু অগুসার।
রায় শেখর বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিনি বিথার॥"

নগেন্দ্রবাবু পাঠ ধরিয়াছেন—

"তোরিতে চল অব কিসে বিচারহ
জীবন মঝু অগুসার।
কবিশেখর বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিন বিথার॥"

এই পদের ধুয়া ব্যতীত প্রত্যেক অৰ্দ্ধ কলিতে নিম্নরূপ মাত্রা বিভাগ দেখা যায়, যথা—

৩+৪ ৩+৪
৩+৪+৩=২৪মাত্রা।

সুতরাং নগেন্দ্রবাবুর 'তোরিতে' 'জীবন' ও 'কবি-শেখর'—পাঠগুলির দ্বারা যে, ছন্দঃপতন ঘটিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। 'তোরিতে' ও 'জীবন' পাঠের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক; কেন না, উহাতে ছন্দঃপতন ব্যতীত আর কোন দোষ ঘটে নাই। কিন্তু 'রায়শেখর' স্থলে 'কবি-শেখর' পাঠ এক-টা মারাত্মক পাঠ-বিভ্রাট নহে কি? আমরা প্রমাণাভাবে ইহা বলিতে চাহি না যে, নগেন্দ্রবাবু নিজের কোনও স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যেই এরূপ অসঙ্গত পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি কোনও পুঁথিতে 'কবিশেখর' পাঠই পাইয়া থাকিবেন; কিন্তু 'পদকল্পতরু'র 'রায় শেখর' পাঠের স্থলে 'কবি শেখর' পাঠ গ্রহণ করার পূর্ব্বে তাঁহার বুঝা উচিত ছিল যে, এখানে 'কবি শেখর' পাঠ গ্রহণ করিলে ৭ মাত্রার স্থলে এক মাত্রা কম হইয়া ছন্দোভঙ্গ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু 'পদকল্পতরু'র 'রায় শেখর' পাঠ লইলে ছন্দো-রক্ষা ও পদকল্পতরুর প্রামাণিক পাঠের সম্মান-রক্ষা উভয় উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়। নগেন্দ্র বাবুর অনুকরণে দারভাঙ্গার হিন্দী সংস্করণের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামবৃক্ষ শর্ম্মা মহাশয় 'কবি শেখর' পাঠ গ্রহণ করিতে যাইয়াও, ঐ পাঠে ছন্দঃ-পতন অনিবার্য্য বুঝিয়া, উহাকে জবরদস্তী করিয়া 'কবী শেখর' বানাইয়া ছন্দের মাত্রা পূরণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, ইহা তাঁহার ছন্দোজ্ঞানের পরিচায়ক হইলেও, 'কবি' স্থলে 'কবী' পাঠের কল্পনা একটটা অদ্ভুত ব্যাপার বটে। বেণীপুরী মহাশয় নিশ্চিতই পদকল্পতরু দেখেন নাই; দেখিলে তাঁহাকে এজন্য এরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইত না।

(৬) বড়ু চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" গ্রন্থে ব্রজ-লীলার 'জটিলা', 'জরতী', 'ললিতা', 'সুবল' ইত্যাদি নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। চণ্ডীদাসের সম-সাময়িক কবি বিদ্যাপতির পদাবলীতেও ইহাদের উল্লেখ নাই। 'কবি শেখর' ও শেখর' ভণিতার উল্লিখিত কোন কোন পদে কিন্তু 'জরতী', 'জটিলা' ও 'ললিতা' নাম পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা দ্বারাও বুঝা যায় যে, ঐ পদগুলি বিদ্যাপতির রচিত নহে। আমরা নিম্নে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিতেছি, যথা—

(ক) "ইহ রস কহনী কহই।
জরতিক উচিত বচন তহিঁ রচই।
(১৯৩ সং পদ)

["জরতিক—জটিলার"—নগেন্দ্র বাবুর টীকা]

(খ) "কী করব কহ মোরে সুবল সজ্যাতি।
পুনশ্চ—"বোধি সুবল কহ শুন গুণমন্ত।
শেখর কহ ধনি মিলন নিতন্ত॥"
(২৫৫ সং পদ)

(গ) "ললিতা ললিত কহি তুহ বেশ খণ্ডিত
সজাওত অনুপম সাজ॥
পুনশ্চ—"অরুণ উদয় ভেল জটিলা শব্দ পাওল"
(২৬৩ সং পদ)

(ঘ) "শুনি ধনি জটিলা তোরিতে চলি আওল"
"জটিলা বচনে সুধামুখি নিয়ড়হি
একদিঠি হেরই বয়ান॥"
(৫০৩ সং পদ)

(৭) শ্রীরাধার দিবাভাগে সূর্য্য-পূজার ছলে বৃন্দাবনের বনাভ্যন্তরে নির্জ্জনে সূর্য্য-মন্দিরে অভিসার বিদ্যাপতির কোন পদে বর্ণিত হয় নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'গোবিন্দ-লীলামৃত' কাব্য রায় শেখরের 'দণ্ডাত্মিকা' প্রভৃতি পরবর্ত্তী কাব্যেই ঐ প্রসঙ্গই দেখা যায়; সুতরাং "কবি শেখর" ভণিতার ২৭৫ সংখ্যক পদে ঐ প্রসঙ্গ থাকায় উহাও

আমরা রায় শেখরের রচনার নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ বলিয়াই বিবেচনা করি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কবি শেখর অর্থাৎ রায় শেখরের ২৮টী পদ নগেন্দ্রবাবু অসঙ্গতরূপে তাঁহার বিদ্যাপতির সংস্করণে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

এখন আমারা 'বল্লভ' ভণিতার কয়েকটী পদ লইয়া নগেন্দ্রবাবু যে কৌতুকজনক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ক্ষণদা-গীতচিন্তামণির "আজু হম পেখল কালিন্দি কূলে" ইত্যাদি পদের ভণিতায় আছে—

"বল্লভ উজ্জল নিকষ সমান।
নিজ তনু পরিখ হেম দশবান॥"

গীতচিন্তামণির সঙ্কলয়িতা হরিবল্লভ ওরফে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার স্বরচিত বহু পদেই "হরিবল্লভ" নামের সংক্ষেপে "বল্লভ" ভণিতা দিয়াছেন। আলোচ্য পদটীও যে তাঁহার রচিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সংস্কৃত সাহিত্যে পারদর্শী ও 'শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃত' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থগুলির প্রণেতা উক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় উদ্ধৃত ভণিতার শ্লিষ্ট 'বল্লভ' শব্দের সাহায্যে নিজের নামের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাধার বল্লভ শ্রীকৃষ্ণকেও বুঝাইয়াছেন। এখন নগেন্দ্রবাবুর একটা সম্পাদন-সূত্র এই যে, ভণিতাশূন্য কোন পদেও যদি বিদ্যাপতির পদের সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তাহা হইলে উহাকে বিদ্যাপতির পদ, দৈবাৎ ভণিতাহীন হইয়া পড়িয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে। এই পদ-টার 'বল্লভ' শব্দের শুধু শ্রীকৃষ্ণ অর্থ গ্রহণ করিয়া, ইহাকে ভণিতাহীন পদ মনে করিয়া নগেন বাবু ঐ ৮৯ সংখ্যক পদ ও তদ্রূপ শ্লিষ্ট 'বল্লভ' ভণিতাযুক্ত ৯০, ১৩৬, ১৭৭, ২৫৭, ২৮৪ ও ৫৯০ সংখ্যক পদগুলি বিদ্যাপতির পদাবলীতে স্থান দিয়াছেন। এই পদগুলি ভণিতা-হীন মনে করিয়াই তিনি এরূপ করিতে পারিয়াছেন। 'বল্লভ' শব্দের আড়ালে পদ-কর্ত্তা 'হরিবল্লভ' লুকাইয়া আছেন এবং প্রয়োজন হইলে, তিনি নগেন্দ্র বাবুর এই অন্যায় কার্য্যের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন, ইহা বুঝিতে পারিলে, নিশ্চিতই তিনি এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। কেন না, বিদ্যাপতির 'চম্পতি' 'ভূপতি' ইত্যাদি যত উপনামই থাকুক না কেন, তাঁহার 'বল্লভ' বলিয়া একটা উপনাম ছিল, ইহা নগেন্দ্র বাবুও তাঁহার সুদীর্ঘ ভূমিকায় কুত্রাপি বলিতে সাহস পান নাই। ফলতঃ পদ-কর্ত্তা হরিবল্লভ ভণিতায় 'শ্লেষ' অলঙ্কার প্রয়োগের অপরাধে নগেন্দ্র বাবুর এক তরফা বিচারে নিজের ছয়টী সুন্দর পদের স্বামিত্ব হারাইয়া বসিয়াছেন। যাঁহারা গীতরচনায় এখনও ভণিতার ব্যবহার করেন * ভরসা করি এখন হইতে তাঁহারা সতর্ক হইবেন; ভুলিয়াও এরূপ শ্লিষ্ট ভণিতার ব্যবহার করিবেন না।

'বল্লভ'-ভণিতার পদের প্রসঙ্গে নগেন্দ্র-বাবুর মতে এক প্রকার বেওয়ারিশী মাল ভণিতাহীন পদের কথা উঠিয়াছে। নগেন্দ্র বাবু এই বে-ওয়ারিশী মালগুলির উপর কিরূপ জবরদস্তী চালাইয়াছেন, এখন তাহাই দেখা যাউক।

নগেন্দ্র-বাবুর সংস্করণে ২, ৩৩, ৪৫, ৪৬, ৬৫, ৭০, ১০২, ১০৯, ১১১, ১৪৩, ১৫৬, ২৩৮, ২৭৭, ৩২৩, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৮২, ৩৮৫, ৩৯৮, ৪০৩, ৪০৯, ৪১৫, ৫২৯, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৯, ৫৭২, ৫৭৪, ৬২২, ৬২৩, ৬৩৬, ৬৩৯, ৭৩৪, ৭৪১, ৭৫১, ৭৭৪, ৮২৫, সংখ্যক মোটে ৩৮টী পদ ভণিতাহীন দেখিয়া বিদ্যাপতির রচিত বিবেচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু এই পদগুলিকে বিদ্যাপতির রচনা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। ইহার মধ্যে ২।৪টী পদের রচনার সহিত বিদ্যাপতির রচনার কিছু সাদৃশ্য আছে; কিন্তু বাকি পদগুলির সম্বন্ধে ততটুকুও বলা যায় না। অপিচ ইহার মধ্যে ১১১, ২৩৮, ৪০৯, ৫৭২ ও ৬২৩ সংখ্যক পদগুলি প্রকৃত পক্ষে ভণিতা-হীন নহে; নগেন্দ্র বাবু কোন পুঁথিতে উহা ভণিতা-হীন অবস্থায় পাইয়া থাকিলেও ১১১ সংখ্যক পদে পদ-কল্পতরুতে গোপালের, ২৩৮ সংখ্যক পদে গীত-চিন্তামণিতে হরিবল্লভের, ৪০৯ সংখ্যক পদে পদ-কল্পতরুতে গোবিন্দদাসের, ৫৭২ সংখ্যক পদে গীত-চিন্তামণিতে হরিবল্লভের, ও ৬২৩ সংখ্যক পদে পদকল্পতরুতে গোবিন্দদাসের ও পদরত্নাকরে ঘনশ্যামের ভণিতা আছে। অতএব এই পদগুলিকে বে-ওয়ারিশী মাল বলিয়া বিদ্যাপতির নামে দাবী করা চলে না। যদি ভণিতা-হীন ব্রজ-বুলীর পদে ভাষা-গত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখিয়াই ঐ পদ বিদ্যাপতির বলিয়া গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে

* পূর্ব্ববঙ্গের ত্রিপুরাজেলার অন্তর্গত শ্যাম-গ্রাম-নিবাসী সাধক-প্রবর স্বর্গ-গত ভুবন চন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার অধিকাংশ মালসী গানে "ভুবন মন-লোভা" ইত্যাদির ন্যায় শ্লিষ্ট-বিশেষণ-যুক্ত ভণিতা দিয়া গিয়াছেন। খুঁজিলে অন্য গীত-কর্ত্তারও এরূপ শ্লিষ্ট ভণিতা পাওয়া যাইবে।—লেখক

এরূপ বা ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আরও অনেক ভণিতাহীন ব্রজবুলী পদ বিদ্যাপতির পদাবলীতে সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে। আমরা এরূপ কতকগুলি পদ "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলীর "অজ্ঞাত পদ-কর্ত্তা" শীর্ষকে সন্নিবেশিত করিয়াছি। উহার মধ্যে এমন দুই চারি-টী অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব পদ আছে, যাহা বিদ্যাপতির উৎকৃষ্ট পদের সহিত তুলনায় অযোগ্য নহে। নগেন্দ্র বাবু গীত-চিন্তামণির 'হরিবল্লভ'-ভণিতার উল্লিখিত দুই-টী পদেই ভণিতায় বড়ই কৌতুক-জনক পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। ২৩৮ সংখ্যক পদের ভণিতা আছে—

"হরিখে বরিখে ফুল
সব সখী শিখিকুল
হরিবল্লভ গুণ গান।"

নগেন্দ্র বাবুর ধৃত পাঠ :—

"হরিখে বরিসে ফুল সব শাখী
শিখিকুল দুহু গুণ গান॥"

বোধ হয় নগেন্দ্র বাবুর দৃষ্ট গীত-চিন্তামণির সংস্করণে মুদ্রাকর ভ্রমে "হরিবল্লভ" শব্দ-টী পড়িয়া যাওয়ায়, তিনি সেই শব্দের স্থলে প্রচলিত রীতি অনুসারে ত্রুটি-চিহ্ন না দিয়া, ঐ পঙ্‌ক্তি দুইটাকেই শুদ্ধ বিবেচনায় এ ভাবে সাজাইবার চেষ্টা করিয়া, প্রথম পঙ্‌ক্তির ছন্দ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। শিখিকুলের গান গাওয়া একান্ত অসম্ভব না হইলেও আজ পর্য্যন্ত কোন কবিই কর্কশ-কণ্ঠ শিখি-কুলের দ্বারা গান গাওয়ান নাই; "সুতরাং এরূপ বর্ণনায় 'কবি-সময়-বিরুদ্ধতা' নামক অলঙ্কার দোষ ঘটে। পক্ষান্তরে আমাদের প্রকাশিত শুদ্ধ পাঠ ধরিলে অর্থ হয় যে, সখীরা শ্রীরাধা-কৃষ্ণের উপর পুষ্প-বর্ষণ করিতেছেন; আর শিখিকুলও তরু-শাখায় থাকিয়া শাখার সঞ্চালন দ্বারা পুষ্প-বর্ষণ করিয়া, সখীদিগের যুগল-সেবা-কার্য্যের সহকারিতা করিতেছে। (পদ-কর্ত্তা) হরিবল্লভ ইহা দেখিয়া (শ্রীরাধা কৃষ্ণের) গুণ-গান অর্থাৎ পদ-রচনা দ্বারা গুণ-কীর্ত্তন করিতেছেন। এরূপ অর্থও বুঝা যায় যে, হরিবল্লভ সখীগণ ও শিখিকুলের বর্ণিত-রূপ সেবা-কৌশল দেখিয়া, উভয়ের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতেছেন। কেন না, বৃন্দাবনের শিখি-কুলের যে সৌভাগ্য ঘটিয়াছে, পদ-কর্ত্তার পক্ষে মানব-দেহে উহাও যে সুদুর্ল্লভ।

৫৭২ সংখ্যক পদে গীতচিন্তামণিতে ভণিতা আছে :—

"সব কানন ভরি পরিমল ভাণ।
হরিবল্লভ অলিকুল গুণ গান॥"

নগেন্দ্র বাবু পাঠ ধরিয়াছেন—

"সব কানন ভরি পরিমল ভান।
অলিকুল দুহু জন গুণ গান॥"

ছন্দোজ্ঞ ব্যক্তিগণকে বলিতে হইবে না যে, নগেন্দ্র বাবুর ২য় পঙ্‌ক্তিতে 'চৌপাঈ' ছন্দের নির্দ্দিষ্ট ১৫ মাত্রা স্থলে ২ মাত্রা কম থাকায়, পঙ্‌ক্তিটী অপাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে; উহাতে সহজে সংশোধিত করারও উপায় নাই। নগেন্দ্র-বাবু বটতলার অশুদ্ধ "গীতচিন্তামণি" হইতে পাঠ গ্রহণ করার জন্যই বোধ হয় এরূপ গোলযোগ ঘটিয়াছে। তথাপি পাঠকদিগের সতর্কীকরণ জন্য নাজাই মাত্রার স্থলে ত্রুটি-চিহ্ন দেওয়াই সঙ্গত ছিল।

নীরস বিষয়ের আলোচনা পড়িয়া বোধ হয় অনেকেরই ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছে। তাই আজ আমরা এখানেই আলোচনা ক্ষান্ত করিব। আগামী সংখ্যায় আমরা "চম্পতি", "ভূপতি" প্রভৃতি পদ-কর্ত্তাদিগের যে সকল পদ নগেন্দ্র বাবু অবিচারে বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, উহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

চিত্রা

(গল্প)

[শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়]

ক

তিনমাসের ছুটি নিয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি— মনের খুসিতে, যেন লাগাম-খোলা ঘোড়া!

সম্প্রতি ভুবনেশ্বরে আস্তানা গেড়ে খণ্ডগিরি দেখতে এসেছি।

'উড়ে' বল্‌তে যে খালি পাল্কীর বেহারা, জলের কলের কুলি-মিস্ত্রি বা তেলে-ভাজা খাবারের দোকানদার প্রভৃতি বুঝায় না, উৎকলের এই-সব গুহা আর মন্দিরে তার প্রমাণ রয়েছে অগুন্তি। আধুনিক উড়িষ্যার দেশে দেশে পথে পথে হাট-বাজারে বেড়ালে উড়িয়াদের দেখলে মন বিশেষ প্রসন্ন হয় না। সেখানেও যে-সব কলহপ্রিয়, নোংরা, ভীরু উড়িয়া পুরুষ আর হাঁটু-পর্য্যন্ত-কাপড়-তোলা নাকে-কাণে-বেয়াড়া-গয়না-পরা, গায়ে হলুদ-মাখা উৎকল তরুণী বিচরণ করে, তাদের কেউই পথিকের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত নয়।

কিন্তু এই যে অগণ্য চিরমৌন পাথরের মূর্ত্তি আর লতা-পাতা-ফুল বিচিত্র সাক্ষীর মত, উড়িষ্যার গৌরবোজ্জ্বল সেকালের অপূর্ব্ব বার্ত্তা একাল পর্য্যন্ত বহন ক'রে আনছে, এদের দিকে একবার চোখ ফেরালে উৎকলবাসীদের প্রতি শ্রদ্ধায় মন একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, সত্য-সত্যই।

কি-ক'রে অমন একটা জাতি যে আজ বাঙালী-জাতেরও চেয়ে এমন অমানুষের সমষ্টি হয়ে পড়েছে, উড়িষ্যা দেশে বেড়াতে এলে সেই কথাটাই মনকে বারংবার নাড়া দিতে থাকে।

সারাদিন খণ্ডগিরির গুহায় গুহায় বিস্মিত মনে বেড়িয়ে বেড়ালুম। তার শিখরে জৈন মন্দিরের পাশে 'স্বর্গ-সভা'য়, দাঁড়িয়ে বিভোর চোখে চমৎকার সূর্য্যাস্ত-শোভা দেখলুম। সে যেন বিশ্বশিল্পীর ধ্যানের ছবি। তার পর নির্জ্জন বনভূমির শিয়রে চির-জাগ্রৎ নীলাকাশের গা থেকে যখন সূর্য্যের রাঙা হাত-বুলানোর দাগ একেবারে মিলিয়ে যায় নি, তখন পাহাড় থেকে নেমে এসে ডাক-বাংলোর ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম।

আসবার সময়ে দুটি জিনিষ লক্ষ্য করলুম। আকাশের একদিকে কষ্টিপাথরের মত কালো একখানা মেঘ, আর পাহাড়ের তলায় একদল নূতন যাত্রী। এমন অসময়ে খণ্ডগিরি দেখতে এসেছে যে যাত্রীরা, তাদের বুদ্ধির গোড়ায় গলদ আছে নিশ্চয়।

খ

খণ্ডগিরির ডাক-বাংলোখানি বেশ। সবুজ পাহাড়ের নিরিবিলি কোলের ভিতরে সে আছে, ছোট্ট এক ঘুমন্ত শিশুর মত। তার চারিধারে দিন-রাত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে কাননের কলহাস্য আর বনের পাখীর গানের ছন্দ। এখানে প্রজাপতিরা ডানা নাচিয়ে চোখের সামনে রঙের মাধুর্য্য লীলায়িত ক'রে যায়, মধুপেরা অশ্রান্ত ভাষায় বনফুলদের স্তব-পাঠ করে। স্থির করলুম, আজকের রাতটা এইখানে সুমধুর বনবাসেই কাটিয়ে দেব—ব'সে ব'সে কবির চোখে দেখব, চাঁদের আলোয় খণ্ডগিরিকে কেমন মানায়।

বনভূমির একটি নিজস্ব ভাষা আছে। সে-ভাষা যে শুনতে জানে, সে বোঝে। দিনে নয়, বনের সে-ভাষা রাতেই বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সঙ্গীর সাথে নয়, একলা থাকলেই মনের মাঝে বনের ভাষার মানে ধরা যায়। মাটির গন্ধ তখন যেন ফুলের গন্ধের সঙ্গে কথা কয়, চাঁদের আলো তখন যেন সবুজ পাতার সঙ্গে আলাপ করে, ঝিল্লীর তান তখন যেন অরণ্যের অন্তরালে লুকানো অন্ধকারের সঙ্গে কাণাকাণি করতে থাকে।

ইচ্ছা ক'রেই ডাক-বাংলোর ভিতরে আড্ডা গাড়লুম বটে, কিন্তু একটু পরেই বুঝলুম, ইচ্ছা না করলেও আজ আমাকে এইখানেই থাকতে হ'ত।

রাত্রের আহারের ভিতরে কিঞ্চিৎ বিলাসিতার সংযোগ

করবার লোভে, বাংলোর উড়িয়া রক্ষীকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, এখানে মুর্গী পাওয়া যায় কি না। সে বলেছিল ও-জিনিষটি এখানে খুব সস্তাতেই পাওয়া যায়। এই অকল্পিত আনন্দ-সংবাদ শুনে আমি ভারি খুসি হয়ে বৈকালে তাকে একটাকার মুর্গী কিনে আনতে পাঠিয়েছিলুম। বেটা ঢেঁকিরাম ঘণ্টা-চারেক পরে এখন ভুবনেশ্বর থেকে মস্ত-একটা বস্তা ঘাড়ে ক'রে ফিরে এসেছে।

আমি আশ্চর্য্য স্বরে বললুম, "কিরে, একবস্তা মুর্গী আন্‌লি না কি? এত সস্তা!"

"হাঁ বাবু" ব'লে সে বস্তার মুখ খুললে। বেটা এক টাকার মুর্গী নয়, একবস্তা মুড়্‌কি কিনে এনেছে!

রামপক্ষী ভক্ষণের উচ্চাকাঙ্ক্ষার এই শোচনীয় পরিণাম দেখে দুঃখে নুয়ে প'ড়ে আবার রাগে সিধে হয়ে উঠলুম—বস্তার উপরে মারলুম এক লাথি এবং বস্তাবাহকের গলায় দিলুম এক ধাক্কা।

উড়িয়া-জাত-কে-জাতের উপরেই বিরূপ হয়ে চুপ ক'রে ব'সে আছি, এমন সময়ে আচম্বিতে বাইরে একটা ভীষণ গর্জ্জন জেগে উঠল।

তাড়াতাড়ি জান্‌লায় মুখ বাড়িয়ে দেখি, বিষম এক দুরন্ত ঝড় প্রকাণ্ড একখানা কালো মিশমিশে মেঘকে ঊর্দ্ধশ্বাসে আকাশের বুকের উপর দিয়ে হু-হু ক'রে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে!

দেখতে দেখতে পৃথিবীর চেহারা বদ্‌লে গেল একেবারে। চারিদিকে স্পর্শাতীত কালির নির্ঝর ঝরিয়ে, ধুলো-বালির পুঞ্জ উড়িয়ে, বনের গাছপালা দুলিয়ে, বাংলোর দরজা-জান্‌লাগুলোকে দুদ্দাড়িয়ে আছড়ে ঝড় ছুটোছুটি করতে লাগল, পাগলের মতন চ্যাচাতে চ্যাচাতে। এত অল্প সময়ের ভিতরে যে ঝড়ের এমন তোড় হ'তে পারে আমি তা জানতুম না,—পাহাড়ের উপর থেকে হুড়্‌মুড় ক'রে অনেকগুলো পাথর নীচে গড়িয়ে পড়তে লাগল, ঘরের ভিতরে আমার ব্যাগটা পর্য্যন্ত যেন কোন অদেখা হাতের ঠেলায় ছিট্‌কে দেয়ালের কাছে চ'লে গেল!

জান্‌লা-দরজা সব বন্ধ ক'রে দিলুম—তবু যে কোথা থেকে ঝোড়ো হাওয়া ঘরে ভিতরে ঢুকে নানানরকম অদ্ভুত আওয়াজ করতে লাগল, কিছুই বুঝতে পারলুম না।

সহরে ব'সে বরাবরই শান্ত ঝড়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। কিন্তু বুনো ঝড়ের বিদ্রোহিতা যে কি ভয়ানক, তার চীৎকার ও উৎপাত যে কি বর্ণনাতীত, আজ এই পাহাড়ের পায়ের তলায় ব'সে প্রথম তা টের পেলুম।

যে-চাঁদকে উপভোগ করবার জন্যে এখানে ডেরা পেতেছি, সে যে আজ মুখ দেখাবে না, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই। আর যে-যাত্রী-গুলোকে আজ বোকার মত অসময়ে পাহাড়ে উঠতে দেখেছি, এতক্ষণে তাদের অবস্থা যে কি-রকম হয়ে উঠেছে, তাও একবার ভেবে দেখবার চেষ্টা করলুম।

হঠাৎ দ্বারের উপরে ঘন ঘন করাঘাত! নিশ্চয় ঝড়ের কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে কেউ আশ্রয় খুঁজছে। হয়তো সেই যাত্রীরাই!

তখনি উঠে দরজা খুলে দিলুম। প্রবল একটা দম্‌কা হাওয়ার সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক এলোমেলো কাপড়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল!

লণ্ঠনের আলো তার মুখের উপরে পড়বামাত্র আমার চোখ চম্‌কে ও বুকের কাছটা দুপ্‌দুপিয়ে উঠল!

এবং পর-মুহূর্ত্তে ঝড়ের ধমকে লণ্ঠনের আলো দপ ক'রে নিবে গেল!

অন্ধকারের ভিতরেই শুনতে পেলুম, স্ত্রীলোকটার কণ্ঠ থেকেও যেন বিস্ময়ের আওয়াজ ফুটে উঠল।

তাহ'লে সেও আমাকে চিনতে পেরেছে?

৩

দশ বছর আগেকার সেই দিনের কথা মনে হ'ল—যে দিন চিত্রার সঙ্গে আমার শেষ দেখা।

তখন তার বয়স সতেরো, আর আমার বয়স বাইশ।

ছয় ছেলের কোলে একটি বৈ মেয়ে নয়, চিত্রা ছিল তাই তার বাপ-মায়ের বুকের দুলালী। বাপ তাই মেয়েকে ভালো ক'রে লেখাপড়া শেখাতে ত্রুটি করেন নি এবং সে সতেরোয় পা দেবার আগে তার বরের জন্যে মাথাও ঘামান নি।

আমরা চিত্রাদের পাশের বাড়ীতেই থাকতুম, তাদের সঙ্গে আমাদের মেলামেশাও ছিল খুব। তবে চিত্রার বাপ ছিলেন পয়সাওয়ালা লোক আর আমার বাবা

আপিসের সামান্ত কেরাণী। কিন্তু এজন্যে আমাদের মেলামেশায় কোন বাধা হয় নি।

চিত্রা ছিল চিত্রের মতই চমৎকার। তার দেহ-আকাশের উপর দিয়ে সর্ব্বদাই রূপের বিদ্যুৎ লীলায়িত হয়ে যেত।

যেমন রূপসী সে, তেমনি চুলবুলে। কখনো সে একটুও স্থির হয়ে ব'সে থাকতে পারত না—এই নাচছে-গাইছে, এই ছুটোছুটি ক'রে আছাড় খাচ্ছে, এই লোকের সঙ্গে খুনসুড়ি করছে!

অতি প্রখর ছিল তার জিভ! যখন সে একরত্তি মেয়ে, তখনি কেউ তার সঙ্গে কথায় এঁটে উঠতে পারত না। একটু এদিক্-ওদিক্ হ'লেই লোকের সঙ্গে সে ঝমাঝম ঝগড়া বাধিয়ে দিত এবং ঝগড়ায় তাকে হারাতে পারতুম কেবল আমি। তার কারণ, সে যত ঝগড়া করত, আমি তত হাসতুম। তার কথার ঝাঁঝ যত বাড়ত, আমার হাসিও তত বেড়ে উঠত। শেষটা আমার সেই অশ্রান্ত হাসির কাছে হার মেনে চিত্রা প্রথমে কেঁদে তারপর হেসে ফেলত। আবার আমাদের ভাব হয়ে যেত।

আমি তাকে ভালোবাসতুম, সেও নিশ্চয় আমাকে ভালোবাসতো। এই ভালোবাসা যে আমরা দুজনেই প্রাণের ভিতরে অনুভব করতুম, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

তাদের বাড়ীর পিছনে একটা পুকুর ছিল এবং সেই পুকুরের পাড়ে ছিল মস্ত একটা আমগাছ।

চিত্রার আব্দারে একবার সেই গাছের উপরে উঠে আম পাড়তে গিয়ে আমি পুকুরের ভিতরে প'ড়ে যাই। তাই দেখে আকুল স্বরে কেঁদে উঠে সেও আমাকে বাঁচাবার জন্যে জলের ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার সেই আকুল স্বর আজও আমার স্মৃতির জগতে বেঁচে আছে। সেইদিন আমরা দুজনেই ডুবে যেতুম, কারণ আমরা দুজনেই সাঁতার জানতুম না। ভাগ্যে তার চীৎকারে চাকর-বাকররা এসে পড়ল, নইলে আজ আর এ কাহিনী লিখতে হ'ত না।

আমার বয়স যখন আঠারো, আপিসের কাজে বাবাকে হঠাৎ একবার পশ্চিমে বদলি হ'তে হয়, তিন বৎসরের জন্যে। বাবার সঙ্গে আমিও যাই। সেই তিন বৎসর চিত্রাকে যে কত ভেবেছি, তার আর কোন হিসাব নেই।

কলকাতায় ফিরে এসে বাবা অন্য পাড়ায় বাড়ী ভাড়া করলেন বটে, আমি কিন্তু রোজই অন্ততঃ একবার ক'রে গিয়ে চিত্রাকে দেখে আসতুম।

কিন্তু আগেকার চিত্রাকে আর ফিরে পেলুম না! এই তিন বৎসরের ভিতরে আমি ছাড়া তার আরো অনেক বন্ধু হয়েছে। বেথুনে সে যাদের সঙ্গে পড়ত, তাদের অনেকের বাড়ীতে চিত্রা বেড়াতে যেত—তাদের কারুর নাম 'মিলি,' কারুর নাম 'রুবি,' কারুর নাম 'গার্লি'। ফিরে এসে যখন সে মহা উৎসাহের সঙ্গে এই মিলি-রুবি-গার্লির ভাইদের ঐশ্বর্য্য আর কেতাদুরস্ত সাহেবিয়ানার বর্ণনা করত, তখন তা আমার কাণে মোটেই মধুবর্ষণ করত না।

এই ফিরিঙ্গিআনার আবর্ত্তে প'ড়ে দিনে দিনে চিত্রাও যে বিচিত্রা হয়ে উঠছে, চোখের উপরে তা স্পষ্ট দেখতে লাগলুম। সর্ব্বদাই তার সেই "ভ্যানিটি ব্যাগ" নিয়ে নাড়াচাড়া, কথা কইতে কইতে হঠাৎ মাঝে মাঝে মুখের উপরে "পাউডারের পাফ" আর ঠোঁটের উপরে "লিপ-ষ্টিক্" বুলানো আর লজ্জাশীলতার হানিকর হাল-ফ্যাসানের অদ্ভুত পোষাক পরা আমার অনভ্যস্ত দৃষ্টির উপরে যেন চিমটি কেটে দিত।

একদিন তার ফিরিঙ্গিআনার প্রতিবাদ করাতে চিত্রা কৃত্রিম মিহি স্বরে আমাকে ব'লেছিল, "পুওর বয়! তুমি একালে জন্মেচ ব'লে আমি অত্যন্ত দুঃখিত!"

তবু আমার ভালোবাসা তাকে ভুলতে পারে নি। এবং সেও যে আমাকে অপছন্দ করত, আমার এমন সন্দেহ হবার কোন কারণও হয় নি। আমাকে দেখলে সে যে খুসি হ'ত আর আমার সঙ্গে গল্প করতে সে যে আগেকার মতই ভালোবাসত, এটা আমি তখনো বেশ বুঝতে পারতুম।

একুশ বৎসর বয়সে আমার বাবার কাল হ'ল এবং পর বৎসরেই আমি সুখ্যাতির সঙ্গে এম-এ পাস করলুম।

পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীতে ঘটকের উপদ্রব এবং আমার কাঁধের উপরে আর একটি প্রাণীকে নিক্ষেপ করিবার জন্য আত্মীয়-স্বজনের আগ্রহ অত্যন্ত

বেড়ে উঠল। আমার এই নূতন বিপদের কথা যখন চিত্রার কাছে তুলতুম, সে নিশ্চিন্ত ভাবে বলত, "বিয়ে করবে, তার জন্যে এত ভাবনা কিসের ?"

ভাবনা যে কিসের, কথায় কথায় একদিন তা ব'লে ফেললুম।

বৈকালে চিত্রাদের বাগানে দুজনে বেড়াতে বেড়াতে গল্প করছি, হঠাৎ একটা প্রজাপতি এসে আমার গায়ের উপরে বসল। তাকে উড়িয়ে দিলুম, তবু সে আমাকে ছাড়লে না।

চিত্রা সকৌতুকে বললে, "অরু, তুমি একটী ভাগ্যবান্ কুকুর! এইবারে নিশ্চয় তোমার বিয়ে হবে। লোকে বলে ফুল ফুটলেই প্রজাপতি গায়ের ওপরে এসে বসে।"

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "আমার সঙ্গে তোমারও গায়ের ওপরে যেদিন প্রজাপতি এসে বসবে, সেইদিনই আমার ফুল ফুটবে, তার আগে নয়।"

—"কেন ?"

—"আমাদের দুজনের ফুল একসঙ্গেই ফুটবে। কারণ তোমাকে ছাড়া আর কারুকে আমি বিয়ে করব না!"

চিত্রা দাঁড়িয়ে প'ড়ে বিরক্ত স্বরে বললে, "অরু, তুমি কি ঠাট্টা করচ ?"

আমি গম্ভীর হয়ে তার চোখের উপরে দৃষ্টি স্থির ক'রে বললুম, "না চিত্রা, আমি ঠাট্টা করচি না। তুমি তো জানোই, তোমাকে ছাড়া আর কারুকে আমি ভালো বাসতে পারব না।"

চিত্রা অল্পক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর সাম্‌নের ডালিয়া-ফুলের গাছে আঙুল দিয়ে আঘাত করতে করতে ধীরে ধীরে বললে, "অরু, তোমাকে আমি বন্ধু ছাড়া আর কিছু ব'লে ভাবি না। আর তোমাকে হয়তো আমি বিয়েও করতে পারতুম, যদি তোমার অবস্থা ভালো হ'ত। আমাকে বিয়ে করলে তুমি তো আমার খরচ চালাতে পারবে না, অরু!"

এই অভাবিত কথা চিত্রার মুখে যেমন অশোভন, তেমনি কঠোর শোনালো। আমি আর মুখ তুলে তার মুখের পানে তাকাতে পারলুম না, তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলুম। এই সেই চিত্রা, আমার জন্যে একদিন যে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল!

চিত্রা আবার বললে, "আর এক কথা, অরু! তুমি কি জানোনা মিলির ভাই মিঃ চৌধুরীকে বিয়ে করব ব'লে আমি কথা দিয়েচি!"

কোনরকমে নিজের দুর্ব্বলতা সামলে সেখান থেকে আমি চ'লে—না, একরকম পালিয়েই এলুম।

তার পরের কথা আর বিস্তৃত ভাবে না বললেও চলবে। যথাসময়ে মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে চিত্রার বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়েছিলুম, কিন্তু সে আমন্ত্রণ আমি রক্ষা করিনি—করতে পারিনি।

চিত্রার বিবাহের পরেই সরকারি উচ্চপদ পেয়ে আমি কলকাতা ত্যাগ করেছি এবং ইতিমধ্যে এ খবরও পেয়েছি যে, বিবাহের চার বৎসর পরেই চিত্রার ধনবান্ স্বামী দেউলে হয়ে অত্যধিক মদ্যপানের ফলে পরলোকে প্রস্থান করেছেন।

আজ আমি ধনবান্, কিন্তু এখনো অবিবাহিত।

এগারো বৎসর পরে এই ঝটিকাক্লিষ্ট বিষণ্ণ সন্ধ্যায় আজ আবার আচম্বিতে সেই চিত্রার দেখা পেলুম!

৩

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অতীতের অনেক ছবিই মনের পটে ফুটে উঠল।

খোলা দরজার ভিতর দিয়ে ঝড়ের ঝাপটার সঙ্গে বিদ্যুতের তীব্র, অগ্নিময় উল্লাস বারংবার ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে লাগল।

চিত্রা বললে, "অরু, শীগ্‌গির দরজা বন্ধ ক'রে দাও, আমার বড্ড শীত করচে।"

দরজা বন্ধ ক'রে লণ্ঠনটা আবার জ্বেলেই দেখি, চিত্রা এর মধ্যেই নিপুণ হস্তে তার এলোমেলো কাপড় আর চুলগুলো সামলে গুছিয়ে নিয়ে একখানা ছোট্ট আরসি সামনে ধ'রে, মুখের উপরে পাউডারের তুলি বুলোচ্ছে।

সে দৃশ্য ভালো লাগল না।

লণ্ঠনের আলোতে দেখলুম, এই এগারো বৎসরে চিত্রার যৌবনের তারুণ্য ম্লান হয়নি কিছুমাত্র। দুই চোখে সেই চপল দৃষ্টি, ঠোঁটের উপরে সেই চটুল হাসির নাচ। হালফ্যাসনের পোষাকের ভিতরে দেহকে তেমনি

যথাসাধ্য প্রকাশ করবার অশিষ্ট চেষ্টারও অভাব নেই এবং সে পোষাক হিন্দু বিধবারও পোষাক নয়। যার সঙ্গে ছেলেবেলায় কত খেলা খেলেছি, যার স্মৃতি এখনো আমি নিত্য পূজা করি, এ চিত্রাকে দেখলে সে চিত্রাকে মনে পড়ে না। ঝিলি-রুবি-গার্লির দল আমার সে চিত্রাকে হত্যা করেছে।

চিত্রা আমার দিকে কৌতুক-ভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে ভঙ্গিভরে ভেঙে প'ড়ে বললে, "অমন ক'রে আমার পানে চেয়ে আছ কেন? আমি কি বড্ড বুড়ো হয়ে গেছি? আমাকে দেখলে ঘেন্না হয়? কিন্তু অরু, তুমি আমারও চেয়ে ঢের বেশী বুড়ো হয়ে পড়েচ! অরুর মাথায় টাক! অরুর চুল পাকা! অরু, my darling, it's funny to think of it even!"

আমি তার কথায় কাণ না পেতে তার দিকে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিলুম। তারপর জিজ্ঞাসা করলুম, "চিত্রা, তুমি কোত্থেকে এখানে এলে?"

—"দাদা আর বৌদিদিদের সঙ্গে বেড়াতে এসেচি। ঝড়ের লক্ষণ দেখে তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে নেমে আস্‌ছিলুম, কিন্তু তার আগেই ঝড় উঠল। দাদা আর বৌদিদিরা একটা গুহার ভেতরে ঢুকে পড়লেন। কিন্তু আমি তখন প্রায় পাহাড়ের নীচে এসে পড়েচি, ঝড়ের তোড়ে আর ওপরে উঠতে না পেরে কোনরকমে ছুটে এইখানে পালিয়ে এলুম। কিন্তু ভাগ্যিস্ এসেচি—ভগবান্‌কে ধন্যবাদ—এখানে না এলে তোমার দেখা তো পেতুম না!"—ব'লেই সে সিগারেট-কেস বার ক'রে ফস্ ক'রে একটা সিগারেট ধরালে।

আমি শুক্‌নো স্বরে বললুম, "এ উন্নতি আবার কবে থেকে হ'ল?"

চিত্রা সিগারেটটী বিশেষ এক কায়দায় দুই আঙুলে টিপে ধ'রে বললে, "অরু, my boy! তুমি বিদেশে থাকো, কলকাতার উচ্চ-সমাজের আদব কায়দা জানোনা তো! দু-এক পেগ হুইস্কি, দু-চারটে সিগারেট না হ'লে সেখানে আজকাল চলে না। আমার স্বামী—poor fellow—খুব cultured gentleman ছিলেন, তিনি এ-সব নিজেই আমাকে শিখিয়েচেন।"

—"শুনে সুখী হলুম।"

হঠাৎ বাংলোর খুব কাছেই বিকট অট্টহাস্যে ঝড়ের ভৈরব হুঙ্কার পর্য্যন্ত ডুবিয়ে, আমাদের প্রাণকে স্তম্ভিত ক'রে ভীষণ এক বজ্র পৃথিবীর উপরে এসে আছড়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে চিত্রাও কাতর আর্ত্তনাদ ক'রে দুই হাতে প্রাণপণে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগল! আমার আনত-দৃষ্টির তলায় চিত্রার ভীতিবিহ্বল সুন্দর মুখ—সে মুখের উপর থেকে মুহূর্ত্তমধ্যে একেলে বিকৃত সভ্যতার কৃত্রিম মুখোস খ'সে পড়ল!—আমি আবার সেই চিত্রাকে দেখতে পেলুম—যে কিশোরী ছিল আমার মরমের মরমী, আমার সুখ-দুঃখের প্রিয়তমা, আমার মনের ঠাকুর-ঘরের দেবী-প্রতিমা!...

কিন্তু অনেক কষ্টে আমি তার মোহময় রক্তাধরের লোভ সংবরণ ক'রে, ধীরে ধীরে তার নিবিড় ভুজবন্ধনের ও পেলব বক্ষের উত্তপ্ত স্পর্শ থেকে নিজেকে বিমুক্ত ক'রে নিলুম। মৃদু-স্বরে বললুম, "চিত্রা, চিত্রা, এমন ক'রে আমাকে পাগল কোরোনা। তুমি স্থির হয়ে বোসো। বাজ দূরে পড়েচে, তোমার কোন ভাবনা নেই।"

চিত্রা আবার চেয়ারের উপরে ব'সে প'ড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "অরু, ঐ বাজকে আমি ভারি ভয় করি। আমার কেবলি মনে হয়, বজ্রাঘাতেই আমি মারা পড়ব।"

—"ও-সব কথা ভেবোনা চিত্রা! তুমি একটু বোসো, তোমার জন্যে আমি কিছু খাবার যোগাড় করতে পারি কিনা দেখি।"

চিত্রা খপ্ ক'রে হাত বাড়িয়ে আমার একখানা হাত ধ'রে বললে, "না অরু, যেওনা। তুমি এইখানে বোসো। তোমার সঙ্গে আমার দরকারি কথা আছে।"

আমি অগত্যা ব'সে বললুম, "কি কথা চিত্রা?"

চিত্রা কিছুক্ষণ নীরবে কি যেন ভাবতে লাগল। তারপর বললে, "তোমার সঙ্গে অনেকদিন আমার দেখা হয় নি। এর মধ্যে কত বার তোমাকে চিঠি লিখব ভেবেচি, কিন্তু লজ্জায় তা পারিনি।"

আমি বললুম, "তাহ'লে এখনো তোমার শরীরে লজ্জা আছে চিত্রা?"

—"আমি যা বলি, শোনো অরু! আমাকে আঘাত কি বাধা দেবার চেষ্টা কোরো না। এক সময়ে তুমি আমাকে

ভালোবাসতে। তুমি কি এখনো আমাকে ভালোবাসো ?"

—"সে কথা জেনে তোমার কোন লাভ নেই।"

—"আচ্ছা, সে কথা জানতে চাই না। লোকের মুখে শুনেছি, তুমি এখনো বিবাহ কর নি। এ কথা কি সত্যি ?"

—"হ্যা।"

—"কেন তুমি বিবাহ কর নি ?"

—"তোমার ও-প্রশ্নেরও উত্তর আমি দেব না। ওটা আমার গুপ্তকথা।"

—"বেশ। গেজেটে প্রায়ই তোমার নাম দেখি। তুমি মোটা মাইনের চাকরি কর। তুমি একলা মানুষ, তোমার খরচ-পত্তর খুবই কম। এতদিনে বেশ দু-পয়সা জমিয়েচ বোধ হয় ?"

—"তোমার এ অনুমান মিথ্যা নয়। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও ?"

—"মনে আছে, একদিন তুমি আমাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলে ?"

—"হ্যা, সেদিনের কথা কোন দিন আমি ভুলব না। কারণ সেইদিনেই তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে আমার সারা-জীবন নষ্ট ক'রে দিয়েচ।"

—"কিন্তু যে কারণে সেদিন তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলুম, সে কারণ আর নেই।"

—"তোমার কথার অর্থ কি ?"

—"তুমি এখন আমাকে বিবাহ করতে পারো।"

—"বিবাহ, বিবাহ ? তোমাকে বিবাহ ?"

—"হ্যা অরু, আজ আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি আছি।"

—"কি বলচ চিত্রা !"

—"আমি বিধবা ব'লে কি তুমি ইতস্তত করচ ? তুমি কি বিধবা-বিবাহের বিরোধী ?"

—"না চিত্রা, বিধবা-বিবাহে আমার অমত নেই। সংসারে আমি একলা, আমি বিধবা-বিবাহ করলে কেউ আমাকে বাধা দিতে আসবে না।"

—"You darling !" ব'লেই চিত্রা খুসি মুখে দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর আমার দুই কাঁধের উপরে দুই হাত রেখে সে আবার বললে, "Just for those words I am grateful……You have warmed my heart !"

না, এ অসহনীয়—এ অসহনীয় ! তার হাত দুটো আমার কাঁধের উপর থেকে জোর ক'রে নামিয়ে দিয়ে আমি তীক্ষ্ণ স্বরে বললুম, "চিত্রা, আজ তুমি আমাকে বিবাহ করতে চাও। কিন্তু কেন ?"

—"আমি তোমাকে ভালোবাসি।"

—"কিন্তু যে ভালোবাসা টাকা-আনার হিসাব রাখে, সে ভালোবাসাকে আমি স্বীকার করি না। যখন আমি গরিব ছিলুম তখন তুমি আমার পানে ফিরে তাকাও নি। আজ আমি গরিব নই, তাই তুমি আমাকে বিবাহ করতে চাও। চিত্রা, আমার প্রাণ পণ্যদ্রব্য নয়। যে-চিত্রাকে আমি ভালোবাসতুম, সে আজ অতীত স্মৃতির অরণ্যে হারিয়ে গেছে—তোমাকে আমি ভালোবাসি না !"

চিত্রার ভ্রূ সঙ্কুচিত হ'ল—চোখে আগুন জ্ব'লে উঠল ! দাঁতে ঠোঁট কামড়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে ঝাঁঝালো স্বরে সে বললে, "কি, তুমি আমাকে অপমান করতে সাহস কর ?"

—"তোমার মান-অপমান আছে চিত্রা ? তাহ'লে আবার শোনো, আমি তোমাকে ভালোবাসি না—আমি তোমাকে ঘৃণা করি !" ব'লেই দ্রুতপদে পাশের ঘরে এসে আমি দরজা বন্ধ ক'রে দিলুম।… ..

বাইরে ঝড়ের তাণ্ডবলীলার ভিতর দিয়ে ভয়ঙ্করের বিজয়-যাত্রা সমান চলছিল। একটা জানলা খুলে দিয়ে বাইরের ঝড়কে ঘরের ভিতরে ডেকে আনলুম। বিদ্যুতের ঘন ঘন চমকে দেখলুম, পাহাড়ের উপরকার কালো কালো ভূতের মতন গাছগুলো যেন যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ক্রন্দন-স্বরে মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে পড়ছে !

আমার মনের জগতে আজ যে ঝড় উঠেছে, তাকে দেখবার লোক এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। নিয়তি আজ সেখানে অশ্রুর পূর্ণকুম্ভ নিষ্ঠুর আঘাতে উপুড় ক'রে দিয়েছে, তার তিক্ত ধারা শুকোবে না, ইহজীবনে আর কখনো শুকোবে না।
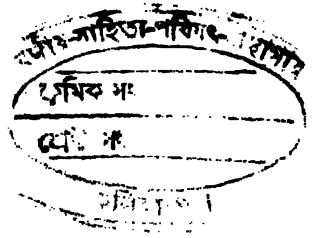
স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র

[স্যর শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, সি, আই, ই]

সাহিত্যিক ও স্বদেশানুরাগী সুধীবৃন্দ বঙ্গভাষার ও বঙ্গসাহিত্যের বিগত শত বৎসরের ক্রমবিকাশ ও উন্নতির ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইবেন। এ দেশে যাহাকে প্রচলিত কথায় ইংরাজি যুগ বলে, তাহা রীতিমত আরম্ভ হইবার সময় হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যে নবজীবন সঞ্চার হইয়াছিল। সে যুগের নূতন শিক্ষা,—রাষ্ট্রীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথঞ্চিৎ আস্বাদ,—স্বাধীনতার উপাসক ইংরাজের নিকট সঞ্জীবন-মন্ত্রের প্রবর্ত্তনা,—পাশ্চাত্য সমাজ-বিজ্ঞান, বিশেষতঃ জীবন্ত সাহিত্যের সহিত পরিচয়—এই সকলের ফলে জাতীয় রক্তে বিদ্যুৎ-প্রবাহের ন্যায় আবেগ উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। ইংরাজি শিক্ষার স্রোত তখন খরতরবেগে বাঙ্গালা দেশের প্রধান প্রধান স্থানে প্রবাহিত হইতেছিল। চারি দিকে যেন মুক্তির হাওয়া,—আকাশ যেন অনেকখানি উপরে উঠিয়া গিয়াছে,—অবরুদ্ধ পিঞ্জরদ্বার উন্মোচন করিতে আর যেন বেশী বিলম্ব নাই। নূতন রীতি, নূতন নীতি, নূতন আদর্শের উন্মাদনা—সকল প্রকার নূতনের নেশা প্রাণের ভিতর হইতে ভরপূর হইয়া উপছিয়া পড়িতেছে। সংস্কৃতমূলক শ্রুতিকঠোর শব্দাড়ম্বর ও সুদীর্ঘ ঘনঘটা সমাস হইতে মুক্ত হইবার জন্য বাঙ্গালা ভাষা যেন ব্যাকুল। "পুরুষপরীক্ষা" স্তরের পর "বেতালপঞ্চবিংশতি" প্রভৃতি স্তর; আর "বেতালপঞ্চবিংশতি" স্তরের পারিপার্শ্বিক যদুনাথ সর্ব্বাধিকারীর "তীর্থ-ভ্রমণ" স্তর—কারণ, উভয় গ্রন্থ প্রায় একই সময়ে, একই গৃহে, একই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে রচিত হইয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষার প্রসাদে ও প্রভাবে স্বদেশানুরাগী সুশিক্ষিত বঙ্গবাসীর মধ্যে অনেকে প্রগাঢ় অনুরাগভরে মাতৃভাষার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন এবং অনেক ক্ষমতাশালী লেখকের প্রাণগত সাধনায় বাঙ্গালা সাহিত্য আশাতীত উৎকর্ষ ও উন্নতি লাভ করিল। ফলে, এক শতাব্দীরও অল্প কাল মধ্যে এমন সাহিত্য গড়িয়া উঠিল, যাহা একটী স্বাধীন ও আধুনিক মতে সুসভ্য জাতির পক্ষে গড়িয়া তুলিতে পাঁচ শতাব্দী লাগে। বোধ হয়, পৃথিবীর মধ্যে অন্য কোন সভ্য জাতির সাহিত্য এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ দ্রুত উন্নতি ও পরিপুষ্টি লাভে সমর্থ হয় নাই। স্পানিস্ ও আধুনিক ইটালিয়ান এবং আরবি, পারসি ও হিন্দি দ্বারা পরিপুষ্ট উর্দ্দ-ভাষা এ সম্পর্কে বিশেষভাবে তুলনীয়।

ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের দেশে যে নূতন ধরণের সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে উপন্যাসই প্রধানতম। বাঙ্গালা দেশ আজ উপন্যাস এবং মাসিক পত্রিকায় প্লাবিত। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহাদের পরিপুষ্টি একই সময়ে হইয়াছে; এক কথায় ইহাদিগকে যমজ বলিলে চলে। ইদানীন্তন যুগে সাহিত্যের বাজারে উপন্যাসের ছড়াছড়ি, অথচ এই উপন্যাসের অনুরূপ কোন সাহিত্য আমাদের, এমন কি, অপর কোনও পুরাতন সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; কারণ, প্রচলিত প্রথা-সঙ্গত উপন্যাসের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা সম্পূর্ণ আধুনিক সামগ্রী। এই শ্রেণীর পুস্তক সাধারণ লোকের সুখ, দুঃখ, আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে আপনার বিষয়বস্তু বলিয়া বরণ করিয়া লয়। এই কারণে পূর্ব্বে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র-প্রমুখ কোনও কোনও সাহিত্যিক এই শ্রেণীর পুস্তকের নাম "নবন্যাস" দিয়াছিলেন। "বিবিধার্থসংগ্রহ" প্রভৃতি পূর্ব্বকালীন সাময়িক পত্রিকায় ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

আমরা আজ অসংখ্য উপন্যাস-প্লাবিত বঙ্গসাহিত্যে প্রথম উপন্যাস-লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় সম্বন্ধে দুই একটি কথা আলোচনা করিব। তিনি একাধারে এ দেশের ইংলণ্ডের অষ্টাদশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিকচতুষ্টয়—Richardson, Fielding, Smollet এবং Sterne। তবে প্যারীচাঁদের কেবলমাত্র একখানি উপন্যাস প্রথম ও শেষ উত্তম বলিয়া পুস্তকে আমরা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন শিল্পীর (finished artist) চমৎকারিত্ব দেখিতে না পাইলেও তিনি যে

একজন প্রথম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ লেখক, তাহা আমাদের সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

প্যারীচাঁদ মিত্র ১২২১ সালে ৮ই শ্রাবণ তারিখে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার ৭৯ বৎসর পরে ১৩০০ সালের ৮ই শ্রাবণ তারিখ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ স্থাপিত হইয়াছিল —আজ সেই কারণে সুধীবৃন্দের সমাগম। তাঁহার পুস্তকে তিনি টেকচাঁদ ঠাকুর নাম ব্যবহার করিতেন; সুতরাং তিনি বঙ্গ-সাহিত্যে এই নামে সুপরিচিত। তিনি পুরাতন যুগের হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন, এ জন্য ইংরাজি শিক্ষার উজ্জ্বল আলোকে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল। তাঁহার অনুজ কিশোরীচাঁদ মিত্র কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তিনিও ইংরাজি শিক্ষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। উভয় ভ্রাতাই ইংরাজি ভাষায় ওজস্বিনী রচনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইংরাজি-শিক্ষা ব্যতীত দেশের ভাবী উন্নতির আশা অসম্ভব বুঝিয়া, উভয় ভ্রাতা ইংরাজি শিক্ষা-বিস্তারের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন। শিক্ষার ব্যবস্থাতে কৃষি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জীবিকার্জ্জনের উপযোগী শিক্ষা যাহাতে প্রচলিত হয় এবং ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ হয়, তাহার জন্য উভয়েই নানাবিধ অনুষ্ঠানে সংসৃষ্ট ছিলেন এবং তাঁহাদের উদ্যোগে বিবিধ তথ্যপূর্ণ কৃষি-বিষয়ক পুস্তিকা ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার হইয়াছিল। যখন স্ত্রীশিক্ষার নামে লোকে খড়্গহস্ত হইত, সেই সময়ে প্যারীচাঁদ স্ত্রীশিক্ষার উৎকর্ষ সাধন উদ্দেশে সুন্দর সুন্দর পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সুরাসেবনের স্রোতে যখন ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙ্গালী ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন প্যারীচাঁদ গল্পচ্ছলে তেজস্বী ভাষায় মদ্যপানের অপকারিতা লিপিবদ্ধ করেন। যখন এক দিকে কুসংস্কার ও অপর দিকে নাস্তিকতায় দেশ ডুবিয়া যাইতেছিল, সেই সময় তিনি একেশ্বরবাদ প্রচার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়াছিলেন—তাঁহার "যৎকিঞ্চিৎ" পুস্তকখানি ধর্ম্মবিশ্বাসের এক সুন্দর ব্যাখ্যান। দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচলন একেবারে অমাবস্যা তিথির ন্যায় নিবিড় তমসাচ্ছন্ন অনুভব করিয়া তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে দৃঢ়সংকল্প করিয়া তিনি সরল বাঙ্গালা ভাষায় রচনা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তৎকালীন সুকুমার বাঙ্গালা সাহিত্যে হয় ত কতকগুলি শ্রুতিকঠোর "কট মট" শব্দ, অনুস্বার-বিসর্গহীন সংস্কৃত, কেবল অক্ষরগুলা বাঙ্গালায়; অপর দিকে ঘোর গ্রাম্যতাদোষ-দুষ্ট, সমাপিকা অসমাপিকা ক্রিয়ার ছড়া-ছড়ি, অধিকন্তু "এবং" "ও" "অপিচ" প্রভৃতি অব্যয় শব্দের বাড়াবাড়িতে স্থান পরিপূর্ণ থাকিত। এই যুগে বাঙ্গালা ভাষাকে কেহ শ্রদ্ধার সহিত দেখিতেন না। সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিতেরা বাঙ্গালা ভাষাকে গ্রাম্য ও ইংরাজিশিক্ষিত বাঙ্গালী মাতৃভাষাকে বর্ব্বর মনে করিতেন। বাঙ্গালা ভাষা যখন সংস্কৃতের অনুসরণ করিতেছিল, তখন প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় "আলালী" ভাষায় অভিনব বাঙ্গালা রচনা-প্রণালী সৃষ্টি করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সেই অভিনব বাঙ্গালা সাহিত্য মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভাবলে নূতন পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া উন্নতির পথে চলিতেছে, আবার মাঝে মাঝে "সবুজ" পরিচ্ছদও ধারণ করিতেছে, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের ছন্দোভঙ্গের অনুসরণও করিতেছে। প্যারীচাঁদের অনুজ কিশোরীচাঁদ যৌবনকালে মাতৃভাষার সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মযাজক জে, লঙ্ সাহেব বঙ্গভাষায় প্রকাশিত পুস্তক-সমূহের একখানি তালিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই তালিকায় তিনি কিশোরীচাঁদের নাম উল্লেখে (১) পরমেশ্বরের প্রজ্ঞাশক্তি ও দয়া এবং (২) রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মসঙ্গীত নামক দুইখানি পুস্তকের গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে সরকারি কার্য্যোপলক্ষে কিশোরীচাঁদ বিদেশে গমন করেন। তদবধি এবং তৎপরে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াও তিনি কেবলমাত্র ইংরাজি ভাষার চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। তৎকালীন বাঙ্গালী ইংরাজি ভাষায় লিখিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া উঠিতেন। সুশিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজে রামগোপাল ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হিন্দুপেট্রিয়ট ও বেঙ্গলী সংবাদপত্র-স্থাপয়িতা গিরিশচন্দ্র ঘোষপ্রমুখ বঙ্গমাতার অনেক সুসন্তান এই পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এমন কি, বঙ্কিমবাবুও কিশোরীচাঁদ মিত্র-সম্পাদিত Indian Field পত্রিকায় Rajmohan's Wife নামক নভেল লিখিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালী-রচিত ইংরাজি গদ্য একণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে; বরং কালী-

প্রসাদ ঘোষ, তরু দত্ত প্রভৃতির ইংরাজি পদ্য কদাচিৎ সাহিত্যে ব্যবহার হয়।

প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙ্গালা ভাষায় নিম্নলিখিত পুস্তক কয়খানি প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

(১) আলালের ঘরের দুলাল।
(২) মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার উপায়।
(৩) রামারঞ্জিকা।
(৪) কৃষিপাঠ।
(৫) গীতাঙ্কুর।
(৬) যৎকিঞ্চিৎ।
(৭) অভেদী।
(৮) ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত।
(৯) এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা।
(১০) আধ্যাত্মিকা।
(১১) বামাতোষিণী।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ধর্ম্মযাজক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় "বিদ্যাকল্পদ্রুম" (Encyclopaedia Bengalensis) নামক পুস্তক খণ্ডশঃ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। উহার পঞ্চম ভাগে জীবনচরিত প্রকাশ হইয়াছিল। ধর্ম্মযাজক জে, লঙ্, সাহেবের মতে এই ভাগে প্রকাশিত বিক্রমাদিত্য, প্লেটো ও যুধিষ্ঠির নামক তিনটি জীবনী প্যারীচাঁদের লেখনীপ্রসূত।

প্যারীচাঁদের প্রণীত পুস্তকের তালিকা আমরা দিয়াছি, তবে তাঁহার যে প্রতিভা, তাহা ব্যঙ্গ এবং গদ্য রচনায় স্ফুট ছিল। তাঁহার সঙ্গীত-পুস্তকে যদিও তাঁহার অন্তরের ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে, তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার যশ গদ্য-রচনার উপর প্রতিষ্ঠিত। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, তিনি "উপন্যাস"কেই বা কেন তাঁহার কার্য্য-কুশলতার বাহন করিলেন ? তাঁহার "আলালের ঘরের দুলাল" পুস্তকের ভূমিকায় তিনি নিজে এতদ্‌বিষয়ে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। পরে তাহা আমরা প্রকাশ করিব। এই সময়ে বাঙ্গালা-সাহিত্য সংস্কৃত বা ইংরাজি পুস্তকের সার সঙ্কলন বা অনুবাদ ভিন্ন কিছুই প্রসব করিত না। ইহার শ্রেষ্ঠ লেখক বিদ্যাসাগর মহাশয়। তিনি যে কেবল ইংরাজি বা সংস্কৃত বস্তু আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালার ভাবসম্পদের শ্রীবৃদ্ধি করিলেন, তাহা নহে। তিনি দুর্ব্বোধ সংস্কৃতানুসারিণী ভাষাকে এমন মার্জ্জিত এবং হৃদয়গ্রাহী করিয়া দিলেন যে, পণ্ডিত এবং মূর্খ উভয়েই চমৎকৃত হইয়া গেলেন। কিন্তু প্যারীচাঁদ অনুবাদসাহিত্য হইতে দূরে থাকিবার জন্য novel of manners লিখিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং তাহার উপযোগী কলিকাতার চলিত ভাষা (dialect) ব্যবহার করিলেন। পরে বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র প্রভৃতি বাঙ্গালাভাষার অনেক পুষ্টিসাধন করিলেও কেহই কলিকাতার ভাষাকে স্থানচ্যুত করিতে সাহস করেন নাই। তবে এস্থলে ইহাও বলা উচিত যে, প্যারীচাঁদ যে সমস্ত শ্রেণীর চরিত্র চিত্রণ করিয়াছেন, তাহাদের মুখে বিশুদ্ধ ভাষা দিলে বাস্তবতার ভঙ্গিমা থাকে না ; কিন্তু তিনি যে বিশুদ্ধ সাধুভাষা লিখিতে পারিতেন,, তাহার পরিচয় তাঁহার "যৎকিঞ্চিৎ", "আধ্যাত্মিকা" প্রভৃতি ধর্ম্মপুস্তকে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

ইংরাজি যুগ আরম্ভ অবধি পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোতে বাঙ্গালার, বিশেষতঃ রাজধানী কলিকাতার কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি দুরাচার ও দুর্নীতির আবিল তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছিলেন। সেই সময়ে প্যারীচাঁদ উচ্চকণ্ঠে তীব্র শ্লেষবাক্যে তাঁহাদের দোষ দেখাইয়া "আলালের ঘরের দুলাল" এবং "মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়" পুস্তকদ্বয়ের অবতরণা করিয়াছিলেন।

টেকচাঁদের আলালের ঘরের দুলাল, মদ খাওয়া বড় দায় এবং রামারঞ্জিকা পুস্তকের কয়েক অধ্যায় "মাসিক পত্রিকা" নামক সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে "মাসিক পত্রিকা" গ্রন্থ নাই। সম্প্রতি হুতোমের আদিম সংস্করণ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে পরিষদের হস্তগত হইয়াছে। এই সংস্করণে দুইখানি লিথোগ্রাফ চিত্র সংস্পৃষ্ট আছে। সে সময়ের সাময়িক পত্র কিংবা পুস্তিকাতে সংস্পৃষ্ট লিথোগ্রাফ চিত্রের পরিচয় ও নমুনা এই চিত্র দুইখানি হইতে বেশ পাওয়া যায়। টেকচাঁদ যুগের কিছু পরে "বসন্তকে" যে সকল চিত্র দেওয়া হইত, তাহা ইহা অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর চিত্র। চিত্র দুইখানির পরিচয় এই :—

১। প্রথম ছবিটি ভূমিকার পরই প্রকাশিত। ভূমিকায় "হুতোম" তাঁহার নক্সা প্রকাশের জন্য একটা

কৈফিয়ত দিয়াছেন। তাহার পরপৃষ্ঠাতেই এই লিথো ছবিখানি। ছবিখানিতে "হুতোম" ভূমণ্ডলের উপর বসিয়া আছেন,—অর্থাৎ তিনি স্তুতিবাদ বা নিন্দার অতীত। পশ্চাতে একটি টেবিলে কয়েকটি পেটিকা; টেবিলটি ভূমণ্ডল হইতে ঊর্দ্ধে একটি দণ্ডের উপর। হুতোমের মস্তকের কেশ, গুম্ফ ও শ্মশ্রু মুণ্ডিত; কিন্তু একটি প্রকাণ্ড শিখা আছে—পরিধানে কেবল একখানি ধুতি ও পিরাণ,—পাদুকাহীন। দক্ষিণ হস্তে একটা উন্মুক্ত পেটিকা,—উহা হইতে পক্ষদ্বয়যুক্ত একটি নক্সা শূন্যে উড়িয়া যাইতেছে। এই ছবির নাম;—"হুতোম প্যাঁচা আশমানে বসে নক্সা উড়াচ্চেন।"

২। দ্বিতীয় চিত্রের নাম;—"ঠণ-ঠণের হঠাৎ অবতার।" একজন উড়িয়া বেহারা,—গলায় মালা—মুখে পিকা,—একটা প্রকাণ্ড ছাতা ধরিয়া "হঠাৎ অবতারের" অগ্রগামী। তিনি পাঁচ জন অনুচর লইয়া রাস্তার মধ্য দিয়া হাঁটিয়া চলিতেছেন, তন্মধ্যে সর্ব্বশেষেরটি ব্রাহ্মণ। তাঁহার গোঁপ আছে, পরিধানে ধুতি। বেনিয়ান ও চাদর, মস্তকে পাগড়িবিশেষ, পায়ে লপেটা জুতা। অপরাপর অনুচরদিগেরও প্রায় এইরূপ পরিচ্ছদ তবে দুই জনের মাথায় শামলা।

সন ১২৬৫ সালে প্যারীচাঁদের প্রথম পুস্তক, আলালের ঘরের দুলাল প্রকাশিত হইয়াছিল।

সাহিত্য প্রচারের অন্যতম অঙ্গ—সংবাদপত্র প্রচার। আমরা দেখিতে পাই যে, প্যারীচাঁদ পাঠ্যাবস্থা হইতে সংবাদপত্র-স্তম্ভে লিখিতেন। "জ্ঞানান্বেষণ" পত্রিকায় তিনি ধারাবাহিকরূপে লিখিতেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি রামগোপাল ঘোষের সহযোগে "বেঙ্গল স্পেক্টেটর" নামক অপর একখানি দ্বিভাষিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার পর বৎসরে বেঙ্গল ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সোসাইটি স্থাপিত হইয়াছিল। বিখ্যাত বাগ্মী জর্জ টমসন ইহার সভাপতি ছিলেন এবং প্যারীচাঁদ ছিলেন অবৈতনিক সম্পাদক। জর্জ টমসন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা সম্প্রতি Bengal Past and Present পত্রিকায় আমি ধারাবাহিকরূপে করিয়াছি। বেঙ্গল ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সোসাইটির স্থাপনার পূর্ব্বে আমাদের দেশে "জমিদার সভা" landholder's Association ভূস্বামীদিগের স্বার্থ রক্ষার্থ ছিল। কিন্তু বেঙ্গল স্পেক্টেটর পত্রিকা এবং বেঙ্গল ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সোসাইটি দুর্ব্বল, অসহায় ও অশিক্ষিত কৃষক-কুলের পক্ষ-সমর্থন করিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে "জমীদার" শ্রেণী সৃষ্টি করিবার এবং তাহাদের হস্তে অসীম ক্ষমতা অর্পণ করার ফলের বিরুদ্ধে এই পত্রিকার স্তম্ভে সুতীব্র ভাষায় প্রতিবাদ প্রকাশিত হইত। ইহার কয়েক বৎসর পরে প্যারীচাঁদ কলিকাতা রিভিউ পত্রিকায় "জমিদার এবং রায়ত" (Zamindar and Ryot) শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের চার্টারের সময় এই পত্রিকা হইতে কিয়দংশ পারলিয়ামেণ্ট লর্ড সভার জনৈক সভ্য পাঠ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন;—it has been discussed in Parliament and out of Parliament। প্যারীচাঁদ তাঁহার "আলালের ঘরের দুলালে" এই কৃষককুলের সপক্ষে যে দুই একটি কথা বলিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—"প্রজার নিস্তার নাই—এদিকে মহাজন ওদিকে জমীদারের পাইক। যদি বিকি ভাল হয়, তবে তাহাদিগের দুই বেলা দুই মুঠা আহার চলিতে পারে। নতুবা মাছটা শাকটা ও জল খাটা ভরসা।" ইহার উপর আবার জমীদারের পীড়ন আছে। দশশালা বন্দোবস্তের ফলে জমীদারের কিরূপ লাভ হইয়াছিল, শুনুন;—"দশশালা বন্দবস্তের সময়ে ঐ তালুকে অনেক পতিত জমী থাকে—তাহার জমা ভৌলে মুসমা ছিল। পরে ঐ সকল জমী হাসিল হইয়া মাঠ-হারে বিলি হয় ও ক্রমে জমির এমত গুমর হইয়াছিল যে, প্রায় এক কাঠাও খামার বা পতিত ছিল না।" বোঝার উপর শাকের আঁটির মত ইহার উপর আবার নীলকরের উপদ্রব। "প্রজারা নীল বুনিতে ইচ্ছুক নহে। কারণ, ধান্যাদি বোনাতে অধিক লাভ, আর যিনি নীলকরের কুঠীতে যাইয়া একবার দাদন লইয়াছেন—তাহার দফা একেবারে রফা হয়। প্রজারা প্রাণপণে নীল আবাদ করিয়া দাদনের টাকা পরিশোধ করে বটে, কিন্তু হিসাবের লাঙ্গুল বৎসর বৎসর বৃদ্ধি হয় ও কুঠেলের গমস্তা ও অন্যান্য কারপরদাজের পেট অন্নে পুরে না।" দাঙ্গাবাজ নীলকরের বিচার করিতে গিয়া "মেজিষ্ট্রেটের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইতে লাগিল যে, নীলকর ইংরাজ, খৃষ্টিয়ান—মন্দ কর্ম্ম কখনই

করিবে না—কেবল কালা লোকে যাবতীয় দুষ্কর্ম্ম করে !" * * * এই অবকাশে নীলকর বক্তৃতা করিল,—"আমি এস্থানে আসিয়া বাঙ্গালিদিগের নানাপ্রকার উপকার করিতেছি—আমি তাহাদিগের লেখাপড়ার ও ঔষধপত্রের জন্য বিশেষ ব্যয় করিতেছি—আবার আমার উপর এই তহমত ? বাঙ্গালীরা বড় বেইমান ও দাগাবাজ।" এরূপ ওজস্বিনী বক্তৃতার ফল ফলিল—মোকর্দ্দমা ডিসমিস। "নায়েব অধোবদনে ঢিকুতে ঢিকুতে—ভুঁড়ি নাড়িতে নাড়িতে বলিতে বলিতে চলিলেন—বাঙ্গালিদের জমিদারি রাখা ভার হইল। নীলকর বেটাদের জুলুমে মুলুক থাক্ হইয়া গেল—প্রজারা ভয়ে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। হাকিমরা স্বজাতির অনুরোধে তাহাদিগের বশ্য হইয়া পড়ে। আর আইনের যেরূপ গতিক, তাহাতে নীলকরদিগের পলাইবার পথও বিলক্ষণ আছে। লোকে বলে—জমিদারের দৌরাত্ম্যে প্রজার প্রাণ গেল—এটী বড় ভুল ! জমিদারেরা জুলুম করে বটে, কিন্তু প্রজাকে যতনে বজায় রেখে করে, প্রজা জমিদারের বেগুণ ক্ষেত। নীলকর সে রকমে চলে না—প্রজা মরুক বা বাঁচুক, তাহার বড় এসে যায় না—নীলের চাষ বেড়ে গেলেই সব হইল,—প্রজা নীলকরের প্রকৃত মূলার ক্ষেত।"

আলালের ঘরের দুলালের এই অধ্যায় মাসিকপত্রিকার ১২৬৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যে বোধ হয়, ইতঃপূর্ব্বে কেহই নীলকরের বিপক্ষে এবং দুর্ব্বল কৃষককুলকে সমর্থন করিয়া এত কথা বলেন নাই। দরিদ্র কৃষকের অন্নের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া ধনীর ধনবৃদ্ধি যে অন্যায়, তাহা আমাদের টেকচাঁদ ঠাকুর সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন।

আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই সময়ে এবং ইহার পূর্ব্ব হইতে প্যারীচাঁদ লাট সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া সকল শ্রেণীর ইংরাজের সহিত মিশিতেন। তিনি নিজে আমদানী রপ্তানী ব্যবসায় করিতেন এবং অনেক ইংরাজ-পরিচালিত লিমিটেড কোম্পানীর ডিরেক্টর থাকার দরুণ তাঁহাকে ইংরাজ-বণিকের আড্ডা Bengal Chamber of Commerceএর সংস্রবে আসিতে হইত। কিন্তু বিরাগ ও স্বার্থহানির ভয়ে তিনি যাহা অন্যায় এবং অবিচার বলিয়া মনে করিতেন, তাহার প্রতিবাদ করিতে কখনই পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি কখনও আপন কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত হন নাই। এই ধীর এবং শান্ত মানুষটির সাহস এবং দৃঢ়তা দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইতেন।

আমরা "আলালের ঘরের দুলালে" এই বিশেষত্ব দেখিতে পাই যে, ইহাতে সকল শ্রেণীর মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক বাঙ্গালার কথা-সাহিত্যিকেরা প্রায় সকলেই প্যারীচাঁদ মিত্রের ন্যায় বা তদপেক্ষা সুশিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু—কিন্তু ইঁহারা সচরাচর কেবলমাত্র তাঁহাদের সমশ্রেণীর নরনারীর জীবনের চিত্র স্ব স্ব পুস্তকে অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা কিন্তু প্যারীচাঁদের পুস্তকে নাপিতের ঘরকন্নার কথা, বাদার ধান কাটার বিবরণ ও তৎসঙ্গে কৃষাণ বাড়ী ঘরের পরিচয় পাই। বঙ্গীয় মুসলমান-সম্প্রদায়ের পরিচয়ে আমাদের দেশের আধুনিক কথা-সাহিত্যিকের অজ্ঞতা আরও অধিক। আজকালকার জাতিবৈষম্যের যুগে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্ব সহরে ও পল্লীগ্রামে অতি অল্পই পরিলক্ষিত হয়, এই কারণে মুসলমান-সমাজের চিত্র আধুনিক বাঙ্গালা কথা-সাহিত্যে বড়ই অভাব। কিন্তু টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালে' বাবুরামবাবুর প্রধান মন্ত্রী ঠকচাচা। এই ঠকচাচার ক্রিয়াকলাপ, তাহার আবাসস্থান বর্ণনা, এমন কি, ঠকচাচীর সহিত কথোপকথন প্রভৃতি এই পুস্তকে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।

ঠকচাচার জীবনযাত্রা পথের মূল মন্ত্র (philosophy of life) সকলের জানিয়া রাখা ভাল,—"দুনিয়াদারি করিতে গেলে ভাল ঝুটা দুই চাই—দুনিয়া সাচ্চা নয়—মুই একা সাচ্চা হয়ে কি করিব।" ঠকচাচার প্রথম পরিচয় এইরূপ পাই ;—"মোকাজান আদালতের কর্ম্মে বড় পটু। অনেক জমিদার নীলকর প্রভৃতি সর্ব্বদা তাহার সহিত পরামর্শ করিত। জাল করিতে—সাক্ষী সাজাইয়া দিতে—দারোগা ও আমলাদিগকে বশ করিতে—গাঁতের মাল লইয়া হজম করিতে—দাঙ্গা হাঙ্গামের জোটপাট ও হয়কে নয় করিতে, নয়কে হয় করিতে তাহার তুল্য আর একজন পাওয়া ভার। তাহাকে আদর করিয়া সকলে ঠকচাচা বলিয়া ডাকিত।" ঠকচাচা প্রথম দেখা

দিল মতিলালের গ্রেপ্তারি মোকর্দ্দমার সময়,—তিনি পরামর্শ দিচ্ছেন; "মকর্দ্দমা করা কেতাবি লোকের কাম নয়—তেনারা একটা ধাক্কাতেই পেলিয়ে যায়। এনার বাত মাফিক কাম কর্‌লে মোদের মেটির ভিতর জল্‌দি যেতে হবে।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাবুরামবাবুর প্রধান মন্ত্রী ঠকচাচা। মতিলালের বিবাহ প্রস্তাব বৈঠকে ঠকচাচার অভিমত—"মণিরামপুরের মাধববাবু আচ্ছা আদমি—তেনার নামে বাগে গরুতে জল খায়—দাঙ্গা-হাঙ্গামার ওক্তে লেঠেল মেংগে লেটেল মিল্‌বে—আদালতের বেলকুল আদমি তেনার দস্তের বিচ—আপদ্ পড়লে হাজারো সুরতে মদত্ মিল্‌বে। কাচড়াপাড়ার রামহরি বাবু সেকস্ত আদ্‌মি—ঘেসাট ঘোসাট করে প্যাট টালে—তেনার সাতে খেশিকামে কি ফায়দা।" কন্যা-কর্ত্তার বংশমর্য্যাদা, কন্যার রূপ গুণ সব ভাসিয়া গেল,—ব্যাস্! বুড়াবয়সে আবার বিবাহের সময়ে বাবুরামের বন্ধুরা বিবাহ বন্ধ করিবার প্রস্তাব করিলে ঠকচাচা বলিয়া উঠিল;—"কেতাবি বাবু কি জানেন এ সাদিতে কেতনা রোপেয়া ঘর ঢুকবে।" গ্রন্থকার ঠকচাচার মতন সজীব চরিত্র আর সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। সমস্ত বইখানি পড়ার পর এই ঠকচাচা চরিত্রই মনে গভীর ভাবে অঙ্কিত থাকে। আবার যখন আন্দামানদ্বীপে চালান হইল, তখন জাহাজে উঠিয়া ঠকচাচা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলে,—"মোদের নসিব বড় বুরো—মোরা একেবারে মেটি হলুম—ফিকির কিছু বেরোয় না, মোর সির থেকে মতলব পেলিয়ে গেছে—মোকানবি গেল—বিবির সাতেবি মোলাকত হলো না—মোর বড় ডর তেনাবি পেন্টে সাদি করে।" এইখানে গ্রন্থকার বিয়োগান্ত দৃশ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। আমাদের মনে হয়, গ্রন্থকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই ঠকচাচা পুস্তকের প্রধান পাত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে।

এক্ষণে কেহ কেহ বলিতে পারেন, প্যারীচাঁদ মিত্র একজন মুসলমানকে এরূপ নীচ দুর্বৃত্ত ভাবে অঙ্কিত করিলেন কেন? উত্তরে আমরা বলিব, ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের বেঙ্গল স্পেক্টেটরে একজন নির্য্যাতিত কৃষাণের গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবল পরাক্রান্ত জমীদার কৃত্রিম দলিলের সাহায্যে ইহাকে লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল, এই কৃষাণ জাতিতে মুসলমান ছিল এবং তাহার নাম ছিল মিয়াজান, আর আমাদের ঠকচাচার প্রকৃত নাম—মোকাজান! সুতরাং জাতি বৈষম্যের কথা আদৌ আসিতে পারে না।

'আলালের ঘরের দুলাল' চলিত প্রবাদবাক্যে পরিপূর্ণ, মধ্যে মধ্যে আমরা দুই একটা ইংরাজি হইতে অনুবাদিত প্রবাদ দেখিতে পাই। অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে আমরা একটি প্রবাদ দেখিতে পাই;—বুদ্ধিতে চতুর কিন্তু কাহণে কাণা।" ইহা ইংরাজি Penny wise and pound foolishএর অনুবাদ। বঙ্গদেশীয় ললনা কিরূপ পতিপুত্রের অনুগত, তাহা আমরা টেকচাঁদের একটী স্বগত উক্তিতে অতি পরিষ্কার জানিতে পারি—"জগদীশ্বর আমি কাহারো মন্দ করি নাই—কোন পাপও করি নাই—এত কালের পর আমাকে কি বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে? আমার ধনে কাজ নাই—গহনায় কাজ নাই—কাঙ্গালিনী হইয়া থাকি সেও ভাল—সে দুঃখে দুঃখ বোধ হইবে না—কিন্তু এই ভিক্ষা দেও যেন পতিপুত্রের মুখ দেখ্‌তে দেখ্‌তে মরিতে পারি।" ইহাই ত বাঙ্গলার মাতা, গৃহিণী ও বধূর অব্যক্ত ও নিরন্তর কামনা। লেখক দুই ছত্রে নারীহৃদয়ের অন্তরের গোপন কথাটা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। পুস্তকে আর একটা লক্ষ্যের বিষয় এই যে, ইহাতে প্রেম বা প্রণয়-ঘটিত কোন ব্যাপার নাই। কিন্তু তাহার পর ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের নভেলের দুর্গেশনন্দিনী-প্রমুখ গ্রন্থাবলী বাঙ্গালা দেশকে রোমান্সের বন্যায় ভাসাইয়া দিল। তবে আমরা পুস্তকের এক ছত্রে "বাঙ্গালার বধূ বুকভরা মধু"র পরিচয় পাই—যুবতী স্ত্রীলোকেরা রামলালের রূপ, গুণ দেখিয়া শুনিয়া মনে মনে কহিত—"স্বামী হবে তো এমনি পুরুষ"।

কোন জাতির ইতিহাস পাঠ করিলে সেই দেশের কীর্ত্তিসমূহের পরিচয় পাই, কিন্তু সেই জাতির সাহিত্য পাঠে কেবল স্থানীয় নহে, ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষার কথা জানিতে পারি। পুরুষ বাহিরের কাজে ব্যস্ত থাকে এবং পুরুষ জাতির খবর অনেকের কাছে পৌছায়, কিন্তু বিশুদ্ধান্তঃপুরের সংবাদ টেকচাঁদের ন্যায় পুণ্যচেতা নিপুণ শিল্পী ভিন্ন কেহ দিতে পারেন না। গঙ্গার ঘাটের বর্ণনায় গ্রন্থকার লিখিতেছেন;—"মেয়েরা ঘাটে সারি সারি হইয়া

পরস্পর মনের কথাবার্ত্তা কহিতেছে। কেহ বলিছে পাপ ঠাকুরঝির জ্বালায় প্রাণটা গেল—কেহ বলে, আমার শাশুড়ী মাগী বড় বৌকাঁটকি—কেহ বলে, দিদি, আমার আর বাঁচ্‌তে সাধ নাই, বৌছুঁড়ি আমাকে দুপা দিয়া থেতলায়, বেটা কিছুই বলে না; ছোঁড়াকে গুণ করে ভেড়া বানিয়েছে—কেহ বলে আহা! এমন পোড়া জাও পেয়েছিলাম, দিবারাত্রি আমার বুকে বসে ভাত রাঁধে—কেহ বলে,—আমার কোলের ছেলেটির বয়স দশ বৎসর হইল, কবে মরি, কবে বাঁচি, এই বেলা তার বিয়েটি দিয়ে নি।" বাঙ্গালার ঘরে ঘরে, ঘাটে ঘাটে এখনও এই সব প্রসঙ্গের পর্য্যালোচনা হয়। শিক্ষিতা অশিক্ষিতা এবং অর্দ্ধশিক্ষিতা সবই এ সম্বন্ধে এক ছাঁচে ঢালা। হয় ত ভাষার বৈষম্য থাকিতে পারে, কিন্তু ভাবের বন্যা সমভাবে প্রবহমান। ইহার সহিত রমেশচন্দ্রের "সমাজে"র পুকুরঘাটের দৃশ্য এবং লালবিহারী দের গোবিন্দ সামন্ত পুস্তকের Ladies' Parliament শীর্ষক অধ্যায়টী তুলনা করিবেন। বঙ্কিমবাবুর ঘাটের বা বাসরের দৃশ্যের কথা এখানে তুলিব না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "আলালের ঘরের দুলাল" পুস্তকখানি একখানি novel of manners। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে আমরা সে কালের কথা যত জানিতে পারি, তত আর কিছুতে পাই না। সে কালে কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত ছিল। ইহা আমাদের সমাজে কি অনিষ্ট করিত, তাহার ইঙ্গিত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিতেছি;—"কতকগুলিন স্ত্রীলোক জল আনিতে আসিয়াছিল, কর্ত্তাকে দেখিয়া তাহারা একটু ঘোমটা টানিয়া দিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে পরস্পর বলাবলি করতে লাগ্‌লো—আ মরি! কি চমৎকার বর! যার কপালে ইনি পড়বেন সে একেবারে এঁকে চাঁপাফুল করে খোঁপাতে রাখ্‌বে। তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিল,—'বুড়ো হউক, ছুঁড় হউক, তবু একে মেয়েমানুষটা চক্ষে দেখ্‌তে পাবে তো? সেও তো অনেক ভাল। আমার যেমন পোড়াকপাল, এমন যেন আর কারো হয় না, ছয় বৎসরের সময় বে হয়। কিন্তু স্বামী কেমন, চক্ষে দেখনু না,—শুনেছি তাঁর পঞ্চাশ ষাটটি বিয়ে, বয়েস আশী বচ্ছরের উপর—থুরথুরে বুড়—... ...'লে বে করতে আলেন না। বড় অধর্ম্য না হলে আর মেয়েমানুষের কুলীনের ঘরে জন্ম হয় না।' আর একজন বলিল, 'ওগো জলতোলা হয়ে থাকেতো চলে চল—ঘাটে এসে আর বাকচাতুরীতে কাজ নাই;—তোর তবু স্বামী বেঁচে আছে—আমার যাঁর সঙ্গে বে হয়, তাঁর তখন অন্তর্জ্জালী হচ্ছিল। কুলীন বামুনদের কি ধর্ম্ম আছে না কর্ম্ম আছে—এ সব কথা বল্‌লে কি হবে! পেটের কথা পেটে থাকাই ভাল।" ব্যর্থ জীবনের হাহাকার—টেকচাঁদে কি pathos নাই!

এইবার একবার আমাদের দেশের তদানীন্তন কালের পাঠশালা-বর্ণনা দেখুন;—"গুরু মহাশয়ের পাঠশালাটি প্রায় যমালয়ের ন্যায়—সর্ব্বদাই চটাপট, পটাপট, গেলুমরে, মলুমরে ও 'গুরুমহাশয় গুরুমহাশয়, তোমার পড়ো হাজির' এই শব্দই হইত। আর কাহার নাকখত—কাহার কানমলা—কেহ ইটে খাড়া—কাহার হাতছড়ি—কাহাকেও কপিকলে লটকান—কাহার জলবিচাটি, একটা না একটা প্রকার দণ্ড অনবরতই হইত।"

আর এক চিত্রে টেকচাঁদের বাস্তবতা দেখুন;—"দৈবস্বস্ত্যয়নে রত পুরোহিতগণ মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছে ও পরস্পর বলাবলি করিতেছে, আমাদিগের দৈব ব্রাহ্মণ্য তো নগদই প্রকাশ হইল—মতিলালের খালাস হওয়া দূরে থাকুক, এক্ষণে কর্ত্তাও তাহার সঙ্গে গেলেন।"

এবার সে কালের আচার ব্যবহার ও পোষাক পরিচ্ছদের কথা। বেণীবাবু বসিয়া আছেন, এমন সময় সময়ে মতিলাল,—"চোদ্দ বৎসরের একটী বালক—গলায় মাদুলি—কাণে মাকড়ি, হাতে বালা ও বাজু, সম্মুখে আসিয়া ঢিপ করিয়া একটী গড় করিল। আবার এই চৌদ্দ বৎসরের বালক মতিলাল যখন নব্য যুবক হইল, তখন তাহার বর্ণনা;—"বাবুরা সকলেই সর্ব্বদা ফিটফাট—মাথায় ঝাকড়াচুল—দাঁতে মিসি—সিপাইপেড়ে ঢাকাই ধুতি পরা—বুটোদার একলাই ও গাজের মেরজাই গায়—মাথায় জরির তাজ—হাতে আতরে ভুরভুরে রেশমের হাতরুমাল ও এক এক ছড়ি—পায়ে রূপার বগলস-ওয়ালা ইংরাজি জুতা।" হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বর্ণনায় গ্রন্থকার বলিতেছেন;—"সাহেব শিশ দিতে দিতে বেঞ্চের উপর বসিলেন—হুকাবরদার আলবলা আনিয়া দিল—

তিনি মেজের উপর দুই পা তুলিয়া চৌকিতে শুইয়া পড়িয়া আলবোলা টানিতেছেন।" আলালের ঘরের দুলাল হইতে আমরা অনেকগুলি চিত্র উদ্ধৃত করিয়াছি, এগুলি আলোচনা করিলে বঙ্গসাহিত্যে টেকচাঁদের স্থান পাঠক উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছিলেন;—"আলালের ঘরের দুলাল" বাঙ্গলা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন, অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন, কিন্তু "আলালের ঘরের দুলাল" এর দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ।...প্যারীচাঁদ মিত্র আদর্শ গদ্যের সৃষ্টি-কর্ত্তা নহেন; কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ, ইহাই তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি। আর তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষয়-কীর্ত্তি এই যে, তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,—তাহার জন্য ইংরাজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি "আলালের ঘরের দুলাল"—প্যারীচাঁদ মিত্রের এই অক্ষয় কীর্ত্তি।"

প্যারীচাঁদের দ্বিতীয় পুস্তক,—মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়,—১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুরাপানের অত্যাচার ও বিষময় ফল বর্ণনা এই পুস্তকে আছে। তৎকালে শিক্ষিতসমাজের কেহ কেহ সুরাপানের কিরূপ পক্ষপাতী ছিল, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। এই পুস্তক প্রকাশের তিন বৎসর পরে "বঙ্গীয় মাদকনিবারণী সমাজ" (Bengal Temperance Society) ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর তারিখে স্থাপিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক সি, এচ, এ, ডল সাহেব ইহার সভাপতি ছিলেন এবং এদেশীয়দের মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষ রায় বাহাদুর, প্যারীচরণ সরকার, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তবে এই সভার কর্ম্ম-কর্ত্তাদিগের প্রকাশিত তালিকা মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের নাম আমরা দেখিতে পাই না। এই সভার উত্তরাধিকারী Temperance Federation এর সেবায় অধীন জীবন-যাপন করিয়াছে, এবং করিবে। শৈশবে মহাত্মা প্যারী-চাঁদ মিত্র ও কেশবচন্দ্র সেন ও ডল সাহেবের দর্শন-সুযোগ পাইয়া ধন্য হইয়াছিলাম। পশুদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণ সম্বন্ধে এবং সুরাপানের অবৈধতা সম্বন্ধে প্রথম শিক্ষা ও দীক্ষা প্যারীচাঁদের পুণ্য পদতলে বসিয়া পাইয়া ধন্য হইয়াছিলাম। প্যারীচাঁদের বংশের সহিত আমি নানাবিধ আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ ছিলাম।

"মদ খাওয়া বড় দায়" পুস্তকে সে সময়ের সমাজ-জীবনের অন্তঃসারশূন্য অবস্থা অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত আছে। তৎকালে সমাজের নেতারা সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সংরক্ষণ করিতে গিয়া কিরূপ দলাদলির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, গ্রন্থকার তাঁহার সরস ভাষায় তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সে সময়ের সমাজচিত্র সম্বন্ধে এখন চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কেবলমাত্র যাঁহারা স্বয়ং প্রকাশ্যভাবে অথবা ইংরাজদিগের সহিত একত্রিত হইয়া অখাদ্য ভোজন বা অপেয় সেবন করিতেন, তাঁহাদিগকে জাতিচ্যুত বা "একঘরে" করা হইবে, তাহা নহে, অধিকন্তু আবার যে সমস্ত লোক এই বিধর্ম্মীদের সংস্রবে থাকিয়া পান ভোজন করিতেন, তাঁহারা নিজে নিজে স্বধর্ম্মরত হইলেও একঘরে হইতেন। কোনও সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে এই বিধর্ম্মীদের সহিত সম্বন্ধ থাকিবে না। ইহাদের কোনও বিপদ-আপদে ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুরা সাহায্য করিবেন না—এমন কি, বিশেষভাবে নির্য্যাতন করিবার জন্য "ধোপা-নাপিত" প্রভৃতি ইহাদের বাড়ী যাইবে না। এজন্য ব্যবস্থা ছিল। এদিকে যে ইংরাজি শিক্ষার স্রোতে শিক্ষিত হিন্দুসমাজ ধর্ম্মে আস্থাহীন হইয়া পড়িতেছিল, ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুরা নিজ নিজ বাটীর সন্তানদিগকে সেই ইংরাজি শিক্ষা-দানে প্রবৃত্ত হইতেন—স্বধর্ম্মরত হিন্দুদিগের সন্তানেরাও মুসলমানের দোকানের পাউরুটি ও সোডাওয়াটার খাইতে আরম্ভ করিল। ফলে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে শিক্ষিতসমাজের অনেকেই হিন্দুধর্ম্মবিরুদ্ধ দ্রব্য খাইতেন। তৎকালে এই দলাদলি প্রথার এতদূর প্রতাপ ছিল যে, পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী মনীষীরাও ইহার কবল হইতে

সময়ে সময়ে রক্ষা পাইতেন না। রমাপ্রসাদ রায় ও রামগোপাল ঘোষ উভয়কেই মাতৃদায়ের সময়ে এইরূপ "দলের" আশ্রয় লইতে হইয়াছিল।

বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ সর্ব্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত করেন। সরস রসিকতা অবশ্য সর্ব্বদেশে প্রায় সর্ব্ব সময়েই প্রশংসনীয়। কিন্তু এই রসিকতার নামে ঘোর অরসিকতা বা নীরসতা তখনকার দুর্ভাগ্য বঙ্গসমাজের একচেটিয়া ছিল, ভাঁড়ামী, ফাজলিমী, গ্রাম্য ইয়ারকি ও অশ্লীল ভাষায় গালাগালিকে তখনকার সময়ে অনেক লোকে রসিকতা বলিয়া জানিত। কিন্তু প্যারীচাঁদের হাস্যরস যেমন কৌতুক ও আনন্দপ্রদ, তেমনই নির্দ্দোষ এবং সর্ব্বজন-উপভোগ্য। ইহাতে Swiftএর তীব্র কশাঘাতের জ্বালা নাই এবং Popeএর মত ব্যক্তিগত আক্রোশ নাই। তাঁহার ব্যঙ্গ Addision, Goldsmith, Dickens, Thacakary প্রভৃতির দ্বারা প্রবর্ত্তিত, স্বচ্ছ, নির্ম্মল, সুখভোগ্য ধারা অনুসরণ করিয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা শ্লেষাত্মক সাহিত্য অন্য যে কোন প্রকার শিক্ষা প্রদান করিতে সমর্থ হউক, ঠিক সুরুচি শিক্ষার উপযোগী ছিল না। টেকচাঁদের লেখার ইহাই বিশেষত্ব। তাঁহার পুস্তক পাঠ করিলে ইহা উপলব্ধি হইবে যে, লেখকের লিপি-কৌশল উজ্জ্বল এবং বর্ণনা-ভঙ্গী মধুর। প্যারীচাঁদের প্রবর্ত্তিত পথে দীনবন্ধু, ইন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষিগণ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর শোকাবহ তিরোধানে এ পথ বুঝি আবার শ্রেষ্ঠ পথিক শূন্য হয়। হাসিতে ও হাসাইতে যিনি পারেন, অথচ শিষ্টাচার-বিরোধী দোষে দোষী না হন, তিনি জীবন্মুক্ত, জগতের পরম সুহৃদ্ ও সহায়ক। এই মুষ্টিমেয় সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থান প্যারীচাঁদ মিত্র চিরদিন অবিবাদে অধিকার করিয়া থাকিবেন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে, প্যারীচাঁদের পত্নীবিয়োগের পর তিনি আর লঘুসাহিত্য রচনা করেন নাই। তাঁহার এক এক খানি গ্রন্থ এক একটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য লিখিত হইয়াছিল। কি ধর্ম্মনৈতিক, কি সামাজিক, যে কোনও বিষয়ে তিনি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি লোকচরিত্র, সামাজিক রীতি-নীতি, দেশীয় আচার-ব্যবহার ও সনাতন উদার ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক গভীর জ্ঞান, সহৃদয়তা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার যথেষ্ট পরিচয় দান করিয়াছেন। বিখ্যাত ইংরাজ সমালোচক এ হ্যামিল্টন টমসন তাঁহার Hrstory of English Literature পুস্তকে ডিফোর পুস্তক সমালোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—Defoe's imagination was not picturesque, it was photographic. অর্থাৎ ডিফো যাহা দেখিতেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেন, কল্পনার মোহন তুলি দিয়া তাহাতে কোন বর্ণসংযোজনা করিয়া প্রস্ফুটিত করিতেন না। আমাদের প্যারীচাঁদের চিত্রগুলি এমন নিখুঁত এবং স্বল্প কথায় এমন মনোজ্ঞ ভাষায় চিত্রিত যে, তাহাদের স্মৃতি মনে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া যায়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্যারীচাঁদ যে কেবল মাতৃভাষার সেবক ছিলেন, তাহা নহে, ইংরাজি ভাষাতেও তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা ছিল। তিনি ইংরাজি ভাষাতেও অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, এবং কলিকাতা রিভিউ নামক ত্রৈমাসিক সাময়িক-পত্রে মধ্যে মধ্যে লিখিতেন। তাঁহার লেখনীপ্রসূত ডেভিড হেয়ার, রামকমল সেন ও কোলেসওয়ার্থি গ্র্যাণ্টের জীবনী পাঠ করিয়া এখনও লোকে অনেক তথ্য অবগত হন। এই সকল পুস্তকে এদেশে ইংরাজিশিক্ষা বিস্তার, সে কালের সামাজিক চরিত্র প্রভৃতি বিশদভাবে অঙ্কিত আছে। আমেরিকা হইতে প্রকাশিত American Year-Book of Spiritualism, Medium and Daybreak, Banner of Light প্রভৃতি সাময়িক পত্রে, লণ্ডন হইতে প্রকাশিত Spiritualist পত্রে এবং অষ্ট্রেলিয়াখণ্ড হইতে প্রকাশিত Harbinger of Light পত্রে তাঁহার প্রবন্ধ সময় সময় প্রকাশিত হইত। ভাষা ও রচনাক্ষেত্রে এরূপ অদ্ভুত সব্যসাচীর শক্তির নিদর্শন আমরা অল্পই দেখিতে পাই। ব্যাবহারিক কার্য্যক্ষেত্রে অভিভূতপ্রায় হইলেও তাঁহার সাহিত্যিক আলোচনা কখনও শ্লথ হয় নাই। সময় অভাবে যাঁহারা সাহিত্য-চর্চ্চার অবকাশ পান না বলিয়া দোষ মোচন করিতে চেষ্টা করেন, প্যারীচাঁদের জীবনী তাঁহাদের পক্ষে আলোচনীয় ও অনুকরণীয়।

কেবল সাহিত্য আলোচনায় তাঁহার প্রতিভার ভূয়োবিকাশ ছিল, তাহা নহে; তৎকালীন সামাজিক ও

রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে ও আলোচনায় এবং শিক্ষাবিস্তার, স্ত্রী-শিক্ষা, কৃষি-শিক্ষা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে তাঁহার সমান অধিকার ও কৃতিত্ব ছিল। সংস্কৃত-দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্র-জ্ঞানে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। আমেরিকা মহাদেশে অধ্যাত্মবিদ্যা (Spiritualism) প্রচলন হইবার কয়েক বৎসর পরেই তিনি এতৎসম্বন্ধে অনুশীলন করিয়াছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে, এক সময়ে সমুদয় ভারতবর্ষমধ্যে কেবল প্যারীচাঁদ মিত্র এই বিদ্যা জানিতেন। প্যারীচাঁদের হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থা ও শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ছিল। ক্রমে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, অধ্যাত্মবিদ্যা ও যোগবিদ্যা অভিন্ন, সুতরাং তিনি যোগশাস্ত্র পাঠে রত হইলেন। ১২৬১ সালের ভাদ্র মাস হইতে তাঁহার "মাসিক পত্রিকা" প্রকাশিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ ছিল—"ঈশ্বরের উপাসনা।" তাঁহার এই ধর্ম্মপ্রবণতা তাঁহার আলালের ঘরের দুলালেও দৃষ্ট হয়। বারাণসীর সাধু মতিলালকে উপদেশ দিতেছেন,—"সকল ধর্ম্মের তাৎপর্য্য এই, কায়মনোচিত্তে ভক্তি, স্নেহ ও প্রেম প্রকাশপূর্ব্বক পরমেশ্বরের উপাসনা করা—এই কথাটি সর্ব্বদা ধ্যান কর, ও মন, বাক্য ও কর্ম্মদ্বারা অভ্যাস কর। এই উপদেশটি তোমার মনে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইলেই মনের গতি একেবারে ফিরিয়া যাইবে, তখন অন্যান্য ধর্ম্ম অনুষ্ঠান আপনা-আপনি হইবে; কিন্তু পরমেশ্বরের প্রেমার্থ মনের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা ও কর্ম্মের দ্বারা সদা একরূপ থাকা অতি কঠিন—সংসারে রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ ইত্যাদি রিপু সকল বিজাতীয় ব্যাঘাত করে, এজন্য একাগ্রতা ও দৃঢ়তার অত্যন্ত আবশ্যক।" ইহা তো সর্ব্বধর্ম্মসম্মত। তবে আজকালকার কথা-সাহিত্যিকরা নভেলের ভিতর হৃদয়গ্রাহিরূপে যথার্থ ধর্ম্মালোচনা করিতে নারাজ—বুঝি, অক্ষম। বঙ্গীয় ব্রহ্মবিদ্যাসমিতি (Bengal Theosophical Society) তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ। যখন ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল অলকট ও ম্যাদাম ব্লাভট্স্কি কলিকাতা রাজধানীতে আসিয়াছিলেন, সেই বৎসর ৬ই এপ্রিল তারিখে তাঁহাদিগের সহায়তায় প্যারীচাঁদ এই সভা স্থাপনা করিয়াছিলেন, এবং ইহার সভাপতিপদে বৃত হইয়া দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

এই ঋষিকল্প পুণ্যস্মৃতি মহাজনের জন্মোৎসব দিনে তাঁহার চরিতকথা আলোচনা করিবার অবকাশ পাইয়া আজ আমি ধন্য। সেই মহান্ আদর্শ মাঝে মাঝে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালাসাহিত্যিকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বাঙ্গালা সাহিত্য গঠনে, সংস্কার, প্রচার ও পুষ্টিসাধনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অপূর্ব্ব সেবার মূল্য এখন নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নয়। এই পুষ্টি ও গঠন সম্বন্ধে যে মহাজনের প্রথম উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, সেই প্যারীচাঁদের শুভ জন্মদিনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের জন্ম, দৈববিধানে যেন ইহা অবশ্যম্ভাবী। আজ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে পরিষদের সপ্তত্রিংশ বাৎসরিক জন্মোৎসব উপলক্ষে প্যারীচাঁদের পুণ্যকথার অবতারণা ও সমালোচনা অতি সুশোভন ও সুসঙ্গত হইয়াছে। এই শুভদিন ও শুভক্ষণ বঙ্গসাহিত্য-সম্প্রসারণক্ষেত্রে চিরদিন অক্ষুণ্ণ ও জয়যুক্ত হউক। বৎসর বৎসর এই শুভদিনে আমরা সম্মিলিত হইয়া দেশের অপর সুসন্তান—যাঁহারা মাতৃভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যশ্লোকদের উদ্দেশে তর্পণ করিয়া নিজেরা গৌরবান্বিত হইবার অবকাশ পাইব।*

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সপ্তত্রিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠাদিবসে পঠিত।

বুদ্ধি ও বোধি

(২)

[শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম-এ, বি-এল]

চরম আর্য্যসত্যের নির্দ্ধারণ পক্ষে বুদ্ধির অক্ষমতা প্রদর্শন করিতে গিয়া গত বারের 'পঞ্চ-পুষ্পে' আমরা ব্রহ্মতত্ত্বের দৃষ্টান্ত দিয়াছিলাম এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানীর নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মবস্তুর পরিচয়, বুদ্ধির নিকট কেন প্রহেলিকা ও প্রলাপ বাক্য বলিয়া বোধ হয়, তাহার উল্লেখ করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ দেখা যায় দার্শনিকগণ বুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বনির্ণয়ে প্রয়াসী হইয়া ব্রহ্ম সম্বন্ধে নানা বিরোধের গহনারণ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছেন। বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া দার্শনিকগণ জীব সম্বন্ধেও বহু বিরুদ্ধবাদের অবতারণা করিয়াছেন। জীব কি বিভু না অণু? জীব কি আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ অথবা অণুরেষ আত্মা? জীব কি ব্রহ্মের অংশ (অংশো নানাব্যপদেশাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৪৩) অথবা তাঁহার আভাস বা প্রতিবিম্ব (আভাস এব চ—ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৫০)? জীব কি এক না বহু? সাংখ্যেরা বলেন পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং —বেদান্তীরা বলেন এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। কাহার কথা ঠিক? শেষ কথা—জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ কি? জীব কি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না অভিন্ন? জীব কি ব্রহ্মের দাসানুদাস (দাসস্য দাসদাসোঽহং) অথবা 'সোহং আপে আপ'? ব্রহ্ম কি জীব হইতে অধিক (অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ—ব্র, সূ, ২।১।২২) না 'তত্ত্বমসি'—তুল্যমূল্য? বুদ্ধির দ্বারা এ সম্বন্ধে যদি দার্শনিক বিচার-বিতণ্ডা করিয়া এক মন্বন্তরও অতিবাহিত করি এবং মৈনাককে লেখনী করিয়া সাগরবারিকে মসিরূপে ব্যবহার করিয়া নিঃশেষ করি, তথাপি বিতর্ক দ্বারা কোন দিন এ রহস্যের উচ্ছেদ করিতে পারিব কি? বস্তুতঃ বুদ্ধির অগম্য হইলেও জীব-ব্রহ্মের প্রকৃত সম্বন্ধ—শ্রীচৈতন্যদেব যাহা বলিতেন—'অচিন্ত্য ভেদাভেদ'—জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। সেই জন্য সুফি সাধক জিমি বলিয়াছেন—And whoever in Love's city enters, finds but room for One and but in Oneness union.

ইহা সেই প্রাচীন কথা—যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়—সেই যুগযুগান্তের উপদেশ—'অবিভাগো লোকবৎ। এ সম্পর্কে এক জন পশ্চিমবাসী যোগী (Recejac) কয়েকটী সুন্দর কথা বলিয়াছেন :—

The mystic experience ends with the words—'I live, yet not I but God in me.' * * * In its early stages the mystic consciousness feels the Absolute in opposition to the self. * * * As mystic activity goes on, it tends to abolish this opposition. * * * When it has reached its turn, the consciousness finds itself possessed by the sense of a Being, at one and the same time greater than the self and identical with it : great enough to be God, intimate enough to be we.

ইহাই অচিন্ত্যভেদাভেদ। বুদ্ধি কোটি কল্প মাথা কুটিলেও এ রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না; কারণ ইহা তর্কের অবিষয়।

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া—উপনিষৎ। সেই জন্য প্রাচীনেরা বলিতেন :—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তান্ তর্কেণ যোজয়েৎ—'যাহা বুদ্ধির অগম্য, এরূপ তত্ত্ব-সম্পর্কে তর্কের প্রয়োগ করিতে নাই' এবং হেতুবাদী (Rationalists)-দিগের নিন্দা করিতেন,—

ভবেৎ পণ্ডিতমানী যো ব্রাহ্মণো বেদনিন্দকঃ।
আন্বিক্ষিকীং তর্কবিদ্যাম অনুরক্তো নিরর্থিকাং॥
হেতুবাদান্ বদন্ সৎসু বিজেতা হেতুবাদিকঃ।

আক্রোষ্টা চাতিবক্তা চ ব্রাহ্মণানাং সদৈব হি।
বোদ্ধব্যস্তাদৃশস্তাত নরং শ্বানং হি তং বিদুঃ ॥

মহাভারত ১৩,৩৭।১১—৩

এবং সর্ব্বদা সতর্ক করিতেন—হেতুবাদান্ বিবর্জ্জয়েৎ। এমন কি মহর্ষি বাদরায়ণ বেদান্তদর্শনে সূত্র করিয়াছেন,—

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ—২।১।১১

ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেনঃ—'লোকে বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া যে তর্কের উত্থাপন করে, সে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। কারণ, এক বুদ্ধিমানের অনুমোদিত তর্ক অপর বুদ্ধিমান্ নিরাস করেন। পক্ষান্তরে, তাঁহার তর্কও তৃতীয় বুদ্ধিমান্ কর্ত্তৃক খণ্ডিত হয়। অতএব তর্কের শেষ কোথায়?' শঙ্করাচার্য্য তৃতীয় বুদ্ধিমানেই বিশ্রান্ত হইয়াছেন, কিন্তু যদি তৃতীয়ের পর চতুর্থ থাকে, চতুর্থের পর পঞ্চম, তাহার পর ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ইত্যাদি, বীজ গণিতের "n" পর্য্যন্ত,—তাহা হইলে তর্ক কোথায় গিয়া পর্য্যবসিত হয়? অনেকস্থলে তার্কিক সমাজে ঐরূপই ঘটে।

বুদ্ধিকে সম্বল করিয়া যদি আমাদের তত্ত্বনির্ণয়ের পথে অগ্রসর হইতে হইত, যদি বুদ্ধি-রচিত বিজ্ঞান-দর্শনকে সর্ব্বস্ব করিয়াই আমাদের তুষ্ট থাকিতে হইত, তবে আমাদের সমুচিত বাদ (appropriate Philosophy) হইত সংঘটনাবাদ বা Phenomenalism. Phenomenalism কি?

বল্ডউইন তাঁহার Dictionary of Philosophy and Psychology গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

Phenomenalism is the theory that all knowledge is limited to phenomena (things and events in time and space) and that we cannot penetrate to reality in itself (যাহাকে *Noumenon* বলে)। এই Phenomenon ও Noumenonএর এ দেশীয় নাম—ব্যাবর্ত্ত ও পরমার্থ। এই Phenomenalismএর পরিণত আকার কোমতের Positivism এবং তাহার মাসীতুত ভাই Huxley ও Spencerএর অনুমোদিত Agnosticism বা অজ্ঞেয়তাবাদ। ঐ Positivism সম্বন্ধে Baldwin তাঁহার অভিধানে লিখিয়াছেন :—

The name is applied by Comte to his own philosophy, characterising negatively its freedom from all speculative elements and affirmatively its basis on the methods and results of the hiearchy of positive sciences i. e mathematics, astronomy, physics, chemistry, biology and sociology. It is allied to Agnosticism in its *denial of the possibility* of knowledge of reality in itself, whether of mind, matter or force. It is allied to phenomenalism in its denial of capacity to know either efficient or final causation or any thing except the relations of co-existence and *sequence* in which sensible phenomena present themselves.

এই Agnosticism বা অজ্ঞেয়তাবাদ সম্বন্ধে বল্ডউইন সংক্ষেপে বলিয়াছেন—

This term is due to Huxley and is primarily descriptive of any theory which denies that it is possible for man to acquire knowledge about God.

এই Positivism ও Agnosticismকে এ দেশের প্রাচীন ভাষায় নাস্তিকতা ও মাস্তিকতা বলা হইত। বস্তুতঃ যদি বুদ্ধি বা intellect আমাদের সর্ব্বস্ব হয় এবং ঐ বুদ্ধির সাহায্যে যখন চরম সত্য নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব, তখন আমাদিগের নাস্তিক বা মাস্তিক না হইয়া উপায়ান্তর কি?

বুদ্ধি বা intellectএর দ্বারা কেন চরম তত্ত্বের নির্ণয় হইতে পারে না, এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা কয়েক বৎসর হইতে বেশ গভীর ভাবে আলোচনা করিতেছেন। এই সকল দার্শনিকের মধ্যে প্রখ্যাত ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁর (Bergson) নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি একাধারে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ দার্শনিক ক্যাণ্ট ও হেগেল যে স্থান অধিকার করিতেন, এই বিংশ শতাব্দীতে বার্গসঁ চিন্তারাজ্যে সেই স্থান অধিকার করেন।

আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রসঙ্গে ঐ বার্গসঁ কয়েকটী অতিশয় উপাদেয় কথা বলিয়াছেন। তৎপ্রতি পাঠকের চিন্তা আকর্ষণ করি :—

"The mind, which thinks it knows Reality because it has made a diagram of Reality, is merely the dupe of its own categories. The intellect is a specialized aspect of the self, a form of consciousness: but specialized for very different purposes than those of metaphysical speculation. Life has evolved it in the interests of life; has made it capable of dealing with 'solids,' with concrete things. With these it is at home. Outside of them it becomes dazed, uncertain of itself; for it is no longer doing its natural work, which is to *help* life, not to *know* it. In the interests of experience, and in order to grasp perceptions, the intellect breaks up experience, which is in reality a continuous stream, an incessant process of change and response, with no separate parts, into purely conventional 'moments,' 'periods,' or psychic 'states.' It picks out from the flow of reality those bits which are significant for human life; which 'interest' it, catch its attention. From these it makes up a mechanical world in which it dwells, and which seems quite real until it is subjected to criticism. It does the work of a cinematograph: takes snapshots of something which is always moving, and by means of these successive static representations—none of which are real because Life, the object photographed, never was at rest—it recreates a picture of life, of motion. This picture, this rather jerky representation of divine harmony, from which innumerable moments are left out, is very useful for practical purposes: but it is not reality, because it is not alive."

অন্যত্র বার্গসঁ বলিয়াছেন :—

"Intuition and intellect represent two opposite directions of the work of consciousness. Intuition goes in the very direction of life: intellect in the opposite direction. ... ... Intellect is characterised by a natural inability to know life. Instinct is sympathy and turned towards life."

এই কথার সম্প্রসারণ করিয়া তাঁহার শিষ্য Wildon Car বলিয়াছেন :—'What then is the intellect?' It is to the mind what the eye or ear is to the body. Just as in the course of evolution, the body has become endowed with certain special sense-organs which enable it to receive the revelation of the reality without, and at the same time limit the extent and the form of that revelation, so the intellect is a special adaptation of the mind, which enables the being endowed with it to view the reality outside it, but which at the same time limits both the extent and character of the view the mind takes.

অতএব বুঝা গেল কেন বুদ্ধি চরমতত্ত্ব নির্দ্ধারণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। এই সম্বন্ধে আণ্ডারহিল কয়েকটী প্রণিধানযোগ্য কথা বলিয়াছেন।—

"Cease to identify your intellect and yourself. Become at least aware of the larger truer self, that free creative Self, which constitutes your life as distinguished from the scrap of consciousness which is its servant. Smothered in daily life by the fretful activities of our surface mind, Reality emerges in our great moments, and seeing ourselves *in*

its radiance, we know, for good or evil, what we are. We are not pure intellects. * * Around our conceptional and logical thoughts there remains a vague, nebulous Somewhat, the substance at whose expense the, luminous nucleus we call the intellect is formed.

—Underhill's Mysticism. pp. 38-39.

অর্থাৎ বুদ্ধি বা intellect আমাদের সংবিতের সর্ব্বস্ব নহে—একটী ভগ্নাংশ মাত্র। বস্তুতঃ নব্য তন্ত্রের মনোবিজ্ঞান কিছু দিন হইতে Subliminal Consciousnessএর কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তত্ত্বদর্শী মায়ার সাহেব (Frederic Myer) সংবিতের এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য ইহাকে সাগরে ভাসমান তুষারস্তূপের (Iceberg) সহিত তুলনা করিয়াছেন। সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, জলপূর্ণ কাঁচের গ্লাসে এক টুকরা বরফ ছাড়িয়া দিলে ঐ বরফের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র (বোধ হয় সাত ভাগের এক ভাগ) জলের উপরে ভাসে—বাকি অংশ জলের নীচে ডুবিয়া থাকে। তুষারস্তুপের সম্বন্ধেও ঐরূপই দেখা যায়। শীত-প্রধান উত্তর সমুদ্রে গ্রীষ্ম ঋতুর আরম্ভে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের পাহাড় ভাসিয়া আসে। ঐ সকল পাহাড়ের দশ হাত যদি জলের উপরে ভাসে, তবে অন্ততঃ ৭০ হাত জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকে। পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদেরা এখন বলিতেছেন যে, জীব-সংবিৎও ঐরূপ। উহা একটা প্রকাণ্ড বস্তু—উহার কিয়দংশ মাত্র মস্তিষ্কের দ্বারা প্রকাশিত হয়—যাহাকে Brain Consciousness বলে। ইহাই যেন বরফস্তুপের জলের উপরিভাগে ভাসমান ভগ্নাংশ; কিন্তু ইহার অধিকাংশ subliminal অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় অব্যক্ত থাকে—ইহাই যেন বরফস্তুপের জলমগ্ন অবশিষ্টাংশ। দিব্যদৃষ্টি, প্রাগ্‌দৃষ্টি, সাইকোমেট্রি, সফল স্বপ্ন, ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি ব্যাপারে ঐ subliminal সংবিৎ (যাহা জাগ্রদ্দশায় অব্যক্ত বা subliminal ছিল), সেই সংবিৎ উপরে কতকটা ভাসিয়া উঠে এবং আমরা এই ব্যাপকতর সংবিতের (Larger Consciousnessএর) ব্যাপার দেখিয়া চমৎকৃত হই। এই Subliminal Consciousness সম্পর্কে স্যার অলিভার লজ লিখিয়াছেন :—

The doctrine is roughly that we are each of us larger than we know, that eaeh of us is only a partial incarnation of a larger Self. The individual, as we know him, is an incomplete fraction. * * The incarnate fraction varies in different individuals, from something almost insignificant to something rather magnificient and striking, but in no case is the whole Self manifested in any given individual.—Making of Man.

তবেই বলিতে পারি, মস্তিষ্কের দ্বার দিয়া বুদ্ধি বা intellect-রূপে সংবিতের যে টুকু প্রকাশিত হয়, সংবিৎ তাহা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ। ঐ ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ দ্বারা আমাদের ব্যাপকতর সংবিতের ইয়ত্তা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা নহে কি? অতএব আমরা বুদ্ধিকে সর্ব্বস্ব ভাবিব কেন? কারণ, we are not pure intellects. জাগ্রত অবস্থার উপরে আমাদের স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয়, নির্ব্বাণ প্রভৃতি অবস্থা আছে। সেই সেই অবস্থায়—'we become at least aware of the larger, truer self'. এই প্রসঙ্গে William Low তাঁহার Spirit of Prayer গ্রন্থে কয়েকটী সুন্দর কথা বলিয়াছেন,—

There is a root or depth in thee from whence all these faculties come forth as lines from a centre or as branches from the body of a tree. This depth is called the centre, the fund or bottom of the soul.

এ সম্বন্ধে জার্ম্মাণ দার্শনিক অয়কেন (Eucken) বলিয়াছেন :—Reality is an independent spiritual world, unconditioned by the apparent world of sense. To know it and to live in it is man's true destiny. His point of contact with it is "personality" : the inward fount of his being : his heart, not his head.

ইহাই আমাদের বোধি। ইহা বুদ্ধির উপরে। এই বোধিকে লক্ষ্য করিয়া অয়কেন অন্যত্র বলিয়াছেন,—

There is a definite transcendental principle in man.

ইহাই বোধি। তিনি ইহার নামকরণ করিয়াছেন—Gemuth.

"It is the core of personality. There God and man initially meet."

উপনিষদ্ যাহাকে 'গুহা,' 'হৃদয়,' 'দহর' আখ্যা দিয়াছেন—Gemuth কি তাহারই ছায়া?

এই বোধি সম্বন্ধে আরও অনেক বক্তব্য আছে। বারান্তরে সে বিষয়ে বলিবার ইচ্ছা রহিল

মানস-বিরহ

[শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী, বি-এ]

১

যবে রাত্রি হ'বে শেষ,—কৃষ্ণতার সে দু'টি নয়নে
নিগূঢ় আনন্দ-জ্যোতি হেরিব মধুর!
বর্ষণ-মুখর নিশা, দিশাহারা কল্পনা-চয়নে—
গুঞ্জরিবে কত গীতি অধরে বধূর।

সে তনু-বল্লরী ঘেরি' পূর্ব্বরাগ-পল্লব মুঞ্জরে;
কত দীর্ঘ দিবা-স্বপ্ন রঞ্জিবে কপোল,—
বিস্মৃত যামিনী-পারে প্রাণে মোর কি গীতি সঞ্চরে—
ললাট পরশে কা'র সুরভি নিচোল!

অপূর্ব্ব অলক-গন্ধে তৃষাতুর কাঁদিছে ভ্রমর—
তোমারে সৃজিনু আমি পড়ে না ত মনে!
সর্ব্ব তৃপ্তি-অতৃপ্তির মাঝে জাগে রহস্য অমর—
সে মায়া তোমারি জানি কমল-আননে!

২

গাঢ় করো মেঘাঞ্জন, আনো ছায়া সন্তাপহারিণী,
মদির আয়তনেত্রে বিভ্রম-প্রলয়!
আনো সেই মোহাবেশ,—মূর্চ্ছে যাহে অযুত রাগিণী,—
অযুত তরঙ্গশীর্ষ যাহে পায় লয়!

ক্ষীণশক্তি লতা তুমি?—এ কথা যে পারি না ভাবিতে—
গড়ি তাই নব মূর্ত্তি, মানসসঙ্গিনী!
তবু তার দেহ ভরি', তার মধু অপাঙ্গ-ভঙ্গীতে
তব রূপ, করে তা'র তোমারি কিঙ্কিণী!

সর্ব্ব দেহে ক্ষরে তা'র অবিমিশ্র স্মরণের সুধা—
আমি যে রাঘব সখী, বিরহবিলীন!—
প্রতিমার পদতলে বিসর্জ্জিনু আসিন্ধু বসুধা—
অসহায় চিত্তে ঘুরে বাল্মীকি-বিপিন!

৩

ব'সে আছ উদাসিনী, করতলে রাখিয়া কপোল,
বিলোল অলকে আলো বিছাইছে মায়া—
হৃদয়-জলধি শান্ত, তাই বুঝি আপনা বিভোল
আছ দ্বারপ্রান্তে বসি' শরীরিণী ছায়া!

স্তব্ধ মেঘ, স্তব্ধ বায়ু—মন কভু স্তব্ধ হ'য়ে রহে?
প্রশান্তি-বিলীনা—তবু চলে আলোড়ন;
কবে দেখা দিবে ঝড় ছিন্ন করি' মানস-বিরহে—
উন্মাদ হৃদয়-সিন্ধু করিবে গর্জ্জন!

তখনো পা'বে না প্রাণ আত্মস্থিতা নবীনা মূরতি?
দেহ-ভরা লাবণ্যের পা'ব না সন্ধান?
ভস্ম হোক মনসিজ—তবু তুমি দেখা দিবে রতি—
শোকময়ী তনু-দেহে হিল্লোলিবে প্রাণ!

মিলনের আনন্দ

(গল্প)

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, বি-এল]

১

অনেক বছর পরে কলকাতায় এলুম। গ্রীষ্মের ছুটি। যদি গ্রামের ... ভোগ করার নাম গ্রীষ্মের ছুটি ভোগ করা হয় তবে তা' সার্থক হয়েচে। প্রাণ পরিত্রাহি, সারারাত গরমে নিদ্রা নাই। এর উপর আবার মাঝে মাঝে বৃষ্টি আছে—রাস্তায় কাদা। অবস্থাটা অনেকটা "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" গোছের।

এই সেই কলকাতা! যেখানে ছেলেবেলা আর কলেজে পড়বার সময় কি সুখেই না কেটেছিল। ফুটবল, ক্রিকেট, বায়োস্কোপ—সে কি দিনই গেছে। আর সে দিনও ফিরবে না—আমিও ফিরব না। কেন ফিরব? এই প্রকাণ্ড সহরটা যখন আমার গ্রাসাচ্ছাদনের একটা ক্ষুদ্র সুযোগও করে দিতে পার্‌লে না, সুদূর আসামে একটা মাষ্টারি নিয়ে যখন যেতে হ'ল, তখন আর এর জন্য মায়া কি? ক'টা বছর চ'লে গেছে, মনে হয় বেশ আছি।

মাস খানেক কেটে গেছে আর দিন পনেরো বাকি। গরম বাতাস যেন আমার শ্বাস রোধ কর্‌ছে। মনে ভাবি এই কলকাতা—একে তো আগে এমন মনে হয় নি। দিন যায়—সঙ্গে সঙ্গে মানুষও বদলে যায়।

বিকেলে বালিগঞ্জের দিক্‌টা বেড়িয়ে ফির্‌চি। ডাইনে বাগানের ভেতরে একটা ছোট বাড়ী—এটা যেন নরেনের বাড়ী—হ্যাঁ তাই তো এই তো লেখা N. Chaudhuri, Bar-at-law. খানিকটা ঢুকে গেলুম। একজন দরওয়ানের মত লোক দেখে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম "সাব হ্যায়"; "হাঁ হুজুর" ব'লে সে আমায় বস্‌বার ঘরে নিয়ে এল। একটা কার্ডে নাম লিখে উপরে পাঠালুম। একটু পরে বয় ফিরে এসে বল্‌লে "সেলাম দিয়া"। মনটার ভেতর কেমন একটা ব্যথা লাগল; ভাবলুম এতদিন পরে এলুম, বন্ধু একটাবার নেমে আসতে পারে-না। অদর্শনের ফলে ওর মন থেকে বোধ হয় সরে যাচ্ছি—আর অনেক বছর তো কেটে গেছে। এত আলো হাওয়াতে রং এর পোঁচ একটুতো ফিকে হবেই।

ওপরে গেলুম, বয় একটা ঘর দেখিয়ে দিলে। এ ঘরে ছেলেবেলা কতবার এসেচি। ঘরটা যেন এখন আরো সাজান। একটা সোফায় নরেন শুয়ে রয়েছে। সে একটু উঠেই আমায় বল্‌লে, "Hullo যতীন! কি মনে করে ভাই—এস এস ব'সো।" বসলুম। সে বল্‌লে "তবুও মনে করে এলে। Excuse me নীচে নামতে পার্‌লুম না, শরীরটা তেমন ভাল নেই কি না—তার পর তোমার খবর কি বল। তুমি না কি মস্ত প্রোফেসার হয়েচ।" বল্লুম "হ্যাঁ ভাই কিছু তো একটা কর্‌তে হবে।" সে বল্‌লে, "নিশ্চয়ই একটা কিছু তো কর্ত্তে হবে—তার পর বাড়ীর খবর? তোমার বিয়ের যখন নিমন্ত্রণ পাই নি তখন অবিশ্যি বাড়ীর খবর জিজ্ঞেস করাটা আমার একটু ধৃষ্টতা।" আমি একটু তাড়াতাড়িই বল্লুম, "বিয়ে আমি করি নি।" "কর নি, বেশ—অন্য সকলে?" "অন্যই বা কে আছে, ঠিক তোমারই মতন—বুঝ্‌লে—যাক্ তোমার কি অসুখ।" সে বল্‌লে, "অসুখ—না—হ্যাঁ একটু জ্বর—ও তেমন কিছুই নয়—মাঝে মাঝে অমন একটু আধটু হয়।" আমি একটু শঙ্কিত হয়েই বল্লুম, "সে কি হে জ্বর! প্রায়ই হয়? এ তো ভাল নয়।" সে একটু মলিন হেসে বল্‌লে, "জগতে ভালই কি খালি হয়।" তারপর আমাকে চুপ করে থাক্‌তে দেখে বল্‌লে, "Never mind, এত দিন পরে দেখা—বাজে কথা থাক্, বল, কেমন আছ সেখানে?" আমি বল্লুম "আছি ভাল, কাজকর্ম্ম কমই। অনেক সময়, পড়াশুনা করবার সময় পাই।" "বেশ বেশ, ভাল! You are a good boy—তা আর ক'দিন আছ?" "প্রায় দিন পনের, এদিকে কিন্তু দম বন্ধ হবার

যোগাড়।" সে বল্লে "ঠিক তাই; এই গরমে কলকাতা অসহ্য—।" তার কথা শেষ হবার আগেই বল্লুম "তবে তুমি কোথাও চল না কেন? এই তো শরীরের অবস্থা —বেশ তো জর রয়েছে দেখচি—আমার সঙ্গেই চল না, ও জায়গাটা ভারী স্বাস্থ্যকর; আর তুমি গেলে আমার তো অসুবিধে মোটেই হবে না। তা ছাড়া বড় একলা থাকি। বেশ দু'জনে ক'টা মাস আমোদে কাটান যাবে।" ঘরের একটা দেওয়ালের দিকে তার দৃষ্টিটা চকিতে একবার ফিরল। সে একটা যেন নিঃশ্বাস চেপেই বল্লে, "কোথায় আর যাব—আর ভাল লাগে না।" "তা এখানে থাক্‌লে অসুখ তো বেড়ে যাবে?" সে বল্লে "কি আর বাড়বে? চিকিৎসা তো হচ্চে, কোথায় আবার যাব, আর পারি না।" শেষ কথা তিনটেতে কেমন একটা দারুণ অবসাদ মাখানো। চোখটা ফিরিয়ে দেওয়ালের দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম—একটা ছবি—এক নারীমূর্ত্তি। সে দেখে ফেল্লে; বল্লে, "ও কার ছবি বল তো।" বল্লুম, "মনে হয় তোমার স্ত্রীর।" "Exactly, আমার স্ত্রীর ছবি।" আমি কিছু বল্‌বার আগেই সে বল্লে, "জান তো আমার স্ত্রী মারা গেছেন—She is no more—এ সবই তাঁর হাতের সাজ'ন—ঠিক যেমনটী ছিল তেমনটীই আছে—ঠিক তেম্‌নি যেমন এক বছর আগে ছিল।" কি বল্‌ব ভাবচি—হঠাৎ সে বল্লে, "আর দশটা দিন বাকি!" স্বর শুনে আমি চম্‌কে উঠ্‌লুম! "কিসের দশ দিন!" "বছর পুরতে আর দশটা দিন বাকি।" সে যেন কি একটা অস্বস্তিতে একটু এ-দিক্-ও-দিক্ নড়্‌ল; তারপর যেন একটু সাম্‌লে নিয়ে বল্লে, "যাক্ ও সব কথা—এত দিন পরে এলে ও সব কথা ছেড়ে দাও, তোমার ও দেশের কথা একটু বল।" আমি বল্লুম—"কিন্তু তুমি"—কথাটা শেষ হবার আগে সে আমায় থামিয়ে দিয়ে বল্লে,—"আমার কথা আর একটীও নয়। আমি শুনবো তোমার কথা। আচ্ছা তোমার সে দেশটা কেমন?" একটু ব্যথিত মনেই এ-কথা সে-কথা বল্‌চি। খানিক পরে মনে হল, সে যেন শুনচে না। কি যেন একটা যাতনায় মুখটা বিবর্ণ হয়ে যাচ্চে। আমি বল্লুম, "তোমার কোন কষ্ট হচ্চে?" সে বল্লে, "কেমন তেষ্টা পাচ্চে। লছমন!"—"লছমন এল—নরেন তাকে খালি বল্লে, "লেয়াও পিয়েলা"। পানের দ্রব্য যা এল তা দেখে আমার চক্ষু স্থির। এ যে মদ। সে এক নিঃশ্বাসে সবটা পান কল্লে। আমি একটু গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস কল্লুম, "কি খেলে?" "ওষুধ", "ওষুধ না ব্র্যাণ্ডি?" সে একটু হেসেই বল্লে,—"যদি তাই হয়—ও কি আমার কাছে নতুন।" "তা হোক্ তোমার শরীর খারাপ—জর, তার উপর এতটা!" সে কাতর ভাবে বল্লে—"সব শরীরটায় কেমন যাতনা—তাই। যাক্, তুমি গল্প বল্‌ছিলে বল।" আমি একটু সোজা হয়ে বসে বল্লুম, "না—আর বল্‌ব না। সব আমি বুঝেচি তুমি এই রকমে নিজেকে মেরে ফেল্‌বে? মানুষের lifeএ disaster তো লেগেই আছে, তুমি educated man হয়ে, cultured man হয়ে এত দুর্ব্বল।" সে হয় তো আমার কথাটা না শুনেই বল্লে—"মাথাটা ভারী ধরেচে, জরটা বোধ হয় আসচে।" গায়ে হাত দিয়ে দেখ্‌লুম—খুব জর। বাইরে শব্দ হ'ল—ডাক্তার আসচেন। ডাক্তার দেখে গেলেন। আমি যখন ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করে ফির্‌লুম, তখন সে ঘুমিয়ে পড়েচে।

২

আমার শরীরটা খারাপ থাকায় ক'টা দিন নরেনের ওখানে যেতে পারি নি, তবে খবর পেয়েছি সে ক্রমশঃ ভাল হচ্চে। ভাব্‌চি তাকে সঙ্গে নিয়ে যা'ব। বেচারীর কেউ নেই, তার ওপর sentimental. ভারী অধীর হয়ে পড়েচে।

সারা দিন রাত টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ে বোধ হয় বৃষ্টি ফুরিয়ে গেছল; তাই সন্ধ্যের সময়টা আকাশ ধরে গেল। বেরিয়ে পড়লুম। নরেনের বাড়ী যখন পৌছুলুম তখন ফের আবার বৃষ্টি এল। ভিতরে গিয়ে বস্‌তেই বয় এল। তার মুখে চোখে কি এক আশঙ্কার ভাব। সে আমায় দেখেই বল্লে, "বাবুর আবার ভারী অসুখ, খুব জর ১০৪|৫।" "সে কি! কে কে আছে?" "কেউ নেই বাবু"—খালি আমি আর লছমন।" "ডাক্তার?" "তিনি দু-বেলাই আসচেন"। দ্বিরুক্তি না করে উপরের ঘরে গেলুম। সেই সোফায় নরেন শুয়ে আছে। বেডরুম লাইট মিটু মিটু করে জলচে; কি যেন একটা অশুভ ছায়া ঘরটার মাঝখানে রয়েচে। ভাবচি সে কি ঘুমিয়ে না জেগে। ঘরে ঢুকতে

সে জিজ্ঞেস করলে, "কে, যতীন এসেচ ?" বললুম, "হ্যাঁ।" মাথায় হাত দিয়ে দেখলুম একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। "আমায় একটু খবর দাও নি কেন ?" সে একটু পরেই বললে—"কেন মিছে ব্যস্ত করব ভাই, এই ক'টা দিন কলকাতায় এসেচ ; তা ছাড়া আজ তো ভাল আছি, একটু ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বই তো নয়, দু-দিকে একটু সর্দ্দি জমেছে এই যা—" আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে বল্লুম—"তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না।" ঘুম পায় তো ঘুমোও, সব সেরে যাবে।" গায়ে হাত বুলিয়ে দিলুম। অনেকক্ষণ পরেও সে জেগে রয়েচে দেখে বল্লুম, "এবার সেরে গেলে আমি তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাব। দেখবে তিন মাসে তোমার চেহারা একদম ফিরে যাবে।" সে চমকে উঠে বললে—"কোথা যাব ?" আমি একটু অপ্রস্তুত হয়েই বল্লুম—"আসামে আমার কাছে।" সে ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা কল্লে, "কবে যাব ?" আমি বল্লুম—"শরীর একটু সারলে।" সে অস্পষ্ট স্বরে কি যে বলতে লাগল, কিছু বুঝলুম না। তারপর খুব চঞ্চল হয়ে দেওয়ালে যেন কি খুঁজে দেখতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলুম, "ছবিটার কথা কইচ ?—এই তো রয়েচে।" সে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তারপর বুকের উপর হাত দুটো রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। ডাক্তার এলেন। জিজ্ঞাসায় বল্লেন, "নিউমোনিয়া বেশ, হার্ট দুর্ব্বল।" কথাটা শুনে অবধি তার বিছানার পাশে চিত্রার্পিতের মত বসে রইলুম। তবে কি— ?

রাত তখন বারটা। সমানে ঝর ঝর বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। প্রায়ান্ধকার ঘরে নিশীথ রাত্রে এ কঠিন রোগীর সামনে বসে কত কি যে ভাবচি কি বলব। বৃষ্টির বিরাম নাই। হঠাৎ ছবির দিকে চোখ পড়ল। মনে হ'ল সে যেন সজীব। কি কাতরতা তার দৃষ্টিতে! যেন বলচে, "ওগো আজ আমার দেহ নাই, সে তো মরণের ও-পারেই ফেলে দিয়ে এসেছি। আমি তো কিছুই কর্ত্তে পাচ্ছি না, আমার হয়ে তোমরা ওকে দেখো, ওগো তোমরা একটু দেখো।" চমকে উঠলুম। কি ভাবচি আমি। আর এখানে বসা নয়, উঠে বারান্দায় পায়চারি করচি—হঠাৎ নরেনের সাড়া পেয়ে ঘরে ঢুকলুম, সে বললে—"ভাই বুকটা কেমন কচ্চে ?" আশ্বাস দিয়ে বললুম—"ও কিছু নয় সেরে যাবে—কোথায় দেখি, একটু হাত বুলিয়ে দি।" ক্ষীণ স্বরে সে বললে, "বাইরে খুব বৃষ্টি না ?" উত্তর শোনবার অপেক্ষা না করেই বলতে লাগল "সে দিনও সারারাত ঠিক এমনি বৃষ্টি—ঠিক এক বছর আগে আজকের দিনটায়"—সব ঘর নিস্তব্ধ। খানিক পরে সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে সে নিজেই বললে—"যতীন আজ তোমায় আমার গল্পটা বলব, তুমি শুনবে ?" আমি বললুম—"আজই ? অন্য দিন হবে ভাই, আজ তোমার বড্ড জ্বর, লক্ষ্মীটি।" সে যেন একটু হতাশ হয়ে পড়ল। বালিশে মুখ লুকিয়ে অস্ফুট স্বরে বললে—"কেউ আমার কথা শুনতে চায় না!" আমার বুকে ভারী লাগল, তার হাত দুটো ধরে বললুম—"ভাই আমায় অমন নিষ্ঠুর মনে কর' না, আমি তোমার কথা শুনব, কিন্তু তোমার যে কষ্ট হবে।" খানিক চুপ চাপ থেকে সে বলতে লাগল—

"বিলেত থেকে ফিরে এসেই মস্ত একটা আশা নিয়ে হাইকোর্টে বেরুলুম—ফলও বেশ ফলল। এ মহলে খুব অল্প সময়ে অনেকের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব জমে গেল। শীঘ্রই পার্টিতে নিমন্ত্রণে আমি এক জন গণ্যমান্য লোক হয়ে উঠলুম। বান্ধবীদের সঙ্গেও বেশ অবাধ মেলা-মেশা হ'তে লাগল। তাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে পছন্দও করলেন। মনের নরম কোণে এক আধটা মধুর স্পর্শও অনুভব করলুম। এ স্পর্শে খালি মুগ্ধ নয়, আপনাকে হারিয়ে ফেললুম। গা ভাসিয়ে দিয়ে স্রোতের টানে দিব্যি যাচ্ছি একটানা। ভবিষ্যতের রঙ্গিন নেশায় বর্ত্তমানটা একদম চোখের বাইরে চলে গেল। বেশ চলছিল—কিন্তু একটা ধাক্কায় নেশাটা চটে গেল।"

একটু চুপ করে আবার বলতে আরম্ভ কল্লে—

"আমার বাবার পুরোনো এক বন্ধুর মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ খেতে গেলুম। পৌঁছে দেখি কান্নাকাটি পড়ে গেছে। কি ? না পাত্রের ভয়ানক অসুখ—সে আসবে না—লগ্ন যায়। এ বাড়ীতে ছেলেবেলা কয়েকবার এসেচি, বাবার বন্ধুকে কাকা ও তাঁর স্ত্রীকে কাকীমা বলি। বাড়ীর ভিতরে গেলুম। সকলে মিলে এমন কাঁদ্‌চেন যে, দেখলে পাষাণের চোখে জল আসে। কাকীমা আমার হাত দুটো ধরে বল্লেন, 'নরেন আমাদের যে সর্ব্বনাশ হ'ল বাবা।' ঘরের কোণে এক বালিকা মূর্ত্তি ভূলুণ্ঠিতা। মনের ভিতরটায় একটা ব্যথা লাগল। বাইরে এসে

বল্লুম 'কাকাবাবু সত্যিই কি কোন উপায় নেই!' তিনি মহা অবসাদে বল্লেন—'না বাবা নেই—আমরা গেলুম—মেয়েটাও চিরকালের জন্যে বিনা অপরাধে গেল। কোন উপায় নেই নরেন! কোন উপায় নেই।" কি উন্মাদনায় জানি না আমিই বিয়েতে রাজি হলুম। সুধা আমার ঘরে এল।"

ছবিটার দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল—সে একটু চুপ করে শুয়ে রইল। প্রায় দশ মিনিট পরে সে মুখ ফিরিয়ে বল্লে—"ওঃ তুমি বসে আছ? শোন—

আমার তখনকার ভবিষ্যতের রঙ্গিন স্বপ্ন এমনি নিষ্ঠুর ভাবে ভেঙ্গে গেল। এ আঘাত সামলাতে পারলুম না। তার কি অপরাধ? ভাবতুম। কিন্তু তার দিকে চাইতেও পারতুম না। সে এক পল্লী-বাসিনী বালিকা—না আছে রূপ—না আছে শিক্ষা। আমি আমার ভবিষ্যৎ সংসারের যে ছবি এঁকেছিলুম—তাতে, তো এ ছিল না। তাতে ছিল সুন্দরী সুমার্জ্জিতা আমারই মত রুচিসম্পন্না মানসী-মূর্ত্তি। যে সব বান্ধবীদের সঙ্গে পার্টিতে, নিমন্ত্রণে মেলা-মেশা করে বেশ আনন্দ পেতাম তাদেরই এক জনকে জীবন-সঙ্গিনী করে সংসার পথে চলব। মনে হ'ল এ আমার পায়ে—লৌহ-শৃঙ্খল। এ লোহার বাঁধন আমি মানব কেন? আমার মন বল্লে, 'চল আবার তেম্নি আগের মত নিজেকে ভাসিয়ে দাও।' এমনি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস করে চারটী বছর কেটে গেল। সে যেন আমার কেউ নয়। কেবল এক এক দিন খুব গভীর রাত্রে যখন ঘুম ভেঙ্গে যেত—তখন দেখতুম কে যেন আমার মাথাটা পাশের দিকে ফিরিয়ে দিত। ভাবতুম কি আশ্চর্য্য জীব এ! এর মনে কি একটা ছাপ পড়ে না—আমার এতটা তাচ্ছিল্যের এতটা অবহেলার—একটুও কি নয়? সমানে দিনের পর দিন আমার গৃহ-স্থালীর ছোট বড় সব কাজগুলো প্রাণ দিয়ে করে যাচ্ছে—কোন ত্রুটি নেই—কোন ওজর-আপত্তি নেই। তার কি কোন উদ্দেশ্য নেই—কোন ইচ্ছা, কোন একটা ছোট্ট আকাঙ্ক্ষা নেই? আমার শয্যার এক কোণে ক্ষুদ্র একটু খানি স্থান—এ অবহেলার দান—এই কি তার সব? ঘুমের ঘোরে তার একটা দীর্ঘশ্বাস যখন বুকের একটা গুরুভার বের করে নিয়ে আসত, তার মুখের উপর এমন একটা করুণ সরলতার ছাপ পড়ত—তাতে আমি নিজেই অবাক্ হয়ে যেতুম—ভাবতুম 'হায় অভাগিনী! তুমি আমার হাতে পড়লে কেন?'

"দিন চলে। সে কারো নয়, চিরদিন সমান যায় না। আমার টাইফয়েড হ'ল—ক্রমে ক্রমে এক দিন জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়ালুম। মরণ আমায় নিলে না—আমার সুধাকে আমায় চিনিয়ে দিয়ে গেল। বুঝলুম—এর চাইতে বড় কিছু কেউ কখন পায় নি।"

যখন একটু ভাল হয়েছি, সে সাম্নে বসে বাতাস কচ্চে, তার একটা হাত, আমার হাতে ধরা রয়েছে, বল্লুম—"সুধা আমায় ক্ষমা কর!" সে ভারি লজ্জিত হ'য়ে বল্লে—"ছি ও-কথা বল্‌তে নেই, ঠাকুর রাগ করবেন!" আমি ফের বল্লুম—"আমি তোমার কাছে যে দোষ করেচি কেউ তা করে না।" সে তেমনি ঘাড় হেঁট করে বল্লে—"কই কিছু তো দোষ কর নি, অমন কথা মুখে আন্‌তে নেই—অকল্যাণ হবে।"

আমি বল্লুম—"সত্যি আর দোষ করব না, তোমায় ভালবাসব।" সে কিছু বল্‌তে পাল্লে না—আমার হাতে মুখ লুকোল। তার চোখের অবাধ ধারায় আমার দু হাত ভেসে গেল।" উত্তেজিত ভাবেই কথাগুলা এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে নরেন চুপ করল। আমিও কিছু না বলে চুপ করে রইলুম। একটু পরে সে আবার বল্‌তে সুরু করলে—"আর বেশী নেই শেষ হয়ে এসেচে—শোন। প্রতিজ্ঞা রাখবার ক্ষমতা আমার ছিল না—তাই ভাল হয়ে সব আগেরই মতন চল্‌ল। দুষ্টু ঘোড়ার মতন মনটাকে আমার শিথিল হাতে লাগাম কষে রাখতে পারলুম না। এ যে নেশা—একে কি ছাড়া যায়। চেষ্টা করতুম, পারতুম না। মনটা আমার একটা তিক্ত বিষাদে ভরে উঠেছিল। সে কিন্তু কিছুই বলত না—কোন দিনও একটা প্রশ্ন করত না।

সে দিন রাত দুটোর পর ফিরলুম। ঘরে এসে দেখি সে ছটফট্ কচ্চে। মাথার ভিতরটা কেমন ঘুরে গেল। অপরাধীর মত তার শয্যাপ্রান্তে গিয়ে হাত দিয়ে দেখি খুব জ্বর। আত্মগ্লানি কাকে বলে তা তুমি জান না, সে কত নির্দ্দয়—বজ্রের চেয়েও কত কঠোর তাও নিশ্চয় জান না, সে রাত্রে তা টের পেলুম। সুধার মুখের কাছে

মুখ নিয়ে গিয়ে রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা কল্লুম, "সুধা জর হয়েচে—সুধা—সুধা" কে উত্তর দেবে—তার জ্ঞান নেই। রাত গেল—দিন গেল—সারা দিন রাত তার শয্যার পাশে কি বেদনা নিয়ে বসে রইলুম কি বল্‌ব—তার পর আরও দুটা দিন কাটল—" দম নিয়ে এবার সে একটু সাম্‌লে কিছু পরে আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—"তৃতীয় দিনে রোগ তার শত হাত আমার সুধার সারা গায়ে বুলিয়ে দিলে—অসহ্য যাতনায় তিনটে দিন কাটল। সন্ধ্যের সময় সে চোখ খুলে বল্লে—'তুমি কতক্ষণ বসে আছ?' সে করুণা-মাখা কথা কয়টায় কি উৎকণ্ঠার ভাব; কি বল্‌ব আমি, চোখের জল আমার মুখ বন্ধ করে দিলে। অবহেলার বিনিময়ে কি প্রাণভরা ভালবাসাই না সে দিয়েছিল। আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা আমাকে হিন্দুরমণীগণকে বুঝ্‌তে দেবার অবসর দেয় নি। একটু পরে তার ছোট্ট জীবনে সর্ব্বপ্রথম আমার দিকে সোজা চেয়ে একটু যেন হেসেই সে বল্লে—"ভাল থাক্‌বে।" আমার বল্‌বার কিছু ছিল না। রুদ্ধ গলা দিয়ে খালি বেরিয়ে এল, "আমায় মাপ কর—মাপ কর সুধা।" সে চুপ করে গেল, যেন মায়ের কোলে মেয়ে ঘুমল। ভোরের আলো যখন সবে ফুটচে, সে একবার চোখ চাইলে—পরিষ্কার সাদা দুটী চোখ আমার দিকে তুলে দিলে—দুই ধার গড়িয়ে জল পড়্‌তে লাগল—যেন বলচে "বিদায় বিদায়"। তার পর ইঙ্গিতে আমার পায়ের ধূলা চেয়ে নিয়ে মাথায় ঠেকালে। তার চির-যাত্রার দিনে সুধু একটা বিদায়-বাণী তাও মরণ তাকে বল্‌তে দিলে না—উঃ!" নরেন চুপ কল্লে—কি একটা গভীর নিরাশার মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল। সে নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে নরেন বল্লে,—"এবার ছবিটা দাও।" মন্ত্রচালিতের মত এনে দিলুম। ছবি বুকের উপর রেখে সে যেন ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

বারান্দায় পায়চারি কর্‌তে কর্‌তে কখন যে কোথায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই—হঠাৎ লছমন তুলে দিলে। সে কাঁদচে। ভোরের আলো সবে ফুটচে। বল্লুম, "কি রে কি?" সে কাঁদছিল কিছু বল্‌তে পাল্লে না। ঘরে ঢুকে দেখলুম নরেন ঠিক তেম্নি শুয়ে আছে, দুটো চোখের জলে সারা বালিশটা ভিজে গেছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম সে নেই—ছবিটা খালি তার দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ রয়েছে।

মীমাংসা-দর্শনে বাঙ্গালী

[অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ, এম্‌-এ]

সাধারণের ধারণা হিন্দুদিগের ষড়্‌দর্শনের মধ্যে বাঙ্গালী কেবল ন্যায়-দর্শনেরই বিশেষভাবে আলোচনা করিত এবং সেইজন্য এই দর্শনেই বঙ্গদেশ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত অথবা মিথ্যা নহে। বঙ্গগৌরব বাসুদেব সার্বভৌমের সময় হইতে এদেশে নব্যন্যায়দর্শন আলোচনার প্রবল স্রোত কয়েক শত বৎসর যাবৎ অব্যাহতভাবে বহিয়া গিয়াছে—বহু অমূল্য গ্রন্থ রচনার দ্বারা বাঙ্গালী পণ্ডিত সমগ্র ভারতের নিকট নিজেদের সূক্ষ্ম বুদ্ধির ও এই শাস্ত্রের প্রাধান্য খ্যাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—এই শাস্ত্রের অধ্যাপনা ও অধ্যয়নে বাঙ্গালার চতুষ্পাঠীগুলি সমগ্র ভারতের সংস্কৃতাধ্যায়ীর নিকট তীর্থক্ষেত্র-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে যদি কেহ ন্যায়দর্শনই বাঙ্গালীর আলোচ্য ছিল বলিয়া অনুমান করেন তবে তাঁহাকে একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে এই অনুমান আংশিকরূপে সত্য। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে বঙ্গে নব্য ন্যায় আলোচনার সূত্রপাত হয় এবং কিছু দিনের মধ্যেই বঙ্গদেশ এই শাস্ত্রে প্রাধান্য লাভ করে। তখন হইতে বঙ্গদেশে অন্যান্য দর্শনের আলোচনা এবং আদর কমিয়া যাইতে থাকে—সত্যের অনুরোধে একথা

স্বীকার করিতেই হইবে। তবে এই সময়ের পূর্ব্বে এবং পরে বঙ্গদেশে কোন্ কোন্ দর্শন আলোচিত হইত এবং বঙ্গদেশ তাহাতে কোনরূপ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল কি না তাহারও অনুসন্ধান করা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

এইরূপ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—নব্যন্যায় প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে বঙ্গে অন্যান্য দর্শনেরও বিশেষ আলোচনা হইত—বাঙ্গালী-পণ্ডিত অন্যান্য দর্শনের সাহিত্যকেও নিজেদের রচনার দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন এবং কোন কোন অংশে বাঙ্গালী অন্য কোন কোন দর্শনেও অল্পবিস্তর খ্যাতিও অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তবে নব্য-ন্যায়ে বাঙ্গালী যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন সে প্রতিষ্ঠার নিকট ইহা অতি সামান্য।

ইহা জোর করিয়াই বলা চলে যে কম হউক আর বেশী হউক সমস্ত দর্শনের আলোচনাই বঙ্গদেশে হইত। প্রাচীন পুথির সংগ্রহ বা আলোচনা যাঁহারা করিয়া থাকেন তাঁহারা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। এখনও বঙ্গাক্ষরে লিখিত বিভিন্ন দর্শনের পুঁথি নানা স্থান হইতে পাওয়া যাইতেছে। বাঙ্গালীর রচিত বিভিন্ন-দর্শনের বহু ব্যাখ্যা-গ্রন্থ ও নিবন্ধ-গ্রন্থ অপ্রকাশিত অবস্থায় সাধারণের অজ্ঞাতভাবে বিভিন্ন পুঁথিশালা বা ব্যক্তিবিশেষের গৃহে বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়া জানিতে পারা যায়। ইহা ছাড়া, ন্যায়-বিষয়ক গ্রন্থাদিতে খণ্ডন অথবা মণ্ডনপ্রসঙ্গে যে সকল পরমত উদ্ধৃত হইয়াছে সকল স্থলে না হউক কোন কোন স্থলে তাহারা বঙ্গে অন্যান্য দর্শনের আলোচনার জ্বলন্ত সাক্ষ্য-স্বরূপ বিদ্যমান। অনেক স্থলে অবশ্য পরমত প্রদান-কালে গ্রন্থকারগণ পরমতের গ্রন্থ আলোচনা না করিয়া পরম্পরাক্রমে শ্রুত মতই গ্রন্থমধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সেই জন্য কোন কোন স্থলে সেই সেই মত যথার্থভাবে উপস্থাপিত হয় নাই বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বাঙ্গালীর মীমাংসা-দর্শনালোচনার কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব। বৈদিক-কর্ম্ম-কাণ্ডের বিচারই মীমাংসা, পূর্ব্বমীমাংসা বা কর্ম্মমীমাংসার প্রধান উদ্দেশ্য। বেদালোচনা-পরাঙ্মুখ বঙ্গদেশে তাই মীমাংসালোচনার অনুসন্ধান এক আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে পারে। তবে বাঙ্গালী যে চিরদিনই বেদাধ্যয়ন-বিমুখ ছিলেন তাহা মনে হয় না। তাই অতি প্রাচীনকাল হইতেই বঙ্গে মীমাংসালোচনার পরিচয় পাওয়া যায়। পাল বংশের রাজা দেবপালের সময়ে বাঙ্গালী পণ্ডিত নারায়ণ ছন্দোগ-পরিশিষ্ট-প্রকাশ * নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহার ভূমিকায় মীমাংসা-শাস্ত্রের প্রভাকর-মতে তাঁহার পাণ্ডিত্য স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি নিজেকে 'প্রাভাকরমতস্থিতিলব্ধকীর্ত্তি' এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত উমাপতিকে 'প্রাভাকরগ্রামণী বলা হইয়াছে। ইহা তাঁহার প্রভাকরমতে বিশেষজ্ঞতার সূচনা হইতে পারে। ঐ বংশের রাজা প্রথম মহীপাল দেবের সময়েও মীমাংসা-লোচনার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার প্রদত্ত এক দান-পত্রে † দেখিতে পাওয়া যায় তিনি শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষ বিষয়ের অধীন গোকলিকা মণ্ডলান্তঃ-পাতি কুরটপল্লিকা গ্রাম "মীমাংসা-ব্যাকরণ-তর্ক-বিদ্যাধ্যায়ী" ভট্টপুত্র কৃষ্ণাদিত্য শর্ম্মাকে দান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণাদিত্য শর্ম্মার অধীত মীমাংসা পূর্ব্বমীমাংসা বলিয়াই মনে হয়।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে উদয়নাচার্য্য ন্যায়কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে (৩।১৪) গৌড়মীমাংসকের উল্লেখ করিয়াছেন। এই শব্দের দ্বারা উদয়ন কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন কি কোনও ব্যক্তিবিশেষকে মাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তবে বরদারাজ তাঁহার কুসুমাঞ্জলি-বোধিনী ‡ গ্রন্থে এই অংশের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে গৌড়মীমাংসককে "পঞ্চিকাকার" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন (পৃঃ ১২৩)। গ্রন্থ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এই পঞ্চিকাকার ও প্রসিদ্ধ মীমাংসাগ্রন্থ প্রকরণ-পঞ্চিকার রচয়িতা শালিকনাথকে অভিন্ন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। তাঁহার অনুমান সত্য হইলে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেই বঙ্গে মীমাংসার প্রচুর আলোচনা ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে শ্রীধর তদ্রচিত ন্যায়কন্দলী

---

* এই গ্রন্থ এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত Bibliotheca Indica Seriesএ প্রকাশিত হইয়াছে।

† বাণগড় তাম্রশাসন—গৌড়লেখমালা—পৃঃ ৯৭।

‡ এই গ্রন্থ Saraswati Bhaban Series (Benares)এ প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থে * তত্ত্বপ্রবোধ নামক তাঁহার অপর একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। যে প্রসঙ্গে এই গ্রন্থখানি উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে ইহাকে মীমাংসার গ্রন্থ বলিয়াই মনে হয়।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত-ভবদেব ভট্ট কুমারিলমতে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার প্রশস্তি হইতেই সে কথা জানিতে পারা যায়। † ঐ প্রশস্তিতেই তাঁহার রচিত মীমাংসাশাস্ত্রের এক গ্রন্থের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে।

"মীমাংসায়ামুপায়ঃ স খলু বিরচিতো যেন ভট্টোক্তনীত্যা।
যত্র জ্যায়াঃ সহস্রং রবিকিরণসমা ন ক্ষমন্তে তমাংসি॥
[শ্লোক ২৩]

লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিস্ লাইব্রেরীতে ভট্ট ভবদেব প্রণীত মীমাংসাশাস্ত্রবিষয়ক একখানি গ্রন্থ আছে। উহার নাম 'তৌতাতিকমত-সংগ্রহ।' ‡ এই গ্রন্থই প্রশস্তি বর্ণিত গ্রন্থ বা উহা আর একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ তাহা বলিবার উপায় নাই।

সেন-বংশীয় রাজগণের সময়েও বঙ্গে মীমাংসালোচনার প্রমাণ পাওয়া যায়। লক্ষ্মণ-সেনের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত হলায়ুধ "মীমাংসা-সর্ব্বস্ব" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এই কথা তিনি তাঁহার "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব" গ্রন্থের অনুক্রমণিকায় স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন (শ্লোক ১৯)। হলায়ুধরচিত মীমাংসা-শাস্ত্র-সর্ব্বস্ব নামক এক গ্রন্থের খণ্ডিত পুঁথি স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। § এই গ্রন্থ ও হলায়ুধের উল্লিখিত মীমাংসা-সর্ব্বস্ব এক কি না বলিবার কোনও উপায় নাই। হলায়ুধ তাঁহার ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বের এক স্থানে প্রসঙ্গক্রমে বঙ্গে মীমাংসা-শাস্ত্রের আদরের কথা বলিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে বাঙ্গালী বেদাধ্যয়ন-বিমুখ হইলেও মীমাংসার আলোচনা করিত *

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নব্যন্যায়ের জনক গঙ্গেশ উপাধ্যায় তাঁহার তত্ত্ব-চিন্তামণি গ্রন্থে গৌড়মীমাংসকদিগের মত উল্লেখ করিয়াছেন। † তাঁহার গ্রন্থের এই অংশ উদয়নের পূর্ব্বোল্লিখিত অংশ অবলম্বনে লিখিত বলিয়া মনে হয়। উভয় গ্রন্থের ভাষা ও বস্তুগত অতিরিক্ত সাদৃশ্যই এইরূপ সংশয় উত্থাপিত করে। ‡

গঙ্গেশের পরে বাঙ্গালায় যে মীমাংসার আলোচনা একেবারেই হয় নাই—এরূপ কথা বলা চলে না। স্মৃতি-শাস্ত্রের আলোচনার জন্য মীমাংসাশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রণালী বিশেষভাবেই অনুসৃত হইত। অন্ততঃ সেই সূত্রেও মীমাংসা দর্শনের অল্পবিস্তর আলোচনা যে না হইত এমন নহে।

মীমাংসাদর্শন-নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রব্যাখ্যাপ্রণালী অবলম্বন করিয়াই মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য "অধিকরণ-কৌমুদী" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে বাচস্পতি-মিশ্রের শ্রাদ্ধ-চিন্তামণি, পরাশরমাধবীয়-রচয়িতা মাধব এবং শূলপাণিকৃত শ্রাদ্ধবিবেকের উল্লেখ পাওয়া যায়। (চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত ঐ গ্রন্থের ২০,৩০, ৬২ ও ৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ইহা হইতে মনে হয়, রামকৃষ্ণ আনুমানিক খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থে একস্থানে মৎস্যভক্ষণের শাস্ত্রীয়ত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন (পৃঃ ৫৭)। তাঁহার এই প্রয়াস এবং তাঁহার ভট্টাচার্য্য উপাধি তাঁহার বঙ্গীয়ত্বই প্রমাণিত করে বলিয়া মনে হয়।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নবদ্বীপের অধিবাসী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখর বাচস্পতি মহাশয় স্মৃতিশাস্ত্রের

* Vizianagaram Sanskrit Series এ এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। একস্থলে গ্রন্থকার স্পষ্টই বলিয়াছেন—মীমাংসাসিদ্ধান্তরহস্য তত্ত্বপ্রবোধে কথিতম্ অস্মাভিঃ। (পৃঃ ১৩৬ পংক্তি ৪)

† 'ভট্টগিরাং গভীরিমগুণপ্রত্যক্ষ দৃশ্বা—ভট্টভবদেব প্রশস্তি—পংক্তি ১৪ (Epigraphia Indica—Vol. VI. p. 203-7)

‡ Descriptive Catalonge of Sanskrit Manuscripts in the India Office Library London.—Vol. IV.—No. 2166.

§ Notices of Sanskrit Manuscripts—Rajendra Lal Mitra—Vol. IV.—No. 1507.

* কলৌ আয়ুঃ-প্রজ্ঞোৎসাহ শ্রদ্ধাদীনামল্পত্বাৎ উৎকল-পাশ্চাত্যাদিভি-র্বেদাধ্যয়নমাত্রং ক্রিয়তে। রাঢ়ীয়বারেন্দ্রৈস্তু কিয়দেব বেদার্থস্তু কর্ম্ম-মীমাংসাদ্বারেণ যজ্ঞেতিকর্ত্তব্যতা বিচারঃ ক্রিয়তে।

† Bibliotheca Indica Series Vol. IV. Pt. I—৮৮ পৃঃ।

‡ তবতি হি বেদানুকারেণ পঠ্যমানেষু মন্বাদিবাক্যেষু অপৌরু-ষেয়ত্বাভিমানিনো গৌড়মীমাংসকস্যার্থনিশ্চয়ঃ।—উদয়ন। বেদানুকারেণ পঠ্যমানমন্বাদিবাক্যেঽপৌরুষেয়ত্বাভিমানিনো গৌড়মীমাংসকস্যার্থনিশ্চয়াৎ—তত্ত্বচিন্তামণি।

আলোচনার সুবিধার জন্য ধর্ম্মদীপিকা নামে এক মীমাংসা গ্রন্থ রচনা করেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ-শাস্ত্রী মহাশয় ইহার একখানি পুঁথির বর্ণনা করিয়াছেন। *

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ-লাইব্রেরীতে এই চন্দ্রশেখর বিরচিত আর একখানি এইরূপ গ্রন্থের পুঁথি আছে। উহার নাম 'তত্ত্ব-সম্বোধিনী।' এই গ্রন্থের প্রারম্ভ-বাক্য হইতে জানিতে পারা যায় চন্দ্রশেখর বারেন্দ্রবংশীয় ছিলেন এবং বালাযুত রামজীবন মহারাজ তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। †

আর একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এইখানি হইতেছে 'মীমাংসা-রত্ন।'

* Notices of Sanskrit Manuscripts—Vol. 1—পুঁথি নং ১৯২। গ্রন্থকার গ্রন্থপ্রারম্ভে গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন—"স্মৃতানাঞ্চ প্রকাশার্থং তনোতীমাং প্রদীপিকাম্"।

† শ্রীবালাযুতরামজীবনমহারাজেন সংস্থাপিতো বারেন্দ্রান্বয়-সম্ভবো বিতনুতে শ্রীতত্ত্বসম্বোধিনীম্।

ইহার একখানি পুঁথি লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে আছে। * গ্রন্থকারের নাম রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যালঙ্কার। ইহার সময় জানা নাই। ইহাতে দুই ভাগে মীমাংসা-দর্শনের প্রমাণ ও প্রমেয় আলোচিত হইয়াছে। ন্যায় ও বৈশেষিকের প্রমাণ ও প্রমেয় অবলম্বন করিয়া বঙ্গদেশে বহু প্রকরণ-গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। মীমাংসা-দর্শন বিষয়ে বাঙ্গালীর রচিত এরূপ গ্রন্থ কিন্তু আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

উপরে বঙ্গদেশে মীমাংসালোচনার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল তাহা হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে প্রাচীনকাল হইতে মীমাংসালোচনার এক ধারা অব্যাহত ভাবে এদেশে চলিয়া আসিয়াছে। নব্যন্যায়ের প্রাবল্য ইহাকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারে নাই।

ভবিষ্যতে অন্যান্য দর্শন-সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

* Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the India office Library, London—Vol. IV—No. 2216.

কবিরাজ রাজশেখর

[শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য, বেদান্ততীর্থ, এম-এ

(বহিরঙ্গ আলোচনা)

বাণীর বরপুত্র কালিদাস বা ভবভূতির মত প্রসিদ্ধি না থাকিলেও সংস্কৃত কাব্য-জগতে রাজশেখরের প্রতিষ্ঠা বড় অল্প নহে। কিন্তু বঙ্গীয় পাঠকসমাজে তিনি পূর্ব্বোক্ত মহাকবিদ্বয়ের ন্যায় ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত নহেন। সেই অভাব দূর করিবার নিমিত্তই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

রাজশেখর তাঁহার অতুলনীয় "**কাব্য-মীমাংসা**"য় নিজেকে '**যাযাবরীয়**' (অর্থাৎ যাযাবরবংশোদ্ভূত) বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ধনপালের 'তিলকমঞ্জরী' ও সোড্ঢলের 'উদয়সুন্দরী'চম্পূতে 'যাযাবর কবির' বহু প্রশংসা দৃষ্ট হয়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই প্রসিদ্ধ কাব্যকার ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে তাঁহার প্রপিতামহ "**অকালজলদে**"র নামই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। 'কাদম্বরীরাম' নামক আর একজন কবি ইহার গ্রন্থ হইতে বহু রচনা আত্মসাৎ করিয়া কবিপ্রসিদ্ধি লাভ করেন। চেদিরাজের সভাকবি 'সুরানন্দ', 'তরল' ও 'কবিরাজ' নামক আরও তিন জন প্রসিদ্ধ কবি এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজশেখরের পিতা '**দুর্দুক**' (বা '**দুহিক**') ছিলেন এক জন মহামন্ত্রী; তাঁহার মাতার নাম ছিল '**শীলবতী**'।

কবির বংশপরিচয়

কবি যাযাবরবংশীয় ছিলেন—এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কিন্তু তথাপি তাঁহার জাতিনির্ণয় করা সহজ

নহে। তিনি রাজা 'মহেন্দ্রপালের উপাধ্যায়' শুনিয়া বোধ হয় যে ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম; আবার তাঁহার 'রাজশেখর' নাম ও 'চাহুআণকুলমৌলিমালিকা' কবীন্দ্রগেহিনী 'অবন্তি-সুন্দরী'র নাম শ্রবণে তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলিতে ইচ্ছা করে। এ সমস্যার সমাধানের ভার সুধী পাঠকসমাজের উপরই ন্যস্ত হইল।

জাতি-পরিচয়

কবির সহধর্ম্মিণী অবন্তিসুন্দরী যে সর্ব্বাংশেই কবির উপযুক্ত ছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ কাব্যমীমাংসার পত্রে পত্রে পাওয়া যায়। মনে হয়, এই মহীয়সী বিদুষী রমণী অলঙ্কারের উপর কোন গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সে গ্রন্থ অধুনা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। **'কর্পূর-মঞ্জরী'** সর্ব্বপ্রথমে ইহারই মনোরঞ্জনের নিমিত্ত অভিনীত হইয়াছিল।

কবীন্দ্রগেহিনী

রাজশেখরের দৃশ্যকাব্যগুলির প্রস্তাবনা হইতে জানা যায় যে, তিনি কনৌজরাজ মহেন্দ্রপাল (খ্রীঃ ৯০৩ অব্দ) ও তৎপুত্র মহীপালের (খ্রীঃ ৯১৭ অব্দ) উপাধ্যায় ছিলেন। ইহা ছাড়া অন্য উপায়েও তাঁহার সময় নিরূপিত হইতে পারে। কাব্যমীমাংসায় তিনি **'গৌড়বহো'**-প্রণেতা 'বাক্‌পতিরাজ' (খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগ), কাশ্মীর-রাজ 'জয়াপীড়ে'র (খ্রীঃ ৭৭৯—৮১৩ অব্দ) সভাপতি 'উদ্ভট' ও কাশ্মীররাজ 'অবন্তিবর্ম্মা'র (খ্রীঃ ৮৫৭—৮৮৪ অব্দ) সমসাময়িক 'আনন্দবর্দ্ধনে'র নাম করিয়াছেন। 'সোমদেব' তাঁহার **'যশস্তিলকচম্পু'**তে (খ্রীঃ ৯৬০ অব্দ) ও 'সোড্ঢল' উদয়সুন্দরী'তে (খ্রীঃ ৯৯০ অব্দ) রাজশেখরের যথেষ্ট মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহা অনুমান করা যায় যে কবিবর খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

আবির্ভাব কাল

কবিরাজকৃত **'হরবিলাস'** পাঠে মনে হয় যে, তিনি এক জন খুব গোঁড়া শৈব ছিলেন। আবার কাব্যমীমাংসায় বিষ্ণুভক্তির সংখ্যাও বড় অল্প দৃষ্ট হয় না। সোমদেব সুরেন্দ্রের, রাজশেখর নিজ গ্রন্থে জিনস্তুতি করিতেও পশ্চাৎপদ হ'ন নাই। এ নিমিত্ত আমরা অনায়াসে সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, কবির উদার হৃদয়ে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক ভাব স্থান পাইত না।

সাম্প্রদায়িকতার অভাব

রাজশেখর নিজেকে 'মহাকবি' না বলিয়া **'কবি-রাজ'** বলিয়াছেন। তাঁহার মতে কবিশক্তির দশটী ক্রমোন্নত অবস্থা আছে। ষষ্ঠ অবস্থায় উপনীত হইলে কবির আখ্যা হয় 'মহাকবি'; আর সপ্তম অবস্থায় উঠিলে তিনি 'কবিরাজ' উপাধি লাভ করেন। বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন রসবহুল বিভিন্নপ্রকার নিবন্ধরচনায় যাঁহার স্বাতন্ত্র্য আছে, তিনিই 'কবিরাজ' হইবার যোগ্য। রাজশেখরের সে সামর্থ্য যে ছিল, তাহা তাঁহার গ্রন্থপাঠেই বুঝা যায়।

কবিরাজ আখ্যার হেতু

কর্পূরমঞ্জরী (১।৯) হইতে আমরা জানিতে পারি যে, রাজশেখর প্রথমে 'বালরামায়ণ' ও 'বালভারত' রচনা করিয়া **'বালকবি'** নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বালকবি রূপেই তাঁহার কবিজীবনের প্রারম্ভ। ইহা হইতে বোধ হয় যে, ঐ দুই খানি রূপকই তাঁহার কাব্যালোচনার প্রথম ফল। তাহার পর 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা' রচিত হয়। কর্পূর-মঞ্জরী ও কাব্যমীমাংসা অনেক পরের রচনা। তখন তিনি **'কবিরাজ'** রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কাব্য-মীমাংসায় তাঁহার তিন খানি সংস্কৃত রূপক (কর্পূরমঞ্জরী—সট্টক—প্রাকৃতে রচিত) হইতে উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোক দৃষ্ট হয়।

কবির অনাবিষ্কৃত গ্রন্থের উল্লেখ

হেমচন্দ্রের "কাব্যানুশাসনবিবেকে" রাজশেখরকৃত **'হরবিলাস'** কবিনামাঙ্কিত বলিয়া উল্লেখ আছে*। হেমচন্দ্র হরবিলাসের প্রথম সর্গ হইতে আশীঃ ও সুজন-দুর্জন-স্বরূপ-বর্ণনার আরও দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। "উজ্জ্বলদত্ত"কেও হরবিলাস হইতে শ্লোকার্দ্ধ সমুদ্ধৃত করিতে দেখা যায়।

এই "হরবিলাস" নামক মহাপ্রবন্ধ নিশ্চয়ই কবিরাজ-রূপে প্রসিদ্ধিলাভের পরে রচিত হইয়াছিল। বোধ হয়, এই হরবিলাসেরই প্রথম অথবা শেষ সর্গ হইতে (খুব সম্ভবতঃ প্রথম সর্গ হইতেই) "বিশেষকবিপ্রশংসা"র শ্লোকগুলি লইয়া "জহ্লণ" তাঁহার "সূক্তিমুক্তাবলী"

* "স্বনামাঙ্কতা যথা রাজশেখরস্য হরবিলাসে" (পৃঃ ৩৩৫)

গ্রথিত করিয়াছিলেন।* সাধারণতঃ, হর্ষচরিত তিলকমঞ্জরী, উদয়সুন্দরী প্রভৃতি আখ্যায়িকা ও কথাতেই কবির বংশানুকীর্ত্তন ও পূর্ব্বকবিপ্রশংসা দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু তাই বলিয়া মহাকাব্যেও যে পূর্ব্বকবিগণের প্রশংসা থাকিতে পারে না এমন কোন কথা নাই। উদাহরণস্বরূপে আমরা দেখাইতে পারি যে, "মঙ্খক" তাঁহার "শ্রীকণ্ঠচরিতে" প্রাচীন সমসাময়িক কবিগণের নামোল্লেখ করিয়াছেন; "সোমেশ্বর"ও তাঁহার "কীর্ত্তিকৌমুদী"র প্রথম সর্গে পূর্ব্বকবিগণের প্রশংসায় দশমুখ; কাব্যের প্রারম্ভে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিগণের প্রশংসাকীর্ত্তনের এই রীতি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রাকৃত কাব্যেও বর্ত্তমান দেখা যায়—দৃষ্টান্তস্বরূপে হেমচন্দ্রের গুরু "দেবচন্দ্রে"র "শান্তিনাথচরিত্রে"র নাম করা যাইতে পারে।

কেহ কেহ বলেন যে, রাজশেখর "কবিবিমর্শ" নামক এক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; সূক্তিমুক্তাবলীতে যে সকল কবিপ্রশংসার শ্লোক রাজশেখরকৃত বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে, সেগুলি সবই কবিবিমর্শ হইতে গৃহীত। কিন্তু অষ্টাদশ অধিকরণে সুবিরাট্ কাব্যমীমাংসা রচনা করিবার পর, রাজশেখর যে কোন্ প্রয়োজনে আবার কবিবিমর্শরচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কুলায় না। কারণ, কবি ও কাব্য সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার থাকিতে পারে, তাহা সমস্তই কাব্যমীমাংসার অধিকারমধ্যে পতিত হয়। অর্থাৎ কাব্যমীমাংসার সূচিপত্র হইতে বুঝা যায় যে, উহা এ সম্বন্ধে একটী Encyclopædia বিশেষ। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই।

অপর কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ঐ শ্লোকগুলি কাব্যমীমাংসারই শ্লোক। কাব্যমীমাংসার প্রথম অধিকরণে (বরোদা ষ্টেট হইতে মাত্র এই প্রথম অধিকরণই ছাপা হইয়াছে) শ্লোকগুলি পরিদৃষ্ট হয় না। আর সমগ্র কাব্যমীমাংসার যে সূচিপত্র রাজশেখর স্বয়ং রচনা করিয়াছেন—তাহা আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, এরূপ কবিপ্রশংসার শ্লোক কাব্যমীমাংসার কেবল প্রথম অধিকরণেই থাকা সম্ভব; প্রথমাধিকরণে না থাকিলে অবশিষ্ট সপ্তদশটী অধিকরণের যে কোন অধিকরণে ঐরূপ শ্লোক থাকার সম্ভাবনা খুব অল্প।

হরবিলাস ব্যতীত রাজশেখর পৃথিবীর ভূগোলসম্বন্ধে এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন—উহার নাম **"ভুবনকোশ"**। কাব্যমীমাংসার সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষে উক্ত গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।* পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উজ্জ্বলদত্ত রাজশেখরকৃত মহাদেবের পর্য্যায়বাচক শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন।† হয় ইহা হরবিলাস হইতে গৃহীত, অথবা ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, রাজশেখর কর্ত্তৃক অন্য কোন কোষগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই সকল আলোচনায় আরও মনে হয় যে, রাজশেখরের যে কয় খানি গ্রন্থ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা ছাড়া আরও অনেক অধিক গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন। এ নিমিত্ত সুধীসমাজে রাজশেখরসম্বন্ধে যত অধিক আলোচনা হয়, ততই মঙ্গল।

বরোদার "গাইকোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজে" (নং ১) "কাব্যমীমাংসা" নামে যে গ্রন্থখানি ছাপান হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃ সম্পূর্ণ কাব্যমীমাংসা নহে—উহা কাব্যমীমাংসার প্রথমাধিকরণ মাত্র।‡ ঐ গ্রন্থের "শাস্ত্রসংগ্রহ" শীর্ষক প্রথম অধ্যায় দেখিলে বুঝা যায় যে, কবিরাজ মহাভারতের ন্যায় এক খানি অতি বিরাট্ গ্রন্থ রচনার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সে সঙ্কল্প তাঁহার কখনও কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল কি না, কে বলিবে? কারণ, বর্ত্তমানে "কবিরহস্য" নামক প্রথমাধিকরণ ব্যতীত আর কিছুই আমাদের হস্তগত হয় নাই। তবে এই প্রথমাধিকরণেরই কয়েকটী উক্তি § হইতে বেশ মনে হয় যে, তিনি

* Many stanzas on poets by Rajashekhara probably come from some lost work; perhaps the Haravilasa" —Keith, A history of Sanskrit Literature, p. 386.

* "ইত্থং দেশবিভাগো মুদ্রামাত্রেণ সূত্রিতঃ সুধিয়াম্।
যস্তু জিগীষত্যধিকং পশ্যতু মদ্ভুবনকোশমসৌ॥" (পৃঃ ৯৮)

† "চণ্ডীকান্তো ভগালী চ লেলিহানো বৃষধ্বজঃ।" (২।৭৬)

‡ উক্ত গ্রন্থের ভূমিকারূপে যে পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ সুদীর্ঘ ইংরাজী প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, বর্ত্তমান নিবন্ধটী মূলতঃ তদবলম্বনেই রচিত। —লেখক

§ "রীতয়স্তু তিস্রস্তাস্তু পুরস্তাৎ" (—কা. মী. পৃ ১০)
"তমৌপনিষদিকে বক্ষ্যামঃ" (— ঐ পৃ ১১)

স্বীয় গ্রন্থের বিষয়বিভাগসম্বন্ধে একটী সুন্দর আদর্শ মনে মনে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই কল্পনা শেষ পর্য্যন্ত কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হয়, অথবা সমগ্র গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল—তাহা জানিবার মত উপাদান বর্ত্তমানে আমাদের হস্তে নাই। "অলঙ্কারশেখর" গ্রন্থে রাজশেখর-কৃত তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়। যদি সত্য সত্যই এগুলি রাজশেখরের রচনা হয়, তাহা হইলে প্রথম দুইটী শ্লোক কাব্যমীমাংসার **"উভয়ালঙ্কারিক"** অধিকরণ এবং তৃতীয়টী **"বৈনোদিক"** অধিকরণ হইতে গৃহীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। *

অন্তরঙ্গ আলোচনা

কাব্যমীমাংসার লিখন-রীতি

কাব্যমীমাংসার রচনাপদ্ধতি (style) অনেকটা সূত্ররচনারীতির অনুরূপ। সে নিমিত্ত কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র" বা বাৎস্যায়নের "কামসূত্রে"র লেখসরণির সহিত ইহার লিখনরীতির যথেষ্ট সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। কাব্যমীমাংসা সূত্রাকারে সংক্ষিপ্তভাবে গদ্যে লিখিত; উহার ভাষা বেশ সরল, সতেজ ও শ্রুতিমধুর।

কাব্যমীমংসা ও পরবর্ত্তী যুগের আলঙ্কারিকগণ

সুপ্রসিদ্ধ বুধবর হেমচন্দ্রের "কাব্যানুশাসন-বিবেক" গ্রন্থে কবিরহস্যের প্রায় একচতুর্থাংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কবিরহস্যের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায় তিনি প্রায় একরূপ হুবহু নকল করিয়াছেন বলিলেও চলে; মধ্যে মধ্যে কেবল ক্রমের একটু ইতরবিশেষ করিয়া সাজাইয়াছেন। নেমিকুমারের পুত্র বাগ্‌ভটও ঐ অংশটাই হেমচন্দ্রের নিকট হইতে আত্মসাৎ করিয়া স্বীয় "কাব্যানুশাসনে"র প্রথম ও পঞ্চম অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন; তবে তিনি একেবারে নকল করেন নাই—মাঝে মাঝে দুই একটা নিজের কবিতা চালাইয়াছেন। পরবর্ত্তী যুগের ক্ষেমেন্দ্র, অমর, বিনয়চন্দ্র, দেবেশ্বর প্রভৃতি "কবিশিক্ষা"-রচয়িতৃগণ রাজশেখরের নিকট যে কতদূর ঋণী তাহা তাঁহাদের গ্রন্থ দেখিলেই বুঝা যায়। "সরস্বতীকণ্ঠাভরণ" গ্রন্থেও কাব্যমীমাংসা হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়; উহার টীকাকার "রত্নেশ্বর" ইহাদের মধ্য হইতে একটী শ্লোককে স্পষ্টই কাব্যমীমাংসার শ্লোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "অভিজ্ঞানশকুন্তলে"র উপর শঙ্করবিরচিত "রসচন্দ্রিকা" নামে যে টীকা আছে, তাহাতেও কাব্যমীমাংসাকারের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়।

শাস্ত্রকারদিগের ন্যায় রাজশেখর পরমপুরুষকেই কাব্যশাস্ত্রের "যোনি" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর

কাব্যশাস্ত্রের উৎপত্তি পরিপুষ্টি ও বিস্তৃতি

সাহিত্যবিদ্যা যে দেবপরম্পরাক্রমে আগত, ইহাও তিনি স্পষ্টভাবে বলিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। শ্রীকণ্ঠ পরমেষ্ঠি, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি তাঁহার চতুঃষষ্টি শিষ্যকে কাব্যশাস্ত্রের উপদেশ দেন। স্বয়ম্ভূ আবার তাঁহার স্বেচ্ছাজাত শিষ্যগণকে অধীতবিদ্যা প্রদান করেন। ইহাদের অগ্রগণ্য ছিলেন সরস্বতীর পুত্র **"কাব্যপুরুষ"**। প্রজাপতি তাঁহার উপরেই কাব্যবিদ্যাপ্রবর্ত্তনের ভারার্পণ করেন। তিনি আবার দিব্য কাব্যবিদ্যাস্নাতকগণকে সবিস্তারে অষ্টাদশাধিকরণী কাব্যবিদ্যা অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সহস্রাক্ষ প্রভৃতি ১৮ জন শিষ্য প্রত্যেকে নিজ নিজ অধীত বিষয় সম্বন্ধে ১৮ খানি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। এইরূপে প্রকীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় কাব্যবিদ্যা কিয়ৎপরিমাণে বিলুপ্ত হইয়া যায়। অবশিষ্টাংশও পাছে কালক্রমে বিলোপ প্রাপ্ত হয়—এই ভয়ে কবিরাজ পূর্ব্বাচার্য্যগণের উক্তির সারসংক্ষেপ এই অষ্টাদশাধিকরণময়ী কাব্যমীমাংসার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

কি বৈদিক, কি লৌকিক—এই উভয়বিধ সাহিত্যেই কাব্যশাস্ত্র ও অলঙ্কারের স্থান অতি উচ্চে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

---

* আহ রাজশেখরঃ—

সমানমধিকং ন্যূনং সজাতীয়ং বিরোধি চ।
সকুল্যং সোদরং কল্পমিত্যাদ্যাঃ সাম্যবাচকাঃ ॥
অলঙ্কারশিরোরত্নং সর্ব্বস্বং কাব্যসম্পদাম্।
উপমা কবিবংশস্য মাতৈবেতি মতির্মম ॥
(অলঙ্কারশেখর, ১১শ মরীচি)

"উৎপাটিতৈস্তোতীতৈঃ শৈলৈরামূলবন্ধনাৎ।
তাৎকালিকাদ্ সমালোক্য সমস্তাৎ পূরয়েৎ কবিঃ ॥"
(অলঙ্কারশেখর ১৯শ মরীচি)।

রাজশেখর বলেন যে, ষড়ঙ্গ ব্যতীত বেদের "**সপ্তম অঙ্গ**" হইতেছে অলঙ্কার ; * কারণ, অলঙ্কারস্বরূপ-নির্ণয় ব্যতীত বেদার্থের জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। আবার অন্যস্থলে তিনি বলিয়াছেন যে, সাহিত্যই "**পঞ্চমী বিদ্যা**"; ও চতুর্দ্দশ বিভিন্ন বিদ্যাস্থানের একমাত্র আশ্রয়-স্বরূপ—"**পঞ্চদশ বিদ্যাস্থান**"। †

সাহিত্যক্ষেত্রে অলঙ্কারের স্থান

"কাব্যপুরুষ" ও তদীয় কান্তা "সাহিত্যবিদ্যাবধূ"র কল্পনা সংস্কৃতসাহিত্যে একেবারে নূতন। ঋগ্বেদবর্ণিত বেদ-পুরুষের অনুকরণে ইহার কল্পনা। বস্তুতঃ, ঋগ্বেদের "চত্বারি শৃঙ্গা—"প্রভৃতি শ্লোকটি কাব্যপুরুষের প্রশংসার্থ কাব্য-মীমাংসায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ‡

পুরাকালে পুত্রলাভার্থ দেবী সরস্বতী হিমগিরিতে তপস্যা করিতেছিলেন। তপস্যায় প্রীত হইয়া বিরিঞ্চি তাঁহাকে পুত্রলাভের বর প্রদান করেন। এইরূপে কাব্যপুরুষের জন্ম হইল। তিনি জন্মিয়াই ছন্দোবদ্ধ শ্লোক উচ্চারণ করিয়া জননীর পাদ-বন্দনা করিলেন। ইহার মুখ হইতেই প্রথম শ্লোকের উৎপত্তি। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্বান্‌গণ গদ্যই জানিতেন ; পদ্য-রচনা তাঁহাদের অগোচর ছিল। শব্দার্থ তাঁহার শরীর, সংস্কৃত মুখ, প্রাকৃত বাহু, জঘন অপভ্রংশ, পৈশাচ ভাষা পদ, মিশ্র ভাষা বক্ষঃস্থল ; রস তাঁহার আত্মা, রোম ছন্দঃ ও বিভিন্ন অলঙ্কার তাঁহার ভূষণ।

কাব্যপুরুষ

একদা ব্রহ্মর্ষি ও দেবগণের মধ্যে শ্রুতির অর্থনির্ণয় লইয়া মহাবিবাদ উপস্থিত হয়। স্বয়ম্ভূ উভয়পক্ষকে ব্রহ্ম-লোকে এক বিরাট্‌ বিচারসভায় আহ্বান করেন। মীমাং-সার ভার পতিত হয় দেবী সরস্বতীর উপর। দেবী মধ্যস্থতা করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মলোকে গমন করিবার উদ্যোগ করিবা-মাত্র কাব্যপুরুষও তাঁহার অনুগামী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দেবী অনেক বুঝাইলেন ; কিন্তু কাব্যপুরুষ একেবারে নাছোড়-বান্দা। দেবী তখন "পরমেষ্ঠীর অনুমতি ব্যতীত তোমার ব্রহ্মলোকগমন মঙ্গলের হইবে না" বলিয়া জোর করিয়া চলিয়া গেলেন ; কাব্যপুরুষ মাতার এই হঠকারিতায় ক্রোধে ও অভিমানে যেন ফাটিয়া পড়িতেছিলেন। তাঁহার প্রিয় মিত্র কুমার কার্ত্তিকেয় বন্ধুর এই দুরবস্থাদর্শনে আকুল হইয়া পড়িলে, মহাদেবী গৌরী কাব্যপুরুষের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত "**সাহিত্যবিদ্যাবধূ**"র সৃষ্টি করি-লেন। * বধূও গৌরীর আদেশে কাব্যপুরুষকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়া কান্তের ক্রোধাপনয়নের জন্য সচেষ্ট হইলেন। কাব্যপুরুষ তখন সক্রোধে ধাবমান ; বধূ তাঁহার চিত্তহরণের নিমিত্ত তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। কান্তের ক্রোধশান্তি করিতে বধূকে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন হাবভাব বিলাসাদির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ক্রমশঃ কাব্যপুরুষ ধীরে ধীরে ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক বধূর প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন ; ও অবশেষে উভয়ের সম্পূর্ণ মিলন হইল। বিদর্ভের "**বৎসগুল্ম**" নামক নগরে সারস্বতেয় কাব্যপুরুষ ঔমেয়ী সাহিত্যবিদ্যাবধূকে গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করিলেন। সরস্বতী ও গৌরীর মধ্যে কুটুম্বিতা স্থাপিত হইল।

সাহিত্যবিদ্যাবধূ

সাহিত্যবিদ্যাবধূ কান্তের মনোহরণের নিমিত্ত যে যে দেশে যে যে বেশ ধারণ করিয়াছিলেন ও যে যে ভাবের অভিনয় দেখাইয়াছিলেন, আজিও সেই সেই দেশের রমণী গণ তদনুরূপ বেশভূষা করিয়া থাকেন ; এবং তদনুরূপ হাবভাব প্রদর্শন করিতেও তাঁহারা অত্যন্ত নিপুণ।

---

* "উপকারকত্বাদলঙ্কারঃ সপ্তমমঙ্গম্‌" ইতি যাযাবরীয়ঃ। ঋতে চ তৎস্বরূপপরিজ্ঞানাদ্বেদার্থানবগতিঃ ॥" (কা, মী, পৃ, ৩)

† "পঞ্চমী সাহিত্যবিদ্যা" ইতি যাযাবরীয়ঃ। সকল বিদ্যাস্থানৈ-কায়তনং পঞ্চদশং কাব্যং বিদ্যাস্থানম্‌" ইতি যাযাবরীয়ঃ। (কা, মী, পৃ, ৪)

‡ চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা
দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য।
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি
মহো দেবো মর্ত্ত্যাঁ আবিবেশ ॥ (ঋ, বে,—৪।৫৮।৩)

* বরোদা সংস্করণের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে—"Sarasvati created Sahityavidyavadhu as his bride" ; কিন্তু ইহা ভ্রম। গৌরীই বধূর সৃষ্টিকর্ত্রী ; কারণ, বধূকে পরে স্পষ্ট "ঔমেয়ী" বলা হই-য়াছে—"তত্র সারস্বতেয়স্তামৌমেয়ীং গান্ধর্ব্ববৎ পরিণিনায়" (কা,মী,পৃ,১০)

প্রাচীন যুগে মথুরাবাসী শূরসেনগণ

[শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি]

বৈদিক সাহিত্যে শূরসেনদের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু মানবধর্ম্মসূত্রে তাহারা ব্রহ্মর্ষি দেশের অধিবাসিরূপে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হইয়াছে। ব্রহ্মর্ষি দেশে সেই সব ব্রাহ্মণ ঋষিদের বাসভূমি যাঁহাদের আচার-ব্যবহার আর্য্যজাতির সমস্ত লোকই অনুকরণ করিত। মানবধর্ম্মসূত্রের উক্তিটী এইরূপ :—"কুরুদের রাজ্য মৎস্য, পঞ্চাল এবং শূরসেনদের দেশ—এই গুলি লইয়াই বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্মর্ষি দেশ (গঠিত) হইয়াছিল। ইহার পরেই ব্রহ্মাবর্ত্ত অবস্থিত ছিল। এই প্রদেশে যে সব ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট হইতেই পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্য বিশেষ বিশেষ রীতি নীতি সম্বন্ধে যেন শিক্ষা গ্রহণ করে"। (Buhler, Laws of Manu. pp. 32—33.) সুতরাং মনুর স্মৃতি যখন সঙ্কলিত হয় তখন যে অল্প কয়েকটী জাতি লইয়া ভারতীয় আর্য্য-সমাজ গঠিত হইয়াছিল শূরসেনরা তাঁহাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল; তাঁহাদের পদমর্য্যাদাও অপ্রশস্ত ব্রহ্মাবর্ত্ত ভূমি অধিবাসিগণ ছাড়া আর কাহারও অপেক্ষা হীন ছিল না। এরূপ ক্ষেত্রে তাহারা যে বৈদিক জাতিদের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। হয় তো ঋগ্বেদ ও পরবর্ত্তী বৈদিক সাহিত্য যখন গড়িয়া উঠিতেছিল তখন তাহারা যথেষ্ট শক্তি ও গৌরব অর্জ্জন করিতে পারে নাই এবং সেই জন্যই বৈদিক সাহিত্যেও তাহাদের উল্লেখ পাওয়া যায় না। শূরসেনরা বলে তাহারা যদু হইতে উদ্ভূত। এই বংশের নর-নারীর উল্লেখ ঋগ্বেদে (Vedic Index, II, 185) পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহাও অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না যে, শূরসেনরা ঋগ্বেদের এই যদু বংশেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই তাহা পৃথক্‌ভাবে উল্লিখিত হয় নাই।

শূরসেনগণ—মনুসংহিতার যুগে

মনু শূরসেনদের সামরিক নৈপুণ্যের অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি অনেক রাজাকে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার সৈন্য-সমাবেশের সময় শূরসেনদিগকেই সম্মুখে স্থাপন করিতে পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন (মনুসংহিতা, ৭ অধ্যায়, পৃঃ ১৯৩)। মহাভারতে যেখানে ভারতবর্ষের নানা জাতির নামের উল্লেখ করা হইয়াছে সেখানে শাল্ব, কুরু, পঞ্চাল, এবং অন্যান্য নিকটবর্ত্তী জাতিসমূহের সঙ্গে শূরসেনদের নামের উল্লেখ পাওয়া যায় (ভীষ্মপর্ব্ব, ৯ অঃ পৃঃ ৮২২)। বিরাট্ পর্ব্বে (১ ও ৫ অধ্যায়) দেখা যায়, পাণ্ডবেরা দ্বাদশবর্ষ বনবাসের পর যখন দ্বৈতবন হইতে বিরাট্ নগরে গমন করিতেছিলেন তখন তাঁহারা শূরসেনদের রাজ্যের ভিতর দিয়াই গমন করেন। সুতরাং শূরসেন রাজ্য যে মৎস্য দেশের নিকটেই অবস্থিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। শূরসেন রাজ্যের অবস্থান-সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন ব্যাপার নহে; কারণ তাহাদের রাজধানীর নাম ছিল মথুরা। এই মথুরা প্রাচীন যুগের আর্য্য-ভারতীয় ইতিহাস হইতে আজ পর্য্যন্তও বৃহৎ নগর বলিয়া জন-সমাজে সুপরিচিত। Cambridge Historyর মতে "মথুরা জেলা এবং তাহার দক্ষিণের আরও কতকগুলি স্থান লইয়া" শূরসেন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। (Cambridge History of India, Ancient India, p. 316) এই মত আমরাও সমর্থন করি। অধ্যাপক রীজ ডেভিড্‌স্ (Rhys Davids) বলেন—"মথুরা যাহার রাজধানী ছিল সেই শূরসেন-রাজ্য মচ্ছদেশের সঙ্গে সংলগ্ন দক্ষিণ পশ্চিমে এবং যমুনার পশ্চিমে অবস্থিত ছিল (Buddhist India, p. 27)। কানিংহাম দেখাইয়াছেন যে, শূরসেন কৃষ্ণের পিতামহ ছিলেন। কংসের মৃত্যুর পর কৃষ্ণ এবং তাঁহার বংশধরগণ যাঁহারা মথুরা অধিকার করেন তাঁহারাই শূরসেন নামে পরিচিত হন। (Cunningham, Ancient Geography, p. 374.)

অবস্থান

রামায়ণে সুগ্রীব যখন সীতার অন্বেষণে তাঁহার বানর সেনাপতিগণকে প্রেরণ করিতেছিলেন তখন যাঁহারা

উত্তর দিকে গমন করেন তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—"শূরসেন এবং উত্তরের অন্যান্য রাজ্যে অন্বেষণ করিয়া তোমরা হিমালয় পর্ব্বতেও সীতাকে খুঁজিয়া দেখিও।" (রামায়ণ, কিষ্কিন্ধা কাণ্ড, ১১—১২. ৪৩ সর্গ)। মহাভারতের অন্তর্গত ভগবদ্গীতায় শূরসেনদিগকে দুর্য্যোধনের সৈন্যদলে দেখা যায়। তাহারা ভীষ্মের দেহরক্ষায় নিযুক্ত ছিল (ভীষ্মপর্ব্ব ১৮ অঃ, পৃঃ ৮২৯)। বীর শূরসেনেরা বাণের দ্বারা বিদ্ধ হইয়াও ভীষ্মকে পরিত্যাগ করেন নাই (ভীষ্মপর্ব্ব, ১০৬ অ, ৯১৪ পৃঃ; ভীষ্মপর্ব্ব, ১০৭—১২১ অঃ, ৯০৬—৯৯৩ পৃঃ)। শূরসেন-সৈন্য দুর্য্যোধনের সহিত কর্ণের অনুগমন করিল এবং কর্ণ ধনুর্ব্বাণের দ্বারা সজ্জিত যোদ্ধাদের সম্মুখে গমন করিলেন (দ্রোণপর্ব্ব ৬ অঃ, পৃঃ ৯৯৮—৯৯৯)। যখন দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে সৈন্যব্যূহ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, তখন তিনি শূরসেন, মদ্র প্রভৃতি জাতিকে সৈন্যদলের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন (দ্রোণপর্ব্ব, ১৯ অ, ১০০৯ পৃঃ)। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শূরসেনসৈন্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয় (কর্ণপর্ব্ব, ৫ অ, ১১৬৭—৬৮ পৃঃ)। সহদেব যখন রাজসূয়যজ্ঞ সম্পর্কে জয়যাত্রার অভিযানে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হন, তখন তিনি শূরসেন রাজ্য জয় করিয়াছিলেন (মহাভারত, সভাপর্ব্ব ৩১ অঃ, ২৪২—২৪৩ পৃঃ)।

মহাকাব্যে শূরসেনগণের প্রসঙ্গ

প্রাচীন যুগে যে ষোলটী জনপদ উন্নতিশীল এবং অর্থশালী বলিয়া খ্যাত ছিল পালি-বৌদ্ধ ত্রিপিটকে শূরসেন তাহাদেরই অন্যতম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (অঙ্গুত্তর-নিকায়, ১অ, ২১৩ পৃঃ; ঐ ৪অ, ২৫২, ২৫৬, ও ২৬০ পৃঃ)। একটী জাতকে দেখিতে পাওয়া যায় যে পঞ্চাল, মৎস্য, মদ্রদের সঙ্গে শূরসেনরাও ধনঞ্জয় কৌরব্য এবং পন্নাক যক্ষের অক্ষক্রীড়া নিরীক্ষণ করিয়াছিল। (Cowell. Jataka, Vol. VI. p. 137).

বৌদ্ধ-সাহিত্যে শূরসেন প্রসঙ্গ

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে শূরসেনদের রাজধানী যমুনা-তীরে মথুরায় ছিল। বর্ত্তমানে এই মথুরা যুক্তপ্রদেশের আগরা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। মথুরা যমুনায় উর্দ্ধভাগে কৌশাম্বী হইতে সোজা প্রায় ২৭০ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। Cambridge History of India, Vol. I, p. 526, পালি-বৌদ্ধ সাহিত্যে মথুরা "মধুরা" নামে ব্যবহৃত হইয়াছে। নামের এই সামান্য পার্থক্য যে ভাষাগত বৈষম্যেরই ফল তাহাতে সন্দেহ নাই। রীজ ডেভিডস্ (Rhys Davids) তাঁহার Budhist India নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে বানানের এই বিভিন্নতা সত্ত্বেও নগরটী বর্ত্তমান মথুরার সহিত অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়।

শূরসেনদের রাজধানী—মথুরার অবস্থান

কচ্চায়ন তাঁহার পালি ব্যাকরণে লিখিয়াছেন, মথুরা হইতে সংকস্সর দূরত্ব চারি যোজন (Book III. ch, p 157, I. S, C, Vidyabhusan's Edition)

ললিত-বিস্তরে দেখা যায়, তুষিত স্বর্গে যখন বোধিসত্ত্বের জন্মস্থান নির্ব্বাচন লইয়া আলোচনা হইতেছিল, তখন কেহ কেহ বলেন, "মথুরা নগরী সমৃদ্ধিশালী, বহু বিস্তৃত, শান্তিপূর্ণ এবং বহু জন-অধ্যুষিত। ভিক্ষা সেখানে সহজেই পাওয়া যায়। সুতরাং বোধিসত্ত্বের জন্মের পক্ষে উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান।" এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দেবতাদের কেহ কেহ আবার বলেন—"যেহেতু এই দেশের রাজা ভ্রান্তধর্ম্মবিশ্বাসীর বংশোদ্ভব এবং অত্যাচারী, সেই হেতু উহা বোধিসত্ত্বের জন্মের উপযুক্ত স্থান নহে (Edited by Lefmann, pp, 21-22)। এই বর্ণনা হইতে বোঝা যায় যে, ললিত-বিস্তর রচনার সময় অর্থাৎ খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে মথুরা ভারতবর্ষের একটী শ্রেষ্ঠ নগর ছিল।

আলেকজান্দারের আক্রমণের পর অত্যল্পকাল-মধ্যেই মথুরা ভারতবর্ষের বিখ্যাত নগরগুলির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। ফলে গ্রীক ঐতিহাসিকদের গ্রন্থেও তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। মেগাস্থেনিসের বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া এরিয়ান মথুরাকে শূরসেনদের রাজধানীরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। টলেমির গ্রন্থেও মথুরার উল্লেখ আছে। (Cunningham's Ancient Geography, p. 374) মথুরা কতকগুলি উচ্চস্তূপের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এই সব স্তূপের একটী সাধারণ ধরণের স্তূপ হইতে কতকগুলি মূর্ত্তি এবং কতকগুলি লিপিসংবলিত স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মূর্ত্তি এবং স্তম্ভগুলি অন্ততঃ দুইটী প্রকাণ্ড বৌদ্ধবিহারের ভগ্নাবশেষ। বিহার দুটী এত প্রাচীন যে তাহাদের

গ্রীক বিবরণ

উৎপত্তি খৃষ্টীয় যুগের প্রারম্ভের সমসাময়িক বলিয়া মনে হয়। (ঐ পৃঃ ৩৭৪) মথুরায় মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌সের সম্মানের জন্য একটী বিখ্যাত স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল (Cambridge History of India, Ancient India. p. 506.)। ফা-হিয়ান পঞ্চম শতাব্দীতে মথুরায় গমন করিয়াছিলেন। সেখানে পৌঁছিবার আগে এই চৈনিক পরিব্রাজকটীকে অনেকগুলি বিহার অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। বিহারগুলি বহু ভিক্ষুর দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল (Legge, Travels of Fa Hien, p. 42)। এই নগরে হিউয়েন সাংও গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে এই প্রদেশটীর পরিধি ৫০০০ লির বেশী ছিল এবং রাজধানীর পরিধি ছিল ২০ লির উপরে। ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বর ছিল এবং কৃষিই তাহাদের প্রধান অবলম্বন ছিল। লোকের বাড়ীর সঙ্গে সংলগ্ন উদ্যানে আম্রবৃক্ষ শোভা পাইত। এ প্রদেশে সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈরী এবং স্বর্ণও উৎপন্ন হইত। ইহার আবহাওয়া সুন্দর ছিল। এখানকার অধিবাসীদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ভাল ছিল। তাহারা কর্ম্মের প্রভাবকে মানিত এবং জ্ঞান ও নীতির শ্রেষ্ঠত্বকেও সম্মান করিত। সেখানে বৌদ্ধবিহার এবং দেবমন্দির ছিল। বৌদ্ধ ছাড়া অন্যান্য নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকেরাও এখানে এক সঙ্গে বাস করিত (Waters, On Yuan Chwang. Vol. I. p. 301)।

জৈন ধর্ম্মাবলম্বীরা মথুরায় নিষ্ঠার সহিত তাঁহাদের ধর্ম্ম-মতের ও আচারপদ্ধতির অনুসরণ করিত। (Smith's Early History of India, p. 301) সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগেই সেখানে এই ধর্ম্ম বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। খুব প্রাচীন কাল হইতেই, এমন কি মেগাস্থেনিসের সময় (খৃঃ পূঃ ৩০০) হইতেই কৃষ্ণ-উপাসকদের কেন্দ্রস্থান বলিয়াও মথুরা সুপরিচিত (Cambridge History of India, Ancient India, p. 167)। বৈষ্ণবধর্ম্মের এবং জৈন ধর্ম্মের কেন্দ্ররূপে এই নগর যে বহু নরনারীর তীর্থ-স্থানে পরিণত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই (Cambridge History of India, Vol. I p. 526)। কিন্তু শক-কুষাণদের যুগে ভাগবতপন্থীদের প্রভাব এখান হইতে

ধর্ম্ম-ইতিহাসে মথুরার স্থান

কমিয়া যায় (H. C. Roy Choudhury, Early History of the Vaishnava Sect, p. 99)। মথুরা শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান (Cambridge History of India, Vol. I. p. 316)। হিন্দুদের কাছে ইহা পূর্ব্বেও মহাতীর্থ ছিল এবং এখনও মহাতীর্থই আছে। হিন্দুদের সাতটী প্রধান তীর্থের ভিতর মথুরাও একটী (Cambridge History of India, Vol. I. p. 531)। হিন্দু, জৈন, এবং বৌদ্ধ ঐতিহ্যে বাসুদেবের জন্ম সম্বন্ধে কোনও মতদ্বৈধ নাই। ডাঃ রায় চৌধুরী বলেন—বাসুদেব যে সত্য সত্যই মথুরায় রাজপরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এই মতের ঐক্য থাকায় তাহাই স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। এই মথুরাতেই বর্ত্তমান বৈষ্ণব-ধর্ম্মের জনক ভাগবত ধর্ম্মের উদ্ভব। কুষাণদের সময়ে মথুরা জৈন-ধর্ম্মের বিশেষ শক্তি-শালী কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল (Rapson, Ancient India, p. 174)।

মহাভারতে মথুরা বাসুদেবের জন্মস্থান বলিয়া পরিচিত। ডাঃ হপকিনস্ বলেন, এই বাসুদেব সেখানে গোচারণ করিতেন। মহাভাষ্যে মথুরা বহুকুরুচরা এবং পঞ্চালদের প্রধান নগর রূপে বর্ণিত হইয়াছে (Hopkins' The Great Epic of India, p, 395)।

কয়েক শতাব্দীর জন্য মথুরায় বৌদ্ধধর্ম্মই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এই সময়ে ব্রাহ্মণদের পশু বলিও এখানে নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

বিমানবত্থুর পালি ভাষ্যে দেখা যায় যে, বুদ্ধদেব ভিক্ষার্থে গমন করিলে উত্তর মথুরায় এক জন রমণী তাঁহাকে ভিক্ষা দান করিয়াছিলেন। এই পুণ্যের ফলে মৃত্যুর পর তিনি তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন (বিমানবত্থু-ভাষ্য, পৃ ১১৮—১১৯)।

অবন্তিপুত্ত নামে মথুরার জনৈক রাজা একদা মহা-কচ্চায়নের নিকট গমন করিয়া বলেন যে, ব্রাহ্মণেরা মনে করেন—তাঁহারাই বর্ণশ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের বর্ণ শ্বেত এবং অন্য সকল বর্ণের লোকরাই কৃষ্ণ বর্ণের; তাঁহারা সাধন-ভজন ও যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া পাপমুক্ত হইতে পারেন; কিন্তু অন্য বর্ণের লোকদের সেরূপ হইবার অধিকার নাই। তাঁহারা ব্রহ্মার পুত্র—তাঁহার মুখ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহারা তাঁহার উত্তরাধিকারী।

অবন্তিপুত্ত অতঃপর এ সম্বন্ধে মহাকচ্চায়নের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। উত্তরে তিনি বলেন—এ সব মিথ্যা বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই নহে। (মজ্‌ঝিম-নিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮০ হইতে)।

বুদ্ধ প্রায়শঃই মথুরা অঞ্চলে গমন করিতেন। এক বার মথুরা হইতে বেরঞ্জিতে গমনকালে যখন তিনি একটী বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন বহু নর নারী তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিল এবং তাঁহার অর্চনা করিয়াছিল (অঙ্গুত্তর-নিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ৫৭)।

পুরাণে মথুরা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বিষ্ণু-পুরাণে আছে—মধু-দানবের পুত্র লবণ অমিতবিক্রম শত্রুঘ্নের দ্বারা নিহত হয় এবং এই শত্রুঘ্নই মথুরা নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন (৪র্থ অংশ, ৪র্থ অধ্যায়)। বৃষ্ণি এবং অন্ধকদের বাসভূমি মথুরা দানবদের দ্বারা আক্রান্ত হয় (ব্রহ্ম-পুরাণ ১৪ অধ্যায়—৫৪ শ্লোক)। এই দানবদের ভয়ে বৃষ্ণি এবং অন্ধকেরা মথুরা পরিত্যাগ করিয়া দ্বারাবতীতে তাঁহাদের রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন (হরিবংশ, অধ্যায় ৩৭)। ২৩ অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া মগধরাজ জরাসন্ধ মথুরা অবরোধ করেন। মহাপ্রয়াণের সময় যুধিষ্ঠির বজ্রনাভকে মথুরার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। (স্কন্দ-পুরাণ, বিষ্ণু-কাণ্ড, ভাগবত-মাহাত্ম্য, ১ম অধ্যায়।)

পৌরাণিক বিবরণ

যে সমস্ত বংশ পুরুদের সমসাময়িক, পুরাণে তাহাদের মোটামুটি একটা বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে পুরাণে মথুরায় প্রথম যুগের শাসকদেরও উল্লেখ পাওয়া যায় (Cambridge History of India. Vol. I p. 526)। বায়ুপুরাণে মগধের ভবিষ্যৎ রাজাদের সমসাময়িক রাজা হিসাবে ২৩ জন শূরসেন নৃপতির নাম উল্লেখ আছে (৯৯ অধ্যায়)। বিধর্ম্মী সুবাহু জম্বুদ্বীপের এক জন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। মথুরা এই জম্বুদ্বীপের রাজধানী ছিল (Romantic Legend of Sakya Buddha, p. 29)।

লেফমান-সম্পাদিত ললিত-বিস্তরে (পৃঃ ২১—২২) শূরসেন-রাজা সুবাহুর উল্লেখ পাওয়া যায়। মথুরা তাঁহারই রাজধানী ছিল। বুদ্ধের সময়ে 'মধুরা'র শূরসেনদের রাজা ছিলেন অবন্তিপুত্ত। এই নাম হইতে মনে হয় তিনি সম্ভবতঃ অবন্তি-রাজ-কন্যারও পুত্র ছিলেন (Cambridge History of India, Vol. I. p. 185)।

গুপ্তদের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে মথুরায় সাত জন নাগ রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন (বায়ুপুরাণ ৯৯ অধ্যায়)। তাঁহাদের পরে মথুরার রাজদণ্ড মগধ-নৃপতিদের হস্তগত হয় (বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ, অধ্যায় ২৩)।

সিংহল-সংহিতা দীপবংসেও মথুরার উল্লেখ আছে। তাহাতে দেখা যায় যে, যে রাজা সাধিনের পুত্র-পৌত্রেরা নগরীশ্রেষ্ঠ মথুরায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। (ওল্ডেন বের্গের দীপবংস, পৃঃ ২৭)।

ঘাট-জাতকে নিম্নলিখিত উপাখ্যানটী বর্ণিত হইয়াছে:—উত্তর মগধে মহাসাগর নামে এক জন রাজা রাজত্ব করিতেন। সাগর এবং উপসাগর নামে তাঁহার দুইটী পুত্র ছিল। রাজার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজপদে এবং কনিষ্ঠপুত্র রাজপ্রতিনিধির পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহার কিছুকাল পরে উপসাগরের সঙ্গে সাগরের বিবাদ হইয়া এবং উপসাগর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া উত্তর পথে কংস রাজ্যের অসিতাঞ্জন নামক নগরে উপস্থিত হইলেন। কংস রাজ্যের রাজার নাম ছিল মহাকংস; কংস, উপকংস নামে তাঁহার দুই পুত্র এবং দেবগর্ভা নামে এক কন্যা ছিল। গণকেরা গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র হইবে সে তাহার মাতুলদিগকে নিধন করিবে। এই গণনায় বিশ্বাস করিয়া মহাকংসের মৃত্যুর পর দুই ভ্রাতা মিলিয়া দেবগর্ভার জন্য একটী গোলাকার দুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন এবং ভগিনীকে অবিবাহিত অবস্থায় সেইখানে বন্দী করিয়া রাখিলেন। দেবগর্ভার ইতিহাস শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি উপসাগরের মনে যেমন ভালবাসার সঞ্চার হইল, তেমনি ভ্রাতার সহিত এক দিন উপসাগরকে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া দেবগর্ভা তাঁহার অনুরাগিণী হইয়া পড়িলেন। অতঃপর রাজকুমারীর পরিচারিকা নন্দগোপার সাহায্যে উভয়ের মিলন সংঘটিত হয়। এক রাত্রিতে উপসাগর দুর্গে নীত হইলেন এবং সেই রাত্রিতেই দেবগর্ভার গর্ভ-সঞ্চার হইল। রাজকুমারীর গর্ভ-সঞ্চারের লক্ষণ দেখিয়া নন্দগোপার নিকট হইতে ভ্রাতারা সমস্ত অবগত হইলেন। অতঃপর তাঁহার সহিত উপসাগরের

বিবাহ হইয়া গেল। যথাসময়ে দেবগব্ভার একটী কন্যা ভূমিষ্ঠ হইল। কন্যা দেখিয়া ভ্রাতারা আনন্দিত হইয়া ভগিনী এবং ভগিনী-পতিকে গোবদ্ধমান নামে একটী গ্রাম দান করিলেন। এই গ্রামে বাসকালে দেবগব্ভার দশটী পুত্র এবং তাঁহার পরিচারিকার দশটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করে, দেবগব্ভা তাঁহার দশ পুত্রের সহিত নন্দগোপার দশটী কন্যা বদল করিয়া প্রত্যেক বার পুত্র প্রসবের পরেই কন্যা হইয়াছে বলিয়া প্রচার করিতেন। এইরূপে তাঁহার পুত্রদের জন্মরহস্য গোপন থাকিয়া যায়। দেবগব্ভার পুত্রেরা বড় হইয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। এই দস্যুবৃত্তির জন্য তাঁহাদের পালক পিতা অন্ধ বেহু রাজা কংসের দ্বারা পুনঃ পুনঃ তিরস্কৃত হয়। অবশেষে সে নিরুপায় হইয়া রাজার কাছে এই দশ পুত্রের জন্মরহস্য ব্যক্ত করে। তাঁহাদিগকে কৌশলে ধরিবার জন্য নগরে একটী কুস্তি প্রতিযোগিতার ঘোষণা করা হইল। যখন দশ ভ্রাতা এই কুস্তি প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবেন তখনই তাঁহাদিগকে বন্দী করিবার চেষ্টা করা হয়। বড় ভাই বাসুদেব এই সময় যে চক্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহার দ্বারাই কংস এবং উপকংস নিহত হইয়াছিলেন। অতঃপর বাসুদেব অসিতাঞ্জন নগরের রাজদণ্ড গ্রহণ করেন (জাতক, কাউল-সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫০-৫২)। জাতকে বাসুদেবের মথুরার সিংহাসনে আরোহণের উপাখ্যান এইখানেই শেষ হইয়াছে। অতঃপর পেতবথু ভাষ্যে এই দশ ভ্রাতার রাজ্য-জয়-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, উত্তর মথুরার নৃপতির দশ পুত্র এবং এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এই পুত্রদের সর্ব্বকনিষ্ঠটীর নাম অঙ্কুর। দশ রাজপুত্র তাঁহাদের পিতার রাজধানী অসিতাঞ্জন হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বারাবতী পর্য্যন্ত সমস্ত রাজ্য জয় করিয়াছিলেন এবং তাহা নিজেদের ভিতর ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এই বিভাগের সময় ভ্রাতারা সকলেই ভগিনী অঞ্জনদেবীর কথা বিস্মৃত হন। পরে যখন তাঁহার কথা মনে হইল তখন তাঁহাকে দান করিবার মত আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। এই অবস্থায় অঙ্কুর তাঁহার নিজের অংশ ভগিনীকে দান করিতে স্বীকৃত হইয়া বলেন,—"তিনি ভ্রাতাদের প্রদত্ত অর্থের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন।"

ইহার পর তিনি ব্যবসা আরম্ভ করেন। তিনি সর্ব্বদাই প্রচুর দান করিতেন। অঙ্কুরের এক জন মহা লোভী ক্রীতদাস ছিল। তাহাকে তিনি দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অঙ্কুর তাহার বিবাহও দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পত্নী যখন অন্তঃসত্ত্বা তখনই তাহার মৃত্যু হয়। যথাসময়ে পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। অঙ্কুর এই পুত্রের পিতাকে যে বৃত্তি প্রদান করিতেন পুত্রকেও সেই বৃত্তি দান করিতে থাকেন। অবশেষে এই পুত্রও বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। এইবার প্রশ্ন উঠিল—এ পুত্র তাহার পিতার মতই অঙ্কুরের ক্রীতদাস কি না। অঞ্জনদেবী কহিলেন—পুত্রের মাতা যখন ক্রীতদাসী নহে, তখন পুত্রও ক্রীতদাস হইতে পারে না। এই যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিয়াই তাহাকে মুক্তিদান করা হয়। পুত্রটি অতঃপর ভেরুব নগরে গমন করিয়া দর্জ্জির ব্যবসা অবলম্বন করে। এই নগরে অসয়হ নামে এক জন বণিক্ বাস করিতেন। তিনি অত্যন্ত দাতা ছিলেন। এই তরুণ দর্জ্জিটির নিজের দান করিবার সামর্থ্য ছিল না। কিন্তু যে সব দানপ্রার্থী অসয়হের গৃহ চিনিত না তাহাদিগকে সে অসয়হের গৃহ দেখাইয়া দিত। এই পুণ্যের ফলে অঙ্কুরের এই পুত্রটি মৃত্যুর পরে বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া একটী নিগ্রোধ বৃক্ষে বাস করিতে থাকে। একদা অঙ্কুর এবং এক জন ব্রাহ্মণ বণিক্ প্রত্যেকে পাঁচ শত শকট-পরিপূর্ণ পণ্য-সম্ভার লইয়া এক মরুভূমি অতিক্রম করিতেছিলেন। এই মরুভূমির মধ্যে তাঁহারা পথ হারাইয়া ফেলেন এবং বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে বহু দিন এখানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হয়। তাঁহাদের খাদ্য, পানীয় এবং পশুর আহার্য্য সমস্ত দ্রব্য যখন নিঃশেষ হইয়া গেল, অঙ্কুর তখন জলের অন্বেষণে নানাদিকে ভৃত্য প্রেরণ করিলেন। নিগ্রোধ বৃক্ষের দেবতাটি এই সময়ে তাঁহাকে বহু ব্যাপারে সাহায্য করেন। এই অবস্থায় দানের সার্থকতা সম্বন্ধে অঙ্কুরের মনের বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল এবং তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি পূর্ব্বাপেক্ষাও মুক্তহস্তে দান করিবেন। বস্তুতঃ দ্বারকায় ফিরিয়া তিনি সকলের অভাব মোচনে বদ্ধপরিকর হন। আয়-ব্যয়দক্ষ সিন্ধুকের উপর তাঁহার সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণের ভার ছিল;

তিনি প্রভুর এইরূপ অবিচারে দান বন্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইল না। অঙ্কুরের দানের ফলে লোকেরা অলস, অকর্ম্মণ্য হইয়া জীবন যাপন করিতে লাগিল এবং রাজার পক্ষে রাজকর আদায় করাও কঠিন হইয়া পড়িল। তখন রাজা অঙ্কুরকে ডাকিয়া কহিলেন, তিনি যদি এইরূপ ভাবে দান করিতে থাকেন, তবে তাঁহার সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইবে। ইহার পর অঙ্কুর দাক্ষিণাত্যে দমিল প্রদেশে গমন করিয়া দানকর্ম্মে নিরত হন। মৃত্যুর পর তিনি তাবতিংস স্বর্গে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (পেতবথু-ভাষ্য, ৩য় খণ্ড ও মৎপ্রণীত Buddhist Conception of Spirits, পৃঃ ৮০-৮৪ দ্রষ্টব্য)।

মথুরার এক জন রাজার নাম ছিল ব্রহ্মমিত্র। তিনি সম্ভবতঃ অহিচ্ছত্রের রাজা ইন্দ্রমিত্রের সমসাময়িক; কারণ বুদ্ধগয়ায় রাণীদের দানের শিলালিপির পরিবেষ্টনীর স্তম্ভে যে সমস্ত নাম আছে তাহাতে এই উভয় নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রকৃত ইতিহাস

প্রত্নতাত্ত্বিকেরা খৃঃ পূঃ প্রথম শতকে এই লিপিগুলির সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন (Cambridge History of India, Ancient India, p, 526)। কাবুল এবং পাঞ্জাবের রাজা মেনন্দর যমুনাতীরস্থ মথুরা অধিকার করিয়াছিলেন (Smith, Early History of India, p. 199)।

র‍্যাপসন বলেন (Ancient India, p. 174) মথুরা দেশীয় রাজাদের দ্বারা শাসিত হইয়াছিল। এই সব রাজার নাম খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে তাঁহারা যে সমস্ত মুদ্রা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে পাওয়া যায়। মথুরায় হিন্দু রাজাদের স্থান হগান, হগামাম, রাজুবুল এবং অন্যান্য শক শাসন-কর্ত্তারা অধিকার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ প্রথম শতাব্দীতে এই সব বৈদেশিকদের অভ্যুদয় হয় (Smith, Early History of India, p. 227)। দ্বিতীয় শতাব্দীতে মথুরা যে কুষাণ রাজা হুবিষ্কের শাসনাধীনে গমন করিয়াছিল তাহা তাঁহার (Smith, Early History of India, p, 271) নাম-সংযুক্ত চমৎকার একটী বৌদ্ধ বিহারের দ্বারাই প্রমাণিত হয়। হুবিষ্কের দানের দ্বারাই যে এই বিহারটী গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই (Smith, Early History of India, p. 271)।

মিনন্দরের বহু মুদ্রা মথুরায় আবিষ্কৃত হইয়াছে (প্রাচীন মুদ্রা—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৫০)। মিঃ ব্রাউন বলেন যে, তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে মথুরা, অযোধ্যা এবং কৌশাম্বী রাজ্যে টাকশালায় এদেশে মুদ্রা প্রস্তুত হইত।

মুদ্রা

এই সমস্ত মুদ্রার কতকগুলিতে ব্রাহ্মী অক্ষরে স্থানীয় রাজাদের নাম মুদ্রিত আছে (Coins of India, p. 19)। মথুরার ধ্বংসস্তূপের ভিতর বহু প্রাচীন তাম্র মুদ্রা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বহু গ্রীক এবং শক মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে (প্রাচীন মুদ্রা, পৃঃ ১০৫)। এই সব মুদ্রায় ব্রাহ্মী অক্ষর ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় (ঐ পৃঃ ১০৬)। এই অঞ্চলে যে সব মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের ভিতর অযু-নায়নদের মুদ্রা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার যোগ্য (Cunningham, Coins of India, pp. 89-90, প্রাচীন মুদ্রা—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ, ১০৯)।

শিলালিপি সমূহ হইতে দেখা যায় যে, খৃঃ পূঃ প্রথম শতকে মথুরা প্রদেশে ভারতীয় রাজাদের হাত হইতে বিদেশী শক রাজাদের হাতে গিয়া পড়িয়াছিল। শিলালিপির এই প্রমাণ মুদ্রার দ্বারাও সমর্থিত হইয়াছে।

শিলালিপি

একটী দণ্ডায়মানা মূর্ত্তিতেই মথুরার রাজাদের বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তি। বোধ হয় এই মূর্ত্তিটী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক-স্বরূপ। মথুরার রাজাদের এই বিশেষ ধরণটী তাঁহাদের বিজেতা শক রাজাদের প্রতিনিধি গ্রহণ করিয়াছিল (Cambridge History of India, Val. I. p. 526)। দান-সম্পর্কিত বহু শিলালিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে কণিষ্ক, হুবিষ্ক এবং বাসুদেবের রাজত্বকালে জৈনেরা মথুরায় বিশেষ সমৃদ্ধিশালী সম্প্রদায় ছিলেন (Eliot, Hinduism and Buddhism, Vol. I. p. 113)। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বলেন, মথুরার একটী শিলালিপি হইতে মহাসত্রপ সোডাসের রাজত্বকালে বাসুদেবের মহাস্থানে একটী তোরণ, বেদিকা, এবং চতুঃশালা নির্ম্মাণের বিবরণ পাওয়া যায় (Early History of the

Vaishnava Sect. pp. 98—99)। মথুরার নাগ-মূর্ত্তির শিলালিপিতে মথুরায় যে নাগপূজা প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কৃষ্ণের দ্বারা কালিয় দমনের যে উপাখ্যান গুপ্তদের সময়ে সঙ্কলিত পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে সেই উপাখ্যানের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এই শিলালিপির সার্থকতা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মথুরায় ভগবতধর্ম্ম যে এ সময়ে সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয় নাই তাহা শিলা-লেখ প্রমাণের অভাব হইতে বুঝিতে পারা যায় এবং ইহা যে রাজানুগ্রহলাভে সমর্থ হয় নাই তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই। ইহার কারণ খৃঃ পূঃ প্রথম শতক হইতে তৃতীয় শতক পর্য্যন্ত এখানকার অধিবাসীরা প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল। এবং মুষ্টিমেয় বৈষ্ণব ভিন্ন অপর অধিবাসীরা বাসুদেবের ধর্ম্মের উপর বিশেষ সন্তুষ্টও ছিল না (Early History of the Vaishnava Sect. p. 100)।

কুষাণদের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে মথুরায় যে ভাস্কর্য্য-শিল্পের নিদর্শন দেখা যায় তাহা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ; কারণ তাহারা সকলেই একই আদর্শ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। এই ভাস্কর্য্যকে প্রধানতঃ তিন স্তরে ভাগ করা যায়। প্রথম স্তর গড়িয়া উঠিয়াছিল, খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের প্রায় মধ্যভাগে, দ্বিতীয় স্তর গড়িয়া উঠিয়াছিল পরবর্ত্তী শতকে, তৃতীয় স্তর গড়িয়া উঠিয়াছিল সত্রপদের আমলে। শেষোক্ত স্তরের ভাস্কর্য্য প্রথম স্তরের ভাস্কর্য্যের ব্যভিচার মাত্র। প্রাচীন ভাস্কর্য্য পরবর্ত্তী কালে প্রচলিত রীতির অনুসরণ করিয়া যখন প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল তাহার সেই সময়কার ধ্বংসোন্মুখ আদর্শের ছাপই এই তৃতীয় স্তরের ভাস্কর্য্যে পাওয়া যায়। খৃষ্টাব্দের আরম্ভের কিছু পূর্ব্বে মথুরা তক্ষশিলার সিথো-পার্থিয়ানদের সংসর্গে আসিয়া গ্রীসের শিল্পের অজস্র আমদানী করিতে থাকে। এ শিল্প যদিও তখন কিছুমাত্র উৎকর্ষ লাভ করে নাই তথাপি ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষে ইহা যথেষ্ট প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। ফলে ভারতীয় শিল্প পশ্চিমের শক্তিতে অনুপ্রাণিত না হইয়া তাহার আলিঙ্গনে মৃত্যুকেই বরণ করিয়া লইতেছিল। মথুরার সহিত উত্তর পশ্চিমের যে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার পরিচয় লোণ শোভিকার পাষাণফলক হইতেই পাওয়া যায়। যে স্তূপ ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা অবিকল তক্ষশিলার সিথো-পার্থিয়ান স্তূপের অনুরূপ কিন্তু হিন্দুস্থানে যে সব স্তূপ, স্তম্ভ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাদের কোনওটীর সঙ্গেই ইহার সাদৃশ্য নাই (Cambridge History of India. Vol I. p-633)। সার চার্লস ইলিয়ট বলেন—যদি মথুরার ধর্ম্মভাবের ভিতরেও এরূপ উপাদান পাওয়া যায় যাহা গ্রীস, পারস্য অথবা মধ্য এসিয়াতেও পাওয়া যায় তবে তাহাতেও বিস্মিত হইবার কারণ নাই (Hinduism and Buddhism, Vol. II. p. 158)। কারণ আমরা জানি যে মথুরায় যে সমস্ত ভাস্কর্য্যের শেষ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহাতে গ্রীস ও ব্যাকট্রিয়ার প্রভাব প্রচুর পরিমাণেই বিদ্যমান।

ভাস্কর্য্য এবং স্থাপত্য

স্মিথ সাহেব বলেন যে, দিল্লীর বিখ্যাত লৌহ-স্তম্ভ যাহার উপর চন্দ্র নামে এক জন শক্তিমান রাজার স্তুতি-গান খোদিত আছে তাহার আদিম উৎপত্তি-স্থান সম্ভবতঃ মথুরায় (Smith.Early History of India. p. 386)। র‍্যাপসন বলেন—ভগবান্ লাল ইন্দ্রজী যে স্মৃতি-স্তম্ভ আবিষ্কার করিয়া ব্রিটিশ মিউজিয়মে দান করিয়াছিলেন মথুরার শক রাজাদের সম্পর্কে তাহা বহুমূল্য। উহা রক্তবর্ণ বালুকা-প্রস্তরে খোদিত একটী প্রকাণ্ড সিংহের মূর্ত্তি। কোনও স্তম্ভের শিরোদেশে বসাইবার উদ্দেশ্যে উহা প্রস্তুত হইয়াছিল। উহার কারুকার্য্যে পারস্য-প্রভাব সুস্পষ্ট। উপরিভাগ খরোষ্ঠী অক্ষরের লিপির দ্বারা সম্পূর্ণভাবেই সমাচ্ছন্ন। তাহাতে যে সমস্ত 'সত্রপ' মথুরায় রাজত্ব করিয়াছেন তাঁহাদেরই বংশানুক্রম প্রদত্ত হইয়াছে। এই শিলালিপি সমূহ হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে মথুরার সত্রপেরা বৌদ্ধ ছিলেন (Ancient India. p. 142—143)। মথুরার সিংহ শীর্ষটী দৃঢ় রক্তবর্ণ বালুকা প্রস্তরে নির্ম্মিত। ভগবান্ লাল ইন্দ্রজী উহা মথুরায় আবিষ্কার করেন। সেখানে উহার দ্বারা শীতলাদেবী অথবা বসন্তের দেবতার পূজা-বেদীর সোপান নির্ম্মিত হইয়াছিল (Ancient India p. 158)।
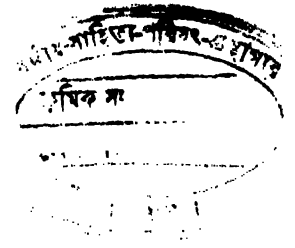
বঙ্গীয় স্থাপত্য-শিল্প

[শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্‌-এ]

আজ বঙ্গের ভাস্কর্য্যও লুপ্ত, স্থাপত্য শিল্পেও বঙ্গের নিজস্ব কিছুই নাই। কিন্তু এক সময়ে বাঙ্গালা দেশে ঐ দুটাই যে প্রচুর পরিমাণে ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণই নাই। স্থাপত্য কীর্ত্তিগুলি নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ভাস্কর্য্য-কীর্ত্তি তো লুপ্ত হইবার নহে। মুসলমান বিজয়ের পরে বঙ্গীয় ভাস্কর্য্য, প্রদীপ যেমন করিয়া নিবে, তেমনি নিবিয়া গেল ; কিন্তু নিবিবার আগেই চারি পাঁচ শতক ধরিয়া বঙ্গের অসংখ্য ভাস্কর যে অসংখ্য মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল, দেশের ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত মন্দির ভরিয়া দিয়াছিল, সেগুলি তো আর হাওয়ায় মিলাইয়া যাইতে পারে না! শক্ত সুচিক্কণ নিকষে নির্ম্মিত কৃষ্ণকমলসদৃশ সেই শ্রীমূর্ত্তিগুলি খানা ডোবা নালা ও পুকুর হইতে সমগ্র বঙ্গে অগণিত সংখ্যায় বাহির হইয়া প্রত্যেক বৎসরই আমাদিগকে বিস্মিত করিয়া দিতেছে ; ভাস্কর্য্যের কি প্রবল বন্যা দেশের উপর দিয়া একদা বহিয়া গিয়াছিল অহরহই তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যাইতেছে।

এই মূর্ত্তিগুলি কি চালা ঘরে থাকিত? ইহাদের জন্য নির্ম্মিত উত্তুঙ্গ মন্দিরসমূহের গিরিশৃঙ্গসদৃশ চূড়াগুলি কি মেঘের গতিরোধ করিতে স্পর্দ্ধিত শির উর্দ্ধে তুলিত না? দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাঙ্গালা দেশ পাথরের দেশ নহে, কাদা-মাটির দেশ। কাদা পোড়াইয়া যে ইট হয় তাহাতে তৈয়ারী মন্দির সযত্নে রক্ষা না করিলে দুই তিন পুরুষের বেশী টিকে না। কতক এইরূপে প্রকৃতি নিজের হাতে ধ্বংস করিয়াছেন, কতক বা মূর্ত্তি-বিদ্বেষী বিজেতারা ভাঙ্গিয়াছে। ফলে বঙ্গীয় স্থাপত্য এমনি বিনষ্ট হইয়াছে যে আজ সারা বাঙ্গালা দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিলেও প্রাক্‌-মুসলমান যুগে বঙ্গীয় স্থপতিরা কি প্রথায় মন্দির তৈয়ার করিত তাহা আর জানিবার উপায় নাই। একটা প্রকাণ্ড শিল্পের এমন ধ্বংসের কাহিনী ইতিহাসে অত্যন্ত বিরল।

মুসলমানগণই কিন্তু সমস্ত মন্দির ভাঙ্গিয়াছে, একথা বলিলে অন্যায় করা হইবে। মন্দির-প্রতিষ্ঠা সাধারণতঃ সম্পন্ন লোকগণই করিয়া থাকেন। সেই মন্দিরগুলি দরকারমত মেরামত করিয়া ঠিক রাখা তাঁহার বংশধরগণেরই কর্ত্তব্য। লক্ষ্মী কিন্তু চিরচঞ্চলা। আজ যিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন—প্রতিষ্ঠায় কত সমারোহ, জাঁকজমক হইল—লক্ষ লক্ষ টাকা জলের মত ব্যয়িত হইয়া গেল, অবস্থার পরিবর্ত্তনে হয়তো সেই লোকবিস্ময়কর মন্দিরের মেরামতের ক্ষমতাও তাঁহার পৌত্রের রহিল না! ফলে দেখিতে দেখিতে মন্দিরের গায়ে অশ্বত্থ-শিশুগণ মস্তক তুলিতে লাগিল—দশ বৎসরে সেগুলি মহামহীরুহে পরিণত হইল—তাহাদেরই শিকড়ের ফাঁসে জড়াইয়া মন্দিরটি জীবন্মৃত অবস্থায় আরও কয়েক বৎসর কাটাইয়া দিল। তার পরে একদিন এক বিরাট্‌ বাত্যায় বিশাল অশ্বত্থগুলি ভূমিসাৎ করিয়া দিল—ঝুর ঝুর করিয়া মন্দিরের গাঁথনী খসিয়া পড়িল,—তিন পুরুষ পূর্ব্বের পরমানন্দ মন্দিরের কুৎসিত ধ্বংসাবশেষ ভিন্ন আর কিছুই রহিল না! পাথরের মন্দিরগুলি এত সহজে বিনষ্ট হয় না; তাই উড়িষ্যার মন্দির জীর্ণ হইয়াও দাঁড়াইয়াছিল—এখন তো সেগুলি সরকার কর্ত্তৃকই সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের প্রাক্‌-মুসলমান-যুগের মন্দিরগুলি নিঃশেষেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালা দেশে মন্দির-নির্ম্মাণে পাথরের ব্যবহার কি একেবারেই ছিল না? কিছু ছিল বলিয়াই তো বোধ হইতেছে। বিক্রমপুরে সোনারঙ্গ গ্রামে একটী দেউল বা প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। তাহাতে বরজের জন্য মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে বারুইগণ হঠাৎ এক প্রকাণ্ড পাথরের স্তম্ভ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

স্তম্ভটী ১১ ফুট ৪½ ইঞ্চি উচ্চ এবং চৌকা গোড়ার মাপ ২ ফুট×২ ফুট। ওজনে বোধ হয় দুই শত মণের কম হইবে না। এ রকম প্রকাণ্ড এক পাথরে তৈয়ারী স্তম্ভ বাঙ্গালা দেশে আর বাহির হইয়াছে বলিয়া অবগত নহি। স্তম্ভটী ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত হইতেছে। গণমূর্ত্তি-চিহ্নিত যে চৌকা বালু পাথরের সুবৃহৎ বেদিকার উপর সাধারণতঃ প্রস্তর-স্তম্ভগুলি স্থাপিত হয়, তাহারও একটী এই দেউল হইতে পাওয়া গিয়াছে। একটী বৃহৎ পাথরের চৌকাঠের নিম্ন কাষ্ঠটীও এই দেউল হইতে পাওয়া গিয়াছে, এটীও ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। সোনারঙ্গ দেউলে যে বিশাল মন্দির এককালে ছিল, এই সমস্ত প্রস্তরের আবিষ্কার হইতেই বুঝা যায় যে তাহাতে কিছু কিছু প্রস্তরও ব্যবহৃত হইয়াছিল।

বঙ্গীয় স্থাপত্যে প্রস্তরের ব্যবহারের নিদর্শন আরও আছে। বিক্রমপুরে সেন রাজধানী রামপালের সন্নিহিত বাবা আদমের মসজিদের খিলানগুলি দুইটী প্রস্তর-স্তম্ভর উপর স্থাপিত। এই দুইটি যে কোন হিন্দু মন্দির হইতে গৃহীত তাহা উহার গাত্রস্থিত কয়েকটী প্রাচীন ব্রাহ্মী অক্ষর হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন

সোনারঙ্গ দেউলে প্রাপ্ত প্রস্তর-স্তম্ভ

ঢাকা জেলায় লক্ষ্যা নদীর পারে নারায়ণগঞ্জের বিপরীত-দিকস্থ বন্দরের মসজিদে, এবং উহারই ৫।৬ মাইল উত্তরে মজুমপুর মসজিদেও প্রস্তর-স্তম্ভ আছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে যখন দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষগুলি দেখিয়া বেড়াইতাম, তখন হঠাৎ এক দিন এক ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিলাম; সেখানে এককালে নিশ্চয়ই পাথরের মন্দির ছিল। গঙ্গারামপুর পুলিস ষ্টেশনের প্রায় ৭ মাইল দক্ষিণে তপন দীঘি নামক বিখ্যাত দীঘি অবস্থিত। এই দীঘিটী লম্বায় প্রায় এক মাইল হইবে এবং ইহার পাড়গুলি এমনি শক্ত করিয়া তৈয়ারী যে দীর্ঘ ৮—৯ শত বৎসর পরেও দীঘিটী সারা
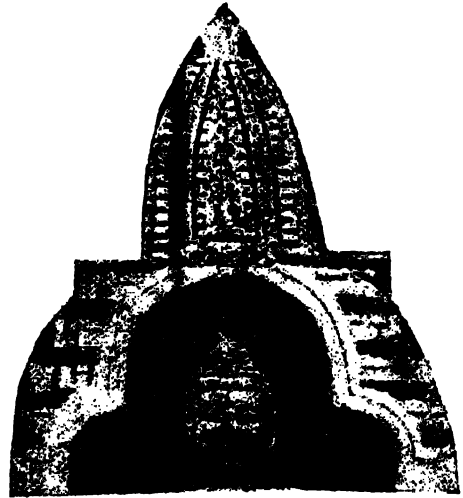
মহাকালী গ্রামে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্ত্তিতে অঙ্কিত মন্দিরের প্রতিকৃতি

বৎসর গভীর জলপূর্ণ থাকে। এই তপন দীঘির আধ মাইল খানিক পশ্চিমে পাথরপুঁজা নামে একটী ধ্বংসাবশেষ আছে। একটী অনতিবৃহৎ জলাশয়ের তীরে প্রস্তর-খণ্ড-সমাকীর্ণ একটী স্তূপ, আর জলাশয়টীর জলের মধ্যে, চারিধারে মন্দিরের বিবিধ প্রস্তরময় খণ্ড ছড়াইয়া পড়িয়া আছে, ইহারই নাম পাথরপুঁজা। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন বিষম গোলাবর্ষণে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দির ভাঙ্গিয়া ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছে। প্রাচীন দেব কোট বা কোটীবর্ষ নগরের ধ্বংসাবশেষ গঙ্গারামপুর পুলিশ ষ্টেশনের প্রায়

সংলগ্ন। উহাতেও বহু প্রস্তর-স্তম্ভ অদ্যাপি দণ্ডায়মান আছে। রাজসাহী সহরের প্রায় ৩৩ মাইল উত্তরে কুসুম্বা নামক স্থানে প্রস্তর-নির্ম্মিত বেশ একটা বড় মসজিদ আছে। ভগ্ন হিন্দু-মন্দিরের মালমশলা দিয়া এই মসজিদ তৈয়ারী বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। (Annual Report of the Archæological Survey of India, 1923-24. p. 33).

মন্দির-নির্ম্মাণে প্রস্তর-ব্যবহারের এই সকল উদাহরণ সত্বেও বলিতে হইবে যে প্রস্তর বাঙ্গালা দেশের জিনিস নহে। বাঙ্গালাদেশে ব্যবহৃত পাথর আসিত রাজমহল পাহাড় হইতে। আনিবার খরচ খুব বেশী পড়িয়া যাইত, তাই মূর্ত্তি-নির্ম্মাণেই প্রস্তর-ব্যবহার প্রশস্ত ছিল। মন্দির-নির্ম্মাণে ইষ্টকই প্রধান উপকরণ ছিল। কিন্তু প্রাক্-মুসলমান যুগের মন্দির তো একটীও আজ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া নাই। বঙ্গের ইষ্টক-স্থাপত্য কি রকম ছিল, তাহা কি জানিবার কোন উপায়ই নাই? আছে।

উড়িষ্যার ভগ্ন দেউল

পাথরের মূর্ত্তি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে সহসা এক দিন চোখে পড়িল, বিক্রমপুরের মহাকালী গ্রাম হইতে প্রাপ্ত এক খানা বুদ্ধ-মূর্ত্তিতে ধ্যানাসনস্থ মূর্ত্তির উপরে একটি মন্দিরের প্রতিকৃতি খোদিত আছে। সোনারঙ্গ দেউলে যে-প্রকাণ্ড স্তম্ভটী পাওয়া গিয়াছে ঠিক তাহার আকৃতির দুইটী স্তম্ভের উপর একটী ত্রিভঙ্গ খিলান। খিলানের দুই ধারে দেখা যায়, ধাপে ধাপে মন্দির উঠিয়া গিয়াছে। শেষ ধাপ বা তলটীর দুই ধারে কতকটা জায়গা ছাড়িয়া একটী পঞ্জরময় মন্দির-চূড়া উঠিয়াছে। চিত্র দেখিলে আমার বর্ণনা পরিস্ফুট হইবে। দুই প্রস্তর স্তম্ভের মধ্যে খিলানের নীচে বুদ্ধদেব বসিয়া আছেন।

বাঙ্গালা দেশে বসিয়া প্রাক্-মুসলমান যুগের মন্দিরের আদর্শ খুঁজিতে গেলে—প্রথমেই আমাদের মনে পড়ে আমাদের প্রতিবেশী—উড়িষ্যাদেশের কথা। সেইখানেই এখনও বিবিধ আদর্শানুযায়ী নির্ম্মিত মন্দিরসমূহ বর্ত্তমান আছে। উড়িষ্যার মন্দিরগুলি তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাস করিলাম, কিন্তু ছাদের দিক্‌টায় তলের উপর ক্রম-হ্রস্বায়মান তল উঠিয়া গিয়াছে এবং সর্ব্বোচ্চ ও ক্ষুদ্রতম তলের মধ্যভাগ হইতে পঞ্জরময় চূড়া উঠিয়াছে, এমন রীতির মন্দির একটীও পাইলাম না। উড়িষ্যায় সাধারণতঃ দুই

রীতির মন্দির দেখা যায়। ক্রম-হ্রস্বায়মান পীঠ বা পীঢ়-যুক্ত এক শ্রেণীর মন্দির আছে, উহাদিগকে ভদ্র বা পীঢ়া-দেউল বলে। ভদ্র-দেউলের ছবি দেওয়া গেল। আর এক শ্রেণীর দেউলকে রেখ-দেউল বলে। উহার অঙ্গ রেখাকৃতি পঞ্জরময় এবং পঞ্জরগুলি মাটি হইতে শীর্ষস্থ আমলক পর্য্যন্ত উঠে। একটী রেখ-দেউলের ছবি দেওয়া গেল, উহার পাশে একটী পীঢ়া দেউলও আছে। উড়িষ্যায় মন্দিরগুলিকে রেখ-দেউল ও ভদ্র বা পীঢ়া দেউল প্রধানতঃ এই দুই শ্রেণীতেই বিভক্ত করা যাইতে পারে।

কিন্তু মহাকালীর বুদ্ধ-মূর্ত্তির উপরে যে মন্দিরের প্রতিকৃতি দেখা যায়, তাহা রেখ ও ভদ্র দেউলের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ বলিয়া বোধ হয়। এই মন্দিরের দুইটী বিশেষত্ব ঐ প্রতিকৃতি হইতেও লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ পীঢ়া দেউলের পীঢ় বা ক্রমহ্রস্বায়মান থাক অনেকগুলি থাকে এবং তাহাদের একটা হইতে আর একটার দূরত্ব বড় বেশী নহে। বুদ্ধমূর্ত্তিতে মন্দিরের যে প্রতিকৃতি দেখা যায় তাহাতে থাক চারিটী মাত্র এবং প্রত্যেকটী বেশ উঁচু। এগুলিকে পীঢ়া না বলিয়া তল বলিলেই অধিকতর সঙ্গত হয়। দ্বিতীয়তঃ পীঢ়া বা রেখ দেউলের মাথায় সাধারণতঃ বৃহৎ আমলক থাকে, প্রতিকৃতির মন্দিরের চূড়ায় আমলক থাকিলেও তাহা তেমন বৃহৎ বা মনোযোগ আকর্ষণ করিবার মত কিছু নহে।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, ভাস্কর বুদ্ধমূর্ত্তির উপরে যে মন্দিরের প্রতিকৃতি আঁকিয়াছে তাহা আদর্শমূলক নহে, কাল্পনিক মাত্র—কারণ পীঢ়া ও রেখ দেউলের এমন জগাখিচুড়ী রীতি যে সত্যই দেশের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহা সহসা বিশ্বাস করা কঠিন। খুঁজিতে খুঁজিতে চোখে পড়িল, বাঙ্গালা-দেশে প্রাপ্ত আরও কয়েকখানি

উড়িষ্যার রেখ-দেউল (পার্শ্বে একখানা ভদ্র দেউলও আছে)

মূর্ত্তিতে এই শ্রেণীর মন্দিরের প্রতিকৃতি আছে। ডাক্তার কুমারস্বামী তাঁহার History of Indian and Indo-nesian Art নামক পুস্তকের ৭১তম চিত্রে একখানা অরপচন মঞ্জুশ্রীর মূর্ত্তির ছবি দিয়াছেন। মূর্ত্তিখানি বঙ্গ-দেশে প্রাপ্ত। এই মূর্ত্তিখানাতেও অবিকল একই রীতির

কুমারস্বামীর পুস্তকে মুদ্রিত মঞ্জুশ্রী মূর্ত্তির উপরে অঙ্কিত মন্দিরের প্রতিকৃতি

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে ত্রিশরণ বুদ্ধ ভট্টারকের মন্দির

মন্দিরের প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে। বেশীর মধ্যে, এই প্রতিকৃতিতে দেখা যায় প্রত্যেক তলের প্রান্ত হইতে স্তূপাকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখর উঠিয়াছে। ফরাসী পণ্ডিত ফুশে সাহেব বৌদ্ধ-মূর্ত্তি-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে বহি লিখিয়াছেন, তাহাতে বঙ্গদেশস্থ দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর কয়েকটী বিখ্যাত বৌদ্ধ দেব-দেবীর ছবি দেওয়া আছে। এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় চিত্রের ৪নং ছবিখানা দেখুন। উহাতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ত্রিশরণ বুদ্ধ ভট্টারক নামক তৎকালবিখ্যাত দেবতার প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে। মহাকালীর বুদ্ধ ও কুমারস্বামীর মঞ্জুশ্রী মূর্ত্তির উপর যে ধরণের মন্দির দেখা যায়, এইখানেও মন্দিরটী ঠিক সেই রীতির,—ক্রম-হ্রস্বায়মান তলার উপর তলা, শেষ তলাটীর মধ্য হইতে পঞ্জরময় চূড়া উঠিয়াছে—সর্ব্বোপরি ছোট একটী আমলক।

উপরে যে দৃষ্টান্ত কয়টি দিলাম তাহা হইতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে ক্রম-হ্রস্বায়মান তল ও সর্ব্বশেষ তলে চূড়া-সমন্বিত মন্দিরই বঙ্গদেশের প্রধান স্থাপত্য-রীতি ছিল, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া হঠকারিতা হইবে না। পরে দেখাইব যে অন্য স্থাপত্য রীতিও দেশে প্রচলিত ছিল, উহাদের তুলনা উড়িষ্যায় এখনও মিলে। কিন্তু রেখ ও ভদ্র দেউলের অদ্ভুত সমন্বয় এই বঙ্গীয় রীতি যে বঙ্গের ইষ্টক-মন্দিরগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহা এখন কতকটা নিশ্চয় করিয়াই বলা যায়।

সহসা মনে পড়িয়া গেল—এই রীতির মন্দির তো ব্রহ্মদেশের প্রাচীন পেগান নগরের ধ্বংসাবশেষে আজিও বর্ত্তমান আছে। ফার্গুসন সাহেব তাঁহার ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের ইতিহাসে এই রীতির মন্দিরগুলির বর্ণনা দিয়াছেন (Indian and Eastern Architecture. Vol II. p. 360—Edition of 1910)। বর্গক্ষেত্রের আকারে এই মন্দিরগুলি নির্ম্মিত। কোন কোন মন্দিরে এক বা একাধিক ধার হইতে পাগ (portico) বাড়িয়া গিয়াছে। ছাদে ক্রম-হ্রস্বায়মান তিনটী বা ততোধিকতল এবং সর্ব্বশেষ তলের উপরে শিখর। এই রীতির স্থাপত্যের উৎপত্তি কোথায় তাহা আলোচনা করিতে গিয়া

পণ্ডিতগণ অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনা করিয়া বসিয়াছেন। ফাগু´সন সাহেব অনুমান করিয়াছিলেন যে বেবিলনে এই রীতির জন্ম এবং তথা হইতে কোন প্রকারে ব্রহ্মদেশে প্রচার লাভ করিয়াছিল (II. p. 365)। অবশ্য তিনি ইহাও অধিকতর সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন যে গঙ্গাবিধৌত প্রদেশ সমূহে সম্ভবতঃ এই রীতি প্রচলিত ছিল, কিন্তু অধুনা একেবারেই লোপ পাইয়াছে। তিনি ইহাও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে বঙ্গদেশ ও উত্তর ভারতের সহিত ব্রহ্মদেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর (II. 365)।

প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ১৯১৩—১৪ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক বিবরণীতে মিঃ দুরোয়াজেল্ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পেগানের আনন্দমন্দির উড়িষ্যায় অনন্ত গুহার অনুকরণে নির্ম্মিত। পেগানের আনন্দ ও অন্যান্য মন্দিরগুলি যে ভারতবর্ষের গুহামন্দির-গুলির অনুকরণে নির্ম্মিত সেই বিষয়ে খুব কমই সন্দেহ আছে। ব্রহ্মদেশের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ১৯১৩—১৪ খৃষ্টাব্দে বার্ষিক রিপোর্টেও এই পেগানের স্থাপত্য-রীতি উত্তর ভারত হইতে গৃহীত বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে (প্যারা ৪৩, পৃঃ ১৬)। ইহারই ১৯১৭—১৮ সনের রিপোর্টে পেগানের মন্দিরগুলি দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। ক্রমহ্রস্বায়মান তল ও শিখরযুক্ত মন্দির (যথা, আনন্দ, সুলেমানী, থিট্সাবাদা ইত্যাদি) গুলি নবম শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই খানে আবার ইহাদের উৎপত্তি দাক্ষিণাত্য রীতির অনুসরণে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (প্যারা ৪৬, পৃঃ ১৮)। এইরূপে দেখা যাইবে পেগানের আনন্দ ও অন্যান্য বিস্ময়কর স্থাপত্যরীতি সকলের মূল খুঁজিতে গিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক-[illegible] হইতে সারা ভারতময় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। পেগানের তাজমহল বিখ্যাত আনন্দ-মন্দির ১০৯০ খৃষ্টাব্দে বা উহারই নিকটবর্ত্তী কোন বৎসরে নির্ম্মিত হইয়াছিল (প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের বার্ষিক বিবরণ, ১৯১৩ –১৪, পৃঃ ৬৪)।

বঙ্গীয় মূর্ত্তিগুলি হইতে বঙ্গ-প্রচলিত স্থাপত্যরীতির যে আদর্শ উপরে দেখাইয়াছি, তাহা হইতে এখন আর
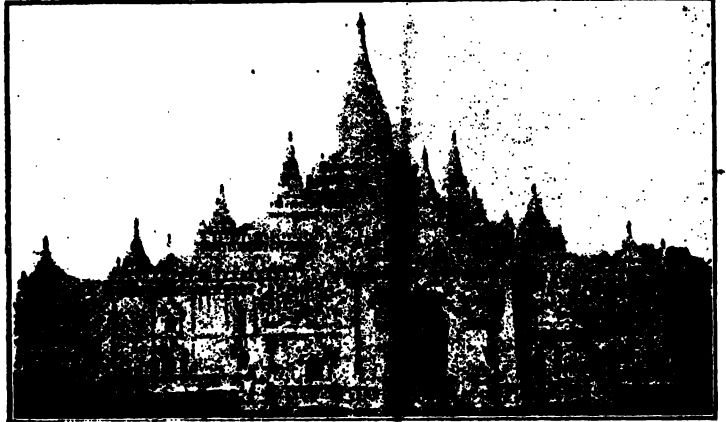
পেগানের আনন্দ-মন্দির
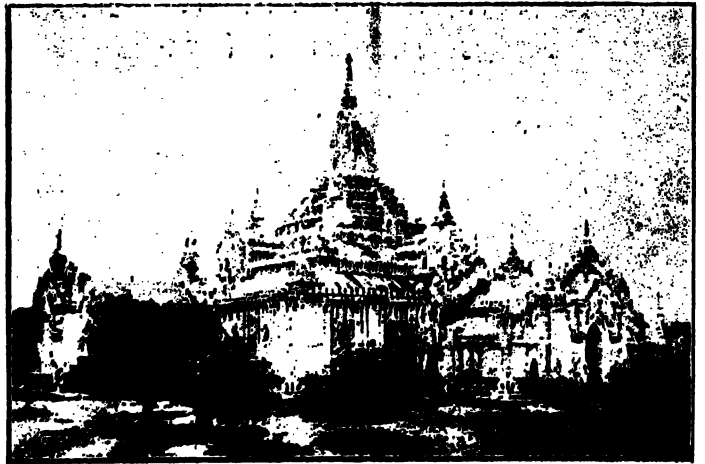
পেগানের আনন্দ-মন্দির (অপর দৃশ্য)

সন্দেহ মাত্রও থাকা উচিত নহে যে, পেগানের বিস্ময়কর মন্দির সমূহ বঙ্গীয় স্থাপত্যরীতি অনুসারেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। মুসলমান-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গে এই রীতি লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মূল বৃক্ষ শুখাইয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার একটী শাখা ব্রহ্মদেশে নীত হইয়া এমন চমৎকার ফলে ফুলে শোভিত হইয়া উঠিয়াছে যে আজ অনেক পরিশ্রম করিয়া প্রমাণ করিতে হইল যে এই [illegible]

মনোমোহকর বৃক্ষটী বঙ্গদেশে যে বৃক্ষ মরিয়া গিয়াছে তাহারই শাখা।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় অতি ক্ষীণ কয়েকটী সূত্র ধরিয়া একটা মস্ত জিনিস দাঁড় করাইবার প্রয়াস করিতেছি। বোদ্ধা মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে সত্যই প্রাচীন বঙ্গীয় স্থাপত্যের স্বরূপ এবং পেগান মন্দিরগুলির মূল আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি। কিন্তু স্থূলতর প্রমাণ না হইলে যাঁহারা সন্তুষ্ট হন না, ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের জন্য তাহাও পাওয়া গিয়াছে।
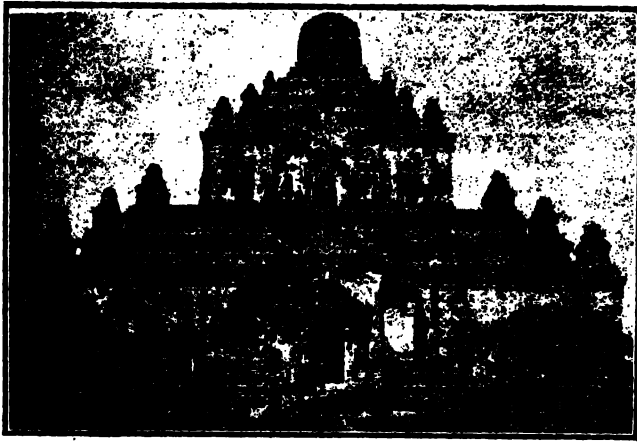
রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে একটী উচ্চ স্তূপ বর্ত্তমান ছিল। বুকানন হ্যামিল্টনের আমল হইতে এই স্তূপ প্রত্ন-প্রেমিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়ের বদান্যতায় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগে এই স্তূপের খনন-কার্য্য আরম্ভ হয় এবং অধুনা ভারতীয় প্রত্ন-তত্ত্ব-বিভাগ কর্ত্তৃক এই স্তূপের খনন-কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। প্রত্ন-তত্ত্ব-বিভাগের ১৯২৫—২৬ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক বিবরণীতে এই স্তূপ খননে আবিষ্কৃত মন্দির সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল—

পেগানের সুলেমানী মন্দির

"(মর্ম্মানুবাদ) মূল মন্দিরটীর প্রত্যেক ধারে এক একটী করিয়া পাগ আছে। উত্তরের পাগটীই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ।... মন্দিরটীর নক্সা নিতান্ত সরল। ইহা একটী ত্রিতল-বিশিষ্ট মন্দির, নিম্নতল একটী ক্রুশের আকৃতি। এই ক্রুশের দীর্ঘতম বাহু ছিল উত্তর দিকে এবং উহার উপর দিয়াই সিঁড়ি ছিল। দ্বিতীয় তলটী প্রথম তলের মতই নিরেট।...(ইহার উপরে) মূল মন্দিরটী অবস্থিত ছিল। ইহা নিরেট ছিল না এবং ইহার উপরে ছাদ ছিল। এই মূল মন্দিরের
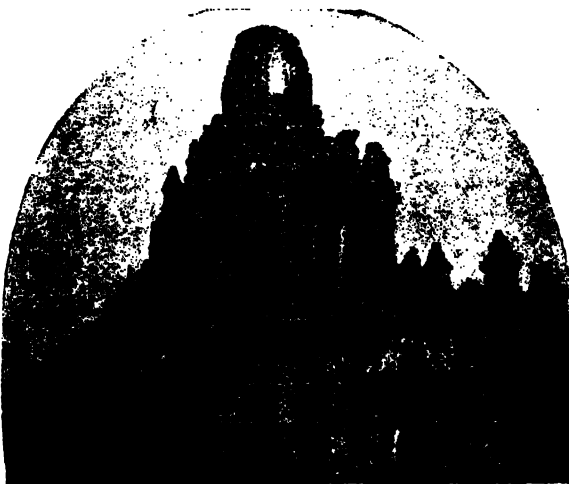
পেগানের থিটসাবাহা মন্দির
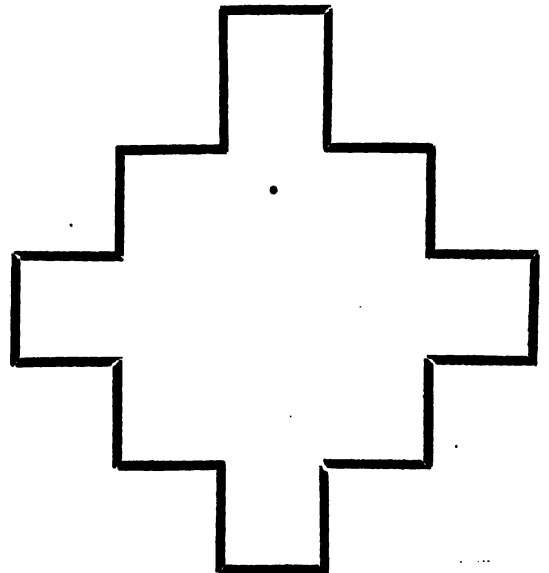
পাহাড়পুর মন্দিরের আনুমানিক নক্সা

পেগানের আনন্দ মন্দিরের নক্সা

প্রত্যেক কোণে এক একটী মণ্ডপ ছিল।" (পৃঃ ১০৮—১০৯)। গত বৎসর জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় সায়েন্স কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহার সভ্যগণ পাহাড়পুর দেখিতে গমন করিয়াছিলেন। প্রত্ন-তত্ত্ব-বিভাগের পূর্ব্ব-ভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দীক্ষিত মহোদয় এই সভ্যগণের পরিক্রমার সুবিধার জন্য পাহাড়পুর-খননের সংক্ষিপ্ত একটী বিবরণী প্রস্তুত করেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন:—

"(মর্ম্মানুবাদ) মন্দিরটী বর্ত্তমানে যেমন আছে তাহাতে উহা উত্তর দক্ষিণে ৩৬১ ফুট লম্বা এবং পূর্ব্বপশ্চিমে ৩১৮ ফুট বিস্তৃত ছিল দেখা যায়। বর্গক্ষেত্রের আকৃতিতে মন্দিরটী নির্ম্মিত কিন্তু প্রত্যেক ধারেই কতকটা অংশ বাড়ান আছে। উত্তর ধারের বর্দ্ধিত অংশ অপেক্ষাকৃত লম্বা, কারণ উহার উপর দিয়া সিঁড়ি গিয়াছে। তিনটী ক্রমহ্রস্বায়মান তলে মন্দিরটী সম্পূর্ণ; উত্তর দিকের প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়া উপরের তল গুলিতে উঠা যায়···

"পাহাড়পুর মন্দিরের স্থাপত্যের নক্সা সবিশেষ কৌতু-

যবদ্বীপের বিখ্যাত বরবুদর মন্দির

হলোদ্দীপক। অনুগাজ প্রদেশে ভারতীয় প্রচীন স্থাপত্য-প্রথায় নির্ম্মিত মন্দির প্রায় নাই বলিলেই হয়। তাই যাহারা এই প্রথা কি রকম ছিল তাহার অনুশীলন করিতে চাহেন তাঁহাদের কাজ বড়ই কঠিন। এই বিশ্বাস অনেক দিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে যে জাভার বর-বুদর মন্দির এবং ব্রহ্মদেশের ক্রমহ্রস্বায়মান তল-যুক্ত মন্দির গুলির মূল ভারতবর্ষের কোথাও বিশেষতঃ বঙ্গদেশে খুঁজিতে হইবে, কারণ ভারতীয় সভ্যতা বঙ্গদেশের মধ্য দিয়াই আরও দক্ষিণ-পূর্ব্বে প্রসারিত হইয়াছিল। পাহাড়পুরের মন্দিরের নক্সা, উহার ধারগুলির মধ্যের পাগ, উহার ক্রম-হ্রস্বায়মান তল...দেখিয়া মনে করা অসঙ্গত নয় যে প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য-প্রথায় এই এক আদর্শ, যাহার সহিত ব্রহ্মদেশ, যবদ্বীপ ও কাম্বোজের স্থাপত্য-কীর্ত্তিগুলির সবিশেষ যোগ আছে।" দীক্ষিত সাহেব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহারও দৃষ্টিতে পাগাড়পুরের মন্দিরের সহিত বৃহত্তর ভারতের মন্দিরগুলির সাদৃশ্য ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বাস্তবিক যবদ্বীপের বিখ্যাত বর-বুদর মন্দির এবং কাম্বোজের বিখ্যাত আঙ্কোর ভাট মন্দির এই একই প্রথায় নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু দীক্ষিত সাহেব শুধু একটি স্থানে একটু গোল করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। এই প্রথায় নির্ম্মিত মন্দির সমগ্র উত্তর ভারতে একটীও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানি না। শুধু আকবরের সমাধি-মন্দির সেকেন্দ্রায় কতকটা এই প্রথা অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু সেকেন্দ্রা তো মোটে শ তিনেক বছরের আগের তৈয়ারী—এবং সেকেন্দ্রার স্থাপত্য-প্রথার মূল খুঁজিতে গিয়াও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা হয়রান হইয়াছেন। উত্তর-ভারতে এই প্রথার আদর্শ খুঁজিয়া পাইলে ফাগুর্সান ইত্যাদি মহা-মহারথিগণ পেগানের মন্দিরের মূল খুঁজিতে বেবিলন হইতে সারা ভারতময় ঘুরিয়া বেড়াইতেন না। পাথরের মূর্ত্তিতে খোদিত প্রতিকৃতি হইতে দেখাইয়াছি যে এই স্থাপত্য প্রথা বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশেরই প্রথা। পাহাড়-পুরের মন্দিরেও সেই প্রথারই আদর্শ পাওয়া গিয়াছে। যখন মনে করা যায় যে, এই সুকুমার স্থাপত্য-প্রথা কালে ব্রহ্মদেশ, যবদ্বীপে এবং কাম্বোজে পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তখন বাঙ্গালার জন্য এই প্রথায় স্বামিত্ব দাবী করিতে সর্ব্বহারা বাঙ্গালী আমরা—আমাদের কণ্ঠ কাঁপিয়া যায়।

জ্যো'স্না-ঝরা'র গান

[শ্রীরামেন্দু দত্ত]

ঐ, বনের কালো বুকের মাঝে
জ্যো'স্না মাগে ঠাঁই—
তা'র, পাতায় পাতায় গ'লে পড়ার
তাইত বিরাম নাই!
তাইত সারা আকাশ জুড়ে
বিদায়-ব্যথা বেড়ায় ঘুরে,
তাইত বনের বাঁশীর সুরে
হাসির আভাস পাই!

জ্যো'স্না ঝরে ধরার পরে
আজকে রাতের বেলা—
আলো-ছায়ার কোলাকুলি,
চল্‌ছে হোলী খেলা!
বর্ষা-রাতের মাতাল হাওয়া,
কর্‌ছে কেবল আসা-যাওয়া,
হাতছানি দেয় গাছের পাতা,
জ্যো'স্না বলে, "যাই!"
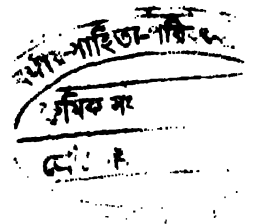
গ্রাম্য কবি

[শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি-এ]

পুস্তকাদিতে আমরা রাজারাজড়ার অনেক যুদ্ধের বিবরণ পাই, তবে তাহার জন্যও এই হতভাগ্য দেশে সাধারণতঃ খুঁজিতে হয় বৈদেশিকদের লিখিত পুস্তক। আলেকজান্দারের ভারতবর্ষ আক্রমণের বিবরণ সংগ্রহ করিতে হয় গ্রীক লেখকদিগের পাতা কুড়াইয়া। এত বড় একটা স্মরণীয় ঘটনা—কিন্তু কোন হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন গ্রন্থকার তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত আবশ্যক মনে করেন নাই। দেব-দেবীর স্তবই রচনা করিবেন, না ইতিহাস লিখিতে বসিবেন? মুসলমান আমলের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হয় মুসলমানদিগের লেখা পার্শী পুস্তক হইতে। বিজেতারা নিজেদের মত করিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, এত কাল পরে দেশের প্রাচীন বিবরণ জানিবার তাহাই প্রধান সম্বল। দুই এক জন ভদ্রলোক সুদূর চীন হইতে ধর্ম্ম শিখিতে আসিয়া আনুষঙ্গিকরূপে এদেশের যে একটু আধটু কথা লিপি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের পক্ষে অমূল্য জিনিস্। অবশ্য দানপত্রে বা পাহাড়ের গায়ে বা মন্দিরের উপর বা মাটীর নীচে দেশের প্রাচীন সংবাদ কিছু কিছু বাহির হইতেছে, কিন্তু তাহা বিপুল চেষ্টার পর এবং এত বড় একটা দেশের ইতিহাসের পক্ষে যৎসামান্য। সে চেষ্টাই যে কত কাল চালাইতে হইবে তাহা কে বলিবে? মুসলমান আমলে এক জন হিন্দু জমিদার অধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া দেশের স্বাধীন রাজা হইয়া বসিলেন, কিন্তু রাজাটীর প্রকৃত নাম কি তাহা লইয়াই বহুকাল বাদানুবাদ চলিল—শেষে বহু কষ্টে দুই এক খানা হিন্দুর গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে যে দুই এক ছত্র বাহির হইয়াছে ইতিহাস তাহার জন্যই আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট অগত্যা কৃতজ্ঞ। এখনও এই রাজাটীর সম্বন্ধে অনেক আবশ্যক কথা তর্কের বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছে।

এ হেন দেশে যদি প্রাচীন গান বা ছড়ায় দেশের ইতিহাস কিছু পাওয়া যায় তাহা নিশ্চয়ই খুব যত্নের সহিত রক্ষা করা কর্ত্তব্য। রাজারাজড়ার যুদ্ধ তাহাতে নাই থাকিল—তাহাই দেশের একমাত্র ইতিহাস নহে। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক যে অবস্থা যতটুকু তাহা হইতে জানিতে পারা যায় সেইটুকুর জ্ঞানই কোথা হইতে আসে? গানে কোন আষাঢ়ে কথা থাকিতে পারে, মৈমনসিংহের গীতিকায় কেদার রায়কে যেমন বিকৃত ভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে, সেই রকম ঘটনার বিকৃতি থাকিতে পারে, কিন্তু মোটামুটী সেকালকার অবস্থার যে একটা প্রতিবিম্ব উহাতে পাওয়া যাইবে তাহা আর কিছুতেই পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। এই গান ও ছড়া যতই সংগৃহীত হইবে বাঙ্গলাদেশ ততই নিজেকে ভাল করিয়া চিনিতে শিখিবে।

অনেক দিনের কথা—রংপুর জেলায় মফঃস্বলে এক ডাক বাঙ্গালায় কোন ভিক্ষুক গায়কের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। ভিক্ষুক একটা গান ধরিল, দেখা গেল গানটা কুচবিহার অঞ্চলের একটা খণ্ড যুদ্ধের বিবরণ। যতদূর স্মরণ হয় লক্ষ্মণ কাঠামা নামক এক ব্যক্তি ছিল সেই গানের নায়ক। গানটী আমি লিখিয়া লইয়াছিলাম কিন্তু এখন খুঁজিয়া পাইতেছি না। আর যে বাঙ্গলা দেশ সে যুদ্ধের বিবরণটী পাইবে তাহার আশা খুব কম। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম কালকেতুর বিবরণে যে রকম যুদ্ধের আলেখ্য উপস্থিত করিয়াছেন এও কতকটা সেই রকমের।

এই সকল গ্রাম্য গীতি অনেক লোপ পাইয়াছে। যাহা আছে তাহাও ক্রমে বিস্মৃতির ক্রোড়ে বিরাম লাভের চেষ্টায় আছে। যাঁহাদের সুযোগ আছে তাঁহারা যদি একটু চেষ্টা করিয়া এই রকমের গান বা ছড়ার সংগ্রহ কার্য্যে খানিকটা সময় নিয়োগ করেন তাহা হইলে বাঙ্গালী তাহা হইতে দেশকে ও দেশের সাবেক অধিবাসীদিগকে অনেকটা বুঝিতে পারিবে ও তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

এখানে এই শ্রেণীর গ্রাম্য গীতির কয়েকটা উদাহরণ দিয়া আমি বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করিব।

সকলেই জানেন এক সময় মগদিগের অত্যাচারে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব বঙ্গ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছিল। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বাখরগঞ্জ, খুলনা ও ২৪ পরগণার দক্ষিণ ভাগ এ সকলের ত কথাই ছিল না, মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত ইহাদের নৌবাহিনী অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। কত লোককে

ধরিয়া নিয়া যে ইহারা আরাকানে দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে, অথবা গরু ভেড়ার দামে বিক্রয় করিয়া দিয়াছে, কত কুল-কামিনীর যে ইহারা চিরকালের মত সর্ব্বনাশ করিয়াছে, কত নিরীহ বাঙ্গালীর রক্তে যে ইহারা মা বসুমতীকে সিক্ত করিয়াছে, অথবা বঙ্গোপসাগরের সলিল-ভার বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে তাহা এখন কল্পনার বিষয়। রাজা তখন দুর্ব্বল, প্রজা নির্জ্জীব—তাহা না হইলে কখন এতটা সম্ভব হইত না। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে এক মাসেই না কি ইহারা দক্ষিণ বঙ্গ হইতে ১৮০০ লোক ধরিয়া লইয়া যায়। বহুকাল পর্য্যন্ত ইহাদের নৌকার গতি-রোধের জন্য ভাগীরথী দেবী কলিকাতা হইতে শিবপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হার গলায় ঝুলাইয়া রাখিতেন—সোণার অবশ্য নয়, লৌহের। ফিরিঙ্গি (পর্ত্তুগীজ) দস্যুরা সময় সময় মগদের সহিত বিবাদ করিলেও অনেক সময় তাহাদের সহিত একযোগে লুণ্ঠনাদি কার্য্য সারিত। নিম্নোদ্ধৃত গ্রাম্য গানটী এই দুঃসময়ে দেশের অবস্থার পরিচায়ক।* মগেরা স্ত্রীকে নৌকায় তুলিয়া লইয়া যাইতেছে, নৌকায় স্ত্রী কাঁদিতেছে, উপরে স্বামী কাঁদিতেছে এই অবস্থা—

খলীর সাজি তৈলীর বাটী রে গাং সিনানে যায়,
সান করিবার চল্লেন নারী পদ্মা নদীর ঘাটে রে—
আমি কি করি ?

আগে যদি জান্তাম আসিবে মাঘন রাজা ঘাটে,
আগে পাছে লইতাম দাসী পদ্মা নদীর ঘাটে।
এক ডুব, দুই ডুব, তিন ডুবের রে কালে
কোথাকার এক মাঘন রাজা চুল ধরিয়া টানে।
আগা নায়ে ঝামুর ঝুমুর, পাছা নায়েরে মাঝি,
ধীরে সুস্থে বাইও নৌকা, আমি পতির কান্দন শুনি।
কাইন্দ না, কাইন্দ না পতি রে, আমার মায়া ছাড়,
বাক্সভরা আছে টাকা আবার বিয়া ক'র।
হাল বাও হালুয়া ভাইরে হাতে সোণার নড়ি,
এই পথ দ্যানি যাইতে দেখ্ছো আমার বেলয়া সুন্দরী ?
জাল বাও জালুয়া ভাইরে, জালের কোণা বেকা,
তোমার নি জালে বাজছে আমার বেলয়ার হাতে শাখা

"কাইন্দ না, কাইন্দ না পতিরে, আমার মায়া ছাড়,
ঝাপি ভরা আছে গয়না, আবার বিয়া ক'র।
[পূর্ব্ব বঙ্গের গান, পাঠক আবশ্যক মত ঁ (চন্দ্রবিন্দু) সংযোগ করিয়া লইবেন]

কি মর্ম্মভেদী করুণ দুঃখের ভিতর দিয়া এক সময় সর্ব্বদা সন্তর্পণে অক্ষম বাঙ্গালী জীবন কাটাইয়াছে।

রাজা রাজবল্লভের রাজধানী রাজনগর এক সময়ে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ও দেবমন্দিরে সাজান ছিল। কালের কুটিল গতিতে সে সমস্তই ক্রমে কীর্ত্তিনাশা নদীর কুক্ষিগত হয়। গ্রাম্য কবি তাহার যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন তাহার সকলটা এখানে তুলিয়া দিয়া প্রবন্ধের কলেবর বাড়াইব না—কতকটা দিতেছি। পাঠক দেখিবেন, সে সময় ঢাকা-ফরিদপুরের মধ্যবর্ত্তী এই অঞ্চলের লোকের মনের ভাব গ্রাম্য কবির তুলিকায় কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে চাঁদরায় ও কেদাররায়ের রাজধানী গ্রাসের কথাও আছে এবং তাহার একটা সময়ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

* * *

হইল মহারাজ রাজনগর মাঝ
বৈদ্যবংশে অবতার।
রাঢ়, গৌড়, কলিঙ্গ, তুল্য অঙ্গ বঙ্গ
চমৎকার কীর্ত্তি যার॥
জয়ে ভূমণ্ডলে নিজ বাহুবলে
কীর্ত্তি ক'রেন বহুতর।
বিল দাওনীয়া ভরি অট্টালিকাপুরী
নির্ম্মাইল নরেশ্বর॥
সব দালান পাকা চক মিলান বাকা,*
তুল্য অমর-নগর।
শত রত্নাবধি, পঞ্চরত্ন আদি,
একুশ রত্ন মনোহর॥
দোলমঞ্চ শোভা, আহা মরি কিবা,
সুমেরুর চূড়া প্রায়।
দীঘি সরোবর সব প্রায় সাগর
স্থানে স্থানে দেখা যায়॥

* * *

* গানটী ফরিদপুর নগরের নিকটস্থ কোন গ্রাম হইতে শ্রীমান্ জসীমুদ্দিন কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

* বাকা=বাঁকা।

সিংহ দরজার নক্সা চমৎকার,
দেখিতে হয় যে শঙ্কা।
(যেমন) সমুদ্র মাঝারে রাজা লঙ্কেশ্বরে
সৃজিল কনকলঙ্কা ॥
* * *
জানি কোন শাপে জরাসন্ধ ভূপে *
জন্মিল রাজনগর মাঝ।
যাঁহার কৃপাতে বাঙ্গালা মুল্লুকেতে
প্রকাশ পাইল ইংরাজ ॥
* * *
শুনি পচিশ সালে ভাঙ্গিল দুকূলে
কীর্ত্তিনাশা হয়ে খল;
আড়া কুলবেড়িয়া গোকুলগঞ্জ ভাঙ্গিয়া
মূলফৎগঞ্জ কল্লে তল ॥
চাঁদ কেদার রায়ের কীর্ত্তি চমৎকার
ভেঙ্গে নিল কে ঈশ্বর।
গোবিন্দ মঙ্গল (সোনার) দেউল
খাকুটিয়াদি বহুতর ॥
পূর্ব্বে এই মত ভেঙ্গে নিয়ে কত
স্থির ছিল কিয়ৎকাল।
পুনঃ ছিয়াত্তর সালে ভাঙ্গনি আরম্ভিলে,
হইল তরঙ্গ উত্তাল ॥
দেখ দেখ ভাই রে, রাজনগরের হল কি দুর্দ্দশা
কল্লে মহারাজের কীর্ত্তি নিবৃত্তি কীর্ত্তিনাশা ॥
* * *
(ওসব) দেখিয়ে লোকে মনের দুঃখে বলে হায় রে হায়।
কল্লেম কি জন্ম অর্জ্জিত বিত্ত, নদী লইয়া যায় ॥
(অগ্নি) কলরব অসম্ভব
হইল নগরে।
কেহ কোলের ছেলিয়া বিত্ত ফেলিয়া
সরিয়া যাইতে নারে ॥
* * *
ক্ষুদ্র তালুকদাররা বিত্তহারা হ'ল হতজ্ঞান।
বলে জীবনে সাধ কি ভবে, কিসে রবে মান?

কেহ বলে, ভাই, কি হইল রে, এই ছিল কি লেখা।
বুঝি এই রাজ্যে আর কার সঙ্গে না হইবে দেখা।
* * *
লোকে কোথা যাবে কি করিবে হয়ে সশঙ্কিত।
(হায় রে) কিবা দশা কীর্ত্তিনাশা কল্লে আচম্বিত ॥
এমন চমৎকার কীর্ত্তি আর হবে না ভুবনে।
এমন সোনার নগর কীর্ত্তিসাগর পাব কোন স্থানে ॥
* * *
কত দালান পাকা চকমিলান বাকা ভাঙ্গিল বহুতর।
প্রথম কুণ্ডের বাড়ী ভেঙ্গে ধরিলেক সুখসাগর ॥
* * *
সাধের মতিসাগর মুহূর্ত্তেক পর ভাঙ্গিয়া রে ভাই।
দেখ কোথায় গেল রাউতপাড়া আকশার চিহ্ন নাই ॥
নিল রাণীসাগর কৃষ্ণসাগর গুরুধাম আর,
[হায় রে] খালে বিলে এক সমান কি করলে একাকার।
[হায় রে] পুরাণ দীঘি কাল বৈশাখী হইত যার পাড়
নিল সেই মেলা জুরাগেলা লাল বাজার বাহার।
* * *
যখন শত রতন হইল পতন চমৎকার নগরে।
হল কাশীতে যে ভূমিকম্পে পঞ্চ ক্রোশী পরে ॥

যেখানে এইরূপ নদী হইয়াছিল সেখানে আবার মাটী হইয়াছে; সে মাটী লইয়া মামলা মোকদ্দমাও যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু রাজ-বল্লভের কীর্ত্তি আর ফিরিয়া আসে নাই। এই ভাটের গানের সার্থকতাও নষ্ট হয় নাই।

এক সময়ে কোন পরগণায় প্রজা বিদ্রোহ হয়। বাঙ্গলায় ইহা একটা অভাবনীয় ঘটনা নহে, তবে বিদ্রোহটা কিছু বড় আকার ধারণ করে। অনেক পল্লীবীর বংশ-দণ্ডের সাহায্যে জমীদারের লাঠিয়ালকে নাস্তা-নাবুদ করিয়া দেয়, পল্লী-কবি তাঁহার গানে "রাজার সঙ্গে বে-ঐক্যতা চিরদিন রবে না" এই আশ্বাস দিয়া শেষে বলিয়াছেন—

"সব ঘুচে যাবে, কীর্ত্তি রবে এটা যেন খাটি।
নান্নু মিঞার নাম থাকিবে যাবৎ রবে মাটী ॥"

"মাটী" এখনও আছে তবে বিদ্রোহের অন্যতম পরিচালক নান্নু মিঞার নাম আছে কি লোপ পাইয়াছে জানি না। যদি এখনও লোপ না পাইয়া থাকে তবে তাহা সম্ভবতঃ এই পল্লী-কবির কৃপায়।

* অনেকের বিশ্বাস ছিল রাজবল্লভ পূর্ব্ব-জন্মে রাজা জরাসন্ধ ছিলেন।

নারীর প্রাণ

(গল্প)

[শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী]

১

মলিনা নামটাও তাকে মানায় নি, এতই কুরূপা, হত-কুৎসিত সে।

বাঙ্গালীর, বিশেষতঃ ছোট জাতের ঘরে কালোর সংখ্যাই অধিক, কিন্তু কালোতেও একটু শ্রীছাঁদ থাকে তো —পোড়ারমুখী মলিনার তাও ছিল না। যাকে দেখলে দর্শকের মন বিরাগে ভ'রে ওঠে—দৃষ্টি ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে আপনা আপনি ফিরে আসে—এমন কুশ্রী কদাকার চেহারাখানা তার।

শুধু কুরূপাই নয়, মলিনার মত বোকা হাবা মেয়ে সংসারে সচরাচর দেখা যায় না। ভদ্রঘরে এমন মেয়ে হলে তার বিয়ে হওয়া দায় হ'ত, কিন্তু তারা ছোট জাত, অসভ্য, মেয়ে যাচাই বা বর-পণের বালাই তাদের সমাজে ছিল না, তাই মলিনার বিধবা মা এমন কুৎসিত জরদ্গব মেয়েটাকেও ন বছরে গৌরীদান করে তার আইবুড় নাম খণ্ডন করতে পেরেছিল।

তবে বিয়ে হয়েছিল এই পর্য্যন্ত—স্বামীর সঙ্গলাভ মলিনার জীবনে কখনো ঘটে নি। মলিনার যে স্বামী এহেন স্ত্রীরত্ন লাভ করে তার মনের অবস্থা কি রকম হয়েছিল তা অন্তর্য্যামীই বলতে পারেন কিন্তু লোকটার ধৈর্য্য ছিল অসাধারণ, বয়সে অনেকের অনেক দোষ শুধরে যায়, যৌবনে কুরূপাও সুন্দরী হয়—এই অনিশ্চিত আশায় নির্ভর করে বালিকাবধূর যৌবন প্রাপ্তির প্রতীক্ষায় সে বেচারা অনেক দিন ধৈর্য্য ধরে বসেছিল—কিন্তু যৌবনের সম্মোহন শক্তি যখন কুরূপা মলিনার কুৎসিত দেহখানিতে এতটুকু লাবণ্য এতটুকু শ্রী ফোটাতে পারলে না—বয়সে তার জিহ্বা বা বুদ্ধির জড়তা একটুও ঘুচল না, তখন ব্যর্থ-মনোরথ সে, বুদ্ধিমান্ পুরুষের মত অলক্ষ্মী বিদায় করে নূতন বউ ঘরে নিয়ে এল। সে পুরুষ—মেয়ে মানুষ তো নয়—তবে একটা কুৎসিত কিম্ভূতকিমাকার জীবকে নিয়ে সারা জীবন-যৌবন নিষ্ফল করবে কেন?—

সংসার যাকে ত্যাগ করলে ঘৃণা করে—সেই ঘৃণাহতা ভাগ্যবঞ্চিতা মেয়েটীকে বুকে তুলে নিলে মা, অতি যত্নে অতি সন্তর্পণে, পক্ষিমাতা যেমন তার শাবকটীকে জগতের ঝড় ঝঞ্ঝা থেকে বাঁচাতে তার স্নেহ-তপ্ত পক্ষপুটে ঢেকে রাখে, তেমনি করে'।

কিন্তু সর্ব্বহারা অভাগীর ভাগ্যে সেই নিরাপদ স্নেহের নীড়টুকুও ভেঙ্গে গেল—বড় শীঘ্র—বড় অসময়ে।

মলিনার মা অনাথা হয়ে যে ভদ্র গৃহস্থের সংসারে আশ্রয় নিয়েছিল, সেই বাড়ীর গিন্নীর হাতে হাতে ভাগ্যহীনা মেয়েটীকে সমর্পণ করে সে এক দিন চলে গেল সেই দূর বিস্মৃতির দেশে যেখানে গেলে পৃথিবীর সব জিনিসই ভুলে যায়। মলিনার বয়স তখন সবে আটারো। মলিনা তার বিঘ্ন-বিপত্তিতে-আরব্ধ নারী-জীবন আর অবজ্ঞাত অনাহূত ভরা যৌবন নিয়ে মায়ের শূন্য স্থানটী জুড়ে দাসীবৃত্তি করতে লাগল। কিন্তু এর জন্যে তার মনে কোনো ক্ষোভ, কোনো দুঃখই ছিল না। বুদ্ধির অভাবে মেয়েটার মনে সুখ দুঃখের এতটুকু অনুভূতিও তখনো জাগে নি: তখনও তার মনে যৌবনের পুলকস্পন্দন জেগে উঠে নি। যৌবনের রঙিন নেশার মাদকতাও সে জানতে পারে নি।

ঘরে বাইরে পথে ঘাটে কেউ কোনো দিন তার দিকে লুব্ধ মুগ্ধ চক্ষে চায় নি। দৈবাৎ কারো চক্ষু পড়ে গেলে—"মা গো!—কি রূপ!—যেন সেওড়া বনের রাণী" বলে মুখ ফিরিয়ে তাচ্ছিল্য হাসিই হেসেছে।

তবু সে এক রকম ছিল বেশ, নিজের অবস্থায় তুষ্ট হয়ে গিন্নীমার সেবা-সুশ্রূষা করে বাড়ীর পাঁচ জনের ফাই ফরমাস খেটে, তাদের বকুনি আর তুচ্ছ তাচ্ছিল্য মুখ বুজিয়া সয়ে মলিনার দিন গুলো নেহাত মন্দ কাটছিল না।

গিন্নীর মেজমেয়ে সুধারাণীর রূপের বেশ একটু খ্যাতি ছিল। মলিনার নাম শুনে সে এক দিন ভ্রূকুটী তুলে নাক

সিট্‌কে বলেছিল "ম্যাগো! —অমন সুন্দর মিষ্টি নামটাতে একেবারে ঘেন্না ধরিয়ে দিলে মা! - ওকে ও নামে আর কেউ ডাকতে পাবে না। সেই অবধি মলিনার আসল নামটা সিকেয় তোলা রইল। কেউ বলত কালিন্দী; কেউ বলত কাল্‌টি, কেউ বলত অন্ধার-পেত্নী। মলিনা রাগ করত না, যে যা বলে ডাকত তাতেই সাড়া দিত,—কালো পুরু ঠোঁট দু-খানা হাসিতে বিকৃত করে'। পোড়ারমুখীর হাসিতেই কি এতটুকু মাধুর্য্য ছিল, ছাই!

২

জামাই ষষ্ঠী। রায়েদের মেজ জামাই অজিত এসেছে —সেই সুধারাণীর স্বামী। নূতন জামাই আসায় বাড়ীতে বেশ একটু সমারোহ পড়ে গিয়েছিল।

মলিনার আজ আর নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই। সে, চর্‌খির মত, কেবল ঘুরছে। কেবল এটা কর্‌ ওটা আন্‌! বাড়ী সুদ্ধর ফরমাস খাট্‌তে খাট্‌তে বেচারীর একেবারে প্রাণান্ত।

কুটনো-কোটা, বাটনা-বাটা শেষ করে, সে যখন হাত ধুচ্ছিল তখন গিন্নী ডেকে বল্লেন—"ওলো ও কালি! একবার ওপরে গিয়ে দেখে আয় তো—জামাইয়ের জল খাওয়া হ'ল কি না। প্রভাকে জিজ্ঞেস করিস— আর কিছু চাই কি না?"—কালিন্দী ধোয়া হাত দু'খানা আঁচলে মুছতে মুছতে চল্লো গৃহিণীর আদেশ পালন কর্ত্তে। গিন্নির ছোট জা শিবানী তার ম্যাচেতা পড়া কদর্য্য মুখখানার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বল্লেন—"ওকে তো পাঠাচ্ছ, দিদি! কিন্তু তোমার জামাই যদি ওর রূপ দেখে ভিরমি যায়? যা চেহারা ওর!"

জামাইকে আদর করে খাওয়াচ্ছিল সুধার দুই বোন,— বড় প্রভা আর ছোট আভা। মাথার কাপড়টা, একটু বেশী করে টেনে, মলিনা জামাইয়ের দিক্‌ থেকে পাশ কাটিয়ে, ধীরে ধীরে প্রভার কাছে গিয়ে দাঁড়াল;—কিন্তু জামাইয়ের দৃষ্টি এড়াতে সে পারল না।

মলিনার বীভৎস রূপ,—আর হাস্যকর চলন-ভঙ্গী দেখে, অজিত মুখ নীচু করে, হাসি চাপতে চাপতে পার্শ্ববর্ত্তিনী প্রভাকে জিজ্ঞাসা করলে চুপি চুপি—"এ অপরূপ জীবটী কোন্‌ চিড়িয়াখানার আমদানী, দিদি?"

ভগিনীপতির প্রশ্নে প্রভা খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে উঠে, সকৌতুকে বল্লে—"কেন বলো দেখি? কালো কি মানুষ নয়?"

আভারাণী সম্প্রতি বঙ্কিমবাবুর 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পড়েছিল—তাই সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল—"কিন্তু ভ্রমর —গোবিন্দলালের ভোম্‌রা—সেওতো কালোই ছিল জামাই বাবু!"

শ্যালিকার আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য-বোধে চমৎকৃত হয়ে অজিত হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—"হ্যাঁ তা ছিল বটে, কিন্তু ভ্রমর এমন হলে—বেচারা গোবিন্দলালকে যে কোন্‌কালে শুভ-দৃষ্টির সময়েই দেশান্তরী, বিবাগী হতে হত! বাপরে বাপ্‌! এযে একেবারে উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি! যেন ম্যাক্‌বেথের 'উইচ্‌'।"

কথা গুলোর মর্ম্ম সমস্ত না বুঝলেও মলিনা এটুকু বেশ বুঝতে পারলে যে তারই কুদর্শন মূর্ত্তি নিয়ে এদের হাসাহাসি হচ্ছে।

নিজের রূপের ব্যাখান সে অনেকের মুখেই অনেক বার শুনেছে—এর চেয়ে ঢের বেশী। সেজন্য তার মনে কোনো দুঃখ বা বিকার কোনো দিন আসে নি! কিন্তু আজ এই সুশ্রী, তরুণ যুবকের মুখে রূপহীনতার নিষ্ঠুর শ্লেষ-তীক্ষ্ণ সমালোচনাটুকু তার প্রাণে এমন গভীর ভাবে বিঁধে গেল যে, সে আঘাত সামলাতে না পেরে, কালো মুখখানা আরো অন্ধকার করে, বেচারী তক্ষুনি পিছে না চেয়ে হন্‌ হন্‌ করে চলে গেল। ঘরের মধ্যে তরুণ-তরুণীদের বিষম হাসির রোল উঠ্‌ল—সে হাসি না, শান্‌ দেওয়া ছুরীর ফলা?

* * *

দুপুর বেলা যে যার ঘরে বিশ্রাম করছিল। তন্দ্রাবিষ্ট গৃহিণীর পাকাচুল বাছ্‌তে বাছ্‌তে মলিনার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ঐ যাঃ!—পানের ডিবেটা বড় দিদিমণি জামাইবাবুর ঘরে রেখে আস্‌তে বলেছিলেন যে! সে কাজের ভিড়ে ভুলে গেছে। বকুনি খাবার ভয়ে মলিনা উঠল।

বাড়ীর মধ্যে তখন সাড়া শব্দ ছিল না। দুঃসহ প্রখর রবি-কর-তাপে স্তব্ধ নিদাঘ-মধ্যাহ্ন যেন এলিয়ে ঝিমিয়ে পড়েছিল। উঠানের এক পাশে সোঁদাল গাছটা আপাদ-

মস্তক ফুলে ফুলে ছেয়ে গিয়ে দীপ্ত গাঢ় পীত বর্ণের কোলে সোণালী আভায় যেন ঝল্ মল্ ঝল্ মল্ করছিল। তারই কোন্ নিভৃত শাখান্তরাল হতে গ্রীষ্মের উতল উষ্ণ বাতাসে ভেসে আসছিল—একটা সঙ্গীহারা ঘুঘুর বিরহ-খিন্ন প্রাণের আকুল আবেগ-ভরা উদাস করুণ রাগিণী!

পানের ডিবা হাতে নিয়ে মলিনা চুপি চুপি সুধার ঘরের দুয়ারে এসে থমকে দাঁড়াল। ভেজানো দুয়ার ঠেলে হঠাৎ ভেতরে যেতে তার ভরসা হল না। যদি ওরা ঘুমিয়ে থাকে। মলিনার চকিতে মনে পড়ে গেল—তাকে নিয়ে সেই হাসি-পরিহাস, ফিরে যাবে কি না ভাবতে ভাবতে সে অন্যমনে দরজায় হাত দিতেই একটা কপাট একটু আল্‌গা হয়ে গেল। সেই ফাঁকে অতর্কিতে তার চোখে পড়ল এক অভিনব অপূর্ব্ব দৃশ্য—মধুর দৃশ্য—যা এর পূর্ব্বে আর কোনো দিন তার চক্ষে পড়ে নি।

খাটের ওপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় জামাই অজিত আর তার কোলের কাছটীতে তার বুকের ওপর মাথাটী রেখে সুধারাণী—দু-জনেই বাক্যহীন স্বপ্নাবিষ্ট। মোহভরা সরস টল টল অধর দুখানিতে স্বর্গের মধুর হাসি টুকু মেখে তারা নীরবে শুধু চেয়ে ছিল পরস্পরের পানে, আত্মবিস্মৃত বিহ্বল হয়ে। সেই সম্মিলিত নয়নের মৌন-দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছিল—কি গভীর প্রেমের আবেগ, কি মধুর উন্মাদনা—

একটা অজ্ঞাত সুগভীর ব্যথায় মলিনার সমস্ত বুক খানা যেন টন্ টন্ করে উঠল। সে বুঝতে পারলে না এ নূতন অনুভূতি তার কিসের? বুঝতে পারলে না—আজিকার এই অসতর্ক মুহূর্ত্তে তার অন্তরের সুপ্ত নারীত্ব-টুকু কি জানি কোন্ ঐন্দ্রজালিকের মোহন স্পর্শে চেতনা পেয়ে হঠাৎ জেগে উঠেছে—তাই তার নিভৃত গোপন মরমতলে আঠারো বছরের অপরিতৃপ্ত ক্ষুব্ধ ব্যর্থ-যৌবন নিষ্ফলতার নিবিড় ব্যথায় আজ গুমরে গুমরে কেঁদে মরছে —এ কান্নার বুঝি অন্ত নেই!

মলিনা কি করতে এসেছে তা ভুলে গিয়ে সেই দিক্ পানে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল—বিমূঢ়ের মত; তার চোখের পলক আর পড়ে না—এ কি এ—কিসের এ মোহ-ঘোর?

দেখতে দেখতে তার আপাদ-মস্তক তড়িৎস্পৃষ্টের মত শিউরে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে পানের ভারি ডিবেটা ফসকে পড়ল ঝম্ ঝম্ শব্দ করে'। চকিত, ত্রস্ত হয়ে সে একছুটে পালিয়ে গেল—একেবারে নীচে।

* * *

সন্ধ্যাবেলা সুধার ঘরে মলিনা বিছানা করছিল—আর ভাবছিল দুপর বেলাকার সেই ঘটনার কথা। তার সেই অনিচ্ছায় আড়িপেতে দেখা, অভিনব চিত্রের কথা—ভাগ্যে ওরা কেউ জানতে পারে নি!

নূতন জামাইয়ের জন্য ঘর খানা নূতন করে সাজানো হয়েছিল, বৈঠকখানার বড় আয়নাখানা সেখানে শিয়রের দিক্‌কার দেয়ালে টাঙ্গানো ছিল, বালিশ দুটো রাখতে এসে সেই আরসীতে মলিনার ছায়া পড়ল—সে হাতের কাজ স্থগিত রেখে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল সেই প্রতিবিম্বের দিকে—চোখের দৃষ্টিতে কেমন একটা আগ্রহ ও ব্যাকুলতা নিয়ে সেই অতি কুরূপ কুশ্রী দেহখানার কোথায় যদি এত-টুকুও রূপের সন্ধান পায়—কিন্তু হায়রে অভাগী! বৃথা—বৃথা তার এ আশা!

সন্ধ্যার আলো-আঁধারে মুকুরে মুখ দেখে সেই কুৎসিতা মেয়েটী আপনাআপনি শিউরে উঠ্‌ল—তার ব্যথিত মর্ম্মস্থল কম্পিত করে একটা ব্যথা-তপ্ত গাঢ় দীর্ঘশ্বাস আপনা হতেই বেরিয়ে এল, দীর্ঘনিঃশ্বাস সে এর আগেও কত বার ফেলেছে, কিন্তু এমন ব্যথা-বিধুরতা, এত আকুলতা তাতে ছিল না।

নিদারুণ ক্ষোভে, দুঃখে তখন তার ইচ্ছা করছিল সেই কদর্য্য কালো মুখখানা আয়নার কঠিন কাঁচের ওপর থ্যবড়ে আছড়ে একেবারে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে!

৩

"ওরে কাল্‌টি! চট করে একবার বাজারে গিয়ে গোটা কতক মাথার কাঁটা এনে দিবি?—লক্ষ্মীটী! যাবি আর আসবি এই তো কাছেই বাজার—"

সুধার চুল বাঁধতে বসে কাঁটার অকুলন হওয়ায় প্রভা মলিনাকে ডেকে এই ফরমাসটী বেশ একটু মিষ্টি করেই বল্লে।

মলিনার মত কাঁচা বয়সে মেয়েদের হাটে বাজারে একা বেড়ান নিরাপদ নয়, কিন্তু বিধাতা তাকে যে কুৎসিত করে গড়েছেন তাতে পথের পথিকের ফিরে তাকানো দূরের

কথা তাকে আচম্‌কা দেখে লোকে আঁৎকে ওঠে—কাজেই মলিনার গতি হাটে-বাজারে সর্ব্বত্রই অবারিত।

প্রভার ফরমাসে মলিনা একটু কুণ্ঠিত হয়ে বল্লে—"যাচ্ছি দিদিমণি, কিন্তু গিন্নীমা যদি খোঁজ করেন—"

"সে আমি বলে দেব'খন তুই যা এরপর দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।"

রাস্তার মোড়েই যে মণিহারীর দোকান, মলিনা কাঁটা কিনতে সেই দোকানে গিয়ে অবাক্ হয়ে দেখলে একটা নূতন জিনিস যা সে কোন দিন স্বপ্নে দেখার কল্পনাও করে নি।

দোকানী পথচারীদের দৃষ্টি প্রলুব্ধ—আকৃষ্ট করে সামনেই গ্লাসকেসের মধ্যে সাজিয়ে রেখেছিল—একটা বড় সেলুলয়েডের পুতুল। পুতুলটা যেন জীবন্ত হঠাৎ দেখলে সত্যিকার ছেলে বলে ভ্রম হয়।

বিস্মিতা মলিনা ব্যগ্র কৌতূহলে তার কাছে গিয়ে অধীর কণ্ঠে বলে উঠিল—"ও মাগো! কি সুন্দর খোকাটী! একে এমন করে বন্ধ করে রেখেছ কেন ভাই?"

দোকানীর বয়স বেশী নয়—মলিনার অজ্ঞতায় সে হেসে উঠে বল্লে—"ও বুঝি খোকা? আ মরি! নেকা আর কি!"

"তবে কি ওটা?"

"পুতুল সেলুলয়েডের তৈরী, এবার কল্‌কাতায় মাল কিন্‌তে গিয়ে এই পুতুলটা নিয়ে এসেছি দেখি যদি বিক্রী হয় তবে—"

"পুতুল? অবাক্ করলে মা! যে তৈরী করেছে তার কি বুদ্ধি!"

মলিনা গালে হাত দিয়ে অবাক্-বিস্ময়ে দেখতে লাগল। এই পুতুলটার কি সুন্দর হাত-পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রত্যেক রেখাটী পর্য্যন্ত কি সুন্দর সুস্পষ্ট, চোখের চাউনিটুকু পর্য্যন্ত কি সজীব ও স্বাভাবিক!

ছোট ছেলে মলিনা অনেক বার দেখেছে, শুধু দেখাই নয়—কোলে পিঠেও করেছে—কিন্তু সেই মানুষের হাতের গড়া নির্জীব শিশুটাকে দেখে আজ কেন জানি না—তার বুকের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল।

সেই স্পন্দহীন শিশুর বাক্যহীন আহ্বানে—তার নারী-হৃদয়ের কোন গোপনতম প্রদেশে অপরিতৃপ্ত প্রচ্ছন্ন মাতৃত্ব বুঝি আজ জেগে উঠে প্রথম সাড়া দিয়েছিল। তার ইচ্ছা করছিল গ্লাসকেসের কঠিন আবরণ তুলে সেই খোকাটীকে তখুনি কোলে তুলে নেয়। পরম আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে মলিনা তার ময়লা হাত খানা চক্ চকে গ্লাসকেসের ওপর রাখতেই দোকানী ধমক্ দিয়ে উঠল—"এই! কি করছিস? সরে যা ঐ ময়লা নোংরা হাত দিয়ে—"

মলিনা খতমত খেয়ে হাত খানা সরিয়ে নিলে, পুতুলটার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে। তার পর সে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলে,—"এ পুতুল তুমি বেচবে তো?"

"হ্যাঁ বেচবার জন্যেই তো রেখেছি। তুই কিন্‌বি না কি?"

মলিনার হীনবেশ ও আকৃতি দেখে দোকানী হাসতে হাসতে কথাটা টিটকারী দিয়েই বলেছিল। মলিনা তা বুঝতে না পেরে পরম উৎসাহে পুলক-ভরে বল্লে "হাঁ, বড় সুন্দর পুতুলটা! কিন্তু ওর দাম কত?"

"দাম বেশী আর কি? আট টাকা বার আনা!"

দাম শুনে ছুঁড়ীটা কি বলে শোনবার জন্যে দোকানী উৎসুক হয়ে তার শুষ্ক মলিন মুখের দিকে তাকাল—তার দৃষ্টিতে আগ্রহের চেয়ে কৌতূহল ও বিদ্রূপের ভাবই বেশী।

"আট টাকা বারো আনা! চার আনা কম ন' টাকা—উঃ! এ যে বড় বেশী দাম বল্‌ছ—এর কমে যদি—"

"নাঃ, এর এক পয়সাও কম করতে পারব না; আজ কাল এ-সব জিনিস সস্তা হয়ে গেছে তাই নইলে এর ডবল দামে পাওয়া যেত।"

মলিনা আর কিছু বল্‌লে না। একটা রুদ্ধ নিঃশ্বাস নিঃশব্দে ফেল্‌ল; কাতর বুভুক্ষু দৃষ্টিতে সেই সুন্দর খোকা পুতুলটার দিকে চেয়ে সে কাঠ হয়ে কতক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল। সেখানে সে কি করতে এসেছে, কেন এসেছে তা বোধ করি তখন তার মনেও ছিল না।

দোকানীর আহ্বানে সচকিত হয়ে মাথার কাঁটা নিয়ে সে যখন বাড়ী ফিরে গেল তখন সুধার চুল বাঁধা শেষ হয়ে গেছে। এই অযথা কুড়েমি করার জন্যে সুধার দিদি আর মার কাছে মলিনা তিরস্কৃত হয়েছিল বিলক্ষণ, কিন্তু সে তিরস্কারের একটা শব্দও তার মনে বা কানে প্রবেশ করে নি—বাৎসল্য-স্নেহের অনাস্বাদিত মধুর রসে তার অন্তর তখন পরিপূর্ণ।

তারপর সেই পুতুলটাকে দেখতে যাওয়া যেন একটা নেশা হয়ে দাঁড়াল। মলিনা তার কাজ-কর্ম্মের ব্যস্ততার মধ্যেও সর্ব্বক্ষণ ছট্ ফট্ করত—কখন্ বাজারে যাবে, কখন্ সেই খোকাটাকে দেখবে—শুধু একটু চোখের দেখা।

নিত্যকার পান-তরকারী খরিদ করতে সে দিকে যাবার দরকার হত না—কিন্তু মলিনা ইচ্ছা করেই সোজা রাস্তা থেকে ঘুরে গিয়ে সেই পথ দিয়ে আনা-গোনা করত, দোকানের সাম্‌নে অকারণে দাঁড়িয়ে থেকে কতক্ষণ অনিমেষ নয়নে চেয়ে থাকত—সেই গ্লাস-কেসে বন্ধ খোকা পুতুলটার দিকে। মনে হত তার সুন্দর নীলাভ উজ্জ্বল চোখ দুটীতে সে যেন ঠিক মলিনার পানেই চেয়ে আছে। ফুলো ফুলো কচি কচি ছোট্ট হাত দু-খানি মেলে লাল ঠোঁট দু-খানিতে মিষ্টি হাসি হেসে সে যেন মলিনার তৃষিত বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে ব্যগ্র ব্যাকুল হয়ে উঠেছে—আহা বাছারে! তোকে কোলে করবার ভাগ্য কি অভাগী মলিনার হবে কোন দিন?

রোজ সেখানে আসবার সময় মলিনার বুক টিপ্ টিপ্ করত যদি সে পুতুলটাকে আজ না দেখ্‌তে পায়, যদি তাকে কেউ কিনে নিয়ে গিয়ে থাকে—কিন্তু ছোট সহর অত দামী খেলনার খদ্দের সহজে জোটে না—তাই এক দিন দু দিন করে দুটী মাস কেটে গেল পুতুলটা যেখানকার সেই খানেই রইল অমর হয়ে।

মলিনার আনন্দের আর সীমা নেই, তার অনেক দিনের আশা আজ পূর্ণ হবে। দু-মাসের মাইনে আর জল-খাবারের পয়সা গুলো বাঁচিয়ে ন টাকা সে জমা করেছিল—সেই টাকা কটা আঁচলে শক্ত করে বেঁধে, দুপুরের কাঠ-ফাটা রোদ অগ্রাহ্য করে মলিনা বেরিয়ে পড়ল তার কামনার ধন সেই পুতুলটাকে কিনে আনবে বলে। সে তখন আহ্লাদে আটখানা, পা দু-খানা টল মল করছিল পথের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে, সেই সুন্দর খোকা এখন তারি—দাম দিয়ে কিনে নেবে—তাকে বাধা দেবার তো আর কেউ নেই—

কিন্তু দোকানটার কাছে এসেই তার মুখের হাসি নিবে গেল, বুকের ভেতর জোরে ধড়াস্ করে উঠল? একি পুতুল তো সেখানে নেই, গ্লাসকেস যে খালি! এই কাল বিকেলেও তো মলিনা তাকে দেখে গেছে, এরি মধ্যে কে নিয়ে গেল? হতভাগীর সাধে বাদ কে সাধ্‌ল এমন করে?

"কই পুতুল কই? হ্যাঁগা বল না তাকে কোথায় রেখেছ?" আশাহতা মলিনার সেই চকিত ত্রস্ত আর্ত্ত প্রশ্নের উত্তরে দোকানী দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বল্‌লে—"বিক্রী হয়ে গেছে, এদ্দিন পরে, চার গণ্ডা বেশীই পেয়েছি, বড় লোকের আদুরে মেয়ে জেদ ধরে বসল। আহা! বড় আপশোষ হচ্ছে দামটা আরো আট গণ্ডা বাড়িয়ে বল্লুম না কেন?"

"বিক্রী হয়ে গেছে? অ্যাঁ! নিয়ে গেছে তাকে?" আহত, করুণ-কণ্ঠে কথা কয়টী বলে মলিনা তাহার হাহাকার-ভরা বুকখানা দু-হাত দিয়ে চেপে ধরল—তার কুৎসিত কালো মুখখানা ভাসিয়ে দিয়ে চোখের জল হু হু করে নেমে পড়তে লাগল। তার ছেলে মানুষি দেখে দোকানী হেসে উঠল; সে পুরুষ; কেমন করে বুঝবে অভাগীর হতাশ প্রাণে আজ কত বড় আঘাত লেগেছে।

খায় দায় কাজ করে, বাড়ীসুদ্ধ লোকের ফাইফরমাস খাটে মলিনা; ঠিক কলের পুতুলের মত। তার অন্তরে যে কোথায় একটা বিপ্লব বেধেছে বাড়ীর কেউ তা জানত না। কেবল গিন্নী এক একবার তার শুক্‌নো মুখের দিকে চেয়ে, জিজ্ঞাসা করেন—"হ্যাঁরে কালিন্দী! তুই আজ কাল এমন মন-মরা হয়ে থাকিস্ কেন বল দেখি?"

কালিন্দী উত্তর দেয় না; একটু খানি হেসে মুখ নামিয়ে নেয় শুধু।

সে পথ দিয়ে মলিনা আর সহজে হাঁটে না দোকানটা দেখলেই তার বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠে। সেই গ্লাসকেসটা এখনো সেইখানেই রাখা আছে অন্য সব খেলনা আর সৌখীন জিনিসে ভর্ত্তি হয়ে—কিন্তু তার বুকের শূন্যতা সে পূর্ণ করবে এখন কি দিয়ে?

*　　*　　*　　*

শাকশব্জীর চুবড়ীটা হাতে নিয়ে মলিনা সকালবেলা যাচ্ছিল বাজারের পথ ধরে। এক জায়গায় দেখতে পেলে ঠিক পথের প্রায় মাঝখানে বসে একটী ছোট্ট ছেলে হাত পা নেড়ে ধূলোর উপর খেলা করছে। দিব্যি নাদুস নুদুস্ ছেলেটী, মাস দশেকের হবে, ছোট দুটী হাতের মুঠিতে ধূলো ভরে সে নিজের আদুল গায়ে ছড়াচ্ছিল—আর ফিক

ফিক্ করে হাসছিল আপন মনে—কি জানি কোন্ অসাবধানী মায়ের বাছা সে!

ছেলেটাকে দেখেই মলিনার প্রাণের ভেতর যেন কেমন করে উঠল, এ যেন সেই খোকা পুতুলটারই জীবন্ত প্রতিরূপ,—কেবল তার রং ফরসা এবং শ্যাম-চোখ দুটীও তার মত স্বচ্ছ নীল নয়, ঘন কালো।

মলিনার বড় লোভ হল ছেলেটাকে একবার কোলে নিয়ে আদর করে পথের ধারে বসিয়ে যায়—মাঝ পথে গাড়ী ঘোড়ার ভিড়—মায়ের অসতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে শিশুটী কি জানি কখন কেমন করে সেখানে চলে এসেছে—উদ্বেগ ও আগ্রহভরে মলিনা তার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল—এমন সময় দ্রুত-ধাবমান ভাড়াটে গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দে চকিত হয়ে সে থমকে দাঁড়াল। গাড়ীখানা খালি—দুষ্ট ঘোড়াটা রাশ ছিঁড়ে হাওয়ার মত ছুটে আসছিল সেই দিকে, গাড়োয়ান প্রাণপণ চেষ্টা করেও তার অসংযত ক্ষিপ্র-গতি সামলে রাখতে পারছে না। ঐ এল, ঐ এল, ঐ বুঝি সে গাড়ীশুদ্ধ ছেলেটার ঘাড়ে এসে পড়ে—আহা হা হা! বোকা ছেলে সর্ সর্! পালা পালা!

বোকা ছেলের কিন্তু সরবার শক্তি বা বোঝবার শক্তিও ছিল না—লোক জনের গোলমাল আর ঘোড়া-গাড়ীর ছুটো-ছুটি দেখে সে হাত পা নেড়ে ঝাঁপাই ঝুড়ে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল—যেন ভারি একটা তামাসা হয়েছে।

বাঁচাবার সময় আর রইল না, চোখের নিমিষে ঘোড়াটা লাফাতে লাফাতে তার কাছে, খুব কাছে এসে পড়ল—এই গেল গেল গেল—আর রক্ষে নেই সর্ব্বনাশ!

পথের পথিকেরা আতঙ্কে হায়! হায়! করে উঠল। কিন্তু নিজের জীবন বিপন্ন করে সেই শিশুটীকে নিশ্চিত মৃত্যুর গ্রাস হতে ছিনিয়ে নেবে, এমন সাহস বা প্রবৃত্তি কারুর হল না। ঘোড়াটা তার বুকের ওপর এসে পড়ে ঠিক সেই সময় একটা তীব্র করুণ আর্ত্তনাদ করে মলিনা চখের নিমেষে পাগলিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল—উদ্যত মৃত্যুর কবলে। ছেলেটাকে একবার বুকে তুলেই সে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে পথের ওধারে যেখানে জন কতক পথিক ভিড় করে দাঁড়িয়ে শুধু হায়! হায়! করছিল—তাদের মধ্যে এক জন বুদ্ধি করে হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে বুকে নিলে—তার দেহ অক্ষত, একটা আঁচড় পর্য্যন্ত লাগে নি কিন্তু—

ক্ষিপ্ত অশ্ব উপস্থিত জনতা ও গাড়োয়ানের আর্ত্ত-চীৎকারে ভ্রূক্ষেপ না করে গাড়ীখানা হিড় হিড় করে টেনে বিদ্যুদ্-গতিতে প্রলয়ের ঝড়ের মত যখন চলে গেল, তখন জনতা স্তম্ভিত হয়ে দেখলে পথের ধূলায় রক্তাক্ত কলেবরে নিঃসাড়ে পড়ে আছে একটা কুৎসিতা তরুণী—তার কুদর্শন মুখখানা অসহনীয় মৃত্যু-যাতনায় আরো ভয়ানক বীভৎস হয়ে উঠেছে—সেই মরণাহতার শুশ্রূষার জন্য কেউ অগ্রসর হল না, দূর থেকেই কেউ বল্লে, "হাঁসপাতালে নিয়ে গেলে হয় না?" কেউ বল্লে, "মড়াকে আর হাঁসপাতালে নিয়ে গিয়ে কি হবে?" "গাড়ীর চাকায় বুকখানা যে একবারে থেঁতলে গেছে—" কেউ বা একটা সহানুভূতির নিঃশ্বাস ফেলে বল্লে "ছুঁড়ীর কিন্তু যেমনি রূপ তেমনি কি বুদ্ধি! কোথাকার কে, কার ছেলে তার ঠিক নেই—তারি জন্যে খামখাই প্রাণটা দিলে!"

মলিনার কাণে তখন কোন শব্দই যাচ্ছিল না, তার চোখে বিশ্বের সমস্ত আলো নিবে যাচ্ছে। জীবনে সে আদর, দরদ, প্রীতি জগতের কাছে পায় নি—মরণেও পেলে না। কেউ জানলে না, কেউ বুঝলে না—সেই মৃত্যুপথ-যাত্রী নারীর কুৎসিত কাল বুকের তলে গোপন ছিল কি সুন্দর, চিরপিপাসিত—নারীর-প্রাণ।

আলোচনা

বলরাম দাসের 'তথা-কথিত' একটী পদ

শ্রীযুক্ত গৌরমোহন মিত্র মহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে,—"রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন 'গোবিন্দ দাসের কড়চা'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—'৩৭৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ কবি বলরাম দাস তাঁহার এক পদে গোবিন্দকে সঙ্গে লইয়া যে চৈতন্য দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন তাহা অতি স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন।' এটী কি বলরাম দাসের পদ?"

মিত্র মহাশয়ের এই প্রশ্ন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বিবৃত করিতেছি।

দীনেশ বাবু যে পদটীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন উহা মহাপ্রভুর নিত্যানন্দকে নামপ্রচারের জন্য গৌড়দেশে পাঠাইবার পদ। এই পদটী জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের সঙ্কলিত "গৌরপদ-তরঙ্গিণী" গ্রন্থে আছে, অপর কোথায়ও দেখিতে পাই নাই।

গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে এই সম্বন্ধে বলরাম দাসের ভণিতাযুক্ত দুইটী পদ আছে। প্রথম পদটী এই :—

"প্রভু কহে নিতানন্দ সব জীব হৈল অন্ধ
কেহ ত না পাইল হরিনাম।
এক নিবেদন তোরে নয়নে দেখিবে যারে
কৃপা করি লওয়াইবে নাম॥
কৃতপাপী দুরাচার নিন্দুক পাষণ্ডি আর
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয় জীবে যেন নাহি হয়
সুখে যেন হরিনাম লয়॥
কুমতি তার্কিক জন পড়ুয়া অধমগণ
জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ।
কৃষ্ণপ্রেম দান করি বালক পুরুষ নারী
খণ্ডাইহ সবাকার দুঃখ॥
সংকীর্ত্তন প্রেমরসে ভাসাইয়া গৌড়দেশে
পূর্ণ কর সবাকার আশ।
হেন কৃপা-অবতারে উদ্ধার নহিল যারে
কি করিবে বলরাম দাস॥'

আর যে পদটীতে গোবিন্দকে সঙ্গে লইয়া দাক্ষিণাত্যে যাইবার কথা আছে, সেটী এই :—

[illegible] নিতাই পাঞা হাতে ধরি বসাইয়া
মধুর কথা কন ধীরে ধীরে।
জীবেরে সদয় হৈয়া হরিনাম লওয়াও গিয়া
যাও নিতাই সুরধুনী তীরে॥
নাম প্রেম বিতরিতে অদ্বৈতের হুঙ্কারেতে
অবতীর্ণ হইনু ধরায়।
তারিতে কলির জীব করিতে তাদের শিব
তুমি মোর প্রধান সহায়॥
নীলাচল উদ্ধারিয়া গোবিন্দেরে সঙ্গে লৈয়া
দক্ষিণ দেশেতে যাব আমি।
শ্রীগৌড়মণ্ডল ভার করিতে নাম-প্রচার
ত্বরা নিতাই যাও তথা তুমি॥
মো হৈতে না হবে যাহা তুমি ত পারিবে তাহা
প্রেমদাতা পরমদয়াল।
বলরাম কহে পহুঁ দোঁহার সমান দুহুঁ
তার মোরে আমি ত কাঙ্গাল॥"

"পদকল্পতরু" গ্রন্থেও এই সম্বন্ধে দুইটী পদ আছে, একটী "গৌরপদ-তরঙ্গিণী"র প্রথম পদের অনুরূপ, এবং বলরাম দাসের ভণিতাযুক্ত। অপর পদটীতে দুই চরণ বা চারি ছত্র আছে, এবং "গৌরপদ-তরঙ্গিণীর" দ্বিতীয় পদের প্রথম চারি ছত্রের অনুরূপ, কিন্তু ইহাতে কোন কবির ভণিতা নাই। ভণিতা নাই বলিয়াই মনে হয় ইহা কোন পদের অংশ-বিশেষ। এখন দেখিতে হইবে ইহা "গৌরপদ-তরঙ্গিণী"র দ্বিতীয় পদের কিংবা অন্য কোন পদের অংশ।

"পদকল্পতরু"তে প্রকাশিত পদদ্বয় পাঠ করিলেই ধারণা হইবে যে উহা এক জন উচ্চদরের ভক্ত-কবি রচিত। সুতরাং প্রথমটী যখন বলরাম দাসের ভণিতাযুক্ত, তখন দ্বিতীয়টীও তাঁহারই রচিত হওয়াই সম্ভব।

বলরামদাস মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ভক্তের মুখে শুনিয়া কিংবা কোন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তিনি যে উক্ত পদ রচনা করিয়াছেন তাহাতে দ্বিমত হইতে পারে না। কিন্তু কোনও ভক্তের নিকট শুনিয়া যে তিনি এই পদ রচনা করিয়াছেন তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ প্রাচীন গ্রন্থগুলির মধ্যে এক মাত্র মুরারি গুপ্তের "চৈতন্য-চরিতামৃতম্" বা কড়চায় নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে জীবোদ্ধারের জন্য পাঠাইবার কথা আছে। যথা,—

"নিত্যানন্দং সমালিঙ্গ্য ধৃত্বা তস্য করদ্বয়ম্।
প্রাহ সগদ্গদং যাহি গৌড়দেশং ত্বমীশ্বরঃ॥
তব দেহং বিজানীহি বিশ্বাসভরণং মম।
এতজ্ জ্ঞাত্বা যথেচ্ছং ত্বং কর্ত্তুমর্হসি হি প্রভো॥
মূর্খনীচজড়াদ্ধাখ্যা যে চ পাতকিনোঽপরে।
তানেব সর্ব্বথা সর্ব্বান্ কুরু প্রেমাধিকারিণঃ॥

তমিতি প্রহসন প্রাহ নর্ত্তকোঽহং তব প্রভো।
করিষ্যামি যথাজ্ঞা তে যতত্ত্বং সূত্রধারকঃ ॥"

অর্থাৎ মুরারি গুপ্ত বলিতেছেন যে, মহাপ্রভু নিত্যানন্দের হাত দুই খানি ধরিলেন, তাহার পর গদগদভাবে তাঁহাকে গৌড়দেশে গিয়া জীবোদ্ধার করিতে বলিলেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে। শ্রীবৃন্দাবন দাস তাঁহার চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"এক দিন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর-নরহরি।
নিভৃতে বসিলা নিত্যানন্দে সঙ্গে করি ॥
প্রভু বোলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি ॥
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি আপনার মুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্রে ভাসাব প্রেমসুখে ॥
তুমিও থাকিলে যদি মুনি ধর্ম্ম করি।
আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি ॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার ॥
ভক্তিরস-দাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার বা কি নিমিত্ত করিলে ॥
এতেক আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও ॥
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সভারে মোচন ॥
আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দচন্দ্র ততক্ষণে।
চলিলেন গৌড়দেশে লয়ে নিজগণে ॥"

"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থেও কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"এক দিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ লঞা।
দুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া ॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত বোলাইয়া।
গৌড়দেশে যাহ সবে বিদায় করিল। ॥
আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিলা করিয়া সম্মান।
আচণ্ডালাদি করিহ কৃষ্ণভক্তি দান ॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলা যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে ॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থদ্বয়েও দেখিতেছি মহাপ্রভু এক দিন নিত্যানন্দকে লইয়া নিভৃতে বসিলেন, তাহার পরে তাঁহাকে গৌড়দেশে যাইয়া নাম প্রচার করিবার কথা উঠাইলেন। বলরাম দাসও সেইরূপ প্রথমে—

"বিরলে নিতাই পাঞা হাতে ধরি বসাইয়া
মধুর কথা কন ধীরে ধীরে।"

এই কথা বলিয়া তাহার পর বলিলেন—

"জীবেরে সদয় হৈয়া হরিনাম লওয়াও গিয়া
যাও নিতাই সুরধুনী-তীরে ॥"

এই দুইটী চরণ মুরারি গুপ্তের

"নিত্যানন্দং সমালিঙ্গ্য ধৃত্বা তস্য করদ্বয়ম্।
প্রাহ স গদ্গদং যাহি গৌড়দেশং ত্বমীশ্বরঃ ॥"

এই প্রথম চরণদ্বয়ের অনুবাদ মাত্র।

তাহার পর, মহাপ্রভু বলিতেছেন, যথা মুরারি গুপ্তের কড়চা—

"মূর্খনীচজড়ান্ধাণ্যা যে চ পাতকিনোঽপরে।
তানেব সর্ব্বথা সর্ব্বান্ কুরু প্রেমাধিকারিণঃ ॥"

আর বলরাম দাস লিখিলেন—

"প্রভু কহে নিত্যানন্দ সব জীব হৈল অন্ধ
কেহ ত না পাইল হরিনাম।
এক নিবেদন তোরে নয়ানে দেখিবে যারে
কৃপা করি লওয়াইবে নাম ॥
কৃতপাপী দুরাচার নিন্দুক পাষণ্ডি আর
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয় জীবে যেন নাহি হয়
সুখে যেন হরিনাম লয় ॥
কুমতি তার্কিক জন পড়ুয়া অধমগণ
জন্মে জন্মে ভকতি-বিমুখ।
কৃষ্ণপ্রেম দান করি বালক পুরুষ নারী
খণ্ডাইহ সবাকার দুঃখ ॥"

সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রথমে "বিরলে নিতাই পাঞা, হাতে ধরি বসাইয়া, মধুর কথা কন ধীরে ধীরে" ইত্যাদি চরণদ্বয়ের পরে "প্রভু কহে নিত্যানন্দ, সব জীব হৈল অন্ধ" ইত্যাদি চরণগুলি বসাইলে উক্ত পদটী মুরারি গুপ্তের কড়চার অনুরূপ এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। মহাত্মা শিশির কুমারও তাঁহার "অমিয় নিমাই চরিত" গ্রন্থে ঐভাবেই এই পদটী দিয়াছেন।

এখন কথা হইতেছে "গৌরপদ তরঙ্গিণী"র দ্বিতীয় পদের "নাম প্রেম বিতরিতে, অদ্বৈতের হুঙ্কারেতে, অবতীর্ণ হইনু ধরায়" ইত্যাদি শেষ চরণগুলি কোথা হইতে আসিল? মুরারির কড়চায় বা অপর কোন গ্রন্থে এই ভাবের কোন কথা নাই। তবে কি ইহা বলরাম দাসের স্বকপোল-কল্পিত? কিন্তু তাঁহার ন্যায় উচ্চদরের ভক্ত-কবির পক্ষে এরূপ রচনা করা অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। কেন তাহা বলিতেছি।

বলরাম দাসের কবিতা যাঁহারা মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, ইহার ভাষা সুললিত, ভাব সুমধুর, ছন্দ প্রাঞ্জল ও স্বাভাবিক, পাঠের সময় কোথায়ও খোঁচ-খাজ পাওয়া যায় না, আর অর্থও অতি সরল ও মর্ম্মস্পর্শী। কিন্তু দ্বিতীয় পদের শেষ চরণগুলির

ভাব ও ভাষা অন্যান্য চরণের অনুরূপ নহে, ইহার ছন্দ অপর অংশের সহিত সমভাবে রক্ষিত হয় নাই, অর্থও পরিষ্কার নহে। অধিকন্তু এই শেষোক্ত চরণগুলি অপ্রসিদ্ধ শব্দ প্রয়োগ-দোষে দুষ্ট। "করিতে তাদের শিব" ইত্যাদি ভাবের কথা কোন বৈষ্ণব কবি লিখিতে পারেন না। ইহা যে কোন কাঁচা কবির কষ্টসাধ্য রচনা তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। দ্বিজ বলরাম দাসের ন্যায় খ্যাতনামা ভক্ত-কবির স্কন্ধে এইরূপ বালকোচিত রচনা চাপাইলে তাঁহার প্রতি অন্যায় করা হয়।

আর একটী কথা। উল্লিখিত রচনার মধ্যে আছে—

নীলাচল উদ্ধারিয়া　　　　গোবিন্দেরে সঙ্গে লৈয়া
দক্ষিণ দেশেতে আমি যাব।"

এই চরণটী পাঠ করিলে মনে হয় মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে যাইবার পূর্ব্বে নিত্যানন্দকে নাম প্রচারার্থে গৌড়দেশে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু এই কথার প্রমাণ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। নীলাচল হইতে দক্ষিণ দেশে যাইবার পূর্ব্বে মহাপ্রভু তাঁহার গমনেচ্ছা নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে জানাইয়াছিলেন, এই কথা চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে আছে। কিন্তু সে সময় নিত্যানন্দকে নাম-প্রচারের জন্য যে গৌড়দেশে পাঠাইয়াছিলেন ইহা কোথায়ও নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে, মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর প্রথমবার যখন গৌড়ের ভক্তগণ নীলাচলে আসেন, তখন নিত্যানন্দ সেখানে ছিলেন। কয়েক মাস পরে তাঁহারা দেশে ফিরিয়া যান। নিত্যানন্দও সেই সঙ্গে গৌড়দেশে গিয়াছিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে—

"এইমত রাসযাত্রা আর দীপাবলী।
উত্থান দ্বাদশী যাত্রা দেখিলা সকলি॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত বোলাইয়া।
গৌড়দেশে যাহ সবে বিদায় করিলা॥

এই সময়

"আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিলা করিয়া সম্মান।
আচণ্ডালাদি করিহ কৃষ্ণভক্তি দান॥"

তাহার পরে

"নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলা যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল কৃষ্ণভক্তি করিহ প্রকাশে॥"

কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থ অনুসারে মহাপ্রভুর আজ্ঞা পাইয়া এই প্রথমে নিত্যানন্দ নামপ্রচারার্থ সপরিকর গৌড়দেশে গমন করিলেন। কিন্তু মুরারি গুপ্তের কড়চানুসারে মহাপ্রভু মথুরা মণ্ডল হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমনের পর নিত্যানন্দকে গৌড়ে পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থকারও এই সম্বন্ধে মুরারি গুপ্তের পদানুসরণ করিয়াছেন।

আজ কাল কেহ কেহ জয়ানন্দের "চৈতন্যমঙ্গল" গ্রন্থকে ঐতিহাসিক হিসাবে উচ্চ পদ প্রদান করেন। এই জয়ানন্দও মুরারি গুপ্তের কথার পোষকতা করিতেছেন। অর্থাৎ মহাপ্রভুকে মথুরা মণ্ডল হইতে আনিয়া জয়ানন্দ তাঁহার "তীর্থখণ্ড" শেষ করিয়াছেন। তাহার পর "বিজয় খণ্ড" আরম্ভ করিয়া উহার একস্থলে লিখিয়াছেন—

"এক দিন চৈতন্য গোসাঞি নীলাচলে।
কৃষ্ণকথা কহিতে ভাসিলা প্রেমজলে॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি তোমার গৌড়দেশ।
আজি হৈতে ছাড়াবোঞি অবধূত বেশ॥
তাহার পর......গৌড়দেশে যাইলা ঠাকুর নিত্যানন্দ।"

মুরারি গুপ্ত, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, এমন কি 'শ্রেষ্ঠ' কবি জয়ানন্দও মহাপ্রভুর দক্ষিণ দেশে যাইবার পূর্ব্বে নিত্যানন্দকে নাম প্রচারার্থ গৌড়দেশে পাঠাইবার কথা বলেন নাই। অপর কোন গ্রন্থে এই কথার আদপে কোন উল্লেখও নাই। তবে কবি কর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে আছে মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে পুরীতে ফিরিয়া আসিয়া নিত্যানন্দকে দেখিতে পাইলেন না। তখন মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মুকুন্দ! ময়ি দক্ষিণস্যাং দিশি গতে সতি শ্রীপাদ-নিত্যানন্দেন ক গতম্?" মুকুন্দ বলিলেন,—"গৌড়ে, উক্তং চেদং ভগবদাগমনসময়মনুমায় পুনঃ সর্ব্বৈরদ্বৈতপ্রমুখৈঃ সহ ময়াত্রাগন্তব্যমিতি।"

কবি কর্ণপূরের নাটকের মর্ম্মানুবাদ প্রেমদাস তাঁহার "চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী" গ্রন্থে এইরূপ করিয়াছেন—

"শ্রীচৈতন্য হেথা পুনঃ কহে মুকুন্দেরে।
আমি যবে গেনু তীর্থ দেখিবার তরে॥
নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গেলেন কোন স্থলে॥
মুকুন্দ বলেন তিঁহো গৌড়দেশে গেলা।
যাত্রাকালে এই কথা আমারে কহিলা॥
ভগবান্ নীলাচলে আসিব যখন।
অনুমানে আমি তাহা জানিঞা তখন॥
অদ্বৈতাদি করিয়া যতেক ভক্তগণ।
সভা সঙ্গে হেথা পুনঃ করিবা গমন॥"

সুতরাং কবি কর্ণপুর ও প্রেমদাসের মতে মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশে গমন করিবার পর নিত্যানন্দ গৌড়দেশে গমন করিলেও, মহাপ্রভুর অজ্ঞাতসারে যে তিনি গিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন।

যাহা হউক বলরাম দাস যে মুরারি গুপ্তের কড়চা অবলম্বন করিয়াই তাঁহার পদ রচনা করিয়াছেন তাহা উপরে দেখাইয়াছি; সুতরাং দক্ষিণ দেশে যাইবার পূর্ব্বে যে মহাপ্রভু নাম প্রচারার্থ নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে পাঠাইয়াছিলেন, এই কথা বলরাম দাসের রচিত পদে কি করিয়া আসিল, ইহা এক বিষম সমস্যা। স্বর্গীয় জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। সেই সময় গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে প্রকাশিত পদগুলি তাঁহাকে সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। কাজেই নানা স্থানে পত্র লিখিয়া কিংবা অবসর পাইলে স্বয়ং গিয়া ইহা সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। এইরূপে দেড় হাজার পদ সংগৃহীত হয়। এই সমস্ত পদ ভাল করিয়া

দেখিবার সময় বোধ হয় তাঁহার ছিল না। যদি পদগুলি করিয়া পরীক্ষা করিবার সময় পাইতেন, কিংবা কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা পরীক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিতেন, তাহা হইলে এরূপ মারাত্মক ভুল হইত না বলিয়া আমার বিশ্বাস। মহাত্মা শিশিরকুমার এক খানি "গৌরপদ-তরঙ্গিণী"তে এইরূপ ভ্রমাত্মক কয়েকটী পদে দাগ দিয়া রাখিয়াছেন। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে ভুলগুলি সংশোধিত হইবে।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ

দেবতামীমাংসা

পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা যে একই মীমাংসা শাস্ত্রের দুইটি অংশ মাত্র—উহারা যে পৃথক্ শাস্ত্র নহে,—তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত আচার্য্য রামানুজ শ্রীভাষ্যের প্রথমেই (বোম্বাই সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্রন্থমালা—শ্রীভাষ্য, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২) ভগবান্ বৃত্তিকারের মত উদ্ধার করিয়াছেন—"সংহিতমেতচ্ছারীরকং জৈমিনীয়েন ষোড়শলক্ষণেনেতি শাস্ত্রৈকত্বসিদ্ধিরিতি।" গোলমাল বাধিয়াছে এই "জৈমিনীয়েন ষোড়শলক্ষণেন" কথাটি লইয়া।

(ক) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় তাঁহার শ্রীভাষ্যের সংস্করণে (পৃঃ ৭, পাদটীকা) বলিয়াছেন যে, জৈমিনিকৃত কর্ম্মমীমাংসার দ্বাদশ অধ্যায় ও বাদরায়ণ-কৃত ব্রহ্মমীমাংসার চারি অধ্যায় মিলিয়া একত্রে ষোড়শ অধ্যায় হইয়াছে। এরূপ ব্যাখ্যায় নিম্নলিখিত দোষগুলি ঘটিতে পারে—

(১) এইরূপ ঐকশাস্ত্র্যসিদ্ধিতে মোট ষোড়শলক্ষণ পাওয়া গেলেও উহাকে "জৈমিনীয় ষোড়শলক্ষণ" বলা যাইতে পারে না। কারণ, এই ষোড়শলক্ষণের মধ্যে দ্বাদশলক্ষণমাত্র জৈমিনিকৃত।

(২) বৃত্তিকারের উদ্ধৃত বাক্যটি দেখিলেই মনে হয় যে, "জৈমিনীয় ষোড়শলক্ষণ" "শারীরক" (চতুর্লক্ষণ) হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ গ্রন্থ। অতএব উভয়ে মিলিয়া মোট (ষোড়শলক্ষণ না হইয়া) "বিংশতিলক্ষণ" হওয়া উচিত।

(৩) এস্থলে পূর্ব্বোত্তরমীমাংসার ঐকশাস্ত্র্য-প্রতিজ্ঞা সাধ্য। "জৈমিনীয় ষোড়শলক্ষণ" কথাটির পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা করিলে সাধ্য প্রতিজ্ঞাকে সিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় (Begging the question)।

(খ) পণ্ডিতপ্রবর বাসুদেব শাস্ত্রী অভ্যঙ্কর লিখিয়াছেন (বোম্বাই সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্রন্থমালা–শ্রীভাষ্য, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫) যে, "যদ্যপি জৈমিনীয়ং দ্বাদশলক্ষণং তথাপ্যধ্যায়চতুষ্টয়াত্মকেন সঙ্কর্ষকাণ্ডেন সহ ষোড়শলক্ষণত্বং বোধ্যম্"—অর্থাৎ, যদিও জৈমিনীয় কর্ম্মমীমাংসা দ্বাদশাধ্যায় পরিমিত, তথাপি চতুরধ্যায়াত্মক "সঙ্কর্ষকাণ্ডের" সহিত যোগ করিলে উহাকে ষোড়শলক্ষণ গ্রন্থ বলা যাইতে পারে।

কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ও একটু চালাকী করিয়াছেন। সঙ্কর্ষকাণ্ড কাহার কৃত, উল্লেখ করেন নাই। আমাদের বর্ত্তমান বিচার এই "সঙ্কর্ষকাণ্ড" লইয়া।

কাশীর "পণ্ডিত" পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া খ্রীষ্টীয় ১৮৯৪ অব্দে "সঙ্কর্ষকাণ্ডম্" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার ভূমিকায় সৎসম্প্রদায়াচার্য্য পণ্ডিতস্বামী শ্রীরামমিশ্রশাস্ত্রী লিখিয়াছেন যে, 'সঙ্কীর্ণার্থনিরূপণপর' বলিয়া গ্রন্থখানির নাম সঙ্কর্ষ-(সঙ্কর্ষণ)-কাণ্ড। এবিষয়ে প্রচলিত মতের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, জৈমিনিকৃত ষোড়শাধ্যায়ী ধর্ম্মমীমাংসার শেষ চারি অধ্যায় সঙ্কর্ষ (পরিশিষ্ট) কাণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রমাণস্বরূপ তিনি সঙ্কর্ষকাণ্ডের টীকাকার ভাস্করভট্টের নিম্নলিখিত তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

> "খণ্ডদেবকৃতভাট্টদীপিকা লক্ষণৈঃ কতিপয়ৈরসম্ভৃতা।
> ইত্যুদীক্ষ্য বুধভাস্করস্থিচিন্তয়াৎসৌ বরিতরাম্বভূব তাম্॥
> অদ্যাবধি কৃতিরেষান্তস্ত্রবিহীনেতি দীপিকাখ্যাসীৎ।
> ষোড়শকলাভিরধুনা পরিপূর্ণা ভাট্টচন্দ্রিকাত্বমগাৎ॥
> আসীৎ ষোড়শলক্ষণী শ্রুতিপদা যা ধর্ম্মমীমাংসিকা
> সঙ্কর্ষাখ্যচতুর্থভাগবিধুরা কালেন সাজায়ত।
> গায়ত্রী ত্রিপদাত্মিকেব বিবুধৈরদ্যাপি পাপঠ্যতে
> তাং পূর্ণামকরোচ্ছ্রমেণ মহতা গম্ভীরজো ভাস্করঃ॥

ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—

"খণ্ডদেব"-কৃত "ভাট্টদীপিকা" কতিপয় অধ্যায়ে অসম্পূর্ণ (অনারব্ধ) দেখিয়া পণ্ডিত ভাস্কর তাহা পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি এই গ্রন্থ আদ্যন্তবিহীন বলিয়া "দীপিকা" (ছোট দীপ) নামে প্রসিদ্ধ ছিল; অধুনা ষোড়শ কলায় পূর্ণ হইয়া উহা "ভাট্টচন্দ্রিকাত্ব" প্রাপ্ত হইল।

ষোড়শাধ্যায়ী শ্রুতিমূলা ধর্ম্মমীমাংসা কালক্রমে সঙ্কর্ষনামক চতুর্থ-ভাগবিহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। (এই ত্রিভাগবিশিষ্ট মীমাংসা) ত্রিপদা গায়ত্রীর মতই অদ্যাপি পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ পঠিত হইয়া থাকে; গম্ভীরের পুত্র ভাস্কর তাহা বহুশ্রমে পরিপূর্ণ করিলেন।

এই ভাট্টচন্দ্রিকাই সঙ্কর্ষকাণ্ডের একমাত্র উপলভ্যমান ব্যাখ্যা। শবরস্বামিকৃত সঙ্কর্ষব্যাখ্যানের দুই একটি বাক্য উদ্ধাররূপে গ্রন্থান্তরে দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহা হইতে সঙ্কর্ষকাণ্ড কাহার রচিত, তাহা স্থির করিবার কোন উপায়ই নাই। অতএব ভাস্করের বাক্যে বিশ্বাস করিতে হইলে সঙ্কর্ষকাণ্ড জৈমিনিকৃত বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। আর ইহাতে "জৈমিনীয় ষোড়শলক্ষণ" কথাটির সার্থকতাও বেশ রক্ষিত হইয়া থাকে।

কিন্তু আমাদের মনে হয় বৃত্তিকারের উদ্দেশ্য আরও নিগূঢ়। আসলে সঙ্কর্ষকাণ্ড জৈমিনিরচিতই নহে। কারণ;—(১) সঙ্কর্ষকাণ্ডের সূত্রনির্ম্মাণপ্রণালী জৈমিনি বা বাদরায়ণের সূত্ররচনারীতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র (ইহা অবশ্য খুব সুদৃঢ় যুক্তি নহে; বিশেষতঃ, কেহ কেহ সন্দেহ

পারের বোঝা

শিল্পী—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রকৃষ্ণ রায়
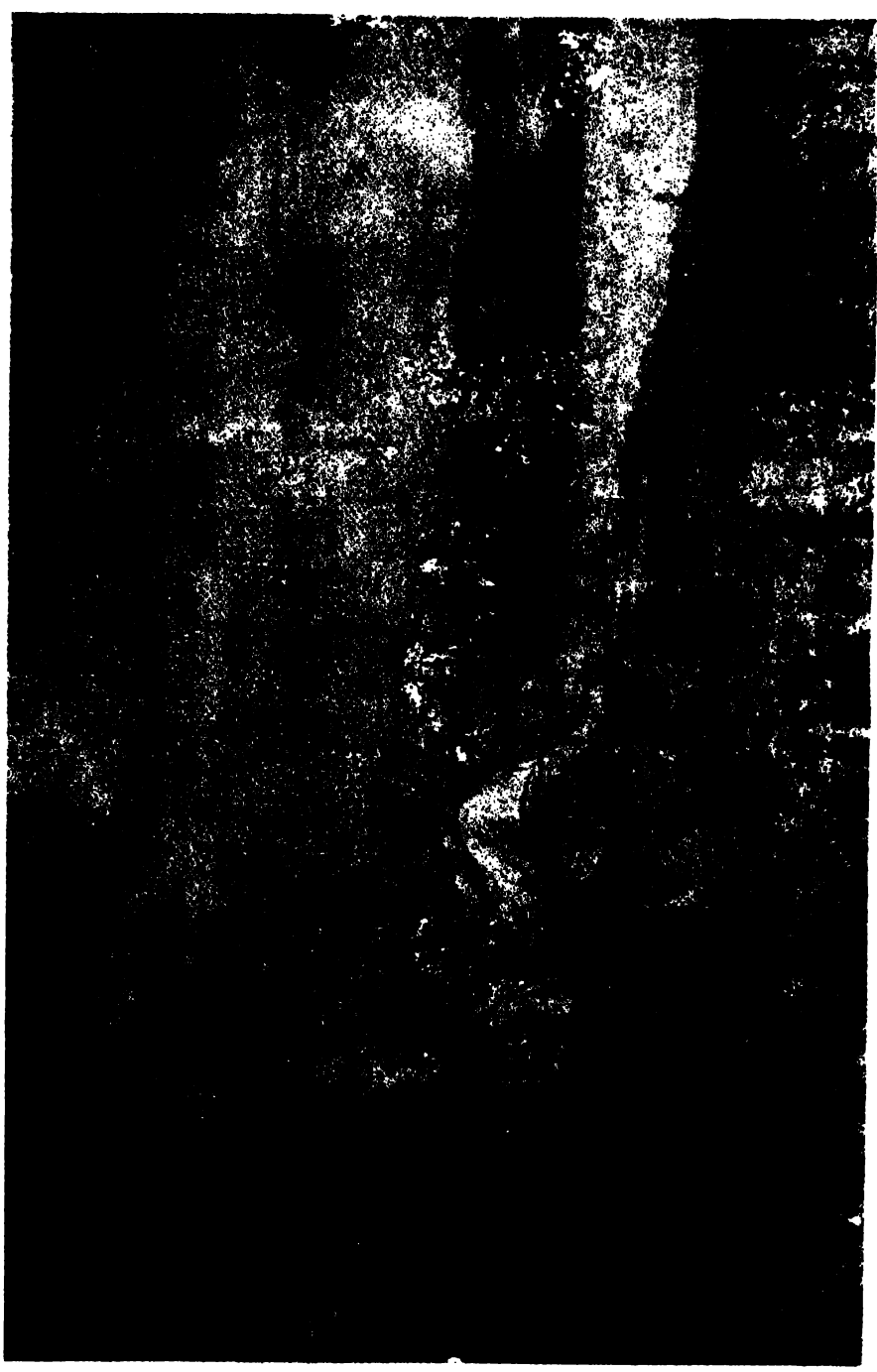
গুহা-মন্দিরের যাত্রী

[নরেশচন্দ্র সিংহ এম-এ, বি-এল,]

অজন্টার দুইখানা চিত্র সম্বন্ধে একটু বিশদভাবে বলা প্রয়োজন মনে করি। দু-খানাই ১৭ সংখ্যক গুহায় আছে; ইহা ছাড়া আরও অনেক চিত্র এখানে আছে। এগুলি জীবন হইতে গৃহীত। বারান্দার বামদিকের প্রাচীরের শেষ ভাগের চিত্রখানি মনোরম। এখানি "সংসারচক্র" বা "কর্ম্মচক্র" নামে অভিহিত। এতৎসংলগ্ন প্রাচীরে আর এক খানি সুন্দর চিত্র আছে, ইহাতে প্রেমালাপ-রত রাজ-দম্পতী গদির উপরের উচ্চাসনে উপবিষ্ট, নিকটে সহচরী-পরিবৃতা অন্য এক রাণী মর্য্যাদার সহিত দণ্ডায়মানা। গবাক্ষের ভিতর দিয়া দুইটী রমণী এ দৃশ্য দেখিতেছেন। উভয়ের মুখই চিন্তাভারাক্রান্ত। আমরা এ দুই খানি চিত্র না দিয়া দুই খানি সুন্দর রেখা-চিত্র নমুনা-স্বরূপ পত্রস্থ করিলাম। শেষোক্ত চিত্রের উপর "আকাশ-মার্গে সঞ্চরণশীল গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের" চিত্র বাস্তবিকই অপূর্ব্ব। গন্ধর্ব্বেরা স্বর্গের গায়ক ও অপ্সরারা নর্ত্তকী। সঞ্চরণশীল কলাকুশলীদের চঞ্চল অঙ্গ-ভঙ্গিমার ভিতর শিল্পীর অপূর্ব্ব রেখা-জ্ঞানের ও ভাব-ব্যঞ্জনার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অনন্য-সাধারণ। এই চিত্রখানি সম্বন্ধে The Cave Temples of India-প্রণেতা ডাঃ বার্জেস বলিয়াছেন, Whether we look at its purity of out-line, or the elegance of grouping, it is one of the most pleasing of the smaller paintings at Ajanta and more nearly approaches the form of art found in Italy in the 13th and the 14th centuries than any example there. The easy upward motion of the whole group is rendered in a manner that could not easily be surpassd অর্থাৎ রেখার বিশুদ্ধির দিক্ দিয়াই দেখি কিংবা মূর্ত্তিগুলির অপূর্ব্ব সমাবেশের সৌন্দর্য্যের দিক্ দিয়া দেখি, অজন্টার ছোট-খাট চিত্রগুলির ভিতর এ চিত্রের তুলনা নাই। ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ শতকের ইটালীর চিত্রের অনুরূপ এ চিত্র। মূর্ত্তিগুলির সহজ সরল উর্দ্ধগতি এরূপ ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে ইহাকে সহজে অতিক্রম করিয়া কোন চিত্রকর বা ভাস্কর যে মূর্ত্তি গঠিত করিতে পারিবেন তাহা মনে হয় না। অপর চিত্রখানি "কুমার বিস্‌সন্তর ও ব্রাহ্মণ জুজক"—এ চিত্রের বিষয়বস্তু "বিস্‌সন্তর জাতক" হইতে গৃহীত। বিস্‌সন্তর সিবি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন।
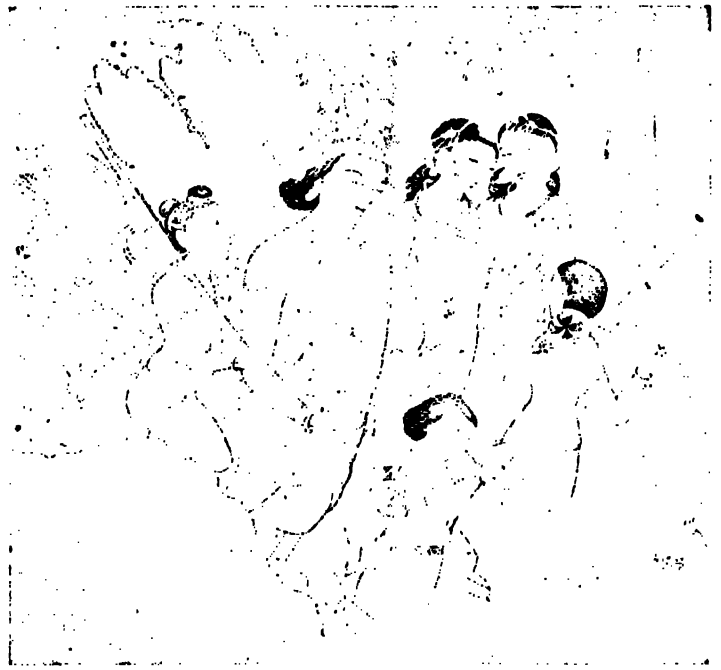
আকাশ-মার্গে সঞ্চরণশীল গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ—১৭ নং গুহা (অজন্টা)

তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল দান করা। নিঃস্ব ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া পিতার রোষানলে পড়িয়া যখন তিনি পত্নী, মন্ত্রী ও পুত্র-সহ নির্ব্বাসিত হন, তখন ক্রূরমতি ব্রাহ্মণ জুজক তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার পুত্রকে ভিক্ষা চান। কুমার বিস্‌সন্তর ব্রাহ্মণের আশা অপূর্ণ রাখেন নাই।

কুমার বিস্‌সন্তর ও ব্রাহ্মণ জুজক—অজন্তা

ক্রূরমতি ব্রাহ্মণের কুটিলতা মুখে-চোখে সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট।

গতবারের ইলোরার পথে ঔরঙ্গাবাদ ও খুলদাবাদে যে কয়টি সুন্দর দ্রষ্টব্য স্থানের চিত্র বাদ পড়িয়া গিয়াছিল এবারে তাহা দেওয়া গেল ও 'কবর-রাজ্য' ঔরঙ্গাবাদে এখন যে সকল কলকারখানা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাদের ভিতর কার্পাস হইতে বীজ বহিষ্করণের কলের চিত্র প্রদত্ত হইল।

পর দিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর আমরা মন্মাদ ত্যাগ করিয়া বেলা তিনটায় নাসিক পঁহুছিলাম। নাসিক পশ্চিম ভারতের মহাতীর্থ। শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসকালে এই স্থানে অবস্থান হেতুই ইহা তীর্থে পরিণত হইয়াছে। গোদাবরীর পশ্চিমতীরের সহরকেই স্থানীয় লোকে নাসিক বলে; পূর্ব্ব তীর পঞ্চবটী নামেই খ্যাত। এই উভয় তীরই বর্ত্তমান নাসিক সহর।

নাসিকে প্রত্যেক দ্বাদশবর্ষ গতে কুম্ভ মেলা হয়, তাহা অনেকেই জানেন। তখন এখানে বিরাট্ জনসমাগম হয়। গোদাবরীতীরে এই মেলা হয়। নাসিক বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান। কলিকাতার অনেক বড় লোকের যেমন দেওঘর, মধুপুর প্রভৃতি স্থানে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য বাংলাবাড়ী আছে, নাসিকের অপর তীরে পঞ্চবটীতে সেইরূপ বোম্বাইএর অনেক ধনীর বাড়ী আছে। বোম্বাইএর যাঁহারা ক্রোরপতি বা ধনকুবের কিংবা যাঁহাদের ঘোড়দৌড়ের নেশা আছে, তাঁহারা থাকেন পুনাতে; পুনাতে তাঁহারা পাথরের বাড়ী করিয়াছেন।

আমরা নাসিক ষ্টেশনে নামিয়া টঙ্গা ভাড়া করিলাম। ফিরিবার সময় একখানি লরি ভাড়া করিয়াছিলাম। ষ্টেশনে মোটর, টঙ্গা ও লরি যথেষ্ট পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন ষ্টেশন হইতে সহর পর্য্যন্ত বাষ্পীয় ট্রামও আছে। অন্ততঃ তখন ছিল; এখন মোটর ও লরির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ইহা সজীব আছে কি না জানি না। ষ্টেশন হইতে সহর দুই মাইল দূরে। সহরের প্রবেশ পথে প্রত্যেককে চারি আনা হিসাবে মিউনিসিপ্যালিটিকে ভেট দিতে হইল। নাসিক জেলায় অবস্থিত ত্র্যম্বকেও এই ব্যবস্থা দেখিলাম। সকল যাত্রীর নিকটই চারি আনা কর আদায় করা বড় সঙ্গত মনে হইল না। উত্তর-ভারতে দেখিয়াছি, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা ও হরিদ্বার যাইতে হইলে রেলটিকিটের সঙ্গে এইরূপ ট্যাক্স আদায় করা হয়,

কিন্তু তথায় শ্রেণী-বিভাগ আছে, অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর যে ট্যাক্স, দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীর ট্যাক্স তদপেক্ষা কম, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর ট্যাক্স আরও কম। যাহা হউক, আমরা একেবারে গোদাবরীতীরে আসিলাম। পাণ্ডা অনেকেই আসিয়া জুটিলেন, কিন্তু আমরা পাণ্ডা লইলাম না বা পাণ্ডার বাড়ীতে বাসা করিলাম না। বোম্বাইএর গুজরাটী বণিক্‌দের অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে, কিন্তু শুনিলাম যে তাহাতে মালিকের পত্র ভিন্ন বাঙ্গালীকে সহরের প্রবেশপথেই প্রকাণ্ড সেতু, তাহার পর নদীবক্ষ প্রস্তরময়। সহরের মধ্যস্থলে নদীর দুই দিকে পাথর দিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত ঘাট বাঁধান আছে ও পশ্চিমতীরে প্রায় চল্লিশ হাত পর্য্যন্ত আরও পাথর দিয়া বাঁধান আছে! যাঁহারা হরিদ্বারে গঙ্গাতীর দেখিয়াছেন, তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিবেন; নাসিকের এই গোদাবরী-তীর অনেকটা হরিদ্বারের গঙ্গাতীরের ন্যায়। পশ্চিমতীরে উপরে বড় বড় বাড়ী ও মন্দির। কপুরথালার ধর্ম্মশালা
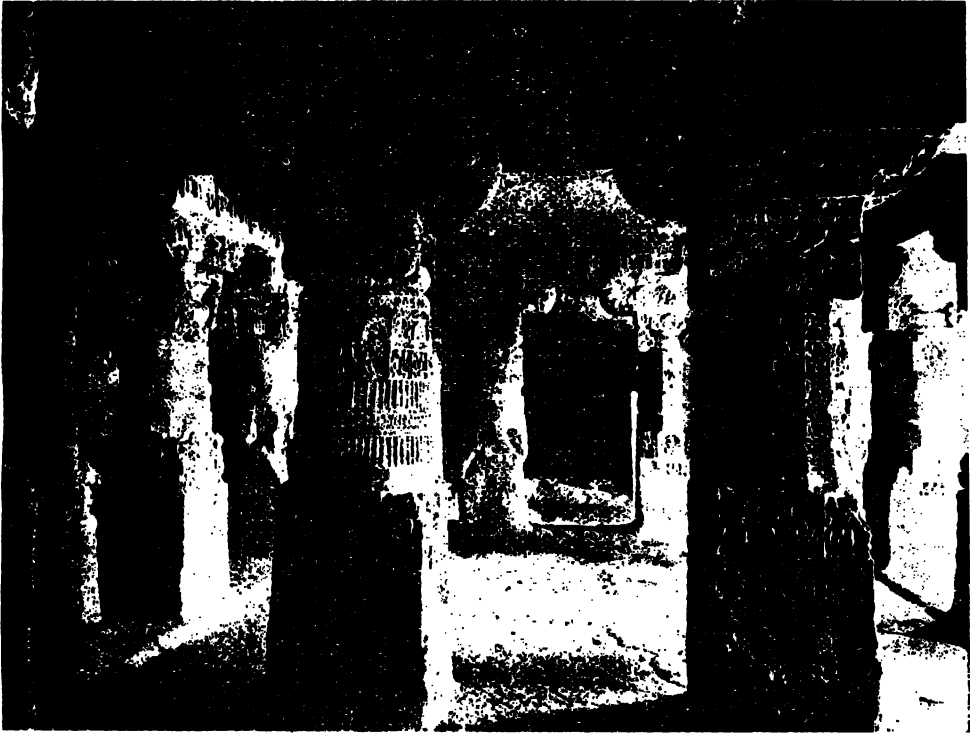
৩ সংখ্যক গুহার অভ্যন্তরের একাংশ—ঔরঙ্গাবাদ

থাকিতে দেয় না, কারণ ইঁহাদের বিশ্বাস, মৎস্যভোজী বাঙ্গালীর সংস্পর্শে তাহাদের ধর্ম্মশালার পবিত্রতা নষ্ট হইবে। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে ভাল ধর্ম্মশালাই জুটিল। গোদাবরী-তীরে কপুরথালার মহারাজার ধর্ম্মশালা। ইহার অবস্থান অতি সুন্দর। দোতালায় দুইটী প্রকোষ্ঠ আছে, তাহার একটীতে "গ্রন্থসাহেব" রক্ষিত আছে, অপর কক্ষটী আমরা পাইলাম। ধর্ম্মশালায় কল প্রভৃতি সমস্ত বন্দোবস্ত আছে। গোদাবরী এখানে সবেমাত্র পর্ব্বত হইতে নামিয়াছে, ক্ষীণকায়া কিন্তু প্রখরস্রোতা। নাসিক ভিন্ন প্রায় পাকা বাড়ীরই ঢালু ছাদ। নদীতীরে যে স্থানটা বাঁধান আছে, সেখানে সন্ধ্যার পর নানাবিধ দোকান বসে, তখন মনে হয় যে এটা একটা প্রকাণ্ড বাজার। এই স্থানেই কুম্ভ মেলা হয়। নদী এখানে প্রস্থে পঞ্চাশ হাত হইবে; জল তিন হাত হইবে। এক দিন বৃষ্টি হইল, সঙ্গে সঙ্গে নদীর তীরে যেখানে বাজার বসে, সব প্লাবিত হইয়া গেল, আবার অল্পক্ষণ পরেই পরিষ্কার হইয়া গেল। নদীবক্ষেও পাথর দিয়া বাঁধা এক একটা কুণ্ড আছে। ঠিক মধ্যস্থলেই এক তীর হইতে অপর তীর

যাইবার জন্য পাথরের একটী নীচু পোল (Causeway) আছে; বৃষ্টি বেশী হইলে জল উপর দিয়া চলিয়া যায়। গোদাবরীর জল এখানে অতি নির্ম্মল। নদীতে একটা অভিনব ব্যাপার দেখিলাম। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পাণ্ডাদের স্ত্রীলোকেরা পাথরে আছড়াইয়া কাপড় কাচিতেছে। শুনিলাম, অপবিত্র হওয়ার ভয়ে ইহারা কাপড় রজককে দেয় না, নিজেরাই পরিষ্কার করে।

নির্ম্মাণ করেন ও তীরের উপর এই ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা করেন। নিম্নতলে সীতারামের মূর্ত্তি আছে; উপরে "গ্রন্থসাহেব" রক্ষিত আছে।

নাসিকে প্রায় পচিশ হাজার লোকের বাস; অধিবাসীরা প্রায়ই হিন্দু। বাজারে খুব ঘন বসতি ও অনেক দোকান। এখানকার বাসনের খ্যাতি বোম্বাই প্রদেশে আছে; বাসনের অনেকগুলি দোকান। সংস্কৃতশিক্ষার

তাজমহলের অনুকরণে নির্ম্মিত রাবেয়া বেগমের কবর—ঔরঙ্গাবাদ

নদীসৈকতে মহারাণী অহল্যাবাইএর নির্ম্মিত তিনটী প্রস্তর-মন্দির আছে। কপুরথালার মহারাজার ধর্ম্মশালার কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। এ ধর্ম্মশালার স্থাপনা কি সূত্রে হইয়াছিল, তাহাও বলি। ১৮৭৫ সালে কপুরথালার তদানীন্তন মহারাজা ইংলণ্ড যাইবার পথে সমুদ্রেই মৃত্যুমুখে পতিত হন; তাঁহার সৎকারের পর অস্থি নাসিকে নীত হইয়া গোদাবরীতে সমর্পিত হয় ও সেইস্থানে স্মরণ-চিহ্ন-স্বরূপে মার্ব্বল পাথরের একটী ফোয়ারা পরবর্ত্তী মহারাজা

জন্য অনেকগুলি টোলও আছে, কলেজও আছে। এক দিন কলেজের দুই জন অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হইল ও আর এক দিন একটী বড় সংস্কৃত টোল দেখিলাম। বন্ধুবর কুমার সংস্কৃত ভাষায় টোলের অধ্যাপকের সঙ্গে কিছুক্ষণ শাস্ত্রচর্চ্চা করিলেন। এতদ্ভিন্ন নাসিকে বিস্তর মন্দির আছে। অনেকগুলিই শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির, অন্যান্য মন্দিরও অনেক আছে।

ধর্ম্মশালায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা অর্থাৎ

কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় ও আমি ভ্রমণে বাহির হইলাম, সহর দেখাই উদ্দেশ্য। বাজারের ভিতর দিয়া যাইতেছি, এমন সময় একটী বাড়ীর দোতালার জানালা হইতে এক-জন বৃদ্ধ কিন্তু দৃঢ়কায় বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমাদিগকে আহ্বান করিলেন। আমরা উপরে গিয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন যে তিনি সন্ন্যাসী, নাম স্বামী প্রেমানন্দ, তবে সন্ন্যাসীর ন্যায় বেশভূসা নাই; বাঙ্গালা দেশ ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে ত্যাগ করিয়াছেন; জিন্না, সিতলবাদ প্রভৃতি আমার বন্ধুটীকে কুমার শরদিন্দুনারায়ণ বলিয়া তিনি বিবেচনা করেন। দেখিলাম, উভয়েই উভয়কে চিনিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি বোম্বাইএ জ্যোতিষের ব্যবসা করেন এবং আয়ুর্ব্বেদিক মতে চিকিৎসাও করেন; আরও বলিলেন যে, তিনি দুই বার পৃথিবী-পর্য্যটন করিয়াছেন ও তাঁহার কয়েক লক্ষ টাকা আছে, আমাকে একটা উইল লিখিয়া দিতে বলিলেন; কিন্তু পরে যখন আমি উইলের মুসাবিদা প্রস্তুত করিতে চাহিলাম, তখন আর
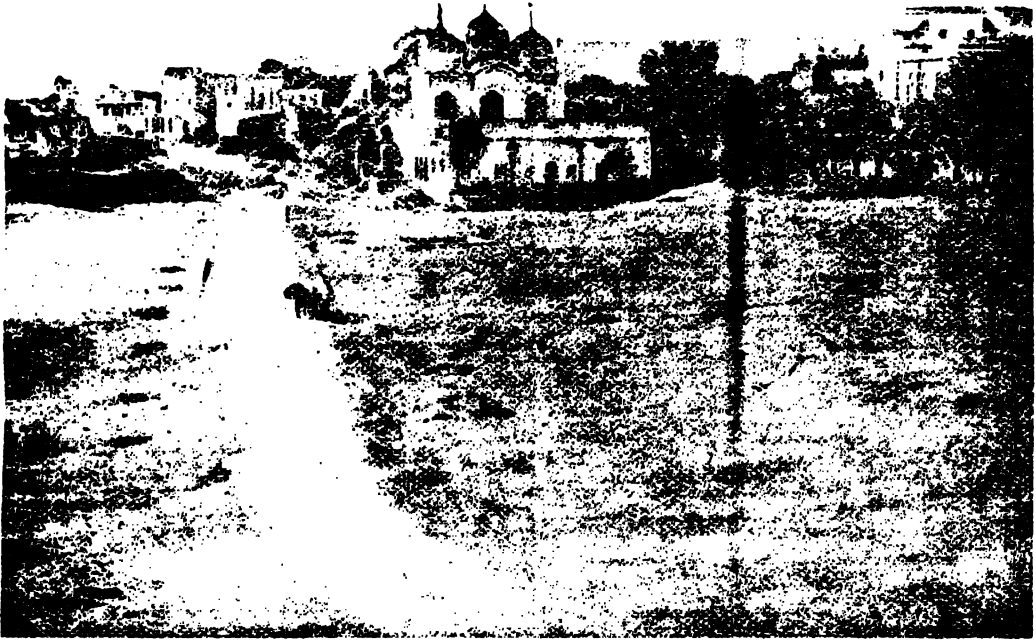
আলমগীরী মসজিদ্—ঔরঙ্গাবাদ

বোম্বাইএর নেতৃবৃন্দ তাঁহার বন্ধু ও অনেক ভাটিয়া ধন-কুবের তাঁহার শিষ্য ও সেবক, এ কথাও বলিলেন। আমি পরিচয় দিলাম, কিন্তু কুমার নিজ পরিচয় দিলেন না; সন্ন্যাসীও পূর্ব্বাশ্রমের তখন পরিচয় দিলেন না। আমাদের কোনও কোনও আত্মীয়স্বজনের নাম করিলেন। কুমার বাহিরে আসিয়া বলিলেন যে তিনি অনুমান করেন যে, সন্ন্যাসী তাঁহার জনৈক আত্মীয়, বহুকাল পূর্ব্বে তিনি দেশত্যাগী হইয়াছিলেন, কেহই তাঁহার সংবাদ জানে না। স্বামী-জী পর দিন গোদাবরীতীরে সান্ধ্য-ভ্রমণে আসিয়া আমাকে নিজ পরিচয় দিলেন ও আমাকে বলিলেন যে তাঁহার কোনও আগ্রহ দেখিলাম না। ভ্রমণ শেষে ফিরিয়া আসিয়া এ গল্প করাতে তাঁহার ভ্রাতা বোম্বাইএ সংবাদ লইয়াছিলেন, কিন্তু কোনও সংবাদ পান নাই।

নাসিকে রাস্তায় একটা নূতন দৃশ্য দেখিলাম। বলদ ও ঘোড়া একসঙ্গে মিলিয়া একাগাড়ী টানিতেছে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে দেখিলাম যে পথে জনস্রোত; নাসিকের যেন সমস্ত নরনারী দক্ষিণমুখে চলিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম যে ইহারা নগরপ্রান্তে কালিকামন্দিরে নবরাত্রি উপলক্ষে যাইতেছে। সে দিন দুর্গাপূজার পূর্ব্ববর্ত্তী চতুর্থী তিথি। আমরাও কালিকা

দর্শন করিয়া গৃহে ফিরিলাম। নাসিকেও সেইরূপ "খানা বলে" ভোজন; তাহাতে আমাদের আনন্দই হইত। রাত্রিতে দুধ ও জলখাবার খাইতাম।

পর দিন এক জন পথ-প্রদর্শককে কিছু পারিশ্রমিক দিয়া আমরা আহারের পর বাহির হইলাম। প্রথমে নদীর অপর তীরে সহরের প্রান্তে প্রায় এক ক্রোশ দূরে তপোবন নামক স্থানে টঙ্গায় যাইলাম। রাস্তায় বোম্বাইএর ধনীদের স্বাস্থ্যভবন দেখিতে পাইলাম। এই তপোবনে শূর্পনখার নাসাকর্তন হয় বলিয়া কথিত আছে। এখন তথায় একটী মন্দির আছে। তথা হইতে আসিয়া "পঞ্চবটীতে" কয়েকটি মন্দির দর্শন করিলাম। এক স্থানে মাটির নীচে একটা অন্ধকার ঘরে সীতার বাসস্থান বলিয়া যাত্রীদের নিকট পয়সা লওয়া হয়, তাহাও দেখিলাম। গোদাবরীর সন্নিকটেই অবস্থিত "কালাবার" নামক মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও "সুন্দর নারায়ণের" মন্দিরে কারুকার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। "কপিলেশ্বর" মহাদেবের মন্দির ও "নরশঙ্করের" মন্দির দুইটীও উল্লেখ-যোগ্য। শেষোক্ত মন্দিরটী সুদৃশ্য। গুজরাটী-দের ধর্ম্মশালাগুলি দেখিলাম, প্রায়ই পঞ্চবটীতে। সন্ধ্যার পর

রোজা—খুলাদাবাদ

আমাদের ধর্ম্মশালার নিকটেই গোদাবরীতীরে অবস্থিত বালাজীর মন্দিরে আরতি দর্শন করিলাম। এ মন্দিরটী প্রকাণ্ড, দ্বিতল এবং সমৃদ্ধিশালী। বালাজীর বিগ্রহ বহুমূল্য রত্ন-বিভূষিত। আরতির পর দ্বিতলে বিগ্রহের সম্মুখে এক জন পণ্ডিত মহারাষ্ট্র ভাষায় ও মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া কথকতা করিতেছেন। তথায়

লোকে লোকারণ্য; নাসিকের জেলা জজও তথায় আছেন দেখিলাম; ইনি মহারাষ্ট্রদেশীয়। বালাজীর মন্দিরে এই কথকতা শুনিয়া আনন্দ হইল। পর দিন দিবাভাগে দেখিলাম বহু শত ব্রাহ্মণ বালাজীর মন্দিরে অতিথি। পর দিবস প্রত্যুষে গোদাবরীতে স্নান করিয়া মোটর ট্যাক্সিতে দুই টাকা দিয়া একটা স্থান লইয়া "ত্র্যম্বকেশ্বর" দর্শনে চলিলাম। বন্ধুবর কুমার তাঁহার পঠদ্দশায় ও তৎ-পরে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই গিয়াছেন; পূর্ব্বে ত্র্যম্বকেশ্বর দেখিয়াছেন, আমার সঙ্গে না গিয়া নাসিকেই থাকিলেন। "ত্র্যম্বকেশ্বর" মহাদেব। বিস্তৃত প্রাঙ্গণ মধ্যে প্রকাণ্ড প্রস্তর নির্ম্মিত এই মন্দির বাজীরাও পেশবা-নির্ম্মিত। মন্দির-চূড়া মার্ব্বল পাথরের। মন্দিরে একটী মার্ব্বল পাথরের কচ্ছপও আছে। প্রাঙ্গণে একটী বিরাট্ বকুল-বৃক্ষ। ত্র্যম্বকেশ্বর গ্রামে ৩০০০ লোকের বাস, এখানে জলের কল আছে। গোদাবরী ইহারই প্রান্তভাগে একটী পর্ব্বত হইতে নির্গতা হইয়া গ্রাম ভেদ করিয়া প্রবাহিতা। এখানে ইহার ছয় বা সাত হাত মাত্র পরিসর; সামান্য জল। তাহাতে উভয় পার্শ্বের বাড়ীর ময়লা জল পড়িতেছে।
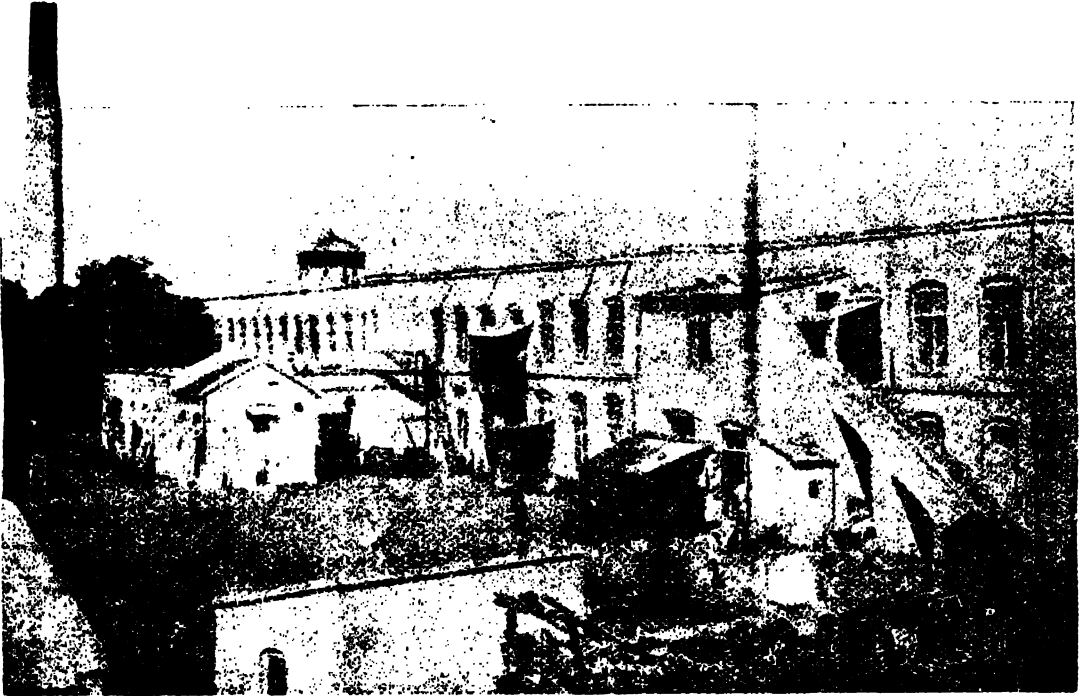
কার্পাস হইতে বীজ বহিষ্করণের কল

ত্র্যম্বকেশ্বর নাসিক হইতে ১৮ মাইল দূরে। রাস্তায় অনেক আঙ্গুরের বাগান দেখিলাম; এ আঙ্গুর কাবুলের আঙ্গুরের ন্যায় অত মিষ্ট নহে। ত্র্যম্বকেশ্বরে নামিতেই মিউনিসি-পালিটী চারি আনা টোল আদায় করিয়া লইল। এক জন পাণ্ডা স্থির করিয়া তখনই ত্র্যম্বকেশ্বরের মন্দিরে গেলাম। সম্মুখে নাটমন্দির হইতেই দেব দর্শন করিলাম, কারণ পাণ্ডারা বলিলেন যে, পুনরায় স্নান না করিয়া মন্দির-মধ্যে দেব দর্শন করিতে পাইব না। পূর্ব্বেই দ্বাদশ জ্যোতি-র্লিঙ্গ মহাদেবের উল্লেখ করিয়াছি। তন্মধ্যে একটী এই

মন্দির হইতে বাহির হইয়াই এক টাকা ভাড়া দিয়া এক খানি ডুলি লইলাম। তাহাতেই বহু কষ্টে কচ্ছপবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক হস্তপদ সঙ্কোচন করিয়া কোনও রকমে বসিলাম ও বাহকস্কন্ধে নীত হইয়া পর্ব্বতোপরি "গোদা-বরীর উৎপত্তি-স্থানে" এক ঘণ্টায় পঁহুছিলাম। প্রায় সাত-শত সিঁড়ি আছে। পর্ব্বতে গোদাবরীর উৎপত্তি স্থান পর্য্যন্ত অনেক বৃক্ষাদি আছে, কিন্তু তাহার উপরে পর্ব্বতটীর আরও যে পাঁচ শত ফুট আছে, সেটী এ দেশের অধিকাংশ পাহাড়ের ন্যায় বৃক্ষ-রহিত। উপরে দুইটী পাহাড় প্রাচী-

রের ন্যায় সোজা ভাবে উঠিয়াছে। গোদাবরী এখানে পর্ব্বতগাত্র হইতে সবে মাত্র বাহির হইতেছে; জল বিন্দু বিন্দু করিয়া পড়িতেছে। মুখে একটা নল সংলগ্ন করা আছে। কয়েক হাত দূরেই আরও জল বাহির হইয়া একটা ছোট কুণ্ডে পড়িতেছে। এই স্থানের নাম কুশাবর্ত্ত; তথায় স্নান করিয়া লইলাম। এক জন ব্রাহ্মণ তথায় বসিয়া যাত্রীদের নিকট পয়সা আদায় করিতেছেন। বানরও এখানে অনেকগুলি দেখিলাম। ত্র্যম্বকেশ্বরের নিকটেই করি নাই। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণদের ধর্ম্মমন্দিরে একাধিপত্য। পরে শুনিলাম যে অব্রাহ্মণকে মন্দির মধ্যে যাইতে দেয় না, অব্রাহ্মণগণ নাটমন্দির হইতেই দর্শন করেন। কিন্তু দর্শনের সময় আমি এ কথা জানিতাম না। আমার গলদেশে উপবীত দেখিয়া পাণ্ডাগণ আমাকে ব্রাহ্মণই মনে করিয়াছিল ও মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে কেহ বাধা দেয় নাই। দর্শন-শেষে পাণ্ডাগৃহে ভোজন ও ভোজনান্তে বিশ্রাম করিয়া এক টাকা ভাড়া দিয়া মোটর লরিতে নাসিক

গোদাবরী নদীর স্নানের ঘাট—নাসিক

আরও দুইটি ক্ষুদ্র পাহাড় দেখিলাম। একটীর উপর তুকারামের ভ্রাতা নিবৃত্তিনাথের এক মন্দির আছে। অপরটী "নীলাম্বিকার" মন্দিরটী, ধর্ম্মগিরি নামক পাহাড়ের উপর। প্রায় আড়াই শত ধাপ সিঁড়ি আছে। যখন ত্র্যম্বকেশ্বরের মন্দিরে ফিরিলাম, তখন দুই প্রহর হইয়াছে। পট্টবস্ত্র না পরিলে প্রবেশ-নিষেধ বলায় গায়ের রেশমী চাদর পরিয়া মন্দির মধ্যে গিয়া দেবদর্শন করিলাম। প্রাচীনপন্থী আমরা, ভাগ্যবশতঃ চাদরটা এখনও ত্যাগ যাইবার স্থান সংগ্রহ করিলাম। পাণ্ডাজী অতি সজ্জন; একটী মাত্র টাকা দক্ষিণা দিলাম, কোনও আপত্তি করিলেন না। মোটরে বসিয়া আছি, এমন সময় দেখিলাম, আমার সমব্যবসায়ী এক মৈথিল বন্ধু সপরিবারে আসিয়া তথায় উপস্থিত। তিনি রামেশ্বর ও দ্বারকা দর্শন করিয়া ফিরিতেছেন; পরে আবার উজ্জয়িনীতেও তাঁহার সঙ্গে দেখা হয়।

সপ্তমী পূজার দিন প্রাতে পূর্ব্বোল্লিখিত সন্ন্যাসী মহা-

শয়ের সঙ্গে বসিয়া অনেকক্ষণ গল্প করিলাম। আহারান্তে আমরা "নাসিকের গুহ মন্দির" দর্শনে চলিলাম। দেখিলাম, এ দেশে মোটর কারের ভাড়া কম। পাঁচ মাইল রাস্তা যাতায়াত ও দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর আড়াই টাকা ভাড়া দিলাম।

এক্ষণে নাসিকের এই গুহা-মন্দিরগুলির বর্ণনা করিব। সদর-রাস্তার অনতিদূরেই একটী পাহাড় আছে। তাহার পর ৩৫০ ফুট উঠিয়া এই গুহাগুলি। সর্ব্বসমেত ২৪টী গুহা আছে। স্থানীয় লোকে এ গুলিকে "পাণ্ডুগুহা" বলে, তাহাদের বিশ্বাস যে বনবাসকালে পাণ্ডবগণ এখানে কিছুকাল ছিলেন। চৈত্যমন্দিরে যে চৈত্যটি আছে, সেটীকে "ভীমগদা" বলে। ভারতের লোকে ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছিল। পরবর্ত্তী রাজগণের কীর্ত্তি অনেক স্থলেই এরূপ পঞ্চ-পাণ্ডবদের নামের সঙ্গে সংযোগ করিয়া দিয়াছিল ও বৃহদায়তন অনেক জিনিসই মধ্যম পাণ্ডবের নামের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছিল। উত্তর বঙ্গের "ভীমের জাঙ্গাল" ইহার একটি দৃষ্টান্ত।

এই গুহামন্দিরে যে ক্ষোদিত লিপি আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে ইহার নাম ত্রিরশ্মি। এ গুলি অতি প্রাচীন। খৃষ্ট পূর্ব্ব ২০০ অব্দ হইতে ৬০০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে এগুলি নির্ম্মিত হয়। ক্ষোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, অনেকগুলি গুহামন্দিরই পশ্চিম ভারতের ক্ষত্রপগণ নির্ম্মাণ করেন। এই পারসিক উপাধি-বিশিষ্ট (Satrap) রাজগণ অন্যান্য স্থলেও বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নাসিকের চৈত্য মন্দিরটি ও তৎপার্শ্বস্থিত ক্ষুদ্র বিহারটি খৃষ্ট জন্মের কিছু পূর্ব্বে অন্ধ্ররাজ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্যই এই বিহার ও মন্দিরগুলি নির্ম্মিত হয়। প্রায় প্রত্যেক মন্দিরেই জলের সুবিধা আছে। অনেক ক্ষোদিত লিপি ও বহু সংখ্যক বৌদ্ধ মূর্ত্তি আছে; অনেকগুলি বজ্রপাণি, পদ্মপাণি ও তারাদেবীর মূর্ত্তিও দেখিলাম। মন্দির দর্শন করিতে এক জন স্থানীয় ডাক্তার গিয়াছিলেন ও তাঁহার সঙ্গে একটী ক্ষুদ্র দল ছিল; তাঁহারা আমাদিগকে জলযোগ করাইয়া আপ্যায়িত করিলেন। বৈকালে আমরা স্বস্থানে ফিরিলাম।
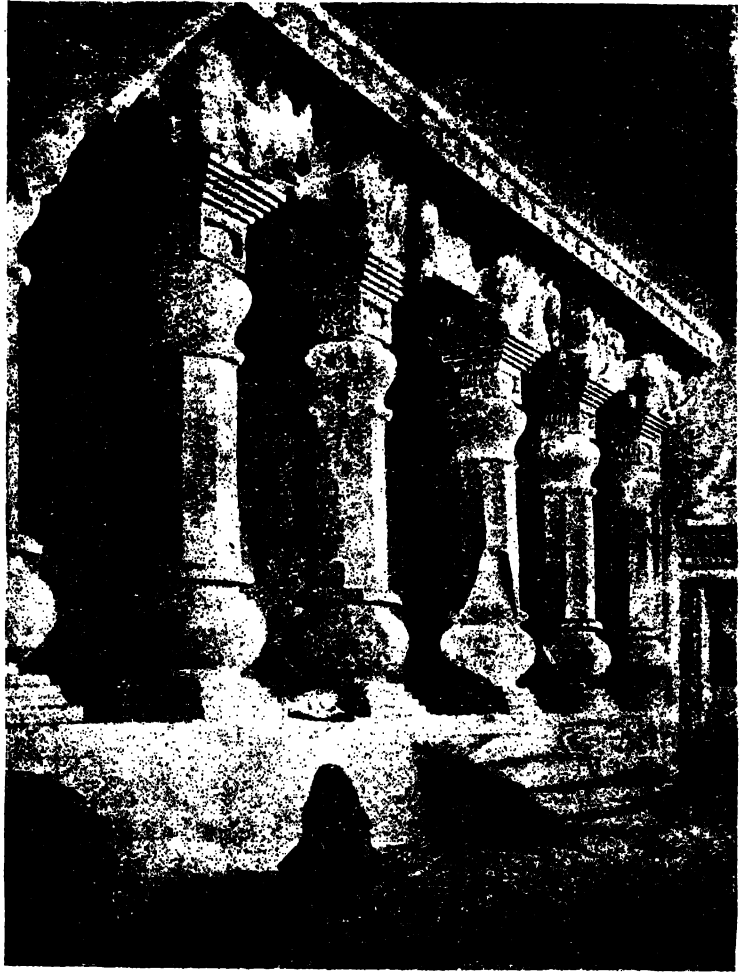
গুহার অভ্যন্তর—নাসিক

নাসিকে পেশবাদের বাড়ী ও মন্দির এখনও আছে। ইহাদের একটী প্রকাণ্ড কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বাড়ীর নাম "হিঙ্গু-ওয়াদা"। এ বাড়ীতে কাঠের উপর সুন্দর কারুকার্য্য

আছে। এখন সেখানে একটা সাধারণ পুস্তকালয় আছে। সন্ধ্যার পর তথায় গিয়া কিছুক্ষণ পড়াশুনা করিলাম।

সপ্তাহকাল নাসিকে অতিবাহিত করিয়া নবমী পূজার দিন আমরা প্রাতঃকালে আহারের পর নাসিক ত্যাগ করিলাম। নাসিক বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান, বেশ ভাল বোধ হইয়াছিল। বেলা একটার সময় বোম্বাই পৌছিলাম। পর্ব্বতের ভিতর অনেকগুলি সুড়ঙ্গ ভেদ করিয়া রেল লাইন চলিয়াছে; পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম।

বোম্বাইএ ভিক্টোরিয়া টারমিনাস্ নামক জি, আই, পি, রেলের যে সুন্দর ষ্টেশনে নামিলাম, তাহা না কি সমগ্র জি, আই, পি, ও বি, বি, সি, আই রেলের বহুসংখ্যক ষ্টেশন আছে ও অনবরত ট্রেণ চলিতেছে। সহরের ভিতরেই এই দুইটি প্রধান রেলপথ। ষ্টেশনে নামিতেই দেশী হোটেলের দালালগণ ঘিরিয়া ফেলিল। সরদার গেহতে যাইব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু অবস্থান ভাল দেখিয়া সিন্ধু-পাঞ্জাব হিন্দু হোটেলে গেলাম। হর্ণবি রোড্ নামক বোম্বাইয়ের এক প্রধান রাস্তার উপর এই হোটেল, অপর-পার্শ্বে আর একটা রাস্তা কোণাকুণিভাবে গিয়াছে। আমরা দ্বিতলে দুই রাস্তার সঙ্গম-স্থলে একটি ঘর পাইলাম। বোম্বাই সম্বন্ধে অনেকেই লিখিয়াছেন, আমি আর অধিক কথা লিখিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না। বোম্বাইএ সপ্তাহ কাল থাকিয়া বোম্বাই সহর ভাল করিয়া দেখিলাম। বোম্বাইএর প্রস্তর-নির্ম্মিত বিরাট্ সৌধ-সমূহ আমাকে আকৃষ্ট করে নাই, আমাকে মুগ্ধ করিল, বোম্বাইএ ভারতীয়-গণের প্রতিপত্তি ও দান-শৌণ্ডতা। কলিকাতার তুলনায় বোম্বাই বহুগুণে শ্রেষ্ঠ মনে হইল। কলিকাতায় ষোল হাজার ইংরাজ আছে; ইংরাজ সওদাগরগণই কলিকাতার প্রধান; ক্লাইভ ষ্ট্রীটের সওদাগরি আফিসগুলিই কলিকাতার বাণিজ্য-কেন্দ্র। পাট যদিও বাঙ্গালার একচেটিয়া, কলিকাতার পাটের কলগুলি প্রায় সবই ইংরেজ কোম্পানি-দ্বারা পরিচালিত, বাঙ্গালীর তথায় স্থান নাই বলিলেই হয়; এমন কি পাট কলের বাঙ্গালী অংশীদারও সামান্য কয়েক জন মাত্র। চা'র ব্যবসাও প্রায়ই ইংরাজের হাতে; অন্য যে সব ব্যবসা আছে, তাহা মাড়োয়ারী

এলিফান্টার মন্দিরে—ত্রিমূর্ত্তি

কি ? তথায় কেবল মাত্র চারি হাজার ইংরাজের বাস। সেখানে প্রধান ব্যবসায়িগণ, যথা, পার্শী, ভাটিয়া, বোরা, নাগর প্রভৃতি সকলেই গুজরাটীভাষী, সেই দেশেরই লোক। ইংরাজ বা মাড়োয়ারীর তথায় আধিপত্য নাই। প্রায় আশিটা সুতা ও কাপড়ের কল আছে, তাহার মধ্যে আট দশটা ব্যতীত সবই দেশী-লোকের হাতে। পার্শী প্রভৃতি দেশীয় ধনকুবেরগণ কতই যে দান করিয়াছেন, তাহার সীমা নাই। তাতার নাম ও তাতার দানের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন, সকলেই জানেন। স্যর জামসেদ্‌জি জিজি-ভাই হাঁসপাতাল, কলাভবন প্রভৃতি কত যে লোক-হিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করিয়াছেন ও ওয়াদিয়া ও মঙ্গলদাস নাথুভাই যে কত সৎকার্য্যে দান করিয়াছেন, তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই সব দেখিয়া আমি মনে অপূর্ব্ব আনন্দ-বোধ করিলাম। সঙ্গে অধিক টাকা লইয়া যাই নাই, একটী বড় ব্যাঙ্কের নামে চেক্ ভাঙ্গাইবার জন্য পত্র লইয়া গিয়াছিলাম। দেখিলাম, সেই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বোম্বাইয়ের তুলনায় কলিকাতার গুণব্যাখ্যায় মুক্তকণ্ঠ। নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের কথায় আমি তাঁহাকে বলিলাম যে বোম্বাইএর প্রায় চতুর্দ্দিকে সমুদ্র ও একাংশে পাহাড় (মালাবার পাহাড়) থাকায় বোম্বাইকে সুন্দর দেখায়। তিনি বলিলেন যে কলিকাতার ন্যায় ময়দান বোম্বাইএ নাই ; সুতরাং তাঁহার মতে কলিকাতাই সুন্দর।

কলিকাতার শ্রেষ্ঠ অংশ চৌরঙ্গীতে বাস করে প্রধানতঃ ইংরেজ, আর বোম্বাইএর শ্রেষ্ঠ অংশ মালাবার হিল ও নেপিয়ান্ সিকেলে বাস করে ভারতীয় ধনকুবের-গণ। বাঙ্গালী আমরা, আমাদের পুঁথিগত বিদ্যার অহঙ্কার করি, কিন্তু দেশের ধন বিদেশীর হাতে সঁপিয়া দিয়াছি, দিনের পর দিন ক্ষুদ্র-ব্যবসা হইতেও হটিয়া যাইতেছি, আর বোম্বাইএ ইহার অন্যথা দেখিলাম। এক দিন আমরা মালাবার হিলে এক পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করিতে
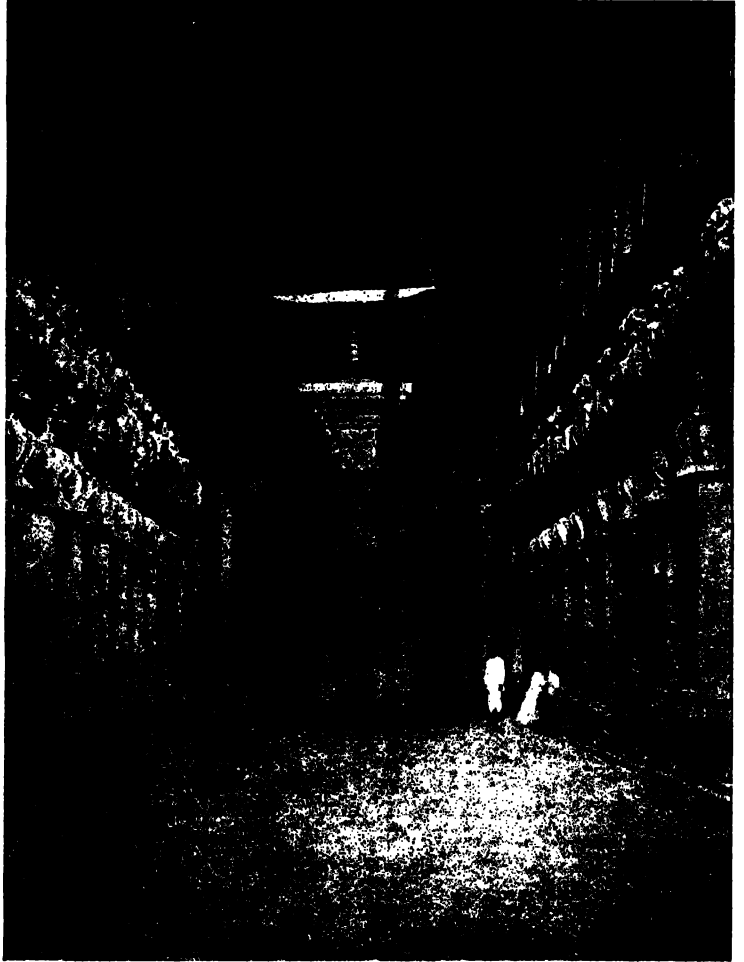
কার্লিতে পাথর কাটিয়া তৈয়ারী মন্দির

গিয়া বাড়ী ঠিক করিতে না পারিয়া একটী বাড়ীতে ঢুকিলাম। সেটী প্রকাণ্ড পাথরের বাড়ী। গৃহস্বামীকে ইংরেজীতে কথা বলাতে তিনি বলিলেন, "No English" অর্থাৎ ইংরেজী বুঝেন না, কিন্তু তিনি বড় ব্যবসায়ী। তাই আবার বলিতেছি, বোম্বাইএর দেশীয় লোকের গৌরব আমাকে মুগ্ধ করিল।

বাঙ্গালীদের বিজয়া সম্মিলন হইয়াছিল। তথায় গিয়া অনেক বোম্বাই-প্রবাসী বাঙ্গালীর সঙ্গে আলাপ হইল। প্রায় তিন শত বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন। নাট্যাভিনয়ও হইল। জানিতাম না যে বোম্বাইএ এত বাঙ্গালী আছেন। শুনিলাম, সর্ব্বসমেত আট নয় শত বাঙ্গালী আছেন। তন্মধ্যে প্রায় ৬০ জন স্বর্ণকারের ব্যবসা করেন।

পূর্ব্ব-তোরণ—সাঁচি

এইবার আবার গুহামন্দিরের কথা। বোম্বাইএ থাকিতে এক দিন "এলিফ্যাণ্টা নামক" গুহা-মন্দিরগুলি দেখিতে গেলাম। এ গুহাগুলি বোম্বাই ও কোঙ্কন মধ্যে এ দ্বীপটী বোম্বাই হইতে তিন ক্রোশ দূরে। বোম্বাইএ দেখিলাম, সমুদ্র স্থির; নৌকায় সমুদ্র পার হইয়া এলিফ্যাণ্টা যাইতে হইলে একবারে গুহাগুলির নীচেই যাওয়া চলে ও নিজ ইচ্ছামত আসা চলে। আমি দ্বিপ্রহরে এক ষ্টীমারে গিয়াছিলাম, তাহাতেই ফিরিয়া আসি। ষ্টীমার ঘাট হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে ক্ষুদ্র পাথরের উপর এই গুহা-মন্দিরগুলি। একটী মন্দির বিরাট্ ও বিস্ময়কর। এ গুলি শৈবমন্দির, তবে একটী গণেশ-মন্দিরও আছে। প্রধান গুহামন্দিরটী অতি বৃহৎ; ইহা ১৩৩ ফুট লম্বা ও ১৩০ ফুট চওড়া। ছাতের নিম্নে ২৬টী প্রকাণ্ড স্তম্ভ। ইহাতে বহুসংখ্যক মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। তন্মধ্যে কয়েকটী বড়ই সুন্দর। "অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি", "ত্রিমূর্ত্তি," "হর-পার্ব্বতীর বিবাহ", "শিবতাণ্ডব" ও "স্কন্দ-জন্ম;" এই কয়টীই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। ত্রিমূর্ত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের বিশাল মূর্ত্তি; ইহা ১৮ ফুট উচ্চ। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি মাতাল ইংরেজ একটী সুন্দর ব্যাঘ্রমূর্ত্তি ধ্বংস করে। মন্দিরগুলি পর্টুগিজ বর্ব্বরগণ অপবিত্র করিয়া দেয় ও অনেক নষ্ট করে।

বোম্বাই প্রদেশে দুর্গোৎসব নাই, তাহা অনেকেই জানেন। আফিস, আদালত, স্কুল, পূজার সময় সব খোলা দেখিলাম; কেবল বিজয়ার দিন দশেরা উপলক্ষে বন্ধ। কোজাগর লক্ষী-পূজার দিন পুনা রওয়ানা হইলাম। ষ্টেশনে যাইয়া দেখি যে একটা এক্সপ্রেস্ গাড়ী শীঘ্রই যাইবে। তাহাতে সবই ইন্টার ক্লাস। তাহাতেই উঠিলাম। বোধ হইল, প্রথম শ্রেণী অপেক্ষাও ভাল গাড়ী। গাড়ীতে

দার্জ্জিলিং বা শিলং মেলের গাড়ীর ন্যায় এক গাড়ী হইতে অপর গাড়ীতে যাওয়া চলে। গাড়ীতেই বহুবিধ খাদ্য ও ফল বিক্রয় হইতেছে। শুনিলাম, ইহা পুনায় ঘোড়দৌড় দেখিতে যাওয়ার জন্য রেস্ এক্সপ্রেস্। ট্রেণে যাইতে বড়ই আনন্দ অনুভব করিলাম। বোম্বাই হইতে কিছুদূর গিয়াই ট্রেণ পাহাড়ের সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ ভেদ করিয়া উঠিতে লাগিল। অপূর্ব্ব এ দৃশ্য। নীচে সমুদ্র ও সমতল ভূমিতে হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র, আর আমরা প্রায় ২০০০ ফুট উপর দিয়া পাহাড়ের গায়ে গায়ে চলিতেছি। অবশেষে উচ্চ মাল-ভূমিতে উঠিলাম। সন্ধ্যার পর পুনা পঁহুছিলাম ও ষ্টেশনের সন্নিকটেই বিশাল হিন্দু হোটেল নামক একটী গুজরাটী হোটেলে গেলাম। হোটেলটী ক্ষুদ্র কিন্তু বন্দোবস্ত ভাল।

পুনা ২০০০ ফুট উচ্চ। বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান। ষ্টেশনের নিকট নূতন পুনা; এখানে বোম্বাইএর ধনীদের বাড়ী। একটু দূরে প্রাচীন পুনা, মহারাষ্ট্রের গৌরব—ভারতের গৌরব। সেখানে অধিকাংশই খোলার ঘর, সামান্য বাড়ী। এই সামান্য সামান্য বাড়ীগুলিই তিলক, ভাণ্ডারকার, প্রভৃতি ভারত বিখ্যাত মনস্বী ও নেতৃগণের বাসভবন। এই সামান্য বাড়ীগুলিতেই পেশবাদের আমলে ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী অধিষ্ঠিত ছিলেন। পুনার গৌরব ধনের জন্য নহে; পূর্ব্বে শৌর্য্যবীর্য্যের জন্য, বর্ত্তমানে বিদ্যা ও জ্ঞানের জন্য। নগরপ্রান্তে এক দিন কৃষি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্গু-সন প্রভৃতি নানা কলেজ ও সেবা-সদন দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলাম; আর এক দিন দেখিলাম, পাহাড়ের উপর "পার্ব্বতী দেবীর মন্দির"। এক দিন ঘোড়দৌড় দেখিতে গেলাম। দেখিতেই গেলাম, কারণ ঘোড়দৌড়ে খেলা আমাদের অভ্যাস নাই। সেখানে এক জন বাঙ্গালীকে দেখিলাম ও তাঁহার সহিত আলাপ হইল। তিনি কেবল ঘোড়দৌড়ের জন্যই সুদূর কলিকাতা হইতে পুনা আসিয়াছেন; ধন্য নেশা!

স্তম্ভ—সাঁচি
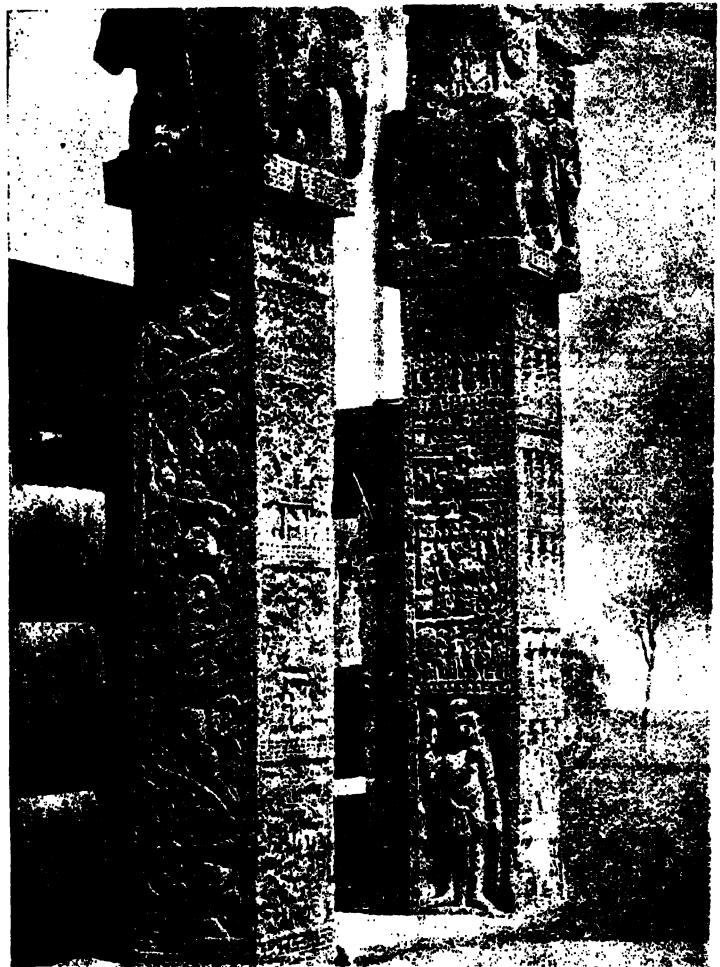
পুনায় থাকিতেই এক দিন আহারের পর পুনা হইতে বোম্বাইএর পথে ৩৯ মাইল দূরে লোনাভালা ষ্টেশনে আমরা আসিলাম। আমাদের গন্তব্যস্থানে কার্লি। মালভলি ষ্টেশন হইতে কার্লি এক মাইল মাত্র কিন্তু লোনাভালা রেল কোম্পানীর একটি সুন্দর উপনিবেশ, আমরা লোনাভালাতেই নামিলাম। লোনাভালা অতি

স্বাস্থ্যকর স্থান, প্রায় ২৫০০ ফুট উচ্চ। ষ্টেশনে টঙ্গা ভাড়া করিয়া ৫ মাইল দূরে কার্লি গেলাম। কার্লিতে প্রায় ৫০০ ফুট উচ্চে একটী পাহাড়ের উপর গুহা মন্দির-গুলি অবস্থিত। আমরা প্রত্যেকে পাঁচ সিকা দিয়া দুই খানি সিডান চেয়ারে বসিয়া বাহক-স্কন্ধে মন্দির সমীপে উপনীত হইলাম। কার্লির "চৈত্যমন্দির" অপেক্ষা বৃহৎ ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর চৈত্যমন্দির আর কোথাও নাই; ইলোরাতেও নাই, অজন্তাতেও নাই। এই মন্দির মধ্যে একটী চৈত্য আছে। এই মন্দির ১২৫ ফুট লম্বা, ৪৬ ফুট চওড়া ও ৪৬ ফুট উচ্চ। খৃষ্ট জন্মের প্রায় সম-সাময়িক এই মন্দিরটী। মন্দির-গর্ভে উভয় পার্শ্বে ১৫টী করিয়া বিরাট্ স্তম্ভশ্রেণী আছে আর গর্ভ ও পার্শ্ব মধ্যে ২২টী করিয়া অষ্ট-কোণ স্তম্ভশ্রেণী বিদ্যমান। গর্ভপার্শ্বে যে ১৫টী স্তম্ভ আছে, উহা বহুবিধ কারুকার্য্য বিশিষ্ট ও প্রত্যেকটীর উপরে দুইটী হস্তিমূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে, আর প্রত্যেক হস্তিমূর্ত্তির উপর আলিঙ্গনাবদ্ধ নরনারীর মূর্ত্তি; স্তম্ভোপরি ব্যাঘ্র ও ঘোটক মূর্ত্তিও আছে। মন্দিরের সম্মুখভাগে একটী দ্বিতল বিস্তৃত ও উচ্চ বারান্দা। এই বারান্দা উচ্চে ৫৮ ফুট। প্রবেশ-পথে তিনটী দ্বার ও উপরে আলোক-প্রবেশ জন্য অশ্বক্ষুরাকৃতি একটী বিরাট্ গবাক্ষ। এই বারান্দাটী নানাবিধ কারু-কার্য্য বিভূষিত হইয়া ভাস্করের অপূর্ব্ব কলা-জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে। কিন্তু এই চৈত্য-মন্দিরের সৌন্দর্য্যের হানি করিয়াছে, প্রবেশ-পথেই অবস্থিত পরবর্ত্তী কালের একটী ক্ষুদ্র হিন্দু মন্দির। একটী ক্ষোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, কার্লির এই বিরাট্ চৈত্যমন্দিরটি বৈজয়ন্তী-নগরের শ্রেষ্ঠ ভূতপালের দান। অন্যান্য যে অল্পসংখ্যক গুহামন্দির এখানে আছে, সেগুলি সমস্তই বৌদ্ধ-মন্দির। কার্লি পর্ব্বতের উপর হইতে দৃশ্য অতি সুন্দর, চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতশ্রেণী।
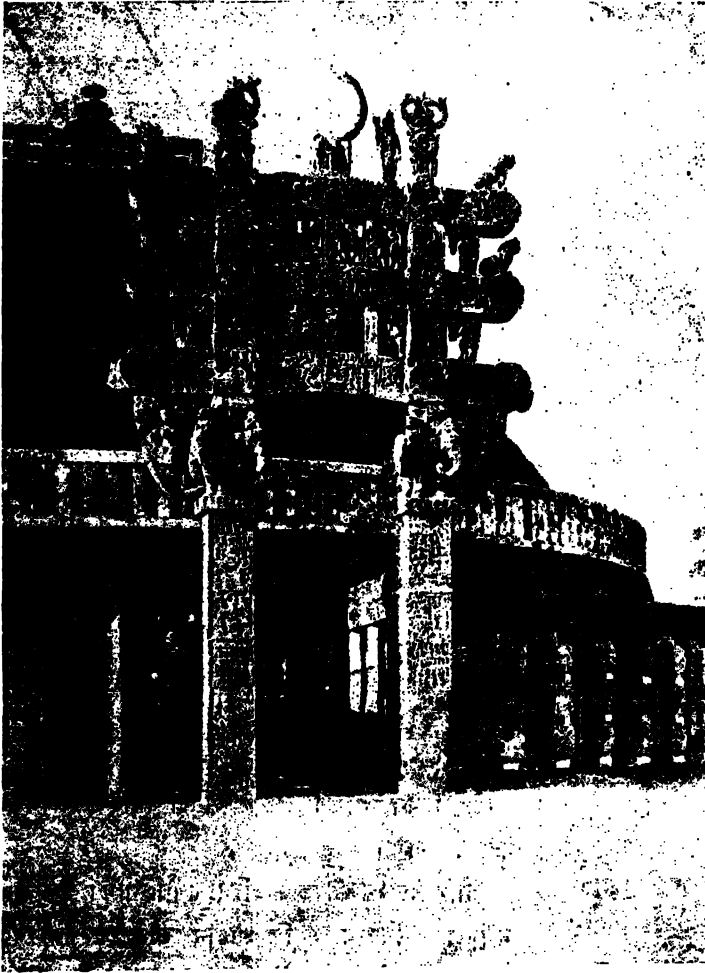
বৃহৎ স্তূপের উত্তর-তোরণ—সাঁচি

ষ্টেশনে ফিরিবার পথে রাস্তার সন্নিকটেই তাতা-হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক ওয়ার্কসের বিস্তৃত জলাশয়। এটী প্রায় ১ মাইল বিস্তৃত ও তিন মাইল লম্বা; ইহার তিন দিকে পর্ব্বত। তন্মধ্য দিয়া পর্ব্বত-নির্ঝরিণী প্রবাহিতা; তাহার সম্মুখ ভাগ সুদৃঢ় কন্‌ক্রিটের বাঁধ দিয়া বন্ধ করিয়া এই জলাশয় নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই জল হইতে দূরে বিদ্যুৎ-সৃষ্ট হইতেছে ও তাহাই বোম্বাইএ মানুষের উপকারে

আসিতেছে। অনেকক্ষণ আমরা এই বিরাট্ জলাশয় দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিলাম।

পুনায় অবস্থানকালে শেষ দিন পেশবাদের আবাস-ভবন প্রভৃতি যাহা এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহা দেখিলাম। বিরাট্ সাম্রাজ্য এই সামান্যকায় গৃহগুলি হইতেই নিয়ন্ত্রিত হইত, ইহা ভাবিয়া মুগ্ধ হইলাম
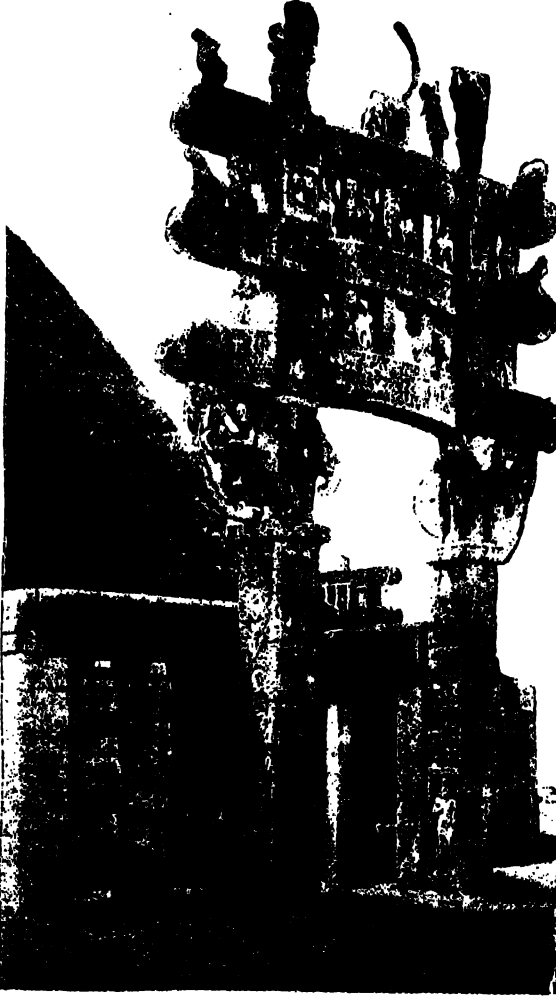
উত্তর-তোরণ—সাঁচি

পুনায় চারি দিন থাকিয়া বিদায় লইলাম। স্থির ছিল যে পুনায় তিন দিন থাকিয়া বোম্বাই হইতে সমুদ্র পথে দ্বারকা যাইব। বন্ধুবর কুমার বলিলেন যে, পুনা মনোরম স্থান, আরও এক দিন থাকিয়া রেলেই দ্বারকা যাওয়া যাইবে, কারণ জাহাজ প্রত্যহ যায় না। তখনও রেলের টাইম-টেবল দেখা হয় নাই। বোম্বাইএ আসিয়া দেখিলাম যে রেলে যাইতে হইলে ভিরামগাঁও ষ্টেশনে বার ঘণ্টার উপর অপেক্ষা করিতে হইবে ও আমরও সময় সংক্ষেপ, সুতরাং এ যাত্রা দ্বারকা যাওয়া আমি স্থগিত রাখিলাম। আমরা বোম্বাইএ ফিরিয়া সেই রাত্রেই বি-বি-সি-আই-রেলের ডাকগাড়ীতে বরোদা রওয়ানা হইলাম। অবসর-প্রাপ্ত একাউণ্টাণ্ট জেনারেল শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ঘটক মহাশয় তখন গভর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অবসর লইয়া গাইকোয়াড় রাজ্যের রাজস্ব-সচিব। তিনি আমাদিগকে আনিবার জন্য ষ্টেশনে পুত্রকে পাঠাইয়াছিলেন; তাঁহার সঙ্গে আমরা যাইয়া মহারাজার অতিথি-ভবনে অতিথি হইলাম। সুন্দর বন্দোবস্ত, সুন্দর বাড়ী। সেই দিনই মহারাজার "লক্ষ্মী-ভবন" নামক প্রাসাদ, কলাভবন, মহারাজার বহু কোটি মুদ্রার রত্নাদি, মিউজিয়ম প্রভৃতি বরোদার দৃশ্য সমূহ দেখিলাম। মহারাজার প্রাসাদ অতিবিস্তৃত ও হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন বড়ই মনোরম। তবে প্রাসাদসংলগ্ন বাগানের অবস্থা ভাল দেখিলাম না। মহারাজার দীর্ঘ প্রবাসই ইহার হেতু। রত্নাদির মধ্যে একটী মালা দেখিলাম, তাহার মূল্য অর্দ্ধ কোটি মুদ্রা, আর একটী হীরক খণ্ড দেখিলাম, তাহারও মূল্য বহুলক্ষ মুদ্রা। আমি সেই-দিনই রাত্রিকালে বরোদা ত্যাগ করিলাম। বন্ধুবর কুমার আরও দুই-দিন অবস্থান করিয়া দ্বারকা ও কাঠিবারের অন্যান্য স্থান ভ্রমণ করেন ও তথা হইতে রাজপুতানায় কয়েক দিবস অতিবাহিত করিয়া খাইবার গিরিবর্ত্ম দেখিতে যান।

আমি পরদিন প্রাতে উজ্জয়িনী পৌছিলাম। উজ্জয়িনীতে নামিয়া ভাবিলাম, এ কি প্রাচীন ভারতের গৌরব সেই উজ্জয়িনী! নামিয়াই ষ্টেশনের নিকটে মহারাজ সিন্ধিয়ার মাতার নির্ম্মিত এক বিরাট্ ধর্ম্মশালার একটী প্রকোষ্ঠে স্থান পাইলাম। এখানে বৈদ্যুতিক পাখা ও আলোক আছে। ধর্ম্মশালার বহুসংখ্যক জলের কল। অতুশঙ্কর কাহাইয়ালাল নামক পাণ্ডাকে পাণ্ডা স্থির করিলাম ও তখনই টঙ্গায় উঠিয়া সহর অতিক্রম করিয়া সিপ্রা নদীতীরে উপস্থিত হইলাম। সিপ্রা ক্ষুদ্রনদী; নদীতে স্রোত দেখিলাম না, তবে প্রস্তর নির্ম্মিত বৃহৎ ঘাটের সম্মুখে জল

অপেক্ষাকৃত গভীর। জলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কচ্ছপ। স্নানাদি সমাপন করিয়া মহাকাল মহাদেব ও হরসিদ্ধি দেবী দর্শন করিলাম। মহাকাল দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম ও উজ্জয়িনী মোক্ষ-দায়িকা সপ্ততীর্থের অন্যতম। প্রত্যেক দ্বাদশ বর্ষ গতে এখানে সিপ্রাতীরে কুম্ভমেলা হয়। উজ্জয়িনী হইতেই প্রাচীন আর্য্য-জ্যোতিষ শাস্ত্রে অক্ষাংশ গৃহীত হইত, ইহাই ভারতের গ্রিন্‌উইচ্‌। বর্ত্তমান উজ্জয়িনী একটী নাতিক্ষুদ্র নগর, সিন্ধেরাজ্যের দক্ষিণাংশের রাজধানী, এবং ক্রমেই ইহার বাণিজ্যবৃদ্ধি হইয়া ও এখানে নূতন নূতন কল হইয়া ইহা সমৃদ্ধিশালী হইতেছে। এখানেও পাণ্ডার কোনও অত্যাচার নাই। যাহা দিলাম, তাহাতেই তিনি তুষ্ট হইলেন। আমার উজ্জয়িনী যাওয়ার কিছু পূর্ব্বেই মহারাজ সিন্ধে ফরাসীদেশে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি নিজরাজ্যের প্রভূত উন্নতি-সাধন করেন ও প্রজারঞ্জক ছিলেন। পাণ্ডাজী দুঃখ করিলেন যে প্রজাগণ রাজার মৃত্যুতে পিতৃমাতৃহীন হইয়াছে। দেশীয় রাজন্যের সুখ্যাতি শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। আসিয়া "ভিসি"তে ভোজন করিলাম ও রাত্রিতে পুনরায় ডাক গাড়ীতে উঠিলাম। এখন আমার গন্তব্যস্থান সাঞ্চি। সাঞ্চিতে ডাকগাড়ী থামে না, কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী পূর্ব্ববর্ত্তী ষ্টেশন ভূপালের ষ্টেশন মাষ্টারকে পূর্ব্ব হইতে সংবাদ দিলে সাঞ্চিতে গাড়ী থামান হয়। আমি ষ্টেশন-মাষ্টারকে প্রাতঃকালেই টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম ও এই জন্যই পর দিবস প্রাতঃকালে ডাকগাড়ী সাঞ্চিতে থামিল। সাঞ্চি ভূপাল-রাজ্যে; তখন বেগম রাজত্ব করিতেছিলেন। পূর্ব্ব হইতে সংবাদ দিলে ভূপাল রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্ত্তা সাঞ্চি যাইয়া দর্শককে সমস্ত দ্রষ্টব্য জিনিস দেখান। আমি সেই জন্য তাঁহাকে টেলিগ্রাম করি। তিনিও সাঞ্চিতে উপস্থিত হইলেন। ইনি বাঙ্গালী-খৃষ্টান বেশ সজ্জন। ষ্টেশনের নিকটই ডাক-বাংলা, তথায় আশ্রয় লইলাম। হিন্দুর খাদ্যের বন্দোবস্ত না থাকায় দুগ্ধ মাত্র পান করিলাম। ডাক্-বাংলার পার্শ্বেই পাহাড়ে সাঞ্চির বিখ্যাত স্তূপ ও তোরণ সমূহ; এ গুলি প্রাচীন ভারতের গৌরবের সামগ্রী। এই স্তূপ সম্বন্ধে সার জন মার্শালের উক্তি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। নিকটেই বিদিশাপুরী ছিল, তাহারই সান্নিধ্য হেতুই সাঞ্চি ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থলে বৌদ্ধ স্তূপাবলীর আধিক্য। লোকে এ গুলিকে ভিল্‌সা স্তূপাবলী বলিয়া থাকে। বৌদ্ধ-স্থাপত্য-শিল্পের এই সাঞ্চি স্তূপই সর্ব্বোত্তম নিদর্শন। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং ও ফাহিয়ান উভয়েই সাঞ্চির কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সম্রাট্ অশোকের এক জন পত্নীর নাম দেবী;

পশ্চিম-তোরণ—সাঁচি

তিনি বিদিশা-কন্যা। কথিত আছে, সাঞ্চিতে অশোক কুমার মহেন্দ্রর জন্য বিহার নির্ম্মাণ করেন। তিন শত ফুট উচ্চ পাহাড়ের উপর বিরাট্ স্তূপ, সম্মুখে অশোকস্তম্ভ বিদ্যমান। মহারাজ অশোকের বহু কীর্ত্তি এই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ অশোকের

গয়ার বোধিদ্রুমদর্শন যাত্রার চিত্র একটী তোরণে খোদিত দেখিলাম। পাটলিপুত্র, যে পাটলিপুত্রে এখন আমার বাস, তাহাও এই চিত্রে দেখিলাম। বৃহৎ স্তূপের চতুর্দ্দিক্ প্রস্তর-বেষ্টনী দ্বারা রক্ষিত। তাহার পর চতুর্দ্দিকে চারটী প্রস্তর-তোরণ, এই তোরণগুলির খ্যাতি দিগন্ত-বিশ্রুত। তাহাতে কত কারুকার্য্য, কত ভাস্কর্য্য শিল্পের নিদর্শন রহিয়াছে। তাহা যে কত সুন্দর, তাহা বর্ণনা করা যায় না। চৌদ্দ শত বর্ষব্যাপী সাধনার ফলে এই অপূর্ব্ব স্তূপাবলী ও নিকটস্থ বিহারাদি ও মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। একটী ক্ষুদ্র স্তূপের সম্মুখে আরও শিষ্য কাশ্যপ নৌকাযোগে নদী উত্তীর্ণ হইতেছেন, অপর একটীতে দেখিলাম বুদ্ধদেবের কপিলবস্তু হইতে নির্গমন। এই সব চিত্র হইতে তৎকালীন সামাজিক রীতিনীতি, যুদ্ধ-যাত্রা প্রভৃতি অনেক তথ্যই জানা যায়।

অশোক-স্তম্ভের উপরিস্থিত সিংহগুলি সারনাথে প্রাপ্ত সিংহ সদৃশই, মসৃণ প্রস্তরে গঠিত। যে বৃহৎ স্তূপটীর উল্লেখ করিয়াছি, তদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী স্তূপ বর্ত্তমান আছে। অনেকগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বিহারগুলি প্রায়ই গিয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এখানে মধ্য-ভারতের বৌদ্ধকেন্দ্র ও শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, কিন্তু কালবশে

উত্তর-তোরণের তক্ষণ-শিল্পের নমুনা—সাঁচি

একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র তোরণ আছে। প্রধান তোরণ চারিটী অন্ধ্ররাজগণ খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বেই নির্ম্মাণ করেন; তাহার পর রাজা শতকর্ণি, ক্ষত্রপরাজগণ ও পরবর্ত্তী কালে গুপ্তরাজগণ সাঞ্চির আরও উন্নতিসাধন করেন। ক্ষোদিত লিপিসমূহ হইতে ইহাও জানা যায় যে, অনেক ধনশালী ব্যক্তি ও বণিক্‌সঙ্ঘ সাঞ্চিতে স্তূপাদি নির্ম্মাণ করেন। বৃহৎ স্তূপটী ৫৪ ফুট উচ্চ ও উহার মস্তকে বেষ্টনী ও ছত্র আছে। ইহা অশোক নির্ম্মিত বলিয়া ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছেন। পরে ক্রমে ক্রমে ইহার সংস্কার ও বৃদ্ধি হইয়াছে। যে সব অপূর্ব্ব প্রতিকৃতি সাঞ্চির এই তোরণসমূহে খোদিত আছে, তাহার অধিকাংশই বুদ্ধদেব সংক্রান্ত। জাতকের উপাখ্যান ও বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলী এই প্রস্তরসমূহে প্রভূত পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। একটীতে দেখিলাম, মগধরাজ বিম্বিসার রাজগৃহ হইতে সসৈন্যে বুদ্ধদর্শনে যাইতেছেন, অন্যটীতে দেখিলাম, গয়ায় নিরঞ্জনা নদীর বন্যায় বুদ্ধ-সব নষ্ট হইয়া যায়। এত দিন ইহা অরণ্য মধ্যে নিহিত ছিল ও অধিকাংশই মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত ছিল; মধ্যে মধ্যে ইংরাজ সেনানায়ক আসিয়া অমূল্য প্রস্তর খণ্ডের অংশবিশেষ লইয়া যাইত। ইহা দেখিয়াই ফরাসী সম্রাট্ তৃতীয় নাপোলেয়োঁ সাঞ্চির একটী তোরণ চাহেন; ভাগ্যক্রমে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই। অবশেষে লর্ড কার্জনের চেষ্টার ফলে ভূপালের বেগম মহোদয়া সার জন মার্শালের সাহায্যে এই অমূল্যরত্নগুলির যতদূর সম্ভব উদ্ধার করিয়াছেন ও এখনও এ উদ্ধার কার্য্য চলিতেছে দেখিলাম। যে প্রধান স্তূপটী আছে, তাহার নিকটে অন্য যে কয়েকটী স্তূপ এখনও আছে, তাহার মধ্যে দুইটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটীতে বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্র ও মহামৌদ্গল্যায়নের অস্থি প্রভৃতি রক্ষিত ছিল; লিপি হইতে ইহাই প্রমাণিত হয়। নিকটেই একটী চৈত্য-মন্দিরও আছে; তাঁহার স্তম্ভগুলি বড়ই সুন্দর; এটী গুপ্ত সম্রাট্‌গণের রাজত্বকালে, যখন ভারতশিল্পের পূর্ণ

পরিণতি, সেই সময়ে নির্ম্মিত। ভিক্ষুদের আবাসগৃহ-গুলি যাহা এখন আছে, তাহা অধিকাংশই এত দিন মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত ছিল; এখনও সেগুলির উদ্ধার হইতেছে দেখিলাম। মধ্যস্থলে প্রাঙ্গণ ছিল, চতুর্দ্দিকে ভিক্ষুদের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ছিল। সাঞ্চির অমূল্য শিল্পের স্মৃতি শীঘ্র লুপ্ত হইবার নহে।

দক্ষিণ-তোরণের কেশরীদ্বয়—সাঁচি

সেই দিনই বৈকালে সাঞ্চি ত্যাগ করি ও প্রাতঃকালে মহারাজ সিন্ধের রাজধানী গোয়ালিয়ার পৌছি। টঙ্গা-যোগে নগরমধ্যে পার্ক হোটেল নামক হোটেলে গেলাম। এই প্রকাণ্ড হিন্দু হোটেলটী দ্বিতল। দ্বিতলে একটা কক্ষ লইলাম। তাহাতে একটী অপেক্ষাকৃত বড় ঘর, দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ও সম্মুখে কতকটা খোলা ছাদ। প্রাতঃকৃত্য সমাপনের পর গোয়ালিয়র ও লস্কর সহর দেখিলাম। তাহার পর "গোয়ালিয়ারের" বিখ্যাত "দুর্গ" দেখিতে গেলাম। দুর্গদ্বারে প্রবেশের জন্য পাশ বা ছাড়পত্র পাইলাম। টঙ্গা দুর্গদ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিল। দুর্গের উপর উঠিবার জন্য ভাল রাস্তা আছে। আমি পদব্রজে দুর্গমধ্যে চলিলাম। দুর্গটি প্রায় দেড় মাইল লম্বা ও এক হাজার ফুট চওড়া। ইহা ৩৪২ ফুট উচ্চ এক পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত। চারিদিকের পাহাড় প্রায় সোজা হইয়া সমতলভূমি হইতে উঠিয়াছে ও এই জন্যই এ দুর্গ দুর্ভেদ্য ছিল। রাস্তাতে উঠিতেই অনেক মূর্ত্তি দেখিলাম, তাহার অধিকাংশই অঙ্গবিহীন। বাবর বাদসাহ এই দুর্গজয় করেন ও তিনি নিজ জীবনীতে লিখিয়াছেন যে ইহা দুর্গশ্রেষ্ঠ, কিন্তু অনেক দেবমূর্ত্তি থাকাতে ইহা জঘন্য স্থান, সেই জন্য তিনি দেবমূর্ত্তিসমূহ ধ্বংসের আদেশ দেন।
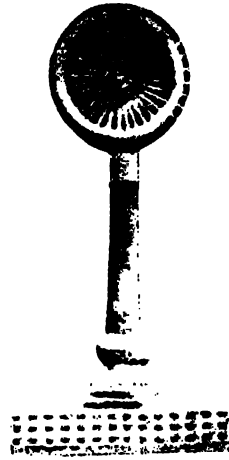
ধর্ম্মচক্র　　পদ্ম ও ত্রিশূল

উপরে উঠিতেই প্রথমতঃ একটা প্রাসাদ দৃষ্ট হয়, এটীর নাম গুজারী প্রাসাদ। ইহা এখন যাদুঘর ("মিউ-জিয়ম") রূপে ব্যবহৃত হয়। আরও উপরে উঠিয়া প্রথমে রাজা মানসিংহের প্রাসাদ দেখিলাম। উহা তদানীন্তন গোয়ালিয়ারের রাজা মানসিংহ—পাঠান-রাজত্ব কালে নির্ম্মাণ করেন। এ প্রাসাদ বিস্তৃত ও সুন্দর কারুকার্য্য-বিশিষ্ট। ইহারই অন্ধকারপূর্ণ নীচের একটী প্রকোষ্ঠে আরংজেব তাঁহার ভ্রাতা মুরাদকে বহুকাল বন্দী অবস্থায় রাখেন ও ইহা অনেক কাল মোগল বাদসাহগণের রাজকীয় কারাগার রূপে ব্যবহৃত হইত। তাহার পর দেখিলাম, শাশবহু (শাশুড়ী-বৌ) মন্দির ও তেলিকি মন্দির। এ দুইটী মন্দিরই প্রস্তর-নির্ম্মিত ও দুইটীই অপূর্ব্ব কারুকার্য্য-বিশিষ্ট। বস্তুতঃ এক ইলোরার ইন্দ্র-সভা ব্যতীত এত সূক্ষ্ম অথচ সুন্দর কারু-কার্য্য এ যাত্রায় কোথায়ও দেখি নাই। উভয় মন্দিরই মুসলমান রাজত্ব-

কালে নষ্ট হয় ও পূজার জন্য ব্যবহার হয় না। সর্ব্বশেষে দেখিলাম জৈনমন্দির ও পর্ব্বত গাত্রে ক্ষোদিত জৈন তীর্থঙ্করগণের বিরাট্ মূর্ত্তি-সমূহ। ইহার কোনও কোনওটী ৩০।৪০ হাত উচ্চ। এ মূর্ত্তি গুলিরও অঙ্গহানি হইয়াছিল, পরে জৈনরা সংস্কার করিয়াছেন। এ গুলি দেখিতে দুর্গের অপর একটী দ্বার দিয়া যাইতে হইয়াছিল ও নূতন ছাড়-পত্র লইতে হইয়াছিল।

শ্রীদেবী

স্থাপত্যশিল্পে পদ্ম

গোয়ালিয়ার দুর্গ দেখিয়া মহারাজার প্রাসাদ দেখিলাম। হোটেলে আসিয়া আহারের পর গোয়ালিয়ার ত্যাগ করিলাম ও বেলা তিনটার সময় আগরা পৌছিলাম। আগরাতে একটী বাঙ্গালী হোটেল আছে; তাহাতেই গিয়া উপস্থিত হইলাম। আগ্রা অনেক পাঠকই দেখিয়াছেন, সুতরাং আগ্রার বর্ণনা আর করিব না। আগরা আমি পূর্ব্বে তিন বার গিয়াছি, তবুও পুনরায় তাজমহল ও আগরার অন্যান্য অপূর্ব্ব সৌধসমূহ দেখিলাম। পর দিন মোটরযোগে "ফতেপুর সিক্রি" গেলাম। রেলেও যাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে ফিরিতে সন্ধ্যা হইবে ও আমার সময়াভাব, এই হেতু যাতায়াত পঁচিশ টাকা ভাড়ায় এক মোটর কার লইলাম, কিন্তু কপালগুণে মোটর ফিরিবার পথে খারাপ হওয়ায় অবশেষে শেষ ১২ মাইল রাস্তা একায় আসিলাম। যদি একা না পাওয়া যাইত, ট্রেণেই আসিতে হইত। হোটেল হইতে এক সহযাত্রী পাইয়াছিলাম। ফতেপুর সিক্রীর বিখ্যাত "বুলন্দ দরোয়াজা" (ইহাই না কি পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ তোরণ), 'আকবর বাদশাহ্‌র গুরু সেলিম চিস্তির মার্ব্বল পাথরের সুন্দর মকবরা আকবার বাদশাহ্ এবং তাঁহার অমাত্যগণের প্রাসাদ ও মসজিদ দেখিয়া দুপ্রহরে আগরা ফিরিলাম ও আহারান্তে ট্রেণে উঠিয়া বৈকালে বৃন্দাবন পৌছিলাম। বৃন্দাবনও আমি তিন বার গিয়াছি। তথায় বন্ধুবর কুমার শরদিন্দু নারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতার দুইটী মন্দির বা "কুঞ্জ" আছে। তন্মধ্যে ছোট মদন মোহনের কুঞ্জে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে দিন রাত্রেই গোবিন্দজী, গোপীনাথ, মদনমোহন, লালা বাবুর মন্দির, শেঠের মন্দির, সাহজীর মন্দির প্রভৃতি প্রধান মন্দিরগুলি দেখিলাম ও পর দিন কুঞ্জের পরমভক্ত কামদার মহাশয়ের সঙ্গে কতকগুলি বনদর্শন করিয়া অনেকগুলি বৈষ্ণব ভক্তের সহিত আলাপ করিয়া ধন্য হইলাম। তৃতীয় দিবসে মথুরা আসিয়াই স্নানান্তে টঙ্গাযোগে গোবর্দ্ধন ও রাধাকুণ্ড দর্শন করিলাম। গোবর্দ্ধনে আমার পূর্ব্বপরিচিত কয়েক জন বৈষ্ণব সাধু থাকেন; ভরতপুর মহারাজার ছত্রিতে তাঁহাদের আখড়া। তাঁহাদের প্রধান সনাতন দাস বাবাজী। সেখানে কিছু দিন পূর্ব্বেই ছয়মাস-ব্যাপী অহোরাত্র কীর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সে দিন একাদশী; কীর্ত্তন হইতেছে। গদাধরদাস বাবাজীর সমতুল্য কীর্ত্তনগায়ক কমই আছেন। তিনি গাহিলেন; শুনিয়া বিমোহিত হইলাম। পরে ভক্তগণের সহিত একাদশীর পারণ করিয়া বৈকালে মথুরা আসিলাম ও বিশ্রাম ঘাটে আরতি ও দ্বারকাধীশ এবং কুব্জানাথ দর্শন করিয়া মথুরা ত্যাগ করিলাম। পর দিন কাশীতে আসিয়া এক দিন থাকিয়া ২৯শে আশ্বিন পুনরায় পাটনা ফিরিলাম। প্রাচীন ভারতের যে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি গুলি দেখিয়া আসিলাম, তাহার পবিত্র স্মৃতি ইহজীবনে লোপ পাইবে না।

কমলকুমারী

(উপন্যাস)

[স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি শেষ না হইতে ঘোর অন্ধকার থাকিতে, অরবিন্দ গঙ্গাস্নানে যাইলেন। স্নানের ঘাটে বড় ভিড়, অনেক গুলি স্ত্রীলোক তাহার ন্যায় ঘোর অন্ধকারে স্নান করিতে আসিয়াছে, অরবিন্দ তাহাদের কিঞ্চিৎ দূরে নামিয়া স্নান করিতে লাগিলেন, প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা জলে নিমগ্ন রহিলেন ; তৎপরে উপরে আসিয়া যেখানে তাহার শুষ্ক বসন ও উত্তরীয় রাখিয়া গিয়াছিলেন সেইখানে আসিয়া দেখিলেন, যেন কেহ তাহা খুলিয়াছিল, কারণ তিনি কাপড় খানি উত্তরীয়ের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, আসিয়া দেখিলেন দুইটী খোলা রহিয়াছে। যাহা হউক যখন কাপড় চাদর পাইলেন, তখন ও-বিষয়ে আর কোনও রূপ চিন্তা না করিয়া পরিধান করিলেন, পরে গুরুদেবের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। প্রায় দশটার সময় বাটী পৌছিয়া দেখিলেন যে তাহার দেশের বাটী হইতে এক জন দ্বারবান তাহার প্রধান কর্ম্মচারীর এক খান পত্র লইয়া আসিয়াছে ; পত্র খানি পড়িয়া ক্রোধে তিনি অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। পত্র খানি পাঠে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতির সুবিধা পাইয়া দেশের ফৌজদার তাহাদের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেছে ও জমিদারীর কিয়দংশ ছুতানতা করিয়া কাড়িয়া লইয়াছে। তিনি যে নবাব সৈন্যের এক জন প্রধান নায়ক ও তাঁহার এক জন প্রিয় সহচর ছিলেন, ফৌজদার তাহা ভালরূপ জানিয়াও যে এইরূপ ব্যবহার করিতেছেন ইহাতে তিনি একটু বিস্মিত হইলেন। পরে পত্রের শেষাংশে পড়িয়া তাঁহার ক্রোধের মাত্রা বাড়িয়া গেল। উহাতে লেখা আছে যে, তাহার শ্যালক বামনদাস ঘোষাল তাহাদের গ্রামে আসিয়াছিলেন, তাহার পত্নীকে খুঁজিতে। তিন প্রকাশ করিয়াছেন যে তিনিই তাঁহার পত্নীকে তাঁহার গৃহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। তাহার পত্নীকে উদ্ধার করিবার মানসে তাঁহার ঠিকানা জানিবার চেষ্টায় আসিয়াছিলেন। অসাবধানতাবশতঃ কোন ব্যক্তি তাহাকে ঠিকানা বলিয়া দিয়াছে। তিনি সেই দিবস ঐ গ্রামে ত্যাগ করিয়া বোধ হয় কাশীধামে গিয়াছেন। ঘোষাল মহাশয়ের অভিপ্রায় ভাল নয় বুঝিতে পারিয়া, কার্য্যাধ্যক্ষ ভীত হইয়া তাঁহাকে সতর্ক করিবার জন্য বাটীর এক জন দ্বারবানকে পত্র দিয়া পাঠাইলেন, পত্রখানি পড়িয়া অরবিন্দ স্থির করিলেন যে, তাহার বিষয় ধর্ম্মার্থে দান করিবেন, সেজন্য একবার বাটী যাওয়া উচিত কিন্তু আপাততঃ নহে ; এক্ষণে বিষয় রক্ষার জন্য তাহার এক জন আত্মীয় নবাবের প্রিয় সহচরকে একখানি পত্রদ্বারা ফৌজদারের অত্যাচারের কাহিনী সকল আনুপূর্ব্বিক জানাইলেন ও তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, যেন পত্রখানি নবাবকে দেখান হয়। আর বামনদাস দ্বারা তাঁহার কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভবনা—এ সংবাদটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া অরবিন্দ দ্বারবানকে তাঁহার কাশীর বাটীতে মাস খানেকের জন্য থাকিবার হুকুম দিলেন, পরে আহারাদি করিয়া নিদ্রা গেলেন। গত রাত্রে নিদ্রা যান নাই, সেজন্য অপরাহ্নে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিল। এই সময়ে ক্ষমা দাসী আসিয়া বলিল, যে সে রূপচাঁদের সহিত জয়াবতী ও তাহার মাতাকে দেখিতে গিয়াছিল, রূপচাঁদ সেখানে রহিল আর জয়াবতীর মাতা তাঁহাকে তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছে। অরবিন্দ ইহা শুনিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, উদ্যোগ আর কি, উত্তরীয় লইয়া গাত্রাবরণ করিলেন। উত্তরীয় খানি লইবামাত্র দেখিলেন উহার এক কোণে কি বাঁধা আছে, কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া উহা খুলিলেন, দেখিলেন এক খানি সামান্য কাগজে কি লেখা আছে। ব্যগ্রভাবে উহা পড়িতে লাগিলেন, উহাতে এইরূপ লেখা আছে,—"বামনদাস ঘোষাল কাশী আসিয়াছে ও আপনার অনুসন্ধান করিতেছে, আমি তাহাকে বিশেশ্বরের মন্দিরে দেখিয়াছি, ও তাহাকে অনেক অপরিচিত ব্যক্তির সহিত আপনার

কথা লইয়া আলোচনা করিতে শুনিয়াছি, তাহাতে আমি বুঝিয়াছি যে, সে ব্যক্তি আপনার পরম শত্রু হইয়াছে ও আপনার প্রতি তাহার অভিসন্ধি ভাল নহে, সাবধানে থাকিবেন। আর সন্ন্যাসীর বেশ ত্যাগ করিবেন, আমার অনুরোধ রাখিবেন—আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী * *

পত্র খানি যে কোন স্ত্রীলোকের লিখিত তাহা হস্তাক্ষরে বুঝিতে পারিলেন, এবং উহা যে প্রত্যূষে গঙ্গা-স্নান কালীন কেহ তাহার উত্তরীয়ে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল তাহাও এখন বুঝিতে পারিলেন, পত্রখানি পড়িয়া আর এক দিনের ঘটনা মনে পড়িল, তাহার কাণে কাণে কোন স্ত্রীলোক বলিয়াছিল, "ছি এ বেশ ত্যাগ কর"—ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার কণ্ঠস্বর মনে পড়িল, জয়াবতীকেও মনে পড়িল, আর মনে হইল যেন কমলকুমারীর সহিত তাহার সাদৃশ্য রহিয়াছে, মনে পড়িবা মাত্র অরবিন্দের মাথা ঘুরিয়া উঠিল, বড় গোলে পড়িলেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। দ্রুত পদে জয়াবতীর বাটীর দিকে চলিলেন, কেন না যদি কেহ এই জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারে তবে সে জয়াবতী, কিন্তু জয়াবতী এ পর্য্যন্ত তাহার সম্মুখে বাহির হন নাই। তাহাদের বাটীতে উপস্থিত হইয়া জয়াবতীর সহিত সাক্ষাৎ-প্রার্থী হইলেন। তাহার মাতা আসিয়া অরবিন্দকে বসাইলেন ও কাঁদিতে লাগিলেন। অরবিন্দ হঠাৎ তাঁহার এই ক্রন্দনের কারণ বুঝিতে না পারিয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি শান্ত হইলে, অরবিন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা আবার কিছু নতুন ঘটিয়াছে না কি ?"

উত্তরে জয়াবতীর মাতা বলিলেন,—"না বাবা রূপচাঁদের নিকট কমলের দুঃখ কষ্ট ও অবশেষে আত্মহত্যার কথা শুনিয়া কাঁদিতেছি, আমাদের সেই আদরের কমলের অদৃষ্টে কি এই ছিল ?"

"মা আমার কোন অপরাধ নাই, যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তাহার জন্য বিশেষ রূপে প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি।"

"সেই জন্যই কি সন্ন্যাসী হইয়াছ ?"

"হাঁ আর আমার বিষয় আশায় যাহা কিছু আছে, তাহা ধর্ম্মার্থে দান করিব ?"

"না না, তা করিও না।"

"আমার আর কে আছে কাহার জন্য বিষয় রাখিব ?"

"তুমি ভোগ করিবে তোমার আবার ভাল দিন হবে, এরূপ মনের অবস্থা চিরদিন থাকবে না।"

"মা আপনি আমার মনের অবস্থা ঠিক বুঝ্‌তে পারেন নি, পার্‌বেনও না বোধ হয়।"

এই সময় অন্তরাল হইতে কে এক জন যেন বিদ্রূপভরে বলিল, "অনেকের ত স্ত্রী মারা যায়—সকলেই কি বিষয় ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়—ছিঃ! এ বেশ ত্যাগ করে বাটী ফিরে যাও, বিষয় ভোগ করগে—আবার একটা বিয়ে কর গে।"

আবার সেই কণ্ঠ স্বর, অরবিন্দ শিহরিয়া উঠিলেন, শরীর কণ্টকিত হইল। এ-দিক ও-দিক চাহিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, বুঝিলেন জয়াবতী তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কথাগুলি বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে জয়াবতীর মাতা বলিলেন—"রূপচাঁদের নিকট কমলের জীবনের ঘটনাগুলি ও আত্মহত্যার কথা শুনিয়া অবধি জয়া কেবল কাঁদিতেছে, আজ আর খায় দায় নাই, কমল অপেক্ষা জয়া তিন মাসের বড় ছিল, দুই জনে এত ভাব ছিল, যে কেহ কাহাকেও চোখের আড়াল করতে পার্‌ত না। দুই জনে এক পাতে খেতো, এক বিছানায় শুতো। একত্রে লেখা পড়া কর্‌তো—এত ভালবাসা বাসি কেহ কখন দেখে নি।"

"দুই জনে কি লেখা পড়া শিখেছিলেন ?

"হাঁ তোমার মামাশশুর এক জন গুরুমশাই রাখিয়া উহাদের বাড়ীতে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, দুই জনেই ভাল লিখতে পড়তে পারে।"

এই কথায় অররবিন্দের একটা বিষয় মীমাংসা হইল যে, জয়াবতী লিখিতে জানিতেন কিন্তু হিন্দুরমণীর পক্ষে স্বামী সম্বন্ধে ঐ-রূপ পত্র লেখা কি সম্ভব ? বামনদাস তাহার স্বামী, স্বামীকে দেখিয়া তিনি চুপ করিয়া থাকিবেন, মাতা ও ভগিনীদের জানাইবেন না, ইহাও কি সম্ভব ? সুতরাং জয়াবতী যে পত্রের লেখিকা নন সে বিষয়ে একরূপ স্থির সিদ্ধান্তই করিয়া ফেলিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়া অন্ধকার হইলে অরবিন্দ বলিলেন, "আজ আসি মামী-মা। আবার কাল আস্‌বো। দিদির (জয়াবতীর) সহিত কি একবার দেখা হবে না ?"

তিনি বলিলেন, "বোধ হয় না, সে কমলের কথা শুনে অবধি বিছানায় শুয়ে আছে, তবে তুমি এসেছ শুনে তোমাকে ঐ সকল কথা বলে গেল।" অরবিন্দ উঠিলেন, মামীশাশুড়ী দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইলেন। রূপচাঁদ এই সময় দেখা দিল, তাহাকে—দেখিয়া মামী-শাশুড়ী বলিলেন, "আমায় দাদা কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গেছেন, যত দিন তিনি বাটী ফিরে না আসেন, তত দিন রূপচাঁদ এখানে থাক।"

অরবিন্দ বলিল,—"রূপচাঁদ আপনার বহুকালের চাকর আপনার কাছেই থাক।"

ইহার পর মামীশাশুড়ী বলিলেন,—"আজ তোমার বাড়ী দেখেছি, অন্ধকার থাকতে থাকতে গঙ্গাস্নানে গেছলাম, ভাল দেখতে পাই নি, ফিরে আসবার সময়, একটু ফর্‌সা হয়েছিল জয়া তোমার বাড়ী দেখিয়ে দেয়।"

"তিনিও কি আজ গঙ্গাস্নানে গেছলেন?"

"হাঁ সে প্রতিদিন আমাদের সঙ্গে স্নানে যায়—আজ যাবার সময় বড় অন্ধকার ছিল।"

আর একটা বিষয় মীমাংসা হইল, জয়াবতী অতি প্রত্যুষে তাহার স্নানের ঘাটে অন্ধকারে উপস্থিত ছিলেন তিনিই কি ঐ চিঠিখানি তাহার উত্তরীয়ে বাঁধিয়াছিলেন, বড় গোলের কথা হইল। জয়াবতী লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিলেন। যে সময় তিনি স্নান করেন ঐ সময়ে সে ঘাটে জয়াবতী উপস্থিত ছিলেন, তিনিই কি ঐ পত্রখানি তাহাকে লিখিয়াছিলেন। অরবিন্দ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

আমরা বলি যে এ বিষয়টা লইয়া এত মাথা কোঁঠাকুঠি কেন? যদি জয়াবতী লিখিয়া থাকে তাহা তোমার জানিয়া লাভ কি? যে লিখিয়াছে সে যে তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও অলক্ষ্যে তোমার মঙ্গল-চেষ্টা করিতেছে ইহা জানিয়া সন্তুষ্ট থাক।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অরবিন্দ প্রায় প্রতিদিন জয়াবতীকে দেখিবার জন্য তাহাদের বাটীতে যাইতেন, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইতেন না। তিনি তাঁহার সম্মুখে বাহির হইতেন না। সম্পর্কে তিনি বড় শালী—পূর্ব্বে দেখা সাক্ষাৎ না হইলেও সম্বন্ধ যখন বাহির হইয়া পড়িয়াছে তখন তাহার সম্মুখে বাহির হইতে কি দোষ আছে! ইহা ছাড়া আরও কয়েকটা ঘটনায় তাহার মন সন্দেহ-দোলায় দুলিতে লাগিল। মন্দির মধ্যে জয়াবতীর কণ্ঠস্বরে কে তাঁহাকে বলিয়াছিল, "ছিঃ এ-বেশ ত্যাগ কর।" পরে বামনদাস সম্বন্ধে পত্রের দ্বারাই কেইবা তাহাকে সতর্ক করিয়াছিল ও সেই পত্রের মধ্যেই তাহাকে সন্ন্যাসি-বেশ ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। তার পর কমলকুমারীর সহিত জয়াবতীর সাদৃশ্য এই সকল কারণে জয়াবতীকে দেখিবার ইচ্ছা তাহার প্রবল হইয়াছিল। এ ইচ্ছার মূলে রূপ-তৃষ্ণা ছিল না—পতঙ্গের অনল-প্রীতির ন্যায় এ ইচ্ছায় আত্ম বিসর্জ্জনের ভাব নাই—ইহার মধ্যে এই ভাবই দেখা যায় যে যদি কোন শোকাতুর ব্যক্তি কাহারও সহিত তাহার মৃত প্রিয়জনের সাদৃশ্য দেখে, তাহা হইলে তাহাকে সে যেমন দেখিতে ইচ্ছা করে। এ সেই রূপ ইচ্ছা। কিন্তু অরবিন্দ তোতারাম পরমহংসের শিষ্য। তাহার নিকট কথঞ্চিৎ শিক্ষা পাইয়াছিল। তাহার এইরূপ এক জন যুবতী স্ত্রীলোককে দেখিবার ইচ্ছা প্রশমিত করাই উচিত ছিল, কেন না উহাতে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। যাহা হউক তিনি দিন দিন জয়াবতীকে দেখিতে যাইতেন বটে, কিন্তু তাহার সহিত দেখা হইত না। জয়াবতীর মুখ-শ্রী সুন্দর কি কুৎসিত, কি প্রকার বর্ণ, মলিন, কি তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় তাহা কিছুই দেখিতে পান নাই। কেবল মাত্র অনুমানে বুঝিয়াছিলেন যে কমলকুমারীর সহিত তাহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

এই রূপ মনের অবস্থায় অরবিন্দ বাটী আসিয়া আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। রাত্র দ্বিপ্রহর অতীত হইলে হঠাৎ কি একটা শব্দে তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিল, শয়ন-কক্ষে জানালা—কয়টী খোলা ছিল, চন্দ্রালোকে অরবিন্দ দেখিলেন, যে এক ব্যক্তি তাহার সম্মুখের জানালার গরাদ কাটিতেছে, উহা কাষ্ঠনির্ম্মিত সাধারণ অস্ত্রের দ্বারায় কাটা যায়—অরবিন্দ উঠিয়া বসিলেন তৎক্ষণাৎ সে ব্যক্তি অন্তর্হিত হইল, অরবিন্দ অতি-দ্রুত পদে জানালার নিকট আসিয়া দেখিলেন, যে এক ব্যক্তি একটী গেঁটে বাঁশ দিয়া উঠিয়া ছিল। এক্ষণে নামিতেছে, চন্দ্রালোকে তাহাকে চিনিতেও পারিলেন, সে বামনদাস

ঘোষাল। অরবিন্দ এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে বামনদাস তাহার মৃত্যু কামনায় অসিয়াছিল, তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বামনদাস বাবু আপনার স্ত্রী জয়াবতী তাহার মাতার সহিত তাহার মামার বাটীতে আছেন, এই বাটী হইতে দুই বাটী অন্তরে।" বামনদাস দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ অরবিন্দর প্রতি চাহিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, "তোমার উপপত্নী হইয়া তোমার আশ্রয়ে আছেন না কি।"

"না, তিনি তাহার মামার আশ্রয়ে আছেন, তাহার মাতা, মামী দুই মামাত ভগিনী সেখানে বাস করেন।"

উত্তরে সে বলিল, "আচ্ছা বোঝা যাবে।" এই বলিয়া তাহার হস্তস্থিত ছোরা দেখাইয়া চলিয়া গেল।

বামনদাস অদৃশ্য হইলে অরবিন্দ বড় চিন্তিত হইলেন।—ভাবিলেন, জয়াবতীর বাসস্থানের ঠিকানা বলিয়া দিয়া কি কুকাজ করিয়াছেন, এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, বামনদাস ক্ষিপ্ত হইয়াছে। কোন কাজ তাহার অসাধ্য নহে, সে জয়াবতীর অনুসন্ধান করিয়া তাহার জীবন নষ্ট করিতে পারে। সমস্ত রাত্রি এই চিন্তাতে তাহার নিদ্রা হইল না। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে, পর দিন জয়াবতীর মাতাকে বামনদাসের কাশীতে আগমন ও তাহার মানসিক অবস্থা জানাইবেন, কিন্তু পর দিবস গুরুদেবের কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় দিবসে যাইতে পারেন নাই, সন্ধ্যার পর জয়াবতীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র অন্ধকারে সম্মুখে দুই তিনটী স্ত্রীলোক দেখিয়া রূপচাঁদকে ডাকিলেন। তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া স্ত্রীলোকেরা সরিয়া গেল; তন্মধ্যে যে জয়াবতী ছিল তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাহার মামী-শাশুড়ী আসিয়া তাহাকে বসাইল ও কথা কহিতে লাগিলেন অল্পক্ষণ পরে অরবিন্দ বলিল—

"আপনার জামাতা কাশীতে এসেছেন, শুনিয়াছেন কি?"

"হাঁ শুনেছি।"

"তিনি কি এ বাটীতে এসেছিলেন।"

"না।"

"তবে কেমন করে জান্‌লেন?"

"মেয়েদের মুখে শুনেছি তাহারা তাঁকে বিশেশ্বরের মন্দিরে দেখেছিল।"

"তাঁহাকে এ বাটীতে আনলে ভাল হয় না? বোধ হয় তাঁহার স্ত্রীর নিকট রাখ্‌লে তিনি আরোগ্য হতে পারেন।"

"বাবাজীর মাথার যেরূপ অবস্থা তাতে মেয়ের আমার প্রাণের আশঙ্কা পর্য্যন্ত আছে, জয়াবতী আমার সর্ব্বস্ব ধন, আমি তাকে দুরন্ত পাগলের সঙ্গে থাকতে দিতে পারব না, আর জয়াবতীও তাহার নিকট থাকতে ভয় পায়।"

এই কথোপকথনের পরে অরবিন্দ প্রস্তরবৎ বসিয়া রহিল, সেই জটিল বিষয়টার এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে মীমাংসা হইল যে, যে তাঁহাকে মন্দিরের মধ্যে কাণে কাণে বলিয়াছিল, "ছি, সন্ন্যাসিবেশ ত্যাগ কর" সে জয়াবতী —যে বামনদাস সম্বন্ধে তাঁহাকে পত্র দ্বারা সতর্ক করিয়াছিল, —সে জয়াবতী, যে অলক্ষ্যে তাঁহার মঙ্গলচিন্তা করিতেছে, সে—জয়াবতী। জটিল বিষয়টার এইরূপ মীমাংসা হওয়াতে অরবিন্দর চিত্ত জয়াবতীর প্রতি আরও আকৃষ্ট হইল; তাহাকে দেখিবার জন্য প্রবল বাসনা জন্মিল, কিন্তু দেখিতে পাইলেন না; অধীর হইয়া বাটী ফিরিলেন, মনের চঞ্চলতা-বশতঃ একস্থানে থাকিতে পারিলেন না। আরতি দেখিবার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। উপরে নীল আকাশের দিক চাহিয়া দেখিলেন, কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথি, অর্দ্ধরজনী তিমিরাবৃতা, অর্দ্ধরজনী চন্দ্রালোকভূষিতা, নীল নভোমণ্ডল সহস্র সহস্র নক্ষত্রখচিত। অরবিন্দ ধীরে ধীরে অনন্যমনে চলিলেন, তাঁহার মামী-শাশুড়ীর বাটীর নিকটে আসিয়া এক চীৎকার শুনিলেন, কণ্ঠস্বরে বুঝিলেন রমণীর চীৎকার তখনই সাহার্য্যার্থ ছুটিলেন। রূপচাঁদও তাহার পুরাতন মনিবের বাটী হইতে ঐ চীৎকার শুনিয়া তাঁহার পশ্চাৎ দৌড়িল? রূপচাঁদের সেকালের ডাকাতি হুঙ্কার শব্দে আক্রমণকারী ঐ স্ত্রীলোককে ছাড়িয়া পলাইল। তিনি আর কয়েকটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে আরতি দেখিতে যাইতেছিলেন আর গেলেন না। সন্ন্যাসিনী-দিগের আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। পথিমধ্যে রূপচাঁদের সহিত অরবিন্দর দেখা হওয়াতে ঐ ঘটনা সম্বন্ধে কথোপ-কথন হইতেছিল। ইতিমধ্যে কে এক জন অন্ধকারে অরবিন্দর সমক্ষে দাঁড়াইল, তাহাকে দেখিবামাত্র অরবিন্দ বলিলেন, "কে বামনদাস বাবু আপনার এই কাজ!"

বামনদাস উত্তরে বলিল, "হাঁ আমার এই কাজ, আমি যদি বলপূর্ব্বক কাহাকে লইয়া যাই, তুই হারামজাদা বাধা দিবার কে?" এই বলিয়া তাহার হস্তস্থিত লাঠি অরবিন্দের মস্তক লক্ষ্য করিয়া উত্তোলন করিল, কিন্তু অরবিন্দ বাল্যকাল হইতে লাঠিখেলা শিখিয়াছিলেন এবং এক জন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন, অবলীলাক্রমে তিনি ঐ লাঠির আঘাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিলেন। এই ঘটনা সন্ন্যাসিনীদিগের আশ্রমের নিকট হইতেছিল, কতিপয় সন্ন্যাসিনী সেখানে উপস্থিতও ছিলেন, তন্মধ্যে প্রধানা পদ্মাবতী, অরবিন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎস আমাকে কি চিনিতে পার?"

"পারি, আমি যখন বর্দ্ধমানে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়ে পড়েছিলাম আপনি আমাকে রক্ষা করেছিলেন, পরে সে দিন আমার গুরুদেব তোতারাম পরমহংসের আশ্রমে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয়েছিল।"

"তুমি আজ রাত্রে এই আশ্রমবাসিনী এক জনকে ঐ নৃশংস পাষণ্ডের হাত হতে রক্ষা করেছ, আজ রাত্রে আমাদের আতিথ্য স্বীকার করতে হবে।"

"মা, এ স্ত্রীলোকের আশ্রম, আমার কি এখানে রাত্রিতে থাকা উচিত?"

"আমি যখন বলচি তখন অনুচিত নহে, এস। দেখ সাবধান থেকো, ঐ পাষণ্ড যেন রাত্রিযোগে এই গৃহে প্রবেশ করে তোমার কোনরূপ অনিষ্ট না করে।"

অরবিন্দ এক্ষণে বুঝিলেন যে তাঁহাদের আশ্রমে পাহারা দিবার জন্য সন্ন্যাসিনী তাঁহাকে রাত্রিকালে থাকিতে বলিয়াছেন, তিনিও অগত্যা স্বীকৃত হইলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাসিনীরা অরবিন্দকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইয়া আপন আপন কক্ষে শয়ন করিতে গেলেন। প্রধানা পদ্মাবতী অরবিন্দকে নিম্নতলের একটী কক্ষে শয়নের ব্যবস্থা করাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

রজনী ত্রিযামা, এখন আর তিমিরাবৃতা নহে, সপ্তমীর চন্দ্রালোক-বিধৌতা, কিন্তু চন্দ্ররশ্মি বড় উজ্জ্বল নহে, হঠাৎ কোন একটা শব্দে অরবিন্দের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল; তিনি উঠিয়া বসিলেন, তাঁহার সন্দেহ হইল যেন কোন এক জন গবাক্ষ ভাঙ্গিয়া ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে দেখিতে ঠিক বামনদাসের মত। অতি মৃদু পদসঞ্চালনে যে কয়েকটী গবাক্ষ ছিল অন্ধকারে সেই সেই স্থানে গিয়া তাহা পরীক্ষা করিলেন, একটী গবাক্ষ-ছিদ্র হইতে আলোক দেখিতে পাইলেন, অতি সন্তর্পণে গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া দেখিলেন যে উহার পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র কক্ষে ক্ষীণ দীপালোকে একটা রমণী বোধ হইল আসনে বসিয়া জপ করিতেছেন; উহাকে যুবতী বলিয়া ধারণা হইল। অরবিন্দ ভাবিলেন, এই স্ত্রীলোকটীর অল্পবয়স—এই বয়সে পরমেশ্বরের প্রতি এত ভক্তি, ধন্য ইহার জীবন! এ জীবনে তাঁহার নিজের কিছু শিক্ষাই হইল না, এমন উপদেষ্টা পাইয়াও কিছু শিখিতে পারিলেন না, কেবল মরীচিকার পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, যাহাকে জন্মের মত হারাইয়াছেন তাহার জন্য মিথ্যা ঘুরিয়া মরিতেছেন। এই অল্পবয়স্কা যুবতীর ঈশ্বরের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা ও ভক্তি দেখিয়া বিস্ময়ে অরবিন্দ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহার জীবনের কোন কার্য্যই ত ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে করা হয় নাই, কেবল যুদ্ধে মারপিট ও রক্তপাতই করিয়াছেন, তাঁহার আপনার উপর বড় ঘৃণা জন্মিল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে আজ হইতে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গুরুদেবের উপদেশানুসারে ঈশ্বরের অরাধনায় মনোনিবিষ্ট করিবেন। ইতিমধ্যে স্ত্রীলোকটী উঠিয়া আসনখানি যথাস্থানে রাখিতে গেল, অরবিন্দ তাহাকে দেখিয়া চমকিত হইলেন, এ যে জয়াবতী, সেই অঙ্গ-পদচালনা, সেই ঈষদ্দীর্ঘায়তন, সেই গ্রীবাভঙ্গী; আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিলেন জয়াবতীর এরূপ ঈশ্বরভক্তি জন্মিয়াছে, ধন্য জয়াবতী এ বয়সেই সে তার জীবন সার্থক করিয়াছে, তাহার জীবন তাহার ন্যায় নিষ্ফল নহে। পূর্ব্ব হইতে নানাকারণে জয়াবতীর প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে এ দৃশ্যে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিল, এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা বড় প্রবল হইল। অনুভব করিলেন যে জয়াবতীর বাটী এই সন্ন্যাসিনীদের আশ্রমের পার্শ্বে, প্রতিদিন পদ্মাবতীর নিকট শিক্ষা করিবার জন্য বোধ হয় সে আসিয়া থাকে ও তাঁহাদের উপদেশ মত অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জপ করে। ইতি-মধ্যে স্ত্রীলোকটী প্রদীপ হস্তে তুলিয়া লইলেন,

বাহিরে যাইবেন। উহা তুলিবা মাত্র প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইল, একটা কাঠির দ্বারা উহা উজ্জ্বল করিলেন, অরবিন্দ তাহার মুখ দেখিতে পাইয়া চমকিয়া উঠিলেন, এ কি মানবী না দেবী! প্রদীপ আরও উজ্জ্বল হইলে দেখিলেন যে, প্রকৃত দেবীমূর্ত্তি, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধারণা হইল যেন এই দেবীমূর্ত্তিকে কোথায় তিনি দেখিয়াছেন—না, না, না এই মহিমময়ী দেবী স্বরূপিণীর মূর্ত্তি কোথায় দেখিতে পাইবেন! এই জ্যোতির্ম্ময়ী-মূর্ত্তি কি পাপসংস্পৃষ্ট সংসারে বাস করে। বোধ হয় দিবানিশি ঈশ্বরারাধনায় বিশুদ্ধ-চিত্তা হইয়া ইনি দেবীমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই দেবীমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে অরবিন্দের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যেন ইংহাকে কোথায় দেখিয়াছেন। যুবতী প্রদীপ লইয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বাহিরের দালানে আসিলেন, অরবিন্দ স্থির করিয়াছিলেন যে ইনি জয়াবতী এবং গৃহে প্রত্যা-গমন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। অরবিন্দও তাঁহার কক্ষের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বাহিরে আসিলেন। ইতি-মধ্যে আর এক বার শব্দ হইল, যুবতী উহা শুনিবামাত্র চমকিয়া উঠিলেন ও হস্তস্থিত প্রদীপটি পড়িয়া গেল; তিনিও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া এ দিক্ ও দিক্ চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। সপ্তমীর চন্দ্রালোক তাঁহার মুখমণ্ডলে নিপতিত হওয়াতে তাঁহার রূপমাধুরী আরও বাড়িয়াছিল। অরবিন্দ মন্ত্রমুগ্ধবৎ একস্থানে দাঁড়াইয়া ঐ রূপ দেখিতে লাগিলেন, এক পদ অগ্রসর হইবার ক্ষমতা রহিল না। অরবিন্দের সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল—প্রতিজ্ঞা ভাসিয়া গেল। ইতিমধ্যে যুবতী একটী অস্ফুট চীৎকার করিয়া অরবিন্দের শয়ন-কক্ষের দিকে দৌড়িলেন। সম্মুখে অরবিন্দকে দেখিয়া চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুর শীঘ্র পালাও, তোমাকে একব্যক্তি খুন করিতে আসিতেছে, শীঘ্র পালাও!" আবার সেই কণ্ঠস্বর, আবার সেই কণ্ঠস্বরে তাঁহাকে সতর্ক করিতেছে, বোধ হয় বামনদাস আসিতেছে, যুবতী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে সতর্ক করিতেছে। অরবিন্দের দৃঢ় ধারণা হইল যে এই স্ত্রীলোকটী অলক্ষ্যে থাকিয়া তাঁহার মঙ্গল চেষ্টা করিতেছেন। নিজের বিপদ ভুলিয়া আগিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি জয়াবতী?"

যুবতী বলিলেন "আমি যেই হই, আপনি আপনার জীবনরক্ষা করুন।"

অরবিন্দ বলিলেন, "আপনারও ত বিপদ আছে, এ ব্যক্তি আপনাকেও খুন করতে পারে। আপনি অবলা-রমণী আপনার জীবন বিপদে ফেলিয়া পলায়ন করিয়া নিজের জীবন-রক্ষা করিব! ধিক্ আমাকে!"

যুবতী বলিলেন, "না না আমার কোন বিপদ নাই। আপনি আর বাক্যব্যয় না করে পালান।" ইতি-মধ্যে আগন্তুক বাগান হইতে দালানে উঠিল, সে আর কেহ নহে—বামনদাস; যখন উভয়কে একত্র দেখিল তখন বামনদাস ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া হস্তস্থিত লাঠি তুলিয়া অরবিন্দকে মারিতে উদ্যত হইল, কিন্তু যুবতী নক্ষত্রবৎ আসিয়া আক্রমণকারীর হস্তোত্থিত লাঠি ধরিতে উদ্যত হইলেন, বামনদাস লাঠি নত করিল। ইতিমধ্যে অরবিন্দ তাহার নিকট হইতে লাঠি কাড়িয়া লইলেন ও পশ্চাৎ হইতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিলেন। গোলমাল শুনিয়া সন্ন্যাসিনীগণ একে একে সেখানে উপনীত হইতে লাগিলেন, যুবতীও ইতিমধ্যে অন্ধকারের ভিতর কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। অরবিন্দ বামনদাসকে ছাড়িয়া দিলেন, বামনদাস পলাইল। প্রধানা সন্ন্যাসিনী পদ্মাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই লোকটা বাড়ী ঢুকিয়াছিল বুঝি?"

উত্তরে অরবিন্দ বলিল,—"হাঁ তাহার অভিসন্ধি বড় ভাল নহে, আপনি কিছুকালের জন্য রাত্রিকালে এই আশ্রম পাহারা দিবার বন্দোবস্ত করিবেন। বুঝিতে পারিতেছি না ঐ হতভাগার এ আশ্রমের উপর এত আক্রোশ কেন?"

"আক্রোশের কারণ আমি ঠিক করিতে পারিতেছি না, তবে রাত্রিকালে পাহারা দিবার বন্দোবস্ত আমি স্থির করি-য়াছি। যাহা হউক আজ তুমি আমাদের রক্ষা করিলে, চির-দিন তোমার জন্য ভগবানের নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করিব। এখন যাও, নিদ্রা যাও। আমি নিকটের সন্ন্যাসীদিগের আশ্রম হইতে সাহায্য আনাইতেছি, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাও।" অরবিন্দ ধীরে ধীরে এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিতে চাহিতে শয়ন-কক্ষে আসিলেন, সেই দেবী-মূর্ত্তিকে আর দেখিতে পাইলেন না। শয্যায় শয়ন করিলেন, রাত্রি-শেষে নিদ্রাভিভূত হইলেন।

ক্রমশঃ

যৎকিঞ্চিৎ

(সংগ্রহ)

ঐতিহাসিক

সম্প্রতি জোহ্‌নেসবার্গের (Johannesburg) ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েসনে প্রসিদ্ধ জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক আচার্য্য লিও ফ্রোবেনিয়ুস (Dr. Leo Frobenius) জীমবাবুইয়ের (Jim-babwe) খনন কার্য্য সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জীমবাবুইয়ে সাত হাজার বৎসরের একটী প্রাচীন মন্দির পাওয়া গিয়াছে। মন্দিরটী ভারতবাসী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। তাহারা ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও মধ্য আফ্রিকা সুসভ্য করিয়াছিল। পরে বুসমানদিগের (Bushman) সহিত বিবাহাদি দ্বারা তাহারা ক্রমে ক্রমে অসভ্য জাতিতে পরিণত হয়। কালক্রমে তাহাদের সাম্রাজ্যও ধ্বংস হইয়া যায় এবং অনেকে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করে। এখানে আরও কতকগুলি সুগঠিত সুড়ঙ্গ (Shafts) পাওয়া গিয়াছে। রুইবার্গের (Rooiberg) সুড়ঙ্গটী ৪৫ ফুট গভীর এবং তাহাতে একটা ২৫ ফুট লম্বা শায়িত মঞ্চ (horizontal gallery) আছে। ইহা হইতে বোধ হয় যে, যাহারা ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহারা ভূতত্ত্ব ও খনিজ-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। তাহাদের সভ্যতার উন্নতির সময়ে নিকেল ও পিতলের জিনিস প্রস্তুত হইয়া ব্যবসার জন্য ইজিপ্ট, সামারিয়া (Samaria) ও ক্রীটে (Crete) পাঠান হইত। এই সকল দ্রব্যের নিদর্শন ঐ সকল দেশে কিছু কিছু পাওয়াও গিয়াছে। কাষ্ঠ ও ইস্পাত নির্ম্মিত যন্ত্রের দ্বারা ধাতুর উপর খোদাই করা হইত। এমন কি তাহারা কেবল ভারতীয় ইস্পাতই ব্যবহার করিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ভারতীয় ধরণের যাঁতাও (Bellows) তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

কিন্তু শ্রীযুক্তা জারট্রুড কেটন টমসন (Miss Gertrude Caton Tompson) উপরোক্ত জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকের কথা প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে জীমবাবুইয়ে সভ্যতার উৎপত্তি সেমেটিক (Semitic) বা অন্য কোন সভ্য জাতি হইতে হয় নাই; কারণ মন্দিরের প্রত্যেক অংশটী আফ্রিকা বা বান্টু ধরণের (Bantu)। এমন কি তিনি ইহার প্রাচীনত্বও স্বীকার করেন না। তবে তাঁহার মতে জীমবাবুইয়ে অন্তর্জাত সভ্যতার বিকাশ মাত্র, অন্য কোন উচ্চতর সভ্যতার অপকর্ষের অনুকরণ নহে। মানুষের গঠন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত উচ্চ ধরণের; ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে নির্ম্মাতারা উদ্ভাবনশীল ও অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিল।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ গণ

* * *

ভিক্টোরিয়া-মেমোরিয়াল-হলে জেম্‌স্ হাণ্টার সাহেবের অঙ্কিত ১৮০১ সালের "বড়লাট-ভবনের পশ্চাদ্দিকের যে চিত্র আছে তাহা এখনকার লাট-ভবনের চিত্র নহে। এ চিত্র খানি Water-Colourএ অঙ্কিত। এখনকার বড় লাটের ভবনের ভিতর এই বাড়ী খানি ছিল। তখন ইহার নাম ছিল "বাকিংহাম হাউস।" বড়লাট ওয়ারেন হেষ্টিংস্ তাঁহার সরকারী বাসভবন রূপে ইহা ব্যবহার করিতেন। এ বাড়ীর চিত্র টমাস ডেনিয়েল সাহেবের কলিকাতার ১২ খানি দৃশ্যের ভিতর "পুরাতন বড়লাট ভবনের" চিত্র। লর্ড কার্জ্জন "British Government of India" পুস্তকের ১ম খণ্ডের ১৩ পৃষ্ঠায় ইহার যেরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার সহিত ডেনিয়াল সাহেবের অঙ্কিত চিত্রের বেশ মিল আছে।

* * *

"Bengal Past and Present" পত্রের সম্পাদকের মন্তব্য হইতে জানিতে পারা যায়, হাণ্টার সাহেবের ধৃত ১৮০১ খৃষ্টাব্দ ঠিক নয়; কারণ ইহার পূর্ব্বে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে "বাকিংহাম হাউস" ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহার উপর লর্ড-ওয়েলেসলির প্রাসাদ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা ঠিক হইয়া

যায়। নূতন প্রাসাদের—গবর্ণমেণ্ট হাউসের—ভিত্তি-স্থাপন করিতে লর্ড-ওয়েলেস্‌লি পারেন নাই, মহীশূর-অভিযানে তাঁহাকে সে সময় মান্দ্রাজে যাইতে হইয়াছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্টের Mr. Timothy Hickey ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রথম ইষ্টক স্থাপন করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট তারিখে এই উপলক্ষ্যে একটী বিরাট্ ভোজের ব্যবস্থা হয়। বড়লাট তখন নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়গণকে আদর আপ্যায়নে প্রীত করেন। এ সময়ে বিশেষভাবে তিনি মেজর জেনারল ডেবিড বেয়ার্ডকে আপ্যায়িত করেন। ইঁহাকেই তিনি সসৈন্যে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে লোহিত সাগর রক্ষার জন্য মিশরদেশে পাঠাইয়াছিলেন। এই বৎসরের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে ফরাসী সাধারণ তন্ত্রের সহিত শান্তি-স্থাপনের জন্য একটী কেলি হইয়াছিল। কিন্তু ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী তারিখের পূর্ব্বে বড়-লাটের নব-নির্ম্মিত ভবন সম্পূর্ণ হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত শান্তি স্থাপনের জন্য পর দিবস সেণ্টজন গীর্জ্জা পর্য্যন্ত সরকারী শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। ইহার এক সপ্তাহ পরে বেশ বড় রকমের একটী উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। এই উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ যাঁহারা জানিতে চান, তাঁহারা লর্ড ভেলেন্‌সিয়ার ভ্রমণ-কাহিনী পড়িয়া দেখিতে পারেন।

* * *

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর হেনরী রাসেলের নাম হইতে যে রাসেল ষ্ট্রীটের নাম-করণ হইয়াছে তাহা অনেকের জানা থাকিতে পারে; কিন্তু এই রাসেল সাহেবের নামানুসারে যে এক খানি বড় বাণিজ্যপোতের নামকরণ "রাসেল" হইয়াছিল তাহা বোধ হয় অনেকের জানা নাই। এই জাহাজখানি কলিকাতায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী মঙ্গলবার দিন স্মিথ সাহেবের ডক হইতে ইহা প্রথম বহির্গত হয়; ইহাতে ৯০৯টন মাল বোঝাই হইতে পারিত। প্রথম যে দিন ইহাকে নদীবক্ষে ভাসান হয়, সে দিন বেশ একটা বড় গোছের উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। সেখানে পান-ভোজনের সহিত প্রধান বিচারপতির স্বাস্থ্যকামনা করা হইয়াছিল। এই সঙ্গে বাদ্যও বাজিয়াছিল। উৎসুক জনতার ভিড় বড় কম হয় নাই।

* * *

এই রাসেল সাহেব হিকির গেজেটের সম্পাদক উইলিয়ম হিকির বিশিষ্ট বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাহার Memoir'sএ প্রধান বিচারপতি রাসেল সাহেবের ভূয়সী প্রশংসা বহুবার করা হইয়াছে।

* * *

১৮০৯ খৃষ্টব্দের Calcutta Monthly Journal পত্রিকার ৪৪৫ পৃষ্ঠা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ১৮০৯ সালের ৫ই এপ্রেল তারিখে বড়লাট বাহাদুর গঙ্গার ধারে বেড়াইবার জন্য একটী সাধারণ নিয়ম প্রচলন করেন। সাধারণের অবগতির জন্য আমরা তাহার মর্ম্মানুবাদ করিয়া দিলাম:—বড়লাট বাহাদুর এইরূপ হুকুম জারি করিতেছেন যে গঙ্গার ধারের চাঁদপাল ঘাট হইতে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের স্রোতদ্বার (sluice gate) পর্য্যন্ত রাস্তা দিয়া কোন ভদ্রলোক ঘোড়ায় চড়িয়া বা গাড়ী করিয়া যাইতে পারিবেন না, কিংবা এস্‌প্লানেডের যে অংশ ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের উত্তরের নব-নির্ম্মিত রেল-ঘেরা কোর্ট-হাউসের সম্মুখ-ভাগে অবস্থিত, সেই অংশে কেহ পাদচারণা করিতে পারিবে না কিংবা গাড়ী ঘোড়া প্রবেশ করিতে পারিবে না।

শ্রীসত্যব্রত বর্ম্মা

সাহিত্যিক

আজ-কালকার অনেক মাসিক-পত্রিকাতেই আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা দেখা যায়। আমরাও নূতন কিছু একটা করিব বলিয়া সঙ্কল্প করি নাই। তবে এক-মাত্র মাসিক-পত্র সমালোচনা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, এবং পত্রিকার এই অংশটীকে কেবল সময়োপযোগী বিবরণ ও ঘটনার কথা লিখিয়া পূর্ণ করিব না। ইহাতে যেমন প্রাচীন পল্লী আছে, তেমনি দেশীয় ও বিশ্ব সাহিত্যের সংবাদও থাকিবে।

* * *

বিশ্ব-সাহিত্যের কথা তুলিতে গেলে নরোয়ে দেশের সাহিত্য প্রথমেই আসিয়া পড়ে। এই ক্ষুদ্র-দেশটী তাহার পুরাতন ও নূতন সাহিত্য-সম্ভার লইয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে ও আমাদের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছে। উনবিংশশতাব্দীতে জার্ম্মাণ ও ফরাসী-সাহিত্যের নেশা শিক্ষিত বাঙ্গালীকে পাইয়া বসিয়াছিল; শেষের দিকে রুষে Virgin Soil এবং নিপীড়িত-রুষের আত্ম-কাহিনীতে আমাদের মন সমবেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। এখন আমরা এই স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান সাহিত্যের বিশেষ পক্ষপাতী; এমন কি পোলিশ্, ইতালিয়ান্, স্পেনিশ্, সিসিলিয়ান কোনও সাহিত্যেই আমাদের বিরাগ নাই। একটা অনুযোগ প্রায়ই এই সম্পর্কে শুনিতে পাই যে ইউরোপীয় সাহিত্য লইয়া বেশী ঘাঁটা ঘাঁটির ফলে আমরা ইংরেজী সাহিত্যের উপর আস্থা হারাইতেছি। কথাটা একবারে মিথ্যা নয়।

অনুবাদের মধ্য দিয়া দেশীয় সাহিত্যের প্রকৃতরূপের সন্ধান মেলা অসম্ভব, তথাপি জ্ঞান-তৃষ্ণা-নিবারণের জন্য ইহাই যথেষ্ট। তবে যে দেশের ভাষার সাহায্যে আমরা এই বিদেশীয় সাহিত্যের পরিচয় পাইতেছি, সে দেশের সাহিত্যও ভাব-গরিমায় বিশেষ সমৃদ্ধ। কিন্তু তাই বলিয়া সময়ের গতিকেও কিছু পরিমাণে জানিয়া চলিতে হয়। আমরা আজকাল Classics কম পড়ি, একথা সত্য। হার্ডি, মেরেডিথ্ ক্রমশঃ বাতিল হইতেছেন, ওয়েল্‌স্ ও গলস্‌ওয়াদির প্রভাবই এখন বেশী।

কিন্তু ইহাতে কতখানি লাভ-লোকসান হইতেছে বা হইতে পারে তাহার হিসাব-নিকাশ করিতে আমরা বসি নাই। তবে এইটুকু বলিতে পারি যে সময় অল্প অথচ দিনে হাজার হাজার ভাল পড়িবার মত বই প্রকাশিত হইতেছে। এমন অবস্থায় কোনও বিশেষ সাহিত্যকে লইয়া ক্ষুদ্র-দেশের গণ্ডীর মধ্যে আঁকড়াইয়া থাকিলে চলিবে না। সব সাহিত্যেই শিক্ষণীয় বিষয় প্রচুর আছে ও উচ্চ আদর্শের অভাব নাই; কেবল দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে লিখন-ভঙ্গী ও সামাজিক চিত্রাঙ্কন-প্রথা অন্যরকমের। বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত এই যে আকর্ষণ ও সংযোগ, ইহা নিন্দনীয় নহে, এবং ইহাতে আক্ষেপের কোনও কারণ নাই। পড়িবার সময় এইটুকু মনে রাখিলেই যথেষ্ট —যে ইহাতে সাহিত্যের শাশ্বত রূপের পরিচয় পাই কি না।

*　　*　　*　　*

সম্প্রতি ডেনমার্ক, নরোয়ে ও সুইডেনের বিখ্যাত ছোট গল্পগুলি একসঙ্গে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান্ দেশে গল্পের অভাব নাই, এবং প্রাচীন সাহিত্যের উপাদানগুলি এ দেশে পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। ইউরোপের উত্তর সীমাতেই Sagas ও Epic এর জন্ম-স্থান; এবং Beowulf ও ভাইকিংদের কাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক গল্পের মধ্য দিয়া আমরা এদেশের অফুরন্ত সাহিত্য-রসের সন্ধান পাইয়াছি। দেশবাসিগণও এগুলি রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট। এই সূত্রে একটী কথা মনে স্বতঃই উদিত হয় যে, আমাদের দেশে এরূপ Anthology'র একান্তই অভাব। এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া দেশীয় সাহিত্যের উপযুক্ত সঙ্কলন খুব কমই আছে। ইউরোপে চিত্রের সহিত এই সংগ্রহ ও Indexing বিদ্যা ওতঃ-প্রোতভাবে জড়িত। ইহাতে নিন্দার কিছুই নাই; বরং ইহা পুরুষোচিত উদ্যম ও প্রকৃত সাহিত্যানুরাগেরই পরিচয়।

*　　*　　*　　*　　*

বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধের পর হইতে মানব-সমাজের ভিত্তি যথেষ্ট নাড়া পাইয়াছে। রাষ্ট্র ও রাজনীতি-ক্ষেত্রে তো কথাই নাই, মানব-মন ও সমাজের রূপ বদ্‌লাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ফলে সাহিত্যের মধ্যেও এই নূতন আভাস প্রবেশ করিয়াছে, এবং যে সকল গ্রন্থে বিশেষ চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় সেইগুলিতে দেখা যায় যে পুরাতন ব্যবস্থার প্রতি একটা সুকঠোর জিজ্ঞাসা রহিয়াছে। গত যুদ্ধের পর হইতে অনেকগুলি সত্যকার সাহিত্য-পদ-বাচ্য পুস্তক বাহির হইয়াছে। তাহার মধ্যে Arnold Zweig-প্রণীত The Case of Sergeant Grisha এবং Gladkov লিখিত Cement বই দু'খানি সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বৈদ্যক

ম্যালেরিয়া রোগের নূতন চিকিৎসা

যদিও কুইনাইন ম্যালেরিয়া জ্বরের পক্ষে অতি উত্তম ঔষধ, তথাপি প্রকৃত পক্ষে দেখা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীকে বিশেষরূপে কুইনাইন প্রয়োগ করা সত্ত্বেও রোগী ম্যালেরিয়ার হাত হইতে নিস্তার পাইতেছে না। এই সকল রোগীর মধ্যে মধ্যে জ্বর হয় ও ইহাদের শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও রক্তহীন হইয়া আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্লীহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইরূপ রোগীকে আজকাল কুইনাইনের সঙ্গে সঙ্গে শেঁকোর (আরসেনিকের) নূতন কম্পাউণ্ড Soamin Stovarsol কিংবা Troposan দেওয়া হয়। ইহাতে শরীরের পোষণ-শক্তি বৃদ্ধি করিয়া জ্বরের বারংবার বিকাশ ও প্রকোপ উভয়তঃই হ্রাস করে।

যে কুইনাইন আজকাল রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে তাহার নাম সিন্‌থিটিক্ কুইনাইন, প্লাসমোচিন, প্লাসমোকুইন অথবা প্লাসমোকুইনাইন। এই সিন্‌থিটিক্ কুইনাইনের উপকারিতা 'স্বাভাবিক কুইনাইন' (অর্থাৎ যাহা সিন্‌কোনা গাছের ছাল হইতে পাওয়া যায়) অপেক্ষা অধিক; এই জন্য আজকাল যে সকল ক্ষেত্রে প্লাসমোচিন বা প্লাসমো কুইনাইন ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

'স্বাভাবিক কুইনাইন' ম্যালেরিয়া জ্বরের বীজ ও কতকগুলি সূক্ষ্মবীজ (Spores) নষ্ট করিতে পারে, কিন্তু সব সূক্ষ্মবীজ কুইনাইন ব্যবহারে সমূলে বিনষ্ট হয় না। এই সকল সূক্ষ্মবীজের কিয়দংশ প্লীহা, মজ্জা অথবা শরীরের অন্য কোনও স্থানে জীবিত অবস্থায় লুক্কাইত থাকে এবং শরীরের পোষণ-শক্তি হ্রাস পাইলে, শরীর দুর্ব্বল হইলে কিংবা অন্য কোনও সময়েও সুবিধা পাইলে এই সকল সূক্ষ্মবীজ বর্দ্ধিত হয় ও ক্রমে বীজ হইয়া পুনরায় জ্বর আনয়ন করে। এই সকল বীজ হইতে আবার সূক্ষ্মবীজ জন্মায় ও এইরূপে কিছুদিন বীজ হইতে সূক্ষ্মবীজ ও সূক্ষ্মবীজ হইতে বীজ উৎপন্ন হওয়ায় রোগী পুনঃ পুনঃ জ্বরাক্রান্ত হইয়া শীর্ণ হইয়া পড়ে। এই সূক্ষ্মবীজগুলিকে সিনথিটিক্ কুইনাইন, প্লাসমোচিন, প্লাসমোকুইন, অথবা প্লাসমোকুইনাইন ব্যবহার দ্বারা নষ্ট করিতে পারা যায় বলিয়া আধুনিক চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞগণ স্থির করিয়াছেন। যে সকল স্থলে পুনঃ পুনঃ ম্যালেরিয়া জ্বর হয় ও যথেষ্ট কুইনাইন ব্যবহার করা সত্ত্বেও জ্বর বন্ধ হয় না, সেই ক্ষেত্রে প্লাসমোচিন অল্প মাত্র ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু প্লাসমোচিন ব্যবহার করিতে হইলে বিশেষ সাবধানের সহিত করা উচিত। কেন না, অনেক সময় প্লাসমোচিন ব্যবহারের পর দুর্ব্বল রোগী নীলবর্ণ হইয়া পড়িয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট অনুভব করিয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। অল্পদিন মাত্র সামান্য প্লাসমোচিন ও সামান্য কুইনাইন ব্যবহারে যে ফল পাওয়া যাইতেছে তাহা পূর্ব্বে বহুদিন অবধি অধিক পরিমাণে কেবল মাত্র কুইনাইন দিয়া পাওয়া যায় নাই। প্লাসমোচিনের আস্বাদ কুইনাইনের মতন কটুতিক্ত নহে। ইহার আস্বাদ নাই বলিলেই হয়; এজন্য বালক-বালিকাদের পক্ষে ইহা ব্যবহার করায় বিশেষ সুবিধা।

যে সকল স্থানে জঙ্গল, পচা পুকুর, ডোবা, খাল, বিল ইত্যাদি নাতিগভীর জলাশয় আছে, ঐ সকল স্থানে বর্ষার অব্যবহিত পরেই মশার আবাস-ভূমি হয়। কোন স্থান হইতে ম্যালেরিয়া দূরীভূত করিতে হইলে এই সকল জলাশয়ও পরিস্কৃত করিতে হয়। কেবল মাত্র রোগীদের কুইনাইন কিংবা প্লাসমোচিন দিয়া সম্পূর্ণ ফল লাভের আশা করা উচিত নয়। যাহাতে মশার আধিক্য না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রধান কর্ত্তব্য। কারণ, ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব মশার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হইয়া থাকে। কেরোসিন কিংবা পেস্‌ট্রিন জলে দিয়া এই সকল পচা জল বিশুদ্ধ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাতে জলে দুর্গন্ধ হয়, এজন্য সাধারণের ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া উঠে। কেরোসিন কিংবা পেস্‌ট্রিনের পরিবর্ত্তে Parish Green ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহাতে জলে গন্ধও হয় না, মশার বাচ্ছাগুলিও মরিয়া যায়। Parish Greenএর ব্যবহার এদেশে বড় একটা দেখা যায় না; কিন্তু অন্যান্য দেশে ইহার উপকারিতা যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

সংক্রামক রোগে লবণ

কতকগুলি সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য আমাদের আহারের সহিত লবণ মিশান নিষেধ।

এই সময় আমাদের শরীরে লবণাংশ এত অধিক হয় যে, আহারের সহিত লবণ পড়িলেই তাহা বিষবৎ কার্য্য করে। বহুমূত্র রোগ, যে সকল রোগে হাত, পা, পেট ও চোখ ফুলিয়া যায়, হাই ব্লাডপ্রেসার, এপিলেপ্সি, এন্‌জাইনা পেক্‌টোরিস্‌ ইত্যাদি রোগে লবণ ভক্ষণ নিষেধ। কিন্তু তাহাতে রোগীর অত্যন্ত কষ্ট হয়, কারণ রোগী কিছুই আহার করিতে পারেন না; সবই তাঁহার বিস্বাদ লাগে; এই সকল রোগীদিগকে "হোসাল" দেওয়া যাইতে পারে। হোসাল লবণের অংশ সামান্যমাত্র, ক্লোরিনও নাই; অথচ ইহার আস্বাদ ঠিক লবণের মত। ইহা নূতন জিনিস—গত ১৮ই ডিসেম্বর ১৯২৮ সালে (Klinische Wechenschrift) Tuteur সাহেব এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। আমাদের দেশে ইহার ব্যবহার এখনও হয় নাই। লবণের পরিবর্ত্তে এইরূপ কোন জিনিস পাইলে এই সব রোগীরা যথার্থই আপনা-দিগকে ভাগ্যবান্‌ মনে করিয়া সাদরে উহা ব্যবহার করিতে থাকিবেন।

বহুমূত্র-রোগে চিনি

যাঁহারা বহুমূত্র-রোগে ভুগিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই চিনি বা চিনি-সংযুক্ত কোন জিনিস খাইতে পান না; কেন না তাঁহারা জানেন যে চিনি বা চিনি সংযুক্ত কোন জিনিস ব্যবহার করিলে প্রস্রাবে চিনির মাত্রা বাড়িয়া যায়। যাহাতে এই সকল রোগী চিনির পরিবর্ত্তে তদনুরূপ কোন জিনিস ব্যবহার করিতে পারেন তাহার চেষ্টা বহুদিন অবধি হইতেছে ও Saccarine প্রভৃতি ২৪টা জিনিস কএক বৎসর হইতে ব্যবহার করা চলিতেছে। ইদানীং Salbrose নামে একটী Tetraglycosal প্রস্তুত করা হইয়াছে—(Medizinische Klinik, Jany. 4 1929)। ইহা বহুমূত্র-রোগীরা অনায়াসে ব্যবহার করিতে পারিবেন, অথচ ইহার আস্বাদন অন্যান্য গ্লাইকোসেল পদার্থের ন্যায় তিক্ত নহে।

শ্রীনিতাইগোপল ঘোষ

সাহিত্য-সংবাদ

মহাভারত—বহু বিশিষ্ট পণ্ডিতের সহযোগে শ্রীযুক্ত বিষ্ণু শুকৃথঙ্কর পি-এচ-ডি দ্বারা সম্পাদিত। শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত বালসাহেব পন্ত প্রতিনিধি বি-এ দ্বারা চিত্রিত। পুনার ভাণ্ডারকার প্রাচ্য অনুসন্ধান-সমিতি (ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট) হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। বোম্বাই সহরে মুদ্রিত।

এই বিরাট্‌ গ্রন্থের ১৩৬ পৃষ্ঠাব্যাপী যে দুইটী খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মাত্র আদি পর্ব্বের ২১ অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকের প্রথম পংক্তি পর্য্যন্ত সন্নিবিষ্ট আছে। প্রায় পঞ্চাশোর্দ্ধ সংখ্যক পুঁথির পাঠ মিলাইয়া তাহা হইতে বিশুদ্ধ পাঠ প্রস্তুত পূর্ব্বক খাঁটী "ভারত-রত্ন" উদ্ধার করা কি অসাধারণ শ্রম ও শক্তি-সাপেক্ষ, তাহা সহজেই অনুমেয়। ডক্টর শুকৃথঙ্কর জন কয়েক গুণী ব্যক্তির সহ-যোগিতায় এই দুষ্কর কর্ম্মে ব্রতী হইয়া আংশিক ভাবে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার যোগ্যতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সংস্কৃত-সাহিত্য-রসিক মাত্রেই আন্তরিক ইচ্ছা করেন তাঁহার এই আরব্ধ কর্ম্ম সুসম্পন্ন হউক।

*　　*　　*

এই মহাভারত সম্পাদন করিতে গিয়া ডক্টর শুকৃথঙ্কর "কাশ্মীরী" ভাষায় অনূদিত একখানি মহাভারত আবিষ্কার করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে স্যর জর্জ গ্রীয়ারসন কাশ্মীরী ভাষায় রামায়ণের অস্তিত্ব-সংবাদ এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকা মারফত সাধারণকে জানাইয়াছেন ও Bulletin

of the School of Oriental Studies (London Institution) এর পঞ্চম খণ্ডের দ্বিতীয়ভাগে সানুবাদ তাহার নমুনাও প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ভারতবর্ষের এই দুইটী মহাকাব্যের কাশ্মীরী সংস্করণ প্রাচীন সাহিত্যানুসন্ধিৎসুদের নূতন অনাবিষ্কৃত পথের সন্ধান দিবে।

* * *

আমাদের বঙ্গদেশ হইতেও একখানি সংস্কৃত মহাভারত সুন্দরভাবে সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইতেছে। অনেকগুলি পণ্ডিত ও মনীষীর সাহায্য লইয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। এই মহাভারতে উপরে মূল সংস্কৃত শ্লোক, তৎপরে মহাদার্শনিক নীলকণ্ঠাচার্য্যকৃত সংক্ষিপ্ত সংস্কৃত টীকা, তৎপরে উক্ত সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়কৃত অতি সরল ও সম্পূর্ণ সংস্কৃত টীকা এবং প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ, তাহার পরে পাঠান্তর থাকিবে। এই গ্রন্থখানি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

* * *

রামশর্ম্মা তর্কবাগীশের শৌরসেনী ও মাগধী স্তবকাবলী —স্যর জর্জ্জ গ্রীয়ারসন কে-সি-আই, ই; পি-এচ-ডি, ডি-লিট; এল্-এল-ডি সঙ্কলিত। Indian Antiquary পত্রিকার ৫৬ ও ৫৭ খণ্ড হইতে পুনর্মুদ্রিত।

* * *

রাম ভট্টাচার্য্য তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য তর্কবাগীশ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ শাস্ত্র বিষয়ে ও বোপদেবের ব্যাকরণ লইয়া কয়েকটী সংস্কৃত পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি "প্রাকৃত-কল্পতরু" নাম দিয়া প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মতামত সংরক্ষিত একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পূর্ব্ব দেশীয় প্রাকৃত ভাষার আলোচনার জন্য মার্কণ্ডেয়ের "প্রাকৃত-সর্ব্বস্ব" ও এই পুস্তকখানি ছাড়া অন্য কোন ব্যাকরণ নাই। কাজেই বহু প্রকার ভুল ভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও "প্রাকৃত-কল্পতরু" অত্যন্ত মূল্যবান্ গ্রন্থ সে কথা বলাই বাহুল্য। অথচ ইহার একখানি মাত্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। তাহাও আবার ভ্রম-প্রমাদ-পূর্ণ। শ্রীযুক্ত গ্রীয়ারসনের ন্যায় ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত ব্যতীত অপর কাহারও দ্বারা এরূপ একখানি পুঁথি বিশুদ্ধ ভাবে সম্পাদিত হওয়া দুষ্কর। গ্রন্থখানি তিনটী বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। তৃতীয় শাখার স্তবকগুলি অপভ্রংশ বিষয়ে রচিত। এগুলিকে তিনি Indian Antiquary পত্রিকার ৫১ ও ৫২ ভাগে প্রকাশিত করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি দ্বিতীয় শাখার স্তবকগুলি ইংরেজী অনুবাদ, টীকা ও নির্ঘণ্টসহ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে শাখা-প্রশাখা সমেত শৌরসেনী প্রাকৃতের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গ্রীয়ার্সন তুলনা-মূলক আলোচনার জন্য মূলের পার্শ্বটীকা হিসাবে মার্কণ্ডেয়ের "প্রাকৃত-সর্ব্বস্বের" উল্লেখ করিয়াছেন। পুস্তকখানি তাঁহা দ্বারা যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে।

The State in Ancient India. (প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র) A study in the structure and Practical Working of Political Institutions in North India in Ancient Times—(প্রাচীন কালে উত্তর-ভারতের রাষ্ট্র-সমূহের গঠন ও শাসন প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা)—শ্রীযুক্ত বেণীপ্রসাদ প্রণীত। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড্ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীযুক্ত বেণীপ্রসাদ বর্ত্তমানে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি History of Jahangir গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও চিন্তাশীলতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান পুস্তক তাঁহার সুনামকে অধিকতর গৌরব-মণ্ডিত করিবে বলিয়া আশা করা যায়। সম্পূর্ণ নূতন ও আশ্চর্য্যজনক তথ্যপূর্ণ উপাদানের সহায়তায় প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ও শাসন—প্রণালী সম্বন্ধীয় এরূপ একখানি বিচিত্র ইতিহাস লিখিতে পারা যায়, ইহা প্রায় ধারণার অতীত। ভারত ও ইউরোপ—যেখানে যে উপাদান পাওয়া গিয়াছে তাহাই গ্রন্থকার সংগ্রহ করিয়াছেন।

চার্ব্বাক-ষষ্টি—(ভারতীয় জড়বাদ—Indian Materialism)—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী এম-এ, বুক-কোম্পানী, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ॥০+৯৪+৫৩+২২ পৃঃ

গ্রন্থকার নৈষধচরিতম্, সর্ব্ব-দর্শন-সংগ্রহ, বিদ্বোন্মাদ-তরঙ্গিণী এবং ষড়্দর্শন-সমুচ্চয় হইতে ৬০টি শ্লোক উদ্ধার করিয়া টীকা ও ভাষ্য-অনুযায়ী ব্যাখ্যা প্রদান

করিয়া চার্ব্বাক-দর্শনের আলোচনা করিয়াছেন। ভূমিকায় চার্ব্বাক-নীতির উৎপত্তি ও প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। পরিশিষ্টে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ-সাহিত্য হইতে চার্ব্বাক-মতানুযায়ী নানা শ্লোক ও বচন উদ্ধার করিয়াছেন।

The Hindu Colony of Cambodia (কাম্বোডিয়ায় হিন্দু উপনিবেশ) অধ্যাপক ফণীন্দ্র নাথ বসু এম-এ, থিয়োজফিক্যাল পাব্লিশিং হাউস এড্যার, মাদ্রাজ পৃঃ ১৪০ মূল্য ২॥০

বিশ্ব-ভারতীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় "বৃহত্তর ভারত" বিষয়ে যেরূপে অক্লান্তভাবে গবেষণা করিয়া কম্বোডিয়ার হিন্দু-রাজত্ব সম্বন্ধে এই মূল্যবান্ গ্রন্থ খানি প্রণয়ন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে আমরা অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বিস্মৃত-প্রায় যুগের হিন্দুগণ কিরূপ ভাবে সমুদ্রপার হইয়া কাম্বোডিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করেন ও তথায় ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আচার ব্যবহারের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকের পক্ষে পুস্তকখানি বিশেষ প্রয়োজনীয়।

The Aravidu Dynasty of Vijayanagara—প্রথম খণ্ড Rev. Henry Herras S.J., M.A. প্রণীত। Sir R. C. Temple-লিখিত ভূমিকা সহ। মাদ্রাজের বি, জে, পল এণ্ড কোম্পানী দ্বারা প্রকাশিত।

—Indian Historical Research Instituteএর (ভারতবর্ষীয় ইতিহাস অনুসন্ধান-সমিতির) "Studies in Indian History" সিরিজের তৃতীয় গ্রন্থ।

আলোচ্য গ্রন্থখানি শিলালিপি, মুদ্রা, সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, সাহিত্য, কিংবদন্তী প্রভৃতি বহু প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত উপাদান হইতে গঠিত। ইহা হইতে বিজয়-নগরের রাজবংশাবলীর চতুর্থ বা শেষ অরবিদু বংশের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক সন্ধান পাওয়া যায়। যথেষ্ট অনুসন্ধান ও শ্রমস্বীকার করিয়া বিজ্ঞ লেখক এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার শ্রম সার্থক হইয়াছে।

পুস্তক খানি ১৭টি চিত্রসহ ২৬টি পরিচ্ছেদে ৫৫৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহা ব্যতীত ৪৪ পৃষ্ঠাব্যাপী মুখবন্ধ, ৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী চারিটি পরিশিষ্ট ও ৪০ পৃষ্ঠাব্যাপী নির্ঘণ্ট পুস্তকের কলেবরকে যথেষ্ট বর্দ্ধিত করিয়াছে, তবে সঙ্গে সঙ্গে উহাকে অধিকতর মূল্যবান্ও করিয়া তুলিয়াছে।

শ্রী—

ভাগ্যবতী

(গল্প)

[শ্রীগোপাল হালদার এম্-এ]

নারী-জীবনে বিমলার মত সৌভাগ্য কয়টী মেয়ের হয়? পিতা জমীদার—বড় না হোক্, বেশী ছোটও নয়; বিমলা তাঁহার একমাত্র কন্যা। তাহার উপর, এমন পতিভাগ্য কয়জনার আছে? নৃপেন্দ্র কুমার দাস অথবা এন্, কে, ডস্, এস্কোয়ার, ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এণ্ড কলেক্টর, এক বৃদ্ধ সদরওয়ালার পুত্র, সুশিক্ষিত, অত্যন্ত হাল ফ্যাসানের কেতাদুরস্ত। সত্য বটে তাঁহার পিতা কঞ্জুষের সর্দ্দার এবং নগদ পনের হাজার টাকা ও সালঙ্কারা সুন্দরী কন্যাটীর পিছনে ভাবী সম্পত্তির অঙ্কটা দেখিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি বিমলাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পুত্র মিষ্টার ডস্ বড় চাকুরে এবং আইডিয়া-ওয়ালা ছেলে হওয়ায় বিমলাকে ঐ বুড়ো শ্বশুরের নজরবন্দী হইতে হয় নাই;—পিতৃগৃহ হইতে বিমলা একেবারে পতিগৃহে গিয়া উঠিল। এমন কপাল কয়টী মেয়ের?

মিষ্টার ডস্ আইডিয়া-ওয়ালা লোক;—তিনি পুরাদস্তুর সাহেব, সাহেবী প্রথায় আফিসে কাজকর্ম্ম করেন, আমলা-আরদালীদের হুকুম করেন, বিকালে টি'র পর সাহেবী ক্লাবে টেনিস তার পর অকসন ব্রিজ খেলেন, বিশ্রাম

করিতে করিতে আইস্ ক্রীম বা অপর কিছু পানীয়াদি পান করেন, তারপর রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া ডিনার খাইয়া একটা ইংরেজি রোমহর্ষক উপন্যাস পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়েন। বিমলাও কলিযুগের মেয়ে, জমীদারের আদুরে কন্যা হইলেও ইস্কুলে পড়িয়াছে, ইংরেজি হরপ তাহার নিকট নিতান্ত নিষিদ্ধ মাংসও নহে। তাঁহাদের দাম্পত্য জীবন সুখেরই হইবার কথা।

পা প্রথম এক-আধটু কাটিলেও উঁচু গোড়ালির জুতা বিমলা অনায়াসে পরিয়া চলে, হবেল্স্ কাটের মহিমায় চঞ্চল-অঞ্চলা শাড়ীকে আঁটিতে আঁটিতে শর্ট স্কার্ট গাউনের অনুরূপ করে, তৈলহীন চুল কটা করিয়া করিয়া ভবিষ্যতে সোনালি করিয়া ফেলিবে, এরূপও আশা করা যায়। মিষ্টার ডসের চেষ্টায়, শিক্ষায় ও উপদেশে, এই সব অনেক উন্নতি বিমলা করিয়াছে। তবে বিমলা এখনো ক্লাবে যায় না। মিষ্টার ডস্ অনুনয় করেন, বিনয় করেন, রাগ করেন, বিরক্তি জানান ;--বিমলা কিছুই বলে না, মাথাটি নোয়াইয়া চুপ করিয়া থাকে, মুখখানা কালো হইয়া উঠে, তথাপি স্বীকৃত হয় না। বিমলার প্রধান আপত্তি, সে ইংরেজি জানে না। ইংরেজ মেয়ে-মদ্দে অমন মেলা-মেশা তাহার ভালো লাগে না, এই কথা শুনিলে নিশ্চয়ই মিষ্টার ডস্ নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেন, তাই বিমলা মুখে ঐরূপ আপত্তি তুলিত না। মিষ্টার ডস্ একটী ফিরিঙ্গী গভর্ণেসকে দুই ঘণ্টা পড়া-শোনা ও আদবকায়দা শিখাইবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাই ভবিষ্যতের ভরসায় ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া আছেন। তথাপি মিষ্টার ডস্, মিসেস হ্যারিস্ ও বাঙালিনী হইলেও বাঙালা অনভিজ্ঞা মিসেস বিশ্বাসের নিকট মাঝে মাঝে তাঁহার যে লজ্জা পাইতে হয় এই কথা কি বিমলা বুঝিতে পারে না? চট্ পট্ কাজ চালাইবার মত ইংরেজিটা সে শিখিয়া ফেলুক।

বিমলা ইংরেজি বই-খাতা লইয়া বসে আর মনে-মনে ভাবে, এক দিন তাহার গঙ্গাজল সুরমার দাদা বীরেশ এই ইংরেজি শিখাইবার জন্যই তাহাকে ও সুরমাকে কত যত্নই না করিয়াছে। বীরেশচন্দ্রের আগ্রহ দেখিয়া দুই সই হাসিয়া গড়া-গড়ি গিয়াছে ;—তাহারা ত 'মাষ্টারণী' হইবে না, তবে তাঁহাদের এই বালাই কেন ?-সাধ থাকে দাদা একটা 'মাষ্টারণী' বউ লইয়া আসুন, নয় একটা বউ আনিয়া তাহাকেই 'মাষ্টারণী' করিয়া তুলুন।

ইংরেজি-বুলি ছাড়াও বিমলা মিষ্টার ডসের আরও দুই একটা এটিকেট্ শীঘ্র দুরস্ত করিতে পারিল না। জুতা পরা, শাড়ী যথারীতি পরা, প্রভৃতি বাইরের দুই-এক ঘণ্টা চলিবার ও চালাইবার মত কায়দা কানুন সহজেই আয়ত্ত করা যায়, কিন্তু ডিনার-ব্রেকফাষ্ট প্রভৃতি আহারের নাম ও নিয়ম, রামদীনকে বয় ও আহমেদকে খানসামা প্রভৃতি সম্ভাষণ, মেম-সাহেব অনুযায়ী আচরণ রাত্রিদিন নিখুঁত ভাবে পালন করিয়া যাওয়া সহজ-সাধ্য কাজ নয়। এইগুলির উপর মিষ্টার ডসেরও ঝোঁক ছিল বেশী। ছোট ছোট বাজ-কর্ম্মের মধ্য দিয়া মানুষের স্বরূপ ধরা পড়ে, তাই ছোট কাজগুলিও ছোট নয়, এই কথা তিনি বেশ জানিতেন। মুস্কিল হইয়াছিল এই যে, এই সব বিষয় লইয়া মিষ্টার ডস্ যতই ব্যস্ত হইতেন, চাকর-বাকরের সম্মুখেই নিজের বিরক্তিটা যতই সহজ পরিষ্কার করিয়া জানাইতেন, বিমলা ততই এই গুলি লইয়া ভুল করিয়া বসিত। মিষ্টার ডসের কাছে তাহারা নিতান্তই বয় বা খানসামা, তাহাদের কাছে কোনরূপ লজ্জা করিবার বা আড়াল রাখিবার দরকার নাই,—কুকুর-বিড়ালের কাছে যেমন লজ্জার বা পর্দ্দার কোনো-কিছু নাই,—বিমলার নিকট তাহারাই কেহ বা রামদীন, কেহ বা আহমেদ।

মিষ্টার ডস্ কিন্তু উৎসাহী লোক,—তিনি গড়িয়া-পিটিয়া বিমলাকে অচিরেই পুরাপুরি মিসেস্ ডস্ করিতে পারিবেন, ইহা একরূপ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন,—একবার পূর্ব্বকার সেকেলে নেটিভ্ পারিপার্শ্বিকটা হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে পারিলেই হয়।

বিমলা তাহার গঙ্গাজলকে লিখিয়াছিল যে, তাহাকে এখন ইংরেজি শিখিতে হইতেছে, সময় থাকিতে বীরুদা'র কাছে শিখিলে কত সুবিধা হইত। এখন অসময়ে এই বাঙালা-না-জানা ফিরিঙ্গি শিক্ষয়িত্রীর হাতে পড়িয়া তাহার কি লাঞ্ছনাই না হইতেছে!

গঙ্গাজল উত্তর দিয়াছে ছয়পাতা জুড়িয়া একটা অদ্ভুত রঙের কালিতে।—তাহার বক্তব্যটা এই যে, বিমলা তো

বিবি হইতে চলিল, সে ঘোড়ায় চড়িতে শিখিয়াছে কি, তুরুক শওয়ার হইতে তাহার আর কত বাকী? ইত্যাদি। কিন্তু, সঙ্গে বীরুদা'ও এক খানা ছোট পত্র দিয়াছেন তাহাকে উৎসাহিত করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিয়া ও তাহার স্বামী মিষ্টার ডসের বুদ্ধি ও মতের অনেক প্রশংসা করিয়া। বিমলা চিঠিটা স্বামীকে দেখাইল। নিজের প্রশংসাপাঠে মিষ্টার ডসের ওষ্ঠদ্বয় স্মিত-হাসিতে ভরিয়া উঠিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

লোকটা কে বল ত?

বীরুদা—আমার গঙ্গাজলের দাদা।

কি করেন?

ইস্কুলে মাষ্টারী।

'বশ্!' তা সে তোমায় ইংরেজি পড়িয়েছিল না কি?

চেষ্টা করেছিল আমাকে আর সুরোকে পড়াতে। কিন্তু আমরা কি পড়বার মত মেয়ে?

ভালোই করেছিলে। নইলে এখন আবার সে সব ভুল শুধ্‌রে নূতন করে ইংরেজি শেখাতে মিসেস্ ডিক্রুজের দ্বিগুণ বেগ পেতে হত?

কেন? বীরেন্‌দা তো বি-এ পাশ;—ভালো পড়ান শুনেছি।

ওসব গ্রাজুয়েট-ফিলিষ্টানদের কথা ছেড়ে দাও। ওরা ইংরেজ দেখেছে না ইংরেজের ইংরেজি শুনেছে?

বিমলা চুপ করিয়া রহিল।

মিষ্টার ডস্ সাহেবদের সহিত মিশিয়া কথা একটু স্পষ্ট-স্পষ্টই কহিতেন। মনের কথা চাপিয়া রাখিয়া ভণ্ড সাজিতেন না। একটু পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—

তোমার ওই 'গঙ্গাজল' না 'ডোবার জল'—তার স্বামীটি কি করেন?

পোষ্টাফিসে নতুন ঢুকেছেন।

তোমায় একটা কথা বলছি, এই গঙ্গাজলের কাছে বা তার দাদার কাছে চিঠিপত্র লেখাটা আমার পছন্দ নয়।

বিমলা হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

ওদের সঙ্গে আমাদের—ওকে কি বলে খাপ-খায় না।

বিমলা হাসিয়া ফেলিল, কহিল, তোমার যেমন কথা। —দেখোনি তাই বলছ—ওরা খাসা লোক। সুরোকে একবার আসতে লিখ্‌ছি এখানে—দেখ্‌বে সুরো আর কালীপদ বাবু কেমন লোক।

মিষ্টার ডস্ গম্ভীর ভাবে কহিলেন,—দেখো, ছেলে-মানুসি করো না। এ তোমার গাঁয়ের বাড়ি নয়। এখানে ক্লাবে আমি দুবেলা পোষ্টাফিসের সেই ফিরিঙ্গি বড় কর্ত্তার সঙ্গে খেলি, ইয়ার্কি দিই, আর তুমি কিনা যাবে তারই কোন কেরাণীর স্ত্রীকে এখানে নিমন্ত্রণ করতে? আমার একটা পজিশ্যান আছে, বুঝেচ? ও সব হবে না, তুমি লিখে দিয়ো এরা যেন তোমায় আর চিঠি-পত্র না লেখে।

বিমলা মাথা হেঁট করিয়া রহিল। সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ প্রভৃতি ভণ্ডামির প্রশ্রয় মিষ্টার ডস্ কোনো কালে দিবেন না, ঠিক করিয়াছিলেন; তাই এই অপ্রিয়-কার্য্য করিয়া গভীর আত্ম-প্রসাদে তিনি চুরুট ধরাইয়া ক্লাবে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

বিমলা হঠাৎ ইংরেজি শিখিবার এক জন নূতন সহায় পাইল। মিসেস্ লরেন্স বৃদ্ধা, ঘরের মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিয়া তিনি যীশুর মহিমা কহিতেন। তাহাকে না-জানে ও না-মানে এমন কেহ নাই। সাহেবদের ও মেমদের দরবারেও তাঁহার খ্যাতি ছিল; তবে তিনি সেদিকে বেশী ঘেঁসিতেন না। তিনি আসিয়া বিমলার সহিত আলাপ করিয়া লইলেন। মেয়েদের সহিত অনর্গল বকিয়া তিনি বেশ বাঙলা শিখিয়াছিলেন; তাই বিমলার ইংরেজি শিক্ষায়ও তিনি সুন্দর সাহায্য করিতে পারিতেন। গভর্ণেস্ মহোদয়ার এই ব্যাপারটা মনঃপূত হইত না; কিন্তু মিসেস্ বিশ্বাসের সহিত পরামর্শে মিষ্টার ডস্ জানিতে পারিয়াছিলেন যে মিসেস্ লরেন্স অপ্রার্থনীয় সহযোগিনী নহেন। তাই, বিমলার সহিত মিসেস্ লরেন্সের আলাপ জমিয়া ওঠাতে তাহার আপত্তি রহিল না।

বিমলা এক দিন জিজ্ঞাসা করিল, মিসেস্ লরেন্স আমাকে লইয়া বিকালে দু'একদিন বেড়াইতে বাহির হইতে চান, তুমি কি বলো?

—নিশ্চয়ই। খুব ভালো।

মিষ্টার ডস্ খুব খুসী হইলেন।

মিসেস্ লরেন্স বেড়াইতে বেড়াইতে কহিলেন, সত্যই, মেয়ে, এই পর্দ্দা দিয়ে ঘিরে রেখে একেবারে তোমাদের দেশের মেয়েদের সর্ব্বনাশ হয়েছে। জ্ঞান পেলে না, আলো পেলে না, সভ্যতা পেলে না, শিষ্টাচার পেলে না, প্রভুর দেওয়া এমন আলো-বাতাস তোমাদের এদেশের তাও এদেশের মেয়েরা পেলে না।

বিমলা ধীরে ধীরে কহিল, খুব বেশী পেয়েও লাভ নেই। তবে একেবারে না পাওয়াটাও ভাল নয়। আর এও ত জানো গাঁয়ের মেয়েদের বয় জনা ভগবানের আলো বাতাস থেকে বঞ্চিত? সহুরে মেয়েরা যত না দুঃখী হোক্ তোমাদের মেয়ে-মজুরদের দুঃখ এদিক্ দিয়ে কম নয়। আর জ্ঞানের কথা বলো—তুমি ত দেখেছ পর্দ্দার মধ্যেও অনেক মেয়ে আছেন যাঁরা এক অক্ষর ইংরেজি বাঙলা না শিখ্লেও যাদের অশিক্ষিত বলা অন্যায় হবে।

তুমি কি তবে পর্দ্দাটাই ভাল মনে করো?

শত করা নব্বুইটি মেয়ে এদেশের গাঁয়ে থাকে। তারা যদি পর্দ্দার তোয়াক্কা না রেখেও বেশ চল্‌তে পারে, তবে ওটাকে দরকারী ভাব্‌ব কি করে।

আসল কথা সাহেবিয়ানার বিরুদ্ধে বিমলার মনে যে বিদ্রোহ জমা হয় মিষ্টার ডসের সম্মুখে তাহা সে চাপিয়া যায়, কিন্তু মিসেস্ লরেন্সের সস্নেহসম্ভাষণে তাহার মন সতর্কতা হারাইয়া ফেলে। তাই এই ইংরেজ মেয়েটীর স্নেহের অভিযোগকেও দ্বিগুণ করিয়া ফিরাইয়া দিতে তাহার বাধে ন, বরং তাহাতে যেন সে একটা আত্মতৃপ্তি পায়।

মিসেস্ লরেন্স নদীর পারের জেলের বা মেথরের ছেলে মেয়েদের দেখাইয়া বলেন, তোমাদের জাতিভেদ দেখো মেয়ে কি করেছে। জানো ত প্রভু বলেছেন, 'প্রতি মানব! আমি তোমাদের তরে, আমি তোমাদেরই, সৃষ্টির অন্ত পর্য্যন্ত আমি তোমাদেরই সাথে সাথে পাশে পাশে চল্‌ব।' সে মানুষকে তোমরা অমন করছ!

মানুষকে আমাদের দেশের বৈষ্ণবেরাও না কি বড় করেছেন, কিন্তু বচন ত তোমাদেরও আচরণ ঠেকিয়ে রাখে নি, আমাদেরও আচরণ সংশোধন করতে পারে নি। আমাদের জাতের বনিয়াদ বরং আজ ভেঙ্গে পড়ছে, ভালই হচ্ছে; কিন্তু তোমাদের কৃপায় যে নূতন জাতি-ভেদ আজ গড়ে উঠ্‌ছে, সে যে আরও ভয়ঙ্কর।

—কি রকম মেয়ে, বলো ত?

তোমাদের দেশে ধনী আর দরিদ্র, আমাদের দেশে আবার আরও প্রধান—তোমরা যাদের বল শিক্ষিত আর যাদের বলো অশিক্ষিত, বর্ব্বর। তুমি ত জানো এরা পরস্পরের থেকে কত ঘৃণায় দূরে সরে যাচ্ছে। ব্রাহ্মণ-শূদ্রের মধ্যেও কিন্তু কোনও যুগে এতটা ঘৃণা ছিল না।

ক্ষুব্ধস্বরে মিষ্টার ডস্ কহিলেন, তুমি চিঠি লিখেছিলে তাদের?

না।

তবে তারা চিঠি লিখলে কেন? চুপ করে রইলে যে? তুমি লিখেছিলে, এরূপ পত্র-ব্যবহার আমি পছন্দ করি না?

—না।

—কেন?

ধীরে ধীরে বিমলা কহিতে চেষ্টা করিল, সুরো আমার গঙ্গাজল—বীরুদা' তার দাদা, তাঁদের অমন কথা লেখা—

—গঙ্গাজল আর দাদা! অত সোহাগের আমি ধার-ধারি না। বুঝলে?"

অগত্যা মিষ্টার ডস্ চিঠি খুলিয়া যাচাই করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কাজটা ভালো নয়, কিন্তু কর্ত্তব্যের কাছে ত অত ভালমন্দ বিচার চলে না।

মিষ্টার ডস্ চেঁচাইয়া সকলকে অস্থির করিলেন।

—দেখো, তোমার কীর্ত্তি। কবে তুমি সেই ডাকাত-টাকে চিঠি লিখেছিলে?

—ডাকাতকে?

—হ্যাঁগো হাঁ, সেই তোমার বীরুদা, তোমার গঙ্গা-জলের দাদা, সেই যে এ্যানার্কিষ্টটা—ফেরার আসামী এবার ডাকাতির দায়ে। কবে লিখেছিলে চিঠি তাকে?

—তাকে চিঠি আমি কই, কোনো দিন লিখেছি মনে পড়ে না।

—তবে পুলীশ পেল কি করে? তৈরী করেছে?

বিমলা একটু ভাবিয়া কহিল, আমার বিয়ের ঠিক পরে আমি তাঁকে একখানা ছোট চিঠি লিখেছিলুম বিজয়ার প্রণাম জানিয়ে।

আর তাই তিনি সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন যত গুপ্ত কাগজ-পত্রের সাথে। এখন তাই টানা-টানি পড়েছে আমাকে শুদ্ধ নিয়ে। তুমি আমার চাকরীর সর্ব্বনাশ করলে, সাহেবদের কাছে আমার নাম খারাপ করলে, আমায় ভদ্র-সমাজে একবারে ডুবুলে।

—তারা ত তোমায় চেনে, ভালো করেই জানে।

—তোমার দয়ায় এখন পুলীশ ত পিছনে লাগ্‌ল। এখন পুলীশ যদি বিরুদ্ধে যায়, জানা-শুনা, আদর-সম্ভাষণ, কিছু কাজ দিবে না। এখন একবার তোমাতে আমাতে [illegible] সাহেব হকিন্সের বাড়ী গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা [illegible]হবে। তাতে হয় ত কিছু ভালো হবে। যাও, [illegible] হয়ে নাও। একবার ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ ম্যাকিন্সির সঙ্গেও দেখা করতে হবে।

বিমলার মুখ শুকাইয়া গেল।

তিন দিনের ছুটী। মিষ্টার ডস্‌ কহিলেন, "বিমু ডিয়ার, তোমায় যেতে হবে। স্নাইপ্‌এর অভাব নাই। ম্যাকিন্সি, হকিন্স. পাটের অফিসের গ্যাস্‌বী, ডেভিড্‌, আর আমাদের বিশ্বাস, সবাই মেম নিয়ে যাচ্ছে। ম্যাকিন্সি সাহেব আর হকিন্স সাহেব বারবার তোমায় নিমন্ত্রণ করেছেন। না গেলে বড্ড খারাপ দেখাবে, তাঁদের অপমান করা হবে।

—শিকারে, আমি গিয়ে কি করব?

—অন্যরাই বা কি করবেন? মিসেস্‌ হকিন্স তবু রাইফেলে ওস্তাদ, শেষ পর্য্যন্ত সাথে সাথে থাকবেন। অন্যান্য মেম সাহেবরাও হয় ত কাছাকাছি থাকবেন। কিন্তু মিসেস্‌ বিশ্বাস তার দেহখানি নিয়ে তাম্বু ছেড়ে বেরুতে পারবেন না। তবু যাচ্ছেন কেন? না গেলে অভদ্রতা হয়। বিমু, সহজ কথাটা বুঝছ না।

বিমলা সহজ কথাটা বুঝিল না; শিকার তাহার সহ্য হইবে না!

মিষ্টার ডস্‌ বাহির হইলেন। কিন্তু ম্যাকিন্সি ও হকিন্স কি সরকারী কাজে বাঁধা পড়িয়া গেলেন। তবে মিসেস হকিন্স পাটের বড় সাহেব গ্যাস্‌বির সাথে ইয়াকি করিতে করিতে কোনরূপে দলটাকে তাজা করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন।

মিষ্টার ডস্‌ শিকারে, তাই সেদিনকার চিঠি যাচাই করিবার মত কেহ নাই। বিমলা নিজের নামের একখানা খাম খুলিলেন, ছোট্ট এক টুকরা কাগজে শুধু দুটী ছত্র লেখা, 'নিরাশ্রয় আমি. দু'রাত্রির মত মাথা গুঁজবার ঠাঁই হবে কি?' নাম নাই, কিন্তু হস্তাক্ষর ভুলিবার নয়। বিমলার সর্ব্ব শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, —চক্ষুর সম্মুখে সেই ছোট্ট ছত্র দুইটী বিদ্যুতের মত তীক্ষ্ণচ্ছটায় ঝলসিয়া উঠিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে বিমলা বয়কে ডাকিয়া এক গ্লাস জল খাইল। তার পর সেই চিঠির টুকরাটুকু কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া পুড়াইয়া ফেলিল।

সমস্ত দিন বিমলা অস্থির উদ্বিগ্নচিত্তে বসিবার ঘরে বসিয়া রহিল, এক এক বার একটু শব্দ হয় আর কান খাড়া করিয়া রাখে, বা ছুটিয়া বারান্দায় গিয়া দেখে, সত্যই কোন সর্ব্বনাশী সত্য উপস্থিত হইল না কি। তাহার স্বামী আজ গৃহে নাই—এই অসময়ে একি বিপদ!

বেলা পড়িয়া আসিল, বিমলা একটু একটু ভরসা পাইল, হয় ত কেহই আসিবে না, শুধুই উপহাস, শুধুই উপদ্রব। প্রায় সন্ধ্যা। বারান্দায় পদধ্বনি শুনিয়া বিমলা ত্রস্তভাবে বাহিরে আসিল—মিসেস্‌ লরেন্স। হঠাৎ যেন নিরাশায় তাহার মন অবসন্ন হইয়া পড়িল। মিসেস্‌ লরেন্সের কি আজ না আসিলেই চলিত না?

বিমলা একা আছে জানিয়াই মিসেস্‌ লরেন্স গল্প করিতে আসিয়াছিলেন। বিমলার শুষ্ক মুখ দেখিয়া বলিলেন, চলো বেড়াইয়া আসি।

বিমলা তাহাকে এড়াইতে চাহিল। স্বামী গৃহে নাই, কেহ তাহার বা অপর কাহারো সন্ধান চাহিলে কি হইবে? কিন্তু মিসেস লরেন্স ছাড়িলেন না। তাহাকে লইয়া বেড়াইতে চলিয়া গেলেন।

মিসেস্‌ লরেন্স বিমলাকে গৃহে পৌছাইয়া দিতে আসিলেন। দারোয়ান্‌ সেলাম ঠুকিয়া কহিল, একঠো আদমী মেমসাহেবকে সাথ মোলাকাৎ মাংতা। মালুম, ও লোক মাতোয়াড়া হায়।

বিমলা চমকিত হইল, মিসেস লরেন্স কহিলেন, কাঁহা, দারোয়ান্‌ দেখলাও।

গেটের পাশেই শয়ান এক দীর্ঘ মূর্ত্তি। তাহার চক্ষু

ঘোরতর রক্তবর্ণ, সমস্ত মুখ ফুলিয়া গিয়াছে। আরক্ত পলকহীন চক্ষু মেলিয়া সে বিমলার দিকে চাহিয়া রহিল। বিমলার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, মুখে কথা ফুটিল না। মিসেস্ লরেন্স গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করিলেন কহিলেন,—লর্ড, স্মলপক্স।

তীক্ষ্ণ কঠিন ভয়ার্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া বিমলা পড়িয়া গেল। মিষ্টার ডসের কাছে তার চলিয়া গেল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বিমলার জ্ঞান হইল না। মিসেস্ লরেন্স হাঁস্‌পাতালে খবর পাঠাইয়া দিলেন, গেটের পার্শ্বের লোকটাকে যেন সেখানে ঠাঁই দেওয়া হয়। হাঁসপাতাল খবর পাঠাইল, ঠিক এখন এরূপ রোগীকে আশ্রয় দিলে অপর রোগীদের বিপদের সম্ভাবনা। অতএব, তাহারা দুঃখিত। সে রাত্রির মত নিজেদের মিসনেই তাহার বন্দোবস্ত করিতে লিখিয়া মিসেস লরেন্স নিজে বিমলার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিলেন।

মিষ্টার ডস্ সকালেই ফিরিয়া আসিলেন। কহিলেন, বাই জোভ্, বিমু, নটি গার্ল, কি অবুঝ তুমি। কি গেম্‌টা-কেই মিস্ করলুম, ফেলে এলুম! ওটা ব্যাগ করলে, হাঁ, খবরের কাগজে ছবি বেরোত। এক দিনে এত স্নাইপ্ আবার একটা হরিণ ব্যাগ করা কি সহজ কথা?

মিসেস্ লরেন্স মিশন হাউসে ফিরিলেন।

দিন তিন চার পরে মিসেস লরেন্স আসিয়া কহিলেন, কি মেয়ে, এখনো কথা কইতে পারছ না? সত্যই বীভৎস দৃশ্য। কাল কিন্তু তার শেষ হয়ে গেছে। আমার কোলেই মারা গেল—নিতান্ত অনিচ্ছায় বারবার বলে, 'দেশী নর্স কেউ নাই—ডোম, বেয়ারা, যে কোনো কালো আদমি? একটু জল দেবে?' আমি জল দিলুম, ছুঁলে না, বল্‌লে 'ভারতবর্ষীয় কেহ নাই, আমার স্বদেশীয়? বেচারী! অসুখে বোধ হয় মাথা বিগ্‌ড়ে গেছল।"

অসময়ে বিমলা একটি সন্তান প্রসব করিয়া শয্যা হইতে আর উঠিল না। তাহার চোখের ভীত দৃষ্টি যেন সর্ব্বদাই কি খুঁজিয়া শিহরিয়া উঠে। মিষ্টার ডস্ বিমলার বয়সী একটী খৃষ্টান সঙ্গিনী নার্স হিসাবে রাখিয়া দিলেন,—নিজে ত সব সময় শয্যাপার্শ্বে থাকিতে পারেন না। সবাই কহিল, 'এমন স্বামী দুর্লভ! এমন রুগ্না স্ত্রীর বোঝা বহিয়া বেড়ানো!'

দুই বৎসর পরে বোঝা কাঁধ হইতে নামিয়া গেল। আরও মাস দুই পরে খৃষ্টান মেয়েটিই মিসেস্ ডস্-রূপে গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

মিষ্টার ডস্ বিমলার মৃত্যুদিনে বিমলার নামে মেটার্নিটি হোমে টাকা পাঠাইয়া দেন, সাহেব বন্ধুদের ভোজ দেন। বিমলা সত্যই ভাগ্যবতী।

জীবনার্ঘ্য

[শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর, বি-এ]

এটা ওটা সেটা দিয়ে
কত তুমি পুজিয়াছ তাঁয়,
কিছুই ছোঁ'ন নি তিনি
অনাদরে সকলি শুকায়।
মধুগন্ধে জীবনেরে
শত দলে কর বিকসিত,
পদ্মে পদ্মে পা ফেলিয়া
যা'ন তিনি কমলাদয়িত।

"দিনু তোমা লও" বলি
কিছু তাঁরে হয় নাক দিতে—
যা কিছু সুন্দর সবি
অর্ঘ্য তাঁর এ বিশ্ব-বেদিতে।
কলামূলা ঘুষ দিয়ে
শ্রীধর তো পায় নি চরণ,
শ্রীনাথের শ্রীচরণে
স্বতঃ অর্ঘ্য শ্রীধর-জীবন।

সে কালের কাশী

[অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ]

হিন্দু-ভারতের কিরীটস্বরূপ বারাণসী অর্দ্ধ-চন্দ্রাকার সমুচ্চ-তটে স্তর-বিন্যস্ত হইয়া আজও বিরাজ করিতেছে। ব্যাসকাশীর সৈকত হইতে দেখিলে মনে হয় সত্যই যেন শূলপাণির ত্রিশূলের উপর স্থাপিতা শিবপুরী বসুধাতল-ভোগভিন্না। বরুণা-সঙ্গম হইতে আরম্ভ করিয়া অবিরাম সোপান-পরম্পরার বিস্তার সুদূর অসিতে গিয়া লীন হইয়াছে। সহস্র সহস্র মন্দিরের চূড়া আস্তিক হিন্দুর আধ্যাত্মিক বাসনার প্রতীকরূপে আকাশের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিতেছে। পঞ্চতীর্থের পাদমূল ধৌত করিয়া উত্তরবাহিনী তর্ তর্ শব্দে বহিয়া যাইতেছে। শতবর্ষ পূর্ব্বে যে বারাণসী, আজও বাহ্য দৃষ্টিতে সেই। কিন্তু আনন্দ-কাননের অভ্যন্তরে বিগত অর্দ্ধ শতকের মধ্যে কত পরিবর্ত্তনই না ঘটিয়াছে। সেই পরিবর্ত্তনের আলোচনায় মনে হয়—যদুপতির মথুরাপুরীর মত, রঘুপতির উত্তর-কোশলার মত, পশুপতির প্রিয় নিকেত সেই শিবপুরী আজ কোথায়!

শিবপুরী আছে—কিন্তু সে পুরবাসী নাই। সে পণ্ডিত নাই—সে ভোগী নাই—সে বিলাসী নাই—সে ত্যাগী নাই—সে গৃহী নাই—সে ভক্ত সন্ন্যাসী নাই। যাহা ছিল তাহার চিত্র কোথায় পাইবে? তবু স্মৃতি এখনও আছে—প্রাচীনের মানসে। তাহারই কৃপায় সে চিত্রপটের দু' এক খণ্ড আজও উদ্ধার করা যায়।

কাশীনরেশ তখনও সামন্ত নরপতির গৌরব লাভ করেন নাই। কিন্তু হিন্দু সমাজের উপর প্রভাবে উচ্ছলিত ঐশ্বর্য্যের বিলাসে, পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের সহিত সংস্পর্শে মহারাজ উদিত নারায়ণ বা তাঁহার দত্তক পুত্র ঈশ্বরী-প্রসাদের মর্য্যাদা বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিক ভিন্ন ন্যূন ছিল না। শুনা যায় মহারাজ উদিত নারায়ণ যখন ভোজনে বসিতেন তখন চতুষ্পার্শ্বে প্রায় ১৫।২০ জন অভিজাত-বংশীয় ভূম্যধিকারী তাঁহার সঙ্গে যোগ দিত। রাজ-ভোগের আয়োজন—পঞ্চাশ বা ততোধিক পদ নানা প্রকার পাত্রে সজ্জিত হইয়া—প্রত্যেকের সম্মুখে অপূর্ব্ব শোভা বিধান করিত। ইহা দৈনন্দিন ব্যাপার। তৎকালে বারাণসীতে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। নাম—আহোবল। কৃষ্ণকায়, শীর্ণ, দীর্ঘ আকার—পাণ্ডিত্যে চলন্ত বিশ্বকোষ। রাজদ্বারে তাঁহার অতুলনীয় সম্মান। একদিন মহারাজ উদিত নারায়ণ মধ্যাহ্নিক আহারে বসিয়াছেন এমন সময় পণ্ডিত আহোবল প্রাসাদে গিয়া উপস্থিত। মহারাজের আদেশ ছিল—পণ্ডিতজী আসিলে কাল বিলম্ব না করিয়া—তাঁহার নিকটে নীত হইবেন। ভৃত্যগণ তদনুসারে পণ্ডিত আহোবলকে ভোজনাগারে লইয়া গিয়া আসন দিল। পণ্ডিতজী লক্ষ্য করিতে লাগিলেন কি ক্রমে বিভিন্ন প্রকারের অন্নব্যঞ্জন গৃহীত হইতেছে। ভোজন-পর্ব্ব শেষ হইলে পণ্ডিতজী বলিলেন, যে ক্রমে বিভিন্ন পদগুলি গ্রহণ করা হয় তাহা ঠিক নহে! পরে তিনি স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন কোন্ রসের পর কোন্ রসের স্বাদ গ্রহণ করিতে হয়—চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়র মধ্যে কোন্‌টী অগ্রে, কোন্‌টী মধ্যে, কোন্‌টীই বা পরিশেষে রসনায় প্রযোজ্য। অধিকন্তু কি ভাবেই বা ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যগুলি প্রস্তুত করিতে হয় সে সম্বন্ধেও কথা-প্রসঙ্গে অনেক তথ্য বিবৃত করিয়া বলিলেন যে একদিন তিনি স্বয়ং আসিয়া পাকের প্রণালী ও ভোজনের ক্রম দেখাইয়া দিবেন। সেই রূপ ব্যবস্থা হইল। পণ্ডিত আহোবল স্বয়ং আসিয়া সেদিন পাচককে উপদেশ দিতে লাগিলেন। পরিশেষে সকল আহার্য্য-সম্ভার প্রস্তুত হইলে পারিষদগণ সমভিব্যাহারে মহারাজ বিভিন্ন পদগুলি পণ্ডিতজীর উপদিষ্ট ক্রমানুসারে গ্রহণ করিলেন। সকলেই এই ক্রম-পরিবর্ত্তনের ফলে আস্বাদের তারতম্য দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইলেন। দরিদ্র পণ্ডিত—শাকান্নভোজী কেমন করিয়া এ সকল জ্ঞানে অধিকারী হইলেন কেহই বুঝিতে পারিল না। পাকপ্রণালী সম্বন্ধে পরে তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করেন—এখনও রামনগর প্রাসাদের

পুস্তকাগারে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। প্রকৃতই পণ্ডিত আহোবল সর্ব্বতোমুখী বিদ্যা ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। এ সম্বন্ধে নানারূপ গল্প প্রচলিত আছে। গঙ্গাতীর হইতে প্রাসাদে উঠিতে প্রাচীরগাত্রে গঙ্গাদেবীর একটী খোদিত মূর্ত্তি দেখা যায়। মূর্ত্তি যখন প্রস্তুত হয় পণ্ডিত আহোবল একদিন তাহার প্রতি নিপুণ-ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া শিল্পীকে বলিলেন উহাতে দোষ হইয়াছে। দেবীর নাসিকা হইতে যে নোলকটি লম্বমান উহা ঠিক হয় নাই। শিল্পী পণ্ডিতজীর কথা যে সত্য তাহা সহজেই বুঝিতে পারিল এবং তৎক্ষণাৎ যন্ত্র-সাহায্যে উহার সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন পণ্ডিতজী তাহাকে নিরস্ত করিয়া কহিলেন প্রস্তরমূর্ত্তির ঐ দোষটুকু সংশোধন করিতে পারে এমন যন্ত্র বা কারিগর নাই। পরে স্বয়ং গঙ্গামৃত্তিকা লইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই একটী অনুরূপ অথচ নির্দ্দোষ গঙ্গামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দেখাইয়া দিলেন কি করিলে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারিত। সকলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া গেল।

শুধু যে পাক-প্রণালী বা ভাস্কর্য্য বিষয়েই পণ্ডিতজীর অধিকার ছিল তাহা নহে—বোধ হয় এমন কোন আলোচ্য বিষয় ছিল না যাহাতে তাঁহার জ্ঞান ও গবেষণা বিস্ময়ের উদ্রেক করিত না। তিনি নানাগ্রন্থের রচনা করেন—জুতা সেলাই হইতে আরম্ভ করিয়া সতরঞ্চ খেলা পর্য্যন্ত, তাঁহার আয়ত্ত ছিল। তিনি যন্ত্র-সঙ্গীতে বংশী-সূত্র ও মৃদঙ্গ-সূত্র প্রণয়ন করেন। তাঁহার আর একখানি গ্রন্থের নাম গ্রামণ্য-সূত্র। ইহার প্রতিপাদ্য গ্রামস্থ প্রতিবেশীগণের সহিত কিরূপে দক্ষতার সহিত কলহ করিয়া জয়লাভ করিতে হয়।

* * *

মহারাজ উদিতনারায়ণের পর তাঁহার দত্তক পুত্র মহারাজ ঈশ্বরী-প্রসাদ রাজ্যে অধিরূঢ় হন। ইনি অতি সুপুরুষ ছিলেন—দর্শনে কালিদাসের সেই প্রথিত শ্লোকটী মনে পড়িত—

ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্ম্মহাভুজঃ।
আত্মকর্ম্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রো ধর্ম্ম ইবাশ্রিতঃ॥

দীর্ঘ সুঠাম বপুঃ—প্রশস্ত ললাট—আয়ত চক্ষু—দিব্য গৌর-বর্ণ—বীরের মত দুইদিকে গুম্ফরাজি পাকান। সুল যষ্টির উপর ভর করিয়া উপবিষ্ট মহারাজের প্রতিকৃতি এখনও বহুস্থলে দেখা যায়—দেখিলে স্বতঃই চিত্ত আকৃষ্ট হয়। তাঁহার আমলের যে সকল দরবারী তাঁহারাও মহারাজেরই মত দর্শনীয়াকৃতি ছিলেন। বিধাতা যেন অভিসন্ধি করিয়াই সকলকে ধরাধামে পাঠাইয়াছিলেন একই সময় রাজসভা আলো করিবার জন্য। মহারাজের শিব-ভক্তি প্রখ্যাত ছিল। প্রত্যহ একাদিক্রমে প্রায় চার হইতে ছয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত তিনি পূজায় নিরত থাকিতেন। শিব-পূজার প্রণালী প্রকৃতই দর্শনীয় বস্তু ছিল। নানাবর্ণের ও নানাগন্ধের পুষ্পরাজি পুষ্পপাত্রে স্তূপীকৃত হইত—জাতি যূথী, বেলা, চামেলী, গন্ধরাজ, চম্পক রাশীকৃত সযত্ন-সমাহৃত বিল্বদলের পার্শ্বে অপূর্ব্ব শোভা পাইত। গঙ্গামৃত্তিকায় স্বহস্তে লিঙ্গমূর্ত্তি গঠিত করিয়া হস্তোপরি রাখিয়া এক একটী করিয়া পুষ্পগুলি তাহাতে উৎসর্গ করিতেন। সঙ্গে সঙ্গে স্তোত্রপরম্পরা পাঠ করিতেন এবং মাঝে মাঝে ধ্যানস্থ হইয়া পড়িতেন। পিঞ্জরে নানাশ্রেণীর কলকণ্ঠ বিহগ-কূজন করিত—কেহ বা মধুর শীষ দিত—কেহ বা শেখান বুলী আওড়াইত। অদূরে ভজন-সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় সুপ্রসিদ্ধ গায়কের অতুলন কণ্ঠের স্বর-লহরীতে পূজকের চিত্ত অপার্থিব রাজ্যে নীত হইত। এই পূজার নির্দ্দিষ্ট বেলা ছিল না—তবে পূর্ব্বাহ্নে বা অপরাহ্নে ইহার অবসান হইলে মহারাজ ভোজনে বসিতেন। শুধু যে শিব-ভক্তির বিলাসেই মহারাজের বৈশিষ্ট্য ছিল তাহা নহে—ব্যবহার মাধুর্য্য ও নৈপুণ্যে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। কোন সময়ে একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহান্ত মহারাজ কাশীধামে আগমন করেন এবং প্রসিদ্ধ ৺গোপালজীউ মন্দিরে অবস্থান করেন। তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কাশীনরেশের নিমন্ত্রণ হয়। অতি সূক্ষ্ম সূতী কাপড়ের পোষাক পরিয়া মহারাজ বৈষ্ণবগণাগ্রগণ্য মহান্তজীর দর্শন করিতে আসেন। মাথায় একটী সাদাসিধা পাগড়ী। সর্ব্বাঙ্গে কোথাও এক খণ্ড মণি বা মাণিক্যের বাহার নাই। এদিকে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য উপাদেয় আমোদ-প্রমোদের আয়োজন হইয়াছিল। সহরের শ্রেষ্ঠ নর্ত্তকী এবং বিখ্যাত গায়ক ও বাদকগণ সমবেত হইয়াছে। মহারাজের কিন্তু সেই দিকে লক্ষ্যই নাই। তিনি ভারতের সুবৃহৎ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গুরু ও নেতা মহান্ত মহারাজের সহিত আলাপ করিতে,
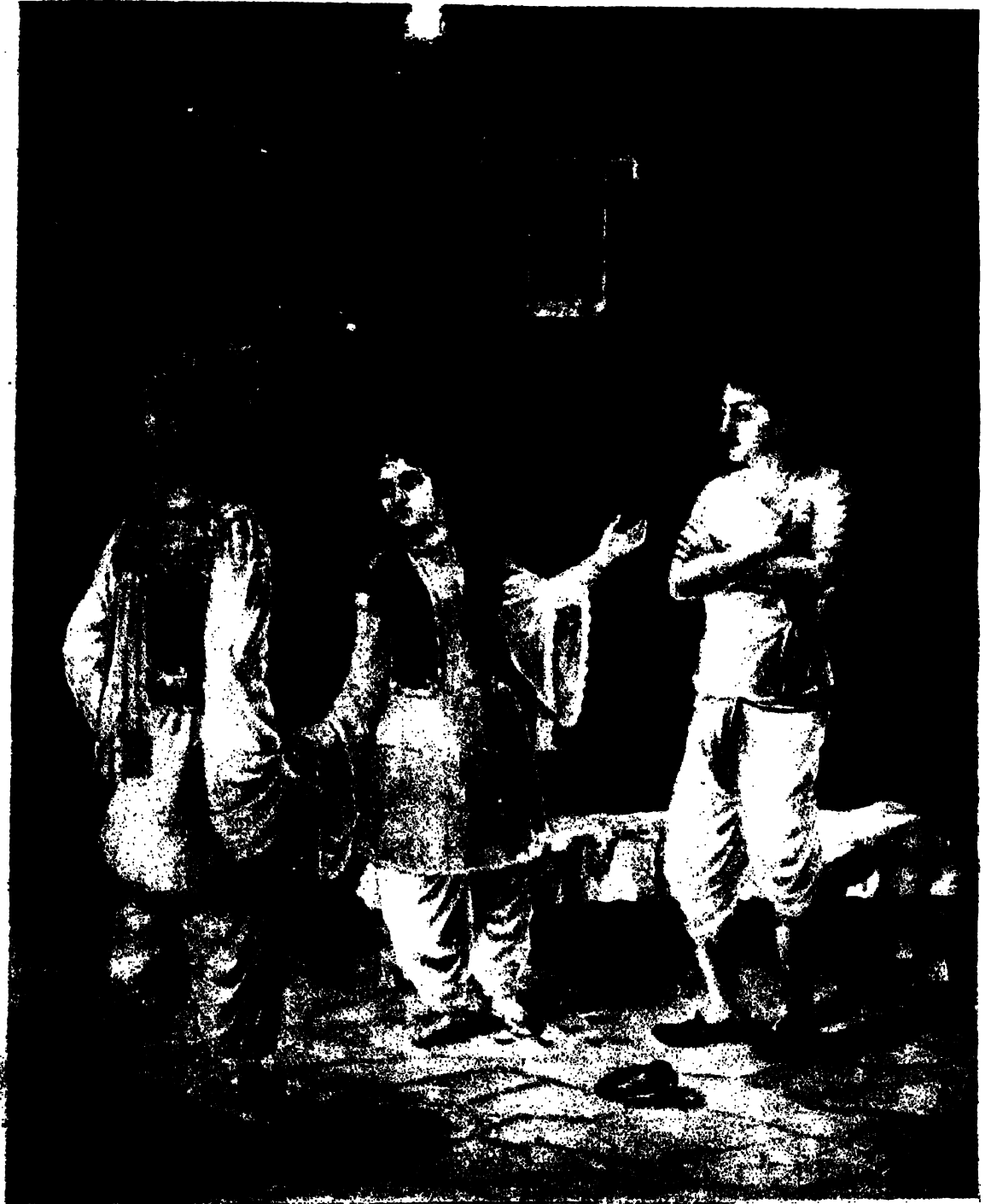
অতি পরিষ্কার স্বরে আয়েষা কহিলেন—"ওসমান! যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর তবে আমার উত্তর এই যে,-
এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর! শুন ওসমান—আবার বলি—এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর,"—দুর্গেশনন্দিনী।

ব্যস্ত। সুগভীর সংস্কৃত পাণ্ডিত্যের অধিকারী না হইলেও মহারাজ বেদান্ত ও বৈষ্ণব-দর্শনের মূলতত্ত্বগুলি সম্বন্ধে অতি সুন্দরভাবে ও বিশুদ্ধভাবে আলোচনা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। সাক্ষাৎ হইবামাত্র মহারাজ প্রসিদ্ধ উদ্ভট শ্লোকটীতে মহান্তজীকে সম্ভাষণ করিলেন—

> জীর্ণা তরী সরিদতীব গভীরনীরা
> বালা বয়ং সকলমেবমনর্থহেতুঃ।
> বিশ্বাসবীজমিদমস্তি তু বল্লবীনাম্
> যন্মাধব ত্বমসি সম্প্রতি কর্ণধারঃ॥

এবং বিদায়কালে গোস্বামী প্রভুকে অতীব বিনয়-সহকারে প্রাসাদে পদার্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া গেলেন।

পরে একদিন সায়ংকালে নানা বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া সদলবলে মহান্ত মহারাজ কাশীনরেশের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে রামনগর প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। সে দিন সন্ধ্যা প্রায় ৬টার সময় মহারাজ ঈশ্বরীপ্রসাদ তাঁহার প্রাত্যহিক শিবপূজায় আসীন হইয়াছিলেন। এ দিকে আতিথেয়তার ভার কুমার বাহাদুরের উপর ন্যস্ত। দেওয়ান সমভিব্যাহারে দ্বারদেশে আসিয়া তিনি অভ্যাগতদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া, সুরধুনীর শীকরবাহী পবনে বীজিত, অসংখ্য আলোকমালায় উজ্জ্বল, বিশাল মর্ম্মর-খচিত বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন। সেখানে ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের সমারোহে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়ক ও বাইজীগণ অবিরাম সঙ্গীতের তান-লয়-মূর্চ্ছনায় সভাগৃহ ঝঙ্কৃত করিতে লাগিল। অভ্যাগতগণ মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। এদিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল—কিন্তু মহারাজের দীর্ঘ পূজার আর শেষ হয় না। পরে রাত্রি দশটার সময় মহারাজ সমাসীন হইলেন। উচ্ছ্বসিত সৌজন্য ও মাধুর্য্যে মুগ্ধ করিয়া কাতর অনুনয়-সহকারে বিলম্বের জন্য তিনি অতিথিগণের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন। সে সময়ে মহারাজের বেশ ও আকার অতি বিচিত্র অতি অপূর্ব্ব। পায়ে সামান্য কাঠের খড়ম। হাতে একটী সামান্য বাঁশের লাঠি। গায়ে মাত্র কার্পাসের উত্তরীয়। আয়ত ললাটে ভস্ম-ত্রিপুণ্ড্রক শোভা পাইতেছে। গলদেশে রুদ্রাক্ষের মালা। সকলের মনে হইল যেন সাক্ষাৎ শিবানুচর হিমালয় হইতে সহসা রাজভবনে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সকলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া মহারাজের অদ্ভুত বেশ ও ব্যবহার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

* * *

মহারাজের নীতি-কুশলতা ও ব্যবহার-চাতুর্য্যের সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প শুনা যায়। সে সময়ে বড়লাট ছিলেন লর্ড নর্থব্রুক। কোন দরবারে তিনি সিন্ধিয়া মহারাজকে গাড়ীতে নিজ পার্শ্বে বসাইয়া উপস্থিত হন। মহারাজ ঈশ্বরীপ্রসাদের ইচ্ছা হয় যে তিনিও এই ভাবে একবার কোন দরবারে উপস্থিত হইবেন—অথচ ইহার জন্য কাহাকেও কোনরূপ অনুরোধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিছুদিন পরে উপযুক্ত অবসর আসিল। এলাহাবাদে একটী দরবার হইল। নিমন্ত্রিতগণের নিকট কার্ড আসিল—তাহাতে ঠিক কয়টার সময় দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেদিন কিছু পূর্ব্বে মহারাজ তাঁহার সুদীর্ঘ শিব-পূজায় বসিয়াছেন। দরবারে রওয়ানা হইবার সময় অতিবাহিত হইয়া গেল—কিন্তু পূজার শেষ হয় না। কর্ম্মচারিগণ ব্যস্ত হইয়া পড়িল। যখন তিনি গাত্রোত্থান করিলেন তখন যথাসময়ে দরবারগৃহে উপস্থিত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। অথচ মহারাজ একটী তাঞ্জামে চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। পথিমধ্যে সরকারী কোচ গাড়ীতে অধিষ্ঠিত বড়লাট বাহাদুর,—মহারাজ তাঞ্জামে করিয়া ধীরে ধীরে যাইতেছেন লক্ষ্য করিলেন। যখন গাড়ী ও তাঞ্জাম পাশাপাশি হইল তখন কাশীনরেশ নামিয়া পড়িয়া বড় লাটকে সেলাম করিলেন। লাট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—তাঞ্জাম চড়িয়া যথাসময়ে তিনি কি করিয়া দরবারে উপস্থিত হইবেন? মহারাজ বলিলেন—তাহার কোন চিন্তা নাই—তিনি যথাসময়েই পৌঁছিতে পারিবেন। কিন্তু বড়লাট বাহাদুর কিছুতেই শুনিলেন না এবং মহারাজকে তুলিয়া লইয়া সরকারী কোচ গাড়ীতে নিজের পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন। চতুর মহারাজের অব্যক্ত মনোভিলাষও বিনানুরোধে পূর্ণ হইল।

* * *

মহারাজ ঈশ্বরীপ্রসাদের সময়েই পিতামহদেব ৺তারাচাঁদ তর্করত্ন কাশীধামে গিয়া উপস্থিত হন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২৪ বা ২৫ বৎসর। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি মহারাজের প্রীতি আকর্ষণে সমর্থ হন এবং রাজসভাপণ্ডিত

নিযুক্ত হন। বস্তিরাম নামক একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিতের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ্যও ছিল। বস্তিরাম পণ্ডিতের একটী মুদ্রাযন্ত্র ছিল—সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশে উহাই বোধ হয় কাশীতে প্রথম প্রেস। ঐ প্রেসে মুদ্রণের জন্য তিনি স্বপ্রণীত টীকার সহিত ব্যাসসূত্রের সম্পাদন করেন। তাঁহারা দুই জনে মিলিয়া কাশীস্থ পণ্ডিত-সমাজের প্রচলিত আচার ও রীতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন। বিখ্যাত পণ্ডিত তাত্যারামের সহিত তর্করত্ন মহাশয়ের প্রসিদ্ধ জাগদীশী টীকা লইয়া কোন সভাতে বিচার হয়—তাহাতে তাত্যা-রাম পণ্ডিত পরাস্ত হন। তর্করত্ন মহাশয় উল্লাসভরে বলিয়া উঠেন—বাঙ্গালী পণ্ডিত উপস্থিত থাকিতে ন্যায়-শাস্ত্র সম্বন্ধে ভবিষ্যতে প্রতিবাদী যেন আর আলোচনা না করেন। ঐ সময়ে বারাণসীর পণ্ডিত-সমাজে দ্রাবিড়ী পণ্ডিতগণের সম্মান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। তাঁহারা সর্ব্বোচ্চ বিদায় পাইতেন—সভাস্থলে মাল্য-চন্দনে পূজিত হইতেন। কিন্তু হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের এরূপ মর্য্যাদা ছিল না। তাত্যারাম পণ্ডিতের সহিত বিচারে জয়ের ফলে অতঃপর ইঁহারাও দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতগণের সহিত সমান ভাবে সভাস্থলে পূজা ও বিদায় পাইতে লাগিলেন।

হিন্দুস্থানী পণ্ডিতগণকে পূর্ব্বে সভাতে যে পদমর্য্যাদায় নিম্নস্থান অধিকার করিতে হইত তাহার যথেষ্ট কারণও ছিল। তাঁহারা বেদের বিষয় অনভিজ্ঞ ছিলেন। এই কারণে বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণেরও মর্য্যাদার ন্যূনতা ছিল। শুধু গৃহী পণ্ডিতগণকেই যে এরূপ অনাদর সহ্য করিতে হইত তাহা নহে। এমন কি সন্ন্যাসিগণকেও এ কারণে অধঃকৃত হইয়া থাকিতে হইত। হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ বলিতে কান্যকুব্জীয় বা সরযুপারীয় বুঝায়। বাঙ্গালা দেশের মত এ সকল অঞ্চলেও বহুদিন হইতে ম্লেচ্ছ সংসর্গের ফলেই স্বাধ্যায় এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড পরিত্যক্ত ও অবহেলিত হইয়া পড়ে। গৌড়স্বামী নামক এতদঞ্চলের একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার মানস করেন. কিন্তু গুরু করিয়া দণ্ড গ্রহণের জন্য যখন দণ্ডি-সম্প্রদায়ে উপস্থিত হন, তখন বেদে অজ্ঞ বলিয়া অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যাত হন। দাক্ষিণাত্য গণ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়েও তখন বিশেষ প্রবল। প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় ইনি অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হ'ন। সঙ্কল্প করিলেন সমগ্র বেদ আয়ত্ত না করিয়া আর কাশীধামে ফিরিবেন না। এই সঙ্কল্পের বশে তিনি একেবারে দাক্ষিণাত্যে গিয়া উপস্থিত হন, এবং সেখানে সমগ্র বেদ, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্র সমেত কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলেন। তখন ফিরিয়া আসিয়া যাহারা তাঁহাকে সন্ন্যাসের অযোগ্য বলিয়া তাচ্ছিল্য করিয়াছিল তাহাদিগকে নিজ অপূর্ব্ব মেধা ও পাণ্ডিত্য বলে পরাজিত করেন। শাঙ্কর সম্প্রদায়ে তখন তাঁহাকে সন্ন্যাস দিতে আর কেহ কিন্তু আপত্তি করে নাই। এই গৌড়স্বামীই ভারতপ্রথিত স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহা-রাজের গুরু।

* * *

স্বামী বিশুদ্ধানন্দের মত মীমাংসা শাস্ত্রে অসীম পাণ্ডিত্যের অধিকারী সন্ন্যাসী বিগত শতকের মধ্যে ভারতে খুব অল্পই হইয়াছেন। সমস্ত জৈমিনীয় দর্শনের প্রত্যেক অধিকরণ ও প্রত্যেক সূত্র তাঁহার নখদর্পণে ছিল। অথচ তিনিই আক্ষেপ করিয়া বলিতেন যে তিনি যখন প্রথমে কাশীধামে আসেন তখন অন্ততঃ একশত এমন পণ্ডিত-ধুরন্ধর বিদ্যমান যাঁহারা মীমাংসা-সূত্রের সহিত অবাধ পরিচয় ও বিনা পুস্তকে তত্ত্বালোচনায় তাঁহাকেও ম্লান করিয়া দিতেন। সভাস্থলে ইঁহাদিগের সম্মুখে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত।

* * *

কাশীর পরিচিত শব্দ সমূহের মধ্যে "চানাচুর গরমের" ডাক অন্যতম। যাহারা বিক্রয় করে তাহারা যে শুধু ক্রেতার রসনার পরিতৃপ্তি সম্পাদনেই পটু তাহা নহে—তাহাদের ছড়া বলিবার ক্ষমতাও অসীম। এই চানাচুর গরম কাশীধাম হইতে উৎপন্ন হইয়া বোধ হয় এখন সমগ্র ভারতে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে ভবানীপুরে আমাদের গলিতে দুই চানাচুরওয়ালার কবির লড়াই শুনিতে যাই। প্রত্যেকেই নিজের প্রস্তুত দ্রব্যটীর গুণ ব্যাখ্যান করিতে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী জিনিসের নিন্দা করিতে লাগিয়া গেল। চানাচুরের গুণদোষ লইয়া তার-স্বরে এই কবির লড়াই সুরু হইলে আর থামে না। শুধু যে চানাচুরের গুণদোষ কীর্ত্তন হইল তাহা নহে—পর-স্পরের সম্বন্ধেও গালাগালি ও বিদ্রূপের স্রোত অবিরত

ধারায় বহিতে লাগিল। অন্ততঃ আধ ঘণ্টা এই তরজা চলিয়াছিল নিশ্চিত, কিন্তু তবু শেষ হয় নাই। তখন উভয়েই বুঝিল স্থান-ত্যাগ ব্যতীত দুষ্ট প্রতিবাদীর মুখ বন্ধ করা অসম্ভব। তাই সেদিনকার চানাচুরের তরজার অবসান হয়। এহেন চানাচুরের আবিষ্কারক চিরস্মরণীয় ঘাসিরাম—কাশীবাসী হইলেও বাঙ্গালা দেশেই জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল। শুনা যায় কোন সম্ভ্রান্ত সিংহবংশে তাহার জন্ম হয়। দেখিতে কদাকার কুব্জ—নানা ব্যসনে আসক্ত। কলিকাতায় সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া পরিশেষে সপরিবারে বারাণসী আশ্রয় করে। কিন্তু সেখানে যাইয়া এক চানাচুর আবিষ্কার করিয়া যুগপৎ যশ ও অর্থ লাভ করে। অতি সামান্য উপাদান—ছোলা, লবণ ও মরীচ, একটু গব্যঘৃতের প্রক্ষেপ—সযত্নে সংগ্রহ করিয়া প্রত্যহ স্বহস্তে প্রস্তুত করিত। প্রতিভাবান্ ভিন্ন কেহ এরূপ সুতার ঘটাইতে পারিত না ইহা নিশ্চিত।

*　　　*　　　*

চানাচুরে যেরূপ ঘাসিরামের খ্যাতি—কচুরীতে তেমন গেড্ডাসিংহের যশোভাতি। বেচারা সারাদিন ভাঙের নেশায় ভরপুর হইয়া কাটাইয়া দিত। কিন্তু সূর্য্যাস্তের সময় সুস্থ হইয়া দোকান খুলিত। কি অনুপাতে যে হিঙ ও লবণ পুরের সহিত মিশাইত তাহার এই বিদ্যা গোপনের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ ভারতে কেহ জানিতে পারে নাই—তাই সে যাদুবিদ্যা তাহারই সহিত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সারা সহরের অধিবাসী গেড্ডাসিংহের কচুরীর জন্য পাগল। এমন কি বহু ধনী ব্যক্তি তাহার দোকান খুলিবামাত্র সেখানে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। পয়সায় দুখানি করিয়া সেই উপাদেয় কচুরী বিক্রীত হইয়া রসনাবিলাসিগণের তৃপ্তি বিধান করিত। রাত্রি ১০টার মধ্যে সাত আট টাকা রোজগার করিয়া গেড্ডাসিং আবার অভ্যস্ত ভাঙের নেশায় নিজেকে ১৮ ঘণ্টার জন্য সমর্পণ করিত।

অসাধারণ পণ্ডিত ও চরিত্রে মহনীয় কাকারাম শাস্ত্রীর উল্লেখ করিয়া এই চটুল চর্চ্চার উপসংহার করিব। সারস্বত ব্রাহ্মণ—সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্—কাকারামের পাণ্ডিত্য-সৌরভ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ছিল। তিনি আত্মপুরাণ নামক একখানি মহামূল্য বেদান্ত গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা বারাণসীস্থ দণ্ডি-সম্প্রদায়ে সুপ্রচলিত। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের বেদান্ত-ভাষ্যের সহিত সমান ভাবে সমাদৃত হইয়া থাকে। এক সময়ে ইনি দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিশেষ বিরাগ-ভাজন হইয়া পড়েন। রামানুজ-সম্প্রদায়ে তপ্তশিলা বা তপ্ত মুদ্রা-ধারণের রীতি আছে। উত্তপ্ত মুদ্রার সাহায্যে বাহুতে বা বক্ষে সাম্প্রদায়িক চিহ্ন আঁকিয়া দেওয়া হইত, কাকারাম পণ্ডিত বচন ও যুক্তির বলে প্রমাণ করেন যে তপ্তশিলা-ধারণ অশাস্ত্রীয়। ইহাতে তাৎকালিক রামানুজ-সম্প্রদায়ে বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং পণ্ডিতজীর উপর ঐ শ্রেণীর বৈষ্ণবগণ ক্রুদ্ধ হন। এমন কি তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার ষড়যন্ত্র পর্য্যন্ত হয়। একদিন প্রাতঃকালে পণ্ডিতজী যখন তাঁহার নিত্য স্নান সমাধান করিয়া ফিরিতেছিলেন, দেখিলেন দুইটী গুণ্ডা আসিয়া তাঁহার পথ রোধ করিল। অশ্রাব্য গালি দিয়া পরিশেষে তাঁহারা সেই নিরীহ জ্ঞানীর গলায় একটী জুতার মালা পরাইয়া দিল। কিন্তু ইহাতে তাঁহার একটুকুও চিত্তবিকার হয় নাই। তিনি স্থির, শান্ত, প্রসন্ন বদনে সেই জুতার মালা বহন করিয়াই বাটীতে ফিরিয়া গেলেন। এই ব্যাপারে কাশী সহরে হুলস্থুল পড়িয়া যায়। তাঁহার বন্ধু-বান্ধব ক্ষুব্ধ হইয়া প্রতিশোধ লইবার পরামর্শ করিতে থাকেন। কিন্তু কাকারাম পণ্ডিত তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া বলেন—ইহাতে কি হইয়াছে? আমার ইহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইয়াছে কি?

জনকরাজ যে বলিয়াছিলেন—মিথিলায়াং প্রদগ্ধায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন—গীতায় যে আত্মার স্বরূপ বর্ণনায় উক্ত হইয়াছে—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।

এই কাকারাম পণ্ডিতের ইতিবৃত্ত সেদিনকার জলন্ত দৃষ্টান্ত নহে কি? পরমতাসহিষ্ণুতা পণ্ডিত সমাজে পূর্ব্ববৎ আছে—কিন্তু তিতিক্ষা, ঔদার্য্য, জ্ঞানের গাম্ভীর্য্য বর্ত্তমান কতদূরই না অপচিত হইয়াছে! অথচ এই কাকারাম পণ্ডিতের যখন দেহান্ত হয়, তখন পিতৃদেবের বাল্যাবস্থা। পঞ্চাশবৎসর—না যুগান্তর!

কন্যাদায়

(গল্প)

[শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ]

১

স্বামী-স্ত্রী মেঝেয় একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া অভিনিবেশ-সহকারে 'স্বদেশ'-পত্রিকা পাঠ করিতেছিলেন। যে স্থানটায় উভয়ের চক্ষু স্থাপিত, তথায় ছিল একটী বিজ্ঞাপন। সুন্দরী পাত্রী চাই—কুলীন ঘোষজ বা বসুজ ২৫ পর্য্যায়ের কন্যা। পাত্র ধনীর সন্তান, বি, এ, পাশ। কলিকাতায় ১২। ১৩ খানা বাড়ী। যথার্থ সুন্দরী হইলে পণ লওয়া হইবে না

সর্ব্বাণী সানন্দে বলিলেন—"যাওনা গো তবে আজই বিকেলে এক বার সেখানে। পুঁটীকে তো এ পর্য্যন্ত কেউ অপছন্দ করে' যায় নি। পর্য্যেয়ও মিলেছে। এমন সম্বন্ধটা হাতছাড়া করো না।"

জগদীশ উত্তর করিলেন—"হাতছাড়া কি আর আমি ক'রতে চাই গিন্নী! হাত থেকে যে আপনিই ছাড়িয়ে যায়। আজ ক'বছরে আর না হ'ক বিশটে সম্বন্ধ এসেছে অর্থাৎ কি না করা গেছে, কিন্তু কি বস্তুর অভাবে সে সবই হাতছাড়া হ'ল তা' তো জান। ২৫ পর্য্যের সম্বন্ধই কোন্ না ৫।৭ টা এসেছে, কিন্তু ঐ একই বস্তু হাতে না থাকায় সবই হাত ফস্কে গেল। পুঁটীকে পার করতে তোমার গাও যেমন খালি করেছি, প্রভিডেণ্টফণ্ডও তেমনি শূন্য করেছি তো। মাইনে থেকে কেটে কেটে আজও তা শোধ হ'ল না। যা' পাই তা'তে তুমি যে কি করে চালাও সে তুমিই জান; কত জন্মের পাপে যে মেয়ের বাপ হ'তে হয়, আমি তাই শুধু ভাবি এখন—"

"চুপ্-চুপ্ পুঁটী শুনতে পাবে। আহা! বাছা কি যে কষ্টে কাটায় রাত-দিন সে তো আমার অজানা নেই। সে দিন ঠাকুর ঘরে বসে তোমার নাম ক'রে' বলছিল—ঠাকুর তাঁকে আমার দায় থেকে উদ্ধার করে' দাও—কাণা খোঁড়া যা' হয় একটা জুটিয়ে দাও। আর যে আমি মা-বাপের কষ্ট দেখতে পারি নে'। চোক দিয়ে তা'র ধারা বইছিল। আমি জানালা থেকে দেখে গিয়ে তার চোখ মুছিয়ে দিলুম। আমার কোলে মাথা গুঁজে বাছা আমার ফঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কি কান্নাটাই কাঁদলে। তা' দেখ, তুমি অত ভেব' না, বিধিলিপি থাকে ওর বিয়ে এক জায়গায় হবেই। তোমার শুক্‌ন' মুখ দেখে' ও আরও বেশী কষ্ট পায়, আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলুম—"

"পুঁটী অ পুঁটী! আমায় একটা পান দেতো মা!"

"বাবা! ডাকৃছ"—বলিয়া পুঁটী উপস্থিত হইতেই—জগদীশ তাহার রুক্ষ চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "হ্যাঁ মা তোমার মুখখানি শুক্‌ন' কেন-গা! নাওনি এখনও?"

"না বাবা এখনও নাইনি"—বলিয়া পুঁটী পান আনিতে ছুটিল। জগদীশ দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া দড়ির আল্‌না হইতে জামা লইয়া বলিলেন,—

"এখনই একবার ঘুরে আসি গিন্নী! বেশী দূর তো নয়। ওবেলা আবার টিউসনি আছে। অসুখ বলে সে দিন যেতে না পারায় রবিবার আস্‌ব বলে' এসেছি।"

পুঁটী পান আনিল। সর্ব্বাণী দেওয়ালে পেরেক-লাগান জুতা পাড়িয়া দিলেন। জগদীশ জুতা পরিতেই পুঁটী তাড়াতাড়ি করিয়া ফিতা বাঁধিয়া দিল।

২

"হরিনাথ মিত্র বাবুর এই বাড়ী?"

"কি বাপু?"

"আজ্ঞে, হরিনাথ বাবু মিত্র"—

"হাঁ্যা তিনি থাকেন বটে এখানে—এটা মেস্"

"মেস্?" জগদীশ একটু আশ্চর্য্য হইলেন—নম্বর রাস্তা সবই তো মিলিতেছে।

বাবুটি বলিলেন—"আসুন আমার সঙ্গে, আমিও উপরে যাচ্ছি, দেখিয়ে দিচ্ছি—"

জগদীশ চিন্তিত-মুখে পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

"আপনার নাম হরিনাথ বাবু? নমস্কার।"

"নমস্কার। কোথা থেকে আসা হচ্ছে?"

"আজ্ঞে এই কারবালা ট্যাঙ্ক থেকে—আপনি কি এই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন"—জগদীশ পকেট হইতে খবরের কাগজ বাহির করিলেন, "ও—হাঁা, আসুন—ভেতরে"—

উভয়ে একটী অনতি-পরিসর ঘরে প্রবেশ করিয়া গৃহ-মধ্যস্থ চৌকির উপরে উপবিষ্ট হইলেন।

"আপনার নামটা কি, জিজ্ঞেস্ করতে পারি?"

"আজ্ঞে—আমার নাম শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু—মাইনগরের বোস্—কনিষ্ঠ। আমার বিবাহ-যোগ্যা একটী মেয়ে আছে—২৫ পর্য্যায়। বিজ্ঞাপনে লেখা—

"হ্যাঁ ও আমার এক জ্ঞাতি-পুত্রের জন্যে পাত্রীর কথা লিখেছি। তাঁর নামও হরিনাথ মিত্র—কুমারটুলিতে—"

"কুমারটুলির? এঁ্যা, ইনি স্বরাজ্য দলের হরিনাথ বাবু কি? বরপণ-নিবারণী সভার সভাপতি, নর্থ ক্যালকাটা কংগ্রেস কমিটির যিনি প্রেসিডেণ্ট ছিলেন—"

"হ্যাঁ, তিনিই। তবে বর-পণ-নিবারণী-সভার সভাপতি এখন আর নন, স্বরাজ্যদলের সঙ্গে মত-দ্বৈধ হওয়ায় তাতেও আর নেই,—ইনি এখন রেস্‌পন্‌সিভিষ্ট। যাক্, তার একমাত্র ছেলে অজিত পাটনা ইউনিভারসিটি থেকে এবার বি-এ পাশ করেছে—ল'পড়ছে। আপনার মেয়ে সুন্দরী? বয়স?"

"আজ্ঞে বয়স এই ১৪।১৫ হ'বে, এখনও ১৫ হয় নি বোধ হয়। মেয়ে অপছন্দ হ'বে না—মনে হয়। হরিনাথ বাবু স্বনামধন্য আজই যদি মেয়ে দেখে আসেন তিনি দয়া করে, তো নিজের চোখে দেখে মীমাংসা করতে পারবেন। বাপের চোখ কি না তাই বলছি। তা বিজ্ঞাপনটা আপনার নামে—"

"ওর একটু কারণ আছে—আচ্ছা চলুন তাঁর কাছেই যাওয়া যা'ক্।"

জগদীশ বাবু হৃষ্টমনে তাহার সহিত কুমারটুলি রওনা হইলেন। এইবার তাঁহার আশা হইল বুঝি এত দিনে বিধাতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কুমারটুলির হরিনাথ বাবুর নাম না জানে কে? যিনি বর-পণ-প্রথার বিরুদ্ধে ওজস্বিনী ভাষায় শত শত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, অবশ্য সে আজ বছর দশের আগের কথা। জগদীশ জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিতে যখন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন তখন ইঁহার বক্তৃতা শ্রবণে কতবার চিন্তা করিয়াছিলেন—আহা! ইঁহার যদি একটী বিবাহ-যোগ্য পুত্র থাকিত। শুধু জগদীশ নহে বোধ করি তখন অনেক বয়ঃস্থা কন্যার পিতাই এইরূপ ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। হরিনাথ বাবুর বক্তৃতা-শক্তি এমনই মর্ম্মস্পর্শী ছিল।

এই হরিনাথ বাবুর কিঞ্চিৎ পরিচয়-প্রদান আবশ্যক। ইঁহার বক্তৃতা-শক্তি যে অসাধারণ ছিল তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। লগ্নী কারবারে তাঁহার বহু টাকা খাটিত; এমন কি একাধিক লোককে তিনি লাখ টাকা করিয়া ধার দিয়াছেন এইরূপ জন-শ্রুতি। ব্যবসার গুণে অসংখ্য লোক তাঁহার অনুগত থাকিতে বাধ্য হইত। সুদ যে কাহাকেও তিনি রেহাই দিয়াছেন—এরূপ সুনাম অবশ্য তাঁহার পরম মিত্রও দিতে পারিবে না। কেহ কখনও তাঁহাকে একটী পয়সা পর্য্যন্ত দান করিতে দেখে নাই। পাড়া-প্রতিবেশীরা তাঁহার অসাক্ষাতে তাঁহাকে "একাদশী মিত্র" বলিয়া ডাকিত। তথাপি কারবারের ফলে ভোটের ব্যাপারে কুমারটুলি বাগবাজারে তাঁহাকে এ পর্য্যন্ত কেহ হটাইতে পারে নাই। গত বার তিনি মিউনিসিপাল কাউন্সিলারও হইয়াছিলেন—এবার আর দাঁড়ান নাই। নর্থ ক্যালকাটা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট থাকা কালে তাঁহার বাড়ীতেই আপিস ছিল। লোকে জানিত বাড়ীর একাংশ তিনি কংগ্রেস কমিটিকে নিঃস্বার্থ-ভাবে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন; কিন্তু আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি যে, তিনি তজ্জন্য মাসিক একশত মুদ্রা নাম মাত্র ভাড়া লইতেন। একবার হুজুগে উঠে কংগ্রেসে আত্মনিয়োগ নিবন্ধন তাঁহার কারবারটী নষ্ট হইয়াছে। তদবধি তিলক-স্বরাজ্য-ফাণ্ড নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত মাসে দুইশত টাকা ভাতা লইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার ব্যবসায় এখনও সমভাবেই চলিতেছে।

এ-হেন সুবিখ্যাত হরিনাথ বাবুর আলয়ে কন্যাদায়-গ্রস্ত জগদীশ হরিবাবুর সহিত উপস্থিত হইলেন।

৩

খদ্দর পরিয়া শ্রীযুক্ত হরিনাথ মিত্র মহাশয় স্বহস্তে সম্মার্জ্জনী দ্বারা বৈঠকখানা পরিষ্কার করিতেছিলেন। তিনি পরিচারক রাখিতেন না। মানব মাত্রেই এক, এক জন যাহা করিতে পারে তিনি তাহা করিতে হীনতা

বোধ করিবেন কেন? তাঁহার খদ্দরের জামা কাপড় বাড়ীতেই সাবান দিয়া পরিষ্কৃত হইত। দুই খানা ধুতি ও দুইটী জামা না ছেঁড়া পর্য্যন্ত তিনি এই ভাবে ব্যবহার করিতেন। লোকে ধন্য ধন্য করিত—শত্রু-পক্ষ বলিত তিনি পয়সা বাঁচাইতে এরূপ ব্যবস্থা করিতেন।

"আসুন—আসুন, আস্‌তে আজ্ঞে হ'ক্, বসুন। কোথা থেকে আসা হ'চ্ছে?"—তাঁহার ন্যায় মিষ্টভাষী বিরল।

হরিনাথ বাবুর সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাতে হরি বলিল—"একটী সম্বন্ধ এসেছে। এঁরই কন্যা,—বয়ঃস্থা-সুন্দরী। একবার দেখে আস্‌তে হচ্ছে। এঁর নাম শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বসু, মাইনগরের বোস্, কনিষ্ঠ—২৫ পর্য্যের মেয়ে। ইনি আপিসে কায করেন সেইজন্যে আজই গেলে ভা'ল হয়—"

"বেশ বেশ বা যাওয়া যাবে এখন। কোন্ আপিসে কায করা হয়?"

"আজ্ঞে ইণ্ডিয়ান জুটমিলে সামান্য চাকরি—পরের গোলামী না করে' তো উপায় নেই। দয়া করে যদি মেয়েটাকে নিয়ে গরীবের দায়-উদ্ধার করেন তা' হ'লে কি আর বলব—জগদীশ কাঁদিয়া ফেলিলেন—"

আহা—হা— হা, করেন কি? শুভ কাযে চোখের জল ফেলবেন না মশাই, চলুন চলুন—চলহে হরিনাথ এখনি মা-লক্ষ্মীকে দেখে আসা যাক্। কতদূর—

"আজ্ঞে এই কারবালা ট্যাঙ্ক বেশী দূর নয়। আমি গাড়ী নিয়ে আস্‌ছি—ট্যাক্‌সি করে' পাঁচ মিনিটে পৌঁছন যাবে—" জগদীশ শশব্যস্তে গাড়ী ডাকিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন—

"আহা-হা তামাক খান—তামাক খান; ব্যস্ত কেন হচ্ছেন? এই রাস্তায় দাঁড়াইলে ট্যাক্‌সি ধরা যাবে। চলুন, এক সঙ্গেই বেরনো যা'বে। একেবারে যাতায়াতের কুরোন করলেই হবে। হরিনাথ—

আজ্ঞে দিন আমার কাছে—জগদীশ বাবুকে আমিই সেজে খাওয়াচ্ছি—"নাঃ—হরিনাথ, তোমায় আর কত শেখাব? অভ্যাগতকে নিজ হাতে সেবা করতে হয় হে—"

জগদীশ গলিয়া গেলেন—তাড়াতাড়ি করযোড়ে বলিলেন—"আজ্ঞে—তামাক তো আমি খাই না—"

তিনজনে ট্যাক্‌সি করিয়া কারবালা ট্যাঙ্ক অভিমুখে রওনা হইলেন। জগদীশের মনটা একটু খুঁতখুঁত করিতে লাগিল—বিনা আয়োজনে এরূপ সম্মাননীয় আত্মীয়ের যথাযোগ্য সমাদর করিতে পারিবেন না ভাবিয়া।

মেয়ে পছন্দ হইল—না হইবেই বা কেন? ২৫শের বুড়ো পর্য্যায়। এমন নাক এমন চোখ, এমন কাল চুল পাওয়া সহজ নয় শুধু রংটা একটু চাপা, অর্থাৎ কলিকাতায় যাকে বলে উজ্জ্বল শ্যাম, কিন্তু পল্লীগ্রামে গৌরবর্ণ। পুঁটির রং যদি আর এক পোঁচ শাদা হইত তাহা হইলে কলিকাতাবাসীর চোখে সেও গৌর হইত।

হরিনাথ বাবুরা এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া গেলেন। যত্নের কোন ত্রুটি হয় নাই এ সংবাদ আমরা রাখি। এবং বলা বাহুল্য যাতায়াতের ট্যাক্‌সি ভাড়া জগদীশই দিলেন। কথা হইল বাড়ী যাইয়া হরিনাথ বাবু পরিবারের মত লইবেন। 'একা তো আর সম্পূর্ণ মত দেওয়া চলে না—অর্দ্ধেকই চলে, কি বলেন বে'ই মশায়?'—বলিয়া হাসিতে সমগ্রবাড়ীখানি যেন ভরিয়া দিলেন।

(৪)

"রয়েল্‌স্ ওয়ান"

"টু—ইন্ ক্লাব্‌স্"

"যা—একেবারে ছ্যাকড়া ডাক্ ডাক্‌লি!"—অজিত বলিল—"কি করি বল! তোমার যেন সবদিকেই 'পোয়া বার'—রমেন জবাব দিল—

"নোট্রাম্প—"

ব্রিজ খেলা পুরাদমে চলিতেছিল। অসিত এক পার্শ্বে ষ্টোভে চায়ের জল চাপাইয়াছিল—বেলা ৩টার বেশী হইবে না। অসিত চা-খোর। মেসের এই ঘরটী তাহার নিজস্ব। রবিবার দ্বিপ্রহরে এই ঘরটীতে একটী নাতি-বৃহৎ মজলিস্ বসিত। তাস-কেরম, গান-বাজনা, কাব্য-কলা, বক্তৃতা-অভিনয় কিছু বাদ যাইত না। অসিত সবেতেই যোগ দিত, অধিকন্তু নিজে চা করিয়া অতিথিগণকে আপ্যায়িত করিত। অসিত অজিতের মাতুল বিনয়-বাবুর শ্যালক—মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। বিনয় বাবু পাটনা সেক্রেটেরিয়েটে কোন এক ডিপার্টমেন্টের রেজিষ্ট্রার। অজিত তাঁহার নিকট থাকিয়া বি-এ, পাশ করিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অন্য ছেলেদের সহিত

সেও অসহযোগের ডাকে ইস্কুল ছাড়ে। হরিনাথ বাবুর গোপন উপদেশে অজিতের জননী ভ্রাতার নিকট কাঁদিয়া-কাটিয়া পত্র দেন। বিনয় বাবু স্বয়ং আসিয়া অজিতকে অনেক বুঝাইয়া এবং হরিনাথকে তিরস্কার করিয়া ভাগিনেয়কে নিজের কাছে লইয়া যা'ন। কলিকাতায় তাহাকে কদাচিৎ আসিতে দিতেন। বি-এ পরীক্ষা দেওয়ার পর হইতে সে কলিকাতায় আছে। মাকে শিরঃ-পীড়া সত্ত্বেও গামছা মাথায় বাঁধিয়া রন্ধন-কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া সে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছে—শুধু রাজীই নহে, শুভকার্য্য যাহাতে সত্বর হয় তজ্জন্য মাকে রীতিমত তাগিদ দিতেছে। সে জানিত মা মরিয়া গেলেও তাহার পিতা পাচক—এমন কি একটা পরিচারিকা রাখিতেও সম্মত হইবেন না। অজিত চায়—পত্নী দরিদ্রের কন্যা হইবে—যে তাহার মায়ের সর্ব্ব-কর্ম্মে সহায়তা করিবে—রোগের সময় সেবা করিবে। মা চাহেন বধূ অনিন্দ্য-সুন্দরী হইবে। পঁচিশ পর্য্যন্ত, কুল করিতে হইবে, অনেক চিন্তার পর হরিনাথ বিজ্ঞাপন দেন।

অজিত পাত্রী দেখিয়া পিতার মনোনীত করার কথা অসিতকে বলে। অসিত আবার তাহা মজলিসে প্রকাশ করে। বহুক্ষণ ধরিয়া কয়েক বন্ধুতে সেই কথারই আলোচনা করিয়াছে। এমনও কথা উঠিয়াছিল যে সকলে মিলিয়া অন্ততঃ অজিতের মানসীকে এক বার দেখিয়া আসিলে হয়। কিন্তু মনোমত উপায় এ পর্য্যন্ত কেহ বাৎলাইতে পারে নাই।

তাস খেলায় বিরত হইয়া সকলে চা-পানে প্রবৃত্ত হইল।

"কি হে সতীশ! এত দেরী যে"—সতীশ প্রবেশ করিতেই সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

"তুমি না আসায় আজ খেলাটা জমলই না"—নগেন ক্ষোভ-প্রকাশ করিল—

"সতীশ-ভাই! আজ তোকে এমন মন্‌মরা দেখাচ্ছে কেন রে! বাড়ীতে কারু অসুখ-টসুক্ করে নি তো?"—অসিত প্রশ্ন করিল।

সতীশ একটা চৌকী টানিয়া উপবিষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে কহিল—

"আর ভাই! তোমাদের মত সব সময় প্রফুল্ল থাকৃতে পারি কৈ! আমাদের মত গরীবের মন-মরা কি ব'লছ, প্রাণ-মরাটা না হওয়াই যে আশ্চর্য্য!"

অসিত সতীশের নিকট এক পেয়ালা চা দিয়া কহিল—

"কি হয়েছে ভাই! বল্ না—একবার"

"না চা আজ আর খা'ব না—"

"সে কি রে চায়ে তোর অরুচি? নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে। বল্ না ভাই—লক্ষ্মীটী!"

"কি আর ব'লব! আমাদের জীবন চিরদিনই যে তোমাদের খেলার বস্তু! তাই এ নিয়ে তো আর আক্ষেপ চলে না। আজ এই যে অজিত-বাবুর পিতা তাঁ'র বিয়েতে অজিত বাবুর মায়ের পাঁচ হাজার টাকা দাবী জানিয়েছেন সেও এমন কিছু অসম্ভব নয়—"

"আমার মায়ের দাবী! কি বল্‌ছেন—কোথায়!"—অজিত সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—

"সবই বল্‌ছি। কিন্তু তা'তে করে' জগদীশ বাবুর প্রাণটা যদি বেরিয়েই যায়, তা'তেই বা দুনিয়ার কি এসে যায়! অমন কত লোকেরই তো যাচ্ছে—কে তা'র খবর রাখে বল—"

"তুই যে হেঁয়ালি আরম্ভ করলি সতীশ! কি হয়েছে একটু খুলেই বল না।" নগেন চটিয়া বলিল—

"এই দেখ, শুনতেই তোমাদের ধৈর্য্য থাকৃছে না তা' আর ব'লব কি! তা' ছাড়া সব কথা এখানে ব'ললে অজিত বাবু হয় তো ব্যথা পা'বেন; বাস্তবিক ওঁর তো এতে কোন হাত নাই"—

"না—না, বলুন সব আপনি—এখানে তো আর কেউ নেই। আপনি বলুন; দেখি শুনে' আমি যদি কিছু প্রতীকার করতে পারি—কিন্তু আপনি জগদীশ বাবুকে জান্‌লেন কি করে?"—

"আমাদের যে এক পাড়াতেই বাড়ী। তাঁকে কাকা বলি। তাঁর বাড়ীতে অবাধ গতি ছেলেবেলা থেকে। বাস্তবিক বল্‌ছি আপনাকে অজিত বাবু! পুঁটীর মত দুর্লভ রত্নকে পেলেন না, বড় লোক হ'লেও সে আপনার দুর্ভাগ্যই ব'লব আমি। আপনার বাবা একটু দেরী করে' জানা'লেও কোন ক্ষতি হ'ত না কারো। জগদীশ বাবুরও জীবন-সংশয় হ'ত না—"

"জীবন-সংশয়—?"

"হ্যাঁ—অতি বড় আশায় মন-ভাঙ্গা হ'য়ে যে এ ব্যাপারটি ঘটেছে তা'তে আর কোন সন্দেহ নেই। আপনার বাবার কথাবার্ত্তায় দাবীর গন্ধ না পেয়ে—সরল মানুষ—একেবারে আহ্লাদে আটখানা হ'য়েই ছিলেন তিনি। এই চিঠি দুপুরে পেয়ে, আশাভঙ্গ হ'য়ে, ওপরে উঠ্‌তে, পা ফস্‌কে পড়ে' মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে যা'ন। কান্নাকাটি শুনে' আমি ছুটে গিয়ে দেখে ডাক্তার ডেকে এনে জ্ঞান-সম্পাদনের চেষ্টা করি। অতি কষ্টে জ্ঞান ফিরে এসেছে বটে কিন্তু ডাক্তার বল্‌লেন জর হ'লে জীবন-সংশয়। চিঠিখানা আমি নিয়ে এসেছি—"

অজিত চিঠি পড়িয়া দেখিল। তাহার পিতার হস্তাক্ষর নয়—তাহাদের কর্ম্মচারী হরিমিত্রের লেখা। চিঠি খানা এইরূপ—

মান্যবরেষু

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন :—

পূজ্যপাদ দাদামহাশয়ের পাত্রী যে পছন্দ হইয়াছে ইহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু শ্রীযুক্তা বৌদিদি ঠাকুরাণীর ইচ্ছা যে আপনি শ্রীমতী বধূমাতাকে একশত ভরি সোনার অলঙ্কার দিবেন। রূপার গহনা কিছুর আবশ্যক নাই, দুই শত ভরিতে এক সেট রূপার বাসন দিবেন। পিতল-কাঁসা কিছু না দিলেও চলিবে। একটী হীরক অঙ্গুরী, পাঁচ ভরি সোনার একটী চেন, সোনার ঘড়ি, একটী সোনার রিষ্ট ওয়াচ—আপনার জামাতাকে দিবেন। খাট পালঙ্ক ইত্যাদি দেওয়া না দেওয়া আপনার ইচ্ছাধীন। একটী মুক্তার কলার ও একজোড়া মুক্তার ব্রেস্‌লেটের কথাও বৌদিদি ঠাকুরাণী বলিয়াছেন। দাদামহাশয় আশা করেন যে শেষোক্ত গহনা দুইটী সম্বন্ধে তিনি বৌদিদিকে বুঝাইয়া বলিতে পারিবেন কিন্তু অন্য কিছু সম্বন্ধে তাঁহার উপরোধ ফলদায়ক হইবে না। বলা বাহুল্য তিনি নগদ কিছু মাত্র চাহেন না। পণ-প্রথার তিনি বিরোধী—এ কথা মহাশয় জ্ঞাত আছেন। অলঙ্কার-বরাভরণ পণের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। আপনি যাহা দিবেন তাহা আপনার কন্যা-জামাতারই থাকিবে। পাত্র শ্রীমান্, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, সচ্চরিত্র, ধনবান্—পিতার একমাত্র পুত্র। এরূপ পুত্রের বিবাহে ইচ্ছা করিলে তিনি বিশ-পঁচিশ হাজার লইতে পারিতেন।

মহাশয়ের পাটের আফিসের চাকুরীতে অবশ্যই দুপয়সা উপরি রোজগার আছে। মহাশয়ের পুত্র-সন্তান নাই, আজ দিলেও মেয়েকে দিবেন, জমাইয়া রাখিলেও মেয়েই পাইবে। সুতরাং এ সম্বন্ধে মহাশয়ের আপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না। এ কারণ নিবেদন—উল্লিখিত বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিয়া মহাশয় পত্র দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইবেন। শুভস্য শীঘ্রং—দাদা মহাশয় বিলম্ব করিতে ইচ্ছা করেন না।

প্রেরিত লোক মারফৎ পত্রের উত্তর পাইলে সুখের কারণ হইবে। অলমতি বিস্তরেণ ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী বিনীত শ্রীহরিনাথ মিত্র।

পত্র পড়িয়া অজিত বুঝিল ইহা তাহাদের কর্ম্মচারীর জবানি হইলেও মুসাবিদা তাহার পিতারই। তাহার জননীর ইচ্ছা সে সম্যক্ জানিত। তিনি যে কোন দাবী করিতে পারেন ইহা যেমনই অদ্ভুত তেমনই অবিশ্বাস্য। পিতার পরিচয় তাহার অবিদিত ছিল না, তথাপি চিঠি পড়িয়া সে যেন মরমে মরিয়া গেল। সতীশকে কহিল "দয়া করে কিছুক্ষণের জন্যে চিঠিখানা আমায় ধার দেবেন? ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আমি ফিরে আস্‌ছি—চল্লুম অসিত—"

অজিত ছুটিল। রাগে, দুঃখে, লজ্জায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বালা করিতেছিল। চাবুক-প্রহৃত ধাবমান অশ্বের মতই সে ছুটিল।

৫

জগদম্বা অজিতের বৈকালিক আহারের ময়দা মাখিতেছিলেন। হরিনাথের এই স্থানটায় একটু দুর্ব্বলতা ছিল—পুত্রের সম্বন্ধে তাঁহার কার্পণ্য অণুমাত্র ছিল না। ... প্রতি যেমনই তিনি নির্ম্মম, পুত্রের প্রতি তেমনই তাঁহার মমতার অন্ত ছিল না। অশন-বসনে চিরদিন সে বড়লোকের ছেলের মতই চলিতে পারিত।

"মা—মা—" অজিতের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, চক্ষু জলপূর্ণ। "কি বাবা? ওকি অজি—কি হয়েছে বাবা?"—জগদম্বা পুত্রকে কোলে টানিয়া বসাইলেন।

"মা! এই চিঠি তুমি লিখ্‌তে বলেছ বাবাকে? জান মা জগদীশ বাবু এই চিঠি পেয়ে হতাশ হ'য়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে অজ্ঞান হ'য়ে গেছেন?—বাঁচেন কি না সন্দেহ। টাকাই তোমাদের সর্ব্বস্ব মা? থাক তবে তোমরা টাকা নিয়ে, আমি এখ্‌খুনি পাটনায় যাব চলে"—

"এঁ্যা—সে কি রে? কই দেখি—"

জগদম্বা চিঠি পড়িয়া অবাক্ হইলেন, বলিলেন—"ও: বুঝেছি। কর্ত্তা এখন এইরূপে শত্রুতা আরম্ভ করেছেন? তোর বিয়েটা যা'তে না হয় সেই চেষ্টাই ধরেছেন এখন? ঠাকুরপোর কাছে শুন্‌লুম—মা যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। পঁচিশের কুল—এমন মেয়েও হাতছাড়া করে কেউ? আহা! বেয়াই বুঝি পড়ে গেছেন—জ্ঞান নেই বল্‌লি? হায়—হায়! কর্ত্তার মস্তিষ্ক হয়েছে। চল্ অজি! আমাকেও নিয়ে চল্ পাটনায়—"

"তাই চল মা! এখানে থাক্‌লে তুমি বাঁচবে না মা"—

হরিনাথ চেঁচামেচি শুনিয়া—"কি হয়েছে—কি হয়েছে" বলিতে বলিতে স্খলিত-চরণে ভিতরে আসিয়া, অজিতের চোখে জল দেখিয়া হতবুদ্ধি হইলেন।

জগদম্বা কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—"ওগো! শেষ কালে তোমার মনে এই ছিল! আমাদের তুমি ঘর-ছাড়া না করে' ছাড়বে না—প্রতিজ্ঞা করেছ? তবে তাই হ'ক্। অজি পাটনায় যেতে চাইছে—চির-দিনের মত, আমিও যাব ওর সঙ্গে। তুমি থাক তোমার ধন-দৌলত নিয়ে। চিরদিন মুখ বুজে সব স'য়ে এইছি—আর সইব না—"

হরিনাথ ধমক দিয়া উঠিলেন।

"বাবা!"—

অজিতের ডাক শুনিয়া হরিনাথ এতটুকু হইয়া গেলেন বলিলেন "অজিত বাবা! আমায় কিছু না বল্‌লে আমি বুঝি কেমন করে' বল তো?"

"বল্‌বে আবার কি? এই দেখ তোমার কীর্ত্তি—তোমার এই চিঠি পেয়ে সে বেচারা হতাশ্বাস হ'য়ে, পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হ'য়ে গেছে—"

জগদম্বা হরিনাথের দিকে চিঠিখানা ছুঁড়িয়া ফেলি-লেন। হরিনাথ পত্রখানা কুড়াইয়া দেখিলেন। অজিতের পানে চাহিয়া সমস্ত ব্যাপারটা অনুমানে বুঝিলেন। মুখে বলিলেন—

"তা'—তা,' তাঁর যদি কিছু দিতে আপত্তি থাকে, না হয় নাই দেবেন। হরেটাও যেমন পাগল—লিখ্‌তে যদি বলি এক লিখে বসে আর! এমন মুখ্যু আর দু'টি—দেখলাম না। আমি তা'কে এখ্‌খুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি জগদীশ বাবুর কাছে। শাঁখা আর সাড়ী ছাড়া আর যদি কিছু নিই আমি তা'র ঠেঞে, তো আমার নামই হরিনাথ মিত্র নয়। জান তো গিন্নী আমার যে কথা সেই কাজ—" হরিনাথ বাবু অপাঙ্গে পুত্রের দিকে একবার চাহিয়া হন্ হন্ করিয়া কর্ম্মচারী হরিনাথের উদ্দেশে চলিলেন।

মাতা-পুত্রের মুখ প্রসন্ন। পরক্ষণে বিষণ্ণ-স্বরে অজিত বলিল—"আমিও যাই মা অসিকে নিয়ে—দেখি যদি বেচারিকে বাঁচান যায়।"

"কিছু খেলি নি বাবা—"

"না মা! অসিতের ওখানেই খাব এখন—তুমি ভেব না।" অজিত আবার ছুটিল।

৬

রাত্রি গভীর। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মধ্যে মধ্যে মেঘের বুক চিরিয়া রক্ত-রেখা বাহির হইতেছে। বজ্র ডাকিতেছে, বাতাস বহিতেছে। আসন্ন দুর্য্যোগে প্রকৃতির মূর্ত্তি ভয়াবহ।

ভিতরের দৃশ্য আরও ভয়াবহ। জগদীশের প্রবল বেগে জ্বর আসিয়াছে। অজ্ঞান অবস্থায় প্রলাপ বকিতে-ছেন। সমগ্র শরীর কম্পমান। চক্ষু রক্তবর্ণ।

অজিত মাথায় আইস্ ব্যাগ দিতেছে। অজিত ও সতীশ বাতাস করিতেছে। দুই কন্যা দুই পায়ের তলা গরম জলের বোতলে সেঁক দিতেছে। সর্ব্বাণী হাতে হাত বসিয়েছেন। আসন্ন বিপদের ছায়া সকলেরই মুখে। হরিনাথ বাবু ডাক্তারের সহিত পার্শ্বের কক্ষে উপবিষ্ট।

সহসা আবার প্রলাপ আরম্ভ হইল।

"—মন্তর—মন্তর, হ্যাঁ-হ্যাঁ, চেঁচিয়ে পড়। না শুন্‌লে সম্প্রদান করি কি করে?"—

"না—না—না, অত টাকা আমি পাব কোথায়? দেশের বাড়ী! তার দাম আর কত হ'বে? এক হাজার?

প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডেও শ-পাঁচেক হ'তে পারে আর! ভিক্ষে! কে দেবে? কন্যাদায় কন্যাদায়! দয়া করুন, দয়া করুন! আমার কন্যাটিকে নিন; ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন—"

"—ওগো! নিয়েছেন -নিয়েছেন। এই দেখ কেমন রাজপুত্তুর জামাই—"

জগদীশ বিকারের চোখে সর্ব্বাণীর পানে চাহিয়া রহিলেন—সর্ব্বাণী পুনরায় বলিলেন—

"ওগো, ঐ যে তোমার পুঁটীর বর। কিছু লাগবে না বিয়েতে, শাঁখা সাড়ীতেই হবে—"

ডাক্তার এ ঘরে আসিয়া বলিলেন—"উনি তো কিছু বুঝতে পারছেন না মা! ওসব ব'লে আর—"

সর্ব্বাণী কাঁদিয়া কহিলেন—"একবার—একবার জ্ঞানটা ফিরিয়ে আনুন ডাক্তার বাবু! কন্যেদায় থেকে যে উদ্ধার হয়েছেন, এই কথাটা শুধু জেনে যেতে দিন এমন জামাই জ্ঞানে একবার দেখে যান—"

"কেন মা হতাশ হচ্ছেন! ভগবান্‌কে ডাকুন, লোকে কথায় বলে যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ—"

"তাই কি? আশা কি আর আছে ডাক্তার? বল—বল—

ডাক্তার ঘাড় হেঁট করিলেন। সর্ব্বাণীর সে অন্তর্ভেদী দৃষ্টির তলে চাহিয়া থাকা দুঃসাধ্য হইল।

"তবে?—তাই বলছি। আমি আর কিছু চাইনে, শুধু একবার উনি জেনে যান যে যার প্রতি ওঁর মন গিয়েছিল সেই তার হাতেই পুঁটীকে উনি দিতে পেরেছেন—"

"মা—মা! দেখছেন না মেয়েরা আপনার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে! আপনি স্থির না হলে ওরা শান্ত হ'বে কি করে। শুশ্রূষার ব্যাঘাত এখন আমি কিছুতেই হতে দিতে পারিনে। চেষ্টার তো ত্রুটি হচ্ছে না। সব চেয়ে বড় সাহেব ডাক্তারও দেখে গেছেন—"

সর্ব্বাণী পুনরায় শুশ্রূষায় রত হইলেন সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া যমে-মানুষে যেন যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ভোরের দিকে জ্বর কমিতেছে দেখিয়া সকলের মুখ প্রফুল্ল হইল, কিন্তু তাপযন্ত্রে জ্বর ১০৬ হইতে একেবারে ১০২ ডিগ্রিতে নামিতে দেখিয়া ডাক্তারের মুখ শুখাইল। তিনি আর একবার ঔষধ ইন্‌জেক্‌সন করিলেন।

"সর্ব্বাণী"—হঠাৎ রোগীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সর্ব্বাণী মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন—

"এই যে—ওগো—এই যে আমি। এই তোমার জামাই হরিনাথ বাবুর ছেলে। এক পয়সাও নেবেন না তিনি। ঐ তোমার পুঁটি, ঐ পটী—ওকেও আনিয়েছি।"

জগদীশ একে একে অজিত, পুঁটী ও সকলের পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন। চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, কিন্তু মুখখানি হাসি হাসি হইল। পুঁটীকে ইঙ্গিতে নিকটে আসিতে বলিলেন—অজিতকেও ইসারায় ডাকিলেন। উভয়ে নিকটবর্ত্তী হইলে পুঁটীর হাতখানি অজিতের হাতের মধ্যে দিলেন এবং উভয়ের অবনত মস্তকে নিজের হাতখানি রাখিয়া মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পুঁটীকে ডাকিয়া বলিলেন—"মা, আশীর্ব্বাদ করি—তোমাদের যেন কন্যাদায় না হয়—"

সর্ব্বাণী বলিলেন—"ঐ যে বেয়াই—"

হরিনাথ নিকটে আসিয়া করযোড়ে, কহিলেন—"বেয়াই, আমায় ক্ষমা করুন—"

জগদীশ বলিলেন—"আপনি মহানুভাব। সর্ব্বাণী—আমার শরীর বড় আন্‌চান্ করছে—আমি চল্লুম একটু আগেই - তুমি নিজে সম্প্রদান করো—আমার হ'য়ে—আসি বেয়াই—সর্ব্বাণী বড় ঘুম পাচ্ছে—"

রোগী যেন ঘুমাইয়াই পড়িতে লাগিলেন। ডাক্তার পুনরায় তাপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন একেবারে ১০০র নীচে নামিয়াছে। হরিনাথ বাবু ও অজিতকে পার্শ্বের কক্ষে ডাকিয়া জানাইলেন—

"আর বৃথা আশা। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ হ'বে"—

রাত্রিও অবসান হইল, জগদীশও কন্যাদায়-মুক্ত হইয়া শেষ নিঃশ্বাস ছাড়িলেন।

———

আমাদের শিশু-সাহিত্য

[শ্রীকৃষ্ণনাথ গোস্বামী]

বাঙলা দেশের দেশী কবি একদিন কণ্ঠ খুলিয়া গায়িয়াছিলেন

"নন্দনের এনেছে সংবাদ
ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ"

শুধু আশীর্ব্বাদ করিয়াই সে দিন চুপ্ করিতে পারেন নাই ; তিনিও মনে প্রাণে শিশু হইতে চাহিয়াছিলেন। তাই সে দিন প্রাণ-খোলা উল্লাসে বলিয়াছিলেন,—

"আবরণ তোরে নাহি পারে সম্বরিতে, দিগম্বর,
স্রস্ত ছিন্ন পড়ে ধূলি' পর।
লজ্জাহীন সজ্জাহীন বিত্তহীন আপনা-বিস্মৃত,
অন্তরে ঐশ্বর্য্য তোর, অন্তরে অমৃত।
দারিদ্র্য করে না দীন ধূলি তোরে করে না অশুচি,
নৃত্যের বিক্ষোভে তোর সব গ্লানি নিত্য যায় ঘুচি।"

শিশুর এই ঐশ্বর্য্যের রূপ দেখিয়া, শিশুর এই প্রাণ-খোলা হাসি দেখিয়া, নবপ্রস্ফুটিত ফুলের মত তার রূপ দেখিয়া, কবিও শিশুর রূপ, শিশুর ঐশ্বর্য্য ও প্রাণ খোলা হাসি ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন।

অশ্রুমতী পৃথ্বীর বুকখানা নানা বিবাদ ঝড় ঝঞ্ঝা বাত্যাঘাতে প্রপীড়িত, কিন্তু একদিন যখন এই অশ্রুমতী পৃথ্বীর ক্রোড়ে রবির আলোর মত জীবন লাভ করিয়া একটী নব শিশু আবির্ভূত হয়, তখন এই ধরিত্রীর সারা দেহে এক অভিনব শিহরণ খেলিয়া যায়। এই নব প্রস্ফুটিত পদ্মটী যখন প্রকৃতির নৃত্যের সঙ্গে পা ফেলিয়া ফেলিয়া নানা ছন্দে নানা ভঙ্গিমায় নৃত্য করিতে থাকে, যখন সেই কুসুমের মত মৃদু হাত দু'খানি প্রসারিত করিয়া পূর্ণিমার চাঁদকে মহা উল্লাসে আপনার কাছে আহ্বান করে, তখন ধরণী আপনার সর্ব্বদুঃখ জ্বালা নিমিষের তরে বিসর্জ্জন দিয়া সেই শিশুকে অতি নিবিড়ভাবে আপনার বুকের ভিতর টানিয়া লয়, শিশুর সেই আনন্দ-নৃত্য দেখিয়া বিভোর হইয়া থাকে। তার পর শিশু দিন দিন ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া ধরাকে আপন করিয়া লয় ; শেষে আপনার কল্পনার অশ্ববেগ ছুটাইয়া দেয়, স্বপ্নের স্বর্ণজাল বুনিয়া যায়, কল্পনার আনন্দ-স্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকে। কল্পনায় সে আকাশ ভেদ করিয়া ইন্দ্রলোকের ঐশ্বর্য্যের দ্বারে উপস্থিত হয়, ইন্দ্রলোকের মণি-মাণিক্যে তার চক্ষু ঝলসিয়া যায়, সজীব শিশু কল্পনায় সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ঘুমন্ত পুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যার খোঁজ করে, কল্পনাতে দৈত্য-দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হয়। আনন্দের শিহরণে উন্মত্ত হইয়া শিশুগণ এই বিশ্বটাকে লইয়া কতই কি না করিয়া থাকে।

এই যে শিশু, যাহারা নিমিষের মধ্যে কল্পনায় পৃথ্বী তোলপাড় করিতে পারে তাহাদের মনের বিকাশ সাধন করিতে—তাহাদের মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার—একটা প্রকাণ্ড দায়িত্ব আছে, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ইহাদের প্রাণে নব নব রসের সঞ্চার ও আনন্দ সৃষ্টি করিবার অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ইউ-রোপের শিশুদিগের মন গড়িয়া তুলিবার জন্য কত সুন্দর অভিনব ছড়ার মধ্য দিয়া নানারঙে চিত্র-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছে। তাহাদের শিশু-সাহিত্য গড়িয়া তুলিবার আয়োজন দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আর আমাদের শিশু-সাহিত্যের দিকে চাহিলে ভয় হয়, লজ্জা হয়। আমাদের শিশু-সাহিত্য আজও অত্যন্ত দীন হীন। শিশুই জাতির মেরু-দণ্ড। ইহাদের প্রাণে সজীবতা না আনিতে পারিলে এ জাতিকে বাঁচান সম্ভবপর নহে। শিশুদিগের প্রাণে প্রচুর আনন্দ চাই, তাহাদের কোমল মনে শক্তি ও বীর্য্যের বীজ বপন করা চাই।

এই শিশুদিগের প্রাণ জীবন্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য যাঁহারা আমাদের শিশু-সাহিত্যে একটু চেষ্টা করিয়াছিলেন ও করিতেছেন তাঁহাদের একটু পরিচয় দিব।

প্রথমেই অশ্রু-নেত্রে শিশু-সাহিত্যের অমর কবি ৺সুকুমার রায়কে মনে পড়িতেছে। তাঁহার লেখনী দিত শিশুকণ্ঠের ভাষা, তাহাদের প্রাণ-খোলা খল্‌খল্ হাসির চিত্র। তিনি ছিলেন শিশুমনের অজানা দেশের পথি-

প্রদর্শক। তাঁর "আবোল তাবোল" শিশু-কাব্য সাহিত্যের একখানা সেরা পুস্তক। শিশুদের প্রাণের কথা, শিশুদের হাসি-কান্নার খোঁজ এমন অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিবার মত ক্ষমতা আর কাহারও বড় দেখা যায় না। তাঁর "আবোল তাবোলের" প্রতি পৃষ্ঠায় ফুটিয়া উঠিয়াছে শিশু-কণ্ঠের অসংলগ্ন ভাষা ও ভাব, শিশু-মনের হাসির ফোয়ারা। শিশুর কণ্ঠে যখন আধ আধ ভাষা ফোটে, আধ আধ প্রকাশের ক্ষমতা হয়, তখন এই অর্দ্ধপ্রকাশের অসংলগ্ন ভাব ও ভাষার মধ্য দিয়া কি এক মাধুরীর সৃষ্টিই না হয়। শিশুর মন তখন বিরাটের দিকে ধাবিত হয়; সেই বিরাটকে আপনার মধ্যে সসীম করিয়া লইতে হয়। এই বিশাল আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ক্ষণেক যেন কি ভাবে, তার পর মনে করে ঐতো আকাশখানা ও-পাড়ার কোণে হেলিয়া নামিয়া আসিয়াছে, ও-পাড়ায় গেলেই সে যেন ধরিতে পারিবে, কিন্তু ধরা আর তাহার সহজ হইয়া উঠে না।

বাঙ্‌লা দেশের শিশুগণ অতি শৈশব হইতে গল্প ও ছড়ার ভিতর দিয়া মানুষ হইয়া উঠে। অথচ ছড়ার অধিকাংশই অর্থহীন; কিন্তু এই ছড়াগুলির আনন্দ-দানের ক্ষমতাকে অস্বীকার করা চলে না—যেমন,—

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম ইত্যাদি।

এই ছড়াগুলির কোন বিশেষ অর্থ নাই, অথচ আমরা যখন ছোট শিশুটি ছিলাম এই ছড়াগুলি আবৃত্তি করিয়া যে আনন্দ পাইয়াছি তাহা আজও ভুলিতে পারি না। এই আনন্দের ছড়াগুলি যদিও অর্থহীন, তবুও শিশুমনকে আনন্দ দিবার পক্ষে ইহার মূল্য অত্যন্ত বেশী।

সুকুমার বাবুর কবিতাগুলির এই একটী বিশেষত্ব আছে। কবিতাগুলির অধিকাংশেরই অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কিন্তু অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও আনন্দপূর্ণ। এই কবিতাগুলি শিশুদিগের প্রাণে এক অভিনব আনন্দ-রসের সৃষ্টি করে, যেমন—

"কহ ভাই কহরে আঁ্যকা চোরা সহরে
বদ্যিরা কেউ কেন আলুভাতে খায় না?
লেখা আছে কাগজে আলু খেলে মগজে
ঘিলু যায় ভেস্তিয়ে বুদ্ধি গজায় না।

কবির এই কয়টী ছত্র পড়িয়া শিশু মহা ভাবনায় পড়িয়া যায়। এত দিন যে আলুভাতে খাইয়া আসিয়াছে তাহার জন্য চিন্তা হয়; এবং চিন্তা করিয়া দেখে সেদিন যদু মাষ্টারের ঘণ্টায় ঠিক করিয়া আঁক কসিতে পারে নাই। হয় তো আলুভাতে খাওয়ারই ফল। তাই শিশু মাতাকে আলু সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দেয়।

তার পর তার—

"শুনেছ কি ব'লে গেল সীতানাথ বন্দ্যো?
আকাশের গায়ে না কি টক টক গন্ধ?
টক টক থাকে না কো হ'লে পরে বৃষ্টি—
তখন দেখেছি চেটে একেবারে মিষ্টি।"

ইহাও অর্থহীন কিন্তু আনন্দদায়ক। অর্থহীন অদ্ভুত কবিতায় শিশুগণ যে কেন এত আনন্দ পায় বলিতে পারিব না।

অতি সাধারণ কতকগুলি অদ্ভুত বাক্য যোজনা করিয়া রসসৃষ্টি করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত, যেমন—

আরে আরে ওকি কর প্যালারাম বিশ্বাস?
ফোঁস্ ফোঁস্ অত জোরে ফেল' না'ক নিশ্বাস্!
জান না কি সে বছর ওপাড়ার ভূতনাথ,
নিশ্বাস নিতে গিয়ে হয়েছিল কুপোকাৎ?

* * *

তাই বলি সাবধান! ক'রো না কো ধুপধাপ,
টিপি টিপি পায় পায় চলে যাও চুপ চাপ।
চেয়ো না'ক আগে পিছে চেয়ো না'ক ডাইনে
সাবধানে বাঁচে লোকে এই লেখে আইনে।

এই কবিতাগুলির পাশে পাশে অদ্ভুত ছবিগুলি দেখিলে হাসিতে হাসিতে পিলে ফাটিবার জোগাড় হয়। তাঁহার "গানের গুঁতো" কবিতা-মালা, যেমন—

"গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে
ভীষ্মলোচন শর্ম্মা
আওয়াজ খানা দিচ্ছে হানা
দিল্লী থেকে বর্ম্মা।
গানের দাপে আকাশ কাঁপে
দালান ফাটে বিল্‌কুল্
ভীষ্মলোচন গাইছে ভীষণ
খোস্ মেজাজে দিল্ খোল্

এক যে ছিল পাগলা ছাগল
এমনি সেটা ওস্তাদ
গানের তালে শিং বাগিয়ে
মারলে গুঁতো পশ্চাৎ।
আর কোথায় যায় একটী কথায়
গানের মাথায় ডাণ্ডা,
বাপরে বলে' ভীষ্মলোচন
একেবারে ঠাণ্ডা।"

কবিতার সঙ্গে ছবিখানা দেখিলে না হাসিয়া থাকিতে পারা যায় না অথচ সে হাসি কি নির্মল কি প্রাণ-খোলা। হাসির সৃষ্টি করিয়াই তিনি শিশুর প্রাণে কতই না উল্লাসে আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু বিধাতা এই অমূল্য রত্নটীকে শিশুদের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া গেলেন। এইরূপ শিশুকাব্য সৃষ্টিতে ৺মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়েরও বিশেষ দখল ছিল; কিন্তু এদিকে তিনি বেশী ঝোঁক দিতে সমর্থ হন নাই। যাহা লিখিয়াছেন তাহাও অতি সামান্য। তবুও তাঁহার দানকে একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না।

তার পর আমরা শিশু-সাহিত্যে কবি প্যারীমোহনের নাম করিতে পারি। তিনি মণিলাল, সুকুমার রায় ইত্যাদির সমসাময়িক কবি। তাঁহার শিশু কাব্যপুস্তক "হালুম বুড়ো" শিশু-সাহিত্যের অন্যতম সেরা পুস্তক। তাঁহার এই বইখানি পড়িতে পড়িতে মনে হয় এ যেন বর্ষার কাব্য।

ঘন কালো মেঘে যখন দিক্ বিদিক্ ছাইয়া ফেলে, আকাশের কালো মেঘের যখন গুরু গুরু ডাক চলে, তখন শিশু যেমন মেঘের ডাকে ময়ূরের মত আত্মহারা হইয়া বৃষ্টি-ধারায় আপনাকে সিক্ত করিতে চায়; সেইরূপ কবি প্যারীমোহনও বৃষ্টির দিনে শিশুর প্রাণ লইয়া শিশুর মনের কথা অতি নিখুঁত ভাবে আঁকিয়াছেন, যেমন—

"এলো বিষম বিষ্টি
ভাসিয়ে দেবে ছিষ্টি
মেঘ ডাকে যে গুড় গুড়
বুকটা করে দুর্ দুর্।
আকাশ খানার কান্না
ঝরছে জলের পান্না।
চলাফেরা বন্ধ,
মজা ত নয় মন্দ।
ঘটি বাটি বাজিয়ে
আজ পুতুলের বিয়ে
সেই বিয়েতে রান্না
তা ধিন্ ধিন্ নাচনা।"

বিষম বৃষ্টিতে ছেলে ভিজিয়াছে। পিতা মাতা ছেলেকে শাসন করিয়াছেন। তার পর আদর করিয়া ঘুম পাড়াইতেছেন—যেমন—

"এই ঘুমুল এই ঘুমুল এই যে এলো ঘুম
কেউ এসো না কেউ ডেকো না—ডাক্‌লে দুমাদুম
মারবে খোকা—পালাও সবাই ঘরটী ছেড়ে যাও
মণ্টু পালাও ঝণ্টু পালাও দাও ঘুমুতে দাও।
ঐ এলোরে জল এলোরে ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝর্
আবার ডাকে আকাশ বুড়ো কড়্ কড়্ কড়্ কড়্।
গাছপালায় বৃষ্টি পড়ে ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্
ঘুমিয়ে পড়ো দুষ্টু ছেলে ঘুমিয়ে পড়ো খুব।"

আর একটী কবিতায় বারোমাসের ঋতুপার্ব্বণের উল্লাসে শিশুমনে কি ভাব হয় তাই বলিতেছেন—

"আষাঢ় মাসে বর্ষা আসে ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্
কুড়্ কুড়্ মুড় ইলিশভাজা ছুটিতে একদম্।
শ্রাবণ মাসে প্যাচ প্যাচানি তাল ফুলুরি খাই
খেলতে গেলেই বৃষ্টি কেবল ভাল লাগে না ভাই।

এই তো গেল বর্ষার মেঘের আড়ালে শিশুমনের অতি নিভৃত কোণের কথা কয়টী। তার পর শিশুদিগের দিন দিন জীবনের সেই মহানন্দময় দিনগুলির কথাও বাদ যায় নাই। শিশু-জীবনের সেই পরম মুহূর্ত্তের কথা কে ভুলিতে পারে? সেই বেত্রদণ্ডধারী, নাসিকাগ্রে চশমাধারী, শিশুগণের ত্রাস-উৎপাদনকারী পণ্ডিত মহাশয়কে ফাঁকি দিয়া সেই মুক্ত প্রকৃতির ভিতর আনন্দ-নৃত্য আর প্রাণের সাথী-গণের সঙ্গে খেলা—সে পরম মুহূর্ত্তের কথা কি কেহ ভুলিতে পারে? আমাদের কবিও ভুলেন নাই। তিনি শিশুর মন লইয়া পাঠশালা পলায়নের কথা, তার পর সাত বন্ধুতে মিলিয়া "দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গের" যাত্রা করিতে গিয়া কেমন কাণ্ড বাধাইয়াছিল তাহা অতি কৌশল করিয়া চমকপ্রদ ভাবে বলিয়াছেন।

শিশুদিগের খেলায় কেমন অধিকাংশ স্থলের 'উল্টা বুঝলি রামে'র দশা হয় তাহা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তার পর যাহা হয় তাহাই হইল—

"দুর্য্যোধনকে কেষ্ট বলে "যা পড়ে যা মর,
সে বলে—তুই থাম্ থাম্ থাম্ ভীমকে দেখি, সর।
এই না বলে লাগলো আবার তাথৈ তাথৈ রণ
গদার উপর কাপড় খুলে বাঁশ বের হয় একদম
সেই বাঁশেতে ভীমের ঘাড়ে মারে দুর্য্যোধন
একটী ঘায়ে হুমড়ে পড়ে ভীম সে বাছাধন।"

অতি সত্য ঘটনা। এইরূপে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিতে গিয়া যে ভীমের স্কন্ধভঙ্গ অধিকাংশ স্থলে হয় ইহা অতীব সত্য। এইরূপ সুন্দর সুন্দর শিশুদিগের মনোহরণকারী অনেক কবিতায় "হালুম বুড়ো" পুস্তকটী ভরা।

তার পর শিশু-সাহিত্যের ছন্দের "জিম্‌নাষ্টিক-মাষ্টার" সুনির্ম্মল বাবুর কথা বলিব। শিশুদের কাব্য-সৃষ্টিতে ছন্দের উপর তাঁহার যে কিরূপ দখল তাহা শিশু-সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

তিনি বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতি গতি-ভঙ্গিমায় ছন্দের নব নৃত্য দেখিতে পান। বিশ্ব-প্রকৃতির নৃত্য তাঁহার মনকে কেমন দোলা দেয় তাহা তাঁহার নিজের কথাতেই বলি—"ছন্দ কোথায় নেই? গাড়ী যাওয়া-আসার শব্দে, মানুষের কথা-বার্ত্তায়, ফেরী ওয়ালার হাঁক্‌ডাকে, পশুর চীৎকারে, পাখীর গানে, ভোমরার গুঞ্জনে, নদীর কল্লোলে, পাতার মর্ম্মর ধ্বনিতে সবার ভিতরই বিভিন্ন ছন্দ বাঁধা আছে—" শিশুদিগের কবিতায় নব নব ছন্দ:—প্রকাশের ক্ষমতায় ইহার স্থান সত্যেন্দ্রনাথের পরেই।

ম্যাচ জিতিয়া একদল খেলোয়াড় ভীষণ হল্লা করিয়া রাস্তায় ঘুরিয়া ফিরিতেছে—সবাই চীৎকার করিতেছে—"হিপ্ হিপ্ হুররে" অমনি কবি ছন্দের রূপ দিয়ে তাকে প্রকাশ করিলেন—

হিপ্ হিপ্ হুর রে
বুক্ দুর্ দুর্ রে—
উল্লাস চীৎকার
উৎকট সুর রে।—
আজ আর কাজ নয়
রাস্তায় ঘুর রে
হিপ্ হিপ্ হুর রে।

তার পর এক দল লোক হয় ত একটা ভারি কিছু তুলিতেছে। তখন তাহারা অনেক সময় 'হেইয়ো' 'হেইয়ো' ইত্যাদি শব্দ করে। কবি সেই শব্দের অনুযায়ী কবিতা করিলেন—

"হেইয়ো হো — চুপ্ রহো—
বাঃ সাবাস্ — বাস্‌রে বাস
মর্দ্দ কে — সত্য যে
কোরতে কাজ — পায় না লাজ—
দ্বন্দ্ব যে — মন্দ সে।"

এই দুনিয়ার অতি ছোট খাটো জিনিসও তাঁহার চক্ষু এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। প্রায় সকল জিনিসকেই তিনি তাঁহার ছন্দের বন্ধনীতে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রত্যেক টুং টাং শব্দের ভিতরই যে একটা ছন্দের গতিভঙ্গিমা আছে তা সুনির্ম্মল বাবুর চক্ষু এড়াইয়া যাইতে পারে নাই।

তাঁর ঝুট্টা মিঞা পাট্টাদার
মোরবে খেলে গাট্টা তার
ঝুট্টা মিঞা পাট্টাদার।

এক অভিনব ছন্দের কবিতা। এই কবিতাগুলি যে শুধু সৃষ্টি ও ছন্দের দিক্ দিয়ে সুন্দর তাহা নহে, ইহার ভিতর প্রাণ আছে, এ গুলির অধিকাংশই সজীব।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, প্রখ্যাত-নামা সাহিত্যিকরা যেন শিশুসাহিত্যকে করুণার চক্ষে না দেখেন। তাঁহারা যেন এই শিশু-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে যত্নবান্ হন। তাহা না হইলে গোড়া কাটিয়া আগায় জল দিবার মত হইবে।*

---

* প্রবন্ধ-লেখক আধুনিক কয়েকজন কবি বা লেখক যাঁহারা শিশু-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন তাঁহাদের কথাই আলোচনা করিয়াছেন। এ সাহিত্যের গোড়ার যুগে যাঁহারা বাঙ্গালার শিশু-মনকে গঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে আলোচনা আদৌ করেন নাই। অন্ততঃ তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের রচনাগুলি, প্রসিদ্ধ চিত্র-কথা-শিল্পী সাহিত্যাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজভোগ' প্রভৃতি পুস্তকের, দক্ষিণাচরণ মিত্র মজুমদারের রচনাগুলি ও শান্তিপুরের স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "স্বদেশ" এবং বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের "শিশু ভোলানাথ" 'রাজর্ষি' প্রভৃতি পুস্তকের আলোচনা করা উচিত ছিল। এ গুলির আলোচনা না করিলে প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়।—পক্ষপুষ্প-সম্পাদক
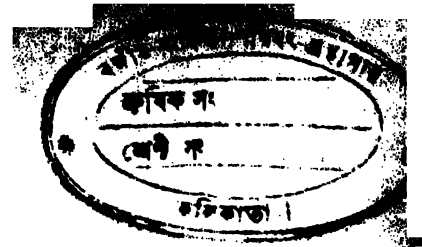
অমৃত-তর্পণ

[গত মাসের 'পঞ্চপুষ্প' যখন ছাপা শেষ হইয়া আসিয়াছিল, তখন আমরা অধুনা পরলোকগত অমৃতলাল সম্বন্ধে অনেকগুলি লেখা পাইয়াছিলাম। সেগুলির মধ্যে যে কয়টী প্রকাশযোগ্য মনে করিয়াছি, তাহা এইবারে ছাপা হইল।—সম্পাদক]

রসরাজ

বসুধার রস-সিন্ধু করিয়া মন্থন
আনন্দের সুধা তুমি এনেছিলে বহি'
অমল হৃদয়-পাত্রে ; মৃত-সঞ্জীবন
ধারা তার করি পান, দুঃখময়ী মহী
বাঙালী দেখিয়াছিল সুন্দর, মধুর ;
কাব্যে, গানে, অভিনয়ে, কথা বক্তৃতায়
পরাণ-পরশ-করা তারি মায়া-সুর
ছন্দে আর কণ্ঠে তব বেজেছে ধরায় ;
হে সার্থক-নামা শিল্পী, হে চির অমৃত
বাঙালী যে মা ব'লেছে বঙ্গ-ভারতীরে
জীবনে তা কোন দিন হওনি বিস্মৃত
বহুমুখী প্রতিভার জয়গর্ব্বে ফিরে ;
যে মদিরা গেলে নিয়ে প্রাণ-পুষ্প মাঝে
সারা স্বর্গ মত্ত জানি হবে তার ঝাঁঝে।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

অমৃতলালের জনৈক বালক-বন্ধুর কথা ও তাঁহার ছাত্রজীবনের

একপৃষ্ঠা

গত ১৬ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার অমৃতলালের শ্রাদ্ধ-দিবসে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট গৃহে নাট্যাচার্য্যের পরলোকগমন উপলক্ষ্যে যে মহতী শোকসভার আয়োজন হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় বলিয়াছিলেন, শোকসভার উপর তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা নাই। অমৃতলালের মৃত্যুর ঠিক দুইদিন পরেই তিনি যখন একটী শোকসভার নিমন্ত্রণ পান, তখন তাঁহার চিত্ত ব্যথিত হইয়াছিল। তাঁহার বিশ্বাস, এরূপ সভা করা মাত্র বক্তৃতা দিবার প্রবল বাসনার জন্য—'Just to let the gas out.' শিশিরকুমারের এই কথায় মুখে কেহ কিছু না বলিলেও অনেকেই যে অন্তরে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কিন্তু আমার হৃদয়ও এই কথাতেই সায় দেয়। আমার প্রিয় গুরুজনের মৃত্যুতে আমি অশ্রুভারাক্রান্ত চিত্তে হিন্দুসন্তানের অবশ্য কর্ত্তব্য হিসাবে তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্য সমাধা করিতে পারি, কিন্তু গলা শানাইয়া 'তিনি কত বড় লোক ছিলেন,' 'তাঁহাকে আমি কিরূপ ভালবাসিতাম', ইত্যাদি কথা বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া সাধারণ-সমক্ষে জাহির করিতে পারি না ; তখন বিরহব্যথাতুর বক্ষ হইতে উদ্বেল অশ্রু কণ্ঠরোধ করিয়া থাকে। তাই যখন উপরিউক্ত শোক-সভার অনুষ্ঠাতাদের মধ্যে অগ্রণীরূপে অমৃতলালেরই প্রিয় শিষ্য সাঙ্গোপাঙ্গ অনুচর দ্বারা গঠিত 'অমৃতচক্রে'র নাম লিপিবদ্ধ দেখিলাম, তখন মনে মনে আহত হইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, 'চক্রের' ইহা উচিত হয় নাই ; অমৃতলাল নিজেই বারংবার বলিয়াছিলেন, "তোমরা আমার শোক-সভা ক'রো না ; বরং আমার জন্ম-বাৎসরিক বছর বছর ক'রো"। অমৃতলাল স্বয়ং শোকসভার উপর কিরূপ খড়্গহস্ত ছিলেন, তাহা যাঁহারা তাঁহাকে কোনও শোক বা স্মৃতিসভায় যোগদান করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। আমার মনে আছে, যে দিন আচম্বিতে 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাতে'র ন্যায় দেশবন্ধুর মৃত্যুসংবাদ কলিকাতায় প্রচারিত হয়, সেইদিনই বীডন উদ্যানে এক শোকসভার আয়োজন হয়। অমৃতলাল সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছিলেন, 'আজ দেশবন্ধুর মৃত্যুতে বাঙ্গালা ব্যথিত, আজ আকাশে রোদনের রোল শোনা যাচ্ছে, গাছের মর্ম্মরধ্বনিতে বিলাপ শুনতে পাচ্ছি' ইত্যাদি ইত্যাদি মুখরোচক কথা। অমৃতলাল বক্তৃতা দিতে উঠিয়া বলিয়াছিলেন, 'যে লোকটা এখনও প্রায় জলজ্যান্ত, যার নশ্বরদেহ আজও ভস্মীভূত হয় নি, মন আশা কচ্ছে, না, না, সে হয় তো বেঁচে উঠবে, তারই জন্যে

শোকসভা—এ আমরা কি হয়েছি!'—এই ধরণের উক্তি গুলি সত্যকথা। আমি কামনা করিয়াছিলাম, বঙ্গদেশের জন-সাধারণ অমৃতলালের মৃত্যুতে শোক সভা করিতে হয় করুন; বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট কত বিভিন্ন দিক্ দিয়া গভীরভাবে ঋণী—সে ঋণ উপলব্ধি করিয়া সাধারণে তাঁহার মর্ম্মর-মূর্ত্তি গড়িয়া তাঁহার পূজা করিতে চান, ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁহারই 'অমৃত-চক্র' যেন তাঁহার নামে গলা বাজাইয়া শোক করিতে বা তাঁহার নাম লুপ্ত হইবার ভয়ে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত না হইয়া পড়ে। যে কারণে অমৃতলালের শবদেহের আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয় নাই, ঠিক সেই কারণেই ইহাতে অমৃতলালের অমৃতলোকগত আত্মা ব্যথিত বৈ আনন্দিত হইবেন না। কিন্তু আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, এদেশের লোকের দশাই হইতেছে, জ্যান্তে পায় না ভাত-কাপড়, ম'লে হয় দান-সাগর!

অমৃতলালের মর্ম্মরমূর্ত্তি যদি গঠিত না হয়, সে বাঙ্গালীর কলঙ্কের কথা; তাহাতে অমৃতলালের বিশেষ কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। বিলাতে সেক্সপীয়র সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত না হইলেও সেক্সপীয়র বাঁচিয়া থাকিতেন। অমৃতলালও বাঁচিয়া থাকিবেন তাঁহার আপন জোরে। যেমন কালিদাস, সেক্সপীয়র, মিল্টন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কাশীরাম, কৃত্তিবাস অমর, অমৃতলালও ঠিক তেমনই অমর। তথাপি যেমন কালিদাস কোন্ দেশের লোক, সেক্সপীয়র কতদূর পড়াশুনা করিয়াছিলেন, মিল্টন যে লেখনী দিয়া প্যারাডাইস্ লষ্ট লিখিয়াছেন, সেটী কোথায়, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের আর কোনও ছত্র তাঁর প্রিয়তমার লেখা কিনা, চণ্ডীদাসের মৃত্যু কি ভাবে সংঘটিত হইয়াছিল, বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের সত্যই সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি না, কাশীরাম তাঁহার মহাভারতের জন্য অন্য কাহারও নিকট কতখানি ঋণী, কৃত্তিবাসের জন্ম-তারিখ কি—এই সব লইয়া অনুসন্ধানের শেষ নাই, পণ্ডিতে পণ্ডিতে রীতিমত লাঠালাঠি উপস্থিত হয়, তেমনই অমৃতলালের নামকরণটী কে করিয়াছিল, কোন্ রসিক তাঁহাকে প্রথম 'রসরাজ' আখ্যায় ভূষিত করেন, কেমন করিয়া [illegible] মুস্তফী তাঁহাকে থিয়েটারে নামাইয়াছিলেন, তরু-[illegible] কোন্ 'সতী-যুবককে' দেখিয়া লেখা, কোন্ বালিকাবধূর প্রেম তাঁহার মনে 'গিরিবালা'র প্রেরণা যোগাইয়াছিল—এই ধরণের বিষয় আলোচনা করা এবং আলোচনায় সাহায্য করা 'অমৃত-চক্রে'র প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। তবে এরূপ আলোচনা করিবার মত চিত্তস্থৈর্য্য এখনও হয় তো অমৃতলালের গুণগ্রাহী শিষ্যদের মধ্যে আসে নাই এবং না আসিবারই কথা।

বিয়োগ-ব্যথায় আকুল হৃদয়ে অমৃতলাল সম্বন্ধে এখন কিছু লিখিতে বা বলিতে গেলে সম্ভবতঃ কিছু উচ্ছ্বাসেরই বাড়াবাড়ি হওয়া স্বাভাবিক। তাই তাহা হইতে আপাততঃ বিরত থাকিয়া বালক অমৃতলালের ছাত্রাবস্থার একটী পরিচয়-লিপি পাঠকবর্গকে উপহার দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

বাল্যকালে অমৃতলালের বাস ছিল কথুলিয়াটোলার যে বাড়ীতে তাঁহার বর্ত্তমান ঠিকানা, ১৪৯ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। আর তিনি যে বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছিলেন, তাহার তখনকার নাম 'শ্যামবাজারস্থ বঙ্গ বিদ্যালয়' উহাই এক্ষণে অমৃতলালের চেষ্টায় গভর্ণমেণ্টও বহু সদাশয় ব্যক্তির অনুগ্রহে 'শ্যামবাজার এ, ভি, স্কুল' নামক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়। অমৃতলাল, অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রভৃতি কয়েকজন পল্লীস্থ বালককে সম্বল করিয়াই এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে। ইহার 'শকাব্দা ১৭৮২। ইংরাজী ১৮৬০ সালের 'পঞ্চমবর্ষীয় বিজ্ঞাপনী' হইতে অমৃতলাল তখন কিরূপ ছাত্র ছিলেন, তাহার পরিচয় পাই। উহাতে যাহা দেখিতে পাই, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

তৃতীয় পৃষ্ঠায় আছে—

"পঞ্চম সাম্বৎসরিক পরীক্ষার পাঠাবলী।

প্রথম শ্রেণী।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র। শ্রীঅমৃতলাল বসু।

ছাত্র সংখ্যা। (১৩) ত্রয়োদশ।

পাঠ্যপুস্তক। নীতিবোধ। সমাপ্ত।

সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা। সন্ধি সমাপ্ত।

বঙ্গদেশের ইতিহাস। দ্বিতীয়ভাগ সমাপ্ত।

ভূগোলসূত্র। সমাপ্ত।

অঙ্ক। লঘুকরণ"

চতুর্থ পৃষ্ঠায়—

শ্রীযুক্ত বাবু অনুপচাঁদ মিত্র-প্রদত্ত এক রজত-নির্ম্মিত

পদক প্রথম শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র শ্রীঅমৃতলাল বসুকে প্রদত্ত হইল।"

পঞ্চম পৃষ্ঠায়—

To The Secretary of the Sambazar,
Vernacular School.

Dear Sir,

Agreeably to your desire I examined the 1st. Class of the Sambazar Bungo Bidyalaya and was well satisfied with the boys' answers. The lad named Umurto Lall Bose is far ahead of his class mates and deserves especial commendation. 18 December, 1860.

I am Dear Sir
Your's faithfully
(Sd) Gopal Chunder Goopto
Offg, Deputy Inspector of Schools.

ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় উক্ত পরীক্ষায় কে কোন্ বিষয়ে কত নম্বর পাইয়াছে, তাহার তালিকা আছে।

অমৃতলাল যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা এই :—

Dictation from any book—	৫০এর	মধ্যে	৪৮
Reading from any book—	"	"	৪৯
Nitibodh	"	"	৪৮
Wopocromonica	"	"	৫০
Bhoogul Sootro	"	"	৫০
Bengal History	"	"	৫০
Arithmetic	"	"	২২
	মোট ৩৫০এর	মধ্যে	৩১৭

অমৃতলাল বরাবরই অঙ্কে কাঁচা ছিলেন, একথা তিনি সগৌরবেই স্বীকার করিতেন।

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

অমৃতলালের বৈশিষ্ট্য

স্তূপীকৃত পাষাণ ভেদ করে নির্ঝরের পুলকোচ্ছল জল বাহিরে আসতে পারে, দুর্দ্ধর্ষ মরুর তলে তলে ফল্গু আপনার কল্যাণময় প্রবাহ বিস্তার করতে পারে—কিন্তু জাতির অন্তর যখন আদর্শ-হীনতায় কঠিন হয়ে আসে, জাতির প্রাণ যখন ভাব-কুটিলতায় দগ্ধ হয়, তখন তার ভবিষ্যৎ বড় ভয়াবহ। এমনি একটা ভয়ের দিন বাঙ্গলার আকাশে ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এসেছিল—মনীষীরা যে তা লক্ষ্য করেন নি এমন নয়, তবে সে দুর্দ্দিনকে অপসারিত করতে পারা, বা সে বিকলতাকে যথাসময়ে দূরীভূত করতে পারা মানুষের শক্তির বাহিরে।

মন-মরা জাতি আপনা থেকেই বুঝতে পারে—এবং বাঙ্গালীও মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিল কি একটা বৈক্লব্য-ময়ী মরণের ছায়ার উষরস্পর্শে সে ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে আসচে—তার প্রাণের স্পন্দনকে সে যেন রুদ্ধ করেচে, বিষের নিঃশ্বাসে কে যেন তার সমগ্র চেতনাকে হরণ করতে প্রবৃত্ত।

মন-মরা জাতির এ এক দুর্ব্বোধ্য অবস্থা। সে যেন প্রাণ থাকতে নিস্পন্দ, শক্তি থাকতে অশক্ত। এ সেই দিন যে দিন আলস্য ও নিশ্চেষ্টতাই জীবনের কাম্যবস্তু বলে আরাধনা পায়—কর্ম্ম জীবনের দাস্য বলে ঘৃণিত হয়, আনন্দের সংসর্গকে অশ্লীলতা আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এ সেই দিন যে দিন সাহিত্যিক তার লেখবার বস্তু খুঁজে পায় না, গায়ক তার মর্য্যাদা বুঝে না, শিল্পীর শিল্প প্রলাপ-শিল্পে পরিণত হয়। বাঙ্গলার এমনই এক সময়ে অমৃতলাল লেখক, অমৃতলাল শিল্পী, অমৃতলাল অভিনেতা।

সাহিত্যগুরু বঙ্কিমকে অগ্রণী করে সহসা বাঙ্গলার দ্বারে এক নহবৎ বসেচে—বাঙ্গালা যে দিকে চায়, যে যে দিকে তার দৌর্ব্বল্য দেখা দিয়েছিল ঠিক সেই সেই দিকে বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়ে যে সকল শিল্পী অসাড় মৃতকল্প বাঙ্গালীর প্রাণে নূতন চেতনা এনে বাঙ্গালীকে পুনর্জ্জীবিত করে তুলচে—এর পিছনে কে? কার করুণা এ জাতির শিরে কল্যাণ বর্ষণ করেচে, কার ইচ্ছায় পদ্মা-ভাগীরথীর দেশে পুনর্ব্বার মুক্ত-মহান্ ভাব-প্রয়াগের সৃষ্টি। চিরতরুণ যে, চিরসুন্দর যে, কবির কবি, সত্যের গুরু, উপাসকের উপাস্য যে, সেই আজ নিজে বাঙ্গলার ইতিহাস-রচনার ভার নিয়েচে—তাই আজ জাতির জীবনে বিজয়-বৈচিত্র্য দেখা যাচ্চে।

বাঙ্গলার জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রথম স্তবকে মঙ্গলময়ের মঙ্গলেচ্ছায় প্রবুদ্ধ হয়ে যে যে মনীষী কর্ম্মযুক্ত হয়েছেন—অমৃতলাল তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সাহিত্য-ক্ষেত্রে বঙ্কিম,

গিরিশ, অমৃতলাল, রাজনীতির পথে সুরেন্দ্র, চিত্তরঞ্জন ও অরবিন্দ—জাতীয় সঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলাল—ধর্ম্মসাধনে ভগবান্ রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ।

এই সময়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে অমৃতলালকে দেখার প্রয়োজন। অমৃতলাল স্বেচ্ছাকৃত লেখন-বিলাসী সাহিত্যিক নন। অমৃতলালের অকাট্য বিদ্রূপ, অমৃতলালের হাস্যাবৃত অশ্রু, অমৃতলালের ব্যঙ্গব্যূহ—বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবন গঠনে কতটা সহায়তা করেচে ভবিষ্যৎ তার নির্ণেতা।

মানুষ যখন শোকদুঃখে জর্জ্জর তখন তারি তল্লাসে বিশ্বনাথ শিবের আবির্ভাব হয় মানুষের শ্মশানে। তেমনই করে যে সময়ে বাঙ্গালী মহত্ত্বের ভারে ক্লান্ত, নিম্নরসালাপ-পরতন্ত্র, বাঙ্গালী যখন আত্মবিস্মৃত, তখন বাঙ্গালার অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল ও গিরিশের হাতে রঙ্গালয়ের বিকাশ,—বাঙ্গালার রঙ্গালয়ে বাঙ্গলার জাতীয় জীবনের একদেশ সাধনা—একদিকে গিরিশের তেজশ্ছন্দরচিত ধর্ম্ম-কাব্য বাঙ্গালীকে তার বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, রামলক্ষ্মণ ও কৃষ্ণার্জ্জুনকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে তার নিত্য আদর্শ চিনিয়ে দিয়েছে—অপর দিকে, আলস্য, অনাচার, কপটতার রুদ্রদ্রোহী অমৃতলালের ছদ্মবেশী প্রহসন বাঙ্গালার গৃহজীবন ও সামাজিক জীবনকে আত্মবিচারের তুষানলে নিক্ষেপ করে নিকষিত স্বর্ণে পরিণত করবার চেষ্টা করেচে।

জাতীয় জীবনের এই আদ্য গুরুগণের কাকেও বিভিন্ন করে দেখবার উপায় নেই। বঙ্কিমের মাতৃবন্দনা, গিরিশের লোকশিক্ষা ও শাস্ত্র-প্রীতি, অমৃতলালের কটাক্ষ, দ্বিজেন্দ্রের শঙ্খধ্বনি, সুরেন্দ্রের তূর্য্যনাদ, চিত্তরঞ্জনের ত্যাগ, অরবিন্দের ভাবপ্রদীপ, রামকৃষ্ণের তপস্যা ও বিবেকানন্দের শক্তিমন্ত্র—কালের সংযোগে বাঙ্গলার মাটীতে জাতীয়তার মহাযজ্ঞের আরম্ভ।

সেই আদ্যগুরুগণের অনেকেই আজ অনন্তধামে। অমৃতলালকে দেখবার ও অর্চ্চনা করবার সুযোগ আমরা সম্প্রতি হারালুম। দেশবাসী অমর-লোকে তাঁর মঙ্গল কামনা করে। তাঁর কৃতিত্ব বাঙ্গালীর চিরস্মরণীয় সম্পত্তি।

শ্রীঅমিয়কুমার সান্যাল

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অমৃতলাল

স্বর্গীয় নাট্যাচার্য্যের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা প্রায় চল্লিশ বৎসরের এবং তাহা এক ক্ষেত্রে নয় বহুক্ষেত্রে। গৃহী, সামাজিক, নট, নাট্যকার, নাট্যাচার্য্য, সাহিত্যিক, বক্তা, নেতা, উপদেষ্টা, শিক্ষানৈতিক প্রভৃতি সকল রূপেই তাঁহাকে অতি নিকট হইতে দেখিবার সুযোগ আমি পাইয়াছি। সুতরাং তাঁহাকে কতকটা চিনিবার ও জানিবার অভিমান আমি রাখি। তাঁহার জীবন ছিল এত ব্যাপক যে তাঁহার সম্বন্ধে সকলকথা, যাহা আমি জানি, তাহা বলিতে গেলে একটা বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং এখানে সে কথা বলিতে যাওয়ার চেষ্টা করা থলীর ভিতর হাতী পোরার ন্যায় অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠে। আমি কেবল তাঁহার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার জন্য আজ এই কয়েক ছত্র লিখিতে বসিয়াছি।

তাঁহার রসরচনা, সামাজিকতা সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিবেন—সুতরাং আমি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সে সকলের কথা উত্থাপন করিব না। আমি কেবল বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহার কি মত ছিল তাহারই সম্বন্ধে দু'-একটা কথা বলিব। কারণ আমার বিশ্বাস এ সম্বন্ধে অনেকেই হয় ত কিছু আলোচনা করিবেন না। আমার সঙ্গে এ সম্বন্ধে প্রায়ই তাঁর কথাবার্ত্তা হইত। আমার প্রতি তাঁহার গভীর স্নেহবশতঃ তিনি আমার মতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। বর্ত্তমানে প্রচলিত শিশুদের পাঠ্য-পুস্তকের উপর তাঁহার একটা বিশেষ বিতৃষ্ণা ছিল। তিনি বলিতেন যে আমাদের দেশের শিক্ষা চিরদিনই রসের ভিতর দিয়া হইয়া আসিয়াছে, আমাদের বালক-বালিকাদের শিক্ষা গল্প, কথকতা, যাত্রা প্রভৃতি সরস বাহনের ভিতর দিয়াই নিষ্পন্ন হইত। তাহাতে তাহারা প্রচুর আমোদের সঙ্গে যথেষ্ট শিক্ষা পাইত। শিক্ষককে দণ্ডদাতা বলিয়া মনে হইত না। আর বর্ত্তমান কালের পরীক্ষারূপ ভীষণ বিড়ম্বনা তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইত না। কিন্তু এখনকার পাঠ্যপুস্তকে যেরূপ কঠোরভাবে নীতিশিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে নীতির প্রতি কোমলমতি বালক-বালিকাগণের একটা ঘোর বিদ্বেষ স্বভাবতঃই জন্মে। এই জন্যই বর্ত্তমান Text Book Committeeর উপর তাঁহার

বিশেষ বিরাগ ছিল। এবং এমন কি বলিতেন যে তাহাদের পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচনের দোষে আজকাল দুর্নীতির এত প্রাদুর্ভাব। তাঁহার জীবনের শেষ কয়েক বৎসর শ্যামবাজার এ, ভি, স্কুলের সম্পাদকতা করিয়া কাটিয়াছে। সেখানকার বালকদিগকে তিনি আপন পুত্রের চেয়েও অধিকতর স্নেহ করিতেন। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ঐরূপ ধরণের পুস্তক ছেলেদের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচন করিতে বাধ্য হইতেন বলিয়া তিনি প্রায়ই গভীর মনোবেদনা প্রকাশ করিতেন। প্রায়ই আমাকে বলিতেন, কবে ছেলেরা এই নরক-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবে বলিতে পার?

তিনি একবার বর্ত্তমান পাঠ্যপুস্তকের যে সুন্দর ব্যঙ্গ-চিত্র আঁকিয়াছিলেন তাহা এখনও আমার মনে জাগরূক আছে। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে তাঁর মত লোক আমাদের Text Book Committee-তে কখনও আসন পান নাই।

শ্রীমন্মথমোহন বসু

অমৃতলাল

রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন—"মানুষকে যেখানে ভালোবাসি তুলাদণ্ডে সেখানে তা'র ওজন পাই নে। মানুষের সমস্তই পরিমেয়, কিন্তু ভালোবাসার মানুষ পরিমেয় নয়।" ভবভূতি একদিন ব'লেছিলেন—'স তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ',—অর্থাৎ "যে মানুষটী প্রিয় সে যে কি তা মনেও ভাবা যায় না, মুখেও বলা যায় না,—কেন না সেই খানেই মানুষের অসীমকে আমরা উপলব্ধি করি।"—অমৃতলাল সেইরূপ আমাদের ভালোবাসার মানুষ, অন্তরের প্রিয়জন। তিনি ছিলেন একজন মনীষী, তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ছিল, কিন্তু সে কথা আজ খুব বড় হ'য়ে দেখা দিচ্ছে না,—কেবল আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি মানুষ অমৃতলাল—ভালোবাসার মানুষ অমৃতলাল, দেশের মানুষ দশের মানুষ অমৃতলাল, সত্য মানুষ অমৃতলাল। তিনি ছিলেন কর্ম্মযোগী, তিনি বিশ্বকর্ম্মে আপনার আত্মাকে নিয়োগ ক'রেছিলেন। কর্ম্মই ছিল তাঁর একমাত্র আনন্দ, এবং তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কর্ম্ম ক'ত্তে ক'ত্তে মোহমুক্তি পেয়েছেন। তিনি পূর্ণ ভাবে জেনেছিলেন সেই বিরাট্ কর্ম্মীকে, তাই কর্ম্মই ছিল তাঁর জীবনের সাধনা। তিনি এই কর্ম্মের দ্বারা আপনার আত্মাকে চিনতে পেরেছিলেন। এই আত্মার উপলব্ধি দ্বারা তিনি অমৃত সন্ধান পেয়েছিলেন।

"এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ,
হৃদা মনীষা মনসাভিক্‌প্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"

"এই যে দেবতা, যিনি বিশ্বকর্ম্মা, যিনি মহান্ আত্মা, যিনি জনসকলের হৃদয়ের মধ্যে নিবিষ্ট, তাঁকে হৃদয়ের দ্বারা, আত্মবশ মনের দ্বারা, মননের দ্বারা যাঁরা জেনেচেন—তাঁরা অমৃত হন।"—'কারণ তাঁরা আত্মাকে পেয়েচেন, সেই আত্মাকে পাওয়াই অমৃতকে পাওয়া।'—(রবীন্দ্রনাথ) অমৃতলাল জেনেছিলেন আপন অন্তরদেবতাকে, সেই দেবতাই তাঁকে তাঁর আত্মা চিনিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন,—তাই আজ তিনি সত্য মানুষ।

জীবনের শেষ-অঙ্কে আমি তাঁর নিকটে বসবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছিলুম, আমাদের বয়সের যথেষ্ট অনৈক্য ছিল, তথাপি মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত আমাদের দুজনের মধ্যে একটা সম্বন্ধ ছিল। তাঁর ছিল স্নেহপ্রবণ হৃদয়, নিরহঙ্কার, কিন্তু তাঁর মধ্যে যথার্থ শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ও সত্য মানুষের আভিজাত্য প্রকাশ পেত। তাঁহাকে শেষ দিন পর্য্যন্ত জরা আক্রমণ ক'ত্তে পারে নি, তাঁর যৌবন-সুলভ কর্ম্ম তাঁকে ক্লান্ত করতে সমর্থ হয় নি। তাঁর মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি—আশ্চর্য্য যৌবনের তেজ। তিনি পরিপূর্ণরূপে কর্ম্মকাণ্ডের ভিতর যোগ দিয়েছিলেন। আর এই খানেই তাঁর সাধনার সিদ্ধি।

অমৃতলালের কি সাহিত্যে, কি সামাজিক জীবনে কি আচারে ব্যবহারে একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল। অথচ তিনি ছিলেন সহজ সরল মানুষটি, অভিলাষী ব্যক্তিমাত্রেই তাঁর সঙ্গ পেয়ে পরিতৃপ্ত হ'য়েছিল। লোকে যেমন তাঁর সঙ্গ আকিঞ্চন করত, তিনিও অপরের সঙ্গ প্রার্থনা ক'রতেন। "মানুষের চিত্ত অন্য চিত্তের অপেক্ষা রাখে," তিনি একথা মানতেন। 'পরস্পর সঙ্গের ভিতর দিয়েই প্রাণশক্তির উদ্বোধন হয়, এই ক'রেই সাহিত্যের উৎপত্তি; 'সহিত' সকলের সঙ্গে যে সঙ্গলাভ, সেই সঙ্গ-লাভ থেকেই অর্থাৎ মানুষের সহিত মানুষের সঙ্গের মধ্য' দিয়েই রস-বিনিময়

হয়। এবং অমৃতলাল চিরদিন এইরূপে রসসৃষ্টি ক'রে গেছেন, তিনি কোনদিনই একান্তবাসী ছিলেন না।

তিনি আসল মানুষ ছিলেন, তাই তিনি দেশের মানুষকে আগে চিনতে চেয়েছিলেন। মানবজাতির পরিচয় পেতে হ'লে ব্যক্তিকে জানতে পারা চাই। আবার ব্যক্তিকে জানতে হ'লে তা'র রীতি-নীতির (manners) সহিত ঘনিষ্ঠতা থাকা প্রয়োজন, তার পর প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরে ভাল কিংবা মন্দ ভিন্ন ভিন্ন রীতি-প্রিয়তা (mannerism) বর্ত্তমান র'য়েছে; যে শিল্পীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এই সকল বৈশিষ্ট্য এড়িয়ে যায় না, তিনিই বড় শিল্পী। অমৃতলালের ছিল এই খানেই বিশিষ্টতা। তিনি অনেক চরিত্রের "Vanity Fair" সৃষ্টি ক'রে গেছেন। Vanity মানুষের ভিতর মানুষের পার্থক্য সৃষ্টি করে, এবং তাহাতেই রসের সৃষ্টি। অমৃতলাল ছিলেন সৃষ্টি-ক্ষম নাট্যকার, তাই তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে মানুষের এই সকল জিনিস অতিক্রম ক'রে যেতে পারে নি। প্যারীচাঁদ মিত্র এইরূপ প্রথম রসিকতার সৃষ্টি ক'রে গিয়েছেন, এবং সেই রসিকতা আজ অমৃতলালে পরিপুষ্টি লাভ ক'রেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের সম্বন্ধে ব'লেছিলেন, দীনবন্ধু যে রকমটী দেখে, ঠিক সেই রকমটী ক'রে আমাদের দেখায়, কাটে না, বা ছেঁড়ে না, সে ঠিক 'আদুরী' ও সঠিক 'নিমচাঁদ' আমাদের দিয়েচে; দীনবন্ধু আমাদের ছেঁড়া আদুরী বা কাটা নিমচাঁদ দেয় নি। অমৃতলালের সম্বন্ধেও এই কথা অনেক স্থলে প্রযোজ্য।

অমৃতলাল ছিলেন—খুব বড়—সমাজের মানুষ। তিনি ছিলেন বনস্পতির মত। "সমস্ত মানুষের চিত্তে মূল বিস্তার ক'রে বড় হ'য়ে উঠেছিলেন। সকল মানুষেরই তপস্যা তাঁকে প্রাণ দিয়েছিল। —তাই আজ তিনি অমৃত, তাই তিনি আজ সকলের অন্তরকে অধিকার করে ব'সে আছেন।" তিনি যেমন ভালবাসা নিতে জানতেন, তার চেয়েও বেশী ভালবাসতে পারতেন।

অমৃতলাল—মানুষ ছিলেন, তিনি মানুষের মতই চ'লে গিয়েছেন। আজ তাঁর স্মৃতিপূজা ক'রে আমাদের অন্তরের ভালবাসা জানাবার ক্ষণিক অবকাশ পেয়েছি, তাই আমরা নিজেদের ধন্য জ্ঞান করি।

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য

অমৃত-কথা

অমৃতলাল ছিলেন বঙ্গ-রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, একজন প্রতিভাশালী নট ও নাট্যকার এবং একজন সর্ব্বজনপ্রিয় বাগ্মী একথা সকলেই জানেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারা জানেন তিনি কত বড় educationist ছিলেন। ১৯০৭ খৃঃ অব্দে তিনি কম্বুলিয়াটোলাস্থিত শ্যামবাজার মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়ের সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন এবং পরে ১৯১৩ খৃঃ অব্দে ঐ স্কুলের (এখন উহার নাম শ্যামবাজার এ, ভি, স্কুল) সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। ১৯১৬ খৃঃ অব্দে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া ঐ বিদ্যালয়ের জন্য একটী ত্রিতল বাটী নির্ম্মাণ করেন—তার পর অমৃতলালের ইচ্ছা হয় উত্তর কলিকাতায় একটী আদর্শ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য ৬১ হাজার টাকা সাহায্য প্রাপ্ত হন। আরও কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া তিনি আর একটী ত্রিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন এবং ১৯২৪ খৃঃ অব্দে শ্যামবাজার এ, ভি, স্কুলটী একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত করেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বিশেষ যোগ্যতার সহিত তিনি এই বিদ্যালয়ের সম্পাদকতা করিয়া গিয়াছেন। শ্যামবাজার এ, ভি, স্কুল তাঁহার একটী মস্ত কীর্ত্তি।

এই বিদ্যালয়টী তাঁহার বড় গর্ব্বের ও আদরের বস্তু ছিল। তাঁহার পিতৃদেব ছিলেন Oriental Seminaryর শিক্ষক এবং শ্যামবাজার মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। অমৃতলাল বলিতেন—"শিক্ষকের বংশে আমার জন্ম, তাই শিক্ষকের নিন্দা বা অপমানকে আমি নিজের নিন্দা বা অপমান মনে করি।" ইদানীং শিক্ষকের আদর্শ অত্যন্ত ছোট হইয়া পড়িতেছে বলিয়া তিনি বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিতেন এবং বারবার বলিতেন—যে বঙ্গদেশের বড়ই দুর্দ্দিন যে প্রকৃত উচ্চমনা শিক্ষক বঙ্গদেশ হইতে লোপ পাইতেছে। তিনি নামে স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন না। প্রতিদিন স্কুলে আসিতেন এবং স্কুলের কোন শিক্ষক পীড়িত বা অন্য কারণে অনুপস্থিত হইলে তিনি নিজে তাঁহার ক্লাশে পড়াইতে যাইতেন—সেই সঙ্গে

ছাত্রদিগকে কত অমূল্য উপদেশ প্রদান করিতেন। তিনি যেদিন প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরাজী কবিতা পড়াইতেন—ছাত্রেরা তাঁহার আবৃত্তি শুনিয়া অবাক্ হইয়া যাইত। বর্ত্তমান নীরস শিক্ষা-প্রণালী, যাহা কোনমতে বালক বালিকাগণের হৃদয়ে শুধু ভীতির সঞ্চার করে,—তাহার প্রতি তাঁহার ঘোর বিদ্বেষ ছিল।

অমৃতলাল একজন 'মজলিসী' লোক ছিলেন। বিকেলে যখন তিনি শ্যামবাজার এ, ভি, স্কুলের উঠানে বসিয়া 'মজলিস্' করিতেন তখন সেখানে কত লোকের সমাগম হইত। সারাদিনের পরিশ্রমের পর একবার তাঁহার কাছে বসিয়া তাঁহার অমৃতময় কথোপকথন শুনিলেই সমস্ত ক্লান্তি কষ্ট ভুলিয়া যাইতে হইত। এই 'মজলিস্' হইতেই আমাদের 'অমৃত-চক্রের উৎপত্তি। 'অমৃতচক্রে'র মাসিক অধিবেশনেও এইরূপ মজলিসই হইত, আমরা তাহার নামকরণ করিয়াছিলাম—'সদালাপ'। তিনি আমাদিগকে বলিতেন—"তোমরা একজন হোমরা চোমরা লোককে সভাপতি ক'রে নিয়ে আসবে, তিনি নিজেই বক্তৃতা ক'রে যাবেন, আর তোমরা চুপ ক'রে শুনে যাবে এ আমি পছন্দ করি না বরং যাঁকে তোমরা আনবে, চা খেতে খেতে তোমরা সকলে অবাধে তাঁর সঙ্গে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে—এই 'সদালাপ' আমি চাই।"

আজ এইটুকু লিখিয়াই সেই স্বর্গীয় পুণ্যাত্মার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিলাম।

শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়

মরণের ভয়

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

যেতে হবে পরিহরি
এমন ধরণী এই প্রিয়জন এই সংসার, মরি!
ভ'রে ওঠে বুক গভীর হতাশে
সকল অঙ্গ শ্লথ হয়ে আসে,
যবে মনে হয়—ছেড়ে যেতে হবে
সকলি দু'দিন পরে,
আজ নয় কাল—পরাণ-গুমরে, মরিতে চাহি না, ওরে!

এতটা যে ভালবাসি
এই বসুধার তৃণ হ'তে তরু, গিরি হ'তে ধূলা-রাশি,
কীট হ'তে নর, আলোক আঁধার
বজ্র বিজলী, রস-বাস-ভার,
হাজার দুঃখ মাঝারে যে টান
কখনো হয়নি' শ্লথ—
সে মায়া কাটানো সোজা কি অমনি? পূরেনি'যে মনোরথ।

এত যে দুঃখ সহি—
সুদিনের আশে, বুক বাঁধি আর জীবনের ভার বহি!
কত যে কামনা অন্তরে রাজে
দুখ-দুলাখিয়া সুর তার বাজে
একটিও তার মেটেনি হয়ত,
মিটিবেও নাক' কভু—
ঘোর নিরাশায় প্রাণ যায় যায়, মরিতে চাহিনা তবু!

হয়ত জীবন-ভোর
শুধু হারায়েছি, শুধু কাঁদিয়াছি, পেয়েছি নিরাশা ঘোর।
যেটি চাহিয়াছি তা-ই পাই নাই
পেয়েছি কেবলি যাহা চাই নাই
নয়নের জলে দিতেছি সাঁতার,
ধরেছে অকাল-জরা—
জীবনের স্বাদ নাই বা পাইনু, চাহিনা তবুও মরা।

কেউ নাই প্রিয়জন
কিছু নাই মোর তবু মনে হয় ফেলে যাব' সব ধন!
কেউ নাই মোর বলিতে আপন
মোরে না আপন ভাবে কোনো-জন
হয়ত কাহারো ঝরিবে না কভু
আঁখি-জল মোর তরে—
তবু বড় ব্যথা ছেড়ে যেতে কেন? মরণ আকুল করে!

ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসের কারণ

[শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়]

খৃষ্টীয় প্রথম শতক এবং খৃষ্টীয় বিংশ শতক! এই দুই সহস্র বৎসরে ভারতের শিল্পকলার কি বিষম অধঃপতন হইয়াছে। তখন সুদূর রোম হইতে অশেষ বিপদ্ অতিক্রম করিয়া নৌ-বণিকগণ এদেশের পণ্যদ্রব্য লইয়া যাইত। পাশ্চাত্য দেশের ধনী ও বিলাসী ক্রেতা সেগুলির জন্য উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিত। এখন এদেশের ধনী ও বিলাসীরা পাশ্চাত্য দেশজাত শিল্পদ্রব্য সাদরে ক্রয় করেন, অধিকন্তু দেশের জিনিসও দেশের কারিগর অবহেলায় লুপ্তপ্রায়। তখন এদেশের লৌহ-ইস্পাত, কাচ, কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র, নীল, মঞ্জিষ্ঠা ইত্যাদি রঞ্জক পদার্থ, বহুমূল্য কাষ্ঠ ও গজদন্ত নির্ম্মিত শিল্প দ্রব্যাদি বাণিজ্য-জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। আর এখন?

লৌহ, ইস্পাত, তাম্র ইত্যাদির উৎপাদন মধ্যে এদেশে ছিলই না, সম্প্রতি তাহা হইতেছে, কিন্তু তাহা বিদেশী রপ্তানী দ্রব্যের তুলনায় নিকৃষ্ট অথচ মহার্ঘ্য। যে ভারতীয় ইস্পাতের প্রশংসা প্লিনী রোমযুগে করিয়া গিয়াছেন, যাহা খৃঃ ঊনবিংশ শতকের আরম্ভ পর্য্যন্ত পৃথিবী-বিখ্যাত ছিল, তাহা এখন লুপ্ত! যে দেশের কাচ,* কার্পাস-নির্ম্মিত সূক্ষ্ম বস্ত্র (মসলিন)† বিদেশী শিল্পীর নিকট অননুকরণীয় ছিল, সে দেশ এখন ঐ সকল দ্রব্যের জন্য বিদেশীর মুখ চাহিয়া থাকে। অন্যান্য শিল্পেরও প্রায় এই দুর্দ্দশা।

এদেশের শিল্পের ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই।
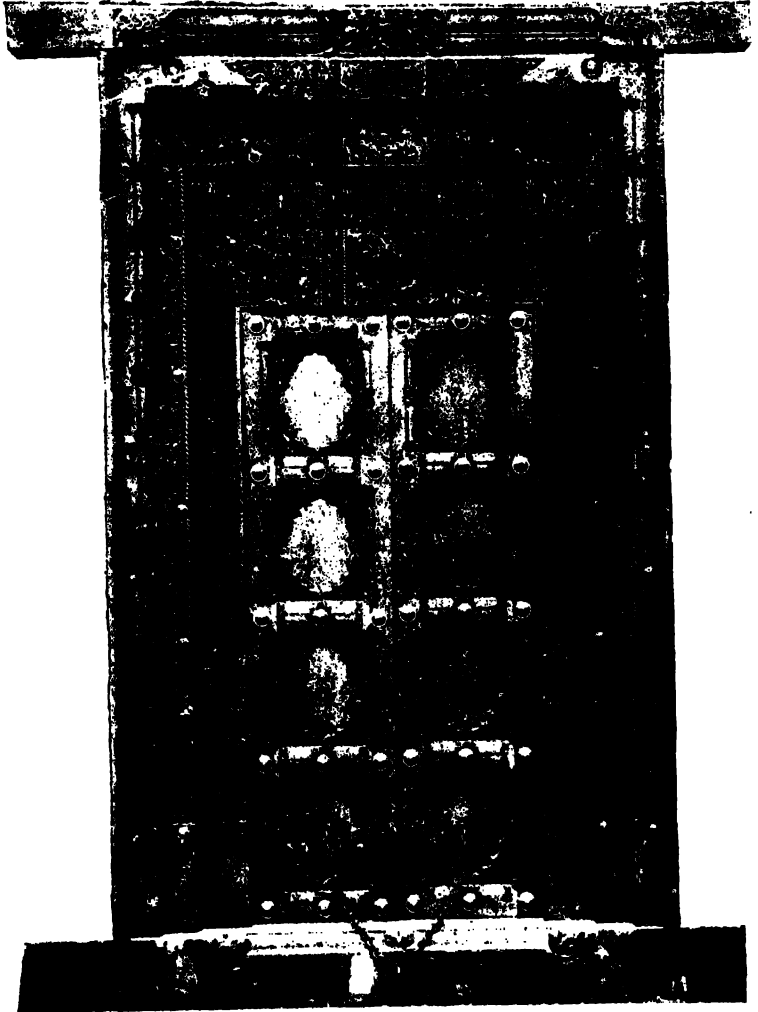
দ্রাবিড় রীতিতে ক্ষোদিত কাষ্ঠ-নির্ম্মিত দ্বার—বেলারী

কয়েকজন বিদেশী কিছু কিছু চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মতামত বহুস্থলে ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। তবে একথা খাঁটী সত্য যে এদেশের শিল্পকলা খৃঃ দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর উন্নত, [illegible] মুসলমান যুগে

* Pliny XXXVI, 66 and XXXVII, 26,

† Periplus 63.

বিধ্বস্ত; দ্বিতীয় মুসলমান (মুঘল) যুগে পুনর্গঠিত এবং বিভিন্ন প্রকার নূতন পথে চালিত, এবং খৃঃ অষ্টাদশ শতকে স্থাণু ভাবাপন্ন হইয়া খৃঃ উনবিংশ শতকে অবনতির পথে চলিতে থাকে। এই অধোগতি প্রায় শতাব্দী কাল ধীরে ধীরে চলিবার পর বিগত শতকের মধ্যভাগ হইতে অতিশয় দ্রুত হইয়া পড়ে। তখন হইতে বর্ত্তমান কালের মধ্যে ভারতবর্ষের অধিকাংশ শিল্পকলার ধ্বংস হইয়াছে। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের আন্তর্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনীতে ভারতবর্ষ শিল্পজগতের সর্ব্বোচ্চ স্থলে স্থিত।* ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের আন্তর্জাতিক শিল্পকলা-প্রদর্শনীতে (প্যারিস) ভারতবর্ষের স্থান কোথায় ছিল তাহা বলিতে লজ্জা হয়।†

শিল্পের এইরূপ দ্রুত অবনতির কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া প্রথমে আমি যুক্তিসঙ্গত কোন কারণই খুঁজিয়া পাই নাই। যে সকল দেশীয় শিল্পকলা দুই সহস্র বৎসরের যুদ্ধ বিগ্রহ, বিপ্লব, লুণ্ঠন ইত্যাদি সত্ত্বেও শিল্পজগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া ছিল, সে সকল কোন নবাবিষ্কৃত সংহার-শক্তির প্রভাবে সহসা লোপ পাইল? তারপর চিন্তা করিতে করিতে যে কয়টী কারণ সঙ্গত বলিয়া আমার মনে হইয়াছে, সেগুলি উদ্ধৃত হইল:—প্রথম কারণ এদেশে রেলওয়ের প্রসার। যেখানেই রেলওয়ে গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী দ্রব্যের দালাল সেখানেই দেশী শিল্প-দ্রব্যের নিকৃষ্ট কিন্তু স্বল্পমূল্যের বিদেশী নকল লইয়া গিয়াছে। "সস্তায় বড়মানুষী" করার স্পৃহা সকল দেশেই

নেপালে খোদিত কাষ্ঠের জানালা

আছে, কিন্তু এদেশের অশিক্ষিত দরিদ্র লোক এবং মূর্খ ধনীদিগের আসল ও নকলের প্রভেদ বুঝিবার বিদ্যা ও বুদ্ধি দুইয়েরই অভাব; সুতরাং বিদেশী বিক্রেতা সর্ব্বত্রই জয়ী হইয়াছে।

দ্বিতীয় কারণ এদেশীয়দিগের ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের অনুকরণ-স্পৃহা। এই অনুকরণস্পৃহা যদি খাঁটি পথে চালিত হইত, তবে এদেশের অনেক বিষয়ে উন্নতি হইতে পারিত। ইংরাজ মাত্রেরই সর্ব্বকালের মূলমন্ত্র "British and therefore best" অর্থাৎ "ইহা ব্রিটিশ এবং সেই কারণে শ্রেষ্ঠ।" ইংরাজের যথার্থ অনুকরণ করিবার জন্য এই উক্তির বিশ্লেষণ করিলে,

* The Grammar of Ornament. Owen Jones.

† International Exhibition. Paris, 1925. Report on the Industrial Arts

তবে দেখা যাইবে ইহার অর্থ "যেহেতু ইহা আমার স্বদেশজাত, অতএব আমার নিকট ইহা জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" দুঃখের বিষয় এদেশের লোকের এ বিষয়ে জ্ঞান এখনও অতটা তীক্ষ্ণ হয় নাই। সুতরাং ইংরাজী শিক্ষার ফলে ভারতীয় ইংরাজী-নবীশ ইংরাজের সুরে সুর মিলাইয়া বলেন, "British and therefore best", এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজেরই মত এদেশের যা কিছু দেখেন ইংরাজের ব্যবসায়-বুদ্ধি-বিরুদ্ধ। প্রত্যেক সুশিক্ষিত ইংরাজই (বা ইয়োরোপিয়) যে এদেশের শিল্পকলাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছেন আমার এইরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এই যে আমি বিদেশীয় শিল্পকলাবিদ্ বা রূপ-রসজ্ঞ বলিয়া খ্যাত যত লোকের পুস্তক বা মতামত পাঠ করিয়াছি—এবং এই সকল পুস্তকের অধিকাংশই ভারতবর্ষ বা ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধীয় নহে—তাঁহারা
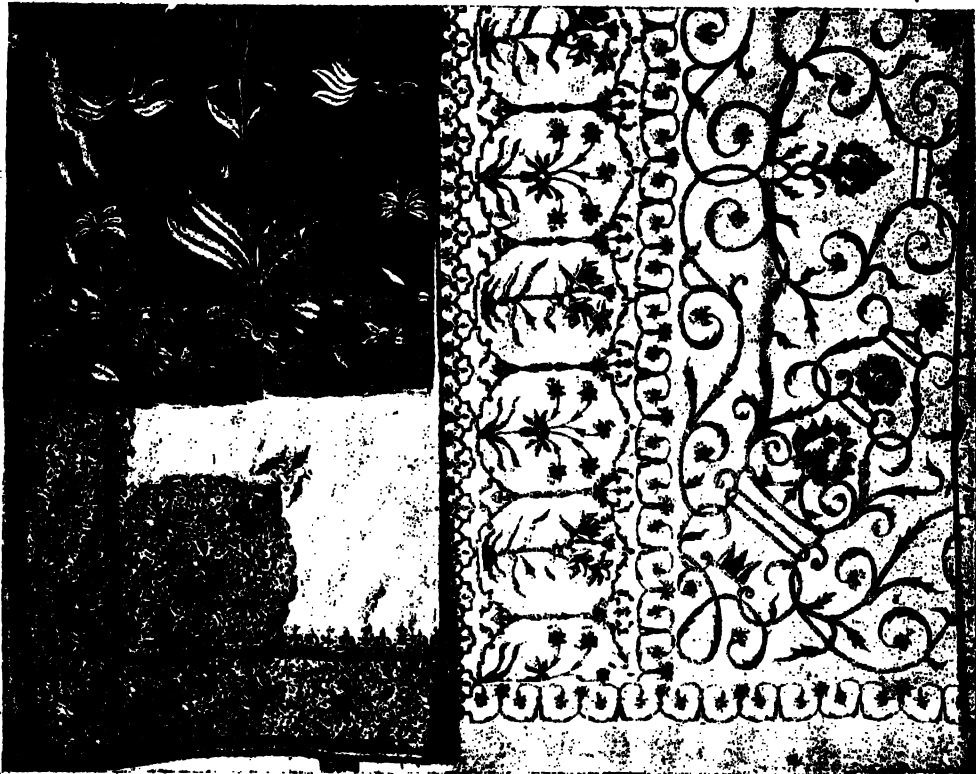
দিল্লীর চিকনের কাজ

সে সকল জিনিসকেই (রৌপ্য বা স্বর্ণমুদ্রা বাদে) হেয় জ্ঞান করেন। অথচ ইংরাজ কেন যে এদেশের শিল্প ও পণ্য দ্রব্যকে হেয় জ্ঞান করে, (অন্ততঃ পক্ষে সেইরূপ ভাব দেখায়) তাহা কাহারও জানিবার ইচ্ছা নাই। সুশিক্ষিত এমন কোনও ইংরাজ বোধ হয় এদেশে আসেন নাই যিনি ভারতীয় শিল্পকলাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন নাই। কিন্তু সে শ্রদ্ধা এদেশে প্রকাশ করা সকলেই শিল্পকলা এবং রূপরসের প্রসঙ্গে ভারতীয় শিল্পের প্রশংসা কোথাও না কোথাও করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রতি বিদ্বেষ ও অশ্রদ্ধা স্পষ্টভাবে থাকা সত্ত্বেও অনেকে এইরূপ লিখিয়াছেন * বলিয়া "বাধ্য" শব্দ ব্যবহার করিলাম।

অশিক্ষিত ইংরাজ বিজয়-দম্ভে অন্ধ হইয়া এদেশের

* যথা—John Ruskin তাঁহার Two Paths পুস্তকে।

সকল জিনিসকেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখে, এবং সেরূপ দেখা তাহার ব্যবসাবুদ্ধিরও স্বপক্ষে ; সুতরাং সে উচ্চকণ্ঠে তাহার মতামত প্রকাশ করে এবং আমাদের দেশীয় ইংরাজী শিক্ষিতের মধ্যে যাহারা অল্পবুদ্ধি (এবং তাহাদেরই সংখ্যা অধিক) তাহারা উহাকে "বেদবাক্য" বলিয়া গ্রহণ করে।

তৃতীয় কারণ বিদেশী শিল্পীর অধ্যবসায় ও উদ্যম এবং ভারতীয় শিল্পীর ঐ দুই গুণের অভাব। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী ক্রেতার স্বদেশী শিল্পীকে উৎসাহ-দানের প্রবৃত্তি এবং এদেশীয় ক্রেতার তাহার বিপরীত ভাবেরও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। এদেশে এক দিকে শিল্পী স্থাণু ভাবাপন্ন হওয়ায় কালের গতির সঙ্গে অগ্রসর হয় নাই, অন্য দিকে ক্রেতার অভাবে নিরন্ন ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে ; অতএব তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য।

উল্লিখিত তিনটি কারণের মধ্যে শেষোক্ত (দেশীয় শিল্পী ও দেশীয় ক্রেতার সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ) কারণটিই সর্ব্বাপেক্ষা বিষম এবং প্রধানতঃ উহারই জন্য ভারতীয় শিল্পের বর্ত্তমান শোচনীয় দৈন্যদশা উপস্থিত হইয়াছে। ইহার জন্য শিল্পী ও ক্রেতা উভয়েই দোষী ; কিন্তু ক্রেতার মধ্যে শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন লোকের অভাব নাই, শিল্পীর শিক্ষা ও অর্থ দুইয়েরই দারুণ অভাব। সুতরাং এখন ক্রেতারই উচিত শিল্পীকে উৎসাহ ও শিক্ষাদান করা। যদি তাহাতে কোনও ফল না হয়, তবেই ক্রেতা বিদেশীর দ্বারস্থ হইতে পারেন, তাহার পূর্ব্বে নহে।

ব্রহ্মদেশের পিন্টিকরা ও গালার কাজ করা বাক্স

ক্রেতার প্রধান অভিযোগ যাহা শোনা যায় তাহা এই যে "দেশী জিনিস বড়ই খেলো বড়ই বিশ্রী দেখিতে, বিলাতির মত চটকদার জিনিস ঐ দামে কোথায় পাইব ?"

এই সমস্ত অভিযোগের মধ্যে কেবলমাত্র মূল্যের কথার ভিতর আংশিক সত্য আছে ; সুতরাং উহার বিচারই প্রথমে করা যাউক।

ইহা সত্য যে এদেশের শিল্প-দ্রব্যের মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট তাহা বিলাতী দ্রব্যাপেক্ষা খুব বেশী মূল্যের। তাহার কারণ এই যে, এ দেশের শিল্পী কেবলমাত্র দুই প্রকারের পদার্থ প্রস্তুত করে। প্রথম, অতি উৎকৃষ্ট ; দ্বিতীয় নিকৃষ্ট। যে দ্রব্যটি সে স্বচ্ছন্দ মনে স্বাভাবিক কৌশলের সহিত করে তাহা সাধারণতঃ অতি উৎকৃষ্ট হয়, আবার যাহা তাহার অন্ন-সমস্যা সমাধানের জন্য এবং সহজে বিক্রয় করিবার জন্য প্রস্তুত তাহা "খেলো"। বিদেশীর ন্যায় বাহিরে "চটকদার" এবং ভিতরে "বাজে" পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করার বিদ্যা তাহার নাই। কাজেই বিদেশী দ্রব্যের তুলনায় তাহার শিল্পসামগ্রী হয় বহুমূল্য নহিলে অসার হয়।
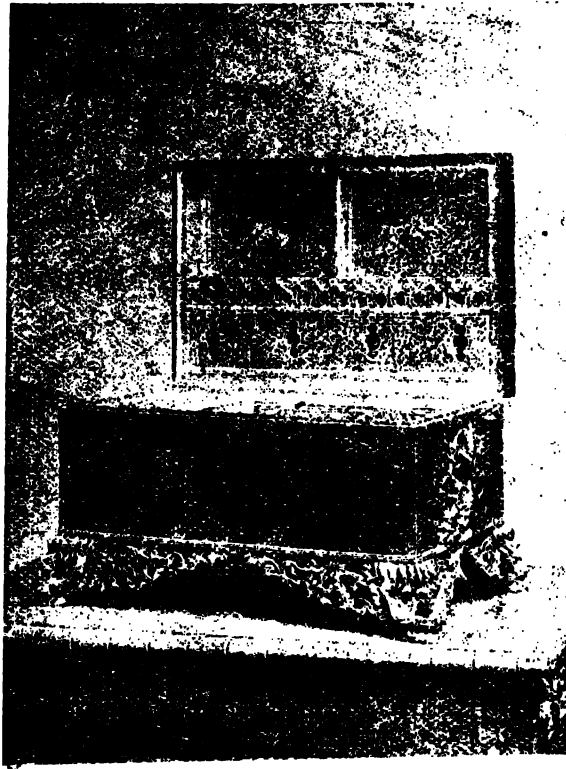
কিন্তু দেশী উৎকৃষ্ট পদার্থের মূল্য ও গুণের যাচাই কি ক্রেতা কখনো করিয়া দেখেন ? করিয়া দেখিলে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে বিদেশী শিল্পী চতুর্গুণ মূল্যেও উহার তুল্য পদার্থ দিতে পারে না। সৌন্দর্য্য এবং রূপরসের ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্প এই অবনত অবস্থায়ও বিদেশীয় অপেক্ষা বহু উর্দ্ধে রহিয়াছে।

অতএব স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে ক্রেতার খাঁটি

ও ভেজালের বিচার-শক্তির অভাবই এই মূল্যাধিক্যের অভিযোগের কারণ। দেশী শিল্পী জানে স্বর্ণ ও পিত্তল প্রস্তুত করিতে। ক্রেতা বিদেশী "রোল্ড গোল্ড" লইয়া তুলনা করিতেছেন সুতরাং স্বর্ণ তাঁহার নিকট মহার্ঘ্য, পিত্তল খেলো এবং চটকদার নহে।

এদেশের ক্রেতা যে সৌন্দর্য্য বা রূপরসজ্ঞানশূন্য তাহা অনেকেই বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন যে

স্থপতিবিজ্ঞান বা সৌধ-শিল্পের কথা আমার পক্ষে না বলাই ভাল। কলিকাতা, বোম্বাই, এলাহাবাদ, দিল্লী, লাহোর, পাটনা, নাগপুর, এই কয়টী প্রাদেশিক রাজধানী আমি ভাল রকমেই দেখিয়াছি এবং ইহা আমার দৃঢ় ধারণা যে ঐ কয়টী নগরের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা বিংশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত, কোনও ধনীর প্রাসাদ বা বাসগৃহ আমি দেখি নাই যাহাতে সুরুচি,
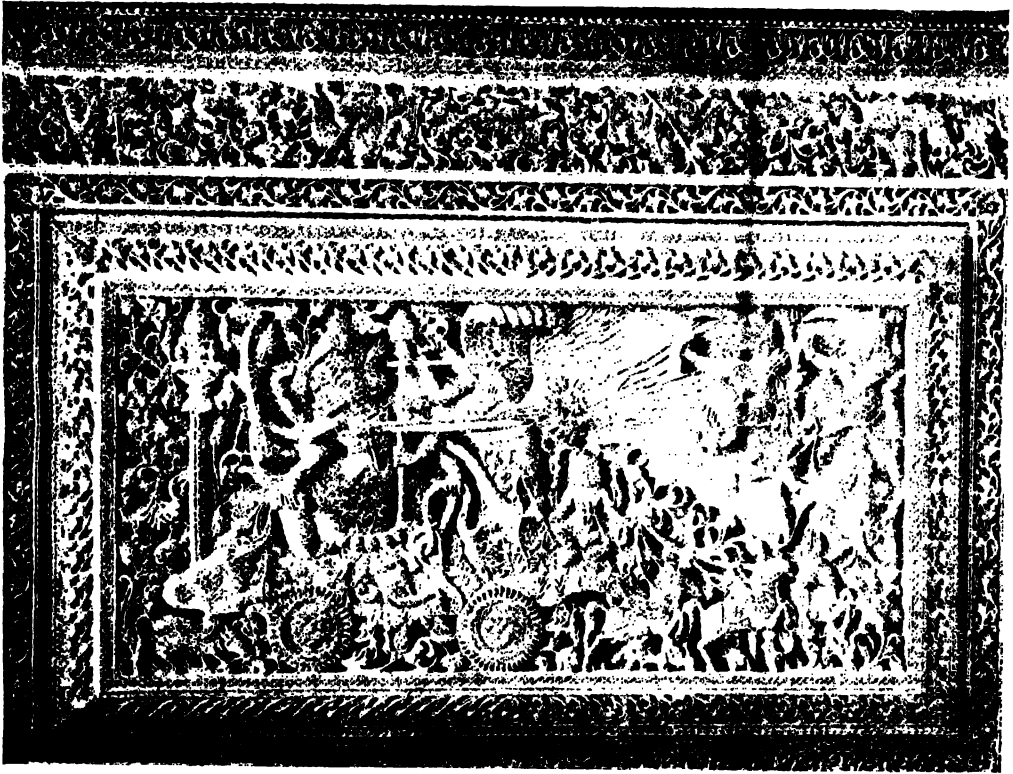
মহীশূরের চন্দনকাষ্ঠের উপর খোদাই চৌখুপীর কাজ

এদেশী ক্রেতার দেশীয় শিল্পের মূল্য দিবার ক্ষমতা নাই। আমার পক্ষে এই যুক্তি মানিয়া লওয়া সম্ভব হয় নাই। কেন হয় নাই তাহা বলিতেছি।

কলিকাতার বড় বড় পথ দিয়া চলিলে অনেক ধনী লোকের গৃহদ্বার দেখা যায়। আমি প্রায় সকল ট্রাম ও বাসের পথে গিয়াছি। কিন্তু একমাত্র বসু-বিজ্ঞানমন্দির ভিন্ন অন্য কোথাও একটী সুন্দর দ্বার দেখি নাই। অন্য সবই "হাল ফ্যাসনের" বিলাতী "গেট্" বা "ডোর"।

রূপ-সামঞ্জস্য বা সৌন্দর্য্যের লেশমাত্র আছে বলিয়া আমার মনে হইয়াছে। তবে অবশ্য আমার এ বিষয়ে জ্ঞান অতি অল্প; সুতরাং আদার-ব্যাপারীর জাহাজের প্রসঙ্গে প্রয়োজন কি!

তবে প্রাসাদ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া প্রাসাদের অংশ বিশেষের কথা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

গৃহদ্বারের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন গৃহের জানালার কথা বলি। আজকাল গৃহের বাহিরের শোভা

বর্দ্ধনের জন্য বিদেশী 'ব্যালকনি'-জাতীয় অলিন্দের খুবই প্রচলন হইয়াছে। দ্বিতল বা ত্রিতলে লম্বা 'টানা বারান্দা' বড় বেশী দেখা যায় না। কিন্তু যাঁহারা উদয়পুর, জয়পুর বা প্রাচীন দিল্লীর কারুকার্য্যখচিত প্রস্তরের অলিন্দ বা কাশ্মীর ও নেপালের কাষ্ঠের অলিন্দ দেখিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই বলিতে পারিবেন দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ কত।

গৃহের বাহিরের অবস্থা তো এই প্রকার। গৃহের ভিতর আরও অপরূপ। আসবাবপত্র সবই বিলাতী প্রসিদ্ধ ছাঁদের (Sheraton, Chippendale, Louise
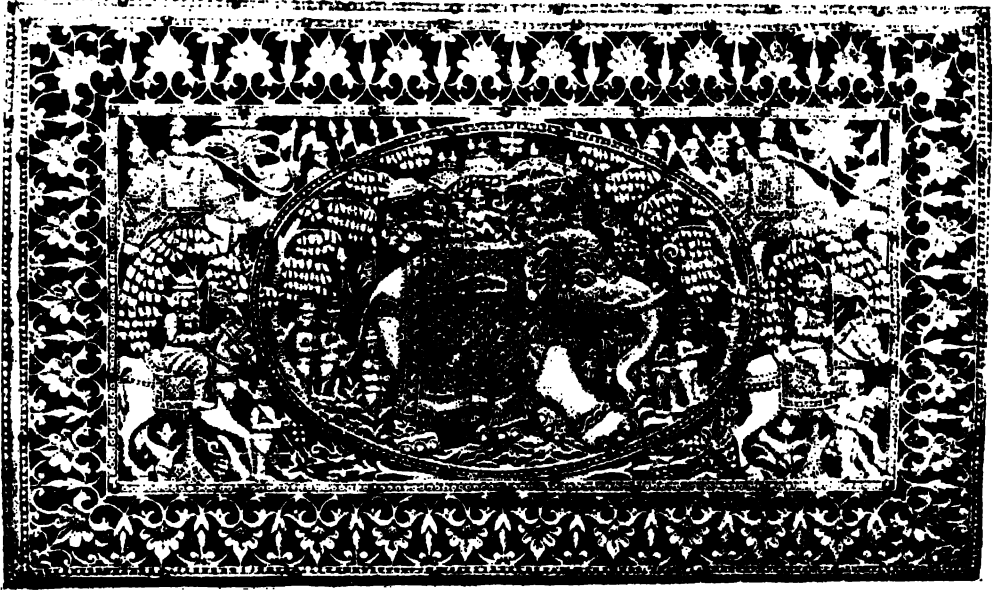
ভিজাগাপত্তনের হাতীর দাঁতের ও কচ্ছপের খোলার কাজকরা বাক্সের ঢাকনী

quinze ইত্যাদি) অতি জঘন্য অনুকরণে প্রস্তুত। ধনীর গৃহে বড় জোর দুই একটা কাশ্মারি আখরোট কাষ্ঠের ব্যবদান বা টেবিল থাকে। গালিচা তো প্রায় সবই রুসেল্‌স্‌, আক্স্মিনস্টার বা অন্য বিদেশীয় কারখানায় প্রস্তুত। অথচ বিদেশের লোকে মির্জাপুরি, মণ্ট-গোমেরি ইত্যাদি ভারতীয় গালিচার যথেষ্ট খাতির করে।

গৃহ-সজ্জার ব্যাপারে বহুমূল্য যাহা কিছু সবই বিদেশী। চীনামাটির শিল্পের বিষয় আমার কিছু বলিবার নাই; কেন না উহা এদেশে কখনও বিশেষ প্রচলিত ছিল না, অন্ততঃপক্ষে কলাশিল্পের হিসাবে।

কিন্তু গজদন্ত, শৃঙ্গ, কচ্ছপের খোলস, ইত্যাদি পদার্থ হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদির গৃহশোভা বর্দ্ধনের ক্ষমতা কি কিছুমাত্র কম? এই সকল শিল্পে ভারতের শিল্পীর কলা-কৌশল এখনও অদ্ভুত। তবে ধনীর গৃহে ইহাদের স্থান এতই সঙ্কীর্ণ কেন?

বোম্বায়ের রৌপ্যের চা-দানি

পিত্তল, কাংস, স্বর্ণ ও রৌপ্য ইত্যাদি ধাতুর কার্য্যে এদেশের বাহিরে কোথায় এত নিপুণ কারু-কৌশলী শিল্পী পাওয়া যায়? এবং উৎসাহ পাইলে এমন কি কাজ আছে যাহাতে ইহারা বিদেশীকে পরাজিত না করিতে পারে?

বসন-ভূষণে ধনীর গৃহে কেন সাধারণ গৃহস্থেরও কি অল্প ব্যয় হয়? তবে দিল্লীর ও হুগলী জেলার চিকণ ও অন্য সূচের কাজ, নানাপ্রদেশের রঙ্গীন ও ছাপান কার্পাস এবং রেশমী বস্ত্রাদি ধনি-গৃহিণীর অঙ্গের শোভাবর্দ্ধন আর করে অভাবের যুক্তির কোনই মূল্য নাই। অভাব সুরুচির, জ্ঞানের এবং স্বদেশ-প্রীতির। এই তিনটির অভাবে দেশের শিল্প সবই একে একে লোপ পাইতেছে।

এখন দেশীয় শিল্পীর যোগ্যতা ও দক্ষতার সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। অনেকে বিশ্বাস করেন না যে দেশী কারিগর শ্রেষ্ঠ হওয়া দূরের কথা কখনও বিদেশীয়ের সমকক্ষ হইতে পারে। তাঁহাদের একটি সর্ব্বজনবিদিত শিল্পের কথা বলিলে ভাল হয়।
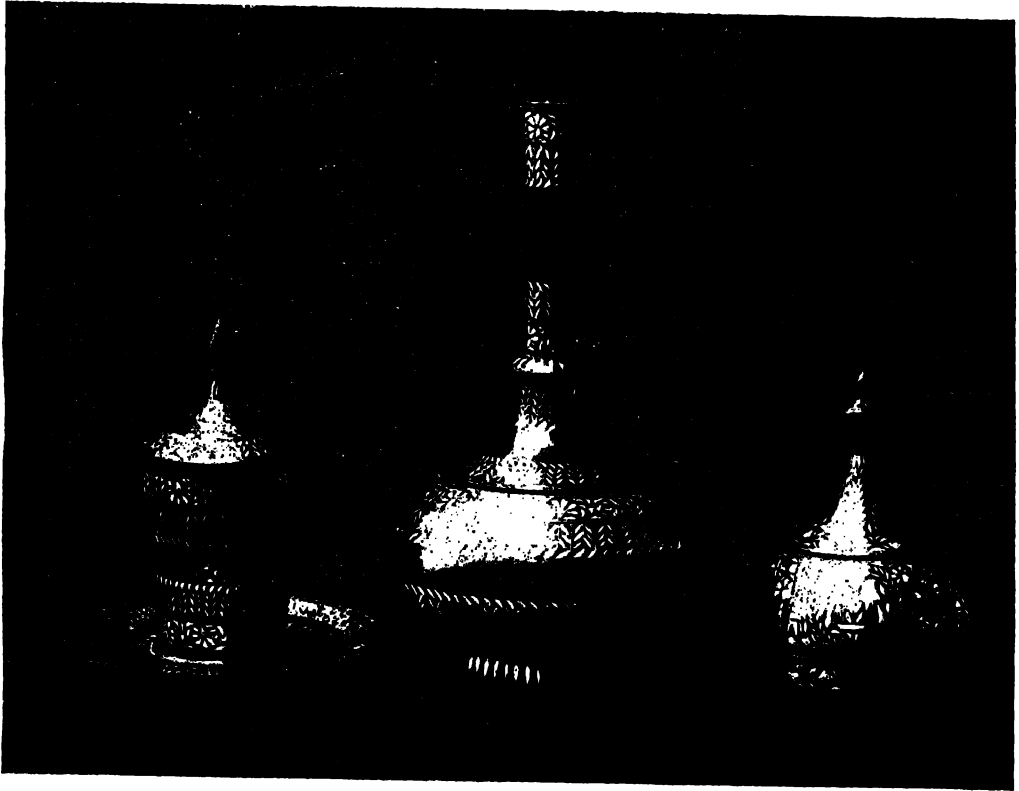
লক্ষ্ণৌয়ের বিদরী কাজের নমুনা

না কেন? সৌন্দর্য্যে এই সকল দ্রব্য বিদেশী অপেক্ষা অধিকতর মনোরম এবং স্থায়িত্ব হিসাবে বিচার করিলে মূল্যও অপেক্ষাকৃত কম।

উপরে যে সকল শিল্প-সামগ্রীর কথা বলিলাম, সে সকলেরই বিলাতী সংস্করণ এ দেশের ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হইতেছে এবং সে সকলের জন্য বিদেশীকে কিছু কি কম মূল্য দিতে হইতেছে? তাহাও নহে। সুতরাং অর্থের

ঢাকার মস্‌লিন বহু শতাব্দী ধরিয়া এদেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল। সুদূর রোমে ইহা Ventus textilis or nebula নামে বিক্রীত হইত*। তাহারও বহু পূর্ব্বে এদেশের প্রাচীন পুস্তকে উহার উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন কার্পাস বস্ত্র হিসাবে ইহা অতুলনীয় এবং এ শ্রেণীর বস্ত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইত। ট্যাভরণীয়েরের

* Schoff. 63. See notes.

আমলেও (খৃঃ সপ্তদশ শতকের প্রথমার্দ্ধে) ইহা জগদ্‌-বিখ্যাত এবং সর্ব্বত্র আদৃত হইত*।

তখন পনের গজ লম্বা ও এক গজ চওড়া একখণ্ড সাধারণ মসলিনের ওজন হইত তিন বা চার তোলা মাত্র।

১৮৬৬ খৃঃ শ্রেষ্ঠ মসলিন ঐ মাপের হইলে তাহার ওজন হইত পাঁচ হইতে সাত তোলা মাত্র। সে সময়ের দশ গজ

জাফরগঞ্জের কার্পাস বস্ত্রের উপর সুক্ষ্ম কাজ—ফতেপুর

লম্বা এবং এক গজ চওড়া মলমল খাসের খণ্ডে ১০০০ হইতে ১৮০০ সুতা টানায় থাকিত†। ইহার ওজন হইত ১৪০০ হইতে ১৫০০ গ্রেণ অর্থাৎ চার হইতে পাঁচ তোলার মধ্যে।

এই ঢাকাই মসলিন পৃথিবীর সকল দেশের তাঁতি অনুকরণের চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু আজও তাহা ভারতের বাহিরে কাহারও সাধ্যায়ত্ত হয় নাই। কিন্তু এই অজেয় শিল্প-গৌরব এখন আর আমাদের নাই। ক্রেতার অনাদরের জন্য তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে

ঢাকাই মসলিন

রাজনীতিবিদেরা বলেন যে বিদেশীয়েরা নানা বৈধ ও ও অবৈধ উপায়ে এদেশের শিল্পকলার ধ্বংস-সাধন করিয়াছে। ইহা সত্য তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও সত্য যে এই ধ্বংসের চেষ্টায় তাহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। কেন না ভারতীয় ক্রেতা পরম উৎসাহের সহিত তাহাদের এই সৎকার্য্যে যোগদান করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে।

---

* Tavernier's Travels. Ball's Edition. Book II chap. XII.
† Textile Manufactures. Watson. p. 75.

কৃষ্ণকান্তের উইল আলোচনায় গোড়ার কথা

[শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী বি-এস্‌সি]

ক

কৃষ্ণকান্তের উইল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে গ্রন্থ খানির প্রকাশ সম্বন্ধে গোটাকতক কথা মোটামুটি ভাবে জানিয়া রাখা আবশ্যক।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন চরিতে'ই দেখিতে পাই যে, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে (১২৮২ বঙ্গাব্দ) বঙ্কিমচন্দ্র নয় মাসের ছুটী লইয়া গৃহে অবস্থান করিতে-ছিলেন (১৮৮ পৃষ্ঠা) ; এই গৃহে অবস্থান-কালে তিনি 'রাধারাণী' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনা সুরু করেন। রাধারাণী বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের চতুর্থ বর্ষে (১২৮২) কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ—এই দুই মাসে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। ইহা হইতে বোঝা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের ছুটীর মধ্যে রাধারাণীর রচনা সম্পূর্ণ হইয়াছিল ; কিন্তু কৃষ্ণকান্তের উইল লেখা সম্পূর্ণ হইয়াছিল কি না, তাহা কিছুই জানা যায় না এবং জীবনীকার সে সম্বন্ধে কোনো কথা উল্লেখ করেন নাই।

রাধারাণী প্রকাশের পর পৌষ মাস হইতে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ক্রম-প্রকাশ্যভাবে প্রকাশিত হইতে সুরু হয় এবং চৈত্রমাস পর্য্যন্ত মোট নয়টী পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়। পরবৎসর (১২৮৩) বঙ্গদর্শন কোনো কারণে উঠিয়া যায় ; কিন্তু পরবর্ত্তী বৎসর (১২৮৪) সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদকতায় বঙ্গদর্শন পুনঃপ্রকাশিত হয়। তখন কৃষ্ণকান্তের উইলও ক্রমপ্রকাশ্যভাবে বৈশাখমাস হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে এবং মাঘ মাসে, উপন্যাসখানি সম্পূর্ণ হয়। ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে 'রাজসিংহ' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন।

গ্রন্থাকারে ১২৮৫ সালে (১২৭৮ খৃষ্টাব্দ) কৃষ্ণকান্তের উইল কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হয় প্রথম সংস্করণ প্রকাশের চারি বৎসর পরে,—১২৮৯ সালে (১৮৮২ খৃষ্টাব্দ)। দ্বিতীয় সংস্করণে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। এই বৎসরেই (১২৮৯ সালে) রাজসিংহ ও আনন্দমঠ প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য পুস্তকের মত কৃষ্ণকান্তের উইলের দ্রুত সংস্করণ বাহির হয় নাই।১ ইহার চতুর্থ সংস্করণ বাহির হইয়াছিল ১২৯৯ সালে (১৮৯২ খৃষ্টাব্দে) অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় দেড়বৎসর পূর্ব্বে। এই সংস্করণেও পরিবর্ত্তনের ছাপ আছে। ইহার পরেই (১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে) বঙ্কিমচন্দ্র পরিবর্দ্ধিত আকারে (বর্ত্তমানে প্রচলিত ইন্দিরা (৫ম সংস্করণ) ও রাজসিংহ (৪র্থ সংস্করণ) প্রকাশ করেন। কৃষ্ণকান্তের উইলের ২য় সংস্করণ হইতে ৪র্থ সংস্করণের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৬) ও ধর্ম্মতত্ত্ব (১৮৮৮) প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমচন্দ্রের দশম আখ্যায়িকা,—(১) দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫ খৃঃ), (২) কপালকুণ্ডলা (১৮৬৭ খৃঃ), (৩) মৃণালিনী (১৮৬৯ খৃঃ), (৪) বিষবৃক্ষ (১৮৭৩ খৃঃ), (৫) ইন্দিরা (১৮৭৩ খৃঃ), (৬) যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪ খৃঃ), (৭) রাধারাণী (১৮৭৫ খৃঃ), (৮) চন্দ্রশেখর (১৮৭৫ খৃঃ), (৯) রজনী (১৮৭৭ খৃঃ), ও (১০) কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮ খৃঃ)২। ইন্দিরা যুগলাঙ্গুরীয় ও রাধারাণী এই তিনখানি ছোট বলিয়া উপন্যাসের মধ্যে গিরিজা প্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় গণনা করেন নাই।৩ বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকান্তের উইল রচনার পর আরও চারিখানি উপন্যাস প্রকাশ করিয়াছিলেন,—(১) রাজসিংহ (১৮৮২ খৃঃ), (২) আনন্দ-মঠ (১৮৮২ খৃঃ) (৩) দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪ খৃঃ) ও (৪) সীতারাম (১৮৮৭ খৃঃ)। 'নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী' নামক একটী

১। বঙ্কিমচন্দ্র—(কৃষ্ণকান্তের উইল)—গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী পৃঃ ১।

২। সনগুলি শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-চরিত ২য় সং) হইতে গৃহীত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাসম্ভব মিলাইয়া লওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে।

৩। ১নং এর পুস্তক পৃঃ ১।

গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদ রচনার সূচনা করিয়াছিলেন মাত্র, তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।৪ তাঁহার বৈদিকযুগের ছবি দিয়া একখানা উপন্যাস লেখার ইচ্ছা ছিল এবং ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের কাছে সে ইচ্ছা প্রকাশও করিয়াছিলেন।৫

বিষবৃক্ষের অনুবাদিকা শ্রীমতী মিরিয়াম নাইট কৃষ্ণকান্তের উইল ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন (১৮৯৫ খৃঃ)।

২

কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত বয়সের রচনা; রচনাকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৩৭ বছর। কৃষ্ণকান্তের উইল লেখার তেরবৎসর পূর্ব্বে তাঁহার প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী রচনাকালে তাঁহার বয়স ছিল ২৪ বছর।৬ দুর্গেশনন্দিনী লেখার আগে তিনি ইংরেজি ভাষায় কথাসাহিত্য রচনা করিতে গিয়াছিলেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র-সম্পাদিত ইণ্ডিয়ান ফিল্ড পত্রিকায় 'রাজমোহনস্ ওয়াইফ' নামক একটী গল্প লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন (১৮৬০ খৃঃ?) কিন্তু পত্রিকাখানি উঠিয়া যাওয়ায় লেখা সম্পূর্ণ হয় নাই।৭ বঙ্কিমজীবনীকার 'এডভেনচারস্ অফ এ ইয়ং হিন্দু' নামে একটী গল্প রচনার সংবাদ দিয়াছেন৮ কিন্তু সেটী এখনও আছে কি না বা কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, তাহা উল্লেখ করেন নাই। ইংরেজি রচনার কথা ছাড়িয়া দিয়া বলা যায় যে কৃষ্ণকান্তের উইল রচনার পূর্ব্বে ন'খানি আখ্যায়িকা লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কথাসাহিত্য রচনায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

দুর্গেশনন্দিনী রচনার আগে বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গলা গদ্যরচনার বিশেষ নিদর্শন নাই এবং যাহা আছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া অক্ষয়চন্দ্র অনুমান করেন যে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গলা গদ্যের আলোচনা করেন নাই।৯ প্রথম বয়সে বঙ্কিম পদ্য লিখিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'প্রভাকর'এ তাঁহার অনেকগুলি পদ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন সাহিত্যে গুপ্তকবির অত্যন্ত প্রভাব। বঙ্কিমও এককালে গুপ্ত কবির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন১০ এবং নিজেও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।১১

দুর্গেশনন্দিনীর পর তিনি 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, 'প্রথম তিনখানি বইয়ের জন্য আমি ইংরেজি সাহিত্যের কাছে ঋণী, তবে 'দুর্গেশনন্দিনী' লেখার আগে 'আইভান্‌হো' পড়ি নাই। কপালকুণ্ডলা লেখার সময় সেক্সপীয়ার পড়িতাম। মৃণালিনীর পর ইতিহাস দর্শন ইত্যাদি পড়িয়াছি।১২

বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি নানা চর্চ্চা করিতেন। ইতিহাসে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল,১৩ তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি ইহার সাক্ষী।

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য ছিল, জ্ঞান-প্রচার ও লোকশিক্ষা।১৪ বঙ্গদর্শনের সম্পাদনের ভার লওয়ায় তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইত; নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা, বিভিন্ন লেখকের প্রবন্ধ সংশোধন করিয়া উপযুক্ত করা, সমালোচনা করা—সবই নিজে করিতেন। অথচ, এই গুরু সাহিত্যচর্চ্চার জন্য তিনি

৪। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন চরিত—৫৮৩পৃঃ।

৫। বঙ্কিমপ্রসঙ্গ—৩৩৭পৃঃ।

৬। বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ (১ম)—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার [শ্রীশগ্রন্থাবলী, বসুমতী, বঙ্কিমপ্রসঙ্গ ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি পৃঃ ১৯৬-৯৭]

৭। বঙ্কিমচন্দ্র—বিজয়লাল দত্ত [ভারতী—আষাঢ় ১৩০১]

৮। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনচরিত—শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২য় সং) পৃষ্ঠা ১৮৪।

৯। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম গদ্যরচনা—অক্ষয়চন্দ্র সরকার [বঙ্কিমপ্রসঙ্গ পৃঃ ১১২।]

১০। ৯এর প্রবন্ধ [বঙ্কিম প্রসঙ্গ পৃঃ ১২৫।]

১১। দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [বসুমতী সংস্করণের দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী—পৃঃ ২।] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিত্ব ও জীবনী—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [বসুমতী সংস্করণের ঈশ্বর গ্রন্থাবলী পৃঃ ১]

১২। বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ (১ম)—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার [বঙ্কিমপ্রসঙ্গ পৃ ১৯৫।]

১৩। কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী [বঙ্কিমপ্রসঙ্গ—পৃঃ১৫৭।] বঙ্কিমের মত রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস লইয়া নাড়া-চাড়া করিয়াছেন; শরৎচন্দ্রও বাদ যান না।]

১৪। বঙ্গদর্শনের সূচনা

বঙ্কিমচন্দ্র—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী [বঙ্কিমপ্রসঙ্গ—পৃঃ ১৭১।]

কথাসাহিত্য রচনা বন্ধ করেন নাই। এই জন্যে তাঁহাকে 'সাহিত্যে কর্ম্মযোগী' বলা হয়।১৫ বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম চার বৎসর বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। সেই চার বৎসরে তাঁহার ৬ খানি সম্পূর্ণ আখ্যায়িকা ও কৃষ্ণকান্তের উইলের নয়টী পরিচ্ছেদ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বঙ্কিমের কথাসাহিত্য রচনায় কেহ কেহ বিলাতী গন্ধ অনুভব করিয়াছেন,১৬ তবে বিলাতী গন্ধের ছোঁয়াচ থাকায় রচনা অপকৃষ্ট বা অনুকৃতি সাহিত্য হইয়াছে, ইহা কেহ স্বীকার করেন নাই,—অন্ততঃ এই যুগে। এই মতের বিপরীত মতও আছে; বাঙ্গলা উপন্যাস, হিন্দু সাহিত্য, বিশ্লেষণমূলক নয়; সুতরাং আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি ও সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টি ইহাতে পাওয়া যায় এবং এই জন্য ইহা বিলাতী কথাসাহিত্যের সহিত তুলনায় বিচার্য্য নয়।১৭ মধ্যবর্ত্তী মতে বঙ্কিম প্রতিভাই ইয়ুরোপীয় আদর্শ অনুসরণ করিলেও পাপপুণ্যের জয়-পরাজয় দ্বন্দ্বে একটা মঙ্গলের মৌলিকতার আদর্শ পরিস্ফুট করিয়া ভারতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছেন।১৮ হিন্দুয়ানীর জন্য হউক বা-না-হউক বঙ্কিমের কথা-সাহিত্যে বিশ্লেষণের চেয়ে ক্রিয়ার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছিল, ইহা অনেকে বলেন।১৯ এই জন্য অনেকে তাঁহার কথা-বস্তুর (প্লটের) গাঁথুনির নৈপুণ্যের প্রশংসা করেন।২০

বাঙ্গালীর সমাজের সীমাবদ্ধতার ফলে এখানে বিপুল বৈচিত্র্যে জীবন অতি বৃহৎ হইয়া প্রকাশ পায় না।২১ বঙ্কিম কথা-সাহিত্যে চরিত্রগুলি এই জন্য বিরাট্, বৈচিত্র্যবিশিষ্ট ও সমস্যাসমাকুল হইয়া ওঠে নাই, সরল ভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে।২২ জীবনের ব্যাখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিকতা জীবনের সৌন্দর্য্য,২৩ শোভনতা ও মনোজ্ঞতাতেই আবদ্ধ ছিল, দুঃখ-বেদনার স্থান তাহাতে ছিল না।২৪ বাঙ্গালীর জীবনকে এমনি সুন্দর করিয়া দেখার মূলে ছিল তাঁহার স্বাদেশিকতা।২৫

প্রথম জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র নাস্তিক২৬ ছিলেন, তাঁহার উপর মিলের অত্যন্ত প্রভাব ছিল; পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার এই মতের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ২৭ কিন্তু কি করিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহার ইতিহাস তিনি দেন নাই। মতামতের পরিবর্ত্তন আপন অন্তর্জীবনের কথা। ইহার ছায়া যে তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যে পড়ে নাই, একথা বলা যায় না।

শেষ জীবনের দিকেই ইয়ুরোপীয় দর্শন ও ভারতীয় ধর্ম্মের সমন্বয় করিয়া একটী অনুশীলন-ধর্ম্ম গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ পুরুষ করিয়া মানবতার আদর্শ প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন। ২৮ তাঁহার শেষ

১৫। বঙ্কিমচন্দ্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [বঙ্কিমপ্রসঙ্গ পৃঃ ১০।]

১৬। 'His novels are English in taste in the construction of the plot, in the setting of character, sometimes to a fault. He was no imitator, but the moulds of his thought had come to be, by much reading and assimilation, English, and they imparted their stamp to all his productions. N. N. Ghose—The Indian Nation, April 16th. 1894 [বঙ্কিম-প্রসঙ্গ—পরিশিষ্ট পৃঃ ৮।]

১৭। বাঙ্গালা উপন্যাসের বিশেষত্ব—দেবেন্দ্র বিজয় বসু [নব্যভারত শ্রাবণ ১৩০১—পৃঃ ১৭৯ হইতে] [সমস্ত প্রবন্ধটী ঐ মর্ম্মে লেখা।]

১৮। 'বঙ্গবাণী (২য় খণ্ড) শশাঙ্কমোহন সেন [বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার অন্তর্জীবন—পৃঃ ৬৬ ও ৩৭৯]

১৯। বঙ্কিমপ্রতিভা (১) বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য [ভারতবর্ষ—অগ্রহায়ণ ১৩২৩ পৃঃ ৯০৯।]

২০। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ (উপন্যাসের আর্ট) শিবপ্রসাদ রায় [যমুনা—মাঘ ১৩৩০, প্রবন্ধের শেষাংশে।]

২১।২২। বঙ্গবাণী (১ম খণ্ড) শশাঙ্কমোহন সেন - [পৃঃ ১০৯, ১০৮ ও ১১০।] দেবেন্দ্র বিজয় বসু ক্ষুদ্রকায় প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করিয়াছেন হিন্দু চরিত্রসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য বলিয়া, ১৭ সংখ্যক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।]

২৩। চরিতকথা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী [বঙ্কিমচন্দ্র -পৃঃ ২১।]

২৪ ও ২৫। বঙ্কিমপ্রতিভা (২)—বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য [ভারতবর্ষ-পৌষ ১৩২৩ পৃঃ ১২৪]।

২৬। '৩০বৎসর বয়সে নাস্তিক, ৪০বৎসর বয়সে ধর্ম্মভাব সূচনা'—বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনচরিত পৃঃ ১৩৯ ও ৭৪০। প্রত্যক্ষবাদ দ্বারা প্রভাবিত—রমেশ বসু বাঙলার সমাজ ও সাহিত্যে মানবতার বিকাশ—সবুজপত্র-কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ পৃঃ ৯৮; এই প্রবন্ধে ঐ যুগের এইভাবের কথা লিপিবদ্ধ। [রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গে' জগমোহন ঐ যুগের নাস্তিকদিগের একটী সুন্দর চিত্র।]

২৭।' আগে আমি নাস্তিক ছিলাম। তাহা হইতে আমার হিন্দু-ধর্ম্মে মতি-গতি অতি আশ্চর্য্যরকমের।'...'এক সময়ে মিলের আমার উপর বড় প্রভাব ছিল......। বঙ্কিম বাবুর প্রসঙ্গ (১ম)...শ্রীশচন্দ্র মজুমদার —বঙ্কিম প্রসঙ্গ পৃঃ ১২৪ ও ১২৮।

২৮। বঙ্কিমসাহিত্যে মানবতার আদর্শ—রমেশ বসু—সবুজপত্র শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩৩৪

জীবনের বার তের বৎসর এই কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে, যদিও তাঁহার এই মতের অঙ্কুর ইহার বহুপূর্ব্বে দেখা গিয়াছিল। ২৯

বোধকরি বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনের মতের দিকে লক্ষ্য করিয়া অনেকে তাঁহার কথা-সাহিত্য-সৃষ্টিকে তিনটী স্তরে ভাগ করেন,—১ম স্তরে,—দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী। ২য় স্তরে,—বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর ও কৃষ্ণকান্তের উইল; ৩য় স্তরে, আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী ও সীতারাম; অন্যান্য উপন্যাসে এই সব স্তরের জিনিস কম বেশী আছে। ১ম স্তরে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি, ২য় স্তরে সৌন্দর্য্য সৃষ্টির সহিত লোকশিক্ষা, ৩য় স্তরে লোকশিক্ষা ও অনুশীলন, ধর্ম্মপ্রচার।৩০ কেহ কেহ একটু পৃথক করিয়া দেখেন,—প্রথমে সৌন্দর্য্যের উপাসনা, পরে লোকশিক্ষায় পরহিতে সৌন্দর্য্যের ব্যবহার, শেষে পরহিতের বদলে দেশহিতের আশ্রয় এবং তাহার সঙ্গে হিন্দু ধর্ম্মের প্রচার।৩১ কাহারও মতে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি সব স্তরেই মূল আদর্শ কিন্তু ১ম স্তরের রচনা সম-সাময়িক সমাজ-নিরপেক্ষ, ২য় স্তরের সমসাময়িক সমাজ অবলম্বনে এবং ৩য় স্তরের ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া।৩২ এই স্তর বিন্যাসে রচনার পরম্পরা রক্ষিত হইয়াছে এবং তাহার অন্যান্য পারিপার্শ্বিকের যোগও কিছু আছে।৩৩ রচনার বিষয়-বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভাগ করা হইয়াছে,—(১) রমন্যাস—যথা, দুর্গেশনন্দিনী, চন্দ্রশেখর ইত্যাদি, (২) সামাজিক—যথা, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, (৩) অধ্যাত্মিক বা আদর্শ মূলক,—যথা, দেবী-চৌধুরাণী, সীতারাম।৩৪ বঙ্কিমের অধিকাংশ উপন্যাস প্রেম মূলক।৩৫ কেহ কেহ এই প্রেমের বিভিন্ন বিভাগের বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে হইয়াছে দেখাইয়াছেন,৩৬ তবে এই ভাবে স্তর বিন্যাসের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেন নাই। এইরূপ গুরুবাদেরও একটা স্তর বিন্যাস সন্ন্যাসীর চিত্র মারফত প্রকাশিত হইয়াছে।৩৭

বঙ্কিম কথা-সাহিত্যে একটা সুনির্দ্দিষ্ট স্তর থাকুক বা না থাকুক, তাঁহার অনেকগুলি উপন্যাসে যে লোকশিক্ষা প্রচারে কোনো তত্ত্ব কথার ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য ছিল, সমালোচকদিগের মধ্যে এ বিষয়ে খুব বেশী মতভেদ দেখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রেরও সেই অভিপ্রায় ছিল।৩৮ বিশেষতঃ তাঁহার শেষ বয়সের উপন্যাস কয়খানিতে তাহা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

দেশ-প্রীতি বঙ্কিম সাহিত্যের একটী বৈশিষ্ট্য;৩৯ ইহা ইয়ুরোপীয় স্বদেশ-প্রেম হইতে কিছু ভিন্ন।৪০ বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে সাধু-সন্ন্যাসী চরিত্রের সাহায্যে যে পরহিতবাদ প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার এই দেশপ্রীতি উদ্ভূত।৪১ তাঁহার অনুশীলন-ধর্ম্মে এই দেশপ্রীতির বড় স্থান ছিল।৪২

রস-সাহিত্যে প্রধান চরিত্র গুলির সাহায্যে দার্শনিক-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার প্রয়াসে যে রস ও সৌন্দর্য্যের কিঞ্চিৎ হানি ঘটিয়াছে, তাহা একেবারে অস্বীকার করা যায়

২৯। বঙ্কিমচন্দ্র—রমাপ্রসাদ চন্দ—উপাসনা, কার্ত্তিক ১৩৩০।

৩০। বঙ্কিমচন্দ্র (পরিশিষ্ট)—গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, পৃঃ ১৪১।

৩১। বঙ্কিমচন্দ্র—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বঙ্কিম-প্রসঙ্গ পৃঃ ১৭১-৭২-৭৩। [এখানে গ্রন্থের কোনো স্পষ্ট নামোল্লেখ নাই। শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্কিমের মৃত্যুর পর ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে Calcutta University Magazineএ একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে এই স্তরবিভাগের উল্লেখ ছিল। প্রবন্ধটী আমি দেখি নাই। আমার বিশ্বাস, তাহা ইহা হইতে মূলকথায় পৃথক হইবে না।]

৩২। বঙ্কিমচন্দ্র—অক্ষয় চন্দ্র দত্তগুপ্ত—১০ম পরিচ্ছেদ।

৩৩। আদি, মধ্য ও অন্ত লীলা—বঙ্কিমচন্দ্র—রমাপ্রসাদ চন্দ—উপাসনা, কার্ত্তিক ১৩৩০।

৩৪। বঙ্কিমপ্রতিভা (১ম)—বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য—ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩২৩—পৃঃ ৯০৩।

৩৫। বঙ্গবাণী (১ম খণ্ড) শশাঙ্কমোহন সেন পৃঃ ১১২।

৩৬ ও ৩৭। বঙ্কিমচন্দ্র—হেমচন্দ্র বসু—সাহিত্য, ফাল্গুন ১৩০৯ পৃঃ, ৬৯২-৯৯ ও ৭০৭-৮।

৩৮। বঙ্কিমচন্দ্র—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বঙ্কিম-প্রসঙ্গ—১৭৪ পৃঃ।

৩৯। The religion of patriotism, this is the master idea of Bankim's writings—অরবিন্দ ঘোষ—বঙ্কিমপ্রসঙ্গ পরিশিষ্ট পৃঃ ১৫। [বন্দেমাতরম্ দেশসেবার মূলমন্ত্র হওয়ার তত্ত্ব ও ইতিহাস অনুসন্ধান যোগ্য।]

৪০। বঙ্কিম সাহিত্যে মানবতার আদর্শ—রমেশ বসু—সবুজপত্র, শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩৩৪

৪১। বঙ্কিমচন্দ্র—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বঙ্কিম-প্রসঙ্গ পৃঃ ১৭২।

৪২। ধর্ম্মতত্ত্ব-অনুশীলন—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৪শ অধ্যায়।

না,৪৩ এবং তাঁহার চরিত্র-চিত্রগুলি যে সর্ব্বত্র আদর্শ হইয়াছে, সে কথাও জোর করিয়া বলা যায় না।৪৪ রস-রচনায় চরিত্রগুলিকে আপন হৃদয়বৃত্তির বেগে ফুটিতে না দিয়া একটা কোনো তত্ত্ব কথা, আদর্শের ব্যাখ্যা বা নীতি প্রচারের দিকে লক্ষ্য করিয়া পরিচালিত করিলে কাব্যের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় না, এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিতেন।৪৫ বাস্তব অনুসরণ করিয়া বাস্তবতার অতিরিক্ত যে রূপ, সে রূপ ফুটাইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল।৪৬ কিন্তু দেশের তৎকালীন অবস্থা ও শিক্ষিত মনের অন্তর্বিপ্লব দেখিয়া তাঁহার আপন সমন্বয়-ধর্ম্ম সুপরিস্ফুট করিয়া তোলায় ইচ্ছায় তিনি লোকশিক্ষা প্রচারের দিকে ঝোঁক দিয়াছিলেন।৪৭

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অনেক উপন্যাস নানা সংস্করণে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। এইরূপ পরিবর্ত্তনে সর্ব্বত্রই যে উৎকর্ষ লাভ হইয়াছে, কোনো ত্রুটি ঘটে নাই, এমন কথা বলা যায় না। রচনা পরিবর্ত্তন করার একটা ঝোঁক তাঁহার ছিল।৪৮ কোনো কোনো গ্রন্থের ভূমিকায় পরিবর্ত্তনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আবার কোনো কোনো স্থানে উল্লেখ করেন নাই বা ভূমিকাই লেখেন নাই। অবশ্য, তাঁহার উপন্যাসের আখ্যান লইয়া অপরে উপসংহার ৪৯ হিসাবে গ্রন্থ রচনা করিয়া বা নাটকাকারে ৫০ গ্রথিত করিয়া বা অন্যবিধ কোনো উপায়ে ৫১ তাঁহার আখ্যানের সৌন্দর্য্য হানি করিবে, ইহা নিরাকরণ করা তাঁহার পরিবর্ত্তনের একটা উদ্দেশ্য ছিল, অবশ্য একথা তিনি কোনো গ্রন্থের ভূমিকায় ব্যক্ত করেন নাই। কিন্তু মতামতের পরিবর্ত্তনের স্থান যে তাহাতে একেবারে নাই, এমন কথা বলা চলে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাকে বুঝিতে হইলে এই সব দিক্ হইতে পারিপার্শ্বিক বিষয়ের তুলনায় দেখিতে হইবে, এবং এই ভাবে দেখিতে গেলে বঙ্কিমের রচনায় লেখকের একাধিক ব্যক্তিত্বের ছায়াপাত অথবা তাহাদের সূক্ষ্মদ্বন্দ্বের আবিষ্কার হইলেও হইতে পারে।

আর একটা কথা। কৃষ্ণকান্তের উইল রচনা কালে এবং প্রকাশ কালে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মবিষয়ে মতামতের পরিবর্ত্তন বিশেষ কিছু লক্ষিত হয় না; দ্বিতীয় সংস্করণ-কালে পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় এবং চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশকালে মোটামুটি ভাবে একটা স্থায়ী আকার লইয়াছে।

গ

বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্রিত চরিত্রগুলির জীবিত বা মৃত আদর্শ আছে কি না প্রশ্নের উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন সেই রকম বটে, কিন্তু তার উপর অবশ্য অনেক রঙ্-

৪৩। Tendency in Bengali Literature—Romes Basu, The Visva Bharati quarterly, Sravana 1333, Page 1521

৪৪। বঙ্কিম সাহিত্যে মানবতার আদর্শ—রমেশ বসু—সবুজপত্র শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩৩৪

৪৫। 'কাব্যে উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে'—'চিত্তবৃত্তি অবস্থানুসারে অত্যন্ত বেগবতী হয়। সেই বেগের সমুচিত বর্ণনদ্বারা সৌন্দর্য্যের সৃজন-কাব্যের উদ্দেশ্য'। উত্তরচরিত (শেষাংশ) বিবিধপ্রবন্ধ (১ম খণ্ড)। 'যাহা মনুষ্যহৃদয়ের অংশ অথবা যাহা তাহার সঞ্চালক তদ্ব্যতীত আর কিছুই কাব্যোপযোগী নহে'। প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত—বিবিধ প্রবন্ধ (১মখণ্ড)। চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি—অনুশীলন-ধর্ম্মতত্ত্ব২৭শ অধ্যায়। 'বন্দেমাতরম্'—ললিত চন্দ্র মিত্র বঙ্কিমপ্রসঙ্গ পৃঃ ২৮৯।

৪৬। 'যাহা স্বভাবানুকারী, অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি—উত্তর চরিত। বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিমপ্রসঙ্গ পৃঃ ৭৪।

৪৭। ৩৮এর প্রবন্ধ।

৪৮। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-চরিত পৃঃ ৪১৫। 'কেবল পুরাতনের মেরামত ও চুনকাম।'—বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ (২য়)—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার [বঙ্কিমপ্রসঙ্গ পৃঃ ১০৮] বঙ্কিমের নব্য লেখকদিগের প্রতি উপদেশ (৫ম)।

৪৯। দামোদর মুখোপাধ্যায় কৃত 'মৃন্ময়ী' [কপালকুণ্ডলার উপসংহার।] সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যকৃত 'হেমচন্দ্র' [মৃণালিনীর উপসংহার] ইত্যাদি।

৫০। 'মৃণালিনীর নূতন সংস্করণ আগাগোড়া প্রায় নাটক। থিয়েটারে আমার বইয়ের যে দুর্দ্দশা করা হইয়াছে তাহা দেখিয়া ওরূপ করিতে আমার ইচ্ছা হয়েছিল।'...বঙ্কিমবাবুরপ্রসঙ্গ (১ম)...পৃঃ ১৯১ (বঙ্কিমপ্রসঙ্গ)।

৫১। দুর্গেশনন্দিনীর অভিনব সংস্করণে দিগ্‌গজকে নূতন রূপ দেওয়ার হেতু 'এক শ্রেণীর অনুকরণ-প্রিয় লেখক বিদ্যাদিগ্‌গজ চরিত্রের নামে বঙ্গ সাহিত্যে অশ্লীলতা আনিতেছে।'—বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ (১ম)—বঙ্কিম-প্রসঙ্গ পৃঃ ১৮১।

ফলানো। ৫২ সেইরূপ বিষবৃক্ষের কথা প্রসঙ্গে জানাইয়াছিলেন যে, তাহাতে তাহার নিজের জীবনের কিছু ছবি আছে, তবে অবশ্য অনেক রঙ ফলানো। ৫৩

রস-সাহিত্য রচনায় রসস্রষ্টার দেখা চরিত্রের ছায়া এবং আপন জীবনের কথা অনেক সময়ে আসিয়া হাজির হয়; কিন্তু রূপ রচনা-কালে তাহার আসল চেহারা থাকে না, রূপে ও রসে ঢাকা পড়িয়া একটী স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া ওঠে।

কৃষ্ণকান্তের উইলে এরূপ দেখা চরিত্রের ব্যবহার অথবা স্বকীয় জীবনের কোনো কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন কিনা, তাহা জানিবার কোনো নিদর্শন তিনি রাখিয়া যান নাই, অথবা তাহা প্রকাশ পায় নাই। অথচ, এই কৃষ্ণকান্তের উইল তাঁহার মতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্য রচনা এবং ইহা সাহিত্যের আসরে বেশী দিন টিকিবে আশা করিতেন ৫৪ আর ভ্রমর তাঁহার মতে তাঁহার সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ নারী-চরিত্র।৫৫ বঙ্কিমের মতে কৃষ্ণকান্তের উইল শ্রেষ্ঠ রচনা হোক বা না হোক ৫৬ অনেকের মতে ইহা শ্রেষ্ঠ রচনা। তাই, তাঁহার জীবনের কথা বা দেখা চরিত্রের সাক্ষাৎ এই গ্রন্থে পাওয়ার জন্য একটা স্বাভাবিক কৌতূহল হয়।

উইল করিয়া পুত্রকে বঞ্চনা করার ঘটনার মত একটী ঘটনা কৃষ্ণকান্তের উইল রচনার পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল; সে ঘটনা কৃষ্ণকান্তের উইল পরিকল্পনার ভিত্তি ৫৭ হইতে পারে। এ সম্বন্ধে কোনো কথা নিশ্চিত করিয়া বলা খুব কঠিন।

শোনা যায়, রোহিণী বঙ্কিমের দেখা চরিত্র, কাঁটালপাড়ায় তাহার বাড়ী ছিল ৫৮ কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনো লিখিত প্রমাণ নাই। আর অনেকে অনুমান করেন, ৫৯ বারুণী পুষ্করিণী, বঙ্কিমচন্দ্রদিগের অর্জ্জুনা পুষ্করিণী; কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের মতে ইহা ভুল ধারণা—অর্জ্জুনার সহিত বারুণীর সাদৃশ্য নাই।৬০

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীতে বঙ্কিমবাবুর সব কথা প্রকাশ পায় নাই। সব কথা প্রকাশের তাঁহার বোধ করি ইচ্ছাও ছিল না,—"আমার জীবনের কথা মাঝে মাঝে গল্প বলিয়া তোমায় শুনাইব, সকল কথা বলা ত' সহজ নহে। জীবনে অনেক ভ্রম প্রমাদ আছে, তা বলা বড় কঠিন, কাজেই জীবনী হইল না।......আমার জীবন অবিশ্রাম সংগ্রামের জীবন। একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের—আমার পরিবারে।......তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম বলিতে পারি না।......আমার জীবনের কত বড় শিক্ষাপ্রদ।৬১.....।" মানুষের জীবনে ক্রটিবিচ্যুতি আছেই, এবং তাহাতে চরিত্র-গৌরবের মহিমা খর্ব্ব হয় না; বরঞ্চ, সর্ব্বাবয়বে ও পূর্ণতায় দেখায় মানুষকে যথার্থভাবে বোঝার সুযোগ পাওয়া যায়। উপযুক্ত তথ্যের অভাব হেতু বঙ্কিমচন্দ্রের অভিজ্ঞতা কৃষ্ণকান্তের উইলে কত খানি প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা বিচার করিয়া কোনো সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে রস-স্রষ্টার রসসৃষ্টি উপভোগে এসব তথ্য নিষ্প্রয়োজন। স্রষ্টার ব্যক্তিত্ব, মতামত, অভিজ্ঞতা,—এই সব বুঝিতে জীবনের তথ্যাবলীর প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

এইখানে আর একটা কথার উল্লেখ প্রয়োজন। কৃষ্ণকান্তের উইলে বঙ্কিমের কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্রের লেখা আছে। ৪র্থ পরিচ্ছেদের কৃষ্ণকান্তের সহিত রোহিণীর সাক্ষাৎ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার লেখা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সেই লেখার প্রথমাংশ নূতন করিয়া লিখিয়াছিলেন। শেষাংশে

---

৫২ ও ৫৩। বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ (১ম)—শ্রীশ মজুমদার—বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, ১৮৯ ও ১৯৫ পৃঃ।

৫৪। 'কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ ও নূতন সংস্করণের রাজসিংহ'—বন্দেমাতরম্—ললিতচন্দ্র মিত্র—বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, ২৮৯ পৃঃ।

৫৫। বঙ্কিম বাবুর প্রসঙ্গ (১ম)—বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, ১৯৫ পৃঃ।

৫৬। মতভেদ আছে—কেহ বলেন দেবীচৌধুরাণী, কেহ কপালকুণ্ডলা ইত্যাদি।

৫৭। বঙ্কিমচন্দ্র—অক্ষয়চন্দ্র দত্তগুপ্ত, ১১শ পরিচ্ছেদ। ['সাহিত্য' পত্রিকায় ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এক প্রবন্ধে এই ইঙ্গিত করিয়াছেন।]

৫৮। অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মুখে শোনা। এরকম একটা জনশ্রুতি সাধারণে প্রচারিত আছে।

৫৯। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-চরিত, ১৮৯ পৃঃ।

৬০। অর্জ্জনাপুষ্করিণী—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, ১০৩পৃঃ।

৬১। বঙ্কিম বাবুর প্রসঙ্গ (১)—বঙ্কিম প্রসঙ্গ, ১৯৪ পৃঃ।

অল্প অদল বদল করিয়াছিলেন। ৬২ বঙ্কিমচন্দ্র ভূমিকায় বা অন্য কোথাও এ ঋণ স্বীকার করিয়া যান নাই,৬৩ সুতরাং পূর্ণচন্দ্রের উক্তি সত্য হইলেও নির্দ্ধারণের কোনো উপায় নাই। তাই তাঁহার এ প্রশ্ন তোলা সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়াছে।

৬২। বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিমপ্রসঙ্গ ৭৭-৭৮ পৃঃ। হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখিত বঙ্কিমযুগে (ভারতী, কার্ত্তিক, ১৩১৮) কথাটা বাড়াইয়া বলা হইয়াছে। পূর্ণচন্দ্র তাহার প্রতিবাদও করিয়াছেন (বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, ৭৭পৃঃ)।

৬৩। কমলাকান্তের দপ্তরে অপরের লেখাগ্রহণের কথা ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। নিজে অপরের লেখায় যে অংশ লিখিয়াছেন, তাহা পৃথক করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন (সঙ্গীত প্রবন্ধ)।

শোক-সংবাদ

পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার শাস্ত্রী এম্-এ

বাঙ্গালা দেশের বড়ই দুর্ভাগ্য, এক এক করিয়া ধীরে ধীরে বাঙ্গালার গৌরবের ধন—বঙ্গজননীর সুসন্তানগণ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন।

আমরা বর্ত্তমান মাসে যাঁহার অকাল মৃত্যুর কথা পাঠকবর্গকে জানাইতে চাইতেছি তাঁহার নাম সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার শাস্ত্রী। তিনি এম্-এ উপাধিধারী এবং প্রেমচাঁদ রায়-চাঁদ-বৃত্তিভুক্ ছিলেন। একপক্ষ পূর্ব্বে কলেরা রোগে তিনি কর্ম্মস্থল পাটনা নগরে পরলোকগত হইয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে তিনি তেমন সুপরিচিত ছিলেন না সত্য—তবে তিনি বঙ্গভাষার জননী সদৃশী সংস্কৃত ভাষার ও ভারত-ইতিহাসের আলোচনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতে ছাত্র হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা-সমাপ্তির পরেই তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ক্রমে এই কলেজ হইতেই তিনি বি-এ ও এম্-এ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া শাস্ত্রী উপাধিলাভ করেন। এইস্থানে তিনি পূজনীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অতিপ্রিয় ছাত্র ছিলেন। বস্তুতঃ, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রিয়তম কৃতী ছাত্রদিগের মধ্যে তিনি অন্যতম। এই সংস্কৃত বিদ্যালয়ে স্বর্গগত পশুপতিনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। বাল্যকাল হইতে উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব-বন্ধন ক্রমে দৃঢ়তর হইয়াছিল। মনে হয়, পরলোকেও পশুপতিনাথ সেই বন্ধুত্বের কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; তাই তিনি স্বীয় পরলোক-গমনের পর দুই বৎসর কাল অতীত না হইতেই প্রিয় বন্ধুকে নিজের কাছে টানিয়া লইলেন।

সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত, পালি, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস প্রভৃতি বিভাগে অধ্যাপক ছিলেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি গভর্ণমেণ্টের চাকরী গ্রহণ করেন এবং পাটনা কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে সেখান হইতে মজফরপুর কলেজে বদলী হইয়া যান। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার যথেষ্ট পদোন্নতি হয়। এই ভীষণ বাঙ্গালী বিদ্বেষের দিনে তিনি বিহার ও উড়িষ্যা বিভাগের সংস্কৃতালোচনার অধ্যক্ষপদ (Superintendent of Sanskrit Studies, Behar and Orissa) প্রাপ্ত হন। মিথিলা ও উৎকলের পণ্ডিত-সম্প্রদায় তাঁহার ন্যায় আচারনিষ্ঠ সাত্ত্বিক পণ্ডিত ব্যক্তিকে এই পদ অলঙ্কৃত হইয়াছে দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হন। কিন্তু ভগবান্ তাঁহাকে এই গৌরব বেশী দিন ভোগ করিতে দিলেন না।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ যথেষ্ট কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এস্থলে তাঁহার সাহিত্য-বিষয়ক কার্য্যের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। অতি সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করিতেছি। প্রাচীন ভারতীয় ভূগোল সম্বন্ধে তিনি অনেক কাজ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বিষয়েই তিনি দুইখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। পুস্তক দুইখানির নাম—

Cunningham প্রণীত Ancient Geography of India এবং Mecrindle প্রণীত Ancient India। বিস্তৃত ভূমিকা ও বহুমূল্য টিপ্পনীর সহিত এই দুই গ্রন্থ তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। Behar Orissa Research Societyর পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘেও তিনি কিছুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন। সংস্কৃত-সাহিত্য সম্বন্ধে নানা বিষয়ে তাঁহার বহু প্রবন্ধ Journal of the Asiatic Society of Bengal, Indian Antiquary, Silver Jubilee Commemoration Volumes of Sir Asutosh Mukherji, Journal of the Behar Orissa Research Society, সংস্কৃত-সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিছুদিন হইল তিনি সংস্কৃতে শিলালেখ কাব্য রচনা করিতেছিলেন। সংস্কৃত-শিলালেখ প্রভৃতি হইতে শ্লোক সংগ্রহ করিয়া এবং মধ্যে মধ্যে নিজে শ্লোক রচনা করিয়া একখানি ধারাবাহিক ইতিহাস প্রস্তুত করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ইহা তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

পরিশেষে তাঁহার কয়েকটী বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁহার ধীরপ্রকৃতি, অমায়িক ব্যবহার, মধুর বাক্যালাপ, সদাচার ও ব্রাহ্মণোচিত নিষ্ঠা তাঁহাকে সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়াছিল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম-এ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রামাবতার শর্ম্মা, এম-এ

গত ৩রা এপ্রিল পাটনা কলেজের অধ্যাপক মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত রামাবতার শর্ম্মা এম-এ, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অকালবিয়োগে বিহারবাসী একজন যথার্থ মনীষী ব্যক্তিকে হারাইয়াছেন। পণ্ডিত রামাবতার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। কাশী হইতে তিনি সাহিত্যাচার্য্য উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ইংরাজী বর্ষের প্রারম্ভে তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হইয়াছিল। ১৩০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পাটনা কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি এই কলেজের সংস্কৃত বিভাগের উচ্চতম আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মধ্যে তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত রামাবতার হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যে একজন ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। "মারুতি শতকম্" প্রভৃতি কতকগুলি সুললিত সংস্কৃত পুস্তকের তিনি রচয়িতা। "সদুক্তি কর্ণামৃত" নামে তাঁহার একটী সাহিত্যসংগ্রহ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। গায়কোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজভুক্ত "কেশব-কল্পদ্রুম" তাঁহারই সম্পাদিত। রামাবতারের আর একখানি অপ্রকাশিত পুস্তকের নাম "মুদ্গর-দর্শন"। বঙ্গভাষায় বিশ্বকোষের অনুরূপ একখানি সুবৃহৎ সংস্কৃত অভিধান তিনি সঙ্কলন করিতেছিলেন; উহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। অধ্যাপক মহাশয় Journal of Bihar and Orissa Research Society পত্রে অনেকগুলি মূল্যবান্ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

শ্রীগোপাল বসু মল্লিক ফেলোশিপ লেকচারার রূপে ১৯০৭-৮ খৃষ্টাব্দে "বেদান্ত-দর্শন" ও ১৯১৩খৃষ্টাব্দে "অধিকরণ রতনমালা পরমার্থ দর্শনীয়া"—এই দুই বক্তৃতায় পণ্ডিত রামাবতার শর্ম্মা জীবন সম্বন্ধে হিন্দুদর্শনশাস্ত্রের সনাতন ধারণার একটী বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্বলিত ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। Doctrine of Returnএর খণ্ডনের জন্য তাঁহার যে বিরুদ্ধযুক্তি, তাহাকে Nietzschএর মতবাদের সমপর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। পণ্ডিত রামাবতার বলেন, "All beings uptil now have created something above themselves, and you (men) want to be the reflux of this great flow and rather to return to the beast than surmount man..............It is a blasphemy to esteem the entrails of the impenetrable and to despise the world one lives in. (এ পর্য্যন্ত সকল জীবই তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন-না কোন বস্তু সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু মানুষ এই বিশ্বপ্রবাহের বিপরীতমুখী হইয়া অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবে পরিণত হওয়ার পরিবর্ত্তে অধমতর পশুত্বের পর্য্যায়ে অবনত হইতে

প্রচেষ্ট।.................যে জগতে বাস করি, তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া এক (অজ্ঞাত) অভেদ্যের অন্তরদেশকে মূল্যবান্ জ্ঞানে পূজা করা ঈশ্বরনিন্দার নামান্তর মাত্র) অধ্যাপকের মতে "We should cease to be men that pray and become men that bless" আমরা মানুষ,—কিন্তু আমরা যেন আর প্রার্থনা না করি ; এবার হইতে আমরা আশীর্ব্বাদ করিতে অভ্যস্ত হইতে চাই —তিনি চিরন্তন ধর্ম্মমতের কিরূপ বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, তাহা তাঁহার এই উক্তি হইতেই অনুমেয়। পণ্ডিত রামাবতার শর্ম্মার বিয়োগবার্ত্তা কিঞ্চিৎ পুরাতন ও অসাময়িক হইলেও এরূপ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রসঙ্গালোচনার সুযোগ পরিত্যক্ত হয় নাই।

লেখ-পঞ্জী

[দেশ-বিদেশ হইতে ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায় ক্ষুদ্র বৃহৎ, খ্যাত অখ্যাত কত সাময়িক পত্র বাহির হইতেছে, তাহার সন্ধান সকলে রাখেন না ; আর যে কয়খানির নাম জানা আছে কিংবা যে গুলিকে হাতের কাছে পাওয়া যায়, তাহাও ঠিক মত পড়িবার সুযোগ বা সময় কচিৎ মেলে। অথচ ইহার ফলে হয়তো অনেক ভাল জিনিসই পাঠকদের দৃষ্টির বাহিরে থাকিয়া যায়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য আমরা স্থির করিয়াছি, প্রতিমাসে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধ, উপন্যাস, শিল্প, জীবনী, ভ্রমণ-কাহিনী, কবিতা, আলোচনা পাঠ করিয়া আমাদের যেগুলি ভাল লাগিবে অথবা প্রণিধানযোগ্য বলিয়া মনে হইবে, সেই গুলির নাম উল্লেখ করিয়া যাইব। আশা করি, ইহা বহু দিক্ দিয়া আমাদের পাঠকবর্গের সহায়তা করিবে।

এমাসে অল্প সময় থাকিতে এই কার্য্যে প্রথম হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে বলিয়া যে কয়খানি পত্রিকা নিকটে ছিল, তাহাদেরই বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে। সুখপাঠ্য ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস গুলিরও নাম দেওয়া হইল না। আগামী মাস হইতে যতদূর সম্ভব ইহার পূর্ণতা দিতে চেষ্টা করা হইবে।—[সম্পাদক]

প্রবন্ধ

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা — শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — প্রবাসী, আষাঢ়
দ্বন্দ্ব — " — বিচিত্রা, "
মেঘদূতে রমণী — শ্রীহরি সেন — " "
সাহিত্য ও "হিউমার" অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম্-এ, — মানসী ও মর্ম্মবাণী, "
বৌদ্ধসাহিত্যে জাতক — ডাক্তার শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া, এম্-এ, ডি লিট্, — প্রবর্ত্তক "

দর্শন

ক্ষর ও অক্ষর — শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্ এ, — বিচিত্রা আষাঢ়

ইতিহাস

মধ্য এশিয়ার হিন্দু সাহিত্য — শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী — বিচিত্রা "
প্রাচীন চেদিগণ ও চেদিরাজ্য — ডাঃ শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম্-এ, বি-এল্, পি, এইচডি. — বিচিত্রা "
বঙ্গসাহিত্যে ইতিহাস-চর্চ্চা — শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার — মানসী ও মর্ম্মবাণী "

গল্প

স্মৃতি — শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায় — প্রবাসী "
কুধোজল — শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র — " "
বিযুৎবারের বারবেলায় — শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল্ — ভারতবর্ষ "
নেকী — শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় — বিচিত্রা "

জীবন-বৃত্তান্ত

রঙ্গলাল — শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ — মানসী ও মর্ম্মবাণী "

ভ্রমণ-কাহিনী

হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর — শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় — প্রবাসী "

বাদল বাঁশী।

কথা ও সুর—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী।

মেঘমল্লার—জলদ একতালা।

বাঁশীর ডাকে নিশীথ রাতে এলাম পথে শ্রাবণে,
আকাশ-ঘেরা নিবিড় মেঘ বইছে বাতাস সঘনে।

বাদল রাতি আঁধার গভীর
করলে বাঁশী ঘরের বাহির
বিরহের কত ব্যথা জাগিয়ে হিয়ার মাঝখানে
ডাকছে আমায় কোন নিরালায় কোনখানে তা সেই জানে!

মনকে আমি শুধাই ওরে
পথ আমারে দেখায় কেরে
কে যেন গো ডেকে আমায় বল্‌লে কাণে কাণে
সুর শুনে তুই যারে চলে চেয়ে সুমুখ পানে।

পথই তোরে পথ দেখাবে
তারই কাছে নিয়ে যাবে
যে জন তোরে ডাক্‌ছে ওরে ব্যাকুল বাঁশীর তানে
ভাবিস্ নে আর ঘরের্ কথা চাস্‌নে পিছন্ পানে॥

স্বরলিপি

দুই নি
গা কোমল

—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীচন্দ্রমোহন ঘোষ।

• ১ + ৩ • ১ + ৩
|জ্ঞা মা রা |। সা সা | ন্‌া সা রা | রা রা । ¦ সা রা পা |। পা ধা | মা পধা পা | মা জ্ঞা । |
১ | বাঁ শী র্‌ | • ডাকে | নি শী থ্‌ ¦ রা তে • | এ লা ম্‌ | • প থে | শ্রা • ব | নে • • |
২ | ডা ক্‌ ছে | আ মা য় | কো ন্‌ নি | রা ল য় | কো ন্‌ খা | • নে তা | সে ই জা | নে • • |
৩ | ম ন্‌ কে | • আ মি | শু ধা ই | ও রে • | প থ্‌ আ | • মা রে | দে খা য় | কে রে • |
৪ | সু র্‌ শু | •নে তু ই | যা • রে | চ লে • | চে য়ে • | সু মু খ্‌ | পা • • | নে • • |
৫ | ভা বি স্‌ | নে আ র | ঘ রে র্‌ | ক থা র | চা স্‌ নে | পি ছ ন্‌ | পা • • | নে • • |

• ১ + ৩ • ১ + ৩
| মা পা পা ¦ পা । পা | মা পা পা | র্সা । র্সা | ণা ণা ণা | ধা পা । | মা পধা পা | মা জ্ঞা । |
১ | আ কা শ্‌ | ঘে • রা | নি বি ড়্‌ | মে • ঘ্‌ | ব ই ছে | বা তা স্‌ | স • ঘ | নে • • |
২ | কে • যে | ন • গো | ডে কে • | আ মা য় | ব ল্‌ লে | কা ণে • | কা • • | ণে • • |

• ১ + ৩ • ১ + ৩
| মা পা পা | না । না | র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা । পা র্রা র্রা |। র্সা র্সা | র্সা র্রা ণা | ধা পা । |
১ | বা দ ল | রা • তি | আঁ ধা র | গ ভী র | ক র্‌ লে | • বাঁ শী | ঘ রে র | বা হি র |
২ | প থ্‌ ই | তো • রে | প থ্‌ দে | খা বে • | তা • র ই | • কা ছে | নি য়ে • | যা বে • |

• ১ + ৩ • ১ + ৩
| মা পা । | পা । পা | মা পা । | র্সা । র্সা | ণা ণা । | ধা । পা | মা পধা পা | মা জ্ঞা । |
১ | বি র • | হে • র্‌ | ক ত • | ব্যা • থা | জা গি য়ে | হি য়া র্‌ | মা ঝ্‌ খা | নে • • |
২ | যে জ ন্‌ | তো • রে ¦ ডা ক্‌ ছে | ও রে • | ব্যা কু ল্‌ | বাঁ শী র্‌ | তা • • | নে • • |

গ্রামফোন রেকর্ড

গত জুলাই মাসে "হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" গ্রামফোন কোম্পানীর নিম্নলিখিত রেকর্ডগুলি বাহির হইয়াছে। উহাদের মধ্যে কয়েকখানি আমাদের বেশ ভালই লাগিয়াছে :—

১১৬০৭ নং—
শ্যামা শুধু এ বাসনা মনে…

১১৬০৩ নং—মিস্ নীহারবালা
সকল বাঁধন ঘুচিয়ে দিয়ে…

১১৬০০ নং—ইন্দুবালা
স্বপনে তোমারে দেখিয়াছি আমি…

১১৫৯৯ নং—মিস আঙ্গুরবালা
কেন মিছে মরি ভুলে,
হৃদয়েরই পটে তোমার মুরতি

১১৬০৪ নং—বলাই ভট্টাচার্য্য
হের লো রাধিকা প্রিয়…

১১৬০৮ নং—হরিদাস ব্যানার্জ্জি
কুকুরের ঝগড়া… ও চাবার রেল-বিভ্রাট

যশোদা-গোপাল

দ্বিতীয় বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৩৬ | পঞ্চম সংখ্যা

জন্মাষ্টমীর দিনে

[শ্রীগিরিজাকুমাব বসু]

পূর্ণব্রহ্ম—চরাচর সৃজিয়াছ তুমি
তবু কোন্ লীলাছলে অন্ধ কারাভূমি
জনমের ঠাঁই বলি করিলে বরণ,
হে সুন্দর ভাবি আজি তাই ; প্রয়োজন
হয়তো বা ছিল তার, করি নিবেদন
সেও প্রভু তোমারি যে আপন সৃজন ;
হে প্রিয়, হে চক্রধর, হে রাধাবল্লভ
কি উপায় ওগো তব ছিল সুদুর্ল্লভ
যার লাগি কংসঘাতে মানবের গেহে
কুমারের বেশে তুমি জনমিলে স্নেহে ?
আমি জানি প্রেমময় কোন্ অভিলাষে
মাতৃগর্ব্বে দেবকীরে ভরিলে উল্লাসে ;
তুমি যদি না আসিতে দলি' সব বাধা
কে কহিত 'শ্রীচরণে রেখো মোরে রাধা' ?

শিবাজীর রাজ্যাভিষেক

[স্যর যদুনাথ সরকার এম-এ, কে টী]

শিবাজী অনেক দেশ জয় এবং অগাধ ধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তিনি নিজকে ছত্রপতি অর্থাৎ স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। ইহাতে তাঁহার অনেক অসুবিধা ও ক্ষতি হইতেছিল। প্রথমতঃ, অন্যান্য রাজারা তাঁহাকে বিজাপুরের অধীন জমিদার অথবা জাগীরদার মাত্র বলিয়া গণ্য করিতেন ; বিজাপুরের কর্ম্মচারীদের চক্ষে তিনি বিদ্রোহী প্রজা মাত্র। আর, অন্যান্য মারাঠী জমিদার-বংশও ভোঁশলেদিগকে নিজেদের অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিত না ; বরং তাহাদের মধ্যে অতি পুরাতন ঘরগুলি (যেমন, মোরে, যাদব, নিম্বলকর প্রভৃতি) শাহজী শিবাজীকে ভূঁইফোড় অকুলীন বলিয়া অবজ্ঞা করিত। শিবাজীর প্রজারাও মহা সঙ্কটে পড়িয়াছিল, কারণ যতদিন তিনি ছত্রপতি বলিয়া গণ্য না হন, ততদিন আইন-অনুসারে তাহারা নিজেদের পুর্ব্বেকার রাজার প্রজা, শিবাজীর শাসন মানিতে বাধ্য ছিল না। তাঁহার ভূমিদান এবং নিয়োগপত্র আইন-অনুসারে সিদ্ধ হইতে পারিত না।

সুতরাং শিবাজী নিজের অভিষেক করিয়া ছত্রপতি উপাধি লইয়া জগৎকে দেখাইলেন যে তিনি স্বাধীন রাজা, তাঁহার অধীন প্রজাগণ তাঁহাকেই মানিবে, অন্য কোন প্রভুর ক্ষমতা স্বীকার করিবে না। ইহা ভিন্ন মহারাষ্ট্রের সকল উচ্চমনা দেশসেবকেরা দেশে স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব—"হিন্দবী স্বরাজ"—স্থাপনের জন্য উৎসুক হইয়াছিল। একমাত্র শিবাজীই এই জাতীয় বাঞ্ছা পূরণ করিতে পারেন।

কিন্তু শাস্ত্র-অনুসারে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কোন জাতের লোক হিন্দুর রাজা হইতে পারে না ; অথচ সে যুগে সমাজে ভোঁশলে বংশকে শূদ্র বলিয়া গণ্য করা হইত। তখন, শিবাজীর মুন্শী বালাজী আবজী মারাঠাজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত কাশীবাসী বিশ্বেশ্বর ভট্টকে (ডাক নাম গাগা ভট্ট) অনেক টাকা দিয়া হাত করিলেন। ভট্ট মহাশয় শিবাজীর ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিয়া এবং তাঁহার আদি পুরুষ যে সূর্য্যবংশীয় চিতোরের মহারাণার পুত্র ইহা স্বীকার করিয়া এক পাঁতি লিখিয়া দিলেন এবং তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়ায় প্রধান পুরোহিত হইতে সম্মত হইলেন। গাগা ভট্ট দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত—"চার বেদ ও ছয় শাস্ত্রে যোগাভ্যাস-সম্পন্ন, জ্যোতিষী, মন্ত্রিক, সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী, কলিযুগের ব্রহ্মদেব" [সভাসদ বখর]। তাঁহার বিরুদ্ধে তর্ক করিতে পারে এমন শক্তি বা সাহস মহারাষ্ট্রে তখন কোন ব্রাহ্মণের ছিল না। সুতরাং শাস্ত্রীয় তর্কে পরাস্ত হইবার ভয়ে এবং মোটা দক্ষিণার লোভে সকলেই শিবাজীর ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করিল।

তাহার পর কয়েক মাস ধরিয়া মহাব্যয়ে অভিষেকের নানা আয়োজন করা হইল। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেরই পণ্ডিতরা নিমন্ত্রিত হইলেন। সে সময় রাস্তা ঘাট এবং ভ্রমণের সুবিধা ছিল না বলিলেই হয় ; তথাপি এগার হাজার ব্রাহ্মণ—তাহাদের স্ত্রী পুত্র লইয়া পঞ্চাশ হাজার লোক—রায়গড় দুর্গে উপস্থিত হইল এবং চারি মাস ধরিয়া রাজার খরচে মিঠাই-পক্কান্ন খাইতে থাকিল।

অভিষেকের পূর্ব্বে আবশ্যক সকল অনুষ্ঠানই সম্পন্ন হইতে লাগিল। প্রথমে শিবাজী নিজ গুরু রামদাস স্বামী এবং মাতা জীজাবাঈকে বন্দনা করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লইলেন।

জীজাবাঈএর আজ আনন্দের সীমা নাই। যৌবনের শেষ হইতে স্বামীর অবহেলা সহ্য করিয়া তিনি সন্ন্যাসিনীর মত এই সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাটাইয়াছেন। পুত্রের আজীবন ভক্তিতে তিনি সে দুঃখ ভুলিয়াছিলেন। আর, সেই পুত্রের পবিত্র চরিত্র, দয়া দাক্ষিণ্য, এবং অজেয় বীরত্বের খ্যাতিতে জগৎ পূর্ণ। আজ তাঁহার পুত্র স্বদেশবাসীদের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করিয়াছে, হিন্দু নরনারীকে অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে, সর্ব্বত্র ধর্ম্ম ও ন্যায়ের রাজ্য স্থাপন করিয়াছে ; এমন রাজার জননী বলিয়া আজ তিনি দেশপূজ্যা। পঞ্চদশ শতাব্দী পূর্ব্বের এই মহারাষ্ট্র দেশের আর এক রাজ-জননী—অন্ধ্ররাজ শ্রীসাতকর্ণীর মাতা গোতমীর—ভাষায় তিনিও বিজয়ী ধার্ম্মিক পুত্রের গুণগান করিয়া যেন বলিতেছেন :—

নস খখরাতবস নিরবসেসকরস সাতবাহনকুলযসপতি- থাপন করস / সবমডলা ভিবাদিতচ. গস বিনিবতিত- চাতুবণসকরস অনেকসমরাবজি / তসতুসঘস অপরাজিত বিজয়পতাকসতুজনতুপধসনীয় /

পুরবরস কুলপুরিসপরপরাগত-বিপুলরাজসদস আগমান নিলয়স সপুরিসানং / অসযস সিরীয়. অধিঠানস উপ- চারান পভবস এককুসস একধনু / ধরস একসুরস একবম্হণস রাম /

কেসবাজুনভীমসেন-তুলকর কমস ছণঘনুসব সমাজ- কারকস / নাভাগ—নহুস—জনমেজয় সকরযযাতি— রামাবরীস-সমতেজস অপরিমিতম্ / অখয়ম্ অচিতম্ অভুত পবন-গরুড় সিধ-যখ-রখস / বিজাধর-ভূত-গধব-চারণ—

চদ-দিবাকর -নগত-গহ-বিচিণ সমরসিরসি জিতরি- পুসঘস নাগ বরখধা / গগন তলম্ অভিবিগাঢস কুলবিপুল- সিরিকরস সিরি—সাতকণিস মাতুয / মহাদেবীয় গোতমিয় বলসিরীয় সচবচনদানখমা হিসা—নিরতায়তপদমনিয—/

মোপবাসতপরায় রাজরিসিবধুসদম্ অখিলম্ অনু- বিধীয়মানায় কারিত / দেয়ধম ..সিখরসদিসে তিরণ্- হুপবতসিখরে বিম্ বরনিবিসেসমহিটীক লেণ এত চ লেণ মহাদেবী মাহারাজ মাতা / মহারাজপ তামহী দদাতি নিকযস ভদাবনীযানম্ ভিখুসঘস /

এতস চ লেণস চিতণনিমিত মহাদেবীয় অয়কায় সেবকামো পিয়কামো / চ ণং পথেসরো পিতুপতিয়ো ধমসেতুয দদাতি / গাম তিরণ্হুপবতস অপরদখিণপসে পিসাজিপদকম্ সবজাতভোগ নিরঠি।

শুধু তাঁহার জীবনের এই পূর্ণ সফলতা দেখাইবার জন্যই যেন ভগবান্ জীজাবাঈকে এতদিন পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন, কারণ শিবাজীর অভিষেকের বারো দিন পরেই তাঁহার আত্মা আশী বৎসর বয়সে পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

তাহার পর শিবাজী তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া চিপ্লুন তীর্থে পরশুরামের পূজা করিলেন এবং প্রতাপগড়ে গিয়া নিজ ইষ্টদেবী ভবানীকে সওয়া মণ ওজনের সোনার ছাতা উপহার দিয়া আরাধনা করিলেন। ২১এ মে রায়গড়ে ফিরিয়া অনেক দিন ধরিয়া প্রত্যহ স্থানীয় দেব-দেবীর পূজায় ব্যস্ত রহিলেন।

তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ ক্ষত্রিয়াচার না করিয়া যে পতিত (বা শূদ্র) হইয়াছিল, তাহার জন্য শিবাজী ২৮এ মে প্রায়শ্চিত্ত করিলেন; এবং গাগাভট্ট তাঁহাকে উপবীত পরাইয়া ক্ষত্রিয় করিয়া দিলেন! তখন শিবাজী বলিলেন, "আমি দ্বিজ হইয়াছি; সকল দ্বিজের বেদাধিকার আছে, সুতরাং আমার ক্রিয়াকাণ্ডে বৈদিক মন্ত্র পড়িতে হইবে।" ইহা শুনিয়া সমবেত ব্রাহ্মণেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, বলিল যে "কলিযুগে ক্ষত্রিয় জাত লোপ পাইয়াছে, এখন ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহ দ্বিজ নহে।" তাহারা টাকার লোভে ভোঁশলে বংশকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল, নচেৎ অভিষেক হয় না আর ব্রাহ্মণেরা এত লক্ষ লক্ষ টাকার দক্ষিণা ও সিধা পায় না। কিন্তু এখন তাহাদের প্রথম মতের ন্যায়সঙ্গত ফল দেখিয়া তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিল। স্বয়ং গাগাভট্টও ভয় পাইলেন, এবং একটা গোঁজামিল দিয়া তাড়াতাড়ি গোলমাল মিটাইয়া ফেলিলেন। অভিষেকে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হইল না, কিন্তু শিবাজী বিবাহে (৩০এ মে) ঐ মন্ত্র ব্যবহার করিলেন।

এই ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত ও উপবীত ধারণে মহা সমারোহ ও অগাধ টাকা দান করা হইল; গাগাভট্ট "মুখ্য অধ্বর্য্যু," এজন্য ৩৫ হাজার টাকা পাইলেন; অপর ব্রাহ্মণ সাধারণের মধ্যে ৮৫ হাজার টাকা বিতরিত হইল।

পরদিন শিবাজী জ্ঞাত ও অজ্ঞাত স্বকৃত পাপ মোচনের জন্য তুলা করিলেন, অর্থাৎ সোণা-রূপা তামা প্রভৃতি সপ্ত ধাতু, সূক্ষ্ম বস্ত্র, কর্পূর, লবণ, মশলা, ঘৃত, চিনি, ফল ও খাদ্য প্রভৃতি নানা দ্রব্য তাহার দেহের সমান (দুই মণের কিছু কম) ওজন করিয়া লইয়া ঐ সমস্ত এবং নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করা হইল। ইহা ভিন্ন তাঁহার দেশলুণ্ঠনে যে গোব্রাহ্মণ স্ত্রীলোক ও শিশু মারা পড়িয়াছিল সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শিবাজী আট হাজার টাকা ব্রাহ্মণদের দান করিলেন।

অভিষেকের আগের দিন শিবাজী সংযম করিয়া রহিলেন। গঙ্গাজলে স্নান করিয়া গাগাভট্টকে ২৫ হাজার এবং অন্যান্য বড় বড় ব্রাহ্মণদের প্রত্যেককে পাঁচ শত করিয়া টাকা দিলেন।

জ্যৈষ্ঠ মাস শুক্লা ত্রয়োদশী (৬ই জুন ১৬৭৪ খৃঃ) অভিষেকের শুভদিন। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া শিবাজী

প্রথমে মঙ্গলস্নান এবং কুলদেবদেবী—মহাদেব ও ভবানীর —পূজা, কুলগুরু বালম্ ভট্ট, পুরোহিত গাগাভট্ট এবং অন্যান্য বড় বড় পণ্ডিত ও সাধুগণকে বন্দনা এবং বস্ত্রালঙ্কার দান শেষ করিয়া ফেলিলেন।

তাহার পর বিশুদ্ধ শ্বেতবস্ত্র পরিয়া, মালা চন্দন স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিয়া অভিষেক-স্নানের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে গেলেন। সেখানে দুই ফুট লম্বা চওড়া ও উঁচু এক সোণার চৌকীতে বসিলেন। তাঁহার পাশে বসিলেন রাণী সোইরা বাঈ—সহধর্ম্মিণী বলিয়া রাণীর আঁচল শিবাজীর আঁচলে গির বাঁধিয়া দেওয়া হইল। কিছু পশ্চাতে যুবরাজ শম্ভুজী বসিলেন। আট কোণে আটটী স্বর্ণ কলস এবং আটটী ভাঁড় ভরিয়া গঙ্গা প্রভৃতি সপ্ত মহানদী ও অন্যান্য বিখ্যাত নদ-নদী-সমুদ্র এবং তীর্থস্থানের জল আনিয়া রাখা হইয়াছিল। প্রত্যেক কলসের কাছে অষ্ট প্রধানের এক এক জন দাঁড়াইয়া। তাঁহারা ঠিক মুহূর্ত্তে ঐ জল শিবাজী রাণী ও রাজপুত্রের মাথায় ঢালিয়া দিলেন; আর শ্লোক পাঠ এবং মঙ্গল বাদ্যে আকাশ কাঁপিয়া উঠিল। ষোল জন সধবা ব্রাহ্মণী সুশোভন বস্ত্র পরিয়া সোনার থালায় পঞ্চ-প্রদীপ লইয়া তাঁহার মাথার চারিদিকে ঘুরাইয়া মঙ্গল আরতি করিলেন।

তাহার পর ভিজা কাপড় ছাড়িয়া রাজার যোগ্য জরীর কাজ করা লাল বস্ত্র এবং মণিমুক্তাহীরা-বসান নানা প্রকার উজ্জ্বল অলঙ্কার পরিয়া, গলায় ফুলের মালা ও মাথায় মুক্তার অসংখ্য ঝালরে সজ্জিত পাগড়ী দিয়া, শিবাজী নিজ ঢাল তলোয়ার তীর ও ধনুকের "অস্ত্রপূজন" করিলেন, এবং এই উপলক্ষে আবার ব্রাহ্মণদের চরণ বন্দনা (তথা দক্ষিণা দান) করিলেন।

অবশেষে তিনি সিংহাসন-গৃহে ঢুকিলেন। এই ঘরের সজ্জায় অগাধ ধনরত্ন ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ছাদের নীচে জরীর সামিয়ানা খাটান, তাহা হইতে লহরে লহরে মুক্তার মালা ঝুলিতেছিল। মেঝেতে মখমল বিছান; মধ্যস্থলে বহু পরিশ্রমে প্রস্তুত অশেষ কারুকার্য্যে শোভিত, "অমূল্য নবরত্নে খচিত" এক প্রকাণ্ড সোনার সিংহাসন। সিংহাসনের তলদেশ সোনার চাদর দিয়া মোড়া; আট কোণে আটটী স্তম্ভ, মণিবসান সোনার পাতে জড়ান। আর এই আটটী থামের মাথায় চক্‌মকে জরীর চাঁদোয়া বাঁধা, তাহার স্থানে স্থানে মুক্তার গুচ্ছ, হীরক, পদ্মরাগ প্রভৃতি ঝুলিতেছে। রাজার বসিবার গদি ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর মখমল দিয়া ঢাকা। গদির পশ্চাতে রাজছত্র।

সিংহাসনের দুই পাশে নানা প্রকার রাজচিহ্ন সোনার হলকরা বল্লম হইতে ঝুলিতেছিল,—যেমন, ডান দিকে দুটী প্রকাণ্ড মাছের মাথা (মুঘলদিগের মাহী মুরাতিব্), বামে ঘোড়ার লেজের চামর (তুর্কীজাতীয় রাজচিহ্ন) এবং ওজনের মানদণ্ড (ন্যায়বিচারের চিহ্ন, প্রাচীন পারস্যরাজ্য হইতে লওয়া)। রাজদ্বারের বাহিরে দুই দিকে পাতায় মুখ ঢাকা জলের ঘট সাজান, এবং তাহার পর দুটী হস্তী-শাবক ও দুটী সুন্দর ঘোড়া; তাহাদের সাজ ও লাগাম সোণা ও মণি দিয়া কাজ করা।

নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে শিবাজী পূজ্যগণকে নমস্কার করিয়া সিংহাসনের সিঁড়ি বহিয়া উঠিয়া গদিতে বসিলেন। অমনি মুঠা মুঠা রত্ন-খচিত সোণার পদ্ম ও অন্যান্য সোণা রূপার ফুল সভাসদ্‌গণের মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া হইল। আবার ষোলজন সধবা ব্রাহ্মণী সু-বাস পরিয়া সোণার পঞ্চ প্রদীপ তাঁহার চারিদিকে ঘুরাইয়া অমঙ্গল দূর করিলেন। সমবেত ব্রাহ্মণগণ উচ্চৈস্বরে শ্লোক আওড়াইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, শিবাজী নতশিরে তাহার প্রত্যুত্তর দিলেন। জনসাধারণ আকাশ ফাটাইয়া চেঁচাইতে লাগিল—"জয়, শিবরাজের জয়! শিব ছত্রপতির জয়!" এক সঙ্গে সমস্ত বাদ্য যন্ত্র বাজিয়া উঠিল; আর, বাহিরে মহারাষ্ট্র দেশের সব দুর্গ হইতে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তোপের আওয়াজ করা হইল। দেশ জানিল যে নিজের রাজা পাইয়াছে।

প্রথমে অধ্বর্য্যু গাগাভট্ট, তাহার পর অষ্ট প্রধান ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ অগ্রসর হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। শিবাজীর মাথার উপর রাজছত্র ধরা হইল। তিনি সকলকে গণনাতীত ধন দিলেন। "দানপদ্ধতি-অনুযায়ী ষোড়শ মহাদান ইত্যাদি সমস্ত দান গুলি সম্পন্ন করিলেন।" সিংহাসনের আট কোণে অষ্ট প্রধান অর্থাৎ মন্ত্রীগণ দাঁড়াইয়া ছিলেন; তাঁহাদের পদের পারসিক ভাষার নাম বদলাইয়া সংস্কৃত নাম দেওয়া হইল,—যেমন পেশোয়ার বদলে "মুখ্য প্রধান"। শিবাজীর উপাধি হইল

—ছত্রপতি। সেই দিন হইতে "রাজ্যাভিষেক শক" নামে এক নূতন বৎসর গণনা সুরু করা হইল; ইহাই পরে সমস্ত মারাঠা সরকারী কাগজ-পত্রে ব্যবহৃত হইল।

সিংহাসন অপেক্ষা কিছু নীচু তিনটী আসনে যুবরাজ শম্ভুজী, গাগাভট্ট ও পেশোয়া মোরেশ্বর ত্র্যম্বক পিঙ্গলে বসিলেন। বাকী মন্ত্রীরা দুই লাইন করিয়া সিংহাসনের দুইপাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাঁহাদের পশ্চাতে কায়স্থ "লেখক" নীল প্রভু (পারসনিস্) এবং বালাজী আবজী (চিটনিস্) স্থান পাইলেন। অন্যান্য দরবারীরা যথাক্রমে আরও দূরে দাঁড়াইল।

এই সব কাজে বেলা আটটা হইয়া গেল। তখন ইংরাজ দূত হেনরি অক্‌সিণ্ডেনকে নীরাজী রাবজী (শিবাজীর ন্যায়াধীশ) সিংহাসনের সামনে লইয়া গেলেন। দূত মাথা নত করিলেন, আর তাঁহার দোভাষী নারায়ণ শেনবী ইংরাজ কোম্পানীর উপহার একটি হীরার আংটি উঁচু করিয়া ধরিয়া শিবাজীকে দেখাইলেন। রাজা তাঁহাদের আরও কাছে ডাকিয়া খেলাৎ পরাইয়া বিদায় দিলেন।

সর্ব্বশেষে হাতীতে চড়িয়া শিবাজী সদলবলে রায়গড়ের রাস্তা বাহিয়া শোভাযাত্রা করিয়া চলিলেন। আগে দুই হাতীর উপর দুই রাজপতাকা "জরী পতাকা" (জরীর) এবং "ভাগবে ঝাণ্ডা" (অর্থাৎ রামদাস সন্ন্যাসীর গেরুয়া বস্ত্রের খণ্ড)। শহরবাসীরা নিজ নিজ বাড়ী ও রাস্তা নানারূপে সাজাইয়া রাখিয়াছিল। সর্ব্বত্রই ঘরে ঘরে সধবারা প্রদীপ ঘুরাইয়া রাজার আরতি করিল, তাঁহার মাথার উপর খই ফুল ও দুর্ব্বা ছিটাইতে লাগিল। তাহার পর রায়গড় পাহাড়ের সব মন্দিরে গিয়া প্রত্যেক স্থানে পূজা দিয়া দান-ধ্যান করিয়া শিবাজী অবশেষে বাড়ী ফিরিলেন। তখন বেলা দুপুর।

পরদিন ব্রাহ্মণদের দক্ষিণাদান এবং কাঙ্গালীবিদায় আরম্ভ হইল। ইহা শেষ হইতে বারো দিন লাগিল, এবং সে পর্য্যন্ত সকলেই রাজার সিধা পাইতে থাকিল। সাধারণ ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা তিন হইতে পাঁচ টাকা, ব্রাহ্মণী ও শিশুদের দুই এক টাকা বরাদ্দ ছিল। এই দানে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা ব্যয় হইল।

অভিষেকের দুই দিন পরে বর্ষা নামিল, আর দশ এগার দিন ধরিয়া সেই বৃষ্টি মুষলধারে চলিল। আগন্তুকেরা বিদায় লইয়া পলাইবার পথ পায় না। ১৮ই জুন বৃদ্ধা জীজাবাঈ পূর্ণ সুখ সম্পদের মধ্যে জীবন শেষ করিলেন। তাঁহার ২৫ লক্ষ হোণের সম্পত্তি শিবাজী পাইলেন। এই অশৌচ শেষ হইলে শিবাজী দ্বিতীয়বার সিংহাসনে বসিলেন।

কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদ বাড়াইয়া বলিয়াছেন যে অভিষেকের ব্যয় সাত কোটি দশ লক্ষ টাকা হইয়াছিল।* কিন্তু সর্ব্বসমেত পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ধরিলে বোধ হয় সত্য হয়।

অভিষেকের ধুমধামে শিবাজীর রাজভাণ্ডার প্রায় খালি হইয়া গিয়াছিল। তাই তাঁহাকে আবার লুঠ করিতে বাহির হইতে হইল। ইহার ঠিক এক মাস পরেই, অর্থাৎ জুলাইএর মাঝামাঝি, এক দল মারাঠা অশ্বারোহী দূরে একটি স্থান আক্রমণ করিবে এরূপ ভাব দেখানতে, মুঘল সুবাদার বাহাদুর খাঁ পেড়গাঁওএ নিজ শিবির রাখিয়া সৈন্যসহ পঞ্চাশ মাইল দূরে উহাদের বাধা দিতে গেলেন। আর সেই অবসরে অপর এক দল সাত হাজার মারাঠা সৈন্য অন্যপথ দিয়া দ্রুত আসিয়া হঠাৎ আক্রমণ করিয়া পেড়গাঁওএর অরক্ষিত মুঘল শিবির অবাধে লুঠ করিয়া এক ক্রোর টাকা এবং দুই শত ভাল ভাল বাদশাহী ঘোড়া লইয়া শিবিরে আগুন ধরাইয়া দিয়া চম্পট দিল। শীতকাল আসিলে মারাঠারা কয়েক মাস ধরিয়া কোলী-দেশ, আওরঙ্গাবাদ, বগলানা ও খান্দেশ লুঠ করিয়া বেড়াইল; জানুয়ারি ১৬৭৫এর শেষে কোলাপুর হইতে সাড়ে সাত হাজার টাকা আদায় করিল। কিন্তু ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি মুঘলেরা কল্যাণ সহর পুড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

১৬৭৫ সালের মার্চ্চ হইতে যে এই কয়মাস ধরিয়া শিবাজী আবার মুঘল বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক এইরূপ ভাণ করিয়া সন্ধির আলোচনায় সুবাদার বাহাদুর খাঁকে ভুলাইয়া রাখিলেন, এবং সেই অবসরে

* সভাসদ বলেন, সিংহাসনে ৩২ মণ সোণা (দাম ১৪ লক্ষ টাকা) এবং বাছা বাছা হীরা ও মণি মুক্তা লাগিয়াছিল; অষ্ট প্রধানেরা প্রত্যেকে একলক্ষ হোণ (অর্থাৎ পাঁচলক্ষ টাকা) নগদ এবং হাতী ঘোড়া বস্ত্র অলঙ্কার বকশিশ পাইয়াছিলেন; গাগাভট্টকে "অপরিমিত দ্রব্য" দেওয়া হইল, ইত্যাদি।

কোলাপুর (মার্চ্চ) এবং বিখ্যাত ফোণ্ডা দুর্গ (জুলাই মাসে) অধিকার করিলেন। তাহার পর কার্য্য সিদ্ধি হওয়ায় বাহাদুর খাঁর দূতকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

রাগে, লজ্জায় বাহাদুর খাঁ শিবাজীকে জব্দ করিবার জন্য বিজাপুরের উজীর খাওয়াস্ খাঁর সহিত জোট করিলেন। কিন্তু ১১ই নবেম্বর বিজাপুরের আফঘান দল খাওয়াস্ খাঁকে বন্দী করিয়া রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব কাড়িয়া লইল; বাহাদুরের ইচ্ছা বিফল হইল।

১৬৭৬ সালের প্রথমেই শিবাজী বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়েন। সাতারায় তিন মাস চিকিৎসার পর, মার্চ্চের শেষে তিনি আরোগ্যলাভ করেন।

এ দিকে খাওয়াসের পতনের পর হইতেই বিজাপুরে আফঘান ও দক্ষিণী ওমরাদের মধ্যে ভীষণ গৃহ-বিবাদ বাধিল। বাহাদুর খাঁ নূতন উজীর আফঘান নেতা বহলোল খাঁকে আক্রমণ করিবার জন্য রওনা হইলেন (৩১এ মে ১৬৭৬)। অমনি বহলোল শিবাজীর সহিত সন্ধি করিলেন; তাহার সর্ত্ত হইল যে বিজাপুর সরকার শিবাজীকে নগদ তিন লক্ষ টাকা এবং প্রতি বৎসর এক লক্ষ হোণ (অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ টাকা) কর দিবে এবং তাঁহার জয় করা প্রদেশগুলিতে তাঁহার অধিকার মানিয়া লইবে; আর মুঘলেরা আক্রমণ করিলে শিবাজী নিজ সৈন্য দিয়া আদিল শাহী রাজ্য রক্ষা করিবেন। কিন্তু বিজাপুরে ঘরোয়া বিবাদ ও নিত্য পরিবর্ত্তনের মধ্যে এ সন্ধি বেশী দিন টিকিল না। তাহাতে শিবাজীর কোনই ক্ষতি হইল না। তিনি অন্যত্র এক বহু ধনশালী দেশে দিগ্বিজয় করিতে চলিলেন; তাহার নাম পূর্ব্ব কর্ণাটক, অর্থাৎ মাদ্রাজ অঞ্চল।

বিশ্বমোহিনী

[শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়]

জীবন-সেতারে মোর বাজে রোজ যে-গানের সুর
কে বুঝিবে তাহার রাগিণী ?
সে-গান আপনি জাগে সঞ্চারী, আভোগ, অন্তরায়,—
কোন্ তালে, খেয়াল রাখিনি !
অজানার চির-নীরবতা
গানে মোর শোনে রূপকথা !
চাঁদ দূরে আনমনে নীলিমায় মাখায় জ্যোছনা—
তখন মরমে সুধু জাগো তুমি মধুর-লোচনা !

* * *

প্রিয়া, সখি, বধূ, আলি ! থাকো কোন্ ঘুমন্ত জগতে-
জানাওনা তোমার ঠিকানা !
তবু আমি গান গাই বনবাসী কোকিলের মত,
মানিনাকো সুদূরের মানা।
মরু-বায়ু যথা চলে গেয়ে,
শ্রোতা কোথা, দেখনাকো চেয়ে ;—
দেশছাড়া শাঁখ যথা গাহে দূরে সাগরের গীতি ;—
অদৃশ্য ঈশ্বর তরে ভক্ত যথা গেয়ে যায় নিতি।

* * *

না-ছাখা নিটোল গালে পরাব বলিয়া সখী আমি
　　গাঁথি ব'সে গানের মালিকা ;—
কানন উচ্ছুসি ওঠে, প্রজাপতি দোলে বায়ু-কোলে,
　　খোঁজে কোথা কমল-কলিকা !
　　মোর গান স্বপনে শুনিয়া
　　পাপিয়াও ডাকে 'পিয়া পিয়া' !
তটিনীর ঘুম ভাঙে ;—চকিতে সে নিয়ে জল-বীণা,
আমার গানের সনে দেখে সুর রাখা যায় কি না !

*　　*　　*

নিঝুম রাতের সাথে গান মোর চলে অভিসারে,
　　খুঁজে দেখে তারকা-সভায়,
জলদপর্ব্বতচূড়ে, রহস্যের অনন্ত শয়নে,
　　কাম্যধন যদি মিলে যায় !
　　নিশা-শেষে জাগে যবে উষা,
　　চুমি' আসে শুভ্র তার ভূষা !
দুপুরে রাখাল-বাঁশী মেঠো তানে বাজে থাকি' থাকি',
রন্ধ্রে তার ঢুকে দেখে, ছন্দ হ'য়ে তুমি আছ নাকি !

*　　*　　*

আমি জানি মোর গীতি সমুদ্রের মুখে দেয় ভাষা
　　তোমারই নামগান তরে।
রাগিণীর রঙ ঢেলে গোলাপকে ক'রে তোলে রাঙা,
　　ঘেষো ফুলে মোহনীয় করে।
　　চাঁদ ছুঁয়ে আছে মোর গান
　　তোর নামে বাজে আলো-তান !
গিরির আঁধার কক্ষে এ-সঙ্গীত তোকে খোঁজে প্রিয়া,
সে সুর ঝরণা হ'য়ে পাথরেও বহায় দরিয়া।

*　　*　　*

গান মোর গিয়ে যদি ক্ষুদ্র কোন নারীর অধরে
　　দিয়ে আসে উত্তপ্ত চুম্বন,—
সে-চুম্বন তোমাকেই !—পূজি' যথা মৃন্ময়ী প্রতিমা
　　অনন্তকে করি আমন্ত্রণ।
　　আলিঙ্গন পাই যদি কার,
　　ভুলে ভাবি, তব বাহু-হার !
পলকে প্রমাদ ভাগে। দেখি আমি ধরার ধূলায় !
ওগো সখি, চিরসখি ! মায়া তোর এম্নি ভুলায়।

*　　*　　*

ক্ষুদ্রের মুঠায় বন্দী এ-সঙ্গীত অসীমাকে চাহে—
কূপে চাহে অনাহত আলো!
তুমি মোরে চাহো কি না, জানিবার কোন সাধ নাই—
ভালবাসি শুধু বাসি ভালো।
প্রিয়তমে, আমার এ গীতি,
নদীর মতন এর রীতি,—
যত যায়, তত গায়,—দিনে-রাতে হয়না অবোলা—
যত বাধা, তত কাঁদা,—সাধাসাধি পথ পেতে খোলা!

* * *

বিচিত্রবরণী গীতি ইন্দ্রধনু-তোরণ গড়িয়া
মুক্ত রাখে মেঘের ফটক.
আসিবে বলিয়া তুমি চরণের আল্‌তা-লেখায়
রচি' কত কাব্য ও নাটক!
ধরণীর সুরের আল্পনা
ক'রে তোর প্রেমের কল্পনা
বিশ্বের সাহিত্য হয়ে মানবের মন-পুরে বাঁচে,
চির-অন্বেষণা তার মরলোকে অমরতা যাচে।

* * *

তোমারে চেয়েছে ঋষি, সুরাসুর, নিখিল মানব,
হে মোহিনী, শত যুগে যুগে!
জীবন-সংগ্রাম ভুলে যত কবি করে তোর স্তব,
দুঃখে, তাপে আর শোকে ভুগে।
ওগো চির-সাধন-রতন,
তবু তুমি জানিনা কেমন!
এমন আলেয়া-স্বপ্নে কেন সখী মাতালে আমায়?
ধায় মন-ধূমকেতু, বল বল কে তারে থামায়?

* * *

না-জানি গেয়েছি কবে, সৃষ্টির সে আদিম প্রভাতে—
সুরু যবে জীব-অভিনয়!
এম্‌নি গাহিতে হবে, রুদ্র যবে নাচিবে তাণ্ডবে,
হবে যবে জীবনের লয়!
চিরন্তন মানব-সঙ্গীত,
পাবে কবে তোমার ইঙ্গিত?
বিশ্ব যবে নিঃস্ব মরু, মৃত্যুম্মুখ রাগিণী অবশ,
সে দিন কি গান মোর পাবে তোর অদ্ভুত পরশ?

গৌড়েশ্বর গণেশ*

[রায়সাহেব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব]
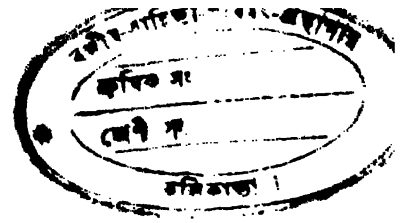
যে সময়ে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে মুসলমান প্রভাব, যে সময়ে সমস্ত গৌড়বঙ্গে অপ্রতিহত মুসলমান শাসন, রাজপুরুষগণ হিন্দুর প্রভাব ধ্বংস ও হিন্দুর যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিবার জন্য লোলুপদৃষ্টি করিতেছিলেন, দীর্ঘকাল মুসলমান-শাসনে হিন্দুগণ নিগৃহীত ও নিপীড়িত হইয়া মুসলমানদিগের মুখাপেক্ষী হইয়াছিল, যে সময়ে সম্ভ্রান্ত, নিষ্ঠাবান্, ধনশালী হিন্দুমাত্রেই মুসলমানের নিগ্রহ-ভয়ে সতত সন্ত্রস্ত ছিলেন, হিন্দুর সেই দুর্দ্দিনে একজন মহাপুরুষ হিন্দুসমাজ রক্ষার জন্য হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য মস্তকোত্তলন করিয়াছিলেন। হিন্দুকুল-তিলক ছত্রপতি শিবাজী যাহা করিতে পারেন নাই, হিন্দু-কুলগৌরব মহারাজ প্রতাপাদিত্য বা রাজা সীতারাম রায় যাহা করিতে পারেন নাই, রাজা গণেশ সেই অসাধ্যসাধন করিয়া গৌড়দেশে হিন্দুসমাজে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। যে মহাপুরুষ নিজ ভুজবলে অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রভাবের পরিচয় দিয়া মুসলমানের করাল কবল হইতে গৌড়রাজ্য অধিকার করিয়া স্বাধীন বাদশাহ্‌রূপে গৌড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, রিয়াজ-উস্-সলাতীন্, ফেরিস্তা, লাউরিয়া কৃষ্ণদাস-রচিত সংস্কৃত বাল্যলীলাসূত্রে ও ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশে সেই মহাবীর গণেশের রাজ্যাধিকারের কথা উল্লিখিত থাকিলেও এই মহাপুরুষের আভিজাত্য ও কুলশীলের পরিচয় উক্ত গ্রন্থসমূহে বিবৃত হয় নাই। কেবল-মাত্র নাম লক্ষ্য করিয়া নানা ব্যক্তির লেখনীতে নানা-প্রকার কবিকল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে।

রাজা গণেশ সম্বন্ধে যে সকল ভ্রান্ত মত প্রচলিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এখানে দুই একটীর উল্লেখ করিতেছি।

ভ্রান্ত মত

১। রিয়াজ-উস্-সলাতীন্ গ্রন্থে পারসী লেখার দোষে রাজা গণেশ 'কাঁস' বা 'কানিস' নামে পরিচিত হইয়াছেন। তাহা দেখিয়া কেহ কেহ রাজা গণেশ ও তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

২। রিয়াজ্ হইতে জানা যায়, রাজা গণেশ প্রথমতঃ ভাতুরিয়ার জমিদার ছিলেন। ভাতুরিয়া শব্দের উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ লিখিয়াছেন, ভাতুরিয়ার প্রকৃত নাম ভাদুড়িয়া বা চাক্‌লা ভাদুড়িয়া। তাঁহাদের মতে ভাদুড়ী-বংশীয় জমীদারের নাম হইতে ভাদুড়িয়া নাম হইয়াছে। এই ভাদুড়িয়া-মত-সমর্থক কেহ কেহ লিখিয়াছেন, ইলিয়াস্ শাহ্ যখন দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে গৌড়াধিপ বঙ্গের প্রধান প্রধান হিন্দু জমীদারদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তৎকালে উত্তরবঙ্গে কুলীন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-দিগের মধ্যে ভাদুড়ী ও সান্ন্যাল বংশ বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। সেই সময়ে শিকাই সান্ন্যাল ও সুবুদ্ধি ভাদুড়ী গৌড়েশ্বরের পক্ষে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিকাই সান্ন্যালের কনিষ্ঠ পুত্র সত্যবান্ ওরফে প্রিয়দেব এবং সুবুদ্ধি ও তাঁহার দুই ভ্রাতা ফৌজদার পদে সম্মানিত হইয়াছিলেন। ইলিয়াস্ বজ্র-যোগিনীর ফুলমতী নাম্নী এক ব্রাহ্মণকন্যাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফুলমতীর গর্ভে মৈজুদ্দীনের জন্ম। মৃত্যুকালে ইলিয়াস্ তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া যান। কিন্তু ইলিয়াসের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র গিয়াস্-উদ্দীন বহু সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সত্যবান্ সান্ন্যালের পুত্র কংসরাম মৈজুদ্দীনের অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কংসরাম সান্ন্যাল ও মধু খাঁ ভাদুড়ী মৈজুদ্দীনের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে গিয়াস্-উদ্দীন্ নিহত হন। কংসরাম অভিভাবকরূপে ৭ বৎসর কাল বঙ্গরাজ্য শাসন করেন। পরে মৈজুদ্দীন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কংসরাম রাজকীয় ক্ষমতা পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইলে মৈজুদ্দীন বিষপ্রয়োগে কংসরামকে বিনাশ করিয়া সেকেন্দর শাহ্ নামে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। পরে তিনি সান্ন্যালদিগের সাঁতোর জায়গীর বাজেয়াপ্ত করেন। সেকেন্দর শাহের পুত্র গিয়াস্-উদ্দীন বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণকে বিনাশ করিয়া সিংহাসনারোহণ করেন।

---

* এই প্রবন্ধটী প্রকাশ্যমান বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কাণ্ড, ৩য় খণ্ডের এক অধ্যায়।

ভাদুড়ীবংশের প্রতি তাঁহার বিশেষ সুদৃষ্টি ছিল। কিন্তু শেষে ভাদুড়ীদের ষড়যন্ত্রে তিনি নিহত হন। ভাদুড়ীরা তৎপুত্র সৈফ্-উদ্দীন্‌কে সিংহাসনে স্থাপিত করেন। সৈফ্-উদ্দীন রাজকার্য্য কিছুই দেখিতেন না, ভাদুড়ীরাই সর্ব্বে-সর্ব্বা হইয়া পড়িয়াছিলেন। সৈফ্-উদ্দীনের দুই পুত্র নসরিত ও আজিম। নসরিত বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভজাত আজিম আপনাকেই প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। ভাদুড়ীরা আজিমের পক্ষ ও মুসলমানেরা নসরিতের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সময়ে ভাদুড়ীবংশে গণেশনারায়ণ ও সান্ন্যালবংশে অবনীনাথ প্রধান ছিলেন। অবনীনাথের কন্যার সহিত গণেশের পুত্র যদুনারায়ণের বিবাহ হয়। নসরিত মুসলমান আমীর-গণের সাহায্যে দ্বিতীয় সামসুদ্দীন্ উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। আজিম সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হইয়া ভাদুড়ী ও সান্ন্যালগণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। গণেশ তাঁহাকে সাহায্য করিতে সম্মত হন। কিন্তু তিনি আসিয়া সসৈন্যে যোগদান করিবার পূর্ব্বেই নসরিত আসিয়া আজিমকে আক্রমণ করেন। সেই যুদ্ধে আজিম পরাজিত ও অবশেষে নিহত হন। এদিকে গণেশ দ্রুতবেগে গৌড়ে আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন নগর রক্ষা করিবার কেহ ছিল না। গণেশ সহজেই নগর দখল করিলেন। এদিকে বিজেতা নসরিতও গণেশের গৌড়াধিকারের সংবাদ পাইয়া দ্রুতবেগে গৌড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গণেশের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে নসরিত নিহত হইলেন। আজিমের আস্‌মান্‌তারা নামে এক কন্যা ছিলেন। তিনি স্ত্রীলোক বলিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করা হইল না। গণেশই বঙ্গের সিংহাসনে অভি-ষিক্ত হইলেন ও ৭ বৎসরকাল রাজত্ব করিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে যদু বাঙ্গলার রাজা হইলেন। তিনি আজিমের কন্যা আস্‌মান্‌তারাকে বিবাহ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপুত্র অনুপনারায়ণ ভাদুড়িয়া জমিদারীতে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।*

রাজা গণেশ সম্বন্ধে আরও অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কাহিনী অনেকে বিশ্বাস করেন বলিয়াই উপরে লিপিবদ্ধ হইল। উক্ত কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। ভাদুড়িয়া হইতে ভাতুরিয়া কিছুতেই হইতে পারে না। যে স্থান লইয়া প্রধানতঃ ভাতুরিয়া ধরা হয়, সেই বারেন্দ্র বা রাজশাহী অঞ্চলে কোথাও 'দ' স্থানে 'ত' উচ্চারিত হয় না।

সমসাময়িক ঘটনা লক্ষ্য করিলে এবং বারেন্দ্রব্রাহ্মণ-দিগের কুলপঞ্জিকা আলোচনা করিলে সহজেই মনে হইবে, —ভাতুরিয়ার রাজা গণেশ ও তাহিরপুরের রাজা কংস-নারায়ণ দুই জনে ভিন্ন ব্যক্তি। উত্তররাঢ়ীয় কুলগ্রন্থানুসারে রাজা গণেশ দত্তখান রাজা বল্লালসেনের সমসাময়িক মহেশ্বর দত্ত হইতে অধস্তন ৯ম পুরুষ এবং রাজা কংস-নারায়ণ বল্লালসেনের সমসাময়িক মৌনভট্ট হইতে অধস্তন ২১শ পুরুষ হইতেছেন। শিকাই সান্ন্যাল ও সুবুদ্ধি ভাদুড়ীকে ইলিয়াস্ শাহের সমসাময়িক এবং সত্যবান্‌কে শিকাই সান্ন্যালের পুত্র ও সত্যবানের প্রপৌত্র অবনী-নাথকে রাজা গণেশের পুত্র যদুর শ্বশুর বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ৺দুর্গাচন্দ্র সান্ন্যাল মহাশয় 'বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে' মনগড়া যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার কল্পনা-প্রসূত ভিন্ন আর কিছুই নহে। একান্ত দুঃখের বিষয় যে, কোন কোন ঐতিহাসিক মূল কুলগ্রন্থের অনুবর্ত্তী না হইয়া কল্পিত বিবরণের অনুসরণ করিয়াছেন। শিকাই সান্ন্যাল ইলিয়াস্ শাহের সমসাময়িক বটে এবং সত্যবান্ তাঁহার বংশধর হইলেও তাঁহার পুত্র নয়, তাঁহার অধস্তন ৫ম পুরুষ হইতেছেন। অর্থাৎ শিকাই সান্ন্যাল বল্লালসেনের সমসাময়িক লক্ষ্মীধর সান্ন্যালের ৯ম পুরুষ অধস্তন এবং সত্যবান্ ১৪শ পুরুষ অধস্তন হইতেছেন। এইরূপে সুবুদ্ধি ভাদুড়ী শিকাই সান্ন্যালের সমসাময়িক না হইয়া শিকাই সান্ন্যালের সমসাময়িক উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর ৯ম পুরুষ অধস্তন হইতেছেন অর্থাৎ বল্লালসেনের সম-সাময়িক ক্রতু ভাদুড়ী হইতে সুবুদ্ধি খাঁ ভাদুড়ী ১৮শ পুরুষ অধস্তন হইতেছেন।*

* দুর্গাচন্দ্র সান্ন্যালের বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস—এবং Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal by Nalinikanta Bhattasali, p. 81—86.

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিবরণ, ৩৮, ৪৯, ৬২, ৬৩ ও ৯৩ পাতায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।

তুলনায় আলোচনায় সুবিধা হইবে ভাবিয়া নিম্নে বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকা অনুসারে বংশলতা প্রদত্ত হইল—
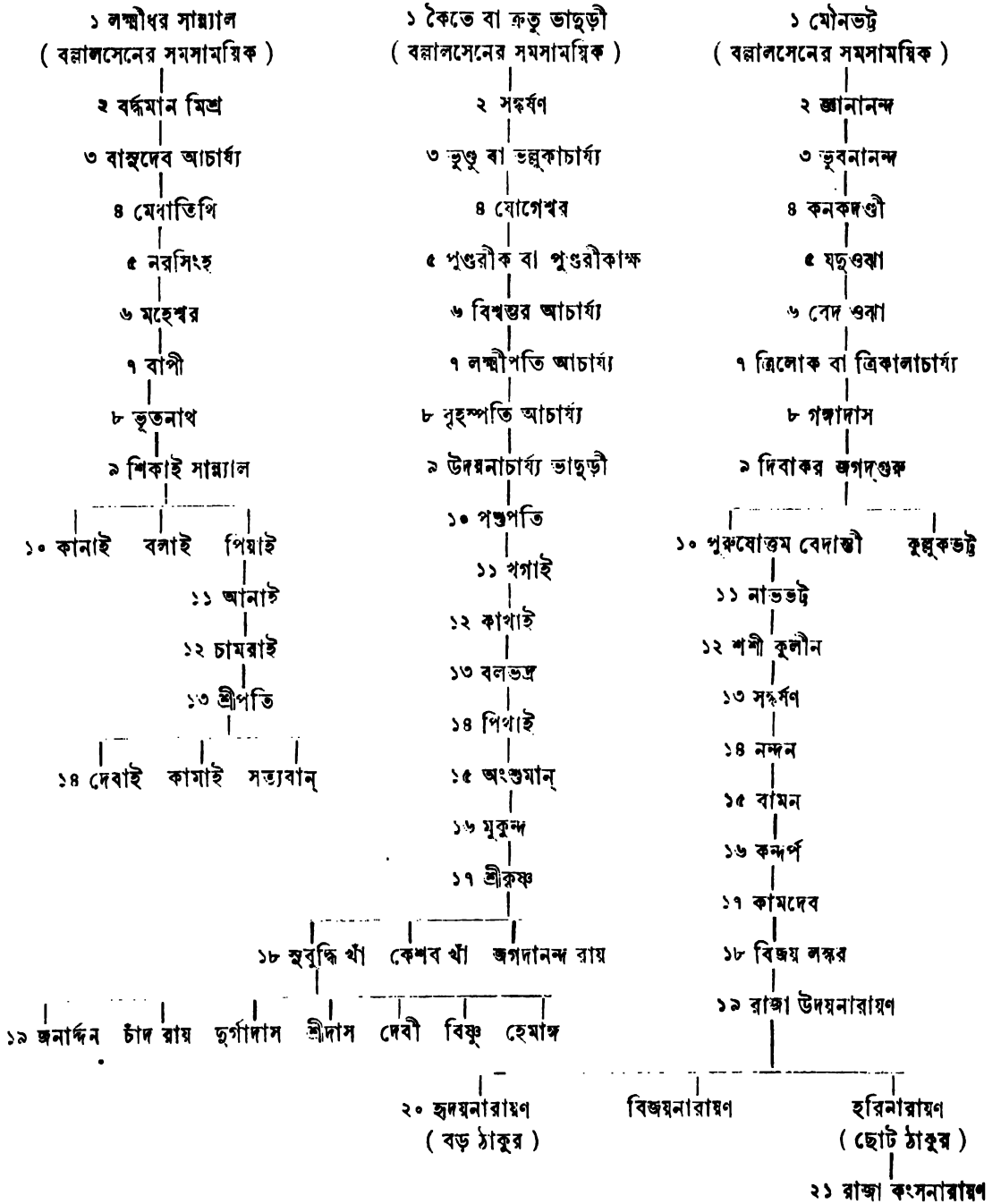
রাজা গণেশের প্রকৃত পরিচয়

রিয়াজ-উস্-সলাতিন হইতে জানা যায়, রাজা গণেশ সমস্ত ভাতুরিয়ার জমিদার ছিলেন। আইন্-ই-আক্‌বরীতে ভাতুরিয়া সরকার বাজুহার অন্তর্গত একটী পরগণা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু রেনেল্ সাহেবের প্রাচীন মানচিত্রে ভাতুরিয়া ভূভাগের যে সংস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান রাজসাহী বিভাগের অধিকাংশ স্থান বলিয়া মনে হয়। উক্ত মানচিত্র অনুসারে গঙ্গাতীরবর্ত্তী নদীয়া জেলার উত্তরাংশ হইতে মালদহ জেলার প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত ধরিয়া লইতে হয়, দিনাজপুর জেলা ইহার বাহিরে পড়ে। এ অবস্থায় ভাতুরিয়ার কোন স্থানে অথবা দিনাজপুরের কোন স্থানে গণেশের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহাই এখন বিবেচ্য। পূর্ব্বেই সদানন্দের কারিকা হইতে লিখিত হইয়াছে—

"রবি হৈল দত্ত-খান্। রণে গণে কীর্ত্তিমান্॥
সে পাইল গুয়া বাটা। তার হইল তিন বেটা॥
বিভাকর দত্ত-খান্। জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান্॥
প্রভাকর অনুজ তার। দিবাকর ছোট সভার॥
প্রভাকর উত্তরে গেলা। বহু ভূমি লাভ কৈলা॥
বাদশাহের দক্ষিণ হস্ত। অসি মসি উভয় দুরন্ত॥
সোম দত্ত তার সুত। তেজ ধরে অদ্‌ভূত॥
তার বেটা শিব নাম। অশ্বঘাটে কৈলা ধাম॥
তার পুত্র পুণ্যবান্। শ্রীগণেশ দত্ত খান্॥
রঘুপতি মল্লিকে কন্যা। বিভা দিয়া হৈল ধন্যা॥
নিজ তেজে গৌড়ের রাজা। সভে যারে কৈলা পূজা॥"

উদ্ধৃত কুলকারিকার প্রমাণে জানিতে পারিতেছি, রাজা গণেশের পূর্ব্বপুরুষ রবিদত্ত মুসলমান রাজসরকারে ফৌজদার বা সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইয়া 'খান্' উপাধি লাভ করেন এবং 'দত্তখান্' বলিয়া পরিচিত হন। রণক্ষেত্রে এবং নিজ সমাজে তিনি কীর্ত্তিমান্ হইয়াছিলেন। তজ্জন্য 'গুয়াবাটা' পাইয়াছিলেন অর্থাৎ সমাজপতিস্বরূপ সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যম পুত্র প্রভাকর দত্তখান্ গৌড়ের বাদশাহের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। যুদ্ধবিদ্যায় ও লেখনী-পরিচালনে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যে সময়ে ইলিয়াস্ শাহ্ দিল্লীশ্বরকে অমান্য করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন, তৎকালে প্রভাকর দত্ত তাঁহার দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ শাসনকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য উত্তরাঞ্চলে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই দিনাজপুর অঞ্চলে তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হয়। তাঁহার পুত্র সোমদত্ত ও পৌত্র শিবদত্ত উত্তরাঞ্চলে বহু স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়া অশ্বঘাটে বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। উত্তররাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে দিনাজপুর ও ঘোড়াঘাট অঞ্চল অশ্বঘাট নামে পরিচিত হইয়াছে। শিবদত্তের পুত্র হইতেছেন মহাবীর গণেশ দত্তখান্। প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থে ইনি 'রাজা গণেশ'নামে পরিচিত হইয়াছেন। এক্ষণে কুলকারিকার প্রমাণে বুঝিতেছি, রাজা গণেশের বৃদ্ধপ্রপিতামহ রবিদত্ত খানের সময় হইতেই তাঁহার সৌভাগ্যোদয়ের সহিত ভাতুরিয়া বা বর্ত্তমান বরেন্দ্রভূমির প্রধান স্থানগুলি ক্রমে ক্রমে তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। তিনি ভাতুরিয়ার জমিদার বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। পুরুষপরম্পরায় শক্তিসামর্থ্য ও সম্পত্তি বৃদ্ধির সহিত তিনি রাজদরবারে ও সমাজে রাজতুল্য সম্মানিত হইয়াছিলেন। রবিদত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিভাকর দত্তখান্ পৈতৃক অধিকারে অর্থাৎ ভাতুরিয়া জনপদে বাদশাহের প্রধান সামন্ত বা সেনাপতিরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারই অনুজ প্রভাকর দত্তখান্। ১৩৫২ খৃষ্টাব্দে সুলতান্ ইলিয়াস্ শাহ্ দিল্লীশ্বর ফিরোজশাহের প্রাধান্য অমান্য করিয়া সর্ব্ববঙ্গের একচ্ছত্র স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে প্রভাকর দত্তখাঁ তৎকর্ত্তৃক উত্তরবঙ্গে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কুলগ্রন্থে তিনি গৌড়ের বাদশাহের দক্ষিণহস্ত এবং অসি ও মসি উভয় কার্য্যে অগ্রগণ্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন; তৎকর্ত্তৃক উত্তরবঙ্গে বহু ভূমিলাভের কথারও উল্লেখ করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ প্রভাকর দত্তখান্ হইতেই দিনাজপুর অঞ্চলে হিন্দুরাজ্য-প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। তৎপুত্র সোমদত্ত অদ্ভুত তেজস্বী বলিয়া কুলগ্রন্থে উক্ত হইয়াছেন। পিতার ন্যায় সোমদত্তও তেজোবীর্য্যপ্রভাবে উত্তর-বরেন্দ্রভূমে স্বীয় বিষয়বৈভব ও প্রভুত্ব অক্ষুণ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সোমদত্তের পুত্র শিবদত্ত খান্ পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করিয়া অশ্বঘাটে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

শিবদত্ত খানের সময়ে গৌড়ের সিংহাসন লইয়া বহু যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়াছিল। তৎপূর্ব্বে ইলিয়াস্ শাহ্ সামসুদ্দীন

নাম গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ত্রিপুরারাজ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া রাজকর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি দত্তখানের উপর গৌড়ের শাসনভার অর্পণ করিয়া পশ্চিমে বারাণসী পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহাতে দিল্লীশ্বর ৩য় ফিরোজ শাহ্ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। সেই যুদ্ধে ইলিয়াসের পুত্র বন্দী হন, সম্রাট্ পাণ্ডুয়া অধিকার করেন। এই সময়ে সামসুদ্দীন পাণ্ডুয়া হইতে ১১ ক্রোশ দূরে একডালা নামক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে দত্তখানেরা সদলবলে আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কৌশলে দিল্লীশ্বর সন্ধি করিয়া দিল্লীতে প্রস্থান করেন। দিল্লীশ্বরের পক্ষীয় গৌড়ের মুসলমান আমীর ওমরাহ্গণ অনেকে ইলিয়াসের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন। কিন্তু দত্তখান্দিগের প্রভাবে তাঁহারা বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। এমন কি, তাঁহাদের চেষ্টায় ও শাসন-কর্ত্তৃত্বপ্রভাবে ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর বাঙ্গালার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময়ে গৌড়েশ্বর মালদহের নিকটবর্ত্তী পাণ্ডুয়া নগরে নূতন রাজধানী পত্তন করিয়াছিলেন। উত্তর বিহারে গণ্ডকনদ পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। ৭৬০ হিজরীতে বা ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেকন্দর শাহ্ উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক পাণ্ডুয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। এই সময়ে দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ্ আবার বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। সেকন্দর শাহ্ একডালা দুর্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। অবশেষে কয়েকটী হস্তী ও কিছু উপঢৌকন দিয়া দিল্লীশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়া ফিরাইয়া দেন। সেকেন্দরের দুইটী বেগম ছিল। একের গর্ভে গিয়াসুদ্দীন্ ও অপরের গর্ভে ১৬টী সন্তান জন্মে। গিয়াসুদ্দীন্ বিমাতার চক্রান্তে প্রাণ হারাইবার আশঙ্কা করিয়া সুবর্ণগ্রামে পলাইয়া যান। তথায় তিনি দলবল সংগ্রহ করিয়া রাজবিদ্রোহী হইলেন। এখানে হিন্দু জমিদারগণের সাহায্যে তিনি স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। সেকন্দর শাহ্ তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হন। পিতাপুত্রে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সেকন্দর গুরুতররূপে আহত হন, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। গিয়াসুদ্দীন রাজা হইয়া আপনার রাজপদ নিরাপদ করিবার জন্য বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণকে অন্ধ করেন।

পূর্ব্বোদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে, দিল্লীশ্বরের সহিত বিরোধ, মুসলমান আমীর ওম্রাহ্গণের বিরুদ্ধাচরণ, পিতাপুত্রে অসদ্ভাব এবং ভ্রাতৃগণ মধ্যে পরস্পর জিঘাংসা গৌড়ের সুলতানদিগকে অস্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। পূর্ব্বে যে হিন্দু জমিদারদিগকে মুসলমান নৃপতিগণ সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন, ঘটনাচক্রে মুসলমান গৌড়াধিপ তাঁহাদেরই নিকট সাহায্য আশা করিয়াছিলেন। গৌড়েশ্বরের অনুকূলদৃষ্টি পতিত হইবার কারণ, হিন্দু জমিদারগণ স্ব স্ব শক্তি ও সম্পদ্ বৃদ্ধির সহিত অর্দ্ধস্বাধীন নৃপতিরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। এই সুযোগে দত্তখানেরা যেরূপ পদমর্য্যাদা ও শক্তি-সঞ্চয় করিয়াছিলেন, পূর্ব্বেই তাহার আভাস দিয়াছি। শিব দত্তখানের পুত্র হইতেছেন প্রবল-প্রতাপান্বিত রাজা গণেশ দত্তখান্। শিবদত্ত অশ্বঘাট বা দিনাজপুরে রাজধানী করিয়াছিলেন। এই দিনাজপুর অঞ্চলেই রাজা গণেশের বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি বাল্যকাল হইতেই মুসলমান সুলতানদিগের গৃহবিবাদ ও শাসনবৈলক্ষণ্যহেতু পদে পদে বলক্ষয় দর্শন করিয়া আসিতেছিলেন। পিতৃপুরুষগণের অনুবর্ত্তী হইয়া রণনীতির সহিত উপযুক্ত শাসননীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। উপযুক্ত মৌলবীগণের নিকট মুসলমানী প্রধান প্রধান গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের নিকট হইতেও সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পিতামহ প্রভৃতি সকলেই দরবারী ছিলেন, তাঁহাদের নিকট গণেশ দরবারের আদবকায়দা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি মুসলমানী শিক্ষায় ও আদবকায়দায় এরূপ অভ্যস্ত হইয়াছিলেন যে, মুসলমান রাজপুরুষগণ তাঁহাকে আপনাদের লোক বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। হিন্দু মুসলমান সকলেরই তিনি প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। সময়োপযোগী বাহ্যাড়ম্বরে সকলকে মুগ্ধ করিলেও অন্তরে অন্তরে তিনি একজন নিষ্ঠাবান্ হরিভক্ত ছিলেন। মুসলমানেরা হিন্দু সমাজের প্রতি কিরূপ অত্যাচার করিয়া আসিতেছে, মুসলমানপ্রধান স্থানে হিন্দুগণ কিরূপ সশঙ্কিতভাবে কালযাপন করিতেছে, পদমর্য্যাদার খাতিরে বা স্বকার্য্যসিদ্ধির জন্য গৌড়ের

সুলতান বা মুসলমান রাজপুরুষগণ কয়েকজন হিন্দু জমিদারকে অথবা তাঁহাদের কয়েকজন হিন্দু রাজ-কর্ম্মচারীকে প্রকাশ্যে আদর বা সম্মান প্রদর্শন করিলেও মনে মনে যে তাঁহারা সকলেই হিন্দুগণকে হীনভাবে দেখিয়া থাকেন ও 'কাফের' বলিয়া ঘৃণা করেন, তাহা গণেশ বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। কিসে আবার হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, হিন্দুগণ স্বাধীনতার বিমল আনন্দ আবার কবে উপভোগ করিবে, যৌবনারম্ভ হইতেই সেদিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনি পিতৃ-পুরুষার্জ্জিত শক্তি-সামর্থ্য ও বিত্ত লইয়া ধীরে ধীরে স্বরাজ্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি জানিতেন, যে গৌড়বঙ্গ দ্বিশতাধিক বর্ষ মুসলমান অধিকারভুক্ত রহিয়াছে, মুসলমানের করাল কবল হইতে তাহা সহসা উদ্ধার করা সহজসাধ্য নহে। এজন্য তিনি মুসলমান গৌড়েশ্বর ও রাজ-পুরুষগণের সহিত মিলিত হইয়া ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন। গিয়াসুদ্দীন্ আজম শাহ্ যখন পূর্ব্ব-বঙ্গে গিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন, তৎকালে তিনি রাজা গণেশের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর গিয়াসুদ্দীন্ গৌড়ের অধীশ্বর হইয়া রাজা গণেশকে আপনার প্রধান মন্ত্রিত্ব ও সেনাপতিত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। গিয়াসুদ্দীন্ নিজে সুকবি ও পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তিনি গণেশের শৌর্য্যবীর্য্য ও রাজনীতিতে মুগ্ধ হইয়াই একপ্রকার রাজ্যভার তাঁহার হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। গণেশও গুণজ্ঞ ও রসজ্ঞ সুলতানের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু যখন সুলতান স্বার্থ-রক্ষার জন্য একে একে ষোলটী ভ্রাতার চক্ষু উৎপাটন করিলেন, সেই অমানুষিক নৃশংস কার্য্যের জন্য রাজা গণেশ মনে মনে বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন। অন্ধ ভ্রাতৃগণ ও তাঁহাদের অন্তরঙ্গ আত্মীয়স্বজনবর্গ গিয়াসুদ্দীনের প্রবল শত্রু হইয়া পড়িলেন এবং সকলেই এরূপ পাপিষ্ঠকে সিংহাসন হইতে সরাইবার জন্য রাজা গণেশকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। গিয়াসুদ্দীনের পুত্র সৈফুদ্দীনও রাজ্যলোভে এই ষড়্‌যন্ত্রে যোগদান করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরেই গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। কোন কোন মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন, দিনাজপুরের রাজা গণেশের হস্তে গিয়াসুদ্দীন্ নিহত হন। গৌড়ের বাদশাহ্‌কে মারিয়া রাজা গণেশের রাজ্যগ্রহণ সম্বন্ধে লাউরিয়া কৃষ্ণদাসের বাল্যলীলাসূত্র ও ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত আভাস পাওয়া যায়।

লাউরিয়া কৃষ্ণদাস-রচিত বাল্যলীলাসূত্রে লিখিত আছে—

"শ্রীমান্ নৃসিংহস্য মহাত্মনো বৈ
যশঃপ্রসূনে স্ফুটিতে মনোজ্ঞে।
তৎসৌরভব্যূহবিমোহিতাত্মা
রাজা গণেশো বহুশাস্ত্রদর্শী ॥ ৪৮
সদ্বংশশৈলে * দ্বিজরাজকল্পো
বেদজ্ঞ সদ্বিপ্রসমাশ্রয়ো যঃ।
দুষ্টস্য শাস্তা কিল সাধুপালো
দাতা গুণজ্ঞো হরিভক্তচূড়ঃ ॥ ৪৯
দূতৈস্তমানীয় চ রাজধান্যাং
দিনজপুরাখ্যে বহুসভ্যযুক্তে।
তস্মিন্ নৃসিংহে বহুনীত্যভিজ্ঞে
সংন্যস্য মন্ত্রিত্বমবাপ ভদ্রম্ ॥ ৫০
তদ্যুক্তিচাতুর্য্যবলেন রাজা
শ্রীমদ্গণেশো বরদস্যুরূপান্।
গৌড়স্য পালান্ যবনাত্মজান্ হি
জিত্বা চ গৌড়েশ্বরতামবাপ ॥ ৫১
গ্রহপক্ষাক্ষিশশপ্রমিতে শাকে সুবুদ্ধিমান্।
গণেশো যবনং জিত্বা গৌড়ৈকচ্ছত্রধৃগভূৎ ॥ ৫২ †"

অর্থাৎ মহাত্মা নৃসিংহের প্রস্ফুটিত যশঃপ্রসূনসৌরভ-গুণে বহুশাস্ত্রদর্শী রাজা গণেশ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সেই রাজা সদ্বংশশৈলের দ্বিজরাজ অর্থাৎ চন্দ্রের সমান ছিলেন। তিনি বেদজ্ঞ ও সদ্বিপ্রগণের আশ্রয়, দুষ্টের শাস্তা, সাধুজন-পালক, দাতা, গুণজ্ঞ ও হরিভক্তগণের চূড়ামণি ছিলেন। তিনি বহুনীতিজ্ঞ নৃসিংহের নিকট দূত পাঠাইয়া বহুসভ্যযুক্ত দিনাজপুর নামক রাজধানীতে আনাইয়া তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই নৃসিংহের যুক্তি-চাতুর্য্যবলে তিনি গৌড়ের মুসলমান রাজগণকে জয় করিয়া গৌড়েশ্বর হইয়াছিলেন। সুবুদ্ধিমান্ গণেশ ৩২৯ শকে যবনকে জয় করিয়া গৌড়ের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়াছিলেন।

* "কায়স্থশৈলে" এইরূপ পাঠ প্রভাতচন্দ্র সেনের বগুড়ার ইতিহাসে মুদ্রিত হইয়াছে।

† শ্রীবাল্যলীলা সূত্র, ১ম সর্গ, শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি সম্পাদিত, ১১পৃষ্ঠা।

ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে, —

"যেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাত।
সিদ্ধশ্রোত্রিয়াখ্য আরু ওঝার বংশজাত॥
যেই নরসিংহ যশ ঘোষে ত্রিভুবন।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ॥
যাঁহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়ের বাদশাহ মারি গৌড়ের হৈল রাজা॥
যাঁর কন্যা বিবাহে হয় কাপের উৎপত্তি।
লাউর প্রদেশে হয় যাঁহার বসতি॥"

উপরোক্ত দুই প্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণে নরসিংহ নাড়িয়ালের সময়ে ১৩২৯ শকে বা ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে রাজা গণেশ কর্ত্তৃক গৌড়াধিকারের প্রসঙ্গ পাওয়া যাইতেছে।

বাল্যলীলাসূত্রে ১৩২৯ শক বা ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে রাজা গণেশের সমস্ত গৌড়বঙ্গের একচ্ছত্র অধিপতি হইবার কথা বর্ণিত হইলেও মুসলমান গৌড়াধিপগণের মুদ্রা হইতে জানা যায়, ৮১২ হিজরী বা ১৪০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গিয়াসুদ্দীন্ আজম শাহ্ জীবিত ছিলেন। তৎপরবর্ষের মুদ্রা আলোচনা করিলে মনে হয়, গিয়াসুদ্দীন্ আজম শাহের পর তৎপুত্র সৈফ্উদ্দীন্ হামজা শাহ্, তৎপরে সিহাবুদ্দীন্ বয়াজিদ্ শাহ্ এবং অবশেষে তৎপুত্র আলাউদ্দীন্ ফিরোজ শাহ্ রাজা হইয়াছিলেন।

রিয়াজ-উস্-সলাতীনে লিখিত হইয়াছে, রাজা গণেশের কৌশলে গিয়াসুদ্দীন্ আজম শাহ্ নিহত হইলে তিনি রাজ্যের এক প্রকার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমাদের মনে হয়, যদিও আজম শাহ্ ও তাঁহার বংশধরগণের নাম মুসলমান মুদ্রায় পাওয়া যাইতেছে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা রাজা গণেশের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র ছিলেন। আজম শাহের মুদ্রা হইতে জানিতে পারি, তিনি ৭৯৫ হইতে ৮১৩ হিজরী পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৩৯২ হইতে ১৪১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সপ্তদশবর্ষের উপর (নামমাত্র) রাজত্ব করিয়াছেন। এরূপস্থলে মনে হয় ১৩৯২ হইতে আজম শাহের রাজ্যাভিষেকের সহিত রাজা গণেশের অভ্যুদয় ও পরাক্রম বিস্তৃত হইয়াছিল।

মুসলমান ইতিহাস ও সুলতানগণের মুদ্রা হইতে ৮১৭ হিজরীতে ফিরোজ শাহের অভিষেক ও পতনের সংবাদ পাওয়া যায়। সুতরাং এ সময়ে প্রকৃত প্রস্তাবে রাজা গণেশ গৌড়বঙ্গের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেও নিজে মুসলমান-শাসিত পাণ্ডুয়ায় অভিষিক্ত হন নাই।

দিনাজপুরের কোন্ স্থানে রাজা গণেশের অভ্যুদয় হইয়াছিল এবং তাঁহার কোন স্মৃতিচিহ্ন আছে কি না তাহাই প্রথমতঃ আলোচ্য। দিনাজপুর জেলায় রাইগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল উত্তরে মহেশ নামক একটী ক্ষুদ্রগ্রামে বহুদিনের পুরাতন একটী মস্‌জিদ্ দৃষ্ট হয়। এই মস্‌জিদ্‌টী স্বচক্ষে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। মস্‌জিদের পীর সাহেবের সহিত আলাপ হয়। পীর সাহেব দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন, এই মসজিদের অদূরে ক্ষত্রিয়-রাজ গণেশের বাড়ী ছিল; বাস্তবিকই এখানে বিশাল ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। তন্মধ্যে শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত প্রস্তরখণ্ডেরও অভাব নাই। সেই ভগ্ন প্রস্তরখণ্ডগুলি রাজা গণেশের প্রাচীন রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ। মহেশ-গ্রামের মস্‌জিদ্‌টী জলাল্-উদ্দীনের নির্ম্মিত। রাজা গণেশের পুত্র যদু মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জলাল্-উদ্দীন্ নাম গ্রহণ করিয়া এই মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বে এখানে প্রস্তরময় একটী হিন্দুদেবালয় ছিল। সেই হিন্দুমন্দির ভাঙ্গিয়া তাহারই উপর এই মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছে। মস্‌জিদের প্রবেশ-দ্বারে মাথার উপর একটী বাসুদেব মূর্ত্তি, মন্দিরের আশ-পাশ চারিদিকেই হিন্দুস্থাপত্যের নিদর্শন ও মধ্যে মধ্যে দেওয়ালের গায়ে উল্টাভাবে নানা হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে।

এই প্রাচীন গ্রামের যেখানে অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, তাহারই অনতিদূরে অর্দ্ধ মাইলের মধ্যে 'গণেশপুর' নামক গ্রাম রাজা গণেশের নাম ঘোষণা করিতেছে। গণেশপুর হইতে মালদহ জেলায় বর্ত্তমান পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত বরাবর একটী পুরাতন রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। গণেশপুর হইতে ২ মাইলের মধ্যেই ব্রাহ্মণগাঁও। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, উক্ত গ্রামে রাজা গণেশের ব্রাহ্মণসচিব ও পুরোহিতগণ বাস করিতেন। এই গ্রামের মধ্য দিয়া পুরাতন পাণ্ডুয়ার সড়ক গিয়াছে। বলা বাহুল্য, রাজা গণেশের প্রাধান্যকালে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী গৌড়ের সুলতানগণ পাণ্ডুয়া নগরেই রাজধানী করিয়াছিলেন। রাজকার্য্যোপলক্ষে রাজা গণেশ গণেশপুর হইতে এই পুরাতন রাস্তা

দিয়াই পাণ্ডুয়ায় যাতায়াত করিতেন। রাজা গণেশের রাজকীয় কার্য্যের সুবিধার জন্য সম্ভবতঃ তিনি গণেশপুর হইতে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত তাঁহার গমনাগমনের উপযোগী পথ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

রাজা গণেশ গৌড়েশ্বর হইয়া কেবল হিন্দুস্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না। তাঁহার অভ্যুদয়ের সহিত আবার হিন্দুমন্দিরসমূহ শঙ্খঘণ্টানিনাদিত, দেবস্তোত্রমুখরিত ও বেদধ্বনিবিঘোষিত হইল—সমস্ত ব্রাহ্মণসমাজ তাহাতে উল্লাসিত হইয়া উঠিলেন। হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়াছিলেন। অপর সমাজের ত কথাই নাই, ব্রাহ্মণসমাজেও এই সময় মুসলমান-নিগ্রহে সামাজিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণসমাজের নেতৃগণ এই সময়ে সমাজরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা ও আভিজাত্যরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য রাজা শ্রীগণেশ-দত্ত খানের সভাস্থ হইয়াছিলেন, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থে সেই সময়ের কথা বিবৃত হইয়াছে।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবিবরণ প্রসঙ্গে পূর্ব্বে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি, এখানে তাহা সাধারণের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিতেছি :—

"দীর্ঘকাল মুসলমান শাসনে থাকিয়া গৌড়বাসী এই গণেশ নৃপতির সময়ে কিছুদিনের জন্য স্বাধীনতার উজ্জ্বল মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। এই সুদিনে গৌড়ের ব্রাহ্মণ-সমাজও সমাজ-সংস্কারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। এই শুভ অবসরে স্মার্ত্তপ্রবর কুল্লূকভট্ট ও সমাজ-তত্ত্ববিৎ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী আসিয়া মিলিত হইলেন। বহুদিন হইতেই এখানকার নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণগণ সেনবংশের অভ্যুদয় কাল হইতে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য রক্ষায় উদ্যোগী ছিলেন, কিন্তু বিধর্ম্মী মুসলমানের শাসন ও বৌদ্ধাচারের প্রবল বন্যায় তাঁহাদের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে নাই। এখন হিন্দু-রাজের অধিকারে ও ব্রাহ্মণমন্ত্রীর শাসন-সুযোগে তাঁহারা সকলে মস্তকোত্তোলন করিলেন। এই স্থানীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ-সংস্কার ব্যাপারে উদয়নাচার্য্য ও কুল্লূকভট্ট অগ্রণী হইয়াছিলেন। এক ব্যক্তি বল্লাল-পূজিত শ্রেষ্ঠ কুলীন সন্তান ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত, বৌদ্ধ পরাজয় করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, অপর ব্যক্তি (মনুসংহিতার টীকাকার) অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত। বলিতে কি, কুল্লূকের মত স্মৃতিশাস্ত্রবিৎ তৎকালে গৌড়মণ্ডলে কেহই ছিলেন না। হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠাতা ও হিন্দুধর্ম্মানুরাগী রাজা গণেশের সভায় তাঁহারা যে সর্ব্বপ্রধান সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ অসাধারণ প্রতিপত্তিবশতঃই, সমাজে তাঁহারা যে ব্যবস্থা চালাইয়া ছিলেন, তাহা সকলেই অবনতশিরে বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বলিতে কি, বৌদ্ধাচার-বিপ্লাবিত ও মুসলমান-শাসিত বারেন্দ্র সমাজে এই সময়েই বৈদিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের সমন্বয়ে নবীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইল।"*

রাজা গণেশের সভায় সম্মানিত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-কুল-তিলকগণের চেষ্টায় যেরূপ সমাজ-সংস্কারের আয়োজন হইয়াছিল, এক্ষণে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থ হইতেও জানিতেছি, রাজা দত্তখানের সভাতেও কুলমর্য্যাদা রক্ষার জন্য রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ সেইরূপ সমবেত হইয়াছিলেন। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশে লিখিত আছে—

"স্ববংশভূপালকুমারকাভ্যাং যোগ্যো বিবদঃ প্রতিপত্তিকারি।
শ্রীদত্তখানস্য সভাসু পূর্ব্বং কিনালকুণ্ডং ঘট্টকাঃ সমু চুঃ॥"

৫৭ সমীকরণ বর্ণনাপ্রসঙ্গে ধ্রুবানন্দ মিশ্র উক্ত কারিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত সমীকরণ প্রসঙ্গে ধ্রুবানন্দ মিশ্র এইরূপ কারিকা দিয়াছেন,—

"কাহ্নায়িমিশ্রশ্রীমন্তৌ নরসিংহবশিষ্ঠকৌ।
পীতাম্বরো ধনপতিঃ সর্ব্বানন্দস্তিলো সমাঃ।"

চট্টবংশীয় কানাই মিশ্র, শ্রীমান্, নরসিংহ ও বশিষ্ঠ এই চারিজন এবং বন্দ্যবংশীয় পীতাম্বর, চট্টবংশীয় ধনপতি, বন্দ্যবংশীয় সর্ব্বানন্দ এবং চট্টবংশীয় তিলাই এই আটজন সমান কুলীন বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন।'

দেবীবর-কৃত মেলপর্য্যায় গণনার টিপ্পনীতে লিখিত আছে,—

"গৌণৈঃ সহ গৌণানাং পরীবর্ত্তবিধানং
কদাচিন্মুখ্যে তনয়াপ্রদানাং অতঃ
শ্রীদত্তখানেন রাজ্ঞা শ্রোত্রিয়াণাং
সধর্ম্মত্বেন গৌণা অপি শ্রোত্রিয়াঃ কৃতাঃ॥"

'গৌণকুলীনের সহিত গৌণদিগের পরিবর্ত্ত চলিতেছিল, কখন মুখ্যের সহিতও আদান প্রদান হইতেছিল; কিন্তু

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রাজা শ্রীদত্ত খান্ শ্রোত্রিয়ের সধর্ম্মহেতু গৌণদিগকেও শ্রোত্রিয় করিলেন।'

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকাণ্ড প্রকাশকালে হস্তলিখিত পুঁথির বিকৃত পাঠ অনুসারে 'দত্তখান' স্থলে 'দত্তগাস' নাম ছাপা হইয়াছিল এবং তাঁহাকে আমি জাতিমালা-কাছারীর বিচারপতি মনে করিয়াছিলাম। উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ এবং ধ্রুবানন্দের মহাবংশ-মুদ্রণকালেও এই ভ্রম থাকিয়া যায়। মহাবংশের মুদ্রণকার্য্য শেষ হইলে গোপালশর্ম্মা রচিত একখানি মহাবংশটীকা হস্তগত হয়। এই টীকার রচনাকাল ১৬৭১ শক, নকলের তারিখ ১৬৮১ শক। মহাবংশ-মুদ্রণকালে এই টীকার সাহায্য পাই নাই। পীরালী-সমাজের ইতিহাস লিখিবার সময় এই টীকাখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিবার আবশ্যক হয়। এই সময়ে উক্ত টীকার মধ্যে "গৌড়ৈকচ্ছত্রী শ্রীদত্তখানস্য" এইরূপ পাঠ দৃষ্টিগোচর হয়। বলাবাহুল্য রাজা গণেশ ভিন্ন তৎকালে আর কেহ গৌড়ের একচ্ছত্র অধিপতি হইতে পারেন নাই। এজন্য রাঢ়ীয়ব্রাহ্মণ কুলগ্রন্থের রাজা শ্রীদত্তখান এবং রাজা গণেশ অভিন্ন ব্যক্তি হইতেছেন। তুলনায় আলোচনা করিবার সুবিধার জন্য পর পৃষ্ঠায় রাজা গণেশের বংশলতা ও রাজা শ্রীদত্তখানের সভায় সম্মানিত কুলীনগণের বংশলতা প্রদত্ত হইল।

এই সকল বংশলতা আলোচনা করিলে দেখা যায়, রাজা বল্লালসেনের সময় হইতে রাজা গণেশের সময় পর্য্যন্ত ৯।১০ পুরুষ অতীত হইয়াছিল। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলগ্রন্থে রাজা শ্রীদত্তখানের নাম থাকিলেও রাজা গণেশের নাই বা তাঁহার সময় যে সকল মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতেও রাজা গণেশের নাম নাই। সম্ভবতঃ ঐরূপ কোন কারণে যে কৌলিক উপাধিতে তিনি হিন্দুসমাজে পরিচিত ছিলেন, সেই উপাধিই কুলজ্ঞগণ ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সমাজের সমাজ-সংস্কারের ইতিহাস আলোচনা করিলে মনে হয়, গৌড়াধিপ বল্লালসেনের ন্যায় গৌড়েশ্বর গণেশ দত্তখানও হিন্দুধর্ম্মে নিষ্ঠা, দেবদ্বিজে ভক্তি, অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও অদ্বিতীয় বাগ্মিতাগুণে হিন্দুসমাজে অসাধারণ প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার এবং সাধারণের ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি যেমন ব্রাহ্মণ-সমাজকে সম্মানিত করিয়াছিলেন, সেই রূপ নিজ সমাজের কুলীনগণের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া কুলগৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। নিজ কুলগৌরব বর্দ্ধনাশায় তিনি পাঁচথুপীর রাজা নরপতি ঘোষের পৌত্র কুলীনপ্রবর রঘুপতি মল্লিককে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন।*

মুসলমান ইতিহাস রিয়াজ্ গ্রন্থে লিখিত আছে, তাঁহার অসাধারণ প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য মুসলমানেরা ঈর্ষাপরবশ হইয়া পীর নূর কুতব-আলমের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পীর সাহেবের আহ্বানে জৌনপুরের মুসলমান নৃপতি সুলতান ইব্রাহিম শাহ্ সসৈন্যে আসিয়া গৌড় আক্রমণ করেন। বলিতে কি, এ সময়ে সকল স্থানের মুসলমানই রাজা গণেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। জয়লাভের সম্ভাবনা অল্প ভাবিয়া রাজা গণেশ প্রিয়পুত্র যদুকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া সরিয়া দাঁড়ান। পীর সাহেব নূরকুতব-আলমের পরামর্শে যদু মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। পরে পীর সাহেব গিয়া জৌনপুরের সুলতানকে বুঝাইয়া দেন, স্বধর্ম্মীর সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত নহে। পীর সাহেবের আদেশে জৌনপুর-নৃপতি সসৈন্যে ফিরিয়া যান। গৌড়রাজ্য নিরাপদ হইলে রাজা গণেশ প্রিয় পুত্র যদুকে আবার হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া নিজে রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

গণেশপুত্র যদু ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করায় ব্রাহ্মণ-সমাজে বেশ চাঞ্চল্য হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে আপৎকালে কেহ যদি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে, ইচ্ছা করিলে পুনরায় সে নিজ ধর্ম্মে আসিতে পারে, এ বিশ্বাস রাজা গণেশের ছিল। উদয়নাচার্য্য, কুল্লূকভট্ট প্রভৃতি তাঁহার সভাপণ্ডিতগণ এ বিষয়ে অনুমোদন করিয়া থাকিবেন, সন্দেহ নাই। হিন্দুরাজ্য-প্রতিষ্ঠার সহিত ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত ভূতপূর্ব্ব হিন্দুসন্তানদিগকে আবার হিন্দু করিতে পারিলে হিন্দুসমাজের শক্তিবৃদ্ধি এবং হিন্দু স্বরাজ্য স্থাপনের সুবিধা হইবে, তাহা মহামতি রাজা গণেশ বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। ৮১৯ হিজরা বা ১৪১৬ খৃষ্টাব্দে যদুকে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ এবং রাজা গণেশের পুনরায় সিংহাসন গ্রহণের কথা লিখিত আছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রাজা গণেশ নিজ নামে মুদ্রা চালাইয়া

* উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ড—২য় খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রাজা গণেশ ও তৎসাময়িক ব্রাহ্মণ প্রবরগণের এবং তৎতৎ পূর্ব্বপুরুষগণের নাম

১ মহেশ্বর (বল্লাল কর্ত্তৃক নিহত)

উবারু দত্ত
কুলপতি
কবিদত্ত
রবিদত্ত খান্
বিভাকর, প্রভাকর, দিবাকর, দত্তখান্ (ভ্রাতা)
প্রভাকর → সোমদত্ত খান্
শিবদত্ত খান্
গণেশদত্ত খান্
যদুনাথ (জিৎমল)

ভাস্কর বেদান্তী (বল্লালের সমসাময়িক)

সায়নাচার্য্য
আরু ওঝা নাড়িয়াল
যদুপণ্ডিত
শ্রীপতি
কুলপতি
ঈশান
বিভাকর
প্রভাকর
নরসিংহ নাড়িয়াল

কৈতে বা ক্রতু ভাদুড়ী (বল্লালের সমসাময়িক)

সঙ্কর্ষণ
ভৃগু বা ভল্লুকাচার্য্য
যোগেশ্বর
পুণ্ডরীক বা পুণ্ডরীকাক্ষ
বিশ্বম্ভর আচার্য্য
লক্ষ্মীপতি আচার্য্য
বৃহস্পতি আচার্য্য
উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী

মৌন বা মনুভট্ট নন্দনাবাসী (বল্লালের সমসাময়িক)

জ্ঞানানন্দ
ভুবনানন্দ কনকদণ্ডী
যদু ওঝা
বেদ ওঝা
ত্রিলোক বা ত্রিকালাচার্য্য
গঙ্গাদাস
দিবাকর জগদ্গুরু
কুল্লূক ভট্ট

মহাদেব বন্দ্য (বল্লালের সমসাময়িক)

মকরন্দ
দাশরথি (কাটাদিয়া)
বনমালী
বনমালীর পুত্র: ভীম, ভব
ভীম → মাধব → আদিত্য → পীতাম্বর
ভব → জিয়ো → দিগম্বর → সর্ব্বানন্দ

কাশ্যপগোত্র শ্রীকর চট্ট (বল্লালের সমসাময়িক)

বহুরূপ
গোবিন্দ
চাকু
গুণাকর
অর্ক
কৃষ্ণ
কৃষ্ণের পুত্র: লোকনাথ, হরি, কেশব
লোকনাথ → শ্রীমান্, তিলাই
হরি → কানাই, ধনপতি
কেশব → নৃসিংহ, বশিষ্ঠ

ছিলেন কি না তাহার কোন আভাস পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ ৮২১ হিজরা বা ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে রাজা গণেশের দেহাবসানের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অভ্যুদয় ও তাঁহার দেহাবসান-কাল-মধ্যে প্রচারিত তাঁহার স্বনামাঙ্কিত কোন মুদ্রা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ১৩৩৯ শকের (বা ১৪১৭ খৃষ্টাব্দের) শ্রীদনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার মুদ্রায় পাণ্ডুনগর, সুবর্ণগ্রাম, ও চাটিগ্রামের নাম আছে। এই সকল মুদ্রা হইতে সহজেই মনে হইবে, বর্ত্তমান মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া হইতে সুদূর চাটিগাঁ পর্য্যন্ত অর্থাৎ সমগ্র বাঙ্গলায় উক্ত ১৩৩৯ শকে রাজা শ্রীদনুজমর্দ্দনের নামে আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সময়ে রাজা গণেশের বিদ্যমানতা স্বীকার করিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক শ্রীদনুজমর্দ্দন ও রাজা গণেশকে অভিন্ন ব্যক্তি এবং রাজা গণেশেরই উপাধি দনুজমর্দ্দন এবং জলাল-উদ্দীনের 'মহেন্দ্রদেব' উপাধি বলিয়া স্থির করিয়াছেন।* কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন সাময়িক ইতিহাস বা কিংবদন্তী মূলে রাজা গণেশ বা দনুজমর্দ্দনের কাহারও একাধিক নাম উল্লেখ পাওয়া যায় নাই।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ রাজা গণেশের ও জলাল-উদ্দীনের যে অভ্যুদয়কাল নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, সেই সময়ের প্রাচীন মুদ্রা হইতে আমরা জলাল্-উদ্দীন্, দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রদেব এই তিন জন রাজার নাম পাইতেছি। রিয়াজ্-উস্-সলাতিন মতে মুসলমানবিদ্বেষী রাজা গণেশ ৭বর্ষ মাত্র প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ১৩২৯ শকে বা ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে রাজা গণেশ গৌড়ের একচ্ছত্র নৃপতি হইয়াছিলেন। তিনি মুসলমানদিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য নূর-কুতুব-আলম্ জৌনপুরের সুল্তান ইব্রাহিমকে আহ্বান করেন। ৮১৭ হিজরায় বা ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে সুলতান ইব্রাহিম গৌড় আক্রমণ করেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, রাজা গণেশ যদুকে রাজ্য ছাড়িয়া দেন। যদু ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করায় সুলতান্ ইব্রাহিম ফিরিয়া যান। সুলতানের প্রত্যাগমনের পর রাজা গণেশ সিংহাসন পুনরায় গ্রহণ করেন ও যদুকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। রাজা গণেশের বিদ্যমানে যদু বা জিৎমল সিংহাসনে আরোহণ করিলে জলাল্-উদ্দীন্ নামে তাঁহার মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাতে ৮১৮ ও ৮১৯ হিজরী অঙ্ক পাওয়া যায়। আবার ঠিক ইহার অব্যবহিত পরেই দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা পাওয়া যাইতেছে। শেষোক্ত নৃপতিদ্বয়ের মুদ্রা হইতে মনে হয় যে তাঁহারা পাণ্ডুয়া হইতে চাটিগ্রাম পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এ অবস্থায় রাজা গণেশ ও রাজা দনুজমর্দ্দন দেবকে অভিন্ন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

সম্ভবতঃ বৃদ্ধবয়সে রাজা গণেশ মুসলমানবিদ্বেষী ও একজন গোঁড়া হিন্দু হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুলতান ইব্রাহিমের নিকট অবনতি স্বীকার তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল। বিশেষতঃ পুত্রকে হিন্দু করিয়া লওয়ায় সমাজে যে কিছু গোলযোগের সূত্রপাত না হইয়াছিল এমন নহে। যাঁহার সভায় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজ ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের কুলবিধি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, বল্লালসেনের ন্যায় যিনি ব্রাহ্মণসমাজে সম্মানিত হইয়াছিলেন, হিন্দুসমাজ-রক্ষায় যাঁহার চিরন্তন লক্ষ্য ছিল, এখন তিনি হিন্দু-সমাজের গৌরবরক্ষার্থ অপরের হস্তে সমগ্র গৌড়ের শাসনভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন, তাহা সম্ভবপর নহে। যদুর পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণের পর রাজা গণেশ দুই বর্ষ মাত্র জীবিত ছিলেন, এই সময়ে তিনি দনুজমর্দ্দন নামে নির্বিরোধে রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর যদু হিন্দু আত্মীয়গণের পরামর্শে প্রথমে 'মহেন্দ্রদেব' নামে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন ও মুদ্রা প্রচার করেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই তিনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ ও সুলতান আজিমের কন্যা আস্মান্‌তারাকে বিবাহ করেন। কুলগ্রন্থে যদু ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করায় তাঁহার নামের শেষে 'জাত্যন্তর' লিখিত আছে, তৎপরবর্ত্তী পুরুষের নাম কুলগ্রন্থে নাই।

---

* Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bangal., by Nalinikanta Bhattasali, P. 115-122.

কোন্ পথে ?

[মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ]

২

মধ্যপথ অবলম্বন করিতেই হইবে, তাহা না করিলে আমরা এই ভয়াবহ জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না,—ইহা আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে সূচিত হইয়াছে। এই মধ্যপথ কি তাহাই বুঝিবার চেষ্টা অগ্রে করিতে হইবে। মধ্যপথ কি তাহা বুঝিতে হইলে কোন্ পথটা মধ্যপথ নহে তাহাও বুঝিতে হইবে। চরমপন্থীর পথ যে মধ্যপথ নহে ইহাই আমি বলিতে চাহি। চরমপন্থী আবার দুই ভাগে বিভক্ত,—এক নব্য চরম পন্থী, দ্বিতীয়, প্রাচীন চরমপন্থী। এই দুই পন্থীর মাঝামাঝি পথ আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। নব্য চরমপন্থীর পথে চলিতে হইলে যাহা কিছু প্রাচীন শাস্ত্রানুমোদিত আচার ব্যবহার তাহা সকলই আমাদের জাতীয় ঐক্য সম্পাদনের অন্তরায়; সুতরাং তাহা পরিত্যাজ্য, অর্থাৎ এই মত অবলম্বন করিয়া আমাদের সাধনার পথে, গন্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে হইলে আমাদিগকে বর্ণ-বৈষম্যকৃত উচ্চনীচ ভেদ জ্ঞান একেবারে পরিহার করিতে হইবে; অসবর্ণ বিবাহের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, অস্পৃশ্যতা, অনাচরণীয়জলতা বিরাট্ হিন্দু সমাজের মধ্য হইতে, একেবারে উঠাইয়া দিতে হইবে। সকলে সকলের স্পৃষ্ট-অন্ন জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে ভক্ষণ করিতে হইবে, পরলোকে আত্মার অস্তিত্ব; তাহার সদ্‌গতি প্রভৃতির প্রতি আস্থা একেবারে উড়াইয়া দিতে হইবে, এক কথায় বলিতে গেলে আত্মার অমরত্ব ও জন্মান্তর-বাদ আমাদের লৌকিক স্বরাজ প্রাপ্তির ঐকান্তিক প্রতিকূল বলিয়া তাহা উরগদষ্ট অঙ্গুলির ন্যায় সমাজ-শরীর হইতে এখনই কাটিয়া ফেলিতে হইবে। ইহা না করিলে কিছুতেই আমরা স্বরাজ-লাভ করিতে পারিব না। ইহাই হইল বর্ত্তমান সময়ে নব্য চরমপন্থীর মত।

অপর দিকে প্রাচীন চরম পন্থীর মত এই যে, আমাদের সামাজিক সর্ব্বপ্রকার অধোগতির মূল কারণ হইতেছে আমাদের সনাতন ধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীনতা, বৈদেশিক সভ্যতার তীব্র আলোকচ্ছটায় আমাদের নয়ন ঝলসিয়া অন্ধপ্রায় হইয়াছে; তাহার ফলে আমাদের জাতীয়-জীবনের কি লক্ষ্য তাহা আমরা সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইতেছি না। আমরা মঙ্গলকে অমঙ্গল বলিয়া, সুন্দরকে অসুন্দর বলিয়া, অন্যদিকে অমঙ্গলকে মঙ্গল বলিয়া, অসুন্দরকে সুন্দর বলিয়া বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি; সুতরাং বৈদেশিক সভ্যতার বা ঐহিক-সর্ব্বস্ববাদের মস্তিষ্ক-বিকারজনক প্রভাবকে অগ্রে দূর করিতে হইবে। তাহা দূর করিবার প্রধান উপায় হইতেছে—ভারতে ব্রাহ্মণ্যশক্তির পুনরুদ্বোধন। ব্রাহ্মণই—হিন্দু-সমাজ-ব্যবস্থার গঠক, ব্রাহ্মণত্বের উপরই সমাজ প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণের অবনতির সহিত ইহার অবনতির সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। সেই ব্রাহ্মণত্ব শাস্ত্রানুগত পুরুষপরম্পরাপ্রাপ্ত সদাচারের উপরই প্রতিষ্ঠিত। সেই সদাচার-নিবহ যে পরিমাণে ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিত হইতেছে সেই পরিমাণেই সমাজ-সংরক্ষণী ব্রাহ্মণ-শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-বন্ধন দ্রুততর ভাবে শিথিল হইয়া পড়িতেছে বলিয়া বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজ বিধ্বস্ত হইতে বসিয়াছে। পাপ, অনাচার, অশান্তি, দুঃখ, দারিদ্র্য, অনৈক্য ও আত্ম-কলহ বাড়িয়া যাইতেছে। হিন্দুজাতি সর্ব্বনাশের করাল পথে অতি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে! এই অনর্থ-জালকে ছিন্ন করিতে হইবে। তাহা না করিলে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম টিকিবে না। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম না থাকিলে হিন্দুজাতিও থাকিবে না; সুতরাং স্বরাজ পাইবারও কোন সম্ভাবনা থাকিবে না; অতএব ভারতে হিন্দু জাতিকে স্বরাজ

পাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মরক্ষার উপায় করিতে হইবে, প্রকৃত ব্রাহ্মণশক্তিকে অগ্রে জাগাইতে হইবে। ব্রাহ্মণশক্তি জাগিলে ব্রাহ্মণের তপস্যা, বিদ্যা ও কর্ম্ম-কুশলতার বলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র শক্তি জাগিবে। আবার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে; ভারত আবার ধনে জনে সম্পদে বিদ্যায় বলে, ঐশ্বর্য্যে অতুলনীয় প্রভাবসম্পন্ন হইয়া সমগ্র জগতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইবে। মোটের উপর ইহাই হইল প্রাচীন চরমপন্থীর মত. এখন সমস্যা দাঁড়াইতেছে যে, নব্য ভারত এই দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ মতের কোন্‌টী কে অবলম্বন করিবে, এই সমস্যার সমাধানের উপর হিন্দুর জাতীয় জীবনের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে। দেশ কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা-নিচয়ের যথাযথ ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে ইহা কিন্তু স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে এই উভয় প্রকার চরমপন্থিগণের কোন মতটীকেই বর্ত্তমানকালে হিন্দু-সমাজ গ্রহণ করিতে পারে না, গ্রহণ করিতেছে না এবং ভবিষ্যতেও যে গ্রহণ করিবে তাহার সম্ভাবনাও নিতান্ত অল্প, এমন কি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে বলিয়া মনে হয় না; কেন যে এইরূপ সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হইয়াছি তাহাই বিস্তৃত ভাবে আলোচনাপূর্ব্বক দেখাইবার জন্য আমার এই প্রয়াস, ইহা সফল হইবে কি না তাহার উত্তর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। এই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি তাহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে গেলে হয় তো উভয় দলের নেতৃগণ আমার প্রতি একান্ত ভাবে চটিয়া উঠিবেন; কিন্তু আমার পক্ষে ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই। ইতিহাস, পুরাণ ও বৈদিক-সাহিত্যের যথাশক্তি অনুশীলনের ফলে এবং বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থা-নিচয়ের অপক্ষপাতে পর্য্যালোচনের প্রভাবে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা সত্য ও অবশ্যম্ভাবী বলিয়া প্রতীত হইয়াছে আমাদের সমাজের ও জাতির হিতৈষণার বশবর্ত্তী হইয়া সদর্থাবলম্বী মানবগণের সেবার জন্য তাহাই বিনীত ভাবে উপহার দিবার জন্য আমার এই উদ্যম যদি সামাজিক কল্যাণ-চিন্তার পথকে অণুমাত্রও সুগম করিতে সমর্থ হয়. তাহা হইলে আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনকে ধন্য বলিয়া বোধ করিব।

প্রাচীন পন্থী

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় গ্রন্থের প্রকৃত গুণদোষের বিচার হইতে পারে না। তদ্দ্বারা. গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। কিন্তু গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা সমালোচনার উদ্দেশ্য নহে। কেবল সেই উদ্দেশ্যে গ্রন্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক নহি। গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠক যে সুখলাভ বা যে জ্ঞানলাভ করিবেন. তাহা অধিকতর স্পষ্টীকৃত বা তাহার বৃদ্ধি করা; গ্রন্থকার যেখানে ভ্রান্ত হইয়াছেন, সেখানে ভ্রম সংশোধন করা; যে গ্রন্থে সাধারণের অনিষ্ট হইতে পারে, সেই গ্রন্থের অনিষ্টকারিতা সাধারণের নিকট প্রতীয়মান করা; এই গুলি সমালোচনার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য দুই ছত্রে সিদ্ধ হইতে পারে না। সেই কারণেই এ পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় আমরা বিরত ছিলাম। ইচ্ছা আছে, অবকাশানুসারে গ্রন্থ-বিশেষের বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। সাধ্যানুসারে সেই ইচ্ছামত কার্য্য হইতেছে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনার নমুনা

কাব্যমালা। কলিকাতা। বেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানি।

কাব্য মিষ্টান্নের ন্যায় আশু মধুর। এ মিঠাইয়ের ময়রা কে, তাহা গ্রন্থে প্রকাশ নাই। আমরা জানিও না। জানিতে পারিলে তাঁহার দোকানে কখনও যাইব না। তাঁহার দ্রব্যগুলিন একে তেলে ভাজা, তার বাসী; তিনি নাম পত্রে ববকচি হইতে কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

······——চতুরানন।

অরসিকেষু রহস্য-নিবেদনং

শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥

কিন্তু যখন আমাদিগের হাতে তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়াছে, তখন তাঁহার কপালে বিধাতা তাহাই লিখিয়াছেন। আমরা নিতান্ত অরসিক। তাঁহার কাব্যের রস-গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলাম না। কবিতাগুলিন সকলই আদিরস-ঘটিত। তাহা হইলেই দোষের হইল না। যাহা

শারীরিক কুপ্রবৃত্তির উদ্দীপক. তাহাই দুষ্য এবং কাব্যের অযোগ্য। কিন্তু এদেশে কতকগুলিন অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোক হইয়াছেন,— তাঁহাদিগের নিকট বিশুদ্ধ দম্পতী-প্রেম—যাহা সংসারের একমাত্র পবিত্র গ্রন্থি, এবং মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম. চিত্তোৎকর্ষের প্রধান উপায় তাহাও আদিরস-ঘটিত এবং অশ্লীল বলিয়া ঘৃণ্য। তাঁহারা মনে করেন এরূপ কথা কহিলেই, লোকে ইংরাজিওয়ালা ও সুসভ্য বলিবে। তাঁহাদিগকে গণ্ডমূর্খ বলিতে আমাদিগের কোন বাধা নাই। এ ঘৃণা তাঁহাদিগের স্বচিন্তের সমলতারই ফল। যাঁহারা কিছুই বিশুদ্ধ ভাবে দেখিতে জানেন না, তাঁহাদিগের চোখে সকলই সমল। যাঁহাদিগের চিত্ত কেবল কুক্রিয়ার অভিলাষী, বিশুদ্ধ বর্ণনাও তাঁহাদিগের কুপ্রবৃত্তির উদ্দীপক হইয়া উঠে।

আমরা অনেকবার দেখিয়াছি, অতি বিমল প্রসঙ্গেরও এই পাপাত্মারা অসদর্থ বুঝিয়াছে। সে সুসভ্য শ্রেণী মধ্যে আমরা গণ্য হইবার অভিলাষী নহি। আদিরস যদি কেবল বিশুদ্ধ প্রেমাত্মক এবং ধর্ম্মের সহায় হয়, তবে তাহাকে আমরা সমাদর করি. ইহা বলিতে আমাদিগের লজ্জা নাই। কিন্তু কেবল শারীরিক প্রবৃত্তির উদ্দীপক রসে যে সমাদর করে, তাহাকে পশু মধ্যে গণনা করি। যে কাব্য সে রসাত্মক, তাহা সমাজের ঘোরতর অনিষ্টকারী। এই কাব্যমালা গ্রন্থখানি সেই মহাদোষে দূষিত "কোন প্রৌঢ়া নায়িকার প্রতি নায়কের উক্তি" "পয়োধর" ইত্যাদি কবিতাগুলি এই কথার প্রতিপোষক।

একেত রস এই, তাহাতে আবার পুরাতন। কাব্যমধ্যে এ রসেরও নূতন কথা কিছু দেখিলাম না। সকলই চর্ব্বিত চর্ব্বণ। গ্রন্থকার নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন ;—

"যদিও এ ফুলচয়, সমুদয় নব নয়
রসপূর্ণ বটে কি না তোমারে বুঝাই"

২ পৃষ্ঠা।

তবে গ্রন্থকার এত কষ্ট স্বীকার করিয়া কবিতাগুলি না লিখিয়া, পূর্ব্ব কবিদিগের উপর বরাত দিলেই গোল মিটিত।

ঐতিহাসিক নবন্যাস। অঙ্গখণ্ড। মাধবমোহিনী। শ্রীগজপতি রায় দ্বারা সঙ্কলিত। কলিকাতা সুচারু যন্ত্র।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, অগ্রে ধনাঢ্য লোকের এক এক জন করিয়া কথক (গল্প-বক্তা) থাকিত, প্রতিদিবস সন্ধ্যার পর নগর ও গ্রাম-ভেদে পল্লীস্থ ও গ্রামস্থ প্রায় সমস্ত লোকেরা স্ব স্ব দৈনিক কার্য্য সমাধা করিয়া ঐ ধনাঢ্য লোকের বৈঠকখানায় মিলিত হইয়া বহুবিধ রঙ্গ-রস-ঘটিত গল্প-শ্লোকাদি শ্রবণ করিয়া উপজীবিকার শ্রম দূর করিত। এক্ষণে সে চাল আর নাই. এক্ষণে স্ব স্ব প্রধান 'আপনি আর কপনি' কিন্তু উপজীবিকার্থে সেই প্রকার পরিশ্রম করিতে হয়, সন্ধ্যার পর বাটী আসিয়া শ্রমদূরার্থ ইচ্ছা সেই প্রকারে বলবতী, কিন্তু উপায় অভাব, সেই অভাব পূরণার্থ 'নবন্যাসাদির উৎপত্তি ?"

বোধ হয়, এই কথার পর গ্রন্থের কোন পরিচয় দিতে হইবে না। যদি এমত শ্রেণীর কোন পাঠক থাকেন, যে এরূপ উদ্দেশ্যে লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পাঠ করুন। কিন্তু আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যে এরূপ নীচাশয় লেখকদিগের সংখ্যা দিন দিন অল্প হউক। এরূপ লেখকদিগের দ্বারা সাধারণের কোন মঙ্গল সিদ্ধ হয় না বরং অমঙ্গল জন্মে।

এ শ্রেণীর লেখক ও পাঠক উভয়কেই আমাদিগের একটি একটি কথা বলিবার আছে। লেখকদিগকে বক্তব্য এই যে, যতই যত্ন করুন না কেন, তাঁহারা কখন ভাঁড় ও কথকদিগের সমকক্ষ হইতে পারিবেন না। কেন না ভাঁড়েরা মুখভঙ্গী, অঙ্গভঙ্গী, স্বরবিকৃতি প্রভৃতির দ্বারা যে প্রকার লোকের মনোহরণ করিত, ঘ্যান ঘ্যান করিয়া এ প্রকারের উপন্যাস পাঠ করিয়া কাহারও সে রূপ চিত্তরঞ্জন হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব এইরূপ উদ্দেশ্য করিয়া যাঁহারা উপন্যাস লেখেন, তাঁহাদিগের স্থান কথক ও ভাঁড়ের নিম্ন পদবীতে।

ঐ শ্রেণীর পাঠকদিগের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, যে অভাব পূরণ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা এরূপ গ্রন্থপাঠ করিবেন, সে অভাব তাস খেলা প্রভৃতির দ্বারা তদপেক্ষা উত্তমরূপে পূর্ণ হইতে পারে। একখানি গ্রন্থ এক টাকা বার আনার কমে কিনিতে পাওয়া যায় না, এক জোড়া তাস চারি আনায় পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি একবার পড়িলে আর ভাল লাগে না ; কিন্তু এক জোড়া তাসে প্রত্যহ খেলা যায়, নিত্যই সমান আমোদ পাওয়া যায়। বিশেষ তাস খেলায় কোন অনিষ্ট নাই, ভাঁড়ামি বা ভাঁড়ামির স্থলাভিষিক্ত উপন্যাসে অনিষ্ট আছে।

বলা বাহুল্য যে, যে গ্রন্থের উদ্দেশ্য এরূপ, তাহা আমরা আদর করিয়া পড়িতে প্রবৃত্ত হই নাই। কেবল কর্ত্তব্যানুরোধে পড়িতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু কর্ত্তব্যানুরোধেও সমুদায় গ্রন্থখানি পড়িতে পারিলাম না—ইহা নিতান্ত অপাঠ্য বোধ হইল। এমত হইতে পারে যে, সমুদায় গ্রন্থখানি পড়িলে তাহার কোন বিশেষ গুণ দেখিতে পাওয়া যাইত। যদি এ গ্রন্থের এমত কোন গুণ থাকে, তবে গ্রন্থকার আমাদের এই ক্রটি মার্জ্জনা করিবেন—আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্রটি করি নাই। ইহা আমরা বলিতে পারি যে যতদূর পড়িয়াছি, ততদূর মধ্যে গ্রন্থে বিশেষ গুণ কিছু দেখিতে পাই নাই। দোষ যাহা দেখিয়াছি, তাহা লিখিতে গেলে "ঐতিহাসিক নবন্যাসের" আকারের আর একখানি গ্রন্থ লিখিতে হয়। দুই একটী উদাহরণেই যথেষ্ট হইবে।

১। গ্রন্থের নাম ঐতিহাসিক। লেখকের ঐতিহাসিক জ্ঞানের পরিচয় এই মাত্র দিলে যথেষ্ট হইবে, যে সৎকালে মগধে হিন্দুরাজা, তৎকালের একজন লোকে জয়দেব হইতে "দেহি পদপল্লবমুদারম্" আওড়াইতেছে—২৭পৃষ্ঠা শেষপংক্তি দেখ।

২য়। অসভ্যতা। পূর্ব্বগামী লেখকদিগকে "বাঁদর, হনুমান্, জাম্বুবান্" বলিয়া গ্রন্থকার গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। (ভূমিকার শেষভাগ দেখ) ভদ্রলোকে স্মরণ করিবেন যে, বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, টেকচাঁদ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি পূর্ব্বগামী উপন্যাসলেখক।

৩য়। শ্রেণী-বিশেষের লোকের অসভ্যতা মার্জ্জনীয়। কিন্তু অশ্লীলতা মার্জ্জনীয় নহে। (৮ পৃষ্ঠার ১৭। ১৮ পংক্তি দেখ) ভদ্রলোক এবং

স্ত্রীলোকের পাঠ্য এই বঙ্গদর্শনে উঁহার সবিশেষ নির্ব্বাচন অসম্ভব।

৪র্থ। সদসৎ জ্ঞান মাত্রেরই অভাব। উদাহরণ স্বরূপ নায়ক নায়িকার অবিবাহিতাবস্থার একদিনের ব্যবহার উদ্ধৃত করিলাম—

মাধবলাল গৃহ হইতে বাহির হইয়া, * * * মনোদুঃখে মস্তক নত করিয়া শীঘ্র চলিয়া যাইতেছেন * এমন সময়ে কে এক জন স্তম্ভের পার্শ্ব হইতে আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিল। চমকাইয়া দেখিলেন, মোহিনী সজল নয়নে তাঁহার হস্ত ধরিয়া মুখাবলোকন করিতেছেন। * * * * * মোহিনী এক হস্ত দিয়া মুখ হইতে হস্ত সরাইলেন, অন্যহস্ত মাধবের গলদেশে দিয়া মস্তক পরিণত করাইয়া স্বস্কন্ধে রাখিলেন। কপোল-স্পর্শে, যে প্রকার স্খলিত ক্ষত তৈলদানে শীতল হয়, মাধবের দগ্ধ হৃদয় শীতল হইল, বাহু প্রসারি আলিঙ্গন করিয়া বক্ষে টানিয়া হইলেন, যাহা অদ্যাবধি করেন নাই, মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "মোহিনী ইত্যাদি। * * * এমন সময়ে সুমতী (নায়কের যুবতী ভগিনী) শীঘ্র আসিয়া কহিল, "দাদা ওদিগে কে আসচে," মাধবপ্রসাদ পুনর্ব্বার মুখচুম্বন করিয়া মোহিনীকে বক্ষ হইতে সরাইয়া প্রস্থান করিলেন।" (২১-২২ পৃষ্ঠা)

আমরা শুনিয়াছি যে, যেখানে রাধা-শ্যাম, সেখানে বৃন্দা দূতীর অভাব নাই। কিন্তু শ্যামচাঁদের ভগিনীই যে বৃন্দাদূতী, এইটি নূতন।

৫ম। দেশীয় আচার ব্যবহারের সঙ্গে গ্রন্থকারের বড় বিবাদ। তাঁহার নায়ক ঐ যুবতী ভগিনীর ললাট চুম্বন করিয়া থাকেন। ভগিনীও "দাদার হস্তধারণ" করেন। (২১ পৃষ্ঠা ১১। ১২ পংক্তি) মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বকার হিন্দু ভদ্রলোকে বাবু পদে বাচা হইয়াছেন। রাজপুত্রের নাম "মাধব বাবু"। সর্ব্বাপেক্ষা "রাজা বাবু" সম্বোধনটি আমাদিগের মিষ্ট লাগিয়াছে।

৬ষ্ঠ। আমরা লেখকের ভাষার বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি না। তাঁহার ভাষার একটি গুণ আছে—ভাষা অতি সরল। যাঁহারা বড় বড় সংস্কৃত শব্দ এবং পদত্যাগ করিয়া সচরাচর পরিশুদ্ধ কথোপকথনের ভাষা অবলম্বন করেন, আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহারা ভালই করেন। কিন্তু তাই বলিয়া ইতর লোকের ভাষা অবলম্বনীয় নহে। এ গ্রন্থে যে যে স্থানে ভাষার অশুদ্ধি ঘটিয়াছে, তাহার অনেকেই বোধ হয় মুদ্রাকরের দোষ। বাঙ্গালা গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন কার্য্য পরিশুদ্ধ রূপে নির্ব্বাহ হওয়া দুর্ঘট। আমরা অনেক যত্ন করিয়া দেখিয়াছি তাহা ঘটনীয় নহে। তজ্জন্য আমরা সর্ব্বদাই পাঠকদিগের নিকট লজ্জিত। সকল গ্রন্থেই এইরূপ দেখিতে পাই। কিন্তু এদোষে এইগ্রন্থ বিশেষ দুষ্ট। ইত্যাদি।

"পাণ্ডাজী কয়েকবার পরাস্থ হইয়া মনে মনে তাঁহার উপর অত্যান্ত আক্রোশ জন্মিয়াছিল, কিন্তু ভয় বশতঃ কথা বাহ্যিক বলিতে সক্ষম হইতেন না; লুকাইয়া লোকের নিকট নৈয়াইক বলিয়া গ্লানী করিতেন।"

চারিটি ছত্রে চারিটি ভুল—যথা পরাস্থ, অত্যান্ত, নৈয়াইক, গ্লানী। এইগুলি মুদ্রাকরের দোষ বিবেচনা করিতে পারি, কিন্তু "পাণ্ডাজী পরাস্থ হইয়া—আক্রোশ জন্মিয়াছিল," "বাহিক বলিতে" ইত্যাদি দোষ মুদ্রাকরের নহে। যে ভ্রমটী একবার ঘটে, তাহাই মুদ্রাকরের, কিন্তু

৮ পৃষ্ঠায় ৮ পংক্তিতে দেখিলাম, কথাবার্ত্তার স্থানে "কথাবাত্রা", আবার ২২পৃষ্ঠায় ২৩ ছত্রে "কথাবাত্রা" ইহাতে কি বিবেচনা হয়? এই গ্রন্থে "বালাপোষাবৃত" পুরুষের কথা পড়িলাম। এই রূপ দোষ অসংখ্য।

এক্ষণে অনেকে মাতৃভাষার বিশেষ আলোচনা না করিয়াও গ্রন্থাদি প্রণয়নে প্রবৃত্ত, এবং তাহাদিগের গ্রন্থ অনেক সময়ে ভাল হইয়া থাকে। তাঁহাদিগকে ভগ্নোৎসাহ করিতে আমরা অনিচ্ছুক; কিন্তু যে সকল দোষ আমরা দেখাইলাম, তাহা কাহারও ঘটে না।

৭ম। গ্রন্থকারের প্রণীত চিত্রগুলি সম্বন্ধে কি বলিব? এ গ্রন্থে রাজপুত্র নাগরীগণের জলের কলস ভাঙ্গিতেন, (১৩পৃ) তাঁহার বিমাতার সঙ্গে বিবাদ হইলে দুধ পাইতেন না, পেঁড়া পাইতেন না, জল-খাবার পাইতেন না। রাজকুমারী দোকানে দাঁড়াইয়া খেলানার দর করেন। ১৯ পৃষ্ঠায় রাজা এবং রাজপুত্রের যে কথোপকথন হইয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা তাহাই আমাদিগের মনোহরণ করিয়াছে। রাজা বলিতেছেন, "আমি আমার রাজ্যে কুকুরকে দিয়া যাইব, তথাচ তোমাকে দিব না।" তাঁহার পুত্র উত্তরে বিমাতা সম্বন্ধে বলিতেছেন, "এমন স্ত্রীকে হেঁটোয় কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়া পুঁতিয়া ফেলুন, পাণ্ডার মস্তক মুণ্ডন করিয়া উল্টা গাদায় চড়াইয়া দেশান্তর করিয়া দিন।" "ঐতিহাসিক নবন্যাসের" ঐতিহাসিক ভাগ পিতামহীদিগের নিকট প্রাপ্ত।

৮ম। গ্রন্থকার প্রতি পরিচ্ছেদে, এক একটি গীত উদ্ধৃত করিয়া বসাইয়াছেন। তাহা দাশু রায়, গোপালে উড়িয়া প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত। ইহা লেখকের রুচি এবং শিক্ষার পরিচয়।

এরূপ তালিকা করিতে গেলে শেষ হইবে না। আমরা যাহা বলিলাম, তাহা গ্রন্থের অত্যল্পাংশ সম্বন্ধে। গ্রন্থের বিশেষ কোন গুণ দেখিলে এসকল দোষ সামান্য বলিয়া গণনা করিতাম।

জ্ঞান কুসুম। প্রথমভাগ। শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। পাঠ্য পুস্তক, স্মরণ শক্তি, যৌবন, স্বভাব, ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রভৃতি কয়েকটি প্রস্তাব ইহাতে লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে উপহার দিই।

"পুস্তকপাঠ জ্ঞানবৃদ্ধির এক প্রধান উপায়।" ১পৃষ্ঠা

"যিনি পুস্তক পাঠ করিতে পারেন না, তিনি জ্ঞান হইতে একপ্রকার বঞ্চিত।" ২ পৃষ্ঠা

"জ্ঞান সঞ্চয়ের নিমিত্ত স্মরণ এক প্রধান সাধন। এই সাধন না থাকিলে আমরা কিছুই শিক্ষা করিতে পারিতাম না।" ৩ পৃষ্ঠা

"আমরা স্বভাবের হস্ত হইতে স্মরণ পাইয়াছি। কিন্তু তিনি সকলকে সমান স্মরণ দান করেন নাই।" ৪ পৃষ্ঠা

এই রূপ ৫, ৬, ৭, ৮ যথাক্রমে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখিয়া আমরা কেবল ঐরূপ নূতন এবং দুজ্ঞের্য় তত্ত্বই পাইলাম। গ্রন্থকারকে জিজ্ঞাসা করি, কোন্ উদ্দেশে এই গ্রন্থ খানি প্রচারিত হইয়াছে?

শিশুপাঠ বাঙ্গালার ইতিহাস। বর্গীর হাঙ্গামা হইতে লার্ড নর্থব্রুকের আগমন পর্য্যন্ত। শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রণীত। কলিকাতা ভারত যন্ত্র।

১১১ পৃষ্ঠায় পড়িলাম, "প্রিন্স অব আলফ্রেড" এখানে আসিয়াছিলেন। গবর্ণর জেনারেল তাঁহাকে ষ্টার অব ইণ্ডিয়া "উপাধি" দান করেন। তিনি আর কটি উঠাইয়া দিয়া যান নাই বলিয়া তাঁহার সমাদরার্থে যে অর্থ ব্যয় হইয়াছিল, তাহা অপব্যয় হইয়াছে। যে গ্রন্থে এরূপ পাণ্ডিত্য, তাহা শিশুদিগের বা কাহারও পাঠ্য নহে।

কিন্তু ইহা অপেক্ষা এ গ্রন্থে আরও গুরুতর দোষ আছে। ৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, "এমন কোন গ্রন্থকারই নাই, যিনি স্বর্ণময়ীর পারিতোষিক প্রাপ্ত হন নাই।" ক্ষেত্রনাথবাবু কে, তাঁহার কি অভিপ্রায়, তাহা আমরা কিছুই জানিনা; বোধ করি, তিনি ভদ্র লোক এবং অসাবধানতাবশতঃই এমত লিখিয়াছেন; কিন্তু যদি তিনি ইহা না বুঝিতে পারিয়া থাকেন, যে কথাটি মিথ্যা লেখা হইল, এবং অর্থলোলুপ ভিক্ষুকের তোষামোদের মত শুনাইবে, তবে তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। লেখক মাত্র সম্বন্ধে এইরূপ অপবাদ প্রচার করিতে তাঁহার লজ্জা হইল না? আমরা জানি, মহারাণী স্বর্ণময়ী অত্যন্ত দানপরায়ণা এবং অনেক ভিক্ষুক গ্রন্থ লইয়া তাঁহার দ্বারস্থ, মহারাণীও অকাতরে তাহাদিগকে অর্থ বিতরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এদেশের লেখক মাত্রেই যে তাঁহার পারিতোষিক ভোক্তা নহেন, তাহা বলা বাহুল্য। সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গদেশে এখন অনেক গ্রন্থকার আছেন, যে তাঁহারা অন্যকে ভিক্ষা দেন, অন্যের নিকট ভিক্ষার্থী নহেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের নাম এমন দেশব্যাপ্ত, যে এস্থানে নাম করিবার আবশ্যক নাই। এই লেখক, বোধ হয়, স্বশ্রেণীর লোক ভিন্ন অন্য কাহাকেও চেনেন না। তিনি যাঁহাদিগের কথা বলিবার অভিপ্রায়ে লিখিয়াছেন, সেই শ্রেণীর লোক গ্রন্থকর্ত্তা নামের অধিকারী বলিয়াই বঙ্গদেশে ভদ্রলোকে সচরাচর গ্রন্থ প্রণয়নে বিমুখ। বাঙ্গালা গ্রন্থ লেখা কাজে কাজেই আজিও অনেকের কাছে ইতর বৃত্তি বলিয়া গণ্য। এই লেখকের উক্তি বিচারাগারে এবং অন্য প্রকারে দণ্ডনীয়।

যে সকল গ্রন্থকার ভিক্ষার জন্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাঁহাদিগকে ইহা বলিয়া দিবার আবশ্যক হইল যে মহারাণী স্বর্ণময়ীর নিকট প্রাপ্তি কামনায় পরনিন্দা ঘটিত তোষামোদের প্রয়োজন নাই। বিনা তোষামোদেও তিনি দান করিয়া থাকেন।

[বঙ্গদর্শন, ১ম বর্ষ]

কমলকুমারী

[স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদ বর্ণিত ঘটনার পরদিন প্রত্যূষে জয়াবতীর মাতা তাহাকে গঙ্গাস্নানের জন্য ডাকিলেন কিন্তু উত্তর পাইলেন না; দ্বারে করাঘাত করাতে জয়াবতী বলিলেন, "আজ স্নান কর'ব না, শরীর ভাল নয়।"

মাতা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে?"

জয়াবতী উত্তর করিলেন,—"বিশেষ কিছু নহে।"

স্নান করিয়া আসিয়া মাতা আবার দ্বারে করাঘাত করিলেন, উত্তর পাইলেন না। পুনঃ পুনঃ করাঘাত করাতে জয়াবতী বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "আমি এখন দ্বার খুলতে পারব' না,"

মাতার সর্ব্বস্বধন ঐ একমাত্র কন্যা। ঐরূপ উত্তর শুনিয়া ভীত হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। পূজা-আহ্নিকের আয়োজন হইয়াছিল, পূজা করিতে পারিলেন না, গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে জয়াবতী উঠিয়া গঙ্গাস্নান ও পূজাহ্নিক সারিয়া গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, অদ্য বেলা সাতটা হইল তথাপি দ্বার খুলিল না, আটটা বাজিল এখনও দ্বারবদ্ধ, নয়টার সময় দ্বার খোলার শব্দ পাইয়া মাতা দৌড়াইয়া গিয়া দেখিলেন যে জয়াবতীর মুখ শুষ্ক, চোখের পাতা ফুলিয়াছে; যেন সমস্ত রাত্রি সে কাঁদিয়াছে, আর গভীর বিষাদের ছায়া যেন তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে।

মাতা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে।"

"উত্তরে কিছু নয়" বলিয়া জয়াবতী চলিয়া গেলেন। বাড়ীতে স্নানাদি করিয়া পূজাহ্নিক কোনগতিকে সারিয়া সামান্য আহার করিয়া আবার বিছানা লইলেন। মাতা বাড়ীর সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জয়ার কি হয়েছে?" তাঁহার এক মামাত ভগিনী বলিল, "শোন দিদি তোমার জামাই এত দুরন্ত পাগল হয়েছে যে গত রাত্রে অরবিন্দকে একখানা তরোয়াল নিয়ে কাটতে গিয়েছিল, রূপচাঁদের

নিকট একথা শুনিয়া জয়াবতী কষ্টে সমস্ত রাত্রি কেঁদেছে।

আমরা কিন্তু ইহার অন্য একটা কারণ বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি তাহা এখন আর প্রকাশ করিব না—যথা সময়ে সকল কথাই প্রকাশিত হইবে।

ষড়্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অরবিন্দ এক্ষণে দিবারাত্রি তাঁহার গুরুর আশ্রমে থাকিতেন, জয়াবতীর বাটীতে আর যাইতেন না, অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান সারিয়া গুরুর আশ্রমে গিয়া সেই স্থানে মধ্যাহ্নে আহারাদি করিতেন। সমস্ত দিন গুরুর উপদেশ শুনিবার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার আশ্রমে থাকিয়া রাত্রি দশটার সময় নিজ বাটীতে আসিতেন। সেই দেবীমূর্ত্তিকে তিনি যে ভুলিয়াছেন এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। সময়ে অসময়ে তাঁহার হৃদয়-মন্দিরে সেই মূর্ত্তি উঁকি মারিয়া তাঁহার চিত্তকে বিচলিত করিত। গুরুদেব ঋষিতুল্য ব্যক্তি, বুঝিতে পারিলেন শিষ্যের কোনরূপ মনঃপীড়া জন্মিয়াছে কিন্তু তিনি উহা প্রশমিত করিতে পারিতেছেন না। তিনি চিত্তসংযমের সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিতে লাগিলেন। অরবিন্দ ইহাতে বড়ই উপকৃত হইলেন। এইরূপ এক মাস পরে এক দিন সন্ধ্যায় মেঘাড়ম্বর দেখিয়া অরবিন্দ গুরুদেবের নিকট বিদায় লইয়া বাটী ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন। আশ্রমত্যাগ করিয়া সদর রাস্তায় দাঁড়াইয়া পশ্চিমদিকে যে প্রকাণ্ড একখানা কালো মেঘ উঠিয়াছে তাহাই দেখিতে লাগিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহার পশ্চাৎ হইতে এক জন তাঁহাকে একখানা ছোরার দ্বারায় আঘাত করিল, অরবিন্দ চীৎকার করিয়া ভূপতিত হইলেন। তাঁহার চীৎকার শুনিয়া গুরুদেব আসিয়া পথিকদিগের সাহায্যে তাঁহাকে আশ্রমের দ্বিতলের একটা নিভৃত কক্ষে শয়ন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি তোমাকে এরূপ আঘাত করিল ?"

উত্তরে অরবিন্দ বলিল, "বামনদাস ঘোষাল।"

ইহার পর অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হওয়াতে তিনি জ্ঞান হারাইলেন। পরমহংসদেব চিকিৎসক ডাকিলেন না, তিনি স্বয়ং চিকিৎসাশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন, নিজেই তাঁহার প্রিয়শিষ্যের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

সে দিন অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত অরবিন্দ অজ্ঞান অবস্থ ছিলেন। প্রায় তৃতীয় প্রহর রাত্রে তাঁহার চৈতন্যলা হইল। তখন তিনি শারীরিক যন্ত্রণায় অস্থির হই পড়িলেন। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন গুরুদেবে আশ্রমের একটী কক্ষে শয়ন করিয়া আছেন, আর গুরুদে নিকটে বসিয়া ক্ষতস্থানে মধ্যে মধ্যে কি ঔষধ লেপ করিতেছেন। অরবিন্দ পাশ ফিরিতে চেষ্টা করিলে কিন্তু দারুণ বেদনায় নড়িতে পারিলেন না।

অরবিন্দ একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা, অনেক বার যু আহত হইয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ গুরুতরভাবে কখন আহত হন নাই। জ্ঞানপ্রাপ্তি হইবামাত্রই বুঝিলেন, ে স্থানে বামনদাস ছোরা মারিয়াছে—ঐস্থানে আহত হইে মানুষের জীবন সংশয়, সেই জন্য জীবনের আশা ত্যা করিয়া ক্ষীণ অস্ফুট স্বরে গুরুদেবকে বলিলেন, "আ বুঝিতেছি যে আমার মৃত্যু নিকট—"

গুরুদেব আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "না না—সত্ব আরোগ্যলাভ করিবে।"

"মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার একটী গুরুতর কাজ করিতে হইবে, যদি উহা শেষ না করিয়া মারা যাই তাহা হইতে বিশেষ ক্ষতি হইবে।"

"কি কাজ ?"

"আমার মাতা নাই, পিতা নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই কিন্তু আমি অনেক ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, যদি এই বিষয়ের কোন বন্দোবস্ত না করিয়া আমার মৃত্যু হয় তাহা হইলে হয় উহা ফৌজদার বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবে নতুবা বার ভূতে খাইবে।"

"কিরূপ বন্দোবস্ত করিতে চাও ?"

"দীনদরিদ্রের ভরণ-পোষণের জন্য আপনার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া যাইব।"

গুরুদেব এই কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে রহিলেন, অরবিন্দের মুখেও একটী কথা নিঃসৃত হইল না—তিনি আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। গুরুদেব তাঁহার নাড়ী টিপিয়া দেখিলেন, জ্বরের প্রকোপ বড় বেশী। অরবিন্দকে তিনি পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন। এবার সন্ন্যাসীর মুখে চিন্তার রেখা দেখা দিল, তিনি যেন একটু অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই রূপ অবস্থাতে

র্যোদয় হইল। দুই দিবস কাটিল, তৃতীয় দিবসে বৈকালে ন্যাসিনী পদ্মাবতী আসিলেন, পরমহংস তাঁহাকে অর বিন্দের অবস্থা জানাইলেন ও কি প্রকারে এবং কাহার দ্বারা ইরূপ আঘাত বেচারা পাইয়াছে তাহাও জানাইলেন, দ্মাবতী বড় দুঃখিতা এবং চিন্তিতা হইলেন। সম্প্রতি রবিন্দের প্রতি তাঁহার ভক্তি শ্রদ্ধাও জন্মিয়াছিল, ঠিয়া গিয়া অরবিন্দের পার্শ্বে বসিলেন, তাঁহাকে অজ্ঞান বস্থায় দেখিয়া পরমহংসকে বৈদ্যদ্বারা চিকিৎসার জন্য নুরোধ করিলেন। কাশীধামে তৎকালের বিখ্যাত ভিষক্ বীদাস বৈদ্যকে সংবাদ পাঠান হইল। অপরাহ্নে তিনি াসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রোগীকে দেখিয়া পরমহংস-বকে বলিলেন, "দেব! যেরূপ চিকিৎসা আপনি বলম্বন করিয়াছেন, উহাই চলুক, উহার বেশী আমার না নাই।"

পদ্মাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতদিনে রোগী আরোগ্য-ভ করিতে পারেন?"

উত্তরে কবিরাজ বলিলেন,—"উহার জীবনের আশা ্যাগ করিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে।"

এবার সন্ন্যাসিনী অধিকতর চঞ্চল হইয়া তাঁহাকে জ্ঞাসা করিলেন,—"তবে চিকিৎসার উদ্দেশ্য কি?"

"পরমহংস ঠাকুরের চিকিৎসার বলে বাঁচিলেও বাঁচিতে ারেন।"

ইহা শুনিয়া পদ্মাবতী একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, রে অঞ্চলদ্বারা চক্ষু মুছিলেন। কিছুক্ষণ পরে পুনর্ব্বার জ্ঞাসা করিলেন, "কতদিন পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারেন?"

"রোগী এখন জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আছেন। াজ রাত্রিশেষে অথবা কাল রাত্রিশেষে বুঝিতে পারিবেন, য় তিনি আরোগ্যের পথে ধীরে ধীরে নয়, মরণের পথে ত অগ্রসর হবেন, সম্ভবতঃ কাল রাত্রি আর কাটিবে না।"

বৈদ্যরাজ এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। পদ্মাবতী পরমহংস নিঃশব্দে বসিয়া অরবিন্দের শুশ্রূষা করিতে াগিলেন। অরবিন্দের তিন কুলে কেহই ছিল না, কিন্তু াহার চরিত্রগুণে এক ঋষিতুল্য ব্যক্তি তাঁহার পিতৃস্থান ঋষিপত্নীতুল্যা পদ্মাবতী তাঁহার মাতৃস্থান অধিকার রিয়াছিলেন। এরূপ সৌভাগ্য প্রায় মানুষের অদৃষ্টে টে না।

সূর্য্যদেবকে অস্তগমনোন্মুখ দেখিয়া পরমহংসদেব পদ্মাবতীকে গৃহে যাইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি যাইতে স্বীকৃত হইলেন না, সমস্ত রাত্রি রোগীর সেবা করিবেন এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, কিন্তু পরমহংস তাঁহাকে বুঝাইলেন যে তাঁহার আশ্রমে অনেকগুলি যুবতী বাস করে, পাপিষ্ঠ বামনদাস ঘোষাল রাত্রিকালে নিশাচরের ন্যায় উহার নিকট ঘুরিয়া বেড়ায়। কি জানি রাত্রিযোগে যদি সে আশ্রমে প্রবেশ করিয়া কাহারও উপর অত্যাচার করে। পদ্মাবতী ইহা শুনিবা মাত্র যাইতে উদ্যত হইলেন, যাইবার কালে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন যে রাত্রিশেষে অরবিন্দের অবস্থা কিরূপ ঘটে তাহা যেন তাঁহার নিকট সংবাদ দেন। আর তাঁহার আশ্রমের এক জন পরিচারিকাকে তিনি রোগীর শুশ্রূষার জন্য পাঠাইবেন।

সন্ধ্যা অতীত হইলে পদ্মাবতী তাঁহার রোহিণী গোয়া-লিনী নামে পরিচারিকাকে ডাকিয়া উপদেশ দিলেন যে, আহারাদি করিয়া যেন সোতারাম পরমহংসের আশ্রমে গিয়া শয়ন করে ও বিন্দুবাসিনী নামে অপর একটী স্ত্রীলোককে,—যাহার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর—উপদেশ দিলেন যে, রোহিণীর সহিত গিয়া ঐ আশ্রমে একটী আহত ব্যক্তির শুশ্রূষা করে। এইরূপ কথা শুনিয়া অনেকে জিজ্ঞাসা করিল, আহত ব্যক্তি কে, কি প্রকারে আহত হই-য়াছে, কিন্তু পদ্মাবতী তাহাদের কথায় কোন উত্তর না দিয়া আপন কক্ষে গিয়া জপ করিতে বসিলেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ রোহিণী গোয়ালিনীর রূপচাঁদের সহিত রাস্তায় সাক্ষাৎ হয়। উভয়ের মনিব বাটী পাশাপাশি থাকায় পূর্ব্ব হইতে উভয়ের পরিচয় ছিল। রোহিণী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে কোন ব্যক্তি খুব বেশী রকম জখম হইয়াছে জান? কিসের জন্য, কে তাকে জখম কর্‌লে।"

উহা শুনিবামাত্র রূপচাঁদ বলিল, "তা'ত জানি না—তবে কথাটা শুনে বোধ হচ্ছে আমাদের অরবিন্দবাবুকে বামনদাস-বাবু জখম করেছেন, কেন না তিনি তিন দিন তাঁহার বাটীতে আসেন নি, তাঁহার গুরু বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, কিছুদিন তিনি তাঁহার আশ্রমে থাকিবেন।" রোহিণী ফিরিয়া আসিয়া সন্ন্যাসিনীদিগকে রূপচাঁদের অনুমানকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া স্পষ্টই বলিল যে, "অরবিন্দবাবুকে বামনদাসবাবু

ছোরা মেরেছেন। রূপচাঁদ তাঁহার মনিব-বাটীতে গিয়া তাহা বলিল। এই সংবাদ শুনিবামাত্র রূপচাঁদের মনিব-বাড়ীর স্ত্রীলোকদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। জয়াবতীর মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে রূপচাঁদকে বলিলেন, "তুমি শীঘ্র অরবিন্দের গুরুর আশ্রমে গিয়া তাহার সংবাদ নিয়ে এস, আমি তার জন্য বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছি।" জয়াবতী কোন কথা কহিলেন না, যেন একখানা কালো মেঘ চন্দ্রকিরণ ঢাকিল, নিঃশব্দে নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি ঘনান্ধকার, তৃতীয় প্রহরে চন্দ্রোদয় হইবে, এক্ষণে কাল মেঘে আকাশের নক্ষত্র ঢাকিয়াছে, প্রচণ্ড বায়ু বহিতেছে, কোলের মানুষ দেখা যায় না, এক একবার বিদ্যুতের আলোকে জনমানবশূন্য রাস্তা দেখা যাইতেছে, রাত্রি প্রহরাতীত হইয়াছে, এ সময়ে এই মহানগরী নিস্তব্ধ, পথ ঘাট নির্জ্জন, এই ভয়ঙ্কর নিশীথে দুইটী স্ত্রীলোক নিঃশব্দে পথে বাহির হইয়াছে, রাজ-পথ ত্যাগ করিয়া সংকীর্ণ গলির পথ ধরিয়া চলিতেছে, অগ্রগামিনী এক জন ইতর জাতীয়া, দেখিতে দীর্ঘাকায়া ও বলিষ্ঠা, পশ্চাদগামিনী ভদ্রমহিলা, যুবতী, মৃদুপদ সঞ্চালনে হাঁটিতেছেন, প্রথমা রোহিণী গোয়ালিনী, দ্বিতীয়া কে তাহা আমরা এখনো চিনিতে পারি নাই। রোহিণী গোয়ালিনীর হাতে একটী বড় ত্রিশূল। এই তিমিরাবৃত রাত্রিতে নির্জ্জন পথে আত্মরক্ষার জন্য বোধ হয় ঐ ত্রিশূল লইয়াছিল। বয়কনিষ্ঠ ভদ্রমহিলা, সশঙ্কচিত্তে, ধীরে ধীরে অন্ধকারে চলিতেছেন, রোহিণীকে মাঝে মাঝে সঙ্গিনীর জন্য দাঁড়াইতে হইতেছে। এক সময় সে বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ঠাকুরাণী চলে এসো না গা তোমার কি মনে ভয় ডর নেই।"

যুবতী উত্তরে বলিলেন, "এই যে আমি তোমার সঙ্গে সমান হাঁটচি চল চল, কত রাত হয়েচে ?"

রোহিণী বলিল, "কে জানে কত রাত হয়েছে, চলে এস।"

কিছুক্ষণ পরে তাহারা তোতারাম পরমহংসের আশ্রমের সম্মুখে আসিয়া পৌছিল, রোহিণী উহার দ্বারে করাঘাত করিবামাত্র এক ব্যক্তি রাস্তার অপর পার্শ্ব হইতে দ্রুত আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ রে মাগি বল্‌তে পারিস, এই বাড়ীতে অরবিন্দ রায় পড়ে আছে, সে বেঁচে আছে না মরেছে ?" রোহিণী উত্তর করিল, "তুই কে র‍্যা মিন্‌সে ?" এই কথা শুনিবামাত্র আগন্তুক "আমি তোর যম" বলিয়া বাম হস্তে তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। রোহিণী অত্যন্ত ক্রোধান্বিতা হইয়া তাহার হস্তস্থিত ত্রিশূল দ্বারা আক্রমণকারীকে বক্ষে আঘাত করিল। বেচারা সে আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে পরমহংসের এক জন শিষ্য দ্বারোদ্ঘাটন করিল ও এক ব্যক্তি আহত হইয়া রাস্তায় পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া পরমহংসদেবকে সংবাদ দিল, তিনি আসিয়া শিষ্যের সাহায্যে তাহাকে আশ্রমে লইয়া গিয়া নীচের তলায় একটী কক্ষে শয়ন করাইলেন ও রক্তস্রাব বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এতক্ষণ রোহিণীর সঙ্গিনী যুবতীটী আশ্রমের পার্শ্বে একটী অন্ধকার গলিতে লুকাইয়া ছিলেন, যখন পরমহংসদেব শিষ্যের সাহায্যে আহত ব্যক্তিকে আশ্রমের ভিতরে লইয়া যান, সেই সময়ে যুবতী অলক্ষ্যে আশ্রমের ভিতরে প্রবেশ করিলেন—আর রোহিণী গোয়ালিনী এক ব্যক্তিকে সাংঘাতিক আঘাত করিয়াছে ভাবিয়া ভয়ে অন্ধকারের মধ্যে লুকাইয়া পড়িল।

আহত ব্যক্তির শুশ্রূষাদি করিয়া রক্তস্রাব বন্ধ করিয়া পরমহংসদেব তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন ইনিই বামনদাস ঘোষাল। তার পর তিনি অরবিন্দকে দেখিতে আসিবার সময় দেখিলেন যেন কোন এক ব্যক্তি সিঁড়ির নিকট দাঁড়াইয়া আছে। আশ্রমে অপরিচিত স্ত্রীলোক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, অরবিন্দর শুশ্রূষার জন্য পদ্মাবতী তাহাকে পাঠাইয়াছেন। তাহাকে অরবিন্দের ঘরে লইয়া গিয়া কি ভাবে কখন ঔষধাদি দিতে হইবে তাহার ব্যবস্থা করিয়া ও সেবা শুশ্রূষার উপদেশ দিয়া পরমহংসদেব ফিরিয়া গেলেন। স্ত্রীলোকটীর মুখ আবৃত ছিল, সে জন্য তিনি তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পান নাই।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি তৃতীয় প্রহর হইয়াছে, ঝড় আসিয়াছে যেখানে ইতিপূর্ব্বে কালো মেঘ আকাশকে ছাইয়া ছিল সেখানে নক্ষত্রখচিত নীল নভোমণ্ডল প্রকাশ পাইয়াছে, ঈষৎ পশ্চিমে চন্দ্রোদয় হইয়াছে, পরমহংসদেবের আশ্রমের দ্বিতলের একটী কক্ষে বাতায়ন-পথ দিয়া চন্দ্রালোক প্রবেশ করিয়াছে, বাতায়নের নিকট একটী শয্যাতে অরবিন্দ শায়িত, তাঁহার শয্যাপার্শ্বে একজন যুবতী বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন। ইনি কে এ পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার পরিচয় পাই নাই, অরবিন্দের কি অবস্থা তাহাও বুঝিতে পারি নাই, তবে তিনি যে অজ্ঞান অবস্থায় আছেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। দেবদাস বৈদ্য-রাজ বলিয়া গিয়াছেন অদ্য রাত্রি শেষে তাঁহার ভাল মন্দ যাহোক একটা কিছু হবে, পরমহংসদেব শুশ্রূষাকারিণীকে এ কথা পূর্ব্ব হইতে জানাইয়া সাবধান করিয়া দিয়াছেন। যুবতী রোগীর মুখের দিকে পলক-হীন চক্ষে চাহিয়া আছেন ও ঔষধ খাওয়াইতেছেন, পরমহংসদেবও মুহুর্মুহুঃ আসিয়া তাঁহার নাড়ি টিপিতেছেন, যুবতী মৃদু মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু পরিবর্ত্তন দেখলেন কি ?"

পরমহংসদেব উত্তর করিলেন, "এ পর্য্যন্ত ত কিছুই বোধ হচ্ছে না।" যুবতী তাঁহাকে আরও দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাহার যথাযোগ্য উত্তর দিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার যাইবার পরেই অরবিন্দ পাশ ফিরিবার চেষ্টা করিলেন, অমনি যুবতী তাঁহাকে ধরিলেন ও তাঁহার কর্ণে দুই খানি ঠোঁট রাখিয়া বলিলেন, "নড়িবেন না, স্থির থাকুন।" এই মধুর কণ্ঠস্বর অরবিন্দের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি একবার মুহূর্ত্তের জন্য চক্ষু মেলিয়া যুবতীকে দেখিলেন, আবার চক্ষু বুজিলেন। কিছু ক্ষণ পরে আবার নড়িলেন, যুবতী আবার মধুর কণ্ঠে কানে কানে নিষেধ করিলেন; এইরূপ বারংবার করাতে অরবিন্দ আর একবার চক্ষু চাহিলেন, এবারে ধীরে ধীর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কোথায় ?"

যুবতী কহিলেন, "আপনার গুরুদেবের আশ্রমে, এখন কথা কহিবেন না, নড়িবেন না, এই দুধটুকু খান দেখি।" এই বলিয়া ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ দুই তিন ঝিনুক খাওয়াইলেন ও আপনার অঞ্চলদ্বারা তাঁহার মুখ মুছাইলেন। অরবিন্দ এখন বুঝিলেন যে কণ্ঠস্বরে তাঁহাকে কানে কানে বলিয়াছিল যে 'ছি এ বেশ কেন! বসন্ত দেখে যে কেঁদে মরবে' সেই কণ্ঠস্বর—নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ যেমন বিন্দু বিন্দু তৈল সঞ্চারে ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়, যুবতীর সহিত কথোপকথনে তাঁহার সেইরূপ প্রাণে জীবনী-শক্তি সঞ্চারিত হইল; ইতি মধ্যে পরমহংসদেব অরবিন্দকে দেখিয়া হাসি হাসি মুখে তাঁহার হাত ধরিয়া নাড়ি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি দীর্ঘায়ু হইবে, তোমার জীবনের আর কোন আশঙ্কা নাই।" ইহার পর অরবিন্দ গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন।

প্রভাতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। কক্ষমধ্যে উষার আলোক প্রবেশ করে নাই, কেন না ঐ দিবস উষার বায়ু বড় শীতল বুঝিতে পারিয়া শুশ্রূষাকারিণী গবাক্ষগুলি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। আবার পরমহংসদেব আসিয়া নাড়ি টিপিলেন, এবারে হাসিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছ।" তিনি উঠিয়া গেলে শুশ্রূষাকারিণী হাসি হাসি মুখে অরবিন্দের শয্যায় আসিয়া বসিলেন, তাঁহাকে দেখিবামাত্র অরবিন্দ বলিলেন, "আপনি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবেন না, আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন।"

যুবতী উত্তর করিলেন, "যতদিন না আপনি শয্যাত্যাগ করেন, ততদিন আমি ত আপনাকে ছেড়ে যেতে পারব না। যিনি আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন তার এই রকমই হুকুম।"

হায় নারী! অরবিন্দকে দেখিবার অতৃপ্ত বাসনা আজ তোমার লজ্জা সরমকে ভাসাইয়া দিয়াছে—বাঙালীর মেয়ের 'বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না' কথাটা তুমি মিথ্যা প্রমাণ করিয়া দিলে। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে যে দুর্গ রচনা করিতেছ তাহা যে এক দিন তাসেরি ঘরে পরিণত হইবে না তাহা কে বলিতে পারে ?

রমণীর কথায় অরবিন্দ অতিমাত্রায় আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "আপনি কে? আমি কি আমার জীবন-দায়িনীর পরিচয় জান্‌তে পারি না।"

"আমি পদ্মাবতী ঠাকুরাণীর প্রেরিতা সেবা-দাসী। পরমহংস ঠাকুরের অনুরোধে আপনার শুশ্রূষার জন্য তিনি আমায় এখানে পাঠিয়েছেন।"

"আপনাকে কি আমি কখনও দেখেছি ?"

"ভগবান্ জানেন আর আপনি জানেন।"

"আর একটা কথা, আপনি কি আমাকে বিশ্বনাথের মন্দিরে সন্ন্যাসী বেশ ত্যাগ করতে বলেছিলেন?"

"ওমা,—সে কি কথা!—এ সব কি রকম কথা! সন্ন্যাসী ঠাকুর, আপনার কি এখনও মাথা ঠিক হয় নি?"

"না, না, আমার মাথা এখন বেশ আছে, তবে জিজ্ঞাসা করি, আপনি, কি জয়াবতী?"

"জয়াবতী কে?"

"আমার মৃতা স্ত্রীর মামাত ভগিণী।"

"আপনার কি স্ত্রী নাই? তাঁহার মৃত্যু হয়েছে?"

"হাঁ, মৃত্যু হয়েছে, তাঁর জন্যই ত আমার এই দুর্দ্দশা ঘটেছে, সন্ন্যাসী হয়েছি।"

"স্ত্রী মরে গেলে কি কেউ সন্ন্যাসী হয়?"

"না, কিন্তু আমার স্ত্রীর মৃত্যুতে সে আমাকে চিরদুঃখী করে গেছে।"

"কেন?"

অরবিন্দ তখন যুবতীকে তাঁহার স্ত্রীর সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক ঘটনাগুলি ধীরে ধীরে বলিলেন। শুশ্রূষাকারিণী স্থির হইয়া শুনিলেন, পরে বলিলেন "গৃহে ফিরে আবার বিবাহ করে সংসারী হন না কেন?"

অরবিন্দ বলিলেন, "এ জন্মের মত আমি সে সুখে বঞ্চিত, এখন মৃত্যুর অপেক্ষা করছিলাম আপনি এসে ব্যাঘাত দিলেন।"

উভয়ে অনেকক্ষণ নীরবে রহিলেন, এখনও কক্ষ অন্ধকার সুতরাং কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পাইতেছে না; ইতিমধ্যে যে শিষ্যটী ঐ রাত্রে আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন তিনি অলক্ষ্যে আসিয়া যুবতীর পশ্চাৎ দিকের জানালাটী খুলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। যুবতী অসাবধানে ছিলেন, মুখাবরণ ছিল না, অরবিন্দ তাঁহার মুখ দেখিবা মাত্র চীৎকার করিয়া উঠিলেন, দেখিলেন সেই মহামহিমপ্রতিমাস্বরূপিণী দেবীমূর্ত্তি যাঁহাকে সন্ন্যাসিনীদিগের আশ্রমে দেখিয়া আর ভুলিতে পারেন নাই, যাঁহার সহিত তাঁহার মৃতা পত্নী কমলকুমারীর সাদৃশ্য তিনি দেখিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহার শয্যাপার্শ্বে। অরবিন্দ বিচলিত চিত্তে তাঁহাকে অনুনয় বিনয় করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" যুবতী আর মুখাবরণ না দিয়া সলজ্জে হাসিতে হাসিতে অরবিন্দের কাণের নিকট ঠোঁট দুখানি রাখিয়া বলিলেন—"আমি সেই।"

অরবিন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন "সেই কে?"

যুবতী উত্তর দিবার অবকাশ পাইলেন না, কেন না শিষ্যটী পুনরায় প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "আপনার মামীশাশুড়ী প্রভৃতি কয়েকজন স্ত্রীলোক আপনাকে দেখ্তে আস্ছেন।" ইহা শুনিবামাত্র শুশ্রূষাকারিণী যুবতী দ্রুতপদে পার্শ্বের কক্ষে প্রবেশ করিলেন ও দ্বারের অন্তরাল হইতে অরবিন্দের কক্ষের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন। ইতিমধ্যে অরবিন্দের মামীশাশুড়ী ও আর তিনজন স্ত্রীলোক তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নিকট বসিলেন। মামীশাশুড়ী অনেক কাঁদিলেন ও জয়াবতীর অদৃষ্ট সম্বন্ধে বিধাতাকে অনেক দুষিতে লাগিলেন এবং অরবিন্দকেও প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন; অবশেষে বলিলেন যে জয়াবতী তাঁহার সহিত আসিতে পারে নাই, সে রূপচাঁদের সহিত দুর্গাবাড়ীতে অরবিন্দের আরোগ্যের জন্য পূজা দিতে গিয়াছে। এইরূপ কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর রূপচাঁদ আসিল, সঙ্গে সঙ্গে পরমহংসদেবও আসিলেন। মামীশাশুড়ী রূপচাঁদকে একাকী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জয়াবতী কৈ?"

রূপচাঁদ বলিল, "ঐ ঘরে দাঁড়াইয়া আছেন?"

পরমহংস ঠাকুর অরবিন্দকে বলিলেন "গত রাত্রে এক প্রহর অতীত হইলে শিষ্য রামানুজ এক ব্যক্তিকে আহত অবস্থায় রাস্তায় পতিত দেখিয়া আমাকে সংবাদ দেয়, তাহাকে নীচের একটী কক্ষে রাখিয়াছি, জখম গুরুতর হইয়াছিল, অধিক রক্তস্রাব হওয়াতে অজ্ঞান হইয়াছে, তাহার চৈতন্যলাভ হইলে আমাকে নিজ পরিচয় দিয়াছে, আমি পূর্ব্বে তাহার নাম, তাহার অবস্থা, দৌরাত্ম্য ও তোমার প্রতি অত্যাচারের কথা শুনিয়াছিলাম, তাহাকে কখনও দেখি নাই—আজ দেখিলাম, তাহার নাম বামনদাস ঘোষাল।"

এই কথা শুনিবামাত্র জয়াবতীর মাতা একটা অস্ফুটশব্দ করিলেন, বিস্ময়ে তাঁহার মুখ হইতে বাক্য স্ফুরণ হইল না। পরে পরমহংসদেব বলিতে লাগিলেন, "বামনদাস উন্মত্ত হইয়াছিল, কিন্তু অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হওয়াতে এক্ষণে তার আর সে অবস্থা নাই, সে বলে

যে, জয়াবতী নাম্নী তাঁর স্ত্রীকে তুমি তাঁদের বাড়ী থেকে বার করে এনে এই কাশীধামে রেখেছে, সেজন্য তোমার জীবননষ্ট করে স্ত্রীকে উদ্ধার করবে—এই সঙ্কল্প সে করেছে; পরে গতরাত্রে তুমি জীবিত কি মৃত জানবার জন্যে আশ্রমের নিকট ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এমন সময়ে এক ত্রিশূলধারিণী ভৈরবী তাকে ত্রিশূলাঘাতে বিদ্ধ করে; এক্ষণে তাঁর যেরূপ শরীরের অবস্থা তাতে বেচারা স্থির করছে যে, তাঁর মৃত্যু অবধারিত। তাঁর পিতার মৃত্যুতে সে বহুতর সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। এখন সে বুদ্ধি পুনঃপ্রাপ্ত হয়েছে; সে বলে যে, জয়াবতী তাঁর শ্রাদ্ধাধিকারিণী ও বিষয়াধিকারিণী, সেইজন্য সে জয়াবতীর অনুসন্ধান করতেছে, কোন্ বাড়ীতে জয়াবতী বাস করে শিষ্য রামানুজকে বলে দাও, সে গিয়া তাঁকে আনবে।" অরবিন্দ জয়াবতীর মাতাকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইনি জয়াবতীর মাতা।"

পরমহংসদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জয়াবতী কোথা?"

"ঐ ঘরে আছে, আমি তাহাকে নিয়ে যাচ্ছি।"

"আসুন, আসুন।" বলিয়া পরমহংসদেব চলিয়া গেলেন। জয়াবতীর মাতা যে কক্ষে জয়াবতী দাঁড়াইয়াছিলেন সেই কক্ষে গেলেন, ও তৎক্ষণাৎ মুখভার করিয়া ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সঙ্গিনীদিগের সহিত জামাতাকে দেখিতে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে অরবিন্দের কক্ষে একটী যুবতী ঈষৎ অবগুণ্ঠনে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। অরবিন্দ তাঁহার শারীরিক গঠন ও অঙ্গচালনা দেখিয়া চিনিলেন যে, এই জয়াবতী। হাত বাড়াইয়া তাঁহার পদধূলি লইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু জয়াবতী সরিয়া বসিয়া তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ করিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কেমন আছ?"

অরবিন্দ বলিলেন, "বোধ হয় আপনাদের আশীর্ব্বাদে এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম।"

ইহার পর উভয়ে নীরব রহিলেন। ইতিমধ্যে অরবিন্দ জয়াবতীকে অলক্ষ্যে দেখিয়া লইলেন, তিনি সুন্দরী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কমলকুমারীর সহিত শারীরিক গঠনে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু কমলকুমারীর মুখের সহিত কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই, ইনি গৌরাঙ্গী বটে কিন্তু কমলকুমারীর বর্ণ সাদা ধবধবে ঈষৎ রক্তাভ, আর কমলকুমারীর মুখের সহিত জয়াবতীর মুখের তুলনা হয় না, কমলকুমারীর মুখের একটা মনোমোহিনী শক্তি ছিল যাহা সচরাচর দেখা যায় না। অরবিন্দ আর একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, সেই দেবীস্বরূপিণী যিনি তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছিলেন তাঁহার কণ্ঠস্বরের সহিত জয়াবতীর কণ্ঠস্বরেরও সাদৃশ্য আছে। অরবিন্দ এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে জয়াবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তোমায় দেখছে কে, সেবা শুশ্রূষাই বা করছে কে?"

"কেহ নহে, গুরুদেব মধ্যে মধ্যে আসিয়া দেখছেন ও ঔষধ খাওয়াচ্ছেন। আর গতরাত্রে যেন স্বপ্নের ন্যায় বোধ হচ্ছিল যেন কোন যুবতী আমাকে দুধ খাওয়াচ্ছেন, ঔষধ খাওয়াচ্ছেন, তিনি বলেন যে তিনি পদ্মাবতী সন্ন্যাসিনীর প্রেরিতা।"

"তুমি কি তাহাকে চেন?"

"না।"

"তবে অপরিচিত লোকের সেবা লইও না, সে কি খাওয়াইতে কি খাওয়াইবে। আমি তোমার শুশ্রূষা করব।"

এই বলিয়া নিকটস্থ একখানি পাখা তুলিয়া লইয়া বাতাস করিতে লাগিল।

পার্শ্বের কক্ষ-দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া যে শুশ্রূষাকারিণী যুবতীটী অরবিন্দের কক্ষের সকল কথাই একাগ্রচিত্তে শুনিতেছিলেন ও ঘরের লোকদের কার্য্যাবলী দেখিতেছিলেন তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মনে মনে বলিলেন, "আ, মলো! —আ, মলো!—সেই জয়াবতী! এ ত ভাল লোক নয়! আপনার স্বামী মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া আছে, তাহার সেবা-শুশ্রূষা না করিয়া পরের স্বামীকে বাতাস করছে! উহার মাতা উহাকে স্বামীর সেবার জন্য লইয়া যাইবার চেষ্টা করিল, গেল না—পরের স্বামীকে বাতাস করতেছে! আবার বলে 'আমি তোমার সেবা শুশ্রূষা করব', ছি—ছি—ছি!"

আমরা বলি, জয়াবতীকে 'ছি' দাও কেন ঠাকরুণ! তুমি কি করিতেছ! তুমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া অরবিন্দের সেবা করিয়াছ, তাহাকে ঔষধ দুধ খাওয়াইতেছ, বাতাস

করিয়াছ, আবার তাহার কাণের উপর রাঙ্গা ঠোঁট দুই-খানি রাখিয়া কত কথা কহিয়াছ, শেষে অঙ্গীকার করিয়াছ—যতদিন অরবিন্দ শয্যায় পড়িয়া থাকিবেন ততদিন তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবে না। ঠাকরুণ, তোমার কি পরকে 'ছি' দিবার অধিকার আছে!

অরবিন্দ জয়াবতীর হস্ত হইতে পাখা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "না দিদি তোমায় বাতাস করতে হবে না, তোমার ও মামীর স্নেহ যত্ন আমি এ জীবনে ভুলতে পারব না।"

উত্তরে জয়াবতী বলিল,—"মা তোমাকে স্নেহ-যত্ন করেন বটে কিন্তু আমার—আমার স্নেহের কথা কচ্ছ কেন? আমার স্নেহ-যত্নের চিহ্ন কি দেখেছ ভাই? আমি কি কখনও তোমার সাম্‌নে বেরিয়েছি, না, তোমার সঙ্গে কথা কয়েছি।"

কথা কয়টী বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল, তিনি কিছুতেই আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না।

পার্শ্বের কক্ষে যুবতীটী আবার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জয়াবতীকে গালি দিতে লাগিলেন, এবার ভাবিলেন, এই শয্যাশায়ী সুন্দর সন্ন্যাসীর রূপ দেখিয়া জয়াবতী চিত্তের সংযম হারাইয়াছে—মরিয়াছে, নতুবা এরূপ ব্যবহার করে কেন?

ইতিমধ্যে জয়াবতীর মাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, "আমি জামাইকে আমার বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে চিকিৎসা করাব। জামাইয়ের আর সে উন্মাদের অবস্থা নেই, এখন তার বেশ জ্ঞান হয়েছে, শান্ত ও শিষ্ট হয়েছে, সে এপর্য্যন্ত কমলকুমারীকে স্ত্রী-বোধে এরূপ করে বেড়াচ্ছিল, এক্ষণে সে ভ্রম তার দূর হয়েছে, জয়াবতীকে কখনও দেখে নাই, দেখতে চাচ্ছে, আমি বলেছি আমার বাড়ী গেলে তার সঙ্গে দেখা হবে।" এই বলিয়া অরবিন্দকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় লইলেন। জয়াবতীকে তাঁহার সহিত যাইতে হইল, চক্ষের জল বড় বেশী পড়িতে লাগিল, যাইবার সময় পশ্চাৎ ফিরিয়া অন্তের অলক্ষ্যে অরবিন্দকে দেখিতে লাগিলেন। এদৃশ্য পার্শ্বের কক্ষের যুবতীর চক্ষু এড়াইল না। আবার গালি দিতে লাগিলেন, "মরণ, মরণ, তুমি কবে মরবে!"

ইঁহারা কক্ষত্যাগ করিয়া গেলে অরবিন্দ পার্শ্বের কক্ষের দিকে চাহিলেন, সেইদিকে হঠাৎ একবার যেন বিদ্যুৎ চমকাইল, মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে শুশ্রূষাকারিণী যুবতী অরবিন্দের শয্যার উপরে আসিয়া বসিলেন ও অরবিন্দকে বাতাস করিতে লাগিলেন। অরবিন্দ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

যুবতী বলিলেন "আমি সেই!"

অরবিন্দ বলিলেন, "সেই কে?"

যুবতী বলিলেন, মনে নাই! গঙ্গাতীরে এক দিন তুমি আমাকে দেখে—আমি তখন বালিকা—বললে 'তুমি আমার সঙ্গে যাবে?' আমি বললাম 'কোথা যাবে?' বললে 'আমি যেখানেই যাই তুমি আমার সঙ্গে যাবে?' আমি বলেছিলাম 'যাব,' কই তুমি ত আমায় নিয়ে গেলে না—আমি সেই।"

অরবিন্দ ঈষৎ চীৎকার করিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতে গেলেন, যুবতী তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া শোয়াইলেন। অরবিন্দ কাঁদিয়া বলিলেন, "সে যে আমার স্ত্রী কমলকুমারী।"

যুবতী বলিলেন, "আমি সেই কমলকুমারী, আমি মরি নি।"

বিস্ময়ভরে অরবিন্দ বলিল,—"তুমিই আমার স্ত্রী কমলকুমারী।"

যুবতী হাসিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ—গো—হ্যাঁ—আমিই তোমার স্ত্রী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, আমি জলে ডুবে মরি নি। যখন তুমি বর্দ্ধমানের যুদ্ধক্ষেত্রে অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিলে তখন আমি পদ্মাবতী সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাকে খুঁজে বার করি, তোমাকে অজ্ঞান অবস্থায় একটী কুটীরে রাখি, তোমার জ্ঞান হলে একবারমাত্র চক্ষু চেয়ে আমাকে দেখবামাত্র তুমি চক্ষু বুজলে, ভাবলাম আর আমার মুখ দেখবে না। পরে তোমাকে নবাবের লোকেরা নিয়ে গেল, তার পর তোমাকে স্বচ্ছন্দ অবস্থায় দেখে আমি ৺কাশীধামে এলাম। সেই অবধি পদ্মাবতী সন্ন্যাসিনীর আশ্রমে বাস করছি।"

তখন বিহ্বল অরবিন্দ কমলকুমারীর হস্ত ধরিয়া নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন—

তাঁহার চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু দর দর বেগে বহিতে লাগিল, কমলকুমারী কাঁদিতে কাঁদিতে অঞ্চল দ্বারা স্বামীর চক্ষু মুছাইতে লাগিলেন।

আমরা বলি—

"দু'জনে দু'জনে পেয়ে দু'জনার মুখ চেয়ে
অনিবার ঝরিছে নয়ন।"

অনেকক্ষণ পরে অরবিন্দ বলিলেন, "কমল, প্রাণের কমল, তুমি আর আমাকে ছেড়ে যাবে না ?"

"না, যাব না, যতক্ষণ না—যমরাজ তলব করেন।"

"না, না, পদ্মাবতী সন্ন্যাসিনী যদি তোমাকে কেড়ে নিয়ে যান ?"

"সাধ্য কি !—স্বয়ং যমরাজ সাবিত্রীর মৃতপতিকে তার কাছ থেকে যখন কেড়ে নিতে পারেন নি তখন হিন্দু রমণী, পরোপকারিণী, সেবাব্রতধারিণী, উদার-হৃদয়া সন্ন্যাসিনী পদ্মাবতী দেবী-স্বরূপিণী হয়ে স্ত্রীকে স্বামীর কাছ থেকে কি কেড়ে নিতে পারেন !"

এই ঘটনার এক মাস পরে এক দিন অপরাহ্ণে গঙ্গা-তীরে একটা শ্বেত দ্বিতল-গৃহের বারান্দায় দুই ব্যক্তি দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন,—একটী যুবাপুরুষ অপরটী যুবতী। যুবকের মুখ দেখিলে বোধ হইবে তিনি সম্প্রতি ক্ষৌরদ্বারা শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল পরিষ্কৃত করিয়াছেন আর লম্বিত কেশগুলি কাটিয়া আধুনিক বঙ্গীয় যুবকদের মত কেশ-বিন্যাস করিয়াছেন। বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়, শরীরের গঠন হৃষ্টপুষ্ট, সম্প্রতি যেন কথঞ্চিৎ কৃশ হইয়াছেন, গলায় যজ্ঞোপবীত আর গাত্রে একখানি উত্তরীয়,—ইনিই জমীদার অরবিন্দ রায়, আর যুবতীটী অপ্সরোনিন্দিত সুন্দর—হস্তে, কণ্ঠে ও কর্ণে স্বর্ণালঙ্কার বিভূষিতা, পরিধানে একখানি রাঙ্গাপেড়ে শাটী,—ইনিই কমলকুমারী—স্বামীর নিকট দাঁড়াইয়া গ্রীবা বাঁকাইয়া হাসিতে হাসিতে কি বলিতেছেন, গ্রীবাভঙ্গীর সহিত কর্ণাভরণ দুলিতেছে ও চিকুচিক্ করিতেছে, অরবিন্দ মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহাই দেখিতেছেন।

* * * *

ওদিকে বামনদাসের চিকিৎসা হইতে লাগিল। জয়াবতীর মাতা সেকেলে পাকা গিন্নী, জয়াবতীর স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির অভাব দেখিয়া তাহাকে স্বামী-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন। বামনদাসের প্রকৃতির সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তিনি ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। জয়াবতী এইরূপ এক মাস স্বামীর সেবা করিতে করিতে তাঁহার প্রতি ভাবান্তর হইল, শ্রদ্ধা-ভক্তি জন্মিল, অবশেষে ভালবাসাও জন্মিল, অরবিন্দকে তিনি ভুলিয়া গেলেন। বামনদাস সম্পূর্ণ আরোগ্য হইলে জয়াবতী ও তাহার মাতাকে লইয়া বৰ্দ্ধমানে আসিয়া পৈতৃক বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন।

সমাপ্ত

বেদান্তে উপাসনা-তত্ত্ব

[অধ্যাপক শ্রীমাধবদাস বিদ্যাবিনোদ সাংখ্যতীর্থ এম-এ]

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, বেদান্ত মতে উৎপত্তি, লয়, সাধক, মুমুক্ষু ও মুক্ত বলিয়া কোন কথা নাই; সুতরাং উপাসনা একটা কথার কথা, ইহার কিছুমাত্র উপযোগিতা নাই*। উপাসনার প্রকৃত অর্থ ভগবৎপ্রাপ্তি বা তত্ত্বজ্ঞান। ব্রহ্মস্বরূপ বা আত্মস্বরূপ অবগতির জন্য বেদান্তের প্রবৃত্তি†; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বাক্য যে নিতান্ত অসার ও ভিত্তিহীন, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত কোন প্রয়াসেরই প্রয়োজন নাই।

জগৎ, জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্মের সম্বন্ধে জ্ঞান ও তাহাদের স্বরূপানুভূতিই মানুষ মাত্রের পরম ও চরম উদ্দেশ্য ও উপাসনার ফল। জীব স্বীয় কর্ম্মবশে উত্তম, মধ্যম বা অধমগতি প্রাপ্ত হয়। বেদাদি শাস্ত্র-বিহিত উপাসনার দ্বারা তাহার কর্ম্মবীজ ক্ষয় হয় এবং বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ কর্ম্ম তাহাদের ফল প্রসব করিতে পারে না। এই উপাসনা বা সাধনাদ্বারা জীব প্রজাপতির ক্রমসৃষ্টির বিপরীত অর্থাৎ বিলোমক্রমে উর্দ্ধে উন্নীত হইয়া থাকে। এইরূপে সে বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ, তুরীয় ও তুরীয়াতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া চির পূর্ণানন্দভোগী হয় এবং তারপর নির্ব্বাণ অবস্থায় ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়।‡ এই অবস্থাই শ্রুতিতে তুরীয়-তুরীয়, ঈশ্বরগ্রাস, ও মৃত্যু-মৃত্যু প্রভৃতি সংজ্ঞায় কথিত হইয়াছে।

সাধন-প্রণালীর বিচারের পূর্ব্বে জীবকর্ত্তৃক সৃষ্ট অবস্থা-সকল অর্থাৎ "জাগ্রদাদি বিমোক্ষান্তা" জীবের বিবরণ অবগত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

জীবের স্বভাবই এই যে, সে অখণ্ড অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করিতে চায়, অজ্ঞানমূলক অভাব, ভয়াদির তাড়না সে সহ্য করিতে পারে না, এই অভাব ও ভয়াদির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার ইচ্ছায় কখনও বা বিষয়ের সেবা করে এবং কখনও বা বেদোক্ত আচরণ ও যোগ অবলম্বন করিয়া থাকে।

বিষয়াসক্ত ব্যক্তির আত্মজ্ঞানের আশা দুরাশামাত্র; সুতরাং পুনঃ পুনঃ বিষয়ের দোষ দর্শন করিয়া সংসারে বিরাগ উৎপন্ন হইলে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস ও দীর্ঘকালব্যাপী আসেবাদ্বারা উহার স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। এইরূপে ক্রমে অভাব ও দুঃখের হাত এড়াইয়া জীব স্বীয় অভিলষিত পদ প্রাপ্ত হইবে। তখন আর সংসারে তাহার আসক্তি থাকিবে না, সে সর্ব্বদা পদ্মপত্রের জলের ন্যায়

---

* "ন নিরোধো নচোৎপত্ত র্নবদ্ধো নচসাধকঃ।
ন মুমুক্ষু র্নবৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥"

† "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—ব্রহ্মসূত্র ১।১।

‡ ব্রহ্মবিৎ পরমাপ্নোতি শোকং তরতি চাত্মবিৎ।
রসো ব্রহ্মরসং লব্ধ্বানন্দী ভবতি নান্যথা॥

বিশ্ব—স্থূলশরীর বা জাগ্রৎ অবস্থা। ইহার নাম বিরাট্। ভাগবত (২।১।২৫) বিরাট্ শরীরের এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন—

"অণ্ডকোষে শরীরেঽস্মিন্ সপ্তাবরণসংযুতে।
বৈরাজঃ পুরুষো যোঽসৌ ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ॥"

পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার ও মনকে সপ্তাবরণ কহে। বিষয় ইন্দ্রিয়ের সংযোগের নাম জাগ্রৎ অবস্থা।

তৈজস—সূক্ষ্মশরীর বা স্বপ্নাবস্থা। ইহা হিরণ্যগর্ভ নামে কথিত। কঠোপনিষদের—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"

দ্বারা এই হিরণ্যগর্ভকে লক্ষ্য করা হইতেছে।

প্রাজ্ঞঃ—যঃ প্রকৃষ্টতয়া চরাচরস্য জগতো ব্যবহারং জানাতি স প্রজ্ঞঃ। প্রজ্ঞঃ এব প্রাজ্ঞঃ। কারণশরীর বা সুষুপ্তি অবস্থা। ইহা ঈশ্বর রূপে ব্যপদিষ্ট।

জাগ্রৎ সংস্কারের নাম স্বপ্ন, সংস্কারশূন্য আবিদ্যিক জ্ঞানের নাম সুষুপ্তি।

তুরীয়—সমাধি অবস্থা—প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ।

তুরীয়াতীত—আত্মজ্ঞানাবস্থা—জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির সংযোগ।

"তুরীয়মীশঃ সাক্ষী চ পরমাত্মাঽক্ষরস্তথা।
কূটস্থো জগদাধারো নিষেধাবধি চেত্যপি।
বৃহত্বাৎ বৃংহনত্বাচ্চ ব্রহ্মসংজ্ঞা প্রবর্ত্ততে॥"

বিষয়ের সংস্পর্শে আসিয়াও তাহা দ্বারা লিপ্ত হইবে না। জীবের এই অবস্থার নামই জীবন্মুক্তাবস্থা। লোকে সাধারণ কথায় বলিয়া থাকে "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি—অভীষ্ট লাভের অন্তরায় অনেক। মোক্ষাবস্থার প্রতিবন্ধক বিঘ্ন-সমূহ অবিদ্যাসম্ভূত। এই অবিদ্যার নিবারণ-চেষ্টাই সাধনা।

যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ব্রত প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে জীব যমনিয়মাদি* অষ্টাঙ্গযোগ অবলম্বন করিবে। এই সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা শমদমাদি সাধন সম্পন্ন হইলে, জীব ব্রহ্ম বা আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসার অধিকারী হইবে। এই জন্য রামগীতাতেও উক্ত হইয়াছে—"স্ব স্ব আশ্রম-বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে জীব সমুদয় কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করিয়া, সাধন সম্পত্তি-যুক্ত হইয়া আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করিবেন†।

অধিকারী না হইয়া কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়; কারণ উহাতে পণ্ডশ্রম হয় মাত্র। এই জন্য হিন্দু-শাস্ত্র অধিকারী সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়াছেন। শাস্ত্রারম্ভের পূর্ব্বেই তাঁহারা "অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ের" বিচার করিয়াছেন‡। বেদান্তসারেও এই মর্ম্মে বলা হইয়াছে যে, অধিকারী যথাবিধি বেদাঙ্গ ও বেদ অধ্যয়ন করিয়া এবং তাহার অর্থ অবগত হইয়া ইহ জন্মে ও জন্মান্তরে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের বর্জ্জন পূর্ব্বক যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত ও নিত্য-নৈমিত্তিক স্বকর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা নির্ম্মলচিত্ত হইবেন এবং তৎপর সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা করিবেন।

মোক্ষাভিলাষী বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমূহের প্রত্যাহার করিয়া বহির্গমন-প্রবণ§ ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্ম্মুখ করিবেন এবং শ্রদ্ধা-সম্পন্ন (২) হইয়া শাস্ত্র ও গুরুবাক্যানুসারে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিয়া আত্মবিদ্যালাভে অগ্রসর হইবেন। এইরূপে ক্রমে উর্দ্ধে লয় প্রাপ্ত হইয়া আত্ম-স্বরূপানু-ভূতিরূপ মুক্তিলাভে সমর্থ হইবেন। এইজন্য ভগবান্ বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরং সংযতেন্দ্রিয়ঃ"।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জীব প্রজাপতিক্রমসৃষ্টির বিলোম প্রণালীতে উর্দ্ধে উন্নীত হইয়া থাকে। উপাসনা বুঝিতে হইলে এই সৃষ্টিতত্ত্বের জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। তাই আমরা উপনিষদের সৃষ্টি-প্রণালী সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

জগতের স্বরূপ লইয়া বাদিগণের মধ্যে আবহমান কাল হইতে বিবাদ চলিয়া আসিতেছে, ইহার কখনও মীমাংসা হইবে কি না, তাহাও ভবিষ্যতের অন্ধকার-গর্ভে নিহিত। প্রত্যেকেই স্বাধীন-সত্ত্বা বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর, কেহ কাহাকে নিজগণ্ডী হইতে সূচ্যগ্র-ভূমি প্রদান করিতেও নারাজ; সুতরাং মীমাংসার আশা সুদূর-পরাহত। আরম্ভ-বাদী ন্যায় ও বৈশেষিকগণ নিত্য ও সৎ পরমাণু হইতে অসৎ অর্থাৎ পূর্ব্বে ছিল না এরূপ দ্ব্যণুকাদির এবং ঐ দ্ব্যণুকাদি হইতে জগতের উৎপত্তি হয় বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে ভাবরূপে বিদ্যমান হওয়ার নাম সৎ। পরিণামবাদী সাংখ্য ও পাতঞ্জল প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে প্রকৃতি সৎ, সুতরাং প্রকৃতির পরিণাম জগৎও সত্য। পূর্ব্বমীমাংসা-মতে উৎপত্তিপ্রলয়-বিশিষ্ট জগৎ সিদ্ধ বস্তু, ইহা নিত্য, কখনও ইহার ধ্বংস হইবে না। বেদান্তমতে ব্রহ্মাশ্রিত মায়া হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। মায়াতুচ্ছ অর্থাৎ পরমার্থিক সত্ত্বাশূন্য পদার্থ, সুতরাং জগৎ মিথ্যা, সদ্বস্তু ব্রহ্মে উহা কল্পিত। চার্ব্বাক-মতে জগৎ অনাদি ও স্বয়ং সিদ্ধ। জগতের অন্তর্গত কার্য্যের উৎপত্তি ও নাশ স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। জৈনগণের মতও চার্ব্বাকেরই অনুরূপ। শূন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধগণের মতে অসৎ হইতে সৎজগতের আকস্মিক উদ্ভব হইয়াছে। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন যে, জগতের কোন বাহ্য অস্তিত্ব

* যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধ্যানধারণসমাধয়ঃ অষ্টাবঙ্গানি। পতঞ্জল

† আদৌ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা সমসাদিতশুদ্ধমানসঃ।
সমর্প্য তৎ পূর্ব্বমুপাত্তসাধনঃ সমাশ্রয়েৎ সদ্‌গুরুমাত্মলব্ধয়ে॥

‡ বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অধিকারী এই চারিটির নাম অনুবন্ধ।

§ পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুঃ তস্মাৎ পরাক্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্ত চক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥

(২) গুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা।

নাই, ক্ষণিক অন্তর বিজ্ঞান দোষহেতু বাহ্যাকারে প্রতীত হইয়া থাকে। বাহ্যাস্তিত্ববাদী সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন যে, জগতের বাহ্যসত্তা রহিয়াছে, কিন্তু উহা ক্ষণিক অর্থাৎ ভাবপদার্থ মাত্রেই উৎপত্তির পরক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায়। আধুনিক মতাবলম্বী কেহ কেহ অভাব হইতে ঈশ্বরদ্বারা ভাব-জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন। কেহ মনুষ্য ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডের অংশকে প্রকৃতি, আবার কেহবা জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যবর্ত্তী জগৎকে প্রকৃতি বলিয়া থাকেন।

উপরি উল্লিখিত মতগুলি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, কেহ জগৎকে সত্য, কেহ অসত্য কেহ সত্যাসত্য এবং কেহবা সদসৎ বিলক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এখন দেখা প্রয়োজন এই চারিটী মতবাদের মধ্যে কোন্‌টী বিচারসহ। প্রকৃতিকে মনুষ্যের জ্ঞানগোচর ব্রহ্মাণ্ডের অংশবিশেষ বলিয়া স্বীকার করিলে জগৎকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করিতে হয়, বিশেষতঃ মানবের সাধারণ জ্ঞানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ না করিলে বস্তুপদার্থের সম্যক্ উপলব্ধি অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং দার্শনিককে বৈজ্ঞানিকের ন্যায় জগতের অতি ক্ষুদ্রতম অসম্পূর্ণ অংশকে গ্রহণ করিয়া পরীক্ষা-কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে এবং পরে তাহা হইতে অতীন্দ্রিয়তত্ত্বে পৌঁছিতে হইবে। সুতরাং দার্শনিকের সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিকেরই মত অসম্পূর্ণ ও ভ্রম-সঙ্কুল থাকিয়া যাইবে। গুণজাত ইন্দ্রিয়সকল কখনও কোনপদার্থের প্রকৃতস্বরূপ প্রদর্শন করিতে পারে না, উহা সর্ব্বদা অনুমানের দ্বারাই জানা যায়। যেহেতু সত্তামাত্রই ব্যক্তিনিষ্ঠ এবং ইন্দ্রিয় ব্যক্তি-নিরূপণে অক্ষম। ইন্দ্রিয় শুধু তদ্‌গম্য গুণ বা ধর্ম্মই উপলব্ধি করিতে পারে। করণের স্বভাবই স্বজাতীয়ের অনুভব; ইহাদ্বারা বিসদৃশ পদার্থের উপলব্ধি হয় না। তবে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানদ্বারা সূচিত হেতু হইতে বহির্জগতের অস্তিত্বের অনুমান হইতে পারে। কাহারও মতে মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধি-বৃত্তিই বহির্জগতের অস্তিত্বের প্রমাপক। কিন্তু ইহা প্রমাণ-সিদ্ধ নয় বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কেহ কেহ বা বলেন যে, বাধা বা প্রতিরোধই বহির্জগতের অস্তিত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহার সত্যতা-নিরূপণ করিতে হইলে আমাদিগকে নিবিষ্টভাবে কার্য্য-কারণ বাদের অনুসরণ করিতে হইবে। কার্য্যকারণবাদের নিগূঢ় রহস্য এই যে, কারণ ছাড়া কখনও কার্য্য উৎপন্ন হয় না অর্থাৎ কার্য্য মাত্রেরই একটী ব্যাখ্যা আছে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক ঘটনাই ঘটনান্তরের সহিত নিত্য-সম্বদ্ধ। আমাদের ধারণার অন্তর্গত অভিপ্রায় সর্ব্বদাই অসম্পূর্ণ ও অসন্তোষকর, সুতরাং তাহারই পূর্ণতার জন্য আমরা বিষয়ান্তরের অনুসন্ধান করিয়া থাকি। সেই অভিপ্রায়ের পূর্ণতা-সূচক বিষয়ান্তরই বহির্জগদ-রূপে বিদ্যমান আছে বলিয়া আমরা মনে করি, কিন্তু প্রকৃতির বা ক্রিয়ার বাধা দেয় বলিয়া আমরা বহির্জগতের অনুমান করি না। কার্য্যকারণবাদের ধারণা পূর্ব্বে না থাকিলে কেবলমাত্র প্রবৃত্তি বা ক্রিয়ার বাধা দ্বারা কিছুই অনুমিত হইতে পারে না। ইহা দ্বারা শুধু আন্তরিক-ধারণাসমূহের অন্তর্গত অভিপ্রায়ের সার্থকতা ও সম্বন্ধভাব অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া থাকে, কিন্তু বহির্জগতের জ্ঞান জন্মে না।

বহির্জগৎ মানব মাত্রেরই সাধারণ প্রত্যক্ষের বিষয়। যাহা কেবল ব্যক্তিবিশেষের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত, সকলের নহে, তাহা কখনই জড় জগৎ হইতে পারে না। অতএব আমাদের সদৃশ মানুষের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মিলেই জড় জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মিতে পারে। সাধারণ মতানুসারে বাধার অনুভব হইতে বহির্জগতের অস্তিত্ব অনুমিত হয়, কিন্তু আমাদের সদৃশ মনুষ্যের অস্তিত্ব তাহার বিপরীত ক্রমে অনুভূত হইয়া থাকে। ইহা শুধু সাদৃশ্যের অনুভব হইতে উৎপন্ন হয়। মানুষ তাহাকে অন্য মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও স্বাধীন মনে করিলেও তাহাদের উভয়ের ভোগের জন্য যে বহির্জগৎ আছে তাহাতে বিশ্বাস-সম্পন্ন থাকে। এইরূপে স্বীয় সত্তা, সদৃশ মানুষের সত্তা ও বহির্জগৎ, এই ত্রিবিধ সত্তার উপলব্ধি হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ সত্তার মধ্যে অনুস্যূত জড়-জগৎ ও জীব-জগৎকেও প্রকৃত সত্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না।

জীব জগৎ ও জড়-জগৎ আপাত দৃষ্টিতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, বাস্তবিকপক্ষে তাহা নহে। জড়-জগৎ জীবজগতের জ্ঞানেরই বহির্বিকাশমাত্র। আবার এই জীবজগৎ ও জড়-জগৎ বলিয়া যাহা কথিত তাহা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত, ইহাদের কাহারও স্বাধীন

সত্ত্বা নাই। যে সকল বস্তু সম্পূর্ণ পৃথক্ ও স্বাধীন তাহারা কোন কারণেই পরস্পর মিলিত হইতে পারে না এবং মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে পারে না। সুতরাং জীব-জগৎ ও জড়-জগতের স্বতন্ত্র সত্ত্বা যে অযৌক্তিক ও অসঙ্গত তাহাতে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না।

আত্মার সহিত জীব ও জড়-জগতের সম্বন্ধ জানিতে হইলে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ইহা শুধু ব্রহ্মের অনন্ত জ্ঞানেই প্রকাশিত-মনুষ্য, জ্ঞানে নহে। সুতরাং মানুষ স্ব-স্বরূপালব্ধির পূর্ব্বে নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড-জ্ঞান-সম্পন্ন হইতে পারে না। এই জ্ঞান দুই প্রকারে অর্জ্জিত হইতে পারে—১ সূক্ষ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হইতে জগতের জ্ঞান, ২ এবং স্থূল অর্থাৎ প্রপঞ্চ জ্ঞান হইতে ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্ম স্বরূপাবাপ্তি।

এইরূপে উপাসনাও কর্ম্মাঙ্গ ও জ্ঞানাঙ্গ ভেদে দ্বিবিধ হইয়া থাকে। প্রপঞ্চের ভিতর দিয়া ব্রহ্মসত্ত্বার উপলব্ধির নাম কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা এবং ব্রহ্মসত্ত্বার ভিতর দিয়া প্রপঞ্চ দর্শনের নাম জ্ঞানাঙ্গ উপাসনা।

বৈদিকমতে জীব অনুৎপদ্যমান অর্থাৎ জীবের জন্ম হয় না, অবিকৃত পরমাত্মাই ঈশ্বর, জীব ও জগদ্রূপে ভাসমান হইয়া থাকে। সুতরাং জগৎ, জীব ও ঈশ্বরের প্রতীতি অনাদিসিদ্ধ মায়া দ্বারা কল্পিত*। ঈশ্বর মায়া-সৃষ্ট দেহে অনুপ্রবেশ করিয়া থাকেন+। ঈশ্বর সকল ব্যষ্টিজীবের মস্তক বিদীর্ণ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করেন ও উহার চৈতন্য ও স্পন্দনশক্তি সঞ্চারিত করেন। জীব অল্পজ্ঞ, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ এবং জগৎ প্রপঞ্চময় ও পরিচ্ছিন্ন, ইত্যাদি জ্ঞানও অবিদ্যাকল্পিত। একমাত্র ব্রহ্মই তত্ত্ব, জীব ও ব্রহ্মের অভেদ স্বাভাবিক ও ভেদ অবিদ্যানিবন্ধন। ব্রহ্মবিদ্যা অবিদ্যার নিবারণ করিয়া অপরিমিত ব্রহ্মভাব জন্মাইয়া থাকে। অবিদ্যাবশতঃ জীব দেহাদি উপাধিতে আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে এবং দেহাদির ধর্ম্ম সকলকে নিজের ধর্ম্ম মনে করিয়া ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত যোনিতে স্বীয় কর্ম্মানুসারে ভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন শরীর ধারণ করে। এইরূপে মোক্ষের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বার বার সংসারগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রকরণে বৃহদারণ্যকের জ্যোতিঃ ব্রাহ্মণে ও শারীরিক ব্রাহ্মণে এই সকলের বিস্তারিত বিবরণ আছে। জীব স্বীয় বিদ্যা, কর্ম্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞা অনুসারে ভোগোপযোগী শরীর ও উপভোগের সাধনপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের জ্ঞানকে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা বলে, ইহা অপূর্ব্বকর্ম্মারম্ভের ও কর্ম্ম-বিপাকের অঙ্গ। জীব পরলোকে কর্ম্মফলভোগ করিয়া অনারব্ধ-কর্ম্মবশে পুনরায় কর্ম্ম করিবার জন্য মর্ত্তলোকে আগমন করে।

ব্রহ্মের জীবেশ্বর ভাবের বিস্তৃত বিবরণ ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। আমরা বাহুল্য ভয়ে সে সকলের এখানে উল্লেখ করিলাম না।

স্থূল, লিঙ্গ ও কারণ ভেদে শরীর প্রধানতঃ তিন প্রকার। বাসনা কারণ-শরীরের গতাগতির নিয়ামক। কাম-ক্রোধাদি লিঙ্গ-শরীরের এবং বাতপিত্তাদি স্থূল-শরীরের স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিয়া থাকে। সাধনপ্রণালীর সৌকর্য্যের নিমিত্ত শরীরকে—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোশে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই জন্যই মনুষ্যদেহ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিকল্পিত হয়**। দেবতাগণ ও ঋষিগণ দিব্যশরীর, মন্ত্রময় শরীর ও মানস শরীর ধারণ করিয়া থাকেন+। অবিদ্যা-কল্পিত লিঙ্গ-শরীরে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব আভাস চৈতন্য অহঙ্কারের অভিমানী কর্ত্তা ও ভোক্তা‡। পঞ্চস্থূলভূত পঞ্চীকৃত§ হইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি

---

* জীবেশ্বরাদিরূপেণ চেতনাচেতনাত্মকম্
ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তঃ সৃষ্টিরীশেন কল্পিতা
জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকল্পিতঃ।

মহোপনিষৎ ৪।৭৩, পঞ্চদশী ৬।২১২—১৩, বরাহোপনিষৎ ২।৫৪।

\+ ছান্দগ্য ৬।৩।২, তৈত্তিরীয় ২।৬।২, ঐতরেয় ৩।৫, বৃহদারণ্যক ২।৫।১৮ কৌষীতকি ৪।২০ ইত্যাদি।

** শাণ্ডিল্যোপনিষৎ ১।৬ ; যোগতত্ত্বোপনিষৎ ৮৪।৯১।৯৭।

\+ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ৫।১ ; ঐতরেয় উপনিষৎ ২।১।১ ; যোগশিখোপনিষৎ ৪৬।১৬০।

‡ শ্বেতাশ্বতর ৭।১২।

§ বেদে পঞ্চীকরণের কথা নাই, ত্রিবৃৎকরণের কথা আছে। (ছান্দোগ্য) ৬।৩।৩৫ পৈঙ্গল, ঐতরেয় কঠরুদ্রোপনিষৎ প্রভৃতিতে পঞ্চীকরণ প্রণালী প্রদত্ত হইয়াছে। পঞ্চীকরণ প্রণালীতে প্রত্যেক ভূতকে অর্দ্ধাংশ করিয়া সেই অর্দ্ধাংশের সহিত অন্য ভূতচতুষ্টয়ের প্রত্যেকের অর্দ্ধাংশের চারিভাগের ১ভাগ করিয়া মিশ্রিত করিতে হয়।

করে। তমোগুণ-প্রধান মায়াভিভূত পঞ্চতন্মাত্র হইতে স্থূল পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়। পঞ্চীকৃত রাজোংশ হইতে পঞ্চপ্রাণ এবং পঞ্চীকৃত সত্ত্বাংশ হইতে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে। আদি কর্ত্তা, মায়ী, আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম মায়োপহিত হইলে গুণত্রয়ের বৈষম্য উপস্থিত হয়। এই বৈষম্যের নামই সৃষ্টি।

এই সৃষ্টি ও সংহার-চক্রের নাম সংসার-বৃক্ষ। ইহা কোথাও চিত্তবৃক্ষ আবার কোথাও বা ত্রৈলোক্য-বৃক্ষ নামে কথিত হইয়াছে। কঠোপনিষদের (২।৩।১)—

"ঊর্দ্ধমূলোহবাক্‌শাখ এষোহশ্বত্থঃ সনাতনঃ
তদেব শুক্রন্তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে
তদুনাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ।

দ্বারা, এবং গীতার (১৫।১)—

"ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ সবেদবিৎ॥"

প্রভৃতি এই সংসার-বৃক্ষেরই বর্ণনা করিতেছেন। ভগবান্ এই সংসার-বৃক্ষের বর্ণন পরবর্ত্তী শ্লোক সমূহে অতি সুন্দর ভাবে করিতেছেন। সংসার-বৃক্ষের কতকগুলি শাখা ঊর্দ্ধদিকে এবং কতকগুলি শাখা অধোদিকে গমন করিতেছে। অর্থাৎ পাপপরায়ণ জীব ক্রমে পশু, পাখী ও কীটাদি অধমযোনি প্রাপ্ত হইতেছে। আর পুণ্যশীল মানব স্বীয় সুকৃতিবশে দেবযোনি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধে উন্নীত হইতেছে। এইরূপে এই মহাবৃক্ষের শাখা মর্ত্তলোক হইতে অবীচি পর্য্যন্ত অবরোহণ এবং মনুষ্য-লোক হইতে সত্য-লোক পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছে। ইহার মূল ঊর্দ্ধে ব্রহ্মে লগ্ন। তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে এই বৃক্ষের শাখাপল্লবাদি কিছুরই অনুভব থাকে না। অনাদি অবিদ্যাপ্রযুক্তই ইহা অতিশয় বদ্ধমূল হইয়া আছে। এক মাত্র অনাসক্তিরূপ শাস্ত্রদ্বারাই ইহাকে ছিন্ন ভিন্ন করা যাইতে পারে।

নৃসিংহ-পুরাণ এই সংসার-বৃক্ষের বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিতেছেন—অব্যক্ত অনাদি নিধন ব্রহ্ম এই সংসার-বৃক্ষের মূল। বুদ্ধি ইহার স্কন্দ এবং ইন্দ্রিয় সমূহ কোটর-স্থানীয়। মহাভূত ও সূক্ষ্মভূত সমূহ ইহার পত্র ও শাখা। ধর্ম্মাধর্ম্ম ইহার পুষ্প এবং সুখদুঃখ ইহার ফল। ভূত সমূহ এই ব্রহ্মবৃক্ষই আশ্রয় করিয়া আছে। এই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া জীব মোহগ্রস্ত হইয়া থাকে। পাপ-পরায়ণ ব্যক্তি-গণ ইহা ছেদন করিতে পারে না; কিন্তু ধীর ব্যক্তি জ্ঞানরূপ তীক্ষ্ণ অসিদ্বারা ইহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে। তথা হইতে সে আর ফিরিয়া আসে না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে যোগ-মার্গ অবলম্বন করিয়া এই জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হয়। জ্ঞানাঙ্গ ও কর্ম্মাঙ্গ-সাধনার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ মাত্র করা হইয়াছে, এখন ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

দেহী মাত্রে ব্রহ্মসত্ত্বা অব্যাহত থাকিলেও তিনি মনোপস্থিত জীবের উপকার করিতে পারেন না। এই জন্য সাধনার প্রয়োজন। তাই সাধক বলিতেছেন—

"গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গপোষণম্।
নিঃসৃতং কর্ম্মসংযুক্তং পুনস্তাসাং তদৌষধম্॥
এবং স হি শরীরস্থঃ সর্পবৎ পরমেশ্বরঃ।
বিনা চোপাসনাদেব ন করোতি হিতং নৃষু॥"

বেদান্তে বহুবিধ সাধনার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অহংগ্রহ, অপ্রতীক, প্রতীক সম্পৎ, সংবর্গ, যজ্ঞাঙ্গ ও কর্ম্মাঙ্গ উপাসনাই প্রধান। উপাস্য পরমাত্মার আত্ম-অভেদে উপাসনার নাম অহংগ্রহ উপাসনা। ব্রহ্মবিকারো-পাসনা অর্থাৎ প্রতীকোপাসনা ব্যতীত অন্য সকলই ব্রহ্ম ধ্যান হইবে; ইহাই অপ্রতীক উপাসনা। পর্য্যঙ্কবিদ্যা, দহরবিদ্যা, উপকোশলবিদ্যা, মধুবিদ্যা, শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতি ইহারই অন্তর্গত। মনই ব্রহ্ম, সূর্য্যই ব্রহ্ম, নামই ব্রহ্ম-ইত্যাদি উপাসনার আলম্বনকে প্রতীক বলে। ইহা অব-লম্বন করিয়া যে উপাসনা করা হয় তাহাকে প্রতীকোপাসনা বলে। শালগ্রামাদিতে বিষ্ণু প্রভৃতির উপাসনা অর্থাৎ নামরূপের উপাসনা ইহার অন্তর্গত। চিত্তস্থৈর্য্যের নিমিত্ত এই উপাসনার প্রয়োজন। যৎকিঞ্চিৎ সাম্য বা সাদৃশ্য দৃষ্টে কোন এক উৎকৃষ্ট বস্তুর সহিত তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তুর অভেদ চিন্তা সুস্থির হইলে তাহা সম্পৎ উপাসনা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যেমন মনোবৃত্তি অসংখ্য, বিশ্বদেবতাও অসংখ্য; সুতরাং মনকে বিশ্বদেবতা জ্ঞানে উপাসনা করার নাম সম্পৎ উপাসনা। ক্রিয়া সম্বন্ধ দৃষ্টে

বা ক্রিয়া সম্বন্ধ লইয়া ধ্যান-প্রবাহ উত্থাপিত করার নাম সংবর্গ বিদ্যা বা সংবর্গ ধ্যান। বায়ু প্রলয় কালে অগ্নি প্রভৃতির সংহার করে, প্রাণও সুষুপ্তি কালে বাক্য প্রভৃতির সংহার করে, ইহা দেখিয়া প্রাণের সহিত বায়ুর অভেদ চিন্তা করা। জ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়া শক্তির আশ্রয় প্রণবাদি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মোপাসনার নাম যজ্ঞাঙ্গ উপাসনা। হবিঃসংস্কার যেমন যজ্ঞ-কার্য্যের অঙ্গ, আত্ম-সংস্কারও সেই-রূপ ব্রহ্মোপাসনার অঙ্গ। আত্মার সংস্কারের নিমিত্ত নিজেকে ব্রহ্মভাবে ভাবনা করার নাম কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা। ইহাদের মধ্যে আবার অহংগ্রহ, প্রতীক ও সম্পৎ উপাসনা শ্রেষ্ঠ। মানুষ প্রধানতঃ এই ত্রিবিধ উপাসনাই করিয়া থাকে।

নির্গুণ ব্রহ্ম উপনিষৎজ্ঞান-বেদ্য, সুতরাং উপাসনার সৌকার্য্যার্থে সগুণ ও সপাদ ব্রহ্ম কল্পনা করা হইয়া থাকে। এইজন্য তন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—নির্গুণস্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কল-স্যাশরীরিণঃ। সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা। এই সগুণ ও সপাদ ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞান হইয়া থাকে। জগৎকর্ত্তা, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বকর্ম্মা, অধিষ্ঠাতা অন্তর্যামী, সর্ব্বকাম প্রভৃতি বিশেষণ ব্রহ্মার গুণের দ্যোতনা করিয়া থাকে। চতুষ্পাৎ, ষোড়শকল, বিশ্বমূর্ত্তি, বৈশ্বানর, কং খং প্রভৃতি বিশেষণ ব্রহ্মের পাদ-দ্যোতক।

এই সকল গুণপাদ ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ (১)। ইহা হইতেই তাহার গুণপ্রাপ্তি ঘটে। এই সগুণ ব্রহ্মই নিরাকার ও সাকার ভেদে সমুদয় আস্তিক-সম্প্রদায়ের উপাস্য। কর্ম্মযোগ জ্ঞান-যোগের অঙ্গ হইলেও কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয় হইতে পারে না। অতএব কর্ম্মযোগী ব্রহ্ম-জ্ঞানের অধিকারী নহে।

তাই অধিকরণ-মালায় উক্ত হইয়াছে—

"ন্যায়চর্চ্চেয়মীশস্য মননব্যপদেশভাক্।
উপাসনৈব ক্রিয়তে শ্রবণান্তরমাগতা॥
অনন্যচিত্ততা ব্রহ্মনিষ্ঠাসৌ কর্ম্মঠে কথম্।
কর্ম্মত্যাগী ততো ব্রহ্মনিষ্ঠামর্হতি নেতরঃ॥"

এই সকল সগুণ উপাসনার লক্ষ্য যে নির্গুণ ব্রহ্ম যোগী যাজ্ঞবল্ক্য তাহা স্পষ্ট বলিতেছেন—উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ। মুণ্ডক শ্রুতিতেও (২।২।৬) এই তত্ত্ব ধ্বনিত হইতেছে—

"প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥"

পথের শেষে

[শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ]

১

পথের শেষে সামান্য একটা কুটীর। দেখিলেই মনে হয় কে যেন ইহাকে গ্রামের সমাজ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে।

মৃত্যুঞ্জয় স্মৃতিরত্নের নাম ও যশ তখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গ্রামের লোকেরা সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করে। তাঁহার মত নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ না কি এ যুগে বড় একটা দেখা যায় না।

বৃদ্ধবয়সে তিনি পুত্র যোগীনের বিবাহ দিলেন। বধূ এক ধনীর কন্যা, নাম মালতী। যোগীন দেখিতে ছিল কার্ত্তিকের মত। সেই জন্য ভবিষ্যতে তাহাকে ঘরজামাই করিবার অভিপ্রায়ে শ্বশুরমহাশয় এই বিবাহে মত দেন।

মালতী শ্বশুরগৃহে আসিয়া একমাত্র স্বামী ছাড়া আর কাহাকেও আপনার করিতে পারিল না। পিতৃগৃহের সম্পদ স্মরণ করিয়া সে অন্তরে অন্তরে এই দরিদ্র স্বামিগৃহের প্রতি এক তীব্র ঘৃণা পোষণ করিল।

যোগীন পড়িত কাব্য, ব্যাকরণ ও স্মৃতি। এই পড়া শোনা ওঠাকুর-সেবা লইয়াই তাহার সারাদিন কাটিত। রাত্রে যখন মালতী তাহার অনিন্দ্য রূপরাশি লইয়া তাহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিত, তখন তাহার স্নেহ, ভক্তি, প্রীতি ও সেবা একীভূত হইয়া তাহারই পূজায় ব্যাপৃত হইত। সে এই নব-পরিণীতা পত্নীকে কি ভাবে গ্রহণ করিবে তাহা ঠিক করিতে পারিত না।

কিছু দিন কাটিল। তার পর মালতী স্বামীর নিকট নানা আবদার সুরু করিল। একদিন সে স্পষ্টই বলিয়া ফেলিল, "কত লোকে স্ত্রীকে কত উপহার দেয়, তুমি কিন্তু আমাকে কিছুই দিলে না।"

কথাটা যোগীনের অন্তরে মাঝে মাঝে ধ্বনিত হইয়া উঠিত। তার পর স্মৃতিরত্ন মহাশয় যখন বুঝিলেন বৈবাহিক মেয়ে-জামাইকে তাঁহার ঘরেই চিরদিনের জন্য আবদ্ধ করিতে চান তখন তিনি বধূকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে রাজী হইলেন না। মালতী শ্বশুরগৃহেই রহিল, কিন্তু ক্রমশঃ তাহার অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

স্মৃতিরত্ন মহাশয় একদিন স্বর্গলাভ করিলেন। যোগীন দেখিল পত্নী আর স্বামিগৃহে থাকিতে চায় না। সে নানা উপায়ে তাহার মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

এক দিন বিষয়সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া সে এক বাক্স গহনা প্রস্তুত করাইয়া পত্নীকে উপহার দিল, পত্নী কিছুক্ষণ তাহা নাড়া চাড়া করিয়া বাক্সটী অনাদরের সহিত দূরে নিক্ষেপ করিল।

যোগীন মর্ম্মাহত হইল। ইহার কিছু দিন পরে শ্বশুর মহাশয় কন্যাকে স্বগৃহে লইয়া আসিলেন। তার পর জামাই শ্বশুরবাড়ী গেল না, বধূও স্বামিগৃহ ত্যাগ করিল।

কিন্তু যোগীন আর বিবাহ করিল না। সে ঠাকুর-সেবা ও পিতার টোলে অধ্যাপনাকার্য্যে মাতিয়া রহিল।

তার পর পাঁচ বৎসর এই ভাবে কাটিয়া গেল।

২

পথের শেষে একটী দোতলা খোলার ঘরে আজ দশ দিন হইল সে বাস করিতেছে। এটি মুসলমানপাড়া। রাস্তা আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ। দিন দিন সেগুলি বাড়িয়া ওঠে। দু-চারিটা কুকুর মাঝে মাঝে ধুলা, ছাই ও মাটি, কাঁকর এদিকে সেদিকে ছড়াইয়া তাহাদেরই মধ্যে নিভৃত শয়ন নির্ম্মাণ করে। কখনও কখনও সন্তানসন্ততির সহিত কুক্কুটজননীরা সেখানে বিচরণ করিতে আসে এবং তাহাদের মৃত্তিকালেখন, কলরব ও কলহে সে পাড়ার অলক্ষ্মী জাগ্রত হইয়া ওঠেন।

তখন শ্রাবণ মাস। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িয়া সেই নোংরা পথটাকে ছোটখাট একটী নরককুণ্ডে পরিণত করিল। ঘন কৃষ্ণ মেঘরাশি আকাশে পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। দেখিলে মনে হয় এ জল শীঘ্র থামিবে না।

কিন্তু জল থামিল। মালতী তখন খোলার চাল ভেদ করিয়া যেখানে বিন্দু বিন্দু করিয়া জল পড়িতেছিল সেখানে একটা বালতী রাখিয়া একটু তন্দ্রাবিষ্ট হইয়াছে, এমন সময় একটি শিশুর ক্রন্দনধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল।

বহু দিন এরূপ শিশুকণ্ঠের ক্রন্দন কোথাও সে শুনিতে পায় নাই। মনে পড়িল ছেলেবেলায় তাহারএকটী ভায়ের কণ্ঠে সে এইরূপ শব্দ শুনিয়াছিল। তার পর যৌবনের কথা।— পিতা যথাসময়ে তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন; কিন্তু বিবাহের অল্পকাল পরেই তাহাকে বাপের বাড়ী ফিরিতে হয়; পাঁচ মাস পরে তাহার একটি শিশুসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। তার পর এক বৎসর পরে হঠাৎ এক দিন শিশুটী ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া গেলে মালতী বুঝিল তাহার সংসারবন্ধন সবই ঘুচিয়া গিয়াছে।

নিজ সন্তানের রোদনধ্বনি সে কিছু দিন শুনিয়াছিল। তার পর তাহার জীবনপ্রবাহ একটা নূতন পথ অবলম্বন করিল।

পিতা ছিলেন বৈষ্ণব। তিনি মালতীকে কীর্ত্তনের সুরে গান করিতে শিখাইয়াছিলেন। ছেলেবেলায় তাহার গান শুনিবার জন্য সন্ধ্যার পর পাড়াপড়সীর ভিড় নিতাই লাগিয়া থাকিত।

ধনী পিতার সংসারে কিছুকাল তাহার বেশ সুখেই কাটিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর একটা মোকর্দ্দমায় বিষয়-সম্পত্তি প্রায় সবই নষ্ট হইয়া গেল।

স্বামী নাই, পুত্র-কন্যা নাই, আত্মীয়-স্বজনও নাই বলিলেই চলে। এই নিরাশ্রয় অবস্থায় মালতী বুঝিল কেহ তাহাকে চালাইবার নাই, যদি চলিতে হয় নিজের মতেই চলিতে হইবে।

সে নিজের মতেই চলিল। যে কখনও নিজের মতে চলে নাই, তাহার নিকট এ চলা শুধু ভয় নয় একটা আনন্দেরও সঞ্চার করে। নূতন সাঁতার শিখিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়ার আনন্দ সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল, সঙ্গে সঙ্গে একটু ভয়ও হইল, পাছে সে একটা অজানা বিপদের আবর্ত্তে পড়িয়া যায়।

কিছু দিন পরে সে দেখিল তাহার শেষ অবলম্বন মঙ্গলা পিসীও গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হইয়াছে। এই পিসীটির সুনাম ছিল না। মালতীর সঙ্গে তাহার সম্বন্ধটাও কিরূপ ছিল তাহা আমাদের ঠিক জানা নাই। তবে তিনি যে তাহার পিতার ভগিনী ছিলেন না, এবং তাঁহারই পরামর্শে যে সে নবজাত সন্তানটীর ভরণপোষণের জন্য পিতার মৃত্যুর পর তাহার ভিটাটী পর্য্যন্ত এক মামলাবাজ দালালকে বিক্রয় করিয়া হাজার খানেক টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল এ কথা গ্রামের অনেকেই জানে। শিশুটী যখন মারা যায় তখন মালতী এক ব্রাহ্মণের ঘরে রাঁধুনীর কাজ করে ও মঙ্গলা পিসী দিনে দুইবার তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া যায়। এই অবস্থায় কিছু দিন কাটিল। হঠাৎ এক দিন সে চাকুরী ছাড়িয়া মনিবের অজ্ঞাতে কোথায় চলিয়া গেল।

তাহার খোঁজ করা গ্রামের লোকেরা আবশ্যক মনে করিলেন না, কারণ মালতী গ্রাম ছাড়িয়া যাক্ ইহাই তাঁহাদের আন্তরিক কামনা ছিল।

মালতীর সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলা পিসীও গ্রাম ছাড়িলেন। বাস্তবিক তিনিই তাহার পথের একমাত্র সহায়; এই নিরাশ্রয় অবস্থায় কিরূপে নিজের ভরণ-পোষণ করিতে হয়, তাহা মঙ্গলা পিসী শিখাইয়াছিলেন, তিনিই তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে তাহার রূপ-বহ্নিতে অনেকে সর্ব্বস্ব আহুতি দিতেও কুণ্ঠিত হইবে না।

এই মঙ্গলা পিসী তাহাকে সকল কাজেই সহায়তা করিতেন। যখন তিনিও এ জগৎ ছাড়িতে বাধ্য হইলেন তখন তাহার সাহস পুরা মাত্রায় বাড়িয়া উঠিল। সে লালসার বহ্নির দিকে পতঙ্গের মত ছুটিয়া চলিল। বিচার বিবেচনার অবকাশ হয় ত দু একবার আসিয়াছিল, কিন্তু তখন সে শক্তিহীন—অক্ষম। এখন একটা দ্বিতল খোলার ঘরে সে একাকী কাল কাটায়।

আকাশ অন্ধকার করিয়া মেঘের দল আবার বর্ষণ আরম্ভ করিল। মালতী শুনিল সেই শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনি ক্রমশঃ বর্ষণের শব্দে অভিভূত হইয়া পড়িতেছে।

বৃষ্টি থামিল। আবার সেই শব্দ। এখন তাহা আরও ব্যাকুল, তীব্র ও সুস্পষ্ট। মালতীর সুপ্ত মাতৃত্ব হঠাৎ আজ অতীত দিনের একটী শিশুর ক্রন্দনধ্বনি স্মরণ করিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে কাঠের সিঁড়ি দিয়া ত্বরিত গতিতে নীচে নামিয়া আসিল।

প্রশস্ত রাজপথের ফুটপাথে দাঁড়াইয়া সে দেখিল

[শিল্পী—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন] সন্ধ্যার সমুদ্র [শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে
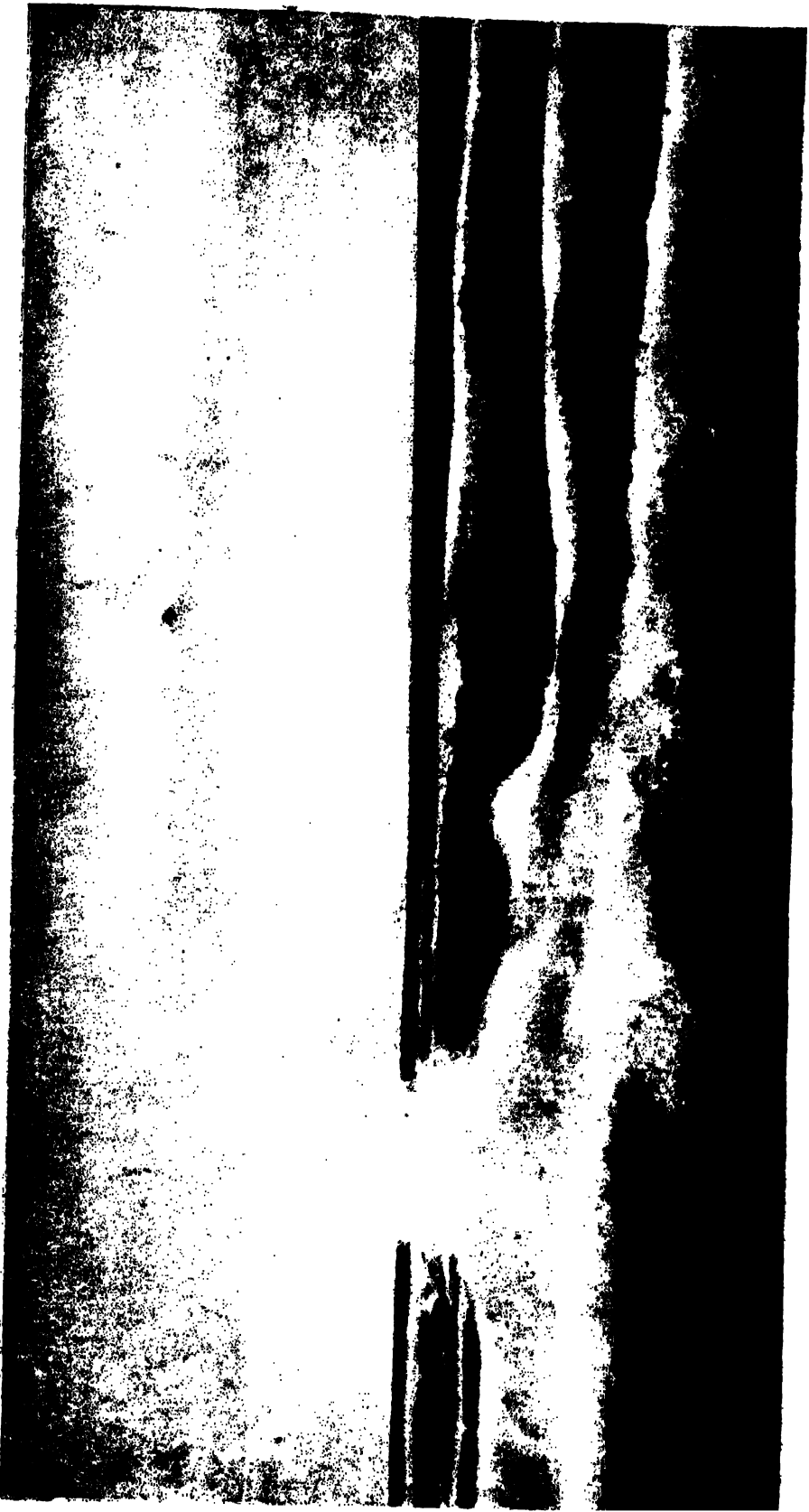
নিকটেই সাধারণের জন্য একটি স্নানাগার—তাহার কাছেই লোকের ভিড়। মালতী শুনিল এই স্নানাগারের মধ্যে একটী শিশু পড়িয়া আছে।

সে অগ্রসর হইল। ভিড়ের মধ্য দিয়া সে স্নানাগারে প্রবেশ করিয়া শিশুটির নিকটে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, মুহূর্ত্তের জন্য কি ভাবিল, একবার চারিদিকে তাকাইল, তার পর সহসা তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া দ্রুতপদে এমন ভাবে আপনার বাসার দিকে চলিয়া গেল যে রাস্তার লোকে স্থির করিল নিশ্চয় এই রমণী শিশুটীর জননী, সেইজন্য জিজ্ঞাসার বিষয় কিছু থাকিলেও তাহা করিতে কেহ সাহস পাইল না। সকলেই নিশ্চিন্ত মনে নিজ নিজ কাজে চলিয়া গেল।

৩

মালতী শিশুটিকে মায়ের মত পালন করিতে লাগিল। একটু বড় হইলেই সে তাহাকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিল। সে লেখাপড়াও শিখিল, ইহাতেও তাহার কতকগুলি কুৎসিত অভ্যাস ঘুচিল না। সে মালতীর বাক্স হইতে টাকা কড়ি প্রায়ই চুরি করিত, কোন ভদ্রলোকের সহিত মিশিতে পারিত না।

মালতী তাহার নাম রাখিয়াছিল হারাধন। হারাধন সদাই অসন্তুষ্ট। মালতীর গর্ভজাত পুত্র হইলে হয় ত সে এতটা হইতে পারিত না।

তখন সহরে তাহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে; নানা বাদক ও গায়ক একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন—কীর্ত্তন গানে মালতী অদ্বিতীয়া। তাহার গান শুনিবার জন্য ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই ব্যাকুল হইয়া ওঠে।

শীঘ্রই তাহার অবস্থা ফিরিল। অসংযত বিলাসের মধ্যে সে আত্মবিসর্জ্জন করিল—একটা নেশার আবেশে তাহার দিনগুলি এক একটী উৎসব-দিনের মত কাটিতে লাগিল। হারাধনও যাহা চাহিল, তাহার চতুর্গুণ লাভ করিয়া বসিল।

কিন্তু কিছুতেই তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিল না। কেবলই সে মালতীর নিকট জামা কাপড়, খেলনার আব্দার করিয়া বসিত। মালতীও সে আব্দার মিটাইতে কালবিলম্ব করিত না।

এক দিন সে তাহার দুই চারি জন সঙ্গিনীর সহিত গঙ্গাস্নান করিতে চলিল। তখন বর্ষার শেষে শরতের নূতন আলোক গাছপালা, অট্টালিকা প্রভৃতিকে একটা নূতন সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে। চারিদিকে বাধাহীন প্রসন্নতা, কোথাও মালিন্যের লেশ নাই। এই শরতের আলোক আজ মালতীর হৃদয় মন্থন করিয়া কত অতীত স্মৃতিকে জাগরিত করিয়া তুলিল; এক জন সঙ্গিনী বলিল, "কি রে, তুই যে বেহুঁস হয়ে পড়্লি, ব্যাপার কি বল্ ত।"

মালতী বলিল, "ব্যাপার কিছুই নয়, তবে শরীরটা ভাল মনে হচ্ছে না।"

গাড়ী থামিল নিমতলার ঘাটে। তাহারা শুনিয়াছিল—এই ঘাটে এক জন সন্ন্যাসী আছেন, তিনি না কি মানুষের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সবই বলিয়া দিতে পারেন। সকলে ঠিক করিল স্নানের পর সন্ন্যাসীকে দেখিতে যাইবে।

স্নানের পর তাহারা একটী বটগাছের নিকট আসিয়া দেখিল মৌনী সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন; কয়জনেই তাহার নিকটে আসিয়া বসিল। মালতীর মনে হইল যেন সে কোথায় সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছে। এক জন চেলা বলিয়া উঠিল, "তোমরা এখানে কেন, ঠাকুর কথা কইবেন না, তোমাদের সঙ্গে।"

এক জন রসিকা হাসিয়া জবাব দিল, "আচ্ছা কথা কন কি না, তা আমরা দেখে নেবো।"

সন্ন্যাসী কিন্তু কথা কহিলেন, বলিলেন, "আমি কিন্তু তোমাদের শুধু একটী কথারই জবাব দেব। ধর্ম্মকথা ছাড়া অন্য কথার উত্তর পাবে না।"

ধর্ম্মকথার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না। চেলা রাগিয়া উঠিল, বলিল "তোমরা এখনই চলে যাও।"

পাঁচ সাতটী নারীকণ্ঠের হাস্যপ্রবাহে প্রতিহত হইয়া চেলার ক্রোধ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "চুপ কর।" তার পর তিনি মালতীর দিকে চাহিলেন বলিলেন "তোমাকে দুটো কথা বলতে চাই—তবে আজ নয়।"

৪

কিছুক্ষণ পরে সকলে উঠিল। এক জন মালতীর গা ঠেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোর হোলো কি না, কথা কইছিস্ না যে।"

অপরে জবাব দিল, "সন্ন্যাসী ওকে দেখে ভুলেছে কি না, তাই উনি গরবিনী রাই সেজেছেন।"

মালতী কথা কহিল না, অপর এক জন রমণী সঙ্গে সঙ্গে তাহার কক্ষদ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল, তার পর কিছু গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ভাই তোর এমন ভাব লাগল?"

মালতী বলিল, "ভাই, ঠিক বল্‌তে পারছি না কেন আমার মনটা এমন হয়ে আস্‌ছে।"

রমণী বলিল, "না, ভাই, তুই সত্য কথা বল্‌ছিস্ না সব গোপন কর্‌ছিস।"

মালতী বলিল "ভাই, আমরা এক বাড়ীতে থাকি, তুইই আমার আত্মীয়-স্বজন সব, তোকে মিথ্যে বলে আমার লাভ কি ভাই?" তাহার কণ্ঠস্বর এতই ধীর ও করুণ হইয়া আসিল, যে রমণী আর তাহাকে কোন প্রশ্ন করিতে পারিল না, সে ধীরে ধীরে স্বস্থানে চলিয়া গেল।

বাক্স খুলিয়া মালতী দেখিল—এক খানি দশ টাকার নোট পাওয়া যাইতেছে না। মালতী ডাকিল "হারা"। হারাধন তখন বাড়ীতে ছিল না, মালতী গঙ্গাস্নান করিতে যাইবার সময় তাহার উপরই কিন্তু গৃহরক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়াছিল।

একটু পরেই হারাধন দেখা দিল, মাকে ঘরে দেখিয়া একটু ত্রস্তভাবেই বলিল "মা আমি কোথাও যাই নি, এই খানেই ছিলুম।"

মালতী বলিল "বাক্স হতে নোট গেল কোথায়?"

হারাধন বলিল, "বাক্সের ভেতর হতে নোট কোথায় গেল তা' তুমিই জান।"

"তা হলে তোকে জিজ্ঞাসা কো'রবো কেন?"

"আমার বদনাম রটাতে হ'বে ত।"

"তা হলে কি লাভ?"

"লাভ এই যে—আমায় তাড়াতে পারবে—একটা বদনাম না দিলে চল্‌বে কেন?"

"তোকে কি আমি এখনিই তাড়িয়ে দিতে পারি না?"

"তুমি যদি আমার মা হও, তা হলে পার্‌বে না।"

"তোর কি সন্দেহ হয় আমি তোর মা নই।"

"সন্দেহ কি—আমি যে তোমার ছেলে নই তা ও বাড়ীর রাজা-দিদি খুব ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছে।"

মালতী আর কোন কথা না কহিয়া রন্ধনকার্য্যে মনোনিবেশ করিল। এতদিন সে হারাধনকে জানিতে দেয় নাই যে সে তাহার পুত্র নয়। যে সত্য এতদিন মিথ্যার মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সহসা আজ তাহা একটা উদ্যত শাণিত খড়্গের মত তাহাকে সচকিত করিয়া তুলিল।

৮

অপরাহ্নে এক খানা সুদৃশ্য মোটর আসিয়া তাহার ঘরের নিকট থামিল। একটী ভদ্রলোক গাড়ী হইতে নামিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার গায়ে চুড়িদার পাঞ্জাবী, কব্জিতে রিষ্টওয়াচ, এক হাতে ছড়ি, অপর হাতে সিগারেট, দাড়ী, গোঁফটী প্রজাপতির আকারে কামানো, গতিতে একটু নৃত্যের ভঙ্গী আছে।

তিনি বলিলেন "আমি মালতী কীর্ত্তনওয়ালীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

এক জন দাসী তাহাকে সঙ্গে করিয়া মালতীর কক্ষদ্বারে উপনীত হইল। ভদ্রলোক বলিলেন, "আমি বিলাসপুরের রাজা গোপীকৃষ্ণের বাড়ী থেকে আস্‌ছি, সেখানে অনেক বৈষ্ণবের সমাগম হবে, আপনার কীর্ত্তন সবাই শুন্‌তে চান্।"

মালতী নিকটে আসিয়া বলিল, "কোন্ সময়ে যেতে হবে, রাজ-বাড়ীর ঠিকানা কি?"

"এখনি যেতে হবে, আমি গাড়ী এনেছি।"

"তাহলে বাইরে বসুন, আমি এখনই যাচ্ছি।"

ভদ্রলোক কক্ষের বাহিরে একখানা তক্তাপোষে বসিয়া পড়িল। মালতী সিন্দুক হইতে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ বসন খানি বাহির করিয়া সাজ-সজ্জা শেষ করিল। তার পর বাহিরে আসিয়া সেই ভদ্রলোককে বলিল, "চলুন।"

দুজনে গাড়ীতে উঠিতেই গাড়ী তীরবেগে ছুটিয়া চলিল।

রাজা গোপীকৃষ্ণ বৈষ্ণব। মাঘী পূর্ণিমার দিনে তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে অনেক সম্ভ্রান্ত লোক জড় হন্। সকাল হইতে আজ রাজবাড়ীর প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। নানা স্থান হইতে নানা গায়ক-গায়িকারও সমাগম হইয়াছে।

মালতীর নাম অনেকেরই জানা আছে। গোধূলির অন্ধকার যখন দেখা দিয়াছে, তখন তাহার গাড়ী রাজ-বাড়ীর তোরণ পার হইয়া গেল, সভামধ্যে প্রচারিত হইল বিখ্যাত কীর্ত্তন-গায়িকা মালতী আসিয়াছে।

গাড়ী হইতে নামিয়া সে দেখিল অনতিদূরে সভাগৃহ আলোকমালায় ঝলমল করিতেছে। মধ্যস্থলে বেদীর উপরে পুষ্প-মাল্যে সুশোভিত রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির চিত্র।

সভাগৃহে প্রবেশ করিতেই সহস্র দৃষ্টি তাহার দিকে উন্নমিত হইল। সে নিজেও কতকটা সংকুচিত হইল। সে চাহিয়া দেখিল—এক দিকে নধরকান্তি বৈষ্ণবেরা নূতন ধোয়া কাপড় ও চাদর পরিয়া বসিয়া আছেন, অপর দিকে প্রবীন ও নবীন ভোগীদের দল; মাঝে মাঝে সাধারণ গৃহস্থঘরের ছেলেরাও আসিয়া জুটিয়াছে, তার পর সহরের শিক্ষিত সমজদার লোকের সংখ্যাও কম নয়।

এত বড় সভায় মালতী কখনও গান করে নাই। সে জানিত যে সে প্রসিদ্ধ গায়িকা, আজ কিন্তু সে সাহস হারাইল। গলবস্ত্র হইয়া যখন সে যুগলমূর্ত্তির নিকট প্রণত হইল, তখন সে অন্তরে অন্তরে প্রার্থনা করিল, "ঠাকুর, আজ আমার সম্ভ্রম বজায় রেখো।" তারপর সে উঠিয়া সমবেত দর্শকমণ্ডলীর উদ্দেশে আবার প্রণত হইল।

৬

তারপর সে সভার মধ্যে দণ্ডায়মান হইলে সভা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। মালতীর রূপ ছিল—সকলের দৃষ্টি সহজেই সে আকর্ষণ করিল। তাহার কপালের চন্দনরেখা, নাসিকার তিলক, মুখ চোখের কমনীয়তা ও সুসংযত চালচলন ও হাবভাব শীঘ্রই শ্রোতাদের মুগ্ধ করিয়া ফেলিল।

তাহার কণ্ঠস্বর বসন্তের কোকিলকে হার মানাইয়া দেয় হৃদয়-মনে অখণ্ড পুলকের সঞ্চার করে, বহির্জগৎকে এক মনোরম স্বপ্নলোকে রূপান্তরিত করে।

নিশ্চল হইয়া শ্রোতার দল যেন সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া তাহার গান উপলব্ধি করিতে লাগিল। তাহার কণ্ঠস্বর, রাগ-রাগিণীর আলাপ ও বাছা বাছা বৈষ্ণব পদাবলী যেন লক্ষ যুগের বিরহ জাগরিত করিয়া তুলিল। শ্রোতাদের সঙ্গে সঙ্গে সেও তন্ময় হইয়া পড়িল। মাঝে মাঝে সে বুঝিতে পারিল, পূর্ব্বে কখনও তাহার কণ্ঠ হইতে এরূপ মধুর গান বাহির হয় নাই।

প্রায় ঘণ্টা দুই গানের পর সে আত্মনিবেদনের ছলে গান ধরিল :—

> গণইতে দোষ গুণ লেশ না পাওবি
> 　　যব তুহুঁ করবি বিচার।
> তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
> 　　জগবাহির নহি মুঞি ছার॥
> কিয়ে মানুষ পশু পাখীয়ে জনমিয়ে
> 　　অথবা কীট পতঙ্গ।
> করমবিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ
> 　　মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ॥

তাহার দুই চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল, অনেক শ্রোতাও ভাবাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ইহার পর গান শেষ হইল। মালতী প্রায় রাত্রি দশটার সময় সভাগৃহ ত্যাগ করিল।

যখন সে আপনার বাসায় ফিরিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, তখন রাস্তায় যাত্রীর সংখ্যা খুবই কম। তবে এ পাড়ার পথ কখনই জনশূন্য থাকে না। অন্ততঃ দু চারিজন গোপনচারী বিলাসীদের প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

শয্যায় শয়ন করিয়া সে শুনিল পাশের বাড়ীতে হারমোনিয়মের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া কোন বিলাসিনী গাহিতেছে :—

> "আমার পরাণ যাহা চায়
> তুমি তাই তুমি তাইগো—"

তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ধ্বনিত হইল—

> তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
> জগবাহির নহি মুঞি ছার।

৭

ধীরে ধীরে বিছানা হইতে উঠিয়া ঘরের মেঝের উপর দাঁড়াইয়া অন্যমনস্ক ভাবে সে কি ভাবিতে লাগিল। তার পর আলো নিবাইয়া সে ঘরের একটা জানালা খুলিয়া দিল। পূর্ণিমার আলো মেজের উপরে ছড়াইয়া পড়িল। গানের সুর, মনের প্রসন্নতা ও আকাশের নির্ম্মলশ্রী

আজ তাহাকে কোন এক সুদূর অতীত-যুগে টানিয়া আনিল।

সে দেখিল কোথা হইতে এক খানা শুভ্র মেঘ ধীরে ধীরে ভাসিয়া আসিয়া চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিল। চন্দ্রদেব মাঝে মাঝে নিজের জ্যোতির্ম্ময় চক্র দিয়া সেই শুভ্র আবরণ ছিন্ন করিতে লাগিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহার আর সামর্থ্য রহিল না। সাদা মেঘে আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল।

তাহার শরীরও ইন্দ্রিয় অবশ হইয়া আসিল। কাণে সেই গানের সুরটি ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া অল্পক্ষণ পরেই যেন কোথায় বিলীন হইয়া গেল, আর সে কিছুই শুনিল না; চক্ষুও আকাশের স্নিগ্ধ ধবলতায় মুগ্ধ ও স্তিমিত হইয়া পড়িল।

শেষ রাত্রে হারাধন তাহাকে বার বার ঠেলিয়া ডাকিল, "কেন মা কাঁদছিস্ কেন?" মালতী জাগিয়া উঠিল, হারাধনকে কোলের কাছে ডাকিয়া বলিল, "না বাবা, কাঁদিনি ত"; কিন্তু সে হাত দিয়া দেখিল অশ্রুজলে উপাধান সিক্ত হইয়াছে।

পর দিন সে স্থির করিল বাসা বদল করিবে। আর সে গণিকা-সমাজে বাস করিবে না। তাহাদের উদ্দাম ভোগ-লালসা ও পাশবপ্রবৃত্তি তাহার অন্তরে কেমন একটা তীব্র ঘৃণার সঞ্চার করিল। তাহার অন্তর সহসা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল কেন তাহা সে নিজেই বুঝিল না।

হারাধনকে বলিয়া সে পরদিনই বাসা বদল করিল।

এ বাসা হইল ভদ্রলোকের পাড়ায়। এখানে থাকিয়া সে ভদ্র-মহিলার মত দিন যাপন করিতে লাগিল। হারাধনকে সে নিকটবর্ত্তী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিল। সন্ন্যাসী নিমতলায় আসিলেই সে তাহার সহিত দেখা করিতে যাইত।

সকালে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় সে ভগবানের নিকট আত্ম-নিবেদন করিত; সে বুঝিল শুধু ঈশ্বরের নাম গানই তাহাকে জঘন্য ইন্দ্রিয়-লালসার পথ হইতে টানিয়া আনিয়াছে। পাড়ার সকলেই বলিত সে ভক্তিমতী। লোকের শ্রদ্ধাও সে কতকটা লাভ করিল।

হারাধন কিন্তু কুসঙ্গ ছাড়িতে পারিল না। মালতী দিন দিন তাহার অধোগতি দেখিয়া বড়ই চিন্তান্বিত হইয়া পড়িল। সে জননীর স্নেহ দিয়া তাহাকে বাঁধিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু শৈশব হইতে মাতা-পিতার আশ্রয় ছাড়িয়া এই জগতে সে কাহাকেও আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিল না, আত্মীয় কিরূপ বস্তু তাহাও সে উপলব্ধি করিতে পারিল না।

কয়েক দিন সে মালতীকে মা বলিয়া জানিয়াছিল। কিন্তু জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবিতে লাগিল মালতী তাহার জননী নয়। লোকের কথা শুনিয়া তাহার সন্দেহ খুবই ঘনীভূত হইল, কিন্তু মায়ের কাছে তাহা সে এখনও ধীরভাবে প্রকাশ করিতে পারিল না। মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে কলহের সময় তাহা প্রকাশ পাইত, তাহাতে মালতীর অশ্রুধারা বহিত না এমন নয়, কিন্তু কলহ মিটিয়া গেলে তাহাদের সম্বন্ধ আবার মাতাপুত্রের মত নিবিড় হইয়া আসিত।

৮

এক দিন হারাধনের বন্ধু রমেন তাহাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিল। মালতী তাহাকে যত্ন করিলেন। সেও মালতীকে মা বলিয়া ডাকিল।

ইহার পর এক দিন রমেনের মা ও ভগিনী তাহাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিল এবং মালতীকেও যাইবার সময় নিমন্ত্রণ করিয়া গেল।

পর দিন সে রমেনদের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বহু দিন পরে একটা বাঙ্গালী গৃহস্থঘরের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিল। সে দেখিল এখানে পিতা আছে, মাতা আছে, তাঁহারা এই মর-জগতে জাগ্রত দেবতার মত। ভাই-বোনের ভালবাসা এখানে ধরণীর অমৃত-উৎসের মত নিত্য উৎসারিত হইতেছে; তার পর রমেন ও তাহার নববিবাহিত বধূ তাহার বিশুষ্ক চির-অতৃপ্ত হৃদয় এক অখণ্ড স্নেহধারায় অভিষিক্ত করিল।

এই গৃহস্থঘরের অভ্যর্থনা গৃহস্থদের মতে সামান্য হইলেও মালতী অন্তরে অন্তরে ভাবিল সে ইহার উপযুক্ত নয়—সে বড়ই সংকুচিত হইয়া পড়িল—প্রতিক্ষণে তাহার মনে হইতে লাগিল সে তাহার জীবন কলঙ্কিত করিয়াছে এবং এই ভদ্রলোকের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া বাড়ীখানি কলঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে।

বিদায়ের সময় গৃহিণী অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া বলিলেন, "আবার দিদি, ডেকে পাঠালে তুমি এসো, তোমাকে দেখ্‌লেও পুণ্য হয়।"

মালতী যখন গাড়ীতে আসিয়া বসিল, তখন সে কোন-মতে অশ্রুবেগ রোধ করিতে পারিল না।

পর দিন হারাধন বলিল, "মা, রমেনের বোনের কাল পাকা দেখা। রমেন বল্‌ছিল তার গায়ের গয়না এখনো গড়ানো হয় নি, তুমি যদি একবার তোমার কতকগুলো গয়না দাও তাহ'লে তারা মেয়েটাকে সাজাতে পারে।"

মালতী বলিল, "বেশ, কখন দিতে হবে?"

"আজই দাও, কেননা কাল সকালেই বরপক্ষ দেখ্‌তে আসবে, তখন তোমার সময় হবে না।"

মালতী লোহার সিন্দুক খুলিল, দেখিল তাহার মধ্যে অনেক মূল্যবান্ অলঙ্কার তাহার রূপবহ্নিতে আহুতি দিবার জন্য কত যত্নে কত লালসার প্রেরণায় নির্ম্মিত হইয়াছে। সে গুলির দিকে আর সে চাহিতে পারিল না। একবার তাহার মনে হইল ইহারই মধ্যে কয়েকটী সে রমেনের ভগিনীর জন্য পাঠাইয়া দিবে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল ইহাদের অপবিত্র স্পর্শে সে তাহার দেহ কলঙ্কিত করিবে না।

সিন্দুকের এক পাশে ছোট একটী টিনের বাক্স ছিল। এই বাক্সটি হঠাৎ সে পাগলের মত টানিয়া বাহির করিল—দেখিল তাহার মধ্যে সামান্য কয়েকখানা গহনা তাহার মধ্যে একখানি ছোট চিরুনি, তাহাতে লেখা আছে, "আশীর্ব্বাদ"। মনে পড়িল স্বামী ইহা ক্রয় করিয়া তাহাকে প্রথম যৌবনে উপহার দিয়াছিলেন।

গহনার বাক্সটী হাতে করিয়া সে তাহার দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তার পর হারাধনকে বলিল, "যা এখনি নিয়ে যা', আবার কাল সন্ধ্যার সময় নিশ্চয়ই ফিরিয়ে আনিস।"

হারাধন গহনার বাক্স লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

রাত্রি দশটা বাজিল হারাধন ফিরিল না, সে বন্ধুর বাড়ীতে আছে স্থির করিয়া মালতী আহারাদির পর শয়ন করিল।

৬

সকালেও হারাধনের দর্শন পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার সময়ে সে রমেনের বাড়ী লোক পাঠাইল। লোক সংবাদ দিল—আজ রমেনের ভগিনীর পাকা দেখা হয় নাই; এ বৎসর তাহার বিবাহ হইবে না, আর হারাধনও কাল হইতে তাহাদের বাড়ী যায় নাই।

মালতী রমেনকে ডাকিয়া পাঠাইল। রমেন আসিয়া একই কথা বলিল। মালতী বলিল, "হারাধন তাহার গহনার বাক্স লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।"

রমেন, "আমি অনুসন্ধান করছি" বলিয়া চলিয়া গেল। মালতী কাঁদিল—সেই স্বামিপ্রদত্ত উপহার কয়টী ছাড়া অপর সব গহনাগুলি চুরি গেলে সে এতটা দুঃখিত হইত না।

আজ তাহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সে দুই দিন ভূমিশয্যায় পড়িয়া রহিল। প্রতি-বেশিনীরা তাহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিল, কিন্তু সে কাহারও কথায় সাড়া দিল না।

সে দিন শ্রাবণের ধারা পৃথিবীর উপর ঝরিয়া পড়িতেছে। রাজপথ কাদায় পরিপূর্ণ। শেষরাত্রে মালতী উঠিল।

কর্দ্দমাক্ত রাজপথ দিয়া সে দ্রুতপদে নিমতলার দিকে অগ্রসর হইল, দেখিল একটা অশ্বত্থবৃক্ষের তলায় সামান্য একটা আচ্ছাদনের নীচে সেই সন্ন্যাসী বসিয়া আছে। মালতী তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল, "ঠাকুর, অনেক দিন কেটেছে, কই আপনি তো কোন কথাই আমায় বললেন না?"

সন্ন্যাসী কয়েকটী কথার পর ধীর স্বরে বলিলেন, "আজ যাও, এক মাস পরে দেখা করবো।"

বাড়ী ফিরিয়া মালতী দেখিল এক জন পুলিশ ইন্‌স্‌-পেক্টর তাহার দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে। মালতীকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এ বাক্সটী কি আপনার?"

মালতী দেখিল বাক্সটী তাহার এবং তাহার মধ্যে সব গহনাগুলিই আছে।

মালতী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এ বাক্স পেলেন কোথায়?"

ইন্‌স্‌পেক্টর বলিলেন, "চোরের হাতে।"

"চোরের নাম?"

"হারাধন।"

"হারাধন আমার ছেলে, তাকে ছেড়ে দিন্।"

"তা ত হ'তে পারে না।"

মালতী কক্ষে প্রবেশ করিয়া লোহার সিন্দুক হইতে একটা সোনার হার বাহির করিল—দাম পাঁচ শত টাকার কম নয়।

হারটী ইন্‌স্‌পেক্টরের হাতে দিয়া মালতী বলিল, "আপনি হারাধনকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন্, কোনমতে তাকে বাঁচান। আমাকে এই বাক্সটা ফেরত দিন্।"

ইন্‌স্‌পেক্টর দেখিল—বাক্সে যে গহনা আছে, এই হারটীর মূল্য তার চেয়ে অনেক বেশী। সে নির্ব্বাক হইয়া চলিয়া গেল।

বৈকালে হারাধন ঘরে ফিরিল। মালতী বলিল, "হারা, আমি তোর মা নই, মাকে দেখ্‌তে চাস্, যে মারেনি কিন্তু ফেলে দিয়েছে?"

"আমার মাকে তুমি জানলে কেমন করে?"

"সে কথা পরে হবে। দেখতে চাস্?

হারাধন সংকুচিত হইয়া বলিল "না।"

মালতী হারাধনের হাত ধরিয়া বাটীর বাহিরে আসিল। রাজপথে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সে তাহার পুরাতন বাসার নিকটবর্ত্তী একটী গৃহে প্রবেশ করিল।

একটী রমণী তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। মালতী বলিল "ছেলেটী কে চিন্‌তে পারছিস্?"

রমণী বলিল "না"।

"আজ হতে ষোল বৎসর আগে একে তুই ঐ স্নানের ঘরে ফেলে দিয়েছিলি।"

"কে বল্লে?"

"বলেছে এক জন সন্ন্যাসী।"

রমণী বসিয়া পড়িল, বলিল "হাঁ, এ কথা কাউকে বলিস্ নি ভাই।"

"জানিস্ ওকে আমিই মানুষ করেছি?"

"জানি"।

"এখন ঠিক করে বল ওর পিতা কে?"

"নাম মনে নাই।"

"কোথা তার বাড়ী?"

"জানি না।"

"তার কোন পরিচয় জানিস্?"

"না"।

মালতী আর কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেল। হারাধন তাহার অনুসরণ করিল।

পথে মালতী বলিল "তুই যা করেছিস্ তা' ভুলে যা— আমি তোর সব দোষ ক্ষমা করেছি। চেষ্টা করেছিলুম তোকে সৎপথে আন্‌তে। কিন্তু তোর জন্মের দোষ— আমি কি করতে পারি।"

হারাধন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মালতীও কথা কহিল না।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিল। সে সেই গহনার বাক্সটী হাতে করিয়া চিন্তাসমুদ্রে গা ভাসান দিল। বর্ত্তমান জীবন একটা কারাগারের মত মনে হইল। সে স্থির করিল যেমন করিয়া হোক তাহাকে পাপপঙ্কিল পথের সীমানায় আসিতে হইবে।

১৩

মালতী এক দিন আপনার কক্ষে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, এমন সময় হারাধন বলিল, "মা, আমাদের কি ভদ্র-লোকালয়ে স্থান নেই?"

মালতী বলিল, "না হারা, আমরা সমাজ-ছাড়া লোক।"

"ভগবানও কি আমাদের পরিত্যাগ করে'ছেন?"

"বোধ হয়।"

আর কোন কথা হইল না। দেয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার টাঙানো ছিল, তাহার দিকে চাহিয়া মালতী বুঝিল সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা-শোনার পরে এক মাস পূর্ণ হইয়াছে।

সে উঠিল, ঘরের আসবাবপত্র সব একত্র করিয়া বলিল, "হারা এই সব জিনিস তুই নিতে ইচ্ছে করিস?"

হারাধন বলিল, "যদি নিতে দাও।"

"তা হলে সবই তোর থাক্, কিন্তু জেনে রাখিস, তাহলে আমাকে ছাড়্‌তে হবে।"

সন্ধ্যার অন্ধকার একটু একটু করিয়া নামিতে লাগিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ বজ্রাঘাত। এমন দুর্য্যোগ সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না।

মালতী ডাকিল, "হারা, বাড়ীওয়ালীকে ডাক।"

বাড়ীওয়ালী নিকটে আসিতেই সে তাহার ভাড়া চুকাইয়া দিল—বলিল, "দিদি, আমি আজই তোমার ঘর ছাড়লুম, কিন্তু হারাধন থাকবে।"

তার পর সে তাহার গহনার বাক্স খুলিল, দেখিল তাহার মধ্যে ছোট একটী টিনের বাক্স। এই বাক্সটী সে

অঞ্চলে লুকাইয়া ডাকিল, "হারা যা, তোর বাড়ীওয়ালী মাকে আর একবার ডেকে নিয়ে আয় ত।"

হারাধন বলিল, "কেন?"

"আমার গহনাগুলা তাকে দিয়ে যাব।"

"কেন মা আমি কি তা পেতে পারি না?"

"তবে তোকেই দিলাম।"

তার পর সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়া সে স্বামিপ্রদত্ত গহনাগুলি পরিল, তারপর সেই অন্ধকার কর্দ্দমাক্ত রাজপথ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। হারাধন বলিল, "মা, আমি সঙ্গে যাব।"

মালতী বলিল, "না বাবা, আর আমার সঙ্গীর দরকার নেই।"

দ্রুতপদে সে নিমতলার ঘাটে আসিয়া সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে পতিত হইল, বলিল, "বাবা, আমায় পথ দেখান্?"

সন্ন্যাসী হাসিলেন, বলিলেন, "সামান্য বিলম্ব আছে।"

"ঠাকুর আর ত বিলম্ব সয় না।"

"সামান্য বিলম্ব অসহ্যই হয়ে থাকে।"

মালতী অপেক্ষা করিল না, উঠিল। আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি নামিল।

১১

পথের শেষে সেই কুটীর। এখনও পূর্ব্বের মতই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাহিরে ছোট একটী বাগান। পাশেই গোয়াল ঘর। উঠানে তুলসী-মঞ্চ।

যোগীন সকালে উঠিয়া তুলসী তুলিতেছে; আকাশ ঘনমেঘে আচ্ছন্ন। হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

এমন সময় সে দেখিল দূরে একটী স্ত্রীলোক ধীরে ধীরে তাহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে।

সে স্তব্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। স্ত্রীলোকটী তাহার পদতলে সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

তাড়াতাড়ি তাহাকে তুলিতে গিয়া তাহার মাথার দিকে দৃষ্টি পড়িল। দেখিল মাথায় একটা সোণার চিরুণি; তাহাতে লেখা আছে "আশীর্ব্বাদ।"

জ্ঞান সঞ্চার হইলে রমণী বলিল, "আমি পাপিষ্ঠা পাপের পথে অনেক দিন ঘুরে আজ পথের শেষে তোমাকেই দেখতে পেয়েছি।"

যোগীন কথা কহিল না, সেই শিথিলদেহ রমণীকে দাওয়ায় শয়ন করাইল, বলিল, "বিশ্রাম কর।"

রমণী বলিল, "আমি তোমার ঘর অপবিত্র করলুম।"

যোগীন উত্তর দিল না।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় যদুনন্দন তর্কতীর্থ গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "যোগীন, বংশের মুখে কালি দেবে?"

যোগীন উত্তর দিল না। গ্রাম্যবৃদ্ধদের কোলাহল বাড়িয়া উঠিল।

অপরাহ্ণে যোগীন এক খানা গাড়ী ভাড়া করিয়া বাহির হইয়া গেল। রাত্রি আটটায় সে ফিরিল, সঙ্গে এক জন সন্ন্যাসী ও হারাধন।

সন্ন্যাসী মালতীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"মনে পড়ে মা আমি কে?"

ভূমিষ্ঠ হইয়া মালতী প্রণাম করিল, বলিল "আপনাকে নিমতলায় দেখেছি, আপনি গুরু আমায় পথ দেখান।"

সন্ন্যাসী বলিলেন আমি তোমাদের কুলগুরু, বিবাহের পর তোমাদের দীক্ষা দিয়েছি। নিজের পথ তুমি নিজেই বেছে নিয়েছ। আমারও কাজ শেষ হয়েছে।"

"কিন্তু বাবা আমার যে গতি নাই।"

"কেন?"

"আমি ঘর-ছাড়া—পাপী"—

"এখন আমার শেষ কথা তোমায় বলি, জান হারাধন কে?"

"সে এক কুলটার ছেলে। তার মাকে আমি জানি।"

"তার পিতা কে জান?"

"না।"

"তার পিতা এই যোগীন।"

* * *

পথের শেষে সেই কুটীরখানি এখন আর নাই; এখন সেখানে একটী অট্টালিকা। হারাধন ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারী ইহারই অন্তর্গত। যোগীন এখন কাঠের কারবার করিয়া বড় লোক হইয়াছে। গ্রামের লোকেরা ইহাদের সঙ্গে বড় একটা মেলামেশা করে না। কেহ বলে ইহারা ব্রাহ্ম, কেহ বলে খৃষ্টান, কেহ বলে ইহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই।

'কৃষ্ণকান্তের উইল'এ পরিবর্ত্তন

[শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী বি-এস্‌সি]

ক

প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকান্তের উইলের পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ২য় সংস্করণের দু'একটী সামান্য অসঙ্গতির সংশোধন ছাড়া উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তনের নিদর্শন তৃতীয় সংস্করণে না পাওয়াই সম্ভব। বঙ্গদর্শনে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রকাশকালে কোনো পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন কি না, তাহা জানিবার এখন কোনো উপায় নাই; এক বৎসর বঙ্গদর্শনের প্রকাশ বন্ধ ছিল, সেই সময়ের মধ্যে পরিবর্ত্তন করা বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে অসম্ভব নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল গ্রন্থে ভূমিকা লিখিয়াছেন, সেই সকল গ্রন্থে কোনো পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিলে অধিকাংশ স্থলেই ভূমিকায় পরিবর্ত্তনের উল্লেখ বা তাহার প্রয়োজনের হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[১] কৃষ্ণকান্তের উইলে কোনো ভূমিকা নাই; তাই তাহাতে পরিবর্ত্তন করার হেতুর কোনো নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয় তাঁহার বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনাগ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় (কৃষ্ণকান্তের উইল) বঙ্কিমচন্দ্রের তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত একটী পত্র উদ্ধৃত করিয়াছিলেন; সেই পত্রে কৃষ্ণকান্তে উইলের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কিন্তু উল্লেখ আছে,—

......কৃষ্ণকান্তের উইল সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। প্রথম সংস্করণে কয়েকটা গুরুতর দোষ ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা কতক কতক সংশোধন করা হইয়াছে। পুস্তকের অর্দ্ধেক মাত্র সংশোধিত হইয়া মুদ্রিত হইলে, আমাকে কিছু দিনের মধ্যে কলিকাতা হইতে অতি দূরে যাইতে হইয়াছিল। তাহাতে প্রথমাংশে ও শেষাংশে কোথাও কিছু অসঙ্গতি থাকিতে পারে।...১১ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র শর্ম্মণঃ।[২]

১ম সংস্করণে পরিবর্ত্তনের বিষয় ছিল, রোহিণী-চরিত্রের প্রথমাংশ গ্রন্থকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করা এবং দুই চারিটা শব্দের পরিবর্ত্তন। ২য় সংস্করণে পরিবর্ত্তনের পরিমাণ বেশী এবং তাহা সাধিত হইয়াছে, ১ম খণ্ডে,—বিশেষতঃ ১ম খণ্ডের প্রথমাংশে। এখানে পরিবর্ত্তনের প্রধান বিষয় ছিল, রোহিণী চরিত্রের প্রথমাংশের রূপ, গোবিন্দলাল সম্বন্ধে মন্তব্যাদি; অবশ্য ইহার সঙ্গে অন্যান্য ছোট খাটো পরিবর্ত্তন ছিল। শেষবারে অর্থাৎ চতুর্থ সংস্করণে পরিবর্ত্তনের বিষয় ছিল, গোবিন্দলালের পরিণতি।

পরিবর্ত্তনের মূল বিষয় ছিল রোহিণী চরিত্রের প্রথমাংশ। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমবাবু রোহিণী চরিত্রের প্রথম দিকটা এই ভাবে আঁকিয়াছিলেন,—রোহিণী অত্যন্ত অর্থলোভী—অর্থলোভের তাহার সীমা ছিল না; তাই, সে অসম্ভব সাহসের পরিচয় দিয়াছে এবং কার্য্যসিদ্ধির জন্য অতি ঘৃণ্য ও হীন উপায় অবলম্বন করিয়াছে; তা'র উপর সে মুখরা ও ব্যাপিকা; তাহার কোনো ভয় ডর ছিল না। আরও, তাহার চরিত্র সম্বন্ধে একটা ইঙ্গিতও ছিল এবং দু'এক স্থলে সে ইঙ্গিতের সার্থকতা প্রকাশ পাইবার উপক্রমও করিয়াছে। ১ম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণী-চরিত্রের মোটামুটি এই রূপই বজায় রাখিয়াছেন; কেবল চরিত্রসম্বন্ধে ইঙ্গিতটা কিছু অস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার ব্যাপিকার ভঙ্গী টুকু কমাইয়া দিয়া সাধারণ মুখরা ও অর্থলোভীর ভঙ্গীটা স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন।

২য় সংস্করণে রোহিণী চরিত্রের প্রথমাংশের উল্লিখিত রূপ পরিবর্ত্তিত করিয়া বর্ত্তমানে আমরা যে রূপ পাই,

১। রজনী, রাজসিংহ, চন্দ্রশেখর ও আনন্দমঠ দ্রষ্টব্য। দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ, কপালকুণ্ডলা ইত্যাদির ভূমিকা নাই; পরিবর্ত্তন আছে।

২। বঙ্কিমচন্দ্র [ভাদ্র ১২৯৩] ভূমিকা।৶০ পৃঃ। পত্র পড়িয়া এবং ভূমিকা দেখিয়া বোধ হয় যে পত্রখানি ১২৯৩ বঙ্গাব্দে লেখা।

সেই রূপ দিয়াছেন। এই পরিবর্ত্তিত রোহিণীতে অর্থ-লোভ আদৌ নাই; অর্থলোভের পরিবর্ত্তে আসিয়াছে—অবশ্য প্রথম দিকে,—'হরলালের লোভ।'[৩] এবং ইহার হেতু হিসাবে হরলাল কর্ত্তৃক রোহিণীর বিপদ হইতে উদ্ধার-রূপ একটী ছোট উপাখ্যানের উল্লেখ আছে। পূর্ব্ব-রোহিণীর ব্যাপিকার ভঙ্গী অনেক খানি মুছিয়া দিয়াছেন,—প্রায় নাই বলিলেই চলে; চরিত্র সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিত নাই, এবং যদি বা থাকিয়া থাকে তাহা হইলে তাহা অত্যন্ত অস্পষ্ট ও জটিল ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।[৪] সুতরাং আগেকার রোহিণীচরিত্র হইতে বর্ত্তমান রোহিণী-চরিত্র প্রথমাংশে পৃথক্।

দ্বিতীয় প্রধান পরিবর্ত্তন গোবিন্দলালের পরিণতি। পূর্ব্বে গোবিন্দলাল রোহিণী-ভ্রান্তির প্ররোচনায় বিকার-গ্রস্ত অবস্থায় আত্মহত্যা করিয়াছিল। অবশ্য গোবিন্দ-লালের এই মৃত্যুকে যথার্থ আত্মহত্যা বলা যায় না; কারণ সে অবস্থায় তাহার কোনো আত্ম-কর্ত্তৃত্ব ছিল না। ৪র্থ সংস্করণে গোবিন্দলালকে ভ্রমর-ভ্রান্তি আত্মহত্যা হইতে নিবারিত করিয়া 'ভ্রমর হইতে প্রিয়'কে পাইবার সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল এবং গোবিন্দলাল দ্বাদশবর্ষ অজ্ঞাত বাস করিয়া বিষয়ের উত্তরাধিকারী ভাগিনেয় শচীকান্তকে দর্শন দিয়া শান্তি-প্রাপ্তির সংবাদ ও আশীর্ব্বাদ জানাইয়া গিয়াছিল। তা'ছাড়া ২য় সংস্করণে গোবিন্দলাল সম্বন্ধে দু'চারিটী মন্তব্য এবং গোবিন্দলালের হরলাল সম্বন্ধে মনোভাবের সামান্য প্রকাশ বর্জ্জন করিয়াছিলেন।

প্রথমবারের পরিবর্ত্তনে একটা প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল, তাহা ভ্রমর-ত্যাগ ব্যাপারটীকে ভিত্তি করিয়া গ্রন্থকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করা। ১ম খণ্ডে ঘটনা সমাবেশের দ্বারা ব্যাপারটী গড়িয়া তোলা, এবং ২য় খণ্ডে পরিসমাপ্তির উপযুক্ত ঘটনা সমাবেশের দ্বারা সমাপ্তি ঘটানো।

অন্যান্য ছোটো খাটো পরিবর্ত্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, —ভ্রমরের মাতার নিকট পত্রের অংশ-বিশেষ পরিবর্জ্জন; ব্রহ্মানন্দের সহিত কৃষ্ণকান্তের দূর-সম্পর্ক ও রোহিণী ব্রহ্মানন্দের 'ঘরের গৃহিণী'—ইহার পরিবর্জ্জন। মালীর রোহিণীর মুখে ফুঁ দেওয়া প্রসঙ্গ, বৈদ্যের কৃষ্ণকান্ত সংহার ইঙ্গিত, মাধবীনাথ ও নিশাকরের 'যশোর' উচ্চারণ পরিহাস ইত্যাদি বিষয়ে সামান্য সামান্য পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন আছে। কিন্তু এইরূপ দু'একটা শব্দের পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জনে কোথাও মূল আখ্যানের রূপ বা চরিত্র-বিশেষের রূপ পরিবর্ত্তিত করে নাই।

কৃষ্ণকান্তের উইলের ১ম সংস্করণের কোন্ কোন্ অংশ-গুলি বঙ্কিমচন্দ্র গুরুতর দোষাবহ মনে করিতেন, তাহা ২য় সংস্করণকালীন পরিবর্ত্তন হইতে অনুমান করা কঠিন। এ বিষয়ে বঙ্কিমের কোনো স্পষ্ট নির্দ্দেশ নাই; উপরন্তু বর্ত্ত-মান গ্রন্থের ব্যাখ্যায় ও তাৎপর্য্যে মত-বৈভিন্ন্যের স্থান আছে। সুতরাং এই মত বৈভিন্ন্যের প্রভাবে এই অনু-মানে পার্থক্য আসা খুবই সম্ভব। এ বিষয়ে আরও কথা আছে; বঙ্কিমচন্দ্র ২য় সংস্করণকালে সমগ্র গ্রন্থের পরিবর্ত্তন করিয়া উঠিতে পারেন নাই, যদি পারিতেন তাহা হইলে কি হইয়া দাঁড়াইত, এখন বলা অসম্ভব। এইজন্য শেষাংশে ও প্রথমাংশে কিছু অসঙ্গতি থাকিয়া যাওয়ার আশঙ্কাও তিনি করিয়াছিলেন।' চরিত্রের ভিত্তির পরি-কল্পনার পরিবর্ত্তনে প্রথমাংশে ও শেষাংশে একটা সূক্ষ্ম অসঙ্গতি আসিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু ব্যাপারটা মন হইতে সরিয়া যাওয়ার জন্যই হৌক, অথবা অপ্রয়োজন বোধেই হৌক, বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সূত্রে কোনো পরিবর্ত্তন ৩য় ও ৪র্থ সংস্করণে করেন নাই। সেইজন্য, মোটামুটি ভাবে বলা যায়, ৩য় ও ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশকালে তিনি এই অসঙ্গতি-বোধের আশঙ্কা তেমন করেন নাই। ৪র্থ সংস্করণে গোবিন্দলালের পরিণতির যে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, সেই পরিবর্ত্তনের ধারণা তাঁহার ২য় সংস্করণ প্রকাশকালে ছিল না, তাহা হইলে পরিবর্ত্তনটা ৩য় সংস্করণে দেখা যাইত।[৫]

রোহিণী-চরিত্রের প্রথমাংশ বঙ্কিমচন্দ্র দুই দুইবার

৩। ৯ম পরিচ্ছেদ। ২য় সংস্করণে 'অর্থলোভে' থাকিয়া গিয়াছিল। পরে ৩য় বা ৪র্থ সংস্করণে সংশোধিত হয়।

৪। গোবিন্দলালের চিন্তা—'এ স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা হউক, দুশ্চরিত্রা হউক.........৭ম পরিচ্ছেদ। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত ও ১ম সংস্করণে এরূপ চিন্তা উদয়ের সমর্থক কিছু তথ্য ছিল; বর্ত্তমানে কিছুই নাই। আর গোবিন্দলালের এই চিন্তার সঙ্গে তাহার তৎকালীন চরিত্রের সঙ্গতি সত্যই রাখে কি না, তাহা বিচার সাপেক্ষ।

৫। শরচ্চন্দ্র সরকার 'কৃষ্ণকান্তের উইল সম্বন্ধে কয়েকটা কথা' প্রবন্ধে [পুরোহিত, ফাল্গুন ১৩০০] পরিবর্ত্তন টা ৪র্থ সংস্করণে হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং বলা যায়, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রোহিণীর চরিত্রের প্রথমাংশ তাঁহার ১ম সংস্করণ প্রকাশকালে খুব মুষ্ঠু ঠেকে নাই, তাই কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ কালে সেই পরিবর্ত্তনও তাঁহার মনঃপূত হয় নাই; সেইজন্য পরিকল্পনার ভিত্তির পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন; এবং লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই পরিবর্ত্তনের গতি ছিল একই দিকে। ২য় সংস্করণে শেষাংশে পরিবর্ত্তন করার সুযোগ পাইলে রোহিণী-চরিত্রের শেষের দিকটা পর্য্যন্ত বদলাইয়া যাইত কি না, এখন নিঃসংশয়ে বলা শক্ত। যে ব্যাপার ঘটে নাই, তাহা লইয়া আলোচনা করা নিষ্ফল। এই ভাবে রোহিণীর চরিত্রের প্রথমাংশ পরিবর্ত্তন করার ফলে রোহিণী চরিত্রে সত্য সত্যই কোনো অসঙ্গতি আসিয়া গিয়াছে কি না,—ইহার বিচার রোহিণীর চরিত্র বিশ্লেষণসাপেক্ষ, এবং তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়।

এই সকল পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য কি এবং তাহার ফলে আখ্যায়িকা কতখানি উৎকর্ষলাভ করিয়াছে ইত্যাদি কথা,[৬] কিংবা শেষবারের পরিবর্ত্তনের ফলে কোনো ত্রুটি ঘটিয়াছে কি না এবং এই সম্পর্কে চরিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে কি না ইত্যাদি কথা,[৭] অনেক পরিমাণে চরিত্র সমালোচনার উপরে নির্ভর করে। এখানে সে সব প্রশ্নে বা মতামত সমালোচনায় যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই।

এই পরিবর্ত্তন সূত্রে দু'একটা অসঙ্গতির কথা উল্লেখ করিলে বোধ করি দূষণীয় হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র অন্ততঃ তিনবার এই আখ্যায়িকাটির সংশোধন করিয়াছেন, অথচ, এই অসঙ্গতিগুলি আদৌ তাঁহার নজরে পড়ে নাই, ইহাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

১ম পরিচ্ছেদে হরলালের মাতার উল্লেখ আছে, কৃষ্ণকান্ত গৃহিণীকে সম্পত্তির এক আনা অংশ উইলে লিখিয়া দিতেছেন,[৮] হরলালের তাহাতেও আপত্তি,[৯] কিন্তু গ্রন্থের অন্য কোথাও তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না,—এমন কি কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু বা শ্রাদ্ধ সম্পর্কেও না। কৃষ্ণকান্তের চিত্র বিপত্নীক বৃদ্ধের মত ঠেকে। যেরূপ চরিত্রে পারিবারিক ব্যাপার গুলিতে অন্ততঃ কিছু কর্ত্তৃত্ব থাকা সম্ভব, সেইরূপ চরিত্রের উল্লেখ মাত্র করিয়া, তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব হইয়া যাওয়ার অর্থ বোধ হয় না। এ ব্যাপারটা বঙ্কিম-সমালোচক অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে, কারণ, তিনি ধরিয়া লইয়াছেন, হরলালের মাতা ছিলেন না।[১০]

আর একটা,—গোবিন্দলালের ভাগিনেয় শচীকান্ত গোবিন্দলালের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইল, প্রথম দিককার সংস্করণে সে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিল, কিন্তু শেষ পরিবর্ত্তন কালে বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে প্রাপ্তবয়স্ক করিয়া দেন। শচীকান্ত বোধ করি শৈলবতীর পুত্র,[১১] কারণ গোবিন্দলালের ভগিনী ছিল গ্রন্থে সেরূপ কোনো উল্লেখ নাই।[১২]

৬। শরচ্চন্দ্র ঘোষাল—কৃষ্ণকান্তের উইল—ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩২০—৮১৫ পৃঃ। (চরিত্রের উৎকর্ষ ৮১৯ পৃঃ)।

৭। শরচ্চন্দ্র সরকার—'কৃষ্ণকান্তের উইল সম্বন্ধে কয়েকটা কথা' পুরোহিত, ফাল্গুন ১৩০০ [তিনি গোবিন্দলালকে পুনর্জ্জীবিত করার হেতু জানিতে চাহিয়াছিলেন। যদি গোবিন্দলালকে পুনর্জ্জীবিত করা হইল, তবে ভ্রমরকে কেন করা হইল না, এ প্রশ্নও তুলিয়াছেন।]

৮। ১ম পরিচ্ছেদ—৩য় অনুচ্ছেদ—গৃহিণী একআনা,…।

৯। ১ম পরিচ্ছেদ—"…আর মা বহিনকে আমরা প্রতিপালন করিব তাহাদিগের বা এক এক আনা কেন ?…"

১০। মা—[ভারতবর্ষ শ্রাবণ ১৩২২] ২৮০ পৃঃ—৯। কৃষ্ণকান্তের উইল—(৷৹) কৃষ্ণকান্তের উইলে হরলালের জননী নাই অর্থাৎ বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত রায় বিপত্নীক। নতুবা বৃদ্ধের প্রসঙ্গে অবশ্যই কোথাও না কোথাও তাহার উল্লেখ থাকিত। হরলালের দুর্দ্দমনীয় চরিত্রের উপর স্নেহময়ী জননীর যে প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারিত, তাহা হইল না।

১১। ১০এর প্রবন্ধ—(৷৹) শৈলবতী ও তাহার পুত্র শচীকান্তের উল্লেখ আছে।…এমন কি তিনি সধবা কি বিধবা তাহা………স্পষ্ট বুঝা যায় না। তাঁহার গর্ভে কৃষ্ণকান্ত রায়ের দৌহিত্র জন্মিবে এবং সেই সন্তান গোবিন্দলালের পরিত্যক্ত বিষয় পাইবে, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাহার সৃষ্টি। [শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ উত্তরাধিকারিত্ব সম্ভব কি না কোথাও বিচার করেন নাই।]

১২। রামকান্ত রায়ের একটা পুত্র জন্মিয়াছিল—তাহার নাম গোবিন্দলাল। ১মপরিচ্ছেদ। ১৯শ পরিচ্ছেদে 'ভ্রমর ননদের কোন্দল' করিয়াছে, কিন্তু এ ননদ শৈলবতী বা অন্য কেহ বলা অসম্ভব। ২১শ পরিচ্ছেদে 'ঠাকুর ঝি' বিনোদিনী ছেলে কোলে করিয়া রোহিণী-ব্যাপার জানিতে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহার ভাবগতিকে ভ্রমরের আপন ননদ বলিয়া সন্দেহ হয় না।

অবশ্য গোবিন্দলালের মাতা কাশী যাইবার সময়ে ভ্রমরকে সান্ত্বনা দিয়াছেন, 'তোমার বড় ননদ রহিল।' (৩০শ পরিচ্ছেদ) কিন্তু এই বড় ননদ যে গোবিন্দলালের আপন জ্যেষ্ঠ ভগিনী, তাহা বলা কঠিন, কারণ কৃষ্ণকান্ত উইলে তাহার জন্য ভায়ের সঙ্গে কোনো ব্যবস্থা করেন নাই। সুতরাং এই 'বড় ননদ' শৈলবতী এবং এই শৈলবতী শচীকান্তের মাতা এই অনুমান করিতে হয়, যদিও এই অনুমান খুব শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। শৈলবতী কৃষ্ণকান্তের কন্যা।[১৩] সুতরাং হরলাল, বিনোদলাল এবং হরলালের পুত্র জীবিত থাকিতে শচীকান্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। এবং ইহা সম্ভব ধারণা করিবার জন্য হরলাল প্রভৃতি সাত আট বছরের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে,—এরূপ কল্পনা করাও কঠিন।

বিনোদলাল সম্বন্ধে একই কথা প্রযুজ্য। সে একান্নবর্ত্তী পরিবারে বাস করে, অথচ পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির সুখ দুঃখের সঙ্গে বা পারিবারিক দুর্ঘটনার সঙ্গে তাঁহার কোনো সংযোগই নাই।

অবশ্য এগুলি মূল আখ্যানের দিক হইতে অবান্তর ব্যাপার। এই প্রসঙ্গে অন্য ভাবের দু'একটী বিষয় উত্থাপিত করা যাইতে পারে,[১৪] কিন্তু সে সম্বন্ধে নানারূপ তর্ক উঠিবার সম্ভাবনা বেশী। চরিত্র-সমালোচনা এবং কথা-বস্তুর বিশ্লেষণ ব্যতীত সে সব প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভবপর নয়।

২

কৃষ্ণকান্তের উইলের পরিত্যক্ত ও সংশোধিত অংশগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।[১৫] পরিবর্জ্জিত ও পরিবর্ত্তিত অংশগুলি অধোরেখা-চিহ্নিত বা বন্ধনী-বদ্ধ; কোন্ কোন্ সংস্করণে এই পরিবর্জ্জন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে, তাহার যথাস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ :—

৪র্থ অনুচ্ছেদ—বাঙ্গালির উইল কখন গোপন থাকে না। 'প্রায়' ১ম সং।

১০শ অনুচ্ছেদ—গুরু মহাশয়ের দাড়ি পুড়াইয়াছিলাম 'গোঁপ'—১ম সং।

১৪শ অনুচ্ছেদ—স্বহস্তে লিপিকৃত উইলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পরিত্যক্ত ১ম সং।

২০শ অনুচ্ছেদ—(কৃষ্ণকান্তের সঙ্গে একটু দূর সম্বন্ধ ছিল, এজন্য ব্রহ্মানন্দ জ্যেঠা মহাশয় বলিতেন।)—পরিত্যক্ত—২য় সং।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ :—

ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "সে ভাবনা করিও না; কথা আমার নিকট হইতে প্রকাশ পাইবে না।" ইহার পর হইতেছিল :—

(এই কথার পর হরলাল বিদায় হইলেন। তিনি গৃহের বাহির হইলে পর একটী স্ত্রীলোক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হরলাল তাঁহাকে অন্ধকারে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ও?")

স্ত্রীলোকটী দুই হস্তে অঞ্চল ধরিয়া বলিলেন, "দাসী।"

হর। কে ও রোহিণী।

স্ত্রীলোকটী বলিল, "আজ্ঞে।"

বন্ধনীবদ্ধ অংশটুকু ১ম সংস্করণে ছিল; কিন্তু অধোরেখাঙ্কিত অংশটুকুর পরিবর্ত্তে লিখিত হইয়াছিল—(স্ত্রীলোকটী দুই হস্তে অঞ্চল ধরিয়া বলিলেন, "আমি রোহিণী।)"

২য় সংস্করণে উভয় অংশ পরিত্যক্ত ও পুনর্লিখিত হয়,—সেখান হইতে উঠিয়া ব্রহ্মানন্দের পাকশালায়...... রোহিণী রাঁধিতেছিল। (গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

১৩। কৃষ্ণকান্তের দুই পুত্র, আর এক কন্যা।......কন্যার নাম শৈলবতী। ১ম পরিচ্ছেদ।

১৪। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ,—ক্ষীরিদাসী ভ্রমরের হুকুম 'রোহিণী পোড়ারমুখী'কে জানাইয়া আসিল, অথচ ইহার হেতু জানিবার জন্য তাহার কোনো কৌতূহল হইল না। (১৪শ পরিচ্ছেদ)।

১৫। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত, ১ম, ২য়, ও ৭ম সংস্করণের কৃষ্ণকান্তের উইল মিলাইয়া দেখিয়াছি। ৩য় ও ৪র্থ সংস্করণের গ্রন্থ দুই খানি কোথাও পাই নাই। ৪র্থ ও ৭ম সংস্করণে কোনো প্রভেদ নাই; ৪র্থ সংস্করণ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। ৩য় সংস্করণে দু-একটী অসঙ্গতি সংশোধিত হইয়াছিল অনুমান করিতে হইয়াছে। মিলাইয়া দেখিবার কালে দু-চারিটী শব্দ দৃষ্টি এড়াইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে; কেহ এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বাধিত হইব। অনুচ্ছেদ বিভাগ সর্ব্বত্র উল্লেখ করা সম্ভব হয় নাই।

[রোহিণী ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতুষ্কন্যা। তাহাকে যুবতী বলিতে হইবে। তাহার বয়ঃক্রম অষ্টবিংশতি বৎসর অতীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাকে বিংশতি বৎসর মাত্র দেখাইত। রোহিণী পরমা সুন্দরী; সুন্দরী বলিয়া পল্লীতে তাহার খ্যাতি ছিল। সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালাপেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পান খাইত, নির্জ্জলা একাদশী করিত না। পাড়ার লোকে কানাকানি করিত যে সে মাছও খাইত। যখন পাড়ায় বিধবা বিবাহের হুজুক উঠিয়াছিল, তখন সে বলিয়াছিল, পাত্র পাইলে আমি এখনই বিবাহ করি।

পক্ষান্তরে তাহার অনেক গুণও ছিল ;] রন্ধনে সে দ্রৌপদীবিশেষ বলিলে হয় ;........চুল বাঁধিতে, কন্যা সাজাইতে পাড়ার একমাত্র অবলম্বন। [পল্লী মেয়েরা সেখানে লুকিয়ে চুরিয়ে গানের মজলিশ করিত, রোহিণী সেখানে আখড়াধারী—টপ্পা, শ্যামাবিষয়ক কীর্ত্তন, পাঁচালী, কবি রোহিণীর কণ্ঠাগে। শুনা গিয়াছে, রোহিণী "ছিটা-ফোঁটা তন্ত্র-মন্ত্র" অনেক জানিত। সুতরাং মেয়ে মহলে রোহিণীর পশারের সীমা ছিল না।] তাহার আর কেহ সহায় ছিল না বলিয়া সে ব্রহ্মানন্দের বাড়ীতে থাকিত। [ব্রহ্মানন্দের গৃহ শূন্য ; রোহিণী তাঁহার ঘরের গৃহিণী ছিল।]

১ম সংস্করণে, অধোরেখাঙ্কিত অংশ পরিত্যাগ করিয়া লেখেন,—তাহার যৌবন পরিপূর্ণ—রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল—শরতের চন্দ্র ষোলকলায় পরিপূর্ণ। ২য় সংস্করণে বন্ধনীর মধ্যস্থ অংশ পরিত্যাগ করিলা লেখেন,—এই রোহিণীতে.........তবে ইহা বলিলে হয় যে, রোহিণীর (১ম সং এর পরিবর্ত্তনের 'তাহার' শব্দের পরিবর্ত্তে) ......পরিপূর্ণা (১ম সং এর পরিবর্ত্তন।) 'পান খাইত' পরিবর্ত্তে 'পানও বুঝি খাইত।' 'নির্জ্জলা.........গুণও ছিল'—পরিত্যক্ত। 'এদিকে' দিয়া দুইটী অনুচ্ছেদ যুক্ত করেন। পরবর্ত্তী বন্ধনীবদ্ধ—অংশগুলি ২য় সংস্করণে পরিত্যক্ত। (গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

[দুই চারিটী মিষ্ট কথার পর রোহিণী জিজ্ঞাসা করিল, "কাকার কাছে যে জন্য আসিয়াছিলেন, তাহার কি হইল ?"

হরলাল বিস্ময়াপন্ন এবং বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি জন্য আসিয়াছিলাম ?"

রোহিণী হাসিয়া মৃদু-মৃদু শ্লোক বলিল,

"যাও যাও আর কেলে সোণা, কাজ কি সোহাগ বাড়িয়ে।
শুনেছি সব মনের কথা, বেড়ার গোড়ায় দাঁড়িয়ে।"

হরলাল ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, বটে ! তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। এখন কি একটা নূতন রোজগারের পন্থা হইল ?"

রো। হইল বই কি ?

হর। কার কাছে—কর্ত্তার কাছে এ কথা যাবে না কি ?

রো। রোজগার বড় বাবুর কাছেই হবে।

হর। কি রূপে ?

রো। তুমি আমাকে ঐ হাজার টাকা দিবে—আমি তোমার উইল বদলাইয়া দিব।

হরলাল বিস্মিত হইলেন ; বলিলেন সে কি রোহিণী ?" পরে কহিলেন, "আশ্চর্য্যই বা কি ? তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। তা তুমি কি প্রকারে উইল বদলাইবে ?"

রো। সে কথাটা আপনার সাক্ষাতে নাই বা বলিলাম। না পারি আপনার টাকা আপনি ফেরৎ লইবেন।

হর। ফেরৎ ? তবে কি টাকা আগামী দিতে হবে না কি ?

রো। সব।

হর। কেন, এত অবিশ্বাস কেন ?

রো। আপনিই বা আমায় অবিশ্বাস করেন কেন ?

হর। কবে এটা পারবে ?

রো। আজিকেই। রাত্র তৃতীয় প্রহরে এইখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। হরলাল বলিলেন, "ভাল," এই বলিয়া তিনি রোহিণীর হাতে হাজার টাকার নোট গণিয়া দিলেন।]

১ম সংএ অধোরেখাঙ্কিত অংশ ত্যাগ করিয়া লিখিয়াছেন,—[রোহিণী মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল,—"সব শুনেছি। তুমি আমাকে ঐ হাজার টাকা দিবে—আমি তোমার উইল বদলাইয়া দিব।] (ইহা পরিত্যক্ত অংশের শেষ লাইন, রোহিণীর উক্তি।)

২য় সং-এ সমস্ত বন্ধনীর মধ্যস্থ অংশটুকু পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন করিয়া লেখেন,—

রোহিণী রূপসী ঠন্‌ঠন্‌······ জাল উইল রাখিয়া নোট লইয়া গেল। (গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ :—

৩য় অনুচ্ছেদ—রোহিণী বুঝিল যে কৃষ্ণকান্তের আফিমের আমল [আসিয়াছে]। ১ম সং পরিবর্ত্তে 'হইয়াছে'।

১৬শ অনুচ্ছেদ—কহিলেন, "রোহিণী, আমি কি [এতই বুড়] হইয়াছি।······" ২য় সং—পরিবর্ত্তে 'বুড়ো হইয়া বিহ্বল'।

১৮ অনুচ্ছেদ—(রোহিণীর যে অভিপ্রায় তাহা সিদ্ধ হইল। কৃষ্ণকান্তের উইল কোথায় আছে, তাহা জানিয়া গেল)। রোহিণী তখন······নিষ্ক্রান্ত হইল। ২য় সং—পরিত্যক্ত।

২১শ অনুচ্ছেদ—[হরি তখন মতি গোয়ালিনীর গৃহে সেই বহু বিলাসিনী সুন্দরীকে কেবল হরিমাত্রপরায়ণা মনে করিয়া তাহার সতীত্বের প্রশংসা করিতেছিলেন। সেও রোহিণীর কৌশল! নহিলে দ্বার খোলা থাকে না। এদিকে] কৃষ্ণকান্ত বারেকমাত্র············পরিবর্ত্তে স্থাপিত হইল। ২য় সং—পরিত্যক্ত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ :—

[সুপ্তা সুন্দরীর প্রথম নিদ্রাভঙ্গে নয়নোন্মীলনবৎ, পৃথিবীমণ্ডলে প্রভাতোদয় হইতে লাগিল। তখন ব্রহ্মানন্দ ঘোষের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠতলে রোহিণীর সহিত হরলাল কথোপকথন করিতেছিল—যেন পাতাল মার্গে, অন্ধকার বিবর মধ্যে সর্পদম্পতী গরল উদ্গীর্ণ করিতেছিল। কৃষ্ণকান্তের যথার্থ উইল রোহিণীর হস্তে।

হরলাল বলিল, "তার পর, আমাকে উইলখানি দাও না।"

রো। সে কথা ত বলিয়াছি, উইলখানি আমার নিকট থাকিবে।

হরলাল তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "তোমার পুরস্কার তোমাকে দিয়াছি। এখন ও উইল আমার।"

রো। আপনারই রহিল, কিন্তু আমার কাছে থাকুক না কেন? আমি ত চিরদিন আপনারই আজ্ঞাকারী। ইহা আর কাহারও হস্তে যাইবে না বা আর কেহ দেখিতে পাইবে না।

হর। তুমি স্ত্রীলোক—কোথায় রাখিবে কাহার হাতে পড়িবে, উভয়েই মারা যাইব।

রো। আমি উইল এমন স্থানে রাখিব, যে অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমি না দিলে আপনিও সন্ধান পাইবেন না।

হর। তোমার ইচ্ছা যে তুমি ইহার দ্বারা আমাকে হস্তগত রাখ—না, কি গোবিন্দলালের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ কর।

রো। গোবিন্দলালের মুখে আগুন! আমাকে অবিশ্বাস করিবেন না।

হর। আর যদি কোন প্রকারে আমি কর্ত্তাকে জানাই যে রোহিণী তাঁহার ঘরে চুরি করিয়াছে।

রো। আমি তাহা হইলে কর্ত্তার নিকট এই উইলখানি ফিরাইয়া দিব। আর বলিব যে আমি এই উইল ব্যতীত কিছুই চুরি করি নাই। তাও বড়বাবুর কথায় করিয়াছি। তাহাতে বড়বাবুর উপকার কি অপকার হইবে তাহা আপনিই বিবেচনা করুন। স্মরণ করিয়া দেখুন আসল উইলে আপনার শূন্যভাগ; আমাকে থানায় যাইতে হয় আমি মহৎ সঙ্গে যাইব।

হরলাল ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া রোহিণীর হস্ত ধারণ করিলেন এবং বলে উইলখানি কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করিলেন। রোহিণী তখন উইল তাঁহার নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, ইচ্ছা হয় আপনি উইল লইয়া যাউন। আমি কর্ত্তার নিকট সম্বাদ দিই, যে তাঁহার উইল চুরি গিয়াছে—তিনি নূতন উইল করুন।

হরলাল পরাস্ত হইলেন। তিনি ক্রোধে উইল দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন, "তবে অধঃপাতে যাও।

এই বলিয়া হরলাল সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। রোহিণী উইল লইয়া নিজালয়ে প্রবেশ করিল।]

অধোরেখা-চিহ্নিত লাইনটী ১ম সংস্করণে পরিত্যক্ত। ২য় সংস্করণে এই পরিচ্ছেদটী সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত এবং নূতন ভাবে লিখিত হয়। (গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ :—

১ম অনুচ্ছেদ—...মনের সাক্ষাৎ পাইয়া কৃষ্ণকান্তের

উইলের কথা ফাঁদিয়া লিখিতে বসিতেছিলাম—এমত সময়ে তুমি আকাশ হইতে ডাকিলে···। পরিবর্ত্তে 'বসিলাম'—২য় সং।

৩য় অনুচ্ছেদ—...এমত সময়ে, নিম্বের ডালে বসিয়া বসন্তের কোকিল ডাকিল। পরিবর্ত্তে 'বকুল'—২য় সং।

সপ্তম পরিচ্ছেদ :—

৪র্থ অনুচ্ছেদ—...এটুকুতে কত হিংসা! (রোহিণী লোভী, রোহিণী চোর, তা বলিয়াছি—হরলালের টাকা লইয়া উইল চুরি করিল। রোহিণী ব্যাপিকা, তাও বলিয়াছি, হরলালের সঙ্গে অতি ইতরের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিয়াছিল।) রোহিণীর অনেক দোষ···। ২য় সংএ পরিত্যক্ত।

৭ম অনুচ্ছেদ—···(এখন রোহিণী বড় ব্যাপিকা বলিয়া বিখ্যাত। খ্যাতিটা অযোগ্য নহে, তাহা পাঠক দেখিয়াছেন। ব্যাপিকা হইলেই আর এক অখ্যাতি, সত্য হউক, মিথ্যা হউক, সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া জোটে। রোহিণীর সে গুরুতর অখ্যাতিও ছিল। সুতরাং কোন ভদ্রলোক তাহার সঙ্গে কথা কহিত না। গোবিন্দলাল কুষ্ঠগ্রস্তবৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিতেন।] কিন্তু এতক্ষণ অবলা একা...হইল। ১ম সংএ অধোরেখাঙ্কিত 'ব্যাপিকা' ও 'খ্যাতিট'ার পরিবর্ত্তে 'মুখরা' ও 'খ্যাতিটা'। ২য় সংএ সমস্ত পরিত্যক্ত।

৮ম অনুচ্ছেদ—...মূর্ত্তিবৎ সেই চম্পকালোক চন্দ্রকিরণে দাঁড়াইলেন। ১ম সং—পরিবর্ত্তে চম্পকবর্ণ।

'যদি আমি কোন উপকার করিতে পারি।' এর পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদ—যে রোহিণী হরলালের সম্মুখে [অতি ঘৃণাযোগ্য ব্যাপিকার ন্যায় অনর্গল] কথোপকথন করিয়াছিল—[কত হাসিয়াছিল, কত ঠাট্টা করিয়াছিল, কত জঘন্য শ্লোক আবৃত্তি করিয়াছিল]—গোবিন্দলালের সম্মুখে সে রোহিণী একটী কথাও কহিতে পারিল না। ১ম সং—অধোরেখাঙ্কিত 'ব্যাপিকার' পরিবর্ত্তে 'মুখরা', কত... করিয়াছিল, পরিবর্ত্তে 'কত অর্থপ্রিয়তা প্রকাশ করিয়াছিল।' দ্বিতীয় সং—'অতি...অনর্গল' পরিবর্ত্তে 'মুখরার ন্যায়'; 'কত হাসিয়াছিল...করিয়াছিল'—পরিত্যক্ত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ :—

৩য় অনুচ্ছেদের পর হইতে :—

[কুমতি। হাজার টাকা দেয় কে? টাকায় কত উপকার!

সু। তা গোবিন্দলালের কাছেও টাকা পাওয়া যায়। তার কাছে ঐ হাজার টাকা লইয়া কেন উইল ফিরাইয়া দাও না?

(N B.—এই কথাটা সুমতি বলিয়াছিল কি কুমতি বলিয়াছিল, তাহা লেখক ঠিক বলিতে পারেন না।)

কু। টাকা চায় কে? আর গোবিন্দলাল উইল বদল হইয়াছে জানিতে পারিলে টাকাই বা দিবে কেন? উইল যে বদল হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিলেই তাহার কার্য্যোদ্ধার হইবে। তখনই সে কৃষ্ণকান্তকে বলিবে, মহাশয়ের উইল বদল হইয়াছে—নূতন উইল করুন সে টাকা দিবে কেন?

সু। ভাল, টাকাই কি এত পরম পদার্থ? কি হইবে টাকায়? তোমার এতদিন হাজার টাকা ছিল না, তাতেই বা কি ক্ষতি হইয়াছিল—হাজার টাকা কতদিন যাইবে? হরলালের টাকা হরলালকে ফিরাইয়া দাও।] আর কৃষ্ণকান্তের উইল কৃষ্ণকান্তকে ফিরাইয়া দাও।

বন্ধনীবদ্ধ অংশগুলি ২য় সং এ পরিত্যক্ত এবং তৎ-পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত লাইনটী সংযোজিত :—

কুমতি। উইল ত হরলালকে দিই নাই। সর্ব্বনাশ কই করিয়াছি?

নবম পরিচ্ছেদ :—

২য় অনুচ্ছেদের শেষে ১ম সং এ সংযুক্ত হইয়াছে,—কুমতির পুনর্ব্বার জয় হইল।

৩য় অনুচ্ছেদের শেষে—'যেমন ঘটিয়াছে, তেমনি লিখিতেছি' ১ম সং এ পরিবর্ত্তিত হইয়া—'আমি যেমন ঘটিয়াছে, তেমনি লিখিতেছি' ২য় সং এ—'যেমন ঘটিয়াছে; আমি তেমনিই লিখিতেছি'।

৮ম অনুচ্ছেদ—রোহিণী কৃতসঙ্কল্প হইল—হরলালের বশীভূত হইয়া গোবিন্দলালকে দারিদ্র্যে নিক্ষেপ করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব হরলালকে দেওয়া যাইতে পারে না—জাল উইল চালান হইবে না। ২য় সং এ পরিত্যক্ত।

৯ম অনুচ্ছেদ—অতএব অর্থলোভে রোহিণী গোবিন্দ-লালের...পারিল না। 'অর্থলোভে' এর পরিবর্ত্তে 'হর-

লালের লোভে'··৩য় সং (?)। শেষাংশে—এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া রোহিণী প্রথমতঃ হরি খানসামাকে হস্তগত করিল। ২য় সং এ পরিত্যক্ত।

১০ম অনুচ্ছেদ—[হরি যথাকালে কৃষ্ণকান্তের শয়নকক্ষের দ্বার মুক্ত করিয়া রাখিয়া যথেপ্সিত স্থানে সুখানুসন্ধানে গমন করিল।] নিশীথকালে, ···করিলেন। ২য় সং এ পরিত্যক্ত। রোহিণী নির্ব্বিঘ্নে···শয়নকক্ষে গেলেন—হরির কৃপায় পথ সর্ব্বত্র মুক্ত। প্রবেশকালে কান পাতিয়া···হইতেছে। ২য় সং এ বর্জ্জিত।

১৭শ অনুচ্ছেদ—কৃষ্ণকান্ত কয়বার হরিকে ডাকিয়া কোন উত্তর না পাইয়া উপাধান তল হইতে...করিলেন। ২য় সং—'না পাইয়া' পরিবর্ত্তে 'পাইলেন না'। তৎপরে সংযোজিত হরি স্থানান্তরে......শীঘ্র আসিবে। তখন কৃষ্ণকান্ত...করিলেন (গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

"হাঁ হাঁ ও কি ফাড় ।"...পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদ,—কৃষ্ণকান্ত ক্রোধে লোচন আরক্ত করিয়া বলিলেন, "ও কি পুড়াইলে"? ১ম সংএ "পোড়াইলে"; ২য় সংএ "পোড়াইলি"।

দশম পরিচ্ছেদ :—

৯ম অনুচ্ছেদ শেষ লাইন—ভোমরা কিছু কাল। —১ম সং এ—ভোমরা কালো।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ :—

৭ম অনুচ্ছেদ—এদিকে গোবিন্দলাল, রোহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বৃত্তান্ত আমাকে সকল বিশ্বাস করিয়া বলিবে কি?" ২য় সং বাদ; 'বিশ্বাস' এর পরিবর্ত্তে 'বিশেষ'।

গো। আমার কাছে...কখনও বিশ্বাস করি।—পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদ—রোহিণী মনে মনে বলিল, "বুঝি বিধাতা তোমাকে এতগুণেই গুণবান করিয়াছেন। নহিলে... বসিব কেন? ২য় সংএ বর্জ্জিত।

রো। হরলালবাবুর অনুরোধে।—পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদ, [—গোবিন্দলাল অপ্রসন্ন হইয়া ভ্রূকুটী করিলেন। দেখিয়া, রোহিণী বলিল, তাহা নহে। এই কার্য্যের জন্য তিনি আমাকে এক হাজার টাকা দিয়াছেন। নোট আজিও আমার ঘরে আছে। আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি আনিয়া দেখাইতেছি। ২য় সংএ ইহা বাদ গিয়াছে।]

রো। বড় বাবুর বার আনা—আপনার এক পাই। ইহার পরে,—গো। আমি ত তোমায় কোন টাকা দিই নাই—তবে কেন আবার উইল বদলাইতে আসিয়াছিলে? ২য় সং এ পরিত্যক্ত, এবং 'আসিয়াছিলে ?' পরে সংযুক্ত—আমি ত......করি নাই।

গো। কি, রোহিণি?—ইহার পরে,—

রো। কি?.....না—কি? মেজবাবু—আর কিছু বলিবেন না। এ রোগের .....করিতে পারেন—আমায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিন। তারপর যদি...দিবেন। ২য় সং—'মেজবাবু...না' পরিত্যক্ত, 'আমায়...দিন' পরিবর্ত্তে 'একবার ছাড়িয়া দিন কাঁদিয়া আসি।'

"রোহিণী, মৃত্যুই বোধ হয় তোমার ভাল, কিন্তু...... মরিব কেন? আমার কথা শুন—আগে বড়বাবুর সে টাকাগুলি আনিয়া দাও—সে টাকা তোমার রাখা উচিত নহে। আমি সে টাকা তাহার কাছে পাঠাইয়া দিব। তারপর—"২য় সং এ পরিত্যক্ত।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ :—

১ম অনুচ্ছেদ :—রোহিণী, গোবিন্দলালের অনুমতি ক্রমে হরলালের দত্ত নোট বাহির করিয়া লইতে আসিল। ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সিন্দুক হইতে নোট বাহির করিল। ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে আসিতেছিল—কিন্তু গেল না। মধ্যস্থলে বসিয়া পড়িয়া, নোটগুলির উপর পা রাখিয়া, রোহিণী কাঁদিতে বসিল। ২য় সং—'হর......লইতে' পরিবর্ত্তে 'খুড়ার সঙ্গে...করিতে'; 'ঘরে......গেল না' পরিবর্জ্জন করিয়া সংযোগ—'খুড়াকে...ঘরের'।

৪র্থ অনুচ্ছেদ—শেষ লাইন—রোহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে গোবিন্দলালের কাছে, নোট ফিরাইয়া দিল। ২য় সং পরিবর্ত্তে 'পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল'।

ভোমরা একটু......বলিল কেন? ইহার পরে—

গো। ঠিক ভোমরা......কলিকাতায় গিয়া বাস করিতে বলিয়াছিলাম—আমাকে আর না দেখিতে পায়। খরচ···করিয়াছিলাম। ২য় সং পরিত্যক্ত।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ :—

১ম অনুচ্ছেদ—[গোবিন্দলাল, হরলালের হাজার টাকা ডাকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন। লিখিয়া দিলেন, আপনি

যে জন্য রোহিণীকে টাকা দিয়াছিলেন, তাহার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, রোহিণী টাকা ফিরাইয়া দিতেছে।]—২য় সং এই অনুচ্ছেদটী বাদ গিয়াছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ :—

৩য় অনুচ্ছেদের পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদ—[আজি গোবিন্দলালের পরীক্ষার দিন। আজ গোবিন্দলাল পিত্তল কি সোণা বুঝা যাইবে।] —২য় সং—বর্জ্জিত।

"যদি রোহিণীর...কঠিন কাজ।" ইহার পর অনুচ্ছেদে—

গোবিন্দলাল জানিতেন, যাহাকে ডাক্তারেরা Sylvester's Method বলেন তদ্দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস বাহিত করান যাইতে পারে। মুমূর্ষুর বাহুদ্বয়···স্ফীত হয়। ২য় সং—বর্জ্জিত।

পর অনুচ্ছেদ—গোবিন্দলালের... মালী। বাগানের অন্য চাকরেরা ইতিপূর্ব্বেই গৃহে গিয়াছিল।···দে দেখি? ২য় সং পরিবর্ত্তে 'ইতিপূর্ব্বে'।

মুখে ফুঁ!...মালীর মুখের ফুঁ—তা হেবে না অবধড়! ২য় সং—পরিবর্ত্তে—!—"সে হৈ পারিব না মুনিমা।"

মালীকে মুনিব যদি শালগ্রামের উপর পা দিতে বলিত, মালী মুনিবের খাতিরে দিলে দিতে পারিত, কিন্তু সেই চাঁদমুখে রাঙ্গা অধরে—সেই জগন্মেখে মুখের ফুঁ!...... বলিল,

"মু ত পারিবি না অবধড়।"

২য় সং—'শাল...দিতে' পরিবর্ত্তে 'শাল···করিতে', 'দিলে দিতে' পরিবর্ত্তে 'করিলে করিতে', 'জগন্মেখে' পরিবর্ত্তে 'কটকি'। ১ম সং 'ত..না' পরিবর্ত্তে 'ত পারিবে নি'—২য় সং এ পরিবর্ত্তিত 'সে পারিবি না।'

মালী...জলে ফেলিয়া দিয়া এক দৌড়ে ভদড়ক-অ পানে ছুটিত। ১ম সং 'ভদরক-অ', ২য় সং—ভদরক।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ :—

শেষ অনুচ্ছেদ—তখন ..আমায় এ বিপদে রক্ষা কর! আমার হৃদয় অবশ হইয়াছে আমার প্রাণ গেল! রোহিণীর ...করিব। ২য় সং—বর্জ্জিত।

বিংশ পরিচ্ছেদ—

শেষ অনুচ্ছেদ—তার মনের ভিতর যে মন, যে মন হৃদয়ের লুক্কায়িত স্থান...অবিশ্বাস নাই। ২য় সং বর্জ্জিত।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ—

শেষ অনুচ্ছেদ......আমাদের......আন্তরিক দুঃখ। আমরা উপস্থিত থাকিলে রোহিণীকে স্বহস্তে প্রহার করিতাম, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ২য় সং—পরিবর্ত্তে যথাক্রমে—'আমাদের পাঠিকারা' ও 'করিতেন'।

ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ—

১ম অনুচ্ছেদ—সে রাত্রি...ইকারের স্থানে আকার—আকারের এককালীন লোপ, যুক্ত অক্ষরের...কোন কোন অক্ষরের এককালীন লোপ,—ভ্রমর কিছু মানিল না। ২য় সং 'একেবারে'; এবং অপরটা বর্জ্জিত।

৩য় অনুচ্ছেদ—সেবিকা...কাটিয়া ভ্রমরা...নিবেদনঞ্চ) 'বিষেস'।.....পরে সংযুক্ত করিল; বিশেস—১ম সং।

চতুর্বিংশতিতম পরিচ্ছেদ—

২য় অনুচ্ছেদ—শেষ লাইন—রাগে এত সর্ব্বনাশ হইত না। পরিবর্ত্তে এই—১ম সং।

৩য় অনুচ্ছেদ—গোবিন্দলাল গৃহযাত্রা করিলে, নাএব কৃষ্ণকান্তের নিকট...করিয়াছেন। পরিবর্ত্তে যথাক্রমে 'স্বদেশ' ও 'নায়েব' ২য় সং। সে পত্র ডাকে...মাতাকে লিখিলেন, যে, আমার বড় পীড়া হইয়াছে। শ্বশুর শাশুড়ী আমার পীড়ার কথায় মনোযোগ করেন না কোন চিকিৎসা পত্র করেন না—পীড়ার কথা স্বীকারই করেন না। তোমরা যদি.....পীড়ার কথা বলিও না, তাহা হইলে আমাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে।" এই পত্র...দিল। ২য় সং —বর্জ্জিত।

৪র্থ অনুচ্ছেদ—যদি না...শাশুড়ীকে এক লক্ষ গালি দিয়া স্বামীকে পত্র দেখাইলেন। ১ম সং পরিবর্ত্তে 'কিছু গালি দিলেন'।

৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ—চারদিনের......মনে মনে ভাবিলেন, "আমি কেবল ভ্রমরের জন্য এ তৃষায় দগ্ধ হইতেছি, নিবারণ করি না। তবু ভ্রমরের এই ব্যবহার?—এই অবিশ্বাস!" ২য় সং বর্জ্জিত; 'এই' এর পরিবর্ত্তে এত।

শেষ অনুচ্ছেদ—[গোবিন্দলালের প্রধান ভ্রম যাহা উপরে দেখাইয়াছি। তাঁহার মনে মনে বিশ্বাস সৎপথে থাকা ভ্রমরের জন্য, তাঁহার আপনার জন্য নহে। ধর্ম্ম পরের·

সুখের জন্য, আপনার চিত্তের নির্ম্মলতা সাধন জন্য নহে; ধর্ম্মাচরণ ধর্ম্মের জন্য নহে, ইহা ভয়ানক ভ্রান্তি। যে পবিত্রতার জন্য পবিত্র হইতে চাহে না, অন্য কোন কারণে পবিত্র, সে বস্তুতঃ পবিত্র নহে। তাহাতে এবং পাপিষ্ঠে বড় অধিক তফাৎ নহে। এই ভ্রমেই গোবিন্দলালের অধঃপতন হইল।]—২য় সং এ বর্জ্জিত।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ—

২য় অনুচ্ছেদ—গোবিন্দলাল......পাপের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া, পাপিষ্ঠ এইরূপ ভাবে। ২য় সং পরিবর্ত্তে 'পুণ্যাত্মাও'।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ—গোবিন্দলাল......তাঁহার সঙ্গে ছুটিলেন। —মনে মনে স্থিরসঙ্কল্প অদ্য কৃষ্ণকান্তকে সংহার করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন। কৃষ্ণকান্তের...হইলেন। ২য় সং—বর্জ্জিত।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—

৭ম অনুচ্ছেদ—আর......"ভূর্য্যি," "ভূমি," "ভূম"—সে সব......অধরে অধরে প্রকাশ পাইত, এখন সে কথা উঠিয়া গিয়াছে। যে কথা অর্দ্ধেকমাত্র বলিতে হইত, আর অর্দ্ধেক না বলিতেই বুঝা যাইত, এখন সে কথা উঠিয়া গিয়াছে। যে......গিয়াছে। ২য় সং—বর্জ্জিত।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—

শেষদিকে—যিনি অনন্ত সুখদুঃখের বিধাতা ..... ভাবিতেছিল। তীব্রজ্যোতির্ম্ময়ী, অনন্তপ্রভাশালিনী প্রভাতশুক্রনক্ষত্ররূপিণী রূপতরঙ্গিনী......ভাবিতেছিল। ২য় সং পরিবর্ত্তে 'তারা'।

শেষ—ভ্রমর পদত্যাগ......যাইতেছিল। দ্বারদেশে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল। ২য় সং পরিবর্ত্তে 'চৌকাঠ বাধিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইল।'

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ—

সুমতি। যদি সে যাহা...রাগ না করিবে? সেই বিশ্বাসই তাহার ভ্রম—আর দোষ কি? ২য় সং এ বর্জ্জিত।

[কুমতি। এমন বিশ্বাস করিল কেন?] ১ম সং এ বর্জ্জিত। ২য় সং এ বর্জ্জিত সুমতির প্রশ্ন—'সেই বিশ্বাসই তাহার ভ্রম—আর দোষ কি?' কুমতির প্রশ্নে সংযোজিত হইয়াছে।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ—

১ম অনুচ্ছেদ—আমার......ভ্রমরের উপরে একটু বিদ্বেষাপন্না হইয়াছিলেন। ২য় সং—'বিদ্বেষাপন্নাও'।

শেষাংশে—বড় কষ্টে ভ্রমর......আন্তরিক স্নেহ কোথায়? একদিন তুমি বলিবে—আবার দেখিব ভ্রমর কোথায়? দেবতা সাক্ষী। ২য় সং এ বর্জ্জিত।

১ম সংস্করণে একত্রিংশ পরিচ্ছেদের পর গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড সুরু হইয়াছে। সুতরাং দ্বাত্রিংশ ও তৎপরবর্ত্তী পরিচ্ছেদগুলি যথাক্রমে প্রথম পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ইত্যাদি হইয়া গিয়াছে। ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ [বর্ত্তমান ২য় পরিচ্ছেদ]—

'প্রথম বৎসর' ছিল। অগ্রহায়ণ সংখ্যা ভুল সংশোধিত হইয়াছিল যে দ্বিতীয় বৎসর হইবে। পরে বর্জ্জিত হইয়াছে।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ [বর্ত্তমান ৪র্থ]

ব্রহ্মানন্দ আকাশ......নোট!—পরেঃ—মাধবী। তোমার জানতঃ চোরা না হইতে পারে। ২য় সং (?) পরিবর্ত্তিত 'জানা'।

শেষাংশে—মা। জিলা—জশ—শ—শর—২য় সং (?) যশোর। নি। যশ্-শরে কেন? ২য় সং (?) 'সেখানে'।

চতুশ্চত্বারিংশতম পরিচ্ছেদ (বর্ত্তমান ১৩শ)—

ভ্রমরের ১ম পত্রাংশে—

"আর এই পাঁচ বৎসরে কয় লক্ষ টাকা জমাইয়াছি। তাহাও আপনার। ১ম সং—'অনেক'।

ঐ টাকার মধ্যে......যাজ্ঞা করি। পচিশ হাজার টাকা আমি উহা হইতে লইলাম। পাঁচ হাজার টাকায় গঙ্গাতীরে আমার একটী বাড়ী প্রস্তুত করিব। বিশ হাজার টাকায় আমার জীবন নির্ব্বাহ হইবে। ১ম সং যথাক্রমে 'আটহাজার', 'তিনহাজার' ও 'পাচহাজার'।

ষট্চত্বারিংশতম পরিচ্ছেদ (বর্ত্তমান ১৫শ)—

৩য় অনুচ্ছেদ—শেষ লাইন যদি কেহ......তবে বৃথায় এ উপন্যাস লিখিলাম। ২য় বা চর্থ সং—'বৃথাই'।

"হাঁ আইস...প্রায়শ্চিত্ত কর। মর।" পরবর্ত্তী অংশ—

[গোবিন্দলাল উঠিলেন। উদ্যান হইতে অবতরণ করিয়া বারুণীর ঘাটে আসিলেন। বারুণীর ঘাটে আসিয়া সোপান অবতরণ করিলেন। সোপান অবতরণ করিয়া

জলে নামিলেন। জলে নামিয়া স্বর্গীয় সিংহাসনারূঢ়া জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমরের মূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে ডুব দিলেন।]

[পরদিন প্রভাতে যেখানে সাত বৎসর পূর্ব্বে তিনি রোহিণীর মৃত-দেহ পাইয়াছিলেন, সেইখানে তাঁহার মৃত-দেহ পাওয়া গেল।] ৪র্থ সংস্করণে বন্ধনীর মধ্যস্থ অংশ-টুকু পরিত্যক্ত এবং তৎপরিবর্ত্তে সংযোজিত—গোবিন্দলাল চক্ষু বুজিলেন......উদিত হইল।......শ্রাদ্ধ হইল। [গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

পরিশিষ্ট :—

গোবিন্দলাল সম্পত্তি তাঁহার অপ্রাপ্তবয়ঃ ভাগিনেয় ......হইল। কয়েক বৎসর পরে শচীকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। ৪র্থসং—বর্জ্জিত (?)।

শচীকান্ত যখন মানুষ হইল, তখন সে প্রত্যহ সেই... আসিত। ৪র্থ সং—বর্জ্জিত (?)।

'স্বর্ণ-প্রতিমা দান করিব।' ইহার পরে ৪র্থ সংস্করণে নূতন অংশ সংযোজিত হইয়াছে,—ভ্রমরের মৃত্যুর........ হরিদ্রাগ্রামে দেখিতে পাইল না। (গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

কালিদাসের বর্ষা-বর্ণন

[শ্রীসরোজকুমার মিত্র বি-এস্‌সি]

(ঋতু-সংহার)

এসেছে বর্ষা কামিজন-প্রিয়, নৃপতির মত প্রিয়া গো আজি,
তড়িৎ-পতাকা, অশনি-মাদল, জলদ-মত্ত-হস্তী আজি। ১

নিবিড় নীলাভ-শতদল পাতা, কোথাও কাজল আকাশ-গায়,
কোথাও মেঘের বর্ণ যেন গো গর্ভবতীর স্তনের প্রায়। ২

জলভারে নত মন্দ গমন ধারার ঝারায় করিছে গান,
জলদের কাছে তৃষিত চাতক মাগিছে সলিল করিতে পান। ৩

অশনি-মাদল মেঘের বাদ্য, ইন্দ্র ধনুর তড়িৎ-গুণ
বৃষ্টি ধারার খর-শর হানি প্রবাসী-চিত্ত করিছে খুন। ৪

নীলাভ কান্তি মণির শোভাতে জেগেছে তরুণ তৃণের দল,
ইন্দ্র গোপের রত্নে শোভিত রমণী-ধরণী-বক্ষ-তল। ৫

বর্ষা-উৎস উৎসবে মাতি উঠিছে মধুর কেকার স্বর,
বিশাল কলাপ বিকাশি ময়ূর চুমিছে ময়ূরী-অধর'পর। ৬

বিনাশি সকল তট-তরু তার আবিল জলের বেগের ঘায়,
দুষ্টা-রমণী নদীটি যেন গো, ছুটিছে মিশিতে সাগর-গায়। ৭

কোমল তৃণের নীলিমা-বরণ হরিণী-মুখেতে হ'য়েছে ক্ষত,
হরিছে মানস, বিন্ধ্যা-কাননে তরুর নবীন-পত্র যত। ৮

বিলোল-কমল-নয়না-হরিণী সভীত দৃষ্টি ফেলিছে কত,
চারিদিক ব্যাপি বনভূমি আজি আকুল করিছে হৃদয় যত। ৯

বিরাম-বিহীন মেঘের শব্দে দামিনী উঠিছে তিমিরে জ্বলি,
তাহারি আলোকে, অভিসারিকারা অনুরাগ ভরে যেতেছে চলি। ১০

চমকি উঠিলে বিজলীর আলো, অথবা শুনিলে নিনাদ ঘোর,
চকিতা রমণী বাঁধিছে প্রাণেশে অঙ্গে মিশায়ে বাহুর ডোর। ১১

নয়ন-ইন্দিবরের জলেতে বিম্বাধরটি সিক্ত হয়,
আভরণ ত্যজি, প্রোষিত-ভর্ত্তা নিরাশে বাদলে রয়। ১২

ধূলাকীটে মিশে পাণ্ডুবর্ণ ধরেছে নিম্ন-গামিনী জল,
সর্পের মত বাঁকা গতি দেখে সভয়ে কাঁপিছে ভেকের দল। ১৩

পত্র-পুষ্প-শূন্য-নলিনী ত্যজিল ভ্রমর শব্দ তুলি,
নৃত্য-চপল-শিখির পুচ্ছে কুবলয় ভাবি পড়িছে ঢুলি। ১৪

মেঘের শব্দে বনের বারণ, যাতে বৃংহিতে বারম্বার,
কপোলে তাহার মদবারি ঝরে ভৃঙ্গ এসেছে গন্ধে যার। ১৫

শুভ্র-পদ্ম মেঘের শোভাতে ঢেকেছে উপল, প্রস্রবণ,
শিখিরা নাচিতে করিয়াছে সুরু; ভূধর হরিছে আকুল মন। ১৬

কদম-কেতকী অর্জ্জুন-শাল গন্ধে ভ'রেছে মৃদুল বায়,
সশীকর মেঘ-শীতল সমীর, কোন্ হৃদি নাহি শিহরে তায়? ১৭

সসীধু মুখেতে জাগিতেছে রতি, শ্রোণি-তটে দোলে চিকন-চুল,
স্তনেতে শোভিছে সুশোভিত হার, কর্ণে গন্ধ-পুষ্প-দুল। ১৮

বিদ্যুল্লতা, ইন্দ্র-ধনুর শোভায় ভ'রেছে জলদগণ,
উজলকাঞ্চী মণি-কুণ্ডলে, কামিনী হরিছে প্রবাসী-মন। ১৯

কেতকী-কদম নব-কেশরের গন্ধ মালিকা বাঁধিছে মাথে,
অর্জ্জুন-ফুল-গুচ্ছ দোলায় বিলাসী রমণী কর্ণ-পাতে। ২০

সুবাসিত কেশ করিল নারীরা, কৃষ্ণ-অগুরু মাখিল গায়,
প্রদোষে পয়োদ-গরজন শুনি গুরু-গৃহ ত্যজি শয়নে যায়। ২১

রামধনু আর বিজলীর শোভা নীল মেঘ-দল বুকেতে ধরে,
পবনের ভরে ধীরি ধীরি চলি, পথিক বধূরা মানস হরে। ২২

নব-জল সেচে বন-তাপ গেল, পবন কাঁপাল বনের শাখী,
কদম ফুটিল, কেতকী চাহিল কাঁটায় মধুর হাসিটি রাখি। ২৩

শিরে দিল বাঁধি যূথিকা-বকুল-মুকুল-মালতী-মালিকা রম্য,
কদম-কর্ণ-ভূষণ দোলাল জলদ আজি গো কান্ত সম। ২৪

শ্রোণি-তটে বাঁধে শ্বেতাভ দুকূল, দুলিল মালাটি স্তনের মুখে,
দেহ-লতা কাঁপে, কটি ত্রিবলিতে নব সলিলের পরশ-সুখে। ২৫

নব-জল-কণা-সিক্ত-পুষ্পে অবনত আজি বৃক্ষগুলি,
প্রোষিত জনারে আকুল করিছে, পবন কেতকী-গন্ধ তুলি। ২৬

মোরা জলধর জলের ভারেতে নমিত হইয়া যখন পড়ি
মোদের আলয় তপ্ত বিন্ধ্যে সলিল সেচনে ফুল্ল করি। ২৯

বৃক্ষলতার অমিয় বন্ধু কামিনী জনের চিত্তহারী,
তোমার আশাটি পূর্ণ করুক জীবের জীবন বৃষ্টি বারি। ২৮

জন্মাষ্টমী

[শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ]

দুইটি শিশুর জন্মকথা

আজ হইতে পাঁচ হাজার বৎসরেরও পুরাতন কথা। বর্ত্তমান কালের যুক্ত-প্রদেশের মথুরা জেলা এবং তাহার চারিপাশের স্থান লইয়া সেকালে "শূরসেন" নামে একটী জনপদ গড়া হইয়াছিল, এবং যমুনা নদীর তীরবর্ত্তী মথুরা-নগর ঐ জনপদের রাজধানী ছিল। এই পাঁচ হাজার বৎসরের ভিতরে এই জনপদের উপর পুরাতন যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ, শক, যবন, কুষাণ এবং নূতন রাজপুত-ক্ষত্রিয় রাজগণের শাসন চলিবার পর খৃষ্টের দ্বাদশ শতকের শেষ ভাগ হইতে প্রায় পাঁচ শত বৎসর পর্য্যন্ত নানা শ্রেণীর মুসলমান রাজারা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন এবং সম্প্রতি তথায় ইংরেজ-রাজত্ব চলিতেছে। একমাত্র যমুনা নদীই পুরাকালের সাক্ষি-স্বরূপে মথুরার নিম্ন দিয়া বহিয়া যাইতেছেন, আর সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। পাঠান এবং মুঘল ধর্ম্মান্ধ মুসলমান সম্রাট্ এবং সেনাপতিগণের দারুণ বিদ্বেষের ফলে এখন সমস্ত প্রাচীন চিহ্নই মুছিয়া গিয়াছে।

ইংরেজ রাজের দয়ায় মথুরার কোন কোন অংশের মাটির নীচু পর্য্যন্ত খুঁড়িয়া শক, যবন এবং কুষাণ প্রভৃতি রাজগণের বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম্মানুরাগের অনেক মূল্যবান্ নিদর্শন বাহির হইয়াছে, কিন্তু যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের সমসাময়িক কোন কীর্ত্তিচিহ্নই পাওয়া যায় নাই এবং পাইবার আশাও বড় নাই। জনশ্রুতি যে স্থানে পবিত্রাদপি পবিত্র গৃহাদির অবস্থান দেখাইয়া দেয়, সেইখানে ঔরঙ্গজেব বাদশাহের সুবিশাল মসজেদ সদর্পে দাঁড়াইয়া সকল অনুসন্ধানের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়েরা অনেক প্রাচীন কাল হইতে শূরসেন প্রদেশ শাসন করিতেন, এবং তাঁহাদের শাসন-প্রণালী গণতান্ত্রিক ছিল। গণতান্ত্রিক শাসন-প্রণালীর অনেক কথা বৌদ্ধ-সাহিত্য হইতে পাওয়া যায়। যে সময়ের কথা আমরা বলিতে যাইতেছি, সেই সময়ে যদুবংশীয় অন্ধকের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুকুর-কুলোৎপন্ন উগ্রসেন গণনায়ক ছিলেন, অপর সকল ক্ষত্রিয় বীর গণসভার সভ্য-স্বরূপে শাসন-কার্য্য চালাইতেন।

উগ্রসেনের পুত্র কংস প্রাচ্য ভারতের রাজচক্রবর্ত্তী মগধ-সম্রাট্ জরাসন্ধের দুইটী কন্যাকে বিবাহ করিয়া এবং শ্বশুরের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব (Imperial influence) নিজের চক্ষুতে দেখিতে পাইয়া, লোভবশতঃ এবং খুব সম্ভব শ্বশুরের উৎসাহে, পিতাকে গণনায়কের আসন হইতে দূরীভূত করিয়া নিজে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে শাসন-প্রণালীকে রাজতন্ত্রে পরিবর্ত্তিত করিয়া বসেন। তাঁহার এই কর্ম্ম যদুবংশীয় অন্যান্য বীরপুরুষগণের অনুমোদিত না হইলেও কেহই শক্তি-সামর্থ্যের অভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস পান নাই।

যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে স্বগোত্রে বিবাহ প্রচলিত ছিল, এবং তাঁহাদের সমাজে কন্যাকে (মামাত এবং পিসতুত ভগিনীকে) বিবাহ করারও প্রথা ছিল। বসুদেব নামক যাদব-বীর উল্লিখিত অন্ধকের অন্যতম পুত্র ভজমানের বংশধর ছিলেন। এই সময়ে, কংসের পিতৃব্য দেবকের কন্যা দেবকীর বিবাহ মহাসমারোহে বসুদেবের সহিত সুসম্পন্ন হইল। কংস এই বিবাহে নূতন কুটুম্বকে উচিতেরও অতিরিক্ত আদর করিলেন; নিজে দেশের রাজা হইয়াও নূতন বিবাহিত বরকন্যাকে সুসজ্জিত রথে চড়াইয়া এবং নিজে সারথী হইয়া মহা আদরের সহিত তাঁহাদিগকে অন্তঃপুরে আনিলেন।

এই বিবাহ-মহোৎসব, কিন্তু মহাবিষাদে পরিণত হইল। কংস অতি আনন্দের সহিত ভগিনী এবং ভগিনীপতিকে রথে বসাইয়া অন্তঃপুরে আনিতেছেন, এমন সময়ে এক দৈববাণী শুনিতে পাইলেন। দৈববাণী বলিল, "মূর্খ, যাহাদিগকে রথে চড়াইয়া এত আদরের সহিত ঘরে আনিতেছ, ইহাদের পুত্র তোমার প্রাণনাশ করিবে।" এই অশুভ-সংবাদের ফলে কংসের প্রাণ যে আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। হরিবংশের মতে, নারদঋষি বসুদেব-দেবকীর বিবাহের পরে, কংসের

সভায় আসিয়া দেবগণের ষড়্‌যন্ত্রের কথা এবং তাহার ফলে স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্মিয়া কংসকে বধ করার কথা বলিয়াছিলেন।

মথুরা নগরের অদূরে যমুনাতীরবর্ত্তী বনভূমিতে আভীর বা গোয়ালাদের ঘোষ বা বাথান ছিল। এক দিকে যমুনা নদী এবং অন্যদিকে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত, ইহার মধ্যে বনভূমিতে বাথানগুলি প্রয়োজনমত নানাস্থানে বসান হইত। "বৃন্দাবন" নামক অতি রমণীয় ছায়াবহুল অথচ ঘন ঘাসপূর্ণ একটী বনে নন্দ নামক এক ধনবান্ গোপ-প্রধানের গোচারণ স্থান ছিল। অগণ্য গোধন তাঁহার থাকায়, তিনি গোপগণের সর্দ্দার বা রাজার মত মাননীয় ছিলেন। অন্যান্য গোপেরা নন্দের যোগে রাজার পাওনা খাজনা মিটাইয়া দিত, এবং সেই উদ্দেশ্যে নন্দকে প্রতি-বৎসরে রাজধানীতে আসিতে হইত।

ভয়ানক দৈববাণী শুনিয়া, আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কংস কি করিলেন, হরিবংশের ঋষি চমৎকার ভাবে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন :—

"কংসরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার হিতকামী মন্ত্রীদিগকে আদেশ দিলেন,—দেখুন, আপনারা দেবকীর গর্ভ হইবা মাত্র প্রথম হইতেই শিশুকে মারিয়া ফেলিবার জন্য প্রস্তুত হউন; যেহেতু যে স্থানে এরূপ আশঙ্কা, সেখানে প্রথম হইতেই অর্থাৎ প্রথম সাতটী শিশুকেই মারিতে হইবে, কেবল অষ্টমটিকে মারিলে চলিবে না। অন্তঃপুরের মধ্যে দেবকী যেরূপ ভাবে গুপ্ত পুরুষ এবং নারী চরের নজরবন্দী আছেন, সেইরূপ স্বাধীন ভাবে বিশ্বাসের সহিত থাকুন, কেবল গর্ভের সময় সাবধান হইতে হইবে। ...প্রসবের সময় কখন্ হইবে, আমরা বেশ বুঝিতে পারিব। বসুদেবকেও অন্তঃপুরের মেয়ে মহলে জামাই আদরে খুব সাবধানে রাখিতে হইবে, নপুংসক এবং নারী উভয় প্রকার প্রহরীরাই খুব গোপনে দিনরাত উঁহার উপর কড়া নজর রাখিবে, কিন্তু তিনি যেন ব্যাপারটা বুঝিতে না পারেন, কেহ যেন তাঁহাকে আমাদের উদ্দেশ্যের কথা বলিয়া না দেয়।"

কংসের আদেশমত অতি চতুর নারী এবং নপুংসক উভয় প্রকার প্রহরীর খুব কড়া নজর বন্দীতে বসুদেব এবং দেবকী রাজার অন্তঃপুরে বাস করিতে লাগিলেন। ভিতরে ভিতরে যাহাই হউক, বাহিরে লোকে দেখিল, যে, রাজা ভগিনী এবং ভগিনীপতিকে খুব আদর যত্নের সহিতই অন্তঃপুরে রাখিয়া প্রতিপালন করিতেছেন।

কংস মথুরার রাজত্ব-ভার লইয়াই শুধু জ্ঞাতি বন্ধুদিগের উপরেই নহে, পরন্তু সকলের উপরেই খুব অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। বিশেষতঃ দেবদেবী এবং ব্রাহ্মণ-গণের উপর তাঁহার দ্বেষ অতিরিক্ত মাত্রায় পড়ায়, হয় (বংশীয়?) কেশী, প্রলম্ব, ধেনুক, অরিষ্ট, বৃষভ, পূতনা এবং কালিয় প্রভৃতি দুষ্ট-স্বভাব নরনারীকে তিনি ঐ অত্যাচার কার্য্যের সহায়রূপে গ্রহণ করায় লোকে কংসকে অসুর বলিত এবং নিজেও সম্ভবতঃ সাধারণ অজ্ঞ লোকের কাছে নিজের মান বাড়াইবার অভিপ্রায়ে নিজেকে মানুষ উগ্রসেনের পুত্র না বলিয়া, শৌভপতি দ্রুমিল নামক অসুরের ঔরসজাত পুত্র বলিয়া বাহাদুরি করিতেন (বিষ্ণু-পর্ব্ব, ২৮শ অধ্যায়)। তাঁহার অত্যাচারে পীড়িত হইয়া পৃথিবী স্বর্গে গিয়া ব্রহ্মার নিকট কাঁদাকাটী করায়, ব্রহ্মার অনুরোধে ভগবান্ বিষ্ণু নিজে রাম এবং কৃষ্ণ মূর্ত্তিতে দেবকীর সপ্তম এবং অষ্টম গর্ভে জন্মিবেন এবং কংসকে তাহার সাহায্যকারী অসুরগুলির সহিত মারিয়া পৃথিবীর ভার কমাইয়া দিবেন, স্বীকার করিয়া পৃথিবীকে বুঝাইয়া পুনরায় নিজের কাজে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

জন্ম-কথা

ভগবান্ মহামায়াকে যাহা আদেশ দিয়াছিলেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে যে প্রতিপালিত হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। দেবকীর এক এক করিয়া ছয়বারে ছয়টী পুত্র হইল এবং কংস প্রত্যেকবার নিজে আসিয়া সদ্যোজাত শিশুটীকে মারিলেন। সপ্তম বারে রাজাবরোধের লোকেরা জানিল, যে, এবারে দেবকী দেবীর গর্ভ নষ্ট হইয়া গেল, কিন্তু আসল কথা এই যে, মহামায়া ছেলেটিকে দেবকীর উদর হইতে মায়াবলে বাহির করিয়া রোহিণীর উদরে রাখিয়া দিলেন। মথুরার নিকটবর্ত্তী স্থানে যে সকল গোয়ালারা বাথান (ঘোষ) করিত, তাহাদের মধ্যে নন্দ-গোপ মোড়ল বা মুখিয়া ছিলেন, তাই পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কোনও কারণবশতঃ তাঁহার সহিত বসুদেবের খুব বন্ধুত্ব ছিল, এবং বসুদেব রোহিণীর গর্ভের লক্ষণ দেখিয়া খুব সাবধান লোকের মত তাঁহাকে নন্দগোপের বাথানে

গোপনে পাঠাইয়া দিলেন। রোহিণীর বাপের বাড়ী সিন্ধুনদের পশ্চিমে বাহ্লিক দেশে ছিল, এবং তাঁহার বাপ পুরুবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন (১)। মথুরার লোকে ভাবিল, রোহিণী হয় তো সেই সুদূর বাহ্লিক দেশে বাপের বাড়ী গিয়াছেন। যাহা হউক, যথাসময়ে রোহিণীর অতি সুন্দর গৌরবর্ণ হৃষ্ট-পুষ্ট বলিষ্ঠ পুত্র বলরাম জন্মিলেন, এবং নন্দালয়েই তিনি বাড়িতে লাগিলেন।

এ দিকে শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষ আরম্ভ হইলে, গোপপ্রধান নন্দ তাঁহার অধীন ঘোষগুলির গোয়ালাদের বার্ষিক রাজকর দিবার উদ্দেশ্যে নিজের প্রিয়তমা পত্নী যশোদা, নিজের লোক জন, গরুর গাড়ী, পালকী ইত্যাদি লইয়া রাজধানী মথুরার খুব নিকটে, যমুনার ঠিক অপর পারেই, ছাউনি গাড়িলেন। গোয়ালারা এক রকম যাযাবর স্বভাবের লোক, গরু-বাছুর পুত্র-পরিবার এবং গৃহস্থালীর সমুদায় জিনিস পত্র লইয়া, গরুর খাদ্য ঘাস, জল এবং নিজেদের দরকারী কাঠ মোটের অভাব বুঝিলেই, এক বন হইতে অন্য বনে বাথান লইয়া যাইতে তাহারা খুব অভ্যস্ত ছিল। গরুর অভাব ছিল না, গরুর গাড়ী তৈয়ারও বিনা খরচে হইত, কাজেই তাঁহাদের সকলেরই অনেক গরুর গাড়ী থাকিত এবং সেগুলি বাথান বসাইবার সময় চক্রাকারে রাখা হইয়া প্রাচীরের বা বেড়ার কাজ করিত। এইজন্য ঘোষ বা বাথানের বর্ণনায় শকটের বর্ণনা খুব পাওয়া যায়। আগেই বলা হইয়াছে, যশোদা নন্দের প্রিয়তমা পত্নী ছিলেন, সুতরাং তিনি ভরা আট মাস গর্ভবতী থাকিলেও, স্বামীর সঙ্গে শহরে যাইতে ছাড়েন নাই। যাহারা বনবাসে বা পাড়াগাঁয়ে থাকে, তাহাদের পক্ষে শহরের আকর্ষণ চিরকালই বড় শক্ত; আর যশোদা এবং নন্দ উভয়ের কেহই ভাবেন নাই, যে, আটমাসেই হঠাৎ "ছেলে হইয়া" পড়িবে! তাঁহারা আরও এক মাস দেড় মাস সময়ের বিলম্ব আছে ভাবিয়াছিলেন। সেই জন্য যশোদার শহর দেখিতে যাওয়ার আব্দার রক্ষা করিতে স্বামী মহাশয়ের বিশেষ কোনও আপত্তির কারণ হয় নাই।

যাহা হউক, যে রাত্রির কথা বলিতেছি আজ হইতে পাঁচ হাজার বৎসরেরও আগে চান্দ্র শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা অষ্টমীর সেই জয়ন্তী রাত্রি আসিল। রাত্রির ঠিক অর্দ্ধেক কাটিয়া গেলে, অভিজিৎ নক্ষত্র এবং "বিজয়" নামক মুহূর্ত্ত আসিল। সাগর কাঁপিয়া উঠিল, পর্ব্বত টলিতে লাগিল, অগ্নিহোত্রের সুষুপ্ত অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, শুভবায়ু বহিতে লাগিল, পৃথিবীর এবং বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণা শান্ত হইয়া গেল, আকাশের জ্যোতিষ্কগুলি প্রকাশিত হইয়া পড়িল, —অব্যক্ত, শাশ্বত, সূক্ষ্ম, প্রভু হরিনারায়ণ জন্মগ্রহণ করিলেন,—সেই রাত্রি 'জয়ন্তী' নাম পাইয়া ধন্য হইল; ভগবান্ জন্মিবামাত্র আকাশে দেবগণের দুন্দুভি গুলি আঘাত না পাইয়া আপনিই বাজিয়া উঠিল, দেবরাজ ইন্দ্র নিজে রাশি রাশি দৈব কুসুমের বৃষ্টি করিলেন, এবং অপ্সরোগন্ধর্ব্বগণের সহিত দেবদেবীগণ দলে দলে মঙ্গল গান গাহিতে গাহিতে এবং সুস্বরে স্তুতি করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হৃষীকেশের জন্মগ্রহণে জগৎ প্রহৃষ্ট হইয়া উঠিল, দেবর্ষি-মহর্ষিবৃন্দ-পরিবৃত স্বয়ং শতক্রতু মধুসূদনের স্তুতিগান গাহিতে লাগিলেন। সেই রাত্রিতে অখিল জগতে কি যে হর্ষ, কি আনন্দ, কি উৎসবের উচ্ছ্বাস বহিয়াছিল তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

কংসের আজ্ঞাবহ এবং বিশ্বস্ত কত নর-নারী-নপুংসক প্রহরীদিগের দ্বারা দিবারাত্রি সযত্নে সুরক্ষিত সেই শুদ্ধান্তের ভিতর একটী বিশেষ গৃহে, বর্ষাঋতুর চান্দ্র শ্রাবণের কৃষ্ণা অষ্টমীর মধ্যরাত্রিতে দেবকীর অষ্টম গর্ভের পুত্র অকালে প্রসূত হইলেন। চতুর চরেরা গর্ভের প্রথম সঞ্চার হইতেই গণনা করিয়াছে, দেবকীর দেহের লক্ষণগুলির উপর প্রত্যহ কি পরিবর্ত্তন আসে, তাহা লক্ষ্য করিয়াছে যত কিছু সংবাদ লওয়া দরকার মনে করিয়াছে, সব লইয়াছে,—কিন্তু এই তো আট মাস বৈ নয়, এখনও দেরী আছে, মাথা নাড়িয়া বর্ষীয়সী বহুদর্শিনী নিপুণা ধাত্রী বলিয়াছে, 'ওগো এখনই ব্যস্ত কেন? দেরী আছে।' সেই আশ্বাসে কংস এবং তাঁহার অমাত্য উপদেষ্টারা নিশ্চিন্ত আছেন। কিন্তু, ভগবান্ সমস্ত গুণীর গণনা, চতুরের চালাকী ব্যর্থ করিয়া অবতীর্ণ হইলেন। স্তিমিত প্রদীপের আলোকে বসুদেব দেখিলেন,—এ কি অপূর্ব্ব পুত্র! তিনি পুত্রের মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া ভাবিলেন, "এ, যে—**তিনি**

---

(১) পুরুবংশীয় অনেকগুলি ক্ষত্রিয়-রাজা হিমালয়পর্ব্বতের দুর্গম অংশে সিন্ধুনদের উপত্যকার উত্তর পার্শ্বেই রাজ্য করিতেন। পুরুবংশীয় মহারাজ শান্তনুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাহ্লীকরাজের দৌহিত্র ছিলেন, তিনি মাতামহের রাজ্য এবং "বাহ্লিক" নাম দুইই পাইয়াছিলেন।

প্রফুল্ল পদ্মপত্রাভনয়ন, শ্রীবৎস-শোভিত বক্ষোদেশ, শঙ্খ-চক্রগদাপদ্মবিভূষিত চতুর্বাহুধর, একেবারে সর্ব্বলক্ষণ-যুক্ত বাসুদেব যে।" তিনি ভয়, ভক্তি, প্রেম এবং বিস্ময়ে অভিভূত-প্রায় হইয়া গেলেও, দারুণ পচ্যমান ব্রণ-শোথের মত দিবারাত্র অনুভূত কংস-ভয় তাঁহার প্রাণে জাগিয়া উঠিল। যাবতীয় ভয়হারীর পিতৃত্ব পাইয়াও বসুদেব মায়া-মুগ্ধ চিত্তে এবং অশ্রুনিরুদ্ধ গদ্-গদস্বরে বলিলেন, "বাবা,—তোমার ঐ জগন্মনোবিমোহন রূপ লুকাও বাবা! কংসের ভয়ে মরিয়া আছি, বাবা, তাই এমন কথা বলিতেছি। বাবা, তোমার যতগুলি বড় ভাই হইয়াছিল, সেই নিষ্ঠুর সবগুলিকেই মারিয়া ফেলিয়াছে!"(২)

ভগবান্ মায়ামুগ্ধ পিতার কথা শুনিয়া নিজের অলৌকিক রূপ লুকাইয়া অষ্ট মাসের অকালপ্রসূত খোকাটী হইলেন, আর বাবাকে বলিলেন, "আমাকে নন্দগোপের গৃহে লইয়া যাও।" ভগবানের আজ্ঞা পাইবামাত্র, বসুদেব চোরের মত সেই সদ্যোজাত ছেলেটি বুকে লইয়া নন্দ-গোপের সেই ছাউনির দিকে চলিলেন,—অন্তঃপুরের প্রহরী-দল, মথুরাদুর্গের রক্ষকগণ, কেহই কিছু জানিল না, বুঝিল না! যোগমায়ার প্রভাবে সে রাত্রিতে নিদ্রা ঠিক মহা-নিদ্রার মত রক্ষিবর্গের নয়নগুলিকে গাঢ় মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিল। একে কৃষ্ণাষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রি, তাহার উপর ঘন ঘন গর্জ্জনের সহিত মেঘমালা আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল, মুষলধারে বৃষ্টি ঝর ঝর অবিশ্রাম ঝরিতে লাগিল, এদিকে ছেলেটী কোলে লইয়া বসুদেব শঙ্কাকুল হৃদয়ে যমুনার তীরে আসিয়া পৌছিলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন, সর্ব্বনাশ! কৃতান্তের ভগিনী কালো যমুনা ভরা ভাদ্রের বর্ষণে দশগুণ স্ফীত হইয়া, বুকে অগণ্য অসংখ্য আবর্ত্তের-মালা লক্ষ-মুণ্ডমালার মত লইয়া, প্রলয়-কালের মহাকালীর উপমার অতীত কালো তরল ভীষণাতিভীষণ মূর্ত্তিতে উন্মাদিনী হইয়া ভীষণ ঘোর গর্জ্জন করিতে করিতে কোথায় ছুটিতেছে! জল যে কত গভীর, তা কে জানে? ধরা পড়িবার ভয়ে নৌকা ডাকিবার উপায় নাই;—নটের শিরোমণি ছেলে আগেত একটু সংবাদও দেন নাই—যে যাহাহউক একটা বন্দোবস্ত পূর্ব্ব থেকে করা যেত! এখন আর ভাবিবার সময় নাই, পিছু ফিরিবার উপায় নাই, দুটী হাত দিয়া ছেলেকে বুকে ধরিয়া বসুদেব সাতরাজার ধন অপেক্ষাও কোটি কোটি গুণে মূল্যবান্ সেই কালো মাণিককে বুকে ধরিয়া সূচিভেদ্য কালো অন্ধকারে তাহার অপেক্ষাও শতগুণ কালো যমুনার সর্ব্বগ্রাসী তরঙ্গে নামিলেন এবং কেমন করিয়া রুদ্ধ-শ্বাসে পরপারে আসিয়া পৌছিলেন আশ্চর্য্য! ভদ্রলোকের ধুতিও ত যমুনার জলে ভিজে নাই, তাঁহার উত্তরীয়, লম্বিত কেশ, ছেলের দেহ কিছুই ত ভিজে নাই। নীচে যমুনার কূলপ্লাবী-জল, উপরের অশ্রান্ত ঝর ঝর বৃষ্টির জল, কোথায় গেল? ঋষিরা বলিয়াছেন, স্বয়ং অনন্তদেব তাঁহার সহস্র কুলোর মত ফণার শ্বেতছত্র খুলিয়া বসুদেবের মাথার উপর ধরিয়াছিলেন, যম-ভগিনী যমুনা নিজেই বসুদেবের না হউক বসুদেবের পায়ের নীচে নিজের বুক উচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।

নন্দগোপের সেই ছাউনী যমুনার তীরের উপরেই ছিল, বসুদেব অন্ধকারে চুপে চুপে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একটী ঘরের (কাপড়ের তাম্বুও হইতে পারে) দ্বার—প্রায় খোলা রহিয়াছে, এবং ভিতরে যশোদা তখনই একটি মেয়ে প্রসব করিয়া অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছেন; ছোট্ট মেয়েটী মায়ের কোলে রহিয়াছে। বসুদেব পা টিপিয়া অতিশয় সাবধানে কোলের ছেলেটাকে যশোদার কোলে শোওয়াইয়া মেয়েটিকে বুকে তুলিয়া লইয়া চলিয়া আসিলেন,—যশোদা আদৌ জানিতে পারিলেন না। তিনি যখন জাগিলেন, দেখিলেন, অতি সুন্দর কালো এক ছেলে তাঁহার কোল আলো করিয়া আছে!

ও-দিকে বসুদেব মেয়েটাকে আনিয়া দেবকীর কোলে দিলেন। মহামায়ার দয়ায় তখনও রাজবাড়ীর একটী প্রাণীও জাগিয়া উঠে নাই, কাজেই দেবকীর পুত্র প্রসব, এবং বসুদেবের ছেলে-মেয়ে বদলা-বদলির ব্যাপার, কেহই জানিতে পারিল না। বসুদেব নিশ্চিন্ত হইয়া তখন নিদ্রিত কংসকে উঠাইয়া বলিলেন, "ওহে, এবার দেবকীর একটী টুক্ টুকে খুকী হইয়াছে।"

যাহা হউক, কংস এই সংবাদ শুনিবা মাত্র কতকগুলি প্রহরী সঙ্গে লইয়া দৌড়িয়া বসুদেবের ঘরের দরজায় পৌছিলেন এবং "কি হইয়াছে কি হইয়াছে শীঘ্র আমাকে

(২) শ্রীমদ্ভাগবতে খুব সুন্দর কবিত্বপূর্ণ স্তোত্র আছে, প্রস্তাব বড় হইবার ভয়ে আমরা হরিবংশের খুব ছোট স্তুতিটী তুলিয়াছি।

দাও, শীঘ্র আমাকে দাও" বলিয়া বজ্রের মত কঠোর স্বরে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন;—দেবকীর নিকটে যে মহিলারা ছিলেন, তাঁহারা সেই বিকট চীৎকার শুনিয়া সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিলেন। দেবকী অনেক সহ্য করিয়াছিলেন, তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন না, কিন্তু কংস বারংবার "দাও দাও" বলিয়া অস্থির করিয়া তুলিলে তিনি বিষণ্নভাবে বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন,—

"এই তো মেয়েটী হইয়াছে, আপনি সর্ব্বশক্তিশালী, আপনি একে একে আমার সাতটী পুত্রকেই মারিয়াছেন, এটি তো মেয়ে, মরিয়াই আছে; যদি দেখতে চা'ন, এই দেখুন না কেন!"

কংসও সেই সদ্যোজাতা কন্যাটীকে টানিতে টানিতে বলিল 'হাঁ যখন জন্মিয়াছে, তখন তো মরিয়াই আছে!" তখন দেবকী সেই সদ্যোজাতা কন্যাকে মাটির উপর শোওয়াইয়া দিলেন, তখনও মেয়ের চুলগুলি ভিজা রহিয়াছে। কংস অবজ্ঞার সহিত মেয়েটিকে তুলিয়া দুই একবার ঘুরাইয়া সহসা এক পাথরের উপর ছুড়িয়া আছাড় মারিতে গেল. কিন্তু আশ্চর্য্য! মেয়ে সেই পাথরের উপর তো পড়িল না, আকাশে বরং কিছু উঁচুর দিকেই উঠিয়া গেল!

সহসা কি পরিবর্ত্তন! সেই আকাশে অতি ক্ষুদ্র শিশুটী তো আর নাই! অন্ধকারময় আকাশের মধ্যে তাঁহারই দিব্য জ্যোতির ঝলকে কয়েকটী নরনারী মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখিতে লাগিল,—উজ্জ্বল নীল বর্ণের রেশমী ঘাগরা-পরা এবং স্বর্ণবর্ণের রেশমী ওড়না গায়ে মুকুট-কটক কেয়ুর-বলয়-হারাদি উজ্জ্বলতম বিবিধ ভূষণ-ভূষিতা পীনোন্নত-পয়োধরবতী পূর্ণ-যৌবনা এক কুমারী মুক্ত কেশে ভীষণ অথচ আশ্চর্য্য উজ্জ্বল মহামহিমবেশে দশ হাতে দশ প্রহরণ লইয়া ভ্রূকুটী-কুটিল মুখে আসন্ন যুদ্ধের ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার বর্ণ স্ফুরিত তড়িতের ন্যায়, তিনি গর্জ্জন করিতেছেন। তাঁহার মূর্ত্তি অতিশয় রৌদ্র; স্বর্ণ মুষ্টি ভূষিত নিষ্কোশিত ভীষণ খড়্গ এবং জলদগ্নি-শিখার মত শাণিত ত্রিশূল তুলিয়া অতি বিকট হাস্যের সহিত হুঙ্কাররবে চীৎকার করিয়া তিনি কংসকে বলিলেন,—"কংস, কংস, তোমার নিজের সর্ব্বনাশের জন্য যে আজ তুমি আমাকে মারিয়াছ,—সহসা আমাকে আকাশে তুলিয়া পাথরে মারিয়াছ, তাহার ফলে তোমার অন্তিম সময়ে, শত্রুরা তোমার দেহ লইয়া যখন টানাটানি করিতে থাকিবে,—আমি তখন আমার নখ দিয়া তোমার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া উষ্ণ শোণিত পান করিব। আমাকে বৃথা মারিয়াই বা তোমার কি লাভ হইবে? তোমাকে যিনি বধ করিবেন, তিনি জন্মিয়াছেন। যাবতীয় দেবগণের তিনি সর্ব্বস্ব,—তিনিই তোমার মৃত্যু।" এই কথার পর সহস্র সহস্র ভূত প্রেত অন্ধকারের মধ্য হইতে ভৈরব রবে ও বিকট হাস্যে দশ দিক্ যেন ফাটাইয়া দিল। তাহার পর, রাত্রির গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে, ইন্দ্রজালের খেলার মত, সবই মিলাইয়া গেল। অসুরের মত অতি দাম্ভিক কংস মহাত্রাসে যেন মোহপ্রাপ্ত হইল,—সে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল।

দেবী কিন্তু পৃথিবীতে আর্য্যা, একানংশা, কাত্যায়নী, গৌরী ইত্যাদি বিবিধ নামে পরিচিতা এবং পূজিতা হইয়া চিরদিনের জন্য রহিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের তিনি রক্ষয়িত্রী—এই জন্য যদুবংশের চিরপ্রিয়া, চির-আরাধ্যা হইয়া থাকিলেন এবং তীর্থে-তীর্থে, পীঠে-পীঠে, অরণ্যে-অরণ্যে, পর্ব্বতে-পর্ব্বতে, গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে, সর্ব্বত্র দেব-মানুষ সকলেরই দুর্গতিনাশিনী দুর্গা হইয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মা দুর্গাও ভারতের ঘরে ঘরে রাজা প্রজা, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল—সকলেরই নিত্য আরাধনার বস্তু হইয়া রহিলেন। ব্রহ্মশক্তি এবং ব্রহ্ম উভয়ের অর্চ্চনাই তাই অচ্ছেদ্যরূপে, একযোগে, ভারতের সর্ব্বসম্প্রদায়ে প্রচলিত।

রাত্রির অন্ধকার দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কংসের জ্ঞান আবার ফিরিয়া আসিল। বিবেকের দংশনে সে দেবকীর পায়ে পড়িল, হাতে ধরিল, বসুদেবকে কত অনুনয় বিনয় করিল, দর্শন-শাস্ত্রের অনেক কার্য্য-কারণের তত্ত্ব-কথা বলিয়া, সকল দোষই যে "কালের", সে নিজে নিরীহ, নির্দ্দোষ—ইত্যাদি অনেক বক্তৃতা করিল, চক্ষুর জলও কিছু কিছু ফেলিল। পুণ্যাত্মা পূতচিত্ত দম্পতি পাপিষ্ঠের যাবতীয় অপরাধ মুক্ত-হৃদয়ে ক্ষমা করিলেন, এবং সে আশ্বস্ত হইয়া নিজের গৃহে ফিরিয়া গেল এবং সেখানে নিজের বিশ্বস্ত অমাত্যগণের সহিত আত্মরক্ষার পরামর্শ করিতে লাগিল।

এ দিকে প্রভাতে কংসকে বিদায় দিবার পরই, বসুদেব একাকী যমুনাতীরে গোপগণের ছাউনিতে আসিয়া বন্ধু নন্দ-গোপকে তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লাভের জন্য যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিয়া অবশেষে স্ত্রী-পুত্র-ধন-জন সহিত তৎক্ষণাৎ নগরের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিয়া ব্রজে (ঘোষে বা বাথানে) ফিরিয়া যাইবার পরামর্শ দিলেন।

বসুদেব নন্দগোপকে যে কংসের শিশুবধসংকল্পের কথা বলিয়াছিলেন, সে শুধু অমূলক ভয় দেখাইবার জন্যই নহে। এ-দিকে কাপুরুষ মহামায়ার তিরস্কার তর্জ্জনে নিতান্ত শঙ্কিত চিত্তে দেবকী-বসুদেবের পায়ে পড়িয়া তাঁহাদের পুত্রবধ অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিল, ও-দিকে নিজের গৃহে ফিরিয়াই আপনার আসল প্রকৃতি প্রকাশ করিল। সে অবিলম্বে প্রলম্ব, কেশী, ধেনুক, এবং অরিষ্ট প্রভৃতি নিজের বিশ্বস্ত কুচক্রী মন্ত্রণাদাতা এবং ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া নিজের বিপদের কথা জানাইয়া আদেশ দিল,—"দেখ হতভাগা মেয়েটা বলিয়া গেল যে, আমার নির্দ্ধারিত মৃত্যু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং সে নিশ্চয়ই শিশু; তোমরা যেখানে যত শিশু পাইবে,—সকলকে মারিবে;—বিশেষতঃ যদি কোন বলবান্ ছেলে দেখ, তাহা হইলে তো আর কথাই নাই।"

নন্দগোপ বসুদেবের গুপ্ত পরামর্শ তৎক্ষণাৎ শিরোধার্য্য করিয়া হৃষ্টমনে সেই আড্ডা ভাঙ্গিবার আদেশ দিয়া যশোদার সহিত যানে উঠিলেন, নরম বিছানা পাল্কীতে পাতিয়া তাহার উপর শিশুটীকে সাবধানে শোওয়াইয়া দিলেন, ছোট ছোট ছেলেরা সেই পাল্কীখানি কাঁধের উপর তুলিয়া লইল। তাঁহাদের সকলেই যমুনানদীর তীর ধরিয়া যে রাস্তা গিয়াছে, সেই নির্জ্জন, শীতল সমীরসেবিত জলসুলভ পথ দিয়া চলিতে চলিতে, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকটস্থ অতি সুন্দর দেশে আসিয়া পৌছিলেন। তথায়, যমুনার সুশীতল সলিল-সংস্পৃষ্ট স্নিগ্ধ বায়ু-বাহিত, লতাগুল্ম এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ বিবিধ বৃক্ষসঙ্কুল, হিংস্রজন্তুর রবে মুখর, গোগণের প্রিয় শ্যামল তৃণাস্তৃত, গোচারণের উপযুক্ত সমতল শষ্পশোভিত স্থল এবং তাহাদের জলপানের উপযুক্ত সুখে অবতরণ করিতে পারে এরূপ তীর্থ-(ঘাট) সমন্বিত জলাশয়-বহুল, বৃষগণের শৃঙ্গাঘাতে ক্ষত বিক্ষত এবং তাহাদের স্কন্ধকণ্ডূয়নজনিত ঘর্ষণে গাঢ় চিহ্নিত বন্যবৃক্ষ-পরিপূর্ণ, মাংসাশী পশুপক্ষিগণ এবং নিহত পশুর মেদ মাংসলোভী সিংহব্যাঘ্রাদি জন্তুর দ্বারা এবং তাহাদের নানাবিধ গর্জ্জনশব্দের দ্বারা সতত পূর্ণ, বিবিধবিহগসমাকুল, সুন্দর এবং সুস্বাদু নানাবিধ ফলের বৃক্ষে সুশোভিত, গোপীদিগের দ্বারা আচ্ছন্ন গোব্রজ (গোচারণের এবং রক্ষার স্থান, ঘোষ বা বাথান) তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পড়িল। এই গোব্রজ, বৃষ এবং গাভীর আরাবে এবং বৎসগণের হম্বারবে সর্ব্বদাই নিনাদিত। ঐ গোব্রজের চারিদিকের সীমান্তে বনের বড় বড় গাছ কাটিয়া (Stockade) বেড়ার মত করা হইয়াছে, তাহার ভিতরে কাঁটা গাছের ডাল ফেলিয়া বেড়াকে সুরক্ষিত করা হইয়াছে এবং তাহার ভিতরে গরুর গাড়ীগুলির সারি গোলাকারে সাজাইয়া পরিধি প্রস্তুত করা হইয়াছে। সেই গোলাকার বেষ্টিত স্থানের মধ্যে স্থানে স্থানে বাছুর বাঁধিবার খুঁটি পোতা রহিয়াছে এবং খুঁটির সঙ্গে দড়িগুলি জড়াইয়া রাখা হইয়াছে। শুকান ঘুঁটে মাটির উপর ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে, তৃণাচ্ছাদিত কুটীরও অনেক রহিয়াছে। হৃষ্ট-পুষ্ট গোপ যুবকেরা নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত রহিয়াছে। গোপ-যুবতীরা ঘরঘর শব্দে দধিমন্থন করিতেছে, দই এবং ঘোল পড়িয়া নর্দ্দামা বাহিয়া যাইতে যাইতে মাটীকে কাদা করিয়া তুলিয়াছে। দধিমন্থনের সময় গোপীদিগের হস্তের বালা ক্রমাগত তালে তালে মধুর নিক্কণ তুলিতেছে। ছোট ছোট ছেলেরা ইতস্ততঃ নানা ক্রীড়ায় মগ্ন রহিয়াছে। সদ্যোমথিত নবনীত জ্বাল দিয়া ঘি করা হইতেছে বলিয়া বাতাস সুগন্ধে ভরিয়া যাইতেছে। নীলরঙের ঘাঘরা এবং জরদা রঙের ওড়নায় সাজিয়া, খোঁপায় বনফুল গুঁজিয়া, বুকের আঁটা কাঁচুলির কাছে ওড়নার প্রান্তটিকে বাঁধিয়া, মাথার উপর জলের কলসী লইয়া তরুণী গোপীরা যমুনাতীরের পথকে যেন আচ্ছাদিত করিয়া জল লইয়া সারি বাঁধিয়া ঘরে ফিরিতেছে। গোপ-প্রধান নন্দ নিজের স্ত্রীপুত্র লোকজন লইয়া অতিশয় আনন্দিত মনে সেই আনন্দপরিপূর্ণ গোলোক-তুল্য গোকুলে প্রবেশ করিবামাত্র ব্রজের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আনন্দ-সহকারে তাঁহাকে আগ বাড়াইয়া লইল। বসুদেবের অন্যতমা পত্নী রোহিণী দেবী যে সুখময় আবাসে পুত্রের সহিত বাস করিতেছিলেন, কৃষ্ণ এবং যশোদাকে লইয়া নন্দ আবার সেই সুখস্বর্গে প্রবেশ করিলেন।

শীতের রাত্রি

(গল্প)

[শ্রীনির্ম্মলকুমার রায়]

সে দিন সন্ধ্যা না হইতেই তুষারপাত আরম্ভ হইয়াছিল। অল্প অল্প বাতাস এবং ক্ষুদ্র বৃষ্টিকণা উপেক্ষা করিয়াও রাস্তার আলোকগুলি তাহাদের কর্ত্তব্য-সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছিল। কদাচিৎ কোন পথিক বোধ হয় নিতান্ত অভ্যাসবশতঃই এই দুর্য্যোগেও বাহির হইয়াছিল; হঠাৎ তুষারপাতে আক্রান্ত হইয়া দ্রুত পদক্ষেপে গৃহাভিমুখে ফিরিতেছিল। অন্ধকার খুব বেশী ঘন নয় এবং জমাটীও নয় বলিয়া পীড়াদায়ক। অত বড় রাস্তার নির্জ্জনতা কিছুতেই দুই চারিটী আলোক্য স্তম্ভ এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী পথিক দূর করিতে পারিতেছিল না। মাঝে মাঝে দু একটা পত্রশূন্য বৃক্ষ অত্যন্ত উদাসীন ভাবে দাঁড়াইয়া তুষার-পীড়ন সহ্য করিতেছে।

ছুটীর সময় সহরটীর অবস্থা প্রায়ই এরূপ হয়। এক সময় যাহারা প্রত্যেক রাস্তাই অসংখ্য তরুণ-তরুণীর কলকোলাহলে মুখরিত হইয়া আপন গর্ব্ব প্রচার করে, তাহাই আবার এই সময়ে নির্জ্জন এবং উৎসবশূন্য হয়। নিতান্ত যাহাদের বাসস্থান তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ জায়গাটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। রাত্রিতে বড় কেহ বাহির হয় না; বিশেষতঃ শীতের প্রকোপটা সেবার বড় বেশী পড়িয়াছিল।

রাত্রির গভীরতার সঙ্গে তুষারপাতের প্রচণ্ডতাও বাড়িতে লাগিল। রাস্তা একেবারে জনশূন্য হইয়া গেল। কদাচিৎ দূরে কোন গৃহকুকুরের ডাক শুনিতে পাওয়া যায়। এমন সময় একটী বাঙ্গালী যুবক নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে রাস্তা দিয়া চলিতেছিল; তাহার বেশভূষা এই দুরন্ত শীত হইতে আত্মরক্ষা করিবার পক্ষে নিতান্ত অপ্রচুর অথচ তাহাকে দেখিয়া মনে হয় না যে, সে এই দেশ সম্বন্ধে কিংবা এই দেশের এই শীতঋতু সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। তাহার চলনে বিদেশগত নূতন লোকের পরিচয় পাওয়া যায় না। একটা মোটা ফ্লানেলের পোষাক—তাহাও অনেক দিনের পুরাতন, গায়ে 'ওভার কোট' নাই। শীতের হাত থেকে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বোধ হয় বেচারা প্রাণপণে একটা প্রকাণ্ড সিগার টানিতেছিল। বড় রাস্তা ছাড়িয়া সে একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। একটা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া অস্পষ্টালোকে বাড়ীর নম্বরটা দেখিল, ইহাতেও সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া পকেট হইতে দেশলাই লইয়া জ্বালিল এবং তাহার আলোতে বাড়ীর নম্বর আবার দেখিল। তারপর 'নক' করিল। কোন উত্তর আসিল না। পাশের আর একটা বাড়ী হইতে সঙ্গীতের মৃদু শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল। বন্ধ কাচের জানালার ভিতর দিয়া স্তিমিতালোক রাস্তার তুষার-পাতকে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। লোকটা কিছুকাল সেই জানালার দিকে চাহিয়া রহিল। নানাগ্রামের সঙ্গীতধ্বনি, তুষারের মৃদু পতন-শব্দ, গলির ভিতরের এই আলো অন্ধকার লইয়া সে যেন কিছুকাল আত্মস্থ হইল। ধীরে ধীরে সে বাড়ীর চৌকাঠে পায়ের নীচের তুষার ঝাড়িতে লাগিল।

এই ভাবে বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা সমীচীন নয় ভাবিয়া আবার সে সাহসে ভর করিয়া 'নক' করিল, অল্পক্ষণের মধ্যেই দ্বার খুলিয়া গেল। এক বলিষ্ঠকায় ইংরেজ যুবক এই অসময়ে অপ্রচুর পরিচ্ছদে শোভিত শীতে কম্পমান বিদেশীকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। চোখে-মুখে সর্ব্বাঙ্গে তাহার দরিদ্রতার চিহ্ন সুস্পষ্ট। বহু দিনের অল্পাহার তাহার চেহারা হইতে ভদ্রতার আবরণ তুলিয়া লইতে চেষ্টা করিয়া প্রায় সফল হইয়াছে। গৃহস্বামী প্রশ্ন করিল—

'আপনি কাকে চান?'

'মিষ্টার চক্রবর্ত্তী এ বাড়ীতে থাকেন না? তিনি কি বাড়ীতে আছেন?'

'না'।

স্পষ্ট বুঝা গেল আগন্তুক একটু চমকাইয়া উঠিল। সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

'তবে তিনি কোথায় গেছেন? আমার যে আজ এখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল।'

ইংরেজ যুবক একবার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ রূঢ় দৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া লইল। তাহার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতাতে আগন্তুক অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

'মিষ্টার চক্রবর্ত্তী তাঁর পড়া শেষ করিয়া দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যাত্রা করিয়াছেন—কাল তাঁর বোম্বে পৌঁছিবার কথা আপনি কি এ খবর জান্‌তেন না?'

এই কথা শুনিয়া আগন্তুকের মুখ কালি হইয়া গেল। অত্যন্ত কষ্টে আত্ম-সংবরণ করিয়া সে ভাবিতে লাগিল, এই ভীষণ শীত-রাত্রি আত্মীয়-স্বজন-বিহীন বিদেশে সে এখন কোথায় যায়!

'দেখুন মিষ্টার পিয়ার্স, আমি মিঃ চক্রবর্ত্তীর এক জন বিশিষ্ট বন্ধু। আমরা শৈশবে এক সঙ্গে পড়েছি। লণ্ডনে আমার বাড়ীতে সে অনেক বার গেছে, এবং আমাকে এখানে আসবার জন্য অনেক বার অনুরোধ করেছে; কিন্তু আমি কিছুতেই সময় করে উঠ্‌তে পারি নি। আজ মনে হ'ল চক্রবর্ত্তীর তো পড়া শেষ হ'ল, এখন একবার দেখা করে আসি। প্রায় এক মাস আগেও তো তার পত্র পেয়েছি; সে লিখেছে যে আরো ২।৩ মাস সে এখানে থাক্‌বে।'

'আপনার কথার সত্যতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হচ্ছে। আপনি বল্‌ছেন চক্রবর্ত্তী আপনাকে এক মাস পূর্ব্বে লিখেছে যে সে আরো দুই তিন মাস এখানে থাক্‌বে, অথচ আমরা জানি অনেক দিন হইল সে স্থির করেছে যে ঠিক এই দিনই সে যাত্রা কর্‌বে।'

'আমি কি আপনার কাছে মিথ্যা বল্‌ছি? আমার যদি সে বন্ধুই না হ'বে তবে কি করে তাহার বাড়ীর খোঁজ কর্‌লাম, কি করেই বা আপনার নাম জান্‌লাম?'

'আচ্ছা আপনার নাম কি!'

'মিষ্টার ঘোষ।'

'কই মিষ্টার ঘোষ বলে তো তার কোন বন্ধু আছে জানি না বা কোন দিন শুনি নে। সে লণ্ডনে গিয়ে এক মজুমদারের বাড়ীতে থাকৃত!'

ঈষৎ হাসিয়া আগন্তুক উত্তর দিল—

'ঠিকই হয়েছে। আমারই পুরা নাম মিঃ মজুমদার ঘোষ। আমরা ছেলেবেলার বন্ধু কি না তাই সে আমাকে নাম ধরেই ডাকৃত।'

বোধ হয় গৃহস্বামী ইহাতেও সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। আগন্তুককে প্রথম দেখিয়াই তাহার মনে কিরূপ একটা সন্দেহ হইতেছিল. যেন কোথায় ইহাকে দেখিয়াছে। অন্ধকারে ভাল করিয়া মুখ দেখিতে পাইতেছিল না। অস্পষ্ট পরিচয়ের একটা অপরিস্ফুট চেতনাতে সে বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

'তা যা হোক্ মিঃ চক্রবর্ত্তী যখন নাই তখন অনর্থক এখানে দাঁড়াইয়া কেন কষ্ট পাবেন। আপনার গন্তব্যস্থানে যেতে পারেন।'

'একটা কথা ছিল। আপনি যখন চক্রবর্ত্তীর এক জন বিশিষ্ট বন্ধু আপনাকে বল্‌তে বাধা নাই। আমি ষ্টেশনে নেমেই দেখি আমার পকেট থেকে গাঁঠকাটারা যথাসর্ব্বস্ব কেটে নিয়েছে। এখন এ রাত্রিতে আমি কোথায় যাই; একটী পয়সা নাই যে কোন হোটেলে রাত্রি কাটাব। আপনি যদি বিশ্বাস করে আমাকে পাউণ্ড দুই ধার দেন তবে বিশেষ উপকৃত হই। কোথাও আশ্রয় না পেলে আজ এই রাত্রিতে শীতে ও অনাহারে আমি বাঁচ্‌ব না।'

গৃহস্বামীর সন্দেহ আরো ঘনীভূত হইল; হইবার কথা। কোন অপরিচিত বিদেশী আসিয়া যদি হঠাৎ রাত্রিতে দুই পাউণ্ড ধার চায় কাহার না সন্দেহ হয়! একবার মনে হইল লোকটাকে সে চিনিতে পারিয়াছে। এমন সময় হঠাৎ পশ্চাৎদিক্ হইতে এক ঝলক আলোক আসিয়া আগন্তুকের মুখের উপর পড়িল। মিসেস্ পিয়ার্স স্বামীর বিলম্ব দেখিয়া বাতিহস্তে নামিয়া আসিয়াছিলেন। তাহারই স্পষ্টালোকে আগন্তুক অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তাহার চেহারা দেখিয়া মনে হইল সে যেন চুরি করিতে কৃতসংকল্প হইয়াই আসিয়াছিল, কিন্তু চুরি করা বেচারার পেশা নয়। রাত্রির অন্ধকারে সে এই গর্হিতকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, হঠাৎ আলোক স্ফুরণের সহিত সে যেন নিজে নিজেই লজ্জিত হইল। বিশেষতঃ পশ্চাৎ হইতে ইংরেজ মহিলা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছিল। তাহার সেই বিশ্লেষণকারী অমোঘ দৃষ্টির অণুবীক্ষণের

সম্মুখে তাহার মনের, দেহের এবং পোষাকের সমস্ত দৈন্য যেন মুহূর্ত্তে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল।

হঠাৎ ইংরেজ যুবক জিজ্ঞাসা করিল, 'বলুন দেখি আপনার বন্ধুর পুরা নাম কি?'

এবার আগন্তুক সত্যই ভীত হইল। মনে করিল এবার তাহাকে ধরা পড়িতেই হইবে। হঠাৎ সে অত্যধিক অনাবশ্যক জোরে বলিয়া উঠিল,—'আমি কি আপনার কাছে দুই পাউণ্ডের জন্য মিথ্যা কথা বলতে এসেছি? কে না জানে তাহার নাম 'নিশীথ'।'

হঠাৎ গৃহস্বামী লাফাইয়া আগন্তুকের গলাবন্ধ টানিয়া ধরিল এবং প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়া বলিল, 'মিথ্যাবাদী কোথাকার! বদমায়েসি করবার আর জায়গা পাও নি? দুমাস পূর্ব্বে একটা ফৌজদারী মকদ্দমার আসামীরূপে তোমার ছবি কাগজে বেরোয় নি? এখুনি যদি তুমি আমার বাড়ী থেকে না বেরিয়ে যাও ত পুলিশ ডাকব'।'

এক পা দুই পা করিয়া আগন্তুক চলিয়া আসিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে স্তিমিতালোক হইতে অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া গেল। অবিশ্রান্ত তুষারপাত এবং অকরুণ শীতবাতাসে মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের বিশ্রী ঘটনাকে ধুইয়া মুছাইয়া দিল।

গৃহস্বামী দ্বার বন্ধ করিয়া পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'দেখিলে এডি পাজী হিন্দুস্থানীর কাণ্ড, বলে কিনা চক্রবর্ত্তীর নাম 'নিশীথ'।'

'কিন্তু দেখ, লোকটা এই অসময়ে এসেছিল, তুমি তাকে একটু জায়গা দিলে না, হয় ত লোকটা শীতে মারাই যাবে।

'কোথাকার কে বদমায়েস তাকে বাড়ীতে জায়গা দেব! জান দু মাস আগে যে রাস্কেল 'ফৌজদারী কেসে' পড়েছে তাকে ভদ্রলোকের বাড়ীতে কি করে স্থান দেই।'

'তুমি ঠিক জান যে এ লোকটাই সে মোকদ্দমার আসামী ছিল।'

'নিশ্চয়ই, আমি তার ছবি দেখেছি। এ বিষয় নিয়ে আন্দোলনও তখন বড় কম হয় নি।'

'তুমি ভুল দেখেছ।'

যতটা জোরের সহিত সে একথা বলিল তাহার স্বামী কিন্তু তাহার কারণ ঠিক করিতে পারিল না। তাহার মনে হইল কি করিয়া এই অপরিচিত বিদেশবাসীর সততার প্রতি তাহার স্ত্রীর এ অখণ্ড বিশ্বাস হইল? বোধ হয় লোকটার অসহায়তাই তার সমস্ত দৈন্য ও দোষ ঢাকিয়া নারীর মনে করুণ অনুভূতির উদ্রেক করিয়াছে, ইহার কাছে তাহার কোন যুক্তিই খাটিবে না।

ঘরে গিয়া মিসেস্ পিয়ার্স খুব তাড়াতাড়ি বাহিরে যাইবার পোষাকে সজ্জিত হইলেন এবং স্বামীকে বলিলেন,—'আমি বাইরে যাচ্ছি; দেরী হ'লে তুমি ডিনার খেও, আমার জন্য বসে থাকবার প্রয়োজন নেই।'

'এই রাত্রিতে এমন অসময়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'আমার একটু বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ আছে!'

'চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই, একেলা গেলে তোমার খুবই অসুবিধা হ'বে।'

'কিছুই অসুবিধা হ'বে না। আমি যে কাজে যাচ্ছি তাহা আমাকেই একেলা করতে হ'বে—দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকলে চলবে না।'

এই বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে দ্রুত পদক্ষেপে নামিয়া গেল। স্বামী স্ত্রীর এইরূপ বিচিত্র আচরণ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল।

রাস্তায় ইতিমধ্যে তিন চার ইঞ্চি তুষার জমিয়া গিয়াছিল। তাহার উপর দিয়া এক খানা 'ক্যাবে' মিসেস্ পিয়ার্স যাইতেছিলেন, তাঁহার আপাদমস্তক শীতবস্ত্রে আবৃত। অন্ধকারে মুখ ভাল করিয়া দেখা যায় না। একটা চৌরাস্তার মোড়ে গিয়া কিয়ৎকাল ইতঃস্তত করিলেন, তারপর প্রহরী পুলিশকে জিজ্ঞাসা করিয়া একটা রাস্তা ধরিয়া চলিলেন। ঘোড়াটা আর পারিতেছিল না; এক এক বার বাতাস আসে আর থম্‌কিয়া দাঁড়ায়। মিসেস্ পিয়ার্স মুখ বাহির করিয়া একাগ্রদৃষ্টিতে কি খুঁজিতেছিলেন। নির্জ্জন তুষারময় পথ। আলোক অন্ধকার তুষারের বুকে খেলা করিতেছিল, হঠাৎ দূরে এক মনুষ্য-মূর্ত্তি দৃষ্টি-গোচর হইল। ক্যাবখানি বেশ জোরে ছুটিল। লোকটার কাছে আসিয়া গাড়ীখানা থামিল। সেও বড় বিস্মিত কম হয় নাই। এই জন-মানবশূন্য রাস্তার মধ্যে হঠাৎ এক খানা গাড়ী অত বেগে ছুটিয়া আসিয়া তাহার কাছে থামিল কেন? কিন্তু যখন সে শুনিতে পাইল গাড়ীর ভিতর হইতে কোন ইংরেজ মহিলা তাহাকে ডাকিতেছে, 'মিষ্টার ঘোষ, ভিতরে এস' তখন তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। এই বিদেশে

তাহাকে নাম ধরিয়া কে ডাকে? চারিদিকের এই অসহনীয় নিষ্ঠুরতার মধ্যে তাহার এ আহ্বান বড় মধুর লাগিল। কে যেন অত্যন্ত আপনার জন তাহাকে এই বিপদে সাহায্য করিতে আসিয়াছে। কিন্তু ব্যাপারটা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তাই সে বলিল—'মহাশয়া আপনি ভুল করিয়াছেন আমি তো আপনাকে চিনি না।'

'তাতে কিছু আসে যায় না। বোকামি করো না; বেশীক্ষণ বাহিরে থাকলে বাঁচবে না।'

হঠাৎ তাহার মনে হইল ব্যাপারটা যেন সে বুঝিতে পারিয়াছে, তাই ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'সুন্দরী সে দিকে সুবিধা হইবে না, আমার পকেটে একটা পেনিও নাই।'

অন্ধকারে যুবক বুঝিতে পারিল না যে তাহার রসিকতা অত্যন্ত অস্থানে পতিত হইয়াছে। শীতবাতাসের চেয়েও নির্ম্মম এই পরিহাস নারীকে অত্যন্ত ব্যথা দিল। তাহার মুখ বিবর্ণ হইল কিন্তু অন্তরের ব্যথাকে অন্তরে চাপিয়া সে বলিল,—'তাতে কি? তুমি ভিতরে এস'।

বুঝি কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াই সে গাড়ীতে ঢুকিল।

'আজ রাত্রি কোথায় কাটাবে?'

'ঠিক নাই কোন গাছতলায় পড়িয়া থাকিব।'

'গাছতলাতে পড়িয়া থাকিবার মত রাত্রি নয়। পোষাকের যা পরিমাণ তাতে গাছতলা তো দূরের কথা ঘরেও থাকতে পারবে কি না সন্দেহ, এমন হতচ্ছাড়া ভাবে তোমাকে তো সে দিন দেখি নাই।'

'আমাকে আপনি দেখেছেন?'

'যে দিনই দেখি না কেন! তুমি যে শীতে কাঁপছ। এই নাও আমার 'ওভার কোট'; গায়ে দাও।'

'আপনার 'ওভার কোট' আমি গায়ে দিব কেন?'

'তাতে কোন দোষ হ'বে না। আমার গায়ে যথেষ্ট জামা আছে।'

'না, আমি লেডিজ কোট গায়ে দিতে পারব না।'

'তোমাকে দিতেই হ'বে,' বলিয়া সে একরূপ জোর করিয়াই তাহাকে জামাটা পরাইয়া দিল। তার পর পকেট হইতে দুই পাউণ্ড মুদ্রা বাহির করিয়া বলিল—

'এই নাও তুমি যা চেয়েছিলে। আমার হাতে বেশী কিছু নাই। একটা হোটেলে তোমাকে পৌছে দিয়া আসবো। সেখানে খেয়ে-দেয়ে রাতটা কোন গতিকে কাটিয়ে দিয়ো। তার পর ভোরে যেখানে ইচ্ছে যেও। তোমার চেহারা অমন খারাপ হয়েছে কেন? আর তোমার নামে যা সব শুনছি সব কি সত্যি? বহু দূর দেশে বিদ্যার্জ্জন করতে এসেছ, অপব্যয় করো না।'

এতগুলি উপদেশও তাহার অসহ্য বোধ হইল না; কারণ দুই পাউণ্ড নগদের মধুর তুলনায় দুই মিনিটের উপদেশের তিক্ততা কিছুই না, কিন্তু তবু তাহার মনে কিরূপ একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল। হঠাৎ এই বিদেশী নারী তাহার প্রতি এত করুণা-পরবশ হইল কেন? কথা-বার্ত্তাও এরূপ ভাবে বলিতেছে যেন তাহাকে বিশেষ ভাবে চিনে; অথচ অনেক চেষ্টা করিয়াও সে কিছু মনে করিতে পারিতেছিল না। তাই জিজ্ঞাসা করিল,—

'আচ্ছা আপনি আমাকে কবে, কোথায় দেখেছেন!'

'তা শুনে দরকার কি?'

'আমাকে শুনতেই হ'বে। না শুনলে আমি আপনার কোন দানই গ্রহণ করব না।'

তবে শোন, সে দিনকার স্থান ও দৃশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের ছিল। নব বসন্ত-সমাগমে সমস্ত হাইড পার্ক উৎফুল্ল, প্রত্যেক বৃক্ষে নূতন কিসলয়, বাতাসে অপূর্ব্ব আরামদায়ক উষ্ণতা। আকাশও সে দিন বেশ পরিষ্কার ছিল। নীচে 'লেকে'র জলে চন্দ্রকিরণ সহস্র ভাবে প্রতি-ফলিত হচ্ছিল। রাত্রি তখন কম হয় নাই, কিন্তু তবু প্রণয়ি-যুগলদের খেয়াল ছিল না। কেহ বেড়াচ্ছিল, কেহ ঘাসের উপর শুচ্ছিল, কেহ বা চেয়ারে বসে প্রেমা-লাপ করছিল। আমার সে দিনকার পোষাকে আজকার শালীনতা ছিল না কিন্তু রঙের প্রাচুর্য্য ছিল। দেহে ও মনে যৌবনের স্ফূর্ত্তি ছিল। পর পর দু' তিন জনকে অভিবাদন জানাইলাম—কিন্তু তাহারা ভ্রূ কুঞ্চিত করে চলে গেল। পুলিশের লোকটার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিও অস্বস্তির সৃষ্টি করতে লাগল। ভাবলাম আমিই কি শুধু একা থাকব? দলে দলে প্রণয়ি-যুগল মনের আনন্দে চলেছে। এই আকাশ, এই বাতাস, এই জল, ঘাস এতো একা থাকবার জন্য নয়। আমি হৃদয়ের মধ্যে কেমন একটা অপূর্ণতা অনুভব করলাম হঠাৎ দেখলাম এক জন ভারত-বর্ষীয় আসছে, তাহার বেশের পারিপাট্য দেখে বুঝতে ভুল হয় না যে সে নবাগত। সে দিন তাহাকে

দেখিয়া আমার খুবই ভাল লেগে ছিল। তাহার কৃষ্ণ চক্ষু, তাহার গৌর বর্ণ, সলজ্জ এবং অপটু চলন-ভঙ্গী আমার মনের মধ্যে বেশ একটা মোহের সৃষ্টি করল, নিকটে গিয়ে হেসে বললাম, 'নমস্কার মহাশয় কেমন চমৎকার রাত্রি; নয় কি?' হঠাৎ চমকে উঠে যুবক বলল—'মহাশয়া, আপনি ভুল করেছেন।'

ক্যাব গাড়ী খানি চলিতেছিল। মাঝে মাঝে একটা ল্যাম্প পোষ্টের নিকট দিয়া যাইতেই এক ঝলক আলোক গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই ক্ষণিকালোকে ইংরেজ মহিলা দেখিতে পাইল যুবক একাগ্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

'তুমি কি আরো শুনতে চাও?'

'নিশ্চয়ই, আমি শেষ পর্য্যন্ত শুনতে চাই।'

বেশ—আমি হেসে উত্তর দিলাম, 'তাতে কিছু আসে যায় না, বোকা ছোকরা, চল একটু বেড়িয়ে আসি।'

বহুদিন পূর্ব্বের স্মৃতি একটু একটু করিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। সমস্ত ব্যাপারটা যেন একটা ব্যঙ্গ। সে দিন ছিল চন্দ্রালোক, বসন্ত হিল্লোল, নিষ্কলঙ্ক যৌবন, উচ্চাশা। আজ এই ভীষণ তুষারপাত, কঠোর শীত-বাতাস, ছিন্ন বস্ত্র, কলঙ্কিত চরিত্র। লজ্জায় ক্ষোভে সে অধীর হইয়া উঠিল।

'শেষটা বলুন।'

'শেষটা ভাল নয়। নবাগত যুবক চলিয়া যাইতে চাহিলে, আমি হাত ধরিয়া টানিলাম। একটা পুলিশ আসিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—'তোমার নাম, থানায় যেতে হবে।'

আমি একটু বিব্রত হইয়া পড়িলাম। তাহার মুখের দিকে কাতর ভাবে চাহিলাম, সে একটু হাসিয়া উত্তর দিলে,—'তুমি ভুল করেছ, উনি আমার এক জন বিশিষ্ট মহিলাবন্ধু? এই বলিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল। আমার কাছে তখন হাইড্ পার্কের সমস্ত শোভা ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। সে দিন জীবনে ভালবাসার ব্যবসা করতে গিয়া লজ্জা পেলাম; নিজের এই নির্লজ্জ উঞ্ছবৃত্তির দৈন্য বুঝিতে পারলাম। মনে হইল নারীত্বের যে অপমান আমি এত দিন ধরে নিজে করেছি, এক মুহূর্ত্তে তার উপযুক্ত শাস্তি যুবক আমাকে দিয়েছে। মুখ ঢাকিয়া, 'মহাশয় ধন্যবাদ, আপনার দয়া আমি জীবনে ভুলবনা' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া আসিলাম।

যুবক হঠাৎ উচ্চ হাসিয়া বলিল, 'ওঃ—তাই বুঝি এত দিন পরে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করেছিলাম বলে এই প্রতিদান দিতেছ? তা বেশ একটা কথার মূল্য দুই পাউণ্ড কম নয়!'

'আমাকে সে দিন পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করেছিলে সত্য! কিন্তু না করলেও ক্ষতি ছিল না। যে লজ্জা আমি পেয়েছিলাম তার চেয়ে পুলিশের শাস্তি আমাকে বেশী পীড়া দিত না। কিন্তু তোমার সে করুণা আমাকে আমার নারীত্ব ফিরিয়ে দিয়েছে। সেই আমার শেষ 'হাইড পার্কে' যাওয়া। আমি নিজের পরিশ্রম দ্বারা গত-জীবনের প্রায়শ্চিত্ত করেছি। ভগবান্ আমাকে তাহার পুরস্কার দিয়েছেন। আমি আজ এক জন ভদ্রলোকের বিবাহিত পত্নী, আমার এ সৌভাগ্যের মূলে তুমি। যে উপকার তুমি আমার করেছ তাহার দাম পাউণ্ডে হয় না।'

একটা তীব্র ব্যঙ্গের সুরে, 'সত্যি না কি' বলিয়া সেই বিদেশী যুবক হঠাৎ তাহার হাতের মুদ্রা ফেলিয়া দিয়া ওভার কোটটা ছুড়িয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল।

তুষারপাত অবিশ্রান্তভাবে হইতেছিল, শীত-বায়ু নির্দ্দয়ভাবে বহিতে লাগিল।

বিদ্যাসাগর-বাটী

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

[বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটী পরের হইয়াছে। তাহাতে তাঁহার নামের কলকও আর থাকিবে না। দেশের লোকে সে ভবন রাখিবার জন্য কোনো চেষ্টা করিল না।]

সাগর-ভবন বিকিয়ে গেল
মাটী সে যে নেহাৎ মাটী,
লজ্জা ঘৃণা নাই ত তাহার
বক্ষ তাহার যায় নি ফাটি।

বিকিয়ে গেল দয়ার দেউল
মহত্বেরি গর্ভগৃহ,
বঙ্গভাষার সূতিকাগার
ছিল যাহা সবার প্রিয়।

শকুন্তলার তপোবন ওই
ছারে খারে যাচ্ছে ওরে,
সীতার বনবাসের কুটীর
ভাঙছে আজি টাকার জোরে।

সত্র দানের, জ্ঞানের বেদি
নিরাশ্রয়ের ধর্ম্মশালা,
আর্ত্তগণের সেবা-সদন
আজকে সেথা পড়লো তালা।

ভাঙ্গলো গরুড় পাখীর কুলায়
মজলো ত্যাগের নিরঞ্জনা,
সাগর-সলিল শয়নে আজ
স্বর্ণ-হাঙর দেয় রে হানা।

কল্পতরুর বেদির মূলে
কুঠার আজি পড়ছে কত
বাদুড় মোরা চক্ষু মুদে
দোল খেতেছি হতের মত।

ভক্ত ভাবুক পারবে না আর
প্রণাম এবং অর্ঘ্য দিতে
কাঁটায় বেড়া সাগর-গৃহ
রুদ্ধ ধারা গোমুখীতে।

একটা কি প্রাণ নাইক দেশে
রাখে এ ঘর তীর্থ করে,
আজও কি দেশ তেমনি আছে
বেহায়া ও 'গরুজে' রে।

যে মহাজন এ ঘর পেলে
ভুলনাক এইটা দেখো
চটি তাঁহার সরল চটি
দেশের লাগি টাঙ্গিয়ে রেখো।

পারস্যের উদ্যান ও তাহার কবি

[শ্রীনীহাররঞ্জন মিত্র বি-এ]

অমর কবি ওমর খৈয়াম তাঁহার অমৃত-নিস্যন্দিনী কবিতার মধুর ঝঙ্কারে স্বদেশীয় জলাশয়-তীরবর্ত্তী উদ্যান-সমূহের যে মধুর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে পাঠকের চিত্তে স্বভাবতঃই নন্দন-কাননের চিত্র পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। চির-কৌমুদীস্নাত কুসুমিত উপবন, তাহারই নদনদীশূন্য পারস্য দেশে প্রতি বৃক্ষলতা, প্রতি পুষ্প একটী বিশিষ্ট ভাবধারার পরিচয় প্রদান করে।

তিহারাণে এবং তাহার কিঞ্চিৎ উত্তরে পারস্যের সুন্দর উপবনগুলি সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়। ইস্পাহান এবং শীরাজ এই দুই নগরীই সৌন্দর্য্য এবং তাহার উপাসক কবিগণের
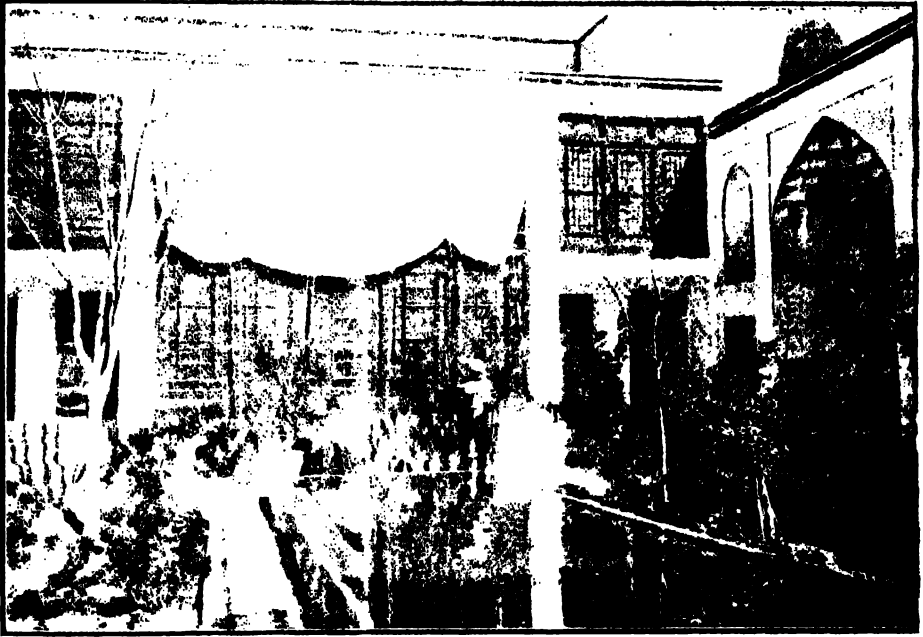
একটী "হায়ৎ" বা প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যান—ইস্পাহান

পার্শ্বস্থিত নির্ঝরের অশ্রান্ত ঝঙ্কার এবং কুঞ্জান্তরাল-স্থিত কলকণ্ঠ বিহঙ্গমের মধুর সঙ্গীত সত্যই এক কল্পলোকের সৃষ্টি করে। কাব্যলক্ষ্মীর বরপুত্র কবিগণের সুনিপুণ তুলিকাপাতে পারস্যের সেই মর্ম্মর-মণ্ডিত রাজপথ, তাহার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী তরুবীথি, স্বর্ণময় চন্দ্রার্দ্ধ-খচিত গম্বুজ-সমূহ পাঠকের চিত্তপটে অতি সুন্দর হইয়া ফুটিয়া ওঠে।

প্রাচ্য দেশীয় উদ্যানাবলীর নির্ম্মাণে নানারূপ কল্পনার এবং নানারূপ ভাবের ক্রীড়া দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু জন্ম-স্থান। পারস্যে একটী প্রবাদ আছে, "ইস্পাহান্ নেস্ফাজাহান্" অর্থাৎ ইস্পাহান পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ। অবশ্য ভারতও ইহার উত্তর দিয়াছিল, "অগর লাহোর ন বুঅদ্" অর্থাৎ যদি লাহোর না থাকিত। যাহা হউক ইস্পাহান এবং লাহোরের শ্রেষ্ঠতা এখানে বিচার্য্য নহে।

পারস্যের অধিকাংশ নগরই সাধারণতঃ চতুর্দ্দিকে জলাশয় দ্বারা বেষ্টিত এবং তাহারই একটী শান্ত নির্জ্জন প্রদেশে উপবন-বাটিকা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। দ্বিপ্রহরের

নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নগরবাসিগণ শান্ত দিনান্তে তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকানগুলি বন্ধ করিয়া ধূলি-সমাচ্ছন্ন রাজপথ অতিবাহিত করিয়া উদ্যান-বাটিকায় উপনীত হয় এবং শীকর-স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিয়া দেহমন স্নিগ্ধ করে।

কবিবর ওমর খৈয়াম তাঁহার কবিতার প্রতিছত্রে গোলাপের কথা বলিয়া গিয়াছেন, কারণ পারস্যে তাহার অত্যন্ত প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। প্রকৃতি তাঁহার ভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়া এখানে তাঁহার সমস্ত সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য ঢালিয়া দিয়াছেন।

শয্যার উপর বসিয়া সতত দোদুল্যমান চঞ্চল পত্রাবলীর মধ্য দিয়া দূরস্থিত পর্ব্বত-শ্রেণী অবলোকন করিলে মনে হয় যেন উহারাও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যপানোন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই স্থলে সুকোমল গালিচা বিস্তৃত করিয়া তাম্রকূট-বিলাসিগণ শীরাজের বিখ্যাত সুগন্ধি তাম্রকূট সেবনে মনোনিবেশ করেন। নিতান্ত সাধারণ ভাবে নির্ম্মিত কোন উদ্যানও এইরূপ সুন্দর এবং মনোহর, কিন্তু এতদপেক্ষাও অধিকতর সুন্দর উদ্যান সে দেশে অনেক রহিয়াছে।
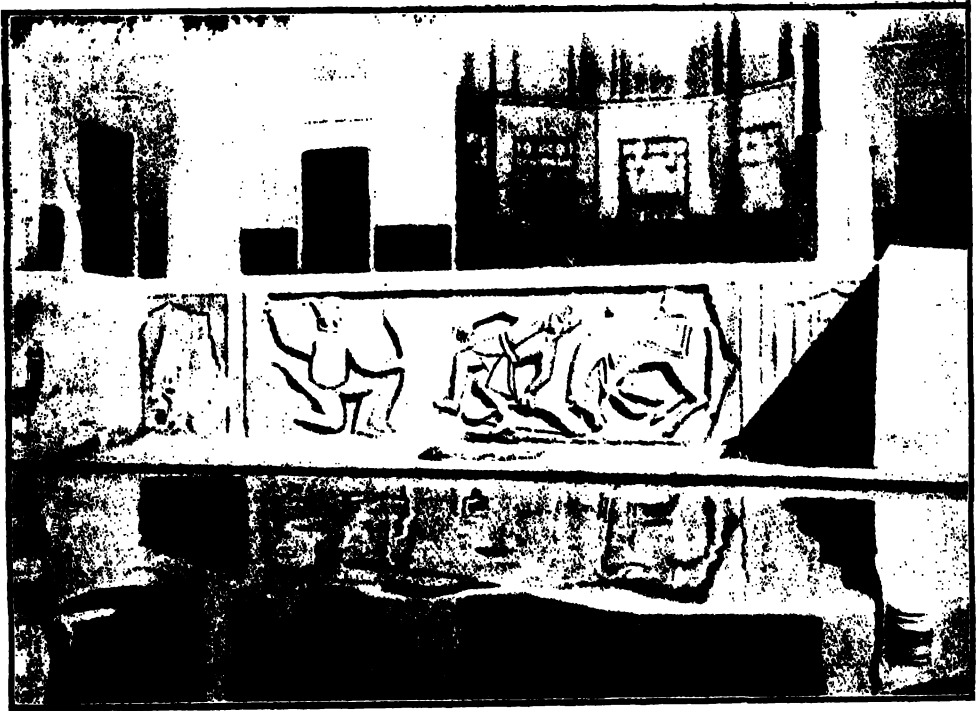
হেল-উস্-সুলতানের উপবনবাটিকার বারাণ্ডায় খোদিত সোরাব ও রুস্তমের যুদ্ধ—ইস্পাহান

নানারূপ গুল্মলতাদি উদ্যানের প্রাচীর গাত্র বাহিয়া ওঠে এবং তাহাতে রক্ত, নীল, পীত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের কুসুমরাজি সর্ব্বদাই সুরভি এবং সুষমা বিস্তার করিতে থাকে। উদ্যানের অপর এক রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তে পারস্যের বিখ্যাত তরমুজ, ফুটি ইত্যাদি দর্শকের নয়ন এবং মন তৃপ্ত করে। কোথাও বা তুঁত বৃক্ষ-শ্রেণী গ্রীষ্মকালের তৃপ্তিকর ফল-সমূহের ভারে অবনত হইয়া দর্শককে অভিবাদন করে। তাহাদের শীতল ছায়ায় উদ্যানের কোমল তৃণ-

চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানকে পারস্যে 'হায়ৎ' বলে। ইহার মধ্যস্থলে একটী প্রাঙ্গণ এবং তথা হইতে বিভিন্নদিকে গমনাগমনের জন্য অনেক গুলি প্রবেশ-পথ আছে। মধ্য স্থলে "হোস্" নামে একটী সুন্দর জলাশয় নির্ম্মিত হয়। অনুচ্চ মর্ম্মর-প্রাচীর দ্বারা তাহার তীরভাগ বেষ্টিত থাকে বলিয়া জল পার্শ্ববর্ত্তী কুসুমাস্তরণ হইতে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠিবার সুযোগ পায়। এক বা ততোধিক কৃত্রিম প্রস্রবণ হইতে জলধারা পতিত হইয়া তাহার দর্পণ-

স্বচ্ছ জলরাশিকে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত করিতে থাকে। তাহার চতুঃপার্শ্ব দিয়া একটী মস্মর-মণ্ডিত পথ তাহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে। পথ এবং জলাশয়—এই উভয়ের মধ্য দিয়া একটী ক্ষুদ্র ক্ষীণকায়া প্রণালী থাকে, তাহাকে "পাশুই" অথবা "পাদপ্রক্ষালনকারী" বলে। অবশ্য ইহা দ্বারা পাদ-প্রক্ষালনের বিশেষ কোনও সুবিধা না হইলেও ইহা হইতে অনেক শাখা বাহির হইয়া উদ্যানের অধোভাগস্থিত কুসুমাস্তরণে জল বিতরণের সহায়তা করে। এই "হোস্" বা জলাশয় সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প আছে। নাসিরুদ্দীনের সময়ে পারস্যের সম্পৎশালী যুবকগণ শিক্ষাসমাপনার্থ পারী খুল্লতাতের হস্তস্থিত বেত্র পৃষ্ঠে পড়িবামাত্র চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "হোস্", "হোস্"। এক বেত্রাঘাতেই তাঁহাকে ইউরোপ্ হইতে পারস্যে আনিয়া ফেলিল।

উদ্যানমধ্যে "হোসের" বিপরীত দিকে একটী বৃহৎ ধনুরাকৃতি গবাক্ষ। ইহাকে "শাহ্‌নেসিন্" অর্থাৎ শাহ্ বা মাননীয় ব্যক্তিগণের উপবেশন-স্থান বলে। স্থানটী শীত গ্রীষ্মে সমভাবে মনোরম, কারণ শীতকালে যেমন সূর্য্যের মৃদু উত্তাপ পাওয়া যায় তেমনি গ্রীষ্মকালেও নির্ঝরের ঝর্ ঝর্ শব্দ এবং সুরভিত মৃদু পবন অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

গম্বুজ—শীরাজ
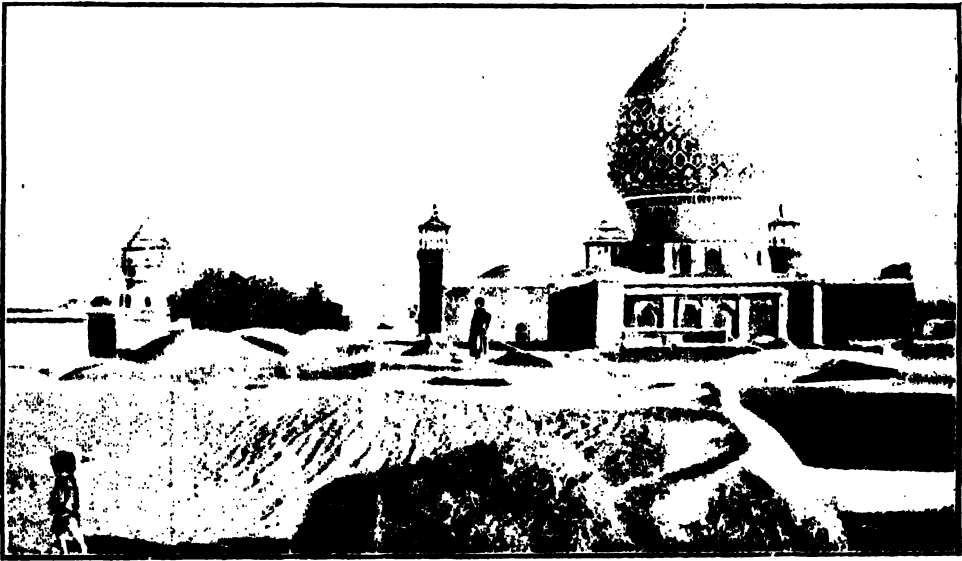
নগরীতে গমন করিত। ইহা রক্ষণশীল বৃদ্ধগণ অত্যন্ত আপত্তি করিতেন, কারণ পারী নগরীতে কিয়ৎকাল অবস্থানের পরই যুবকগণ এতদূর বৈদেশিক ভাবাপন্ন হইয়া পড়িত যে এমন কি মাতৃভাষা বিস্মৃত হওয়াও তাঁহারা গৌরবের বিষয় মনে করিত। এই সময় ইউরোপ হইতে সদ্য-প্রত্যাগত জনেক যুবককে তদীয় খুল্লতাত উদ্যান ভ্রমণকালে একটি "হোস্" দেখাইয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করেন। যুবক তখন মনে প্রাণে নিজেকে সম্পূর্ণ ইউরোপীয় করিয়া তুলিতেছিলেন তাই তিনি "হোস্" না বলিয়া বলিলেন "বেসিন্" (Bassin)। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ

ইস্পাহানের শাসনকর্ত্তা মুজাফরুদ্দীনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জেল-উস্-সুলতানের অন্তঃপুরস্থ উদ্যান সাতিশয় উল্লেখযোগ্য। উদ্যানটী অতিশয় নয়নাভিরাম করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। আকাশচুম্বী বৃক্ষ সকল শ্রেণীবদ্ধ ভাবে শোভা পাইতেছে। একাধিক বিচিত্র প্রস্রবণ ইহার "হোসে" জলধারা বর্ষণ করে। ইহার প্রান্তভাগ এরূপ বিস্তৃত যে জলরেখা প্রায় অলিন্দ স্পর্শ করিয়াছে। এই অলিন্দকে "এইভান" বলে। গ্রীষ্মকালে ইহা অতিরম্য স্থান বলিয়া পরিগণিত হয়। পারস্যের "এইভান" গুলি যে প্রাচীন আসিরিয়া দেশের প্রেক্ষাগারের অনুকরণে নির্ম্মিত সে

বিষয়ে বিশেষ সন্দেহের অবকাশ নাই; কারণ তাহাতে তিন দিক্ উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত থাকিত এবং অপর-দিকে দণ্ডায়মান সুবৃহৎ স্তম্ভরাজির গাত্রে যবনিকা লম্বিত থাকিত।

ইহার "হোস্" এবং গৃহতলের মধ্যস্থ প্রস্তর-বেষ্টনী পারসিক ভাস্কর্য্যশিল্পে একটী চারু নিদর্শন। পারস্যের পুরাণখ্যাত বীরবর রুস্তম এবং তাঁহার অজ্ঞাত পুত্র সোরা-বের ভয়ঙ্কর যুদ্ধের চিত্র ইহার গাত্রে খোদিত রহিয়াছে। নিহত সোরাবের পার্শ্বে তাহার প্রিয়তম অশ্ব রুবসের চিত্রও অতি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে।

তিরস্কার করেন তবে হয় ত' ভৃত্যবর তৎক্ষণাৎ দার্শনিক কবি সাদির কবিতা হইতে ধৈর্য্যের গুণাবলী সম্বন্ধে দুই চারিটী চরণ উদ্ধৃত করিয়া প্রভুকে শোনাইয়া দেয় এবং তিরস্কারের পরিবর্ত্তে পুরস্কার লাভ করে। উদ্যানসমূহের অধিকারিগণও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নহেন। উদ্যানমধ্যে পরিভ্রমণকালে হয় ত' তাহারাও আপন মনে ওমরের কবিতাবলী একটীর পর আর একটী সুরসহ আবৃত্তি করিতে করিতে চলিতে থাকেন। নব বসন্তের সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে যখন কুসুম-কিশোরী আপন হৃদয় ধীরে ধীরে উন্মুক্ত করিতে থাকে, তখন যেন তাহার
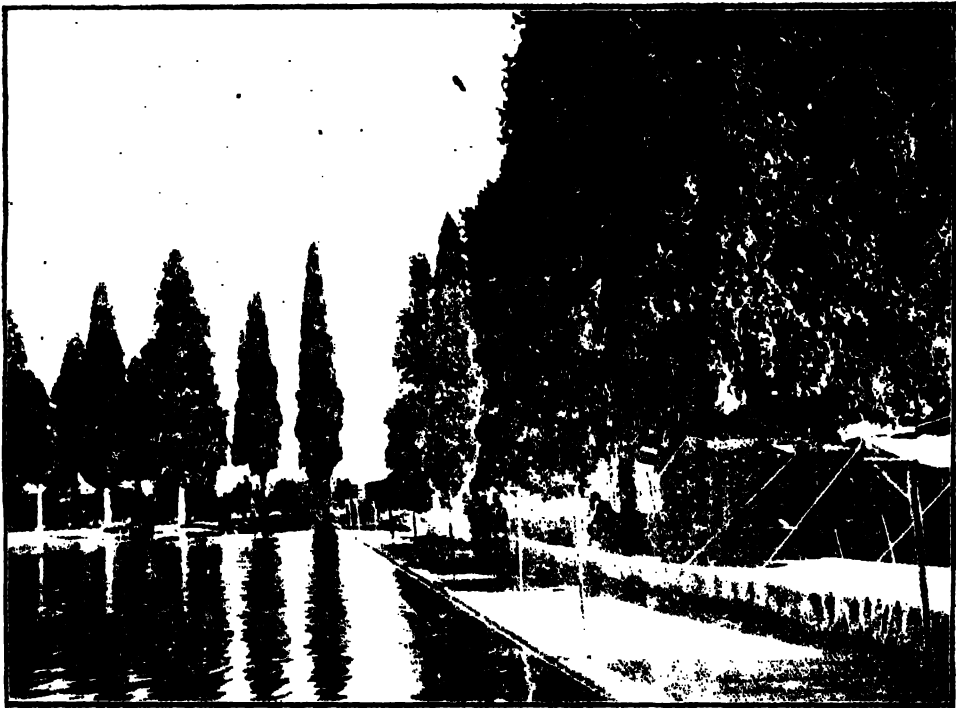
বাগ্-ই-তখত্—শীরাজ

পারসিকগণ সম্বন্ধে কিছু না বলিলে, তাঁহাদের উদ্যান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। পারসিকগণ অত্যন্ত কবিতা-প্রিয় এবং তাঁহারা কথায় কথায় শ্রেষ্ঠ কবিগণের বয়ৎ বা বচন উদ্ধৃত করিতে ভাল বাসেন, এমন কি স্থপতিগণ পর্য্যন্ত কবিগণের লিখিত গান গায়িতে গায়িতে গৃহনির্ম্মাণ করিতে থাকে। যদি কোনও প্রভু স্বীয় ভৃত্যের অলসতার জন্য তাহাকে

হৃদয়-মধুপানোন্মত্ত ভ্রমরটী পর্য্যন্ত গুন্ গুন্ স্বরে ওমরের কবিতা গায়িতে থাকে।

ইস্পাহান ত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ দক্ষিণাভিমুখে গমনর করিলে যে পার্ব্বত্য প্রদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় তথা হইতে কবিবর হাফিজের সমাধিমন্দিরের উপর উঠিয়া শীরাজ নগরী অবলোকন করিলে ইহার সূর্য্যকিরণে দীপ্তিমান্ বহুবর্ণ রঞ্জিত গম্বুজসমূহ সর্ব্বপ্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শীরাজ নগরী কবিবর হাফিজের জন্মস্থান। তথায় তিনি খৃষ্ট চতুর্দ্দশ শতকের প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল—শমসুদ্দীন মুহম্মদ-ই-হাফিজ। হাফিজ কথার অর্থ কুরা'ন যাঁহার কণ্ঠস্থ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুরা'ন্ তাঁহার আদৌ কণ্ঠস্থ ছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে এবং থাকিলেও তাহা প্রথম বয়সে যে ছিল না এ কথা নিশ্চয়; কারণ, তাঁহার কবিতার অধিকাংশই যৌবনের উচ্ছ্বাসপূর্ণ—তাহাতে কুরা'নের গন্ধও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহার সম-

বাগ-ই-তক্তের গ্রীষ্মাবাস—শীরাজ

সাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার পানাসক্তির জন্য তাঁহাকে বিশেষ সুনজরে দেখিতেন না, কিন্তু শীরাজ নগরী সম্বন্ধে যাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও জ্ঞান আছে তিনি অতি সহজেই বুঝিতে পারিবেন কেন তিনি জলাশয়-তীরবর্ত্তী ছায়া-শীতল উপবনে বসিয়া গোলাপ পুষ্প, পানপাত্র এবং কবিতা লইয়া সময়াতিবাহিত করিতেন।

তিনি যে উদ্যানে বসিয়া সুরার সহিত কবিতার আরাধনা করিতেন তাহার নাম "বাগ-ই-তখত্" অথবা "সিংহাসনের উপবন।" এই উদ্যানের বিশাল জলাশয়, তিন দিকে নানারূপ বৃক্ষলতার দ্বারা সুশোভিত এবং সু-উচ্চ প্রাচীর পর্ব্বত-পার্শ্বস্থিত স্বর্ণশীর্ষ পিরামিডের পার্শ্বে শোভা পাইতেছে। বোধ হয় এই "বাগ-ই-তখতে"র সরোবর তীরে বসিয়াই তিনি লিখিয়াছিলেন-

লয় যদি গো প্রণয় আমার
শীরাজ দেশের তথী ঐ
ছাড়তে পারি ফুল বোখারা
তাহার গালের তিল তরেই।

আর তাঁহার এই উক্তি শ্রবণ করিয়া এশিয়ার নর-ব্যাঘ্র তৈমুরলঙ্গ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক নিজ সভায় আনয়ন করিলেন। হাফিজ তাঁহার সম্মুখে নীত হইলে তিনি কোষ হইতে তরবারি বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "এই তরবারির সাহায্যে আমি ধরণীর ঐশ্বর্য্য লুটিয়া আনিয়া আমার বাসস্থান সমরখন্দ ও বোখারাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছি। ক্ষুদ্র কীটানুকীট তুমি, মাত্র রমণীর গণ্ডের একটী তিলের

পরিবর্ত্তে তুমি এই দুই প্রধানা নগরীকে ত্যাগ করিতে চাও।"

আভূমি প্রণত হইয়া এক দীর্ঘ সেলাম করিয়া কবিবর বলিলেন, "হায় সম্রাট্! নগরীর এই অতি সমৃদ্ধিই আমাকে তাহার নিকট হইতে দূরে ঠেলিয়া দিতেছে।" হাফিজের এই সুন্দর, সরল এবং সময়োচিত উত্তর শ্রবণ করিয়া তৈমুরলঙ্গ এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন যে তিনি কবিকে শেষে বহু সমাদর করিলেন।

এই "বাগ্-ই-তখত্" সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প আছে। এক সময়ে জনৈক শাহ শীরাজের পার্শ্ববর্ত্তী উপত্যকায় শিকার করিতে করিতে "বাগ-ই-তখ্তে"র নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে উপনীত হন। ঐ গ্রামে জনৈক ব্যক্তির একটী পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। শাহ্ তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে গ্রহণেচ্ছায় ঐ ব্যক্তির গৃহে আশ্রয় লইলেন। পরে যখন তিনি এবং তাঁহার ভাবী প্রণয়িনী ছাদের উপর বসিয়া গল্প করিতেছিলেন, সেই সময় নিম্নে কুঞ্জ মধ্যে একটী সুন্দর মৃগ দৃষ্ট হইল। তদ্দর্শনে শাহ্ লাফাইয়া উঠিলেন এবং স্বীয় প্রণয়িনীকে চমৎকৃত করিবার অভিপ্রায়ে মৃগের দিকে লক্ষ্য করিয়া শরত্যাগ করিলেন। মৃগ তাহার পশ্চাতের এক খানি পদদ্বারা কর্ণমূল কণ্ডূয়ন করিতেছিল, শাহের হস্তনিক্ষিপ্ত তীর তাহার পদ এবং কর্ণমূল একত্র বিদ্ধ করিল। গর্ব্বিত ভাবে শাহ্ তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি আমার লক্ষ্য কেমন অব্যর্থ! খুব আশ্চর্য্য নয় কি?" সুন্দরী মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, "এ জগতে কিছুই আশ্চর্য্য নয়—সমস্তই অভ্যাসের কাজ।" ইহাতে শাহ্ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রণয়িনীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এক বৎসর পরে শাহ্ পুনরায় শিকারব্যপদেশে ঐ প্রদেশে উপনীত হইলে শুনিতে পাইলেন যে একটী রমণী প্রত্যহ একটী গাভীকে পৃষ্ঠোপরি বহন করিয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ করে। এই অদ্ভুৎ সংবাদ শুনিয়া তিনি অতি মাত্রায় বিস্মিত হইলেন এবং কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য সত্যই এক দিবস উক্ত রমণীকে এক গাভী পৃষ্ঠে বহন করিয়া অবতরণ করিতে দেখিলেন, মাত্রাতিরিক্তরূপে বিস্মিত হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি আশ্চর্য্য! ইহা কিরূপে সম্ভব?" অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে

শাহ সুলতান হোসেনের মাদ্রাসার উদ্যান—ইস্পাহান

দুইটী কৃষ্ণতার চক্ষু তাঁহার দিকে ঘুরাইয়া রমণী ঈষৎহাস্যে বলিল, "আপনি কি ইহার মধ্যেই সেই মৃগ-ঘটিত ব্যাপারটা বিস্মৃত হইলেন। ইহাও অভ্যাসের কাজ। গাভীটাকে আমি অতি শিশুকাল হইতেই পৃষ্ঠে বহন করিয়া আসিতেছি।" তার পর ব্যাপারটী মধুরেণ সমাপয়েৎ হইল।

এইবার শীরাজ দেশের অপর এক কবির কথা উল্লেখ করিব। তাঁহার নাম মোস্লেহ্ উদ্দীন। সাদির ন্যায় ইনিও জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। "বাগ্-ই-তখ্‌তে"র কুসুমরাশিই ইহার অধিকতর প্রিয় ছিল এবং ইনি তাহাদের বর্ণনাই অধিক করিয়াছেন।

নব-কলেবর

(গল্প)

[শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল]

বয়স বেশী হইয়াছে—তা হোক্! দুনিয়ার আমোদ-আহ্লাদের দিকে মনের ঝোঁক এখনো বেশ প্রবল রহিয়াছে! চাঁদনী রাত, তরুণী নারীর অঙ্গ-লীলার চপল হিল্লোল, গানের সুর,—এ-সবে এখনো তেমনি বিহ্বলতা! গৃহে অভাব-অভিযোগের তীব্র আর্ত্তনাদ, গৃহের বাহিরে সকল-ভোলা স্বপ্ন-বিভ্রম—ইহারি মধ্যে এই পাঁচ ইয়ারের দিন কাটিতেছিল একই ভাবে! পরিচিত বন্ধুর দল—যারা এ দলকে চিনিয়াও, এ-দলে পুরাপুরি ভিড়িত না,—এ দলের নাম দিয়াছিল, বোহেমিয়া। 'হেসে খেলে নাওরে যাদু, কবে যাবে শিঙে ফুঁকে'—বোহেমিয়া-দলের এটি ছিল প্রধান মন্ত্র।

সাধক এঁরা নিশ্চয়। নহিলে গৃহে যখন ষোল বছরের ছেলে অন্তিম শয্যায় খাবি খায়, সতেরো বছরের আইবুড়ো মেয়ে পাড়ার লোকের গঞ্জনা সহিয়া ম্লান মূর্ত্তিতে ঘরের কোণে মলিন বেশে পড়িয়া থাকে, তখন তাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া বরানগরের ওধারে জীর্ণ বাগান-বাড়ীতে বসিয়া রঙ্গ-বিলাসিনীর গানের সঙ্গে মোজেলের বোতল-সুধায় মশগুল থাকিতে কোন্ বাপে পারে!

সেদিনকার মজলিশে নন্দ আসিয়া যখন দেখা দিল, তখন তাকে চিনিয়া ওঠা দায়! মাথার চুল বেবাক কালো, সামনের তিনটে দাঁত বাঁধাইয়া ঝক্‌ঝকে করিয়া তুলিয়াছে এবং পাটের মত রঙের গোঁফ-দাড়ি চাঁচিয়া মুখখানাকে বেবাক্ সাফ করিয়া ফেলিয়াছে। গালের উপর যে টোল ছিল, তাও ভরাট হইয়া গিয়াছে!

নন্দ আসিয়া কহিল,—খবর কি হে?

কণ্ঠের স্বরে পরিচয় অগোপন রহিল না। অবিনাশ কহিল,—বাঃ! এ যেন ভাঙ্গা বাড়ী ম্যাকিণ্টশ-বার্ণের হাতে পড়ে আনন্দ-নিলয়ে পরিণত হয়েচে!

অবিনাশ দৈনিক 'চামচিকা'র মাহিনা-করা সম্পাদক। তা ছাড়া বিবিধ মাসিক-পত্রে সে ছোট গল্প লেখে, এবং প্রকাশকদের তাগিদে নগদ মূল্য লইয়া উপন্যাসও মাঝে মাঝে জোগান দেয়। তার কথাবার্ত্তায় তাই সর্ব্বদাই একটু সাহিত্য-রসের ছিট থাকে।

নন্দ কহিল,—ঐ কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফে মুখখানা ভারী বিশ্রী দেখাতো। তার পর একটা দাঁত এমন কষ্ট দিচ্ছিল যে না ফেলে থাকা গেল না। দাঁত বাঁধানোর ফলে তোবড়ানো গাল আবার জেগে উঠলো এবং দাড়ি-গোঁফ-কামানোর ফলে এখন...চেয়ে ঢাখো, I look just quite young. দাড়ি-গোঁফ কামাও হে—বত্রিশ বছর অবধি মানুষের দাড়ি-গোঁফ রাখা চলে, তার পর ঐ দাড়ি-গোঁফ বয়সকে অসম্ভব বাড়িয়ে তোলে!

অবিনাশ কহিল—যা বলেচো! কিন্তু আমার নিশানা যে এই দাড়ি-গোঁফ। ক'খানা বইয়ে ছবি ছাপা হয়েচে; তা এই দাড়ি-গোঁফ সমেত। লোকে এই দাড়ি-গোঁফ থেকেই আমায় চেনে। এখন কামালে পাঠক-পাঠিকার

মালিককে খুশী রাখা কেমন শক্ত, তা ভুক্তভোগীরা বিলক্ষণ জানেন!

নন্দ কহিল—আর অর্থাৎ থাক। ওদিকে বাগানে গাড়ী ঢুকচে, বোধ হয়।

অধর কহিল—তুমি এগুলোর বাঙলায় তর্জ্জমা ছাপো না কেন! এই যে ওমর খৈয়ম নিয়ে দেশে হুলস্থূল বেধে গেছে! কত বাঙলা তর্জ্জমা বেরুচ্ছে। আর আমাদের এমন শাস্ত্র-পুরাণ—

অবিনাশ কহিল—তেমন দরদী পাবলিশার পাই না যে!

অধর কহিল—মোদ্দা, তোমার বড় ছেলের সমবয়সী প্রায় দেখাচ্ছে তোমায়···বলিয়া সে হা-হা করিয়া হাসিল।

অবিনাশ কহিল—তুমিও গোঁফটা কামিয়ে ফ্যালো, হে। ও কালো-সাদা গোঁফ বিশ্রী দেখাচ্ছে।

হতাশভাবে অধর কহিল—বাড়ীতে জানো না গো—

কথাটা সব খুলিয়া বলিতে হইল না। ইঙ্গিতেই বাড়ীর মধ্য হইতে যে বজ্রস্বর ও অগ্নিতীক্ষ্ণ মেজাজের ছবি ফুটিল, সে ছবির সঙ্গে পাঁচ ইয়ারের পরিচয় আছে যথেষ্ট এবং বহুকাল যাবৎ!

রামময় কহিল—তোমার গৃহিণী তোমায় চিনতে পারবেন তো হে?

অবিনাশ কহিল—আলবৎ। আজ পঁচিশ বছর হলো বিবাহ করেচি। আমাদের আবার love-marriage—আমার বড়দি'র ননদ যে তিনি—

নন্দ কহিল—আমার ও ফ্যাশাদ হয় নি। কেন না, গৃহেই নব-কলেবর হয়ে গেল। এক জন বুড়ো জ্ঞাতি মরেছিল—সেই ওজুহাতেই। মোদ্দা গোঁফ-দাড়ি আর রাখচি না। অফিসে আজ বড় সাহেব আমায় নিয়ে একটু মজা করে নিলে, বললে—Are you Nanda? or his younger brother? আমি বললুম—No, Sir, the self-same Nanda, but grown younger, both in body and mind. শুনে সাহেব হাসতে লাগলো। মোদ্দা, অবিনাশ তুমি একটা কাজ করতে পারলে ভাল হয়।

অবিনাশ কহিল,—কি?

নন্দ কহিল,—তোমার বাড়ীতে একটা খপর পাঠালে পারতে! ফিরবে তো সেই সুগভীর রাত্রে। শেষে চাকরে দোর খুলে দেবে না। সে দোর খুলে দিলেও গৃহিণী হয়তো চিনতে না পেরে আমোল দেবেন না!

অবিনাশ কহিল—যা বলেচো! আজ পঁচিশ বছর ধরে গৃহিণীর সঙ্গে ঘর করচি, আর আমায় তিনি চিনতে পারবেন না? পাগল! তবে একটা কৌতুক হবে—সেটার দাম যে দেব হে...! বলিয়া অবিনাশ হাসিল।

২

মজলিশ যখন ভাঙ্গিল, রাত তখন দুটো বাজিয়াছে। পরের দিন ভোরের ট্রেণে মিস্ পটকা ও তার ভগ্নী মিস্ শটকা দুজনেই মুজরায় বাহির হইবে। বেশী আর থাকিতে পারিবে না বেলগাঁওয়ে।

পটকা ও শটকা বিদায় লইবার পর যখন বাবুদের আহারের দিকে হুঁশ হইল, তখন ঠাকুরকে তাড়া দিতে আসিয়া দেখে, দুটো বামুনই সিদ্ধিপান করিয়া এমন অচেতন যে উনুনের আগুন নিবিয়া গিয়াছে এবং বাগান-অঞ্চলের চার-পাঁচটা কুকুর মিলিয়া মাছ আর মাংসটুকু সাবাড় করিয়া দিয়াছে! মাংসের হাঁড়ি লইয়া চারটে কুকুর তখনো তন্ময়! কুকুরগুলাকে তাড়াইয়া বামুনগুলার পিঠে নন্দ সজোরে লাথি বসাইয়া দিল, ব্রাহ্মণ বলিয়া মানিল না! বামুনগুলা ভূতের মত একধারে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্ষুধায় তখন সকলের নাড়ী জ্বলিতেছে। এখন এতরাত্রে এই নির্ব্বান্ধব পল্লীতে আহার মিলিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। অগত্যা! এক খানি ট্যাক্সি মজুত ছিল, তাহাতেই পাশাপাশি সকলে উঠিয়া বসিল। ভৃত্যটাকে রামময় বাগানে রাখিয়া গেল মালীর সঙ্গে সে বাসন-পত্র চৌকি দিবে।

অবিনাশের বাড়ী শিমলা ষ্ট্রীটে। বাড়ীর অদূরে ট্যাক্সি হইতে নামিয়া সে গৃহে আসিল। সদরের দ্বার খোলা থাকে। বাবু প্রত্যহই অধিক রাত্রে ফেরেন। তাস, পাশা, দাবা, নয় গান-বাজনা, নয় থিয়েটারে রিহার্শাল বা অভিনয়...এ তো তার নিত্য লাগিয়া আছে।

সদরে খিল লাগাইয়া অন্দরের মুখে সে পকেট হইতে চাবি বাহির করিল। এ দ্বারে তালা দেওয়া থাকে। তালার একটা চাবি ঘরে থাকে, আর একটা অবিনাশের কাছে। সেই চাবি দিয়া তার তালা খুলিয়া অবিনাশ অন্দরে ঢুকিল, এবং হাত-পা ধুইয়া একেবারে নিজের ঘরে।

ঘরের মেঝেয় খাবার ঢাকা থাকে। অবিনাশ নিঃশব্দে আহার সারিয়া মুখ-হাত ধুইয়া একটা বিড়ি টানে; তার পর বিড়িটা নিঃশেষ হইলে চুপ-চাপ গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়ে। এ তার বাঁধা রুটিন।

আজ ঘরে ঢুকিয়া দেখে, খাবার ঢাকা নাই। মনে পড়িল, ঠিক, বাগানে ভোজ ছিল বলিয়া খাবার তৈরী রাখিতে নিষেধ করিয়াছিল! কিন্তু ক্ষুধার বেগ প্রচণ্ড, এ ক্ষুধার নিবৃত্তি না হইলে চোখে ঘুম আসিবে না! কাজেই গৃহিণীকে তুলিতে হয়। চাদরখানা আল্‌নায় রাখিয়া সে গৃহিণীকে ধাক্কা দিল—ওগো শুনচো?

গৃহিণী চিরাভ্যাসবশতঃ নিদ্রামগ্না। ধাক্কা খাইবা মাত্র তাঁর ঘুম ভাঙ্গিল। ঘুম ভাঙ্গিতেই আলোয় যে-মূর্ত্তি চোখে পড়িল, তা তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত। তিনি ভয়ে আর্ত্তনাদ তুলিলেন। নিস্তব্ধ নিশীথ—নারী-কণ্ঠে সে ভীষণ আর্ত্তনাদ কাছাকাছি দশ-বারোটা বাড়ীকে কাঁপাইয়া জাগাইয়া দিল! সে আর্ত্তনাদ শুনিয়া অবিনাশ প্রথমে চমকিয়া উঠিয়াছিল, তারপর খেয়াল হইল, ঠিক গোঁফ-দাড়ি-হীন মুখ, গৃহিণী ঠিক চিনিতে পারেন নাই! সে কহিল—ভয় নেই গো, আমি, আমি—তোমার প্রাণের কর্ত্তা—

গৃহিণীর ভয়ের প্রথম বেগ তখন কমিয়াছে, কিন্তু এই অপরিচিত তরুণের মুখে ঐ দ্বিতীয় বাণী শুনিবা মাত্র তার স্পর্দ্ধা দেখিয়া তাঁর ভয় আরো বাড়িয়া গেল। তিনি আর একটা আর্ত্তনাদ তুলিয়া ছুটিয়া একেবারে ঘরের বাহিরে আসিলেন। স্ত্রীবুদ্ধি...ভয়ের সঙ্গে সেটুকু একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। বাহিরে আসিয়াই তিনি ঘরের দ্বার টানিয়া তাহাতে শিকল আঁটিয়া দিলেন।

প্রথম আর্ত্তনাদে গৃহ ও পাড়া কাঁপিয়া উঠিয়া ছিল; দ্বিতীয় আর্ত্তনাদে সকলে জাগিয়া প্রশ্ন তুলিল—ব্যাপার কি?

অবিনাশের বড় ছেলে সে দিন গৃহে ছিল না। সদ্য বিবাহিত, শনিবার পাইয়া সে গিয়াছে শ্বশুর-বাড়ী। একটা ভৃত্য; গৃহে আর কেহ নাই। ভৃত্য চীৎকার শুনিয়া সদর খুলিয়া একেবারে পথে গিয়া দাঁড়াইল। তার বুকখানা যেন ফাটিয়া যাইবে, ভয়ে এমনি ধড়ফড় করিতেছে! চোর না ডাকাত পড়িল গৃহে...তুচ্ছ চাকরির মায়ায় প্রাণটা খোয়াইবে কি শেষে!

পাড়ার পাঁচ-সাত জন ছোকরা বাড়ী ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিল। চাকরটাকে সামনে পাইয়া প্রশ্ন করিল—ব্যাপার কি রে ভোলা?

সে ব্যাপার জানিত না; ভয়ে কাঁপিতেছিল। ছোকরারা তাকে ছাড়িয়া বাড়ীর মধ্যে আসিয়া ঢুকিল। গৃহিণী তখনো দোতলার দালানে দাঁড়াইয়া হাউ-মাউ করিতেছেন।

সত্য কহিল—কি হয়েচে জ্যাঠাইমা?

জ্যাঠাইমা ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়া তারা রাগে অগ্নিশর্ম্মা! তারা পাড়ায় থাকিতে এক ব্যাটা বওয়াটে মাতাল আসিয়া দোতলায় ওঠে!

গোপাল কহিল—হাতে ছুরি-ছোরা আছে?

কেশব কহিল—সিঁধ-টিঁধ দ্যায়নি তো?

বিষ্ণু কহিল—আপনার গয়নার সিন্দুকের চাবি কোথায়?

গৃহিণী কহিলেন—ঐ ছাখো বাবা, দরজা ঠেলচে।

প্রচণ্ড কোলাহলে প্রমাদ গণিয়া অবিনাশ তখন ঘরের দ্বার ঠেলিতেছে এবং চীৎকার করিতেছে,—ওরে শোন্, আমি চোর নইরে শোন, আমি, আমি...শ্রীঅবিনাশ হালদার।

বয়স্কের দলও ইতিমধ্যে আসিয়া হাজির। জগবন্ধু শশব্যস্তে প্রশ্ন তুলিল—পালিয়েচে?

সত্য কহিল—না।

মেঘু কহিল—ঐ যে ঘরের মধ্যে দোর ঠেলচে আর বলচে,—আমি, আমি, ওরে, আমি অবিনাশ হালদার—

শিবনাথ কহিল—উনি অবিনাশ হালদার! ছুঁচো পাজী ব্যাটা।

হরপ্রসাদ কহিল—ভদ্দর লোকের মত সাজ-পোষাক?

গৃহিণী তখন মুখে ঘোমটা টানিয়াছেন ; সত্য মারফৎ জানাইলেন, হাঁ।

শ্রীকান্ত কহিল—মোড়ে ঐ যে মেশটা হয়েচে ঐ যে ছোঁড়াগুলো সন্ধ্যা হতেই তাশ পেটে আর টপ্পা গায়, বিকেলে মেয়েরা ছাদে উঠতে পারে না তাদের জ্বালায়! বোধ হয়, ঐ মেশেরই কোনো বখা ছোঁড়া—

গোপাল কহিল—ঘর থেকে টেনে এনে বেদম্‌সে দেবো ক'ষা?

বংশী বলিল—না, না। তার চেয়ে পুলিশ ডাকো। যেমন আস্পর্দ্ধা, তেমনি জেলে গিয়ে তার ঠেলা বুঝুক! মার-ধর করে কি হবে? রাজ দ্বারে শাসিত হওয়া দরকার!

শ্রীকান্ত কহিল—হাঁ, তাই করো হে। আমরা চৌকি দিচ্ছি তো। পালাবে আর কোথা দিয়ে? মোদ্দা, অবিনাশ এখনো ফেরেনি! ছাখো তো তার কাণ্ডখানা! শ্রীবিলাস কোথায়?

শ্রীবিলাস অবিনাশের পুত্র। গৃহিণী জানাইলেন, সে শ্বশুর-বাড়ী গিয়াছে।

বংশী কহিল—মোদ্দা, এ ব্যাটা ঢুকলো কোথা দিয়ে?

ছোকরার দল আপশোষ করিল, হাতের সুখটা হইল না!

বংশী কহিল—পাগল! মারের চোটে গুঁড়ো হয়ে যাবে। তখন উল্টো ঠ্যালা সামলানো দায় হবে।

সত্য-কোম্পানি পথে বাহির হইয়া পড়িল, পুলিশ ডাকিতে। বয়স্ক-দলে গল্প চলিতে লাগিল।

শ্রীকান্ত কহিল—বুকের পাটা বোঝো! সোজা উপরে চলে এসেচে!

বংশী কহিল—জানো না তো, ভদ্র লোকের সাহস একটু বেশীই হয়। শোনোনি লালাবাজারের পুলিশ কোর্টের ঘটনা? অনেক দিনের কথা। পুলিশ কোর্ট তখন ভেঙ্গে এমন ছন্নছাড়া হয় নি। লালবাজারে তখন একটা কোর্ট বসতো। কি জমাট ভিড় ঠেলে গিয়েছিলুম একবার সাক্ষী দিতে। দেখে এসেচি কাণ্ড! তা, বেলা সাড়ে দশটায় হাকিম এজলাসে বসেচে। লোক গিস্‌গিস্ করচে...সার্জ্জেণ্ট, কনষ্টেবল। তার মধ্যে এক ভদ্র লোক এসে এজলাসে ঢুকলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটা কুলি। কুলির ঘাড়ে মই। ভদ্রলোকের ইঙ্গিতে কুলি মই লাগালো দেওয়ালে; আর ভদ্রলোক ঘড়ির কাঁটা ঘুরুলেন দু'চার বার; তারপর ঘড়িটা কাণে ঠেকিয়ে কি শুনলেন, শুনে ঘড়ি নামিয়ে বগলে পুরলেন। কুলি মই খুলে নিলে—তারপর দুজনে সটান বিদায় নিলে। খোলবার আধঘণ্টা পরে সকলের হুঁশ হলো, তাই তো, ঘড়ি যে খুলে নিয়ে গেল, কে ও? আর কে! কেউ বললে, মেরামত করবার জন্য নিয়ে গেচে সরকারের লোক! তারপর ঘড়ি আর ফিরলো না।

শ্রীকান্ত কহিল,—চুরি?

বংশী কহিল,—তা না তো কি!

হরপ্রসাদ কহিল,—একেই বলে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!...ওই যে দোরে ফের ঘা দিচ্ছে ...শোনো—

বেচারা অবিনাশ দ্বারে করাঘাত করিতেছিল, অবিশ্রাম। সেই সঙ্গে চীৎকারও করিতেছিল,—দোর খুলে ছাখো দেখি, আমি, আমি অবিনাশ কি না! ও বংশীদা...বলি ওহে শ্রীকান্ত, চোখে ছাখো, কথায় বিশ্বাস না হয় যদি—

বংশী কহিল,—হ্যাঁ দেখবো। একটু সবুর করো দাদা। পুলিশ আসুক।

পুলিস আসিল; দুই কনষ্টেবল এবং সার্জ্জেণ্ট সাহেব। আসিয়া কহিল,—কোন্ ঘরে?

—ওই, ওই, ওই—যেন থিয়েটারের ষ্টেজের উপর এক-পাল সখী কোরাসে গান ধরিল···!

সার্জ্জেণ্ট আদেশ দিল কনষ্টেবলকে—খোলো কেওয়াড়ি। তারা গিয়া শিকল খুলিল হাঁকিল,—আও...। ছোট আহ্বান। তার পিছনে অকথ্য গালি জুড়িল! চোর তবু আসে না! সার্জ্জেণ্ট হাঁকিল—পাকড়কে লে'আও।

কনষ্টেবলরা তখন চোরকে পাকড়াইয়া বাহিরে আনিল। সকলে সভয়ে চাহিয়া দেখে, সম্পূর্ণ নিরস্ত্র শীর্ণকায় এক বাঙালী...দিব্য চাঁচা-ছোলা মুখ—

অবিনাশ ডাকিল,—শ্রীকান্ত......তার স্বর করুণ!

শ্রীকান্ত বিরক্তভাবে কহিল,—কে ব্যাটা চোর—পরম-বন্ধুর মত ডাকে ছাখো না!

সার্জ্জেণ্ট বলিল,—ইহাকে চিনেন?

শ্রীকান্ত কহিল,—কস্মিন্ কালে না!

অবিনাশ কহিল,—আমি অবিনাশ—চিনতে পারচো না? দাড়ি-গোঁফ আজ সন্ধ্যার পর কামিয়েচি—

সার্জেণ্ট কহিল,—Smelling of liquor! মাতোয়ালা হ্যায়! কথার সঙ্গে সঙ্গে তার পিঠে সজোরে এক ঘুষি বসাইল।

সত্য-কোম্পানির হাতও নিশপিশ করিয়া উঠিল। রক্ত দেখিলে বাঘ যেমন ক্ষেপিয়া ওঠে ঐ একটি ঘুষি দেখিবামাত্র ছোকরা ভলাণ্টীয়ারের দলও—

অজস্র কিল-চড়-ঘুষি। অবিনাশ আর্ত্তনাদ তুলিল, উঃ, বাপ রে—

সার্জ্জেণ্ট ও কনষ্টেবলরা ধাক্কা দিয়া তাকে লইয়া পথে আসিল।

শ্রীকান্ত কহিল,—সত্য তোমরা থাকো হে—গিন্নি একা রইলেন—অবিনাশ এখনো ফেরেনি—

সত্য কহিল—আমি থানায় যাবো, ভাবছিলুম।

বংশী কহিল—কিছু ভাবতে হবে না। ইন্‌স্‌পেক্টর এখনি আসবে তদারকে। মোদ্দা, অবু গেল কোথায়? রাত তিনটে বাজে। থিয়েটার তো এত রাত্রি অবধি হয় না।

গৃহিণী ঘোমটার মধ্য হইতে জানাইলেন—নেমন্তন্ন গেছেন কাশীপুরে।

৩

ভোরের বেলায় আসামী লইয়া ইন্‌স্‌পেক্টর আসিলেন অবিনাশের গৃহে। ভৃত্যটা সামনে ছিল। ইন্‌স্‌পেক্টর ডাকিলেন,—অবিনাশবাবু আছেন?

আসামী অবিনাশ কহিল—আপনার সঙ্গেই তিনি বরাবর আছেন, মশায়!

ইন্‌স্‌পেক্টর কহিলেন—চোপ।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অবিনাশ ডাকিল,—ওরে ব্যাটা ভোলা—

ভোলা ভৃত্য। চোরের মুখে নিজের নাম শুনিয়া তার বড় ভয় হইল। পুলিশ ভাবিবে, চোরের সঙ্গে তার হয়তো ষড় ছিল! অবিনাশ কহিল—দৌড়ে একবার নন্দবাবুর বাড়ী গিয়ে বল্‌গে, বাবুর ভারী বিপদ। শীগগির আসুন। তিনি যতক্ষণ না আসেন ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু, একটু বিশ্রাম করুন এখানে এবং আমাকেও দয়া করে বিশ্রাম করতে দিন।

ইন্‌স্‌পেক্টর কহিলেন,—বেশ।

অবিনাশ কহিল,—চা খাবেন?...গেলি না ভোলা? মজা পেয়েচিস, না? দেখবি?

ইন্‌স্‌পেক্টর কহিলেন,—যারে, বাবুকে ডেকে আন্।

ইন্‌স্‌পেক্টর আসার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাও সকৌতুকে অবিনাশের গৃহে আসিয়া জমিয়া গেল। অবিনাশ ডাকিল—ওরে বাঁটুল—

বাঁটুল শ্রীকান্তর নাতি। সে সবিস্ময়ে অবিনাশের দিকে চাহিল। অবিনাশ কহিল,—তোর ছোট দিদিমাকে বল্‌গে যা,—

সকলে অবাক্! বদমায়েসটা এত পরিচয়ও জানে! বাঁটুল অবিনাশের স্ত্রীকে যে ছোট দিদিমা বলিয়া ডাকে, সে খপরও এর অবিদিত নয়!

বংশীও আসিয়াছিল। দিনের আলোয় আসামীকে লক্ষ্য করিয়া সে কহিল,—লোকটার বয়স হয়েচে। নেহাৎ ছোকরা তো নয়। তবু এ বয়সে এমন দুর্ম্মতি!

সত্য কহিল—জানো না, ছোটমামা, আজকাল অনেক বুড়ো দেখা দেছে, যারা শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশতে চায়। বুড়ো হয়ে গেছে, তবু মুখে বলে, আমরা তরুণ, আমরা সবুজ, আমরা কাঁচা—

বংশী কহিল—জেলের খাঁচায় ঢুকে কাঁচা এবার কাঁচাত্ব বাঁচাক!

হরপ্রসাদ কহিল,—ভাগ্যে মেয়ে-বৌ এখানে নেই... না হলে একটা ঢি-ঢি পড়ে যেতো...তা ইনিস্‌পেক্টর বাবু, ও বলে কি? কি মতলবে এসেছিল?

ইন্‌স্‌পেক্টর কহিলেন,—কিছুতে সে কথা বার করতে পারচি না। মতলব আবার কি? নিছক চুরি...কেশটা ভারী আর ভদ্রমহিলাকে সাক্ষী দিতে যেতে হবে আদালতে, তাই না...

বয়স্ক-দল ভাবিত হইয়া কহিলেন,—তাইতো! তা অবিনাশ গেল কোথায়! এখনো তার ফেরবার নামটী নেই...

শ্রীকান্ত কহিল,—কাল শনিবার গেছে যে...

অবিনাশ কহিল,—ওহে বংশী, শ্রীকান্ত, বলি ও হরপ্রসাদ, আমায় স্রেফ ভুলে গেলে! একটা চোরের মত হাজত-ঘরে রাত্রি-যাপন! অপরাধ? না, নিজের ঘরে রাত্রে প্রবেশ করে স্ত্রীকে ডেকেছিলুম...

শ্রীকান্ত কহিল,—থাম্ ব্যাটা—তোর এক গেলাশের ইয়ার পেয়েছিস্—না ? থাকতো অবু তো দেখিয়ে দিত !

অবিনাশ কহিল,—তাকে আর দেখাবার সুযোগ দিলে কৈ ভাই ? দেখলেও না, দেখাতেও দিলে না !... শুনবে রহস্য ? বলি শোনো—আমি কাল রাত্রে দাড়ি-গোঁফ ফেলে দিয়েচি। তাই চিনতে পারচো না। ভালো করে দিনের আলোয় চেয়ে ছাখো তো আমার পানে...

বংশী হাসিয়া কহিল,—ঢের দেখেচি। প্রমাণ দিতে পারো যে তুমি অবিনাশ ?

অবিনাশ কহিল,—পারি। আচ্ছা, মনে পড়ে, বছর দশেক হলো, সেই ভুনুর ঠাকুমার শ্রাদ্ধে আমার সঙ্গে তুমি গেছলে কীর্ত্তনের বায়না করতে...সেখানে তুমি রাঙ্গী কীর্ত্তনির গান শুনে এমনি মুগ্ধ হলে যে...তোমায় আনা দায় !

পাড়ায় বংশী চিরদিন নিজের সুনাম রক্ষা করিয়া আসিয়াছে...ভয়ানক সচ্চরিত্র, কখনো আড়-চোখে কোনো নারীর পানে চাহে নাই! অসতর্ক মুহূর্ত্ত জীবনে তার ঘটে নাই কি ? ঘটিয়াছে। কিন্তু সে সংবাদ খুব অন্তরঙ্গ ঐ দু-এক জন বন্ধু ছাড়া বাহিরের বিশ্বে গোপন রহিয়া গিয়াছে.. রাঙ্গী কীর্ত্তনওয়ালীর ওখানকার কথাটা সত্য। তাই সে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সে বলিল,—থাম্ ব্যাটা মাতাল !

অবিনাশ হতাশভাবে কহিল,—এ কথা যদি না মানো দাদা, তা হলে তোমার কাছে আমার অস্তিত্ব প্রমাণের আর কোনো আশাই দেখচি না...তোমার মনে পড়ে হে শ্রীকান্ত...? সেই গ্রহণের স্নানের দিন সেই গলির পথে একটা স্ত্রীলোক পথ হারিয়ে কাঁদছিল ? তুমি তাকে সঙ্গে নিয়ে ওই—

আর বলিতে হইল না।

শ্রীকান্ত সগর্জ্জনে কহিল,—চোপ, হতভাগা! আমায় তেমন লোক পেয়েচিস, বটে! সন্ধ্যা-আহ্নিক পূজাচার নিয়ে আছি আমি...

মুখে এ কথা বলিলেও চোখের সামনে জাগিয়া উঠিল সাত-আট-বছর পূর্ব্বেকার সেই দৃশ্য! ঝুপ-ঝুপ বৃষ্টি—সেই বৃষ্টিতে স্ত্রীলোকটাকে ছাতায় ঢাকিয়া সে গলির পথে চলিয়াছিল...ঐ কিনুর কারখানার দিকে, এমন সময় অবিনাশের সঙ্গে দেখা !

চট্ করিয়া মনে হইল, এ তবে অবিনাশই ? সে কথা আর কেহ তো জানে না। একটু-আধটু নেশা করিলেও অবিনাশ এ দিকে খাঁটী—যা কথা দেয়, তার খেলাপ করে না।

দুজনের কাছে ধমক খাইয়া অবিনাশ ইন্‌সপেক্টরের শরণ লইয়া কহিল,—একবার অবিনাশ বাবুর স্ত্রীকেই নয় ডাকুন মশায়। রাত্রে ওঁকে উঠেছিলেন ঘুমের ঘোরে—এখন দিনের আলোয় আমায় দেখুন একবার—চিন্‌তে পারেন যদি ?

প্রস্তাব শুনিয়া রাগিয়া সকলে আগুন! ব্যাটার স্পর্দ্ধার সীমা নাই!

নন্দ আসিয়া হাজির হইল। সে প্রশ্ন করিল,—ব্যাপার কি ?

ব্যাপার তাকে আনুপূর্ব্বিক বলা হইলে সে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল; পরে কহিল,—আচ্ছা মজা তো! দাড়ি-গোঁফ কামানোর দরুণ এমন শাস্তি!

অবিনাশ কাতর স্বরে কহিল,—নিজের স্ত্রীর এই কাজ। আমার কত-বড় ইজ্জৎ সাহিত্য-জগতে...

নন্দ কহিল,— ছিঃ! তোমরাই বা কি! পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে যার সঙ্গে চলা-ফেরা, বসা-দাঁড়ানো, সে আজ দাড়ি-গোঁফ কামিয়েচে বলে তাকে দূর করে দেবে!... তা, বৌদি কোথায়? আমি একবার তাঁর সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে চাই।

ইনস্‌পেক্টর কহিলেন,—মজা তো মন্দ নয়! আমায় একটা রিপোর্ট তবু লিখে ফেল্‌তে হবে। Cognizable case বলে যখন হাত দিয়েচি—তা যাক, আমি তা হলে যাই।

অবিনাশ কহিল,—শুধু হাতে যাবেন ? আমায় নিয়ে না ?

হাসিয়া ইন্‌স্‌পেক্টর কহিলেন,—থাক্। আপনি এখন বিশ্রাম করুন। আমি বরং একটা মুচলেকার ফর্ম্ম পাঠিয়ে দেবো, সেটায় সই করে দেবেন। তারপর কাল একবার—সে আমি নয় আর এক দফা এসে বলে যাবো'খন।

অবিনাশ কহিল—কিন্তু আর একটু বসুন। চা আসচে ·····

চা আসিল। ইনস্‌পেক্টর চা পান করিয়া বিদায় লইলেন; সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার যত লোক তামাসা দেখিয়া হাসিয়া খুশী-মনে সরিয়া পড়িল।

নন্দ তখন গৃহমধ্যে আসিয়া বৌদির সঙ্গে মহা দ্বন্দ্ব বাধাইয়া তুলিল,—ছি বৌদি, এই কি হিন্দু স্ত্রীর আচরণ! পঁচিশ বছর যে-স্বামীর সঙ্গে ঘর করচেন, তাকে চিনতেও পারলেন না!

অবিনাশের গৃহিণী কহিলেন—চেনবার আর অবসর পেলুম কখন্, বলো! প্রথমে ঘুম-চোখে ঐ মূর্ত্তি দেখে ভয়ে চীৎকার করলুম—তার পর সেই ভয় নিয়েই ছুটে বাইরে এসে ঘরে শিকল টেনে দিলুম। শেষে অত যে হৈ-হৈ ব্যাপার—আমি একধারে ভুতের মত দাঁড়িয়ে, আমায় আর দেখতে দিলে কৈ।

অবিনাশ গম্ভীর স্বরে কহিল,—এ লাঞ্ছনার পর সংসারে কি আমি আর বাস করতে পারবো! অসম্ভব! আমি ভাবচি, আমি বৈরাগ্য নেবো, নন্দ......

গৃহিণী কহিলেন,—থামো। ঢের হয়েচে! পাড়াশুদ্ধ টী-টী।

অবিনাশ কহিল,—সেইজন্যেই তো আমার পক্ষে সংসারে থাকা সম্ভব নয়। সকলে কি ভাবলে, বলো তো! শয়নে-স্বপনে, ধ্যানে-জাগরণে যে-স্বামী হিন্দু নারীর উপাস্য দেবতা, সেই স্বামীর সঙ্গে এমন পরিচয়! তাছাড়া আমার মান-ইজ্জৎ! অন্য কাগজওয়ালারা সং সাজিয়ে কাগজে আমার ছবি বার করবে, কত ছড়া কাটবে,—চামচিকার সম্পাদকী চাকরি আমার পক্ষে আর কি বজায় রাখা সম্ভব হবে?

গৃহিণী কহিলেন,—তুমি এক কাজ করো। তাদের কিছু করার আগে তুমি নিজেই নিজের কাহিনী লিখে তোমার 'চামচিকা' কাগজে ছেপে বার করে দাও।

অবিনাশ কহিল,—তুমি মোদ্দা কি ভেবেছিলে বলো দিকিনি—যে তোমার রূপে মুগ্ধ হয়ে কোনো তরুণ প্রণয়ী...

গৃহিণী কহিলেন—গলায় দড়ি! গলায় দড়ি! তোমার মত তো আমি আক্কেল হারিয়ে বসে নেই... ..

"সিমেণ্ট"

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রবন্ধের শিরোনামা দেখে অনেকেই হয়ত আশঙ্কিত হবেন যে বাঙ্গালীর ব্যবসায় বুদ্ধি উদ্‌বুদ্ধ করবার জন্য আমরা বিলাতী মাটীর গুণাগুণ বর্ণনা করে একটী বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ রচনা করতে বসেছি। তা নয়, ব্যাপারটা আরও হাল্‌কা। 'সিমেণ্ট' নামক একখানি উপন্যাস সম্প্রতি ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হয়ে এই বৎসরেই আমাদের হাতে এসে পৌছেছে; সেই বইখানি নিয়ে কিছু আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য। বই খানির বাঁধাই থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে এতে রুষ দেশের কমিউনিষ্টিক বিদ্রোহের কথা অতি অবশ্যই আছে। প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনায়, অলক্ষিত চিত্রজগতের দীর্ঘ অসরল রেখা-সমন্বিত মূর্ত্তি দুটীতে সোভিয়েট্ আর্টের নিদর্শন ভাল ভাবেই ফুটে উঠেছে। গ্রন্থকারের নাম গ্লাড্‌কভ্; কিন্তু এই রুষ সাহিত্যিকের সঙ্গে সাধারণের বোধ হয় তেমন পরিচয় নাই, তাই এ প্রবন্ধে তাঁর শিক্ষা, দীক্ষা ও লেখার সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই।

১৮৮৩ খৃঃ অব্দে সারাটভ্ প্রদেশে দরিদ্র কৃষকের ঘরে গ্লাড্‌কভের জন্ম হয়। ছেলেবেলায় ন'দশ বছর পর্য্যন্ত তিনি গ্রামেই বাস করেন। পড়াশুনার চেয়ে ধর্ম্ম-সঙ্গীত ও পৌরাণিক কাহিনীই তিনি বেশী ভালবাসতেন ও সে

গুলি গল্পচ্ছলে কণ্ঠস্থ করতেন। তিনি নিজে স্বীকার করেছেন যে এ বিষয়ে তিনি তাঁর মা ও মাতামহীর কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ বাল্যকালে যা' কিছু শিক্ষা, তিনি তাঁদের স্নেহক্রোড়ে বসেই লাভ করেছিলেন। দশ বছর বয়স থেকেই তাঁর যাযাবর জীবন আরম্ভ হয়। এই সময়ে তিনি পিতার সঙ্গে কখনো ভল্‌গা নদীর তীরবাসী ধীবর-গৃহে, কখনো বা সুদূর ককেসাসের পার্ব্বত্য প্রদেশে কৃষক-পল্লীতে থাকতেন। ১৮৯৫ সালে এক কলেজে তাঁর পিতার চাকুরী হ'লে, তিনি কতকটা সুস্থির হয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করেন। বার বছর বয়সেই তিনি যে ক্লাসিক গুলি পড়েছিলেন তা দেখলে এই সুকুমার-মতি বালকের আশ্চর্য্য বুদ্ধিমত্তায় ও সাহিত্যানুরাগে বিস্মিত হ'তে হয়। লারমনটভ, দস্তোভেস্কী, টলষ্টয়-প্রমুখ গ্রন্থকারগণের লেখাগুলি তিনি অতি আনন্দ ও যত্নের সহিত পড়েছিলেন। কিন্তু গ্লাডকভ্‌ তাঁর আত্মকাহিনীতে স্বীকার করেছেন যে দেশীয় সাহিত্যের দুটী খ্যাতনামা লেখকের বই গুলি প'ড়ে তিনি কোনও সুখ পান্‌নি। পুস্কিন্‌ ও গোগলের লেখাতে বরাবরই তিনি কেমন একটা নিঃস্পন্দ প্রাণহীনতা অনুভব করতেন।

ছেলেবেলায় যদিও তিনি এক জন বিশেষ মেধাবী ও কৃতী ছাত্র ব'লে পরিচিত ছিলেন, তবু উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ তাঁর কপালে ঘটে ওঠেনি। প্রথমে দিন কয়েক এক ওষুধের দোকানে গ্লাডকভ্‌ শিক্ষানবিশি করেন, কিন্তু এ কাজ তাঁর ভাল লাগল না। অতঃপর এক ছাপাখানায় কাজ শিখতে চেষ্টা করেন, কিন্তু এখানেও এই প্রতিভাশালী তরুণের মন বস্‌ল না।

অবশেষে এক দিন কাউকে কিছু না জানিয়ে গোপনে গ্রাম ত্যাগ ক'রে সহরে পালিয়ে এলেন; সহরে এসে ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত কয়েক বছর মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করেন। রুষে ছাত্রজীবনে যা' হয়ে থাকে তাঁর বেলাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি, অর্থাৎ মফঃস্বলবাসী দরিদ্র ছাত্রকে নিজের পাঠ্যাবস্থাতেই রোজগারের চেষ্টা করতে হয়েছিল। দুঃখ-কষ্টকে তিনি আজীবন বরণ ক'রে এসেছেন, কিন্তু পিতার সাহায্যের জন্য তাঁকে মাষ্টারী ক'রে ও সংবাদপত্রে লিখে অর্থোপার্জ্জন করতে হ'ত। কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁর ভেঙ্গে গেল; অর্থাভাবে ও অস্বাস্থ্যকর আহারে, তাও যথেষ্ট পরিমাণে না পেয়ে, তিনি অসুখে প'ড়ে হাসপাতালে গেলেন। এদিকে ঘরের অবস্থা আরও শোচনীয়; তাঁর পিতা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে সাইবিরিয়াতে নির্ব্বাসিত হলেন। পিতা কারামুক্ত হ'লে, তাঁকে কিছু জমিজমা কিনে দিয়ে নিজে কপর্দ্দকহীন অবস্থায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার জন্য অদম্য উৎসাহ নিয়ে তিনি মস্কো যাত্রা করলেন। কিন্তু সেখানেও কিছু সুবিধা হ'ল না। তখন চারদিকে বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার অর্থ 'Perpetual Student' হয়ে থাকা; অন্ততঃ দশবছরের জন্য আবদ্ধ থাকা—Five years for study, four in exile and one lost because the University is closed. মাস ছয়েক পড়েই তিনি নর্ম্মালস্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে Social-Democratic দলে প্রবেশ ক'রে বিদ্রোহের কাজে যোগদান করলেন। এখানেও স্থির হয়ে কাজ করা তাঁর অদৃষ্টে হ'লনা; রাজভয়ে সুদূর ট্রান্‌সবৈকালিয়া প্রদেশে আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে গেলেন। কিন্তু পুলিশে তাঁকে ছাড়লে না; ফলে তিন বছর লেনা নদীর নির্জ্জন তীরে তাঁর নির্ব্বাসন দণ্ড হ'ল। ফিরে এসেও তিনি প্রারব্ধ কাজ ছাড়েন নি; কম্যুনিষ্ট দলে প্রবেশ ক'রে, আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত Civil war এ ব্যাপৃত ছিলেন।

এই ত গেল তাঁর কর্ম্মবহুল অভিজ্ঞতাপূর্ণ জীবনের বিচিত্র কাহিনী। এইবার আমরা গ্লাডকভের সাহিত্য-জীবনের কথা বলব কিন্তু সেটা দীর্ঘ নয়; আর এখনও তিনি ইউরোপীয় সাহিত্যামোদিগণের কাছে খুব সুপরিচিত হন্‌ নি। যখন তাঁর ১৭ বৎসর বয়স, তখন থেকেই তিনি লিখতে সুরু করেন, অনটনে প'ড়ে। সাময়িক সংবাদপত্রে এ গুলি ছাপা হ'ত। কর্ম্মহীন শ্রমজীবীদের জীবন তাঁর ভাল ক'রেই জানা ছিল, তাই তাঁর অকৃত্রিম বাস্তব চিত্র-গুলি সাদরে গৃহীত হ'ত। এই সময়ে ম্যাক্সিম গোর্কির সঙ্গে তাঁর পত্রের মধ্য দিয়ে আলাপ হয়; এবং সে পরিচয় বরাবরই অটুট থেকে ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়। গোড়া থেকেই গোর্কি এই নূতন লেখকের প্রতি যথেষ্ট স্নেহ ও সহানুভূতি দেখান, কাজেই গ্লাডকভের লেখাতে, বিশেষ করে Cement এই খনিতে, গোর্কির চিন্তাধারার প্রভাব খুব বেশী ও স্পষ্ট। গ্লাডকভের দু'একটা গল্প সরকার বাজে-

প্ত করায় সেগুলি পুনর্মুদ্রিত হয় নি। বিদ্রোহাবসানের পরে তাঁর গল্পগুলি একসঙ্গে গ্রথিত হ'য়ে যে দু'খানি বইয়ে প্রকাশিত হয় তাদের নাম—The Gulf, ও The Wolves. নাটকও তিনি দু'খানি লিখেছেন, The Horde এবং The Deadwood. উপন্যাসের সংখ্যাও দু'খানি, একটী The courser of fire অপরটী Cement. শেষোক্ত বই খানি নিয়ে আমাদের এই আলোচনা।

বইখানির নামকরণ হয়েছে একটী বিলাতী মাটির ফ্যাক্টরী নিয়ে। এই কারখানাটী বইয়ের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা বা বক্তব্য নয়, কেবল পিছনকার দৃশ্যপটের মত সম্মুখে অবস্থাবর্ত্তনের সহায়তা করে মাত্র। বিদ্রোহসূচনায় ধরপাকড়ের পালা আরম্ভ হ'লে অনেক শ্রমিক কারারুদ্ধ হ'ল; ফলে কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। কম্যুনিজ্‌মের জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কারখানার পূর্ব্ব গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত হল, আবার শেষের দিকে বল্‌শেভিষ্ট দলের বিদ্রোহের সঙ্গে কারখানাটী রূপান্তরিত হয়ে গেল। এখানে শুধুই শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হত না; এটা ছিল সঙ্ঘজীবনের একত্র সমাবেশের স্থান। রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ও কোলাহলের সাড়া এখানে এসে পৌছুত, আর সামাজিক দিক্ দিয়েও বিভিন্ন পরিবারের লোকগুলি একত্র Comrades হিসাবে মেলামেশা করত। মোট কথা, এই কারখানাটী ছিল শ্রমিকদের কর্ম্মস্থল ও তাদের সব আশা-ভরসার কেন্দ্র; আর বিলাতী মাটীর মতই তাদের স্বাধীনতা ও সামাজিকতার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। গল্পটী সংক্ষেপে এই :—

উপন্যাসের নায়ক গ্লেব্ তিন বছর পরে নির্ব্বাসন থেকে ঘরে ফিরছে। বিদ্রোহের সূচনায় রাজদণ্ডে দণ্ডিত ক'রে তাকে দেশ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রথমেই গ্লাডকভ্ শিল্পিসুলভ সুকৌশলে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের দৃশ্যটী আমাদের চোখের সামনে ধরেছেন যাতে ক'রে রুষের পূর্ব্বাবস্থা ও বিদ্রোহের পরের অবস্থার তারতম্যটুকু ভাল করে বোঝা যায়। বইএর গোড়াতেই মিলনান্ত দৃশ্য আছে বটে; নির্ব্বাসিত গৃহহারা পথিক বুকভরা আশা নিয়ে আজ তার ঘরে ফিরে আসছে—মনে তার মিলনের আনন্দ, চোখে তার জাতীয় জীবনের পরিবর্ত্তন-জনিত বিস্ময়ের রঙ্। কিন্তু মিলন ঐ আশাতেই পর্য্যবসিত, কারণ তার পর থেকেই গ্লেবের জীবনে ট্র্যাজেডি সুরু হ'ল।

রুষের রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের আবহাওয়ার মধ্যে ফিরে এসে গ্লেব্ নিজেকে মানিয়ে নিতে পারলে না; অবস্থাবৈগুণ্যে গার্হস্থ্য জীবনেও দারুণ অশান্তির সূত্রপাত হ'ল। দেশে ফিরে এসে গ্লেব্ দেখে যে এ জগতে তার সব চেয়ে যা' কিছু কাম্যবস্তু, পত্নীপ্রেম ও কন্যাস্নেহ, তা' লুপ্ত হয়েছে। তার প্রিয়তমা পত্নী Dasha ও কন্যা Nurka দু জনেই অন্যরকমের হয়ে গেছে; মা ও মেয়ের মধ্যেও সে প্রীতি-বন্ধন আর অটুট নেই। বিদ্রোহের ফলে ড্যাসা সম্পূর্ণ বদ্‌লে গেছে—সে আর কল্যাণময়ী গৃহকর্ত্রী নয়, তার স্থান এখন বাইরে; রাষ্ট্রীয় কোলাহলের মধ্যে স্ত্রীস্বাধীনতাটুকু বেছে নিতে গিয়ে সে তার পতিপ্রেম হারিয়েছে। যখন তার স্বামী ঘরে ফিরে এল, দীর্ঘদিনের বিরহ ও আদর্শনের ফলে কোনও ব্যাকুলতাই তার দেখা গেল না। এখন সে একটা প্রকাণ্ড যন্ত্রের অংশ-বিশেষ—নিশ্চল ও প্রাণহীন। অবস্থাবিপর্য্যয়ে তার আগেকার প্রাণবন্ত উচ্ছলতাটুকু নষ্ট হ'য়ে গেছে। স্বামীর প্রবাস-গমনের সঙ্গে সঙ্গে তাকেও কম দুঃখ সহ্য করতে হয় নি। রাষ্ট্র-জীবনের কঠোর সংঘাতে ও পুরুষদের লোলুপ সংস্পর্শে নারীসুলভ কোমল স্নেহের উত্তাপ এখন তার মনে একটুও স্থান পায় না। নিভৃত গৃহস্থজীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যটুকু বাহিরের উন্মাদনার মাঝে হারিয়ে গেছে, ফলে পলিটিক্স বজায় রহিল, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যই গেল ধুয়ে মুছে।

কিন্তু রাষ্ট্র-জীবনেই বা শান্তি কোথায়? শ্রমিকদল যে লাভের আশায় বিদ্রোহের পতাকা তুলেছিল, সেই লাভ লোকসানের হিসাব-নিকাশ করতেই কতদিন কেটে গেল! প্রথমে নিপীড়িত শ্রমজীবিগণ ঠিক করেছিল যে তারা আর অথরিটির দোহাই মানবে না, নিজেদের জিনিস বুঝে প'ড়ে নেবে। তারা দলবদ্ধ হ'ল বটে, কিন্তু আসল জিনিস রইল তাদের নাগালের বাইরে। তাদেরি প্রতিনিধি নিয়ে পার্টি রচিত হ'ল, কমিটি, কাউন্সিল, এক্‌জিকিউটিভ গঠিত হ'ল, কিন্তু আইনকানুনের গুরুত্ব একটুও কম্‌ল না; প্রয়োজনের সময়েও তারা জিনিস পায় না, কারণ Bureau বা Council তখনও সে প্রস্তাব

অনুমোদিত করে নি বা হুকুম জারী করে নি! শেষের অবস্থা যা দাঁড়ায়, এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হ'ল। কতকগুলি লোকের হাতে সব ক্ষমতা গিয়ে পড়্‌ল, বাকী লোক অন্ধের মত খেটে চল্‌ল। যে স্বাধীনতা-লাভের ঔৎসুক্যে তারা জীবনের সুখ শান্তি বলিদান দিয়ে পুরাতন শাসন পন্থা উলটু পালটু ক'রে দিয়েছিল, সেটুকু পেতে এখনও অনেক দেরী। সোভিয়েট্ গভর্ণমেণ্টের এই ক্রমোন্নত অভিব্যক্তি অথবা কম্যুনিষ্টদলের কার্য্যকলাপ বর্ণনা ও সমালোচনা Vanguard Seriesএর বই এ মিল্‌তে পারে বটে, কিন্তু গ্রন্থকার সে উদ্দেশ্যে কলম ধরেন নি। তাঁর উদ্দেশ্য রাষ্ট্র-জীবনের চঞ্চলতা ও উন্মাদনা অঙ্কিত করা নয়,—মানব-জীবনের যে অংশটুকু লোক-চক্ষুর অগোচরে সুগোপনে থাকে, মানব-হৃদয়ে সুখ, দুঃখ, আশা ও নৈরাশ্য, মহত্ত্ব ও দুর্ব্বলতাগুলিকে নিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তোলা। তাই বইখানিকে গ্লাড্‌কভ—Strata of the Soul, In the Vice, Scum, Tares প্রভৃতি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন।

এক দিন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণে বসে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল। প্রথমে গ্লেব্ তার স্ত্রীর ভালবাসা ও সান্নিধ্য ফিরে পাবার জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু যে দিন ড্যাসা তাকে পর পর জীবনে কঠোর সত্যগুলি প্রকাশ কর্‌লে, তার ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর থেকে বহির্জ্জগতের সংস্পর্শে পুরুষের উৎপীড়নে নিজের পবিত্রতানাশের ইতিবৃত্ত তাকে জানিয়ে দিলে, সেই থেকে গ্লেবের মন স্ত্রীর প্রতি একটা সকরুণ সমবেদনায় ভরে উঠ্‌ল। সে বুঝ্‌লে ঘরের মায়া কাটাতে হ'বে--তাই অদম্য উৎসাহ নিয়ে সে নিজেকে কর্ম্মস্রোতে ভাসিয়ে দিলে—আশা এই যে এক দিন না এক দিন সে তার স্ত্রীর মনে সুপ্ত প্রেম জাগিয়ে তুল্‌বে।

এর পরের ঘটনাগুলি অতি বিচিত্র। পলিটিক্সে নেমে তার বড় বড় ধারণাগুলি একেবারে ডুবে গেল; আদর্শবাদ ও বাস্তবতার ঘাত-প্রতিঘাতে হ্যাম্‌লেটের মতই মানসিক দ্বন্দ্বে প'ড়ে সে হাবুডুবু খেতে লাগ্‌ল। ভবিষ্যৎ জীবনের চিত্র ক্রমশঃ স্বপ্নের মতই অস্পষ্ট হয়ে গেল। এক দিন সে দেখ্‌লে যে বলশেভিষ্টদের দলে ভিড়ে একটা লাল নিশান হাতে নিয়ে সে ক্রমাগতই ঘুরোচ্ছে ও তারস্বরে চীৎকার করছে। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সে তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে বিশাল জনসঙ্ঘের বাহনরূপে পরিণত হয়েছে। গল্পের শেষ এইখানেই।

বই খানিতে অনেক চরিত্রই অঙ্কিত হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে প্রধান যে গুলি সে গুলির সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

ড্যাসের কথা আমরা আগেই কিছু বলেছি। সে তার স্বামীকে শাস্তি দিতে পারে নি—কিন্তু সেটা তার ইচ্ছাকৃত দোষ নয়—সেটা অবস্থা-বিপর্য্যয়ের ফল। কশাক্ সৈন্যদের হাতে প'ড়ে তার যে লাঞ্ছনা ভোগ হয়েছিল, তার স্মৃতি তাকে কঠিন করে তুলেছিল। ঘরে তার মন বস্‌লনা—বাহিরের কাজে সে গা ভাসিয়ে দিলে। এই খানেই তার পরিবর্ত্তনের শেষ অবস্থা। Comrade Badin এর সঙ্গে পরিচয়ের ফলে সে তার কাছে আপনাকে ধরা দিলে, কিন্তু সে ঐ এক রাত্রির জন্য যে দিন তার মনের উপর কোনও লাগাম ছিল না। এর পরে সে আত্মশুদ্ধির চেষ্টা আরম্ভ কর্‌লে—কিন্তু পতিভক্তি দিয়ে নয়। কারণ গ্লেবকে সে আপন-ভোলা সরল, ভাব-প্রবণ ও অতিমাত্রায় উৎসাহী লোক বলে জানে, তার উপর মানসিক প্রীতি কেমন করে নষ্ট হয়ে গেছে সে নিজেই জানে না। স্বামীর উপর কোনও সন্দেহই তার নেই, এমন কি Comrade Polia যখন তার চোখের সামনে প্রকাশ্য ভাবে গ্লেবকে প্রেম-নিবেদন কর্‌ত তখনও সে কোনও চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করে নি। দেশের কাজে সে সর্ব্বদাই ব্যাপৃত থাক্‌ত, ফলে মেয়ে নার্কা অযত্নে শুকিয়ে যাওয়া ফুলটীর মতই ঝরে গেল। এইটাই ড্যাসের মনে সবচেয়ে বেদনা দিয়েছিল। আত্মকৃত অবহেলায় যে কন্যার জীবন নষ্ট হয়েছে এই অনুশোচনায় বিদ্ধ হয়ে সে নার্কার মৃত্যুশয্যায় যে অশ্রুবাঁধ খুলে দিয়েছিল, সে চিত্র গ্লাড্‌কভের নিপুণ তুলিকায় অতি মধুর ও করুণ ভাবে ফুটে উঠেছে। গৃহের সহিত এই শেষ বন্ধনটী ছিন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে পুরাতন নীড় ত্যাগ করে Badin এর ঘরে গিয়ে উঠ্‌ল; গ্লেব্ অবশ্য তখন থেকে সব আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে counter revolutionএ যোগদান কর্‌লে।

পোলিয়ার চিত্রটী একটু সহানুভূতির চোখে দেখা দরকার। এই মেয়েটী অদ্ভুত! প্রবৃত্তির সংযম সে শেখে নি, কিন্তু ইচ্ছাকৃত পদস্খলনও তার হয় নি। সে নীরবে গ্লেবকে ভালবেসে এসেছে, ইঙ্গিতে, ভাষায় ও ভাবে তাকে জানিয়েছে যে তার মন ও দেহের উপর গ্লেবের সম্পূর্ণ অধিকার; কিন্তু কোনও দিন সে গ্লেবকে পেলে না। এক দিন সে গ্লেবের মন ভুলোতে চেষ্টা করেছিল, দৈহিক উত্তেজনা দিয়ে, কিন্তু ড্যাসা সেই মুহূর্ত্তে তাদের সামনে উপস্থিত হ'ল। তার জন্য কারুর মধ্যে ক্রোধ, অভিমান বা বিদ্বেষ জেগে ওঠেনি, সবাই নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পোলিয়ার ইন্দ্রিয়াসক্তি আছে, কিন্তু সত্যিকারের ভালবাসাও সে দেখিয়েছে, যখন অজস্র গোলাবর্ষণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে গ্লেবকে সাহায্য করেছিল।

Sergeএর চিত্র অন্ততঃ রুষ-সাহিত্যে অভাব নেই। এই রকমের নীরব কর্ম্মী, নীরব প্রেমিক, ছাত্রাবস্থায় দেশের কাজে আত্মনিয়োগের দৃষ্টান্ত ঐ দেশীয় সাহিত্যে বিরল নয়। পোলিয়াকে সে ভালবেসেছিল, কিন্তু তাকে সে পায় নি। তখন সে গ্লেবের মত দেশের কাজেই নিজেকে উৎসর্গ করলে, কিন্তু সেখানেও শান্তি পেলে না। কাউন্সিলের লোকের অত্যাচার, ত্রুটি বিচ্যুতিতে তার মন ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ল। অবশেষে তার জীবনের সব চেয়ে বড় ঘটনা এক নিমিষে এক রাত্রিতে ঘটে গেল। মানসিক দ্বন্দ্ব ও অশান্তি নিয়ে সে পোলিয়ার পাশের ঘরেই নিঃশব্দ পদচারণায় কত মধ্যরাত্রি যাপন করেছে; কিন্তু ইঙ্গিতেও জানাতে সাহস করে নি, যে সে পোলিয়ার প্রেমাকাঙ্ক্ষী। পোলিয়া বুঝেও বোঝে নি। যে রাত্রিতে বাদিন্ এসে তার ঘরে জোর করে প্রবেশ করে তার সতীত্ব নিয়ে চলে গেল, তখন তার কান্নায় ব্যথিত হয়ে সার্জ্জি প্রথমে তার কাছে এল, কোনও কথা বললে না, নীরবে তার যন্ত্রণা সহ্য ক'রে, সহানুভূতি জানিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে চলে গেল। পলিটিক্স থেকেও সে বিদায় নিলে; দলের লোক তাকে Menshevik ঠাউরে, তাকে Typical Intellectualist ব'লে, দল থেকে বের ক'রে দিলে।

দেশে যখন চারদিকে বিদ্রোহের অনল জ্বলে ওঠে, তখন এক জন প্রবল ও কর্ম্মপটু লোকের আবির্ভাব আপনা হতেই হয়। আর সে লোক যদি চতুর হয়, তবে তার নিজের জীবনে যতই পঙ্কিল আবর্জ্জনা থাকুক্ না কেন, বাইরে সে নিজেকে মানিয়ে চলে, ধরা ছোঁওয়া দেয় না। বাদিন এই রকমের লোক। কাজে তার অসীম ক্ষমতা, কষ্ট-সহিষ্ণুতাও অসাধারণ, কিন্তু নারীকে সে ভোগের সামগ্রী ব'লেই শিখে এসেছে, ফলে তার ক্ষুধা কিছু অস্বাভাবিক রকমের উগ্র ছিল। প্রবৃত্তির মধ্যে সংযম না থাকলে যা হয়, তার আচরণে কোনও শালীনতার আবরণ ছিল না। সে হচ্ছে—'the terribly efficient man,—the strong man that comes and takes.' সে এগ্‌জিকিউটিভ্ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট, দলপতি; পলিটিক্সে জোর জবরদস্তি করাই তার অভ্যাস, তাই পরের গৃহ-জীবনেও তার প্রচণ্ড উৎপাত। তার অসংযত ব্যবহারের জন্য সে চারটী লোকের জীবন বিষময় ক'রে দিয়েছে। ড্যাসা গ্লেবকে ভালবাস্‌তে পারলে না, বাদিন তার দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সুবিধা করে নিয়েছিল ও শেষে ছলে বলে কৌশলে, ড্যাসাকে নিজের ঘরে তুলেছিল। পোলিয়া গ্লেবকে পেলে না, সার্জ্জি পোলিয়াকে পেয়ে ধন্য হ'ল না; কারণ মধ্যরাত্রে এক দিন বাদিন পোলিয়াকে অতর্কিত আক্রমণ ক'রে নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন অপহরণ ক'রে নিয়ে চলে গেল। বাদিনের চরিত্র দুটো দিক্ থেকে দেখানো হয়েছে—তার কর্ম্মজীবন ও তার ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা। বাদিন, পোলিয়া, ড্যাসা, গ্লেব এবং সার্জ্জি পাঁচ জনের জীবন যেন অদৃশ্য সূত্রে জড়িত, এক জনের সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ জনেরই জীবন ক্লিষ্ট ও খিন্ন। বইএর গোড়াতে কমেডি, শেষেও ধরতে গেলে কমেডি, কারণ বলশেভিজমের জয় জয়কার! কিন্তু ট্র্যাজেডি যা কিছু—ঐ ক'টি লোকের মনে-প্রাণে। এমন একটা সামাজিক চিত্র গ্লাড্‌কভ্ এঁকেছেন যেখানে মানুষের গোপন নিজস্ব বা বরণীয় ব'লে কিছু আলাদা ক'রে রাখা নেই। সবই জনসাধারণের জিনিস, তাদের অগোচরে কিছু নেই, থাকবারও যো নেই। গণতন্ত্র আগে, পরিবারবর্গ পরে; মানুষ আগে কম্রেড, পরে সময় থাকে ত বাপ মা বলে অভিহিত হ'তে পারে। বিদ্রোহের ফল ত' এই। যে সব জিনিস নিয়ে বিদ্রোহ প্রথম সুরু হয়েছিল, সে উচ্চ আদর্শ অনেক দূরে চলে গেছে। মানুষ প্রবৃত্তির

দাস হ'য়ে রইল, ভাবপ্রবণতা জয় করতে পারলে না, ইন্দ্রিয়াসক্তির ত' কথাই নেই। যখন সার্জ্জি পোলিয়ার ঘরে এসে বাদিনের অত্যাচারে ধর্ষিতা নারীর মাথায় ধীরে ধীর হাত বুলোচ্ছিল, তখন পোলিয়া এই কামুকতার কথা উল্লেখ ক'রে বলেছিল—I knew, Serge dear that something would happen. Have't you seen these faces, heard those voices? 'Have pity, Brothers......Help.... Famine......Hunger!' And the dice rattling and the violins, in the cafés...and the shop windows...The revolution has turnd to greed...And *this*—It all belongs together, Serge."

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের কাছে এই যে মানবের দাসত্ব সোভিয়েট্ গভর্ণমেণ্টের অধীনে থেকেও গ্লাড্কভ্ তা' নির্ভয়ে সমালোচনা করতে কুণ্ঠাপ্রকাশ করেন নি। সামাজিক ক্ষতিবৃদ্ধি ছাড়া অর্থনীতি ও রাজনীতির দিক্ দিয়েও গ্রন্থকার সমালোচনা করেছেন, কখনও ইঙ্গিতে কখনও বা চরিত্রগুলির উক্তি দিয়ে।

জনসাধারণের প্রতিনিধির হাতে শাসনভার থাকলেও অতি মাত্রায় উচ্ছৃঙ্খল ডিমোক্রেসীর যা দোষ, তা এ ক্ষেত্রেও হ'য়েছিল। অর্থাৎ চারদিকে বড় বড় প্লাকার্ড মারা হ'ত যে কো-অপারেটিভ ষ্টোর ও কমার্শিয়াল্ ম্যানুফাকচারিং কোম্পানী শীঘ্রই খোলা হবে; ক্যাপিটালিজমের ধ্বংসাবশেষের উপর কম্যুনিজমের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু কাজের বেলায় ইকনমিক্ দাসত্ব ঘুচল না; শ্রমিকরা দলে দলে আসে কাজ করতে অথচ কারখানার দরজা বন্ধ, কারণ কমিটি এখনও মত দেয় নি, সুতরাং অফিসিয়াল কেতা বজায় রাখতে হবে। বিদ্রোহরূপ সাল্সাসেবনের ফলাফল একই, আগেও যে অবস্থা, পরেও সেই অবস্থা। যতক্ষণ না লোকে counter-revolution জুড়ে দিলে, পার্টির সংস্কার করলে, মোট কথা, যতক্ষণ না বলশেভিজমের লাল নিশেন উড়ল, ততক্ষণ কোনও উন্নতিই হ'ল না। বল্শেভিষ্টরা এসেও যে কি উন্নতি সাধন করেছে সেটাও অবশ্য বিবেচ্য এ কথা গ্লাডকভ্ ইঙ্গিতে জানিয়েছেন। স্পেশ্যালিষ্টদের মিটিংএ এক জন এই অবস্থাটী বেশ ভাল ক'রে সাজিয়ে বলেছেন—"Nothing is being built, and nothing can be built, since there is no capital nor productive capacity...They have no strength, no experience, no means for creating new enterprises...And they cannot, when private capital and initiative are absent. They won't go very far with their nationalisation. Willingly or unwillingly, we shall have to apply to the foreigners."

পলিটিক্সেও লোকের অবস্থা খুব সুখের হয় নি। যেখানে গভর্ণমেণ্ট ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মর্য্যাদা রাখে, সেখানে প্রজাদের তরফ থেকে বাধ্যতা ও স্বার্থত্যাগ আপনিই আসে, কিন্তু যেখানে এই দু পক্ষের বিরোধ, সেখানে শান্তির অভাব। এখানেও ডিমোক্রেসীর ছদ্মবেশে কমিটি, বুরো, আর স্পেশ্যালিষ্টদের কাউন্সিল প্রভৃতির অত্যাচার। বইখানি পড়লে একটী সত্যের উপলব্ধি করা যায় যে ইতিহাসে অনেক ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে। মনে হয় যেন আমরা বিদ্রোহ-ক্ষুব্ধ ফরাসী দেশের ১৮৩০ সালের পরের ইতিহাস পড়ছি।

বর্ত্তমান ইউরোপীয় রাজনীতির ছাত্র বইখানির যথাযথ কদর করবেন সন্দেহ নাই, তবে বইখানি কেবল কম্যুনিজমের দোষগুণ বর্ণনা অথবা সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের সমালোচনার উদ্দেশ্যেই লেখা হয় নি। এতে কেবল ঐতিহ্যের মোহ নেই, প্রকৃত শিল্পীর কুশলতাও আছে। কারখানাটীর বর্ণনাচ্ছলে তিনি আবার দেখিয়েছেন যে শাসনপ্রণালী একটা প্রকাণ্ড যন্ত্রের মত নরনারীকে নিষ্ঠুর ভাবে নিপীড়ন করে চলেছে। কারখানার মজুরগুলির দেবতা হচ্ছে যন্ত্ররাজ Kleist, তার কাছে তারা আপনার মনুষ্যত্ব, সুখ, দুঃখ সবই বিসর্জ্জন দিয়েছে। কিন্তু এ সব ছাড়া অন্য জিনিসও আছে।

শিল্প-কৌশলের দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে অবশ্য অনেক কথাই উঠতে পারে। অনেকগুলি লোকের একত্র সমাবেশের ফলে অনেক চরিত্র হয়ত ভাল করে ফোটে নি। আবার অনেক স্থলে তাদের মুখ দিয়ে নাতি দীর্ঘ পোলিটিক্যাল প্রবন্ধ বেরিয়ে পড়েছে! বই খানিতে কত টুকু প্রবলেমের ঝাঁঝ, কতটুকুই বা Conscious art ধরা

পড়েছে সে বিচার আমরা করব না। দেখতে হবে স্বাভাবিক ত্রুটি-বিচ্যুতি বাদ দিলেও বইখানি সাহিত্য-পদবাচ্য অথবা কেবল সময়োপযোগী ঘটনাবলীতেই পরিপূর্ণ।

যে পটখানির উপর গ্লাডকভ তাঁর শিল্প কৌশল প্রয়োগ করেছেন সেখানি একটু বড়। ফলে রুষ দেশের শ্রমিক-দল, তাদের প্রতিনিধির দল, শাসনকর্তার দল প্রভৃতি একরাশ লোক তাদের ছয় সাত বছরের বিদ্রোহ-ক্ষুব্ধ ইতিহাস নিয়ে আমাদের চোখের সামনে এসে পড়েছে। অনেক জায়গায় একটু কেমন বিসদৃশ ঠেকে, মনে হয় এত বড় দৃশ্যপটের উপর ছবিটা না আঁকলেও চলত, গুটী কয়েক চরিত্র নিয়ে রস আরও ঘনীভূত করলে ভাল হ'ত। কিন্তু এতে তাঁর উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলির অঙ্কনে কোনও দোষ হয় নি। তারা আমাদেরই মত, সুখ দুঃখ, রক্ত মাংসের জীব। ছবি গুলি প্রাণবন্ত, কারণ গ্লাডকভ যা এঁকেছেন তাতে কোনও সঙ্কোচ বা ভয় নেই। উপন্যাসে সত্যিকার কবিত্বের স্পর্শ আছে, বিশেষ করে, যেখানে সার্জ্জি সারা বিশ্বের চিন্তাভারে আচ্ছন্ন হয়ে রুদ্ধ ঘরে একাকী পাইচারী কর্চ্ছে, কিংবা যেখানে জ্যোৎস্না-রজনীতে গ্লেবের মাথাটী সযত্নে কোলে নিয়ে ড্যাসা তার স্বামি-নির্ব্বাসনের পর থেকে আপন জীবন-কাহিনী ধীরে ধীরে আবৃত্তি করে যাচ্ছে। নার্কার মৃত্যু-শয্যায় ড্যাসার আকুল মর্ম্ম-বিলাপে, গ্লাডকভ করুণ-রসের অবতারণায় কিরূপ সিদ্ধহস্ত তা প্রমাণ করেছেন।

এই জায়গায় দু একটা তুলনামূলক বই বা গ্রন্থকারের উল্লেখ করলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

যাঁরা Sologub এর 'The Created Legend' বইখানি পড়েছেন তাঁরা দেখবেন যে Cement বইখানির সঙ্গে তার কিছু মিল আছে। সেখানেও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজনৈতিক জীবনে রুষে যে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল তারি আভাস আছে। কিন্তু সে বই খানিতে আদর্শবাদের কথাই বেশী, প্রকৃতির কোলে বিদ্যালয় স্থাপন, রাষ্ট্রীয় সংস্কার প্রভৃতি আইডিয়াগুলি বেশ ভাল ভাবেই ব্যক্ত করা হয়েছে। Elisaveta, Elena, Trividrov প্রভৃতি নায়ক-নায়িকার সঙ্গে অনেক জায়গাতেই 'সিমেন্ট' বইখানির নায়ক-নায়িকার মিল আছে। তবে দুখানি বইএর ধারা বিভিন্ন। আগেকার বই খানিতে আদর্শের ছোঁয়াচ বেশী, শেষেরটীতে বাস্তবতার চিত্রই বেশী। উদাহরণ একটা দেওয়া যেতে পারে। গ্লেবের নিকট পোলিয়ার প্রেম-নিবেদন দৈহিক উত্তেজনার মধ্য দিয়ে, কিন্তু Created Legend এ Akulina, Trividrovএর প্রেম-ভিক্ষা করবার সময় নারীসুলভ প্রগল্‌ভতার সহিত প্রশ্ন করছে, যে তার দেহের ও রূপের আকর্ষণ এখনও আছে কি না! Trividrov ধীর ও সংযত; কিন্তু উত্তর দিয়েছিল কাব্যময়ী ভাষায়—Your beauty is like the snowclad peak caught in the crimson light of the setting sun, like pure white milk poured into a pink crystal vase; like the mortal heart suffused with rose desire.

তফাৎ এই খানেই—বল্‌বার ভঙ্গীতে।

গ্লাডকভের লেখার উপর গোর্কির প্রভাবের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। গোর্কির লেখাতে যেমন দুঃখ, কষ্ট ও পাপের ভয়াবহ বর্ণনা আছে, গ্লাডকভের বইএতেও কতক পরিমাণে আমরা সে চিত্র পাই, যদিও তাঁর লেখাতে গোর্কির মত পাকা হাতের পরিচয় পাই না। তবে কতগুলি Types এর সৃষ্টি গ্লাডকভ অতি নিপুণ ভাবেই করেছেন। গোর্কির Three of them, The man who was afraid, বই গুলিতে Olimpiada, Tania, Vera, Paul, Ilia, Foma, Masha প্রভৃতি যে চরিত্রগুলি আছে, অনেক স্থলে গ্লাডকভের চরিত্র গুলির সঙ্গে তাদের আশ্চর্য্য রকমের সৌসাদৃশ্য আছে। গোর্কির মত পাকা লেখক না হলেও, গ্লাডকভ অনেক বিষয়ে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তফাৎ এই যে গোর্কি রুষের দরিদ্র কৃষক-জীবন নিয়েই বেশী লিখেছেন, গ্লাডকভ জাতীয়-জীবনের স্পন্দন স্পষ্ট করে শুনেছেন, তাই তাঁর শক্তিশালী কলম সেই দিকেই গেছে।

গ্লাডকভের বইএর মধ্যে বিশেষ রকমের আন্তরিকতার সুর পেয়েছি, কারণ বোধ হয় তাতে তাঁর অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে। কোনও কোনও পাতা তাঁর জীবন-কাহিনীর প্রতিলিপি বলেই মনে হয়। এই কৃত্রিমতার অভাবই তাঁর চিত্র গুলিকে বাস্তবতায় সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছে।

এই কারণেই আশা করি যে আধুনিক সাহিত্যিকগণ, যাঁরা পড়েন নি, তাঁরা মনোযোগ দিয়ে বইখানি দেখবেন।

"ললিতা-পাঠাগার"

(গল্প)

[শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস]

গোলগাল নোনা আতাটির মত দেখিতে হইলে কি হইবে, লোকটার ভিতরে কাব্য ছিল; গোপাল দা' বলিতেন, চম্পূকাব্য। এই কথাটি বলিয়াই গোপাল দা' তাঁহার সেই বহু ব্যবহৃত গল্পটির পুনরাবৃত্তি করিতেন। 'শুনিয়াছি' বলিবার যো ছিল না। একটু অন্যমনস্ক হইলেই তিনি একেবারে হাঁড়িপানা মুখ করিয়া সাত দিনের বাসি খবরের কাগজ লইয়া বসিতেন, কোনো দিকে দৃকপাত করিতেন না; দেখিতে সে অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং অস্বস্তিকর হইত। গোপাল দা' বলিতেন, চম্পূ-কাব্য কি রকম বুঝ্‌লে? তবে শোন, অধর বক্সীর মোটরে চেপে আমি আর নেত্য এক দিন গড়ের মাঠে গেছি হাওয়া খেতে, রাত বারোটার পরে। অসহ্য গরম। গঙ্গার ধারে এক চক্কর দিয়ে এসে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সাম্‌নের পথটায় মোটর থামিয়ে সিগারেট ফুঁক্‌তে ফুঁক্‌তে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ কর্‌ছি, দেখি তিন ব্যাটা নেপালী সাইকেলে চেপে কার্জ্জনের ষ্ট্যাচুর চার দিকে পাক খাচ্ছে আর হো হো হিহি ক'রে হাসছে। ব্যাটাদের ওই হ'ল রসিকতা! দেখতে দেখতে বিরক্তি ধ'রে গেল, অধরকে বল্লুম, চল ভায়া, এদের মৎলব ভাল না। অধর ঠোঁটের এক পাশ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বল্লে, ধীরে গোপাল দা' ধীরে। দেখবার বস্তুর অভাব কি?

বাহাদুরী আছে ছোক্‌রার! বল্‌তে না বল্‌তে একটা মোটরকার হুস্‌ ক'রে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। হ্যাঁ, সুখে আছে সাদা চামড়ার ওই লোকগুলো! ফূর্ত্তি তো কর্‌ছে ওরাই! আর কর্‌বেই বা না কেন? বলুর ব্যাটা গাইবে, না তো কি বলদে গান গাইবে? ওদেরই এক জন চলেছে কোলে কাঁখে তিনটে স্বজাতীয়া অপ্সরীকে নিয়ে হারা-রারা কর্‌তে কর্‌তে। ড্রাইভার বেচারার প্রাণ-সংশয়। আর বল্‌ব কি ভাই, আমারই ঘুনধরা মনটা চাঙ্গা হ'য়ে উঠল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উড়তি মোটরটার পেছনের লাল আলোর দিকে চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। গিন্নীকে মনে পড়ল। অধরকে ফির্‌তে বল্‌ব ভাবছি, দেখি আর দুটো মোটর পাশাপাশি প্রায় পাল্লা দিয়ে ছুটেছে। সাম্‌নেরটাতে কোনো সাহেবের খানসামা আর আয়া হবে। মনিবের অনুপস্থিতিতে ড্রাইভারের সঙ্গে চাঁদা করে একটু ফূর্ত্তি লুটছে, আর পেছনটাতে এক টেকো সাহেব একটি মোমের মত মেমের অঙ্গে হেলান দিয়ে চলেছে—ব্যাটার মাথায় এক গাছি চুল নেই। অধর ব'লে উঠল, দেখেছ গোপালদা' ডিমের মতন মাথাটি হ'লে কি হবে, ওর প্রাণের ভেতরটায় টেরী-কাটা। আমাদের দক্ষিণারও তাই, বাইরেটা টাক টাক মত ঠেক্‌লেও ওর প্রাণের ভেতর টেরী ছিল।

এই প্রাণের ভিতর টেরীর গল্প শুনিতে শুনিতে আমাদের মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। তবু দক্ষিণাচরণ সম্বন্ধে এমন লাগসই বর্ণনা আর হয় না! বাইরেটা টাক নয় তো কি? নাম, শ্রীদক্ষিণাচরণ হাজরা; ধাম কলিকাতা, চাঁপাতলা; পেশা, দালালি—পাট আর ঝোলা গুড়ের। বয়স সাড়ে উনচল্লিশ, বিপত্নীক।

বেশ ছিল বেচারা। সকালে উঠিয়াই রাত্রের বাসি লুচি আর গুড়ের সঙ্গে কলাই করা বাটিতে এক কাপ চা খাইয়া বাহির হইয়া নারকেলডাঙ্গা ব্রিজ হইতে আরম্ভ করিয়া বাগবাজার পর্য্যন্ত সমস্ত খালধারটা একবার টহল দিয়া ফিরিত। কোনো নৌকায় গুড়, কোনো নৌকায় পাট—দক্ষিণা নমুনা আর দর যাচাই করিত। সে ছিল দক্ষিণার উত্তুরে হাওয়ার দিক্।

তার পর হঠাৎ এক দিন জানিতে পারি, দক্ষিণার প্রাণে দখিণা হাওয়াও বহিয়া থাকে। আমরা কয়জন তখন সবে কলেজ ছাড়িয়া পাড়ার উন্নতিকল্পে একটি লাইব্রেরী ও রীতিমত সাহিত্য-চর্চ্চার জন্য একটি ক্লাব

ঘর প্রতিষ্ঠা করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। চাঁদা নেহাৎ মন্দ উঠিতেছিল না। বাড়ীর মেয়েরা নিয়মিত উপন্যাস পড়িতে পাইবার লোভে বাজারের পয়সা চুরী করিয়া চাঁদা পাঠাইতে লাগিলেন। আমরা রীতিমত মাতিয়া উঠিলাম।

পাটের দালালের কাছে যাইতে আমাদের বাসনা ছিল না। দালাল জাতটার উপর সন্ত কলেজ-ফেরতা আমাদের কিঞ্চিৎ ঘৃণা ছিল। তবু নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে গেলাম। ভাবিয়াছিলাম, দেখিব, দালাল দক্ষিণাচরণ আট হাতী ধুতি পরিয়া খোলা বুকে থেলো হুঁকোয় তামাক খাইতেছে, লাইব্রেরীর কথা পাড়িলেই বলিবে, কি হবে ছাই ওসব ক'রে? দেখছেন তো আমাকে? নিশ্বেস ফেলবার সাবকাশ নেই—তার চাইতে বরং গণেশ অধিকারীর—

অবাক্ হইয়া গেলাম। একেবারে অপ্রত্যাশিত ব্যাপার! দক্ষিণাচরণ দক্ষিণের জানালার সামনের টেবিলে টেবিল-ল্যাম্প জ্বালাইয়া রবীন্দ্রনাথের টাদি এডিশন কাব্য-গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেছে। ঘরটায় আলমারী পাঁচেক বই—ইংরাজী বাংলা। টেবিলের উপর পাটের চিহ্ন নাই—ঘরের কোণে ঝোলা-গুড়ের হাঁড়িও দেখিতে পাইলাম না।

প্রস্তাব শুনিয়া দক্ষিণাচরণ মহা খুসী। বলিল, এই তো চাই! মানুষের প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাই তো এখন করতে হবে! তা আমি আর কি করতে পারি? এই ঘরখানা আর এই বইগুলো ছেড়ে দিচ্ছি, এখেনেই লাইব্রেরী আর ক্লাব-ঘর—

আমরা স্তম্ভিত হইলাম, মনে মনে লজ্জাও কম হইল না। বলিলাম,—এতটা—

—এত আর কি ভায়া? গিন্নী যাওয়া ইস্তক বইগুলো আর নাড়তে চাড়তেও পারি না। তিনিই এসব দেখা শোনা করতেন কি না! পড়া-শোনার ভারী সখ ছিল তাঁর। তাঁর নামেই—আর একটা ছেলে পিলেও তো নেই যে তার জন্যে—

শেষে তাহাই স্থির হইল। দক্ষিণাদা'র স্বর্গগত পত্নীর নামানুযায়ী লাইব্রেরীর নাম হইল, "ইন্দুমতী-পাঠাগার।" ক্লাবের নাম "দক্ষিণাচরণ-ক্লাব।"

ক্রমশঃ পাটের দালালের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইলে বুঝিলাম, পাট আর ঝোলা গুড় তাহার জীবনের অতি অল্প স্থানই অধিকার করিয়া আছে। দক্ষিণাচরণ কবিতা লিখিত। তার সব চাইতে বড় দুর্ব্বলতা ছিল, আধুনিক ফ্যাশান-দুরস্ত স্কুল কলেজের মেয়ে। সাড়ে নটা দশটার সময় স্কুলের গাড়ী দেখিতে সে প্রত্যহ খালধার হইতে সার্কুলার রোড পর্য্যন্ত একবার হাজিরা দিত।

এই দুর্ব্বলতাটুকুর জন্য আমরা তাহাকে নানাভাবে উত্যক্ত করিতাম। এক দিন ফোরেলের 'সেক্সুয়াল কোশ্চেন' খানা তাহার সামনে ধরিয়া বলিলাম, দেখেছ দাদা' কি লিখেছে?—'সাধারণতঃ ১৮।২০ বছরের মেয়েরা প্রৌঢ় লোকেদের প্রতিই বেশী আকর্ষণ অনুভব করে, সমবয়সী যুবকদের প্রতি নয়।'—ললিতাও তা'হলে—

দক্ষিণাদা' একগাল হাসিয়া বলিল, যাঃ, ও এদেশের মেয়েদের কথা নয়।

ললিতা আমাদের পাড়ার লেডী ডাক্তার মিসেস সরকারের মেয়ে, বেথুনে ফার্ষ্ট আর্টস পড়ে। লেডী ডাক্তার আমাদের লাইব্রেরীর মেম্বর হইয়াছিলেন। দক্ষিণাচরণ প্রত্যহ সন্ধ্যায় একবার করিয়া খোঁজ লইত, সে দিন মিসেস সরকারের বাড়ীতে কোনও বই গিয়াছে কি না! এইরূপ প্রশ্ন করিবার কারণ এই যে, যদি তাহার দেওয়া কোনো বই সে-বাড়ীতে গিয়া থাকে তাহা হইলে ললিতা অন্ততঃ তাহার নামটাও একবার দেখিতে পাইবে!—

দক্ষিণাদা'কে সব চাইতে নাকাল করিতেন গোপালদা'। এক দিন তাহার সহিত দেখা হইতেই গোপালদা' বলিলেন, কি হে ভায়া, বিশ্বভারতীর মেম্বর হ'লে? ললিতার যে এখন বিশ্বভারত-বাই হয়েছে?

দক্ষিণাচরণ প্রথমটা চটিয়া উঠিলেও পরে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, তাই না কি? পরদিনই বিশ্বভারতীর এক জন মেম্বর বাড়িল।

যৌবনে সে একবার কখন কবিতাদেবীর আরাধনা করিয়াছিল। পুরাতন খাতাগুলিই আবার টানিয়া বাহির করিল, নিজের লেখা পড়িতে নেহাৎ মন্দ লাগিল না। তিন অক্ষরে যতগুলি প্রেয়সীর নাম ছিল সব কাটিয়া দিয়া মজায় রাখিয়া 'ললিতা' করা হইল। পুরাতন ছেঁড়া খাতার

বদলে নূতন বাঁধানো খাতায় ঝোলাগুড়ের দালাল দক্ষিণা-চরণ প্রেমের কবিতা লিখিতে লাগিল।

বোম্বাইয়ে মাল পাঠাইবা রেল রসীদের উল্টা পিঠেই এক দিন সে লিখিয়া ফেলিল—প্রথম লাইনটা রবীন্দ্রনাথ হইতে চুরী—তা হোক্—

চোখে চোখে দেখা হ'ল পথ চলিতে,
ওগো ললিতে!
সন্ধ্যা না দ্বিপহর পড়ে না মনে,
লোকের ভিড়ে? না, না, নিরজনে—
গড়ের মাঠে? বুঝি রেল্ ষ্টেশনে;
ষ্ট্রীট রোড, এভিনিউ, কোন্ গলিতে?
ওগো ললিতে!
সেই হ'তে আছ মোরে পায়ে দলিতে,
ওগো ললিতে,
'বাস' আসে 'বাস' যায় চমক হেনে,
তুমি কি জানিবে পাশে পান কে কেনে?
সবাই পথিক সখি, কে কারে চেনে?
তুমি শুধু পথ চল, মোরে ছলিতে—
ওগো ললিতে।

বাবুকে রসীদ হাতে গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতে দেখিয়া রেলের কুলী অবাক্!

সন্ধ্যায় ক্লাবে দক্ষিণা দা' আমাকে গোপনে ডাকিয়া বলিল, দেখ হে, একটা কবিতা লিখেছি। তুমি তো আবার বড় সাহিত্যিক!

বলিলাম, চমৎকার হয়েছে দক্ষিণা দা'! আমার হিংসে হচ্ছে।

—ছাই! আর আমড়াগাছি করতে হবে না, ভাই। সত্যি, মেয়েটা বুড়ো বয়সে—

—বালাই। বুড়ো? ছ্যাঃ। কবিতাটা আমাকে দাও, ললিতার হাতে পৌছে দেবার ভার আমার।

বলিয়াই রসীদখানায় টান মারিলাম।

—আরে আরে, কর কি? কেলেঙ্কারী হবে, মুখ দেখাবার পথ থাকবে না।

কিন্তু কে কথা শোনে! তখন আরো পাঁচ জনে আসিয়া জুটিয়াছে। গোটা পাচেক নকল সঙ্গে সঙ্গে করিয়া লওয়া হইল। রসীদখানা ভিঃ পিঃ করিয়া বোম্বাই পাঠাইতে হইবে বলিয়া ললিতার জন্য আসল পাণ্ডুলিপি রাখা হইল না।

ললিতার কাছে পৌছাইয়া দিব তো বলিলাম, কিন্তু কি উপায়ে? মেয়ের সম্বন্ধে মিসেস সরকার একবারে বাঘ। তিনি নিজে চিরকাল ভদ্র জীবন যাপন করিয়াছেন। আমাদের জ্ঞান হওয়া অবধি আমরা উঁহাকে পাড়ার এক-জন বিশিষ্ট ভদ্র মহিলা বলিয়াই জানি। কাহারো সহিত তাঁহার হৃদ্যতার অভাব নাই। বিপদে আপদে সকলকেই সাহায্য করিয়া থাকেন।

শেষে এক উপায় ঠাওর'ইলাম। যতীন ভাল গাহিতে পারিত। সে নিজেই সুর দিয়া গানটা প্র্যাক্‌টিস্ করিল। এবং হঠাৎ এক দিন ক্লাবে রৈ রৈ পড়িয়া গেল। দক্ষিণাদার গান! আগেই দেখিয়া লইয়াছিলাম, মিসেস সরকার বাড়ী আছেন কি না। তিনি 'কলে' বাহিরে গিয়াছেন।

ক্লাব ঘর হইতে ললিতাদের বাড়ী বেশী দূরে নয়। ক্লাবে হঠাৎ গান শুনিয়া সে জানালায় পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দক্ষিণা দাদাও ঠিক এই সময়ে ক্লাবে হাজির হইল। ইঙ্গিতে তাহাকে ললিতার ঘরটা দেখাই-লাম। দাদা একেবারে জিভ্ কাটিয়া ছুটিয়া গিয়া যতীনের মুখ চাপিয়া ধরিল। তখন দু লাইন গাওয়া হইয়াছে।

ললিতার মূর্ত্তি জানালা হইতে সরিয়া গেল।

দক্ষিণা দাদার এই দুর্ব্বলতা টুকুর সুবিধা লইয়া আমরা দাদাকে দিয়া নিত্য নূতন বই কিনাইতে লাগি-লাম। বইয়ের দরকার হইলেই বলিতাম, দাদা, মিসেস সরকার বলছিলেন, ক্লাবের বইতো সব প্রায় পড়া হ'য়ে গেল। নতুন ভালো বই আপনারা তো কিছু আনান না। তাই ভাবছি 'চন্দন'-লাইব্রেরীর মেম্বর হব।

দাদা বলিত, সে কি কথা! নতুন কি কি বই বেরিয়েছে তার একটা লিষ্টি কর। এ যে ইন্দুমতীর অপমান!

দক্ষিণাদা'র আর কিছু না থাক, পয়সা ছিল। এখন ললিতার মহিমায় দিল্ বাড়িয়াছে। ক্লাবের পুস্তক-সংখ্যা বাড়িতে লাগিল।

দক্ষিণাদাকে এক দিন বলিলাম, দেখ, দক্ষিণাদা, এক কাজ কর। নতুন বই গুলোর উপহার পৃষ্ঠায় একটা করে কবিতা লিখে দাও। পষ্ট ক'রে লেখবার দরকার নাই,

উদ্দেশে লেখ। তা'হলেই কাজ হবে। ও বাড়ীতে যত বই যায় তার পাঠক তো ললিতা। মিসেস সরকারের সময়ই নেই—

—কিন্তু, ধরা পড়লে—

—ধরবে কে? ললিতা যদি বুঝতেও পারে তা'হলে সে কি—

—আচ্ছা, দিও বই গুলো ওপরে পাঠিয়ে।

সচিত্র ওমরখায়েমের উপহার-পৃষ্ঠায় দক্ষিণাদা সম্বন্ধে লিখিলেন:—

ললিত মধুর রুবাই যাহার, কোথা সে আজি,
লিপি কে পাঠাল, ভবিষ্যতের কবিরে স্মরি?
তাহার স্মরণে চিত্ত আমার উঠিল বাজি,
লহ এ অর্ঘ্য দূর হ'তে তোমা বরণ করি।
লিখন তোমার অক্ষয় হ'ল কালের বুকে,
তাহারই পরশ লাগিল আমার লেখনী-মুখে।

দক্ষিণাচরণ

'বুল বুলে'র উপহার-পৃষ্ঠায় লিখিত হইল—

তোমারে দেখবে ব'লে আকাশ-কোলে মেঘের ভীড় এ,
ছুঁতে ও আঁচলখানি কাণাকাণি ধীর সমীরে।
বনের ও মাথায় মাথায় হাত ইসারায় তোমায় ডাকে,
তটিনী কলস্বনে তোমায় টানে চরের বাঁকে।
আজি এ তিমির রাতি পেলে সাথী নদীনীরে
ডুবিয়া মরব সুখে আমার বুকে মেঘের ভীড় এ।

—অভাগা দক্ষিণা

এই ভাবে নূতন বইয়ের প্রায় সব গুলিতেই কয়েক ছত্র করিয়া লেখা যোগ করা হইল।

আসলে মিসেস সরকার কালে ভদ্রে এক আধখানা বই লইতেন। মেয়ের মনে হাল্কা উপন্যাসের ছোঁয়াচ লাগিতে দিতে তিনি রাজী ছিলেন না। নেহাৎ আমাদের উপরোধে পড়িয়াই তিনি মেম্বরশিপ বজায় রাখিয়াছিলেন।

মিসেস সরকারের এক ভাগনে বসন্ত তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়াই 'ল' পড়িত। সে আমাদের ক্লাবের এক জন সভ্য হইল। অল্প দিনেই দক্ষিণাদার দুর্ব্বলতার খবর সে পাইল। সেও আমাদের সহিত যোগ দিয়া দক্ষিণাদা'কে [illegible] আমাদের মহা সুবিধা হইল।

বসন্ত হঠাৎ এক দিন দক্ষিণাদা'কে ধরিয়া বলিল, দক্ষিণাদা', আপনার উপহার-পৃষ্ঠার কবিতাগুলো ললিতা সব পড়েছে, বলে, চমৎকার লেখেন। আপনার সঙ্গে এক দিন আলাপ করতে চায়।

দক্ষিণাদা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলেন, না না, ভাই, সে আমি পারব না। ও গুলো কি আবার কবিতা! হাঁ, কবিতা লিখেছিলাম, যখন যৌবন ছিল—

আমরা তারস্বরে বলিয়া উঠিলাম, ছিল কি দক্ষিণাদা'? তোমার সম্বন্ধেই তো রবিবাবু লিখেছেন—

আমাদের পাক্‌বে না চুল গো,
আমাদের পাক্‌বে না চুল!

যতীন অমনি গান ধরিয়া দেয়।

দক্ষিণাদা' বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলে, তোরা থাম্, বাপু। হাঁ হে বসন্ত, ললিতা আর কি বল্‌লেন?

বসন্ত একটু লজ্জার ভাণ করিয়া বলিল, সে সব কথা কি আমার বলা শোভা পায়, দক্ষিণাদা। সে হল, আমার বোন। হাঁ, আপনার যৌবনের কবিতার কথা কি বলছিলেন?—

দুই একটা কবিতা তখন সত্যিই লিখেছিলুম ভায়া।

সকলেই আবার ধরিলাম, পড়ুন না, দক্ষিণাদা'!

দক্ষিণাদা' যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় আলমারী খুলিয়া একটা খাতা বাহির করিল এবং মাদুরের কাঠি মার্কা দেওয়া একটা পাতা খুলিয়া বলিল, কত স্মৃতিই না এই কবিতার সঙ্গে জড়িত আছে ভাই! ইন্দুমতী এই কবিতাটি বড্ড পছন্দ করতেন।

—তবে তো শুনতেই হবে, পড়ুন দক্ষিণাদা'।

দক্ষিণাদা' চশমাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া খুব ধীরে ধীরে পড়িতে লাগিল—

বাসন্তী পূর্ণিমা নিশি, জ্যোছনা-জোয়ারে
ভাসিতেছে ত্রিভুবন, বনের আঁধারে
কাঁদিল সহসা হিয়া কোকিল-বঁধুর।
সে ক্রন্দন ভেসে গেল দূর হইতে দূর,
অনন্ত আকাশ পানে, শুনিল শ্রবণে
বিরহ-বিধুরা বালা কুটীর-প্রাঙ্গণে;
সহসা খসিল তার ঘোমটা মাথার,
থমকি চমকি, শূন্যে চাহে বারবার

কে ডাকিল তারে? ভাবে বালা ভ্রান্ত মন!
কাঁকন বাজিল বৃথা খসিল গুণ্ঠন!
মিছা আজ জ্যোৎস্না ধারা—

বসন্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, দক্ষিণাদা', দিন দিন, কবিতাটা ললিতাকে শুনিয়ে আসি।

দক্ষিণাদা' বলিলেন সবটা শোন, তারপর—

সে হবে না। একেবারে টাটকা—

বাধ্য হইয়া দক্ষিণাদা' খাতাখানি দিলেন। সেদিন ক্লাবের সভ্যদের বাড়ী ফিরিয়া আর খাইতে হইল না।

পর দিন বসন্ত আসিয়া বলিল, দক্ষিণাদা', কাজটা ভাল করেন নাই। মাসীমা ভারী চটেছেন!

দক্ষিণাদা', এতটুকু হইয়া বলিলেন, ব্যাপার কি ভায়া?

—আর ব্যাপার কি! ওমরখায়েমের উপহার-পৃষ্ঠায় কি কবিতা লিখেছেন, মাসীমা বুঝতে পেরেছেন।

দক্ষিণাদা' প্রমাদ গণিলেন।—কই তেমন কিছু তো—

—প্রথম অক্ষর গুলো প'ড়ে গেলে নাকি 'ললিতা ললিতা' এই দুটো কথা হয়?

আমরা সকলেই কবিতাটা দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহার ভিতর যে দাদা নিজের কেরামতি এতটা ফলাইয়াছে, তাহা জানিতাম না, বসন্তকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা সত্য কি না। বসন্ত বলিল, খানিকটা সত্য। মাসীমা দেখেন নাই বটে, কিন্তু ললিতা দেখিয়াছে।

—সর্ব্বনাশ!

বসন্ত বলিল এতে মাসীমা ললিতা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাকেও অপমান করা হইয়াছে। মাসীমা লাইব্রেরীর মেম্বর তো থাকিবেনই না। অন্য কি ব্যবস্থা করা যায় তাহাও ভাবিতেছেন।

দক্ষিণাদা কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, এই যত সব ছোক্‌রাদের পাল্লায় পড়ে বুড়োবয়সে—

যতীন বলিল, বুড়োবয়স কি, দক্ষিণাদা!

দক্ষিণাদা' হতাশার স্বরে বলিলেন, থাম্ বাপু, আর ইয়ার্কি ভাল্ লাগে না। ছি ছি ছি! কি কেলেঙ্কারীটাই হ'ল? আমি কালই এ বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে অন্য পাড়ায় যাব।

আমি বলিলাম, কিন্তু আমাদের ক্লাব, লাইব্রেরী?

—চুলোয় যাক্। আপনি বাঁচলে—

—কিন্তু দক্ষিণাদা বৌদির স্মৃতি—

দক্ষিণাদার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল।—দুত্তোর স্মৃতি, বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

আসলে ব্যাপারটা এতদূর গড়ায় নাই। কবিতা দেখিয়া ললিতা নিরীহ পাগল দক্ষিণাচরণের দুরবস্থার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইল। তা ছাড়া, এই পাড়ায় জন্মাবধি বাস করিয়া দক্ষিণাচরণ সম্বন্ধে অনেক খবরই সে জানিত। ঝিয়েরা বলিত, মাটির মানুষ! গিন্নী যাওয়া ইস্তক উঁচু নজরে কারো দিকে চায় না পর্য্যন্ত। সেই দক্ষিণাচরণকে যে পাড়ার বখাটে ছোক্‌রারা মিলিয়া এভাবে নাচাইতেছে, ইহা ভাবিয়া ললিতার অনুকম্পা হইল। বেচারা!

বসন্ত এক দিন আমাদের পরামর্শে ললিতাকে বলিল, একটা মজা কর্‌বি, ললি?

মজাটা যে দক্ষিণাচরণকে লইয়া ললিতা চট করিয়া বুঝিতে পারিয়া বলিল, কি মজা?

এক দিন দক্ষিণাদার সঙ্গে দেখা কর্‌বি? কিন্তু মাসীমাকে না জানিয়ে।

বসন্ত মাসীমাকে যমের মত ভয় করিত।

অনেক বোঝাপড়ার পর ললিতা রাজি হইল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে দক্ষিণাচরণের জন্য তাহার কষ্ট হইতেছিল। সে বসন্তকে বলিয়া রাখিল, যে দক্ষিণাবাবুকে বেশী নাকাল করার চেষ্টা হইলে সে সমস্তটা ফাঁস করিয়া দিবে।

এদিকে দক্ষিণাদাকে তাহার কৃতকার্য্যের জন্য ললিতার কাছে ক্ষমা চাহিতে প্রস্তুত হইতে বলা হইল। দক্ষিণাদা নিতান্ত মনোদুঃখে প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন করিতে লাগিল।

মিসেস সরকার এক দিন দূরের ডাকে বাহিরে গেলে বসন্ত যেন চুপি চুপি আসিয়া দক্ষিণাদাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। যে ঘরে দক্ষিণাদার সহিত ললিতার সাক্ষাৎ হইবে, তাহারই পাশের ঘরে আমরা ক্লাবের দশ-পনের জন পূর্ব্ব হইতেই জমায়েৎ হইয়াছিলাম। ললিতা তাহা জানিত না।

দক্ষিণাদা একটা চেয়ারে বসিয়া অধোবদনে রহিল, মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিবার মত সাহস তাহার ছিল না। ললিতা তাহার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল, তবু দক্ষিণাদা চুপ। বসন্ত হাঁকিল, দক্ষিণাদা, ললিতা—

দক্ষিণাদা শশব্যস্তে চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল। ললিতা শান্তকণ্ঠে বলিল, ব্যস্ত হবেন না, আপনি বসুন।

দক্ষিণাদা মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বসিয়া পড়িয়া ভাঙা গলায় বলিল, দেখুন, পাগলামীর খেয়ালে একটা বড় অন্যায় ক'রে ফেলেছি। আমার জ্ঞান ছিল না।

ললিতা বলিল, না, না, কিছু অন্যায় করেন নি আপনি।

বসন্ত হাসি চাপিতে না পারিয়া বাহির হইয়া গেল। দুই ঘরের মাঝখানে দরজাটা একটু ফাঁক হইল।

দক্ষিণাদা হাত দুইটি জোড় করিয়া আর একবার বলিল, আমি পাগল হয়েছিলাম—

দরজাটা দড়াম করিয়া খুলিয়া গেল। দক্ষিণাদা ও ললিতা দুজনেই চমকিয়া উঠিল। ললিতা শুধু গম্ভীর ভাবে আমাদের দিকে চাহিল, তাহার চোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছিল। সে হঠাৎ দৃঢ়পদে দক্ষিণাদার কাছে গিয়া তাহার হাত দুটি ধরিয়া বলিল, পাগল আপনি হন নি। ভুল করেছেন বটে কিন্তু সে ভুল আমি শোধরাব। আপনি বাড়ী যান।

দক্ষিণাদা কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। আমরাও কম অবাক্ হই নাই। বসন্ত হতাশ হইয়া বলিয়া উঠিল, সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, নলিকে আমি চিনি। দক্ষিণাদাই শেষে জিতলে।

মায়ের আপত্তি টিকিল না, তাঁহার চোখের জল নিষ্ফল হইল। ললিতা নাছোড়বান্দা। দক্ষিণাদা' যেন হাতে স্বর্গ পাইল। ললিতার ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুভদিনে শুভক্ষণে দক্ষিণাদা'র সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল। সে দিন ভরপেট খাইলাম।

রসিকতা করিতে গিয়া কিন্তু আমরা প্যাঁচে পড়িলাম। ললিতা বিবাহের দিন কয়েক পরেই দক্ষিণাদা'র শূন্য সংসারে জমজমাট হইয়া বসিল। ভোজপুরী ভঙ্গীতে আমাদিগকে প্রথমেই নিকালো বলিল না বটে, কিন্তু ভাবটা যাহা প্রকাশ পাইতে লাগিল তাহাতে অবিলম্বে ক্লাব অচল হইবে মনে হইল।

দক্ষিণাদা' নিয়মিত পাট আর ঝোলাগুড়ের দর যাচাই করিয়া ফিরিতে লাগিল, কিন্তু পূর্ব্বকার মত সন্ধ্যায় ক্লাবে আসিবার সময় করিয়া উঠিতে পারিল না। কবিতা লেখা বন্ধ করিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু নূতন বই কেনা হইত না বলিয়া উপহার-পৃষ্ঠার কবিতা আর দেখা গেল না। দক্ষিণাদা' আমাদিগকে একেবারে ছিন্ন কাঁথার মত পরিত্যাগ করিল।

লাইব্রেরীর অবস্থা কাহিল, ক্লাব চুলায় যাক্। দাদাকে এক দিন বলিলাম, তাঁহার প্রথমা পত্নীর স্মৃতি এভাবে—

অন্তরাল হইতে ললিতা শুনিয়া থাকিবে। পর দিনই সে হুকুম দিল, ক্লাব ও লাইব্রেরী অবিলম্বে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। বসন্তের ওকালতীতে কাজ হইল না। কেন বলিতে পারি না, ইন্দুমতীর উপর ললিতার ভয়ানক রাগ ছিল, সম্ভবতঃ আমাদের জন্যই।

"ইন্দুমতী-পাঠাগারের" অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইতে লাগিল, কিন্তু পরম্পরায় খবর পাইলাম, দক্ষিণাদা'র বই কেনা বন্ধ হয় নাই। ললিতা পড়িতে ভালবাসিত। মায়ের বাঁধাবাঁধিতে যে ইচ্ছা পূর্ণতা লাভ করে নাই প্রৌঢ় স্বামীর দৌলতে তাহা ভাল করিয়াই পূর্ণ হইতে লাগিল। "ইন্দুমতী-পাঠাগার" উঠিয়া যায় যায় হইল। দক্ষিণাদা'র বাড়ীতে "ইন্দুমতী-পাঠাগারের" একখানিও বই যাইবার উপায় ছিল না।

শেষে আমরা এক দিন বিশেষ বৈঠক ডাকিয়া স্থির করিলাম, লাইব্রেরী বজায় রাখিতে হইলে ললিতাকে বশে আনিতেই হইবে, নূতন বই না হইলে মেম্বর থাকে না, চাঁদার টাকা এত সামান্য যে তাহা দিয়া বই কিনিয়া পাঠিকাদের পড়ার ক্ষুধা মেটান বা পেট ভরান যায় না। সুতরাং দক্ষিণাদা'র দালালীর টাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু সিন্দুকের চাবি এখন ললিতার হাতে। অনেক বাগ্-বিতণ্ডার পর স্থির হইল যে ললিতার এই বিরাগের মূলে সপত্নী-বিদ্বেষ। সে সপত্নীকে দেখে নাই বটে, কিন্তু আমরাই যেন সেই মৃতার স্মৃতি বজায় রাখিয়া চলিয়া-ছিলাম। আমরা ইন্দুমতীর নাম খারিজ করিয়া সে স্থলে ললিতার নাম প্রচার করিতে সুরু করিলাম, লাইব্রেরীর চিঠির কাগজ, বই 'ইস্যু'র টিকিট, খাতা পত্র সর্ব্বত্রই ইন্দুমতীর নাম কাটিয়া ললিতার নাম লেখা হইল, এবং একদা দক্ষিণাদা'কে সস্ত্রীক 'ললিতা-পাঠাগার' পরিদর্শনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলাম।

ঔষধ ঠিক ধরিল। শাশুড়ী-স্ত্রী সমভিব্যাহারে দক্ষিণাদা' হাজির হইলেন। তাহার শরীরের সেই

চোয়াড়ে ভাব আর নাই, অনেকখানি চিক্কণ হইয়াছে। আমরা সসম্ভ্রমে সকলকে অভিবাদন করিলাম। ললিতা স্বয়ং পুস্তকের তালিকা দেখিতে চাহিল, তালিকার উপর ইন্দুমতীর নাম এমন ভাবে কাটা হইয়াছিল যে পড়িবার উপায় ছিল না। ললিতা খুসী হইয়া বলিল, দেখ্‌ছি নতুন অনেক বই আপনাদের এখানে নেই, আমি পাঠিয়ে দেব কালই। সে গুলো ছাড়া আর যদি কোনো ভাল বই বেরিয়ে থাকে তারো একটা লিষ্টি—

আমরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলাম। আমি সেক্রেটারী হিসাবে 'ললিতা-পাঠাগার' ও 'দক্ষিণাচরণ-ক্লাবের' বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিলাম। বলা বাহুল্য, তাহাতে ইন্দুমতীর নাম কুত্রাপি উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় স্থলেও ললিতার নাম দেওয়া হইয়াছিল।

ললিতা খুসী হইয়া ক্লাবের ফরাসের ব্যবস্থা করিবার জন্য নগদ একশত টাকা মঞ্জুর করিল। দক্ষিণাদা'র মনের ভিতরের টেরী জলজল করিয়া উঠিল।

সভা ভঙ্গ হইবার পর দক্ষিণাদা' গোপনে আমার হাতে একটা কাগজ গুঁজিয়া দিয়া বলিল, ভায়া হে, আমার আর কিছু নেই, আমার সর্ব্বশেষ কবিতাটি তোমাদের দিলাম, ইন্দুমতীর নামে সভা ডেকে এক দিন সবাই মিলে পড়ো। আমার আস্‌বার উপায় নেই, তবু—

দক্ষিণাদা'র চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, আর কিছু সে বলিতে পারিল না।

একটা শুভদিন দেখিয়া ইন্দুমতীর চরম বিদায়-গীতি পাঠ করিলাম।

শ্মশানের চিতাবহ্নি তোমারে করেনি ভস্মসাৎ,
মহাকাল পারেনি ভুলাতে,
এ কি বিপর্য্যয় প্রিয়া, জীবনে ঘটিল অকস্মাৎ
তুমি হ'লে বিলীন ধূলাতে!
তোমা লাগি' অশ্রু মোর অন্ধকারে উঠেছে উছলি',
কেহ তা' পায়নি দেখিবারে,
ঝ'রে পড়া ফুলটিরে আজ আমি রূঢ় পায়ে দলি,
তুমি শুধু ক্ষমিয়ো আমারে!
'তুমি ছিলে'—এই সত্য চিরদিন থাকি যেন ভুলে,
'তুমি গেছ', তাও যেন ভুলি,
যে ঢেউ ভাঙিয়া গেছে তারে খুঁজি সাগরের কূলে,
ফিরিব না দীর্ঘশ্বাস তুলি,—

বসন্ত চীৎকার করিয়া উঠিল, থাম থাম, এ অসহ্য! তাহার চোখে জল।

শেষ কবিতা শেষ করা হইল না।

* * *

'ললিতা-পাঠাগার' ও 'দক্ষিণাচরণ-ক্লাব' জোর চলিতেছে। মেম্বরদের বই পড়ার দুঃখ ঘুচিয়াছে। নূতন বই কিনিতে এক দিনও দেরী হয় না।

কিন্তু বসন্তের দুঃখের অবধি নাই। ইন্দুমতীর প্রতি অপরাধ করিয়াছে বলিয়া সে আজিও মনে মনে প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে।

নেপালের পথে

[শ্রীবিদ্যুৎবরণ মুখোপাধ্যায় বি-এল]

ছেলে বেলায় স্কুলে পড়িবার সময় পড়িয়াছিলাম ভারতবর্ষে দুইটী স্বাধীন রাজ্য আছে—নেপাল ও ভুটান। পরে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার 'তাৎপর্য্য' কিছু কিছু বুঝিতে লাগিলাম এবং ক্রমে স্বাধীনতার স্বরূপ জানিবার ও স্বাধীন দেশ দেখিবার জন্য প্রাণে একটা বাসনাও হইতে লাগিল। অধীনতার অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া ভারতবর্ষের মধ্যে স্বাধীন রাজ্য আছে এই টুকু মনে মনে আলোচনা করিলেও যখন প্রাণে এক অপূর্ব্ব আনন্দ হয়—তখন স্বাধীন রাজ্য দেখিলে না জানি কি এক নূতন ভাবের লহর খেলিয়া যাইবে ও অননুভূত আনন্দ উপভোগ করিব ভাবিয়াছিলাম! এত দিন মনের আশা মনেই ছিল—স্বাধীন দেশ দেখিবার সুবিধা ঘটিয়া ওঠে নাই।

নেপাল রাজ্য দেখিবার বাসনা বহু দিন হইতেই মনে জাগিয়াছিল—কিন্তু সে বাসনা যে এত শীঘ্র পূর্ণ হইবে তাহা আশা করি নাই। গত বৎসর হঠাৎ নেপাল রাজ্য দেখিবার একটী সুযোগ ঘটিল। আমাদেরই জনৈক উকিল-বন্ধু শ্রীযুক্ত মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক জন বন্ধু মোকদ্দমা-সংক্রান্ত ব্যাপারে আদালতে আসিতেন। তিনি নেপাল-রাজের ডাক্তার। কথা-প্রসঙ্গে তিনি মাখনবাবুকে নেপাল যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। মাখনবাবুর নিজের যাইবার সুবিধা হইল না। তিনি আমাদের কয়েক জনকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন ও আমাদের নেপাল যাইবার সুবিধা করিয়া দিতে পারেন প্রকাশ করিলেন। আমরাও এ সুযোগ ছাড়িলাম না। তিনিও নেপালে তাঁহার ডাক্তার-বন্ধু শ্রীশরৎচন্দ্র দাস গুপ্ত এম-বি, মহাশয়কে পত্র লিখিয়া আমাদের যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহারই অনুগ্রহে আমাদের বহু দিনের আশা ফলবতী হইতে চলিল।

নেপাল যাইতে হইলে প্রথমতঃ নেপাল সরকারের ছাড়-পত্র ব্যতীত নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। কেবল শিবরাত্রির সময় ১৫ দিন মাত্র দেবাদিদেব পশুপতিনাথ-যাত্রীদের জন্য কোন ছাড়-পত্রের আবশ্যক হয় না।

গত বৎসর ৺শারদীয়া পূজার ছুটী আরম্ভ হইবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বেই আমাদের ছাড়-পত্র আসিয়া পৌছিল—ছাড়-পত্র নেপালী কাগজে নেওয়ারী ভাষায় লেখা। আমরা—শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত এম-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরী এম-এ, বি-এল, শ্রীসুধীন্দ্র-কুমার মিত্র এম-এ, বি-এল ও শর্ম্মা এই চারি জন মিলিয়া ১৪ই অক্টোবর ১৯২৮ সাল রবিবার রাত্রি ৮।১৫ মিনিটের গাড়ীতে নেপাল যাইবার জন্য হাওড়ায় ট্রেণে উঠিলাম। প্রথমে মোকামা ঘাট পর্য্যন্ত 'পূজা কনসেসনে'র টিকিট কিনিলাম। আনন্দের উদ্বেগে সারারাত্রি ঘুম হইল না। ভোর বেলায় মোকামায় পৌছাইলাম। মোকামা ঘাটে যাইয়া আমরা প্রথমে মুজঃফরপুরের টিকিট কিনিয়া ষ্টীমারে চড়িলাম—আন্দাজ তিন কোয়াটার পরে অপর পারে সামারিয়া-ঘাটে পৌছিলাম। আমরা ঘাট হইতে মালপত্র লইয়া বি-এন-ডবলিউ রেলে উঠিলাম। রেলে চড়িয়া আন্দাজ বেলা ১২টার সময় মুজঃফরপুর পৌছিলাম। আমাদের সহযাত্রী অপূর্ব্ব বাবুর বন্ধু শ্রীঅপূর্ব্বকুমার মিত্র এম-এ, বি-এল আমাদের সকলকে মুজঃফরপুরে তাহার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পৌছাইতেই বন্ধুবর অপূর্ব্ব বাবু আমাদের সকলকে লইয়া তাঁহার বাটীতে গেলেন। তাঁহার বাটীতে গিয়া একটু বিশ্রামের পর স্নান করিয়া "চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়" আহারাদি করিয়া ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করিলাম। আবার রাত্রিতে ৮টার গাড়ীতে রক্সৌল রওনা হইতে হইবে। আমি এবং সুধীন ভায়া আমাদের দলের মধ্যে বয়সে ছোট—আমরা দুই জনে দুই খানি 'সাইকেল' লইয়া মুজঃফরপুর সহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া লইলাম—সন্ধ্যার পর কিছু জলযোগ করিয়া

আবার আমরা ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। রক্সৌল পর্য্যন্ত টিকিট করিয়া গাড়ীতে চড়িলাম।

মুজঃফরপুর হইতে রওনা হইয়া রাত ১১টার সময় মতিহারিতে গাড়ী বদল করিয়া অন্য গাড়ীতে উঠিলাম। রক্সৌলের গাড়ী পার্শ্বে (Sidingএ) ছিল। এই গাড়ী ৩৷৹টার সময় ছাড়িয়া পর দিন সকালে আন্দাজ ৬৷৹টার

চূর্ণী নদীর সাঁকোর উপর হইতে প্রাকৃতিক দৃশ্য

সময় রক্সৌলে পৌছিল। এখানে বেশ শীত অনুভব করিতে লাগিলাম। এখানে আসিয়াই আমাদের সকলের মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। এইখান হইতেই স্বাধীন নেপাল রাজ্য আরম্ভ। ইহাই ব্রিটিশ রাজত্বের সীমানা—অপর পারে আমাদের ভারতবর্ষের অন্যতম স্বাধীন হিন্দুরাজ্য। রক্সৌলের সীমানা একটী ছোট নদী, নদীর উপর একটী সাঁকো বা ব্রিজ আছে। এপারে ইংরাজ-রাজত্ব, আর ওপারে নেপাল-রাজত্ব। শুনিলাম পাকা সাঁকোটীর ব্যয়ভার অর্দ্ধেক নেপাল রাজের আর অর্দ্ধেক ইংরাজ রাজের। এত দিনের কল্পিত আশা আজ কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। প্রথমে ষ্টেশনে নামিয়াই

আমরা স্বাধীন নেপাল রাজ্যের সীমানা ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। আমরা সকলে জিনিস পত্র লইয়া গাড়ী হইতে নামিলাম। যাহা হউক যখন শুনিলাম যে নেপাল সরকারের রেল ছাড়িতে তখনও এক ঘণ্টা দেরী তখন আমরা প্রথমে মালপত্র লইয়া নেপালের সীমানার মধ্যে গিয়া নেপাল সরকারের রক্সৌল রেলওয়ে ষ্টেশনে মালপত্র গুছাইয়া রাখিয়া দিলাম। প্রথমেই এক জন নেপালী চৌকীদার আমাদের ছাড়-পত্র দেখিতে চাহিল; দেখিয়া আর কিছু বলিল না। সনৎবাবুকে ষ্টেশনে রাখিয়া আমরা তিন জন আবার ইংরাজ-রাজত্বের একটী বাজার হইতে দুধ গরম করিয়া লইয়া আসিয়া সবলে N. G. Ryএর ছোট গাড়ী চড়িয়া একটু শুভালটীন তৈয়ার করিয়া খাইলাম।
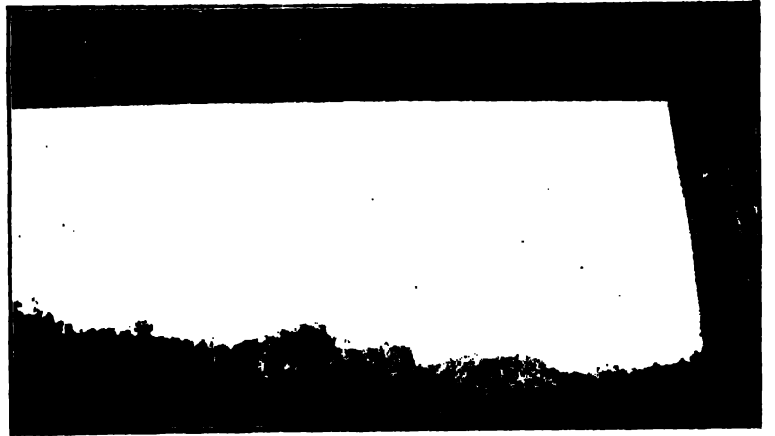
চূর্ণীনদীর অপর পাড়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। তরাইএর মধ্য দিয়া ট্রেণ ছুটিল। শুনিলাম রেলটী আমাদের বাঙ্গালীর গৌরব স্যর রাজেন্দ্র-নাথের অক্ষয় কীর্ত্তি এবং এখনও মার্টিন কোম্পানির কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে। এখান হইতে দেড় মাইল দূরে বীরগঞ্জ ষ্টেশন। ট্রেণ ষ্টেশনে পৌছিবার পূর্ব্বেই একটী ছোট-

খাট সহরের মধ্য দিয়া চলিল—দুই দিকেই হাট বাজার, পাকা বাড়ী। শুনিলাম নেপালের প্রধান মন্ত্রী মহারাজ বীর সামসের জঙ্গ বাহাদুর এই সহরটী বসাইয়াছেন। এখানে ট্রেণ প্রায় ১০ মিনিট কাল থামিয়া রহিল। ইহার পর আমরা পারওয়ানিপুর পৌছিলাম। এখানে প্রায় তিন কোয়াটার গাড়ী থামিয়া রহিল। শুনিলাম ইহাই N. G. Ry. এর Railway yard। এখানে ইঞ্জিন বদল হইল। তখন বেলা প্রায় ১০॥০টা। আমরা মুজঃফরপুর হইতে আসিবার সময় আমাদিগকে অপূদার বন্ধুবর অপূর্ব্ব বাবু একটী হাঁড়ী করিয়া লুচি সন্দেশ ইত্যাদি দিয়াছিলেন, এখানে আসিয়া সকলে সেগুলির সদ্ব্যবহার করিলাম। ট্রেণ হইতে নামিয়া একবার চারিদিক্ চাহিয়া দেখিলাম—তিন দিক্ ফাঁকা মাঠ ও দূরে বন জঙ্গল, কেবল একদিকে অদূরে একটী ছোট গ্রাম দেখিলাম। তার পর ট্রেণ আবার ছাড়িল। মৃদু মন্দ গতিতে একটী একটী করিয়া ষ্টেশন পার হইতে লাগিলাম। পারওয়ানিপুরের পর জীতপুর। এই ষ্টেশনে খুব অল্পক্ষণ রেল থামিয়া ছিল। ষ্টেশনের দুই দিকে ছোট ছোট জঙ্গল। ক্রমে ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া ট্রেণ ছুটিতে লাগিল। এবার আমরা সীমরা ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম। ষ্টেশনটী যেন জঙ্গলের মধ্যেই অবস্থিত, অদূরে ছোট ছোট চালা ঘর ছাড়া বিশেষ কিছু দেখা গেল না—চারিদিকেই জঙ্গল। এখানে কিছুক্ষণ গাড়ী থামিল। এখান হইতে ট্রেণের দুই পার্শ্বে গভীর হইতে গভীরতর জঙ্গল। দিনের বেলায় ঝি ঝি পোকার আওয়াজের ভিতর দিয়া ট্রেণ ছুটিতে লাগিল। বেলা আন্দাজ ১২টার সময় আমরা আমলেকগঞ্জ ষ্টেশনে পৌছিলাম। ইহাই N. G. Ry. এর শেষ সীমানা। স্থানটী বেশ মনোরম। ষ্টেশনটী একটু উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত। ট্রেণ এই স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, কখনও বা পিছু হাঁটিয়া চলিতে থাকে। ষ্টেশনটী আধুনিক ধরণের ইটের তৈয়ারী। আমলেকগঞ্জ ঐ অঞ্চলে একটী ছোট খাট সহর বিশেষ। বাজার হাট সকলই আছে। ভয়ানক রৌদ্রের তাপ ইচ্ছা থাকিলেও আর চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিবার বাসনা হইল না। রক্সৌল হইতে আমলেকগঞ্জ ২৪ মাইল।

ভৈয়সার প্রাকৃতিক দৃশ্য

ভীম-পেদীর বিশ্রামাগারের (Rest house) পশ্চাদ্দিকের চিত্র— পাহাড়ীরা দাঁড়াইয়া আর বসিয়া, বামদিক্ হইতে সনৎকুমার, অপূর্ব্বকৃষ্ণ ও সুধীন্দ্রনাথ

আমলেকগঞ্জে নামিয়া শুনিলাম সেখান হইতে "মোটর বাস" ভীমপেদী পর্য্যন্ত যায়। আমরা বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া একটী বাস ঠিক করিয়া ফেলিলাম। ভাড়া মানুষ পিছু ৩৲ তিন টাকা এবং মাল প্রতি মণ ২৲ দুই টাকা— কেবল মানুষ পিছু দশ সের করিয়া ছাড় পাওয়া যায়। বর্ষাকালে নদী ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করে। পার্ব্বত্য নদীর ধরণই এইরূপ। নদীটীর নাম চূর্ণীনদী। মোটর গাড়ী মেরামত করিতে দেরী হইবে জানিয়া সাঁকোর উপর হইতে দুই দিকের দুইটী ফোটো লইলাম। তখনও অল্প মেঘ করিয়া ছিল, ভাল আলো পাইলাম না। অল্প মেঘের কোলে ধূসর সন্ধ্যায় আলো-আঁধারের মিলনে প্রকৃতির যে সুন্দর চিত্র দেখিয়াছিলাম তাহা ভাষায় বর্ণনা করিতে পারিব না— যন্ত্রও ঠিক সে চিত্র তুলিতে পারে নাই। দূরে পর্ব্বতরাজী প্রহরীর ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। এক পশলা বৃষ্টি হইয়া প্রকৃতির যা কিছু মলিনতা ছিল তা যেন ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। প্রকৃতির অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত যেন দেখা যাইতেছে। আমাদের গাড়ী সর্ব্বাগ্রে

ভীমপেদীর বিশ্রামাগারের সম্মুখ দিকের চিত্র—কাট্‌মুণ্ডু যাত্রার পূর্ব্বে

এখানে ৩।৪টী মোটর বাস কোম্পানি যাতায়াত করে। মোটর বাস যতক্ষণ না নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক আরোহী পায় ততক্ষণ ছাড়ে না। যাহা হউক বেলা আন্দাজ ১টার সময় বাসে চাপিয়া বেলা ২॥০ টা নাগাদ বাস ছাড়িল।

বাস বিসর্পগতিতে আঁকা-বাঁকা রাস্তা দিয়া ক্রমে নিম্নদিকে চলিতে লাগিল। ইতি মধ্যে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেল। গ্রাম, গণ্ড-গ্রাম প্রভৃতি লোকালয় সমস্ত ছাড়াইয়া বাস এইবার উঁচু-নীচু রাস্তা ধরিয়া কখনও বা নীচে নামিতে লাগিল। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই আমরা একটী সাঁকোর উপর আসিয়া পড়িলাম। হঠাৎ সাঁকোর মাঝ খানেই মোটর বাস খানি খারাপ হইয়া গেল। নদীটী বেশ বড়, কিন্তু জল তেমন নাই। শুনিলাম

সীসাগড়ী পাহাড়ের উপল বন্ধুর পথ—মাল লইয়া কুলিরা চলিতেছে। পথিমধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া আছে

ছাড়ায় ক্রমে ক্রমে আরও ৪।৫ খানি মোটর বাস ও লরি সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। সাঁকোটীর পরিসর অল্প হওয়ায় সকল বাসই আটকাইয়া রহিল। প্রায় তিন কোয়াটার পরে আমাদের বাস আবার মেরামত হইল। এবার বাস উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। রাস্তার দুই দিক্‌-

কার পাহাড় খুব কাছা কাছি, রাস্তা খুব সঙ্কীর্ণ। এখানকার মোটর চালক খুব বিচক্ষণ—সরু-আঁকা-বাঁকা, উঁচু-নীচু রাস্তা দিয়া গাড়ী বেশ জোরেই হাঁকাইয়া চলিল। দুই পাশে কখনও খুব উঁচু পাহাড়, আবার কখনও বা প্রায় সমতল ভূমি—কখনও বা গভীর জঙ্গল, কখনও বা ছোট-খাট পল্লী। এই ভাবে আমাদের বাস সেই দুর্গম পাহাড়ী রাস্তা দিয়া ছুটিয়া চলিল।

দার্জ্জিলিংএর রেল যেমন আঁকিয়া বাঁকিয়া পিছু হাটিয়া উপরে উঠিতে থাকে, আমাদের মোটর বাসও সেইরূপ ক্রমে উঁচুতে উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই আমরা বৈকালে "চুরিয়া ঘাট পাস"এ আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে আমাদের গাড়ী থামিল। এখানে একটী ছোট tunnel (তলবর্ত্ম) পার হইতে হইবে। তলবর্ত্মের মধ্যে গাড়ীপ্রবেশ করিবার আগেই মোটর-চালক আমাদের সকলকে সাবধান করিয়া দিল—কেহ যেন সিগারেট বা বিড়ি না খায় অথবা দেশলাই না জ্বালে। ইহার ভিতর প্রবেশ করিবার একটু আগেই কতকগুলি সিন্দুর-মাখান নুড়ি রহিয়াছে দেখিলাম—গাড়ী থামিতেই এক জন নেপালী পূজারী আসিয়া সকলকে পূজার ফুল, চাল ইত্যাদি দিতে লাগিল—কেহ কেহ তাহাকে পয়সা দিল। শুনিলাম সিঁদুর-মাখান নুড়িগুলি "চুরিয়া মায়ী" আর নেপালী ব্রাহ্মণ তাহার পূজারী। তলবর্ত্মটী প্রায় এক মাইল লম্বা ভিতরে দুই দিকে ও মাথায় সাল কাঠের 'স্লিপার' দিয়া পাহাড়ের গা গুলি আটকান—কাঠে আল্‌কাতরা মাখান। তলবর্ত্মের ভিতর অনবরত জল পড়িতেছে এবং এত কম চওড়া যে দুই খানি গাড়ী পাশা-পাশি যাইতে পারে না। আমাদের গাড়ী তলবর্ত্মের মধ্য দিয়া অনবরত horn দিতে দিতে অন্ধকারের ভিতর দিয়া পার হইয়া গেল। তলবর্ত্ম (Tunnel) পার হইয়া কিছুদূর গিয়াই আবার গভীর ঘন জঙ্গল। দিনের বেলায় যেন সে স্থানটী অন্ধকার মনে হইতেছিল। রাস্তার দুই দিকেই পাহাড়—রাস্তা ক্রমে ক্রমে উঁচুতে উঠিতেছে—কখনও বা ছোট পাহাড়ী নদী পার হইতেছে। বাস-চালক এখন হইতে গাড়ী খুব জোরে চালাইবে বলিয়া দিল; কারণ এই জঙ্গলটী ভয়ানক হিংস্র জন্তুর আড্ডা—ইহাই "হটোরার জঙ্গল নামে খ্যাত —হটোরার জঙ্গল নেপাল রাজ্যের প্রধান শীকারের স্থান। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমাদের জঙ্গল পার হইতে হইবে নচেৎ বিপদের আশঙ্কা। এইবার পাহাড়ের গায়েই রাস্তা—নীচে একটী নদী ঝর ঝর ও কল কল রবে রাস্তার সহিত আঁকিয়া বাঁকিয়া খানিক দূর পর্য্যন্ত গিয়াছে—নদীটীর নাম শুনিলাম 'রাওতি' নদী। নদীর অপর পারে আবার পাহাড় ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ—পাহাড়ের গা বড় ও ছোট গাছ দিয়া ঢাকা, কিছুই দেখা যায় না। মাঝে মাঝে দূরে পাহাড়ের মাথায় ছোট ছোট কুড়ে ঘর দেখা গেল। ঘর গুলির 'আশ পাশে' ভুট্টার ক্ষেত। কিন্তু এখানে আদৌ জল পাওয়া যায় না। পরিশ্রমী পাহাড়ীরা সমতল প্রদেশ হইতে বহু কষ্টে জল আনিয়া ভুট্টা প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া থাকে। শুধু ইহাই নয়—আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এমন নির্জ্জন স্থানেও এত কষ্ট সহ্য করিয়া পাহাড়ীরা বাস করে! কিছুদূর গিয়া একটী বড় লোহার পুল দেখা গেল—পুলটী পার হইয়া আমাদের গাড়ী থামিল। এখানে আবার আমাদের ছাড়-পত্র দেখাইতে হইল। এইরূপ পূর্ব্বেও দুই বার দেখাইতে হইয়াছে, আমরা যে স্বাধীন রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি তাহা ঐ ঘন ঘন ছাড়-পত্র দেখাইবার ঘটায় আমরা বেশ

সীসাগড়ী পাহাড়ের উপর হইতে ভীমপেদীর সাধারণ দৃশ্য

উপলব্ধি করিয়াছিলাম। ঠিক সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা এই লোহার পুলটা পার হইয়া 'ভৈসায়' পৌঁছিলাম। এখানে গাড়ী প্রায় ১০ মিনিট অপেক্ষা করিল—আমরা নামিয়া চারিদিক্ একটু দেখিয়া লইলাম। স্থানটার স্বাভাবিক দৃশ্য অতি চমৎকার। ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষগুলির মধ্য দিয়া ক্ষুদ্রকায়া নদী মনের আনন্দে চটুল নৃত্য ভঙ্গীতে ছুটিয়াছে। বৃক্ষের উপরি হইতে পক্ষীরা সেই নৃত্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তাল-মান-সঙ্গত কূজন করিতেছে। প্রকৃতির ভিতর আনন্দের লহর ছুটিতেছে। নদীটার একটা ফোটো লইলাম। এখানে নেপাল সরকারের পুলিশের আড্ডা আছে, ২।১টা পাকা বাড়ীও আছে। আবার গাড়ীতে চড়িলাম। গাড়ীর গতি এবার একটু মন্দা হইয়া আসিল, কারণ ভয়ানক আঁকা-বাঁকা রাস্তা; আবার তাহার অধিকাংশ চড়াই। অন্ধকারও হইয়া আসিতেছে সেই-জন্য খুব সাবধানে গাড়ী চলিল। রাস্তা এত বাঁকিয়া চলিয়াছে যে ২০।৩০ হাত তফাতের জিনিসও দেখা যায় না। অল্প অল্প অন্ধকারেও চারি দিকে ঘন বন জঙ্গলের জন্য যেন একটু বেশী রকম অন্ধকার মনে হইতেছিল —চারিদিক্ নীরব—পাহাড়গুলি যেন নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আমাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। সেই সকল সমাধি-মগ্ন যোগীদের ধ্যান ভাঙ্গিতেছে আমাদের চলন্ত বাসের শব্দ। আর সেখানে কেবল নদীর জল বড় বড় পাথরের উপর আহত হইয়া গর্জ্জন করিতেছে। এই ভাবে প্রকৃতির গম্ভীর দৃশ্যের ভিতর দিয়া গাড়ী ছুটিল। ঠিক সন্ধ্যার পরই আমরা ভীমপেদীতে পৌঁছিলাম।

ভীমপেদী বেশ ছোট গ্রাম, দোকান বাজার সবই আছে। বাস এই পর্য্যন্তই চলে।

আমরা মালপত্র লইয়া সরকারী বিশ্রামাগারের (Rest-house) দিকে চলিলাম। সেখানে আবার ছাড়পত্র দেখান হইল দেখিয়া চৌকিদার বাটীর দরজা খুলিয়া দিল। বাড়ীটা দ্বিতল; আমরা উপর তলায় একটা ঘর লইয়া মালপত্র রাখিয়া সকলে একবার বাজারের দিকে আহারের চেষ্টায় চলিলাম। কলিকাতার মত এখানে খাবারের দোকান নাই, তবে এক খানি দোকান আছে, মালিককে পূর্ব্ব হইতে অর্ডার দিলে পুরি ও তরকারি প্রস্তুত করিয়া দেয়। সন্ধ্যা হইলেই অধিকাংশ দোকান-পাট বন্ধ হইয়া যায়। অপদা ও সনৎবাবুকে ঘরে পাঠাইয়া দিয়া আমি ও সুধীন-ভায়া চৌকিদারের সাহায্যে একটা দোকান হইতে কাঁচা মুগের ডাল ও চাল আনিলাম। সুধীন ভায়া খিচুড়ীর ব্যবস্থা করিল। চৌকিদার আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিল। আমি রন্ধন-বিষয়ে একেবারেই অর্ব্বাচীন। সমস্ত যোগাড় করিয়া দিয়া, কাট্‌মুণ্ড হইতে আমাদের জন্য 'কারপেট' (ছোট নৌকার মত গড়নের যান বিশেষ। ইহাতে

পাহাড়-গাত্রে—সিঁড়ির মত ধাপে ধানের চাষ—উপরে ছোট ছাউনি-ঘর।

চড়িয়া পাহাড়ের উপর যাইতে হয়) আসিয়াছে কি না খোঁজ লইলাম। কথা ছিল নেপালের পূর্ব্বোক্ত ডাক্তার বাবু আমাদের জন্য 'কারপেট' পাঠাইবেন, কিন্তু এবিষয়ে কেহই কোন সংবাদ দিতে পারিল না। রাত্রে বেশ শীত অনুভব করিতে লাগিলাম। আহারান্তে রাত্রি ৯॥০টার ভিতর শয়ন করিলাম।

সকালে উঠিয়া প্রথমেই খোঁজ লইলাম আমাদের 'কারপেট' আসিয়া পৌঁছিয়াছে কি না। অদৃষ্টগুণে এখনও তাহারা আসিয়া পৌঁছায় নাই। সুধীন ভায়া রাত্রের ন্যায় চৌকিদারের সাহায্যে চাল, ডাল, আলু ইত্যাদি কিনিয়া আনিয়া ভাতে ভাত করিয়া আহারের যোগাড় করিল। বেলা ৯টা বাজিয়া গেল তখনও 'কারপেট'র কোন সংবাদ নাই দেখিয়া আমরা আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। স্নান আহার করিয়া লইলাম, মনে করিলাম ইতিমধ্যে আমাদের যানবাহন আসিয়া পড়িবে। তখন আমরা সকলেই ভীমপেদীর চারি দিকে একটু ঘুরিয়া লইলাম—বিশ্রামাগারের পার্শ্বে-ই একটী চমৎকার ফোয়ারা। ফোয়ারার জল একটা পাহাড়ের ঝরণা হইতে আসিতেছে। পরিষ্কার জল; স্থানীয় লোকেরা এখান হইতে পানীয় জল লইয়া থাকে। এখানে একটী সুবৃহৎ ধর্ম্মশালা আছে—কলিকাতার আধুনিক ধর্ম্মশালার মত—শুনিলাম মাড়োয়ারীরা ৺পশুপতিনাথ-যাত্রীদিগের জন্য নূতন তৈয়ার করাইয়াছে। ধর্ম্মশালার ব্যবস্থাও যেন ভাল বলিয়া মনে হইল। ভীমপেদীকে বেড় দিয়া একটী নদী চলিয়া গিয়াছে—নদীতে কিছুমাত্র জল নাই—কেবল ছোট ছোট নুড়িতে ভর্ত্তি—চওড়া নেহাৎ কম নয়। নদীর ওপারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড় মাথা উঁচু করিয়া যেন ভীমপেদীর দিকে চাহিয়া আছে। পাহাড়ের মাথা দিয়া নেপাল সরকার মালপত্র লইয়া যাইবার জন্য লোহার তারে মাঝে মাঝে একটী করিয়া ঝুড়ি ঝুলাইয়া রাখিয়াছে—(Rope line) জিনিস পত্র সমস্তই ইলেকট্রিক সাহায্যে টানিয়া তুলে এবং পাহাড়ের উপর দিয়া লইয়া যায়। শুনিলাম বীরগঞ্জ হইতে আজকাল ব্যবসায়ীরা তাহাদের দ্রব্যাদি এই Rope line দিয়া লইয়া যায়—আজকাল সকলেই নেপাল হইতে বীরগঞ্জ ও বীরগঞ্জ হইতে নেপালে মণ পিছু সামান্য ভাড়া দিয়া দ্রব্যাদি লইয়া আসে। এখানে একটী হাসপাতালও আছে। ভীমপেদী পর্য্যন্ত আমরা প্রায়ই দুই দিকে পাহাড় ও মধ্যে একটী রাস্তা দিয়া আসিতেছিলাম—এখানে আসিয়া দুইদিক্‌কার পাহাড় দূরে সরিয়া গেল বন্ধুর পথ প্রায় সমতল ভূমিতে পরিণত হইল। এই

চিৎলং উপত্যকার জনৈক অবস্থাপন্ন চাষীর বাড়ী

সমতল ভূমির উপরই ভীমপেদী সহর অবস্থিত। যে রাস্তা দিয়া আমরা ভীমপেদীতে পৌঁছিলাম উহা কিছু দূর গিয়া নদীতে পড়িয়াছে। নদীর অপর পারেই আবার উচ্চ পাহাড় আরম্ভ। ভীমপেদীতে আসিয়া আমরা বাটীতে পত্র লিখিলাম। ডাকঘরের কথা জিজ্ঞাসা করায় শুনিলাম সেখানে ডাক বাক্স আছে বটে—কিন্তু চিঠি দিতে হইলে নেপালী ডাক টিকিট ও ইংরাজী ডাক টিকিট—দুই রকমই দিতে হয় এবং পত্র নিয়মিত ডাক বাক্স হইতে চিঠি বিলি হওয়া (clearance) সম্বন্ধেও বিশেষ সন্দেহ আছে। সেখানকার লোকেই আমাদের পরামর্শ দিল যে আমরা নেপালে পৌঁছিয়া কাটমুণ্ড হইতে পত্র দিলে আমাদের পত্র কলিকাতায় অনেক আগেই পৌঁছিবে, খবর শুনিয়া আমরাও নিরস্ত হইলাম। ইহা ছাড়া সেখানে নেপালী ডাক টিকিট কোথায় পাইব।

এইরূপে বেলা বারোটা বাজিয়া গেল—আমরা আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, চৌকিদারকে ডাকিয়া 'খাটৌলি'র ব্যবস্থা করিয়া লইলাম। "খাটৌলি" বাঁশের তৈয়ারী চৌকা খাটিয়া-বিশেষ; একটা বাঁশে ঝুলাইয়া লইয়া যাইবার জন্য দুই পার্শ্বে বাঁখারী দিয়া খাটৌলির সহিত বাঁধিয়া উপরে বাঁখারী দুইটী আর একটী বাঁশের সহিত এক করিয়া বাঁধা। এই ভাবে দুই দিকেই বাঁধিয়া খাটৌলি ঝুলাইবার ব্যবস্থা করিল। আমাদের দেশে যাঁহারা "ডুলি" দেখিয়াছেন তাঁহারা খাটৌলীর ধারণা বেশ করিতে পারিবেন। প্রতি মানুষ পিছু চার জন করিয়া কুলি ঠিক হইল। তাহাদের পারিশ্রমিক কুলি পিছু ৩৲ তিন টাকা এবং যাহারা মাল লইয়া যাইবে তাহাদের পারিশ্রমিক ২৸৹ দুই টাকা বারো আনা স্থির হইল। আমরা রওনা হইবার আগেই সুধীন ভায়া বুদ্ধি করিয়া ভীমপেদীর দোকান হইতে কিছু পুরী ও তরকারী ভাজাইয়া লইয়াছিল।

আন্দাজ বেলা ১২৷৹ টার পর আমরা ভীমপেদী হইতে কাটমুণ্ডর দিকে রওনা হইলাম। যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই rest houseএর পশ্চাতে সকলকে বসাইয়া ও কুলিদের লইয়া একটী ফোটো লইলাম, এবং শেষে রাস্তা হইতে rest houseএর একটী পৃথক্ ছবি তুলিলাম। কিছু দূর পর্য্যন্ত রাস্তা গিয়া নদীগর্ভে মিশিয়াছে—সেখানে কেবল নুড়ি ও পাথর। ইহার উপর দিয়া অপর পারে যাইয়া পাহাড়ের ঢালু রাস্তা। এখান হইতে কাট্‌মুণ্ড প্রায় ২৪ মাইল। রাস্তার প্রথম খানিকটা খুব বেশী ঢালু নয়। কিছু দূর উঠিয়া আমাদের নামাইয়া দিল। সেখানে আবার পুলিশ আফিস। এখানেও আমাদের ছাড়পত্র দেখিল এবং কুলিদের জন্য নেপালী এক সিকি করিয়া 'গড়ী' (poll-tax) লইল এবং আমাদের একটী নেপালী শীল-মোহরযুক্ত কাগজে নেওয়ারী ভাষায় কি লিখিয়া দিল। নেপালী কুলিরা নিকটেই বাজার হইতে তাহাদের কিছু খাদ্য কিনিয়া লইল।

এবার পাহাড়ী কুলিদের পোষাকের কথা কিছু বলিব। ইহাদের পরণে খাদির পায়জামা, তাহার উপর একটী আংরাখা বা ঝুল-ওয়ালা হিন্দুস্থানী বেনীয়ান্—ইহার বোতাম নাই, দড়ি দিয়া বাঁধিতে হয়, এবং কোমরে ৪।৫ ফের করিয়া একটী চাদর জড়ান—মাথায় কাহারও কাহারও টুপি আছে—ইহাই তাহাদের পোষাক। এগুলি সবই হাতে বোনা খাদির তৈয়ারী, ইহাদের ভিতর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ধারণা নাই বলিলেই চলে। ইহারা খুব গরীব। চিড়া সামান্য একটু জল মাখিয়া নুন দিয়া খায়। তবে সকলেই খুব পরিশ্রমী।

মার্ক্‌ হইতে চিসাপানির পথের দৃশ্য

আবার যাত্রা আরম্ভ করিলাম—এবার কি ভয়ানক রাস্তা, একেবারে খাড়া পাহাড়ে চড়িতে হইবে! 'সীসাগড়ী' পৌঁছাইবার এই পথটীকে কোন্ হিসাবে যে রাস্তা বলা হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এত ভয়ানক পার্ব্বত্য পথ কোথাও দেখি নাই—সমস্ত রাস্তার উপর কেবল নুড়ি পাথর যেন কে সাজাইয়া রাখিয়াছে—মাঝে মাঝে খোঁচা খোঁচা বড় বড় পাথর উঁচু হইয়া আছে—ইহার উপর রাস্তা যেমন সঙ্কীর্ণ তেমনই খাড়াই! খাড়া চড়াই পথে আসিয়া কুলিরা আমাদের লইয়া তুলিতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিল দেখিয়া আমরা সকলেই খাটৌলি হইতে নামিলাম। কিন্তু রাস্তা বড়ই

বিশ্রী যে হড় হড় করিয়া গড়াইয়া পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা। যাহা হউক, অতি কষ্টে আমরা এক পা এক পা করিয়া অতি সাবধানে সেই ভয়ানক খাড়া পথটী চড়িতে লাগিলাম। অপূ-দা আমাদের সকলের চেয়ে বয়স্ক এবং একটু স্থূলকায়; তিনি একটু উঠিয়াই অত্যন্ত হাঁপাইয়া পড়িলেন এবং বাধ্য হইয়া খাটৌলিতে চড়িলেন। কুলিরা অতি কষ্টে তাঁহাকে ২।৩ মিনিট অন্তর নামাইয়া পাহাড়ে উঠিতে লাগিল। আমরাও খানিক দূর উঠিয়া সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া আবার খাটৌলিতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলাম।

কুলিরা এই এক মাইল পথ পুরা এক ঘণ্টায় উঠিল! এই ভয়ানক পথের একটী ছবি তুলিয়া লইলাম। কিছু উপরে উঠিয়া আমরা নীচের সমস্ত স্থানটী সুন্দর ভাবে দেখিতে পাইলাম—সেখান হইতে ভীমপেদীর নিম্নের সাধারণ দৃশ্যের একটী ছবি তুলিয়া লইলাম। এই ভাবে বেলা আন্দাজ তিনটার সময় আমরা সীসাগড়ীতে পৌছিলাম।

এখানে নেপাল রাজের একটী ছোট খাট দুর্গ আছে। সেপাই-শান্ত্রী ঘুরিতেছে। এখানে আমাদের সকলকেই নামাইয়া দিল এবং জিনিসপত্র সমস্ত নামাইয়া—বাক্স, বিছানা, মোট-মাটারি যাহা কিছু সমস্তই খুলিয়া দেখিয়া লইল, এবং ছাড়পত্র দেখিতে চাহিল। এখানে আমাদের ছাড়পত্র রাখিয়া আবার নূতন ছাড়পত্র দিল। মাল-পত্র খুলিবার কারণ প্রত্যেক নূতন জিনিসের উপর "চুঙ্গি" (octroi) আছে—কোন নূতন জিনিস লইয়া চুঙ্গি না দিয়া যাইবার উপায় নাই। আমরা কলিকাতা হইতেই এ বিষয় সংবাদ পাইয়াছিলাম, সেই কারণে 'সীসাগড়ী' পৌছাইবার পূর্ব্বেই নূতন মোজা ও জামা রাস্তায় পরিয়া লইয়াছিলাম—আমাদের জিনিসপত্র তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া ছাড়িয়া দিল। সেখান হইতে শীঘ্রই দূরে এবং রাত্রির পূর্ব্বেই সেখানে পৌছান উচিত। আরও কিছু দূর উঠিয়া নামিতে আরম্ভ করিলাম। এখনকার চড়াই তত খাড়া নহে। এখানে এত উঁচু পাহাড়েও ভয়ানক গভীর জঙ্গল দেখিলাম, সাধারণতঃ এরূপ দেখা যায় না। পারিপার্শ্বিক বন জঙ্গল চারি দিক্ অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে—শীতও এখানে খুব বেশী বলিয়া মনে হইল, মাঝে মাঝে ধোঁয়ার মত কুয়াসা আসিয়া স্থানটী একেবারে অন্ধকার করিতে লাগিল—কিন্তু কুয়াসা অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী ছিল। কিছুপথ গিয়া আবার নামিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তা অত্যন্ত উঁচু-নীচু। এখান হইতে চারি দিকের দৃশ্য অতি সুন্দর—রাস্তার এক দিকে খাড়া

চিৎলং উপত্যকার ধর্ম্মশালার নিকট তিনটী শিবমন্দির
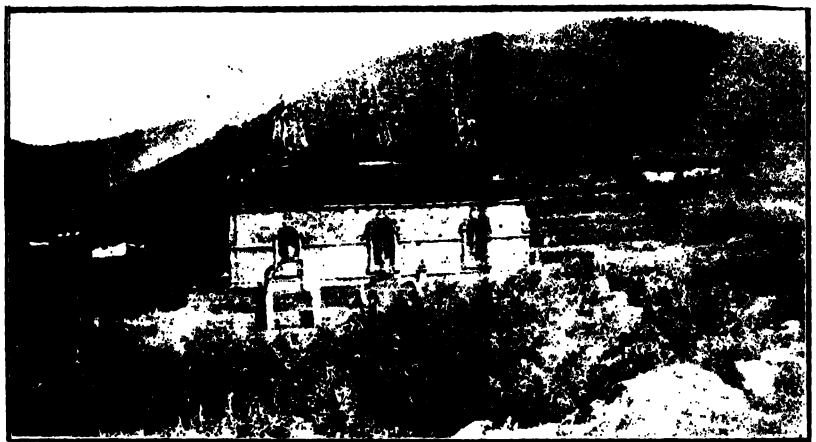
পাহাড় আর অপর দিকে প্রায় ১০০০ হাজার ফুট নীচে গভীর জঙ্গল, মাঝে মাঝে ঝরণা বা ছোট নদী বহিয়া যাইতেছে। এই ভাবে নামিতে নামিতে রাস্তা একটী নদীর ধার দিয়া চলিল—নদীর নাম 'কুলিখানি'। নদীর জল উপর হইতে নীচের দিকে খুব বেগে "তড় তড়" করিতে করিতে ছুটিতেছে। নদীর উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সলিলক্ষত পাথর (boulders) অসংখ্য পড়িয়া আছে—এক একটী পাথর দু'তলা আড়াই তলা পর্য্যন্ত উঁচু এবং বেড়েও তেমনই মোটা! মনে হয় পূর্ব্বে এখানে হিমানীক্ষেত্র (glacier) ছিল, সেইজন্য এতগুলি বড় বড় পাথর একত্র জড় হইয়াছে।

ঠিক সন্ধ্যার মুখেই আমরা পদব্রজে একটী তারের

ধর্ম্মশালায় পৌঁছিলাম। কুলিখানির স্বাভাবিক মনো মোহকর দৃশ্য জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। ধর্ম্মশালা পর্ব্বতের সানুদেশে অবস্থিত। নদীর জলতরঙ্গ ছুটিতে ছুটিতে সলিলক্ষত বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডে প্রহৃত হইয়া যে গম্ভীর কড় কড় শব্দ করিতেছে তাহা মিলাইবার অবসর পাইতেছে না। পার্শ্বের অপর একটী পাহাড়ে সেই উদ্দাম তরঙ্গ-রাজি আহত হইয়া আবার তদপেক্ষা গভীর শব্দ করিতেছে। এ শব্দের যেন শেষ নাই, কারণ পাহাড়ের পর পাহাড় যেন অনবরতই জলরাশির সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

চিৎলং এর ধর্ম্মশালা

এই ভীম গর্জ্জন শুনিতে শুনিতে দেবাদিদেবের তাণ্ডবলীলার কথা মনে পড়িল। নির্ব্বাক বিস্ময়ে এই ভীষণ শব্দ শুনিতে লাগিলাম। সাঁকোটীর নাম "চক্র ব্রীজ"। ধর্ম্মশালা কুলিখানি নদীর ধারেই অবস্থিত—দোতলা পাকা বাড়ী; স্থানটী অতীব মনোরম। সন্ধ্যা হইয়া যাওয়ায় ইচ্ছা থাকিলেও সেখানকার একটী ছবি লইতে পারিলাম না। সেখানে পৌঁছাইয়া শুনিলাম যে 'মার্কু'তে নেপাল-রাজের ভাল ধর্ম্মশালা আছে—আমরা আর সেখানে অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলাম। সেখান হইতে মার্কু মাত্র দুই মাইল পথ।

কিছুদূর যাইতে না যাইতে অন্ধকার আসিয়া পড়িল, সঙ্গে একটী মাত্র লণ্ঠন ও একটী 'টর্চ্চ লাইট'। রাস্তা নদীর ধার দিয়া ধার দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে—একে অন্ধকার তাহাতে রাস্তা অত্যন্ত উঁচু-নীচু, মাঝে মাঝে আবার ধস্ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমরা তিন জনে হাঁটিয়া চলিলাম, কেবল অপূদা খাটৌলিতে রহিলেন। অন্ধকারে পাহাড়ী পথে যাইতে আমাদের যারপর নাই কষ্ট হইতে লাগিল। সুধীন ভায়া সম্মুখে লণ্ঠনের আলো দেখাইয়া চলিল—দুর্ভাগ্যবশতঃ টর্চ্চ-লাইটটী ঐ সময়ে খারাপ হইয়া গেল। যাহা হউক অবশেষে আমরা রাত্রি ৮ আটটার সময় পাহাড়ী দুই মাইল পথ হাঁটিয়া মার্কু বিশ্রামাগারে পৌঁছিলাম। এখানে ভয়ানক শীত—চৌকিদার সেখানে না

থাকায় শীতে আমাদের বাহিরে অনেক্ষণ পর্য্যন্ত কষ্ট পাইতে হইল। সকলেই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি—একটু বিশ্রাম করিয়া বিছানা পাতিয়া লইলাম। পরে সুধীন ভায়া ভীমফেদী হইতে যে লুচি তরকারী আনিয়াছিল, তাহা বাহির করিয়া কোন প্রকারে উদর পূরণ করিয়া আমরা শয়ন করিলাম।

পর দিন ভোর ৫।০টার সময় কুলিরা আমাদের উঠাইয়া দিল। চৌকিদার অল্পক্ষণ মধ্যেই আধ সের গরম দুধ যোগাড় করিয়া আনিল। আমি ও সুধীন একটু ovaltine তৈয়ার করিয়া খাইলাম ও অপূদা বাকী দুধটা পান করিলেন—সনৎ বাবু কিছুই খাইলেন না। আন্দাজ ৬।০টা। ৭টার সময় আবার যাত্রা করিলাম। রাস্তা এবার বেশ ভাল, কখন চড়াই, কখন উৎরাই। উপত্যকায় রাস্তার পার্শ্বেই এক খানি সুদৃশ্য নেপালের অবস্থাপন্ন চাষীর সুন্দর বাড়ী দেখিয়া তাহার ছবি তুলিয়া লইলাম। বাড়ীখানি নির্ম্মাতার সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের বেশ পরিচয় দিতেছে। বাড়ীর বারান্দায় সুধীনভায়া দাঁড়াইয়া আছে। মার্কু হইতে চিৎলং উপত্যকার মোহন দৃশ্য দেখিয়া ছবি তুলিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম

না। পর্ব্বতটী ক্রমশঃ উঁচু নীচু হইতে উপত্যকারূপে পরিণত হইয়াছে। উপরে সবুজ গাছপালা ও ছোটখাট তরুলতাদি প্রচুর পরিমাণে স্থানটার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে পাহাড়ের রাস্তায় চোখের তৃপ্তি (relief)ও দিতে থাকে। পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ির মত ধাপ ধাপ করিয়া চাষের স্থান করা হইয়াছে—বেশীর ভাগ লোকই

চন্দ্রগিরি পাহাড়ের পথে—সম্মুখভাগে সুধীন্দ্রনাথ দণ্ডায়মান—সনৎকুমার বসিয়া আর খাটোলীতে অপূর্ব্ববাবু মোট-সহ একজন কুলী বিশ্রাম করিতেছে।

গম বুনিয়াছে, মাঝে মাঝে ছোট ছোট ছাউনি ঘর। ঐ স্থানের দৃশ্যটী বড়ই মনোহর। আন্দাজ বেলা ৯টার সময় আমরা চিৎলং গ্রামে পৌছিলাম। গ্রাম হইতে কিছু উপরেই ধর্ম্মশালা। এখানে অনেক লোকের বাস—চারি দিকে 'চাস বাস' আছে—গরু, ভেড়া, ছাগল, মহিষ অনেক স্থানেই চরিতেছে। আমরা ধর্ম্মশালায় নামিয়া, সেখানে একটী ঝরণায় স্নান করিয়া লই-লাম। সুধীন-ভায়া আবার আহারের যোগাড় করিতে লাগিল। ধর্ম্মশালার নিকট তিনটী শিব মন্দির আছে, শুনিলাম খুব পুরানো মন্দির—মন্দিরের মাথায় সাপে ফণা ধরিয়া আছে—গায়ে নানারূপ কারুকার্য্য। মন্দিরের একটী ছবি লইলাম এবং পরে ধর্ম্মশালার একটী ছবি লইলাম। চিৎলং একটী মাঝারি উপত্যকা।
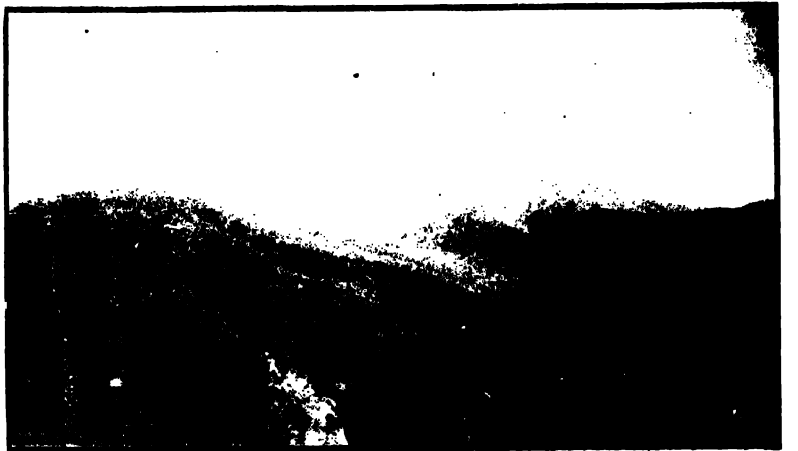
আহারাদি শেষ করিয়া ১১টার সময় যাত্রা করিলাম। এবার বরাবর একটানা কাটমুণ্ডতে লইয়া যাইবে। রাস্তা বেশ ভালই, তবে আবার চড়াই আরম্ভ হইল—মাঝে মাঝে উৎরাই চিৎলং উপত্যকাতে বেশী গাছ-পালা অর্থাৎ বন জঙ্গল দেখিতে পাইলাম না কিন্তু ক্রমে আবার যখন উঠিতে আরম্ভ করিলাম, পূর্ব্বের ন্যায় দুই দিকে গভীর হইতে গভীরতর জঙ্গল দেখা গেল। এবার চন্দ্রগিরি পাহাড়ে উঠিতেছি—চন্দ্রগিরির চড়াইএর দিক্‌টা তত কষ্টদায়ক নয়। সামান্য রাস্তা একটু বেশী চড়াই কিন্তু উৎরাইটী বড় ভীষণ। সীসা-গড়ীর রাস্তা যেমন খাড়া চড়াই, চন্দ্রগিরি-শিখর পার হইয়া

চিৎলং পাহাড়ের নামিবার পথের দৃশ্য

তেমনই খাড়া উৎরাই! নামিবার সময় মনে হইল কে যেন উপর হইতে ধাক্কা দিয়া নামাইয়া দিতেছে। খানিক দূর নামিবার পর পায়ের 'ডিম'-গুলা কন্ কন্ করিতে লাগিল এবং পা কাঁপিতে লাগিল। চন্দ্রগিরির এ দিক্‌টায়

রাস্তা খুব নিবিড় গাছ পালা, নানাপ্রকারের ফুল, অরকিড লতা ইত্যাদি আছে—দিন দুপুরেও যেন অন্ধকার মত মনে হইতেছিল। চন্দ্রগিরি উঠিতে উঠিতে দুই স্থানে দুইটী ছবি লইলাম। উপর হইতে চিৎলং উপত্যকা বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। নামিবার পথটা কতকাংশ অত্যন্ত খারাপ। যাহা হউক খানিক দূর নামিয়া বেশ ভাল রাস্তা পাইলাম বটে, কিন্তু এত খাড়া উৎরাই যে চলিতে আরম্ভ করিলে আর যেন থামা যায় না। এই ভাবে নামিতে নামিতে আমরা একটী ছোট গ্রামের নিকট আসিয়া পৌঁছিলাম স্থানটীর নাম "থানকোট"। রাস্তার দুই দিকে দোকান আছে—এখানে বেশ লোক সমাগম দেখিলাম।

থানকোট হইতেই নেপাল আরম্ভ। নেপাল আসলে একটী উপত্যকার নাম। লম্বায় প্রায় ২০ মাইল এবং চওড়ায় ১০।১২ মাইল হইবে। ইহার চতুর্দ্দিকে পাহাড়। কেবল এক দিকে বাঘমতী নদী, পাহাড়ের ভেতর একটু রাস্তা করিয়া চলিতেছে! থানকোট হইতে কাট্‌মুণ্ড ৬ মাইল। আমরা থানকোটে বৈকালে পৌঁছিলাম। সেখান হইতে রাস্তা সমতল আর 'চড়াই-উৎরাই' নাই। পথ বেশ সরল তবে ধূলায় পূর্ণ। আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কাট্‌মুণ্ড সহরে প্রবেশ করিলাম। রাস্তার দুই দিকে সারি সারি দোকান, পাকা বাড়ী ইত্যাদি। সহরের মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই আবার একটা পুলিশ আফিসে আমাদের ছাড় পত্র চাহিয়া লইল। সহরের কাছাকাছি গিয়া আমরা সকলে হাঁটিয়া চলিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার সময় কাট্‌মুণ্ডতে আমাদের ডাক্তার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস গুপ্ত এম্-বি Chief medical officer to His Highness the Maharaja of Nepal মহাশয়ের বাটিতে পৌঁছিলাম। তিনি আমাদের অপেক্ষায় বাটীতেই ছিলেন, আমাদের সকলকে সাদরে তাঁহারা গৃহ মধ্যে লইয়া গেলেন এবং ৫।৭ মিনিটের মধ্যেই চা ও জলখাবার প্রস্তুত করাইয়া আমাদের খাইতে দিলেন।

পৃথ্বীরাজ

[শ্রীসজনীকান্ত দাস এম্-এ]

অজানা পিছল পথে পা টিপিয়া চলেছিনু ভয়ে দুরু দুরু করে বক্ষ,
আঁধার রজনী নামে ধীরে ধীরে দুই পাশে মেলিয়া তিমির দুই পক্ষ।
বিকল বিবশ মন, নাহি রূপ নাহি রঙ, শুধু কায়াহীন মায়া-রাত্রি;
অনুমান-অনুভবে বুঝিনু চলিছে আরো হেথাহোথা দিশাহারা যাত্রী!
গন্ধ আসিছে ভেসে কভু ভাষা ভাসা-ভাসা, গায়ে গায়ে কভু হয় স্পর্শ,
কভু চমকিয়া উঠি, কে যেন গুমরি' কাঁদে, "অভাগিনী মা, ভারতবর্ষ"

কাঁদিয়া পড়িনু ভূমে, মাটীরে আঁকড়ি ধরি আবার দাঁড়ানু উঠে ত্রস্তে,
চরণ চলে না আর, শৃঙ্খল ঝন্ ঝন্ বাজিল সহসা দুই হস্তে!
নিকটে অদূরে দূরে অযুত কণ্ঠে বাজে, ভয়ার্ত্ত ক্রন্দন-শব্দ,
অদৃশ্য হাতে কারা চাপিয়া ধরিল টুঁটি, চকিতে আঁধার হ'ল স্তব্ধ
অমনি তিমির টুটি খল্‌খল্ খিল্ খিল্ চমকায় কাহাদের হর্ষ,
আকাশে বাতাস তবু শ্বসে ক্রন্দন-স্বনে, "অভাগিনী মা, ভারতবর্ষ"

তারপর মনে নাই, ঘুমায়ে পড়িনু পথে, চরাচর নিদ্রায় মগ্ন,
দ্বারে কর হেনে কারা বিফল চলিয়া গেল, কেটে গেল কত শুভ লগ্ন
কভু তন্দ্রার ঘোরে, মশাল-আলোকে দেখি, ধরা রাঙা চাপ চাপ রক্তে;
রক্ত সে নয়, যেন লাল জবাফুলদল, দেবতারে নিবেদিল ভক্তে।
আবার ঘুমায়ে পড়ি, কত যুগ কেটে গেল, কেটে গেল সহস্র বর্ষ,
ঘুম-ঘোরে শুনি তবু, স্বপন হবে বা বুঝি, "অভাগিনী মা ভারতবর্ষ!"

আলোচনা

দ্বারপাল গোবিন্দ ও কড়চার গোবিন্দ কি একব্যক্তি

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ডি-লিট্ কবিশেখর মহাশয় 'গোবিন্দ দাসের কড়চা'র নবম সংস্করণের যে বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়াছেন তাহার এক স্থানে আছে—"নানা দিক্ দিয়া কড়চার গোবিন্দদাস এবং পুরীর সু-বিখ্যাত অনুচর শ্রীগোবিন্দকে এক ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়।" এই সম্বন্ধে তিনি যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন সেইগুলির একটু আলোচনা করিব।

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন যে, গোবিন্দ দাসের কড়চাতে আছে, মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে পুরীতে ফিরিয়া এক খানি পত্র সহ গোবিন্দকে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট যাইতে আদেশ করেন। এই খানে কড়চা শেষ হইল। ইহার পর গোবিন্দের আর কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রেমদাসের "চৈতন্য চন্দ্রোদয়-কৌমুদী" গ্রন্থে গোবিন্দ দাস নামক এক বৈদেশিকের একটা বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই গোবিন্দই কড়চা-লেখক গোবিন্দ বলিয়া তাঁহার ধারণা। তিনি লিখিয়াছেন, গোবিন্দ দাস শ্রীখণ্ড হইতে শান্তিপুরে যাইয়া অদ্বৈতের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাহার পর শিবানন্দ সেনের সহিত পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, চৈতন্য-চন্দ্রোদয়-কৌমুদীতে এই বিবরণটুকু আছে।

এখন দেখা যাউক প্রেমদাসের চৈতন্যচন্দ্রোদয়-কৌমুদীতে গোবিন্দ দাসের বিবরণ কি আছে। এই কৌমুদী গ্রন্থের দশম অঙ্কের প্রারম্ভেই আছে যে, মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিবার পরে—

গুণ্ডিচা যাত্রার কাল প্রত্যাসন্ন হৈল।
নীলাচলে যাইতে সবাই মন কৈল॥
হেনকালে বৈষ্ণব গোবিন্দ দাস নাম।
উত্তর রাঢ় হইতে গেলা খণ্ডগ্রাম॥
নরহরি দাস আদি যত ভক্তগণ।
তেঁহো আসি তা সবার বন্দিল চরণ॥
নরহরি তাঁহারে করিয়া আলিঙ্গন।
জিজ্ঞাসিলা,—"কোথা বাড়ী কি কার্য্যে গমন॥"
গোবিন্দ বলেন—"ঘর উত্তর রাঢ়েতে।
ইচ্ছা হয় মোর শ্রীপুরুষোত্তম যাইতে॥
প্রতি বর্ষে তোমরা চলহ নীলগিরি।
তোমা সভা সঙ্গে যাব এই চিত্তে ধরি॥"
নরহরি বলেন,—"বড় ভাগ্য সে তোমার।
নীলাচলে দেখিবারে চৈতন্যাবতার॥
কিন্তু তুমি শান্তিপুরে চল পুরঃসর।
যেখানে আছেন শ্রীল অদ্বৈত ঈশ্বর।
গৌড়ের বৈষ্ণব সব তাঁর সঙ্গে চলে।
শিবানন্দ সেন পথে সমাধান করে॥
দেশ যাত্রা তা সভার কতেক বিলম্ব।
পাছে যাব আমরা শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গ॥"

এই কথা শুনিয়া বৈদেশিক গোবিন্দের মনে আনন্দ ও আশার সঞ্চার হইল। তিনি নরহরির কথা ভাবিতে ভাবিতে শান্তিপুর অভিমুখে চলিলেন। পথে এক মহাযতি বৈষ্ণবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন তিনি অদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য, নাম গন্ধর্ব্ব, বাড়ী শান্তিপুরে। গোবিন্দ তাঁহার নিকট "উত্তর রাঢ়ে থাকি" বলিয়া নিজের পরিচয় দিলেন এবং নরহরির নিকট অদ্বৈত ও শিবানন্দ সেন সম্বন্ধে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা বলিলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি অপরিচিত, আমাকে কি শিবানন্দ সঙ্গে লইয়া যাইবেন? গন্ধর্ব্ব বলিলেন, "তুমিত মানুষ, কুকুরেহ শিবানন্দ পালি লঞা গেল।" তাহার পর, কি ভাবে কুকুরকে যত্ন করে লয়ে গিয়াছিলেন, একবার রেমুণাতে ঘাটিয়ালের হাতে কিরূপে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, ইত্যাদি অনেক কথা বলিলেন। শেষে বলিলেন "তুমি শান্তিপুরে অদ্বৈতের নিকট থাক. আমি শিবানন্দের নিকট যাত্রার দিন ইত্যাদি জানিয়া আসি।"

বৈদেশিক বলে ভাই যে আজ্ঞা তোমার।
তোমার অপেক্ষা করি তুমি লৈলে ভার॥
গন্ধর্ব্ব গমন কৈল শিবানন্দ ঘরে।
বৈদেশিক রহিলা অদ্বৈত শান্তিপুরে॥

প্রেমদাসের চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদীতে এইখানে বৈদেশিকের কথা শেষ হইয়াছে। ইহার পরে বৈদেশিকের আর নাম-গন্ধও ইহাতে নাই। তিনি অদ্বৈতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন কি না এবং শিবানন্দের সঙ্গে পুরীতে গিয়াছিলেন কি না তাহা ইহাতে নাই। সুতরাং দীনেশ বাবু কি করিয়া বলিলেন যে এই সকল কথা প্রেমদাসের পুস্তকে আছে তাহা বুঝিতে পারা গেল না।

উপরের উদ্ধৃত পয়ারে আমরা এক গোবিন্দ দাসের বিবরণ পাইতেছি বটে, কিন্তু তিনি যে কড়চার গোবিন্দ কর্ম্মকার তাহার কোন প্রমাণ ইহা হইতে পাওয়া যাইতেছে না। বৈদেশিকের কথায়, কি মনের ভাবে, কি আকার-ইঙ্গিতে সেরূপ কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না। প্রেমদাস যে বৈদেশিককে কড়চার গোবিন্দ বলিয়া খাড়া করিয়াছেন তাহাও মনে হয় না, বরং বৈদেশিক ও গন্ধর্ব্বের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা প্রেমদাস দিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় না যে বৈদেশিক পূর্ব্বে কখন পুরীতে গিয়াছেন।

যাহা হউক, অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণ যখন যাত্রা করিয়া পুরীর পথে অনেকটা অগ্রসর হইলেন তখন এক স্থানে সার্ব্বভৌমের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। এই মিলনে সকলেই আনন্দিত হইলেন এবং সেই দিনের জন্ম সেখানে অবস্থান করিলেন। ইহাদের সঙ্গে শিবানন্দ সেনের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত ছিলেন। তিনি গৌরগতপ্রাণ, তাঁহার আর দেরী সহিল না। মাতুলের অনুমতি লইয়া দ্রুতপদে নীলাচলে চলিয়া আসিলেন, এবং বরাবর মহাপ্রভুর নিকট গিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিলেন। প্রভু তাঁহাকে দেখিয়াই সহাস্য বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন (যথা— প্রেমদাসের কৌমুদী গ্রন্থে)—

"কহ দেখি গৌড় হৈতে কে কে ভক্তগণ।
এ বৎসর নীলাচলে কৈল আগমন॥"
শ্রীকান্ত বলেন,—"যত গৌড়ের ভক্তগণ।
তথা কেহ নাহি, তাঁরা সব আসিছেন॥
শ্রীচরণ না দেখেন যৈছে কপোজন।
এবৎসর দেখিতে কেলা আগমন॥"

ইহাই বলিয়া শ্রীকান্ত একে একে সকল ভক্তের নাম করিলেন। এমন কি, শ্রীনাথ নামক এক পরম বৈষ্ণব অদ্বৈতের সঙ্গে আসিতেছেন তাহাও বলিলেন, কিন্তু গোবিন্দনামক যে কোন ব্যক্তি আসিতেছেন তাহা বলিলেন না।

এদিকে শ্রীকান্ত আসিয়া মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়াছে, ওদিকে (যথা চৈঃচঃ কৌমুদীতে)—

নীলাচলে স্বরূপ গোবিন্দ দুই জন।
পরস্পর কথা কহে সুপ্রসন্ন মন॥
স্বরূপ বলেন,—"শুনিলাও গৌড় হৈতে।
আসিছে বৈষ্ণব সব প্রভুকে দেখিতে।"
গোবিন্দ বলেন,—"সত্য, পথে সভা ছাড়ি।
শ্রীকান্ত আইলা আগে নীলাচল পুরী॥"
স্বরূপ বলেন,—"কহ, কাহা সে শ্রীকান্ত।"
গোবিন্দ কহে—"প্রভু সনে কহিছে বৃত্তান্ত॥"
স্বরূপ বলেন,—"চল, তথায় যাইব।
গৌড়ের বৈষ্ণব সব বৃত্তান্ত শুনিব॥"

ইহাই বলিয়া তাঁহারা প্রভুর কাছে গেলেন। তিনি তখন শ্রীকান্তের কাছে ভক্তদের কথা শুনিতেছিলেন। এমন সময় হরিধ্বনির কোলাহল কাণে গেল। ভক্তেরা পুরীতে প্রবেশ করেছেন বুঝিয়া—

গোবিন্দেরে কহে প্রভু -"চল শীঘ্র কর‍্যা।
জগন্নাথ ভগবৎ প্রসাদমালা লঞা॥
গোবিন্দ বলেন,—"প্রভু, যে আজ্ঞা তোমার।"
মালা লঞা গেল যথা সাধুপরিকর॥

এই গোবিন্দ কে? ইনি কি প্রেমদাসের সেই বৈদেশিক গোবিন্দ? কিন্তু তাহাতো নয়। স্বরূপের সঙ্গে তাঁহার যে কথাবার্তা হইল এবং মহাপ্রভু যেভাবে তাঁহাকে মালা লইয়া পাঠাইলেন তাহাতে মনে হয় তিনি অনেক দিন হইতেই সেখানে আছেন।

দক্ষিণদেশ হইতে মহাপ্রভুর পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরেই প্রথম বার যখন গৌড়ের ভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিতে গমন করেন, তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে এই গোবিন্দ আপনাকে ঈশ্বরপুরীর সেবক বলিয়া পরিচয় দিয়া তাঁহার সেবার ভার গ্রহণ করেন। তখনও অদ্বৈত প্রভৃতির সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয় নাই। সেইজন্য প্রথম বার তাঁহারা পুরীতে আসিলে প্রভুর আজ্ঞাক্রমে যখন গোবিন্দ প্রসাদ-মালা দিবার জন্য স্বরূপের সঙ্গে ভক্তদের নিকট গেলেন, তখন স্বরূপের নিকট অদ্বৈত-প্রভু এই অপরিচিত লোকটীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। (যথা চৈঃ চঃ কৌমুদীতে)—

হেনকালে দ্বারপাল গোবিন্দ আইলা।
গৌরাঙ্গের আজ্ঞা লঞা হাথে পুষ্পমালা॥
তা দেখিয়া অদ্বৈত জিজ্ঞাসে দামোদরে।
"মালাস্তর লঞা কেবা আসিছে গোচরে॥"
দামোদর বলে,—"এহো গোবিন্দ আখ্যান।
চৈতন্যের পার্শ্ববর্ত্তী মহাভাগ্যবান॥"

কবি কর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকেও আছে, অদ্বৈতাচার্য্য স্বরূপ দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুনর্মালান্তরং গৃহীত্বা কোঽয়মায়াতি।" দামোদর বলিলেন, "অয়ং ভগবৎপার্শ্ববর্ত্তী গোবিন্দঃ।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহা আরও পরিষ্কারভাবে আছে,—

তবে গোবিন্দ দণ্ডবৎ কৈল আচার্য্যেরে।
তারে না চিনেন আচার্য্য, পুছিলা দামোদরে॥
দামোদর কহেন,—"ইহার গোবিন্দ নাম।
ঈশ্বরপুরীর সেবক অতি গুণবান্॥
প্রভু সেবা করিতে পুরী আজ্ঞা দিলা॥
অতএব প্রভু তারে নিকটে রাখিলা॥"

দীনেশ বাবু হয়ত বলিবেন যখন কবি কর্ণপূর কেবলমাত্র "ভগবৎ পার্শ্ববর্ত্তী" ও প্রেমদাস "চৈতন্যের পার্শ্ববর্ত্তী মহাভাগ্যবান্" বলিয়া গোবিন্দের পরিচয় দিলেন, তখন কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহাকে "ঈশ্বরপুরীর সেবক" কি করিয়া বলেন? কারণ দীনেশবাবুর মতে কৃষ্ণদাস কবিরাজকে অনেকটা জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার চৈতন্য-চরিতামৃত লিখিতে হইয়াছিল। তবে রূপ ও সনাতন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মহাপ্রভুর সম্বন্ধে যে টুকু জানিতেন, এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজকে বলিয়া-ছিলেন, সে টুকু অবশ্য প্রামাণিক, কিন্তু তাহা ছাড়া ইঁহার অপরাপর কথার ঐতিহ্য খুব দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। কবিরাজ গোস্বামী কিন্তু নিজেই লিখিয়াছেন—

"চৈতন্যলীলা রত্নসার স্বরূপের ভাণ্ডার
তিঁহ থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।

তাহা কিছু যে শুনিল তাঁহা ইহা বিস্তারিল
ভক্তগণে দিল এই ভেটে।"

* * * *

স্বরূপ গোসাঞির মত রূপ রঘুনাথ জানে যত
তাহি লিখি নাহি মোর দোষ।"

* * * *

"রঘুনাথ দাসের সদা প্রভু সঙ্গে স্থিতি।
তাঁর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি॥"

ইহা ব্যতীত স্বরূপের কড়চা ও মুরারির কড়চা এবং কবিকর্ণপূরের নাটকাদি হইতেও চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কবিরাজ গোস্বামী অনেক স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে যে সাহায্য লওয়া হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আর দ্বারপাল গোবিন্দ যে ঈশ্বরপুরীর সেবক তাহা কবিকর্ণপূরও তাঁহার নাটকে বলিয়াছেন। এই নাটক হইতে প্রেমদাস যাহা অবিকল অনুবাদ করিয়াছেন তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

চোখা রঙ্গে গোবিন্দ নামেতে সেই জন।
নীলাচলে আইলা অতি সুপ্রসন্ন মন॥
বিচার করেন তিঁহো আপন অন্তরে।
শ্রীঈশ্বরপুরী পাঠাইলেন আমারে॥
মহাপ্রভুর নিকটে প্রস্থান কর তুমি।
তাঁর আজ্ঞা পাঞা হেথা আইলাম আমি॥
নিজ ভাগ্য মহিমা না জানি কিবা হয়।
অস্বীকার করেন কি না চৈতন্য দয়াময়॥

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি মহাপ্রভুর নিকট গিয়া দণ্ডবৎ করিলেন, এবং আপনার পরিচয় দিয়া বলিলেন, "আপনার সেবার জন্য পুরী গোসাঞি আমাকে পাঠাইয়াছেন।" তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া এবং সার্ব্বভৌমের সঙ্গে এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শেষে গোবিন্দকে নিজ সেবার অধিকার দিলেন।

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন, "অনুমান ও কল্পনা দ্বারা উপন্যাস রচনা করা যায়, কিন্তু ইতিহাস লেখা যায় না।" এ কথা খুব সত্য, আর দীনেশবাবুর নিকট আমরা এইরূপ উক্তিই আশা করি। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, প্রেমদাসের কৌমুদী-গ্রন্থে "গোবিন্দ" নামক যে বৈদেশিকের বিবরণ আছে, তাহা হইতে, ঈশ্বরপুরী-ভৃত্য ও কড়চা-লেখক যে একই ব্যক্তি, এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি?

কিন্তু এই সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা ঐতিহ্য না পাইয়া দীনেশবাবুকে অবশেষে কল্পনাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন যে, চৈতন্যদেব দক্ষিণদেশ হইতে পুরীতে ফিরিয়া আসিয়া, এক খানি পত্রসহ গোবিন্দকে শান্তিপুরে যাইতে আদেশ করেন। কিন্তু তাঁহার একান্ত ভক্ত অনুচরটি কয়েক দিনের বিরহ ভাবিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। সুতরাং এ কথা নিশ্চয় যে, অতঃপর যদি গোবিন্দের বজ্রাঘাতে হঠাৎ মৃত্যু না হইয়া থাকে, তবে তিনি মহাপ্রভুকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন নাই।"

তাহার পরে তিনি বলিতেছেন,—"এ কথা আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, চৈতন্য কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া গোবিন্দ শান্তিপুরে যাইয়া অদ্বৈতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং শিবানন্দ সেনের সঙ্গে পুরীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। পুরী আসিয়া,—যে মহাপ্রভু তাঁহার প্রাণ, মন ধ্যান, জ্ঞান,- তাঁহাকে ছাড়িয়া তিনি কখনই থাকিতে পারেন নাই; এবং ঠিক সেই সময় যখন দেখিতেছি ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দিয়া এক গোবিন্দদাস (শূদ্রজাতীয়) প্রভুর পরিচর্য্যায় লাগিয়া গেলেন, তখন আমাদের সহজেই এই ধারণা হয় যে, কাঞ্চননগরের গোবিন্দদাস ভিন্ন মহাপ্রভুর এমন অন্তরঙ্গ ভৃত্য আর কেহই ছিলেন না, এবং দুই গোবিন্দই এক ব্যক্তি।"

মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে ফিরিবার পর গোবিন্দকে যে শান্তিপুরে যাইতে আদেশ করেন, এ কথা অবশ্য কড়চায় আছে। কিন্তু তিনি সেখানে যাইয়া যে অদ্বৈতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং পরে শিবানন্দ সেনের সঙ্গে পুরীতে ফিরিয়া যান, এ কথা স্পষ্ট ভাবে কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। প্রেমদাসের গ্রন্থে কেবল মাত্র আছে যে, অদ্বৈতের শিষ্য গন্ধর্ব্ব বৈদেশিক গোবিন্দকে বলিয়াছিলেন, "অদ্বৈত গোসাঞি প্রভু সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তাঁহার নিকটে তুমি সুখে বাস কর।" ইহাও কিন্তু কড়চার গোবিন্দের শান্তিপুরে যাত্রা করিবার ৪বৎসর পরের কথা; অকারণ মহাপ্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে বৈদেশিক গোবিন্দকে প্রেমদাস শ্রীখণ্ডে লইয়া আসেন। গন্ধর্ব্ব ও বৈদেশিকের কথাবার্ত্তা দ্বারাও ইহা জানা যাইতেছে; কারণ, শিবানন্দ সেন কি করিয়া কুকুরকে পালিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, এই কথা বৈদেশিক জিজ্ঞাসা করিলে, গন্ধর্ব্ব বলেন,—"শুন, কহি সে প্রসঙ্গ। তখন মথুরা যাত্রা না কৈল গৌরাঙ্গ।" আর, ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য গোবিন্দ যে মহাপ্রভুর দক্ষিণাঞ্চল হইতে ফিরিবার পরেই পুরীতে গিয়া তাঁহার সেবাভার গ্রহণ করেন, এ কথা কবিকর্ণপূরের নাটকে, প্রেমদাসের কৌমুদীতে ও কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃতে পরিষ্কার ভাবে লিখিত আছে। সুতরাং যে দুইটী ঘটনার মধ্যে ব্যবধান অন্ততঃ চারি বৎসর, তাহা এক সময়ে সংঘটিত করিয়া দীনেশ বাবু এই অঘটন ঘটাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন।

দীনেশ বাবু কড়চার গোবিন্দকে বৈদেশিকবেশে শ্রীখণ্ড, শান্তিপুর কাঁচড়াপাড়া ঘুরাইয়া কি প্রকারে ঈশ্বরপুরীর সেবক সাজাইয়া পুরীতে আনিলেন এবং মহাপ্রভুর সহিত পুনর্মিলন করাইয়া দিলেন তাহা উপরে দেখাইলাম। কিন্তু গোবিন্দ এইরূপে বারংবার কেন বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন, তৎসম্বন্ধে দীনেশবাবু যে কারণ দর্শাইয়াছেন তাহাই এখন বলিতেছি।

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন "যখন চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করিয়া বর্দ্ধমানের পথে কাটোয়ায় যাত্রা করিয়াছিলেন তখন (গোবিন্দের স্ত্রী) শশীমুখী একবার তাঁহাকে পাকড়াও করিয়াছিলেন।

......আমাদের মনে হয়, আবার পাছে শশিমুখীর পাল্লায় পড়েন, সম্ভবতঃ এই ভয়ে তিনি আত্মগোপন করেন।"

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। গোবিন্দদাসের কড়চাখানি ৩০ বৎসর যাবৎ দীনেশ বাবুর অপরিহার্য্য সঙ্গী হইয়া থাকিলেও ইহার প্রতি ছত্রের উপর তাঁহার শত শত অশ্রু বর্ষিত হওয়ায় তিনি চোখের জলে ভাল করিয়া দেখিতে পারেন নাই। সেইজন্যই সম্ভবতঃ এই ঘটনা সম্পর্কে তিনি এমন একটা গুরুতর ভুল করিয়াছেন। কারণ, কড়চায় আছে "সন্ন্যাস গ্রহণের পর, পুরী যাইবার পথে, প্রভু গোবিন্দসহ কাঞ্চননগরে গিয়াছিলেন"—সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প করিয়া বর্দ্ধমানের পথে কাটোয়ায় যাইবার সময় নহে। এইরূপ ভুলভ্রান্তি তো অনেকই আছে।

দীনেশ বাবুর মতে,—গোবিন্দ শশিমুখীর ভয়ে কেবল যে আত্মগোপন করিয়াছিলেন তাহা নহে, কড়চাখানিও তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে গোপন করিতে হইয়াছিল। আর, তাহার প্রমাণও কড়চা হইতে দীনেশবাবু দেখাইয়াছেন। যথা—"কড়চা করিয়া রাখি অতি সঙ্গোপনে।" কিন্তু আমেদাবাদের নন্দিনী বাগানে বসিয়া গোবিন্দ এই কথা লিখিয়াছিলেন। সেখানে শশিমুখীর যাইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। আর সেখানে একমাত্র বাঙ্গালী ছিলেন মহাপ্রভু। তিনিও তখন "সদা উন্মত্ত কৃষ্ণপ্রেমাবেশে।" কাজেই এই সুদূর অ-বাঙ্গালীর দেশে শশিমুখীর শঙ্কায় কড়চাখানি গোপন করিবার কোনই কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

আবার শশিমুখীর ভয়ে যে গোবিন্দ আত্মগোপন করিয়াছিলেন তাহার কোন আভাসই কড়চায় নাই। ইহাতে আছে, চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য হইতে পুরীতে ফিরিয়া একখানি পত্রসহ গোবিন্দকে শান্তিপুরে অদ্বৈতের নিকট যাইতে আদেশ করেন। ইহাতে গোবিন্দ কয়েকটী দিনের বিরহ ভাবিয়া কান্দিয়া আকুল হন। দীনেশবাবু বলিতেছেন, "এই কান্নার আর একটী কারণ ছিল—বঙ্গদেশে গেলে শশিমুখী পাছে তাঁহাকে ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা করেন।" কিন্তু কড়চায় আছে যে, গোবিন্দ শান্তিপুরে যাইবার জন্য বিদায় লইবার সময়—

> পৃষ্ঠে হাত দিয়া প্রভু আশিস্ করিল।
> মোর চক্ষে শতধারা বহিতে লাগিল॥
> প্রভু বলে নাহি কান্দ প্রাণের গোবিন্দ।
> আচার্য্যে আনিয়া হেথা করহ আনন্দ॥
> এই বাক্য শুনি মোর চক্ষে বারি বহে।
> প্রভুর বিরহ-বাণ প্রাণে নাহি সহে॥
> প্রভুর বিরহ-বেগ সহিব কেমনে।
> নিদারুণ কষ্ট আসি উপজিল মনে॥

ইহাতে শশিমুখীর জন্য ভয়ের কোন কথা বা আভাস পাওয়া যাইতেছে না।

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন, "শশিমুখীর যে পরিচয় এই কড়চাতে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সে যদি জানিতে পারিত যে তাহার স্বামী পুরীতে আছেন, তবে সে বনজঙ্গল অতিক্রম করিয়া নিশ্চয়ই পুরীতে আসিত এবং গোবিন্দকে পুনরায় গ্রেপ্তার না করিয়া ফিরিত না।" কিন্তু সে ইহা করিল না কেন? আর শশিমুখী প্রকৃতই যদি তার স্বামীকে ফিরাইয়া পাইবার জন্য এতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, তবে পুরী যাইবার পথে শ্রীগৌরাঙ্গ যখন গোবিন্দকে তাহার হাতে সঁপিয়া দিয়া গেলেন, তখন সে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল কেন? আর যদি বা কোন গতিকে গোবিন্দ তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া প্রভুর পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে পুনরায় পাকড়াও করিবার জন্য শশিমুখী তাহার পিছু ছুটিল না কেন। আবার মহাপ্রভুর দক্ষিণ দেশ হইতে পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন-সংবাদ সমগ্র বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইলে, শশিমুখী নিশ্চয় ইহা শুনিয়াছিল। সুতরাং যখন গৌড়ের ভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য দলবদ্ধ হইয়া পুরীতে যাত্রা করিলেন, তখন শশিমুখী তাঁহাদের সঙ্গে কেন গেল না, এ-প্রশ্ন সকলের মনেই উঠিতে পারে।

দীনেশ বাবুও ইহার একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, সে সময় ঘাটিয়ালদিগের দৌরাত্ম্যে পুরীর পথ সহজ ছিল না। শিবানন্দ সেনের মত প্রবলপ্রতাপান্বিত ব্যক্তির আশ্রয়ের উপর নির্ভর করিয়া কয়েকজন বাঙ্গালী-ভক্ত মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন। কাজেই স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এই পথ দুর্গম ছিল।

কেবলমাত্র "কয়েকজন বাঙ্গালী-ভক্ত মধ্যে মধ্যে যাইতেন" ইহা ঠিক নহে। প্রেমদাসের চৈতন্যচন্দ্রোদয়-কৌমুদীতে আছে—

> "নীলাচলে গৌরচন্দ্র থাকেন কৌতুকে।
> প্রতিবর্ষ গৌড়ীয়া আসিয়া দেখে সুখে॥
> ইতি মধ্যে একবর্ষে শিবানন্দ সনে।
> সহস্র সহস্র লোক চলিলা দর্শনে॥"

অন্যত্র গন্ধর্ব্ব বলিতেছেন—

> "একবর্ষে আমার ঈশ্বর আদি করি।
> সহস্র সহস্র লোক চলে নীলগিরি॥
> সর্ব্ব অভিভাবক শ্রী সেন শিবানন্দ।
> স্ত্রীপুত্রাদি সঙ্গে চলে পরম আনন্দ॥"

এইগুলি কবি কর্ণপুরের নাটকের অবিকল অনুবাদ। চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থেও আছে যে অদ্বৈত, শ্রীবাস, চন্দ্রশেখর, শিবানন্দ প্রভৃতি অনেক ভক্ত আপনাদিগের ঘরণী ও শিশুসন্তানগণসহ পুরীতে যাইতেন। সুতরাং শশিমুখী যে দুর্গম পথ বলিয়া পুরীতে যাইতে পারে নাই, এবং পুরীতে তাহার স্বামীর কোন সন্ধান পায় নাই, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

যাহা হউক দুই গোবিন্দকে এক করিবার জন্য দীনেশবাবু ৩০বৎসর কাল গবেষণাদ্বারা যে সকল যুক্তি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার মধ্যে কয়েকটী উপরে দেখাইলাম। কতকগুলি নিম্নে দেখাইতেছি—

(ক) দ্বারপাল গোবিন্দ কড়চার গোবিন্দের সেবা-বৃত্তি এক ধাঁজের।

(খ) মহাপ্রভুর খাদ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের ভার উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(গ) মহাপ্রভুর প্রতি আন্তরিকতা উভয়েরই এক রকমের।

(ঘ) উভয়েই ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগামী হইয়া বেড়াইতেন।

(ঙ) এক জন মুরারিদের পল্লীতে যাইতে তাঁহাকে বারণ করেন, আর একজন সেবাদাসীর স্পর্শ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করেন।

(চ) দ্বারপাল গোবিন্দকে বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি "শ্রীগোবিন্দ" বলিয়া সম্মান করিয়াছেন, এবং প্রেমদাসও বৈদেশিক গোবিন্দকে "শ্রীগোবিন্দ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এগুলি সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না, তাঁহার ন্যায় উচ্চদরের ঐতিহাসিকের নিকট এই সকল সমতাই প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু কোন দেশের তর্ক-শাস্ত্রের বিধান-মতে এগুলি প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না—এগুলি লোকের মনঃকল্পিত অনুমান মাত্র। কিন্তু ইহাই শেষ নহে। ইহা অপেক্ষা আরও একটী অদ্ভুত সমতা দীনেশবাবু আবিষ্কার করিয়াছেন, সেটী হইতেছে—

(ছ) দুই গোবিন্দই শূদ্র!

উভয়েই শূদ্র, সুতরাং উভয়েই এক -উভয়েই কর্ম্মকার। ইহা অপেক্ষা অশ্রেষ্ঠ যুক্তি আর কি হইতে পারে! কিন্তু তিনি নিজেই বলিয়াছেন, বৃন্দাবনদাস কৃত কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথিতে ঈশ্বরপুরী 'আমি শূদ্রাধম' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। আবার কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় নিজে বৈদ্য হইয়াও বারাণসীর বৈদ্য চন্দ্রশেখরকে "শূদ্র" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দীনেশবাবুর যুক্তিমতে ইঁহাদেরও কর্ম্মকার হওয়া কর্ত্তব্য।

দীনেশবাবুর মতে বঙ্গদেশে আসিয়া গোবিন্দের আত্ম-গোপনের আবশ্যকতা হইয়াছিল। যদি তাহাই হয়,—শশিমুখীর পাল্লায় আবার ধরা পড়িবার ভয়ে যদি তাঁহার নিজের বাড়ীর পরিচয় পর্য্যন্ত গোপন করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা হইলে তিনি নিজের নামটী কেন গোপন করিলেন না, তাহার কোন কৈফিয়ৎ দীনেশবাবু দেন নাই।

ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া গোবিন্দ-কর্ম্মকার কিভাবে আত্মগোপন করিয়াছিলেন তাহা ত দীনেশবাবু দেখাইলেন, কিন্তু ঈশ্বরপুরীর সেবক সাজিয়া ২৫ বৎসরকাল তিনি কিরূপে সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া কাটাইলেন সে কথার কোন সমাধান দীনেশবাবু করেন নাই। গোবিন্দের আকৃতি, প্রকৃতি, চালচলন, হাবভাব, কথাবার্ত্তা, এমন কি গলার স্বর পর্য্যন্ত কি করিয়া এরূপ পরিবর্ত্তিত হইল যে, যাঁহাদের সঙ্গে তিনি অনেক দিন ধরিয়া মেলামেশা ও বসবাস করিয়াছিলেন, তাঁহারাও তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না! এরূপ বেমালুম ছদ্মবেশ সহজে ধারণ করা সুকঠিন। বিশেষতঃ গোবিন্দের মত ব্যক্তির পক্ষে ইহা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা যে এক বিষম আশ্চর্য্য ব্যাপার, তাহা দীনেশবাবু কখনই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু কি করিয়া গোবিন্দ এই অঘটন ঘটাইলেন দীনেশবাবু তাহা বলেন নাই। ইহা অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া কৈফিয়ৎ দেওয়া যাইত। কিন্তু দীনেশবাবু বলিয়াছেন তিনি অলৌকিক ব্যাপারে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। তাঁহার মতে এসব ভাবরাজ্যের কথা,—গোড়া বৈষ্ণবদিগের প্রলাপ মাত্র। তিনি নিজেই বলিয়াছেন "আমি গোড়া বৈষ্ণব নহি, এমন কি, বৈষ্ণবই নহি, আমি শাক্ত।" কাজেই বাস্তব লইয়া ব্যস্ত থাকেন, ভাবরাজ্যের কোন ধারই ধারেন না। কিন্তু কি কৌশলে গোবিন্দ এরূপ নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন, তাহার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া দীনেশবাবুর কি কর্ত্তব্য নয়।

আমাদের মনে হয় আসল কথা এই যে, যে বৈদেশিক গোবিন্দকে খাড়া করিয়া দীনেশবাবু দুই গোবিন্দকে এক করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, আদৌ তাহার কোন অস্তিত্বই আছে কি না, আগে তাহাই বিবেচ্য। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন যে, প্রেমদাসের চৈতন্য-চন্দ্রোদয় কৌমুদী গ্রন্থখানি "মূলতঃ কবিকর্ণপুরের চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও কোন কোন অবান্তর কথা ইহাতে আছে।"

কথাটা ঠিক নয়। কবিকর্ণপুরের সংস্কৃত নাটকখানির অবিকল অনুবাদ প্রেমদাস বাঙ্গালা কবিতায় করিয়াছেন। তবে স্থান বিশেষে নূতন কথা বা নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়া উহা আরও অধিক চিত্তা-কর্ষক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যেমন, কবিকর্ণপুরের নাটকে আছে যে গন্ধর্ব্বের প্রশ্নোত্তরে বৈদেশিক বলিতেছেন, "নরহরি দাসাদিভিরহং প্রেষিতঃ।" প্রেমদাস তাহার অনুবাদ করিলেন—

"খণ্ডবাসী নরহরিদাস আদি সভে।
মোরে পাঠাইয়া দিলা কার্য্যের গৌরবে॥"

কবিকর্ণপুরের নাটকে নরহরি প্রভৃতির সহিত বৈদেশিকের কথাবার্ত্তা লিখিত নাই, কিন্তু বিষয়টী আরও পরিষ্কার ও হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য প্রেমদাস তাঁহার কৌমুদীতে এই কথাবার্ত্তা রচনা করিয়া দিয়াছেন।

দীনেশবাবু বলিতেছেন যে গোবিন্দ নিজকে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে আপনাকে 'বৈদেশিক' বলিয়া জানাইয়াছেন। কিন্তু একথা ঠিক নহে। কারণ প্রেমদাসের পুস্তকে 'গোবিন্দ' নাম থাকিলেও, তিনি যে গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়া তাঁহার 'কৌমুদী' লিখিয়াছেন, সেই কবিকর্ণপুরের নাটকে গোবিন্দের নাম-গন্ধও নাই, তাহাতে আছে কেবল 'বৈদেশিক'। সুতরাং 'গোবিন্দ' নামটী প্রেম-দাসের নিজস্ব। স্বকপোল-কল্পনা মাত্র। এখন কথা হইতেছে, কবিকর্ণ-পুরের নাটকে যে নামের উল্লেখ নাই, প্রেমদাস তাহা পাইলেন কোথায়? কবিকর্ণপুর তাঁহার নাটক শেষ করিয়া লিখিয়াছেন—

"শাকে চতুর্দ্দশশতে রবিবাজিযুক্তে
গৌরোহরির্ধরণিমণ্ডল আবিরাসীৎ।
তস্মিংশ্চতুর্নবতিভাজি তদীয় লীলা-
গ্রন্থোঽয়মাবিরভবৎকতমস্য বক্ত্রাৎ॥"

প্রেমদাস ত্রিপদীতে ইহার অনুবাদ করিয়াছেন—

চৌদ্দশত সাত শকে নবদ্বীপে নরলোকে
গৌরহরির আবির্ভাব হৈল।

চৌদ্দশত চোরনুই শক যবে,—গ্রন্থ এই
মোর মুখে প্রকট হইল।
কর্ণপুর ইহা বলি শ্রীচৈতন্যে নমস্করি
নাটক করিলা সমাপন।
ষোল শত চৌত্রিশ শকে লৌকিক ভাষাতে মুখে
প্রেমদাস করিল লিখন॥

সুতরাং কবিকর্ণপুর ১৪৯৪ শকে তাঁহার নাটক রচনা করেন, আর ইহার ১৪০বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৬৩৪ শকে প্রেমদাস ইহার অনুবাদ করেন। কবিকর্ণপুর মহাপ্রভুর শেষ লীলাগুলির কতক স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শিবানন্দ সেনের নিকটেও তিনি অনেক বিষয় জানিতে পারেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য পার্ষদ ভক্তদিগের মুখেও অনেক কথা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু প্রেমদাসের পক্ষে সেরূপ সুযোগ ও সুবিধা হইতে পারে না। সুতরাং কবিকর্ণপুর তাঁহার নাটকে যে সকল ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন, তাহা ছাড়া নুতন কিছু অবগত হওয়া প্রেমদাসের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না। কাজেই বৈদেশিকের 'গোবিন্দ' নাম যখন কবিকর্ণপুর লিখিয়া যান নাই, তখন প্রেমদাসের পক্ষে এই নাম অবগত হওয়া একবারে অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ সামান্য একজন বৈষ্ণবের নাম,—যাহার উল্লেখ অপর কোন গ্রন্থে নাই,—তাহা মহাপ্রভুর অপ্রকটের ১৮০বৎসর পরে এবং বৈদেশিকের আবির্ভাবের ২০০ বৎসর পরে, কাহারও পক্ষে অবগত হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

আমাদের মনে হয় নাটকের ঘটনাবলী ভাল ভাবে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যেমন কবিকর্ণপুরকে কলি, অধর্ম্ম, বিরাগ, ভক্তিদেবী, মৈত্রী প্রভৃতিকে আনিতে হইয়াছে, মহাপ্রভুর কতকগুলি লীলাকাহিনী বিবৃত করিবার জন্য সেইরূপ গন্ধর্ব্ব ও বৈদেশিককে নাট্যোলিখিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে আনিতে হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে, ইঁহারা কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন। আবার, প্রেমদাসও সেই একই কারণে,—অর্থাৎ তাঁহার 'কৌমুদী' গ্রন্থের অংশবিশেষ অধিকতর হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য বৈদেশিকেরও একটা নামকরণ করিয়াছেন মাত্র। ইহা হইতে কোন ঐতিহাসিক ঘটনা টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা দুরাশা মাত্র।

আর দুই একটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। দীনেশবাবু বলিয়াছেন,—"এই দীর্ঘকালের সঙ্গী, যাঁহাকে বৈষ্ণবেরা "শ্রীগোবিন্দ" নামে অভিহিত করিয়া সম্মান করিয়াছেন, তাঁহার বাড়ী কোথায়, এবং তিনি বঙ্গবাসী এই কথা ঠিক হইলেও, তাঁহার আর কোন পরিচয় কেহ দেন নাই, ইহাও বড় আশ্চর্য্যের কথা।" তাঁহার ন্যায় ঐতিহাসিকের নিকট ইহা আশ্চর্য্যের কথা হইতে পারে, কিন্তু ইহা বৈষ্ণবের ভাবরাজ্যের ব্যাপার। তাঁহারা দীনেশবাবুর ন্যায় ঐতিহাসিক ছিলেন না, কাজেই ঘর বাড়ী প্রভৃতির ন্যায় সামান্য বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন না। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন "অপরাপর সঙ্গীদিগের সকলের পরিচয়ই তো বৈষ্ণব-গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়।" কিন্তু সকল পার্ষদ ভক্তদিগেরই পরিচয় যে বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে, ইহা ঠিক নহে। চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে শাখা-বর্ণনায় অনেক বৈষ্ণবের নাম আছে যাহাদিগের বাড়ীঘরের খোঁজ খবর কোন বৈষ্ণবলেখক দেন নাই।

আর একটী কথা প্রেমদাসের গ্রন্থে আছে—

গন্ধর্ব্ব বলেন,—"ভাই, কোথা হৈতে তুমি?"
বৈদেশিক কহে —"উত্তর রাঢ়ে থাকি আমি।"

ইহা পাঠ করিয়া কি মনে হয় যে, বাড়ীর কথা বলিলে ধরা পড়িবেন ভাবিয়া বৈদেশিক এইরূপ উত্তর দিলেন? সম্ভবতঃ তাঁহার বাড়ী কোন ক্ষুদ্র গ্রামে, সে গ্রামের নাম বলিলে কেহ চিনিতে পারিবে না বলিয়াই হয়ত তিনি "উত্তর রাঢ়ে" বাড়ী বলিয়াছেন। সামান্য পল্লীগ্রামবাসীরা অনেক সময় এইজন্যেই কেবল জেলা, মহকুমা বা পরগণা অথবা নিকটবর্ত্তী কোন সহর বা বড় গ্রামের নাম করিয়া থাকেন। অথচ "আমি উত্তর রাঢ়ে থাকি" বৈদেশিকের এই কথা দ্বারা দীনেশবাবু সাব্যস্ত করিয়া লইলেন যে তিনি আত্মগোপন করিবার জন্যই এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন।

দীনেশবাবু ঠিকই বলিয়াছেন, "এখন ঐতিহাসিক বিচারের যুগ; অন্ধভাবে কোন কথা গ্রহণের দিন চলিয়া গিয়াছে।" তিনি যে এক জন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে পাওয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ গোবিন্দদাসের কড়চাখানি ৩০বৎসর যাবৎ তাঁহার অপরিহার্য্য সঙ্গী হইয়া আছে, সুতরাং গোবিন্দদাসের কড়চা সম্বন্ধে যে সকল আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে, তাহার একটা সমাধান তাঁহার দ্বারাই হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকের ৫ম সংস্করণে তিনিই লিখিয়াছেন—

"গোবিন্দদাসের কড়চার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কতিপয় স্বার্থপর ব্যক্তি এবং সংস্কারান্ধ পণ্ডিত একটা বৃথা হৈ চৈ তুলিয়াছিলেন। মৎসম্পাদিত কড়চার নূতন সংস্করণে (যাহা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে) বিস্তারিত ভাবে প্রতিপক্ষীয় দলের ভ্রম নিরসন করা হইয়াছে।"

তিনি নিজেই বলিয়াছেন "আমি ভুলগুলি আঁকড়াইয়া ধরিয়া নিজের জেদ বজায় রাখিব এরূপ মতিচ্ছন্ন আমার হয় নাই।" বেশ কথা। কিন্তু আমরা ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্রকে বিচার-প্রার্থী হইয়া জিজ্ঞাসা করি, যে সকল প্রমাণ বা অনুমান বা কল্পনা দ্বারা তিনি দুই গোবিন্দকে এক করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন তাহাতে কি তিনি প্রকৃতই কৃতকার্য্য হইয়াছেন? আমরাও পাঠকদিগকে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্রের প্রমাণগুলিকে অন্ধভাবে গ্রহণ করিতে না বলিয়া বিচারের নিকষে যাচাই করিয়া গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ

মুক্তির প্রতীক্ষায়

(গল্প)

[শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ]

১

বাংলার এক খানি বিশিষ্ট পল্লীগ্রামের উপকণ্ঠে চারি পাশে গাছ-পালায় ঘেরা এক খানি ছোট সুন্দর বাড়ী; তাহার পশ্চাদ্দিকে একটী ছোট পুষ্করিণী, পাড়ে পাড়ে নানা বর্ণের ফুলের গাছ ও তাহার পাশে দাল-কলাইয়ের ক্ষেত।

বাহিরের দিকে দেওয়ালে লেখা আছে, "শান্তি-কুটীর।"

বৈঠকখানা ঘরে এক খানি টেবিল, এক খানি চেয়ার। একপাশে মেজের উপর তিন চারিটী চরকা ও কয়েকটি লাটাই, কিছু তুলা এবং দেওয়ালে অন্যান্য কয়েক খানি ফটোগ্রাফের সহিত মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহেরু, ডাঃ আনসারী প্রভৃতি স্বনামধন্য দেশ-নেতাদের প্রতিকৃতি টাঙ্গান রহিয়াছে।

পল্লীগ্রামের মধ্যে কিন্তু এরূপ সুসজ্জিত বৈঠকখানা আজকাল জন-মানবের সমাগমে মুখরিত হয় না; মাঝে মাঝে শিশুকণ্ঠের কলধ্বনি ভাসিয়া আসিয়া প্রতিবেশী ও পথচারীদিগকে জানাইয়া দিত যে এই গৃহখানি মনুষ্য-বর্জ্জিত নয়। এই বাড়ীর আশ পাশের লোকেরা যাহারা ভিতরের সংবাদ অবগত আছে তাহারা দূর হইতেই, আহা তাই ত বেচারী, গ্রহ, বরাত ইত্যাদি বলিয়াই ঐ গৃহের অধিবাসীদের বা কর্ত্তার প্রতি সহানুভূতি জানায়; কিন্তু উহার দ্বার অবধি অগ্রসর হইতে পাড়ার দুই চারিটী যুবক ও এক জন বৃদ্ধা ভিন্ন আর কাহাকেও দেখা যায় না।

নবাগত কোনো কোনো লোক যদি গ্রামবাসীদের নিকট ঐ বাটীর মালিকের সংবাদ জানিতে চায় বা তাহার বাড়ী জিজ্ঞাসা করে তাহা হইলে উত্তরে প্রতিবেশী বৃদ্ধদের নিকট হইতে একবাক্যে শোনে—'ও কপাল—তা জান না বুঝি? কেন এ গ্রামের বিজন পালের নাম শোন নি? সে এক হৈ হৈ ব্যাপার, খবরের কাগজে ত কত লেখা-লিখি হ'ল, তা ঐ লেখাই সার, শুনবে তার কথা, আচ্ছা তবে আমার বাড়ীতে এস ভায়া, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ত সে সব কথা বলা উচিত নয়, রাস্তারও কাণ আছে ভায়া—কাজ কি কে জানে ও টিকটিকিদের ত বিশ্বাস নেই,' কথাটা বলেই বক্তা একবার সাবধানে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্মিত আগন্তুককে লইয়া একেবারে আপনার বৈঠকখানায় গিয়া নিশ্চিন্ত মনে বলিতে আরম্ভ করেন:—

'সে আজ প্রায় দুই বছর হ'ল বা দু'বছরের ওপর হ'য়ে গেল, এক দিন সকালে উঠে শুনি চারিদিকে যেন কিসের গোলমাল, তাড়াতাড়ি ত সব রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম, দেখি কি ঐ যে বাড়ীটা দেখলে হে ঐ বাড়ীটা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে লালপাগড়ী, মাথায় মোটা লাঠি হাতে এক দল লোক! দেখেই ত চক্ষুস্থির, ভয়ে ত সব একেবারে চোখকাণ বুজে ছুটে গিয়ে যে যার বাড়ী হাজির হওয়া গেল।

একটু পরেই ছোঁড়ার দল সমস্বরে চীৎকার করে উঠ্‌ল "বন্দেমাতরম্"। বার দুই তিন ঐ রকম চেঁচিয়ে তারা চুপ করল; তার পর খানিক পরে যখন সব গোলমাল থেমে গেল, তখন ত দুর্গানাম স্মরণ করে আমরা বুড়োর দল বেরিয়ে পড়লুম ব্যাপার কি জানবার জন্যে। বেরিয়ে শুনলুম কি জান ভায়া সেই লোকগুলো গ্রাম থেকে চলে গেছে বটে, কিন্তু ঐ যে বাড়ীর কথা বল্লুম না, ঐ বাড়ীর বর্ত্তমান কর্ত্তা আমাদের বন্ধু হরিহর পালের একমাত্র বংশধর বিজন পালকে গেরেপ্তার করে নিয়ে গেছে। শুনে সত্যিই মনে আমাদের তার জন্যে, বিশেষ করে তার বিধবা মা আর সদ্য-প্রসূতা ছেলে মানুষ বউটার কথা মনে করে বড় দুঃখ হয়েছিল; কিন্তু হলে কি হবে, গিয়ে যে তাদের একটু সান্ত্বনা দেব, কি মেয়েরা গিয়ে একটু দেখা শুনা করবে তার ত উপায় নেই, পুলিশের হাতে পড়ে

হয় ত শ্রীঘর-বাস করতে হ'বে, বলত ভায়া বুড়ো বয়সে সে সাহস কি আর হয়, কাজেই মনে দুঃখ হলেও কাজে কিছুই তাদের জন্যে আমরা করতে পারি নে!

তাকে যে দিন ধরে নে যায় তার আগের দিন তার মেয়ের ষষ্ঠী পূজো হয়েছে। ওই প্রথম সন্তান, কত আহ্লাদ করে গ্রাম শুদ্ধ লোককে খাওয়ালে-দাওয়ালে, আর তার পর দিনই এই ঘটনা, গ্রহের ফের ছাড়া আর কি বল্‌ব। ইতিমধ্যে সেখানে কয়েকজন বয়োবৃদ্ধ আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহাদের কেহ বা মন্তব্য প্রকাশ করলেন, "ছেলেটা সত্যিই বড় ভাল ছিল, কেন যে ধরলে তা কিছু ত জানাও গেল না, আদালতে বিচারও ত কই হল না, কবে যে ছেড়ে দেবে তার ত কিছু স্থির নেই।"

আবার কেহ বা একটু বেশী মুরুব্বীয়ানা দেখিয়ে বলিলেন, "আজকালকার ছোঁড়াগুলোও হয়েছে জেদি, একরোখা মত, ভয় নেই কেবল বলে, আমরা কেন চিরকাল নীচু হয়ে থাক্‌ব—কিসের জন্যেই বা পরাধীন হয়ে দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ কর্‌ব, বড় হবার চেষ্টা করতে হবে সকলকে, তা হলে কেউ আমাদের অপমান করতে পারবে না। তারা আমাদের শুদ্ধ দলে টান্‌তে চায়, আরে বাবু আমাদের কি তোদের মত বয়েস আছে যে ডাংপিটে-পনা করে তোদের সঙ্গে নেচে বেড়াব, আর তাও বলি ঐ রকম হুজুক করে ছোঁড়াগুলো কি নিজেরাই কম নাজেহাল হচ্ছে, তবু কি বাগ মানতে চায়।

বিজনটাও ছেলে ভাল, হ'লে কি হ'বে, ওই সব স্বদেশীতে তার খুব উৎসাহ ছিল, সে না থাকায় অন্য ছেলেগুলো যেন একটু মন-মরা হয়ে আছে; তা বলে কিন্তু ওরা নিজেদের জেদ ছাড়ে নি।"

এই সব শুনে আগন্তুক ভদ্রলোক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সহানুভূতির স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আহা তাই ত, তা তাঁর মা, স্ত্রী, কন্যা তাঁদের দেখা শুনা করছে কে? আপনারা ত বলছেন ভয়ে যেতে পারেন না?"

প্রতিবেশী বক্তা একটু হেসে বলেন, "তা আমরা যেতে পারিনে বলে তাদের দেখবার লোকের অভাব নেই, বিজনেরই শিষ্য ও বন্ধু চার পাঁচজন ছেলে প্রাণের মায়া ছেড়ে যখন-তখন তাদের বাড়ী যাচ্ছে-আসছে, যখন যা দরকার কিনে এনে দিচ্ছে, অসুখে-বিসুখে প্রাণপাত করে সেবা করছে, তারা ও গ্রামের ছেলে—আমাদের ছেলেরাও হয় ত লুকিয়ে চুরিয়ে গিয়ে বন্ধু-বাড়ীর খবর নিয়ে আসে, তা আমুক তাতে বকতে ইচ্ছেও হয় না, আর বকলে ফলও হবে না। আজ কালকার ছেলে, তারা যা ভাল বুঝবে তা করবেই কি বল ভায়া?"

প্রশ্নকারী একটু হেসে বলে, "সে ত ভাল কথা, আপনার কথা শুনে শুনে মনে হচ্ছে এই পাড়াগাঁয়ে তা হলে বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রাখবার, বিপন্নকে সাহায্য করবার মত লোক এখনও আছে। ভগবানের কৃপায় তা হলে আমরা সদ্‌গুণ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত হই নি, আমরা এখনও জড়ে পরিণত হই নি। আচ্ছা নমস্কার, তা হ'লে এখন উঠি মশাই।"

বৃদ্ধ বক্তা ও শ্রোতাদের মস্তক লজ্জায় আপনি নত হইয়া আসিল।

"যাইবার সময় আগন্তুক ফিরবার পথে একবার বিজনবাবুর বাড়ী হ'য়ে তাঁর বন্ধু কেহ থাকলে তাঁর কাছে নয় ত তাঁর মার কাছে তাঁর বাড়ীর কুশল জিজ্ঞাসা করে যাব," বলিয়া ভদ্রলোক চঞ্চলপদে অগ্রসর হইলেন।

২

পল্লীর পথে-প্রান্তরে তখন সন্ধ্যারাণী ধীরে ধীরে আপনার অধিকার বিস্তার করিতেছিল। রাখাল বালকেরা আপন মনে গুন্ গুন্ সুরে গান গাহিতে গাহিতে আপন আপন গাভীগুলি লইয়া মাঠ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। এই গোধূলি-সন্ধ্যায় ছোট লাল বাড়ীখানার একটী ঈষদুন্মুক্ত জানালার মধ্য দিয়া পথের দিকে নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া ছিলেন একটি যুবতী বধূ। তাহার ব্যাকুল নয়ন দুটী যেন কাহার আগমন-আশায় চকিতা হরিণীর মত বার বার পথচারী পথিক মাত্রের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইতেছে, আবার গভীর নিরাশায় মৃত্তিকা সংলগ্ন হইতেছে। হঠাৎ কোনও একটু শব্দ হইলে সে যেন চকিতে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া শব্দটী অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছে—তাহার অতি পরিচিত দুই খানি পদের শব্দ কি না?

তাহার ব্যাকুল অন্বেষণ ব্যর্থ করিয়া দিয়া যখন সন্ধ্যা ক্রমে গাঢ় অন্ধকার বিস্তার করিয়া ঘনীভূত হইল, তখন

চতুর্দ্দিকের সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টার শব্দে চকিত হইয়া বধূটী জানালা বন্ধ করিয়া দিল। এই সময় একটী সুগভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস তাহার বক্ষঃস্থল আলোড়িত করিয়া বাহির হইল।

তার পর ধীরে দুই হাত জোড় করিয়া উর্দ্ধপানে চাহিয়া আপনার অন্তরের আকুল আবেদন বিধাতার চরণে নীরবে জানাইয়া সে শ্রান্ত অবসন্নভাবে বিছানায় লুটাইয়া পড়িল।

বধূর জন্ত পথ্য হাতে নিয়া দ্বার-প্রান্তে এক মলিন-বদনা বর্ষীয়সী বিধবা ঠিক ইহার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে উপস্থিত হইয়া তাহার সেই আর্ত্ত মূর্ত্তি দেখিয়া সজল নয়নে তখনকার মত তাহাকে খাওয়াইবার ইচ্ছা স্থগিত রাখিলেন; পরে নিঃশব্দে তুলসীমঞ্চের প্রজ্বলিত প্রদীপের সম্মুখে গিয়া নত-জানু হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে অধীরকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—"দয়াময় অনাথের নাথ, দুঃখিনীর বাছাকে ঘরে ফিরিয়ে এনে দাও ঠাকুর! নিরপরাধা বালিকার স্বামীকে তার কাছে এনে দিয়ে তাকে প্রাণে বাঁচাও প্রভু, আমার বিজনকে আমার কোলে ফিরিয়ে দাও, দাও হরি, আর যে তার অদর্শন সহ্য করতে পারিনে ঠাকুর", বলিতে বলিতে তিনি তুলসীমঞ্চে বার বার মাথা ঠুকিতে লাগিলেন। আর নৈশ বায়ুতে কাঁপিয়া কাঁপিয়া মর্ম্মাহতা জননীর আকুল আহ্বান তুলসীমঞ্চ ও ক্ষুদ্র উঠানখানি ঘিরিয়া ফিরিতে লাগিল।

৩

"বৌমা, আজ কেমন আছ মা, একটু ভাল বোধ হচ্ছে কি?"

একটু ভাল আছি, কিন্তু মা, আমার মনে হচ্ছে আর এবার আমি ভাল হয়ে উঠব না।"

"বালাই ষাট, ছিঃ মা ও-কথা কি বলতে আছে, সেরে উঠবে বৈ কি, তুমি যে আমার ঘরের লক্ষ্মী মা।"

"লক্ষ্মী আর হ'তে পারলুম কই মা, অলক্ষ্মীই হয়েই গেলুম, তা না হ'লে কি আর অকারণ এমন দুর্দ্দশা সকলকে ভোগ করতেই হ'ত, না চোখের জলে দিন কাটাতে হ'ত।" বধূর শীর্ণ গণ্ড বহিয়া অশ্রুরাজি ঝরিয়া পড়িল।

শ্বশ্রূর নয়নও শুষ্ক রহিল না, তিনি ব্যস্ত ভাবে আঁচল দিয়া বধূর চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "না মা, সে আমাদের অদৃষ্ট, তা বলে তুমি অলক্ষ্মী হতে যাবে কেন মা—তুমি সত্যই আমার গৃহলক্ষ্মী।"

"মা জেলখানার সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে চিঠি দেওয়া হয়েছে কি?"

"হ্যাঁ সে ত' নিতাই আজ প্রায় সাত দিন আগে দিয়েছে, তার পর তারা আর কোথায় জানাতে লিখেছে, নিতাই বলছিল আমার জবানীতে লিখে দেবে যদি তাদের দয়া হয়। আজ বিকেলে সে আসবে, আমি যা বলব তাই লিখে পাঠিয়ে দেবে, তার পর মা আমার বরাত, আর তোমার বরাত"—গভীর দুঃখের সহিত গৃহিণীর মুখ দিয়া বাহির হইল. "আর কত দেরী ঠাকুর!" অজ্ঞাত অপরাধের শাস্তির কি আজো শেষ হয় নি প্রভু!

"আবার বড় মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে মা, বোধ হয় জ্বর বাড়ছে, পূর্ণিমা-কোথায় মা, তাকে একবার আমার কাছে দিয়ে যান। বেলা হ'ল আপনি চারটী ভাতে ভাত রেঁধে মুখে দিয়ে আসুন; এমন করে দিন রাত আমার সঙ্গে থেকে রোগের সেবা করে আপনি শুদ্ধ পড়লে কে দেখবে?"

"পাশের বাড়ী খেলতে গেছে, ওদের মেয়ে বড্ড ভাল বাসে। সারাদিন ওকে কোলে বুকে করে নিয়ে থাকে, অনাথের দৈব-সখা, সে অমন করে পূর্ণাকে ভুলিয়ে নিয়ে না থাকলে যে তোমার অসুখের সময় আমি কি করতুম তা জানি না। যাই তাদের ডেকে নিয়ে আসি। এইখানে এসে তারা খেলা করুক, তুমি দেখো।"

উপর্য্যুপরি কয়েকটী সন্তান-বিয়োগ-জনিত শোকের আঘাতে লালবাড়ীর গৃহিণীর শরীর ও মন যখন অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তখন নানাবিধ ব্রত ও দেবতার মানসিক করিয়া তিনি যে পুত্রসন্তানটী কোলে পাইয়াছিলেন, তাহাকে শোকার্ত্ত অন্তরের সমস্ত স্নেহ দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়া আবার তাঁহার শরীর মন প্রফুল্ল হইয়াছিল। তার পর তাঁহার বিজনের যখন উনিশ বছর বয়স তখন কর্ত্তা পুত্রবধূর মুখ দেখার সাধ অপূর্ণ রাখিয়া পরপারে চলিয়া গেলেন। বৎসরান্তে কালাশৌচ কাটিয়া

ওসমান কহিলেন—"আমরা পাঠান—অন্তঃকরণ প্রজ্বলিত হইলে উচিতানুচিত বিবেচনা করি না,
এ পৃথিবী মধ্যে আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দুই ব্যক্তির স্থান হয় না, এক জন এই খানে প্রাণত্যাগ করিব।

—দুর্গেশনন্দিনী।

গেলে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া তিনি সুন্দরী লক্ষ্মী-স্বরূপা মেয়ের সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। তাহাদের সুখে সুখী হইয়াই বাকী দিন কটা কাটাইয়া দিবেন মনে মনে স্থির করিলেন। কিন্তু তাঁহার দুরদৃষ্ট সে সুখটুকু হইতেও তাঁহাকে বঞ্চিত করিল। বিবাহের প্রায় চার বৎসর পরে এক দিন দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়িয়া বিনাদোষে বিজন পুলিশের হস্তে ধৃত হইয়া রাজবন্দীরূপে কারাগারে গেল। সে আজ প্রায় আড়াই বৎসর পূর্ব্বের কথা।

যেদিন বিজনের মা শুনিলেন তাঁহার একমাত্র পুত্র বিনা অপরাধে বন্দী হইয়াছে, আর কবে মুক্তি পাইবে তাহারও কিছু স্থিরতা নাই, সে দিন জগৎ তাঁহার নিকট বিষময় মনে হইয়াছিল, জীবন দুর্ব্বহ হইয়া পড়িল। সেই দিন হইতে তিনি যে শয্যার আশ্রয় লন, আর তাহা হইতে উঠিবার সামর্থ্য বা উৎসাহ তাঁহার ছিল না।

হয় ত উঠিতেন না, কিন্তু পতি-বিরহ-বিধুরা সদ্য-প্রসূতি বধূর মুখ চাহিয়া ও তাহার নিরন্তর সেবা-যত্নে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া আবার তাঁহাকে উঠিতে হইল। পিতৃস্নেহ-বঞ্চিত শিশু ও বধূকে লইয়া বৃদ্ধ বয়সে আবার নূতন করিয়া সংসার পাতিতে হইল।

কিন্তু হায়রে পোড়া অদৃষ্ট! তাহাতেও বাদ সাধিল বধূর এই সঙ্কটাপন্ন রোগ। কি করিবেন, কাহাকে ডাকি-বেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ভাগ্যে বিজনের দু' তিন জন প্রতিবেশী বন্ধু স্বেচ্ছায় প্রত্যহ আসিয়া দেখা শুনা করিয়া যায়, তাহা না হইলে আজ তিনি কি বা করিতেন! ভাবিতে ভাবিতে গৃহিণীর মনে পড়িয়া গেল এখনি বিজনের মুক্তির জন্য তাঁহার জবানিতে পত্র লিখাইতে হইবে ও বধূর জন্য ডাক্তার ডাকিতে হইবে; সুতরাং তিনি গৃহ ছাড়িয়া নিতাইদের বাড়ীর দিকে দ্রুত-পদে চলিলেন।

৪

লাল বাড়ীতে গভীর বিষাদ ও স্তব্ধতা বিরাজ করি-তেছে। আজ সাত দিন হইল বধূটী একেবারে সংজ্ঞা-শূন্যা। ডাক্তার আশা দিতে পারেন নাই, বলিয়াছেন—ডবল নিউমোনিয়া, হার্টও অত্যন্ত দুর্ব্বল। তবে তাঁহার ডাক্তারী চিকিৎসায় যতদূর সম্ভব ব্যবস্থার ত্রুটি করেন নাই। বধূর এক একটা প্রলাপোক্তি শুনিয়া ও নিতাইয়ের নিকট তাহাদের অবস্থার কথা জানিয়া ডাক্তার রুমালে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়াছিলেন এবং এক দিনও ভিজিট লন নাই। দুই দিন হইল অবস্থা খারাপ বুঝিয়া তিনি নিজে গভর্ণরের নিকট তার করিয়া জানাইয়াছেন,—রাজ-বন্দী বিজন পালের স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়, বাঁচিবার আশা খুবই কম, আপনি অবিলম্বে তাহাকে ছুটী দিয়া পতি-প্রাণা পত্নীর শেষ আশা পূর্ণ করুন। আজ তাহার আসিবার অপেক্ষায় ডাক্তার অস্থির ভাবে রোগিণীর গৃহের বাহিরে পরিভ্রমণ ও মুহুর্মুহুঃ আসিয়া রোগিণীর নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিতেছিলেন।

গৃহের মধ্যে মুমূর্ষু বধূর শয্যা-প্রান্তে বসিয়া গৃহিণী আকুল হইয়া ভগবান্‌কে স্মরণ করিতেছিলেন, তাঁহার নয়ন হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল, পুত্রের মুক্তির জন্য তিনি যে চিঠি দেওয়াইয়া ছিলেন তাহার কোনো উত্তর আসে নাই, কি যে হইবে কি করিয়া তিনি বধূ ও নাতিনীকে পুত্রের নিকট ফিরাইয়া দিবেন ভাবিয়া আজ তিনি বড়ই ব্যাকুল।

পূর্ণিমাকে লইয়া এক পাশে বসিয়া নিতাইহরি খেলা করিতেছে। অবোধ বালিকা মা মা করিয়া কেবলি ছুটিয়া ছুটিয়া বিছানায় উঠিতে চাহিতেছে, সে জন্য বেচারাকে অনেক কষ্টে খেলনা লজেঞ্চুষ প্রভৃতি দিয়া ভুলাইয়া রাখিতে হইয়াছে। আজ সে মাতার নিকট হইতে কিছুতেই অন্যত্র যাইতে চাইতেছে না।

বেলা আন্দাজ চারিটার সময়ে রোগিণীর জ্ঞানের লক্ষণ দেখা গেল, সে অকস্মাৎ চক্ষু মেলিয়া উন্মুক্ত দরজার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "এসেছ এস, সত্যই কি এত দিনে তোমার অভাগিনীকে মনে পড়্‌ল—"

বলিতে বলিতে তাহার শীর্ণ ম্লান মুখমণ্ডল স্নিগ্ধ হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অন্যান্য সকলে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া নীরবে রহিলেন।

কিছুক্ষণ দ্বারের দিকে আশাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া শয্যাপ্রান্তে উপবিষ্টা শ্বশ্রূমাতার প্রতি চাহিয়া বধূ কহিল, "আপনি এখনও বসে আছেন মা; যান আপনার ছেলে যে বাহিরে এসে

দাঁড়িয়ে আছেন, এতদিন পরে এসেছেন আমরা কেউ না এগিয়ে নিয়ে এলে বোধ হয় আস্‌তে পারছেন না, আমি ত উঠ্‌তে পারছিনা মা, আপনিই গিয়ে তাঁর ঘরে তাঁকে নিয়ে আসুন, আমার মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিন মা, আর বল্‌বেন যে আমি উঠ্‌তে পারলে নিশ্চয়ই ছুটে গিয়ে এতক্ষণে তাঁকে আপনার কাছে আর তাঁর বড় আদরের পূর্ণিমার কাছে নিয়ে আস্‌তুম ; কিন্তু কি করব আমার যে এখন সে শক্তি নেই, উঃ একটু জল বড় তেষ্টা পাচ্ছে।"

গৃহিণী ত্বরিতপদে উঠিয়া জল আনিয়া বধূর মুখে অল্প অল্প করিয়া ঢালিয়া দিলেন, জল পান করিয়া গভীর শ্রান্তি-ভরে রোগিণীর মস্তক বিছানায় হেলিয়া পড়িল।

ডাক্তারবাবু ত্রস্তে শয্যাপার্শ্বে গিয়া রোগিণীর মস্তক সযত্নে উপাধানে তুলিয়া দিলেন ও ব্যগ্র ভাবে নাড়ী দেখিতে লাগিলেন।

এই সময় পূর্ণিমা উঠিয়া মার কাছে যাইবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, নিতাই তাহাকে ভুলাইবার জন্য বাহিরে লইয়া গেল।

গৃহিণী ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "কি দেখছেন ডাক্তার বাবু? মা আমার আছে ত, বলুন শীগ্‌গির বলুন বৌমা ভাল আছে ত ?"

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ব্যস্ত হবেন না, ওঁর জ্ঞান ফিরে এসেছিল, অজ্ঞানে দেখছিলেন আপনার ছেলে ফিরে এসেছেন, তাই অমন ব্যস্ত হয়ে দরজার দিকে চেয়েছিলেন, আর তাঁকে আনবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করেছিলেন। তারপর অত কথা বলে উত্তেজনায় আবার অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন, ভয় নেই আবার যে কোন মুহূর্ত্তে জ্ঞান ফিরে আস্‌বে। তবে খুব সাবধানে রাখ্‌তে হবে।"

আশ্বস্ত হইয়া বৃদ্ধা বলিলেন, "তাই বল বাবা তুমি আমার সন্তানের অধিক কাজ করেছ,—এই বিপদে তোমার সাহায্য না পেলে আমরা অকুল পাথারে পড়্‌তুম। নিতাইহরি আর তুমি—তোমাদের আমি প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করছি তোমরা চিরদিন সুখে থাক আর এমনি করেই অনাথাদের বিপদে আপদে সাহায্য কর।"

"হাঁরে নিতাই বিজনের আস্‌বার কোন খবর পেলি ? বৌমা আমার সতী লক্ষ্মী, সে যখন বলেছে এসেছে তখন বিজন আমার নিশ্চয়ই শীগ্‌গির আস্‌বে, সতীর বাক্য নিস্ফল হয় না। তার খবর কিছু পেয়েছিস্ বাবা ?"

নিতাই বলিল, "না মা. আমি ত কোন খবরই তাদের কাছে পাইনি আজ পর্য্যন্ত।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আমি নিজে লাট-সাহেবের কাছে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি আপনার কথা, আপনার বৌমার কথা অবশ্যই ঠিক হবে মা তিনি হয়ত আজ কালই এসে পড়বেন।"

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ধরণীর উপর আপনার ম্লানছায়া বিস্তার করিতেছিল, তখনো ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা হয় নাই।

রোগিণী অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে ঘুমাইতেছিল, গৃহিণী নাতনীকে কোলে লইয়া বসিয়াছিলেন। এক পাশে দুই খানা চেয়ারে বসিয়া ডাক্তারবাবু ও নিতাই গল্প করিতেছিলেন।

সহসা বাহিরে কাহার কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল, "মা আমি এসেছি। বৌ কেমন আছে মা ? লাট সাহেব আমাকে মুক্তি দিয়েছেন আমি এসেছি।" সকলে চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহিণী উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন বিজন আসিয়াছে। নাতনীকে কোলের কাছে নামাইয়া দিয়া পুত্রকে জড়াইয়া ধরিয়া আকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বাপ আমার এসেছিস্, তোকে ছেড়ে আমরা যে মরে বেঁচেছিলুম, আয় বাপ তোর মেয়েকে কোলে নিয়ে ঘরে আয়। বৌমা আমার তোর আসার পথ চেয়ে রয়েছে, সে আজই বলেছিল 'তুই এসেছিস্ বাহিরে দাঁড়িয়ে আছিস্।'

ডাক্তারবাবু, নিতাই প্রভৃতি সকলে আসিয়া আনন্দের সহিত অভিবাদন করিয়া কন্যাসহ বিজনকে ঘরে লইয়া চলিল, গৃহিণী তাহাদের পশ্চাতে চলিলেন। সকলের চক্ষেই আনন্দাশ্রু, কাহারও নয়ন আজ শুষ্ক ছিল না।

দরজার নিকট দাঁড়াইয়া এই মিলন-দৃশ্য দেখিয়া রুমালে চক্ষু মার্জ্জনা করিতে করিতে পুলিসের ইনস্পেক-টার সাহেব আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া চলিয়া গেলেন। গৃহে আসিয়া বিজন পত্নীর রোগ-শয্যার শায়িতা

ম্লানমূর্তি দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। তাহার নয়ন হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল। মাতা আসিয়া ধীরে ধীরে ডাকিলেন, "মা আমার, চেয়ে দেখ কে এসেছে, সতীলক্ষ্মী তোমার বাক্য নিষ্ফল হয় নি, আজই বিজন আমার ঘরে এসেছে।" বধূর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

ডাক্তার বলিলেন, "থাক মা, এখন ডাকবেন না, ঘুম ভাঙ্গলেই দেখ্‌তে পাবেন। হঠাৎ উঠিয়ে এ সংবাদ দিলে অত্যন্ত উত্তেজনা হ'বে। জানেন ত দুর্ব্বল শরীরে সেটা হওয়া ঠিক নয়। আপনি স্বয়ং বিজন বাবুর খাওয়ার ব্যবস্থা করুন, আমরা এখানে আছি।

"তা'ই যাই বাবা তোমরা বস" বলিয়া পুত্রকে আশ্বাস দিয়া তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া গৃহিণী রোগিণীর গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ডাক্তারবাবু পূর্ণিমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "খুকু তোমার বাবাকে বলো, শান্ত হও, মা ভাল আছে।" বালিকা পিতার কোলে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, সে একটু হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিল, কি করিবে ঠিক করিতে পারিতেছিল না। কথা বলিতে পারিয়া স্বস্তি অনুভব করিল। ডাক্তারবাবুর কথামত বলিল, "বাবা, তুমি শান্ত হও, মা ভাল আছে।" বলিয়াই নিজেই নিজের পরা ফ্রকটা দিয়া পিতার চক্ষু মুছাইয়া দিল।

বিজন এতক্ষণে যেন জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া কন্যাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া চুম্বন করিল। তার পর ডাক্তারের দিকে ফিরিয়া কহিল, "আপনি ত ডাক্তার বাবু, কেমন দেখ্‌ছেন বাঁচ্‌বে ত?"

ডাক্তার বলিলেন, "এখন ত অবস্থা একটু ভাল বোধ হচ্ছে, তবে এ ভাবটা স্থায়ী হবে কি না বল্‌তে পার্‌ছি না ত, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, চেষ্টা ত যথাসাধ্য কর্‌ছি ও কর্‌ব, তার পর আপনার ভাগ্য আর ভগবানের হাত।

তার পর বন্ধুর দিকে চাহিয়া বিজন বলিল, "ভাই নিতাই তোকে আর বেশী কি বল্‌ব, এই বিপদে তোরা না থাক্‌লে হয় ত আমি এসে আর ওকে দেখতেও পেতুম না—তোরা আমার শুধু বন্ধু নোস্ আমার ছোট ভাই।" বলিতে তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

উত্তরে নিতাই বলিল, "সে কি দাদা আমরা আর বেশী কি করেছি, আশীর্ব্বাদ করো যেন তোমার উপযুক্ত ভাই হতে পারি। আর দাদা কৃতজ্ঞতা তোমার যা জানাবার তা তুমি ডাক্তার বাবুকে জানাও", বলিয়া তাঁহার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ ডাক্তার সত্যচরণ-বাবু বিনা পারিশ্রমিকে আত্মীয়ের মত যত্ন লইয়া বৌ-দিদিকে না দেখ্‌লে আমরা কিছুই কর্‌তে পার্‌তুম না।" বলিয়া নিতাই বিজনের পত্নীর অসুখের প্রারম্ভ হইতে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিয়া গেল। সমস্ত শুনিয়া কৃতজ্ঞতায় বিজনের অন্তর ভরিয়া উঠিল। সে উঠিয়া গিয়া ডাক্তারের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার পায়ে হাত রাখিয়া বলিয়া উঠিল, "ডাক্তারবাবু, আর জন্মে আপনি আমার কে ছিলেন জানি না, কিন্তু আজ হ'তে আপনি আমার বড় ভাই, আমার দাদা," বলিয়া নত হইয়া তাঁহার পায়ে বিজন মাথা রাখিল।

ডাক্তার সত্যচরণ ব্যস্ত হইয়া,"ও কি বিজনবাবু, আপনি কি পাগল হয়েছেন, উঠুন" বলিতে বলিতে বিজনকে সস্নেহে হাত ধরিয়া তুলিয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তাই হবে আপনাকে আমি ছোট ভাই বলেই মনে কর্‌ব, আর আপনি আস্‌বার পূর্ব্বেই মা আমাকে পুত্র বলে গ্রহণ করেছেন আমিও তাঁকে মা বলেছি।" এখন যদি আপ-নার সাধ্বী স্ত্রীকে ভগবান্ আরোগ্য করে দেন তবেই আমাদের শ্রম সব সার্থক হয়।"

"তাই ত ডাক্তার দাদা, তবে কি অসুখ খুব শক্ত?"

ডাক্তার বলিলেন, "হ্যাঁ শক্ত যে তা ত বুঝ্‌তেই পাচ্ছ ভাই, তা নইলে কি আর আমার কথায় তোমাকে মুক্তি দিত। তবে দেখি যদি তোমাকে দেখে বৌ-মার রোগের অবস্থা সহজ হয়ে আসে। যখন আমাকে দাদা বলেই মেনে নিলে তখন ছোট ভাইকে আর ইংরাজের আদব কায়দায় 'আপনি' 'আপনি' বল্‌তে পার্‌লুম না।" এই সময়ে মাতা আসিয়া সকলকে আহার করিতে ডাকিলেন। আজ পুত্র বহু দিন পরে ঘরে ফিরিয়াছে, তাহাকে একলা খাওয়াইতে তাঁহার মন সরিল না। আহারের পর সকলে পরদিন প্রত্যূষে আসিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সে রাত্রে আর রোগিণীর ঘুম ভাঙ্গিল না বা জ্ঞান হইল না।

পর দিন অরুণোদয়ের কিছু পূর্ব্বে ঘুমঘোর হইতে জাগিয়া রোগিণী ডাকিল, "মা, মা"। গৃহিণী মেঝেতে শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, শুনিতে পাইলেন না। বধূর পার্শ্বে বিজন জাগিয়া বসিয়াছিল। সে রোগিণীর আহ্বান শুনিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া সন্তর্পণে তাহার এক খানি হাত ধরিয়া ডাকিল, "লতিকা, রাণী আমার।" সে স্বর ও স্পর্শে অতিমাত্রায় চমকিত হইয়া বিস্মিত নেত্রে বিজনের দিকে চাহিয়া রহিল, যেন সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না—সে নিদ্রিত কি জাগরিত, স্বামী আসিয়াছেন ইহা স্বপ্ন না সত্য? তাহার এই বিস্ময়-বিমুগ্ধ ভাব বিজনের বড় ভাল লাগিল, সে চুপ করিয়া পত্নীর হাত খানি ধরিয়া রহিল। কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিবার পর, বিস্ময়ের প্রথম ঘোরটা কাটিয়া গেলে লতিকা কহিল, "তুমি সত্যই এসেছ, আর পালিয়ে যাবে না ত? আমি রোগের মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় কতবার দেখেছি তুমি এসেছ, কিন্তু চোখ চেয়ে আর তোমায় দেখতে পাই নি, বলো আর পালাবে না ত" বলিয়া সে স্বামীর হাত খানি ঈষৎ জোরে চাপিয়া ধরিল।

বিজন হাসিমুখে কহিল, "না লতা! সরকার আমাকে মুক্তি দিয়েছে, আর আমি পালিয়ে যাব না, কিন্তু তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাবে না ত? এখন কেমন আছ?"

লতিকার শীর্ণ ম্লান মুখখানি গভীর তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। সে কম্পিত হস্তে স্বামীর পদধূলি লইয়া ধীরে ধীরে আপনার মাথায় ছোঁয়াইয়া বলিল, "তা ত আমি জানি না, তবে এইটুকু জানি যে তুমি যখন ফিরে এসেছ, আবার তোমাকে দেখতে পেয়েছি তখন আর আমার মরতেও দুঃখ নেই, আর বাঁচতেও অসাধ নেই। তবে আমার উপর ত কিছু নির্ভর করে না—ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার ওপরই সব নির্ভর করছে। আর আমার যেন মনে হচ্ছে তোমার মুক্তির পর তোমাকে দেখ্‌বার একান্ত আগ্রহেই আমি এত দিন বেঁচে আছি—এখন আমারও মুক্তি। কথাটা বুঝতে পেরেছ,—আমি প্রাণপণ বলে মৃত্যুকে যেন কোন গতিকে ঠেকিয়ে রেখেছিলুম, ভগবানের অসীম করুণায় আমার সে আশা পূর্ণ হয়েছে, এখন তিনি কোলে টেনে নিতে চান শান্তিতে যাব, আর তোমার চরণে ফেলে রাখেন ত শান্তিতে তাই থাক্‌ব—আর আমার কোনো দুঃখ নেই।" বলিয়া সে চুপ করিল।

বিজন ব্যাকুল হইয়া তাহাকে আপনার বক্ষে টানিয়া লইয়া কহিল,—"ছিঃ লতা! এমনি করে আমার মনে কষ্ট দেবার জন্যেই কি তুমি কারাগার থেকে আমায় টেনে নিয়ে এলে, আমি যে সেই নির্জ্জন ঘরে একলা বসে তোমাদের কথা ভেবে, আর আবার ফিরে এসে মাকে, তোমাকে আর আমাদের আদরের পূর্ণিমাকে নিয়ে নতুন করে সুখের ঘর বাঁধব কল্পনা করে' দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতুম, ভাবতুম এবার তোমাকে সাথী করে পূর্ণ উদ্যমে দেশের মঙ্গল-কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করব, কত কি-ই যে ঠিক করে রেখেছিলাম রাণী,—তুমি কি আমার সে সব ইচ্ছা পূর্ণ হতে দেবে না।"

উদ্বেলিত আবেগে সে আত্মহারা হইয়া রোগশয্যা-শায়িতা পত্নীর শীর্ণ দেহ স্পর্শ করিয়া আবোল তাবোল অনেক কথাই বলিয়া গেল।

বহু দিন পরে প্রিয়তমের প্রেমস্পর্শ লাভ করিয়া গভীর তৃপ্তিতে রোগিণীর মুখশ্রী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

বাহিরে ডাক্তার বাবু আসিয়া ডাকিলেন, "বিজনবাবু কি ঘুমোচ্ছেন?"

বিজনের মাতার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখিলেন বেলা হইয়া গিয়াছে, চারিদিক্ তরুণ অরুণালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। বিজন ত্রস্তে আসিয়া গৃহের দ্বার খুলিয়া দিয়া নিতাই ও অপরাপর বন্ধুদিগকে অভ্যর্থনা করিল। লতিকা মাথার কাপড় ঠিক করিয়া দিতে ইঙ্গিত করিলে বিজন আসিয়া তাহার কাপড় চাদর ঠিক করিয়া দিয়া দেখিল, কন্যা আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইয়াছে। তাহাকে কোলে করিয়া আদর করিয়া পত্নীর ইচ্ছায় তাহার কাছে বসাইয়া দিল।

তাহার মাতা বলিলেন, "বিজন তুই ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এসে বৌমাকে ভাল করে দেখতে বল, আমি কাপড় কেচে তোদের জলখাবার, বৌমার বার্লি নিয়ে আস্‌ছি।" বলিয়া বধূর কাছে গিয়া তাহার কপালে চিবুকে হাত বুলাইয়া কহিলেন—"মা লক্ষ্মী কেমন আছ আজ? কে এসেছে দেখেছ? তুমি আমার সতীরাণী মা! তোমার ইচ্ছা কি অপূর্ণ থাক্‌তে পারে?" বধূ স্মিতহাস্যে ঘাড়

নাড়িয়া জানাইল সে দেখিয়াছে এবং মুখে বলিল, "একটু ভাল আছি।" গৃহিণী খুসী হইয়া গৃহান্তরে গেলেন।

ডাক্তার রোগিণীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "অবস্থার খুব পরিবর্ত্তন হইয়াছে, গত কল্য অপেক্ষা অনেক ভাল", তার পর রোগিণীর অগোচরে বিজনকে বলিলেন, "আপনাকে দেখে আহ্লাদে তৃপ্তিতে এ সময় এঁর অবস্থা আশাতীত ভাল হয়েছে, কিন্তু যদি বিকাল অবধি এ ভাবটা স্থায়ী হয় তবেই জীবনের আশা করা যাবে।" নিতাই-হরি, বিজন সকলেই এ কথায় একটু চিন্তিত হইল।

নিতাই লতিকার বিছানার কাছে আসিয়া বলিল, "দেখুন বৌদি! আমরা আপনার জিনিস আপনার কাছে পৌছিয়ে দিলাম। আর আমাদের কোনো দায় নেই, এবার আপনি আঁচল দিয়ে দাদাকে ঢেকে রাখুন। পাশের বাড়ীর রাম বলিল "হ্যাঁ, আর বৌদি সেরে উঠে নিজের হাতে আমাদের একদিন খাইয়ে দিন। জানেন ডাক্তার বাবু বৌদি আমাদের রন্ধনে দ্রৌপদী।" লতিকা একটু হাসিয়া বলিল, "তোমরা আমার অনেক উপকার করেছ ভাই, যদি সেরে উঠি তা হলে নিশ্চয়ই তোমাদের দাবী পূর্ণ করব। আর ডাক্তারবাবুকে প্রণাম করছি বল।" বলিয়া সে শ্রদ্ধাভরে দুই হাত মাথায় ঠেকাইল।

ডাক্তারবাবু সশ্রদ্ধ নেত্রে বিজনকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, "যথার্থই আপনি এমন স্ত্রী-রত্ন লাভ করে সৌভাগ্যবান্, আমি এসে অবধি যা দেখেছি আর শুনেছি তাইতেই এ কথা বলতে পারলাম, কিন্তু যদি রাখতে পারেন তবেই। এঁর এত কথা ও হাসিখুসী দেখে আমার ভয় হচ্ছে বিজনবাবু যে এটা নির্ব্বাণের পূর্ব্বাভাষ নয় ত? তবে এই ভেবে আমি শান্তি পাচ্ছি যে পতিগত-প্রাণা আজ পতি সঙ্গ লাভ করে সুখী হয়েছে।" বিজন সাশ্রুনেত্রে ডাক্তার বাবুর হাত ধরিয়া উদাস দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল।

দিনটা বেশ হাসি খুসীতে কথাবার্ত্তায় কাটিয়া গেল, কিন্তু বিকালের দিকে জ্বর বাড়িতে আরম্ভ করিল, সন্ধ্যার পর অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করিয়া লতিকা মৃত্যু আসন্ন মনে করিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, "আমি চললুম, তুমি মাকে, পূর্ণিমাকে দেখো। তোমার অবর্ত্তমানে এতদিন আমি তাদের ভার নিয়েছিলুম, এইবার তোমার হাতে সে ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলুম। দুঃখ করোনা, আমি শান্তিতে তোমার কোলে যাচ্ছি—এত আমার সৌভাগ্য। তুমি দেশের কাজ কোরো, কিন্তু আর যেন না জেলে যেতে হয়। আর মাকে মেয়েকে যত্ন কোরো—শান্তিতে থেকো।" এতগুলো কথা বলিয়া সে অসুস্থ বোধ করিতে লাগিল। মেয়েকে চুমা খেয়ে স্বামীর পদধূলি লইল, একটু পরে সেই যে জ্ঞান হারাইল আর তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল না।

পরদিন ভোরের আলো চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই সাধ্বী পত্নী স্বামীর কোলে মস্তক রাখিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

সত্যই যেন স্বামীর কারা-মুক্তি দেখিবার আশায় সে নিজের মুক্তিকে রোধ করিয়া রাখিয়াছিল। কন্যা মাতার বক্ষের উপর পড়িয়া ডাকিতেছে, 'মা—মা গো—ওঠ মা' মূর্চ্ছিতা শ্বশ্রূঠাকুরুণ মেঝেয় পড়িয়া জ্ঞানশূন্যা।

ডাক্তার, নিতাই-হরি সকলেই বাহিরে সজল নয়নে নীরবে বসিয়া আছেন। আর সদ্য-কারামুক্ত বিজন পত্নীর মস্তক কোলে করিয়া বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া আছে, তাহার নয়ন হইতে প্রবল ধারায় অশ্রু-রাশি আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্যের মত ঝরিয়া ঝরিয়া মৃতা পত্নীর মুখে মাথায় পড়িতেছে; শান্ত পবিত্র মুখখানি স্বামীর অশ্রু-ধারায় ধৌত হইয়া শিশির-স্নাত পদ্মের ন্যায় রৌদ্র-কিরণে ঝলমল করিতেছে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন লতিকা হাসিতেছে। সেই মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিজন বলিয়া উঠিল, "পাষাণি! আমায় ফেলে তুই চলে গেলি, একটু দেরী সইল না তোর, রাণী!" আবার বলিল, "হায় ভগবান্ একি মুক্তি তুমি আমার জন্যে রেখেছিলে, এতদিন পরে এই দৃশ্য দেখতে কি আমায় তুমি মুক্তি দিলে প্রভু।"

সভ্যতার সূচনায় প্রাচ্যে ধর্ম্ম-প্রণালী ও উপাসনা-পদ্ধতি

[অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম-এ]

(৩)

গতবার প্রাচীন মিশরের সম্বন্ধে যে বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি, আজ প্রাচীন চীন সম্বন্ধে তাহার একটু আলোচনা করিব। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ খেদ করিয়া বলেন যে, ভারতের দুর্ভাগ্য যে, অশোকের পূর্ব্বে ঐতিহাসিক বিবরণাবলীর কোন 'পাথুরে' প্রমাণ নাই। প্রাচীন চীন সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। চীনের প্রাচীন ইতিহাসও 'পাথুরে' প্রমাণের উপর নির্ভর করে না এবং মিশরের পিরামিডগুলির মত প্রাচীন চীনের রাজন্যবর্গের কোন কীর্ত্তিস্তম্ভ চীনে নাই ("The Great Wall" এর তারিখ আমরা যে যুগের কথা বলিতেছি তাহার বহু শতাব্দী পরে)। কিন্তু ঐতিহাসিকের চক্ষে, এক হিসাবে, ভারতের অপেক্ষা চীনের সৌভাগ্য বেশী। প্রসিদ্ধ *Annals of the Bamboo Books*, * Confucius প্রণীত *Shu-king*, Ssi-ma Ts'ienএর ন্যায় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের *Shi-ki* প্রভৃতি গ্রন্থ ও বিবরণাবলী বর্ত্তমান থাকাতে প্রাচীন চীনের ইতিহাস রচনা করিতে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের অধিক অসুবিধা হয় নাই। এ ক্ষেত্রে De Lacouperie, Edouard Chavannes, Edouard Biot, James Legge, Friedrick Hirth প্রভৃতি ফরাসী ইংরেজ ও আমেরিকান পণ্ডিতগণের যত্ন ও অধ্যবসায় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। চীনা ভাষায় অজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে তাঁহাদের পুস্তকগুলি অমূল্য সম্পদ্। ইতিহাস-পাঠকের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, চীনের আদি রাজা (আধ-পৌরাণিক, আধ-ঐতিহাসিক, আধ-মানব, আধ-জন্তু) Fu-hi (২৮৫২—২৭৩৮ খৃঃ পূঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া চীনের একটী ধারাবাহিক ইতিহাসের কাঠামো খাড়া করা আছে। এই Fu-hi মিশরের আদি রাজা Menes এর পরবর্ত্তী সন্দেহ নাই এবং বোধ হয় ভারতীয় ইক্ষ্বাকুর সমসাময়িক ছিলেন (ইক্ষ্বাকুর তারিখ সম্বন্ধে আলোচনা "প্রাচীন ভারতে যুগনির্ণয়" নামক প্রবন্ধে ইতিপূর্ব্বেই করিয়াছি—"নবযুগ" দ্বিতীয় বৎসর ২৯শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ভারতের ইক্ষ্বাকু, মান্ধাতা, সুদাস, যযাতি, পুরুর ন্যায় তাঁহাদের সমসাময়িক চীনের Fu-hi, Huang-ti, Yau, Yu প্রভৃতি প্রাচীন রাজগণ শুধু উপকথার নায়ক নহেন। চীনে Fu-hir পূর্ব্ববর্ত্তী বিবরণ সম্বন্ধে উপকথার অভাব নাই এবং সহস্র সহস্র বর্ষ পরমায়ু অনেক উপকথার নায়কেরই ছিল বলিয়া পড়ি। কিন্তু চীনের কি পৌরাণিক বৃত্তান্ত, কি প্রাচীন ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের একটী বিশেষত্ব এই যে, এক একটী যুগ বা এক এক জন আদি রাজার রাজত্বকাল এক এক প্রকার 'সংস্কৃতি'-মূলক বা 'কৃষ্টি'-মূলক জাতীয় উন্নতির (cultural development) সহিত অভিন্ন। ফির্দৌসী প্রণীত "শাহ্ নামা" গ্রন্থ পাঠ করিলে প্রাচীন পারস্য দেশের এক এক জন রাজার সহিত এক এক রকমের cultural development যে বিশেষ রূপে জড়িত তাহা বেশ প্রতীয়মান হয়; কিন্তু পারস্যের cultural history লেখা ফির্দৌসীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। চীনের প্রাচীন বৃত্তান্তের বিশেষত্বই, কিন্তু, এইখানে। সহস্র সহস্র বর্ষ

* প্রাচীনকালে চীনা রাজাদের মৃত্যু হইলে তাঁহাদের দেহ ভূপ্রোথিত করিবার কালে তাঁহাদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র ও পুঁথিপত্রগুলিও ভূপ্রোথিত করা হইত। এই সময়কার পুঁথিগুলি বাঁশের ছালের উপর (on bamboo tablets) ক্ষোদিত হইতব লিয়া এই পুঁথিগুলির নাম *Chu-shu-Ki-nien* or বা "Annals of the Bamboo Books।" এই পুঁথিগুলিতে অনেক ঐতিহাসিক কথা ও উপকথা লিপিবদ্ধ আছে। ২৭৯ বা ২৮০ খৃষ্টাব্দে চাউ বংশীয় এক রাজার কবর খুঁড়িবার কালে এরূপ কতকগুলি পুঁথির উদ্ধার হয়। সম্রাট হোয়াংটী হইতে আরম্ভ করিয়া চাউ বংশের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত চীনের ধারাবাহিক ইতিহাস এই সকল "বাংশ-পুঁথি" হইতে পাওয়া যায়। শাং বংশীয় রাজাদের সম্বন্ধে এগুলি বিশেষ মূল্যবান। Bamboo books এ প্রদত্ত তারিখ ও ঘটনাবলির বৃত্তান্তের সহিত, কিন্তু, Confucius, Ssi-ma Ts'ien প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ প্রদত্ত বৃত্তান্তও তারিখের অনেক গরমিল আছে। Legge মহোদয় তাঁহার *Chinese Classics* নামক গ্রন্থের এক স্থলে (Vol. III, Prolgomena, Ch. IV). এই সকল Bamboo Booksএর অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন।

পরমায়ু-বিশিষ্ট বিস্তর রাজা ও ঋষির কথা আমরা ভারতের পৌরাণিক সাহিত্যেও পড়ি বটে এবং চীনের পৌরাণিক কাহিনীর সহিত ভারতীয় পৌরাণিক বৃত্তান্তের কিছু কিছু মিলও আছে বটে, কিন্তু cultural development-মূলক ইতিহাস ভারতের প্রাচীন কথার বিশেষত্ব নহে। বর্ত্তমানে প্রবন্ধে এসব পুরাতন ইতিহাস ও পৌরাণিক আলোচনার স্থান নাই। খৃঃ পূঃ প্রায় তিন চার হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ও উপাসনা-পদ্ধতির আলোচনাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তাই এ সম্বন্ধে চীন সংক্রান্ত দুই চারিটি কথা এখন বলিব।

চীনের সভ্যতা, মিশরীয় ও ভারতবর্ষীয় সভ্যতার ন্যায়, অতি পুরাতন ইহা সন্দেহ নাই। কিন্তু ৩০০০ খৃঃ পূঃর আগেকার কোন কথাই চীনা ঐতিহাসিকগণের ইতিহাস-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চীনের ধারাবাহিক ইতিহাস খৃঃ পূঃ উনত্রিংশ শতক হইতে আরম্ভ লইয়াছে, ইহার পূর্ব্বে সবই উপকথা। এই তারিখের পূর্ব্বে জোর করিয়া বলা যায় এমন কোন কথাই আমরা চীন সম্বন্ধে বলিতে পারি না। কিন্তু কোন একটা ধর্ম্ম-পদ্ধতি একদিন হঠাৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। কৃষ্টিমূলক উন্নতিকে সম্মুখে রাখিয়া একজন রাজার সম্বন্ধে খানিকটা বিবরণ লেখা সহজ। অমুক রাজার আমলে প্রথম রন্ধন-প্রণালী আবিষ্কৃত হইল, অমুক রাজার আমলে প্রথম কাপড় পরা প্রথার অভ্যুদয় হইল, অমুক রাজার আমলে প্রথম পঞ্জিকার প্রচলন হইল, অমুক তারিখের পূর্ব্বে লিখন-প্রণালীর অস্তিত্বই ছিল না।—ইত্যাকার কথা লেখা সহজ কিন্তু সাধারণ জ্ঞান যাহার আছে তাহার পক্ষে তাহা সব সময় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা কঠিন। তাই বলিতেছিলাম যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে Ssi-ma Ts'ien, Confucius প্রভৃতি চীনা ঐতিহাসিকগণ ৩০০০ খৃঃ পূঃর পূর্ব্বেকার কথা তাঁহাদের ঐতিহাসিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই, তথাপি প্রচলিত উপকথা হইতে ও তাঁহাদের বর্ণনা হইতে সিদ্ধান্ত স্বরূপ মানিয়া লইলে, আনুমানিক ৩০০০ হইতে ৪০০০ খৃঃ পূর্ব্বেকার ধর্ম্মপদ্ধতির একটা বিবরণ চীন সম্বন্ধে যে আদৌ দেওয়া যায় না তাহা স্বীকার করিতে পারি না।

একটা কথা এখানে আগেই বলিয়া রাখি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে সব কথা বলিব তাহা সাধারণ পাঠকের অবগতির জন্য। যাঁহারা চীন দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ তাঁহাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলিব না। এখানে যাহা বলিব তাহার অনেক কথাই Legge, Hirth, Walshe প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন। এই সামান্য প্রবন্ধকে আমার "মৌলিক গবেষণা" বা "গবেষণাত্মক" রচনা বলিয়া কেহ মনে না করিলে সুখী হইব। তবে, এ সূত্রে ভারত, চীন, মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের প্রাচীন কথার একটা তুলনা-মূলক আলোচনার প্রবৃত্তি যদি পাঠকের জন্মে ও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস প্রণয়নে যদি এক জন পাঠকেরও আন্তরিক বাসনা জাগাইতে পারি তাহা হইলেই এই প্রবন্ধ লেখার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। বড় বড় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণও পরস্পরের বিচারে যে সব ভুল ভ্রান্তি করিয়া গিয়াছেন, সেরূপ ভুল প্রমাদ এ প্রবন্ধে থাকিবে তাহা অবশ্যম্ভাবী। এই ক্ষুদ্র ও নীরস প্রবন্ধের পাঠকবর্গ আমার ঐরূপ ভুল ধরিয়া নিজের নিজের জ্ঞানের বিস্তার সাধন করিলে নিজেকে সৌভাগ্যবান্ বলিয়াই মনে করিব। এরূপ প্রবন্ধ খুব পাকা হাতে লিখিত না হইলে প্রায়ই দুষ্পাচ্য হইয়া পড়ে ইহা মনে রাখিয়া সহৃদয় পাঠক আমার রচনার অপকর্ষ ক্ষমা করিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি (গৌতম বুদ্ধ, জরথুস্ত্র পীথাগোরস প্রভৃতির সমসাময়িক) চীনের দার্শনিক ও সমাজ-সংস্কারক ঋষি Confucius (K'ung-Fu-tzi) প্রণীত *Shu-King* নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ আমাদের এ ক্ষেত্রে প্রধান সহায়। এই অমূল্য গ্রন্থের দুই খানি ভাল ইংরেজি অনুবাদ-গ্রন্থ আমি দেখিয়াছি একখানি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত James Legge লিখিত অপর খানি W. G. Orn লিখিত। সাধারণ পাঠক ইহার মধ্যে যে খানি ইচ্ছা সেখানিই পড়িতে পারেন, তবে Legge প্রণীত গ্রন্থের সহিত একটা অমূল্য মুখবন্ধ বা Prolegomena (Legge প্রণীত *Chinese Classics*, Vol III দ্রষ্টব্য) আছে বলিয়া সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহা সমধিক মূল্যবান্ বলিয়া মনে হয়। Legge ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে *Religions of China* নামক কতকগুলি বক্তৃতা পুস্তকাকারে বাহির করেন, ইহা হইতেও অনেক কথা পাঠক জানিতে পারিবেন। ইহা ছাড়া Giles প্রণীত *Religions of*

Ancient China নামক গ্রন্থ খানিও এ ক্ষেত্রে একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ। আবার এ সমস্ত গ্রন্থগুলি হইতে সার সঙ্কলণ করিয়া সুপণ্ডিত Hirth মহোদয় তাহা তাঁহার *Ancient History of China* নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে সকল কথা বলিব তাহার অনেক কথাই Hirthএর গ্রন্থে আছে কিন্তু সব কথা নাই।

চীনা ঐতিহাসিকগণের মতে বর্ত্তমান Chinaর উত্তর-পূর্ব্ব অংশই চীন সভ্যতার মূল কেন্দ্র। বিদেশ হইতে চীনাদিগের আগমনের কথা চীনা ভাষায় লিখিত কোন ইতিহাস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নাই। Hirthএর মতে (*Ancient History* p. 4) এ বিষয়ে জোর করিয়া কিছু না বলাই ঠিক (De Lacouperieর মতে, কিন্তু, ব্যাবিলনিয়া হইতে 'Bak' জাতির অধীশ্বর Nakhunte নামক রাজা তাঁহার অধীন জাতিগুলি লইয়া চীনে উপনিবেশ স্থাপন করেন)। চীনা উপকথায় পড়া যায় যে, P'an-ku নামক এক অদ্ভুত জীব হইতে মনুষ্যবংশের উদ্ভব হয়। P'an-kuর বিষয় নানা কথা নানা উপকথায় নানা প্রকারে বিবৃত হইয়াছে ও বিবরণ গুলির মধ্যে যথেষ্ট গরমিলও আছে। P'anku হইতে ঐতিহাসিক Fu-hi পর্য্যন্ত সময়কাল, উপকথা বিশ্বাস করিতে হইলে, কোটি কোটি বর্ষব্যাপী। P'ankuর পর দশটী বিভিন্ন যুগ শেষ হইলে পর তবে Fu-hiর জন্ম। এই বিস্তীর্ণ সময়ভাগে "স্বর্গীয় রাজন্যবর্গ" "পার্থিব রাজন্যবর্গ, "পঞ্চ ড্রাগন", "কুলায়-নির্ম্মাতৃগণ" প্রভৃতি লীলাখেলা করিয়া গিয়াছেন। এসময়কার মনুষ্যগণ নিরামিষ আহার করিত ও জীবমণ্ডলী পরস্পরকে হিংসা করিত না। সে এক সত্যযুগ বিশেষ ছিল। এই সত্যযুগের অবসানে মানুষ খাদ্যের জন্য জীব-জন্তু ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিল। বোধ হয় মাংস সিদ্ধ করিবার জন্য, Suijon নামক এক রাজা অগ্নির আবিষ্কার করিলেন। দুইখানি কাষ্ঠ খণ্ড ঘর্ষণ করিলে অগ্নির উৎপত্তি হয়, ইহা Suijon এর প্রধান আবিষ্কার। Suijon এক প্রকার লিখন-প্রণালির ও সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহার নাম "Knot Writing" (Hirth p. 6) Suijonএর পরেই Fu-hi রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। প্রসিদ্ধ চীনাভাষাবিদ্ ঐতিহাসিক Hirth বলেন, P'anku হইতে Fu-hi পর্য্যন্ত [illegible]ব্যাপী কালকে, কতকটা জোর করিয়া, কতকগুলি সংস্কৃতি-মূলক উন্নতির যুগ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ("These periods represent a somewhat arbitrary mixture of cultural development.") এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, এই সময় চীনাগণের ধর্ম্মবিশ্বাস ও উপাসনা-পদ্ধতি কিরূপ ছিল? G. D. Boulger (*History of China*, Vol I, ch. II) এ প্রশ্নের উত্তর দুই একটী কথায় শেষ করিয়াছেন। তাঁহার মতে "The earliest religion of the Chinese consisted in the worship of a Supreme Being, who was the sovereign both of the Heaven and of the Earth......Originally, and in its essence, the religion of the Chinese was as far removed materialism as can be conceived." ইহার উপর তিনি মাত্র আর একটী কথা বলিয়াছেন। কথাটা এই—চীনের প্রাচীন ধর্ম্মপ্রণালী হিব্রুদিগের একেশ্বরবাদের অনেকটা অনুরূপ ছিল ও যীশু খৃষ্ট জন্মাইবার সাত শত বৎসর পূর্ব্বেও চীনাগণ তৎপ্রচারিত ধর্ম্মের অনেক তথ্য জ্ঞাত ছিলেন।

কিন্তু এই সামান্য বিবরণ, তাহাও আবার তারিখ-সম্বলিত নহে, পড়িয়া আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না, বিশেষতঃ যখন এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যই হইতেছে এ সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা করা। *Shu-King*এ লিখিত বিবরণ হইতে অবশ্য জানা যায় যে, প্রাচীন চীনাগণ একেশ্বরবাদী ছিলেন। Shang-ti অর্থাৎ Supreme Ruler বা "শাসক-শ্রেষ্ঠ" যথেষ্ট ভক্তি ও বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন। খৃষ্ট ধর্ম্মের সহিত এই ধর্ম্মের কতকটা মিল দেখা যায়। Sang-ti ছাড়া অন্য দেব দেবীর উপাসনা প্রাচীন চীনে বড় একটা প্রচলিত ছিল না। ধর্ম্মের পরিচালনা পুরোহিত সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত ছিল না। প্রতি পরিবারে গৃহকর্ত্তা স্বয়ং পুরোহিতের কার্য্য করিতেন এবং সম্রাট্ সমগ্র দেশের প্রাধান পুরোহিত ছিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে রাজারা রাজত্ব করেন, ঈশ্বরের হাতেই পুরস্কার তিরস্কার নির্ভর করে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী ছিলেন বলিয়াই প্রাচীন কালের রাজারা ধর্ম্ম বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে কার্পণ্য করিতেন না। সাধারণ লোকের ভগবান্কে ডাকা তাঁহাকে সম্মান করা ও তাঁহার বিধানানুসারে

কার্য্য করা নিজ নিজ কর্ত্তব্য হইলেও এক প্রকার বিরাট্ ও জাতীয় উপাসনা আছে যাহা সম্রাট্ ভিন্ন অপর কেহ করিতে পারে না—ইহা Shang বংশীয় রাজাদিগের (১৭৬৬—১১২২ খৃঃ পূঃ) বদ্ধমূল ধারণা ছিল। তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজারাও অবশ্য ইহা বিশ্বাস করিতেন। অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসরের পূর্ব্বেও এই রূপ ধর্ম্মবিশ্বাস ও উপাসনা-পদ্ধতি ছিল ইহা মানিয়া লওয়া যায়। ভগবানের কোন মূর্ত্তিকল্পনা করিয়া উপাসনা করা প্রাচীন চীনে প্রচলিত ছিল না। প্রার্থনা ও যজ্ঞ করিয়া তাঁহার তুষ্টি সাধন করিতে হইত। (বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে ও মূর্ত্তি-পূজা ছিল না কিন্তু যজ্ঞীয় প্রথার বহুল প্রচলন ছিল) Hirthর মতে "Besides God as the Supreme Ruler, the Shang rulers and their alleged predecessors are shown in the *Shu-King* to have worshipped several minor deities" অর্থাৎ Shan-gti বা "বিশ্বপতি" ছাড়া অনেকগুলি উপদেবতার উপাসনাও প্রাচীন চীনে প্রচলিত ছিল ইহা Shu-King গ্রন্থ হইতে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। "ছয়জন সম্মানিত" ব্যক্তি (তাঁহারা কে তাহা Legge পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারেন নাই), বিশেষ ভাবে পূজিত হইতেন। পিতৃ-পুরুষের পূজা ও পরলোকগত বন্ধুবর্গের পূজাও প্রত্যেক পরিবারে নিয়মিতরূপে হইত। কিন্তু চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, "পঞ্চ পূত পর্ব্বত" প্রভৃতি সমাদৃত এবং পূজিত হইলেও তাঁহারা যে Shang-tir অনেক নীচে তাহা চীনাগণ ভাল রকমেই জানিতেন। Leggeর মতে প্রাচীন চীনাগণের স্বর্গের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা ছিল কিন্তু নরকের (Hell বা Purgatoryর) কোন ধারণা ছিল না। তিনি বলিলেন "The oracles are silent as to any doctrine of future rewards and punishment."

পুরাকালে চীনাগণ বিশ্বাস করিতেন যে, পাপপুণ্যের বিচার এই জন্মেই হয় এবং ভগবানের ইচ্ছা করেন এই জন্য, লোকের ধর্ম্ম আচরণ করিতে হইবে। (চীনা দিগের এই বিশ্বাসের সহিত মিশরবাসিগণের ও বৈদিক যুগের ভারতীয় আর্য্যগণের ধারণার পার্থক্য পাঠক লক্ষ্য করিবেন। প্রাচীন মিশরের কথা ও প্রসঙ্গতঃ প্রাচীন ভারতে এসম্বন্ধীয় প্রথার কথা বিগত আষাঢ় সখ্যার "পঞ্চপুষ্পে" বলিয়াছি।) পরলোকে সুখ ও ঐশ্বর্য্যের কোনও কল্পনাই চীনাগণের ছিল না। (ঋগ্বেদের যুগে কিন্তু ভারতীয়গণের পরলোক সম্বন্ধে একটা ধারণা ছিল ও সমসাময়িক মিশরবাসিগণেরও এসম্বন্ধে বিশেষ ধারণাছিল।) প্রাচীন চীনাদিগের কল্পনায় মনুষ্যের কাম্য "পঞ্চপ্রকার সুখের" মধ্যে প্রথমটী হইতেছে দীর্ঘজীবন, দ্বিতীয়টী ধন, তৃতীয়টী দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, চতুর্থটী ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও পঞ্চমটী ভগবানের ইচ্ছা প্রতিপালন করিবার প্রবৃত্তি। পরলোকে পুরস্কারের কল্পনা প্রাচীন চীনাদিগের ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ধার্ম্মিক লোকরা পার্থিব জীবনে কষ্ট পাইয়া থাকেন সত্য; কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মের ফল তাঁহাদের বংশধরগণ পাইবেন। কিন্তু যদি কোন ধর্ম্মিক ব্যক্তির সন্তানসন্ততি না হয়? এবিষয়ে কোন স্পষ্ট উত্তর নাই। (যেমন মনুর বিধানমতে, স্ত্রীলোকের পক্ষে কন্যাকালে পিতার, বিবাহিত জীবনে স্বামীর ও স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্রের অধীনে থাকিতে হইবে। কিন্তু কোন বিধবার পুত্র না থাকিলে? ইহার উত্তরে মনু কোন স্পষ্ট কথা বলেন নাই, পরবর্ত্তী স্মৃতি-কারগণ কিছু কিছু লিখিয়াছেন বটে।) Shang-বংশীয় রাজাদের ধর্ম্মপদ্ধতির আলোচনা-কালে Hirth মহোদয় মন্তব্য করিয়াছেন, "Sacrificial service was the leading feature in the spiritual life of the Chinese whether devoted to Sang-ti or God or to what we may call the minor deities as being subordinate to the Supreme Ruler or to the spirits of their ancestors" অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যেই হউক, উপদেবতাদের উদ্দেশ্যেই হউক বা মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্দেশ্যেই হউক, এই প্রকার যজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা (মনুর "পঞ্চযজ্ঞ" তুলনীয়) চীনাগণ হৃদয়ঙ্গম করিতেন এবং অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই সব যজ্ঞের বিধি-ব্যবস্থার প্রতি তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। (পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন "ব্রাহ্মণ" ও "আরণ্যক" গুলিতে যেরূপ বৈদিক যুগের ভারতীয় যজ্ঞাবলির বিস্তারিত বিবরণ দৃষ্ট হয় সেইরূপ চীনাগণের প্রাচীন ধর্ম্ম গ্রন্থ গুলিতে, যথা *Shi-King* বা "Book of Odes", এইরূপ প্রথা লিপিবদ্ধ আছে।)

কিন্তু শুধু ভগবানের আরাধনা করিয়াই চীনাগণ ক্ষান্ত থাকিতেন না। তাঁহারা জানিতেন যে মানুষের সুখ দুঃখ অনেকটা নিজের পুরুষকারের উপর নির্ভর করে। *Shu-King* গ্রন্থের এক স্থলে আমরা পড়ি যে, "Although Heaven judges the inferior people and according to their handiwork determines to them either long life or short, it is not that Heaven would destroy the people but the people themselves who half way cut off their own lives" (*The Shu King*, Book III, Sec. XV, Orn's translation). অর্থাৎ, মানুষের সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণের অর্দ্ধেক মানুষের নিজের হাতে নির্ভর করে; মানুষের শাস্তি মানুষ নিজে ডেকে আনে। *Shu-king* গ্রন্থের আর এক অংশে আমরা পড়ি যে, এক জন জ্ঞানী ব্যক্তি অনেকটা এইরূপ বলিতেছেন—"ভগবান্‌কে বিশ্বাস নাই। কিন্তু রাজা যদি ধর্ম্ম পালন করেন তাহা হইলে তাহার ফল ফলিবেই। ভগবান্‌কে ডাকিয়া বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলে ও পূর্ব্ব পুরুষগণের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি করিলে অনেক সময় বেশী কাজ পাওয়া যায়।" † এক কথায় ভগবানের প্রতি প্রাচীন চীনাদের ধারণা অনেকটা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ Oliver Cromwellএর বিখ্যাত উক্তির অনুরূপ ("Put your trust in God, but mind to keep your powder dry)"। ‡

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, প্রাচীনযুগের চীনাগণের মতে ভগবান্ তাঁহার বাণী কোন ঋষিমুখে প্রচার করেন নাই। চীনে ঋগ্বেদোক্ত আরাধনা-মূলক শুলির বা বাইবেলের "Ten Commandments"এর অনুরূপ কোন আপ্তবাক্য প্রচলিত ছিল না। Hirth বোধ হয় সত্যই বলিয়াছেন, "The God of the ancient Chinese was the creation of their own mind and the result of their natural instict, there was no revelation made to them resembling our Ten Commandments or the New Testament."

চীনের এই প্রাচীন উপাসনা-পদ্ধতি ও ধর্ম্ম-প্রণালী কালক্রমে কিরূপে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। K'ung Fu-tzi এবং (Confucius) খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে কিরূপে আবার 'ধর্ম্ম'ও সমাজ-সংস্কার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন সে কথা অতি উপাদেয় ও শিক্ষণীয় বিষয় হইলেও প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে, কারণ তাহা এ প্রবন্ধে আলোচিত যুগের আড়াই হাজার বৎসরের পরবর্ত্তী কালের কথা। বর্ত্তমান প্রবন্ধটী তো একেই নীরস, তাহার উপর কলেবরবৃদ্ধির ভয়ও আছে। প্রাচীন, প্রাগৈতিহাসিক চীনের ধর্ম্মের বিবরণ এই খানেই শেষ করিলাম ও ইহার কতকটা সমসাময়িক কালে (বোধ হয় কিছু পূর্ব্বে) অর্থাৎ বৈদিক যুগে ভারতের ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইবার দুই চারিটী কথা বলিয়া এই নীরস প্রবন্ধটী শেষ করিব।

---

† শ্রাদ্ধ তর্পণাদির প্রথা সম্বন্ধে ঋগ্বেদ অনেকটা মূক বলিয়া আমার মনে হয়। ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী যুগে এ সম্বন্ধে ভারতবর্ষে যথেষ্ট চর্চ্চা হইয়াছিল, কিন্তু ঋগ্বেদে ইহার বেশী উল্লেখ নাই, দশম মণ্ডলে আভাস মাত্র আছে। প্রাচীন চীনে কিন্তু এ সম্বন্ধে যথেষ্ট চর্চ্চা হইয়াছিল। অবশ্য প্রাচীন চীন সম্বন্ধে যে সময়ের কথা বলিতেছি তাহা ঋগ্বেদীয় যুগের কিছু পরবর্ত্তী এবং ভারতবর্ষেও ঠিক এ সময় অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে ও অরণ্যর যুগে সম্ভবতঃ এ সম্বন্ধে যথেষ্ট চর্চ্চা হইয়া থাকিবে। এ প্রসঙ্গে কিছুকাল পূর্ব্বে লিখিত শ্রদ্ধেয় বন্ধু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মাধবদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব" প্রবন্ধটীতে ভারতীয় শ্রাদ্ধবিধি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে।

‡ প্রাচীন চীনাগণের কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি যতটা দৃষ্টি ছিল, আধ্যাত্মিকতার প্রতি বোধ হয়, ততটা দৃষ্টি ছিল না। তাই বুঝি, চীনের সমাজ-সংস্কারক Confucius, তাঁহার সমসাময়িক গৌতম বুদ্ধের ন্যায়, সৎকর্ম্ম ও সদাচারের দিকেই জনসাধারণের দৃষ্টি ফিরাইতে এত চেষ্টা করিয়াছেন। ভগবানের অস্তিত্বও শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া Confucius বেশী কথা বলেন নাই। Confuciusএর পূর্ব্বে অবশ্য Lau-Tzi আধ্যাত্মিকতা-মূলক অনেক দার্শনিক তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে Tau-ism নামক ধর্ম্ম-পদ্ধতির সৃষ্টিকর্ত্তাও এই "বৃদ্ধ দার্শনিক" Lau-Tzi; কিন্তু Confucius অনেকটা "Philosopher of the world" বা কর্ম্মযোগী ছিলেন ও কর্ম্মযোগের প্রাধান্য প্রচারই তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল।

প্রাচীন জাপানী নাটক

[শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়]

জাপানী সাহিত্যের তিনটী বিশেষ যুগ আছে—নারা-যুগ (৭১০—৭৮৪), হিয়ান যুগ (৮০০—১১৮৬) এবং য়েদো যুগ (১৬০৩—১৮৬৭); মান্নিয়ো-স্থ এবং গেঞ্জি মনোগাতারি প্রথমোক্ত দুটী যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নিদর্শন এবং শেষোক্ত যুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'জোরুরী' নাটকাবলী।

জাপানী নাটকাবলী চার ভাগে বিভক্ত—নো (ইয়োকইয়োকু) নাটক, কিয়োগেন বা প্রহসনজাতীয় কিয়াকুহন বা খাঁটী নাটক এবং জোরুরী।

নো নাটকগুলি সাধারণতঃ জাপান, চীন ও প্রাচ্যের অন্যান্যদেশের রূপকথার ঘটনাবলী লইয়া গঠিত। সেগুলি সুন্দরভাষায় রচিত এবং প্রাচীন প্রবচন ও সঙ্গীতাবলীর উদ্ধৃতাংশে পূর্ণ। এই নাটকগুলির সহিত প্রাচীন গ্রীক নাটকের আশ্চর্য্য রকম সাদৃশ্য আছে। অধিকাংশ অভিনেতারাই মুখোস ব্যবহার করেন এবং কথোপোকথন শেষ হইলেই সম্মিলিত কণ্ঠে সঙ্গীত সুরু হয়। কিন্তু এগুলির বিষয়-বস্তু অতি পুরাতন * এবং নাটক হিসাবে খুব উন্নত ধরণের নহে। এই সকল রচনাবলী জাপানের অন্ধকারযুগে (Dark age) মুরোমাচি সাম্রাজ্যের সময় সামরিক পুরুষদের সাময়িক আনন্দপ্রদানের জন্য রচিত হইয়াছিল...এবং সোগুণ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত জনমণ্ডলীর কাছে খুবই আদৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে জাপানের উন্নতশ্রেণীর মধ্যে ইহার পৃষ্ঠপোষক নাই বলিলেও চলে।

কিয়োগেন বা প্রহসনগুলি খুবই ছোট এবং প্রাচীন। 'নো' নাটকের মত এগুলি একই মঞ্চে অভিনীত হইত। কিয়োগেন এবং নো নাটক সম্ভ্রান্ত বংশাবলীর প্রিয় নাটক ছিল। মধ্যযুগের জাপানী সমাজ জানিতে হইলে এই কিয়োগেন নাটক পড়িতে হইবে।

কিয়াকুহন নাটকগুলি প্রায় য়ুরোপীয় নাটকাবলীর সমতুল্য এবং প্রায় অধিকাংশগুলিই য়েদো যুগের মধ্য এবং শেষভাগে রচিত। নাট্যমন্দিরে এগুলির খুবই আদর; ইহার গ্রন্থকারেরা প্রায়ই নিম্নস্তরের লেখক; সুতরাং কিয়াকুহনের সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ কিছু নাই, কিন্তু তাহারা কিয়োগেন বা নো অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।

এইবার জোরুরী নাটকের কথা। এগুলিও য়েদো যুগেই লিখিত—ইহার সাহিত্যিক মূল্য খুবই বেশী; য়েদো যুগের ইহাই না কি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নিদর্শন! গিকোয়ুকু বা নাটক অর্থে অনেকে জোরুরী নাটকই মনে করে। জোরুরী নাটকাবলী মহাকাব্যের ঢঙে রচিত—গল্পাংশ খুব দীর্ঘ এবং দীর্ঘ কথা দিয়ে গাঁথা—যেমন—

নো—কো— রুস্থ—বো—মিনো
হানো হি—তো—স্থ!
মি—জু—এ—গে—কা—নেসী—
ফু—জে—ই নী—তে।

অর্থাৎ—

একলা পথিক, ভাবনা বহু তার মনে।
রইলো বসি, ছিন্ন সে ফুল আনমনে।

আসলে এককথায় 'জোরুরী'ই ও দেশের ভাল নাটক। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্তই ইহার বিষয়-বস্তু সুন্দর এবং চমকপ্রদ। ইহার নাটকীয় উপাদান খুব বেশী—এবং অনেক দৃশ্যই বিশেষভাবে পরিকল্পিত। ইহা মূলতঃ ইয়াৎসুরী সিবাই (Marionette Theatre) এর নিমিত্ত রচিত হইয়াছিল; কিন্তু পরে সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও ইহা প্রদর্শিত হয়। ইহার কথোপকথন খুবই দীর্ঘ এবং কাব্যাত্মক। এই সকল অংশ 'সামিশেন' বা তিনটী তারের বীণায় ভারী সুন্দর শোনায়। ইহার আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রভৃতির ঢঙ অপূর্ব্ব। যদিও জোরুরী নাটক কাব্য,

---

* নো-নাটকের উৎপত্তি মন্দিরে গীতিনাট্য হইতে। প্রাচীনকালের ন্যায় এখনও নারা, ইসি ও ইজুমো প্রদেশে এই ধরণের মন্দিরে গীত হইয়া থাকে। সূর্য্য দেবীর (জাপানী মতে সূর্য্য দেবী) মন্দিরে প্রাচীনকালে কাগুরা নৃত্য হইত এবং বর্ত্তমানেও তাহা প্রচলিত আছে। এই নো-নাটকের উৎপত্তি সেই কাগুরা নৃত্য হইতে—(Enc. of Religion & Ethics—Vol IV p. p. 889.)

তথাপি ইহা সহজ ও সরলভাবে লিখিত। ইহা আসলে সাধারণের সাহিত্য। কাব্যাত্মক নাটকের সাধারণ প্রকৃতি বলা হইল। এবার তাহার উৎপত্তি ও উন্নতির কথা বলা যাক্।

মুরোমাচি-যুগে (১৩৯২—১৬০৩) সাধারণ ইতিহাস বলা, গল্প বলা, বা আবৃত্তি করা একটা সাধারণ ব্যবসার মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। তাইহেকী বা কামাকুরা যুগের একটী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বা 'তারা বংশের গল্প' এবং আরও কতকগুলি ছোটদের গল্প এই জন্য রচিত হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে ইহার সহিত সামিশেন বা তিনটী তারের বীণার সহিত সঙ্গীত জুড়িয়া দেওয়া হইল। এই উন্নতিতে ব্যবসারও উন্নতি হইল—ইহা ক্রমশঃ সাধারণের খুবই প্রিয় হইয়া উঠিল।

সেই সময়ে 'জোরুরী মনিদান শোষী' বা শ্রীমতী জরুরীর গল্প বলিয়া একটী গল্প রচিত হয়। তাহার বারোটী অঙ্ক ছিল এবং গল্প কথকদের সঙ্গে খুব শীঘ্রই তাহার বহুল প্রচার হইয়া গেল। কথিত আছে যে ইহার রচয়িত্রী ওনো-নোওসু নোবুনাগার সহচরী ছিলেন, কিন্তু ইহার কোনো প্রামাণ্য ইতিহাস নাই। গল্পটীর চুম্বক নিম্নে দেওয়া হইল ..

......সিকোয়া প্রদেশের ইহাগী সহরের এক জন উচ্চপদস্থ সামুরাই জোরুরী কো দেবতার কাছে সন্তান প্রার্থনা করিতেছেন। আন্তরিক প্রার্থনার ফলে তাঁর এক পরমাসুন্দরী কন্যালাভ হইল। দেবতার নামানুযায়ী তিনি কন্যার নাম-করণ করিলেন 'শ্রীমতী জোরুরী'। অনেক বৎসর পরে তিনি যখন উদ্ভিন্ন-যৌবনা অপূর্ব্ব সুন্দরী তখন মানোমারু নামক এক যোদ্ধা সেখানে এলেন—তাঁদের মধ্যে প্রেম সঞ্চার হইল এবং তাঁদের বিবাহ হইল।

যদিও বিষয়-বস্তু খুবই সাধারণ, তবুও সাধারণের মনে ইহার খুবই প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ইহার পর হইতেই যে কেহ নাটক লিখিলেই তাহাকে জোরুরী বলিত এবং আবৃত্তিকারেরা জোরুরী-কতারী বা জোরুরী-কথক নামে পরিচিত হইল। ইহাই জোরুরী নাটকের নাম-করণের ইতিহাস।

কিয়োচোর সময়ে (১৫৯৬—১৬১৫) কিয়োতোর দোজাবুরো নামক এক জন বিখ্যাত সামিশেন-বাদক হিকিতানামক এক জন প্রদর্শকের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া দল বাঁধিয়া জোরুরী আবৃত্তি সুরু করিল এবং এই আয়াতসুরী-সীবাই ক্রমশঃ এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিল যে সম্রাট-গো-ইয়োজোই এই দলের অভিনয় দেখিবার জন্য তাদের রাজপ্রাসাদে আহ্বান করিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইয়োজোতে একজন বিখ্যাত জোরুরী কথক ছিলেন—তাঁর নাম সৎসুমা জোয়ুন। তাঁর আবৃত্তির ভঙ্গিমা সাধারণের খুবই প্রিয় ছিল।

সাধারণ দর্শক ত প্রীত হইতই অধিকন্তু সম্ভ্রান্ত জনবর্গ তাঁর অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন। ওকা সিয়েবিই নামক এক জন সাহিত্যিক তো তাঁর জন্য বহু গল্প রচনা করিলেন। সেই সব গল্পের কতকগুলি 'কিম্পিরাবোন' নামে আজও বর্ত্তমান আছে। এইসকল গল্প কিম্পিরা নামক এক জন কল্পিত বীরের দুঃসাহসিক কার্য্যাবলীর বর্ণনা। সাধারণে এগুলি খুব আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিত। এইরূপ জোয়ুন এবং তাঁর শিষ্যদল বহুকাল ধরিয়া সাধারণের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

জোয়ুন এর মৃত্যুর কিছুকাল পরে তেকোমাতা গিদায়ু নামক এক জন বিখ্যাত জোরুরী-কথক ওসাকায় আসিলেন। তাঁর গলার স্বর সুন্দর ও সুস্পষ্ট ছিল এবং আবৃত্তি-ভঙ্গী ছিল নূতন ধরণের। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে ওসাকার ভোতামবরী নগরে তেকোমাতা জা নামক তাঁর অভিনয়-প্রদর্শনী খুলিলেন; পর বৎসরে তিনি চিকামাৎসু মনজেমন দ্বারা কতকগুলি অংশ রচনা করাইলেন। ইনিই কাব্যাত্মক নাটকের জনক।

এই সময়ে সাধারণে 'কিম্পিরা বোন' বা শ্রীমতী জোরুরী প্রভৃতি শুনিয়া বিরক্ত হইয়া গিয়াছিল। তাহারা চায় কিছু নূতন এবং ঠিক 'সেই সময়েই তেকোমাতা জা', তাঁহারা যা প্রার্থনা করিতেছিলেন তাহাই প্রদর্শন করিতে সুরু করিলেন। সুতরাং গিদায়ুর নাম জাপানের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। অন্য অভিনেতা তাঁহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইলেন এবং শেষে এত বিখ্যাত হইলেন যে সাধারণে 'জোরুরী'কে 'গিদায়ু' এবং আবৃত্তিকারকে 'গিদায়ু কতারী' বা গিদায়ু-কথক বলিতে সুরু করিল।

চিকামাৎসু মনজেমনের জন্মস্থান লইয়া অনেক মত-ভেদ আছে। তবে অধিকাংশ লোকের মতে তাঁর বাসস্থান চোসু প্রদেশের হগি সহর। কিন্তু আধুনিক

কালের পণ্ডিতরা বলেন যে তিনি ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে কিয়োতোর সামুরাই বংশে জন্ম গ্রহণ করেন...যৌবনে তিনি ছিলেন এক জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। সেকালের সন্ন্যাসীরা খুব বিদ্বান হইতেন সুতরাং চিকামাৎসুর জ্ঞান যে খুব বেশী ছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। পরে তিনি সন্ন্যাস ত্যাগ করেন। এই সন্ন্যাস-ত্যাগ করিবার পরে সাধারণে তাঁহাকে প্রতিভাশালী লেখক হিসাবে পাইল। কিন্তু তাঁর নামের বিস্তার খুব বেশী হয় নাই।

তাঁর প্রথম মহাকাব্য-জাতীয় নাটক 'সুশী কেন্‌কিয়ো' বা 'কেগকিয়োর জীবনের উন্নতি' গিদায়ুর জন্য লিখিত হয়। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে তাহা তেকোমাতা জা'তে অভিনীত হয়। ইহার পরই লেখক ও অভিনেতা দুজনেরই প্রতিভা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই সময় সাহিত্যে এক নূতন যুগের উদয় হয়...বহু বৎসর ধরিয়া চিকামাৎসু ওসাকায় ছিলেন 'তেকোমাতা জা'র নাট্যকার হিসাবে। এই সময় হইতে তাঁর মৃত্যু (১৭২৪ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত তিনি বহু উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। চৈনিক, জাপানী, বৌদ্ধ এবং সিন্তো সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত জ্ঞান থাকায় তাঁর সাহিত্য খুবই উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

১৭১৫ খৃষ্টাব্দে গিদায়ুর মৃত্যু হয় এবং সেই সময় 'তেকোমাতা জা' প্রায় দেউলিয়াভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।...তেকোমাতা জা'র প্রভাব প্রতিপত্তি—তাঁহাদের এক প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি করিয়াছিল। এই প্রতিযোগিতার ফলে নাটক ও অভিনয় খুবই উন্নত ধরণের হইয়া উঠে। গিদায়ুর এক জন শিষ্য 'তয়োতেক একাতায়ু' স্বয়ং তয়োতকে জা' নামে এক রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিলেন ১৭০২ খৃষ্টাব্দে এবং ঐ অঞ্চলেই। এঁদের নাট্যকার হলেন কিয়োনো কাইওন। গিদায়ুর মৃত্যুর পর এই নূতন নাট্যশালা পুরাতনের মতই প্রসার প্রতিপত্তি লাভ করিল।

কাইওন ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন অর্থাৎ চিকামাৎসু অপেক্ষা তিনি সাত বৎসরের ছোট। তাঁর পিতা ছিলেন এক জন সামান্য মিঠাইওয়ালা। তিনি 'হাইকাই' জাতীয় কবিতা লিখিতে পটু ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এক জন দক্ষ ব্যঙ্গ কবিতার রচয়িতা ছিলেন। এ শ্রেণীর লেখকদিগকে 'কিয়োকালী' বলে। যৌবনে কাইওন ডাক্তারী পর্য্যন্ত করিয়াছেন এবং অবসর সময়ে এক জন বিখ্যাত পণ্ডিতের নিকট প্রাচীন সাহিত্য অধ্যয়ন করিতেন। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে তয়োতেক জা'র সংস্পর্শে আসা অবধি তিনি অক্লান্তভাবে ১৭২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নাটক রচনা করিয়াছেন। চিকামাৎসুর সহিত প্রতিযোগিতার জন্য তিনি একই বিষয়-বস্তু লইয়া অনেক নাটক রচনা করিয়াছেন।

কাইওনের পর আসেন নিসীজমাইপ্পু (১৬৯৫—১৭৩১)। তিনি ইশুদা আবুন এবং নাসিকি সোশুকীর সহিত সম্মিলিত ভাবে দ্বাদশ খণ্ড নাটক রচনা করেন। সেই সময়ে পাঁচ ছয় জন লেখকের সম্মিলিত ভাবে রচনা করাটা রীতি ছিল। ইপ্পুর কতকগুলি নাটক খুবই আদৃত হইয়াছিল।

নামিকি সোশুকী (১৬৯৪—১৭৫০) 'কাইওনের' পর তয়োতেক জার জন্য আর চার পাঁচ জন লেখকের সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রায় কুড়ি খানি পুস্তক রচনা করেন। তাঁর পুস্তকগুলির মধ্যে কতকগুলি খুবই আদৃত হইয়াছে।

চিকামাৎসুর পর তেকোমাতা জার নাট্যকার হলেন টেকেদা ইজুমো (১৬৯১—১৭৫৬)। তিনি গিদায়ুর মৃত্যুর পর থিয়েটারেরও সত্বাধিকারী হন। তিনি প্রায় ৩২ খানি সুন্দর নাটক রচনা করেন, তন্মধ্যে চুশীনগুড়া জাপানী দর্শকদের খুবই প্রিয়।

ইহাদের পর চিকামাৎসু হান্‌জী, চিকামাৎসু তোকাজো প্রভৃতিও সাহিত্য সাধনায় যশ লাভ করেন।

তেকোমাতা জা, ও তয়োতেক জা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে খুবই উন্নতি লাভ করে। সেই সময় ইজুমো ও সোশুকো তাঁহাদের জন্য নাটক রচনা করিত। পরে ক্রমশঃ এরা অবনত হইতে লাগিল এবং ঐ শতাব্দীর শেষভাগেই লুপ্ত হইয়া গেল। তৎপরে ঐরূপ নাট্যশালার কেন্দ্র পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল ইয়াডোতে এবং অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া খুবই উন্নতি লাভ করিল। এই সময় ওসাকা, কিয়োতো প্রভৃতি অঞ্চলে ওদের প্রদর্শনী চলিতে লাগিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ ভাগে ওসাকায় মহাকাব্য-জাতীয় নাটকের যুগ শেষ হয়।

ইহার পর তোকিয়োতে যখন তখন এই ধরণের অভিনয় প্রদর্শিত হইতে লাগিল। কিন্তু দর্শক খুবই কম হইতে লাগিল। এই ধরণের নাট্যশালা উঠিয়া যাইবার একটী

প্রধান কারণ এই যে ইহাদেরই সমসাময়িক 'কাচুকী সীবৈ' এই সময় খুবই উন্নত হইয়া পড়ে। সুতরাং এই স্থলে 'কাচুকী সীবৈ'এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ইজুমো প্রদেশের কিজুকী মন্দিরের ওকুনী নাম্নী এক পুরোহিত ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ওকুনী ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রেমাস্পদের সহিত কিয়তোয় গমন করেন। সেখানে তাঁরা কামো নদীর ধারে এক রঙ্গমঞ্চ তৈয়ারী করিলেন। সেই রঙ্গমঞ্চে ইনি ও মন্দিরেরই কয়েকজন বালিকা নৃত্য করিত। তাহারা পুরোহিতের প্রেমাস্পদ সাঞ্জাচুরোর রচিত কতকগুলি সাধারণ গান গাহিত। ক্রমশঃ এদের প্রভাব চার দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে ওকুনী ইয়োদোতে গমন করিলেন। ইয়োদো, ওসাকা এবং কিয়োতোতে নর্ত্তকী সংখ্যা অনেক বর্দ্ধিত হইল এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে বিশেষ কলাকুশলী ছিলেন। অভিনয় দর্শকের সংখ্যা খুবই বাড়িতে লাগিল কিন্তু স্ত্রীলোকদের অভিনয় অনেকক্ষেত্রে শ্লীল ও সঙ্গত বিবেচিত না হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষ এই স্ত্রী-লোকদের অভিনয় বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু এই কারণে কতকগুলি অভিনেতাকে স্ত্রীলোকের অংশ অভিনয় করিতে হইত। যে সময় চিকামাৎসু ও কাইওন প্রতিষ্ঠালাভ করেন সেই সময়ে কাচুকী সম্প্রদায় ওসাকা, কিয়োতে ও ইয়োদোতে খুবই উন্নতিলাভ করেন—কিন্তু তাঁরা এদের সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ হন নাই। কারণ এই সকলে অশিক্ষিত অভিনেতাদের লিখিত নাটক অভিনীত হইত। নাট্যশালায় দু-এক জন লেখক ব্যতীত এই সব লেখকরা অতি নিম্ন শ্রেণীর লেখক ছিলেন।

কাচুকী থিয়েটারে অভিনেতারাই ছিলেন সর্ব্বে-সর্ব্বা এবং লেখকরা তাঁদের তাঁবেদার ছিলেন। কাজেই কোনো স্বাধীনচেতা নাট্যকার তাঁদের জন্য নাটক রচনা করিতেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই কাচুকী সম্প্রদায় খুবই উন্নতিলাভ করে এবং তাহারা উচ্চস্তরের সমস্ত নাটক অভিনয় করিতে লাগিল।

ফলে শীঘ্রই তাহারা পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায় অপেক্ষা উন্নতিলাভ করিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহারা ঐ দলকে একদম লুপ্ত করিয়া দিল।

বর্ত্তমানে জাপানে দুই শ্রেণীর নাট্যশালা আছে—'কাচুকী' সম্প্রদায় এবং 'নবীনদল'। প্রাচীন ধরণের নাট্য-শালায় প্রাচীন যুগের নাটকাবলী অভিনীত হয়। নবীন-দলের নাট্যশালায় এখন বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক সকলের অনুবাদ অভিনীত হইয়া থাকে—সেক্‌স্‌পীয়র, ইব্‌সেন, স, মেটারলিঙ্ক, অস্কার ওয়াইল্ড প্রভৃতির। প্রাচীন ধরণের নাটকাবলী তরুণদের কাছে তেমন প্রিয় নহে, কিন্তু এই সব অনুবাদ তাহাদের খুবই প্রিয়।

কিন্তু প্রাচীন নাট্যশালায় প্রাচীনযুগের নাটকাবলীর অভিনয়েও দর্শক মিলে। তোকিয়োতে যাযাবর সম্প্রদায়ের মত নাট্যশালার অভিনয়ও হয়। এই সম্প্রদায় সংখ্যায় ১৫০টী।

জাপানের প্রত্যেক সহরে, প্রত্যেক গ্রামে সৌখীন সম্প্রদায় বহু আছে। জাপানের প্রত্যেক কুটীরে—প্রত্যেক সাধারণ স্থানে প্রাচীন যুগের নাটকাবলীর অংশবিশেষ জাতীয় সঙ্গীতের মত চলিয়া আসিতেছে।

জাপানের নাটকের ইতিহাস তথা জাপানের নাট্যশালার ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে বলা হইল। জাপানী গীত-সাহিত্য যেরূপ দ্রুত উন্নত হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায় এর ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল।

সঞ্চয়ন

বৈজ্ঞানিক

[অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ দে এম্-এস-সি]

যদি বলা যায় যে আলোকের সঙ্গে 'এক্স্-রেজে'র* (X-rays) কিংবা রেডিয়াম থেকে যে 'গামা-রে'† (γ-ray) বাহির হয় তাহার কিংবা আতপ-রশ্মির, কিংবা বেতার রশ্মির যে সম্বন্ধ আছে, তা অতি সরল, তা হ'লে অনেকে কথাটা অপ্রাসঙ্গিক ব'লে উড়িয়ে দিতে পারে; কিন্তু পদার্থবিদ্যাবিদের (Physicist) কাছে এই সব গুলির বিশেষ একটু নিকট সম্পর্ক আছে। আচ্ছা, ধরা যাক্ যে, পুকুরের পাড়ে দাঁড়াইয়া মাঝ-খানে একটা ঢিল ফেলা হ'ল। প্রথমে একটা ছোট ঢিল ফেলা হ'ল; সেই জন্য যে ঢেউ গুলি হবে সে গুলি আকারে ছোট, এবং একটা ঢেউয়ের মাথা থেকে পরবর্ত্তী ঢেউয়ের মাথাটাও বেশ ছোট; কিন্তু সেই স্থানে যদি একটা প্রকাণ্ড পাথর ফেলা যায়, তা হ'লে যে ঢেউগুলো তৈয়ারী হ'বে সেগুলো নিশ্চয়ই বেশ মস্ত-মস্ত। একটা ঢেউয়ের মাথা থেকে আর একটা ঢেউয়ের মাথার অনেক খানি ব্যবধান। সেই রকম পদার্থবিদ্যাবিদের মতে ইথার (Æther) বলে এক রকম অজ্ঞেয় পদার্থ সমস্ত বিশ্ব জুড়িয়া আছে, তার মধ্যে ঢেউ হচ্ছে, সেই ঢেউ গুলি আলোক কিংবা X-rays কিংবা γ-rays কিংবা তাপ-রশ্মি কিংবা সেই বেতার রশ্মি। তবে ঢেউয়ের আকারের কেবল তার-তম্য। শব্দ-বিজ্ঞানে (Acoustics) আছে আমরা জানি যে সুর আর কিছু নয় কেবল বায়ুর সাগরে তরঙ্গ, আর ভিন্ন ভিন্ন সুরের প্রভেদ কেবল ঢেউয়ের আকারে। উদারা, মুদারা, তারা যেমন সুর-সপ্তকের ভাগ, সেই রকম X-ray আলোক, তাপ, radio—কেবল æther ঢেউয়ের ভিন্ন ভিন্ন সপ্তক মাত্র।

সাধারণ আলোক — $\frac{৩৫}{১০০০০০০০০}$ হইতে $\frac{১৫}{১০০০০০০০০}$ ইঞ্চি

আল্ভাট্রেওলেট — $\frac{১৫}{১০০০০০০০০}$ হইতে $\frac{১}{১০০০০০০০০}$ ইঞ্চি

এক্স্-রেজ $\frac{৫০}{১০০০০০০০০০০০}$ হইতে $\frac{১}{১০০০০০০০০০০০০}$ ইঞ্চি

কঠিনতম গামা-রেজ — $\frac{২২}{১০০০০০০০০০০০০০০০}$ ইঞ্চি

*   *   *

জড় জগতে বস্তুদের তিন অবস্থায় প্রায় পাওয়া যায়, Solid কঠিন জড়, liquid তরল Gaseous বায়রীয় এই তিন অবস্থায় প্রত্যেক element (মূলপদার্থ)ই পাওয়া যেতে পারে, বায়ুকেও তরল জলীয় অবস্থায় পাওয়া যায়, বিলাতে দুধের মত Ice-factory থেকে কিনতে পারা যায়। Oxygen শক্ত পাথরের মত অবস্থায় পাওয়া যেতে পারে তবে খুব low temperature এ যে Gas অনেক দিন তরল অবস্থায় আনবার প্রয়াসকে ব্যর্থ করেছে সেটা Helium. সবে তিন বৎসর হ'ল Prof. K. Onnes (Holland) তাহাকেও তরলাবস্থায় এনেছেন। পদার্থবিদেদের মত যে Gaseous অবস্থায় অণুর বাঁধন শিথিল হয়, মোটে থাকে না বল্লেই চলে। জলীয়াবস্থায় খানিকটা বর্ত্তমান থাকে। আর (Solid) জড় অবস্থায় বন্ধনটা খুব জোরই থাকে এ সম্বন্ধে একটা উদাহরণ খুব উপযোগী হ'বে। মনে করা যাক্ একটা বিদ্যালয় আছে, তাতে অনেক গুলি ছেলে পড়ে। তারা একসঙ্গে ড্রিল করছে বেশ সুন্দর ভাবে লাইন-বন্দি হয়ে। এ অবস্থাটা আমরা ঠিক একটা Crystalএর মধ্যে পরমাণুর নিয়মিত ভাবে অবস্থানের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। ভাবা যাক প্রত্যেক Section এর ছেলেরা হয়ে এক সঙ্গে, রয়েছে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে কিন্তু এক একটা Group form করে, তাহলে সে অবস্থা আমরা Amorphous solid এর সঙ্গে তুলনা করতে পারি। ভাবা যাক বিদ্যালয়ের পারিতোষিকের

---

* *X-rays* (*Rontgen rays*) একপ্রকার অদৃশ্য রশ্মি যাহা মাংসাপশীর মধ্য দিয়া সহজে ভেদ করিয়া যাইতে পারে, কিন্তু হাড়ের মধ্য দিয়া যাইতে পারে না।

† *γ-rays* X-rays জাতীয় একরকম রশ্মি যাহা X-rays অপেক্ষা আরও "Penetrating" অর্থাৎ সহজে সমস্ত দ্রব্যের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতে পারে।

দিন। সেই দিন ছেলেরা যেমন একত্র থাকে অথচ সকলে ব্যস্ত হয়ে এধার ওধার ঘোরা-ঘুরি করে, কেহ একই স্থানে সমস্ত সময়ের জন্য থাকে না; সেই অবস্থাকে তরল অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তার পর যদি ভাবি ছেলের দলেরা খেলার মাঠে গেছে ঠিক Tiffinএর সময়, কেহ কাহারও সঙ্গে একত্র নাই, সকলে দৌড়া-দোড়ি করে বেড়াচ্ছে এই অবস্থা হবে পরমাণুর Gaseous State.

* * * *

উত্তাপ এক প্রকার radiation বিশেষ, যেমন আলোক Rontgen rays or (X-rays). (γ-rays) রেডিয়াম হতে সকল সময় এক প্রকার অতি তীক্ষ্ণ রশ্মি বাহির হয়, ইহা Rongten (X,) ray অপেক্ষা বহু অংশে জোরালো। Xray ½ inch শীশের Plate ভেদ করতে পারে কিন্তু γ-rays সেই জায়গায় প্রায় ৪ ইঞ্চি হইতে ৫ ইঞ্চি অনায়াসে ভেদ করে যেতে পারে। Radiation ভিন্ন ভিন্ন রকমের হলেও সমস্তই এক প্রকারে জিনিস প্রভেদ কেবল আকারের। যেমন গুটি কত কৌটা বিশ কৌটার ভিতর থাকেমাত্র একটা আর একটা কৌটার চেয়ে ক্রমশ ছোট থেকে ছোট হয়ে যায়। প্লাঙ্ক (Planck) এক জন জর্ম্মাণ পদার্থ-বিদ্যাবিৎ। তিনি ১৯১৮ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি বেশ সুন্দর ভাবে Radiationএর আদান-প্রদানের নিয়ম নির্দ্ধারণ করেছেন। তাঁর মতে এই আদান প্রদান খুচরা খুচরা ভাবে হয়, যেমন পুকুর থেকে বালতি বালতি করে জল তুলে পুকুর খালি করতে পারা যায় সেইরূপে যে Radiating source থেকে energy খুচরা খুচরা ভাবে আদান প্রদান চলে, তাকে আবার radiation quantum বলে। সেই quantum এর আকার ভিন্ন ভিন্ন radiation এ বিশ-কৌটার ভিন্ন কৌটার মত প্রভেদ আকারে প্রকারে নয় X-ray quantum খুব বড় বড় কিন্তু light rays এর ছোট আবার radio waverএর আয়তন ছোট। আবার পুকুরের analogy নেওয়া যাক। পুকুর থেকে জল ছেঁচে ফেলতে হলে আমরা বালতি দিয়ে পারি কিংবা Pump করে পারি, কিন্তু Quantum Theoryর মতে radiation হচ্ছে ঠিক বালতি করে জল তোলার অনুরূপ—Pump করার মত নয়। আবার বিশ-কৌটার analogy নিলে বিশ-কৌটাকে কেটে ফেললে তার যেমন অস্তিত্ব থাকে না সেইরূপ radiation ও কিংবা quantumএর *fraction* হ'তে পারে না। এরূপ ভাবে বিচার করার দিকে অনেক গবেষণার ফল নিহিত আছে, অন্যথা করার উপায় নাই।

গমের রপ্তানীতে ভারতবর্ষ

[শ্রীঅমিয়কুমার সান্যাল বি-এ]

লিলণ্ড ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত "ফুড রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্" হইতে গম সম্বন্ধে আলোচনা ("Wheat Studies") বলিয়া কয়েকখানি পুস্তক বাহির করিয়াছেন (৩য় খণ্ড পৃঃ ৩১৭-৪১২), তন্মধ্যে "ভারতের গমের চাষ ও রপ্তানী" নামক একখানি পুস্তকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভারতের গমের চাষ রপ্তানী হিসাবে কোনকালেই প্রাধান্য লাভ করিবে না। প্রথম প্রথম এরূপ আশা ছিল যে ভারতীয় গমের দ্বারা ইংলণ্ডের অভাব দূর হইবে এবং ভারতবর্ষ গমের রপ্তানীতে অগ্রণী হইবে। ১৮৭০ হইতে ১৮৮০ পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরে যদিও রপ্তানীর মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে তথাপি পূর্ব্বের পরিপুষ্ট সে আশা কখনও সফল হয় নাই। পরবর্ত্তী দশবৎসরে গমের ব্যবসায় বিশেষ উন্নত অবস্থা লাভ করে। এবং পরের কয়েক বৎসরে রপ্তানীর গতি অনির্দ্দিষ্ট রহিয়া যায়। যে বৎসর ভারতে জলবৃষ্টি বেশ ভালই তার অধিকাংশ বৎসরেই গমের রপ্তানী প্রচুর হইয়াছে; তবে ১৮৮০ হইতে ১৮৯০ সাল পর্য্যন্ত গমের যে রপ্তানী হয় তাহা বিশেষ বেশী নয়—এমন কি তাহার পরিমাণ যুক্তরাজ্য, কানাডা, রুশিয়া, আর্জেন্টিনা বা অধুনাতন অষ্ট্রেলিয়া হইতে গমের যে রপ্তানী চলিতেছে তাহাদের সহিত তুলনায় দাঁড়াইতে পারে না। ভারতে অন্যান্য বৎসরে যে সময়ে জল বৃষ্টি ভাল হয় না, গমের রপ্তানী অনেক কমিয়া সে সময় যায়; এমন কি থাকে না বলিলেও হয়। গত মহাযুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে রপ্তানীর মাত্রা কিছু উর্দ্ধ-গতিতে চলিতেছিল, তবে যুদ্ধের অবসানে এক এক বৎসর এমনও হইয়াছে যে বিদেশ হইতে গম ভারতে চালান করা হইয়াছে—উক্ত

গ্রন্থের রচয়িতা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতে উৎপন্ন বর্ত্তমানে গমের পরিমাণ ৩৫ কোটি বুশেল এবং আগামী বিশ বা ত্রিশ বৎসরে মোট উৎপাদন সম্ভবতঃ ৪০ কোটি বুশেলে দাঁড়াইতে পারে। তবে উক্ত উন্নতির পথে বাধাও বিস্তর।

গমের উৎপাদন যতই বাড়ুক, ভবিষ্যতে গমের রপ্তানী হিসাবে ভারতের কোনও কদর হইবে না ;—তাহার কারণ বাড়তির পরিমাণ দেশেই ব্যবহৃত হইবে, যেহেতু ভবিষ্যতে দেশের যন্ত্র-শিল্প অনেক বাড়িবে এবং লোকের ব্যয় সাচ্ছল্যও অনেক বাড়িবে।

উত্তর বঙ্গে বৃষ্টি ও বন্যা

জ্যৈষ্ঠের মধ্য হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্বিনের মধ্য পর্য্যন্ত যে কয় মাস দক্ষিণ পশ্চিম মৌসিম বায়ু বহিয়া থাকে, সেই কয় মাসে উত্তর-বঙ্গে যে পরিমাণ বৃষ্টি পড়ে, তাহা সমগ্র বৎসরের স্থানীয় বৃষ্টির প্রায় চারি ভাগের তিন ভাগ। এই মৌসিম বায়ুর দৌলতেই উত্তর-বঙ্গের কৃষি সম্পদ ; আবার এই মৌসিম বায়ুর দৌরাত্ম্যেই যা কিছু বন্যা।

বর্ষার নিয়মিত বৃষ্টির উপরও কখনও বড় বড় জলঝঞ্ঝা বঙ্গোপসাগর হইতে আসিয়া ধীর গতিতে দেশের উপর দিয়া উত্তরে চলিতে থাকে। এই জলঝঞ্ঝা হইতে যে বারিবর্ষণ হয় তাহাতেই উত্তর-বঙ্গে প্লাবনের সৃষ্টি হইয়া থাকে। বস্তুতঃ গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে যতগুলি বন্যা হইয়াছে তাহার সকল গুলির উৎপত্তিই এই ভাবে এবং প্রায় সকল গুলিই হয় বর্ষার মধ্যভাগে না হয় অন্তে সংঘটিত হইয়াছে। তবে বন্যাগুলির মধ্যে কোন পরিমিত সময়ের ব্যবধান নাই—এবং দীর্ঘকাল অন্তরে যে বন্যা আসে তাহা যে সেই কারণেই গুরুতর হইবে, এমনও নয়।

কোনওরূপ কৃত্রিম উপায়ে এই বন্যা নিরোধ করিবার চেষ্টা সার্থক হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। উত্তর-বঙ্গ ভূভাগ নিতান্ত নিম্নতল, এখানে এত সহজে যে বন্যা হয়, তাহার কারণই এই। নদীর দুই কূল বহিয়া যে জল আসে তাহার গতি রোধ করিবার চেষ্টায় কোন লাভ নাই ; কারণ প্রচুর বর্ষণের ফলে নদী সহসা স্ফীত হইয়া প্রমাদ ঘটায়, দূর হইতে বাহিত জলের উপর এ সকল বন্যা নির্ভর করে না। তবে ভবিষ্যতের বন্যা রোধ করিতে হইলে যে কয়েকটী ব্যবস্থা করা উচিত তাহা এই—

(১) বর্ষার সময় যাহাতে দেশের স্বাভাবিক জলপ্রবাহ কোনও রূপ বাধা না পায় ;

(২) রেলপথ প্রভৃতির মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক খিলান নির্ম্মাণ করা—যাহাতে একদিকের জল অনায়াসে অন্য দিকে যাইতে পারে ;

(৩) বর্ত্তমান খাল সমূহের উন্নতি বিধান করা ;

(৪) বন্যার সময়ে যাহাতে আহার্য্য দুষ্প্রাপ্য না হয় তাহার জন্য স্থানীয় অধিবাসীদিগকে পূর্ব্ব হইতে খাদ্য সঞ্চয়ে শিক্ষিত করা ;

(৫) গ্রামে গ্রামে উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মাণ করা যেখানে বন্যার সময় লোকে আশ্রয় লইয়া আত্ম রক্ষা করিতে পারে এবং খাদ্যাদি ও অন্যান্য মূল্যবান্ জিনিস সময়ে স্থানান্তরিত করিতে পারে ;

(৬) ভারতীয় মিটিয়োরোলজিক্যাল বিভাগ যাহাতে সন্নিকট বন্যা ও বৃষ্টির সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে সতর্কতার সঙ্কেত দেন তাহার ব্যবস্থা করা। শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার মহলনবীশ মহাশয় উক্ত বঙ্গীয় বন্যা-সমিতির পক্ষ হইতে এই সকল বন্যা সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়াছেন। ঐ সমিতি হইতে যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহাতে এই সকল মতামত নির্ণীত হইয়াছে এবং ঐ রিপোর্টে বৃষ্টি ও বন্যা জ্ঞাপক ৩২ খানি মানচিত্র সন্নিবিষ্ট আছে।

প্রাচীন যুগের জীব-জন্তু

[শ্রীজীবনকৃষ্ণ গণ]

চীন দেশের সেন-সি (Shen-Si) প্রদেশে একটী প্রস্তরীভূত (fossil) কচ্ছপ পাওয়া গিয়াছে। এইটী লইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে খুব হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছে। কচ্ছপটী প্রায় একফুট লম্বা এবং এখন উহা আমেরিকার 'Field Museum of Natural History' তে আছে। দূর হইতে দেখিলে ইহাকে একখণ্ড পাথর বলিয়া বোধ হইবে ; ইহার উপরিভাগ প্রায় গম্বুজের (dome) ন্যায় দেখায়। ঐ যাদুঘরের ৩ বিভাগের বৈজ্ঞানিকেরা উহার গবেষণায় লিপ্ত আছেন। উহার পৃষ্ঠে চার হাজার বৎসর

পূর্ব্বের ছয়টী দুর্ব্বোধ্য চৈনিক লিপি (inscriptions) ক্ষোদিত রহিয়াছে। ঐ যাদুঘরের প্রসিদ্ধ নৃ-তত্ত্ববিদ্ আচার্য্য বেরটোল্ড লাউফের (Berthold Laufer) লিপিটীর পাঠোদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আচার্য্যের মতে চীনেরা ঐ কচ্ছপটীর অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য অতি পবিত্র জন্তু বলিয়া ভক্তি করিত। ঐ ক্ষোদিত লিপি

চীন দেশের অতি প্রাচীন যুগের বলিয়া বোধ হয় এবং হো-নানের (Ho-nan) বিখ্যাত দৈব অস্থির (Oracle-bones) সহিত উহার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আচার্য্য মহাশয় আরও বলেন যে পূর্ব্বকালে চীন দেশে কচ্ছপের খোলা ভবিষ্যদ্বাণীর অন্যতম উপাদান ছিল। এই কারণে খোলা গুলিকে আগুনে ঝলসাইয়া ফাটাইয়া ফেলা হইত এবং ঐ ফাটাগুলিকে ভবিষ্যৎ ঘটনার প্রতিচ্ছবি বলিয়া মনে করিত। চৈনিক লিপির অতি পুরাতন নিদর্শন কচ্ছপের খোলায় পাওয়া যায় এবং উহাতে ভবিষ্যদ্বক্তাদের উদ্দেশে প্রশ্ন ও তাহার উত্তর দেখিতেও পাওয়া যায়। ঐ যাদুঘরের প্রাণিতত্ত্ববিদেরা (Zoologists) কচ্ছপটীকে টেস্টুডো (Testudo) বংশের একটী অজ্ঞাত শাখা (Species) বলিয়া অনুমান করেন। এমন কি ঐ যাদুঘরের সরীসৃপ ও উভচর জন্তুবিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত Karl P. Schmidt অনেক গবেষণার পর ঠিক করিয়াছেন যে, এই শাখার আর কোন চিহ্ন অদ্যাপি কোথাও পাওয়া যায় নাই। আবার ঐ যাদুঘরের প্রাচীন জীব জন্তু-বিজ্ঞানবিদেরা (Palaeontologists) [অধ্যাপক Elmer, S. Riggs এর নাম ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য] কচ্ছপটীকে অনুমান এক কোটি নব্বই লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে মাইওসিন যুগের (Miocene) প্রাণী বলিয়া ঠিক করিয়াছেন। প্রাণিতত্ত্ববিদদের ন্যায় ইহারাও ঐ জাতীয় কচ্ছপের আর কোন নিদর্শন পান নাই।

ঐ লিপির যথার্থ পাঠোদ্ধারের চেষ্টা চলিতেছে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য আঁদেরর্স (Andersson) এবং আচার্য্য জডান্স্কি (Zdansky) পেকিঙের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত চুকুতিয়েনের (Chou Kou-Tien) প্রস্তরীভূত অস্থির আবিষ্কারের জন্য প্রবৃত্ত হন। এখানে তাঁহারা কতিপয় জন্তুর ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হন। ঐ ভগ্নাবশেষ-গুলিকে তাঁহারা প্রথমে প্লাইওসিন (Pliocene) যুগের শেষ সময়কার বলিয়া ধারণা করেন। কিন্তু আজকাল ঐ গুলিকে চীন দেশের অতি পুরাতন প্লাইষ্টোসিন (Pleistocene) বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে। সেখানে যে সকল জিনিস পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে দুইটী দাঁতের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দাঁত দুইটীর মধ্যে একটী নীচের pre-molar আর একটী উপরের ডান্ ধারের (arriere-molaire)। দাঁত দুইটী নিঃসন্দেহে মানুষের বলা যাইতে পারে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে শ্লোসের (Schlosser) সাহেব ঐ রকম আর একটী অত্যন্ত প্রস্তরীভূত কসদাঁত (molar) প্রাপ্ত হন। এই দাঁতটী একটী চীন দেশীয় ঔষধের দোকান হইতে পাওয়া যায় এবং ইহা কোন মানুষের কিংবা কোন বৃহৎ বানরের বলিয়া (Singe ant romorphe) বোধ হয়। বৎসর খানেক পূর্ব্বে চুকুতিয়েনের ঐ স্তরেতে আরও একটী নূতন নীচের premolar দাঁত পাওয়া গিয়াছে। পরে পরীক্ষা করিয়া ইহা আট বৎসর বয়সের বালকের দাঁত বলিয়া ঠিক হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ডেভিডসন ব্লাক (Davidson Black) বলেন যে, এই তিনটী দাঁতের বিশেষত্ব এতই অধিক যে পেকিঙের প্রাচীন জীব-জন্তু-বিজ্ঞানবিদেরা (Palaeontologists) ইহাদিগকে Sinanthropus (চীন-মানুষ) বলিয়া স্বতন্ত্র বংশের পর্য্যায়ের অন্তর্গত বলিয়া ঠিকই করিয়াছেন। এবিষয়ে বিখ্যাত পণ্ডিত আচার্য্য জডান্স্কি (Zdansky) বিস্তারিত ভাবে Palaeontologica Sinila তে আলোচনা করিবেন বলিয়া সংবাদ দিয়াছেন।

বৈদ্যক

যক্ষ্মা বা ক্ষয়কাশ

বাঙলা দেশে যক্ষ্মা বা ক্ষয়কাশ সম্বন্ধে প্রাদেশিক চিকিৎসা-বিভাগের কর্ত্তা সার্জ্জন জেনারেল টেট্ সাহেব ১৯২৬ সালের হাঁসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির বার্ষিক বিবরণী আলোচনা করিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, দেশে যক্ষ্মা বা ক্ষয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বাস্তবিক এই কথা যে কতদূর সত্য তাহা আমরা সকলেই নিজ নিজ আত্মীয়, পরিবার ও বন্ধুদের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেই অনুমান করিতে পারি। যে সকল রোগী এই রোগের চিকিৎসার জন্য হাঁসপাতালে বা অন্য কোন দাতব্য চিকিৎসালয়ে আসে তাহাদের সংখ্যা প্রতি বৎসর অন্যূন এক হাজার করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে ও সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১৩৩৭৯ জন যক্ষ্মা কাশগ্রস্ত রোগী* ১৯২৬ সালে বাঙলা দেশের হাঁসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়গুলিতে চিকিৎসিত হইয়াছিল। কলিকাতার মেডিকেল কলেজে মাত্র ২৪ জন রোগী এককালে চিকিৎসিত হইতে পারে— সুতরাং অধিকাংশ রোগীই এই হাঁসপাতালে স্থান না পাইয়া অপর স্থানে যায় ও তাহাদের সংখ্যার কোন সন্ধানই আমরা পাই না। যদি সকল রোগীর সন্ধান আমরা পাইতাম তাহা হইলে রোগীর সংখ্যা অনেক বেশী দেখান যাইত।

আর্থিক দুরবস্থা, অন্নকষ্ট, দূষিত জল ও দূষিত বায়ু সেবন, একত্র অধিক লোকের বাস, অপরিষ্কৃত শয্যা, অপরিষ্কৃত গৃহ প্রভৃতি আমাদের স্বাস্থ্য-হানির কারণ— ইহা বোধ হয় সকলেই জানেন। অধিকন্তু ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও ইদানীং বেরীবেরীতে ভুগিয়া আমাদের দেশের লোকেদের স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, ও তাহার উপর যদি কোন ক্রমে যক্ষ্মারোগের বীজাণু একবার আমাদের শরীরে প্রবেশ করিতে পারে তাহা হইলে আমাদের উহা প্রতিরোধ করিবার আর কোন উপায়ই থাকে না। যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে যে সমস্ত সংবাদ ইউরোপের নানা দেশ হইতে আমরা পাই তাহা হইতে মনে হয় যে, ঐ সকল দেশ হইতে যক্ষ্মাকাশ ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে ও আশা করা যায় যে কিছুদিন বাদে তথায় একটী মাত্রও যক্ষ্মা-কাশগ্রস্ত রোগী থাকিবে না। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা ইহার ঠিক বিপরীত।

ঋগ্বেদে এই রোগের বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয় যে, ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন সময় হইতে এই রোগ আর্য্য-জাতির জানা ছিল। ইহা যে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বিস্তার লাভ করে তদ্‌বিষয়ে অনেকানেক প্রমাণ পাওয়া যায়। যীশুখৃষ্ট জন্মাইবার ৫ শত শতাব্দী পূর্ব্বে "হিপ'ক্রেটিস্" ইহার বর্ণনা করিয়াছেন ও তাহার পর হইতে ইউরোপে যে যে স্থানে সভ্যতার বিস্তার হইয়াছে, এই রোগও সেই সেই স্থানে নিজ প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষেই এমন অনেক স্থান ছিল, যেখানে একটী মাত্রও যক্ষ্মাকাশ-গ্রস্ত রোগী ছিল না; কিন্তু ইদানীং রেলরাস্তা, মোটর, জাহাজ বা অন্য নানা উপায়ে যাতায়াত করিবার সুবিধা হওয়ায় ঐ সকল স্থানের মধ্যে অনেকগুলিতেই অধুনা যক্ষ্মারোগ বহু পরিমাণে দৃষ্ট হইতেছে।

যক্ষ্মা-রোগের যৌবনের সঙ্গে মিত্রতা বড় অধিক। অপর কোনও রোগের তারুণ্যের সহিত ততটা সদ্ভাব নাই; কারণ, তাহাদের বীজাণুগুলি যৌবনে আমাদের শরীরে প্রবেশ করিলে অধিকাংশ সময়েই প্রতিষেধক শক্তির প্রভাবে আপনা হইতেই মরিয়া যায়। এইজন্য যৌবনের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে সকল রোগী মারা যায় তাহাদের অধিকাংশই যক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত। শিশু ও বৃদ্ধদের মধ্যে এই রোগের প্রাবল্য আমাদের দেশে খুব কম।

এই রোগ মানুষকে যেমন আক্রমণ করে গৃহপালিত পশু ও পক্ষীদিগকেও সেইরূপ আক্রমণ করে। বন্য পশু ও পক্ষী—যাহারা সভ্যতার প্রাচীর মধ্যে কখনও প্রবেশ করে নাই—তাহাদের মধ্যে এই রোগ বড় দেখা যায় না। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু ও বাঁদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এজন্য গাভীর দুগ্ধ পান করিবার পূর্ব্বে উহা দূষিত কি না, সর্ব্বাগ্রে নির্ণয় করা উচিত। দুধ জ্বাল দিলে উহার দোষ সংশোধিত হয় বটে, কিন্তু যে অল্প সময় মাত্র আমরা সাধারণতঃ দুধ জ্বাল দিয়া থাকি তাহাতে শুধু যক্ষ্মা-

* Surgeon General Tate's report, 1926. দ্রষ্টব্য।

রোগের কেন অন্য অনেক রোগেরই বীজাণু নষ্ট না হইতেও পারে। আজকাল অন্য এক উপায়ে দুধ সংশোধিত করিয়া বাজারে বিক্রয় হয়; ইহাকে pasturised দুধ বলে। Pasturised দুধ জ্বাল দেওয়া দুধ অপেক্ষা অনেক ভাল হইলেও এই প্রক্রিয়া করিবার সময় দুধকে ঘন ঘন সঞ্চালিত করা আবশ্যক; তাহা না হইলে সরের মধ্যে বীজাণুগুলি জমিয়া সজীব অবস্থায় থাকিয়া যাইতে পারে।

অনেক রোগের বীজাণু বরফের মধ্যে পড়িলে মরিয়া যায়, কিন্তু যক্ষ্মা-রোগের বীজাণু বরফের মধ্যে রাখিলে মরিয়া যায় না; কেবলমাত্র সেই সময়ের জন্য নির্জীব হইয়া থাকে। দূষিত জলে বরফ তৈয়ারী হইলে সেই বরফ ব্যবহারে আমাদের শরীর অসুস্থ হইতে পারে। এই জন্য পানীয় জলের সহিত কিংবা খাদ্য-দ্রব্যের সহিত বরফ ব্যবহার করা শ্রেয়ঃ নহে।

যক্ষ্মারোগ যে বাড়ীতে একবার প্রবেশ করে, সেই বাড়ীতে ক্ষয়রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়; আরও কিছুদিন পরে সেই বাড়ীর চারি পার্শ্বে বিস্তর লোক ইহাতে আক্রান্ত হন। তাহার প্রধান কারণ যক্ষ্মাকাশ-রোগীর কাশ বা শ্লেষ্মা, মল মূত্র, হাঁচি, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, ঘাম ইত্যাদি হইতে ভূরি ভূরি বীজাণু বাহির হইলে বাতাসের কিংবা খাদ্য-দ্রব্যের সহিত নিকটবর্ত্তী অন্য লোকের শরীরে প্রবেশ করে। সাধারণতঃ যাহাকে আমরা "থাইসিস্" বলি তাহাতে এই বীজাণুগুলি আমাদের ফুস্-ফুসের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তথায় ক্ষত উৎপাদন করে। অন্য-স্থানের ক্ষত হইতে যেমন রক্ত বা পুঁজ বাহির হয় যক্ষ্মার ক্ষত হইতেও সেইরূপ হইয়া থাকে। সেই জন্য কাশের সহিত রক্ত উঠে ও কাশিতে অনেক সময় দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। যদি কোনও রকমে যক্ষ্মা-রোগীর শ্লেষ্মা, কাশ, মল, মূত্র, ইত্যাদি রোগীর শরীর হইতে বাহির হইবা মাত্র নষ্ট করিতে পারা যায়, তাহা হইলে একটি মাত্র রোগী হইতে অন্য লোকের শরীরে রোগ-সংক্রমণের (infection) সম্ভাবনা কম থাকে। এই জন্য যক্ষ্মা-রোগীর শ্লেষ্মা, কাশ, মল, মূত্র একটী নির্দ্দিষ্ট পাত্রে রাখিয়া স্পীরিট্ জ্বালাইয়া দিয়া পুড়াইয়া ফেলিতে হয় ও রোগীর মুখে একরূপ ঢাকা (Yeo's inhaler) দিতে হয়। ইহাতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত বীজাণুগুলি বাতাসে মিশ্রিত হইতে পারে না। সাধারণতঃ আমরা দেখি যে যক্ষ্মা-রোগীর মল, মূত্র ও কাপড়-চোপড় রাস্তায় অথবা নিকটবর্ত্তী কোন ড্রেণে ফেলা হয়। এইরূপ করিলে বাটীর চারিদিকের লোকেদের ও গৃহ-পালিত পশু-পক্ষীদের যক্ষ্মা-রোগ হওয়ার সম্ভাবনা। যক্ষ্মা-রোগীর কাপড়-চোপড়, বিছানা বালিসের ওয়াড় ইত্যাদি প্রতিদিন অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টা জলে ফুটাইয়া ব্যবহার করা উচিত।

"থাইসিস্" রোগের চিকিৎসা যে আশাপ্রদ হয় না, তাহার প্রধান কারণ—ফুস্-ফুসের মধ্যে যে ক্ষত হয় তাহাতে এমন কোনরূপ ঔষধ লাগান চলে না যাহা দ্বারা বীজাণুগুলি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। শরীরের বাহিরে ক্ষত হইলে আমরা নানারূপ বীজাণু নষ্ট করার ঔষধ প্রয়োগ বা অস্ত্র-চিকিৎসা করিতে পারি। কিন্তু ফুস্-ফুসের ক্ষতে তাহা করা ততটা সম্ভব নয়। যদিও আজকাল মার্কিন দেশে, ফরাসী দেশে, বিলাতে ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে থাইসিসের অস্ত্র-চিকিৎসা করা হইতেছে (Thoracoplasty, Phrenicotomy, Artificial Pneumothorax)। কিন্তু আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত ইহার কোন আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহাতে হতাশ না হইয়া তাঁহাদের গবেষণা পূর্ণ উদ্যমে চালাইতেছেন। অদূর ভবিষ্যতে তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

যক্ষ্মারোগের এই অভিনব চিকিৎসা-পদ্ধতির (Artificial Pneumotharox) একটী বিস্তৃত বিবরণ পরবর্ত্তী কোন এক সংখ্যায় লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

"ধন্বন্তরি"

রোগী দেখা

(গল্প)

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এ, এল-এম-এস]

ওরে ভজা, শীগ্‌গীর আয় না এ দিকে,—এক খানা চেয়ার দিয়ে যা,—ডাক্তারবাবু এসেছেন। আসুন সলিল বাবু,—নমস্কার ভাল ত সব ?

কৈ রে, এখনও দিলি নে, তোদের দিয়ে তাড়াতাড়ি কিছু হবার উপায় নেই,—ব্যাটারা সব কুড়ের সর্দ্দার।

আজ্ঞা, এই যে চেয়ার এনেছি।

বসুন সলিলবাবু—আপনি ত ঠিক সময়েই এসেছেন, কিন্তু রতনবাবুর ত দেখা নাই। এটি তার ভারি দোষ—কখনও সময় মত আসবেন না। টাইম যদি দিলেন ৮টা—৯টার আগে ত নয়ই। কারু সঙ্গে এনগেজমেণ্ট থাকলে তবুও যা হোক্, নইলে কখন্ যে আস্‌বেন তার পাত্তাই পাওয়া যায় না। কাজের লোক তা মানি, অবসর নাই সত্যি, কিন্তু ইচ্ছা থাক্‌লে এরই মধ্যে গুছাইয়া লওয়া যায়। এটা হচ্ছে চরিত্রগত দোষ—বুঝলেন কি না সলিলবাবু, আমাদের এই বাঙ্গালীদের সময়ের একটা মূল্যই নেই ;—কিন্তু তাও বলি—আপনারও ত কাজ নিতান্ত কম নয়—আপনি ত টাইম বেশ ঠিক রাখেন কি বলেন—এটা নিশ্চয়ই অভ্যাসের ফল। তাইত, রতনবাবুর যে এখনও দেখা নাই। পাঠাব না কি কাউ কে ? কি বলেন আপনি ?

এক জনকে পাঠালেই ভাল হয়। তার জন্ম না হয় ১৫।২০ মিনিট অপেক্ষা করতে পারি, সারাদিন ত আর বসে থাকব না,—আরও ত কাজ আছে। তিনি জানেন বেশী দেরী হলে আমি চলে যাব। দেখেছি ত, আমার তাড়ায় সময় অনেকটা ঠিক রাখেন। তা আপনি কাউকে শীগ্‌গীর করে পাঠান, ততক্ষণ আমি রোগী দেখে ফেলি, কি বলেন ?

তাই ভাল। ওবে শশি, একবার এদিকে শোন্ না, চট্ করে রতন ডাক্তারের বাড়ী যা—বলবি সলিলবাবু অনেকক্ষণ বসে আছেন, আপনি এখনই আসুন—এক খুব তাড়াতাড়ি। এখনও হাঁ করে দাড়িয়ে রইলি, তোদের দিয়ে যদি——

আজ্ঞে এই যাব আর আসব।

আচ্ছা ডাক্তার বাবু, রোগিণীকে দেখবার আগে সংক্ষেপে অবস্থাটা শুনলে হয় না! বোধ হয় রোগটা বুঝতে অনেকটা অসুবিধা হতে পারে,—কি বলেন আপনি ?

তা বলুন না—সব শুনেই যাই।

অসুখ আমার পরিবারের তা বোধ হয় জানেন। এখানে ছিলেন না, আজ ভোরেই পৌঁছেছেন। অবস্থা দেখে ত চক্ষুস্থির। দেখুন নাড়ীটা একটু আধটু দেখ-বার অভ্যাস আছে কি না—দেখলুম অতি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল ভাবে চল্‌ছে। জানেনই ত ওর হার্টটা কোন কালেই সবল নয়। আমার যেন মনে হয় ২৫।৩০টা 'বিটে'র পর এক একবার গোলমাল হয়, তা আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন। যেরূপ দুর্ব্বল তা হওয়া আর আশ্চর্য্য কি ? পাইখানা ত কদিন হয়ই নি, সেটা করান দরকার। তা কড়া পারগেটিভ সহ্য হবে না—মৃদু বিরেচক কিন্তু দিলেই যেন ভাল হয়। সামান্য এক আধবার কোষ্ঠ খোলসা হয়ে পেটটি পরিষ্কার হয়ে যায় সেই ভাল, নতুবা আপনারা যে কতকটা 'ক্যালোমেল' খাইয়ে দেবেন বা উগ্রবীর্য্য ঔষধ ব্যবহার করবেন—তা হবে না। ওর মাঝে মাঝে পেটের অসুখ হয়, এই দুর্ব্বল অবস্থায় যদি আবার পেট চলে তবে বাঁচানই দায় হবে। আপনি কি বলেন ?

সে ত নিশ্চয়ই!

দেখুন এবার আবার একটা নূতন উপসর্গ জুটেছে। মুখে রুচি মাত্র নাই, মুখে তেতো লেগেই আছে, যা কিছু মুখে দেন সবই তেতো-বিষ। ব্যাপারটাও ঘটেছিল বড়ই অদ্ভুত রকমে, অসুখের মুখেই এক দিন পেয়ারা খাবার সখ হ'ল, খুঁজে খুঁজে পেয়ারা ত দিলে এনে ; একটি মুখে

অবধি সারা মুখ তেতোয় ভরপুর। যা কিছু মুখে দেন তাই তেতো—এমনটা কখনও শুনেছেন কি ?

তাই ত, বড়ই আশ্চর্য্য ত ?

তার পর হাত পা জ্বালা ত আছেই—শরীরের চাইতে হাত পা বেশী গরম,—চিরদিনই পিত্তাধিক্য—দিনরাত হাওয়া করুতে করুতে ঝি চাকর সব হয়রান হ'য়ে পড়ল'। জ্বর যে খুব বেশী তা নয় ১০৩°, ১০৪° কখনও হয় না। এই বড় জোর ৯৯°, ৯৯°-৪ ও কি নিদেন ১০০°। এই ঘুসঘুসে জ্বরকে বড় ভয় করি। জোরে বেগ দিলে হয় ত সকালেই ত্যাগ হতে পারে, কিন্তু এই অল্প অল্প জ্বর যেতে চায় না। আপনি কি বলেন ?

হাঁ৷ ঘুস-ঘুসে জিনিসটা কোন কালেই ভাল নয়। রতন বাবুর ত এখনও দেখা নাই—চলুন না দেখার কাজটা না হয় সেরেই আসা যাক্।

তা সব অবস্থাই ত শুন্‌লেন, রোগটা বোধ হয় ধরুতে পেরেছেন। শশীও ফিরছে না,—ঐ আসছে না শশী ? রতনবাবুর খবরটা নিয়েই যাওয়া যাক্।

কি হে শশি, তুমি দেখছি রতনবাবুর উপরেও টেক্কা দেবার যোগাড় করুলে—একেবারে যে লোপ পাও নাই সেই ভাল, বলি এত দেরী হ'ল কেন ? রতনবাবুর খবর কি ?

তার কথা আর বল্‌বেন না কর্ত্তা ; বাড়ী বসে তিনি দিব্যি গল্প করছেন ! এক নম্বর ত খবর দিতেই পারি না, ভিতর মহলে ছিলেন কি না ! যাকে বলি, সেই বলে এই এলেন বলে—আমার প্রাণ ত শেষে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল, একেবারে মরিয়া হয়ে অন্দর বাড়ীর কাছে গিয়ে চেঁচামেচি করুতে, তবে না সাড়া পাওয়া গেল ; ধমক ত খেলুমই, বল্লেন, যাও আমি এখনই যাচ্ছি। বাইরে এসে আবার বস্‌লুম, ভাবলুম সঙ্গে সঙ্গেই যাব। অনেকক্ষণ কাটল, না পাওয়া গেল কোন সাড়া না দিতে পারলুম কোন সংবাদ—কি আর করি, কর্ত্তার কাছেই ছু:ট এলাম।

বড় কাজই করেছ—তোমাদের দিয়ে যদি কোন কর্ম্ম হয়—ডাক্তারবাবুকেই আন্‌তে পারুলে না—কি যে পার তা ত জানি না !

তবে বলুন ডাক্তার বাবু,—আচ্ছা আমি না হয় রতন বাবুর জন্যেই অপেক্ষা করি। যা ত শশি, ডাক্তার বাবুকে নিয়ে যা—একটু মনোযোগ করে দেখবেন যেন,—রোগিণীটী যাতে সত্বর আরোগ্য হয় তাই করুবেন।

রোগিণীটী বিছানায় ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। একটী ঝি পদ-সেবা করিতেছিল—অপর এক জন মাথায় হাত-পাখার বাতাস করিতেছিল। শশী বলিল,—মা,—ডাক্তার সলিলবাবু আপনাকে দেখ্‌তে এসেছেন ;—রতনবাবু এখনও আসেন নি। একেই বা আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখা যায়,—তিনি পরে দেখ্‌বেন এখন।

সলিলবাবু বলিলেন,—তাই ত বড়ই রোগা হয়ে পড়েছেন যে, এই অল্প দিনেই এত দুর্ব্বল করেছে—কেমন বুঝছেন আজ ?

আর বোঝাবুঝি কি ডাক্তার বাবু, যে কষ্ট পাচ্ছি এর চেয়ে প্রাণটা গেলেও যে ছিল ভাল।

সে কি কথা,—একটু অসুখ হলেই যদি আপনারা ওরূপ বলেন তবে ত উপায়ই নেই,—ভয় কি ? সেরে উঠলেন বলে !

একে আপনি একটু অসুখ মনে করছেন ! হায়রে কপাল, পরের দুঃখ কষ্ট কেউ কোন দিন বোঝে না। আপনার নিজের হ'ক, এ কথা বলছি না,—কিন্তু আমার এই কষ্ট যদি পেতেন, তবেই বুঝতেন কি দুর্ব্বিসহ জ্বালা—

আচ্ছা সমস্ত অবস্থাটা ভাল করে বলুন,—দেখি কি করতে পারি !

সর্ব্বাঙ্গের এই জ্বালাটাই প্রধান। এতেই প্রাণটা খাঁচা ছেড়ে বের হ'তে যাচ্ছে,—নতুবা যে জ্বর সে ত অতি সামান্যই তাকে গ্রাহ্যই করতুম না। দারুণ অরুচি,—কিছুই মুখে দেবার সাধ্যি নেই,—সব তেতো, যেন বিষে ভরা। ব্যামোর মুখেই এক দিন পেয়ারা খাবার ইচ্ছে হ'ল, ভাবলুম মুখটা যদি শোধরায়, তা হিতে বিপরীত—পেয়ারাও মুখে পোরা, আর তেতো বিষও সঙ্গে সঙ্গে ঢালা। মুখময় ছড়িয়ে গেল,—সেই থেকে যা কিছু মুখে দি সবই বিষম তেতো। এখন এমন হয়েছে সমস্ত দেহ-ময় এই তেতো ছড়িয়ে পড়েছে, এমন কি রোমকূপ গুলির ভেতর দিয়ে যেন চুঁইয়ে বের হচ্ছে। এ যে কি বিষম অশান্তি—তা আপনাকে বোঝাতে পারুব' না,—এ মর্ম্মান্তিক কষ্টের চেয়ে মৃত্যুও শতগুণে ভাল।

তাই ত—ব্যাপার দেখছি গুরুতর। সমস্ত শরীরে পিত্ত ছড়িয়ে গেছে। তা আপনি ভাববেন না,—অতি সত্বরেই এর প্রতীকার কচ্ছি। একবার হাতটা দিন ত,—নাড়ীটা দেখি—

এর পর ডাক্তার বাবুর রীতিমত পরীক্ষা চল্‌ল। জিভ বের করে দেখলেন, চোখের কোণে রক্ত আছে কি না, উহা হলদে কি সাদা, পিলে যকৃৎ বেড়েছে কি না, আর ওদের অবস্থাই বা কেমন, বেশ পেট টিপে দেখলেন,—হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, সব মনোযোগ করে 'ষ্টেথেসকোপ'-যোগে পরীক্ষা কর্‌লেন। কোষ্ঠ খোলসা হয় কি না, মূত্রের পরিমাণ কতটা; ইত্যাদি ইত্যাদি মামুলি প্রশ্নের কিছুই বাদ গেল না। অবশেষে বললেন—

যকৃৎটা একটু বেড়েছে তাই পিত্তের এত প্রকোপ,—কোন চিন্তা কর্‌বেন না ;—দু দিন ঔষধ খেলেই সব সেরে যাবে। আরো কিছু যদি বলবার থাকে, খুলে বলুন সব এই বেলা,—ভাল করে ভেবে চিন্তে দেখুন।

সবই ত বলেছি আপনাকে, এখন যা করবার থাকে করুন। এই দারুণ অরুচি ও তেতোর হাত হতে ত আপাততঃ রক্ষা করুন। দুটি খেতে পেলেও যে বেঁচে যাই।

তা আপনি কিছু ভাববেন না,—সব ব্যবস্থাই করে যাচ্ছি।

এই বলে ডাক্তার বাবু ঘর থেকে বাহির হইয়া একটু দূরে যাইতেই ঝি তাহাকে পুনরায় ডাকিয়া আনিল।

রোগিণী বলিলেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি ডাক্তার বাবু,—মাথাটা ঠাণ্ডা জলে ধুতে পারি কি ? সব সময়েই সাঁ সাঁ করছে—রেলের এঞ্জিনের জল যেমন টগবগ করে ফোটে মাথার ভিতর অনবরত সেই রূপ হচ্ছে গরম,—ভয়ানক গরম—রাত-দিন পাখার বাতাসে একটু ঠাণ্ডা হয় না।

তা পারে বৈ কি !—একবার না হয় দুবার ধোবেন তাতে কোন বাধা নাই।

সলিলবাবু পুনরায় বাহিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। সিঁড়ি পথ বাকী থাকিতে দেখিলেন, ঝি পুনরায় দৌড়াইয়া আসিতেছে,—নিকটে আসিলে বলিলেন, কি গো, আবার এলে যে, ব্যাপার কি ?

মা জিজ্ঞেস করলেন,—মাথা যে ধোব,—তা কতটা জল দিয়ে,—এক ঘটী না দু ঘটী—

এক ঘটীই দাও বা এক ঘড়াই দাও তাতে কোনই আপত্তি নাই,—বেশ করে ধুইয়ে দিও, বুঝলে ?

ডাক্তারবাবু অতঃপর নির্ব্বিঘ্নে বাহিরে আসিলেন।

বাড়ীর কর্ত্তা নবীনকিশোর বাবু মহা-ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

আচ্ছা সলিলবাবু দেখে ত এলেন, খুবই কঠিন অবস্থা না ? লুকোবেন না কিছু আমার কাছে।—ওরে ভজা এক ছিলিম তামাক দিয়ে যা, শোন্ না এ-দিকে,—মাথা কি আমার ঠিক আছে,—উনি আবার তামাক খান না, যা সিগারেট-কেশটা নিয়ে আয় ; শীগ্‌গীর যা, দিয়েশলাইটা আনতে ভুলিস্ না যেন। রক্ষা পাবার আশা আছে ত,—দোহাই আপনার ডাক্তারবাবু।

পাগল হবার দাখিল হলেন্ যে। এমন কিছু দেখ্‌লুম না ত, যাতে অত ব্যস্ত হবার কোন কারণ আছে ;—দু-দিনেই সেরে উঠ্‌বেন, কোনও ভাবনা করবেন না। আপনি অমন উতলা হলে, রোগী ভয়েই আধমরা হবে।

আপনারা এরূপ বলেই থাকেন, মুহূর্ত্তপরে যে রোগী মর্‌বে, তাকেও আপনারা বলেন ভাল হয়ে যাবে। ভয় নাই—। ভোলাবেন না আমাকে, ঠিক্ ঠিক্ বল্‌বেন যেন।

তা আসুন না রতন বাবু, তাঁকেই না হয় জিজ্ঞেসা কর্‌বেন তখন হবে ত ? আমি আর অপেক্ষা করতে পার্‌ব না, তিনি এসেই প্রেস্‌কিপ্‌সন্ কর্‌বেন। আর যদি বলেন—আমিও এক খানা রেখে যেতে পারি।

তাই করুন রতন বাবুকে নিয়ে আর পারা যায় না,—কিছুতেই সময়ে আস্‌বেন না। রোগী এখন তখন, তিনি আস্‌বেন সব শেষ হয়ে গেলে।

কাগজ কলম কোথায় ?

তাই ত—ওরে ভজা, এক ব্যাটাও যদি হাজির থাকে। জানিস্ই ত বাপু ডাক্তার আস্‌বে ; সব গুছিয়ে রাখ্‌বি—এখন কোথায় বা কাগজ, কোথায় বা কালি, আর কোথায়ই বা কলম।

এই যে কর্ত্তা,—ডেকেছেন বুঝি!

দাঁত বের করে আবার তাই বল্‌তে এসেছেন,—ব্যাটা গাঁজাখোর, ডাক্তার চলে গেলে কালি, কলম, কাগজ হাজির হবে বুঝি—হুঁস্ থাকে না কিছুরই। যা চটকরে সব নিয়ে আয়।

আজ্ঞে—!

ভজা এদিক্ ওদিক্ হাতড়াইয়া অনেকক্ষণ পরে সমস্ত জিনিস লইয়া হাজির হইল। তা কালি ত জলবৎ তরল—কলমেও আঁচড় বড় একটা আসে না! যা হ'ক সলিল-বাবু ইহাদ্বারাই কোনমতে কার্য্য শেষ করিলেন।

তা পথ্য সম্বন্ধে কিছু বললেন না ত! আহার করবেন্ কি! মুখে ত রুচিমাত্র নেই।

নেবুর সরবৎ করে দিন। বেশী করে ফলের রস দিন। এই কমলা, বেদানা, আনারসের রস দিতে পারেন,—আঙ্গুরও চল্‌তে পারে। ডাবের জল খেতে চাইলে দেবেন। দুধটা আপাততঃ দেবেন না, ঘোলের সরবৎ চল্‌তে পারে। মুখে যা ভাল লাগে দেবেন না।

মাংসের জুস কি মসুরীর জুস দেওয়া চলে কি?

দেবেন বই কি! তা আরও দু-একদিন যাক্ না—একটু বাতাবী লেবুর রস না হয় দেবেন। ২।১ পিস্ 'টোষ্ট ব্রেড' একটু জেলী মাখিয়ে দিয়ে দেখ্‌তে পারেন। আসি তবে এখন! ভাবনা করবেন না, সেরে উঠলেন বলে!

আরে বসুন না,—ঐ যে রতন বাবু এসে পড়েছেন। যা হ'ক, তবু দেখাটা হল!

তা রতন বাবু দেখ্‌বেন এখন, আমি আর থাক্‌তে পার্‌ছি না।

এতক্ষণই যদি থাক্‌লেন তবে দয়া করে আরও একটু থাকুন। এই যে সলিল—কতক্ষণ হে—ভাল আছ ত?

তা বিলক্ষণ অনেকক্ষণ এসেছি, আপনার ৮টা হ'ল ত! একটু দেরী হয়েছে বুঝি—

এখন ১১টা ১৪। একে আপনি একটু দেরী বল্‌তে চান। তা যাক্, আমি চল্লুম—একটা ব্যবস্থা করেছি তাতেই আমার মত বুঝ্‌তে পার্‌বেন। আপনি দেখে যা হয় কর্ব্বেন, নমস্কার—

আরে দাঁড়াও না; আমাদের মত বয়েস হলে তোমাদেরও এমনি হবে হে,—দেখ রক্তের জোর কমলে আর ছুটাছুটির শক্তি থাকে না।—আর আমার কথা ত জানই—চল, রোগী দেখে আসি—।

আমার দেখা হয়েছে অনেকক্ষণ, আপনি দেখে-শুনে আসুন আপনার সঙ্গে ত আর পারবার যো নেই—

তা যে কটা দিন বেঁচে আছি, একটু সইতে হবে বই কি! তাও আর বেশী দিন নয় হে সলিল,—দেখছই ত শরীরের অবস্থা—

কি যে বলেন আপনি!—তার ঢের দেরী আছে, যান্ চট করে দেখে আসুন—আমি বস্‌ছি।

স্মৃতি-কথা

(১)

প্রভুপাদ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

[শ্রীকুমুদবন্ধু সেন]

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বাঙলা দেশে শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে যে প্রবল ধর্মান্দোলন উত্থিত হইয়াছিল—যে নব ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল—সে আন্দোলনের মূলে—সে ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তক—ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। বিলাস-ভোগে পালিত প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র ধনাঢ্য জমিদার ঠাকুরগোষ্ঠির সন্তান দেবেন্দ্রনাথকে বাঙলা দেশে তখন না চিনিতে কে? সেই দেবেন্দ্রনাথ যখন রাজা রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসমাজকে সংস্কৃত ও পুনরুজ্জীবিত করিতে উদ্যত হইলেন—তখন কলিকাতার অনেক গণ্যমান্য সম্রান্ত শিক্ষিত লোক তাঁহার ব্রহ্ম পতাকাতলে দণ্ডায়মান হইলেন। দেবেন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রধান প্রতিভা-সম্পন্ন শিষ্য ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র। দেবেন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রধান বিদ্রোহী শিষ্যও ছিলেন শ্রীকেশব। শ্রীকেশবচন্দ্র তাঁহার অপূর্ব্ব জ্বালাময়ী বাগ্মিতায়, তাঁহার

প্রাণস্পর্শী ভাষায়, তাঁহার সুন্দর মধুর উপাসনায়, তাঁহার চরিত্রের ও ব্যক্তিত্বের বৈদ্যুতিক আকর্ষণে এবং তাঁহার অভিনব প্রচার-সৌষ্ঠবে বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।—কেশব বাবুকে দর্শন করিতে—তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে শিক্ষিত বাঙালী উন্মত্তের মত হইতেন। শ্রীকেশবের সহকর্ম্মী এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের একজন প্রভাবশালী প্রধান প্রচারক ছিলেন শ্রীঅদ্বৈতবংশোদ্ভুত প্রভুপাদ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। শ্রীবিজয়কৃষ্ণের ব্রহ্মানুরাগ, সরলতা, তেজস্বিতা, চরিত্রের পবিত্রতা, ধর্ম্মপ্রাণতা ও বক্তৃতামাধুরী অসামান্য ছিল। শ্রীকেশব তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। মুঙ্গেরে যখন শ্রীকেশব ভগবানের অবতার ভাবে পূজা ও অভ্যর্থনা পাইতেছিলেন, তখন একা বিজয়কৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের পূজাগ্রহণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ইহা একটী অসমসাহসিকের কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মবস্তু লাভ করিবার জন্যই শ্রীকেশবের সাহচর্য্য করিয়াছিলেন। এই জন্য প্রবল বৃষ্টিধারা অগ্রাহ্য করিয়া নগ্নপদে আর্দ্রবসনে বিদ্যুৎ বজ্র ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করিয়া একা বিজয়কৃষ্ণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনা করিতে গিয়াছিলেন। এই প্রাণের ব্যাকুলতাই তাঁহার তৎকালীন রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতে পরিস্ফুট হইয়াছিল—

শশী-ভাস্কর তারানিকর
পুছত সলিল পবনে।
হে সুরধুনি সাগরগামিনি
গতি তব বহু দূরে॥
(তোমরা কেউ দেখেছ না কি) (আমার হৃদয়-নাথে)
মিহির ইন্দু কোথা সে বন্ধু
নাথ মম কোন্ পুরে!

আবার এই আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ—ব্রাহ্ম-প্রচারক বিজয়-কৃষ্ণ সর্ব্বত্যাগী প্রেমভক্তি-বিহ্বল বৈষ্ণব-শিরোমণি জটিয়া বাবার রূপে পরিণত হইয়াছিলেন।—ইহাতে অলৌকিক পরিবর্ত্তন। কেশবচন্দ্রের মত বিজয়কৃষ্ণও দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণের নিকট বিনীত শিষ্যের ন্যায় বসিতেন। ৺গয়াধাম হইতে ফিরিয়া বিজয়কৃষ্ণ রামকৃষ্ণের নিকট আসিলে ঠাকুর তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "বিজয় এখন বাসা পাকড়েছে। বিজয়ের এত দিন কোয়ারা চাপা ছিল—এইবার খুলে গেছে।" আবার বলিলেন, "দেখ বিজয়ের অবস্থা কি হয়েছে। লক্ষণ সব বদলে গেছে যেন আউড়ে গেছে। আমি পরমহংসের ঘাড় ও কপাল দেখে চিনতে পারি।"—বিজয়কৃষ্ণও ঠাকুর রামকৃষ্ণের সম্মুখেই বলিতেছেন, "ধরা না দিলে ধরা শক্ত, এই খানেই ষোল আনা। এঁকে ঢাকায় দেখেছি গা ছুঁয়ে।" আবার বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "কি বল্‌বো! দেখছি—যেখানে এখন ব'সে আছি, এই খানেই সব! কেবল মিছে ঘোরা, কোন কোন জায়গায় এঁরই এক আনা কি দু-আনা কোথায় চারি আনা এই পর্য্যন্ত। এখানেই পূর্ণ ষোল আনা দেখছি।" শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "অনেক সাধু দেখিয়াছি—এক এক ভাবে এক এক জন সিদ্ধ, কিন্তু সকল ভাবে সকল সাধনায় সিদ্ধ এক ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ। জগতের ধর্ম্মেতিহাসে ইহা নূতন।"—কলিকাতা হাইকোর্টের অনুবাদক বিজয়কৃষ্ণের শিষ্য চন্দ্রকুমার বাবুর মুখে শুনিয়াছিলাম যে "গোঁসাই যখন মৌন হইয়া থাকিতেন তখন নিজ হাতে লিখিয়া উত্তর দিতেন—সে খাতা খানির এক স্থানে তিনি দেখিয়াছিলেন, "যে দিন রামকৃষ্ণের নাম শোনা যায় সে দিন ধন্য।" ৺দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি-উৎসবে সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ "জয় রামকৃষ্ণ" বলিয়া পঞ্চবটীর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছেন—ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আবার রামকৃষ্ণ-শিষ্য মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত তাঁহার প্রণীত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন-বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, ঠাকুর রামকৃষ্ণ যখন কাশীপুর বাগানে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "মা আমি আর কারুর সঙ্গে কথা বলিতে পারি না—মা, তুই রাম, নরেন, বিজয়, মহেন্দ্র প্রভৃতিকে শক্তি দেখা।" বিজয়কৃষ্ণ যে রামকৃষ্ণের এক জন অন্তরঙ্গ ছিলেন এই উক্তির দ্বারা বোঝা যায়। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার গুরুদেবের দর্শন পাইয়াছিলেন ৺গয়াধামের আকাশ গঙ্গা পাহাড়ের উপর।

গত ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের শ্রাবণ মাসে যখন আমার মধ্যম অগ্রজ ৺প্রফুল্লকুমার সেনের সহপাঠী ও প্রিয়তম বন্ধু ঢাকার বর্ত্তমান অধ্যাপক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয় আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আমাদের

বাড়ীতে আসেন তখন তাঁহার মুখে শুনিলাম যে তিনি শ্রীবিজয়কৃষ্ণের নিকট মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, আজ সন্ধ্যাকালে তিনি তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইবেন। আমি ও আমার তৃতীয় অগ্রজ ও হেমন্তকুমার সেন উভয়েই সতীশ বাবুর সঙ্গী হইতে চাহিলাম। সতীশ বাবু আমাদের দুই জনকে সঙ্গে করিয়া নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ারের নিকট একটী ত্রিতল বাটীতে লইয়া গেলেন। দেখিলাম দলে দলে ভক্তবৃন্দ—কলিকাতার কত আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এই বাটীতে প্রবেশ করিতেছেন। আমরা দোতলায় উঠিয়া ধীরে ধীরে "গোঁসাইর ঘরে" প্রবেশ করিলাম।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণকে দর্শন করিতে বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে উপবিষ্ট। চিকের অন্তরালে অনেক ভদ্র মহিলাও সমবেত হইয়াছেন। একটী স্বতন্ত্র আসনে রুদ্রাক্ষ-তুলসীমালা-পরিশোভিত, গৈরিক-রঞ্জিত বহির্বাস-পরিহিত, গুম্ফশ্মশ্রু-মণ্ডিত, দীর্ঘ জটাজুট-সমন্বিত, ধ্যান-স্তিমিত লোচনে তপস্যাপূত তেজঃপুঞ্জদেহে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ আসীন রহিয়াছেন। ঘর নিস্তব্ধ। সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ গোস্বামীজীর সৌম্য-গম্ভীর মূর্ত্তির দিকে। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। ঘরের এক কোণে দীপ জ্বলিতেছে। গোঁসাই মৌন রহিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে গোস্বামীজীর শিষ্য-মণ্ডলী খোল করতাল লইয়া গোঁসাইর একপার্শ্বে আসিয়া বসিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের নাম-কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। গোঁসাইজী স্থির ধীর গম্ভীর ভাবে বসিয়া নাম শুনিতে-ছেন। ধীরে ধীরে কীর্ত্তন উচ্চ হইতে উচ্চতর রোলে আরম্ভ হইল। গোঁসাইজী ভাবাবিষ্ট হইয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন—সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন-মণ্ডলীও দাঁড়াইয়া নাম-সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মধুরকণ্ঠে নাম-সংকীর্ত্তন চলিতে লাগিল। মধুর ভাবের প্রবাহ বহিতে লাগিল। বিজয়কৃষ্ণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিলেন—তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া সংকীর্ত্তনমণ্ডলীও নৃত্য করিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন—কেহ উচ্চরবে হুঙ্কার দিলেন—কেহ আনন্দে আত্মহারা হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। গোঁসাইজীর ভাবাবেশে বহির্বাস খসিয়া পড়িল—রোমাঞ্চে দীর্ঘ জটা-জুট উর্দ্ধমুখ হইল—গোঁসাইজী দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া তর্জ্জনী হেলাইয়া প্রেমার্দ্র-কণ্ঠে—"হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া কীর্ত্তন-মণ্ডলীর মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সে দৃশ্য অপূর্ব্ব ও অপার্থিব। গোঁসাইজীর সেই হরিবোল ধ্বনিতে কি অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য ঝরিয়া পড়িতেছিল। তাঁহার সেই অর্দ্ধস্ফুট "হরিবোল" উচ্চারণে সমাগত লোকের অন্তরে এক বৈদ্যুতিক প্রবাহ খেলিতে লাগিল। আনন্দ, বিস্ময় ও ভক্তির আবেগে সকলের চিত্ত আর্দ্র হইল। ইহা এক রকম অননুভূত আস্বাদ। তখন বোধ হইল সাধারণ মানবের উচ্চারিত হরিনামে আর মহাপুরুষদের উচ্চারিত হরিনামে কত পার্থক্য। যাঁহারা জীবনে কখনও মহাপুরুষদের দুর্লভ সঙ্গ লাভ করিয়াছেন—তাঁহারা বুঝিবেন মহাপুরুষদের কণ্ঠোত্থিত নামে কত শক্তি—কত অমোঘ প্রভাব। নামে কি প্রবল শক্তি নিহিত আছে—মন্ত্রে কি অদ্ভুত শক্তি সঞ্চার করিতে পারে তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায়। ইহা তর্কের বা বিচারের বিষয় নহে, প্রত্যক্ষ উপলব্ধির কথা। তখন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেই বাণী মনে হইল—

"যাঁহারে দেখিলে তোমার স্ফুরে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিবে তুমি বৈষ্ণব-প্রধান॥"

মধুর কীর্ত্তন শেষ হইলে বিজয়কৃষ্ণ সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন এবং সমাগত দর্শকবৃন্দ ও ভক্তমণ্ডলীও ভূমিতে মস্তক অবনমিত করিলেন। কৌপীনধারী বিজয়কৃষ্ণ বহির্বাস পরিধান করিয়া তাঁহার আসনে বসিয়া ভক্তিমধুর-কণ্ঠে নাম করিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। অবশেষে—

"জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥"

এই বলিয়া বারংবার ভূমিতে মস্তক নত করিলেন।

পরে তাঁহার জনৈক মধুর-কণ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ভক্ত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান গাহিতে লাগিলেন। বিজয়কৃষ্ণ "আহা" "আহা" করিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হইলেন। বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন—"এই হরিনাম শ্রবণেও অনেক ফল। সেইজন্য মহাপ্রভু জীবের মঙ্গলের জন্য উচ্চরোলে নামসংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। হরিনামের রোল যত দূর যায় ততদূর পর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গম প্রাণীসকলের কল্যাণ ক'রে থাকে। মুসলমান যে ডাক নমাজ পড়ে—তার উদ্দেশ্য এই। আল্লার নাম যে যেখানে আছে একবার শুনলে তার মঙ্গল হ'য়ে থাকে। মানুষ নানান্ কাজে ব্যস্ত থাকে তবুও হরিনাম তার কাণে গেলে একবার তাঁকে স্মরণ হয়।

স্মরণ হ'লেই মনন একটু হয়ে যায়। কলিযুগে নামসঙ্কীর্ত্তন জীবের পরম কল্যাণকর।"

সমাগত লোকের মধ্যে এক জন প্রশ্ন করিলেন, "নাম শুন্‌লেই কি নামের ফল হয়? যারা মুখে নাম করে, কি নাম কীর্ত্তন শুনে, তারা আবার অন্যায় আচরণ করছে তাও-তো দেখা যায়?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন "কাণে নাম শুন্‌লে কি মুখে নাম করলেই, মানুষ ন্যায়-অন্যায়ের বাইরে চলে যায় না। নাম কেমন, যেমন গাছের বীজ। বীজ জমিতে পড়িলেই কি তখনই অঙ্কুর ও বৃক্ষ হয়? তার সঙ্গে অনুকূল জল হাওয়া মাটীর যোগাযোগ হওয়া চাই। তাঁর কৃপায় কঠিন জমিতে এমন কি প্রস্তরের উপরও অঙ্কুরোদ্গম হয়। পাহাড়ের গায়েও তৃণ গুল্ম জন্মে, বড় বড় বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। প্রস্তরেও মাটীর স্তর পড়ে।—বীজ হ'তে এক দিন না এক দিন গাছ হয়। হরিনাম—ভগবানের নাম বীজ-স্বরূপ। উর্ব্বর জমীতে সত্বর অঙ্কুর উদ্গাত হয়ে থাকে—অনুর্ব্বর ভূমিতে ধীরে ধীরে কোথাও বৃক্ষ জন্মে। কার্ণিসে কি দেওয়ালের ফাটলেও বীজ পড়ে গাছ জন্মায়। বীজের এত প্রভাব। তবে আবার কলুসের কু-বাতাসে বা অন্য প্রতিকূল কারণেও বীজ নষ্ট হয়ে যেতে পারে—ফল হয় না। হরিনামে মানুষের হৃদয়কে প্রস্ফুটিত করে—সাধু-সঙ্গলাভের ইচ্ছার উদ্রেক করে। আর যেখানে সাধু ভক্ত-বৈষ্ণবেরা হরিনাম করেন—সেখানে তার শক্তিও অমোঘ। সাধু, বৈষ্ণব, গুরুর কৃপায় হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়। এই জন্যই মহাপ্রভু শুধু একবার নয় তিন বার—তিন বার ব'লেও দৃঢ়ভাবে বল্‌ছেন "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।" মায়ান্ধ জীবের আর কোন গতি নাই।—তাও জোর করে দৃঢ়তার সঙ্গে বল্‌ছেন, "কলৌ—নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" আর কোনও গতি নাই।—কলিযুগে নামই—পরম উপায়।"

এই বলিয়া বিজয়কৃষ্ণ মৌন হইলেন। বোধ হইল যেন নামের প্রভাব বলিতে বলিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন। এক একবার যেন বসিয়া বসিয়া নিমীলিত নয়নে ঢুলিয়া পড়িতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে জনৈক ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন "শাস্ত্রে যে সব বিধি-ব্যবস্থার কথা আছে তা কি সত্য?"

গোঁসাইজী বলিলেন, "খুব সত্যি। শাস্ত্রবিধি যে ঋষি মহাত্মারা ক'রে গেছেন, তা লোকের কল্যাণের জন্য। যে আনন্দবস্তু তাঁরা উপলব্ধি ক'রেছেন—সাধারণ লোকে তা যাতে আস্বাদ করবার উপযুক্ত হয়, তার জন্যই বিধি-ব্যবস্থা ক'রে গেছেন। তাঁদের ভিতর বিন্দুমাত্র স্বার্থ-বুদ্ধি ছিল না। শুধু পরার্থে তাঁরা জীবনধারণ করতেন। যে সকল প্রত্যক্ষ সত্য তাঁরা দর্শন ক'রেছেন—যা তাঁদের জীবনে উপলব্ধি করেছেন, যে সব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তাঁরা সত্যকে প্রত্যক্ষ ক'রেছিলেন, সেইগুলি লোকের কল্যাণের জন্য তাঁরা বিলিয়েছেন। যে ভাবের অবস্থায় উপনীত হ'লে সেই সত্য গোচর হয়, মানুষ সেই সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে পারে, সেই অবস্থায় যাবার জন্য তাঁরা পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। শাস্ত্র-বাক্য শাস্ত্রোপদিষ্ট বিধি-ব্যবস্থা সেই চরম সত্যের পথ নির্দ্দেশ ক'রে দিচ্ছে। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র, ভিন্ন ভিন্ন ঋষির সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার ফল। এই জন্য মানুষ যখন শাস্ত্রমর্ম্ম অবগত না হ'তে পেরে সন্দেহের সাগরে পড়ে দিগ্‌ভ্রান্ত হয় তখন সেই সন্দেহের সাগর থেকে তুলে ধরেন গুরুদেব। শাস্ত্রাদি থাক্‌লেও গুরুর আবশ্যক এই জন্য। আর সমস্ত শাস্ত্রই গুরুর প্রয়োজনীয়তা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। সদ্‌গুরু না হলে শাস্ত্রমর্ম্ম বোঝা যায় না—সাধন-পথেও অগ্রসর হ'তে পারা যায় না। পূর্ব্বকালে যিনি যতই বুদ্ধিমান, বিদ্বান্, প্রতিভাশালী হোন্ তিনি গুরুপরম্পরা বিদ্যালাভের জন্য সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতেন। কোনও বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে হ'লে গুরুগত হ'তে হয়—সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে সদ্‌গুরুর কৃপায় তা লাভ করতে হয়! তাই মহাত্মা তুলসীদাস বলেছেন—

> সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ
> তব কয়লা কী ময়লা ছুটে যব আগ করে পরবেশ।

সমস্ত সংশয় ছিন্ন করতে পারেন সদ্‌গুরু। গ্রন্থসাহেবে নানকজী—এই গুরু-মাহাত্ম্য কত ক'রে ব'লেছেন।"

রাত্রি নয়টা বাজিল দেখিয়া আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া আসিলাম। সতীশবাবু পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিলেন। আমরা দুই-ভাই—এই অদ্ভুত মহাপুরুষের প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগত হইলাম।

গান

[কথা—শ্রীসুবোধচন্দ্র পুরকায়েস্থ]

ডাক দিয়ে যায় কেগো আমায়
বাজিয়ে বাঁশী—
মন যে আমার আপন মনে
হ'ল উদাসী।

পুলকে মোর সকল হিয়া,
উঠল যে আজ শিহরিয়া,
বাতাসে কোন্ মধুর বেদন
উঠে আভাসি।

বাদল রাতে তাঁরি বাঁশী
শুনি গো বাজে—
জাগিয়ে-রাখা যূথীবনের
সুরভি মাঝে।

অজানা কোন্ ব্যথা সম
দুলিয়ে পরাণ যায় সে মম,
দূর থেকে সে সুরে সুরে
করে পিয়াসী॥

স্বরলিপি

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত]

ঝিঁঝিঁট—পিলু বাঁরোয়া মিশ্র—কাহারবা

```
    +                 ২                         +                  ২
                      [মপা  -ধণা  ণা  -ধপা |    -া  পা  -মা   মা]  |
||{ া   মা  -ধা  ধা | মপধা  -র্সণা  ণা  -া  |   -া  ণা  -ধপা  পা  | মজ্ঞা  -া  রা  -জ্ঞা |
  ( •   ডা   ক্   দি | য়ে••   ••    যা   য়   |   •   কে  ••    গো  | আ•     •   মা   য়    |

    +                 ২                     +                   ২
   -া   মা  মা   ধা | ণধা  -পা  -মা  -পা  |  মা  -া  -া  -া | -া  -া  -া  -া }||
    •   বা  জি   য়ে | বাঁ•   •    •    •    |  শী   •   •   • |  •   •   •   • }||
```

+　　　　　ম ২　　　　　　　+　　　　　২
-া　মা　-া　র্সা | র্সা　-া　র্সা　-া | -া　র্সা　র্সা　র্রর্সা | ণা　-র্সা　ণা　-ধা
০　ম　ন্　যে | আ　০　মা　র | ০　আ　প　ন০ | ম　০　নে　০

+　　　　২　র্স　　　+　　　　২
-া　ধা　-া　ণা | র্সা　-র্রা　ণা　-র্সা | ণা　-া　-া　-া | -ধণা　-ধপা　-মা　-া
০　হো　০　ল | উ　০　দা　০ | সী　০　০　০ | ০০　০০　০　০

+　　　　২　　　　+　　　　২
া　পা　-ধা　ধা | ণধা　-পা　মা　-পা | -া　পা　ধা　ণা | ধা　-া　ধা　-া
০　পু　ল　কে | মো০　০　র　০ | ০　স　ক　ল | হি　০　য়া　০
০　অ　জা　না | কো০　০　ন　০ | ০　ব্য　০　থা | স　০　ম　০

+　　　　২　　　প　+　　　　২
-া　মা　-ধা　ণা | র্সা　-া　র্সর্রর্সা　-নর্সা | -া　পা　-া　ধা | ণা　-র্রা　র্সণা　-ধপা
০　উ　ঠ্　ল | যে　০　আ০০　০জ | ০　শি　০　হ্ | রি　০　য়া০　০০
০　দু　লি　য়ে | প　০　রা০০　০ণ | ০　যা　য়্　সে | ম　০　ম০　০০

+　　　　২　　　　+　　　　২
-া　পা　ধা　ধা | ণধা　-পা　মা　-পা | -া　পা　ধা　ধা | পধা　-র্সণা　ধা　-া
০　পু　ল　কে | মো০　০　র　০ | ০　স　ক　ল | হি০　০০　য়া　০
০　অ　জা　না | কো　০　ন　০ | ০　ব্য　০　থা | স　০০　ম　০

+　প　　　২　　　　+　　　　১
-া　ণা　-া　ণা | ণা　-া　ণা　-া | -া　ণা　-ধা　র্সা | ণর্সা　-ণা　ধা　-া
০　উ　ঠ্　ল | যে　০　আ　জ | ০　শি　০　হ্ | রি০　০　য়া　০
০　দু　লি　য়ে | প　০　রা　ণ | ০　যা　য়্　সে | ম০　০　ম　০

+　　　র্স২　　　　+　　　　২
-া　মা　পা　পা | ণা　-া　ণা　-া | -া　ণা　ণা　ণা | ণর্সা　-র্রা　ণর্সা　-ণধা
০　বা　তা　সে | কো　০　ন　০ | ০　ম　ধু　র | বে০　০　দ০　০ন্
০　দূ　র্　থে | কে　০　সে　০ | ০　সু　০　রে | সু০　০　রে০　০০

+　　　　২　　　　+　　　　২
-া　ধা　-া　ণা | র্সা　-র্রা　ণা　-র্সা | ণা　-া　-া　-া | -ধণা　-ধপা　-মা　-া
০　উ　০　ঠে | আ　০　ভা　০ | সি　০　০　০ | ০　০০　০　০
০　ক　০　রে | পি　০　য়া　০ | সী　০　০　০ | ০　০০　০　০

+ প ২
[-া ণা ণা ণা দা -পা মা -গা]

+ ম | + ২
-া পা পা দা পদা পা গা -মা | -া গা -া মা ণণা -দপা মগা -মা
• বা দ ল রা• • তে • | • তা • রি বাঁ• •• শী• •

+ ২ | + ম ২
-া মা মা পা মপা -ধা ধা -া | -া মা মা র্সা র্সা -া র্সা -া
• শু নি গো বা• • জে • | • জা গি য়ে রা • খা •

+ সং২ | + ২
-া র্সা -া র্রা ণা -র্সা ণা -ধা | -া ধা ধা ণা পধা -ণা ণধা -পমা
• ধঁ • খী ব • নে র | • সু র ভি মা• • ঝে• ••

+ ম২
-া মা মা ধপা গা -পা মা -া
• শু নি গো• বা • জে •

বিবিধ

ঐতিহাসিক

নবপ্রাপ্ত অশোক-অনুশাসন সমূহ

[শ্রীরমেশ বসু এম-এ]

অতি প্রাচীনকালের সমসাময়িক লিপি সমূহ ভারতবর্ষে খুব কমই আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মৌর্য্যযুগে অশোকের সময়ে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে পর্ব্বত-গাত্রে ও স্তম্ভের উপর খোদিত লিপি সমূহই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া ধরা যায়। ইহারও বহু বৎসর পূর্ব্বে হরপ্পা ও মোহেঞ্জোদড়োতে যে সব মুদ্রালিপি প্রচলিত ছিল তাহা আবিষ্কৃত হইলেও তাহার পাঠোদ্ধার এখনও হয় নাই। তাহা ছাড়া অশোকলিপি গুলির নিজেরই যথেষ্ট মাহাত্ম্য আছে।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের বহু চেষ্টায় নানা স্থানে এই লিপি গুলির সন্ধান ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত একই জায়গায় বেশী লিপি পাওয়া যায় নাই। একই লিপিতে নানা প্রদেশের প্রচলিত ভাষার প্রভাব পড়াতে স্থানীয় উচ্চারণ গুলির বিভিন্নতা ধরা পড়িয়াছিল। এক স্থানে একত্র এই লিপি গুলি খোদিত না হইবার কোন কারণ এত দিন বুঝিতে পারা যায় নাই।

সম্প্রতি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিৎ, শিল্প-সংগ্রাহক ও শিল্পরসিক শ্রীযুক্ত অনু ঘোষ, এফ-সি-এস্, এফ-জি-এস্, এম্-আই-এম্-ই, মহাশয় মান্দ্রাজ প্রদেশের কর্ণুল জেলার মফঃস্বলের কোন স্থানে নিজের খনির ব্যবসা চালাইবার কাজে ব্যস্ত থাকা কালে একই স্থানে একত্র পাহাড়ের গায়ে খোদিত ১৪ খানা অশোক-লিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি এই আবিষ্কারের সংবাদ ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষের নিকট জানান, তাহাতে ঐ বিভাগের উপ-সর্ব্বাধ্যক্ষ এবং লিপিতাত্ত্বিক এই আবিষ্কার সম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে দেখাশোনা এবং আলোচনার জন্য ঐ স্থানে প্রেরিত হইয়াছেন।

এই বিভাগের অস্থায়ী সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেন্‌রি হাব্-গ্রীভস্ মহাশয় বলিয়াছেন যে, গত ৫০ বৎসর মৌর্য্যযুগের

যে সব আবিষ্কার হইয়াছে তাহাদের শ্রেষ্ঠতমদিগের মধ্যে ঘোষ মহাশয়ের এই আবিষ্কারও গণ্য হইবার যোগ্য। সুদূর দাক্ষিণাত্যের একস্থানে এতগুলি অশোক লিপির অবস্থান নানা দিক্ হইতেই অনুসন্ধানের যোগ্য মনে করা যাইতে পারে।

উপরোক্ত বিশেষজ্ঞদ্বয় ইতিমধ্যেই অবিসংবাদিত ভাবে ১৪ খানা গিরিলিপির ১১ খানা এবং অন্ততঃ ২ খানা অপ্রধান লিপি যে অশোকের তাহা চিহ্নিত করিতে পারিয়াছেন। ঐ সব লিপির ছাপ লওয়া হইয়াছে এবং এ বিষয়ের গবেষণা সরকারী প্রত্নবিভাগ হইতে প্রকাশিত হইবে। প্রাচীন মন্দির-রক্ষা বিষয়ে যে আইন আছে তাহা এ ক্ষেত্রে কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মোহেঞ্জো-দড়ো

[শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় বি-এ]

প্রাচীন ভারতের বহু বিখ্যাত জনপদই আজ ভূগর্ভ মধ্যে কবরস্থ হইয়া রহিয়াছে; অথচ প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতার কথা জানিবার জন্য আমাদের আগ্রহের অন্ত নাই। সে যুগের কিছু নিদর্শন-প্রাপ্তির আশায় অক্লান্ত পরিশ্রম ও অপর্য্যাপ্ত অর্থব্যয় করিয়া কত অন্বেষণ, কত খোঁড়াখুড়ি! এই ব্যাপার লইয়া "প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্যা" নামে একটা নূতন বিদ্যারই সৃষ্টি হইয়া গেল ও দেশের শাসনকর্ত্তারা "প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ" খুলিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। পারদর্শী প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুসন্ধানের ফলে যে সকল প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমানে লোকচক্ষুর দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসিয়াছে, তন্মধ্যে "মোহেঞ্জো-দড়ো" অন্যতম। এই আধুনিক আবিষ্কারটীর বিষয় নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় এই মোহেঞ্জো-দড়োর অবস্থিতি। রেল লাইনের দোকৃরি ষ্টেশন হইতে ইহার দূরত্ব মাত্র আট মাইল। যাতায়াতের সুবিধার জন্য ষ্টেশন হইতে একটী পাকা রাস্তা আছে।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসিদ্ধ ভূভাগের আবিষ্কার করেন। এই সময় তিনি গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের পশ্চিম কেন্দ্রের অধ্যক্ষ। কিছুদিন ধরিয়া তাঁহার তত্ত্বাবধানে খনন-কার্য্য চলিবার পর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত এম্ এস্ ভ্যাট্‌স তাঁহার পদাভিষিক্ত হইয়া আসেন। পর বৎসর ইঁহার পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত দীক্ষিত ঐ পদে নিযুক্ত হন। তিন জনেরই খননকার্য্যের ফলে ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, আবিষ্কৃত ভূভাগটীর মাহাত্ম্য বড় কম নহে। যদি উপযুক্ত পরিমাণে অর্থব্যয় করিয়া যোগ্য ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে বহু পারদর্শীর সাহায্যে আধুনিকতম উপায়ে খননকার্য্য চালান যায়, তাহা হইলে ঐ স্থান হইতে প্রাচীন যুগের সিন্ধুনদতীরবর্ত্তী সভ্যতা বিষয়ে যথেষ্ট আলোক পাওয়া যাইতে পারে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বিস্তৃতভাবে কার্য্য পরিচালিত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত স্যর জন্ মার্শালকে মোহেঞ্জো-দড়োর খননকার্য্যের অধিনায়ক নির্ব্বাচিত করেন। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসের প্রারম্ভে যখন শ্রীযুক্ত মার্শাল কর্ম্মস্থলে উপনীত হন, তখন তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য নিম্নলিখিত বিশেষজ্ঞেরা পূর্ব্ব হইতেই সমবেত হইয়াছিলেন:—সীমান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হারগ্রীভস্, উত্তর কেন্দ্রের অস্থায়ী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভ্যাট্‌স্, পশ্চিম কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দীক্ষিত, রাজপুতানা ও মধ্যভারতীয় কেন্দ্রের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ধাম, প্রত্নতত্ত্ব-রাসায়নিক শ্রীযুক্ত সনাউল্লা, শ্রীযুক্ত এ, ডি, সিদ্দিকী, রাজসাহী যাদুঘরের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার, শ্রীযুক্ত মনিয়র, শ্রীযুক্ত জে, সে, রায় ও শ্রীযুক্ত কে, এন, পুরী। শ্রীযুক্ত মার্শাল তাঁহার সহকারীদের লইয়া এক বৎসরের মধ্যে যে কার্য্য করেন, তাহা অচিন্তনীয় ভাবে ফলপ্রসূ হইয়াছে। এই খননকার্য্যে মোহেঞ্জোদড়ো হইতে যাহা-কিছু উদ্ধার হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে বর্ণিত হইবে।

মহেঞ্জো-দড়োর পরিদৃশ্যমান ধ্বংসাবশেষ ন্যূনধিক দুই শত ছয়টি একর জমি জুড়িয়া রহিয়াছে। ইহার স্থানে স্থানে ক্ষয়প্রাপ্ত ইষ্টকনির্ম্মিত স্তূপ ও প্রাচীরের সারি চলিয়াছে, মধ্যে মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিম্ন দীর্ঘ প্রশস্ত জমি —সম্ভবতঃ প্রাচীন নগরীটীর রাজপথসমূহের অবস্থান সূচিত করিতেছে। উত্তর-পশ্চিম কোণের ভূভাগটাই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত; উহারই উপর কুষান যুগের একটী

বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ শোভা পাইতেছে। ইহারই নিকটবর্ত্তী চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূখণ্ড সর্ব্বপ্রথম শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে খনিত হইয়াছিল। উপরি-উক্ত স্তূপটী ছাড়া আর যাহা-কিছু, তৎসমুদয়ই প্রায় পাঁচ সহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের বলিয়া অনুমিত হইতেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই যুগকে স্ক্যাল্‌কোলিথিক (Chalcolithic period) নামে অভিহিত করিয়াছেন। সিন্ধুনদ তীরস্থিত জমির বর্ত্তমান উচ্চতা হইতে কুড়ি বা ত্রিশ ফুট নিম্নে যে সকল স্তরের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, সেগুলিকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে, একটী অধিকতর প্রাচীন যুগের নগরীর ধ্বংসস্তূপের উপর আর একটী সুসমৃদ্ধিশালী নগরী দণ্ডায়মান ছিল।

বৌদ্ধস্তূপের পূর্ব্বদিকে যে প্রশস্ত নিম্ন জমি আছে, তাহারই অপর পার্শ্বে শ্রীযুক্ত ভ্যাট্‌সের খননকার্য্য চলিয়াছিল। আর শ্রীযুক্ত দীক্ষিত মহাশয় মোহেঞ্জো-দড়োর বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উত্তর-পূর্ব্ব অংশ লইয়াই ব্যাপৃত ছিলেন। শ্রীযুক্ত স্যর জন মার্শাল যখন কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি শ্রীযুক্ত ভ্যাট্‌স ও শ্রীযুক্ত দীক্ষিতকে নিজ নিজ গৃহীত অংশেরই বিস্তৃত খননকার্য্য চালাইতে উপদেশ দেন, কারণ ঐ ঐ অংশের ব্যবস্থা-প্রণালীর সঙ্গে ইঁহারা পরিচিত হইয়া গিয়াছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণের যে জমিটী শ্রীযুক্ত ভ্যাট্‌সের পরিচালিত জমি হইতে একটী সুগভীর নিম্নভূমি দ্বারা পৃথক্ ছিল, তাহার কার্য্য শ্রীযুক্ত হারগ্রীভ্‌সের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। আর শ্রীযুক্ত মার্শাল নিজে শ্রীযুক্ত সিদ্দিকী ও শ্রীযুক্ত ধামকে তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে লইয়া বৌদ্ধস্তূপের চতুষ্পার্শ্বস্থ সমগ্র পশ্চিম অংশটীর কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। মোহেঞ্জো-দড়োর বর্ণনা করিতে হইলে এই শেষের অংশটীর কথাই প্রথমে বলা সুবিধাজনক।

উপরে যে বৌদ্ধস্তূপটীর কথা বার বার লিখিত হইয়াছে, তাহার অবস্থিতির সহিত বাকী নগরটীর এমনই এক সম্বন্ধ রহিয়াছে যে, প্রথম দৃষ্টিতেই মনে করা গিয়াছিল —ইহারই ভিত্তিভূমির তলদেশে বা ইহার সন্নিকটস্থ ভূগর্ভে এমন কিছুর সন্ধান পাওয়া যাইবে যাহা প্রাচীন নগরীটীর সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। কতকগুলি ক্ষুদ্র-[illegible] স্তূপটীকে মালার ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছে। স্তূপ ও গৃহগুলির মধ্যবর্ত্তী চত্বরে তিনটী গভীর পরিখা খনন করা হয়—একটী উত্তরে, একটী দক্ষিণে ও একটী পূর্ব্বে। ইহা ব্যতীত আশ্রমগুলির বহির্ভাগে উত্তর ও পূর্ব্বাংশে যে ক্রমনিম্ন জমি, তাহারও মধ্যে মধ্যে সুগভীর খাত নির্ম্মিত হয়। এই পরিখাগুলির অন্তর্দেশে যে সকল স্তর সজ্জিত দেখা যায়, তাহা পূর্ব্বকথিত স্ক্যাল্‌কোলিথিক বিশেষ করিয়া "সিন্ধুদেশীয় প্রাচীন সভ্যতার" যুগের গৃহাদির প্রাচীর সমূহের পরিণত অবস্থা বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

বৌদ্ধ স্তূপের চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিখাগুলিকে এ পর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশ ফুট পর্য্যন্ত গভীর করা গিয়াছে; ইতিমধ্যেই এগুলিতে পাঁচটী বিভিন্ন স্তর লক্ষিত হইয়াছে। যে সকল ধ্বংসাবশেষ ইহাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশগুলিই পাঁজা-পোড়া ইষ্টক-নির্ম্মিত সুবৃহৎ প্রাচীর, রৌদ্র-দগ্ধ ইষ্টক-গঠিত ভিত্তি, সুন্দরভাবে প্রস্তুত পয়ঃপ্রণালী ও ইষ্টকাচ্ছাদিত আঙ্গিনা। আঙ্গিনাগুলির কয়েকটী দুই বিভিন্ন আকারের ইষ্টকের থাক দ্বারা রচিত। বড় ইষ্টকগুলির পরিমাণ ১ ফুট ২ই×৫২/৪ই×৩২/৪ই, আর ছোটগুলির ১০২/৪ই×৫ই×২২/৪ই। প্রাচীনতম নগরীর নিদর্শন প্রাপ্তির আশায় স্তূপচত্বরে যে সকল পরিখা খনন করা হইয়াছিল, তাহা হইতে বিভিন্ন ধরণের স্তরপর্য্যায় নির্ণয় করার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এগুলিকে আরও গভীর করিলে অধিকতর স্তরের সন্ধান পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। কিন্তু তাহা করিতে গেলে পাছে উপরের বৌদ্ধস্তূপটী ভাঙ্গিয়া নিশ্চিহ্ন হয়, সেই আশঙ্কায় আপাততঃ পরিখাগুলিকে সম অবস্থায় রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই সকল পরিখা হইতে প্রাচীনকালের যে সকল সামগ্রী পাওয়া গিয়াছে তাহাদের তালিকা:—আটটী খোদিত মুদ্রা (শীল); রক্তবর্ণ প্রস্তর, হস্তিদন্ত, অস্থি, তাম্র, শঙ্খ, স্ফটিক, দগ্ধ মৃত্তিকা ও কাচ-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি, দগ্ধ মৃত্তিকার গোলক, সম গোলাকার দীর্ঘ ঘন দ্রব্য ও সূচী-ঘন ক্ষেত্র; দগ্ধ মৃত্তিকা ও শঙ্খনির্ম্মিত বলয়; তাম্রনির্ম্মিত বাটালি; প্রস্তর-নির্ম্মিত খোদাই অস্ত্র (chert scraper), ঝিনুক ও সীসকখণ্ড। মূর্ত্তিগুলির মধ্যে একটী শঙ্খ হইতে খোদাই করিয়া প্রস্তুত ভেক-মূর্ত্তি ও একটী দগ্ধ মৃত্তিকা হইতে গঠিত মেষমূর্ত্তি

আছে ; এই মূর্ত্তিই স্তূপ-প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে পাঁচ হইতে সাত ফুট নিম্নে অবস্থিত একটী কক্ষ মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।

পূর্ব্ববর্ণিত পরিখাগুলির কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে স্তূপের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রায় নয় সহস্র বর্গগজ পরিমিত জমিতে খননকার্য্য চলিতে থাকে। খনন শেষে এই অংশে অনেকগুলি ভগ্নগৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে "স্নানাগার"টী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ; ইহা স্তূপ-চত্বরের পশ্চিমে ন্যূনাধিক এক শত ফুট দূরে সমান্তরাল-ভাবে অবস্থিত। স্নানাগারটীর মধ্যস্থলে একটী পুষ্করিণীর ন্যায় চতুষ্কোণ জলাধার আছে ; জলাধারটীর চতুর্দ্দিকে অপেক্ষাকৃত উচ্চে অবস্থিত একটী দালান রহিয়াছে। জলাশয়ের উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে স্নানের জন্য দুইটী প্রশস্ত মঞ্চ আছে। দালানের পূর্ব্বধারে কতকগুলি ছোট বড় কক্ষ দেখা যায়। গৃহের প্রাচীরগুলি সর্ব্বত্রই পাজা-পোড়া ইষ্টকনির্ম্মিত ; মাত্র বুনিয়াদগুলি ও যেস্থলে দুই প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী স্থান ভরাট করিতে হইয়াছে, সেই স্থানগুলি কাঁচা ইটের গাঁথনি। বাড়ীটার বহিঃ-প্রাচীর সর্ব্বত্রই ছয় ফুটের অধিক পুরু ; প্রাচীরটী বহির্ভাগে নীচের দিকে বেশী চওড়া। বাড়ীটার উত্তর-পূর্ব্ব ও দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া যে প্রাচীন নগরীর রাজপথ প্রসারিত ছিল, তাহা ঐ স্থানের নিম্ন প্রশস্ত ঋজু দীর্ঘ ভূভাগ হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয়। বহিঃ-প্রাচীরের দক্ষিণভাগে দুইটী বৃহৎ প্রবেশদ্বার ছিল ; পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের প্রবেশ পথগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। পূর্ব্ব ভাগের কক্ষগুলির মধ্যেরটাতে একটী প্রকাণ্ড গোলাকার কুয়া আছে ; কুয়াটীর ভিতরের দেওয়াল পাকা ইটে গাঁথা, পরে একটী চওড়া কাঁচা ইটের দেওয়াল আছে ; পুনরায় আর একটী বৃহত্তর পাকা ইটের গাঁথুনি। যে ঘরের মধ্যে কুয়া আছে, তাহা হইতে দুইটী জলনালী ভিতরের দালান পর্য্যন্ত গিয়াছে ; বাহিরের দেওয়ালের দিকে একটী জল-নিকাশের বন্দোবস্ত আছে।

সাহিত্যিক

Vedic Magazineএর জুলাই সংখ্যায় 'পুরুষ ও নারী' (Man and Woman) নামক একটী সুন্দর, সরস প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। লেখিকা প্রফেসর চন্দ্রাবতী মহাশয়া এই প্রবন্ধে পুরুষ ও নারীর শক্তি, বৈচিত্র্য প্রভৃতি বিষয় লইয়া যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, পুরুষদের সহিত যদি স্ত্রীলোকদের সামাজিক, রাজনৈতিক, বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সমান অধিকার, শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি পরিচালিত করিবার সুযোগ দেওয়া হয় তাহা হইলে স্ত্রীজাতি শীঘ্রই সর্ব্ববিষয়ে পুরুষের অংশীদার ও সমকক্ষ হইতে পারিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনার অধিকার বুঝিয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন নাই। তিনি চান সমকক্ষতা, সমান অধিকার। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি গঠনকার্য্য বিষয়ে নারীর মতামত গ্রহণ করা হউক এবং তাহাদের উপেক্ষা না করিয়া তাহাদের উপর এই সকল বিষয়ের পুনর্গঠনের ভার অর্পণ করা হউক,—ইহাই তিনি এই প্রবন্ধে বলিতে চাহিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, আমাদের পুরুষজাতি যদি তাহাদের সঙ্কীর্ণতা লইয়া উভয় জাতির ভিতর এইরূপে প্রাচীর গড়িয়া তোলে, তাহা হইলে শীঘ্রই ইউরোপের ন্যায় আমাদের দেশে একটী প্রবল re-action আসিবে এবং সেই প্রবাহে সমস্ত বাধা, সীমা, বন্ধন, লুপ্ত হইয়া যাইবে ! ভারত আবার জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে। তিনি ভারতের সেই উজ্জ্বল দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন।

Hibbert Journalএর জুলাই সংখ্যায় 'বেকার-সমস্যা' লইয়া একটী সুচিন্তিত গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। আজকাল পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বজাতির ভিতর বেকার-সমস্যা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সংক্রামক রোগের ন্যায় দেখিতে দেখিতে এ সমস্যা সারা পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কোন দেশেই আর ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারিতেছে না। বিদ্যাশিক্ষার প্রচার হইলে কিংবা মানব জাতির সুবিধার জন্য নিত্য নব নব যন্ত্রের আবিষ্কার হইলে কি হয়—সাধারণের দুঃখ দূর হইতেছে না, পীড়িতের আর্ত্তনাদের বিরাম নাই, শিক্ষিত দরিদ্রের অশ্রুধারা শুকাইবার আশা নাই। এই বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা, আন্দোলন, বক্তৃতা প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন সন্তোষজনক মীমাংসা মিলিতেছে না। যাহা হউক এই প্রবন্ধে লেখক Dr.

D. M. Sells অনেক মৌলিক বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং যথেষ্ট চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন।

জল্পনা-কল্পনা

বাঙ্গালায় নারী-নির্য্যাতন বৃদ্ধিই পাইতে চলিল। সভা করিয়া বক্তৃতার দ্বারা কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের নিন্দা করিলেই ইহার উপায় হইবে না। যদি দেখা যায় এই নারী-নির্য্যাতনকারীদের মধ্যে অধিকাংশই কোন নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের লোক, সেই সম্প্রদায়কে আপনার ঘর ঠিক করিতে অবশ্য বলিব, দুর্ব্বৃত্তদের অবশ্য তীব্র ভৎর্সনা করিব। কিন্তু সেই খানেই যেন সকল চেষ্টার অবসান না হয়।

* * * *

আমাদের রাজনৈতিক নেতারা দেশের অন্যান্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে যদি এই একান্ত কর্ত্তব্য ও অবশ্য পালনীয় ব্যাপারটির দিকে মনোযোগ দেন, তাহা হইলে প্রভূত উপকার হয়। আমাদের চোখের উপর আমাদের আবাস হইতে, গ্রাম হইতে নারী-হরণ হইবে, পথে ঘাটে আমাদের মাতা জায়া ভগিনী দুহিতার উপর পাশব অত্যাচার প্রতিদিন ঘটিবে, আর আমরা কংগ্রেসের কলহ লইয়া সময় নষ্ট করিব, ইহা কি উচিত?

* * * *

দেশের জননীরা যখন বিপন্ন, আমরা ভাবিয়া উঠিতে পারি না, তখন দেশের নেতারা বা ছাত্ররা সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের রক্ষা করিবার উপায় না করিয়া, কিরূপে আপন আপন স্বার্থ, আপন আপন দ্বন্দ্ব লইয়া বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছেন। দেশের ছাত্ররা মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দেয় নাই, দেশের নেতৃবৃন্দ মুখ্য ও গৌণ কর্ম্মের পার্থক্য বুঝিবার মত মস্তিষ্ক হারায় নাই। তবে এ অত্যাচার নিবারিত হইতেছে না কেন?

* * * *

যে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এই সব নারী-মর্য্যাদা-ধ্বংসকারীদের বেশীর ভাগ, সেই সম্প্রদায়ের নেতাদের আমরা বলি তাঁহারা অন্য সম্প্রদায়ের নারীদের আজ দুর্গতি হইতেছে বলিয়া যদি মানবের সাধারণ কর্ত্তব্য করিতে পরাঙ্মুখ হন, তাহা হইলে আর এক দিন ইহার বিপরীত ঘটনা জগতে ঘটিলে, কেহই তাঁহাদের মুখ চাহিয়া সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে না। দেশের জননীদের মর্য্যাদা দেশের সর্ব্ব সম্প্রদায়েরই রক্ষা করা কর্ত্তব্য, এখানে শ্রেণীভেদ বা ধর্ম্মভেদ নাই ইহা ভুলিলে চলিবে না।

* * * *

কাশীর বাঙ্গালীটোলায় হিন্দুদিগের প্রত্যেকের ঘরে কোন না কোন বিগ্রহ রক্ষিত ও পূজিত হয়। সেই উপলক্ষ্যে বাদ্যধ্বনিও হয়। কিন্তু ঐ বাঙ্গালীটোলায় অবস্থিত মসজিদের লোকেদের সেইটুকুও সহ্য হয় নাই—তজ্জন্য হিন্দুরা নিগৃহীত হইয়াছে। হিন্দু মুসলমানকে একই দেশে পাশাপাশি থাকিতে হইবে। উভয়ের সমবেত প্রযত্নেই দেশের উন্নতি। কিন্তু আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ যদি ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ বিবেচনাহীন অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেন ত তাঁদের ভাগ্যে কাহারও সহানুভূতি লাভ ঘটিবে না।

* * * *

ইণ্ডিয়া অফিসের সহকারী ভারত-সচিব সে দিন স্যাণ্ডার্সের সামরিক কলেজ পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে বৃটিশ ও ভারতীয় ছাত্র একই ভাবে বসবাস করে। সেখানকার মেজর জেনারেল গার্ড উড্ আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, মোটের উপর ভারতীয় ছাত্রগণ সকলেই উপযুক্ত। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন কলেজের সকলেরই প্রিয়পাত্র।

আমরা বলি ভারতীয়েরা উপযুক্ত অবসর এ পর্য্যন্ত পায় নাই বলিয়া আপনাদের কৃতিত্ব অনেক স্থলেই দেখাইবার সুযোগ ও সুবিধা পায় নাই—চিত্ত-বৃত্তির স্ফুরণে বা বুদ্ধির কার্য্যে ভারতবাসী কোন দিনই কাহারও পশ্চাদ্‌পদ ছিল না এবং সে থাকিবেও না, ইহা আমাদের বিশ্বাস।

* * * *

ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালিপদ বসু মহাশয় জার্ম্মাণীর মিউনিক সহরে জৈব-রসায়ন-তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণার জন্য একটী বৃত্তি পাইয়াছেন। এই বৃত্তির জন্য জগতের বহু কৃতী বৈজ্ঞানিকই আবেদন-কারী ছিলেন কিন্তু জয়মাল্যে বিভূষিত হইয়াছেন আমা-

দের এক জন বাঙ্গালী—তাঁহার এই সম্মানে আমরা গৌরব অনুভব করিতেছি। বাঙ্গালীর মুখ তিনি উজ্জ্বল করিয়াছেন।

*　　*　　*　　*

ভারত-সরকার ভারতবর্ষ হইতে চারি জন ছাত্রকে শিল্প-শিক্ষার জন্য বৃত্তি দান করিয়াছেন। ইহাদিগকে বিলাতে কেনসিংটন কলেজে অধ্যয়ন করিতে হইবে। এই বৃত্তি সমগ্র ভারতের জন্য। যে চারি জন শিল্পী উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন তাহারা সকলেই বঙ্গমাতার সন্তান। ইহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত রণদা উকিল মহাশয়ের কৃতিত্বের পরিচয় মাসিকপত্র-পত্রিকার পাঠকেরা মাঝে মাঝে পাইয়া থাকেন। ইঁহাদের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ হইতেছেন শ্রীমান্ সুধাংশু চৌধুরী। শিক্ষান্তে ইহারা ভারত-সরকারের নব-নির্ম্মিত বাড়ীর প্রাচীর গাত্র সুসজ্জিত করণে (mural decoration) নিযুক্ত হইবেন। ইহারাও বাঙ্গালার তথা বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। শিক্ষা-বিভাগের সর্ব্বদিক দিয়া এখনও যে বাঙ্গালী আপনার কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেছেন ইহা কম গৌরবের কথা নয়। চারি জনেই বিলাত-যাত্রা করিয়াছেন। ইঁহাদের যাত্রা পথ শুভ হউক ও ইহারা যশোমাল্যে বিভূষিত হইয়া সগৌরবে বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসুন।

*　　*　　*　　*

সুধু বিদ্যাশিক্ষায় কৃতী হইলে চলিবে না—ভারতবাসীকে খেলাধূলার প্রতিযোগিতায় বড় হইতে হইবে। খেলাধূলা হইতে যে সকল সদ্‌গুণ শিক্ষা করিতে পারা যায় সে গুলিকে আয়ত্ত করিতে হইবে। আজ আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে গত ২৪শে আগষ্ট বেলা ৮টা হইতে হায়দ্রাবাদ ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ছাত্র মহম্মদ সফী আহম্মদ কলিকাতার ওয়েলেস্‌লী পুষ্করিণীতে ২৫শে আগষ্ট বেলা ৯টা পর্য্যন্ত একাদিক্রমে ২৫ ঘণ্টা সন্তরণ করেন। গত বৎসর জনৈক পার্শি যুবক এইখানে ২৪ঘণ্টা ঐরূপ সন্তরণ করিয়াছিলেন। মহম্মদ সফী আহম্মদের বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা ভারতের রেকর্ড সন্তরণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহাকে উঠিতে বলেন; কিন্তু তিনি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন না। তখন ডাক্তার দ্বারা তাহাকে পরীক্ষা করান হইল ও তিনি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, এখনও সন্তরণকারীর দেহ বেশ সবল আছে। সাঁতারু আরও ৩ঘণ্টা জলে থাকিয়া ১২টার সময় উঠেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি অবসন্ন হন নাই। ভারতে আজ পর্য্যন্ত ২৮ঘণ্টা একাদিক্রমে কেহই সন্তরণ দিতে পারেন নাই।

*　　*　　*　　*

গত ২৪শে আগষ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনেট সভার কার্য্য-বিবরণী হইতে জানিতে পারা যায় বিগত ১০ বৎসর যাবৎ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কাজ করিতেছেন। এই সময়ের বেতনের সমস্ত টাকাই তাঁহার জমা হইতেছিল। সেই টাকা তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছেন। সেনেট সভা স্থির করিয়াছেন যে, এই ৯০০০০৲ নব্বই হাজার টাকার দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শিক্ষার উৎকর্ষ ও গবেষণার কার্য্যে নিম্নলিখিত ভাবে ব্যয়িত হইবে :—

(১) ইউনিভারসিটি কলেজের ইন-অরগেনিক কেমেষ্ট্রি লেবরেটরির প্রসারের জন্য ৫০০০৲ টাকা।

(২) বিজ্ঞান কলেজের সহিত যুক্ত ইন-অরগেনিক রিসার্চ্চ লেবরেটরীর আসবাব পত্রে ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা।

(৩) ইণ্ডিয়ান কেমিকেল সোসাইটীর বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য দশ হাজার টাকা।

(৪) অবশিষ্ট টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া তাহার সুদ হইতে সার পি, সি, রায়ের নামে গবেষণাকারী ছাত্রদিগকে ২০০৲ টাকার একটী বৃত্তি দেওয়া হইবে।

*　　*　　*　　*

শিক্ষার জন্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আজীবন যাহা করিয়া আসিতেছেন তাহা লক্ষ্মীর বরপুত্র দিগের অনুকরণ করা উচিত। দেশে বিজ্ঞান ও রসায়নের প্রসার বৃদ্ধি না হইলে ধনাগমের পথ সহজ হইবে না। জগতের সকল সভ্যদেশেই (applied) ফলিত-বিজ্ঞানও রসায়নের গবেষণার জন্য এইরূপ দান করিবার প্রথা আছে। সেখানকার লক্ষ্মীর বরপুত্রদের এইরূপদানের টাকা হইতে যে বৃত্তি নির্দ্ধারিত আছে আমাদের ভারতের কয়েকজন কৃতী ছাত্র এখনও সেইরূপ বৃত্তি পাইতেছেন। এই সকল নিঃস্বার্থ দানশীল ব্যক্তিরাই জগতের মধ্যে চিরবরেণ্য।
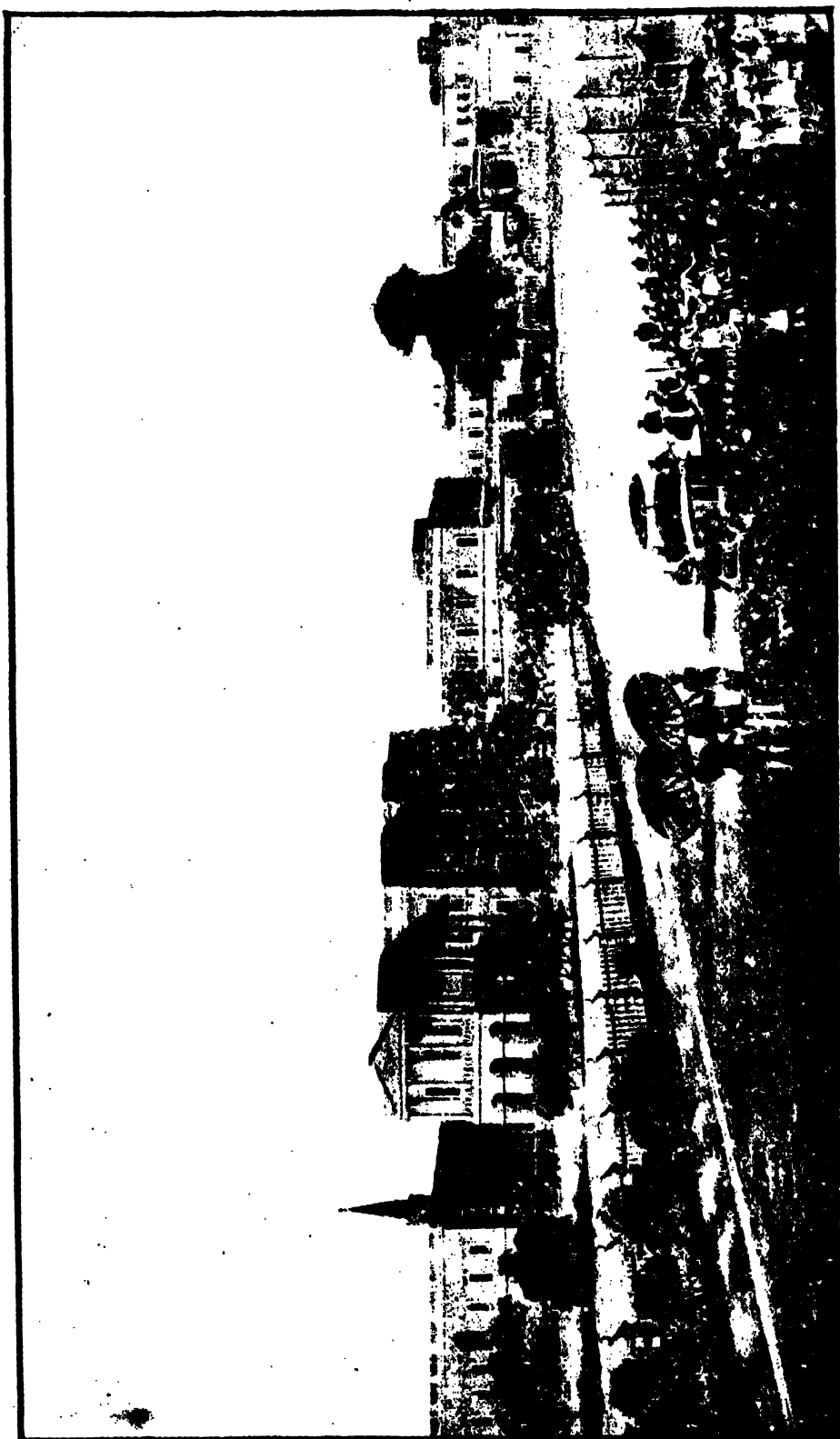
বড়লাট-ভবনের পশ্চাদিকের দৃশ্য—১৮০১

[Bengal Past and Present এর কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীনরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে]

জীবন-প্রিয়

[শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র]

দিকে দিকে আজ কে দিল ছড়ায়ে
রশ্মি-তরল হেম?
ভুবন ভরিয়া একি সম্পদ
মহাবৈভব প্রেম!

শুষ্ক কাননে ফুটিত না ফুল
জাগিত না কভু কেকা,
কুয়াসা ভেদিয়া পশিত না হেথা
একটী হিরণ রেখা।

আনিলে সেথায় সোনার পরশ
আনিলে সেথায় গান,
নিদ্রিত পুরী উঠিল জাগিয়া
মাতিয়া উঠিল প্রাণ।

মনোবেদনার মলিনতা-হরা
শুভ্র হাসিটী নিও
হে মোর জীবন-প্রিয়।

অজানা কাহারে খোঁজে বার বার
অন্তর নাহি জানে,
ব্যাকুল হইয়া চাহিত কহিতে
কি যে কথা কাণে কাণে,
কাহার পরশ বুভুক্ষু আঁখি
মাগিত হিয়ার তলে,
কাহার আসন পাতিত গোপন
বিকশিত শতদলে।

ব্যথা ও অশ্রু উৎসের মাঝে
মগ্ন ছিল যে প্রাণ,
অসীম হরষ পরশে মিলালো—
মিলন-অভিজ্ঞান।

ভুলানো স্মৃতিটী ভরিল প্রীতিতে—
নিও তুমি সেটী নিও,
হে মোর জীবন-প্রিয়।

আজিকে আমার হৃদয় উছলি
উছসি উঠিছে হাসি,
অমার আঁধার নাশিয়া পশেছে
শুভ্র জোৎস্না রাশি।

দিকে দিকে আজ কুহু কেকা তান,
দিকে দিকে ফুটে ফুল,
কুসুম-গন্ধে আকুল হইয়া
ছুটিয়াছে অলিকুল।

(ওরে) হৃদয়-দুয়ারে এল বসন্ত
বিলসিত করি প্রাণ,
উলসিত হিয়া মথিয়া মথিয়া
গাহে তবে আজি গান।

অন্তর ভরি' একি এ পুলক—
নিও তুমি সেটী নিও,
হে মোর জীবন-প্রিয়।

ওরে একি সরসতা মরুভূমে আজ
নদী তুলে কলতান,
ধূসর ধূলার ঊষর বক্ষে
বাসন্তী অভিযান।

ওরে তপ্ত বালুর কণাগুলি আজ
রক্ত রেণুর সম,
বাতাসে উড়িয়া আকাশেরে করে
সুন্দর অনুপম।

ওরে ধরণীরে আজ কে রাঙাল বল
ইন্দ্র-ধনুর বর্ণে,
গোধূলি উষায় ছড়ায় স্বর্ণ
জীর্ণ কুটীর পর্ণে।

ওরে দিকে দিকে আজ একি উৎসব
উঠে আনন্দ রোল,
শাখায় শাখায় ফুল-শিশু-কেলি
ঝুলনে দোদুল দোল।

ওরে দিকে দিকে আজ আয়োজন নব
একি এ অভাবনীয়,
তোমারি আসন হবে সমাসীন
হে মোর জীবন প্রিয়।

পুস্তক-পরিচয়

শকুন্তলায় নাট্যকলা—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্-এ, ডি লিট্, সি-আই-ই,—লিখিত গ্রন্থ-পরিচয় ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার শাস্ত্রী এম্-এ, পি-আর্ এস্-লিখিত ভূমিকা সংবলিত—পৃঃ ১৬+১৫৮—মূল্য এক টাকা। প্রকাশক বরেন্দ্র লাইব্রেরী ২০৪ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

গ্রন্থখানি বারটী অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে—মহাকাব্য, উপন্যাস ও দৃশ্যকাব্যের প্রকৃতি ও পরস্পর-ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে; তাহার পর নাটকে চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ কিরূপ কলা-কৌশলে সাধিত হইতে পারে—তাহারই একটা অনতিবৃহৎ আলোচনা; অবশেষে মহাকবি কালিদাসকৃত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের অবতরণিকা। দ্বিতীয়াধ্যায়ে শকুন্তলার প্রথমাঙ্কের বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণের একটা বৈশিষ্ট্যও আছে। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার প্রথমাঙ্কের ঘটনাবলী গল্পাকারে সাজাইয়াছেন; গল্প বলিতে বলিতে কালিদাসের প্রত্যেকটী বাক্য ও বাক্যাংশ পর্য্যন্ত ভাষান্তরিত করিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে ধরিয়াছেন। অথচ এ ভাষান্তর আক্ষরিক অনুবাদ নহে। গ্রন্থের ভাষার একটী বৈশিষ্ট্য উহার নাটকীয়তা। গল্প পড়িতে পড়িতে বহুবার মনে হইয়াছে যেন আমরা স্বতন্ত্র একখানি নাটকই পাঠ করিতেছি; গল্পের মাঝে মাঝে ছোট ছোট বাক্যের সাহায্যে (Touches) শকুন্তলার নাটকীয় কলা কৌশলগুলি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করিয়া দেবেন্দ্রবাবু অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বাঙলায় এরূপ সমালোচনা সাহিত্যের পদ্ধতি আজকাল আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে ঠিক্ ঐ ভাবেই শকুন্তলার বাকী ছয় অঙ্কের সমালোচনা করা হইয়াছে।

এই পর্য্যন্ত মূল গ্রন্থ (৬৫ পৃষ্ঠা)। পরবর্ত্তী সাতটা অধ্যায়কে আমরা মূলের পরিশিষ্ট বলিয়া মনে করি।

৬ষ্ঠ অংশে দেবেন্দ্রবাবুর অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের নিদর্শন বর্ত্তমান। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের নাট্য সমালোচনার ধারা বঙ্গভাষায় অতি প্রাঞ্জলভাবে বিবৃত করিয়া গ্রন্থকার সাধারণের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। সেক্স্পীয়ার, ইব্সেন্, অস্কার-ওয়াইল্ড প্রভৃতি সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য নাট্যকারগণ সংস্কৃতানভিজ্ঞ হইয়াও নিজেদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে কিরূপে সংস্কৃত নাট্যকলার (technique) অনুসরণ করিয়াছেন—তাহা তিনি কয়েকখানি সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য নাটক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। সংস্কৃত নাট্যসমালোচনার রীতি যে কত উন্নত ও বিশ্বজনীন—তাহা দেবেন্দ্রবাবুই প্রথম আমাদিগকে দেখাইয়া দিলেন। এ বিষয়ে সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই এই মনীষী গ্রন্থকর্ত্তার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। সপ্তমাধ্যায়ে শকুন্তলা-নাটক উক্ত পদ্ধতিতে বিশ্লেষিত করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন যে, "ইংরাজী নাটকের মূল—ঘটনায় ও সংস্কৃত নাটকের মূল—রসে"। অষ্টম অধ্যায়ে—সংস্কৃত-অলঙ্কারিকগণ নাটক সংক্রান্ত যে সকল আলোচনা করিয়াছেন, সেগুলির একটী সুন্দর সার সঙ্কলন প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে মহাকবি শকুন্তলায় নাট্যশাস্ত্রের বিধান কত দূর রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। যে সকল স্থলে তিনি শাস্ত্র-নির্দ্দেশ ভঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়, সে সকল স্থলও দেবেন্দ্র বাবু আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কোন গুপ্ত নাটকীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই কালিদাস ইচ্ছা করিয়া বাঁধন ছিঁড়িয়াছেন; ইহাতে কিন্তু কোনস্থলেই রসস্ফূর্ত্তির অভাব ঘটে নাই। নবমে মহাকবির তিনখানি দৃশ্যকাব্যের তুলনামূলক সমালোচনা ও নাটকীয় উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার; সঙ্গে সঙ্গে নাট্যোক্ত চরিত্রগুলির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা মহাকবির নিজমুখের কথা তুলিয়া প্রদত্ত হইয়াছে। দশমে নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে দেশী ও বিদেশী নানা মত—সংস্কৃতনাটকে বিজাতীয় প্রভাবের বিচার—সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য নাট্য-সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা। গ্রন্থকর্ত্তা দেখাইয়াছেন যে পাশ্চাত্য দেশের নাট্য-রচনার রীতি আমাদের দেশের রীতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন—কোনটি কোনটার হুবহু অনুকরণ নহে। সংস্কৃত নাটকে ব্যক্তিগত (Individual) চরিত্রের বিকাশ। পাশ্চাত্য (বিশেষতঃ সেক্স্পীয়রের) নাটকে প্রায় অধিকাংশ চরিত্রেই জাতিগত আদর্শের (Type) অভিব্যক্তি। একাদশে শকুন্তলোপাখ্যানের প্রাচীনতর পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক উপাখ্যানের সহিত নাটকখানির পার্থক্য—নাটকীয় ঘটনার স্থিতিকাল—unity of time and place—প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশালার নক্সা (plan) ও নাট্য-শাস্ত্রোক্ত রসবিচার অবতারিত হইয়াছে। রস সম্বন্ধে এরূপ বিচার বাঙ্লা ভাষায় বড় দেখা যায় না। শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায় বলিতে গেলে "ইহাতে বেশ পাণ্ডিত্য আছে, গুণ-পণা আছে, রসবোধের প্রাধান্য আছে এবং প্রতিভার বিকাশ আছে।" দ্বাদশাধ্যায়ে শকুন্তলার উদ্দেশ্য আলোচিত হইয়াছে। দেবেন্দ্র বাবু দেখাইয়াছেন যে, শকুন্তলা সমাজ-তত্ত্ব নহে—বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণের অভিযান নহে—মায়াবাদের প্রতিবাদ নহে—স্মৃতিভ্রংশের নিদানও নহে। মানব প্রকৃতির উপর স্বভাবের প্রভাব প্রদর্শনও ইহার গূঢ় উদ্দেশ্য নহে। শকুন্তলা নাটক মাত্র—নীতি-গ্রন্থ নহে; এবং সে জন্য তিনি নাট্যকলার বিধানানুসারেই ইহার ভাব, নীতি ও উদ্দেশ্য বিচার করিয়াছেন। ইহার পর অবান্তর প্রসঙ্গরূপে কালিদাসের সময় নিরূপণ লইয়া যে সকল বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে তাহার একটী সংগ্রহও প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু নিজস্ব কোন সিদ্ধান্ত প্রদান না করিয়া বলিয়াছেন—"পণ্ডিতগণের এই যুগ-

নিরূপণ ব্যাপার অন্ধকারে লোষ্ট্রনিক্ষেপ মাত্র।" শুধু সাধারণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য এই প্রসঙ্গের অবতারণা। অথচ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থপরিচয়ে দেবেন্দ্রবাবুর প্রতি অযথা দোষারোপ করিয়াছেন এই বলিয়া যে তিনি 'সঠ শতাব্দীর দিকে ঝুঁকিয়াছেন।" শাস্ত্রী মহাশয় বোধ হয় আত্মবন্মনাতে জগৎ' নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। দেবেন্দ্রবাবু বরং প্রচলিত ৫ম শতাব্দী মতের দিকে একটু টানিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে কোনটীতেই পুরা বিশ্বাস করেন না তাহা তাঁহার মুখের কথাতেই প্রকাশিত হইয়াছে।

শাস্ত্রীমহাশয়ের আর একটী উক্তিতে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন—"সকলে বলে শকুন্তলা নাটকের বীজ পুত্রমেবং গুণোপেতং চক্রবর্ত্তিনমাপ্নুহি।" দেবেন বাবুও তাহাই বলিয়াছেন।...ছেলে হওয়া শকুন্তলা-নাটকের বীজ নহে। সেটি খুব প্রকাশ।......' উহা শকুন্তলার "সমাজের নিকট অপরাধ।" উহার ফলে "দুরন্ত শাপ"। আমাদের মনে হয় শাস্ত্রী মহাশয় Centre of the plot ও নাট্যশাস্ত্র-বর্ণিত বীজের একটা খিচুড়ী পাকাইয়া বসিয়াছেন। 'ছেলে হওয়া' শকুন্তলা নাটকের বীজ নহে—অধিকন্ত ফল—মূল ফলাগম হইতে শকুন্তলা ও রাজার মিলন। ইহার যাহা 'প্রথম হেতু', তাহাই নাটকীয় বীজ। তাহা সমাজের নিকট অপরাধ বা শাপ নহে। রাজার দক্ষিণ-বাহুস্পন্দনে এই ভাবী ফললাভের প্রথম সূচনা, ঋষির আশীর্ব্বাদ ইহারই সমর্থক; সুতরাং ঐ দুটির কোনটিকে কেহ বীজ বলেন।

অধ্যাপক সুরেন্দ্রবাবুর ভূমিকাটী খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ সন্দেহ নাই। তবে উহাতে নাট্য কলার একটু ইঙ্গিতও নাই। ইহাকে গ্রন্থের ভূমিকা না করিয়া পরিশিষ্ট করিলেই শোভন হইত।

শকুন্তলার বহু সমালোচনা—ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত পড়িবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিয়াছে। কিন্তু নাটক হিসাবে শকুন্তলার স্থান কোথায় তাহার আলোচনা ইতঃপূর্ব্বে আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। সেক্স্‌পীয়রের নাটকাবলীর এরূপ সমালোচনা পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে হইয়াছে বটে, কিন্তু এদেশে এরূপ সমালোচনা বড়ই বিরল। গ্রন্থখানির সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিতে হইলে একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধের প্রয়োজন। বর্ত্তমানে সে সুযোগ নাই বলিয়া আমরা মাত্র দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব—

(১) দেবেন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন যে—"রূপান্তর শাপগ্রস্ত রাজার স্মৃতি-বিভ্রমের বাহ্য সহায়।" পাছে দর্শকগণেরও এইরূপ স্মৃতিভ্রংশ ঘটে, এই ভয়ে তিনি শকুন্তলার প্রসাধন চতুর্থাঙ্কে রঙ্গমঞ্চের উপরই সম্পন্ন করিয়াছেন। শাস্ত্রনিষিদ্ধ প্রসাধন প্রকাশ্যে প্রদর্শন করিবার গূঢ় উদ্দেশ্য ইহাই। ইহাতে ফল হইয়াছে এই—শকুন্তলা যখন পঞ্চমাঙ্কে রাজসভায় আসিলেন, তখন তিনি দর্শকগণের নিকট অপরিচিতা নহেন। রাজার অবস্থা কিন্তু অন্যরূপ। "যে মনোজ্ঞা তপোবনবালা তাঁহার মনের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন, সে অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য বসন-ভূষণের আড়ম্বরে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া তাঁহার সুপ্তস্মৃতি জাগরণের সুদূর সম্ভাবনা পর্য্যন্ত কালিদাস কৌশলে বিলুপ্ত করিয়া দিলেন।"

প্রকৃত ভাবুক ও কবি ব্যতীত মহাকাব-হৃদয়ের এ অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনাময় ভাব হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণের পক্ষে সহজসাধ্য নহে।

(২) দেবেন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন—"অভিজ্ঞান শকুন্তল প্রেমের চিত্র। দুষ্মন্তের চারিত্রগত ত্রুটি ধীরে ধীরে ক্ষালিত করিয়া কালিদাস তাঁহার হৃদয়ে মহৎপ্রেমের বিকাশ করিয়াছেন। ভারতীয় প্রেমের আদর্শ শুধু ভোগে পর্য্যবসিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। তাহা প্রথম কোন মানসী আদর্শে সঞ্চারিত হইয়া সমগ্র জাতির উপর ছড়াইয়া পড়ে, এবং শেষে শ্রীভগবানের চরণে সমর্পিত হইয়া চরম সার্থকতা ও পরম শান্তিলাভ করে। কবি, চিত্রকর, ভাস্কর প্রভৃতি কলাকুশল কল্পনাপ্রবণ ভাবুকমাত্রেরই এইরূপ আদর্শের ধ্যান ও তাহাকে মূর্ত্তিদান জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু এ আদর্শের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সকলের সৌভাগ্যে ঘটে না। কণ্ব-তপোবনেদ্র মধ্যের এক দিন সে সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল। কালিদাসের দুষ্মন্ত চিত্রকর এবং শকুন্তলা তাঁহার মানসী আদর্শ। পঞ্চমাঙ্কে সে আদর্শ রূপান্তরিত হইয়া আসিলে দুষ্মন্ত তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। শকুন্তলা পূর্ব্বোক্তরূপ বৈধ ভোগ ও ভগবৎপ্রেমের অপূর্ব্ব চিত্র।"

কাব্যরচনার ন্যায় কাব্য-সমালোচনাও যে একটা কলাবিদ্যা-বিশেষ (Criticism as an Art) দেবেন্দ্রবাবুর রচনা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবে একটি ত্রুটির কথা বলি। অনেক স্থলে বোধ হইল যেন তিনি ইচ্ছা করিয়াই লেখনীকে অযথা সংযত করিয়াছেন। নতুবা এ বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতা অনন্যসাধারণ। তিনি কালিদাসের নাট্যকলা সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত সমালোচনা করিতে থাকিলে আমরা অত্যন্ত সুখী হইব।

পুস্তকখানিতে কয়েকটি ছাপার ভুল আছে। সেগুলি না থাকিলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

স্বপ্ন—শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু। ১৩নং পার্শীবাগান হইতে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা।

বইখানি কাব্য নয়, মনোবিকলন শাস্ত্র, গিরীন্দ্র বাবু নূতন নামকরণ করিয়াছেন নিজ্ঞান-বিদ্যা। স্বপ্ন এত দিন কবিদের একচেটিয়া সম্পত্তি ছিল। আজ বৈজ্ঞানিক আসিয়া তাহাতে ভাগ বসাইয়াছে। দখল সাব্যস্ত হইয়াছে। মনোবিদেরা 'অবাস্তব অদ্ভুত আজগবী স্বপ্নরাজ্য'—অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

মনস্তাত্ত্বিক জগতে ডাঃ গিরীন্দ্রশেখরের নাম সুপরিচিত। Concepts of Repression লিখিয়া তিনি মনোবিকলনের প্রবর্ত্তক প্রফেসর ফ্রয়েডের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আজ তিনি সাইকো-এনালিটিক সোসাইটির ভারতীয় শাখার সভাপতি এবং তাঁহার বিপরীত ইচ্ছাবিষয়ক মতবাদ মনোবৈজ্ঞানিক জগতে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

পুরাতন মনোবিদেরা শুধু মনের সজ্ঞান অবস্থার ক্রিয়া ও ক্রিয়াফলের

কথাই বর্ণনা করিয়াছেন 'ড দেখিলেন, মনের যেমন একটী সজ্ঞান তেমনই একটী নির্জ্ঞান অবস্থা ; শুধু তাই নয়, নানা দিক দিয়া নির্জ্ঞানের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। বহুবিধ পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে এই মত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। মনস্তত্ত্ব জগতে যুগান্তর আনিয়া ফ্রয়েডের নাম জগদ্বিখ্যাত হইয়া পড়িল।

স্বপ্ন-বিশ্লেষণে আমরা এই মানসিক নির্জ্ঞানের পরিচয় লাভ করি। বাবু এই পুস্তকে স্বপ্ন সম্বন্ধে ফ্রয়েডের গবেষণা ও অন্যান্য মনোবিদগণের মতামত আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সেই সঙ্গে নিজের মত ও মন্তব্যও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল মন্তব্যের মূল্য অল্প নহে।

পাশ্চাত্য যে কোন দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণার একান্ত অসদ্ভাব। ডাঃ গিরীন্দ্রশেখরের মত অভিজ্ঞ পণ্ডিতকে এই অভাব দূর করিবার জন্য অগ্রসর হইতে দেখিলে আশা হয়। শুধু গবেষণা নয়, বাংলা ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে যাওয়া সাহসের কাজ। গ্রন্থকার ...। তাই অনেক স্বপ্নের মূলই যে কামজ-ইচ্ছা তাহার সন্ধান ...নি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।

এই কামজ-ইচ্ছা বিশ্লেষণ করিতে করিতে মনোবৈজ্ঞানিক গ্রন্থকার এমন সব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যাহার আভাস পাইয়া সাধারণ লোক শিহরিয়া উঠে, যাহারা অতিরিক্ত পবিত্রতাধর্ম্মী তাহারা কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করে, যাহারা বোধহীন তাহারা রাগে অধীর হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা বলিতেন, স্বপ্ন অমূলক চিন্তা মাত্র। আধুনিক মনোবিদেরা ছাড়িবার পাত্র নন, তাঁহারা অমূলক স্বপ্নের মূল অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া মনের অজ্ঞাত প্রদেশে গিয়া পড়িলেন। দেখিলেন যে বলবান প্রবৃত্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিতে পারিয়াছি বলিয়া সভ্য মানব এত দিন নিশ্চিন্ত ছিল. সেই ভীষণ প্রবৃত্তিগুলিই নির্জ্ঞানের অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া মানুষকে এ শ্রেণীর স্বপ্নে ও কার্য্যে প্রেরিত করিতেছে ।‍ স্বাধীন ইচ্ছার দম্ভ বৃথা। মানুষ প্রবৃত্তির দাস।

গিরীন্দ্রশেখরের মতে স্বপ্নে আমাদের অতৃপ্ত ইচ্ছা কাল্পনিক চরিতার্থতা লাভ করে। এই হিসাবে স্বপ্ন নিরর্থক নহে। লেখক স্বপ্ন-বিশ্লেষণে ফ্রয়েড-প্রবর্ত্তিত অবাধ ভাবানুষঙ্গক্রম (Free Association Method)এর বিবৃতি ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এমন কঠিন জিনিস এমন সরল ভাবে বুঝাইতে পারা অল্প কৃতিত্বের কাজ নহে। এই পদ্ধতি-প্রয়োগে মনের গুপ্ত ভাবগুলি ব্যক্ত হইয়া পড়ে ; সেই আলোকপাতে স্বপ্নের অর্থও পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

লোকে বলে মনের অগোচরে পাপ নাই। মনোবিদেরা প্রমাণ করিতেছেন, আমাদের মনের অগোচরে বহু পাপই অজানা ইচ্ছারূপে লুকাইয়া আছে। মনের সেই রুদ্ধ বা অবদমিত ইচ্ছাই স্বপ্নে কাল্পনিক তৃপ্তিলাভ করে। সামাজিক নৈতিক প্রভৃতি নানা বাধার ভিতর দিয়া ব্যক্ত হয় বলিয়া প্রকাশ-কালে রুদ্ধ ইচ্ছাগুলি রূপান্তর গ্রহণ করে। স্বপ্ন-বিশ্লেষণের দ্বারা সেই ছদ্মবেশ কেমন করিয়া ধরিতে পারা যায়, গ্রন্থকার তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন। এই ছদ্মবেশ, প্রতীক বা symbol পৃথিবীর সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থে এই সকল প্রতীকের অর্থও দেওয়া হইয়াছে।

রুদ্ধ-ইচ্ছার ব্যাখ্যায় ফ্রয়েডের অনুসরণে লেখক কামবৃত্তির যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা পড়িয়া ভাবি মানুষের মনের অজানা প্রদেশে এত পঙ্ক, এত জঞ্জাল জমা হইয়াছিল! তখনই আবার আশ্বাস হয় এই আদি প্রবৃত্তিই ত সেই প্রীতি ভক্তি রূপে প্রকাশিত হইয়া সংসারকে সম্পূর্ণ ও সমাজকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

বিষয়টী কঠিন। না বুঝা বা অর্দ্ধেক বুঝার একটা আনন্দ ও প্রেরণা আছে সত্য কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে বুঝাইয়া দিতে পারিলে আনন্দের মাত্রাটা বাড়িয়া উঠিবে ভাবিয়া লেখক চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।

বইখানি বৈজ্ঞানিক হইলেও উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক। কঠিন বিষয় কত সহজ কত সরল ভাবে বুঝাইতে পারা যায় 'স্বপ্ন' তাহার উদাহরণ। রচনা রীতি প্রাঞ্জল, সুন্দর ও মনোজ্ঞ। কাগজ ভাল ছাপা পরিষ্কার। গ্রন্থশেষে গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তি ও বিষয়ের নির্ঘণ্ট দেওয়ায় পুস্তকের উপাদেয়তা আরও বাড়িয়াছে পুস্তকের পুরোভাগে ফটো হইতে শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন অঙ্কিত ফ্রয়েডের এক খানি সুন্দর পেনসিল চিত্র বইখানির শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে।
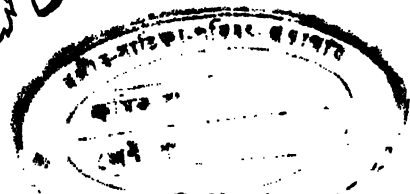
অকবর-মহিষী যোধবাঈ
(প্রাচীন মোগল চিত্র হইতে)

দ্বিতীয় বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৩৬

দুর্গা

[শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম-এ, বি-এল]

ওই শরতের আহ্বান আসে—বর্ণে আলোকে গন্ধে,
জাগ্রত প্রাণ অস্থির আজ অপরূপ তার ছন্দে।
রজনীতে হয় রজত-বৃষ্টি, সূর্য্য-উদয়ে স্বর্ণ,
নিঃশব্দের সঙ্গীত বাজে, শোনে অন্তর-কর্ণ।
নয়নেতে ভাসে নবীন সৃষ্টি—নব রূপ, নব দৃশ্য,
জাগো জাগো আজ রাজার পুত্র, বাহিরে ডাকিছে বিশ্ব !
কুলায়ে কুলায়ে কি কাকলী ওঠে, বনে বনে কোন্ সুর গা,
ওই শরতের আহ্বান আসে, বল দেবী, বল দুর্গা !

শিউলি ও কেয়া কাশফুল আর শ্বেত-পদ্মের সঙ্গে
আকাশের আলো-ঝরণার সুর মিশাইয়া গেছে রঙ্গে।
ভরা-যৌবন তটিনীর নীর নিস্তরঙ্গ, মন্দ
পবনের স্রোত বয়ে আনে দূর পুষ্পবনের গন্ধ।
সন্ধানে তার, ভোমরার দল ফেরে যে কুঞ্জে কুঞ্জে
অবিশ্রান্ত গুণ-গান কার গুন গুন করি গুঞ্জে।
শুধু সেই সুরে মিলিয়ে দে সুর, শরতের এই সু.. গা'
আশ্বিনে আজ আবাহন করি, এস দেবী, এস দুর্গা !

গিরিশচন্দ্রের আগমনী

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

রবীন্দ্রনাথের "গ্রাম্যসাহিত্য" নামক নিবন্ধের একস্থানে আছে,—

"শরৎকালে রাণী বলে বিনয় বচন
আর শুনেছ গিরিরাজ নিশার স্বপন ?"

"এই স্বপ্ন হইতে কথা আরম্ভ। সমস্ত আগমনী গানের এই ভূমিকা। * * * এ স্বপ্ন গিরিরাজ আমাদের পিতামহ এবং প্রপিতামহদের সময় হইতে ললিত, বিভাস এবং রামকেলী রাগিণীতে শুনিয়া আসিতেছেন, কিন্তু প্রত্যেক বৎসরেই তিনি নূতন করিয়া শোনেন।"

রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে উহা লিখিয়াছিলেন, সে সময়ে গিরিরাজের অদৃষ্টে ঐ স্বপ্ন শুনিবার সুযোগ প্রতিবৎসরই ঘটিত কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু এখনও যে 'প্রত্যেক বৎসরই তিনি নূতন করিয়া' তাহা শুনিতে পান, এ কথা কেহ শপথ করিয়া বলিলেও বিশ্বাস করিব না। আগমনী রচনা যে এখন একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, অবশ্য এমন কথাও বলি না। বরং বলিব, আশ্বিন মাস আসিলে আগমনীর ভারে বাঙ্গালা কাগজগুলি কিছু ভারাক্রান্ত হইয়াই পড়ে। এ সময়ে কত কবি ও অকবির রচিত কত আগমনীর কবিতা যে আমরা দেখিতে পাই, তাহা হিসাব করিয়া বলা কঠিন। কিন্তু ঐ দেখিতে পাওয়া পর্য্যন্ত!—চোখের ভিতর দিয়া মনে গিয়া উহারা বড় একটা পৌছায় না। ছন্দের বৈচিত্র্যে এবং শব্দ ও অর্থালঙ্কারের পারিপাট্যে হয়ত এখনকার অনেক আগমনীই সেকালের আগমনী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কিন্তু আসল জিনিসেরই তাহাতে একান্ত অভাব। বাৎসল্য রসের বিকাশ ও ব্যঞ্জনা হিসাবে এখনকার একটি আগমনীও রামপ্রসাদ বা কমলাকান্ত, রামবসু বা দাশরথির আগমনীর সমকক্ষ হওয়া ত দূরের কথা—নিকটস্থও হইতে পারে না। মনে পড়ে, বহুকাল পূর্ব্বে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একবার এসম্বন্ধে যে একটি গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে মেনকার স্বপ্ন-দেখার কথা নাই বটে, তবে মাতৃস্নেহই অভিব্যক্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সেই গানের এই দুই ছত্র—

"সারা বরষ দেখিনে, মা, মা তুই আমার কেমন ধারা
নয়ন-তারা হারিয়ে আমার অন্ধ হল নয়ন তারা ॥"

যখন আমরা পড়ি, তখন মনে হয়, ইহা যেন রাম বসুর রচিত এই দুই ছত্রেরই—

"তারা হারা হোয়ে, নয়নের তারা হারা হোয়ে রই।
সদা কই—উমা কৈ, আমার প্রাণ-উমা কৈ!"

প্রতিধ্বনি শুনিতেছি। দুঃখের বিষয়, এইরূপ প্রতিধ্বনি কিংবা এই প্রতিধ্বনিরও প্রতিধ্বনি এখন আর শুনিতে পাই না। আধুনিক কবিরা মায়ের আগমনবার্ত্তা চাঁদের আলোয়, সূর্য্যের কিরণে, গাছের পাতায়, ফুলের গন্ধে এবং ছুটীর আমোদে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাই নানা ছন্দে প্রচার করেন। কেহই গিরিশচন্দ্রের ন্যায় কন্যাভাবাসক্তির প্রগাঢ়তা ফুটাইয়া বলিতে পারেন না,—

"কুস্বপন দেখেছি গিরি, উমা আমার শ্মশানবাসী।
অসিতবরণা উমা, মুখে অট্ট অট্ট হাসি ॥
এলোকেশী বিবসনা, উমা আমার শবাসনা,
ঘোরাননা ত্রিনয়না, ভালে শোভে বাল-শশী ॥
যোগিনীদল-সঙ্গিনী, ভ্রমিছে সিংহবাহিনী,
হেরিয়া রণ-রঙ্গিণী, মনে বড় ভয় বাসি ॥
উঠ হে উঠ অচল, পরাণ হ'ল বিকল,
ত্বরায় কৈলাসে চল, আন উমা সুধারাশি।"

গিরিরাজ বোধ হয় এই স্বপ্ন-দর্শনের কথা এমন মধুর ও মর্ম্মান্তিক ভাবায় গিরিশের পর আর কোনও কবির নিকট হইতে শুনিতে পান নাই।

সেকালের সমস্ত আগমনী গানেরই যে ঐরূপ স্বপ্ন হইতে কথা আরম্ভ হইত, তাহা নহে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—"ইতিবৃত্তের কোন্ বৎসরে জানি না, হর-গৌরীর

প্রত্যূষে জাগিয়া উঠিয়াছিলেন,সেই প্রথম শরৎ সেই তাহার স্বপ্ন লইয়াই বর্ষে বর্ষে ফিরিয়া আসে।"—কিন্তু শারদীয় সঙ্গীত-সাহিত্যের ইতিবৃত্তে আমরা দেখিতে পাই, রামপ্রসাদ এই সঙ্গীতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেও তাঁহার আগমনীতে স্বপ্ন-দেখার কোনও কথা নাই। রামপ্রসাদের পরই কমলাকান্তের অভ্যুদয়। কমলাকান্তের মেনকাই গিরিরাজকে সর্ব্ব-প্রথম শুনাইয়াছিলেন,—

"কাল স্বপনে শঙ্করী-মুখ হেরি কি আনন্দ আমার।
হিমগিরি হে, জিনি অকলঙ্ক বিধু বদন উমার॥"
ইত্যাদি

শুধু সুস্বপ্ন-দর্শনের আনন্দ নহে, দুঃস্বপ্ন-দর্শনের কাতরতাও কমলাকান্তের এই মেনকারাণীর মুখ দিয়া প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙ্গালার গ্রাম্য ছড়ার মধ্যেও উহার নিদর্শন পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে ছড়ার বয়স কত এবং তাহা রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের গানের পরে জন্মিয়াছিল কি পূর্ব্বে জন্মিয়াছিল, সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কেহ কিছু বলিতে পারেন না। বলিতে পারিলেও আমাদের বক্তব্যের তাহাতে কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি দেখি না। কারণ, আগমনীর গানই আমাদের আলোচনার বিষয়,—আগমনীর ছড়া নহে।

কমলাকান্তের মেনকারাণী দুঃস্বপ্ন দেখিয়া গিরিরাজকে যে গান শুনাইয়াছেন, সে গানের পাশে গিরিশের উপরি-উদ্ধৃত গানটিও অনায়াসে আসন লাভ করিতে পারে। শুধু এই একটি মাত্র গান নহে, গিরিশের আগমনী-বিষয়ক প্রায় সমস্ত গান সম্বন্ধেই ঐ কথা প্রযোজ্য। রামপ্রসাদের মেনকা গিরিরাজকে বলিয়াছিলেন,—

"এবার আমার উমা এলে,
আর উমা পাঠাব না;
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ
কারো কথা শুন্‌ব না।"

গিরিশের মেনকাও মেয়েকে বলিতেছেন,—

"ওমা কেমন করে পরের ঘরে,
ছিলি উমা, বল মা তাই।
কতলোকে, কত বলে, শুনে ভেবে মরে যাই॥
মা'র প্রাণে কি ধৈর্য্য ধরে,
জামাই নাকি ভিক্ষা করে,
এবার নিতে এলে বলবো হরে,
উমা আমার ঘরে নাই।"

ইহা রামপ্রসাদের নামের চর্ব্বিত চর্ব্বণ বা প্রতিধ্বনি নহে; অথচ হঠাৎ ইহা শুনিলে মনে হয়, যেন রাম-প্রসাদেরই নাম শুনিতেছি। খাঁটি বাঙ্গালীর এই খাঁটি বাঙ্গলা সুর রামপ্রসাদ হইতে আরম্ভ হইয়া দাশরথি পর্য্যন্ত পুরা দমে পৌছিয়াছিল। তার পর রঙ্গলাল ও মধুসূদনের সময় হইতে নূতন সুরের সূচনা। এই নূতন সুরের যুগে খাঁটি পুরাতন সুরে ঠিক সুর মিলাইয়া যাঁহারা আগমনী ও বিজয়ার গান গাহিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মনোমোহন, হরিশ্চন্দ্র ও গিরিশচন্দ্রের আগমনী অতুল্য ও অপরাজেয় বলিয়া মনে হয়। ৺পূজার সময় দানবীর কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় গিরিশচন্দ্রকে দিয়া আগমনীর গান লিখাইয়া লইতেন, এবং সেই গান গায়কের দ্বারা পূজার কয়টা দিন নিজের বাড়ীতে গাওয়াইতেন। শুনিতে পাই, তিনি নাকি বলিতেন যে, গিরিশ ঘোষের আগমনী সেকালের প্রাচীন ছাঁচের আগ-মনীর সর্ব্বশেষ আহুতি। একথা যদি তিনি বলিয়া থাকেন, তবে মিথ্যা বলেন নাই। তাঁহার বাটীতে গিরিশের এই যে গান গীত হইয়াছিল—

"এসেছিস্ মা থাক্ না উমা দিন কত।
হয়েছিস্ ডাগর-ডোগর কিসের এখন ভয় এত॥
বলিস্ যদি আনি মা জামাই,
সকালে লোক কৈলাসে পাঠাই,
সবাই মিলে করবো যতন,
যোগাব তার মন মত॥
ছল-কপটতা নাইক' তার মনে,
যে ডাকে, সে ফেরে তার সনে—
মান-অভিমান তার মনে নাই,
কুচুটে তো তুই যত॥
এখন বুঝি ঘর চিনেছিস, তাই হয়েছিস্ পর;
কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দিতিস, নিতে এলে হর,
সঁপে দিছি পরের হাতে,
জোর আমার তো নাই তত॥"

বাস্তবিক, ইহার তুলনা নাই। ইহাতে যেন বাঙ্গালী ঘরের প্রত্যেক জননী-হৃদয়ের বেদনাপূর্ণ অভিমানোচ্ছ্বাস

উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। এ গান গিরিশের 'আগমনী' নামে গীতি-নাট্যে নাই, থিয়েটারে এ গান শুনিতে পাওয়া যায় না, তবু ইহা ভিখারীর মুখে নামিয়াছে—সুদূর পল্লীগ্রামেও ইহা গীত হইতে শুনা যায়। ইহার কারণ কি? কারণ হইতেছে, বাঙ্গালা দেশে এবং বাঙ্গালী সমাজে এখনও যে সুর বাঁধা আছে, সেই সুরেই গিরিশের শুধু এই গান নহে—সকল গানই বাঁধা। গিরিশের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার গান হইতে সে সুরও লোপ পাইয়াছে।

যাস্‌নে—ওরে যাস্‌নে

(চিত্র)

[রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর]

আমাদের গ্রামের নাম সোহাগপুর। এমন কবিত্বপূর্ণ নাম কে রেখেছিলেন এবং কেনই বা রেখেছিলেন, তা অনেক অনুসন্ধান করেও জানতে পারিনি।

আমাদের এই গ্রামের যাঁরা অধিবাসী, তাঁদের প্রায় সকলের অবস্থাই এক রকম—কোন প্রকারে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। ওরই মধ্যে ইদানীং আমাদের অবস্থাই একটু ভাল। আমার দাদা মহেন্দ্রনগরের জমিদার উপেন্দ্র মোহন রায় মহাশয়ের সোহাগপুর কাছারীর নায়েব। গ্রামে বাস করেই তাঁকে চাকুরী করতে হয়; আর সেও যেমন তেমন চাকুরী নয়—একেবারে নায়েবী। সোহাগপুর মহালের আদায়ও কম নয়—প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা।

দাদা এই সোহাগপুরের জমিদারী কাছারীতে প্রথমে আট টাকা বেতনে মুহুরীর কাজে নিযুক্ত হন। বাবা হঠাৎ মারা যাওয়ায় এবং সামান্য জোত-জমা ব্যতীত আর কিছু রেখে না যাওয়ায়, দাদাকে ষোল বছর বয়সের সময়ই এই জমিদারী কাছারীতে প্রবেশ করতে হয়—সেও হ'ল প্রায় আজ আঠারো বৎসর।

সেই আট টাকা বেতনের মুহুরীগিরি থেকে ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করে', আমি যখনকার কথা বলছি তখন, তিনি ত্রিশ টাকা বেতনের নায়েব।

বেতন ত্রিশ টাকা হ'লে কি হয়? জমিদারী সেরেস্তায় বিনা বেতনে চাকরী ক'রেও অনেকের অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়েছে, তাঁরা লক্ষ্মীর কৃপা লাভ করেছেন, এমন দৃষ্টান্ত অনেক দিতে পারি; আমার দাদ[illegible]। ত্রিশ [illegible] পান।

জমীদারের সেরেস্তার [illegible] নিম্নপদ থেকে যিনি [illegible] পদে উন্নীত হন, তিনি যে বাহাদুর [illegible], সন্দেহ করবার অবকাশ নেই; সুতরাং আমার দাদা [illegible], বলে, কৌশলে যথেষ্ট উপার্জ্জন করেছিলেন এবং তার জন্য প্রজার উপর যথাতিরিক্ত জুলুম-অত্যাচার করেছিলেন, এ কথা না বল্‌লেও চলে। এই শ্রেণীর লোকেরই জমীদারী চাকুরীতে উন্নতি হয়; দাদারও তাই হয়েছিল।

একে যথেষ্ট উপার্জ্জন, তার পর মহালের নায়েবীপদ; সুতরাং অপ্র[illegible]ত প্রভাব। এ প্রভাব আরও বেড়েছিল কেন, তা জানেন? সোহাগপুর মহাল যে রূপগঞ্জের থানার অন্তর্গত, সেই থানায় যখনই যিনি দারোগা হয়ে এসেছেন, তাঁকেই দাদা বশ ক'রে ফেলেন। শুধু দারোগা নয়, থানার টিকটিকিটি পর্য্যন্ত দাদার হাতের মধ্যে এসে পড়েন। দাদা হয় যাদুমন্ত্র জানেন, আর না হয়, তাহা অপেক্ষাও অমোঘ কোন মন্ত্র জানেন। সুতরাং দাদা যে আমাদের গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তি, সে কথা বুঝ্‌তে কারও কষ্ট হয় না।

এইবার একটা ভ্রম সংশোধন করা দরকার বোধ করছি। গোড়াতেই এক জায়গায় বলেছি, গ্রামের মধ্যে 'আমাদেরই' অবস্থা আর সকলের চাইতে ভাল। এই 'আমাদের' শব্দটা ব্যবহার করা ঠিক হয় নাই; বলা উচিত

ছিল ... র অবস্থা ভাল। একই পিতার সন্তান হ'লেও, একই মাতার স্নেহে লালিত-পালিত হ'লেও, দাদার এক-মাত্র কনিষ্ঠ সহোদর হ'লেও এখন দাদা আমাদের পর্য্যায়-ভুক্ত নন। তিনি সোহাগপুরের প্রবল প্রতাপান্বিত নায়েব মহাশয়, মহালের প্রজাদিগের দণ্ডমুণ্ডের মালিক; আর আমি? আমি সোহাগপুর উচ্চ-প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক। এখন ঐ সাধুজন-সম্মত নাম ধারণ ক'রে কৃতার্থ হয়েছি; কিন্‌... আগে হ'লে লোকে বল্‌ত, আমি পাঠশালার গুরু ... দাদার ছোট ভাই ব'লে পরিচয় দেবার যোগ্যতা আমার কৈ? আমি কি তাঁর মত, গরীব প্রজার ...কেড়ে নিয়ে তাকে পথের ভিখারী কর্‌তে ... আমি কি তাঁর ... নানা উপায়ে কোন দুই ...মলা ক... দিয়ে উভয় পক্ষের নিকট থেকে শেষে উভয়কেই সর্ব্বস্বান্ত করবার ...খেছি? আমি কি তাঁর মত প্রজার কাছ থেকে ... খাদায় করে দাখিলা না দিয়ে শেষে ...নার নালিশ করে প্রজা উচ্ছেদ কর্‌তে শিখেছি? এ শ্রেণীর কোন বিদ্যাই যখন আমার শিক্ষা হয় নাই, তখন সোহাগপুরের নায়েব সাতকড়ি দত্তের ছোট ভাই ব'লে পরিচয় দেব কি করে? আর গ্রামের মধ্যে 'আমরাই' অবস্থাপন্ন বলে জাহির করব কি করে? আমি যদি বল্‌তে পারতাম আমি সুরেশ দত্তের কনিষ্ঠ সহোদর নই, তা হ'লে আমার মনে শান্তি আস্‌ত. আরও এক প্রতিবন্ধক আমার এসে জুটেছে। তারই জন্যই ত আমি দেশ ছেড়ে দাদার আশ্রয় ছেড়ে যেতে পারি নাই; নইলে মাইনার পরীক্ষা ত পাশ করেছিলাম; কোথাও কি আমার অন্নসংস্থান হ'ত না? একটা পেট ভরাবার মত উপার্জ্জন কি আমি কোনখানে গিয়ে করতে পারতাম না? এত-দিন তা পারি নাই কেন, বল্‌ছি।

আমার প্রতিবন্ধক বৌ-দিদি। আমার বয়স যখন আট বৎসর, তখন আমার মা মারা যান। দাদার বয়স আমার চাইতে চোদ্দ বৎসর বেশী। বাবা যে বছর মারা যান, সেই বছরেই তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে দাদার বিবাহ দেন। সেই যে বৌ-দিদি দাদার সংসারে এসেছেন তারপর কোন দিন তিনি বাপের বাড়ী যান নাই—তাঁর বিবাহের অব্যবহিত পরেই তাঁর পিতৃবংশ একেবারে নির্ম্মূল হয়ে যায়। তিনি আমাদের বাড়ী এসেই সেই যে আমাকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন, আজ আমার এই কুড়ি বৎসর বয়সেও, বল্‌তে গেলে তিনি আমাকে তাঁর কোল থেকে নামান নাই, আমি এখনও তাঁর স্নেহাঞ্চলের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাদার নিষ্ঠুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করি। আমার জন্য বৌ-দিদির কি কম লাঞ্ছনা ভোগ কর্‌তে হয়েছে এবং এখনও হচ্চে। দাদাকে বৌ-দিদি যমের মত ভয় করেন; কোন দিন তিনি দাদার কথার উপর কথা বল্‌তে সাহস করেন না। আমার বেশ মনে আছে, আমি যখন মাইনর পাশ কর্‌লাম—সেই আর কবে, এই তিন বছর আগে—তখন বৌ-দিদি আমাকে আরও পড়াবার জন্য এক দিন আমারই সম্মুখে দাদাকে বলেছিলেন। দাদা তখন যে রকম রেগে উঠে বৌ-দিদিকে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ভৎ'সনা করেছিলেন সে কথা এখনও আমার মনে আছে। নইলে আমি কি এমন করে পাঠশালার গুরুমশাই-গিরি করি। এ শুধু বৌ-দিদির মায়ায় বদ্ধ হয়ে আমাকে কর্‌তে হচ্চে। আমি যে তাঁকে এমন অসহায়া অবস্থায় ফেলে যেতে পারিনে। তাঁর সন্তান হয় নাই; তাঁর মাতৃ স্নেহ আমারই উপর পড়েছে। তিনি মাতৃত্বের ক্ষুধা আমাকে দিয়ে পূরণ করেন। তাঁর যদি ছেলে মেয়ে থাকৃত, তা হ'লে বোধ হয় তিনি আমাকে এত ভালবাসতে পার্‌তেন না, এমন ক'রে আমাকে বেঁধে ফেলতে পারতেন না। আমিও তা হ'লে তাঁর এই স্নেহের বন্ধন হয় ত কাটতে পারতাম। সে সব কিছুই যে পারিনে। প্রতিদিন দাদার কত অত্যাচারের কথা শুনি। কতদিন ইচ্ছা হয়েছে, তাঁকে দশ কথা শুনিয়ে দিয়ে তাঁর আশ্রয় ত্যাগ করে চ'লে যাই। কিন্তু, তখনই বৌ-দিদির অসহায় অবস্থার কথা মনে আসে, তাঁর মলিন মুখ আমার চক্ষের সম্মুখে ভেসে ওঠে। দাদা যে আমার বৌ-দিদির স্বামী! আমার সহোদর বড় ভাইয়ের অনাচার-অত্যাচার আমি হয় ত সহ্য করতে পারতাম না; কিন্তু আমার স্নেহময়ী করুণারূপিণী, মাতৃসমা বৌ-দিদির স্বামী ব'লেই আমি দাদার বিরুদ্ধে কখনও দাঁড়াতে পারি নাই, তাঁর অন্যায় অত্যাচারে উপার্জ্জিত অন্ন আমাকে গ্রহণ ক'রতে হ'য়েছে। ভগবানের নামে শপথ ক'রে বল্‌তে পারি, দাদার

উপার্জ্জনের অন্ন গ্রহণ ক'রতে আমার মনুষ্যত্ব অনেক সময় মাথা নাড়া দিয়ে উঠতে চাইত। কিন্তু ঐ আমার বৌ-দিদি!

এত দিন সহ্য করেছি—এতদিন বৌ-দিদির স্নেহ আমাকে বেঁধে রেখেছিল। কিন্তু সকলেরই সীমা আছে; আমার মত দুর্ব্বল মানুষেরও সহিষ্ণুতা তাই সে দিন সীমা অতিক্রম করেছিল। সেই দিন থেকে আমি দাদার আশ্রয় ত্যাগ করেছি, বৌ-দিদির স্নেহের বন্ধন আমি ছিন্ন করেছি। আজ আমি পথের ফকির!

কেন এমন হ'ল, সেই কথাটা বল্‌তে চাই।

মাস পাঁচ-ছয় আগে, আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী হরিপুর গ্রামের হরিহর চক্রবর্ত্তী দাদার কাছে হাণ্ডনোট দিয়ে দেড় হাজার টাকা ধার করেন। হরিহর বাবুর অবস্থা ভাল। দেশে জোত-জমাও বেশ আছে। পশ্চিমে কানপুরে তিনি বড় চাকুরী করেন। তাঁর ভগিনীর বিবাহ দেবার জন্য দেশে আসেন। বাড়ী এসে তাঁর কিছু টাকার অভাব পড়ে। তিনি দাদাকে বলেন, তাঁর প্রায় দেড় হাজার টাকা অন্য একজনের কাছে পাওনা আছে। সে ভদ্রলোক টাকাটা দুই তিন মাস পরে দিতে পারবেন। এদিকে তাঁর ভগিনীর বিবাহ না দিলেই নয়। তাই তিনি দাদার কাছে টাকা ধার করতে এসেছিলেন। হরিহর বাবুর সঙ্গে দাদার বিশেষ পরিচয় ছিল; তাঁর অবস্থার কথাও দাদা জান্‌তেন। সেই জন্য কোন কিছু মটগেজ না রেখে হাণ্ডনোট্‌ নিয়েই দাদা দেড় হাজার টাকা দেন। হরিহরবাবু প্রতিশ্রুত হ'য়ে যান যে, তাঁর বন্ধুর কাছে যে টাকা আছে, তা পাবা মাত্রই তিনি নিজে এসে ধার শোধ করে যাবেন। মাস তিনেক পরে আফিসের কাজ উপলক্ষে তাঁকে কলিকাতায় আস্‌তেই হবে। সেই সময় একটু সময় ক'রে তিনি দেশে আস্‌বেন।

হরিহরবাবুর দেশে আস্‌তে একটু বিলম্ব হ'য়েছিল। তারও কারণ ছিল। যে ভগিনীটীর বিবাহের জন্য তিনি দাদার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিলেন সেই হত-ভাগিনী বিবাহের দুই মাস পরেই বিধবা হন। বাড়ীতে এলেই তার বিধবার বেশ, তার মলিন মুখ দেখ্‌তে হ'বে, এই ভয়ে তিনি বিলম্ব কর্‌ছিলেন এবং সে কথা দাদাকেও লিখেছিলেন। দাদা তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, সামান্য বিলম্বের জন্য তিনি যেন ব্যস্ত না হন। এই উপলক্ষে দাদা এক দিন হরিপুরে হরিহরবাবুর বাড়ীতেও গিয়েছিলেন এবং হরিহর বাবুর বৃদ্ধা মাতা ও সদ্যবিধবা ভগিনীকে ডেকে, টাকার জন্য তাঁদের ব্যস্ত হ'তে হবে না, এ আশ্বাস দিয়ে এসেছিলেন। এইখানে একটী কথা বল্‌তে হচ্চে। হরিহর বাবু তখনও বিবাহ করেন নাই। একমাত্র ভগিনীর বিবাহ শেষ করে তার পর বিবাহ করতে হয়, করবেন, এই মত তিনি প্রকাশ করেছিলেন; সুতরাং সংসারে বৃদ্ধা মাতা ও সদ্যবিধবা যুবতী ভগিনী ব্যতীত তাঁহার আর কেহই ছিল না।

প্রায় মাস তিনেক পরে হরিহরবাবু এক দিন প্রাতঃকালে আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হ'লেন। দাদা সে সময় বাড়ীতে ছিলেন না; মহলে গিয়েছিলেন; সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাঁর বাড়ী ফিরবার কথা ছিল।

হরিহর বাবু দাদা অনুপস্থিত দেখে আমাকে ডেকে বল্‌লেন, "দেখ রমেশ, সুরেশদা ত বাড়ীতে নেই। আমি তাঁর টাকা শোধ করতে এসেছি। তুমি যদি হাণ্ডনোট-খানা বে'র করে দিতে পার, তা হ'লে তোমার কাছেই দেড় হাজার টাকা রেখে যাই; সুরেশদা এলে দিও।"

আমি বল্‌লাম "দাদা ত দরকারী কাগজপত্র বাইরে রাখেন না; সব তাঁর সিন্দুকে বন্ধ থাকে; চাবীও তাঁর কাছেই থাকে। এ অবস্থায় আমি টাকা রাখি কি করে? বিশেস, আমি ও-সব টাকাকড়ির হাঙ্গামার মধ্যে যেতে চাইনে। দাদা বিকেল বেলায় ফিরে আস্‌বেন; আপনি সন্ধ্যার সময় এসে তাঁর হাতেই টাকা দিয়ে আপনার হাণ্ডনোট ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।"

হরিহর বাবু বল্‌লেন "তাই ত হে, বড় মুস্কিলে পড়্‌লাম। আজ রাত্রি আটটার সময়ই যে আমাকে কলিকাতায় ফিরে যেতে হ'বে, নইলে কোম্পানীর প্রায় পনর হাজার টাকার ক্ষতি হবে। তা, এক কাজ কর না রমেশ, টাকাগুলো তুমি রেখে দাও, সুরেশদা এলে দিও। তিনি যেন হাণ্ডনোটখানা আমাকে কানপুরে পাঠিয়ে দেন বা বাড়ীতে মায়ের কাছে দেন, তা হ'লেই হবে।

আমি বল্‌লাম "আপনাকে ত এই পথেই ষ্টেসনে যেতে

হবে। সেই সময় এসে দাদার হাতেই টাকা দিয়ে যাবেন ; আমি আর ও-ঝুঁকি ঘাড়ে করব না।"

হরিহর বাবু কি করেন, আমার প্রস্তাবেই সম্মত হ'য়ে বাড়ী চ'লে গেলেন।

দাদা সেই দিনই সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে এলেন। হরিহর বাবু যখন আস্‌চেন ব'লে গিয়েছেন, তখন তাঁর প্রাতঃকালে আসার কথা আমি আর দাদাকে জানালাম না।

ঠিক সন্ধ্যার পরই হরিহর বাবু এলেন। তখন অন্ধকার হ'য়ে গিয়েছে। দাদা একেলা বাইরের ঘরে ব'সে কি সব কাগজপত্র নাড়াচাড়া করছিলেন। আমি বারান্দায় একখানা বেঞ্চের উপর ব'সে ছিলাম। হরিহর বাবু সেই অন্ধকারে আমাকে দেখ্‌তে পেলেন না ; আমি যে বাইরে ব'সে আছি, দাদাও তা জান্‌তে পারেন নাই।

হরিহর বাবু ঘরের মধ্যে গিয়ে আর বস্‌লেন না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের করে দাদাকে দিয়ে বল্‌লেন, "সুরেশদা, সকালে এসে ফিরে গিয়েছি। তুমি নোটগুলো গুণে নাও। আমি আর অপেক্ষা কর্‌তে পারছিনে, এখনই না বেরুলে ট্রেণ ধরতে পারব না। হ্যাণ্ডনোটখানা বের করে দাও।"

দাদা তাড়াতাড়ি নোটগুলো গণতে গণতে বল্‌লেন, "তাই ত হরিহর ভায়া, সে হ্যাণ্ডনোট ত বাড়ীতে নেই ; কাছারীর লোহার সিন্দুকে রয়েছে। তাই ত, কি করা যায় বল ত ?"

হরিহর বাবু বল্‌লেন, "আরে সুরেশদা, তোমাকে আমার অবিশ্বাস নেই। বড় বিপদের সময় সাহায্য করেছিলে। আমার অদৃষ্ট মন্দ, আমার বোনটীর দিকে চাইলে বুক ফেটে যায়। যাক্‌, আমি আর দাঁড়াতে পারছিনে। তুমি সুবিধামত হ্যাণ্ডনোটখানা আমাকেই পাঠিয়ে দিও, আর না হয় আমার মায়ের কাছে দিয়ে এস। তা হ'লে আমি এখন আসি। নোটগুলো গণে দেখ্‌লে ত, ঠিক আছে।"

দাদা হেসে বল্‌লেন, "ঠিক আছে ভায়া! আর দেরী কোরো না, কানপুরে পৌছে পত্র লিখ্‌লেই হ্যাণ্ডনোটখানা তোমাকেই পাঠিয়ে দেব।"

"বেশ, তাই হবে" ব'লে হরিহর বাবু বেরিয়ে গেলেন। আমি বাইরে অন্ধকারে ব'সে সবই শুন্‌তে পেলাম। জানালার ফাঁক দিয়ে দেখ্‌লাম, দাদা আর একবার নোটগুলো গণে দেখ্‌ছেন।

এই ঘটনার পাঁচ দিন পরেই শুন্‌তে পেলাম, হরিহর বাবু যে দিন বাড়ী থেকে যাত্রা করেছিলেন, তার পরদিনই কলিকাতায় গিয়ে তিনি কলেরায় আক্রান্ত হন এবং সেই-দিনই অপরাহ্নকালে এক বন্ধুগৃহে তাঁর মৃত্যু হয়। সংবাদটা শুনে মনে বড় কষ্ট হ'ল।

হরিহরবাবুর মৃত্যুর বোধ হয় পনর দিন পরে একদিন বিকেল বেলায় একখানি গো-যান এসে আমাদের বাইরের উঠানে দাঁড়াল। আমি তখন বৈঠকখানার পাশের ঘরে একেলা ব'সে ছিলাম ; দাদা বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে বসে-ছিলেন। দাদা টেরও পান নাই যে, আমি পাশের ঘরে রয়েছি।

গো-যান থেকে নামলেন একটী বৃদ্ধা, আর একটী যুবতী। তাঁদের দুইজনকে দেখেই আমি বুঝলাম, তাঁরা বিধবা। দাদার কাছে দরকারী কাজ উপলক্ষে অনেক লোক আসে, অনেক স্ত্রীলোকও দরবার কর্‌তে আসেন ; সুতরাং, এঁদের দুজনকে বৈঠকখানায় প্রবেশ কর্‌তে দেখে আমার মনে কোন সন্দেহেরই উদ্রেক হ'ল না। তবুও, কি জানি কেন, তাঁরা কি প্রয়োজনে দাদার কাছে এসেছেন, তা জানবার জন্য আমার একটু ঔৎসুক্য হ'ল। আমি যেখানে ব'সে ছিলাম, সেখান থেকে উঠে, বৈঠক-খানার দিকে যে বন্ধ জানালা ছিল, তা অল্প একটু খুলে আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বৃদ্ধাই প্রথমে বল্‌লেন, 'বাবা সুরেশ সেদিন যখন আমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলে, তখনই বলেছি, হরিহর এখান থেকে যাবার দিন তোমাকে দেবার জন্য টাকা নিয়ে বেরিয়েছিল। তুমি সেদিন ব'লে এলে, টাকা তুমি পাও নাই, খতখানাও দেখিয়ে এলে। তোমায় সেদিনও বলেছি, আজও বল্‌বার জন্য এই অনাথা মেয়েটীকে সঙ্গে নিয়ে তোমাকে মিনতি ক'রে বল্‌তে এসেছি, আমাদের যা কিছু আছে, সে সব বেচে নিলে তোমার ধার শোধ হ'তে পারবে ; কিন্তু এই বিধবা মেয়েটীকে নিয়ে এই বৃদ্ধ বয়সে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াব বাবা, তাই তুমি বল

আমরা ত জানতাম তোমার টাকা হরিহর দিয়ে গিয়েছে।”

দাদা অসঙ্কুচিত-চিত্তে, অম্লানবদনে বল্‌লেন, “টাকা দিলে কি হরিহর হ্যাণ্ড নোট রেখে যেত; আর আমি কি এমনই জোচ্চোর যে, টাকা পেয়েও বল্‌ছি, পাইনি। আমার নিজের টাকা নয়, মনিবের তহবিলের টাকা; এ টাকা আমাকে পূরণ করে দিতেই হবে। কাজেই আমার নালিশ করে আপনাদের জোত-জমা বিক্রয় করে টাকা আদায় করা ছাড়া আর ত কোন উপায় নেই। আমি কি করব বলুন।” হায় আকাশের বজ্র! তুমি কি তখন ঘুমিয়ে ছিলে? এই পরস্বাপহারী দস্যুর মাথায় এসে পড়তে পারলে না। আমার পা দুখানি তখন কাঁপছিল। একবার মনে হচ্ছিল, দৌড়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে বলি, জোচ্চোর, তুমি যে টাকা পেয়েছ, তার সাক্ষী আমি।” কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল, আমার সাক্ষী কে? আমার কথায় কে বিশ্বাস করবে? তাই, আত্মসংবরণ করে আরও কি হয় দেখবার-শোনবার জন্য অতি কষ্টে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দাদা একটু চুপ করে থেকে, ছোট এক টুকরা কাগজে কি লিখে সেই যুবতীর হাতে দিলেন। মেয়েটী কাগজখানি প'ড়ে দৃপ্তা সিংহীর মত লাফিয়ে উঠে বল্‌ল, “লাথি মারি তোর দয়ায়। ওঠ মা, চল। তুই যা পারিস্ করিস্, সব বেচে নিস; বুড়ো মায়ের হাত ধরে পথে পথে ভিক্ষে করে খাব। কি বল্‌ব, দাদা বেঁচে নেই, নইলে তোর আজ রক্ষা থাকত না। রাখিস্ সুরেশ দত্ত, মাথার উপর একজন আছে।” এই বলে বৃদ্ধাকে টেনে নিয়ে রাগে ফুল্‌তে ফুল্‌তে যুবতী বের হয়ে গেল। আমি মাথায় হাত দিয়ে সেই খানে বসে পড়লাম, আমার বাক্‌শক্তি, বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল।

একটু পরেই সংজ্ঞা লাভ করে, যে অবস্থায় ছিলাম, সেই এক বস্ত্রেই আমি দাদার গৃহ ত্যাগ করলাম। আজ তিন দিন পথে পথে ভিক্ষা করে খেয়ে আমি সোহাগপুর থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি। এখন আমি পথের ফকির! সব ছেড়ে এসেছি—কিন্তু,—কিন্তু—আমার কাণে সেই স্নেহময়ী, মাতৃসমা বৌ-দিদির ক্রন্দন-ধ্বনি এসে পড়ছে—“ওরে যাস্‌নে, যাস্‌নে।”

শারদ-লক্ষ্মী

[শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ]

আবার সেই শুভ শরৎকালের (১) আবির্ভাব। এখন দক্ষিণায়ন, দেবতার অকাল (২)। এ সময় তাঁহারা নিদ্রিত থাকেন। উত্তরায়ণ না হইলে তাঁহারা তো জাগরিত হ'ন না। অকালে দেবতাদিগের নিদ্রা। কাজেই মহামায়া শ্রীদুর্গাকে জাগাইতে হইবে। সেই জন্য বুঝি বোধনের ব্যবস্থা হইয়াছে। শারদীয়া পূজায় শুধু আমন্ত্রণ (৩) ও অধিবাস করিলেই চলিবে না—বোধন করিতে হইবে। তাই মা'র পূজায় বিশেষ ও প্রধান অঙ্গ ‘বোধন’।

মহিষাসুর বধ করিতে হইবে বলিয়া মহামায়া দশভুজা রূপ ধরিয়া এই আশ্বিন মাসে কাত্যায়নের আশ্রমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আবার এই আশ্বিনে একই মূর্ত্তিতে

১। দুর্গাপূজা শারাদীয়া পূজা। শরৎসমাগমে এই মহাপূজার অনুষ্ঠান। আজকাল কিন্তু শরৎ বলিলে ভাদ্র-আশ্বিন বুঝায়; পূর্ব্বে বুঝাইত আশ্বিন ও কার্ত্তিক।

২। অকাল বলিলে আমরা বুঝি কি? সৌরবর্ষের মকর-সংক্রান্তি হইতে ছয় মাস:অর্থাৎ শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত দক্ষিণায়ন শাস্ত্রের বিধি। অনুসারে এক অয়নে দেবতারা জাগ্রত থাকেন, অপর অয়নে নিদ্রিত। যখন তাঁহারা জাগ্রত তখন ‘কাল’, যখন নিদ্রিত তখন ‘অকাল’। উত্তরায়ণে দেবতারা জাগ্রত এবং দক্ষিণায়নে তাঁহারা নিদ্রিত। তাই উত্তরায়ণে ‘বাসন্তী’ কালের পূজা, আর দক্ষিণায়নে দুর্গা অকালের পূজা। আর অকালের পূজা বলিয়া পূজার এত আদর।

(৩) ষষ্ঠীতে সায়ংকালে “বিল্ববৃক্ষমূলে” “আমন্ত্রণ” ও প্রতিমার ‘অধিবাস’ করিয়া রাখিতে হয়, পরদিন সপ্তমীতে আমন্ত্রিত বিল্বশাখা কাটিয়া মহাবিধানে পূজা করিতে হয়।

বিন্ধ্যাচলে আবির্ভূতা হইয়া ঘোরাসুর বধ করিয়াছিলেন। কৈলাস, বিন্ধ্যাচল, হিমাচলে, দশভুজা মূর্ত্তিতে দেবীর নিত্য অবস্থান। আজ ভক্তমণ্ডলী তাঁহাকে স্বস্থান হইতে মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইবার জন্য যথারীতি আবাহন করিতেছেন। দেবী-দুর্গা প্রসন্না হউন।

শক্তিরূপিণী দেবী দুর্গার লীলার মধ্যে প্রসিদ্ধ লীলা তাঁহার অসুর-দমন। অসুরদলনই মার্কেণ্ডেয়-পুরাণের

দক্ষিণ-ভারতে দুর্গা—খৃষ্টীয় সপ্তম শতক

["রস" (Ross)—সংগ্রহ]

অন্তর্গত দেবীমহাত্ম্যের বিষয়। দুর্গাপূজকদের এখানি বিশেষ শাস্ত্র। এই গ্রন্থমতে দুর্গা সমগ্র দেবতাদের সমষ্টী-ভূত শক্তি হইতে চণ্ডিকা নামে আবির্ভূত হন। তাঁহারা তাঁহাকে ক্রোধে মহিষাসুরের উপর ফেলেন। দেবী সমস্ত অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন। তার পর চণ্ডিকা ও মহিষাসুরের একা-একা যুদ্ধ। শেষে দেবী মহিষাসুরের মাথার উপর দাঁড়াইয়া তার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। তখন এই অসুর মহিষের আকার ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার কাঁধের ভিতর দিয়া অসুর বাহির হইল। দেবী তাহাকেও বিনাশ করিলেন। আমাদের প্রতিমায় দেবীর এই মূর্ত্তিই আছে। ছবিতেও এই মূর্ত্তি। কাব্যেও এই মূর্ত্তি। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের মহাকবি বাণ এই দৃশ্যই তাঁর চণ্ডীশতকের প্রত্যেক শ্লোকেই বর্ণনা করিয়াছেন। মহিষাসুর-বধ ছাড়াও দেবী-মাহাত্ম্যে শুম্ভ ও নিশুম্ভ-বধের কথা আছে।

দুর্গা—খৃষ্টীয় নবম শতক

[Pasupati Kovil (A. S. I)]

এই দুই অসুর দেবতাদের তাড়াইয়া ত্রিলোক কাড়িয়া লইয়াছিল। দেবতারা পার্ব্বতীর সাহায্য চাহিলেন। তিনি তখন গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিলেন। তাঁর শরীর হইতে আর এক দেবী বাহির হইলেন। নাম অম্বিকা বা চণ্ডিকা। শুম্ভ-নিশুম্ভের দুই সহচর ভৃত্য চণ্ড ও মুণ্ড; তারা তাঁহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ। তাহাদের পরামর্শে শুম্ভ এই সংবাদ দিয়া দূত পাঠাইল যে, সে তাহাকে বিবাহ করিতে চায়। দেবী রাজী হইলেন।

কড়ার করিলেন যে, তাঁহাকে যুদ্ধে হারাইতে হইবে। এই শুনিয়া শুম্ভ অনেক অসুর লইয়া তাঁহাকে পাকড়াও করিবার জন্য ধূম্রলোচনকে পাঠাইলেন। তিনি তো সকলকে বধ করিয়া ফেলিলেন। চণ্ড-মুণ্ডের পালা এই-বার। তারাও বহু সেনা লইয়া গেল। অম্বিকা তাহা-দের দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। রাগের চোটে

দুর্গা-মহিষমর্দ্দিনী, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক, সিঙ্গসরী—যবদ্বীপ

['রস'-সংগ্রহ]

কপাল দিয়া আর এক দেবী বাহির হইলেন। ইনি হই-লেন, কালী—শীর্ণদেহা, ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিহিতা, নরমুণ্ডহারা। তাঁর প্রচণ্ড মুখের ভিতর দিয়া জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহার সঙ্গে খুব যুদ্ধ বাধিয়া গেল। দেবী মুণ্ডকে মারিয়া ফেলিলেন। তাহাতে নাম হইল তাঁর চামুণ্ডা। এ নাম ইহার আগে আর কোথাও পাওয়া যায় না। পরে মালতী-মাধবে আছে। এইবার শুম্ভ বিপুল বাহিনী লইয়া অম্বিকার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিলেন। দেবতারা সব দেহ-ধারণ করিয়া অম্বিকার দিকে যুদ্ধ করিতেছিলেন। অসুরদের ভিতর ছিল রক্তবীজ। মাটিতে তার রক্ত পড়িলেই আর রক্ষা নাই—অমনই আর একজন জন্মিবেন। যুদ্ধ চলিল। এদিকে রক্তবীজের রক্তে অসংখ্য অসুর উৎপন্ন হইতে লাগিল। চণ্ডিকার তখন আদেশ হইল—চামুণ্ডা, রক্তবীজের রক্ত মাটিতে পড়িবার আগে খাইয়া ফেল। শেষে রক্ত শূন্য করিয়া ক্লান্ত অসুরকে মারিয়া ফেলিলেন। অতঃপর দেবীর সিংহ অসুরদের মধ্যে মহাত্রাসের উৎপাদন করায় নিশুম্ভ দেবীকে আক্রমণ করিল। তুমুল সমর হইল। শুম্ভ পপাত মমার চ। শুম্ভকে দেবী নিহত করিলেন। এই এক আখ্যায়িকা।

দুর্গার আর এক মূর্ত্তি আছে। সে মূর্ত্তি যোগনিদ্রা বা নিদ্রাকালরূপিণী। হরিবংশে (৩২।৩৬) বৈশম্পায়ন বলেন,—দেবকীর পুত্র-নাশে কংসের মতলব নষ্ট করিবার জন্য বিষ্ণু পাতালে যান। সেখানে তিনি নিদ্রাকাল-রূপিণীর সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং বলেন, সহায়তা করিলে তিনি তাঁকে সারা দুনিয়ায় জাহির করিয়া দিবেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি যশোদার নবম-সন্তানরূপে একই সময়ে জন্মিবেন। তারপর উভয়কে বদলাবদলি করা হইবে। তাঁকে পাহাড়ে লইয়া গিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইবে। তখন তিনি অনন্ত আকাশে মিলাইয়া গিয়া তাঁহার সমান গৌরব পাইবেন। ইন্দ্র তাঁর স্তুতি করিবেন ও তাঁহাকে কৌষিকী নামে তাঁহার ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করিবেন। এ ছাড়া ইন্দ্র বিন্ধ্য পর্ব্বতে তাঁর অনন্তকাল বাসের ব্যবস্থা করিবেন। সেখানে তিনি বিষ্ণু-ধ্যান করিয়া শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ করিবেন এবং জীব-বলি দ্বারা পূজিত হইবেন।

এই একই আখ্যায়িকা আবার বিষ্ণুপুরাণ (৫।১) প্রভৃতি কয়েকখানি পুরাণে আছে।

আর এক পুরাণের (মার্কণ্ডেয়—১।২৪৮) মতে ইনি বিষ্ণুর যশোভাক্। কল্পান্তে যখন বিষ্ণু অনন্ত-সমুদ্রে যোগনিদ্রাতে রত হইলেন, মধু ও কৈটভ তাঁর কাছে আসিল। মতলব ব্রহ্মাকে নাশ করিবে। কিন্তু বিষ্ণু চক্র দিয়া তাহাদের কাটিয়া ফেলিলেন। যোগনিদ্রা এ সময় কি করিলেন? ব্রহ্মা তাঁহাকে আরাধনা করায় তিনি

বিষ্ণুর চক্ষু ছাড়িয়া দিলেন। বিষ্ণু জাগিয়া উঠিলেন। অসুর বিনষ্ট হইল।

দুর্গা আমাদের খুব প্রাচীন দেবতা। অতি প্রাচীন যুগেও তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ আছে। কিন্তু বৈদিক যুগে দেবতাদিগের মূর্ত্তি ছিল কি না তৎসম্বন্ধে প্রতীচ্য পণ্ডিত-দিগের মধ্যে যথেষ্ট মত-দ্বধ আছে। আমরা মূর্ত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

হিন্দুশাস্ত্রে দেবতার নাম আছে, তাহাদের শ্রেণীবিভাগ আছে, তাহাদের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা আছে। তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করে। প্রত্যেক দেবতার বৈশিষ্ট্য শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছে। এই যে দেবতা ইঁহাদের কোন মূর্ত্তি আছে কি না। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, তাঁহারা কোন

শ্রীদুর্গা (চণ্ডী সিঙ্গসরি- প্রদ্যুম্নম্)

প্রদ্যুম্নম্ শিবমন্দিরে শ্রীদুর্গা

প্রাকৃত দেহ ধারণ করেন না। তবে শাস্ত্রে দেখি পাওয়া যায় যে, দেবতা যে লোকের উপাদানের অনু- মূর্ত্তি সেই দেবতার সেইরূপ হইয়া থাকে। বেদে এমন অনেক মন্ত্র আছে যাহাতে দেবতার মূর্ত্তি সূচিত হইয়াছে বেদান্তও দেবতার মূর্ত্তির কথা বলিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্যে ইন্দ্রদেবতা-সম্পর্কে বলিয়াছেন,—'ইন্দ্রনামা কশ্চিদ্‌বিগ্রহ-বান্ দেবঃ' (১।২।২৯)। আবার তিনি ৩—১—২৭ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, দেবতারা একই সময়ে বহু-মূর্ত্তিতে কায়ব্যূহ সৃষ্টি করিয়া প্রকটিত হইয়া থাকেন। দেবতাদের নিজেদের প্রিয়মূর্ত্তি আছে, তবে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে যে কোন মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন। এ

লাইডেন চিত্রশালায় রক্ষিত শ্রীদুর্গা (যবদ্বীপ)

অপরকে প্রদর্শন করিয়া, ভিক্ষাস্বরূপ যাহা পাইত, তদ্দ্বারাই নিজের খরচ চালাইত।

পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট হইতেছে ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ। ইহার ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম অদ্ভুত ব্রাহ্মণ। ইহাতে হাস্যকারী, রোদনশীল, নৃত্যকারী দেবমূর্ত্তির উল্লেখ আছে। এত প্রাচীনকালের মূর্ত্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত-মণ্ডলীর মত একরূপ নয়। অধ্যাপক ম্যাক্‌স্‌মূলর লিখিয়াছেন—"The religion of the Veda knows no idols. The worship of idols in India is a secondary formation, a later degeneration of the more primitive Worship of the ideal gods." (Chips from a German workshop. Vol, I, p 35). ডক্টর বোলেনসেন (Z. D. M. G. Vol XXII, p.587) কিন্তু বৈদিক কালে মূর্ত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—"From the common appellation of the gods as দিবো নরঃ "Man of the

...য়া দেখিতে পাই—"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপমীয়তে"। ...নি মীমাংসা-দর্শনে বলিয়াছেন, "মন্ত্রাত্মিকা দেবতা"। ...দেবতার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আরাধনা করা যায়, ...বতা সেই মন্ত্রের অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন ...র অস্তিত্ব-সম্বন্ধে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।

পাণিনি অতি প্রাচীন বৈয়াকরণ। আজকাল পণ্ডিত-...এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পাণিনি অন্ততঃ খৃঃ ...৮ম শতকে বর্ত্তমান ছিলেন। পাণিনি (৫।৩।৯৯) ...কটী সূত্র করিয়াছেন—তাহার অর্থ এই যে, অবিক্রেয় যে 'প্রতিকৃতি', যাহা কেবল জীবিকার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহাতে 'কন্‌' প্রত্যয় হয় না। প্রতিকৃতি শব্দের অর্থ—যাহা কোন মূল মূর্ত্তির আদর্শ। ভাষ্যকারগণ ইহাকে মূর্ত্তি ...িয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রমাণিত ...তেছে যে, পাণিনির সময়ে দেবদেবীর মূর্ত্তি ছিল। ...এ সমস্ত মূর্ত্তি বাজারে বিক্রয় করা হইত না। তবে ...কার্থে ব্যবহৃত হইত। ...বা যাইতেছে যে, ...মূর্ত্তিগুলির অধিকারী ... ...জন্য কাছে রাখিয়া

sky, or simply নর (later) "Men", and from the epithet "নৃপেসঃ" having the form of the Men, R. V. III. 4. 5., we may conclude that the Indians did not merely in imagination assign human forms to their gods, but also represented them in a sensible manner."

প্রসংশা করা হয়। দেবগণ মানবের ন্যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার পর পাতঞ্জলি মহাভাষ্যে বিশেষ প্রচলিত মূর্ত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—শিব, স্কন্দ, বিশাখমূর্ত্তি—শিব, স্কন্দ, বিশাখ বলিয়াই উক্ত হইবে, শিবক, স্কন্দক, বিশাখক হইবে না। রামায়ণ যুগে যে দেব-মূর্ত্তি দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ লঙ্কায়

লাইডেন চিত্রশালায় রক্ষিত মহিষমর্দ্দিনী

যাস্কের সময় মূর্ত্তি যে খুব বেশী প্রচলিত ছিল, তাহা তাঁহার নিরুক্ত পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায়। নিরুক্তে তিনি বলিয়াছেন,—"এখন আমাদের দেবতাদের মূর্ত্তি বিচার করিতে হইবে। সংহিতাতে দেবগণ এক হিসাবে নরাকৃতি। বুদ্ধিমান্ বলিয়া দেবতাদের সম্বোধন ও

মন্দিরের উল্লেখ—৬।৩৯।২১। লঙ্কার প্রতিমা সম্বন্ধে উল্লেখ আর এক জায়গায় আছে—প্রতিমাশ্চ প্রকম্পতে স্বিদন্তি হসন্তি চ (৬।১১।২৮)।

মহাভারতে দেবমূর্ত্তির যথেষ্ট উল্লেখ আছে। যেমন হস্তী, অশ্ব, মানব প্রভৃতির প্রস্তরমূর্ত্তির উল্লেখ আছে,

তেমনই তীর্থে দেবমূর্ত্তিরও যথেষ্ট উল্লেখ আছে। বনপর্ব্বে আছে, জ্যোষ্ঠিলা দেবীর সহিত বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিলে মিত্র ও বরুণলোক লাভ হয়। ইহাতে মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। অন্যত্র (১৩।২১।৬১) আছে—শিব-মূর্ত্তি দর্শনে লোকে পাপমুক্ত হয়—"নন্দীশ্বরস্য মূর্ত্তিং তু দৃষ্ট্বা মুচ্যেত কিল্বিষৈঃ"। ধর্ম্ম গ্রন্থে ধর্ম্মতীর্থে আছে—

"তত্র ধর্ম্মো নিত্যং আস্তে"—ধর্ম্ম সেখানে নিত্য উপবেশন করিয়া থাকেন। ধর্ম্মং তত্রাভিসংস্পৃশ্য—ধর্ম্মকে অভিসংস্পর্শ করিয়া—সম্ভবতঃ স্নান করাইয়া। হরিবংশে ধাতু, মৃত্তিকা, দারু, নবনীত ও লবণ-নির্ম্মিত মূর্ত্তির উল্লেখ আছে।

যাহারা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে এবং বহন করিয়া থাকে মহাভারত ও মনুসংহিতায় তাহাদের নাম দিয়াছেন দেবলক। এছাড়া মন্দির, চৈত্যের ভূরি ভূরি উল্লেখ রামায়ণ, মহাভারতে আছে। কয়েকটী উদাহরণ এই—

"দেবায়তনানি" —রামায়ণ ২।২৬।৩৩

"শ্রীমত্যায়তনে বিষ্ণোঃ"—২।৬।৪

"দেবাগারিণি শূন্যানি ন চ ভান্তি যথাপুরম্"—২।৭১।৩৯

"দেবায়তনস্থা দেবাঃ"—৬।১১২।১১

আমরা যে সমস্ত প্রমাণের উল্লেখ করিলাম, তাহা হইতে বেশ বলিতে পারা যায় যে, বৈদিক যুগেও মূর্ত্তি অজ্ঞাত ছিল না। আর্য্যরা ঐ সমস্ত দেব মূর্ত্তির পূজাও করিত। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে দেব-মূর্ত্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে যথাসাধ্য প্রমাণের উল্লেখ করিলাম। কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি যে, এই প্রমাণগুলির সংগ্রহে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, গোপীনাথ রাও, হপকিন্স প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

নন্দোৎসব

(গল্প)

[শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

১

কয়েক বৎসর থেকে বাঙালী তার 'ঘর-কুনো' অপবাদের বদ্‌লা নেবার জন্যে ঘরের দুর্গোৎসব ঘুচিয়ে ভ্রমণোৎসব সুরু করে' দিয়েছে। সুমতি বলতেই হবে। কলঙ্ক-মোচনে ঝোঁক্ সুসন্তানদেরই ধরে। নন্দ বাবুকেও ধরেছিল।

অধিকাংশেরই কাশীর ওপর ঝোঁক্, যে হেতু বাঙালী Intelligent জাত—তাতে সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎও হয়। আবার বিশ্বনাথ, বাড়ী, রাবড়ী সবই সুলভ কন্যা 'জোনাকির' 'যম পুকুর'ও পচেনা,—সেথা গুণী কল্‌মী, সব সরঞ্জামই ল'ন' করছে।

পুরুষদের বড় বড় পরিচয় দেবার পথ খোলে।—"ওঃ শিশির কাকার কথা বলচেন?—এবার যে খাণ্ডব-দাহে স্বয়ং গাণ্ডীব সাজচেন। ইস্—বলে ফেল্‌লুম,—very গোপনীয়। কাকে বলবেন না,—এই বড়দিনেই দেখতে পাবেন" :—ইত্যাদি।

মেয়েদের স্বরাজের মন্ত্র চলে।

ছেলেরা সিগারেটের পারণ করেন;—ইম্‌পীরিয়েল্ টোব্যাকো কোম্পানির—তথা বিশ্বপ্রেমের ডিভিডেণ্ড বাড়ে।

কাজ বাড়ে কেবল পুলিসের, আর বাড়ীর দালালদের, কারণ সকলেরই কাশীতে একখানা নিজের বাড়ী না হলেই নয়,—"খাসা জায়গা—ড্যাম্ চীপ্!"—ম্যালেরিয়ার জ্বালায় তাঁরা না কি রাগ করে বাস্তবাটী মর্টগেজ দিয়েছেন!

পৈতৃক ব্যবস্থার 'প্রিভিলেজড্ ছিদাম পাল—প্রতিমে ফাঁদতে কোন্ দিন এসে প্রণাম করে দাঁড়াবে! তার 'বদ্-সুরত' না দেখতে হয়। মা তার কাছে কাঁদতে বসবেন,—বীভৎস দৃশ্য, most annoying!

রেল্ কোম্পানী 'বিজ্‌নেস্' বোঝে না। সেই 'কন্‌সেসন্' দিবি,—দেরী করে' তোদের লাভটা কি?

এই সব স্বাস্থ্য চিন্তা,—almost দুর্ভাবনা, ভাদ্র মাসেই ভর করে,—বিজিতদের চিন্তাচর্চ্চা সুরু হয়ে যায়।

'স ম'রা অর্থাৎ সম্পন্ন আর মধ্যবিত্তের মাঝখানের 'হাফব্যাকেরা,—পোষ্টকার্ড টেনে ফাউণ্টেন-পেনে, 'গরজে-পরিচিত'দের পত্র লেখেন—

—"ভায়া তুমি ভুললেও আমি ভুলিনি। একখানা পত্রও কি দিতে নেই! একেবারে যে মায়া কাটালে। বহুদিন সংবাদ না পেয়ে বড়ই ভাবিত আছি, সত্বর কুশল দানে চিন্তা দূর করিও।"—অর্থাৎ মনোমত একটা বাসার ব্যবস্থা করিও।

নন্দবাবুর বাসার বর্ণনাটা পূর্ণ 'দশ-মেসে',—'এক্জিবিসনে' স্বর্ণ-পদকের দাবী রাখে।

প্রায় এই রকম—

বাসাটি বারোদ্বারির ব্রাদারের মত হওয়া চাই,—দশ দিক্ খোলা। প্রতিদিন সব হাওয়াটাই হুকুমের প্রত্যাশায় তাঁর দ্বারে এলেই ভাল হয়। পরে তিনি নিজের প্রয়োজন মত রেখে বাকিটা ইতরে জনাদের জন্য ছেড়ে দেবেন,—এই ভাব। বলাই বাহুল্য যে বাসাটি বড় রাস্তার ওপর হবে,—যেন 'ব্যাল্কনি থেকে বেবাক্ দেখা যায়, কিছু না চক্ষু এড়ায়। আশে পাশে ভদ্রলোকেরা, অর্থাৎ যাঁরা মোটর রাখেন,—থাকেন। আবশ্যক হলে অসুবিধায় না পড়তে হয়। পোষ্ট আফিস্, বাজার বায়স্কোপ যেন পাঁচ মিনিটে পৌছান যায়—পায়দলে।—ইত্যাদি ইত্যাদি;—"ভাড়ার দিকে দেখনা ভায়া বিশ পঁচিশ,—কুছ পরোয়া নেই।"

অভিজ্ঞরাও চট্ পোষ্টকার্ড টেনে অবস্থা জানান,—"সে আনন্দ আর অদৃষ্টে নেই ভায়া! বাত তো ছিলই জানো, in addition প্রবল হানিয়ায় হায়রান্! কাশীর পাপ,—বোধ হয়, ছেলে বয়ে বয়েই হ'ল! নাচার ভাই,—মাপ কোরো। পার তো একটা নিউ টাইপের আটচল্লিশ ইঞ্চি ট্রস্ এনো। ইত্যাদি—

কিন্তু very good manএর (ভাল মানুষের) ভালাই নেই। যথা সাধ্য চেষ্টা করে' যা স্থির করে' রাখলেন—তা নন্দর মনে ধরে না!—"আঃ এ বাড়ীতে জেণ্টেল্ম্যান্ থাকতে পারে,—তোমামার কোন আক্কেল নেই! মুখ খুলে দেখনি, ওপরের ঘরের ক'খানা শার্সি ভাঙ্গা! পাঁচ দিনেই যে প্যারাটাইফয়েড ধরবে! বাথ-রুমে আয়না নেই! ইস—গালে চড়মেরে পঁচিশ পঁচিশ টাকা নিয়েছে। গামছা কাঁধে ফেলে গিয়েছিলে বুঝি?—একটা হাফ্ প্যাণ্ট -

অপরাধী বন্ধু একেবারে এত টুকু!

—"যাক্, এখন একবার ঢালা ফেনাইল দিয়ে আগাগোড়া ধুইয়ে দাও। আর দ্যাখো—ভাল ফার্ষ্ট-ক্লাস্ মটন্—চেন তো,—দু'সের! রাত্রে এখানেই খাবে। ডিম্ পাবে তো,—হাফ-এ-ডজন!

বন্ধুর প্রাণ এখন বলছে—"ধরণী দ্বিধা হও! রাতের খাওয়ার আগেই খাবি খাচ্ছে।"

২

বন্ধু বেচারা ভাবে—"এক সপ্তাহ কাটলো,—আর যে পারি না! ভগবানের নাম ভুলিয়ে দিলে যে!"

তাঁর বাঁচোয়া,—সর্ব্বদা civil (সনাতন) ড্রেসেই থাকে,—হাফ-প্যাণ্টের সঙ্গে খাপ খায় না। নন্দ এড়িয়ে চলে,—সে 'হাই সার্কেল' seeker (শিকারী)। কিন্তু মহিলাদের নিয়ে বন্ধুকে ঘুরতে হয়।

বন্ধুর জ্বর হয়ে গেল।

"ও কিছু নয়,—একটু ঘুরে এলেই সেরে যাবে,—একশো তিনের নীচে জ্বর—জ্বরই নয়। এক-কাপ চা খেয়ে উঠে পড়,—এঁরা সেজে গুজে প্রস্তুত। সেণ্টারেল হিন্দু ইস্কুলটা দেখিয়ে আনো। দেরী না হয়, ফিরলে আমি ওঁদের বায়স্কোপ দেখাতে নিয়ে যাব, বুঝলে।"

"আজ মাপ করো ভাই—উঠতে পাচ্ছিনা। কিছু খাই নি "...

—"ওঃ তাই বল। চ'লো দুখানা লুচি খেয়ে নেবে; অভ্যেস আছে তো?"

প্রতুল, বন্ধুর শ্যালক,—ফিফথ্ ইয়ারে পড়ে। সে কাল এসেছে। কথাটা শুনে নন্দবাবুর দিকে একবার তাকিয়ে বললে,—

"দু-দিনের জন্যে এসে অমন বদ্ অভ্যেস্ করিয়ে যাবেন না। উনি চাও খান না। সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা—মিছরি-মরিচ সেদ্ধ খাওয়াবার চেষ্টা করচি..."

নন্দবাবু বললেন—"তবে উনি থাকুন—বাড়ীর এঁরা সঙ্গে গেলেই হবে। আলাপও হবে বেশ freely—দেখা-শোনাও হবে। ওঁদের তো সবই জানা আছে,—কাশীতে..."

প্রতুল আর বেশী শুনতে চাইলে না, বাধা দিয়ে বললে —"আপনি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোক দেখছি। বিদেশে এসেছেন, তায় ইনি আপনার পরিচিত, চক্ষু-লজ্জায় কিছু গোপন করা এঁদের উচিত হয় না। যাতে আশঙ্কার কারণ আছে তা..."

নন্দ সহসা দু'পা পেছিয়ে সভয়ে—"কেন—কি? কই শিবু তো..."

"উনি সাদা-সিদে লোক, ভয়ঙ্কর ঈশ্বর-বিশ্বাসী, সবই তাঁর উপর নির্ভর। বোধ হয় জানেনও না। আপনি শিক্ষিত লোক, শুনলেই বুঝতে পারবেন।"

নন্দ চক্ষু কপালে তুলে—"কি বলুন তো?"

"এসে দেখচি দিদির ভয়ঙ্কর 'ইন্সোমনিয়া'! এ মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগটি যে কি করে আনলেন জানি না আমাদের ফ্যামিলিতে তো মশাই এ সব ব্যাধি কারুর ছিল না। বিষম স্পর্শাক্রামক (contagious) প্রশ্বাসের সঙ্গেও স্প্রেড্ করে। আপনি তো জানেনই···"

"ইনসোমনিয়া জানি না। ও যে একেবারে সোম্‌নিয়া! বলেন কি! ওরে বাপরে! সে বচর কলকেতায় My Lord! ধন্যবাদ···"

নন্দবাবু আর দাঁড়ালেন না।

প্রতুল একচোট হেসে নিলে। সে দু'চার কথায় নন্দবাবুকে বুঝে নিয়েই অতবড় দমে ভারী Insomnia কথাটা ব্যবহার করবার সাহস পেয়েছিল। লেগেও গেল ঠিক্।

এদিকে নন্দ বাসায় ফিরে পত্নীকে জানালে —"ভাগ্যে শিবুর শালা এসে পড়েছিল, তা না তো আর ফিরতে হ'ত না। শিবুটা কি মতলবি! রাসকেল একদম চেপে রেখেছিল। কেবল হাতাবার চেষ্টা আর বাজার-টাজার করতে দিও না। মিট মিটে লোক কেবল ভণ্ডামি। সন্ধে-আহ্নিকের চাড় দেখেই বুঝেছিলুম···"

"ও সব কি বলচো, অমন নিরীহ লোক,—মাটির মানুষ। ও সব বোল না। কেন কি হয়েছে?"

"ছোট খাটো নয় একেবারে ইন্সম্‌নিয়া—পরিবারের। ছুঁলে আর রক্ষে নেই!

"তাঁর সঙ্গে তো দেখাই হয় নি···"

"[illegible] রক্ষে। শিবুরও জর, ভালই হয়েছে—ব্যস্ Cu[illegible] নয়।"

"অমন বেইমানী করতে নেই। আহা ব্রাহ্মণের জর, দেখবে না?"

"ও দিক্‌ই আর মাড়ানো নয়। সে বাসা যদি ছাখো! চাকর বাকরে মাথা গলায় না। কাশী-বাসের মত কাশী-বাস করতে পারবি নি তো করা কেনো,—বৈঠকখানা পর্য্যন্ত নেই, এক খানা চেয়ার পর্য্যন্ত না! কাশীবাস করচেন!"

নন্দবাবুর কইম্‌সের কামাই,—'গেট মাষ্টার'। হাফ্-প্যান্ট আর কোটে তেরপলের পকেট। বিকেলে—নিকেলে আর তাঁবায় দু'সের নিয়ে ফেরেন। মুটেরা পান আর গাড়োয়ানরা সিগারেট যোগায়। ছোট নজরের লোক নন।

"শুনেছি তোমার পিসিমা কাশীবাস করেন, একবার খোঁজ নেবেন! তোমাকে মানুষ করেছিলেন···"

"অমর নয় তো যে এখনো বেঁচে আছে। আর ওই বরতেই সেকেণ্ড-ক্লাসে আসা কি না······তোমাদের প্রেষ্টিজ জ্ঞান খুব! থাক্ আজ রাত্রে ক্ষীরমোহন খেয়েই থাকা—আর খানকয়েক চপ্। চা খাবার খোক্কোশরা হাঁ করে পথ চেয়ে আছে। তা'দের ওই করেই চলে,—যাই কাঙালী বিদেয় করে আসি।"

সিগারেট ধরিয়ে 'কেন্' ঘোরাতে ঘোরাতে বেরিয়ে পড়লেন; - ট্রট্রা-ট্রেট্রা-টাটা ট্রট্রা...

৩

নন্দ আড়নছাটা কেশে রাজবেশে দশাশ্বমেধে পা-ফাঁক করে সিগারেট্ টান্‌তে টান্‌তে স্থানীয় একটি প্রবীণ লোককে পরিচয় দিতেছিল। —"বুঝলেন, গ্রে ষ্ট্রীটের ওপরেই বাদামী রংয়ের বারাণ্ডা-বারকরা বাড়ীখানা দেখেই থাকবেন,—নজর এড়াবার যো কি! ঠাকুর্দ্দা তয়ের করিয়েই গেলেন, poor fellow ভোগ করতে পান নি। সেই বাড়ী···"

এই সময় একটি বৃদ্ধা, ছিন্ন-বস্ত্রে কোন প্রকারে লজ্জা নিবারণ করতে করতে নিকটে এসে বললে—"বাবা আজ মা অন্নপূর্ণা কিছু দেন নি, মা শীতলা বাড়ীর দুটি ভিজে ছোলা চিবিয়ে আছি,—আর দাঁড়াতে পারচি না বাবা! দুটি না হয় একটি পয়সা দাও যাদু;—চারটি মুড়ি কিনে খাই···"

নন্দ কঠোর চক্ষে বললে—"যাও যাও বিরক্ত করোনা, —দাঁড়াতে বলচে কে? ভদ্রলোকের সঙ্গে দুটো কথা কবার যো নেই..."

—"হ্যাঁ, চৌরঙ্গির বাড়ীখানা ঠাকুরদ্দাই ৩৫০ টাকায় এক সাহেবকে ভাড়া দেন,—সে মরবেও না উঠবেও না, অমন সুবিধে পাবে কোথায়! অন্য লোককে দিলে, এখন তার ভাড়া ৭০০৲ টাকার সিকি পয়সা কম নয়। এ loss লোকসান মানুষ কতদিন সইতে পারে মশাই! ভাবচি কোর্ট খুললেই, ফিরে গিয়ে নোটিস্ দেবো, আমাদের পৈতৃক এটর্নি Orr Barrowকে বলেও রেখেছি।"

বিরক্ত না করে' করুণা-ভিখারিণী সভয় কাতর-দৃষ্টিতে বক্তার মুখের দিকে প্রত্যাশাপূর্ণ নয়নে চেয়ে ছিল। সহসা বলে' উঠলো—"বাবা নন্দ না! বাপরে আজ দেখ আজ তোর পিসিমার দুর্দশা! এই কাপড়, এই আজ একমুটো এঁটো ভাতও..."

কাঁদতে গিয়ে স্বরবদ্ধ অবস্থায় কাঁপতে কাঁপতে নন্দর পদপ্রান্তে পড়ে গেলেন।

লোক জড় হ'য়ে গেল।

সপ্রতিভ নন্দ হেসে বললে,—"কে এ মাগি,—খুব ঘাগি তো! শেখা বিদ্যে! এখানে এমন কত আছে মশাই?"

কে একজন বললেন—"বহুৎ"!

"তাই ত, ভদ্রলোক দেখে দাঁও বুঝে—বাবা! আমার নাম রসিক—বলে নন্দ! দিদি আজ ১৬।১৭ বচর হল' কাশী পেয়েছেন। ফন্দি মন্দ নয়,—এরা সব করতে পারে! যদিও কিছু দিতুম..."

"বাপ রে কিছু দিতে হবে না, শুধু একবারটি পিসিমা বলে ডাক্ নন্দো। আজ ১১ বছর দেখি নি। তোকে যে ১৮ বচর মানুষ করে রেখে এসেছি! কাণের পাশে দেখ দিকি বাবা,—সে দাগ্ তো মেলাবার নয়। আমার শেষ সম্বল—আংটিটী বেচে যে যদু ডাক্তারকে দেখাই। আমার যে প্রাণ চিলি নন্দ, আজ চিনতে পারলি নি! বাবা বিশ্বনাথ, তোমার রাজ্যে মরণও কি এতো মাগ্যি,—তাও দিচ্চনা"!

পড়ে অজ্ঞান হ'য়ে গেলেন।

দোকানিরা তাড়াতাড়ি জল এনে তাঁর চোখে-মুখে দিতে লাগলো। একজন ছুটে গিয়ে খো-খানেক গরম দুধ কিনে এনে খাওয়াতে গেল।

তিনি আর খেলেন না। কয়েকজন বলে' উঠলেন,—"ও বিশ্বনাথ এতদিনে সত্যিই আজ দয়া করলেন।"

উপস্থিত সকলেই একত্রে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন।

নন্দবাবুকে কেহ আর সে স্থানে দেখতে পেলেন না।

একজন দূরে একটা রোয়াকের উপর দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, বললেন,—"বৃদ্ধা ভুল করেন নি;—নন্দকে আমিও চিনি। লজ্জা পাবে বলে..."

রাগে ঘৃণায় একজন বলে উঠলেন,—"অতবড় নির্লজ্জের লজ্জা-বোধ! ধন্য আপনার দয়া। ওহে—সকলে এই দয়াটিকেও চিনে রেখো,—বড় দুর্লভ বস্তু!"

বাঙ্‌লার মৃন্ময়ীমূর্ত্তির পূজা-পদ্ধতি কত প্রাচীন?

[শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য এম-এ]

পুরাণে (শ্রীশ্রী৺ মার্কণ্ডেয়চণ্ডীতে) দেখিতে পাওয়া যায় যে, জগন্মাতার "মহীময়ী" মূর্ত্তি গড়িয়া প্রথম পূজা করিয়াছিলেন সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য। সে সব প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা এ প্রবন্ধে আলোচিত হইবে না। কেবল বাঙলাদেশের মৃন্ময়ীপূজা কত প্রাচীন, সেই সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা যাইবে।

অনেকেরই মনে বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, বাঙ্‌লাদেশে মৃন্ময়ীপূজার প্রথম প্রচলন আরম্ভ করেন নদীয়ার স্বনামধন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। কিন্তু এরূপ ধারণা যে কতদূর ভ্রান্ত তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত দুই চারিটী প্রমাণ নিম্নে দেওয়া গেল।

(১)। বাঙ্‌লার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র—উভয়ে একই সময়ের লোক (খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ)। আর প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সমকালবর্ত্তী—প্রায় সওয়া চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। এখন বাঙ্‌লায় মৃন্ময়ীপূজার যে রীতি প্রচলিত, ঠিক তদনুরূপ মৃন্ময়ীপূজা পদ্ধতি ও সেই বিষয়ের নানাবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য রঘুনন্দনের "দুর্গোৎসবতত্ত্ব" ও "দুর্গাপূজাতত্ত্বে" লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) রঘুনন্দন স্বীয় গ্রন্থে স্মার্ত্ত বাচস্পতি মিশ্রের (ইনি অবশ্য খৃষ্টীয় নবম-শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ মৈথিল দার্শনিকপ্রবর সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্র নহেন; তবে ইঁহারও নিবাস মিথিলাতেই ছিল) রচিত 'কৃত্যচিন্তামণি'র নাম করিয়াছেন। কৃত্যচিন্তামণিতে মৃন্ময়ী "বাসন্তী" পূজার কথা আছে। ইহাতে 'দুর্গা' নামটীর উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩) সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-মহাজনপদাবলী রচয়িতা মৈথিল মহাকবি শ্রীল বিদ্যাপতি ঠাকুর ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে "[illegible]রঙ্গিণী" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতেও মৃন্ময়ী মূর্ত্তি-পূজা-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে পুস্তকখানি এখন আর পাওয়া যায় না। কিন্তু বিদ্যাপতির পদ্ধতি আজিও বাঙলার বহু শাক্তবংশে অনুসৃত হইতে দেখা যায়। বাঙলায় যে পদ্ধতিগুলি এখন বিশেষ ভাবে প্রচলিত, সে গুলি হইতে বিদ্যাপতির পদ্ধতির স্থানে স্থানে সামান্য প্রভেদ আছে। সেই হেতু রঘুনন্দন উঁহার প্রতি কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই।

(৪) রঘুনন্দনের অধ্যাপক শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণির রচিত 'দুর্গোৎসববিবেক' গ্রন্থে মৃন্ময়ীপূজার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রঘুনন্দন নিজের পুস্তকে কোথাও স্বীয় অধ্যাপক শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণির নাম করেন নাই।

(৫) জীমূতবাহন তাঁহার "দুর্গোৎসব-নির্ণয়ে" (তাঁহারই রচিত 'কালবিবেকে'র অন্তর্ভুক্ত) মৃন্ময়ীপূজার কথা বলিয়াছেন। এই জীমূতবাহন ছিলেন শ্রীনাথ আচার্য্যচূড়ামণির মাতুল। শ্রীনাথের পিতার নাম ছিল শ্রীকর। জীমূতবাহন, শূলপাণি ও রঘুনন্দন—এই তিন প্রসিদ্ধ স্মৃতিনিবন্ধকারই শ্রদ্ধার সহিত শ্রীকরের নাম গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকরের কোনও গ্রন্থ বর্ত্তমানে আর দৃষ্টিগোচর হয় না।

(৬) শূলপাণি জীমূতবাহনেরই সমকালবর্ত্তী ছিলেন। কিংবদন্তী এই যে, তিনি শ্রীনাথের গুরু—ও রঘুনন্দনের পরমগুরু। তিনি ছিলেন ভরদ্বাজ-গোত্রীয় রাঢ়ীয় শ্রেণীর বাঙালী ব্রাহ্মণ। তাঁহার 'দুর্গোৎসব বিবেক' ও 'বাসন্তীবিবেক' নামক গ্রন্থ দুই খানিতে মৃন্ময়ীপূজার পদ্ধতি বিশেষ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ আছে।

(৭) শূলপাণির পুস্তকে '**জিকন**' নামে একজন প্রাচীন স্মৃতিনিবন্ধকারের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। জিকন 'সপ্তম্যাদি কল্পে'র উল্লেখ করিয়াছেন।

শূলপাণির গ্রন্থে উদ্ধৃত জিকনের বচন দেখিলে মনে হয় যে, তিনি বর্ত্তমানে বাঙলায় প্রচলিত মৃন্ময়ীপূজা পদ্ধতির বিষয় বিশেষ রূপে জ্ঞাত ছিলেন।

জিকন ব্যতীত আরও একজন প্রাচীন স্মৃতিনিবন্ধ-কর্ত্তার নাম আমরা শূলপাণির পুস্তকে দেখিতে পাই; ইঁহার নাম **'বালক'**। উদ্ধৃত বালকের বচন গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায় যে, অধুনা প্রচলিত মৃন্ময়ীপূজা পদ্ধতি তাঁহারও অজ্ঞাত ছিল না।

এই বালক ও জিকন যে বাঙালী ছিলেন, সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। কারণ, কেবল বাঙলার পরবর্ত্তী স্মৃতি-নিবন্ধ-কর্ত্তারাই ইঁহাদের দুই জনের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু 'হেমাদ্রি', 'পরাশরমাধব', 'নির্ণয়সিন্ধু' প্রভৃতি বাঙলার বাহিরে প্রচলিত স্মৃতি-নিবন্ধ-গুলির রচয়িতৃগণ কেহই ইঁহাদের নাম গ্রহণ করেন নাই। ইহাতে তাঁহারা যে বাঙ্গালী ছিলেন সে সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

জীমূতবাহন 'দায়ভাগে'ও বালক ও জিকনের নামোল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইতে ইঁহাদের সময় নির্ণয় করার কোন সুবিধা হয় না।

সর্ব্ব প্রাচীন বাঙ্গালী স্মৃতিনিবন্ধ-কর্ত্তা ভবদেব ভট্ট তাঁহার 'প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণে' বালক ও জিকনের নাম ধরিয়াছেন। ভবদেব রাজা হরিবর্ম্মদেবের সমকালিক। হরিবর্ম্মদেব বাঙলায় সেনরাজবংশ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পালরাজবংশ ধ্বংস হইবার সময়ে (খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষপাদ হইতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত) রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। অতএব, বালক ও জিকন যে বল্লাল সেন ও হরিবর্ম্মদেব অপেক্ষাও প্রাচীন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

ইহা হইতে আমরা নির্ভয়ে অনুমান করিতে পারি যে, **নয়শত কি হাজার বৎসর পূর্ব্বেও বাঙলায় দেবী জগদম্বার মৃন্ময়ী মূর্ত্তি পূজিত হইত**—আর তখনকার দিনের মৃন্ময়ীপূজা-পদ্ধতির সহিত বর্ত্তমান যুগের মৃন্ময়ী পূজা-পদ্ধতির বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না।

ইহা ত' গেল পদ্ধতির দিক্ দিয়া মৃন্ময়ীপূজার প্রাচীনতার প্রমাণ। ইহা ছাড়া আরও নানাবিধ প্রমাণের সাহায্যে বাঙলায় মৃন্ময়ী পূজার প্রাচীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু সে সকলের আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে।*

---

*'সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষৎ' (শ্যামবাজার, কলিকাতা) হইতে সম্প্রতি রঘুনন্দনের 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব' ও শ্রীনাথ, শূলপাণি প্রভৃতি নিবন্ধকারগণের পাঁচখানি পুস্তক ('দুর্গোৎসব-নিবন্ধকদম্ব') ৺সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসুগণ আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য ঐ পুস্তক কয়খানিতে দেখিতে পাইবেন।

সতীনাথের নতুন সতী

(গল্প)

[শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়]

ক

সেতার তার নিজের ভাষায় শিল্পীর প্রাণের কথা কইছিল—দরদ-মাখা আঙুলের মোহময় ছোঁয়া পেয়ে।

বিভোর হ'য়ে যে বাজাচ্ছিল সে বৃদ্ধ ;—বিভোর হ'য়ে যে শুনছিল সেও বৃদ্ধ। দুজনেরই মুখ থেকে বুক পর্য্যন্ত দীর্ঘ শ্মশ্রু তার শুভ্রতা ছড়িয়ে দিয়েছে। দুজনেরই বয়স ষাটের ওপারে।

সাঁচী বা সারনাথের স্তূপ, কণারকের কৃষ্ণ-দেউল বা বুদ্ধগয়ার মন্দির দেখ্‌লে মনে যে-রকম ভাবের ঢেউ উঠে, মনুষ্যজাতির প্রাচীন মূর্ত্তিগুলি দেখলে হৃদয়ে অনেকটা সেই-রকম ভাবেরই সঞ্চার হয়। তা'দের বুকে অতীতের কত স্মৃতিচিত্র লেখা আছে! তারা অতীতে কত গুপ্তকথা জানে! তারা অতীতকে কত দিক্ দিয়ে কত বিচিত্র রূপে দেখেছে! বার্দ্ধক্য রহস্যময়, সে অতীতের প্রতীকের মত, বর্ত্তমানে সে মূর্ত্তিমান অতীতের মত!

যৌবনকে হারিয়ে এই দুই বৃদ্ধ একান্তে ব'সে পরস্পরের সঙ্গ-সুখ উপভোগ করে। তা'দের আর কোন বন্ধু আছে কি না জানি না, কিন্তু আর কোন দলের ভিতরে তা'দের দেখা পাওয়া যায় না। কেউ তা'দের একঘরে করে নি, কিন্তু তা'রা স্বেচ্ছায় থাকে একঘরের মত।

তা'দের একজনের নাম শ্রীপতি, আর একজনের নাম দীননাথ।

দুই বৎসর আগেও তা'রা ছিল পরস্পরের অচেনা। দুই বৎসর আগে রেলপথে ট্রেণের কামরায় তা'দের পরস্পরের ভিতর প্রথম পরিচয়। সেইদিনেই কি-কারণে জানি না, তা'রা দু'জনেই দু'জনের দিকে আকৃষ্ট হয়। বার্দ্ধক্য আকর্ষণ করে বার্দ্ধক্যকে। কিন্তু একত্রে কেবল বার্দ্ধক্যই যে তা'দের বন্ধুত্বের হেতু নয়, সে কথা অনায়াসেই বলা চলে। স্বাভাবিক নীরবতার ভিতরেই তারা পরস্পরের মধ্যে এমন এক অংশ আবিষ্কার করতে পেরেছিল [illegible]নে অমিল নেই কিছুমাত্র। কিংবা কোন এক অজানা কারণ বা ভাষাতীত অনুভূতি তা'দের দু'জনকেই বন্ধুত্ব-সূত্রে বেঁধে দিয়েছিল।

কলকাতায় ফিরে তা'রা এক মেসের এক ঘরেই দু'জনে মিলে বাসা বাঁধলে।

সে মেসে আরও অনেক লোক ছিল—কেউ ছাত্র, কেউ কেরাণী। কিন্তু শ্রীপতি ও দীননাথ কারুর সঙ্গে মিশত না। অন্য কেউ তা'দের সঙ্গে গায়ে প'ড়ে আলাপ করতে এলে তা'দের গম্ভীর মুখ আরও বেশী গম্ভীর হ'য়ে উঠত।

তা'রা কখনো কারুকে কোন উপদেশও দেয় নি, নিজেদের পক্ককেশ দেখিয়ে কারুর উপরে মুরুব্বিআনাও জাহির করতে যায় নি। তবু মেসের আর সকলেই তা'দের ভয়ও করত, শ্রদ্ধাও করত।

মেসের ছোক্‌রা-মহলে যখন হাসি-ঠাট্টা, আদিরসাত্মক গল্প ও চট্‌কী গান-বাজনা দিব্যি জ'মে উঠেছে, তখন যদি শ্রীপতি কি দীননাথের সাড়া পাওয়া যেত, অমনি সকলে চাপা-গলায় দু-চোখ বিস্ফারিত ক'রে ব'লে উঠত—"চুপ, চুপ! বুড়োরা আস্‌ছে!"

মেসের কর্ত্তার নাম সতীনাথ—এ বাড়ীখানা ভাড়া নিয়েছে সে নিজের দায়িত্বেই। তা'র বয়স পঁইষট্টির কম হ'বে না। একতালার ঘরে মেসের ঝীয়ের সঙ্গে সে বাস করত প্রকাশ্যেই। শ্রীপতি ও দীননাথকে প্রায় সমান-বয়সী দেখে প্রথম প্রথম সে তা'দের সঙ্গেও আলাপ জমাবার চেষ্টা করেছিল।

"এই যে, কেমন আছেন" ব'লে একমুখ হাসি নিয়ে ঘরে ঢুকে সতীনাথ কোনদিন দেখত, দুই বৃদ্ধই দু'খানা কেতাব নিয়ে বোবা হ'য়ে বসে আছে। শ্রীপতি ও দীননাথ, সতীনাথের নমস্কারের প্রতি-নমস্কার দিয়েই আবার নতমুখে কেতাবের পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করত।

সতীনাথ কোনদিন বা গিয়ে দেখত যে, শ্রীপতি বাজাচ্ছে আপন মনে সেতার আর দীননাথ টান্‌ছে আপন

মনে গড়গড়া। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পরেও যখন শ্রীপতির সেতার ও দীননাথের গড়গড়া শান্ত বা স্তব্ধ হ'ত না, সতীনাথের প্রাণ তখন হাঁপিয়ে উঠত, সে আর পালিয়ে আসবার পথ পে'ত না।

হতাশ হয়ে সতীনাথ তাদের সঙ্গে আলাপ করবার নিষ্ফল চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে।

সমবয়সীদের মধ্যে অধিকাংশ বৃদ্ধই অতিরিক্ত মুখর হয়ে ওঠে। যে কোন সরকারি পেন্সন আপিসে মাসকাবারে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে বসলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। বৃদ্ধদের মৌখিক বাচলতা তখন তরলমতি ব'লে নিন্দিত যুবকদেরও অবাক করবে। কিন্তু শ্রীপতি আর দীননাথ ছিল সম্পূর্ণ উল্টো-ধরণের মানুষ।

এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েও তারা পরস্পরের পূর্ব্বজীবনী সম্বন্ধে ছিল একেবারেই অজ্ঞ। তারা যেন ঝড়ে-ওড়া দুখানা পাতার মতন;—হঠাৎ একজায়গায় এসে প'ড়ে মিলিত হয়েছে,—কোন্ গাছের ডালে গজিয়ে তারা কবে দখিন হাওয়ার হাসি বা বন্য ঝটিকার হাহাকার শুনেছে, কেউ তা বল্‌তে পারত না।

রোজ বৈকালে তারা দুজনে মিলে সহরের সরকারি বাগানে গিয়ে ব'সে থাকত নীরবে। তাদের পাশের বেঞ্চে ব'সে কোন দিন হয়তো বৃদ্ধের দল কুচো চিংড়ী বা আলু-পটলের মূল্যবৃদ্ধি ও দুঃসহ গ্রীষ্মাধিক্য কিংবা শীত কি বর্ষার প্রাবল্য অথবা ছেলে-মেয়ের অসুখ প্রভৃতি নিয়ে অনবরত কেবল বক্‌বার জন্যেই বকবক্ ক'রে যেত। কোনদিন আপিসের কেরাণীরা সাহেবের রুক্ষ মেজাজ বা বা বড়বাবুর ছোটলোকমি বা গিন্নীর নিত্যনূতন বায়না নিয়ে অগুন্তি মতামত প্রকাশ করত। কোনদিন বা কলেজের ছোক্‌রারা এসে শিশির ভাদুড়ী বড় না দানীবাবু বড় কিংবা অমুক অভিনেত্রীর বয়স পঁচিশ না চল্লিশ, এই নিয়ে তর্কাতর্কি করতে করতে প্রথমে গালাগালি, তারপর লাঠালাঠির আয়োজন করত।

কিন্তু তার মধ্যে অটল ভাবে ব'সে শ্রীপতি আর দীননাথ থাকত একেলে জনতার ভিতরে সেকেলে পিরামিডের মতন সম্পূর্ণ উদাসীন। তা'দের চারিপাশে জীবনের যে বিচিত্র প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে, তা যেন তা'দের অন্তরকে ছুঁতে পারত না, তার কলনাদ যেন তা'দের কাণে ঢুকত না,—তা'দের হৃদয় যেন দেহের অস্থি-কারাগারের ভিতর মূর্চ্ছিত হ'য়ে আছে........এই পৃথিবীর মাটির উপরে তা'রা যেন দুটো জ্যান্ত মড়ার মত পদচারণ ক'রে বেড়াচ্ছে!

দুই

তখনো ঝিকিমিকি বেলা।

শ্রীপতির সেতার ইমন-কল্যাণে আলাপ কর'ছিল—সুরের সঙ্গে যেন জড়ানো রয়েছে শান্ত সন্ধ্যার পবিত্র শান্তির মাধুর্য্যটুকু।

হঠাৎ অস্থির পদে সশব্দে দীননাথ ঘরের ভিতরে হুড়মুড় ক'রে এসে দাঁড়াল।

এমন ক'রে দীননাথ তো কখনো হাঁটে না! ইমন-কল্যাণের আলাপ অন্তরায় আসবার আগেই থামিয়ে দিয়ে শ্রীপতি মুখ তুলে একটু বিস্মিত চোখে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইল।

দীননাথ উত্তেজিত স্বরে বললে, "সতীনাথ আজ তিন দিন আগে মেসের পুরনো ঝীকে তাড়িয়ে দিয়েচে······"

সতীনাথের শয্যাসঙ্গিনী দাসী যে আজ তিনদিন অদৃশ্য হয়েছে, এ খবর আজ মেসের টিক্‌টিকি আর আরসুলারা পর্য্যন্ত জানত। তাই সে কোন জবাব দেওয়া দরকার মনে করলে না।

দীননাথ বললে, "আজ আবার সতীনাথের আর এক নতুন সতী এসেচে।"

তা যে আসবে, এও তো জানা কথা। শ্রীপতি মনে মনে ভাবলে, সেজন্যে দীননাথের বা তার মাথা ঘামাবার একটুও আবশ্যক নেই।

—"সেই নতুন ঝী মেসের ঘরে ঘরে ঢুকচে। এখনি হয়ত এ-ঘরেও আসবে।"

শ্রীপতি তবু মুখ খোলবার জন্যে কোনই উৎসাহ দেখালে না—কারণ নতুন ঝী যখন এসেছে, তখন সে তো ঘরে ঘরে ঢুকবেই। মেসের সব বাবুর কাজ তাকেই করতে হ'বে তো!

শ্রীপতি আবার সেতারের তারে তারে আঘাত দিতে সুরু করল,—সেতার আবার ইমন-কল্যাণের অসমাপ্ত আলাপ ধরল।

দীননাথ খানিকক্ষণ ঘরের ভিতরে পায়চারি করল। তারপর গড়গড়ার কাছে গিয়ে উবু হ'য়ে ব'সে কল্কের ভিতরে তামাক সাজতে লাগল।.........

ঘরের বাইরে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। শ্রীপতি মুখ তুলে দেখলে, ঘরের ভিতরে একজন স্ত্রীলোক প্রবেশ করছে।

এই বুঝি মেসের নতুন দাসী,—দীননাথের ভাষায় 'সতীনাথের নতুন সতী'। শ্রীপতির দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হ'য়ে তার আপাদমস্তক লক্ষ্য ক'রে দেখলে এবং পর-মুহূর্ত্তেই সে দৃষ্টি আবার লক্ষ্যহারা ও উদাসীন হ'য়ে পড়ল।

নতুন দাসীর বয়স পঁয়তাল্লিস থেকে পঞ্চাশের ভিতরে।

এক সময়ে নিশ্চয়ই সে বিচিত্র সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী ছিল। হারা-যৌবন আজও তার দেহের উপর থেকে নিজের স্মৃতিচিহ্নকে কেড়ে নেয় নি—সূর্য্য অস্তগত হ'লেও যেমন তার সমস্ত রক্তিমাভা আকাশ-পট থেকে মুছে নিয়ে যায় না।

সুন্দর চোখ, সুন্দর নাক, সুন্দর ঠোঁট। তা'দের ভিতরে তরুণ রূপের মাদকতা না থাকলেও আজও তারা বিকৃত হয় নি। আর তার গড়ন! এখনো বয়সের ভারে তা'র ডৌল বেডৌল হয় নি।

এখনো তাকে দেখলে খানিকক্ষণ ভাবতে হয়, ভরা যৌবনে এই নারী কত রূপপিয়াসীর চোখকে মোহের আবেশে নিষ্পলক ক'রে দিয়েছে!

শ্রীপতিও সেই কথা ভাবছিল কি না জানি না, কিন্তু তার সেতার ইমন্‌কল্যাণের আলাপ ভুলে গেল আবার!

রঙিন হাসিতে ঠোঁটদুখানি মিষ্টি ক'রে তুলে নতুন দাসী বললে, "কিগো বাবু, আপনাদের কি কি কাজ করতে হবে, বুঝিয়ে দিন।"

শ্রীপতি গম্ভীর ভাবে সহজ স্বরে বললে, "আপাততঃ ঐ বাসন-ক'খানা নিয়ে যাও। পরে বিছানা পেতে আর ঘর ঝাঁট দিয়ে যেও।"

নতুন দাসী ঘরের একপাশ থেকে খানকয়েক বাসন তুলে নিয়ে, শ্রীপতির মুখের দিকে একবার ঢুলঢুলে চোখে চেয়ে আর-একটু মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে তালে তালে পা ফেলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

সেতারের তারের উপরে শ্রীপতি আর একবার আঙুলের আঘাত দিলে, কিন্তু তারটা পট ক'রে গেল ছিঁড়ে।

সেতারকে কোণের উপরে শুইয়ে রেখে শ্রীপতি বন্ধুর দিকে মুখ ফেরালে। দীননাথ তখনো পিছন ফিরে কল্কে নিয়ে পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির হয়ে ব'সে আছে।

শ্রীপতি মৃদুকণ্ঠে শুধোলে, "দীননাথ, আর কতক্ষণ ধ'রে তুমি তামাক সাজবে?"

সে কথা যেন দীননাথের কাণেই গেল না।

"দীননাথ শুনচ?"

দীননাথ, ধীরে ধীরে মুখ ফেরালে। তার দুই চোখে টলমল করছে অশ্রুজল!

—"দীননাথ, তুমি কাঁদচ!"

দীননাথ কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছে ফেললে।

শ্রীপতি তার সেতারে আবার নূতন তার পরাতে লাগল।

খানিকক্ষণ পরে দীননাথ আস্তে আস্তে উঠে শ্রীপতির পাসে এসে বসল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "আর আমি লুকোতে পারছি না ভাই। আমার গুপ্তকথা আজ তোমাকে বলব। তুমি শুনতে চাও?"

শ্রীপতি তার পরাতে পরাতে বললে, "আমার কিছুই শোনবার আগ্রহ নেই। তোমার যদি বলবার আগ্রহ থাকে, তাহ'লে বলতে পার। কিন্তু তুমি কি বলবে, আমি তা বুঝতে পেরেচি।"

—"তুমি বুঝতে পেরেচ!"

—"হ্যাঁ। ঐ স্ত্রীলোকটাকে তুমি চেন।"

৫

—"ঠিক বলেচ। হ্যাঁ, ঐ নারীকে আমি চিনি বটে। কারণ, ও আমার স্ত্রী।

চম্‌কে উঠলে কেন শ্রীপতি? আমার কথা বিশ্বাস করচ না? কিন্তু বিশ্বাস কর। আমি সত্যিকথাই বলচি। ঐ নারী আমার স্ত্রী।

উঃ, সে কতদিনের কথা—যেন এ-জন্মের নয়! সে

স্মৃতি যেন বিগত জীবন-মরুর পোড়া বালি, বর্ত্তমান জীবন-শ্মশানের ছাইগাদার উপরে উড়ে উড়ে আসছে!

কিন্তু তবু আমি ওকে চিনেচি। ওর ঐ চোখদুটো আর তার চাউনি এখনো একটুও বদ্‌লায় নি। আর ঐ নাকের পাশের লাল আঁচিলটা। আর ওর বাঁ-হাতের কড়ে-আঙুলের পাশের বাড়্‌তি আঙুলটা। ভুল হবার কোন উপায় নেই—আমি ওকে ঠিক চিনেচি।

বল্‌তে গেলে অনেক কথাই বল্‌তে হয়। সে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস, একদিনেও ফুরুবে না। কিন্তু আমি খুব সংক্ষেপেই ব'লব। কেবল দু-চারটে আভাস দিয়ে যাব মাত্র। তাহ'লেই তুমি বুঝবে, কত দুঃখ এ বুকে পোরা আছে, কেন আমি আজ মনের আবেগ সাম্‌লাতে পারচি না।

বলেচি, অনেকদিন আগেকার কথা। হঠাৎ আমার স্ত্রী আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল। রেখে গেল খালি একটি মেয়েকে, তার পবিত্র স্মৃতির মত।

সে ছিল আমার পুলকের পুতলী। একটি উজ্জ্বল দীপশিখার মতন আমার আঁধার ঘরকে সে আলো ক'রে রইল।

কিন্তু মেয়ে ক্রমে এগারোর কোঠায় পা দিলে। আমাকে কাজের খাতিরে সারা দিনই বাইরে বাইরে থাকতে হ'ত। বাড়ীতে এমন কেউ ছিল না, আমার অনুপস্থিতির সময়ে মেয়েকে দেখে-শোনে।

এই সময়ে এক ভদ্র গৃহস্থের ঘরের অনাথা বিধবার সন্ধান পেলুম। শুনলুম, আশ্রয় পেলে সে আমার মেয়ের ভার নিতে রাজি আছে।

সাগ্রহে তাকে আশ্রয় দিলুম। মাথা গোঁজবার ঠাঁই আর পেট-ভাতার উপরে নগদ কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিকেরও ব্যবস্থা করতে ভুললুম না।

নাম তার সুন্দরী। নামের তেমন সার্থকতা আগে আর কখনো দেখিনি। তার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্য্যন্ত কোথাও একটুকুও খুঁৎ ছিল না—যেন গ্রীক ভাস্করের গড়া রূপসীর মূর্ত্তি! শুনেছি পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্য থেকে তিল তিল নিয়ে স্বর্গের তিলোত্তমার সৃষ্টি হয়েছিল। এ কথা যদি সত্য হয় তাহ'লে ঐ তিলোত্তমার সঙ্গেই তার তুলনা করা চলে।

সুন্দরীর উপরে বড় শ্রদ্ধা হ'ল। কারণ এমন এক নিখুঁৎ সুন্দরী যে অনাথা আর বিধবা হয়েও, রক্ত-মাংসের পাশবিক ক্ষুধায় প'ড়ে পৃথিবীর প্রলোভনের ফাঁদে পা দেয় নি, এ বড় যে-সে কথা নয়। দেহ বিক্রী করলে যে রাজা-রাজড়ার প্রিয়তমা হ'তে পারত, আমার নিরানন্দ সংসারে এসে সেইই কিনা সৎপথে দীনভাবে সকলের চোখের আড়ালে দুর্লভ যৌবনকে হারাতে চায়! তার এ সংযম কল্পনাতীত বললেও অত্যুক্তি হয় না।

সুন্দরী আমার মেয়ের ভার নিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত করলে। আমার মেয়ের প্রতি তার যত্ন, আদর, মমতা দেখে মোহিত হলুম। ঠিক যেন নিজের মা।

কেবল তাই নয়, তার আবির্ভাবের পর থেকে আমার লক্ষ্মীছাড়া সংসারে গৃহলক্ষ্মীর অনেক অভাব অনুভবের সুযোগই আমি আর পেতুম না। এমন-কি উড়ে বামুনের ভীতিকর রান্নার ভিতরেও আবার প্রীতিকর মিষ্টতা ফিরে এল।

সাধারণতঃ আমার সুমুখে সে বেরুত না। হঠাৎ আমার সামনে পড়লে তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টেনে সে পালিয়ে যেত। কতদিন কলতলায় আদুড় গায়ে কাপড় কাচতে কাচতে বা অনাবৃত মস্তক নিজের ঢেউ-খেলানো ভোমর-কালো চুলের ভিতরে চিরুণী চালনা করতে করতে আমার সাম্‌নে সে প'ড়ে গিয়েছে। সে সময়ে তার লজ্জাকাতর অসহায় অবস্থা কি চমৎকারই দেখাত! লজ্জা তাকেই মানায় যার লজ্জা করবার যথেষ্ট কারণ আছে, যার সৌন্দর্য্য সত্যসত্যই লোভনীয়। কুৎসিতার লজ্জাও অসুন্দর।

কিন্তু মাঝে মাঝে আমি যখন অসুখে-বিসুখে পড়তুম, কোনরকম যুক্তিহীন লজ্জাই সুন্দরীকে আর নিবারণ করতে পারত না। তখন তার একমাত্র স্থান হ'ত আমার শিয়রে। তখন তার দুখানি সেবানিপুণ হাত আমাকে এতটা তৃপ্তি দিত যে, মনে মনে আমি প্রার্থনা করতুম, হে ভগবান, আমার রোগ যেন শীঘ্র সেরে না যায়!

ক্রমে আমার মেয়ের বিয়ের বয়স হ'ল। একমাত্র সন্তান, তাকে শ্বশুরবাড়ীতে পাঠাতে মন মানল না। একটি ভালো ছেলে দেখে এমন ঘরে মেয়ের বিয়ে দিলুম, যাতে জামাই এসে আমার বাড়ীতেই বাস করতে পারে।

মেয়ের বিয়ে হ'ল, সুন্দরীরও কর্ত্তব্য শেষ হ'ল। অন্ততঃ সে নিজে তাই মনে করলে। কারণ একদিন সে আমার কন্তার মধ্যস্থতায় জানতে চাইলে যে, অতঃপর সে অন্য কোথাও কাজের জন্যে চেষ্টা করবে কি না ?......

সেইদিনেই সে যখন আমার ঘরে সন্ধ্যাবাতি জেলে চ'লে যাচ্ছিল, আমি তাকে ডেকে বললুম, "সুন্দরী, দাঁড়াও।"

সে দাঁড়াল—ঘোমটায় তাঁর মুখ ঢাকা।

আমি বললুম, "সুন্দরী, আমি তোমাকে ছাড়তে পারব না। আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি আমাকে ভালোবাসতে পারবে ?"

সুন্দরীর দেহ কাঁপতে লাগল।

আমি তার একখানি কম্পমান নিটোল হাত ধ'রে বললুম, "তুমি আমাকে ভালোবাসতে পারবে সুন্দরী ?"

ঘোমটার ভিতর থেকে খানিক পরে মৃদুস্বরে জবাব এল, "আমি সতীত্ব হারাতে পারব না।"

আমি বললুম, "দুটো সামাজিক অনুষ্ঠান করলেই যদি তোমার সতীত্ব বজায় থাকে, তাহ'লে আমি বিধবা বিবাহ করতেও নারাজ নই।"

সুন্দরী মাটির উপরে হাঁটু গেড়ে ব'সে আমাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে।

আমি তার ঘোমটা খুলে দিলুম। সে কোন আপত্তি করলে না। দেখলুম, লজ্জায় তার দুই চোখ যেন ঘুমোচ্ছে।

পরের কথা আরো-সংক্ষেপে বলব। কারণ সে সব কথা বিস্তৃত ভাবে বলতে হ'লে নিজের যন্ত্রণাকেই বাড়িয়ে তোলা হবে।

সুন্দরীকে নিয়ে ক'টা বছর কেটে গেল, স্বপ্নের মত। এখানো সে দিনগুলোকে স্বপ্ন ব'লেই ভ্রম হচ্ছে।

সে প্রাণপণে আমাকে খুসি রাখবার চেষ্টা করত। এবং বলা বাহুল্য আমার দিক থেকেও তার প্রতি যত্ন-আদরের কোন ত্রুটি হয় নি। এমন শান্তিতে দিন কাটছিল যে মাঝে মাঝে আমার মনে হ'ত, আমরা দুইজনে যেন দুজনের জন্যেই সৃষ্ট হয়েছিলুম।

ইতিমধ্যে আচম্বিতে একদিন কালবৈশাখীরই মতন কোনরকম জানান্ না দিয়ে আমার দুর্দ্দিনের উদয় হ'ল। একটা কাজে হপ্তাখানেকের জন্যে বিদেশে গিয়েছিলুম।

ফিরে এসে বিনামেঘে বজ্রাপাতের মতন শুনলুম, সুন্দরীকে আর পাওয়া যাচ্ছে না, সঙ্গে সঙ্গে আমার জামাইও নিরুদ্দেশ!

আমার তখনকার মনের ভাব আমি বর্ণনা করতে পারব না। তুমি বুঝে নাও।

সে লজ্জা, সে অপমান আমার অভাগিনী কন্যা সইতে পারলে না। একদিন সে আত্মহত্যা করলে।

সেইদিন থেকে একলা হয়ে আমি ছন্নছাড়ার মতন ঘুরে বেড়াচ্ছি......

এই মেসে আজ এতকাল পরে আবার সেই সুন্দরীর দেখা পেয়েছি, দাসীর বেশে।

আমার মনে হচ্ছে, আমি পাগল হয়ে যাব। আবার ঐ সুন্দরী যদি আমার চোখের সামনে আসে, আমি হয়তো ওকে খুন ক'রে ফেলব।

একবার তাকে সহ্য করেছি, কিন্তু আর সহ্য করতে পারব না।"

ঘ

দীননাথের কাঁধের উপরে সস্নেহে একখানা হাত রেখে শ্রীপতি মমতা-ভরা গলায় বললে, "সহ্য কর বন্ধু! এই পৃথিবীতে তুমি সহ্য করচ, আমি সহ্য করচি, হয়তো আরো অনেকে সহ্য করচে। সহ্য করাই বীরত্ব।"

দীননাথ বললে, "কিন্তু ভগবান কি মানুষের সহ্যশক্তির একটা সীমা নির্দ্দেশ ক'রে দেন নি ? তুমি কি আমার মত এতখানি মাথা পেতে সহ্য করতে পারতে বন্ধু ?"

সন্ধ্যার অন্ধকারে তখন শ্রীপতির মুখ দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু কোন জবাব না দিয়ে অর্দ্ধ-স্ফুট স্বরে সে-সুধু একটু শুষ্ক হাস্য করলে।

দীননাথ দুই হাঁটুর ভিতরে মুখ রেখে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল। অনেক দিন পরে আজ সে অনেক বাক্যব্যয় করেছে। তার কথার পুঁজি বোধ হয় ফুরিয়ে গিয়েছিল।

শ্রীপতি আবার সেতার তুলে নিলে। অন্ধকারের ভিতরে সেতার এবার যে করুণ রাগিণী ধরলে, তার অনুলোমে, বিলোমে, মূর্চ্ছনায়, ঝঙ্কারে সুরের এক দুঃসহ কান্না যেন ঝ'রে ঝ'রে পড়তে লাগল!

এ রাগিণী শ্রীপতির সেতারে দীননাথ আর কোন দিন শোনে নি। তার বুকের ভিতরটা যেন টন্‌টনে ব্যথায় কেমন-কেমন করতে লাগল! অস্ফুট কণ্ঠে সে ব'লে উঠল, "ও কি সুর তুমি বাজাচ্চ বন্ধু? এতদিন তো ও-সুরে তোমার সেতার একবারও বাজে নি?"

শ্রীপতি অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, "শেষ যে দিন এই সুরে সেতার বাজিয়েছিলুম, সে দিন যাকে ভালোবাসতুম তাকে হারিয়েছিলুম।"

—"তা হ'লে তুমিও ভালোবেসেচ?"

—"কেন বাস্‌বনা দীননাথ? দুনিয়ায় মানুষ যে ভালোবাসতেই আসে!"

—"আজ কি সে আর বেঁচে নেই?"

—"বেঁচে আছে বন্ধু! সে হচ্ছে তোমার ঐ সুন্দরী! কিন্তু আমি জানতুম ওর নাম সরলা!"

—"শ্রীপতি, শ্রীপতি। তুমি কি বলচ?"

—"সুন্দরীই বল আর সরলাই বল, ও বিধবা নয়। আমিই ওর স্বামী। আমি ওকে কিশোরী বধূর বেশে ঘরে এনেছিলুম। কিন্তু যখন ওকে হারাই তখন ও যুবতী।"

—"না, না শ্রীপতি, এ অসম্ভব! তুমি নিশ্চয়ই ভুল দেখেচ!"

—"তুমি যে যে চিহ্ন দেখে ওকে চিনেচ, আমিও ওকে চিনতে পেরেচি সেই সব চিহ্ন দেখেই!"

—"শ্রীপতি"………

—"চুপ। আর কোন কথা নয়। এ মেসে আর আমাদের ঠাঁই নেই।"

—"ঠিক বলেচ। ওঠ, এখনি জিনিস-পত্তর সব গুছিয়ে নি।"

দুই বন্ধু তখনি উঠে জিনিস-পত্তর গোছাতে ব'সে গেল।

৬

ঘরের দরজার কাছে হঠাৎ স্ত্রী কণ্ঠে শোনা গেল, "ওগো বাবুরা, রাত হ'ল, এখনো ঘরে সন্ধ্যে দেওয়া হয়নি কেন? বাসনগুলো নিন্‌।"

—"ঐখানেই রেখে যাও।"

—"দেশলাইটা কোথায় আছে বলুন তো, আলো জেলে দিয়ে যাই।"

—"আলো জ্বাল্‌তে হবে না, অন্ধকারই আমরা ভালোবাসি।"

—"ও মা সে কি কথা গো!"—সঙ্গে সঙ্গে খিল্‌ খিল্‌ ক'রে কৌতুক-হাসি শোনা গেল।

—"তোমার ও-হাসি থামাও। ও-হাসি শোনবার জন্যে যারা ব'সে আছে, সেইখানে যাও।…এখনো দাঁড়িয়ে রইলে………যাও………যাও বল্‌চি!"

—অন্ধকারের ভিতরে নারী যে স্বর শুনলে, তা ভেসে এল যেন মরণের ওপার থেকে, অশরীরীর অভিশাপের মত! তার বুকের কাছটা ছাঁৎ ছাঁৎ ক'রে উঠল, অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে দ্রুতপদে সে ঘরের বাইরে পালিয়ে গেল!

—"বন্ধু!"

—"বন্ধু?"

—"ঠিক বলেচ। অন্ধকারই আমরা ভালোবাসি—হ্যাঁ, এই নিবিড়, স্নিগ্ধ অন্ধকার!……এ আমাকে ঢেকে রাখুক, তোমাকে ঢেকে রাখুক, ঐ নারীর চোখকে ঢেকে রাখুক। সেই ফাঁকে চল আমরা পালাই!"

পথ

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

পথ, ওগো পথ!
শত পদধূলি-নামাবলী গায় তুমি পবিত্র সুমহৎ!
থাকি সকলের চরণ-ধূলার' নীচে
অসীম উদার বিস্তৃত আগে পিছে
দিতেছ পথিকে তাহার ঠিকানা ঠাঁই
বিরতি-বিহীন, হে বৃহৎ!

পথ, ওগো পথ!
অসীম অমর অটল নীরব শান্ত তাপস চির সৎ!
মরু-প্রান্তরে কান্তারে নদীতটে
কণ্টকে বনে জনপদে গিরিসঙ্কটে
আছ' বুক পাতি নর-ভূগুপদ তরে
চির অতন্দ্র জাগ্রৎ।

পথ, ওগো পথ!
তোমার ধূলায় লুটায়েছে কত রাজার মুকুট, রাজরথ।
কত না যুগের কত যে অশ্রুরাশে
বিরহে বিয়োগে গভীর দীর্ঘশ্বাসে
কত না বেদন ব্যথা জ্বালা মোহ পাপে
পুণ্য ও ধূলি এ যাবৎ।

পথ, ওগো পথ!
রিক্ত নিঃস্বে বক্ষে ধরিতে, কে হেন দরদী প্রাণবৎ?
তোমার শরণে খৃষ্ট অমর আজ
শাক্যসিংহ বুদ্ধ রাজাধিরাজ,
শচীর দুলাল পাইল পরশ-মণি
তুমি গুরু, তুমি ত্রিজগৎ।

পথ, ওগো পথ !
জানা অজানার চির খেয়াতরী তুমি অজ্ঞেয় শাশ্বত !
দীনজন সাথী বান্ধব তুমি চির
রিক্তের করে বাঁধ' তুমি রাখী দৃঢ়
কিছু নাই যার, তুমি তার চিরসখা—
তাই তব ধূলি মধুমৎ।

গুরু-তর্পণ

[শ্রীনীলমণি চট্টোপাধ্যায়]

সৃষ্টিকর্ত্তার কোন ত্রুটি ত তাহাতে ছিল না তবুও তাহার দুর্নাম রটিল "সৃষ্টি ছাড়া মেয়ে।" তাহার ভাল নাম শান্তশীলা কিন্তু, নামটী দুর্দ্দান্ত মেয়ের যোগ্য নয় বলিয়াই বোধ হয় তাহার ডাক নাম হইল 'ইলা'। পিতৃ-হারা কন্যা বলিয়া মাতার আদর-লালন যথেষ্ট হইলেও অতিরিক্ত ছিল না, কারণ একটীমাত্র সন্তান, তা কন্যাই হউক, সুশিক্ষিত করাই ইলার মাতার চরমোদ্দেশ্য। গ্রাম্য বালিকা-বিদ্যালয়ে ইলা পড়িত,—কিন্তু নিত্যই তাহার বিপক্ষে ছোট ছোট অনর্থপাতের অভিযোগ হইত। শিক্ষয়িত্রী শুনিয়াও শুনিতেন না, কারণ বুদ্ধিমতী মেয়ে লেখাপড়ায় বড়ই ভাল। বিরক্ত হইয়া মাতা নিজেই শাসনে উদ্যত হইতেন, কিন্তু 'দস্যিমেয়ে' তাঁহারই অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া হাসিয়া উঠিত। ইলার এই অনিয়ম-শিথিল জীবনে মাত্র ৫টী দিনের অস্থায়ী সই পাতান দেখিয়া তাহার 'মকর' ও 'গঙ্গাজল' আর ধরা দিল না বটে, কিন্তু ইলার হস্তে তাহাদের নির্যাতনেরও সীমা রহিল না। তাহাকে 'মকর' 'গঙ্গাজলের প্রবীণা আত্মীয়ারা চটিয়া তিনি সত্য করিয়া বলিলেন যে ইলার মত মেয়ে ভবিষ্যতে একটা অঘটন ঘটাইবেই। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া অভিমানে ইলার সারা গ্রামখানি অসহ্য বোধ হইত। তখন ইলার বয়স মাত্র ১০ বৎসর।

২

ইলা ছবি আঁকিত। কোথা হইতে একদিন এক বৃদ্ধ আসিল যেন তাহার ছবি আঁকার পরীক্ষা লইতে। ভাল আপদ! কোথায় নিশ্চিন্ত মনে গাছতলায় বসিয়া সে ছবি আঁকিবে, না বৃদ্ধ সেইখানেই আসিয়া উপস্থিত। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, "কি ছবি আঁকছ দিদি?"

না ইলা কিছুতেই ছবি দেখিতে দিবে না। সে হাত দিয়া ছবি ঢাকিল।

বৃদ্ধ বড়ই দুষ্ট। অঙ্গুলির ফাঁকে ফাঁকে দৃষ্টি ফিরাইয়া সে বলিল, "বাঃ বেশ আঁকা হয়েছে ত।"

বৃদ্ধের কথাগুলি বেশ মিষ্ট, তবে ছবি দেখাইতে দোষ কি? ইলা হাত সরাইয়া লইল।

বৃদ্ধ দেখিয়া বলিল, "বাঃ দিদি তুমি ত বেশ ছবি আঁকতে পার। তোমার আর সব ছবি আমায় দেখাবে না?"

ইলা অঙ্কের খাতা হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া বৃদ্ধের হস্তে দিল।

দেখিয়া বৃদ্ধ হাসিয়াই আকুল। ইলাও হাসিল। সেটা ইলাদের শিক্ষয়িত্রীর উদ্দেশে ব্যঙ্গচিত্র।

বৃদ্ধ আরও ছবি দেখিতে চাহিল।

ইলা বলিল, "আর ত নেই।" তাহার পর সহসা একটী

খাতার শেষপাতা খুলিয়া বলিল, "এই যে একখানা।" সেই পাতায় বহুক্ষণ দৃষ্টি বুলাইয়া বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল, "চমৎকার!"

ইলা চমকিত হইল।

বৃদ্ধ বলিল, "একটী কথা মনে রেখ দিদি,—তোমাকে সকলের বড় হয়ে সকলকে এগিয়ে যেতে হবে।" তাহার পর বৃদ্ধ ভাষার ভাবে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল যে চতুর্দ্দিকের বাধা ছিন্ন করিয়া তাহাকে কেবল পথেই পথ চিনিয়া যাইতে হইবে। ভবিষ্যতের অনিশ্চিত অংশটুকুর একটী ক্ষীণ আভাস জানাইয়া বৃদ্ধ তাহার মর্ম্মনিবেদন যা'চিয়া লইতে চায়। বৃদ্ধ লোক ভাল কিন্তু বড় দুষ্ট।

আপন কামিজের পকেট হইতে একখানি সুন্দর পুস্তক বাহির করিয়া বৃদ্ধ বলিল, "তোমাকে যদি এই বইখানি দিই,—তুমি নেবে?"

ইলা মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নামটী কি দিদি?"

"ইলা।"

বৃদ্ধ উপহারের পাতায় লিখিল—

"কুমারী ইলার প্রতিভা-পূজায়"

"সমশিল্পী"

ইলা পড়িয়া বলিল, "তোমার নাম বুঝি সমশিল্পী?"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল, "ঠিক না হলেও এক রকম তাই।"

"ও মা একি নাম।"

বৃদ্ধ ব্যঙ্গচ্ছলে বলিল, "তোমার নামত ইলা। ওমা, একি নাম।"

হাসিয়া ইলা বলিল, "আচ্ছা, এই রকম বই বুঝি তুমি সকলকেই দাও?"

"হাঁ দিদি, তোমারই মত দাদা-দিদিদের ওইরকম বই দিয়ে আশীর্ব্বাদ করি। আর দেখো আমার এই আশীর্ব্বাদ-টুকুই তোমার বড় হওয়ার পথ পরিষ্কার করে দেবে," বলিয়া সস্নেহে ইলার চিবুক স্পর্শ করিয়া বৃদ্ধ বিদায়গ্রহণ করিল। পুস্তকখানি ইলার হস্তে অস্ত্রের মত দৃঢ়বদ্ধ হইয়া রহিল।

৩

দশ বৎসর পরের কথা। শতকণ্টক বাধার এক একটী কণ্টক হইতে অতি কষ্টে মুক্ত হইতে দশটী বৎসর কাটিয়া গেল কিন্তু,—সাধারণ হিন্দু-বধূর মোহময় সংসার-যাত্রা যে ইলার ভাগ্যে কেন ঘটিল না তাহা জানা যায় নাই। এই রূপে বিঘ্নবেষ্টনী হইতে আপনাকে ছিনাইয়া লইয়া যখন ইলা সহজ পথে উপস্থিত হইল, তখন এই দেশে তাহার চিত্রকলা লইয়া তুমুল আলোচনা চলিয়াছে। একদিকে মাতামহপরিত্যক্ত সচ্ছলতা, অপরদিকে অপ্রত্যাশিত যশ, ইলার দিনগুলি বেশ কাটিয়া যায়, কিন্তু মনটী যে অসম্বল থাকিয়া গেল। ইলা নূতন নূতন পুস্তকে পাঠাগার সাজাইয়া মনের আহার যোগাইল। ক্রমশঃ নূতনের মোহ পুরাতনে ঢালিয়া তাহার পুরাতন সংগ্রহের একটী বাতিক জুটাইল।

পুরাতন পুস্তকের দোকানে প্রথম পদার্পণেই ইলা বুঝিল নূতন অপেক্ষা পুরাতনের আকর্ষণই অধিক। সুন্দর নির্ব্বিকারপুরী! অনাবৃত জীর্ণ দেহ ঋষিগণের পার্শ্বে পাশ্চাত্য ধূলিমলিন মনীষিবর্গ নির্ব্বিরোধে কাল কাটাইতেছেন; কাব্যের ওষ্ঠে মৃত গোলাপের রক্ত শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়াছে; দর্শনের দর্শন কর্দ্দমরুদ্ধ অবৈধ স্পর্শে বিজ্ঞান বিশেষত্ব হারাইয়া মুণ্ড দিয়াছে। এই বিভিন্নভাবের মধুর বিশৃঙ্খলা ত তালিকাভুক্ত নহে। ইলা পুস্তকের পর পুস্তক উল্টাইয়া দেখিল। কিন্তু,—একি! একত্রে একইরূপ চারিখানি পুস্তকের সহিত তাহার পূর্ব্বপরিচয়ের দৃষ্টি বিনিময় হইল কেন? ইলা কম্পিত হস্তে একখানি পুস্তক লইয়া উপহারের পাতায় দেখিল—সেই পরিচিত অক্ষরে, পরিচিত ভাষায় লেখা—

"উদীয়মান কবি শ্রীমান্ অহুকুলচন্দ্রের করকমলে,—

জনৈক সমশিল্পী"

ইলা দেখিল পর পর চারিখানাই উপহার। তাহাকে পুস্তক-নির্ব্বাচনে কৌতূহলী ভাবিয়া দোকানদার বলিল, আপনি কখানি নেবেন? যদি ৪খানিই নেন তাহ'লে আপনাকে আমি আট আনায় দেবো। দেখ্‌ছেন ত প্রায় ওজন দ'রেই হ'ল।"

এই বাক্যস্রোতের প্রতি ইলার লক্ষ্যই ছিল না। একে একে তাহার সেই পরাজয়-ক্ষুব্ধ সঙ্কীর্ণ অতীতের দিনগুলি মনে পড়িল। কঠোর তুষার স্তূপ যে কেমন করিয়া কাহার ইঙ্গিতে স্নিগ্ধ শান্ত স্রোতে পরিণত হইল

তাহা ভাবিয়া ইলার চক্ষে জল আসিল। এ যে তাহার গুরুলাঞ্ছনা তাহারই হৃদয়ে কশাঘাত করিতে চায়। বেশ, সে হৃদয় পাতিয়া আঘাত সহিয়া লইবে। এইগুলিকে ধূলিধূসরিত অবজ্ঞার আসন হইতে সযত্নে উঠাইয়া সে তাহার নিত্য পূজায় শ্রদ্ধার আসন দিবে।

দোকানদার আরও পাঁচখানি সেইরূপ উপহার বাহির করিয়া ইলার সম্মুখে আছড়াইয়া ফেলিয়া বলিল, "এই গুলিও দেখুন।"

দরদীর মত সযত্নে সাদরে সেগুলিকে ধরিয়া ইলা বলিল, "কত দিতে হবে?"

"আচ্ছা আপনি এক টাকাই দিন।"

করুণ হাস্যে ইলা বলিল, "দেখছি, এই বইগুলিকে তোমার দোকান থেকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচ।"

সে কথার মর্ম্ম দোকানদার বুঝিল না, কেবল আপ্যায়িত ভাবে বলিল, "আজ্ঞে, একরকম তাই বটে। এই বইগুলি কেউ নিতে চায় না। প্রায় দুই বৎসর ধরে ১২ খানি এসে পড়েছিল, মাত্র তিনখানি বেচেছি। তাও যারা নিয়েছে তারা উপরের মলাট ছিঁড়ে নিয়ে বইগুলি এইখানেই ফেলে গিয়েছে।"

এতই তুচ্ছ যে এত নির্য্যাতন!—গভীর মমতায় ইলার মন ব্যথিত হইয়া উঠিল। "বেশ, এই নাও তোমার দাম," বলিয়া দোকানদারের সম্মুখে একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া ইলা বইগুলি তুলিয়া লইল।

দোকানদার টাকা উঠাইয়া বলিল, "বইগুলি গাড়ীতে তুলে দিই।"

দৃঢ়স্বরে ইলা বলিল, "নাঃ, আমিই নিয়ে যাচ্ছি।"

৪

সেই রাত্রেই ইলা তাহার গুরুস্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া পুস্তকগুলির পাতা কাটিতে বসিল। তিনখানি পুস্তকের পাতাকাটা শেষ করিয়া চতুর্থখানি টানিয়া লইতেই তাহার মধ্য হইতে একখানি ভাঁজ করা চিঠি বাহির হইল। চিঠি খুলিয়া ইলা পড়িল,—

"নরেন,

আমার পাগলামী কি সত্য? আর তাই যদি না হ'বে—তা হ'লে অতবড় প্রোফেসারিটাই বা যাবে কেন? কিছু কবিযশ আশা করে এই কবিতাকটী লিখেছিলুম। মাসিকে পাঠিয়েছিলুম, কিন্তু মাসিকের মালিকদের মনোনীত হ'ল না। তারা যে নামের পূজারী। নিজের সঞ্চিতের অর্দ্ধেক এইগুলি ছাপাতেই ব্যয় হয়েছিল। বড় বড় কবিদের উপহার পাঠালুম,—দুছত্র প্রাপ্তি-সংবাদ জানিয়েও কেউ উৎসাহিত করলেন না। কেন? আমার কবিতাগুলি কি এতই অপাঠ্য? দু একটী মাসিকের তরফ থেকে দু-একজন দু একটী অযাচিত উত্তর লিখলেন। লেখার ভাবে বুঝা গেল যে তাঁরা এমন কবিতা চিতায় শুয়ে পড়তে রাজি আছেন। আহা, তারা ছেলেমানুষ, আমার কবিতা পড়বার জন্য ত তাদের চিতায় শোয়া দেখতে পারি না। না হয় এমন কবিতা নাই লিখতাম।

সেই থেকে ধারণা হ'ল,—বড় হলেই মহৎ হওয়া যায় না। সেই থেকেই সে মহত্ত্ব তোমাদের মধ্যে খুঁজতে বেরিয়েছি আর সানন্দে জানাচ্ছি যে তোমরা সরল বলেই মহৎ! এ জন্মের দিনগুলি তো ফুরিয়ে এসেছে; কিন্তু তোমাদের মধ্যে একজনকেও যদি বড় হ'তে দেখে যেতাম, তা হলে আমার সেই তৃপ্তিতে স্বর্গলাভ হ'ত। আমার আপনার বলবার তোমরা ছাড়া আর ত কেউ নেই। আশীর্ব্বাদ করি আমার মনের মত হও, ইতি—

তোমাদের

"কবি-দাদা"

ইলার সমস্ত শরীর স্পন্দনহীন! কেবল কয়েক ফোঁটা অশ্রু জানাইয়া দিল যে এখনও সে জীবিত। ধীরে ধীরে পত্রখানি তাহার ললাটস্পর্শ করিয়া দশ বৎসরের সঞ্চিত আশীর্ব্বাদের পুলক-শিহরণে সেই দশবৎসর পূর্ব্বের দুর্দ্দান্ত আত্মবশ ইলাকে ফিরাইয়া আনিল। পরদিন কলিকাতার সমস্ত পুরাতন দোকান উজাড় করিয়া সেই পুস্তকগুলি সে কিনিল। তাহাতে একটী সুন্দর আলমারি পূর্ণ করিয়া স্বহস্তে বড় বড় অক্ষরে আলমারির ললাটে সে অঙ্কিত করিয়া দিল "শ্রদ্ধা—পাঠ"। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকায় এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দিল যে যাহার নিকট এই পুস্তক যত আছে তাহা সমস্তই সে কিনিতে প্রস্তুত।

তাহার এই গুরু-তর্পণের উপকরণ যোগাইতে সকলেই তৎপর হইল।

খেলায় হারা

[শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর, বি-এ]

খেলায় হারা কম কথা কি, যত হেলাই করো,
যতই হাসো ঠাট্টা হানো ও'র যে খেলাই বড়।
ঐ ব্যথারি মাঝে নাহি ভাণ কি অভিনয়,
সকল ব্যথায় করে ওযে সারল্যে বিজয়।
ঝুটার হাটের দোকান-পাটে ঐ টুকু ভাই খাটি,
ফুল্ল উহার বাল্যবুকের একটি দলই মাটি।
জীবন যাহার খেলায় গড়া—তার ও পরাজয়
কপোত বুকে শরের সম.—হেলার কথা নয়।
পড়িয়ে আছে খেলার লতা তোমার সকল কাজে,
কাজের ছায়া মাত্র নাহি তাহার খেলার মাঝে.
তোমার কাজের চাইতে যে তাই তাহার খেলাই বড়,
খেলায় হেলা ক'রে মিছে কাজের বড়াই করো।
তুমি হেসে উড়াচ্ছ ভাই, জগন্মাতার প্রাণে
ঐ শিশুটীর ব্যথাটুকুই শেলের আঘাত হানে।
সমব্যথী লীলাময়ের চক্ষে ঝরে জল,
তাহার বিরাট্ খেলাপাতী হঠাৎ বিশৃঙ্খল।
মহামায়া অশ্রু উহার মুছান্ গভীর ঘুমে,
স্বপ্নে ওরে জিতিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা দেন চুমে।

মেষশাবক ও নেক্‌ড়ে বাঘ

(গল্প)

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

এক

দীনু হালদার নীলগাঁয়ের জমীদার।

শুধু জমীদার ব'লে পরিচয় দিলে দীনু হালদারের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলা হয় না। দীনু ছিল সেই গাঁয়ের ছোট বড় সবার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা।

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ তার। গ্রামশুদ্ধ লোক তাকে রীতিমত ভয় ক'রে চ'লত। তার অসংখ্য অন্যায় অত্যাচার তারা নিত্য নীরবে সহ্য ক'রত।

ছোট্টগ্রাম নীলগাঁ। অল্প লোকের বাস। তার মধ্যে ছোট লোকদের সংখ্যাই বেশী। ব্রাহ্মণ কায়স্থ কয়েক ঘর মাত্র আছে। তাদের অবস্থাও ভাল। কাজেই, তারাই গাঁয়ের মাতব্বর। জমীদার দীনু হালদারের সকল কাজের সঙ্গী ও সহচর তারা। অগত্যা গাঁয়ের গরীব লোকগুলিকে তাদেরও জুলুম সইতে হয়।

কানাই দাস দীনু হালদারের সেরেস্তায় কাজ করে। গরীব সে। সামান্য বেতন পায়। রুগ্না স্ত্রী লক্ষ্মী ও বিধবা কন্যা সৌদামিনীকে নিয়ে তার কুঁড়ে ঘর খানিতে সে কায়-ক্লেশে দিন যাপন করে। কন্যার জন্য কিন্তু তার মনে শান্তি নেই। গাঁয়ের জমীদার দীনু হালদার থেকে সুরু ক'রে নায়েব সীতানাথ পর্য্যন্ত সবার লুব্ধ দৃষ্টি তার ঐ বিধবা কন্যা তরুণী সুন্দরী সৌদামিনীর উপর।

অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয়ে সৌদামিনী এক দিন সাশ্রু নেত্রে তার বাবাকে বল্লে—বাবা, চল' আমরা এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাই!

কানাই দাস ম্লান মুখে ব'ল্লে—কোথায় যাব মা? এখানকার বাস অন্যত্র তুলে নিয়ে যাবার সঙ্গতি কই? তা ছাড়া এই সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে যেতেও যে মায়া হয় সদু! কিন্তু তবুও আমি হয়ত চলে যেতে পার্‌তুম মা, কিন্তু তোর মায়ের এই অসুখ যে আমাকে একেবারে নাচার ক'রে রেখেছে রে! ওই শয্যাগত রোগামানুষকে নিয়ে কি আমি এখন ঠাঁই-নাড়া হ'তে পারি?

পিতার কথাগুলি সৌদামিনীর অন্তর স্পর্শ ক'রলে। সে-দিন থেকে সে আর কানাইকে কিছু ব'লত না। দুশ্চরিত্র প্রতিবেশীদের অভদ্র আচরণ সে কঠিন হ'য়ে নীরবে সহ্য ক'রত।

দিন যায়। একদিন সে স্নান ক'রে ঘাট থেকে ভরা ঘট কাঁখে নিয়ে ঘরে ফিরছে এমন সময় সাদেক্ এসে তার পথ আগলে দাঁড়াল।

সাদেক হ'ল তাদের মুসলমান প্রতিবেশী মহীউদ্দীনের ছেলে। উচ্ছৃঙ্খল যুবক বলে গ্রামে অনেক দিন থেকেই তার দুর্নাম রটেছিল। সৌদামিনীকে ইতিপূর্ব্বে আরও দু' এক বার সে পত্র লিখে এবং হরির মাকে পাঠিয়ে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সফল হ'তে পারে নি। কিছু দিন ধ'রে সন্ধানে থেকে আজ সে নিরিবিলি ঘাটের ধারে এসে নিজেই সৌদামিনীর কৃপা প্রার্থনা করলে।

সদ্যস্নাতা সৌদামিনীর অঙ্গের সিক্তবসন তার যৌবন-পুষ্ট সুকান্ত দেহের তারুণ্য-দীপ্তি যেন আবৃত করে রাখতে পারছিল না! লুব্ধ সাদেকের দুই চোখে পশুর মত দৃষ্টি!

সৌদমিনীর তীব্র তিরস্কার তার নিশ্চেতন মনুষ্যত্বকে লজ্জা দিতে পার্‌লে না। তার ভিতরের উন্মত্ত পশুটা তখন মানুষকে হত্যা ক'রে উদ্দাম হ'য়ে উঠেছে! তাই পশুর মতই উচ্চহাস্য ক'রে উঠে সে সৌদামিনীকে আক্রমণ ক'রলে—।

সৌদামিনী চীৎকার ক'রে উঠল। সাদেকের সঙ্গে লোক ছিল; তারা ছুটে এসে তার মুখ চেপে ধরলে।

পলকের মধ্যে সৌদামিনীকে তুলে নিয়ে তারা ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছিল, কিন্তু অকস্মাৎ সেই সময় বন্দুকের শব্দ শুনে ও লোক জনের সাড়া পেয়ে তারা

সংজ্ঞাহীন সৌদামিনীকে পথের ধারে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল।

সৌদামিনীর বারেকের ভয়ব্যাকুল অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ কারুর কাণে গিয়ে পৌছায় নি বটে, কিন্তু বন্দুকের আওয়াজ শুনে পল্লীর অনেক লোকই সেখানে তাদের কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্য ছুটে এল।

ব্রীজ সাহেব তখন বন্দুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজের মাথার টুপী করে ঘাট থেকে জল তুলে এনে অচেতন সৌদামিনীর চোখে মুখে ঝাপটা দিয়ে তাকে সুস্থ করবার চেষ্টা করছিল।

সৌদামিনীর যখন জ্ঞান হ'ল সে দেখলে তার চার পাশে অনেক লোক জড় হয়েছে। সে ঘাটের ধারে এক ঝোপের পাশে পড়ে রয়েছে। এক জন সাহেব তার মুখের দিকে সাগ্রহ দৃষ্টি মেলে মাটিতে নতজানু হয়ে বসে রয়েছে!

সাহেবের সঙ্গে সৌদামিনীর চোখো-চোখি হতেই বেশ পরিষ্কার বাংলাতে ব্রীজ সাহেব বল্লে—তোমার কোনও ভয় নেই। তোমাকে যে মুসলমানরা ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তারা আমার বন্দুকের আওয়াজ পেয়ে পালিয়েছে। তোমার বাড়ী এখান থেকে কত দূর? তুমি উঠতে পার যদি তবে চল' তোমাকে তোমার ঠিকানায় রেখে আসি।

সৌদামিনী উঠে ব'সল। তার অঙ্গের অসংবৃত বসন সলজ্জ সংকোচে সত্বর সুসংবৃত করে নিয়ে দাঁড়াতেই দূরস্থ জনতা থেকে যদু মাইতি বলে উঠল—'সাহেব ও আমাদের কানাই দাসের মেয়ে সদু! বাড়ী খুব কাছেই—

ব্রীজ সাহেবকে এ গাঁয়ের অনেকেই চিন্‌ত। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের মিশনারী বন্ধু। ছুটীর সময় প্রায়ই বন্দুক হাতে আসতেন গাঁয়ের মধ্যে পাখী শিকার ক'রতে।

সৌদামিনীর পা টলছিল। ব্রীজ সাহেব ব'ললে—তুমি আমার কাঁধের উপর ভর দিয়ে চল' তা হ'লে তোমার কোনো কষ্ট হবে না।

সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সাহেবের দিকে মুখ তুলে চেয়ে সৌদামিনী ব'ল্লে—না, আমি যেতে পারব।

দুই

ব্যাপারটা কিন্তু অত সহজে মিট্‌ল না। নীল-গাঁয়ের হরি-সভায় পঞ্চায়েত ব'সল। কানাই দাসের উপর পরওয়ানা জারি হ'ল সৌদামিনীকে যখন ম্লেচ্ছ যবনে হরণ ক'রেছিল, এবং ওর মুখে যখন ম্লেচ্ছ খৃষ্টানের টুপীর জল পড়েছে, তখন ওর জাত গেছে। অতএব তুমি ওকে আর এক দিনও ঘরে ঠাঁই দিতে পাবে না। মেয়েকে আজই তাড়িয়ে দাও—নইলে তোমাকে একঘরে ক'রে দেওয়া হবে।

কানাইয়ের মাথায় যেন আকাশের বজ্র ভেঙ্গে পড়'ল!

নিরপরাধী স্নেহময়ী কন্যাকে পরিত্যাগ ক'রতে তার প্রাণ যেন কোকিয়ে কেঁদে উঠে অস্বীকার জানাতে লাগল'।

কিন্তু সৌদামিনীকে গৃহে রাখাও যে এর পর একেবারেই অসম্ভব এ কথাও কানাইয়ের অবিদিত ছিল না। একঘরে হওয়া মানে যে কি সে তা দেখেছে। বছর কয়েক আগে মহেশের ছোট বোন ইন্দুকে নিয়ে নীলগাঁয়ে যে কাণ্ড হয়ে গেছে কানাই তা ভোলে নি।

আট বছরের মেয়ে ইন্দুর বিয়ে দিয়ে মহেশের বাপ ঈশান রায় গৌরীদানের পুণ্য অর্জ্জন করতে না করতেই সেই পুণ্য ফলে ছ-মাসের মধ্যেই মেয়েটা বিধবা হ'ল। ঈশান রায় মেয়েকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিতে দিতে তৃতীয়পক্ষে আবার একটা বিবাহ ক'রে যখন মারা গেল, ইন্দুর বয়স তখন সতেরো বছর পূর্ণ হয়েছে!

বাপের শ্রাদ্ধের সময় মহেশের এক জন কলেজ-বন্ধু এসেছিল নীলগাঁয়ে নিমন্ত্রণ রাখ্‌তে। কলেজ তখন গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বন্ধ ছিল বলে মহেশ শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যাবার পরও তাকে যেতে দেয়নি—ধ'রে রেখেছিল।

সপ্তাহকাল মাত্র যেতে না যেতে নীলগাঁয়ে রটে গেল সেই ছেলেটির সঙ্গে ইন্দুমতীর কলঙ্ক! মহেশ ছোক্‌রা! রক্তগরম। ভীষণ রেগে উঠে সমাজের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল। নিজে উৎত্যাগী হ'য়ে এই গাঁয়ের ভিতরই বসে সেই সহরের বন্ধুটীর সঙ্গে আপনার বিধবা বোনের বিয়ে দিলে। বর-ক'নে চ'লে যাবার পর মহেশ বাড়ী এসে শুনলে তাকে একঘরে করা হয়েছে! চাকর-দাসী তার চলে গেল। বাড়ীতে

ঝাঁট পড়ে না, গরু জাব পায় না। গোয়াল ঘর সাফ হয় না। দোয়াল দুধ দুইতে এল না। মেথরও আসে না, নাপিত ঢোকে না, ধোপা কাপড়কাচা বন্ধ ক'রলে। মুদী তাকে মাল দিতে চায় না। কলু তার তেলের ভাঁড় ফেরত দেয়। ময়রা তাকে খাবার বেচে না। জেলে মাছ বন্ধ করেছে! গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান তার মাল বইতে অস্বীকার করে। কবিরাজ তার বাড়ীতে চিকিৎসা ক'রতে আসে না। ঘরামী তার ঘর ছায় না, কামারে তার কাজ করে না—শেষে বাধ্য হয়ে মহেশ এ গ্রামে তার বাস তুলে দিয়ে চলে গেল!

কানাই আতঙ্কে শিউরে উঠল! তার প্রাণাধিকা দুহিতা সদুকে যে বিসর্জ্জন দিতেই হবে এ বিষয়ে তার আর কোনও সন্দেহ রইল না তবু, একবার শেষ চেষ্টা করবার জন্য জোড়হাত করে সে গাঁয়ের জমীদার দীনু হালদারের দরবারে গিয়ে হাজির হ'ল!

কিন্তু, সেখানে গিয়ে কানাইয়ের যেন চোখ খুলে গেল! সে বুঝতে পারলে যে সদুকে ঘর-ছাড়া করবার জন্য এই ধর্ম্মধ্বজ সমাজপতিদের এত আগ্রহ কেন?

জনে জনে সবার হাতে-পায়ে ধ'রে অনুনয় বিনয় ও তোষামোদ ক'রেও কৃতকার্য্য হতে না পেরে একটা কঠিন পণ নিয়ে কানাই বাড়ী ফিরে এল।

বাপ আর মেয়েতে মিলে সে-দিন অনেক রাত পর্য্যন্ত কি পরামর্শ ক'রলে তারা।

পরের দিন থেকে সৌদামিনীকে গাঁয়ে আর দেখতে পাওয়া গেল না!

একটা হৈ চৈ পড়ে গেল চারি দিকে।

কানাই দেখলে—ঠিক যে ক'জন প্রতিবেশী হিন্দুসমাজের পাণ্ডা হ'য়ে সদুকে ঘরে রাখার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী জোর গলায় ভোট দিয়েছিলেন, সদুকে নীলগাঁয়ের মধ্যে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না বলে তাঁরাই ব্যস্ত হ'য়ে উঠছেন সকলের চেয়ে বেশী!

কানাই শুধু মনে মনে একটু হাসলে। কিন্তু তার রুগ্না স্ত্রীকে সে কিছুতেই বোঝাতে পারলে না যে কন্যার নিরুদ্দেশ হওয়া প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছিল।

কানাই যত বলে—ওগো সে কোথায় আছে আমি জানি। ভালই আছে এবং ভাল যায়গাতেই তাকে রেখে এসেছি—লক্ষ্মী বলে—না, তুমি আমার মেয়েকে এনে দাও। তাকে না দেখতে পেলে আমি বাঁচব না!

মেয়েকে নিয়ে যে গাঁয়ে একটা ঘোঁট পাকিয়ে উঠেছিল এবং তাকে না সরিয়ে দিলে যে গাঁয়ে বাস করা তাদের পক্ষে অসম্ভব—মেয়ে রাখলে যে তাদের একঘরে হ'তে হবে—এ সব কথা কানাই কিছুতেই তার শয্যাশায়ীনী পত্নীকে শোনাতে পারলে না। তার আশঙ্কা হ'ল যে এ সব দুঃসংবাদের আঘাতে তার রুগ্না স্ত্রী সহ্য ক'রতে পারবে না।

কিন্তু কানাই কিছু না বললেও লক্ষ্মী যথাকালে সবই জানতে পারলে! পাড়ার গিন্নীরা বাড়ী ব'য়ে এসে তার রোগশয্যার পাশে ব'সে মেয়ের কুৎসা মাকে সব শুনিয়ে গেল। বলবার সময় তারা ব্যাপারটাকে আরও একটু অতিরঞ্জিত ক'রেই গল্প করে গেল। অল্পে ছাড়লে না।

শুভানুধ্যায়িনী প্রতিবেশীদের রসনা যে বিষ লক্ষ্মীর রোগশয্যায় উদ্গীর্ণ ক'রে গেল তার ফল ফলতেও বিলম্ব হ'ল না। লক্ষ্মীর অবস্থা এই কয় দিনের মধ্যেই অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ল! কানাই পত্নীর সম্বন্ধে অত্যন্ত চিন্তিত হ'য়ে উঠল!

এতদিন সদু কাছে ছিল। কানাইকে কিছু দেখতে হ'ত না। মেয়ে তার সুনিপুণ হাতে মায়ের অক্লান্ত সেবা, বাপের সকল পরিচর্য্যা ও সংসারের যা কিছু কাজ সমস্ত সুচারু রূপে সুসম্পন্ন করছিল। সৌদামিনী চলে যাবার পর থেকে কানাই বুঝতে পারলে তার গৃহের মঙ্গল-প্রদীপ নিবে গেছে! সৌদামিনীর অভাব প্রতি দিন প্রতিমুহূর্ত্তে তাকে পীড়া দিতে লাগল। কানায়ের সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ল' এই হিন্দু-সমাজ ও সমাজপতিদের উপর।

তিন

সেদিন লক্ষ্মীর অবস্থা খুবই খারাপ—এ দেখেও কানাইকে আসতে হ'ল জমীদার-বাবুর কাছারী বাড়ীতে তার গোমস্তাগিরি চাকরীটুকু বজায় রাখতে।

গিয়েই শুনলে জমীদারবাবু তাকে খাস-কামরায় ডেকে পাঠিয়েছেন।

কানাই তাড়াতাড়ি ছুটল। তখনও তার কপালের ঘাম শুকোয় নি। যেতে যেতে ভাবলে জমীদারবাবুকে

ব'লে সে কিছুদিনের ছুটী মঞ্জুর করিয়ে নিয়ে আসবে, নইলে লক্ষ্মীকে বাঁচান' যাবে না।

দীনু হালদার তাকিয়ায় হেলান দিয়ে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আলবোলার নলটি মুখে দিয়ে অলসভাবে তামাক টানছিলেন। কানাই গিয়ে ভূমিষ্ট হ'য়ে প্রণাম করতেই জমীদার বাবু বললেন—ওহে, কালকের পঞ্চায়েতে ঠিক হ'য়ে গেছে যে তোমাকে নিয়ে আমরা সমাজে চলতে পারি নি। কারণ, তোমার মেয়েকে নিয়ে ওই কাণ্ড হ'য়ে যাবার পরও সে যখন তিন চার দিন তোমার বাড়ীতে ছিল এবং তোমরা যখন সেই ম্লেচ্ছ সংস্পর্শে পতিতার ছোঁয়া অন্নজল গ্রহণ করেছ তখন তোমাদেরও জাত গেছে।

কানাই শুনে বজ্রাহতের মত সেখানে ব'সে পড়ল।

ক্ষণকাল স্তম্ভিতের মতো চুপ ক'রে বসে থেকে সে রোরুদ্যমান হ'য়ে ব'ললে,—তা হ'লে মেয়েকে ত্যাগ করা সত্বেও আপনারা আমাকে রেহাই দিলেন না!

দীনু হালদার উত্তেজিত হ'য়ে উঠে বল্লে,—মেয়েকে ত্যাগ ক'রেছ কি রকম! ভেবেছ তোমার শয়তানী আমরা কেউ টের পাই নি? রাতারাতি গিয়ে ব্রাউন-সাহেবকে ধ'রে তুমি যে সৌদামিনীকে খৃষ্টানদের জেনানা-মিশনে রেখে এসেছ সে খবরও আমরা পেয়েছি!

এতক্ষণে কানাই বুঝতে পারলে সমাজপতিদের অমোঘ দণ্ড তারও মাথায় এসে পড়ছে কেন?

অত্যন্ত বিনীত মিনতি জানিয়ে সে বল'লে—হুজুর। আপনি গরীবের মা-বাপ! বুঝে দেখুন—ও ছাড়া আমি আর মেয়েটার সম্বন্ধে কি সুব্যবস্থা ক'রতে পারতুম? তাকে রাস্তায় বার ক'রে না দিয়ে আমি পাদ্রী বাবাদের কাছে দিয়ে এসেছি। সেখানে তবু সে একটু আশ্রয় পেয়েচে, কিন্তু পথে ছেড়ে দিলে অসহায়া নিরাশ্রয়া হয়ে তাকে অকূল সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে হ'ত! হয় ত আবার মুসলমানদের হাতেই গিয়ে পড়ত,, নয় ত পেটের দায়ে ঘৃণিত-জীবন যাপন ক'রতে বাধ্য হ'ত! বাপ হ'য়ে কি আমি নিজের মেয়ের এত বড় সর্ব্বনাশ ক'রতে পারি?

ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে দীনুহালদার ব'ললে—আমি তোমার কোনও কথা শুনতে চাইনি। মেয়েকে যদি আজই গিয়ে মিশনারীদের আড্ডাথেকে ফিরিয়ে আনতে পার তবেই তোমাকে সমাজে রাখা হবে, নইলে কাল থেকে তোমাকে একঘরে করা হ'য়েছে ব'লে ঢেঁড়া পিটিয়ে দেওয়া হবে।

করজোড়ে কানাই বললে—হুজুর যদি হুকুম দেন যে মেয়েকে আমি আবার ঘরে নিতে পারি—তা হ'লে এখনি গিয়ে আমি সদুকে সেখান থেকে নিয়ে আস্‌ছি!

দীনু হালদার স্বর একবার খুব নরম করে বল্লেন—পাগলামী কোরো না কানাই, কথা শোন! এখনি গিয়ে মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে এস, কিন্তু ঘরে তাকে আর নেওয়া চলবে না।

কাতরভাবে কানাই জিজ্ঞাসা ক'রলে তবে সে কোথায় যাবে?—কোথায় আশ্রয় পাবে?

দীনু এবার মৃদুহেসে আরও স্বর নীচু ক'রে কানাইকে যা ব'ললে; শুনে কাণে আঙুল দিয়ে কানাই উঠে পড়ল।

তীব্র কণ্ঠে ব'ল্‌লে—ও! বুঝিছি এইবার এই জন্যেই আমার উপর আপনাদের এত বেশী চোট! বাড়া ভাতে ছাই পড়েছে না?—কিন্তু আমি ত' পিশাচ নই। এ কাজ আমার দ্বারা প্রাণ থাকতে হবে না জানবেন—

ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে ক্রোধে, ক্ষোভে, অপমানের তীব্র জ্বালায় অস্থির হ'য়ে কানাই চলে আসছিল—দীনু হালদার গম্ভীর ভাবে ব'ললে—কাল থেকে আর এসো না। তোমার চাকরী খতম্। তোমাকে আমি জবাব দিলুম—বুঝলে?

কানাই উত্তেজিত ভাবে ব'ললে—বাঁচলুম!

দাঁতে দাঁত চেপে ধ'রে দীনু হালদার ব'ললে—এই যে বাঁচাচ্ছি তোমাকে আরও ভাল ক'রে! এখনি সমস্ত গাঁয়ে ঢাক পিটিয়ে জানিয়ে দেব যে তোমাকে নীল-গাঁয়ের পঞ্চায়েত আজ থেকেই সমাজচ্যুত ক'রেছে। তোমার চালকেটে বাসা তুলে দেব এখানে আমি।

বিদ্যুৎ বিকাশের মতো কানায়ের মনে মহেশের সেই একঘরে অবস্থাটা জেগে উঠল। তার বুকের ভিতর পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তের জন্য কেঁপে উঠল! তার পরই কি একটা যেন দৃঢ় সঙ্কল্প তার চোখে মুখে দেখা গেল।

কানাই এক রকম ছুট্‌তে ছুট্‌তেই বাড়ী চলে এসে একেবারে লক্ষ্মীর রোগশয্যার শিয়রে গিয়ে ব'সে পড়ল।

লক্ষ্মী স্বামীকে দেখে একটু বিস্মিত হ'য়ে ক্ষীণ কণ্ঠে তুজিজ্ঞাসা কর্‌লে—যি কি আজ কাছারীতে যাও নি?

কানাই একটু ইতস্ততঃ করে বললে—হ্যাঁ গেছ্‌লুম, কিন্তু কাজে মন বসল না। ছুটী নিয়ে ছুটে তোমার কাছে চলে এলুম!

পাণ্ডুর মুখে একটু ম্লান হেসে লক্ষ্মী বললে, বেশ করেছ! অন্তর্যামী আমার কাতর প্রার্থনা তা হ'লে শুনেছেন দেখছি। আজ তোমাকে কাছটীতে পাবার একান্ত আগ্রহ হ'চ্ছিল! ওগো! আমার দিন যে ফুরিয়ে এসেছে! যাবার বেলা শুধু এই একটা দুঃখ আমার রইল যে সত্নকে একবার দেখে যেতে পেলুম না!

এই কটা কথা ব'লেই লক্ষ্মী এমন নেতিয়ে পড়ল' যে তার সর্ব্বাঙ্গ যেন স্থির হয়ে গেছে বলে মনে হ'ল! কানাই অত্যন্ত ভয়-ব্যাকুল হ'য়ে ছুটে গেল কেদার কবিরাজের কাছে।

কিন্তু কানায়ের একান্ত কাতর মিনতি সত্ত্বেও কেদার কবিরাজ তার স্ত্রীকে দেখতে এল না। বল্লে—মাপ করো কানাই,—এই মাত্র পঞ্চায়েতের ঢেঁড়াদার হেঁকে ব'লে গেলো তোমাকে একঘরে করা হ'য়েছে—তোমার ধোবা-নাপিত বন্ধ হয়েচে!—

কানাই সেখান থেকে বেরিয়ে পাগলের মত উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেল ব্রীজ সাহেবের কাছে।

ব্রীজ সাহেব সমস্ত শুনে তখনি মিশনের ডাক্তারকে পাঠিয়ে দিলেন কানায়ের সঙ্গেই, এবং বলে'দিলেন তোমার মেয়েকে আমি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে এখনি যাচ্ছি।

মিশনের ডাক্তারের প্রাণপণ চেষ্টা ও সৌদামিনীর দিবারাত্র শুশ্রূষাতেও লক্ষ্মীকে ধ'রে রাখা গেল না। নীল গাঁয়ের মাতব্বরদের সকল অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়ে লক্ষ্মী জন্মের মত চ'লে গেল। কিন্তু একঘরে কানাই গাঁয়ের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও এমন এক জনও লোক সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌লে না যে তার স্ত্রীকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে সৎকার কর্‌তে তাকে সাহায্য করে!

শেষে ব্রীজ সাহেবের অনুগ্রহে ম্যাজিষ্ট্রেটের পৃষ্ঠ-পোষকতায় ভিন্ন গ্রাম থেকে লোক আনিয়ে কানাইকে তার পত্নীর শেষ কার্য্য সমাধা করতে হ'ল, কিন্তু এক-মাস পরেই অশৌচান্ত ও স্বর্গগত পত্নীর শ্রাদ্ধ শান্তির জন্য কানাইকে আবার একবার বিপদ্‌গ্রস্ত হয়ে পড়্‌তে হ'ল। নীল-গাঁয়ের কোনও নাপিত তাকে কামাতে চাইলে না, কোনও ব্রাহ্মণ পুরোহিত শ্রাদ্ধের ভার নিতে চাইলে না। তখন ব্রীজ সাহেব নিজে খরচ দিয়ে সহর থেকে জন দুই পুরোহিত ব্রাহ্মণ আনিয়ে সৌদামিনীর মায়ের শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করিয়ে দিলেন।

লক্ষ্মীর শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে যাবার সপ্তাহ কাল পরেই কানাই কন্যাকে নিয়ে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হ'ল! দীনু হালদার শুনে হতাশভাবে বল্লে, নীল-গাঁয়ের মুখে এই বার কেনো গোমস্তাটা চূণকালি লেপে দিলে!

পঁচিশ বছর

[শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী, বি-এ]

১

যদি নেমে আসে মেঘ তোমার পথের চারিপাশে,
মানবক, কিবা ভয়?—জানো না কি যৌবন তোমার,
তুচ্ছ করি' ছুটিয়াছে সীমাহীন মহা পারাবার,
উপেক্ষিয়া চলিয়াছে অদৃষ্টের ঘোর পরিহাসে!

জানো না কি সে যৌবন মাতে নাই ভাবের বিলাসে,
রক্তিম আঁখির প্রান্তে আনে নাই মদ-মত্ততার
কুটিল জীবন-ভিক্ষা,—কৃপণের কৃত্রিম আশার
মিথ্যা স্বপ্নে মজে নাই—মাতিয়াছে প্রাণের উল্লাসে!

বক্ষে মোর শুনি আমি যৌবনের মহানৃত্যধ্বনি—
গুরু গুরু সুগম্ভীর,—দূরে যেন ঝরিছে নির্ঝর
গুহামুখে; কুহরে কুহরে তা'র প্রতিধ্বনি ফিরে;—

কোথায় ফুটেছে ফুল,—কোথা' আছে সৌরভের খনি,—
গন্ধময়—নিঃশব্দ আহ্বানে তা'র এ চিত্ত জর্জ্জর;
সন্ধান বাড়িয়া চলে পঁচিশ বসন্ত-ডোর ঘিরে!

২

যে পথ চলিয়া গেছে বনে বনে শীর্ণা নদী সম,
ধূসর, কঙ্করলীনা,—আমি চলি সেই পথ ধরি'
শীত সন্ধ্যা-শেষে,—মাঠগ্রাম একাকার করি'
নামিছে নিঃশব্দ রাত্রি—ছেয়ে যায় সুনিবিড় তম।

আঁধার কবরী 'পরে উঠে শুকতারা—মনোরম
মুকুতা কেশের; কুন্তলে তারকারাজি—মরি মরি
নিদ্রাহীনা রজনীর কি সে শোভা!—আপনা পাসরি'
স্মৃতি মোর সাথে চলে, আর চলে পীরিতি পরম!

অঞ্জলি ভরিয়া লই কামনার কল্প-ফুল-দল;
গাঁথি মালা, নিজে পরি, প্রিয়ারে পরাই ম্লান হেসে—
দোলে বুঝি অশ্রুবিন্দু আ-পাণ্ডুর কপোলে তাহার!—

চিরমৌনা,—তবু তা'র নয়নের জ্যোতি-শতদল
আমার যৌবন-স্বপ্ন—জীবন কৃতার্থ ভালবেসে,
মাধুরী ছড়া'য়ে যাই সারাবেলা ধ্যান-সুষমার!

৩

পঁচিশ বসন্ত এলো;—উৎসবের রাতি আজি তোর.
ওরে কবি, ছন্দে ছন্দে আজি কা'রে পরাইবি মালা?
দু'টি কালো আঁখি কা'র করিবি রে স্বপন-উজালা?
কঙ্কণের পাশে কা'র রাখিবি রে তোর রাখী-ডোর!

নবীনা সে নতমুখী, দ্বারপ্রান্তে উদাসী বিভোর,
ব'সে আছে একাকিনী, রচিয়াছে আপন নিরালা
কত স্নেহ-স্বপ্ন দিয়ে,—এ ভুবনে কত দীপ জ্বালা—
কত দীপ্ত কলহাসি,—ভাঙিল না সে নয়ন-ঘোর!

গুঞ্জরিছে নীল রাত্রি,—তা'রি স্বপ্নে বিভোর পরাণ;
উতল পবন আজি লুটে যেন প্রাণ-পরিমল,—
নব মধুগন্ধলোভী; এ জীবন ফিরিবে না আর!

এই ক্ষণ-পূর্ণতার স্বাদ লভি' ধাও মোর গান,
মানবের দীর্ণ বুকে ধ্বনি' তোল' ক্ষণিক কোমল
আশার মধুর সুর, খুলে দাও স্বরগ-দুয়ার!

"লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন"

[কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি-এ]

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে একটী প্রবাদ-বাক্য বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। প্রবাদ-বাক্যটী এই :—"লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।" ইহার অর্থ এই যে, যদি কেহ অর্থাভাবে বিপদে পড়ে, তাহা হইলে গৌরী সেন অর্থ দিয়া তাহাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, গৌরী সেন পর-দুখ-কাতর, মুক্ত-হস্ত ও মহাত্মা লোক ছিলেন। এখন দেখা যাউক, এই মহাত্মা গৌরী সেন মহাশয় কে ?

সহর হুগলীর নিকটে বালী-নামক একটী স্থান আছে। সেই স্থানে হরেকৃষ্ণ মুরারিধর সেন নামক এক জন সামান্য গৃহস্থ লোক বাস করিতেন। ইনি জাতিতে সুবর্ণ-বণিক্ ছিলেন। মহাত্মা গৌরী সেন ইঁহারই পুত্র। গৌরী সেনের প্রকৃত নাম "গৌরীশঙ্কর সেন।" কেহ কেহ বলেন, ইঁহার নাম "গৌরীনাথ সেন"। যাহা হউক, আমরা এই প্রবন্ধে ইঁহাকে সাধারণতঃ "গৌরী সেন" নামেই অভিহিত করিব।

গৌরী সেনের সময়-নিরূপণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। পাঠকগণ পাদ-টীকায় ইহা দেখিতে পাইবেন। *

গৌরী সেনের পিতা হরেকৃষ্ণ সেন অবস্থাপন্ন ছিলেন না। তিনি এক জন সামান্য গৃহস্থ মাত্র ছিলেন। গৌরী সেন কায়-ক্লেশে সামান্য ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে তিনি যৎসামান্য লাভ করিতে লাগিলেন। সামান্য ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া কেহ কেহ পরিণামে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া থাকেন গৌরী সেনেরও অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছিল।

তৎকালে কলিকাতা-বড়বাজারে বৈষ্ণবচরণ সেট নামক * এক জন ধনাঢ্য তন্তুবায় বাস করিতেন। তিনি যেরূপ ধনে কুবের, সেইরূপে ধর্ম্মেও যুধিষ্ঠির ছিলেন। অধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। কলিকাতার প্রাচীন-ইতিহাসের নানা প্রসঙ্গে বৈষ্ণবচরণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর সহিত তিনি বাণিজ্য করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে তিনি কোম্পানীকে টাকা ধার দিয়া তাঁহাদিগের যথেষ্ট উপকার করিতেন। এই বৈষ্ণবচরণ তৎকালে একজন পরম নিষ্ঠাবান্ হিন্দু বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। দক্ষিণ দেশে তেলিঙ্গানা-নামক স্থানে "রামরাজা" বলিয়া এক জন ঘোর নিষ্ঠাবান্ হিন্দু রাজা ছিলেন। তিনি প্রত্যহ গঙ্গাজল দিয়া স্বীয় অভীষ্ট-দেবতার

---

* হুগলী-নিবাসী সুপণ্ডিত ও প্রত্ন-তত্ত্ব বিৎ স্বর্গত শম্ভুচন্দ্র দে বি-এল মহাশয় বলেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র সেন মহাশয়, গৌরী সেনের অধস্তন অষ্টম পুরুষ ছিলেন। শম্ভু বাবু ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে ঈশ্বর বাবুর মুখে এই কথা শুনিয়াছিলেন। শম্ভু বাবু তৎকালে আরও বলিয়াছিলেন যে, ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে গৌরী সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; সুতরাং এতদনুসারে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু লঙ্ সাহেবের প্রবন্ধে জানিতে পারা যাইতেছে যে, বড়বাজার-নিবাসী বৈষ্ণবচরণ সেট ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে গৌরী সেনকে অংশীদার করিয়াছিলেন। সুতরাং শম্ভু বাবুর মতে দেখা যায় যে, যখন গৌরী সেন বৈষ্ণবচরণের অংশীদার হইয়া কার্য্য করিতেছিলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১৪৬ বৎসর, কিন্তু ইহা অসম্ভব। বোধ হয়, ঈশ্বর বাবু আপনাকে গৌরী সেনের অষ্টম পুরুষ বলিয়া ভুল করিয়াছেন। ফল কথা এই যে, পলাশীর যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বেই গৌরী সেন ও বৈষ্ণবচরণ বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া উভয়েই ধনাঢ্য হইয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা অনুমান হয় যে, সপ্তদশ-শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা অষ্টাদশ-শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌরী সেনের জন্ম হইয়াছিল।

* মদীয় পরম-বন্ধু সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেট মহাশয় "সেট ও বসাকদিগের" সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি একখানি বৃহৎ খাতায় এই সব তথ্য লিখিয়া রাখিয়াছেন। আমি তাঁহার খাতা দেখিয়া বৈষ্ণবচরণ ও গৌরী সেন সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারিয়াছি। "কলিকাতায় প্রাচীন হিন্দু-কলেজের" ইতিহাস আমি লিখিয়াছি। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ২০ জানুয়ারি, সোমবার (১২২৩ বঙ্গাব্দে ৯ মাঘ) তারিখে গরাণ-হাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাটীতে সর্ব্ব-প্রথমে হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গোরাচাঁদ বসাক সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য আমি উক্ত শ্রীনগেন্দ্রনাথ বাবুর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। সেট ও বসাক মহাশয়গণ নগেন্দ্র বাবুর অমূল্য খাতাখানি ছাপাইয়া দিলে প্রাচীন কলিকাতার অনেক কথা জানিতে পারা যাইবে।—লেখক

পূজা করিতেন। তিনি বৈষ্ণবচরণের প্রেরিত গঙ্গাজল ব্যতীত অন্য জলে পূজা করিতেন না। বৈষ্ণবচরণ প্রতি-দিন কয়েকটী কলস গঙ্গাজলে পূর্ণ করিয়া ও তাহাতে নিজ-নামাঙ্কিত মোহর দিয়া ডাকযোগে তেলিঙ্গানায় রামরাজার নিকটে প্রেরণ করিতেন। বৈষ্ণবচরণের গঙ্গাজল না পাইলে রামরাজা পূজা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন না।

শাস্ত্রে বলে, "যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ", অর্থাৎ "যোগ্য বস্তুর সহিত যোগ্য বস্তুরই মিলন হইয়া থাকে।" এক দিকে যেমন বৈষ্ণবচরণ, অন্যদিকে তেমন গৌরী সেন। কি সূত্রে বলা যায় না, উভয়ের মধ্যে পরম সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। বৈষ্ণবচরণ, গৌরী সেনের সাধুতা ও ধার্ম্মিকতা দেখিয়া তাঁহাকে স্বীয় ব্যবসায়ে অংশীদার করিয়া লইয়া-ছিলেন। একবার বৈষ্ণবচরণ, অংশীদার গৌরী সেনের নামে প্রচুর "দস্তা" ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনি দেখিলেন যে, এই দস্তার সঙ্গে প্রচুর-পরিমাণে রৌপ্য মিশ্রিত রহিয়াছে। তখন তিনি গৌরী সেনকে কহিলেন, আপনারই সৌভাগ্যে এই দস্তার সঙ্গে এত রূপা রহিয়াছে। ইহা বিক্রয় করিয়া যে লাভ হইবে, তাহা আপনিই লইবেন, আমি লইব না। এই বলিয়া সমস্ত লাভের টাকা বৈষ্ণব-চরণ, গৌরী সেনকে আহ্লাদ-সহকারে প্রদান করেন।*

ঈশ্বরচন্দ্র সেন নামক একটী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সহর হুগলীর নিকটবর্ত্তী বালী-নামক গ্রামে বাস করিতেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি জীবিত ছিলেন। এখন তিনি জীবিত আছেন কি না, জানি না। স্বর্গত শম্ভুচন্দ্র দে বি-এল মহাশয় তাঁহার পরম বন্ধু ছিলেন। শম্ভু বাবু, ঈশ্বর বাবুর মুখে গৌরীসেন সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছিলেন। এই ঈশ্বর বাবু কে, তাহাও বলা উচিত। স্বর্গত ক্রোরপতি মহাত্মা মতিলাল শীল মহাশয় ইঁহার সাক্ষাৎ পিতৃ-স্বসৃ-পতি (পিসে-মহাশয়) ছিলেন।†

শম্ভু বাবু, ঈশ্বর বাবুর মুখে একটী অলৌকিক গল্প

* The Rev. James Long, Calcutta Review, vol. XVIII, p. 309

† স্বর্গত মহামতি দানবীর মতিলাল শীল মহাশয়ের নামটী স্মরণ করিলেও তাঁহার প্রতি ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনি সামান্য লোক হইতে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার মত মুক্ত-হস্ত ও মহাত্মা পুরুষ তৎকালে আর কেহই ছিলেন না। তাঁহার মাহাত্ম্য ও [illegible] সম্বন্ধে অনেক কথা অনেক প্রাচীন সংবাদ-পত্রে পাঠ করিয়াছি। এখন তৎ-সম্বন্ধে দুইটা চারিটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না:—

১। মতিলাল শীল মহাশয় রাজা রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেনের পরম বন্ধু ছিলেন। পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজেই একটী মেডিক্যাল কলেজ ছিল। ইহাতে ৩০ রোগী থাকিত। শীল মহাশয় ইহাদের খরচ দিতেন।

২। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ১জুন যখন "মেডিক্যাল কলেজ" স্থাপিত হয়, তখন শীল মহাশয় চাঁদার খাতায় ১২০০০৲ (বার হাজার) টাকা সই করিয়াছিলেন। হেয়ার সাহেব টাকার তাগাদা করিতে গেলে শীল মহাশয় বলিলেন, "সাহেব! আর টাকা দিব কি? আমার বাটীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে যে আমার জমী টুকু আছে, তাহাই দিলাম। এখন জমী টুকুর মূল্য কি, তাহা পাঠকগণ বুঝিয়া দেখুন।

৩। হীরা-বুলবুল-নামা পশ্চিম-দেশীয়া কোন এক বারাঙ্গনা কলি-কাতায় বাস করিত। তাহার একটী নয়-বৎসর-বয়স্ক পুত্র ছিল। এই বালকটীকে হিন্দু-কলেজে ভর্ত্তি করায় ধনাঢ্য হিন্দুগণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বহুবাজারের রাজেন্দ্রনাথ দত্ত (রাজা বাবু) ও মতিলাল শীল "হিন্দু-মেট্রপলিট্যান কলেজ" স্থাপন করেন। ইহার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য শীল মহাশয় মাসিক ৫০০৲ টাকা দান করিতেন।

৪। প্রসিদ্ধ সিলস্-ফ্রি-কলেজের জন্য তিনি প্রচুর-পরিমাণে দান করিয়া গিয়াছেন।

৫। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখের "Literary Gazette" নামক সংবাদ-পত্রে দেখা যায় যে, "মেডিক্যাল কলেজে" পারিতোষিক-বিতরণের নিমিত্ত মতিলাল শীল মহাশয় ১০০০০০৲ (এক লক্ষ) টাকা দান করিয়াছিলেন। Fever Hospitalএর নিমিত্তও তিনি প্রচুর টাকা দিয়াছিলেন। শীল মহাশয়দিগের দানশীলতায় মেডিক্যাল-কলেজ অদ্যাপি হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া রহিয়াছে।

৬। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ১০ অক্টোবর তারিখের Friend of India নামক সংবাদ-পত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুর্গাপূজার সময় মতি-লাল শীল মহাশয় "পেটি কোর্ট জেলের" কয়েদীদিগকে খালাস করিয়া আনিতেন। যে টাকা দেনা করিবার জন্য কয়েদীরা কারাগারে আবদ্ধ থাকিত, শীল মহাশয় সেই টাকা গবর্ণমেণ্টে জমা দিয়া ও তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব গৃহে পাঠাইয়া দিতেন।

৭। শীল মহাশয় যেরূপ নম্র, সেইরূপ তেজস্বী ছিলেন। স্বর্গত সুপণ্ডিত ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন, মতিলাল শীলের মত যুগপৎ নম্র ও তেজস্বী লোক দেখা যায় না। কলেরায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্রগণ তাঁহারই ঘাটে তাঁহাকে তীরস্থ করেন। তখন শীল মহাশয়ের পূর্ণ জ্ঞান ও চৈতন্য ছিল। পুত্রগণ বলিলেন "বাবা! মা গঙ্গাকে একবার দর্শন করুন।" মতিলাল হাত যোড় করিয়া গঙ্গাদেবীর দিকে চাহিয়া নম্রভাবে বলি-

শুনিয়া ইহা নিজ গ্রন্থে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন *। অলৌকিক হইলেও আধ্যাত্মিক-ভাবে ইহা সম্ভবপর। গল্পটী এই :—"মেদিনী-শঙ্কর-পুর-নিবাসী কায়স্থ-কুলোদ্ভূত ভৈরবচন্দ্র দত্ত নামক একটী ভদ্রলোক গৌরী সেনের পরম বন্ধু ছিলেন। সেন মহাশয়, দত্ত-মহাশয়কে অত্যন্ত ভালবাসিতেন ও বিশ্বাস করিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে নানাবিধ পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে দিতেন। একবার তিনি সাত নৌকা দস্তা বিক্রয় করিবার জন্য ভৈরবচন্দ্রের নিকটে পাঠাইয়া দেন। একখানি নৌকার উপরি-ভাগে একটী বৃদ্ধ সন্ন্যাসীও বসিয়া যাইতেছিলেন। দাক্ষিণাত্যে তীর্থ-দর্শন করিতে যাওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। যখন দস্তা-পূর্ণ নৌকাগুলি ভৈরবচন্দ্রের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন তিনি পণ্য দ্রব্যগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, ইহা দস্তা নহে,—খাটি রূপা। তখন তিনি ভাবিলেন, দস্তার দাম দিয়া রূপা কিনিলে বন্ধুবর গৌরী সেনের বিশেষ ক্ষতি হইবে। বোধ হয়, ভ্রম-বশতঃ সেন মহাশয় ইহা আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহা ভাবিয়া ভৈরবচন্দ্র সেই রৌপ্য-পূর্ণ সাত খানি নৌকা হুগলীতে গৌরী সেনের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। নৌকাগুলি উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে গৌরী সেন রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, স্বয়ং মহাদেব যেন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'তুমি দস্তা দিয়া আমার কৃপায় রূপা পাইলে। এখন বাটীতে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে আমাকে প্রতিষ্ঠা কর।' গৌরী সেন মহাদেবের আদেশে নিজ গৃহে একটী শিব-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখনও এই শিব-মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে।"

গৌরী সেন এই সময় হইতেই প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই ধন সৎকার্য্যেই ব্যয়িত হইতে লাগিল। দীন দুঃখী লোক সকল তাঁহার নিকটে সাহায্য পাইয়া আপনাদের দুঃখ দূর করিতে লাগিল। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর সময়ে যাহারা দেনার দায়ে জেলে যাইত, তাহারা যতদিন না দেনা পরিশোধ করিতে পারিত, ততদিন তাহারা জেলে আবদ্ধ থাকিত। সুতরাং জীবনে দেনা শোধ করিতে না পারিলেই জেলের মধ্যে তাহাদের মৃত্যু হইত। এই হেতু, এখনও আমাদের দেশে এই একটা প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে,—"তোকে জেলে পচাব।" অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই কয়েকটী মহাত্মা লোক আবির্ভূত হইয়াছিলেন,—পিটার স্থাকিয়া ও তাঁহার স্ত্রী রিজেবিব, জ্যাকোরিয়া ও গৌরী সেন। এই চারিটী মহাপ্রাণ লোক দেনার দায়ে কয়েদী লোকদিগকে টাকা দিয়া উদ্ধার করিয়া আনিতেন। ইঁহাদের পরে মহাপ্রাণ মতিলাল শীল ও রামতনু মল্লিক মহাশয়ও উক্ত মহাত্মাদিগের সাধুপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে সুফল না ফলিয়া কুফল ফলিতে লাগিল। অনেক লোকেই টাকা ধার করিয়া জেলে যাইতে লাগিল। তাহারা বুঝিয়াছিল যে, আমরা যত টাকা দেনা করিয়াই জেলে যাই না কেন, মতিলাল শীল ও

লেন, "মা গঙ্গা! মতিলাল শীল ইহজীবনে কখনও কোন মানুষের কাছে হাত যোড় করে নাই। তুমি জগজ্জননী! তোমার কাছে হাত যোড় করিয়া ভিক্ষা চাহিতেছি, তোমার এই অধম সন্তানকে কোল দাও।"

৮। মতিলাল শীল মহাশয় অত্যন্ত রসিক পুরুষ ছিলেন। বাটীতে ক্রিয়া-কলাপের সময় তিনি বাঈনাচ, খামটা নাচ, গোপালে উড়ের যাত্রা, দাশুরায় রায় প্রভৃতির পাঁচালী দিতেন। একবার দাশুরায় পাঁচালী গাহিতেছেন। শীল মহাশয়ের জনৈক বন্ধু, দাশুরায়কে গোপনে বলিলেন, আপনি এই সভায় শীল মহাশয়ের কিছু মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। তখন দাশুরায় শীল মহাশয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ছড়া বাঁধিয়া বলিলেন—

> সেঁয়ের কালী, ভুবোর কালী, তারে বলি কি কালী?
> কালীর মধ্যে মানি কেবল সেই কালীঘাটের কালী।
> ভাঁড়ার সিং, মোষের সিং, তারে বলি কি সিং?
> সিং এর মধ্যে মানি কেবল দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং।
> উপরে শিল, নীচের শিল, তারে বলি কি শিল?
> শিলের মধ্যে মানি কেবল এই মতিলাল শীল।

গুণগ্রাহী শীল মহাশয় ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ দাশুরায়কে বিলক্ষণ পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন।

মহাত্মা মতিলাল শীল, মহাত্মা দুর্গাচরণ লাহা, মাধবচন্দ্র দত্ত, সাগরচন্দ্র দত্ত মহাশয়-গণ এক একটী ধন-কুবের ছিলেন। তাঁহারা অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া নানারূপে দেশের প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বংশধর-গণও এক একটী ধন-কুবের। কিন্তু বিষম দুঃখের বিষয় এই যে, উক্ত মহাত্মাদিগের বংশধর-গণ কেহই তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের জীবন-চরিত লিখিলেন না। উক্ত মহাত্মগণের জীবন-চরিত না লিখিলে বংশধর-গণের বিশেষ অন্যায়, ইহাই আমার ধারণা।—লেখক

* S. C. Dey's Hughly, Past and Present, p. 101

রামতনু মল্লিক মহাশয় আমাদিগকে নিশ্চিত উদ্ধার করিয়া আনিবেন। এই বিশ্বাসে কয়েদীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফ্রেণ্ড-অফ-ইণ্ডিয়ার সম্পাদক জন-ক্লার্ক-মার্শমেন সাহেবও এ বিষয়ে বহু বিদ্রূপ করিয়া নিজ সংবাদ-পত্রে লিখিতে লাগিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসের উক্ত সংবাদ-পত্র পাঠ করিলেই এ সকল কথা জানিতে পারা যায়।

গৌরী সেন যেরূপ বিনয়ী, সেইরূপ তেজস্বী ছিলেন। বলরাম সেন নামক একজন ধনাঢ্য বৈদ্য হাতীর উপরে চাপিয়া একবার তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসেন। হাতীর উপর হইতেই নিমন্ত্রণ করায় গৌরী সেন আপনাকে অবমানিত মনে করিয়া বলরাম সেনকে কহিলেন, আপনি যদি হাওদা হইতে নামিয়া আসিয়া আমাকে নিমন্ত্রণ না করেন, তবে আমি আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিব না। বলরাম লজ্জায় ও ক্রোধভরে হাতীর উপর চাপিয়া চলিয়া গেলেন।

গৌরী সেন যখন তখন নিজ বাটীতে মহা-সমারোহে ক্রিয়া-কলাপ করিতেন। একবার তিনি কোন বিশেষ কার্য্যের উপলক্ষে হুগলী ও অন্যান্য স্থানের সজাতীয়-গণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি যে কেবল তাঁহাদিগকে পরিতোষ-পূর্ব্বক আহার করাইয়াছিলেন, তাহা নহে। প্রত্যেক নিমন্ত্রিত লোককে প্রচুর ধন-সম্পত্তিও দান করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, গঙ্গার পশ্চিম পারে কেহ কখনও এরূপ সমারোহে কার্য্য করিতে পারেন নাই। যে কোন ব্যক্তির অর্থাভাব হইত, সে মনে মনে জানিত যে, গৌরী সেন আছেন, আমার ভাবনা কি ?—এইজন্যই "লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন,"—এই প্রবাদ-বাক্য বহু-কাল হইতেই বাঙ্গালা-দেশে চলিয়া আসিতেছে।

কুন্দনন্দিনী

(গল্প)

[শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী]

১

গীতিরাণী অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া যখন মোটরে আসিয়া বসিল, তখন বেশ বেলা হইয়া গিয়াছে।

সঙ্গে ঝি কাত্যায়নী বা কাতু। পূজার নির্ম্মাল্য আর প্রসাদের থালা-খানা এক পাশে সাবধানে নামাইয়া রাখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "আর কোথাও যাবে, দিদিমণি ?—না সোজা বাড়ীতেই..."

গীতি রেশমী উড়ানীতে মুখের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিল,—"না, আজ আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই! তবে মোটর যেন একটু আস্তে আস্তে নিয়ে যায়,—"

"কেন গা ?"—কাত্যায়নী তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া শঙ্কিত-স্বরে সাগ্রহে উৎকণ্ঠা-ভরে জিজ্ঞাসা করিল, কোথাও হ্যাঁচকা ট্যাঁচকা লাগল না কি ?"

গীতি সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল—"দূর! তোমার কেবল ঐ ভাবনা !—

"ওসব নয়; তবে বাজারটা একটু দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাব, তাই—!"

"হরি বল! তোমার বাজার দেখে আশ আর মেটে না, বাপু!—এই যে কালই সেই ফিরিওয়ালাটার ঠেঙে কি কতক-গুলো বাজে জিনিস কিনে ফেল্লে একটা-আঁচলা টাকা দিয়ে, তা একটু দরদ লাগে না পয়সা গুলো জলের মত খরচ করতে ?"

কাত্যায়নী গীতির বাপের বাড়ীর পুরানো ঝি। তাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। তাই তার এই সস্নেহ ভৎর্সনা-টুকু সানন্দে পরিপাক করিয়া সে হাসিতে হাসিতে বলিল "ভগবান্ খুসি হয়ে দিয়েছেন, তবু খরচ করব না ? এ যে তোমার অন্যায় কথা, কাতুদি!—অমন হাড়-কিপ্‌টে হতে আমি কক্ষনো পারব না।"

গীতিরাণী অবস্থাপন্ন লোকের কন্যা। উপর্য্যুপরি দুইটী পুত্র সন্তানের পর এই একটী মাত্র মেয়ে। কাজেই

পিতা মাতা আর ভাইদের কাছে অত্যধিক আদর যত্ন পাইয়া সে ছোট বেলা থেকেই এমন আদুরে ও আবদেরে হইয়া উঠিয়াছিল, যে শেষ কালে মা বড় ভাবনায় পড়িয়াছিলেন, পরের ঘরে গিয়ে মেয়েটা যদি কষ্ট পায়। গীতিরাণীর কিন্তু তপস্যা ছিল ভাল। তার স্বামী ডাক্তার ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, বেনারস কুইন্স কলেজের এক জন প্রোফেসার; মোটা মাহিনা পান; তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির আয়ও যথেষ্ট। সংসারে শ্বশুর-শ্বাশুড়ী বা অন্য অভিভাবক কেহ ছিলেন না। সুতরাং স্বামি-গৃহে, স্বামীর অকৃত্রিম ভালবাসা আর অবাধ স্বাধীনতা লাভ করিয়া, তার আদুরে-আবদারের ভাব পুরাপুরি কায়েমী-বন্দোবস্ত করিয়া রহিয়া গেল।

ললিতকুমার স্ত্রীর কোন ইচ্ছাতেই বাধা দেয় না। গীতির রূপে গুণে কোন অসাধারণ বিশেষত্ব ছিল না, তবু ললিতকুমার তাকে খুবই ভাল বাসিতেন। গীতির শিশুর মত সরলতা তার ভারি মিষ্ট লাগিত।

গীতির আদেশমত, মোটর খুব আস্তেই যাইতেছিল। দুধারেই সজ্জিত বিপণীর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, গীতি উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "দোকান গুলো কি চমৎকার সাজিয়েছে দেখ কাতুদি!"

"ওমা!—তা আর সাজাবে না!—পূজোর বাজার যে!"

"পূজোর তো এখনও দেরী আছে..."

"দেরী আর কই!—এই তো আজ অপর পক্ষের সাত দিন গেল। আমাদের দেশে এক মাস আগে থাক্‌তে বাজার কি রকম সাজায় তা দেখেছ তো! হুঁ—তার কাছে কি আর এসব চোখে লাগে?"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া কাতু একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

গীতি, কারণটা অনুমানে বুঝিতে পারিয়া, সকৌতুকে একটু হাসিয়া বলিল,—"দেশের জন্যে তোমার মন-কেমন করছে, না কাতুদি?"

"তা কেন?—ভগবান্ দিন দেন এই তো দেবী-পক্ষের ভেতরে, আমাদের যেতেই হবে। তার পর জোড়ামাস পড়্‌লে আর তো..." কথাটা শেষ হইবার আগেই গীতিরাণী হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিলেন, "রোক্কো। রোখ দো—"

কাত্যায়নী একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, "কি হ'ল আবার?—থাম্‌বে কেন?—বেলা তো কম হয় নি।"

সামনের একটা মণিহারীর দোকানে, পরে পরে সজ্জিত জমকালো সৌখীন জিনিসগুলির দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া, গীতি দুষ্টুমীর হাসি হাসিয়া বলিল,—"দেখছ না?—চোখের মাথা একেবারেই খেয়েছ না কি? যাই বল, একটা কিছু নূতন জিনিস না নিয়ে, আমি শুধু হাতে ফির্‌তে পার্‌ব না, বাপু!—কদ্দিন পরে আজ এদিকে এসেছি—"

সুদৃশ্য মোটর এবং মোটরের অধিকারিণীর আগ্রহ দেখিয়া, দোকানদার, শশব্যস্ত হইয়া, দোকানের মালপত্র দেখাইতে লাগিল।

কত রকমের কত জিনিস; সুন্দর, মনোহর। দেখিয়া গীতি ভাবিয়া পাইতেছিল না, কোন্‌টা রাখিয়া কোন্‌টা কিনিবে। একটা হাতীর দাঁতের কাজ-করা, আরসী-বসান, ফুলকাটা বাক্স গীতির খুব পছন্দ-সই হইল। তার দাম কত জিজ্ঞাসা করায় দোকানী বলিল বেশী নয়,—"তেরো টাকা সাত আনা মাত্র।—"

দামটা যেন বড্ড বেশী বোধ হইল,—তাই বাক্সটা নাড়া চাড়া করিতে করিতে বলিল, "ঠিক ক'রে বল, তুমি বড্ড বেশী দাম বলছ।"

কাত্যায়নী মাঝে পড়িয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল "তোমাকে দেখে বাড়িয়ে তো বল্‌বেই, দিদিমণি!—থাক্ ওটা এখন ফিরিয়ে দাও জামাই বাবুকে বল্‌ব, কাল..."

অমন খদ্দের হাত-ছাড়া হয়ে যায় দেখিয়া, দোকানী বাধা দিয়া শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল,—"আচ্ছা, নিয়ে যান, সাত আনা ছেড়ে দিলুম,—এ শুধু আপনার খাতিরে। এ রকম জিনিস সদা-সর্ব্বদা বাজারে পাওয়া যায় না!"—

গীতির সঙ্গে ছিল কিন্তু কেবল পাঁচ টাকার নোট এক খানা আর চারটী টাকা, তার মহা আপশোষ হইল টাকা কিছু বেশী করিয়া কেন সঙ্গে আনে নাই। অনিচ্ছায় বাক্সটী কোল থেকে নামাইয়া সে বলিল, "থাক, এখন দরকার নেই।"

দোকানদার এই ভাগ্যবানের ঘরণীর কাছ থেকে কিছু 'দাঁও' বাগাবার ফিকিরে দামটা অতিরিক্ত বাড়াইয়াই বলিয়াছিল, তাই বাক্সটা ফিরাইয়া দিতে দেখিয়া সে

ব্যগ্রভাবে বলিল, "আচ্ছা, আপনি নিজের মুখেই বলুন না, এ জিনিসের দাম কত হতে পারে ?"

দোকানীর সেই চড়া গলার আওয়াজের মধ্যে শোনা গেল, নারী-কণ্ঠের ক্ষীণ, করুণ স্বর—"আমাকে কিছু দেন যদি দয়া করে"—শুনা গেল।

গীতি সচকিত হইয়া, মুখ ফিরাইয়া দেখিল—একটী অল্প-বয়সী বাঙ্গালী মেয়ে মোটরের পাশে মিনতি-ভরা দীন-নয়নে তাহারই দিকে চাহিয়া—শ্বেত পদ্মের পাপড়ীর মত শুভ্র সুন্দর হাতখানি পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

গীতি সওদা করা ভুলিয়া গিয়া, তাহার দিকে অনিমেষ-নয়নে চাহিয়া মনে মনে বলিল, কে এ ?—ভিখারিণী ?—ভিখারিণীর কি এত রূপ হয় ?

মেয়েটী বাস্তবিক সুন্দরী, কিন্তু বড্ড বেশী রোগা। চোখের কোল বসা, তাহাতে কালির রেখা পড়িয়াছে; তবু সে চোখদুটী যেন তাকিয়ে দেখ্‌বার মত। দুঃখ, কষ্ট, দৈন্য তার যৌবন-পুষ্পিত তনুখানির সৌন্দর্য্য-শ্রীকে যেন মেঘ-ঢাকা চাঁদের মত নিষ্প্রভ করিয়া তুলিয়াছে।

পরণে একখানি কালো-ফিতে-পাড়, আধ ময়লা ছেঁড়া সাড়ী; সেই রকমেরই একটা সেমিজ, তাও আবার বৃষ্টির জলে ভিজে গিয়ে গায়ের সঙ্গে লাগিয়া রহিয়াছে।

অঙ্গে আভরণের চিহ্নমাত্র নেই, শুধু কয়েক গাছি ফিকে-নীল রংয়ের রেশমী চুড়ী তার গৌরবর্ণ হাত দুখানির লাবণ্য সুকুমার করিয়া তুলিয়াছে। গীতির মনে করুণা ও কৌতুহল এক সঙ্গে জাগিয়া উঠিল।

গ্রাহিকার মনোযোগ অন্যদিকে আকৃষ্ট হইতেছে দেখিয়া, দোকানদার মহা খাপ্পা হইয়া ধমক দিয়া বলিল, "এই মাগি হঠ্‌ যা, ভাগ যা হিঁয়াসে !—"

মেয়েটী থত-মত খাইয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল, গীতি এক বাক্স সাবান আর এক খানা চিরুণী কিনিয়া দোকানীকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিয়া দিল, তার পর মোটর থেকে মুখ বাড়াইয়া মেয়েটীকে বলিল, "শোনো, এ দিকে এস—"

মেয়েটী ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইয়া মোটরের পা-দানীর কাছে দাঁড়াইল। সহানুভূতি-ভরা করুণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া গীতি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে গ ?—কি চাও ?"

মেয়েটী কিছু বলিবার আগেই, কাত্যায়নী বিরক্তি-ভরে বলিয়া উঠিল "কে আবার ? দেখ্‌ছ না ও ভিখিরীর মেয়ে"

"আঃ ! তুমি থামো না কাতুদি !"—

তাহার সরলতা-মাখা, সুন্দর মুখ আর মিষ্টি কথায় কতকটা আশ্বস্ত হইয়া মেয়েটী ধীরে ধীরে বলিল, "আমি বড় দুঃখী, ভয়ানক কষ্টে পড়েছি; দয়া করে যদি কিছু ভিক্ষা দেন, তা হলে—"

মেয়েটীর মুখে, চোখে, কণ্ঠস্বরে এমন একটা গভীর ব্যথা ও কারুণ্য মাখা ছিল যাহাতে গীতিরাণীর কোমল প্রাণ মমতা ও সমবেদনায় বিগলিত হইয়া গেল। আহা ! এই ভাগ্য-বিড়ম্বিতা, সুন্দরী তরুণী অদৃষ্ট-দেবতার নির্ম্মম অভিশাপে আজ পথের কাঙ্গালিনী; কিন্তু এক দিন ওর জীবন, হয় তো, কতই সুখের, কতই গৌরবের ছিল।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া একটু খানি ভাবিয়া গীতি স্নিগ্ধ কোমল-স্বরে বলিল—"তুমি আমার সঙ্গে, আমাদের বাড়ীতে যাবে ? তা হ'লে তোমার আর কোন কষ্টই থাকবে না।"

মেয়েটী তার ডাগর চোখ দুটী বিস্ফারিত করিয়া প্রশ্ন-কারিণীর পানে চাহিয়া রইল। তাহার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। মহার্ঘ্য বেনারসী সাড়ী আর হীরা মোতির সৌখীন অলঙ্কারে সজ্জিতা গীতিরাণীকে যেন দেবী-প্রতিমার মত দেখাইতেছিল। মেয়েটীকে তদবস্থায় দেখিয়া গীতি তার প্রশ্নের পুনরুক্তি করিল। মেয়েটী এবার একটু ইতস্ততঃ করিয়া সংশয়-জড়িত কুণ্ঠার স্বরে বলিল, "আপনি যদি দয়া করে আমাকে নিয়ে যান, তাতে আমার আপত্তি কি আছে, কিন্তু—"

"কিন্তু কি বল না ? তোমার কোনও আত্মীয় যদি—"

"আত্মীয় ? না না, আমার তিন কুলে কেউ নেই; তা থাকলে আর এমন দশা হয় ?"

"তবে চল না ?"

"যাচ্ছি; কিন্তু আমার ভয় করছে, আপনারা বড় লোক—কোনও হাঙ্গামায় পড়তে হবে না তো ?"

"হাঙ্গামা কি রকম ?"

"কত রকম ! এই পুলিশ টুলিশ—" গীতিরাণীর সরল

[illegible]

গীতি হাসিতে হাসিতে বলিল, "পাগল না কি? তুমি কি চোর যে পুলিশে ধরিয়ে দেব? কোনো ভয় নেই তোমার, উঠে এস।"

গীতি সত্যি সত্যিই সেই অচেনা অজানা মেয়েটাকে গাড়ীতে তুলিয়া নিল। কাত্যায়নী কিছুতেই বাধা দিতে না পারিয়া নিষ্ফল আক্রোশে নিজের মনেই গজর গজর করিতে লাগিল, "কি খেয়ালী মেয়ে বাপু! যা জেদ ধরবে তা করেই ছাড়বে! কোথাকার ভিখারী মেয়ে, চোর কি ছ্যাঁচোড় তার ঠিক নেই—"

গীতি তাকে যতই চোখ টিপিতে লাগিল, কাতু ততই রাগিয়া উঠিতে লাগিল।

২

প্রোফেসার সাহেব, তখন কলেজে। বাড়ীতে চাকর-বাকর ছাড়া আর কেহ ছিল না।

গীতি সেই অপরিচিতা মেয়েটার হাত ধরিয়া নিরিবিলি ঘরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি ভাই? তোমার পরিচয় জান্‌তে যে বড় আগ্রহ হচ্ছে—"

মেয়েটা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চারিদিকে দেখিতেছিল। তার ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল—এই ধনি-গৃহের আড়ম্বর দেখিয়া সে যেন হতভম্ব হইয়া গিয়াছে।

গীতির সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে, সে বিমর্ষভাবে বলিল, "আমার নাম, বিজনবালা। পরিচয় আর কি শুন্‌বেন? আমি দুঃখী অতি দুঃখী"।

"তাতে কি হয়েছে? পৃথিবীতে সুখী আর কজন আছে, ভাই! তুমি তোমার দুঃখের কথা আমাকে সব বল। আচ্ছা, আগে ভিজে কাপড়টা তোমার ছেড়ে ফেল দেখি—"

গীতি আল্‌না থেকে, নিজের এক খানা চওড়া কালা পেড়ে সাড়ী, আর পরিষ্কার সেমিজ পাড়িয়া পাশের বাথ-রুম দেখাইয়া দিয়া বলিল, "বেশ করে সাবান দিয়ে, গা, হাত, মুখ ধুয়ে এই কাপড় সেমিজ পরে এস, আমিও ততক্ষণ এই গয়না আর কাপড়ের খোলোসটা ছেড়ে রাখি;—বেনারসী কাপড় পরা যেন একটা বিভ্রাট, কিন্তু কাতুদি তো ছাড়বে না।"

করিয়া এলো চুলের রাশি পিঠের উপর ছড়াইয়া দিয়া যখন ঘরে ফিরে আসিল তখন তাকে যেন আর চেনা যায় না!

গীতি এক মুহূর্ত্ত নীরবে মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে চিরুণী খানা তুলিয়া নিয়া, বিজনের সকাতর অনুনয় ও নিষেধ সত্ত্বেও, সে নিজের হাতে তার অযত্ন-ছড়ান চুল-গুল আঁচড়াইয়া দিতে লাগিল।

সেই রেশমের মত নরম, কাল কুচকুচে চুলের গোছা নিয়া গীতি প্রশংসার স্বরে বলিল, "আহা! এমন সুন্দর চুল তোমার কিন্তু কি অযত্নেই জটা পাকিয়ে রেখেছ।"

বিজন উত্তরে কিছুই বলিল না;—নিঃশব্দে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। সম্মুখের বড় আয়না খানায় একসঙ্গে দুজনেরই ছায়া পড়িয়াছিল। চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে গীতি দেখিল,—বিজনবালা সুন্দরী বটে! সাধারণ বাঙ্গালীর ঘরে, এমন রূপ সচরাচর দেখা যায় না! হায়......! রূপসী বলে গীতিরও একটু খ্যাতি ছিল; কিন্তু বিজনের সেই স্বভাব-সুন্দর অনাড়ম্বর রূপের কাছে, প্রসাধিত, মার্জ্জিত, রূপশ্রীও যেন ম্লান দেখাইতেছিল। তবু কত কষ্টে কত অযত্নে রয়েছে বেচারী! হয় তো পেট ভরিয়া একবেলাও খাইতে পায় না, তবু—এত রূপ।

গীতির সরল মনে খল কপটতা ছিল না; তাই পথে কুড়ান ভিখারী-মেয়ে বিজনের কাছে নিজের রূপের গর্ব্ব খর্ব্ব হইতে দেখিয়াও, সে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না, বরং একটা গর্ব্ব ও আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিল এই ভাবিয়া যে শুধু দুঃখীর দুঃখ-বিমোচনই সে আজ করে নাই, আজ সে অজ্ঞাতে সংসারের আবর্জ্জনার ভিতর হইতে একটা লুপ্ত রত্নকে উদ্ধার করিতে পারিয়াছে।

কেশ-বিন্যাস শেষ করিয়া, গীতি বিজনের সিঁদুর-রেখা-হীন সীমন্তের দিকে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা, এত বয়স পর্য্যন্ত তোমার বিয়ে হয় নি, কিংবা—"

"আমি আপনাকে সব কথাই বলছি, দিদি! কিন্তু, আমাকে কিছু খেতে দিন আগে। আমি তিন দিন থেকে

"ও মা! তাই না কি? আহা! আমার যে একথা মনেই পড়ে নি; তুমি বসো ভাই! আমি এখনি আমাদের ভাত দিতে বলি গে।"

গীতিরাণী বাঙালী বামুন-ঠাকুরকে দু-খানা থালায় ভাত দিতে বলিতেই, কাত্যায়নী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। ঘৃণায়, মুখ বিকৃত করিয়া সে বলিয়া উঠিল, "ওমা! সেকি অনাছিষ্টি কথা গো? থালায় করে ওকে ভাতবেড়ে দিতে হবে? ও ছুঁড়ীর জাত-জন্মের কিছু ঠিক নেই। কাশী সহরে, কত বদমাইস, কত নষ্ট দুষ্ট নচ্ছার—"

"আ! কেন মিছে বকছ, কাতুদি? ও মেয়ে ভাল না'হলে কি আজ এক মুঠো ভাতের জন্তে, পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়ায়? আর অজাত, কুজাত হলেই বা? ভগবানের জীব তো বটে? আহা! বেচারী, তিন দিন থেকে ভাত পায় নি!"

আহারান্তে, গীতির শরীরে আলস্ত, আচ্ছন্ন-ভাব এতই প্রবল হইয়া উঠিল, যে বিজনের পরিচয় শুনিবার অবকাশ আর রহিল না। বেশ এক ঘুম ঘুমাইয়া মুখে চোখে জল দিয়া সে ঘড়ীতে দেখিল সাড়ে তিনটে। তার স্বামীর আসিবার সময় চারিটা।

বিজনের পরিচয় কিন্তু সে এখনও শোনে নাই, স্বামী জিজ্ঞাসা করিলে সে কি বলিবে, ভাবিয়া গীতি বিজনের সন্ধানে গিয়া দেখিল, সে সুসজ্জিত নির্জ্জন ড্রয়িং রুমের একটা পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া, এক খানা ফোটো দেখিতেছে। সে ফোটো তাদেরই স্বামী-স্ত্রীর।

গীতি হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "এ ফোটো কার চিন্‌তে পেরেছ?"

"আপনার—"

"হ্যাঁ, আমার, আর আমার—"

কথাটা বলিয়া, গীতি কৌতুক-ভরে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসি শিশুর মত সরল, তরল ও সুমধুর। এক খানা সোফার উপর বিজনকে বসাইয়া, নিজে তার পাশে বসিয়া গীতি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি একটু গড়ালে [illegible]? আমার তো বেশ এক-ঘুম হয়ে গেল।"

উত্তরে বিজন বলিল, "না দিদি! দিনে শোওয়া আমার [illegible] নেই।"

"সে এক রকম ভাল। তুমি আমাকে জাগিয়ে দিলে না কেন? চারটে বাজে উনি এখনি আস্‌বেন"—

"কে? বাবু; আপনার স্বামী?"

"হ্যাঁ। তোমাকে হঠাৎ দেখে একেবারে অবাক্ হ'য়ে যাবেন আর কি?

বিজনের সুন্দর মুখে উদ্বেগের ছায়া ফুটিয়া উঠিল। সে একটু ব্যস্ত হইয়া কাতরভাবে বলিল, "কিন্তু, উনি যদি আমাকে দেখে রাগ করেন......তা'হলে"—

"না না, রাগ করবেন? উনি তেমন লোকই নন। তবে তোমার পরিচয় যদি জিজ্ঞাসা করেন—"

"আমার পরিচয় শুন্‌বেন, দিদি?" বিজন এক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া, একটা রুদ্ধ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, "আমি বামুনের মেয়ে, বাবার নাম শুনেছি মাত্র; চোখে দেখা অদৃষ্টে ঘটে নি। আমি যখন মাতৃগর্ভে, তখনই না কি—"

কথাটা শেষ হইবার আগেই, বাইরে সাইকেলের বেলের টুং টুং শব্দ শোনা গেল—সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্র পদ-শব্দের আওয়াজ হইল।

"ঐ যে উনি এসেছেন" বলিয়া গীতি স্বামীর অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হইবার আগেই, ললিতকুমার সশরীরে সেই ঘরে আসিয়া হাজির। তার 'গ্যাগল্‌স্'-মণ্ডিত চক্ষের দৃষ্টি প্রথমেই পড়িল—ত্রস্তা, সঙ্কুচিতা বিজনের উপর। পাড়ার কোনও ভদ্র মহিলা গীতির সঙ্গে সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন মনে করিয়া, চকিতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া সে একটু অপ্রতিভ ভাবে, পাশের দরজা দিয়া তাড়াতাড়ি শোবার ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

স্বামীর এই অপ্রতিভ ভাব দেখিয়া গীতির বড় আনন্দ হইল। "তুমি একটু বস, ভাই! আমি এখনি আস্‌ছি" বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে, সে স্বামীর পশ্চাদনুসরণ করিল।

ললিতকুমার খাটের উপর পা ঝুলাইয়া দিয়া 'ফ্যান্' খুলিয়া হাওয়া খাইতেছিল। গীতিকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া ঈষৎ সলজ্জভাবে বলিল, "কি বিভ্রাট দেখ দেখি! বলা নেই, কওয়া নেই, একেবারে 'হুট্' করে ঢুকে পড়লুম;—উনি হয় তো ভাবলেন লোকটা কি

গীতি হাসি চাপিতে চাপিতে জিজ্ঞাসা করিল, "উনি আবার কিনি গো ?"

"আহা ! জেনে শুনে ন্যাকা সাজা হচ্ছে ! ঐ যে ঐ অন্তঃপুরিকাটী"—

"আ, কপাল ! ও বুঝি অন্তঃপুরিকা ?"

"তবে ?"

"ও এক পথ-হারা 'যমুনা-পুলিনের ভিখারিণী' !"

গীতির চাপা হাসি এবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

ললিতকুমার অসহিষ্ণু হইয়া বলিল,—"বাপরে বাপ ! তুমি যে আজ মূর্তিমতী হিঁয়ালী হয়ে উঠ্‌লে গীতি ; সত্যি, বল না ও মেয়েটা কে ?"

"সত্যি বল্‌চি, ও মেয়েটা বড় দুঃখী, বড় অভাগিনী"—

"কিন্তু অভাগিনীর তো কোনো লক্ষণই দেখলুম না ! দিব্যি, কালাপেড়ে, ফিন্‌-ফিনে সাড়ী-পরা,—একেবারে 'আপ্‌-টু-ডেট'—"

স্বামীর কথার ভঙ্গীতে গীতিরাণীর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল।

ব্যথাভরা করুণা কণ্ঠে বলিল, "ও কাপড় ওর না ; আমিই দিয়েছি। বিষ্টিতে ভিজে কাপড় গায়ে শুকোচ্ছিল, তাই। মেয়েটা সত্যি বড় দুঃখী, অনাথা। আজ অন্নপূর্ণা-বিশ্বনাথ দর্শন কর্‌তে গিয়ে ওকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছি। বেচারীর কেউ নেই ; তিন কুলে—"

"কিন্তু তোমার এই পথে-কুড়িয়ে-পাওয়া রত্নটী কোন্‌ কুল উজ্জ্বল করেছেন তা কি জানো...?

"বেশ ! তুমিও ঐ কথা বলছ ? কাতুদি তো সেই অবধি বকে অনর্থ করছে ; বলে জানা নাই, শুনা নাই, ও ছুঁড়ী ভাল কি মন্দ, কি চোর ছ্যাচোড়—"

"তা মিথ্যে কি ?—কাতুদি ঠিক কথাই তো বলেছে। সংসারে কত রকম ভণ্ডামী, জাল-জুয়াচুরী চল্‌ছে, হঠাৎ কাউকে বিশ্বাস করতে আছে কি ? যাক্‌ বাড়ী বয়ে এনেছ যখন, তখন ওকে কিছু দক্ষিণে দিয়ে বিদেয় করে দাও। কাপড়খানা তো দিয়েই ফেলেছ"—

স্বামীর এই অনুযোগে, গীতিরাণী অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "ওঃ ! ভারি তো এক খানা আধপুরোনো কাপড়, তার আবার খোঁটা দিচ্ছ। তোমাদের সব আশ্চর্য্য সন্দিগ্ধ মন কিন্তু। যার অমন স্ত্রী চেহারা অমন মিষ্টি কথা, সে কি কখনো খারাপ হতে পারে ? বইয়ে যে কত পড়া যায়—কত নিষ্পাপ সুন্দর জীবন শুধু দুঃখ, দৈন্য, অভাবে পড়ে বিনষ্ট হয়ে গেছে—"

"ও সব বইয়ের কথা, বাস্তব সংসারে খাটে না—সকল সময়।"

"কিন্তু বাস্তবে যা সম্ভব হতে পারে, তাই ত কেতাবে লেখে, যাক্‌ গে,—আমি কিন্তু তোমাদের আপত্তি শুন্‌ছি না। বিজনকে আমি নিজের কাছে রাখব।"

"কি নাম ওর ? বিজন ! বাঃ ! বেশ নামটী তো ! নামটায় কবিত্ব আছে ! সেই জন্যেই তো আমার গীতিরাণীর মনোহরণ করেছে—" তবে নামটা ওর বাপ মায়ের দেওয়া—"না নিজের নেওয়া।"

স্বামীর হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া, গীতিরাণী আবদার-ভরা মিষ্ট স্বরে বলে, "ঠাট্টা নয়, সত্যি ;—ও মেয়েটাকে আমার বড্ড ভাল লেগেছে। অজাত, কুজাতও নয় বামুনদের মেয়ে খাবে দাবে থাক্‌বে ;—বেশ তো আমার একটা দোসর হবে ?"

গীতিরাণীর প্রকৃতি ললিতকুমারের ভালরূপেই জানা ছিল। প্রতিবাদ বা আপত্তি করিলে, গীতির জেদ আরো বাড়িয়া যাইবে ভাবিয়া একটু মুচকে হাসিয়া, মিষ্ট কথায় সে বলিল "বেশ তাই রাখ। কিন্তু তোমার 'দোসরটী' যদি 'নাই' পেয়ে শেষকালে, তোমার অন্য কোন জিনিসে ......ওর নাম কি—বিজন যদি স্বজন—"

"দূর ! তোমার সকলতাতেই ঠাট্টা।"

"ঠাট্টা নয়, গীতি ! তুমি ছেলে মানুষ, জান না,—কার মনে কি আছে। যাক্‌, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি—যদি এ মেয়েটাকে নিতান্তই রাখতে চাও, তা হলে নিজের জিনিস পত্র সব সামলে রেখ। এই...যে... তোমার চাবির গোছা—গহনা পত্র সব যেরকম এলো-মেলো ভাবে ছড়ান পড়ে থাকে।"

"আচ্ছা ! আচ্ছা ! ওসব ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না ! আমি কি এতই বোকা, না কি ? মানুষ চেনবার শক্তি আমারও আছে- একটু। ওর সঙ্গে একটু কথা কইলেই তুমি নিজের ভুল বুঝতে পারবে।"

"থাক্‌। আমার আর কাজ নেই ওর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে. তোমার "দোসর" তোমারি থাকুন !—"

গীতির মুখে যেন কথা যোগাইতেছিল না, যাকে সে এই মাত্র অভয় দিয়া বলিয়াছে, 'তোমার কোনো ভয় নেই, আমার কাছে ছোট বোনটীর মত থাকবে' তাকেই এখন কি করিয়া বলিবে, "ওগো! তুমি বিদায় হও, নিজের পথ দেখ, এখানে থাকা তোমার পোষাবে না।"

গীতি কি উত্তর দিবে, কি করিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। বিস্মিত বিজন একটু শঙ্কিত হইয়া বলিল, "কি হ'ল দিদি?—আপনার শরীর বুঝি ভাল নেই?"

"না, হ্যাঁ,—শরীরটা কেমন যেন ম্যাজ-ম্যাজে হয়ে রয়েছে। হ্যাঁ কি বলছিলুম, দেখ ভাই বিজন!—"

গীতিকে কথার আরম্ভেই থামিতে দেখিয়া আগ্রহে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া বিজন উৎসুক দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

গীতি জোর করিয়া তার মনের দ্বিধা কুণ্ঠা ঠেলিয়া দিয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "আমার স্বামী বলছেন, আর আমিও বেশ করে ভেবে দেখলুম, আমাদের বাড়ীতে আর থাকা তোমার তেমন সুবিধে হবে না, তার চেয়ে—"

"আমার আবার সুবিধে অসুবিধে কিসের দিদি! যাকে পেটের দায়ে পথে পথে ঘুরতে হয় তার আবার—"

"সে তো ঠিক কথা, কিন্তু আমার স্বামী, ওঁর তো একটা মান-সম্ভ্রম আছে। তোমার বয়স অল্প, আমাদের মনে পাপ না থাকলেও পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলতে পারে তো? তাই বলছিলুম—"

গীতির মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বিজন তাড়াতাড়ি বলিল,—"কাজ কি পাঁচ জনের নিন্দে কুড়িয়ে দিদি? তার চেয়ে আমাকে বিদায় দিন—আমি চলে যাই—"

বিজনের কণ্ঠস্বর ঈষৎ ক্ষুব্ধ, কিন্তু তার মুখে চোখে আশ্রয়-হারার বিপন্ন, আর্ত্ত ভাব মোটেই ছিল না।

গীতিরাণী একটু দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবে?"

"যেখান থেকে এসেছি—সেইখানে?"—

"ঠিক সেই রকম পথে পথে—"

"তা কি করব? বাবা বিশ্বনাথ যা করতে পাঠিয়েছেন, তাই করতে হবে, তা ছাড়া আর তো কোনও উপায় নেই। তা হ'লে এই বেলা বেরিয়ে পড়ি এর পর সন্ধ্যে হ'য়ে গেলে—"

"দাঁড়াও একটু—"

গীতি ছুটিয়া গিয়া এক খানা দশ টাকার নোট লইয়া আসিল। নোট খানা বিজনের হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "এই টাকায় আপাততঃ তোমার চলে যাবে, তার পর ভিক্ষে আর করো না তুমি, কোনও একটা কাজ করো। পৃথিবীতে কত রকম কাজ করবার রয়েছে, বিশ্বনাথ হাত পা, বল, বুদ্ধি সবই দিয়েছেন, তখন পথে পথে ভিক্ষে করে নিজেকে হীন করবে কেন? মেয়ে মানুষের একটা লজ্জা আবরুর ভয় আছে তো?"

গীতিরাণীর এই অযাচিত সদুপদেশ বিজনের হৃদয়ঙ্গম হইল কি না কে জানে, কিন্তু দশ টাকার নোট খানা অপ্রত্যাশিত ভাবে পাইয়া তার মুখ চোখ আনন্দ-দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

তাড়াতাড়ি গীতির পায়ের ধূলা লইয়া সে কৃতজ্ঞতা-গাঢ়-কণ্ঠে বল্লে, "আপনার দয়ার সীমা নেই দিদি! বাবা বিশ্বনাথ আপনার মঙ্গল করুন। তা হলে আমি আসি এখন—"

"হ্যাঁ—এসো।"

"আপনার এ কাপড় খানা ছেড়ে"—

"না থাক, ও কাপড় তুমিই পরো"—

নোটখানা আঁচলে বাঁধিয়া কাচা কাপড় ও সেমিজ হাতে করিয়া গীতিরাণীকে আর একবার সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। তার পর যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথ ধরিয়া বিজন চলিয়া গেল।

চিক্-ফেলা বারান্দায় দাঁড়াইয়া গীতিরাণী যতক্ষণ বিজনকে দেখা যায়, ততক্ষণ তার দিকে চাহিয়াছিল।

বিজন যখন রাস্তায় অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন গীতি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল।

হাড়জ্বালানী কুন্দনন্দিনীর প্রতীক বিজনকে বিদায় করিয়া গীতির বুক হইতে যেন একটা ভারি পাথরের বোঝা নামিয়া গেল। বাতাসের মত হাল্কা ফুরফুরে প্রাণ নিয়া সে তখন চুল বাঁধিতে বসিল। কিন্তু আজিকার চুল বাঁধাটাও যেন একটা বিড়ম্বনা হইয়া উঠিল—কিছুতেই মনের মত হ[illegible]না। কতবার কত রকম করিয়া

সিঁথী কাটিল, কিন্তু পছন্দ-সই আর হইতেছিল না—চুল গুলাকে কতবার কত ভাবে আঁচড়াইল; প্রায় ঘণ্টা খানেক গলদঘর্ম্ম হইয়া গীতিরাণীর কেশ-বিন্যাস এক রকম সমাধা হইল।

তার পর বেশ-বিন্যাস করিল। আজ কার প্রসাধনেও একটু বিশেষত্ব, একটু বৈচিত্র্য দেখা গেল। আলমারীর কাপড়গুলো সব ওলোট-পালোট করিয়া বাছিয়া বাছিয়া গীতি বার করিল একখানা ফিকে আসমানী রংয়ের জরীর বুটি দেওয়া সূক্ষ্ম ঢাকাই সাড়ী। ললিতকুমার একবার বলিয়াছিলেন, এ কাপড়খানা পরিলে গীতিকে ভারি সুন্দর মানায়।

সেই সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধক সাড়ীখানা পরিল, মাথার ওপর-কার জরীর ঝলমলে চওড়া পাড়ে জড়োয়া লেশ পিন্‌টী আঁটিয়া কম্বুকণ্ঠে শুভ্র নিটোল মুক্তার মালা ছড়াটী দুলাইয়া তাম্বূলরসে পাতলা ঠোঁট দু'খানি ডালিম ফুলের মত রাঙ্গা-ইয়া, গীতিরাণী যেন পরীরাণী সাজিয়া এস্‌রাজ লইয়া বসিল।

মৌন সন্ধ্যায় তরল বিষণ্ণতায় গানের সুরের মোহন মায়া-স্বপ্ন-জাল বুনিয়া এস্‌রাজে মৃদু মধুর ঝঙ্কার তুলিয়া গীতি গাহিতে লাগিল—

"পিয়ারে মোরে সঁইয়া! অব তুম্ জাগো—
অব তুম জাগো, ছাতিয়ন লাগো
খোল্ দে মুখ্‌ড়া—পড়ুঁ তোরে পঁহিয়াঁ
পিয়ারে মোরে সইয়াঁ!"

"বাঃ বাঃ!—ভৈরবী আর গেয়োনাক এই সাঁঝেতে!"

গীতিরাণী চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া দেখিল—ললিত-কুমার!

স্বামীর সহসা আগমন ও ব্যঙ্গোক্তিতে সে একটু লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "ভৈরবী যে সাঁঝের গান নয়—তা আমিও জানি। এ গানটা কিন্তু নতুন শেখা—তাই অসাময়িক হলেও 'প্র্যাক্‌টিস' কর্‌ছিলুম।"

"তবু ভাল, গানে তোমার মন বসেছে, মাঝে যে রকম ঢিলে দিয়েছিলে আমি তো ভেবেছিলুম—ইঃ! আজ যে সাজ-সজ্জারও ভারি ঘটা দেখ্‌ছি!—ব্যাপার কি গীতি?"

ললিতকুমার স্মিত প্রফুল্লমুখে সুসজ্জিতা তন্বী তরুণী পত্নীর পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

লজ্জারক্ত মুখখানা এস্‌রাজের আড়ালে রাখিয়া গীতি বলিল, "আহা! আজ যেন তুমি সবই নতুন দেখ্‌ছ!"

"তা তো দেখবই,—আজ আমাদের বাড়ীতে নতুন লোক এসেছে কি না? কই—সে কোথায়,—তোমার কুড়িয়ে পাওয়া রত্নটী?"

গীতির মুখের ভাব এক মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এস্‌রাজ রাখিয়া দিয়া সে গম্ভীরভাবে বলিল, "যেখান থেকে এসেছিল, সেইখানে?"

"অ্যাঁ!—চলে গেছে? সে নিজেই গেল না তুমি বিদায় করে—"

"বিদেয় যদি করেই থাকি তাতে আমার এমন দোষ-ঘাট কি হয়েছে?"

গীতির কণ্ঠস্বরে শুধু অভিমানই নয় বেশ একটু ঝাঁঝও ছিল।

ললিতকুমার হাসি চাপিতে চাপিতে মৃদু কোমল স্বরে বলিল, "মহাভারত! আমি কি তাই বল্‌ছি? তবে তোমার 'দোসর' করে রাখার সাধ এরি মধ্যে মিটে গেল—একবেলা রেখেই—"

"দেখ্‌লুম তার থাকবার তেমন ইচ্ছে নেই—আমার কি দায় পড়েছে তাকে ধরে বেঁধে রাখবার—"

"রাম! ধরে বেঁধে রাখলেও সে থাকত না গীতিরাণী! ও বনের পাখী তোমার সোণার পিঞ্জরায় শত আদরে রাখলেও থাকতে পারত না।"

স্বামীর প্রফুল্ল হাসি-মাখা মুখের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া গীতি বলিল, "আহা! বনের পাখীটার জন্যে তোমার মনে ভয়ানক আপশোষ হচ্ছে না?"

"ভয়ানক না হোক্ তবু অল্প একটু হচ্ছে বই কি? অমন সুন্দর পাখীটা!—"

গীতির সুন্দর মুখখানি ব্যথায় বিবর্ণ, ম্লান হইয়া গেল। ললিতকুমার আর স্থির থাকিতে পারিল না। অভিনয়ের ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া সে ব্যথিতা পত্নীকে বুকে টানিয়া নিয়া আদর করিয়া সোহাগ-মাখা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তাই বলে আমার এ খাঁচার পাখীটার মত নয়!"

স্বামীর সোহাগে গলিয়া গিয়া গীতি মিষ্ট অভিমানের সুরে বলিল, "হাঁ তোমাদের মুখে এক আর পেটে এক। আচ্ছা কথাটা কি সত্যি বলছ?"

"কি কথা গীতি?" এই যে এখনি বল্লে তুমি কি আমাকে সত্যিই সুন্দর দেখ?"

তা মিথ্যে মনে হয় না কি? আমার চোখে তুমি সুন্দর, অতি সুন্দর, চিরসুন্দর—"

স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া গীতি সঙ্কোচ-জড়িত মধুর সুরে আবার বলিল, "তা হ'লে তুমি আমাকে সত্যিই ভালবাস?"

"এখনও অবিশ্বাস? আমায় তুমি এখনও বুঝ্‌লে না গীতিরাণী—!"

স্বামীর প্রাণঢালা আদর-সোহাগে গীতিরাণীর মন থেকে সন্দেহের মেঘ কাটিয়া গেল কিন্তু তবু সে একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিল না, কিসের একটা অস্বস্তি তার অন্তরের কোথায় যেন কাঁটার মত খচ্‌ খচ্‌ করিতেছিল।

গভীর রাত্রে ললিতকুমার এক সময় সজাগ হইয়া দেখিল গীতি তখনও ঘুমায় নি—এপাশ ওপাশ করিতেছে। ব্যস্ত হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি? তুমি এখনো ঘুমোও নি গীতি?"

"না ঘুম আস্‌ছে না।"

"কেন? কোনো কষ্ট হচ্ছে না কি?"

"না।"

"তবে?"

"জানি না,—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—সত্যি বল্‌বে?"

"কেন বল্‌ব না? তোমার কাছে মিথ্যে আমি তো বলিনি কখনও—শুধু আজ—"

"কাল সে যদি আবার ফিরে আসে, তাকে তুমি রাখ্‌বে?"

"কে গো?"

"সেই যে তোমার কুন্দনন্দিনী—"

"হরি বল! সেই ভাবনায় তোমার ঘুম হচ্ছে না? —পাগলী কোথাকার!"

ললিতকুমার হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেমন জব্দ! আর কখনো যাকে তাকে পথ থেকে কুড়িয়ে আন্‌বে না তো?"

"যাও! তুমি ভারি দুষ্টু।"

অভিমানিনী গীতিরাণীকে গভীর প্রেমে নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া প্রেমের চিহ্ন লাজারুণ গণ্ডে মুদ্রিত করিয়া ললিতকুমার হাসিতে হাসিতে বলিল, "ওগো! আমার আদরিণী সূর্য্যমুখী! তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও! তোমার কুড়িয়ে-আনা কুন্দনন্দিনীটী এ বাটীতে দেখা দিয়ে চির-বিদায় নিয়ে গেছে—আর সে আস্‌চে না, সে ব্যবস্থা করে এসেছি—আর এ কাশী সহরে—তার নগেন্দ্রনাথের অভাব হবে না।—তুমি নিষ্কণ্টকে সুস্থ শরীরে, খোস মেজাজে, এই একমাত্র প্রজাটীকে নিয়ে রাজত্ব কর। ভাল কথা আমাকে একটা সার্টিফিকেট দিতে হবে যে আমি শুধু গরু-তাড়ান রাখাল নই—একজন দক্ষ অভিনেতা। কেমন অভিনয় করেছিলাম!

বসিরহাট—ধান্যকুড়িয়া

[রসরাজ অমৃতলাল বসু]

জেলা চব্বিশপরগণার তালিকাভুক্ত, কলিকাতার উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে প্রায় ছত্রিশ মাইল অন্তস্থিত বসিরহাট একটী প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জনপদ।

বসিরহাট নামটী বসির-উদ্দীনের স্মৃতি ঘোষণা না করিয়া বসুরহাটেরই গ্রাম্য পরিবর্ত্তন, ইহাই আমার ধারণা। বসু হইতে বোস, সেই বোসেদের বাড়ী যে গ্রাম্য-উচ্চারণে 'বসিগার বাড়ী' হয় ইহার প্রমাণ দীনবন্ধুর নীলদর্পণ নাটকে আছে।

আমি নিজে বসু-বংশজ, পূর্ব্বপুরুষের বাস বসিরহাটের অতি সান্নিধ্যে ধলচিতা গ্রামে। আমার প্রপিতামহ গঙ্গানারায়ণ বসু মহাশয় প্রথমে তথা হইতে আসিয়া কলিকাতায় বাস করিতে আরম্ভ করেন; এই জন্য বসু নামের গৌরব বৃদ্ধি সম্বন্ধে আমার কল্পনার পক্ষপাত দোষ ঘটিতেছে কি না, তাহা বলিতে পারি না; তবে এ কথা নিশ্চয় যে বসু মহাশয় ঐ হাটের পত্তন করিয়াছিলেন, তিনি এই দীনের জল-পিণ্ডের গণ্ডীর বাহিরে।

বসিরহাটের সঙ্গে সর্ব্বাগ্রে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত সারা-বঙ্গ বিদিত টাকির মুন্সিবাবুদিগের নাম। কালীনাথ চৌধুরীর দান ও বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরীর মান এখন প্রচলিত আখ্যানের মধ্যে গণ্য। ইঁহাদেরই বংশ বিদ্যা ও চরিত্র-গৌরবে আলো করিয়া সে দিন হঠাৎ নিবিয়া গিয়াছেন রায় যতীন্দ্রনাথ এবং এখন উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছেন তদীয় জ্যেষ্ঠ রায় সুরেন্দ্রনাথের সুযোগ্য পুত্র হরেন্দ্রনাথ।

এই বংশের পরেই মনে আসে আড়বেলের নাগ মহাশয়-দিগের কথা; হায় এক্ষণে স্তিমিত-প্রায়, কিন্তু আমার যৌবনেও ইঁহাদের গৌরব-দীপ্তি দেখিয়াছি।

ট্যাট্‌রার চৌধুরীদেরও এক সময়ে ধনের প্যাট্‌রা বেশ ভারি ছিল, নামেরও ট্যাটরা ছিল।

দাঁড়ীর হাটকে খ্যাতির পাটে বসাইয়া গিয়াছেন ডাক্তার জগবন্ধু বসু। ইঁহার ভ্রাতারাও বিদ্বান্ ও যশস্বী হইয়াছিলেন; এক ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যেন্দ্রকুমার এক্ষণে সাহিত্য-ক্ষেত্রে কীর্ত্তিমান্; 'মাসিক বসুমতী'র অন্যতম সম্পাদক।

মিতভাষী ইতিহাস-রস-রসিক নিখিলনাথ রায়ের নিবাস যে বসিরহাটে, সেই বসিরহাটের নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়, বেদাধ্যায়ী সহীদুল্লা এম-এ ও 'মুসলমান'-সম্পাদক মুজিবর রহমন।

বহুলুপ্ত-প্রায় ইংরাজিতে লিখিত ভারত-ইতিহাসের পুনঃপ্রকাশক ৺ঠাকুরদাস করের (ক্যাম্বে কোং) বাড়ী বসিরহাটে।

আর যিনি ঐশ্বর্য্যে, সুযশে, উৎসাহে, সাহসে জগতের বাণিজ্য-ক্ষেত্রে সান্ধ্য নক্ষত্রের ন্যায় বাঙ্গালী জাতির নাম গৌরবান্বিত করিয়াছেন সেই স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও বসিরহাটবাসী।

স্মৃতির সাহায্যে যে কয়টী নামের উল্লেখ করিলাম তদ্ব্যতীত আর একটী বাকি আছে, সেই সংসার-ত্যাগী মহাসংযমী যোগী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পুত্রোপম শিষ্যের পূজ্য পবিত্র নাম রাখাল মহারাজ বা শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ স্বামী। ইঁহার নাম লিপিগত করিয়া আমার লেখনীকে ধন্য ও বসিরহাটবাসীদের নাম-কীর্ত্তন শেষ করিলাম।

কীর্ত্তি-কলাপ, বিদ্যাবত্তা, হৃদয়ের মহত্ত্ব প্রভৃতি মহাশয় মানবোচিত সদ্‌গুণের আধার হইয়া এক শ্রেণীর শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি যেমন বসিরহাট বিভাগকে জন-শ্রী-সম্পন্ন করিয়াছিলেন, কর্ম্ম-শক্তিও সেইরূপ গ্রাম্য-জীবনে অধিষ্ঠাত্রী হইয়া কয়েকজনকে সম্পৎ-সম্পন্ন ও তেজীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছিল।

যে লাঠির জোরে মোগল-পাঠান-শাসন-শেষেও বাঙালী বাঙলার মাটীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিল, সেই লাঠি এক দিন বসিরহাটবাসী ইতর-ভদ্র সকলের দক্ষহস্তে

দস্যু-দমনের ও আত্ম-রক্ষণের অমোঘ অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইত।

তিতুমীরের বীর-বাতুলতার কথা আমার যৌবন সময় পর্য্যন্ত গল্পের আসরে বেশ সজাগ ছিল। তার 'বাঁশের কেল্লা', 'গুলি খাডালা' পাগলাম বই আর কি? তবে ধরিতে গেলে আমরা কেবল পাগল নয়? কেউ টাকার পাগল, কেউ নামের পাগল, কেউ রমণী-রূপের জন্ম পাগল, কেউ ছেলে ছেলে করিয়া পাগল, আবার সবার চেয়ে সেরা পাগল যে ভগবান্ ভগবান্ করে পাগল; স্বাধীনতার স্বপ্ন সেই অক্ষর-জ্ঞান-বিহীন গ্রাম্য মুসলমান তীতুমীরকে মুক্তির পিপাসায় এমন পাগল করেছিল যে, সে ভেবে ফেল্লে বিপক্ষের অগ্নিগোলা পীরের বরে হাঁ ক'রে গিলে ফেল্‌তে পারবে, আর তার সেই পাগলামীর পরশে হাজার দু-চার চাষা কাস্তে হাতে পাগল হ'য়ে উঠেছিল। সেই তীতুর লীলাক্ষেত্র ঐ বসিরহাট অঞ্চলে।

স্বাস্থ্য-ফুল্ল শ্রমের ফলে কৃষি-বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে বসিরহাটের লক্ষী-শ্রী বহুকাল অম্লান ছিল।

জাভার চিনির বস্তা যদি সস্তার জোরে কিস্তিমাৎ করিয়া দেশীয় ইক্ষু-রস-জাত চিনির কারবার ছারখার করিয়া না দিত তবে ঐ ধানকুড়ের অনেক কুড়ে ঘর এত দিনে সোনায় মুড়ে যেত। হায় বাঙলার বাঁশের জ্ঞাতি আখ, এক দিন তোমায় দেখেই পটুগালের এক পাদরী তাঁর দেশে লিখে পাঠান যে বাঙলায় এক রকম আক জন্মায় যার মধ্যে মধুর চাক আছে! আর বাঙলার খেজুর গাছ তুমি আজও যে খাড়া আছ তা কলের কুলীদের পয়সা ওড়াবার তাড়ি যোগাবার জন্ম!

তথাপি বসিরহাট আজও সম্পূর্ণ রূপে জাতিচ্যুত হয় নাই; এখনও সে পাটে, ধানে ও হরিনাম-গানে আপনার নাম বজায় রাখিয়া চলিতেছে।

যখন বঙ্গদেশে ইংরাজ নবাবের পরোয়ানার শিরোপা রাখিয়া দাড়ি-পাল্লার দোহাই দিয়ে কেল্লা গড়িবার কল্পনা করিতেছিল, যখন রাজনৈতিক আত্মীয়তা দাক্ষিণাত্যকে বাঙালীর চক্ষে বীর-তীর্থে পরিণত করে নাই, তখন মহারাষ্ট্রবাসী কয়েকদল দস্যু এদেশে আসিয়া কিছু দিনের জন্য [illegible] বাঙালী নর-নারীর চক্ষু হইতে যে জালাময় জল বাহির করিয়া দিয়াছিল, ইংরাজী-স্পঞ্জের শোষণে তাহা অনেক পরিমাণে অপসারিত হইলেও এখনও শিশুকে ঘুম পাড়াইবার ছড়ার সঙ্গে বর্গীনাম জড়াইয়া আছে।

বর্ত্তমান সময়ে ম্যালেরিয়ার ভয়ে বা দৌলতের লোভে বঙ্গের বহু স্থানে পরিত্যক্ত-পল্লীর কঙ্কাল দেখা দিয়াছে বটে, কিন্তু বর্গীর উৎপাতে রাঢ়ের লোকদিগকে যেরূপ ছন্নছাড়া করিয়া দিয়াছিল, তাহাদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়া পূর্ব্বপুরুষের বাস্তু ছাড়িয়া দূর-দূরান্তরে অপরিচিত জেলায় বনে জঙ্গলে সপরিবারে ছুটিয়া পলাইতে বাধ্য করিয়াছিল, কোন ভৌতিক বা বৈষয়িক বিপ্লব ইতিপূর্ব্বে তাহা করিতে পারে নাই। বাগ্‌ড়ীর মধ্যেও যে বর্গীর রক্ত-রঞ্জিত-পাগড়ী লুণ্ঠনের লোভে দেখা দিয়াছিল, বঙ্গের অনেক পারিবারিক ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে।

সৎচাষী জাতীয় সাউ বা সাধু উপাধি-বিশিষ্ট মাধবরাম ও যাদবরাম নামে দুই সহোদর খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আপনাদিগের কৃষিক্ষেত্র, গৃহস্থালীর যোত্র বর্গীর আগুনে অর্ঘ্য দিয়া সপরিবারে পথের ভিখারীর অবস্থায় চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত গোবরডাঙ্গার নিকটস্থ নিজ গ্রাম কনোপুর ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

দস্যুদলের অতর্কিত আক্রমণ-আশঙ্কা ও আত্মরক্ষার ব্যাকুলতা তখন জনমনকে এত সন্দিহান করিয়াছিল যে, ধর্ম্মভীরু গৃহস্থ বাঙ্গালী অতিথিকে আশ্রয় না দিলে মহাপাতক হয়, তাহার চিরদিনের এই সংস্কারও ভুলিয়া গিয়াছিল।

বসিরহাটে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া আশ্রয়-লাভে ব্যর্থ-মনোরথ হন ঐ দুই গৃহহীন ভ্রাতা।

তখন মনুষ্য-সমাজে থাকিতেও যেন লজ্জা বোধ করিয়া সোদরদ্বয় প্রবেশ করেন ব্যাঘ্র-রাজ্য সুন্দরবনে। যখন একটী ভ্রাতা ব্যাঘ্র-কর্ত্তৃক রাজকর স্বরূপ গৃহীত হইল; তখন আবার অদৃষ্ট-পরীক্ষার জন্য অবশিষ্ট ভ্রাতা আসিয়া পড়িলেন ধানকুড়ে গ্রামে।

সহর বসিরহাটের মাইল আষ্টেক পশ্চাতে ধানকুড়ে গ্রাম। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তখন ঐ গ্রামের সাজ-সজ্জা কিরূপ ছিল তাহা ঠিক বলা যায় না; তবে বয়ঃ-ক্ষয়প্রাপ্ত দু-একটী [illegible]কাঠার অবয়বের প্রতি দৃষ্টি

করিলে অনুমান করা যায় যে উহাদের আবির্ভাব-কাল একশত বৎসরের ন্যূন নহে ; কিন্তু নামকরণেই বুঝা যায় গ্রামে ধানও ছিল কুড়েও ছিল। যখন প্রত্যেকেরই এক-একটী নিজস্ব কুটীর ছিল ও সেই কুটীরে তাহার নিজের ধান মজুত থাকিত, তখন বাঙালীর ঘরে ঘরে সুখ-সন্তোষের সিংহাসন পাতিয়া স্বরাজ সগর্ব্বে বিরাজ করিত।

কদাচিৎ তৃপ্তিপ্রদায়ী চির-বর্দ্ধমান পাশ্চাত্য সভ্যতার ভোগলালসা ও অর্থ-পিপাসা এক্ষণে আমাদিগকে শিখাইয়াছে যে, সন্তোষ উন্নতির পথের প্রতিরোধক ; সেইজন্যেই দেখা যায় যে সাজ-সজ্জা, পোষাক-এলাবাস্ আংটি-ঘড়ি, জুড়ি-মোটর প্রভৃতিতে বহুলোকের বহিরঙ্গে জীবনী-শক্তির দীপ্ততেজ প্রকাশ পাইলেও তাঁহাদের তর্জ্জনী-স্পর্শে নাড়ী পাওয়া যায় না ; বাড়ী খানির ভাড়া, তিন মাসে সাড়ে সাতশ টাকা বাকি প'ড়ে আছে, জীবন বীমার উপর কর্জ্জ 'মুঠীর কাছে বাঁট' পর্য্যন্ত। পঞ্চাশ বৎসরেরও কিছু পূর্ব্বে এই কলিকাতাতে 'ভাড়াটিয়া' কথাটা হীনার্থবোধক ছিল ; থানায় খোলার ঘরে বিধবা জামীন রূপে গ্রাহ্য হইত, কিন্তু ভাড়াটিয়া রায় মহাশয়ের উপর ততটা প্রত্যয় ছিল না।

প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে এক সময়ে কৃষিকার্য্য প্রত্যেক বাঙালী গৃহস্থের বৃত্তি বলিয়াই বিবেচিত হইত। ধান-কুড়েতে ছিল চাষীর বাস বেশী। ইহাদের মধ্যে সৎচাষী জাতি সংখ্যায় অধিক। যে দু-এক খানি প্রাচীন দালানের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা নির্ম্মাণের অর্থ সঙ্কুলান করিতে পারিয়াছিলেন ঐ সৎচাষী জাতের অন্তর্গত কোন কোন ভাগ্যবান্।

ধান ছাড়া ধানকুড়িয়ায় ধনোপার্জ্জনের প্রধান উপায় ছিল তাহার সে কালের প্রসিদ্ধ চিনির বাণ।

জীবহত্যা পাপ ; ছায়া-ফল-প্রদায়ী বৃক্ষচ্ছেদনেও হত্যার পাপ ; নরহত্যা অতি ভীষণ ঘৃণ্য পাপ ; আর জাতির জীবিকা-অর্জ্জনের উপায় বাণিজ্য হত্যাও অতি-পাতকের মধ্যে গণ্য।

বিদেশী বণিক্ ! বন্দুকের নল, ব্যাসাভির কৌশল, চক্রচালিত কল অথবা মূলধনের বল-যে কোন নিষ্ঠুর উপায়-প্রয়োগে তুমি এদেশের গ্রাম্য স্বাস্থ্যপূর্ণ বাণিজ্যের প্রাণ বিয়োগ করিয়াছ তাহা দৈব পিনাল কোডে 'মার্ডারে'র ধারাভুক্ত। তুমি ভাবাই হও, জার্ম্মানিই হও, সুইডেন হও, আমেরিকাই হও আর দরকারের সময় যিনিই তোমার বাবাগিরি করুন তোমাদের নাম আসামী শ্রেণীভুক্ত হইয়া এক জায়গায় নিশ্চয়ই লেখা থাকিবে। আইন লেখনীকে অচল করিতে পারে, রসনাকে নীরব করিতে পারে, কিন্তু দীর্ঘশ্বাসের অশ্রুসিক্ত বাতাস জগৎপিতার খাতায় পৌঁছিয়া নালিশ লিখিয়া দেয়। যেমন জন্মান্ধ সূর্য্য নাই বলিলে সূর্য্যের অস্তিত্ব লোপ হয় না, তেমনই স্বার্থান্ধের মাৎসর্য্য-জনিত গর্জ্জনে সর্ব্বশক্তির উৎস ঈশ্বরেরও অস্তিত্ব লোপ-প্রাপ্ত হয় না।

ধানকুড়িয়ার বর্ত্তমান সাউ-বংশের গৃহতাড়িত পূর্ব্ব-পুরুষ ঐ গ্রামে আসিয়া এক স্বজাতির আতিথ্যে আশ্রয় লাভ করেন। শারীরিক বল, সদ্য-ফলপ্রদ হল, আর জননী বসুমতীর তল, তাঁহার সরল জীবন-রক্ষার উপায় করিয়া দিল।

আদিতে সকল মানুষই কৃষক ছিল ; এই মত-প্রকাশে বর্ত্তমান কালে বংশ-গরিমা ক্ষুণ্ণ হইয়া যদি কাহারও মনে আঘাত লাগে তবে তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাঁহার বংশের ধারা নামিয়াছে ধীবর, ব্যাধ বা তস্কর হইতে। দেহবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভক্ষ্যের প্রয়োজন যখন নিত্য সত্য, তখন উপরি উক্ত কয়টী বৃত্তি অবলম্বন ভিন্ন প্রথমে অন্য কি উপায়ে মানব আপনার অন্ন-সংগ্রহ করিত তাহা ত অনুমান করিতে পারি না।

যে ধাতু হইতে কৃষ্ণনামের উৎপত্তি, সেই ধাতু হইতেই ভাষাগত কৃষক শব্দ উৎপন্ন ; তবে কালে সেই কৃষিকর্ম্ম-জীবী কেন নীচ, মূর্খ, বোকা প্রভৃতি হীন বিশেষণে অসম্মানিত হইয়া পড়িল ?

বৈদ্যশাস্ত্র-প্রণেতা চরককার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সঞ্চয়ের কৌশলে আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে লোভাদি রিপুর তাড়না হইতেই মানবদেহে রোগের প্রথম উৎপত্তি। কেবল শরীরকে ব্যাধিমন্দিরে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াই সঞ্চয় নিরস্ত হইল না ; সঞ্চয়ের বঞ্চনাতে মানব-মন ক্রমে মাৎসর্য্যরূপ মহা-ব্যাধি-গ্রস্ত হইয়া পড়িল ; ধান মাড়ানর চেয়ে দু-পায়ে মানুষ মাড়ানতেই অধিক আনন্দ, অধিকতর শৌর্য্য, বীর্য্য ও সম্ভ্রমের বিকাশ, এই দুঃস্বপ্নের উৎপাতে

বিকারগ্রস্ত মন অস্থির হইয়া পড়িল। সঞ্চয়শীল প্রতিবেশীর উদ্বৃত্তের প্রলোভনে নিত্যশ্রমী কৃষক তাহার ক্ষেত্রের স্বত্ব যোত্রবান্ শ্রেষ্ঠের হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনাকে আশা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম, উৎসাহ, উদ্ভাবনী-শক্তি-বিহীন, হলবাহী বলদের সহযোগী হলধারী গো-জাতি-ভুক্ত করিয়া ফেলিল। শ্রেষ্ঠের উপাধি হইল শ্রেষ্ঠী ও ভূস্বামী; ক্ষেত্রপাল দাঁড়াইলেন দায়গ্রস্ত দাস বা বিলাতি বুলিতে Serf।

একান্ত অবশ্য-পোষ্য বৈশ্যবুদ্ধি-সম্পন্ন গো-জাতির নিত্য সাহচর্য্যে শরীরপোষণ-ব্রতধারী কূটবুদ্ধিহীন সরল কৃষক ও গোপ ভদ্র-সমাজে অবজ্ঞেয় হইয়া দাঁড়াইল। 'চাষাড়ে বুদ্ধি'; 'চাষার হাতে কাস্তের ঠোকর'; 'চাষা কি জানে মদের স্বাদ' প্রভৃতি কত সাধু বচনই না মেদিনীমাতার কোলের শিশু এই কৃষককুল সৃষ্টি করিয়াছে! আর বাঙালাদেশে একটা প্রবাদই চলিয়া আসিতেছে যে, গোয়ালার ছেলে ষাট বৎসর পার না হইলে সাবালক হয় না। ধন-মদমত্ত সভ্যতা, সরল মন ও কায়িক শ্রমকে কি সুন্দর শিরোপা পরাইয়া না পুরস্কৃত করিয়াছে!

হিন্দুস্থান আজ জাতিভেদের আন্দোলনে দোদুল্যমান। সমাজ-গঠনের সঙ্গে সঙ্গে গুণকর্ম্ম-বিভাগ অনুসারেই প্রথমে চতুর্ব্বর্ণের প্রতিষ্ঠা; পরে ব্যাবহারিক প্রয়োজন সাধনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বনের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার সূত্রে জাতি-বিভাগের সৃষ্টি। কিন্তু বৃত্তিগত জাতিকে বংশানুক্রমিক করিয়াই যত গোল বাধিয়া গিয়াছে।

প্রথমে গুণকর্ম্ম-বিভাগে বর্ণভেদ হইল বটে, কিন্তু ক্রমেই গুণ রহিল কাদায় পড়িয়া আর মাটী ভেদিয়া কঞ্চি জড়াইয়া বংশ উঠিলেন খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া। ব্রহ্মজ্ঞান দূরে থাক, কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-হীন গণ্ডমূর্খ ব্রাহ্মণ-কুল-পাষণ্ডও গোত্র-গর্ব্বে স্বয়ং ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত খর্ব্ব করিবার অভিলাষে ভৃগুমুনি ভগবানের বক্ষে পদাঘাত করিয়াছেন, এই কলুষ-কাহিনী শাস্ত্রবচনের মধ্যে চালাইয়া দিয়া সংস্কৃত অক্ষরের পর্য্যন্ত অবমাননা করিয়া বসিলেন!

ব্রাহ্মণের শক্তি, শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস; আমার এখনও বিশ্বাস যে জগতে আবার ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্মশক্তি সম্পন্ন ব্রাহ্মণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া সার্ব্বজনীন শান্তি, শ্রী ও মঙ্গলের হেতু হইবে। কিন্তু সে ব্রাহ্মণ যে মাত্র পাড়ে ঠাকুর বা চকোত্তি খুড়োর ঘরেই জন্মিবে এ-ধারণা আমার নাই। যাহাকে আজ নমঃশূদ্র বলিয়া অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছি, এক দিন তাহারই বংশে ব্রাহ্মণ-গুণ-মণ্ডিত এমন প্রশংসনীয় জন জন্মগ্রহণ করিতে পারেন যিনি সর্ব্বসমাজে প্রণম্য হইবেন।

এক দিন এই বঙ্গদেশে শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিশ্বপ্রেমের জ্যোৎস্না-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া জীর্ণসমাজকে জাগ্রত করিবার জন্য বলিয়াছিলেন যে, চণ্ডালও যদি একনিষ্ঠ হরিভক্তি-পরায়ণ হয় তবে সে বিপ্র অপেক্ষা পূজনীয় হইবে; আর নষ্টমতি ভক্তিহীন দ্বিজ-সুত, সারমেয় অপেক্ষা হীন বলিয়া গণ্য। কাল আবার বৈষ্ণবহৃদয়ে সৌষ্ঠব কুষ্ঠগ্রস্ত করিয়া দিল; কণ্ঠতিলক ব্যভিচারের ভেকে কলঙ্কিত হইল।

কিন্তু যে শক্তিশালা হইতে তেজের তরঙ্গ আসিয়া এই বিশ্বযন্ত্রের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক চক্র, দণ্ড, বেধন, উৎক্ষেপণী প্রভৃতি চলন-ক্ষম করিয়া রাখিয়াছে সেই বিরাটের অনুষ্ঠানই এক দিন পৃথিবীতে এমন এক পুরুষ-প্রধান প্রেরণ করিবে, যাঁহার আবিষ্কারে, নব সংস্করণে, গুণ-কর্ম্ম, বিভাগে আবার জাতির পর্য্যায় নির্ণীত হইয়া যাইবে।

প্রলয়ের পর সৃষ্টির বিকাশ। তমসান্তে আলোকের আভাস। বিপ্লব-প্লাবন-স্নাত ধরাতলে সংযম ও শান্তির শতদল প্রকাশ হইতেছে প্রকৃতির নিয়ম। এই মৃন্ময় জগতে সর্ব্বত্রই এক্ষণে বিপ্লবের লক্ষণ দেখা যাইতেছে; রাজা-প্রজা, শাসক-শাসিত, প্রভু-সেবক সকলেরই অন্ধকারময় দুর্গন্ধপূর্ণ চিত্তাবাস হইতে মর্ম্মাহত ধর্ম্ম অপসারিত হইয়া দূরে দাঁড়াইয়া নরপুরী পরিষ্কার করাইয়া লইতেছেন।

কৃষ্ণচরিত্র বাস্তব বা কল্পনা যাহাই হউক সে বিষয়ে তর্ক করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু এ সিদ্ধান্ত নিশ্চয় যে এই আর্য্যজাতির প্রাচীন পবিত্র মন কৃষ্ণলীলা-বর্ণনে পরিস্ফুটর হিয়াছে।

ভক্ত-কবি যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, কৈশোর-প্রাপ্তির পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে শিশুবুদ্ধি-স্তম্ভকারী শব্দ-শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে না পাঠাইয়া ব্রজ-বনমধ্যস্থ গোকুল গ্রামে গোচারণ ও হলকর্ষণে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই শিক্ষা-প্রণালীই

প্রকৃত কিণ্ডার-গার্টেন। কোমল মন যখন চিন্তাভার বহনে অক্ষম তখন সেই মনকে বলীয়ান্ করিবার সহজ সংস্কার নব-নির্ম্মিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আপন-আপন অংশে শক্তি-সঞ্চারের জন্য চঞ্চল করিয়া তোলে; প্রকৃতির মুক্ত-রাজ্যে, বিহঙ্গ-সঙ্গীত-মুখরিত সুরভী-পূর্ণ নয়নারাম শ্যামল বনে, কলনাদী যমুনা-পুলিনে হলচালন ও গোচারণ, ইহাতে খেলার উল্লাস, ব্যায়ামের উত্তেজনা, কর্ম্মবুদ্ধি জাগরণের আনন্দ আছে। বাঙ্গালার সৎচাষীরাই এই শ্রীকৃষ্ণ হইতে যে তাঁহাদের উৎপত্তি হইয়াছে ইহা তাঁহারা ঘোষণা করিয়া থাকেন। এই সৎচাষী সাউবংশে উদার প্রাণ কর্ম্মী উপেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বহু সদনুষ্ঠান করিয়া সম্মানভাজন হইয়াছেন।

পথের কাঁটা

(গল্প)

[শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

এক

মানবজীবন বা ঘড়ীর কাঁটার বেতালে পা ফেলিলে চলে, বড় জোর তাহাতে ডাক্তারের ব্যবস্থা করিতে হয় কিংবা কারিগরের হাতের দু-চারিটা কাণমোচড় লাভ হয়। উভয়-ক্ষেত্রে কিন্তু একটা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকে। বলিহারি কিন্তু কেরাণী জীবনকে, জীবনের এ দিক্টা যেন একটা পাথর দিয়া গড়া, তাহাতে বিশ্রাম অর্থে অনাহার, কাজেই সুধীনকে সকাল সাতটা পঞ্চান্নের ট্রেণের জন্য ছুটিতে হইত।

মায়া এক এক দিন বলিত, আচ্ছা, 'এ দিকে ত এতটা কড়াকড়ি, তিলটি খস্‌তে পায় না। কিন্তু রাত্রি ন'টা পনের'র বেলা সেটা সয় কেমন করে, এক এক দিন কাঁটাটা পৌনে এগারটায় গিয়ে ঠেকে কেন?'

সুধীন বুঝাইয়া দিত, প্রবেশ-পথে মনিবের দণ্ড-নীতি যতটা কড়া, নির্গমের দিকে ঠিক্ ততটা নয়, ছুটীর নির্দ্ধারিত সময় ছয়টা হইলেও সওয়া সাতটায়ও কেহ ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দেয় না; বরং, কাজ যে করে গাধার বোঝা তাহারই স্কন্ধে আসিয়া চাপিয়া বসে, সঙ্গে সঙ্গে হয় ত লাভ ঘটে মনিবের মুখের ফিকে হাসিটুকু! তা কেরাণী-জীবনে তাই কি কম!

মায়া বুঝে না হয় ত কিছুই, কিন্তু তথাপি নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া থাকে, কারণ—সে এটা ত জানে, মাসিক ওই ছাপ্পান্ন টাকার ওজন কতটুকু!

কি শীত কি বর্ষা প্রত্যহ পানাপুকুরে স্নান, তাও ছ'টা বাজিতে পায় না। বাড়ীতে বিগ্রহ আছেন, তা তিনি এখন কতকটা গলগ্রহ! কিন্তু উপায় ত নাই, কাজেই ফুল এক-আধটা চাপাইতেই হয়। যে দিন ফুরসৎ পায়, কলিকাতাতেই বাজার সারিয়া বাড়ী ফিরে। না হইলে যা করে মাচার শাক্-পাত, রবিবার বা ছুটি-ছাটার দিন কাজেই পুণ্যাহ! কিন্তু তবুও ঝগড়া বাধে, মায়া চায় স্বামীকে অন্ততঃ এক দিন পাঁচ তরকারি ভাত খাওয়াইতে, সুধীন চায় সুনিদ্রায় বিশ্রাম উপভোগ করিতে, কিন্তু আশা কাহার প্রায় মিটে না, যত গণ্ডগোল আসিয়া জুটে সেই দিনই। পাওনাদার আনে খাতা-পত্র, পাড়ার লোকে হয় সালিশি, নয় গান বাজনা থিয়েটার! তা ছাড়া গরুর সাত দিনের খোরাক খড় খোলের যোগাড়, নিত্য সেবক বাড়ীর উঠানের গাছ-পালা গুলিকে নাড়িয়া চাড়িয়া বসাইয়া দেওয়া—এত আছেই!

দুই

কিন্তু এততেও সুধীন চাকরী রাখিতে পারিল না। একটা বড় গোছের 'কার্ব্বাঙ্কেলে' মাস দুই ভুগিয়া সে তার শূন্য-স্থানটীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—তা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে! বড় বাবুর নিকট বহু মিনতিতেও কিন্তু কোন ফল হইল না, তিনি স্পষ্টাক্ষরে জানাইলেন, মনিব কাজ চান, তোমার সুখ-অসুখ তারা বুঝ্‌বেন কেন? পরের কাজ কর্‌তে হ'লে চাই পাথরের মত শক্ত দেহ, বুঝলে?

বলিতে হইবে কেন সুধীন তা জানে। আর জানে বলিয়াই অক্ষুধায় খাইয়া, বাপ-পিতামহের কোন নেম-কর্ম্মে ধরা-ছোঁয়া না দিয়া, এমন কি প্রাণ সম পুত্রটীকে দুই মাস যাবৎ বিছানায় ফেলিয়া রাখিয়া নিয়মিত ভাবে

আফিস বজায় রাখিয়া আসিতেছিল। কোথা হইতে আসিল এ বিস্ফোটক, তার জীবনের উপর একটা বিষের প্রক্রিয়া রাখিয়া দিয়া সে সরিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে কাড়িয়া লইয়া গেল তার জীবনের যা কিছু আশা—অবলম্বন, গ্রাসাচ্ছাদন। এখন উপায় কি—সে কোথায় যায়?

দু-একজন আফিসের পুরাতন বন্ধু চুপিসাড়ে আসিয়া পরামর্শ দিয়া গেল, সাহেবের নিকট গিয়া জানাইতে, সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলিতে ছাড়িল না, এ তাল-পাতার ছাওনি রে দাদা, আজ আছে, কাল ঝড়ে উড়ে গেছে। বিশ্বাস ত হয় না কিছু হবে, তবু দেখা ভাল যদি পাথর-চাপা কপাল ফেরে!

সুধীন ভাল-মন্দ কোন উত্তরই দিল না, ধীরে ধীরে আফিস হইতে বাহির হইয়া আসিল। লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে সুধু সারা সহরটা ধোঁয়া বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। হঠাৎ পিছন হইতে কে ডাকিল, বাবু!

সুধীন চমকিয়া উঠিল! তার পর পিছন ফিরিয়া বিস্ময়ভরে বলিল. কে দীনু!

চাপরাশী দীনু সুধীনের পায়ের খানিকটা কাদা 'খপ' করিয়া মাথায় তুলিয়া লইয়া বলিল, হাঁ বাবু, আপনার কৃপায় দাসু আমার ভাল হয়ে উঠেছে তাই বল্‌তে এলুম। কিন্তু......

কিন্তু কি দীনু, ওঃ, টাকার জন্যে ভাবছ বুঝি, আরে খেপেছ না কি সে আর দিতে হবে না তোমায়, ভগবান্ যে তোমার ভাল করেছেন, এতেই আমি সুখী হয়েছি—বলিয়া সুধীন হাসিয়া উঠিল।

দীনু জিব কাটিয়া বলিল, টাকার কথা তুলে আপনার অপমান কর্‌তে পার্‌ব না বাবু। আমি ভাবছিলুম আপনাকে ছেড়ে আমি এখানে চাক্‌রী কর্‌ব কি করে। দয়া করে দেশের ঠিকানা আমায় লিখে দিয়ে যান, যেমন করে পারি বড় বাবুর চালাকি ভাঙ্‌ব, তার শালাকে চাকরী দেওয়া ঘুরিয়ে ছাড়ব, তবে আমার নাম দীনু মড়ল, হাঁ?

সুধীনের বুকে যেন একটা তৃপ্তির হিল্লোল বহিয়া গেল। সে দীনুর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, মিছে রেগে মাথা গরম করে লাভ কি ভাই, সত্যি সত্যিই ত [illegible] ক্ষতি হচ্ছিল। তাই না...

ও কথা আমায় বুঝুতে এসো না, তোমার ঠেঙে যা চাচ্ছি তাই দাও ত দেখি—বলিয়া দীনু রাগিয়া উঠিল।

সুধীন বিনা প্রতিবাদে নিজের ঠিকানাটা এক খানি কাগজে লিখিয়া দিয়া নিরাশ বুকে গ্রামে ফিরিয়া গেল। সরল দীনুর মধুর ব্যবহারটুকুই তাহার প্রাণে আনন্দ দিতে লাগিল, কার্য্যতঃ বিশেষ কিছু যে তাহার দ্বারা সম্ভব, ইহা সে বিশ্বাসই করিতে পারিল না।

তিন

গাঁয়ে সুধীনের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। একটা মুখের কথা খসাইতে না খসাইতে গ্রামের মুদী মেছুনী কলু স্ব-স্ব পণ্যভার উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া যাইত, মুখে বলিত, আরে বাস্‌রে, দেব না, ক'লকাতার চাকরে! ভাবনা কিসের, টাকার? তা আমাদের ধরে নাও সিন্ধুকে তোলাই রয়েছে!

কিন্তু আজ?

সাত দিন অনাহারী থাকিলেও কেহ ফিরিয়া চায় না! কারণে-অকারণে নির্ব্বোধ লোকটার উপর খড়্গ-হস্ত হইয়া উঠে।

সে দিনের সকালটায় একটু বেশী রকমের ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। সিধু মুদীর দোকানে কয়েক জন মুড়ি দিয়া বসিয়া তামাকের সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত ছিল। সুধীন আসিয়া বলিল, পো-পাচেক চাল দাও ত সিধু, নইলে বিগ্রহের সেবা চল্‌বে না।

সিধু ব্যঙ্গ-ভরে বলিল, ঠাকুর বাঁধা রেখে'ত, না ঠাকুর অতটা আহাম্মুখ এখনও আমরা হই নি!

সুধীন এ আঘাতটার জন্য ততটা প্রস্তুত ছিল না, কাজেই শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল, এক দিনের কথা, জল হইতেছিল, পথে যাইতে যাইতে সিধুর পেড়া-পীড়িতে যে দিন সে তার দোকান-ঘরে ক্ষণেকের জন্য বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইয়াছিল। হঠাৎ মনে পড়িল—ঠাকুরের মিষ্টি কিছু নাই, সঙ্গে পয়সা ছিল না; মুখ ফুটিয়া বলিতে না বলিতে সে দিন সিধু পার্শ্বের দোকান হইতে টাট্‌কা ভেয়ানের সন্দেশ আনিয়া হাতে দিয়া বলিয়াছিল, এটুকু আমি ঠাকুরকে দিলুম মুখুর্জ্জে মশাই, দাম দিতে হবে না।

ঘর জুড়িয়া সে দিন তার দেবভক্তির সাড়া পড়িয়া

গিয়াছিল, আজও তাহার সমর্থকের অভাব হইল না। দুনিয়া বটে! তবু নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্ষীণ প্রচেষ্টায় সে আর একবার বলিল, তুমি কি মনে কর সিধু, ঠাকুরের নাম নিয়ে আমি খেয়ে ফেল্‌ব, দেব না!

সিধু একবার সকলের মুখের দিকে চাহিয়া বেশ কাটা কাটা ভাবে বলিল, কি করি বলুন, শুন্‌ছি আপনার ওই করেই ত পেট চল্‌ছে, আমার দোকানেই যা ফেলে-ছেন, দাও ত হে খাতাটা...

সুধীন এত লোকের সম্মুখে এ ভাবের আক্রমণে লজ্জা পাইয়া বলিল, আমি কি দেব না সিধু, তুমি কি মনে কর আমি দেবই না। আচ্ছা, আচ্ছা, এদিন কিছু চিরকাল থাকবে না। তখন দেখো সবার দেনা দেবার আগে তোমায় দিয়ে ..

সমবেত অট্টহাসির ভিতর তাহার সে ক্ষীণ আবেদন কিন্তু ভাসিয়া গেল। সে বাধ্য হইয়া একটু একটু করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে চাহিল—হঠাৎ তাহার কাণে গেল সিধু বলিতেছে—আচ্ছা বিপদ দেখছি এই সকাল বেলা, ভালয় ভালয় আর এ দোকান মুখো না হলেই বাঁচি!

এত দুঃখেও কি জানি কেন সুধীনের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

বাড়ী ফিরিয়া সে মায়াকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, তবু বেঁচে থাকতে হবে, কি বল মায়া?

স্বামীর অলক্ষ্যে চক্ষু মুছিয়া মায়া বলিল, পূজো করে নাও গে, কাল থেকে খাও নি—মিত্তির গিন্নি পূজো যা পাঠিয়েছেন আজ ত চল্‌বে?

সুধীন হাসিয়া বলিল, তা বটে, সাগরে পড়েছি কুটো ধরে বাঁচতে হবে বৈ কি? কিন্তু এ চুরী মায়া, গাঁয়ের লোকে আজ স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে দিয়েছে দেবতার নাম নিয়ে এও একরকম ভিক্ষে!

মায়া কথা কহিল না। সুধীন বলিয়া চলিল, আজ সিধু বল্‌লে কি জান, ঠাকুর বাঁধা রেখে আমি চাল ধার দিতে পারব না, আচ্ছা সিধু কি পাগল, ও মনে করে আমি ওকে ফাঁকি দেব! ভয় দেখ, বলে দোকান মুখো না হইলে বাঁচি!

মায়া আর শুনিতে পারিতেছিল না; তাড়াতাড়ি বলিল, ভাবনা কি নারায়ণ যখন যে অবস্থায় রেখেছেন—

তাহার কথা কিন্তু শেষ করা হইল না। সুধীন উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, এখন বিশ্বাস কর মায়া, ফেলে দাও গে টান মেরে ও নোড়া-নুড়ি গুলোকে...

কিন্তু দামোদর মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই—সে থামিয়া গেল। তার পর উদাসকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তবে তাই হ'ক, তাই হ'ক ঠাকুর, তোমারই ইচ্ছা সফল হ'ক! গামছাটা দাও ত মায়া স্নানটা সেরে আসি তাড়াতাড়ি!

চার

দীনু চাপরাশী হন্ত-দন্ত হইয়া গ্রামের পথে ছুটিয়া আসিতেছিল। বাজারে সিধুর দোকানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বল্‌তে পার, এ গাঁয়ে সুধীন মুখুজ্জে বলে কেউ থাকেন কি?

মুদী মুখ ফিরাইয়া বলিল, এই রে, সকাল বেলা অযাত্রার নাম নিলে! নাও, নাও, আজ দেখ্‌ছি, বিক্রি-বাটার দফা গয়া!

দীনু অবাক্-বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মুদী বিরক্তি-চঞ্চল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, হাঁ করে দেখছ কি! অনামুখো না হ'লে লোকে অমন চাকরীও খোয়ায়... তাও বা যদি এক বেলা খেয়ে ভিক্ষে-সিক্ষে করে চল্‌ছিল—জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ! বিষ নেই কুলোপানা চক্র, এখন রইল কোথায় জারী জুরী তাই শুনি?

দীনু অধৈর্য্য হইয়া বলিল, ও কথা আমি শুনতে চাই নি তাঁর বাড়ীটা কোন্ দিকে বল ত?

আরে বল্‌ছি ব্যস্ত হও কেন? শোনই না সবটা। আরে গাঁয়ের মাথা সমাজ-পতি যাকে গাঁ ছাড়া হবার হুকুম দিলে, তোর কি মাথা ব্যথা পড়েছিল বল্ ত তাকে ঘরে টেনে নে যাবার! 'আপনি শুতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে' আর কি!

"তবু সবাই গিয়ে বল্‌লে, 'ও দজ্জাল মাগীকে বার করে দাও সুধীন, নইলে সমাজ বাঁচান দায় হবে।' উত্তর দিলে কি না 'যে দুর্দ্দান্ত গাঁয়ের ওপর বসে অসহায়ার ওপর অত্যাচার করতে সাহস পেয়েছে আগে তাকেই গাঁ ছাড়া করা হ'ক, নইলে এ সমাজ গেলেও তার দুঃখ নেই!'

"শোন আস্পর্দ্ধার কথাটা একবার! একটা মাগীর জন্যে কিনা সমাজপতির একটী মাত্র ছেলে, ছেলেমানুষ না হয় একটু দোষই করে ফেলেছে, তাকে গাঁ ছাড়া হ'তে

হবে! বিচার বটে! ফলও তার পে'য়েছে একঘরে হয়ে হাড়ির হাল হয়েছে! তার ওপর···"

দীনু দীপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ওর মত লোকের ঠাঁই এখানে হবে না, হওয়া উচিতও নয়! এখন দয়া করে বাড়ীটার পথ বলে দাও, এখনই তাকে ক'লকাতায় যেতে হবে। সাহেব ডেকে পাঠিয়েছে আবার তাঁর চাকরী হয়েছে।

ঠিক পাশ দিয়া এই সময়ে কতকগুলি সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোক একটী শব বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছিল; সমস্বরে তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিল,—বল হরি, হরিবোল!

সিধু ব্যঙ্গভরা হাসি হাসিয়া বলিল, যাবে কে, সে ত ওই চল্‌ল, তোমার সাহেবকে ব'ল, সে বড় চাকরী পেয়েছে কাজেই দরকার হবে না। বাপ্! পথের কাঁটা সর্‌লো। তবে বেঘোরে লাঠির ঘায়ে প্রাণটা দিতে হ'ল—তা যেমন কর্ম্ম! এই যে বামুনের ছেলে ডোমের কাঁধে চড়ে চলেছে বেশ!

পথের কাঁটাই বটে!

দীনু পায়ে-পায়ে শবের অনুগমন করিতে লাগিল। তাহার চক্ষুতে তখন সমুদ্র-সৃষ্টি হইয়াছে!

শিশু-মড়ক

[ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্‌-এম্‌-এস্‌]

বাঙ্গালাদেশে—

প্রত্যেক ২ মিনিট অন্তর—১টী শিশু মারা পড়ে!

শতকরা ৫০টী শিশু মারা পড়ে!!

প্রত্যহ ১ দিন বয়স্ক, ২৪৫ শিশু মরে!!!

"	৭	"	"	১৩৯	" "
"	১৪	"	"	৯৬	" "
"	১ মাস	"		৮৫	" "
"	২	"	"	৫৭	" "
"	৩	"	"	৪১	" "
"	৪	"	"	৩৩	" "
"	৫	"	"	২৬	" "
"	৬	"	"	২২	" "

সন্তানবৎসলা বঙ্গজননি! সমগ্র জগতে আর কোথাও এত শিশু-মড়ক নাই—আছে সুধু তোমারই দেশে! এই ভীষণ মৃত্যুর বহর দেখিয়াও তোমাদের চেতনা হইবে না—"কেন সুধু আমার দেশেই এত শিশু-মৃত্যু, অপর দেশে নাই?"

অকাল-শিশুমৃত্যুর কারণ অনেকগুলি। তন্মধ্যে প্রধান কারণ অজ্ঞতা। মানুষের জীবনে সব চেয়ে বড় সার্থকতা কাব, মানুষের-মত-মানুষ সমাজকে দান করা। এত বড় [illegible] জন্ত—মাতৃত্বের জন্ত—কোন্ বাড়ীর মেয়ে কবে [illegible] পান? জগতে মাতৃত্বের স্থান অতীব উচ্চে; কিন্তু মাতৃত্বের জন্ত আমরা কি ভাবে প্রস্তুত হই? যত দিন আমাদের একান্নবর্ত্তিতা ছিল, তত দিন, ছেলেবয়সে সন্তানের মাতা হইলেও, নবীনা জননীরা বর্ষীয়সী শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী প্রভৃতির নিকট হইতে, ক্রমশঃ, নানারূপ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিবার অবসর পাইতেন। এখন, স্বস্ব-প্রধানা ক্ষুদ্র সংসারের কর্ত্রীরা মেয়েদিগকে মাতৃত্বের উপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে হিষ্ট্রি, অ্যাল্‌জেব্রা প্রভৃতি পড়ান, গান শিখান এবং উল-কার্পেট বুনিতে শিখান। আর এই বালিকারা বধূ হইয়া, উনানের মধ্যে ও হাঁড়ির মধ্যে সেই সমস্ত বিদ্যা "ধো-করিয়া", কথায় কথায় হাত-পা মেলিয়া নিরাশার চীৎকার করিয়া ধন্য হন!

অজ্ঞতার কতকগুলি দৃষ্টান্ত ও সেই অজ্ঞতার মাশুলের হার কি দিতে হয়, তাহা বিবৃত করিতেছি:—

(ক) খুব কম সংখ্যক গৃহিণীরা জানেন যে, মায়ের শরীর ভাল না থাকিলে, কখনো সন্তানের স্বাস্থ্য ভাল হয় না। অথচ, এ দেশে, স্ত্রীলোকদিগের "ভাল" খাবার খাইতে নাই, এমন কি শৈশবেও নয়—কিন্তু ভাল "পরা" যথেষ্টই পরিতে আছে! এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, বাড়ীর গৃহিণীরা "আপনার পেটের সন্তান" ছেলেকে দুধ, ক্ষীর, সর, সন্দেশ, যোগা দেন; কিন্তু সেই সঙ্গেই, "আপনার পেটের সন্তান" মেয়েকে দুধ দেন না, সন্দেশ

দেন ত পাঁচ খণ্ড করিয়া দেন, "ক্ষীর সর মেয়েদের ত খাইতেই নাই!" বাড়ীতে মার্ব্বেল পাথর, কার্পেট, কৌচ, "ইলেকৃটিরির" ছয় লাপ করিতে আছে অকাতরে শাল-দোশালা, বেনারসী-পার্শী শাড়ীর জন্য মোটা মোটা টাকা ব্যয় করিতে আছে—কিন্তু প্রত্যেক ছেলেকে এক সের করিয়া দুধ খাওয়াইতে হইলেই, গৃহিণী দেউলিয়া হইবার আশঙ্কা করেন! গৃহিণীরা স্বীকার করুন আর নাই করুন—তাঁহারা নিজ তথাকথিত অভিজ্ঞতার অহম্-অহমিকার উচ্চ চূড়া হইতেই শুনিয়া রাখুন যে—

প্রত্যেক বালক ও বালিকাকে, অন্ততঃ দশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, অপর সকল খাবারের উচিত। "বধূ" অর্থে বিনা মাহিনার দাসী, যাহার শ্রমের "দিশ-পাশ" নাই; যাহার অদৃষ্টে সকলের খাবারের শেষে যাহা জোটে, তাই খাওয়া; যাহার শ্রান্তি-ক্লান্তি, সুখ-অসুখ বোধ করিবার অবসর নাই; যাহার সাধ-আহ্লাদ করিতেও নাই;—এই আদর্শে আজ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বধূ "জ্যান্তে মরা" হইয়া, একাধারে সন্তান-প্রসবের কল ও বেপরোয়া দাসী সাজিয়া, সমস্ত জাতিটাকে ধ্বংস করিতে বসিয়াছে! এখনো কি আমরা তাহা বুঝিব না? এখনো যদি আমরা চিকিৎসকদিগের এই সতর্কবাণী শুনি, তবে এখনো জাতিটাকে বাঁচাইবার সময় আছে!
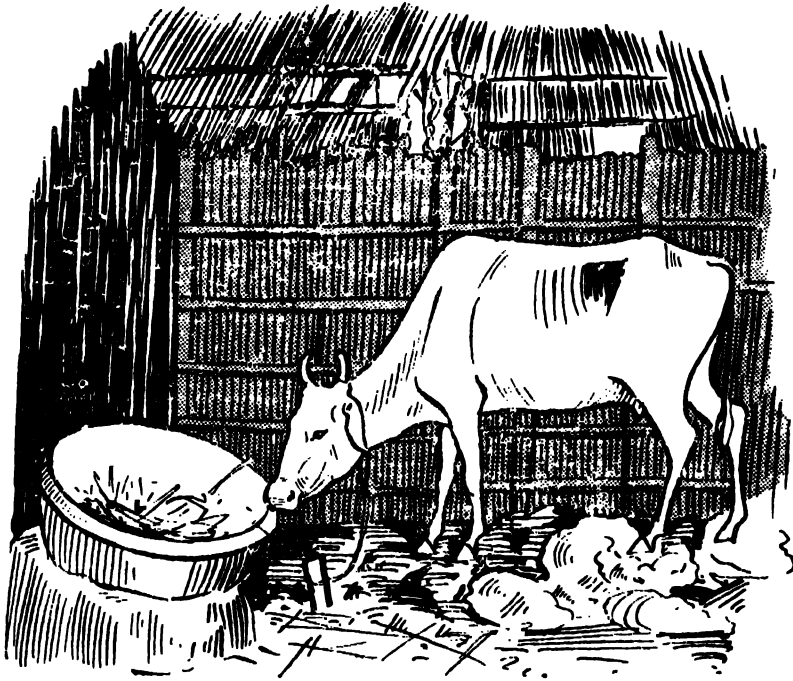
উপরে, প্রত্যহ, এক সের খাঁটি দুধ খাওয়ান চাই—চাই।

প্রত্যেক বধূকেও নিত্য ঐ হারে দুধ পান করান চাই—চাই!!!

ছেলে মেয়েদের বিবাহে অনর্থক ধুমধাম করিলে, নিজের অহংবুদ্ধির পুষ্টিলাভ ঘটে বটে; কিন্তু, সেই অর্থটা বধূমাতার "সেবার" জন্য—তাঁহাকে ভাল করিয়া দুধ ঘি প্রভৃতি খাওয়াইবার জন্য—রাখাই আমাদের

(খ) মাতৃ-স্তন্যের পরেই গো-দুগ্ধের স্থান। গরুকে আমরা মাতৃ-সম্বোধন করি, কিন্তু আমাদের অপর সকল কার্য্যের ভ্যাংচানির মত, গোমাতার অবস্থা কেমন করিয়াছি তাহা সারা জগৎ দেখিতেছে। এ দেশে, বৃষোৎসর্গ করা বন্ধ হইয়াছে—করিলেও, পিতা মাতার আত্মার কল্যাণার্থে মৃতকল্প বৎসতরীর মূল্য ধরিয়া দিয়া নির্জ্জলা জুয়াচুরি করিয়া থাকি; অর্থের লোভে আজকাল আর গোচারণ ভূমি রাখি না; গো-সেবা রাখালের

বৈমাতৃক স্নেহে পর্য্যবসিত হইয়াছে; চা-পান ও সন্দেশ মোণ্ডা খাওয়ার চোটে, কচি ছেলেরা ও বৎসতরীরা দুধ হইতে বঞ্চিত হইতেছে! কাযেই একই সঙ্গে, গোজাতি ও বাঙ্গালী জাতি ডুবিতে বসিয়াছে! যতদিন আমরা গরুর উচিতমত সেবা না করিব, ততদিন, জাতি-হিসাবে, আমাদের অবনতি অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃত পক্ষে, বাঙ্গালীর সংসারে ও সমাজে, জননীর ও গাভীর স্থান পাশাপাশি, অতি উচ্চে।

(গ) অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, হাটে-মাঠে দোহন করিলে, গরু দুধ দেয় না। নিরিবিলি স্থানে, বৎসতরীর গা লেহন করিতে করিতে স্নেহার্দ্র হইলে, তবে গরু দুধ দেয়। আর, আমাদের জননীরা যখন-তখন, মনের ও শরীরের সকল সু ও কু অবস্থাতেই, সন্তানের মুখের মধ্যে স্তন ঠাসিয়া ধরেন—সে দুগ্ধে শিশুর উপকার কি অপকার হইবে, সে জ্ঞানও তাঁহাদের নাই!
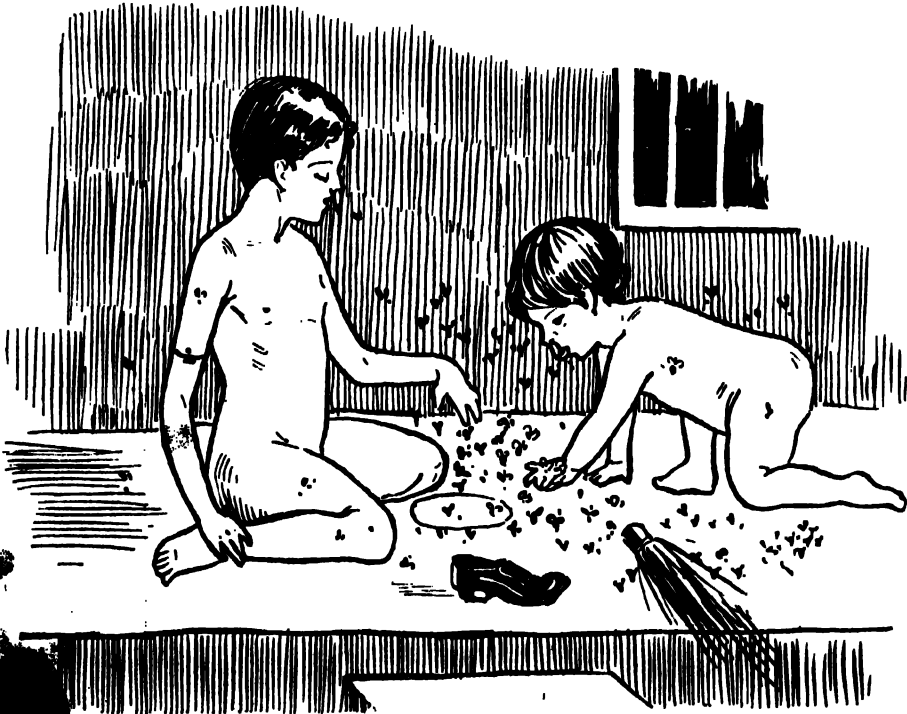
জননীর ক্রুদ্ধ অবস্থায়, মাতৃস্তন্য পান করিয়া শিশুর উদরাময় হইয়াছে, এটা অনেকবারই দেখিয়াছি। আর আমাদের বধূরা শাশুড়ীর গঞ্জনার ভয়ে, চোরের মত, কম্পিত হৃদয়ে, কতবারই না শিশুকে স্তন্য দেন! সাধে কি বাঙ্গালী জাতি ধ্বংসোন্মুখ?

(ঘ) আমাদের মেয়েরা সাবান মাখেন, দিনের মধ্যে দশবার কাপড় ছাড়েন ও গা ধৌত করেন, হয় ত বা গঙ্গাজল স্পর্শও করেন—কিন্তু বিধাতার কি দারুণ পরিহাস, এদেশের মেয়েরা পরিষ্কার থাকা কাহাকে বলে, তাহা একেবারেই জানেন না! ধূলা যে কি জঘন্য জিনিস, এবং ধূলা কর্ত্তৃক যে কত ব্যায়রাম হয়, তা তাঁহারা জানেন না ও জানিতে চেষ্টাও করেন না। অথচ তাঁহারা বেপরোয়া মাতা হইতেছেন!

ধূলা কি? মাটি+শুক্‌না বিষ্ঠাচূর্ণ+পূঁয রক্ত+থুথ্‌-গয়ার+ক্রিমির ডিম। সত্যই কি আমরা জানি না, ধূলায় কত মানুষের ও জীবজন্তুর বিষ্ঠার গুঁড়া মিশান আছে? আমরা জানি বৈ কি!—তাহা না জানিলে, "ঠাঁই" করিবার সময়ে যায়গাটি "নিকাইয়া" দিই কেন?

কিন্তু, সেই আমরা, এতবড় কাণ্ডজ্ঞান-হীনা যে, শিশুকে খাওয়াইবার সময়ে, ঝিনুকটি মাটিতে রাখিয়া, সেই ঝিনুকই শিশুর মুখে ঠেকাই! বিষ্ঠা মাড়াইলে আমরা শিশুদের বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া স্নান করাইয়া দিই, কিন্তু বিষ্ঠা-মাখা ঝিনুক ত অনায়াসে শিশুর মুখে তুলিয়া দিই? "মায়ের এমনি বিচার বটে!"

অনেক বাড়ীতে দেখিয়াছি যে, দুখানি রেকাবি মাজিবার আলস্য করিয়া, "পরিষ্কার" মেঝেতেই ছেলেদের রুটি পরিবেষণ করা হয়। মেঝে পাকাই হউক আর কাঁচাই হউক, অনেক বাড়ীতে শিশুদিগকে মুড়ি, মুড়কি, খৈ মেঝেয় ছড়াইয়া দেওয়া হয়, আর সেই মেঝে হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া শিশুরা শুষ্ক বিষ্ঠাচূর্ণ-মাখা মুড়ি প্রভৃতি খায়! আর সব চেয়ে জঘন্য প্রবৃত্তির পরিচয় পাই, যেখানে মাটিতে লবণ পরিবেষণ করা হয়, অথবা মাটিতে খাবার জিনিস পড়িয়া গেলে, তাহাই উঠাইয়া খাইতে জননীরা উপদেশ দেন! মাটিতে থাকে না এমন ময়লাই নাই—

ধূলায় থাকে { বালি, মাটি, মানুষ ও জীব-জন্তুর শুকনা মলচূর্ণ, ঘায়ের ও কুষ্ঠরোগীর পূঁয-রক্ত, ক্ষয়কাশ রোগীর গয়ার, নানা রকম ক্রিমির ডিম।

এ কথা জানিয়াও, সামান্য পয়সার মায়ায়, অথবা সামান্য গতরের খাটুনির ভয়ে জননীরা প্রত্যহ শিশুদিগকে ঐ ঘৃণিত পদার্থ খাওয়াইতেছেন! তাই—

উদরাময়
ওলাউঠা
আমাশয় { রোগে নিত্য অসংখ্য শিশু মরে!

আর সেই জন্য,

পেটে ক্রিমি নাই, এমন ছেলে দেখি না! কচি ছেলেরা মাটি হইতে খাইতে শিখে বলিয়া, তাহাদের নখের নীচে কত ময়লা থাকে! ঐ ময়লায় কত মানুষ ও জানোয়ারের বিষ্ঠা আছে, কত কুষ্ঠরোগীর ঘায়ের পূঁয ও কত ক্ষয়কাশ রোগীর গয়ার আছে! মায়েরা শিশুদিগকে কত সাবান, পমেড, হেজেলীন মাখান, কত রেশম-পশম পরান, কিন্তু কয়টি জননী শিশুর নখের নীচের ময়লা পরিষ্কার করেন—আর বেশীর ভাগ শিশুরাই যখন-তখন মুখের মধ্যে আঙুল পুরিয়া চোষে তাহা দেখিয়াও কিছু বলেন না!

(৬) আজকাল প্রসব করিলেই একটা পোর্ট, ব্রাণ্ডি বা ভাইব্রোণা প্রসূতিকে খাওয়ান ফ্যাসান হইয়াছে। প্রসবান্তে ঐ গুলি সেবন করিলে "দেহ কড়া হয় না, শীঘ্র "শুকায়" না—বরং দেহের সমূহ অনিষ্ট হয়। সে অনিষ্ট খুবই সামান্য, অপর একটী অনিষ্টের তুলনায়। যেমন প্রসূতিকে মদ্যপান করান একটা বদ অভ্যাস দাঁড়াইয়াছে, তেমনি শিশুদিগকে নানা রকম ফুড্ খাওয়ানটা আরো বিষম বদ অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আইনের ভয়ে কোনও "ফুডের" নাম করিব না; কিন্তু প্রত্যেক জননীই বেশ করিয়া স্মরণ রাখিবেন যে,

"ফুড্" খাওয়াইলে, দেখিতে শিশু গোল-গাল হয় বটে, কিন্তু সে একেবারে অন্তঃসার-শূন্য হইয়া পড়ে এবং সে শিশু অতি সামান্য কারণেই ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া বা অপর রোগে মারা পড়ে!
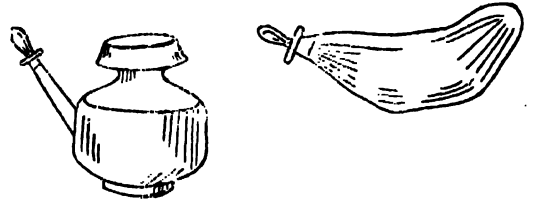
ফুড খাওয়ানের সঙ্গে ফিডিং বোতলের ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়। ফিডিং বোতলের চুচুকের (teat) মুখে কত যে মাছি বসে তাহার ইয়ত্তা নাই। আর মাছি বসা চুচুক মুখে দেওয়ার ফলে ছেলেদের ভীষণ উদরাময় হয়। মাছিরা বিষ্ঠায় বসে; কাযেই মাছি বসিয়াছে এমন কিছু শিশুর মুখে দেওয়া যা, সদ্য বিষ্ঠা তুলিয়া শিশুর ওষ্ঠে তাহা মাখাইয়া দেওয়াও তাই।

এই সব অজ্ঞতার মাশুল বাঙ্গালার জননীরা কি হারে দেন, এই বারে তাহা শুনুন—

এই বাঙ্গালাদেশে,

৩ মিনিট অন্তর একটী শিশু নিউমোনিয়ায় মরে!
৪ „ „ „ „ ওলাউঠায় „
৪ „ „ „ „ আমাশয়ে „
২৫ „ „ „ „ টাইফয়েড্ জ্বরে „

বঙ্গের জননীরা—হৃদয় থাকে ত একবার তাহার পরিচয় দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগুন!

কাপুরুষ ?

(গল্প)

[শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু সাহিত্য-রত্ন, বি-এ]

১

সমস্ত হল-ঘরটায় গুমোটের মত অসহ্য নীরবতা একটা দারুণ অস্বস্তি আনিয়া দিল। সে কিন্তু মুহূর্ত্ত মাত্র। তাহার পরেই শ্রাবণের ধারার মত বিকট 'ছি ছি'র ধিক্কার-ধ্বনি ঘরটা ছাইয়া ফেলিল!

সে ছিল আমাদের ইনষ্টিটিউটের প্রধান পাণ্ডা—রূপে গুণে আমাদের তরুণ-সঙ্ঘের সর্ব্বজন-প্রিয় দলপতি। তাহার মত 'অল রাউণ্ড স্পোর্টস্‌ম্যান' আমাদের দলে ত ছিলই না, এত বড় সহরে কেহ ছিল কি না জানি না। আমাদের ইনষ্টিটিউটের ছেলের দল তাহার কথায় মরিত বাঁচিত। তাহার গুণের কথা এক মুখে কি বলিব?

তাহাকে দেখিলে আমরা তামাসা করিয়া রঘুর শ্লোকটা প্রায়ই আওড়াইতাম—"ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশু মহাভুজঃ।" বস্তুতঃ তেমন দীর্ঘোন্নত, বলিষ্ঠ, সুগৌর সুশ্রী যুবক বাঙ্গালীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না।

তাহার নামে কলঙ্ক—হিরণকুমারের নামে কলঙ্ক! প্রথমে বিশ্বাস করিতেই প্রবৃত্তি হইল না। এই ত বেলা ২টার সময় সে আমাদের সঙ্গে ইনষ্টিটিউটে "মার্চ্চেণ্ট অফ ভিনিসের" রিহার্সাল দিতেছিল। আমি চলিয়া গেলাম রিহার্সালে নিমন্ত্রিতগণকে আনিতে। মাত্র ঘণ্টাখানেক গিয়াছি, ইহার মধ্যে কোথা হইতে কি হইয়া গেল!

হল-ঘর সদস্য ও তাহাদের বন্ধুবান্ধবে ভরিয়া গিয়াছে। আমি আরও কয়টী নিমন্ত্রিত ভদ্রলোককে লইয়া পৌঁছিয়াই শুনিতে পাইলাম, হল-ঘরে একটা যেন গণ্ডগোল হইতেছে। ব্যাপার কি? হিরণ ত রহিয়াছে, তবে? আমাদের ইনষ্টিটিউটের ভিতরে হিরণ উপস্থিত থাকিতে ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করিতে সাহসী হয়, কে সে ব্যক্তি? গোলমালে ঠিক কাহারও গলা বুঝা যাইতেছিল না, আমি উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ লইয়া হলঘরে প্রবেশ করিলাম।

হলঘরে পদার্পণ করিবা মাত্রই কর্ণে সুরেশের উচ্চস্বর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল,—তাই ত! ওর যে এণ্টনিওর পার্ট রয়েছে রে! কি হবে?

পরেশ কথার পিঠেই সঙ্গে সঙ্গে বলিল, আর মেঘনাদে মেঘনাদ?

এ ত দেখিতেছি হিরণের কথাই হইতেছে। হিরণকেও দেখিতে পাইতেছি না। কি হইল? তাড়াতাড়ি নিমন্ত্রিতগণকে সেক্রেটারীর ঘরে বসাইয়া চলিয়া আসিলাম। আমার প্রতি তখনও কাহারও নজর পড়ে নাই। আমি একরূপ নিঃশব্দেই তাহাদের মাঝে গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, ছেলের দল একস্থানে জমায়েৎ হইয়া গুলতানি করিতেছে। ব্যাপার যে তাহা হইলে কিছু না কিছু একটা গুরুতর রকমের হইয়াছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

আমাকে দেখিয়াই বরেন বলিল, এই যে গুণেনদা, শুনেছ সব?

আমি বলিলাম, না। কি?

বরেন বলিল, হিরণ......

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, হিরণ? হিরণ কি?

পাঁচ সাত জন ছেলে সমস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল, ড্যাম কাওয়ার্ড! ব্রুট!

আমি ত অবাক্! ক্ষণেক হতভম্ব হইয়া থাকিবার পর বলিলাম, হিরণ কাওয়ার্ড? তার মানে? হাঃ হাঃ। জোকিং?

রমেশ বলিল, জোক্? এটা যদি জোক্ হয়, তাহ'লে এর চেয়ে সিরিয়াস কি, তা ত জানি নি আমরা।

আমি একটু বিরক্ত হইয়াই বলিলাম, খুলেই বল না ছাই, ব্যাপারটা—এই শুনে গেলুম বরেন বলছে, তার এণ্টনিওর পার্ট রয়েছে মার্চ্চেণ্ট অফ ভিনিসে—তা সে কি রিফিউজ করেছে?

সুরেন গম্ভীর হইয়া বলিল, রিফিউজ করলে ত বুঝতুম

তার এখনও চারা আছে; প্লে ত আর আজ হচ্ছে না।

আমি বলিলাম, তবে?

উত্তরে বরেন যা বলিল, তাহাতে আমি বসিয়া পড়িলাম—আমার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। আবার 'ছি ছি' রবে ঘরটা ভরিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে আমি হাসিয়া বলিলাম, দূর, এও কখনও হতে পারে? তোরা তামাসা করছিস! হিরণ?—আর কেউ হলে না হয়—হিরণ—হিরণ এই কাজ করেছে? দূর! এত ভার্টি, এত মীন্? হতেই পারে না।

আমার ক্রুদ্ধ অক্ষি, গম্ভীর মুখ, আর মুষ্টিবদ্ধ হস্ত দেখিয়া সকলেই বুঝিল, হিরণের নামে কোন কুৎসা রটনা আমি সহজে সহ্য করিব না। সকলে জানিত, আমি ও হিরণ অভেদাত্মা। বরেন কিন্তু তখনও দৃঢ়স্বরে বলিল, তুমি রাগই কর আর যাই কর, গুণোদা, চাক্ষুষ যা দেখেছি তাতো আর অবিশ্বাস করতে পারি নি। মাতাল আঙ্গলটা এসে যাচ্ছে তাই বলে গাল দিয়ে গেল—যাবার সময় 'ড্যাম সোয়াইন' বলে মুখের উপর ছড়ির ঘা বসিয়ে দিলে তবু রাস্কেল হিরণটা কথাটি কইলে না! এটা কি ষ্ট্রেঞ্জ নয় বলতে চাও? হিরণ কিল খেয়ে কিল হজম করে, এর মানে কি?

আমি বলিলাম, হাঁ, ব্যাপারটা ঘোরালো বটে। তা, আমিও এর একটা হেস্ত-নেস্ত করতে ছাড়ছি না। দেখ, তোরা সব বাড়ী যা, আজ আর রিহার্সাল হবে না, আমি তার সন্ধানে চল্লুম।

বরেন বলিল, বারে, তা কেমন করে হবে? যাঁদের ইনভাইট ক'রে—

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, সে হবে'খন হ্যামলেটের অভিনয়ে হ্যামলেট নেই, তা ত হতে পারে না। পরেশ, তুই ভাই গেষ্টদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ী পৌঁছিয়ে দিয়ে আয়—তোর ওপরেই ভার রইল। আমি চল্লুম।

যখন বাহিরে আসিলাম, তখনও ছেলের দল হিরণের কথা লইয়া গুলতানি করিতেছিল, বেশ বুঝিলাম; কারণ, রাম [illegible] রামায়ণ নাই, তেমনই আমাদের ছাত্র-[illegible] হইতে পারে, এ বিশ্বাস আমাদের ছিল না।

২

হিরণের কুৎসার কথা আমি কেন সহ্য করিতাম না, তাহার একটা মস্ত বড় কারণ ছিল। তাহার সহিত আমার এক নিকট-আত্মীয়ার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছিল। উৎসা তাহারই যোগ্য বটে। উৎসা আমার মাতৃস্বসার একমাত্র কন্যা। আমার মেসোমহাশয় হাই-কোর্টের সিনিয়ার উকীল, তাঁহার সম্পত্তিও কম ছিল না। উৎসা শিক্ষিতা, সুন্দরী, পরন্তু ধনিকন্যা; সুতরাং এমন কন্যার বর খুঁজিতে বেগ পাইতে হয় না। বিধাতার বিধানে যোগ্য বরই তাহার মিলিয়াছিল। হিরণ আমার সতীর্থ—সে সহরের মস্ত বড় ধনীর সন্তান—কিন্তু তাহা বলিয়া আলালের ঘরের দুলাল ছিল না। প্রেসিডেন্সী হইতে বি-এ, পাশ করিয়া সে বিলাত যায়। সেখানে অক্সফোর্ডে এম-এ, পড়িতেছে, এমন সময় তাহার পিতা রাইচরণ বাবু হৃদ্‌রোগে মারা যান। তাহার লেখাপড়া আর হইল না, তাড়াতাড়ি তাহাকে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। তদবধি সে তাহার আরাধ্যা বিধবা জননীকে লইয়া তাহাদের বেলতলার বাটীতেই বাস করিতেছে। এখনও সে আমাদের ইনষ্টিটিউটের মেম্বার আছে। আমাদের সকল খেলায়, সকল আমোদ-প্রমোদে, সকল সৎকার্য্যে সে-ই অগ্রণী—সে না থাকিলে আমাদের কোন কাজই সম্পূর্ণ হয় না।

যেবার হিরণ অক্সফোর্ডে ভর্ত্তি হয়, সেবার উৎসা বেথুন কলেজ হইতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। সে যেমন সুন্দরী তেমনিই নানা গুণের অধিকারিণী। বিদ্যার চর্চ্চা করা তাহার জীবনের একটা চরম লক্ষ্য ছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া সে পুস্তকের কীট ছিল না—গীত-বাদ্য, আমোদ প্রমোদও সে গুরুগম্ভীর বিদ্যালোচনার মত আপনার জীবনের অঙ্গ করিয়া লইয়াছিল। এই জন্য তাহাকে আমরা 'সরস্বতী' আখ্যা দিয়াছিলাম।

ইংরাজীতে যাহাকে বলে প্রথম দর্শনেই ভালবাসা, তাহাই তাহাদের মধ্যে হইয়াছিল। যোগাযোগটাও হইয়াছিল আমারই মারফতে! আমার বেশ মনে আছে সে দিনের ঘটনাটা। সেবার আমরা বি-এ, পরীক্ষা দিয়াছি, পরীক্ষার ফল বাহির হইবার বিলম্ব নাই। আমি, হিরণ ও জ্যোতীশ দার্জ্জিলিং বেড়াইতে গিয়াছিলাম, মাত্র পূর্ব্বদিন

কলিকাতায় ফিরিয়াছি। পরের মাসে হিরণ বিলাত যাইবে। সন্ধ্যার পর একটু বিশ্রাম করিয়া হিরণদের ওখানে যাইব মনে করিতেছি, এমন সময় মাসীমা উৎসাকে লইয়া আমাদের বাড়ীতে আসিলেন। আমি সবেমাত্র জামাটা গায়ে চড়াইয়া টেবিলের সামনে চুলটা আঁচড়াইতে সুরু করিয়াছি, এমন সময় উৎসা ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া একবারে আমার হাত হইতে ব্রাসখানা টান মারিয়া কাড়িয়া লইয়া বলিল, গুণোদা, কি খাওয়াবে বল ?

আমি বিন্দুমাত্র বিস্মিত হই নাই, তাহার কাজগুলাই ছিল ঐরূপ। বয়সের সঙ্গে সকল মেয়েরই একটা গাম্ভীর্য্য আসে, উৎসার ধাতু ছিল ভিন্ন রকমের—তাহার অন্তরের হাসি ও স্ফূর্ত্তির সীমা ছিল কোথায়, তাহা আমরা কখনও ধরিতে পারি নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার প্রগল্‌ভতা আদৌ ছিল না। মেসোমশাই একটু লিবারল ছিলেন, তাঁহার বাড়ীতে অবরোধ ত ছিলই না, বরং তাঁহার বন্ধুবান্ধবের ছেলেপুলেদের তাঁহার বাড়ীতে অবাধ যাওয়া-আসা ছিল। কত ভাল ভাল ছেলে তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত বা অনিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছে, সকলেই তাঁহার শিক্ষিতা স্ত্রী-কন্যার সহিত আলাপ পরিচয় করিয়াছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত উৎসার মুখের দিকে চাহিয়া কেহ হাসি-তামাসা করিতে সাহসী হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। তাহার সদা প্রফুল্লতার মধ্য দিয়াও এমন একটা গভীর তেজ ও আত্ম-সম্মানের ভাব ফুটিয়া উঠিত—যাহার ঝাঁঝের কাছে কাহারও অগ্রসর হইবার সাহস হইত না।

আমি তাহার ঝড়ের মত আগমন ও ততোধিক অতর্কিত প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে কিছুই বলিতে পারি নাই। পরে বলিলাম, খাওয়াব কেন ? কি সূত্রে ? বরং তোরাই আমাকে খাওয়াবি, আমি দার্জ্জিলিংএর ফেরত বুভুক্ষু আসামী।

সে বলিল, বারে, তাই বুঝি ! অনার্সে পাশ করেছ, তার সন্দেশটা ?

আমার বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল, পরীক্ষার্থি-মাত্রেরই এরূপ হয়। অনিশ্চিতের আশঙ্কা যখন দূর হওয়ার প্রথম সম্ভাবনা হয়, তখন এমনই একটা সুখের আঘাত বুকে লাগে। আমি বলিলাম, সত্যি ? খবর পেলি কোথা ?

উৎসা তখন চেয়ারে বসিয়া পড়িয়াছে, মাসীমাও আসিয়া বসিয়াছেন। মাসীমা বলিলেন, হ্যাঁরে, সত্যিই গুণো তুই পাশ করেছিস, উনি খবর পেয়েছেন কোথেকে। তাই দৌড়ে খবরটা দিতে এলুম, ছিলি দার্জ্জিলিং এ পড়ে—

মাসীমার কথাটা শেষ হইল না, সকলে উৎকর্ণ হইয়া শুনিলাম, দেউড়ীতে মোটরের ভোঁ ভোঁ, পরক্ষণেই সোপানে ধুপ ধাপ্ শব্দ। আওয়াজ শুনিয়াই বুঝিলাম কে আসিতেছে ! এক এক লম্ফে তিনটা সোপান অতিক্রম করিয়া আর কেহ ত সোপানে উঠে না ! মুহূর্ত্তেই সন্দেহ দূর হইল—হিরণ সোপান হইতে হাঁকিল,—রাস্কেল, কি খাওয়াচ্ছিস্ বল্ !

আশ্চর্য্য ! দুই জনের মুখে একই কথা—প্রথম সম্ভাষণে ! বিধাতার যোগাযোগের নিদর্শন না কি ? হিরণটা হাসির ফোয়ারা খুলিয়া কক্ষে পদার্পণ করিয়াই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল—এ দৃশ্য ত সে প্রত্যাশা করে নাই। আর—আর বিস্ময়ের বিষয়—উৎসাও অপলক নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। মুহূর্ত্ত মাত্র ! কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই তাহাদের উভয়ের নিকটে বোধ হয় জগৎ সংসার কিছুই ছিল না—এই বিরাট্ বিশ্বে তাহারা দুইটী প্রাণীই বুঝি তখন একা !

মুহূর্ত্ত পরেই উৎসা আরক্ত-মুখ নামাইয়া লইল। রাস্কেল হিরণটাও যে খুবই অপ্রতিভ হইয়াছিল, তাহা তাহার মুখ চোখের ভাবেই ধরা পড়িল। সে আমতা আমতা করিতে করিতে বলিল,—অ-ফুলি সরি ! গাধার মত ইনট্রুড করেছি বোধ হয়—বলিয়াই তিন চারি লাফে একবারে অন্তর্দ্ধান ! কত ডাকিলাম, কিছুতেই ফিরিল না। ইডিয়ট ! মাসীমা বলিলেন, আহা, দিব্যি ছেলেটি ! কে রে গুণো ? আমি পরিচয় দিলাম। উৎসা কিন্তু নত-মুখ আর তুলিল না।

সেই প্রথম দেখা। হিরণের কাছে পরে শুনিয়াছি, সেই দেখাই তাহার ইহজন্মের দেখা। উৎসার মুখে কোন কথা শুনি নাই, হিরণের কথা উঠিলেই সে কথা থাকিলেও উঠিয়া পলায়ন করিত। অত্যন্ত হাসি-তামাসার মধ্যে তাহাকে হিরণের গলার সাড়া পাইয়া উঠিয়া দ্রুত পলায়ন করিতে দেখিয়াছি। দৈবাৎ উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়া গেলে

তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত সমস্ত মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিত, সে নত-মস্তকে বসিয়া থাকিত, কোন কথায় যোগদান করিত না।

ইহার পর হইতেই মাসীমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আমাকে ঘটকালীর পেশা ধরিতে হইল। মাসীমার অনুরোধের মাত্রা যতই চড়িতে লাগিল, ততই বুঝিলাম এত দিন পরে সম্ভবতঃ শিবের মাথার ফুল পড়িয়াছে। উৎসা এত দিন বিবাহের নাম শুনিলে জ্বলিয়া যাইত।

এত দিন সে বরাবরই ইঙ্গিতে বুঝাইয়া আসিয়াছে যে, সে বাণীর পূজারিণী রূপেই জীবন উৎসর্গ করিবে। মাসিমা কাহাদের নিকট গোপনে শুনিয়াছেন যে, সে বলিয়াছে, কেহ তাহার মন জয় করিতে না পারিলে সে কাহারও নিকট দেহ বিক্রয় করিবে না, ইহাই তাহার পণ। কিন্তু সে বিবাহের কথা উঠিলে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিত না।

আমাদের ওখানে উৎসাদের ন মাসে ছ মাসে যাওয়া-আসা ছিল কি না সন্দেহ। শিকদার-বাগানে তাহাদের বাড়ী। শিকদার-বাগান আর বকুলবাগান, বড় কাছে পিঠে নয়। হিরণ কতবার পঠদ্দশায় আমার ওখানে আসিয়াছে, অথচ একবারও সেখানে উৎসার সহিত তাহার দেখা হয় নাই। বিশেষ আমি উভয়ের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ ঘটাইবার পক্ষে ছিলাম না। কারণ আমি যতবার হিরণের প্রসঙ্গ পাড়িয়াছি, ততবারই উৎসা হাসি-বিদ্রূপে আমার কথা উড়াইয়া দিয়াছে। আমি কতবার হিরণের দৈহিক শক্তির প্রশংসায় বিভোর হইয়াছি, কতবার তাহার রূপগুণের কথা পাড়িয়াছি, কিন্তু উৎসা কেবল বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি, আমি হিরণকেই উৎসার একমাত্র যোগ্য পাত্র বলিয়া মনে করিতাম, তাই প্রায়ই তাহার কাছে হিরণের কথা পাড়িতাম; কিন্তু তাহার মনের ভাব দেখিয়াই ক্রমে হতাশ হইয়া পড়িয়া যোগাযোগ ঘটাইবার আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। শেষে বিরক্ত হইয়া স্থির করিয়াছিলাম যে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল। কিন্তু এই একটী দিনে বিধাতার অপূর্ব্ব যোগাযোগে দুইটী প্রাণের মিলনের বাধা এক মুহূর্ত্তে কোথায় অপসারিত হইয়া গেল!

ইহার পর হইতে উভয়ের মাত্র তিন চারি বার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু কথার সুযোগ অল্পই হইয়াছিল। আমি কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, উহারা পরস্পর চিত্ত বিনিময় করিয়াছে। বিলাত-যাত্রার পূর্ব্বে হিরণ আমার নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়া গেল, জীবনে সে একবার ভাল বাসিয়াছে—উহাই তাহার প্রথম ও শেষ।

তাহার পর হিরণের প্রবাস-জীবন। ঐ সময়ের মধ্যে মেসোমহাশয় ও মাসীমাতা উৎসার বিবাহের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। মেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছে, সাহেবী ষ্টাইলে থাকিলেও তাঁহারা হিন্দু, হিন্দুর ঘরে কন্যাকে পাত্রস্থ না করিলে ত চলিবে না। কত ভাল ভাল সম্বন্ধ দেখা হইল, রূপে, গুণে, অর্থে, মানে, কুলে, শীলে, তাহারা সকল কন্যারই স্পৃহণীয়। কিন্তু উৎসার এক কথা—সে বিবাহ করিবে না। এবার আমি তাহার আপত্তির কারণ বুঝিয়াছিলাম। এক দিন পরীক্ষা করিবার ইচ্ছায় পাঁচ কথার মধ্যে হিরণের কথা পাড়িবামাত্র তাহার অলক্ষিতে দেখিয়াছিলাম, তাহার সুন্দর মুখখানি একবারে সিন্দুরের মত রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে—সে পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। তখন বিলাত হইতে প্রেরিত হিরণের পত্র খানা তাহার সম্মুখেই পাঠ করিয়াছিলাম। সে নিবিষ্ট মনে তাহা শুনিয়াছিল, অবশ্য অন্য কার্য্যে লিপ্ত আছে এইরূপ ভাণ করিয়া। আমি যেন ভুল করিয়া পত্র খানা ফেলিয়া দিয়াছি এই ভাব দেখাইয়া চলিয়া আসিয়াছিলাম। সেখানা আর আমি ফিরিয়া পাই নাই। বুঝিয়াছিলাম, এত দিন বৃথায় আমি হিরণের রূপ-গুণের কথা তাহাকে শুনাই নাই। নহিলে এক দিনের সাক্ষাতেই কি এত হয়?

কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে তাহাদের বিবাহের কথা একরূপ স্থিরই হইয়াছিল। হঠাৎ হিরণের বাপ মারা গেলেন, তাড়াতাড়ি হিরণকে দেশে ফিরিতে হইল। কথা রহিল, এক বৎসর কালাশৌচ গত হইলে পর বিবাহ হইবে। ইতিমধ্যেই উভয় পক্ষে তত্ত্ব-তাবাস চলিতেছিল, হিরণও প্রায় উৎসাদের ওখানে যাওয়া আসা করিত! এরই মধ্যে এই বজ্রাঘাত!

৩

আঘাতটা ছোট খাটো নহে, একেবারে যাহাকে বলে সাংঘাতিক। যৌবনের উদ্দাম প্রবৃত্তি মানুষকে বিপথে

লইয়া গিয়া থাকে, ইহাতে বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই; কিন্তু যদি তাহার সঙ্গে নীচতা, কাপুরুষতা—সঙ্কীর্ণ জঘন্য স্বার্থপরতা স্থান পায়, তাহা হইলে কেমন হয়? বিশেষতঃ যাহার নির্ম্মল চরিত্রে শত অপরাধের মধ্যেও এতদিন সামান্য এক বিন্দু সঙ্কীর্ণতার স্পর্শমাত্র ঘটে নাই, তাহার সম্বন্ধে যদি অতি জঘন্য সঙ্কীর্ণতার খবর পাওয়া যায়?

প্রথমটা বিশ্বাস হয় নাই কিন্তু—কিন্তু—প্রত্যক্ষ ঘটনা! ইনষ্টিটিউটের অনেক ছেলে দেখিয়াছে—উহা ত অবিশ্বাস করা যায় না। ছিঃ ছিঃ ইহার পর জগতে আর কাহাকে বিশ্বাস করিব?

বরেন একটা মাতাল সাহেবের কথা বলিয়াছিল, এ-কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সাহেবটা ছিল অদ্ভুত প্রকৃতির। শুনিয়াছি পূর্ব্বে সে ছিল একটা ভাল চাকুরে, বিলাত হইতে এদেশের কাষ্টম বিভাগে একবারে মাসিক ৮শত টাকা বেতনে চাকুরী করিতে আসে। কিছু দিন চাকুরীর পর এদেশের গরম সহ্য করিতে না পারিয়া সে অসুস্থ হইয়া পড়ে, তাহাকে হাঁসপাতালে যাইতে হয়। সেখানে এক দেশীয় বাঙ্গালী খৃষ্টান নার্স তাহাকে অহোরাত্র এক-মনে এক-প্রাণে সেবা করিয়াছিল। সে পরে তাহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া সাহেব-পল্লী ছাড়িয়া দিয়া ভবানীপুরের বেলতলা পল্লীতে এক খোলার ঘরে বাস করিতে থাকে। সে ক্রমে বাঙ্গালীর মত থাকিতে, খাইতে, বেশ-বিন্যাস করিতে এবং কথা কহিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। সে যখন বাঙ্গালীর মত কাপড় পরিয়া হুঁকায় তামাক টানিত, তখন তাহাকে কেহ হঠাৎ সাহেব বলিয়া ধরিতে পারিত না। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের ফলে সাহেবরা তাহাকে একঘরে করিল, তাহার বড় চাকুরী গেল, সে উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোনরূপে সংসার চালাইত। শেষে সংসারের কষ্ট ভুলিয়া থাকিবার জন্য মাঝে মাঝে মদ খাইতে লাগিল। কিন্তু এত দুঃখ কষ্টেও তাহাকে অনেকে বলিতে শুনিত, "বাঙ্গালী ওয়াইফের মত ওয়াইফ জগতে নেই রে বাবা—স্ত্রীকে স্ত্রী, মা, বোন, নার্স, কুক, সার্ভেণ্ট—সব একজনেই পাওয়া যায়।"

বিবাহের পরই মুর সাহেবের একটি কন্যা হইয়াছিল—সাহেব তাহার নাম রাখিয়াছিল 'ডলি'। ডলিকে কিন্তু সে ঠিক বাঙ্গালী মেয়েরই মত লালন-পালন করিয়াছিল। বস্তুতঃ পালন তাহাকে বড় একটা করিতে হইত না, সে ত অহোরাত্র প্রায় অর্থের সন্ধানে ঘুরিত, পালন করিত মিসেস্ মুর। সে খৃষ্টান হইলেও বাঙ্গালীর মেয়ে, কাজেই সে নিজের মেয়েকেও আপনার মত করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিল।

ডলির বয়স হইলে তাহার মা তাহাকে পাড়ারই একটা বালিকা-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিল। মুর-সাহেবের কিন্তু ইচ্ছা ছিল, কন্যাকে ভাল করিয়া লেখা-পড়া শিখাইতে; কিন্তু অর্থাভাব! যখন সে মদ খাইত না, তখন মেয়েকে আদর করিত, স্ত্রীর কাছে কৃত-অপরাধের জন্য বার বার ক্ষমা চাহিত, সংসার-প্রতিপালনের জন্য স্ত্রীকে আর নার্সগিরি করিয়া রোজগার করিতে দিবে না, নিজেই মুঠা মুঠা টাকা আনিয়া দিবে, এই সব কথা বলিত, আর ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিত। দোষে-গুণে লোকটা মন্দ ছিল না—। এ সব কথা আমি হিরণের মুখেই শুনিয়া ছিলাম—হিরণদের বাড়ীর কাছেই এক বস্তীতে মুর সপরিবারে বাস করিত। তাহার পর মুর নিজে পাড়ার অবস্থাপন্ন লোকের নিকট ভিক্ষা সাধিয়া ডলিকে ডাওসেসান স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিল। এ-ভিক্ষার অধিকাংশটাই কে দিত, তাহা মুর-ই নেশার ঝোঁকে পাড়ায় পাড়ায় বলিয়া বেড়াইত। প্রকৃতপক্ষে ডলির লেখাপড়ার খরচটা প্রায় সমস্তই হিরণকে বহিতে হইত, ইহা আমরা জানিয়া-ছিলাম। এমন দান তাহার একটা ছিল না। কিন্তু সে নিজে কখনও কাহাকেও তাহা জানিতে দিত না। ডলি এইভাবে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ দিয়া আই-এ, পড়িতেছিল। সে হিরণকে দাদা বলিত এবং হিরণও তাহাকে আপনার কনিষ্ঠা ভগিনীর মত স্নেহ করিত, ইহাও আমরা জানিতাম।

সে দিন যখন হিরণ ছেলেদের সঙ্গে ইনষ্টিটিউটে মার্চ্চেণ্ট অব-ভিনিস্ রিহার্সেল দিতেছিল, তখন হঠাৎ মাতাল মুর একবারে মারমুখো হইয়া হলঘরে প্রবেশ করে। তখন তাহার অঙ্গে হ্যাটকোট ছিল; বাহিরে গেলে সে সাহেব সাজিত। কাজেই দ্বারবান ভয়ে তাহাকে দেউড়ী ছাড়িয়া দিয়াছিল। ছেলেরা বলে, সে সটান হিরণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ছড়ি তুলিয়া বলিল, শয়তান! আমার ডলিকে কোথায় রেখেছিস্ বল? না হলে—

ছেলের দল বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া ক্ষণেক তাহার দিকে চাহিয়া রহিল,—তাহার পর এক জন উদ্যত-মুষ্টি হইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, মাতলামির আর জায়গা পাওনি—

হিরণ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, কি হয়েছে মিঃ মুর ?

মুরের মুখে তখন নরকের ক্রোধ ও ঘৃণা ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে ক্রোধ-কম্পিত-কণ্ঠে বলিল,—এটা কি দেখছিস ? বলিয়া একখানা কাগজ হিরণের সম্মুখে ধরিল। ছেলেরা দেখিল, সেখানা একটা মণিঅর্ডারের ফরম। সাহেবটা মাতাল, তাহার উপরে বহু দিন যাবৎ তাহার মেয়ে ডলি নিরুদ্দেশ, মাথা খারাপ হইয়া যায় নাই ত !

কিন্তু হিরণ সেই ফরমখানা দেখিয়া কি মনে করিল, কেহ জানিল না, তবে ছেলেরা সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার মুখখানা পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

মাতাল মুর তখন বিকৃত কর্কশস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, এত দিন এই ঠিকানায় তা হ'লে ডলিকে টাকা পাঠান হচ্ছিল। ড্যাম সোয়াইন !

বলিয়াই সে ছড়িটা তুলিয়া সজোরে হিরণের মুখের উপরে বসাইয়া দিল। হিরণের ওষ্ঠ কাটিয়া রক্ত ঝুঁঝিয়া পড়িল। তথাপি আশ্চর্য্য ! ছেলেরা উত্তেজিত হইয়া মাতালটার গলা টিপিয়া ধরিলেও হিরণ শান্ত, নির্ব্বিকার। কেবল সঙ্কেতে ছেলেদের নিরস্ত হইতে বলিয়া সে রুমাল দিয়া রক্ত মুছিতে লাগিল। পরে শান্ত-স্বরে বলিল, ডলির কথা আমি জানি, কিন্তু তোমায় কেন, কাউকে বলব না, তোমার যা ইচ্ছে করতে পার।

কথাটা বলিয়াই উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া সে তৎক্ষণাৎ হল ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ছেলের দল একেবারে স্তম্ভিত ! মাতালটা বুনো শুয়ারের গোঁ ধরিয়া হল-ঘর হইতে ঝড়ের বেগে বাহির হইতে গেল, কিন্তু অতিরিক্ত মত্ততা হেতু একটা চেয়ারে বাধা পাইয়া সশব্দে পড়িয়া গেল। তখন তাহার দিকে কাহারও নজর ছিল না। সে যে কখন গা ঝাড়িয়া উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাও কেহ জানিতে পারে নাই। ছেলেরা তখন পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া পরস্পরকে নীরবে প্রশ্ন করিতেছিল,—এ কি অভাবনীয় কাণ্ড ! যে হিরণের মুষ্ট্যাঘাতে খেলার মাঠে কত [illegible] কতবার ধরাশায়ী হইয়াছে, আজ তাহার এ কি ব্যবহার ! মার খাইয়া, সে ভাল মানুষের মত চলিয়া গেল ! অপমানিত হইয়া, বিশেষতঃ চরিত্রের প্রতি কুৎসিত ইঙ্গিত শুনিয়া সে চুপ করিয়া মার ও অপমান হজম করিল। এ কি প্রহেলিকা ! এই ব্যাপার সম্বন্ধেই যখন ছেলেদের মধ্যে জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল, আমি সেই সময়েই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হই।

আমি হিরণদের বেলতলার বাড়ীর দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে হইতে কেবল এই কথা ভাবিতে লাগিলাম,—ডলি ! না, অসম্ভব ! হিরণ তাকে সহোদরার অধিক স্নেহ করিত, ইহা আমি তাহার অনেক আচরণে বুঝিয়াছিলাম। সেই হিরণ এমন নীচ, এমন প্রাণহীন বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে ! ছি, ছি, মানুষ চিনিতে পারা ত তাহা হইলে বড়ই কঠিন।

হিরণের ওখানে পৌঁছিয়া দেখিলাম, জেঠাইমা নীরবে গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছেন। হিরণের মাকে আমি জেঠাইমা বলিতাম। আমাকে দেখিয়াই তাঁহার নয়নে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। তিনি স্বল্প-ভাষিণী ও পরম ধৈর্য্যশালিনী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বাষ্পাকুল নয়ন দেখিয়া বুঝিলাম, আঘাতটা তাঁহাকে খুব অধিকই বাজিয়াছে। সর্ব্বগুণান্বিত সন্তানের এই ব্যবহার কি তিনি জানিতে পারিয়াছেন ? তাঁহার কথার ভাবে তাহা কিন্তু জানা গেল না। যতটা শুনিলাম, তাহাতে বুঝিলাম, হিরণ সরাসরি ইনষ্টিটিউট হইতে বাড়ী গিয়াছিল এবং কোন কিছু না বলিয়া মাত্র একটি সুটকেস সাজাইয়া অপরাহ্ণেই গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। জননীর বার বার অনুরোধ ও মিনতিতেও তাহার মন টলে নাই,—কোথায় কি কারণে কত দিনের জন্য যাইতেছে, সে কিছুতেই বলে নাই। এমন ভাবে মাতা-পুত্রের ছাড়াছাড়ি এই প্রথম। তাই তিনি মনে বিষম ব্যথা পাইয়াছেন।

যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিব, তাঁহাকে এই আশ্বাস দিয়া আমি শিকদার-বাগানে উৎসাদের বাড়ী গেলাম—যদি সেখানে কিছু সন্ধান মিলে। মিথ্যা আশা ! সেখানে হিরণ যায় নাই। সে কোথায় গেল ? এত বড় ছোটলোক,—সংসারের মধ্যে তাহাকে এক মা ভিন্ন আপনার বলিবার কেহ নাই, অথচ তাঁহাকেও বলিয়া গেল না, কোথায় যাইতেছে ? ইডিয়ট !

পাছে কথাটা অপরের মুখে অতিরঞ্জিত হইয়া উৎসা-দের কাণে উঠে, এই জন্য আমি নিজে যতটা পারি রাখিয়া ঢাকিয়া কথাটা তাঁহাদের শুনাইয়া দিলাম। যতক্ষণ মেসোমশাই ও মাসীমাকে কথাটা বলিতেছিলাম, ততক্ষণ উৎসা নীরবে ঘাড় গুঁজিয়া শুনিয়া যাইতেছিল, শেষ হইলেই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল—তাহার মুখে চোখে আমি কোন ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম না।

সেখান হইতে আমি সহরটা তোলপাড় করিয়া বেড়াইলাম। যেখানে যেখানে তাহার যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সকল জায়গাই সন্ধান লইলাম, কোথাও তাহার খোঁজ পাইলাম না। শেষে স্থির করিলাম, যখন সুটকেস লইয়া বাহির হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই সহর ছাড়িয়া দূরে গিয়াছে। শিয়ালদা, হাওড়া, দুইটা ষ্টেশনেই ঘুরিয়া আসিলাম—সমুদ্রে রত্ন হারাইয়া গেলেও বরং ডুবুরির সাহায্যে খোঁজ পাওয়া যায়, কিন্তু এই লোকারণ্যের মাঝারে হিরণের ন্যায় ক্ষুদ্র বিন্দু খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব। হতাশ হইয়া রাত্রি প্রায় ১১টার সময় ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

৪

হিরণকে কি চিরদিনের জন্য হারাইলাম? যদিও সে বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলেও আমাদের সমাজে সে জীবন্মৃত হইয়াই রহিল। জীবন্মৃত হইয়া থাকাই তাহার পক্ষে মঙ্গল!

সংসারে যেমন হইয়া থাকে, তেমনই হইল, দিন কতক হিরণের কথা লইয়া আমাদের সমাজে খুব তোলা-পাড়া হইল, তাহার পর চুপচাপ। আবার একটা নূতন চমকপ্রদ কথা উপস্থিত হইল, লোক তাহা লইয়াই ব্যস্ত হইল, হিরণের কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। কেবল আমা-দের মত দুই এক জন অন্তরঙ্গ বন্ধু বেলতলার ও শিকদার-বাগানের দুইটী পরিবারের সঙ্গে তাহার কথাটা একবারে ভুলিতে পারিল না, এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে কখনও কখনও আলোচনা হইত। কিন্তু একটা আশ্চর্য্য দেখিয়া-ছিলাম, উৎসা এ আলোচনায় কখনও যোগ দিত না, কথা উঠিলে অন্যত্র চলিয়া যাইত। সে স্বভাবতঃ হাস্য-পরিহাস-রসিকা, সদানন্দময়ী, সদালাপিনী, এখনও তাহার সে স্বভাবের ব্যতিক্রম হইল না। আমি জানিতাম, সে হিরণকে ভালবাসে; অথচ তাহার এই বিপরীত আচরণ! এ প্রহেলিকার আমি মর্ম্ম ভেদ করিতে পারি নাই। কেবল এক দিন আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছিলাম। সেদিন একলা বসিয়া লিখিতেছিল। আমি হিরণের কথা পাড়িতেই সে ঘাড় গুঁজিয়া লেখায় আরও অধিক মনো-নিবেশ করিল। তাহার স্বভাবগৌর সুন্দর মুখখানি আরও রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল। আমি তাহাকে প্রশ্নের পর প্রশ্নে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিলাম—হিরণের নামে যাহা রটিয়াছে, তাহাতে বিশ্বাস হয়? সে কোন জবাব না দিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, তাহার পর ছুটিয়া পলাইল। আমি বিস্মিত হইলাম। এত দিনেও তাহাকে বুঝিতে পারিলাম না। ক্ষণেক নীরবে বসিয়া থাকিবার পর হঠাৎ তাহার লেখার উপর আমার নজর পড়িল। তাহাতে হিজিবিজির ভিতর একটা কথা স্পষ্ট লেখা আছে,—তাকে কেউ চিন্‌তে পারে নি—অভিন্ন-হৃদয় বন্ধুও নয়। আমি কাগজখানা পকেটে পুরিলাম।

এক দিন সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিতেছি, গলির মোড়ে মুরের সহিত দেখা। বুঝিলাম, মোড়ের মদের দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। আহা! বেচারা এক-বারে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে! আমাকে দেখিয়া সে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর জড়িত স্বরে বলিল, কোন সন্ধান পেয়েছ?

আমি বলিলাম, না। তুমি কি এখনও তাকেই সন্দেহ কর?

মুর গর্জ্জিয়া উঠিল,—সে শয়তান! ফুলের মত মুখের আড়ালে সাপের চেয়েও খল। প্রবঞ্চক! কাপুরুষ!

বলিতে বলিতে মুর কাঁদিয়া ফেলিল, আবার বলিল, তাকে আমি ছেলের চেয়েও বিশ্বাস করতাম—এই খানে এই হাত দিয়ে দেখ—এই খানে সে বড় দাগা দিয়ে গেছে!

বলিয়াই মুর হন হন করিয়া অগ্রসর হইল; কিন্তু তাহার পদক্ষেপ স্থির ছিল না, আমি শীঘ্র তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম, বলিলাম, তুমি ভুল করেছ আঙ্কল (আমরা সবাই তাহাকে আঙ্কল অর্থাৎ খুড়ো বলিতাম)—

ভুল?—মুরের মুখ তখন ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিল, সে চীৎকার করিয়া বলিল, শয়তান এমনই করে সকলকে

ভুলিয়েছে বটে! উঃ সময়ে চিনতে পারলুম না কেন! ভগ-বান্! বাপের অভিসম্পাত কি বিফল হবে!

মুর দাঁড়াইল না, আমিও আর পথে ভিড় জমাইবার ইচ্ছা করিলাম না। মনটা আমার বড়ই ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল।

প্রায় মাসখানেক জেঠাইমার ওখানে যাওয়া হয় নাই, এক দিন তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। কার্পেট-মণ্ডিত পুত্তল, মুকুর, ফার্ণ, চিত্র আদি শোভিত সোপান বাহিয়া উপরে উঠিয়া যখন বারাণ্ডা দিয়া অন্দরে যাইবার জন্য অগ্রসর হইলাম, তখন বারাণ্ডার অপর পার্শ্বে হল ঘরের পার্শ্বস্থ বসিবার কক্ষ উন্মুক্ত ও আলোকিত দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। হিরণ গৃহত্যাগ করা অবধি ঐ কক্ষ রুদ্ধই থাকিত—উহা আলোকিত করা হইত না। তবে? বুকের মধ্যে দ্রুত স্পন্দন আরম্ভ হইল। ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম, তাহার পর এক পা এক পা করিয়া কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলাম। প্রতি পাদ-বিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে বক্ষে যেন হাতুড়ীর ঘা পড়িতে লাগিল।

কক্ষ-মধ্যে যাহা দেখিলাম, তাহাতে বিস্ময়ের আতি-শয্যে আমার পাদদ্বয় যেন স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতে-ছিল না। সম্মুখের টেবিলের উপর দুই হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া আছে হিরণকুমার!

আকাশটা যদি তন্মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া পড়িত, বোধ হয় তাহা হইলে ইহা হইতেও বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতাম না।

নিঃশব্দে কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার স্কন্ধদেশে হস্তার্পণ করিবামাত্র সে চমকিত হইয়া আমার দিকে তাকাইল, বলিল, কি চাও?

কি চাও? ড্যাম চীট্! তোর আগাগোড়াই মিথ্যে? কোথায় লুকিয়ে ছিলি, কি করছিলি?—পার্শ্বের চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম।

আমার সবটাই যদি মিথ্যে, তবে মিশতে এসেছ কেন, আমি ত তোমাদের সমাজ থেকে দূরেই রয়েছি।

আমি তাহাকে ধরিয়া বেশ একটা ঝাঁকুনি দিয়া বলি-লাম, কি হয়েছে বল ত তোর—ভেবেছিস, এই রকম ন্যাকার ভাণ করে থাকলেই তোর সব দোষ কেটে গেল?

না, তা যাবে না, কাটাতে ত চাচ্ছিনি। তার জন্যে [illegible] নিইছি, ভণ্ড প্রতারক হইছি, তোমাদের ভদ্রসমাজ থেকে তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছি। তবে আবার এসেছ কেন?

আমি ক্রমশঃ ধৈর্য্যচ্যুত হইতেছিলাম। শেষে সত্য সত্যই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, ঝকমারি হয়েছে, এইছিলুম। কোথায় টাকা পাঠাচ্ছিলি মাস মাস, তাকে কোথায়ই বা রেখে এলি?

হিরণ ক্ষণকাল বিস্মিত ভাবে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, তাহার পরে আমি স্পষ্টই দেখিলাম, দারুণ ঘৃণায় তাহার মুখখানা কুৎসিত ভাব ধারণ করিল, সে ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, কেবল মণি অর্ডার, গুণো দা? এবার ভাবছি, তার জন্য কিছু দানপত্র করে দিয়ে যাব। ভালই হয়েছে, ঠিক সময়ে এসে পড়েছ। তোমার মত বন্ধু হঠাৎ ক-জনের মেলে? এসোদিকি, চট্ করে ড্রাফ্‌টা করে ফেলা যাক দানপত্তোরের।

আমি বিস্ময়ে অবাক্! এত বড় বেহায়া দু'কাণ কাটা লোক ত দেখা যায় না। সত্যই কি হিরণ আমার সহিত কথা কহিতেছে!

আমাকে কথা কহিবার অবসর না দিয়াই সে টানার ভিতর হইতে কাগজ বাহির করিয়া ষ্টাইলো পেন লইয়া অম্লানবদনে লিখিতে বসিল, বলিল, দেখ, হাজার ত্রিশেক টাকা নগদ আর হাজার ১০এক টাকার গহনাপত্তোর ওদের নামে লেখা পড়া করে দিতে চাই—আহা বড় গরীব ওরা, কি বল?

হতভাগা বলে কি! আমি ক্রোধে একবারে জ্ঞানহারা হইয়া একটানে কাগজ খানা ফেলিয়া দিয়া বলিলাম, দেখ, বেহায়াপানার একটা সীমা আছে। জানিস, উৎসা আমার ছোট বোন—আমার কাছে তোর একটা কৈফিয়ৎ ডিউ আছে?

হিরণ দাঁড়াইয়া উঠিল, তাহার দীর্ঘ শালতরুর মত দেহযষ্টি যেন আরও দীর্ঘ দেখাইতেছিল—তাহার মুখমণ্ডল গম্ভীর, দীর্ঘ আয়ত লোচনদ্বয় আরক্ত, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ। সে গম্ভীর স্বরে বলিল, যে দিন তোমায় কৈফিয়ৎ দেবার উপযুক্ত বোধ ক'র্‌ব সেই দিন কৈফিয়ৎ দেব। এটা জেনে রেখো, এ বাড়ীটা আমার; এই বাড়ী বয়ে যে কৈফিয়ৎ চাইতে আসে আমার কাছে, তার বেয়াদপি সহ্য করবারও একটা সীমা আছে।

এ্যাঁ, এই কি হিরণকুমার? কতদূর নেমেছে এ? আমিও সমান ওজনে তাচ্ছিল্য ভরে বলিলাম বেশ, তাই হোক। তুই যে এতটা অধঃপাতে গেছিস, তা জানতুম না। তুই উৎসা হোতে কত নীচে নেমেছিস, তা উৎসার এই লেখাটা পড়লেই জানতে পারবি।

বলিয়া আমি হিজিবিজি কাটার মধ্যে উৎসার সেই লেখা কাগজখানা তাহার মুখের উপরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া হন হন করিয়া নীচে নামিয়া গেলাম। যখন সোপান বাহিয়া নামিতেছি, তখন স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, বেহায়াটা হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে হঠাৎ থামিয়া গেল। গাড়ীতে যখন উঠিয়াছি, তখন মনে হইল যেন সে আবার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। ছিঃ ছিঃ! লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ এত হৃদয়হীন, এত বাঁদর হয়!

৮

মনটা কয়দিন খারাপ হইয়াই ছিল। কোথাও বড় একটা বাহির হই নাই, কাহারও সহিত বড় একটা দেখাও করি নাই, কেবল মাঝে মাঝে দৈবাৎ ইনষ্টিটিউটে হাজির দিয়াছি মাত্র! কিন্তু পূর্ব্বের মত তেমন প্রাণ খোলা আমোদ আনন্দ সেখানে কিছুই হয় নাই। ছেলেদের যেন কি একটা অভাব ঘটিয়াছে, তাহারাও ঠিক পূর্ব্বের মত আর হৈ হৈ করে না, সকল বিষয়েই যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করে। হতভাগাটা কি যাদুই জানিত!

মধ্যে মেসোমশাই একবার আমার কাছে উৎসার বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন। যাহা হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য আক্ষেপ বা অনুশোচনা করায় ফল নাই, উৎসাকে তাহা বলিয়া ত আর ঘরে অনূঢ়া অবস্থায় রাখা যায় না; কাজেই একটা ভাল সম্বন্ধ দেখিতে হইবে,—কথাটা হইতেছে এই। কিন্তু পাত্রের ত অভাব নাই, ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই দুই তিনটী সুযোগ্য পাত্রের পিতা উৎসাকে ঘরে লইবার প্রস্তাব করিয়া রাখিয়াছেন; পাত্রদের কেহ ব্যারিষ্টারি পাশ, কেহ বা নবীন সিবিলিয়ান, কেহ ডাক্তার,—তাহারা প্রত্যেকেই উৎসার পাণিগ্রহণের জন্য লালায়িত, একথা আমাদের ছেলে মহলে সকলেই জানিতাম। ইহা ছাড়া আমাদের দলের আরও দুই একটী ছেলে যারা অবস্থাগতিকে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে সাহস করিত না, অথচ উৎসার প্রতি মনে মনে অনুরাগী ছিল, তাহা তাহাদের ভাব গতিক দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম। কাজেই উৎসার সম্বন্ধের জন্য খোঁজাখুঁজির প্রয়োজন ছিল না। তবে কথা, যাহার বিবাহ, তাহার মনের ভাব কি? মেসোমশাই হিন্দু হইলেও উদার-মতাবলম্বী ছিলেন—বিশেষতঃ উৎসা বয়ঃ-প্রাপ্ত এবং শিক্ষিতা; সুতরাং তাহার মতামত গ্রহণ না করিয়া যে তাহার বিবাহ দেওয়া হইবে না, ইহা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু মাসীমার মুখে শুনিয়াছি, হিরণের সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে সে যেমন বুলী ধরিয়াছিল, বিবাহ করিবে না, এখনও নাকি সেইরূপ বুলী ধরিয়াছে, কেন, কি বৃত্তান্ত সাতবার জিজ্ঞাসিত হইলেও সে এ কথার উত্তর দেয় না। তবে আমার ঘাড়ে এই ঘটকালীর ভার চাপাইয়া দেওয়া কেন?

দূর হউক, কিছুই ভাল লাগে না। দিন কতক কোথাও বেড়াইয়া আসিলে হয় না? তাই ঠিক। ল' কলেজের ত আর একসপ্তাহ পরেই ছুটি। পশ্চিমেই যাই। বিজয় ভাগলপুরে ত রোজই যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছে, ভাগলপুরেই না হয় দিনকতক বেড়াইয়া আসি। ভাল লাগে, থাকিব, না হয় ওখান হইতে কাশী চলিয়া যাইব। হাওড়া রেলের টাইম টেব্‌লখানা লইয়া বসিলাম। কেতাবখানা দুই চারি পাতা উল্টাইয়া টেব্‌লের উপর তুলিয়া রাখিয়া দিলাম। হিরণটা কি ছোট লোক! ঘরের কোণ থেকে বাহির হয় না, কাহারও সহিত দেখা করে না। তাই ভাল! কোন্ লজ্জায় মুখ দেখাইবে?

হঠাৎ চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল; ফটকে একখানা গাড়ী লাগিল। বুকের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল—হিরণ? না, তাও কি সম্ভব? তবে? না, এ যে নারীর মৃদু পদধ্বনি। কে এ?

একি, উৎসা? দাঁড়াইয়া উঠিলাম,—একলা নাকি? মাসীমা?

উৎসা বসিল না, তাহার মুখমণ্ডল অসম্ভব গম্ভীর। কোন ভণিতা না করিয়াই সে বলিল, শুণোদা আমার সঙ্গে যেতে পারবে? না পারো, একলাই যেতে হবে। বাড়ীটা খুঁজে নিতে একটু কষ্ট হবে।

যেতে হবে—কোথায়? এখনই?

হাঁ, এখনই। গাড়ীতেই সব বল্‌ব।

উৎসা নামিয়া গেল, আমিও সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম।

গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া উৎসা বলিল, যাও ইটিলি।

গাড়ী চলিল।

আমি বলিলাম, ইটিলি?

উৎসা বলিল, হাঁ।——নং——লেন। ডলি সেখানে যেতে বলেছে।

আমি বিষম চমকিত হইয়া বলিলাম, কে, ডলি? উৎসা বলিল, হুঁ। চল, সব জানতে পারবে।

* * *

গাড়ী যখন ইটিলি পৌছিল, তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। গোধূলির আলো-আঁধারে বস্তীর মধ্যে দরমার দেওয়ালের খোলার ঘরখানা খুঁজিয়া বাহির করিতে কম বেগ পাইতে হইল না। ঘরের মধ্যে সাঁজের আলো জলিয়াছে। আমরা ঘরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম, উৎসা আগে, আমি পশ্চাতে।

ঘরের মধ্যস্থলটা উজ্জ্বল ওয়াল-ল্যাম্পের আলোকে দিবালোকেরই মত আলোকিত হইয়াছিল। আলোক-কেন্দ্রের মধ্যস্থলে ছিন্ন মলিন শয্যায় ছিন্ন মলিন বসনে শুইয়া রোগ-মলিন ডলি—তাহার সোণার বরণ কালিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। দুই-পার্শ্বে বসিয়া তাহার জনক, জননী। আমাদিগকে দেখিবামাত্র ডলির জননী ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আর—আর—বিস্ময়ের বিষয়,—সেই দীর্ঘ বলিষ্ঠ বৃদ্ধ আইরিশম্যান মূরের দেহ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল, তাহার দুই গণ্ড বহিয়া শ্রাবণের ধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল। ডলি দুইখানি কোমল মৃণাল হস্তে পিতা মাতার হস্ত ধারণ করিয়াছিল।

ডলি একি সর্ব্বনাশ করিয়াছে! ডলি তাহার অনুতাপানলে নবীন মুকুলিত জীবন আহুতি দান করিয়াছে! একরূপ পিতামাতার ক্রোড়েই বিষপান করিয়াছে। জীবন থাকিতে হতভাগিনী পিতার সম্মুখীন হইতে সাহসী হয় নাই!

তখন শেষ মুহূর্ত্ত। তথাপি ডলি তখনও দেখিতে পাইতেছিল, তাহার সংজ্ঞাও লুপ্ত হয় নাই। সে অঙ্গুলি সঙ্কেতে উৎসাকে কাছে গিয়া বসিতে বলিল। তাহার পরে কম্পিত হস্তে তাহার হস্তখানি ধরিয়া ধীরে ধীরে আপনার বুকের উপর রাখিল—পুনরায় কপোলের উপর রক্ষা করিল। তাহার অধরোষ্ঠ থর থর কাঁপিতেছিল, বোধ হয় সে কি বলিবার চেষ্টা করিতেছিল। শেষে জননীকে ইঙ্গিতে কি বুঝাইল। সে একখানি কাগজ তাহার উপাধানের নিম্ন হইতে বাহির করিয়া উৎসার হস্তে অর্পণ করিল।

দ্বারপথে দুইটী মনুষ্যমূর্ত্তি। একটিকে দেখিয়াই বুঝিলাম ডাক্তার, অপরটী হিরণকুমার! ডলি মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া কি সকলকে খবর দিয়াছিল? ডাক্তার সমস্তই সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাঁহার সহকারী গাড়ী হইতে যন্ত্রপাতি আনয়ন করিল। হিরণ মুক্ত-হস্তে অর্থব্যয় করিয়াছিল—যাহাতে হাঁসপাতালে বা পুলিশে যাইতে না হয়।

আমরা সকলেই ঘরের বাহিরে চলিয়া আসিলাম। মূর হস্ত প্রসারণ করিয়া অশ্রুসিক্ত কাতর নয়নে হিরণের দুইখানি হস্ত ধরিয়া বোধ হয় ক্ষমা প্রার্থনা জানাইতেছিল; কিন্তু দেখিলাম, হিরণের দৃষ্টি সেদিকে নাই। তখন হিরণ ও উৎসার প্রথম দর্শনের দিনে যে ভাবে গাঢ় দৃষ্টি বিনিময় হইয়াছিল, যেন তাহারই পুনরাভিনয় হইতেছিল। হিরণ অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি দৃষ্টি নামাইয়া লইয়া মূরের করমর্দ্দন করিল।

যখন ডাক্তার বাহিরে আসিলেন, তখন তাঁহার মুখ-মণ্ডল প্রসন্ন। তিনি যখন বলিলেন, বোধ হয় বাঁচিয়া গেল, তখন উৎকট আনন্দে আমাদের হৃৎপিণ্ড যেন ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল। ডাক্তার বাবু কেবল রোগীর ঘরে জনতা করিতে নিষেধ করিলেন।

হিরণ আমার হাত ধরিয়া বলিল, বোধ হয় তোর আর আমার উপর রাগ নেই? উৎসাকে নিয়ে বাড়ী যা—আমি পরে যাচ্ছি। তাহার নয়ন-প্রান্তে আমি অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িতে দেখিয়াছিলাম। আমারও নয়ন অনার্দ্র ছিল না।

গাড়ীতে উঠিবার সময় আমি ইচ্ছা করিয়াই তাড়াতাড়ি আগে চলিয়া গিয়াছিলাম। একবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলাম, হিরণ উৎসার করপল্লব দুইটী আপনার হস্তে ধারণ করিয়া অশ্রুসজল দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। আর উৎসা? তাহার চোখে মুখে তখন যে ভাব ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছিলাম, তাহা এ জগতের নহে

বলিয়াই আমার মনে হইয়াছিল। আমি তাড়াতাড়ি বাষ্পাকুল দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলাম।

মোটর ঝড়ের বেগে উড়িয়া চলিয়াছে, আমরা ঘরে ফিরিতেছি। অবস্থা তখন এতই গুরুগম্ভীর বলিয়া বোধ হইতেছিল যে, কথা কহিবার ইচ্ছাই হইতেছিল না। বিশেষতঃ উৎসা একবারে নিশ্চল পাষাণ-মূর্ত্তির মত বসিয়াছিল—তাহাকে এত গম্ভীর কখনও দেখি নাই। সে যেন তখন এ পৃথিবীর নহে, কোথায় কোন স্বপ্ন-রাজ্যে বিচরণ করিতেছে।

নীরবতা অসহ্য হওয়ায় আমি বলিলাম, মেয়েটা বাঁচবে বোধ হয়। কেমন ?

উৎসা একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, আহা, অভাগিনী !

ঐ পর্য্যন্ত ! গাড়ীতে আর একটী কথাও হয় নাই। আমায় বাড়ীতে নামাইয়া দিবার সময় উৎসা একখণ্ড পত্র দিয়া বলিল, প'ড়ে দেখো গুণোদা, সব বুঝতে পারবে।

মোটর চলিয়া গেল, আমি কিছুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম।

যখন চিঠিখানা পড়িলাম, তখন আনন্দে, বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায়, অনুতাপে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। সত্যই ত এখনও মানুষ চিনিতে পারি নাই ! পত্রখানি এই :—

"আমায় ভোলো নি বোধ হয়। গুণেন বাবুদের বাড়ী তোমায় আমায় দেখা হয়েছিল, মনে পড়ে না ! তবে বড়লোকে গরীব লোকে আলাপ যতটুকু হওয়া সম্ভব তাই। হয় ত ভুলেই গেছ। তা হোক, তবুও চিঠি লিখছি। হয় ত এই শেষ লেখা। আমি মরে গেলে ভেতরের কথা জানতেও পারবে না, জীবনটাও তা হলে মাটী করবে।

"যার সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা হয়েছে, তাকে তুমি কি চোকে দেখ জানিনি, তবে আমি তাকে দেবতার মতই দেখেছি। তোমাদের মধ্যে নাকি ছাড়াছাড়ি হয়েছে ?—তাও নাকি আমাকেই নিয়ে ? ছিঃ ছিঃ তোমরা কি অন্ধ ? তোমাদের লজ্জা করে না তাকে সন্দেহ করতে ? যার পায়ের নখের যোগ্য তোমরা কেউ নও, তাকে তোমাদের মনের মাপকাঠি দিয়ে মাপতে চাও ? এই সন্দেহের ছাপ-মারা ভালবাসা নিয়ে তাকে ভালবাসবার স্পর্দ্ধা রাখ ?

"মরণের কোলে শুয়ে আজ কিছু লুকুব না, সব খুলেই বোলব। তোমাদের সম্বন্ধ হবার অনেক আগে থেকেই হিরণদাকে আমি ভালবাসতুম। কিন্তু তার প্রতিদান পাইনি—বড় জোর ভাই বোনের ভালবাসা সে আমায় দিয়েছিল, যাতে আমার অন্তর জ্বলে যেত। অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে দিন রাত জ্বলে পুড়ে মরতুম। তাই ত ডি' সিলভাদের মেঝো ছেলেটার শয়তানিতে ভুলে নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে এনেছিলুম। যখন বিপদের দিন ঘনিয়ে এল, ভয়ে আধমরা হয়ে গেলুম। মুখপোড়া জিমি ডি' সিলভাটা বিপদ দেখেই পশ্চিমের রেলে চাকরী নিয়ে কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছিল। কাকে জানাই ? কে সহায় হবে ? জান ত বাবাকে, কেমন বদ্‌রাগী !

এক আছে হিরণদা। এমন উদার সাগরের মত মন ত কারুর নেই ! হিরণদার হাতে পায়ে ধরে কেঁদে কেটে বললুম। কি অবস্থা বুঝে দেখ। মা যা জেনেছে, জেনেছে, কিন্তু আমার এই লজ্জার কথা জগতে আর কাউকে জানানো হবে না। বিপদের সময়টা কেটে গেলে মার কাছে ফিরে আসব, বাবাকে জানাব যে, ঝোঁকে প'ড়ে ক্লাসের মেয়েদের সঙ্গে দার্জ্জিলিংএ পড়তে গিয়েছিলুম, খরচ তারাই দিত। তখন যা হয় হবে। কত বড় দায়িত্ব হিরণদার ঘাড়ে চাপিয়ে ছিলুম, বুঝতে পারছ।

তাই ত কালিম্পং যেতে হল। হিরণদা খরচা পাঠাত। বেশ দিন কাটছিল সেখানে। মার চিঠিতে জানলুম, বাবা পাগলের মত হয়েছে, কেবল মদ খাচ্ছে। ঐ যা দুঃখ। কিন্তু কি করব, উপায় নেই।

"বেশ নিরাপদে বিপদের দিন কেটে গেল। যেটা জগতে এল, তিন দিন থেকেই জগৎ থেকে বিদায় নিলে। কলকাতায় ফেরবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় আবার শয়তান ঘাড়ে চাপল। কালিম্পংএ দুচারটা কাঠের আর পশমের কুঠি ছিল। প্যারেরা ব'লে একটা ছোঁড়া এক কুঠীতে কাজ করত। সেই হতভাগাটা আমায় ভুলিয়ে দার্জ্জিলিং নিয়ে গেল। সেটার সঙ্গে কিছুদিন এখানে সেখানে ঘুরলুম। শেষে শয়তানটা আমায় কার্সিয়ংএ ফেলে পালাল। মাকেও খবর দেবার উপায় নেই, কেন না তা হলে হিরণদাও আমার সন্ধান পাবে। কোন্ লজ্জায় আবার হিরণদার কাছে দাঁড়াব ? কলকাতায় ফিরে

এলুম। রোগ নিয়েই এসেছি ইটিলিতে—নং বস্তীর এক ঘরে। এই খানেই তোমাদের সকলকে আসতে লিখেছিলুম।

"মার কাছে শুনেছি, এবার কালিম্পংএর মণি অর্ডার কলকাতায় ফিরে এসেছে। বেলতলার ডাক-পিওন হিরণদার কাছে না গিয়ে আমার নাম দেখে প্রথমে বাবার কাছে ঠিকানা জানতে গিয়াছিল। তাতেই জানাজানি হয়ে গেছে। তখন আমি দার্জ্জিলিং কি বোধ হয় কার্সিয়ং। আহা হিরণদা বেচারা সরল মানুষ—আমার বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ কত মনঃকষ্ট পেয়েছে—মার কাছে শুনেছি, বাবার কাছে অপমানিত হয়েছে—মার পর্য্যন্ত খেয়েছে, তবুও মুখ ফুটে আমার কথা কিছু বলে নি! এমন মানুষ কি হয়?

আমার অন্তরে সেইটে তুষের আগুনের মত রি রি করে জলছে। সে আগুন নেবাবার চেষ্টা করতেই আজ তোমাদের সবাইকে এনেছি। আমার এই তুচ্ছ প্রাণ দিয়েও কি তোমাদের মুখে হাসি ফোটাতে পারব না?

ডলি।

আমি বার বার পত্রখানা পাঠ করিলাম, তথাপি উহার মোহ ত আমি এ জীবনে এড়াইতে পারিলাম না।

কাশ্মীরের কথা

[শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ]

১

কাশ্মীর ভূ-স্বর্গ নামে আমাদের দেশে খ্যাত। নামটী সার্থক। কি সুন্দর দেশ, কি হরিৎ শ্যামল খেত গুলি, কি মনোরম 'পপলার' গাছের সারি গুলি, আর 'চেনায়ের' কুঞ্জ, কিবা তার বাহার—আর সবার উপর অভ্রভেদী বরফের পাহাড়। দেশের লোকেরই বা কি সুঠাম ও সুন্দর চেহারা। এ দেশের মজুরনীর যা মুখশ্রী, তা রাজার ঘরেও শোভা পায়। এখানকার নানান্ শিল্পের কাজ দেখেও চমৎকৃত হ'তে হয়। এমন যে দেশ তার পূর্ব্ব-ইতিহাস যে বৈচিত্র্যময় হবে তা আর বিচিত্র কি! এ স্থলে কাশ্মীরের পূর্ব্ব-ইতিহাসের একটু আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বৌদ্ধ-যুগে মহারাজ অশোক কাশ্মীর অধিকার করেন। শ্রীনগর নামটীও সেই সময় থেকেই চলে আস্‌ছে। হয় ত তাঁরই দত্ত নাম। অশোক যে নগর স্থাপন করেন সেটী এখনকার শ্রীনগর থেকে মাইল তিনেক দূরে। সেখানে এখন একটী গ্রাম মাত্র আছে—আর আছে একটী ভগ্ন ম[illegible] গৌরবের আর কোন চিহ্নই নাই। গ্রামটীর নাম 'পর্ব্বথান'—'পূর্ব্বস্থানে'র অপভ্রংশ বলে মনে হয়। মন্দিরটী অশোকের সময়কার হতে পারে না, তবে বেশ প্রাচীন বটে। স্থানটী বড় মনোরম। পুরাতন সহরটী যেখানে ছিল তা দেখলে বেশ প্রতীয়মান হয় যে—সে কালের লোকের সৌন্দর্য্য-বোধ কিছু কম ছিল না।

এর পর রাজা কণিষ্কের সময় (৪০ খৃষ্টাব্দে) কাশ্মীরের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা কণিষ্ক বড় ধার্ম্মিক বৌদ্ধ রাজা ছিলেন। তিনি তাঁর রাজত্ব-কালে নিখিল ভারতের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের তৃতীয় সম্মেলন কাশ্মীরে আহ্বান করেন। তাঁরই সময় শ্রীনগর থেকে মাইল ১৩ দূরে 'হারওয়ান' উপত্যকায় পাহাড়ে বিখ্যাত বোধিসত্ত্ব নাগার্জ্জুনের আশ্রম ছিল। সে স্থানটীর চিহ্ন আজও বর্ত্তমান। কণিষ্কের সময় কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব খুবই বেশী হয়েছিল। ক্রমশঃ সে প্রভাব চলে যায় ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাব বিস্তারিত হ'তে থাকে। এই ব্যাপার ব্যতীত পরবর্ত্তী পাঁচ ছয় শ' বৎসরের মধ্যে আর তেমন উল্লেখ-যোগ্য কোন ঐতিহাসিক ঘটনা পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিস্তারের সঙ্গে রাজা মিহির-

কুলের নাম সংশ্লিষ্ট (৫১৫ খৃষ্টাব্দ)। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম-বিদ্বেষী অত্যাচারী রাজা ছিলেন। তাঁর রাজত্ব মধ্য-ভারত হ'তে কাবুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ইহার রাজত্ব-কালের কিছু পরেই—কাশ্মীর-ইতিহাসে বিখ্যাত রাজা ললিতাদিত্যের রাজত্ব আরম্ভ হয়।

ললিতাদিত্যের পিতামহ এক সময় অতি সামান্য লোক ছিলেন। রাজ-সরকারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করেন ও ক্রমে রাজ-পরিবারে বিবাহ ক'রে রাজ-পরিবারভুক্ত হন। তিনিই কালে কাশ্মীর রাজ-সিংহাসনের অধিকারী হয়ে নূতন রাজ-বংশের আদি পুরুষ হলেন।
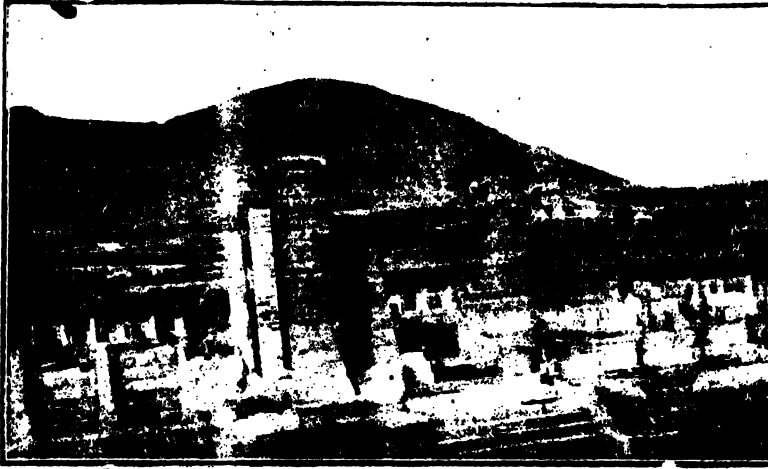
অবন্তিপুরের ধ্বংসাবশেষ

তাঁর পৌত্র ললিতাদিত্যের সময়ে কাশ্মীর-রাজ্যের গৌরব যতটা বেড়ে উঠেছিল তেমনটী আর কখন হয় নি। কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে ললিতাদিত্যের নানান্ প্রশংসার ভিতর উল্লেখ আছে যে তিনি কাশ্মীর হতে পৃথিবী জয় করতে বেরিয়ে ছিলেন, আর সফল-কাম হয়ে স্বরাজ্যে ফিরেও এসেছিলেন। পৃথিবী জয় অত্যুক্তি হ'তে পারে, তবে এটা সত্য যে তিনি উত্তর পাঞ্জাবে তাঁর ক্ষমতা বিস্তার করেছিলেন, কর্ণাট রাজাকে পরাস্ত করে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করিয়েছিলেন, তিব্বত স্বীয় অধিকারভুক্ত করেছিলেন, সুদূর মধ্য এসিয়া-প্রদেশ আক্রমণ করে সেখানেও তাঁর বিজয়-নিশান উড়িয়ে-ছিলেন। চীন-সম্রাটের কাছে দূত পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এত খানি করা বড় কম গৌরবের কথা নয়। হিন্দু রাজত্বের সেই মহিমময় দিন আর কি কখনও ফিরে আসবে? মার্ত্তণ্ডের মন্দির ও পরিহাসপুরের ধ্বংসাবশেষ আজও জগতে ললিতাদিত্যের কীর্ত্তিকথা ঘোষণা করছে। মার্ত্তণ্ডের মন্দির-স্থাপন ও পরিহাসপুরে নগর-সৃষ্টি তাঁরই কীর্ত্তি। এই মন্দিরটী ইসলামাবাদ বা অনন্তনাগ হ'তে পাহলগাম যাবার পথে পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত। কাশ্মীরে গিয়ে এ মন্দিরটীর ধ্বংসাবশেষ না দেখে যেন কেউ না ফেরেন। এর চেয়ে সুন্দর স্থানে দেবতার পূজাগৃহ কেহ কখনও স্থাপন করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। মন্দিরটীর সামনে দাঁড়ালে মনে হয় না যে এ জগতে রয়েছি। সারা কাশ্মীর উপত্যকার হরিৎ-শ্যামল শোভা এখান থেকে অপরূপ রূপে চোখের সামনে পড়ে—আর তার পশ্চাতে তুষার-মণ্ডিত পীর পঞ্জল গিরি-শ্রেণী আকাশ চুম্বন করতে উঁচু হয়ে উঠেচে—সে ছবি এক বার দেখলে চিরকালের জন্য হৃদয়-পটে আঁকা হয়ে যায়।

ললিতাদিত্য ৩৭ বৎসর রাজত্ব করেন—৬৯৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ৭৩৬ অবধি। তাঁর পরবর্ত্তী রাজন্যবর্গের মধ্যে তাঁর পৌত্র ছাড়া আর কেহ তেমন পরাক্রমশালী ছিলেন না। রাজশক্তির দৌর্ব্বল্যের অনিবার্য্য ফল যা তাই ফলেছিল। ষড়্‌যন্ত্র ও চক্রান্তের অভাব ছিল না।

এর পরে প্রায় দু শ' বৎসর কাশ্মীর ইতিহাসে কেবল শক্তিহীন রাজার সিংহাসনচ্যুতি, নৃশংস হত্যা, নূতন নূতন ক্ষণস্থায়ী রাজার সিংহাসন অধিকার ছাড়া আর কিছুই উল্লেখযোগ্য বিষয় পাওয়া যায় না। ৮৫৫ খৃষ্টাব্দে রাজা অবন্তিবর্ম্মা সিংহাসনারোহণ করেন। তাঁর রাজত্ব-কালে কাশ্মীর-প্রদেশের আভ্যন্তরিক অনেক উন্নতি হয়। তিনি প্রতাপবান্ রাজা ছিলেন ও স্বীয় শক্তি রাজ্যের নানাবিধ উন্নতিকল্পে নিয়োজিত করেছিলেন। অবন্তিপুর সহরের ধ্বংসাবশেষ আজও জগতে তাঁর কীর্ত্তি

প্রচার করচে। অবন্তিবর্ম্মার পরবর্ত্তী রাজাও বেশ ক্ষমতাশালী ছিলেন এবং তিনি কাশ্মীরের বাহিরে রাজত্ব বিস্তারের চেষ্টায় বাহিরও হ'য়ে ছিলেন তবে তেমন সফল কাম হন নি। কাশ্মীরের বাহিরে রাজ্য-বিস্তার চেষ্টা এই শেষ—এর পর ইতিহাসের ধারা অন্যরূপ।

শীঘ্রই অর্থশূন্য হ'য়ে পড়ে। করবৃদ্ধি ও প্রজাপীড়নের ফলে শেষে বিদ্রোহানল জ্বলে ওঠে ও তিনি বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণত্যাগ করেন। এর পর রাজশক্তির হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে দেশে সামন্তগণের শক্তিবৃদ্ধি ও অত্যাচার বাড়তে থাকে—রাজা নামে মাত্র রাজা, দেশ অরাজক হ'য়ে দাঁড়ায়। এই যুগেই কবি কহ্লণ—তাঁর বিখ্যাত "রাজতরঙ্গিণী" ঐতিহাসিক কাব্য লেখেন। হিন্দু রাজত্ব আরও দুই শত বর্ষ টলটলায়মান অবস্থায় থেকে স্থায়ী হয়েছিল বটে, তবে কাশ্মীরে হিন্দু রাজ্যের গৌরব-রবি পূর্ব্বেই চির তরে অস্তমিত হ'য়েছিল। সামান্য ক্ষীণ আলোকটুকু গভীর অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে আর বেশী সময় লাগে নি।

১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে সাহ মীর নামে এক জন মুসলমান কাশ্মীর অধিকার

গান্ধারবলের দৃশ্য—কাশ্মীর

কাশ্মীরে আবার দুর্দ্দিন সমাগত। রাজশক্তি ক্ষীণ, মন্ত্রীদের চক্রান্ত, নানা ষড়্যন্ত্র ও হত্যার প্রাদুর্ভাব আবার দেখা দিল। মাহমুদ গজ্‌নী ইতিমধ্যে ভারতে হিন্দু-রাজশক্তির দুর্ব্বলতার সুযোগ লক্ষ্য করে ভারত বার বার আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেছেন। ১০১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কাশ্মীর আক্রমণের চেষ্টা করেন, তবে অকৃতকার্য্য হ'য়ে ফিরে যান। দুর্ভেদ্য ও অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতমালার দৌলতেই সে যাত্রা কাশ্মীরীরা মাহমুদ গজনীর অত্যাচার হ'তে রক্ষা পেয়েছিলেন।
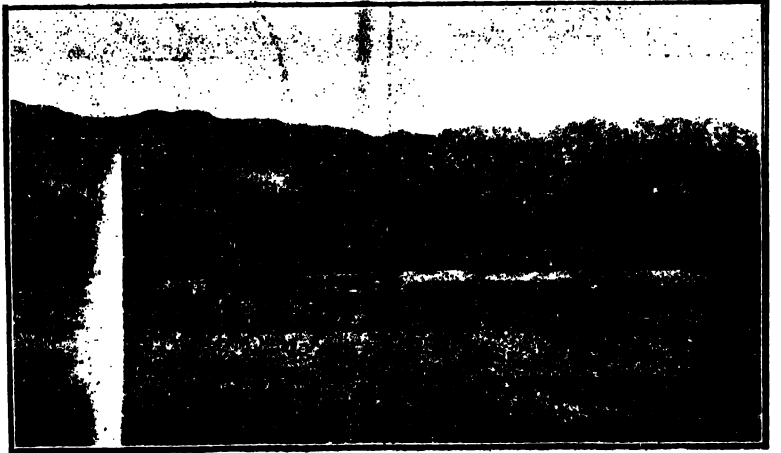
গান্ধারবলের আর একটী দৃশ্য—কাশ্মীর

শেষ হিন্দু রাজন্যবর্গের মধ্যে রাজা হর্ষের নামই একমাত্র উল্লেখযোগ্য। তিনি খৃষ্টাব্দ ১০৮৯ থেকে ১১০১ পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও প্রতাপবান্ রাজা ছিলেন, তবে আড়ম্বর ও আমোদ-প্রমোদে একটু বেশী মাত্রায় অনুরক্ত থাকায় রাজকোষ

করে' মুসলমান রাজত্ব স্থাপন করলেন। মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হ'ল বটে, তবে রাজ্যে শৃঙ্খলা বা সুশাসন এ যুগে আদৌ ছিল না। কেবলমাত্র জিয়ান-উল-অব-উল-দীনের রাজত্বের সময় (১৪২০—১৪৭০ খৃষ্টাব্দ) কাশ্মীরে কতকগুলি সদনুষ্ঠান সাধিত হ'য়েছিল।

এই পাঠান নরপতি উদার-প্রকৃতি ও হৃদয়বান্ শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। তিনি দেশে নানান্ শিল্পকলার পোষকতা করেছিলেন। খাল কাটান ও মন্দিরাদি সংস্কার প্রভৃতি দেশহিতকর কার্য্যেও তিনি মনোযোগ দিয়ে ছিলেন। ব্রাহ্মণদের উপর হেয় জিজিয়া কর তিনি উঠিয়ে দিয়ে ছিলেন। ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে মিরজা হাইদার নামে এক জন তুর্কী কাশ্মীর অধিকার করেন, কিন্তু তিনি দেশ সুশাসনে আনতে পারেন নি। সামন্তবর্গের বিদ্রোহ ও কতকটা অরাজক ভাব দেশে ছেয়ে ফেলেছিল। অবশেষে ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আকবর কাশ্মীর অধিকার করেন ও পরবর্ত্তী দু শ' বছর কাশ্মীর মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হ'য়ে থাকে।

আকবর স্বীয় রাজত্বকালে তিনবার কাশ্মীর পরিদর্শন করেন ও সুশাসনের বন্দোবস্ত করেন। শ্রীনগর প্রবেশের পথেই হরিপর্ব্বতের উপরে যে সুন্দর দুর্গটী দেখা যায় সেটী তাঁহারই নির্ম্মিত। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর কাশ্মীরের বড় ভক্ত ছিলেন। তাঁর সময়েই কাশ্মীরে নানা-স্থলে অপূর্ব্ব রম্য কাননগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব রমণীয় বিলাসের স্থানগুলিতে তিনি বিলাসে মশ্গুল' হয়ে থাকতেন। মোগলদের মত সৌন্দর্য্যের একনিষ্ঠ উপাসক আর কোন জাতি কখন জন্মায় নি। শালিমার, নিশাত, আচ্ছিল প্রভৃতি রম্য উদ্যানগুলি আজও তাঁদের এই সৌন্দর্য্যলিপ্সার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত-স্বরূপ জগতের চক্ষের সামনে দাঁড়ায়ে রয়েছে।

মোগল-যুগে কাশ্মীর যে সুশাসিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ফরাসী পর্য্যটক বরনির আওরংজেবের রাজত্বকালে কাশ্মীরে পরিভ্রমণ ক'রে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন তা পড়লে বেশ প্রতীয়মান হয় যে এসময় কাশ্মীরীরা বেশ সুখেই ছিল।

এ সুখ স্থায়ী কিন্তু হয় নি। দিল্লীর সম্রাটের শক্তির হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গেই মোগল শাসন-কর্ত্তাদের অত্যাচার বেড়ে ওঠে ও অল্প দিনের মধ্যেই আবার কাশ্মীর-রাজ্যে বিদ্রোহানল জ্বলে উঠল ও অরাজকতা এসে পড়ল। দিল্লীর রাজশক্তির হীনতায় সুযোগ পেয়ে আফগানেরা ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর অধিকার করে নৃশংস অত্যাচার করতে আরম্ভ করে। সে অত্যাচারের আর তুলনা হয় না। এই সময় সারা কাশ্মীরী জাতিটাকে তলোয়ারের খোঁচার জোরে বলপ্রয়োগে মুসলমান করা হয়। ফলে কাশ্মীরে এখন শতকরা ৯৫ জন মুসলমান, সামান্য শতকরা ৫ জন মাত্র পণ্ডিত নিজের ধর্ম্মরক্ষা করে বেঁচে থাকতে পেরেছিলেন। অনেকে দেশ ছেড়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতের নানা স্থানে চলে এসে বসবাস করেন—আর তাঁরা দেশে ফেরেন নি। এঁদের বংশধররা একটী বিশিষ্ট কাশ্মিরী পণ্ডিত-সম্প্রদায় গঠন করে নিয়েছিলেন।

আফগান অত্যাচার নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় শেষে কাশ্মীরীরা পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের শরণাপন্ন হন। রণজিৎ সিংহ ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে জম্মুর রাজা গোলাপসিংহের সহিত মিলিত হয়ে কাশ্মীর আক্রমণ করেন ও আফগানদের বিধ্বস্ত করে কাশ্মীর-প্রদেশ স্বীয় অধিকারভুক্ত করেন। প্রায় পাঁচশ' বৎসরব্যাপী মুসলমান অধিকারের পর মুসলমানদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেও কাশ্মীরে প্রজাপীড়ন ও অত্যাচার তিরোহিত হয় নি। শিখ রাজত্ব-কালে অত নিদারুণ না হলেও প্রজাপীড়ন যথেষ্ট ছিল ও রাজ্যে সুবন্দোবস্তের বিশেষ অভাব ছিল। যাই হোক শিখ-রাজত্ব বেশীদিন স্থায়ী হতে পারে নি। পঞ্জাবে শিখ-শক্তি বীর রণজিৎ সিংহের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই নানা কারণে হ্রাস হয়ে আসে। তিনি নিজে প্রভূত প্রতাপবান্ হ'লেও রাজ-শক্তি স্থায়ী করবার যে কৌশল তা তাঁর জানা ছিল না। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সঙ্গে শিখ-সম্প্রদায়ের ভীষণ যুদ্ধ বাধে। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে গোলাপ সিংহকে ইংরাজের সঙ্গে সন্ধির মধ্যস্থতা করবার জন্যে ডাকা হয়। এই বৎসর মার্চ্চমাসে লাহোরে সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হয়—ও তদনুযায়ী উত্তর পঞ্জাবের পার্ব্বত্য প্রদেশ ইংরাজ অধিকারে আসে। এই সময়ে গোলাপ সিংহের সহিত একটী স্বতন্ত্র সন্ধি হয় ও গোলাপ সিংহ উত্তর পঞ্জাবের পার্ব্বত্য প্রদেশের ও কাশ্মীরের স্বাধীন নৃপতি বলে স্বীকৃত হন। কাশ্মীর প্রদেশের মূল্যস্বরূপ তাঁকে ৭৫ লক্ষ টাকা ইংরাজ সরকারে দিতে হয়। তা ছাড়া, ইংরাজ সরকারে অধীন নৃপতি, এই জন্য বৎসরে একটী ঘোড়া, ১২টী মেষ করস্বরূপ ইংরাজ সরকারকে দিতে বাধ্য থাকেন। এই গোলাপ সিংহের বংশধরেরাই এখন কাশ্মীরে রাজত্ব করছেন। গোলাপসিংহের সহিত সন্ধিসূত্রের আরও অনেক তথ্য থাকতে পারে তা ইতিহাসজ্ঞরা অনুসন্ধান ও

বিচার করবেন এ সম্বন্ধে এস্থলে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

কাশ্মীরের সাধারণ লোক-চরিত্র আদৌ প্রশংসার্হ নয়। কাশ্মীরে এসে এদের নিছক মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে সব সময়েই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয়। বহু দিন ধরে যে অত্যাচার উৎপীড়ন এ জাতির উপর চলেচে তাতে এদের মনুষ্যত্ব যে একেবারে লোপ পেয়ে যাবে তা আর বিচিত্র কি? সবে মাত্র ৮৩ বৎসর দেশে শান্তি স্থাপিত হয়েচে। এখন শিক্ষার বিস্তার ও সুশাসন হ'লে আবার দেশের লোকে মানুষ হ'বে আশা করা যায়। কাশ্মিরী পণ্ডিতরা অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি চতুর জাতি, তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম। এদের মধ্যে শিক্ষার বেশ বিস্তার হ'চ্চে।

এই ত গেল কাশ্মীরের ইতিহাসের কথা, এখন কাশ্মীরের পথের কথা ও দেশের কিছু পরিচয় সংক্ষেপে দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

২

পঞ্জাব থেকে কাশ্মীর-প্রদেশের পথ তিনটী। প্রথমটী জম্মু থেকে, দ্বিতীয় রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ও তৃতীয়টী হ্যাভেলিয়ান থেকে। তৃতীয়টী স্বতন্ত্র পথ বলা চলে না, কারণ হ্যাভেলিয়ান থেকে কাশ্মীর রাজ্যে ডোমেল চটীতে এসে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পথ একই হয়ে গিয়েছে। প্রথম পথে কাশ্মীর-প্রবেশের একটা বিশেষত্ব আছে। এই পথে ৯০০০ ফুট উচ্চে বাণিহাল গিরিসঙ্কট পার হয়ে যেতে হয়। এত উচ্চে মোটরের রাস্তা বোধ হয় আর পৃথিবীতে কোথাও নাই। বাণিহালের কাছাকাছি সারা পথটা বৎসরে ৪।৫ মাস বরফে আচ্ছাদিত থাকে, তখন এ পথও কাজে কাজেই বন্ধ থাকে। বাণিহাল থেকে কাশ্মীর উপত্যকার দৃশ্য—সে এক অপূর্ব্ব অনুভূতি—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পরা কাষ্ঠা বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

রাওলপিণ্ডি থেকে শ্রীনগরের সব চেয়ে পরিচিত সাধারণ পথ (১৯৬ মাইল)—যা সারা বৎসরই খোলা থাকে। রাওলপিণ্ডি থেকে বেরিয়ে মাইল ১৫ সমতল রাস্তায় এসেই, পাহাড়ে চড়াই আরম্ভ হয়। এও বড় কম চড়াই নয়। ৬০০০ ফুট ওপরে মারী পাহাড়ে চড়ে আবার নাবতে হয়। মারী পাহাড় থেকে নেবে ঝেলম নদীর উপত্যকার ভেতর দিয়ে রাস্তাটী গিয়েছে। সারা পথটী ঝেলম নদীর আঁকা বাঁকা স্রোতকে আশ্রয় করে চলেচে। দেখতে বেশ; মাঝে মাঝে অভ্রভেদী তুষারে মণ্ডিত পাহাড়ের চূড়াগুলি চোখে পড়'লে বেশ একটু বৈচিত্র্য এনে দেয়। প্রায় এক শত মাইল ধরে ঝেলমের একই রূপ দেখা যায়—বেগবতী ক্ষরস্রোতা—কি তার উদ্দাম ভাব।
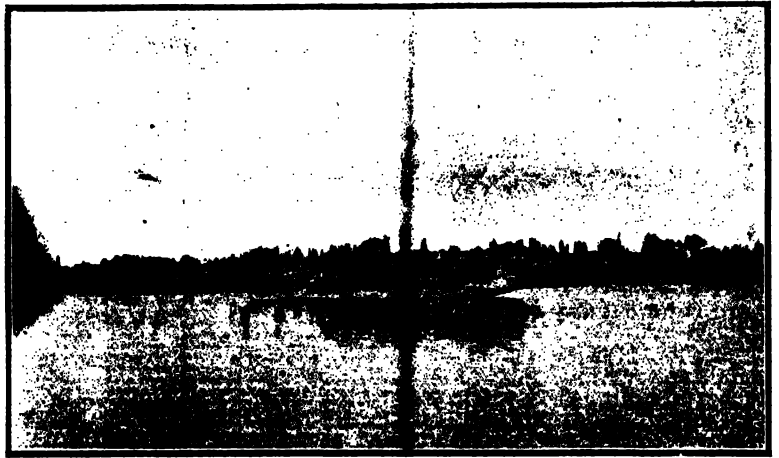
শ্রীনগরের কাছে ঝেলম নদীর দৃশ্য

মত্ত হস্তী তাতে পড়লে তারও যেন নিস্তার নাই। শ্রীনগর থেকে ৩২ মাইল দূরে বারমুলাতে এসে নদীর রূপ একেবারে বদলে গেল—এ যেন সে নদীই নয়—এ এক স্থিরা ধীরা স্রোতস্বতী। ছোট বড় নৌকাগুলিকে বুকে করে চলেচে। এই খান থেকে কাশ্মীর উপত্যকার সমতল ক্ষেত্র আরম্ভ হল। মধ্যে নদীটী বয়ে গিয়েচে, আর দুপাশে হরিৎ শ্যামল ক্ষেতগুলি, আর চতুর্দ্দিক্ তুষারমণ্ডিত গিরিরাজি বেষ্টন করে রয়েচে। এমন নয়নাভিরাম দৃশ্য বড় একটা চোখে পড়ে না।

কাশ্মীরের সঙ্গে সাধারণতঃ সুইটজারল্যাণ্ডের তুলনা করা হয়। সুইটজারল্যাণ্ড আমি পূর্ব্বে দেখে এসেচি। পর্ব্বত ও ছোট বড় হ্রদের সংমিশ্রণে সুইটজারল্যাণ্ডের যে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, তার তুলনা হয় না; কিন্তু

সুইটজারল্যাণ্ডের সবই ছোটর ভেতর। কাশ্মীরের চিরতুষারমণ্ডিত অনন্ত ও মহান্ পর্ব্বতশ্রেণীর যে বিশাল দৃশ্য, সে সুইটজারল্যাণ্ডে কোথায় পাবে! কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ উপত্যকাটীর যেখানে দাঁড়ান যায় সেখান থেকেই দেখা যায় চতুর্দ্দিকে তুষারমণ্ডিত পাহাড়গুলি উপত্যকাটীকে একেবারে বেষ্টন ক'রে রয়েচে। এ দৃশ্য ত — সুইটজারল্যাণ্ডের কোথাও নাই। সেখানকার সব চেয়ে বড় উপত্যকাও যে কাশ্মীরের প্রধান উপত্যকার পার্শ্বস্থিত ছোট ছোট উপত্যকাগুলির মত বা তার চেয়ে ছোট। আর কাশ্মীরের উত্তরে হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গের যে দৃশ্য দেখা যায় সেই বা সুইটজারল্যাণ্ড কোথায় পাবে। নঙ্গাপর্ব্বতের মত ২৬০০০ ফুট উঁচু গিরিশৃঙ্গের দৃশ্যের যে বিশালত্ব, সে ত সুইটজারল্যাণ্ডে সম্ভব নয়।
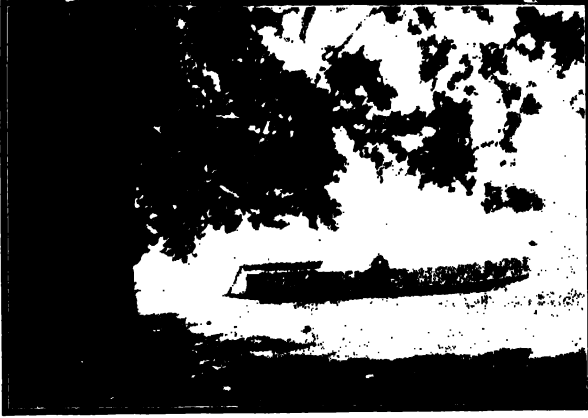
নাসিমবাগে একটী বিরাট্ চিনারের গাছের ছায়ায় অবস্থিত একটী House-boat

রাওলপিণ্ডি বা জম্মু থেকে শ্রীনগর-যাত্রীরা এক দিনে বা দুই দিনে আসেন। দু দিনে আসাই বেশী আরামপ্রদ। পাহাড়ের পথে ২০০ মাইল এক দিন মোটরে চলা বেশ সুখকর নয়। দুই পথেই বেশ সুন্দর সুন্দর ডাকবাংলা আছে। রাজ সরকারের সে বিষয়ে ব্যবস্থা বেশ ভাল। পথে কোন কষ্ট হয় না, ডাক বাংলাতে খাওয়া দাওয়ার সব বন্দোবস্ত থাকে।

শ্রীনগর পৌঁছে প্রথমেই মনে হয় এ কি অপরূপ সহর। এ রকমটী ত পূর্ব্বে কখন দেখি নি। শ্রীনগর সহরে একটা বিশেষত্ব আছে যা তার একান্ত নিজস্ব। সহরটী বেশ বড়, প্রায় দেড় লক্ষ লোকের বাস। ঝেলম নদীর উভয় তীরে তিন মাইল ধরে সহরটী বিস্তৃত, চতুর্দ্দিকে জলপথের ব্যবস্থা। নদী বা খালের দুই পার্শ্বে কাঠের ঘেরা বারান্দাযুক্ত অপরূপ দৃশ্য বাড়ী গুলি। আর নদী-বক্ষে ভাসমান গৃহ গুলি (House boats) সন্ধ্যা-সমাগমে আলোক-মালায় মণ্ডিত হয়ে এক অপরূপ রূপ ধারণ করে—যেন কোন স্বপ্ন-রাজ্যের এ দেশ। নদীর জলের তালে তালে বাত্যাহত হয়ে—হাউস-বোটের আলোগুলি যখন নাচতে থাকে তখন আরও সুন্দর দেখায়—এ যেন বাস্তব নয়—মনে হয় যেন কোন কল্পনার রাজ্যে বাস করচি। নাসিমবাগের একটী বিরাট্ চেনারের গাছের ছায়ায় অবস্থিত একটী house boatএর ও ঝেলম নদীর উপর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ house boat Victoryর চিত্র দিলাম।
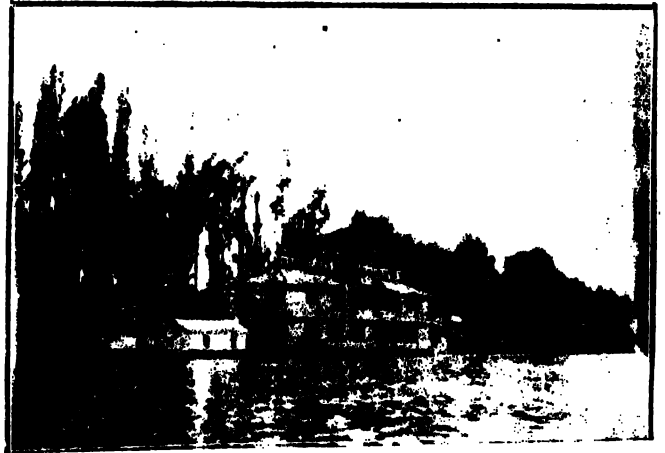
ঝেলম নদীর উপর সব চেয়ে বড় House-boat—Victory

এই ত গেল বাইরের দৃশ্য, কিন্তু সহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে আর কাশ্মীরে থাকতে ইচ্ছা করে না। কি পূতিগন্ধময়, অপরিচ্ছন্ন ও সংকীর্ণ পথ-বিশিষ্ট সহর। একে কাশ্মীরীরা নিজেরা অতি নোংরা, তার উপর সহরের

মিউনিসিপ্যালিটীর সুব্যবস্থা নাই, কাজেই ফল ভীষণ না হয়ে যায় না। কাশ্মীরীদের লজ্জা, ঘৃণার বালাই বড় একটা দেখা যায় না। প্রকৃতি এত দিয়েচেন—এর সঙ্গে যদি পাশ্চাত্য দেশের মত মানব-শক্তির মিলন হ'ত তা হলে এ দেশ বস্তুতই স্বর্গে পরিণত হ'ত। কিন্তু আমাদের এ দুর্ভাগ্য দেশে যেদিকে তাকান যায় সেই দিকেই মানুষের প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হয়। কখনও কি সুদিন আসবে না, দেশের প্রতি অনুষ্ঠানে ও সকল স্থানে কি মানব-শক্তির বিকাশ ফুটে উঠবে না ?

শালিমার উদ্যান

শ্রীনগরের কাছাকাছি জায়গার মধ্যে নিশাত ও শালিমার উদ্যান দুটীরই নাম প্রথমে করতে হয়। এ রম্য কানন দুটাই মোগলদের শিল্প-রচনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ দুটী উদ্যানই ডালহ্রদের ধারে অবস্থিত। শ্রীনগরে থাকতে ডাল-হ্রদে নৌকা-বিহার একটী প্রধান আকর্ষণ। বৈকালে শত শত সুসজ্জিত 'শিকারা' (ছোট নৌকা) নিত্যই হ্রদের দিকে ছুটে যায়। হ্রদের চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতীব রমণীয়। আবার শরৎ-কালে যখন হ্রদটী পদ্মফুলে ভরে যায়, তখন এখানকার দৃশ্য দেবতার উপভোগ্য জিনিস হ'য়ে ওঠে। শ্রীনগর থেকে ১৩ মাইল দূরে হারওয়ান উপত্যকার উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হয়েচে। এই খানে একটা পাহাড়ে জল আটকে সহরের পানীয় জল সরবরাহের জন্য একটী সুন্দর হ্রদ তৈরী করা হয়েচে। এই উপত্যকাটী ভারী মনোরম ও রাজার শিকারের একটী খাস জায়গা।

আচ্ছাবল মোগল উদ্যানের একটী অংশ

কাশ্মীরের প্রধান উপত্যকার পার্শ্বস্থিত দুটী উপত্যকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। একটী লিডার নদী, অপরটী সিনং ; নদী-প্লাবিত লিডার উপত্যকাতেই 'পাহলগাম' সহর অবস্থিত। এই পাহলগামের পথেই অমরনাথ-তীর্থ-যাত্রীরা গিয়ে থাকেন। সে পথে প্রাকৃতিক দৃশ্য না কি ভারী চমৎকার। এবার আমাদের অমরনাথ যাওয়া ঘটে উঠল না। পাহলগাম স্বাস্থ্য হিসাবে কাশ্মীরের ভেতর একটী সুন্দর জায়গা, এখানে দেওদারের জঙ্গলে তাঁবুতে থাকাই ব্যবস্থা। তা ছাড়া খালশা হোটেল সম্প্রতি

হয়েছে, হোটেলওয়ালারাই আবার তাঁবুতে থাক্‌বার ও সব ব্যবস্থা ক'রে দেবার ভার নেন।

অনন্তনাগ বা ইসলামাবাদ থেকে আচ্ছাবল, ভেরী নাগ ও কুক্করনাগ যেতে হয়। প্রথম স্থানটীতে একটী সুন্দর প্রস্রবণ আছে ও সেইটীকে আশ্রয় করে একটী রমণীয়

উলার হ্রদে প্রবেশের পথ

মোগল-উদ্যান রচিত হয়েছে। ভারী চমৎকার বাগানটী। ভেরীনাগ ও কুক্করনাগের প্রস্রবণ দুটী এবং সে দিক্‌কার প্রাকৃতিক দৃশ্যও দেখবার জিনিস।

কাশ্মীরে গেলে সকলেই একবার উলার হ্রদটি দেখে আসেন—দেখবার জায়গা বটে। এত বড় হ্রদ হিমালয়ের এদিকে আর ত কোথাও নাই—এর চেয়ে বড় হ্রদ দেখতে হলে তিব্বতে যেতে হয়। হ্রদটি দৈর্ঘ্যে খুব বড়, প্রস্থেও প্রায় সেইরূপ। সোপুর নামে একটী ছোট সহর থেকে নৌকা-যোগে সাধারণতঃ এই হ্রদ দেখতে যাওয়া হয়। কাশ্মীরের নৌকা গুলি ঢেউয়ে টেকবার তেমন উপযোগী নয়, সেই জন্যই এখানকার মাঝিরা উলার হ্রদকে বড়ই ভয়ের চক্ষে দেখে। উলার হ্রদে অপরাহ্নে সাধারণতঃ জোর বাতাস চলে এবং জলে অনেকটা সমুদ্রের মত ঢেউ হয়। সে সময় মাঝিরা প্রাণান্তেও হ্রদের মাঝে যেতে বা পাড়ি দিতে রাজী হয় না।

কাশ্মীরে আর একটী বিশেষ দ্রষ্টব্য জায়গা হচ্ছে গুলমার্গ পাহাড়। ভারতবর্ষের মধ্যে এটী সর্ব্বোচ্চ শৈলাবাস। ৮৫০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। বৎসরের মধ্যে ৫ মাস এ জায়গাটী বরফে ঢাকা থাকে। শ্রীনগর থেকে ২৬ মাইল দূরে টন্‌মার্গ অবধি মোটরকার বা লরীতে এসে ঘোড়া কিংবা ডাণ্ডিতে উপরে উঠতে হয়। দেওদারের জঙ্গলের ভিতর দিয়া চমৎকার রাস্তা উঠে গেছে। তিন মাইল চড়াই ঠেলে উঠেই এক অপরূপ দৃশ্য চোখে পড়ে। একটী রেকাবের আকারের স্বচ্ছ সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ, আর

গুলমার্গের মহারাণীর শিব-মন্দির—উপরে মেঘমালা

চতুর্দ্দিকে দেওদার বন, আর সেই দেওয়াদার বনের ধারে ধারে ছোট ছোট কাঠের বাড়ী। এ জায়গাটী ইংরাজ পল্টনের অফিসারদের উপনিবেশ বল্লেই হয়। দেশী ভদ্রলোক বড় একটা এখানে যেতেন না, আজ কাল দু-চার জনকে যেতে দেখা যাচ্ছে। জুন, জুলাই ও আগষ্ট

মাসে যখন শ্রীনগর অপেক্ষাকৃত গরম ও অস্বাস্থ্যকর হয়, কাশ্মীর-প্রবাসী ইংরেজের দল ও রেসীডেনসী অফিস এইখানে চলে আসে। গুলমার্গের গোল্‌ফ খেলবার মাঠ বা Golf Link পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এখান থেকে আর খানিক উপরে উঠলে বরফ দেখতে পাওয়া যায়।

গুলমার্গের পোষ্ট অফিস থেকে খিলন-মার্গের-তুষারের দৃশ্য (জুলাই)

ঘোড়া যাবার রাস্তাও আছে প্রায় তিন মাইল। জায়গাটীর নাম 'খিলন্‌মার্গ'। পাহাড়ের ধারে খানিকটা সবুজ মাঠ, মাঝে মাঝে ফুলের গাছের ঝোপ, তারই পাশে উপর থেকে বরফ নেবে চাপ বরফের নদীর মত হয়ে আছে। আমরা সেখানে পৌঁছাতেই ছেলেরা খুব খেলা আরম্ভ করে দিলে। বরফ ছোড়াছুড়ি ও বরফে গড়ান। এখান থেকে উত্তর দিকের উচ্চ পাহাড়শ্রেণীর দৃশ্যও ভারী চমৎকার দেখায়। খিলনমার্গ প্রায় ১১০০০ ফুট উঁচু। গুলমার্গ বেষ্টন করে একটী Circular Road রাস্তা আছে। সেখান থেকেও উত্তর দিকের আকাশ পরিষ্কার থাকলে নন্দন পাহাড়ের অপূর্ব্ব-দৃশ্য দেখা যায়। পাহাড়ের চূড়াটী এত উঁচু, দেখায় যেন সেটা আকাশে ভাসছে—তার কারণ এ পাহাড়টার উচ্চতা কাছাকাছি অন্য পাহাড়ের উচ্চতার তুলনায় প্রায় ৮।১০ হাজার ফুট বেশী। গুলমার্গের মহারাণীর শিব-মন্দির দেখিতে অতীব মনোরম। পর্ব্বতের সানুদেশে অবস্থিত। উপরে মেঘমালার বিচিত্র বর্ণ পথিকের নয়ন-মন মুগ্ধ করিয়া দেয়। বালারুণের রশ্মিজাল মেঘের উপর পড়িয়া যে নয়নাভিরাম চিত্রের উৎপাদন করে তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য। এখানে আমরা খিলন্-মর্গের একটী অপূর্ব্ব দৃশ্যের চিত্র তুলিয়া দিলাম। জুলাই মাসে গুলমার্গের পোষ্ট অফিস হইতে এই দৃশ্য সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়।
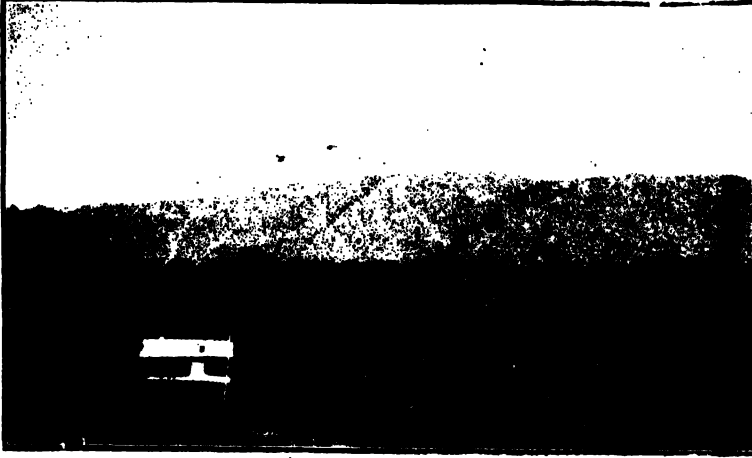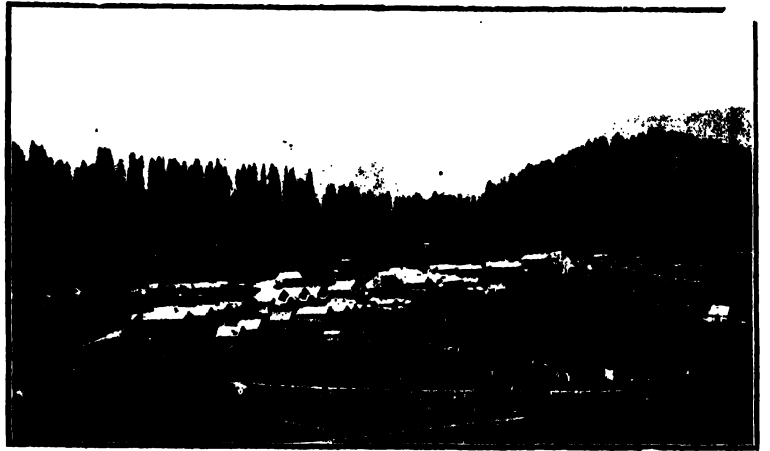
কাশ্মীরে অবসর থাকলে বেড়াবার ও দেখবার আরও অনেক জায়গাই আছে—তবে পথ দুর্গম। আমাদের এ যাত্রায় সে সব জায়গা দেখা হয় নাই।

গুলমার্গের দৃশ্য

খ-

কাশ্মীরীরা শিল্প-কার্য্যে বিশেষ [illegible] থাকেন। সে পথে যখন চতুর্দ্দিকে বরফে আচ্ছাদিত [illegible] না কি ভারী বেরোবার উপায় থাকে না, তখন ঘরের কোণে বসে [illegible] ঘটে বুকে করে ছেলে, মেয়ে, বুড়ো সবাই ছুঁচের কাজে ব্যাপৃত থাকে। কাংড়ী জিনিসটা বেতে মোড়া একটী ছোট গামলা, তাতে আগুন রাখা হয় ও বুকে ঝুলিয়ে

বেড়ায়। এইটার জন্তে এখানকার মেয়ে পুরুষের সব এক পোষাক—একটা প্রকাণ্ড 'আলখেল্লা', আগুনের গামলাটা খোলবার মত জায়গা ত ভিতরে চাই। যা কিছু শাল আলোয়ান তৈরী তা সব এই ক'মাস হয়, গ্রীষ্মকালে বিক্রয় করে।

শাল, আলোয়ান, শাড়ী ইত্যাদি ছাড়া এখানে রূপার কাজেরও বেশ বৈশিষ্ট্য আছে। এ ছাড়া Papier-mache work—কাগজের কাজ কাশ্মীরের একটা মস্ত মৌলিক শিল্প, ভারতবর্ষে আর কোথাও এটা হয় না। কাগজের তৈরী কোটা, চৌকি, বাতিদান ইত্যাদি নানান্ জিনিস। কাগজ জমিয়ে তার ওপর রং করে নানান্ রকমের নক্সা করা চমৎকার জিনিস।

সংক্ষেপে কাশ্মীরের সামান্য পরিচয় দেওয়া গেল ও খান কয়েক ছবিও সন্নিবেশিত হল। যাঁদের দেশভ্রমণের সখ আছে তাঁদের একবার কাশ্মীর দেখা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কাশ্মীরের সৌন্দর্য্যের বস্তুতই তুলনা হয় না। কাশ্মীরের রাজ-সরকার দেশভ্রমণকারীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে যদি একটু নজর দেন তা হ'লে কাশ্মীর-ভ্রমণকারীদের সংখ্যা খুবই বাড়া সম্ভব ও তাতে রাজ্যের বিশেষ লাভ।

রক্ত-কমল

(উপন্যাস)

[রায় সাহেব শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ]

৩

কিড্ ষ্ট্রীটের পূর্ব্ব মাথায় ডাক্তার মিত্রের কুঞ্জ-কুটীর। কুঞ্জ-কুটীর হইতে বাহির হইয়া লীলা এবং ডাক্তার যখন রাস্তায় আসিল, তখন ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামিতেছে। এক খানা চল্‌তি মোটর গাড়ী ডাকিয়া তাহারা উঠিয়া বসিল। বাড়ীতে বাড়ীতে তখন বিদ্যুতের বাতি জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পথের আলোকগুলিও উজ্জ্বল চোখে নির্নিমেষে কলিকাতার লোকারণ্য দেখিতেছে।

সেই আলোক ও আঁধারের ভিতর দিয়া গাড়ীখানা যখন নানা পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিতেছিল, লীলা তখন অন্ধ-হৃদটি দে[illegible] নীরবে বসিয়াছিল। লীলা দেখিল সেইরূপ। সোপ[illegible] পর একটা তাহাদের গাড়ীর পাশ ছোট সহর [illegible] হইতেছে। লীলার মনটা কেমন এক [illegible] হইয়া উঠিল। আনন্দের যে দীপশিখাগুলি সে তাহার অন্তরে জ্বালাইয়াছিল, তাহারাই কি শেষে এমনি করিয়া ফাঁকি দিয়া পলাইতেছে? হঠাৎ আজ লীলার মনে পড়িল, মা বলিয়াছিলেন—সুখ ভোগের পথে নাই, সুখ আছে ত্যাগের পথে। সে কথাটা দুই হাতে ঠেলিয়া দিয়া লীলা ব্যাকুল হৃদয়ে ডাক্তারের আরও কাছে আসিয়া বসিল। ভাবিল, সে-ই বুঝি তাহার চিরদিনের আশ্রয়।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাড়ী আসিয়া হাওড়া পোলের মুখে থামিল। লীলা ও ডাক্তার পথে নামিল। সন্ধ্যার সময় গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতে লীলার বড় ভাল লাগিত। পোলের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আলোকোজ্জ্বল জলোচ্ছ্বাস দেখিলে তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠিত। ফাল্গুনের মিষ্ট বাতাস তখন গঙ্গার উপর দিয়া ভাসিয়া আসিয়া লীলার উষ্ণ কপোল শীতল করিতেছিল। লীলা উপবাসীর ব্যাকুল-আগ্রহে সেই বাতাস নাকে মুখে টানিয়া লইতে লাগিল।

কিছু দূর অগ্রসর হইয়া লীলা দেখিল, পথের দক্ষিণ দিকে একটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার গলির মুখে ছোট এক খানি ফুলের দোকানে মিট্ মিট্ করিয়া দীপ জ্বলিতেছে। দীপের আলোক পড়িয়া বর কনেদের মাথার টোপরের উপর নাচিতেছে। লীলা এক দৃষ্টেই সেই দিকে তাকাইয়া

লইবার মানসে চাকরকে আর চিঠি ফেলিতে না দিয়া বাটীর বাহির হইলাম—কেবল ডাকঘর কোন্ দিকে এবং কত দূরে, জিজ্ঞাসা করিয়া লইলাম। পথ ঘাট কিছুই চেনা নাই—আন্দাজ বেলা ৮৷৷৹টার সময়ে সকলে বাটীর বাহির হইয়া এক জন নেপালী পথিককে জিজ্ঞাসা করিলাম—ডাকঘর কোন্ দিকে? সে উত্তর করিল—"ব্রিটিশ লাইনমে" বলিয়া একটী রাস্তা দেখাইয়া দিল। "কতদূর!" বলিল—"আধ্-মিল্ হোগা"। যা'ক আমরা তাহার নির্দ্দেশমত সোজা পথ ধরিয়া চলিয়াছি; প্রখর রৌদ্র। রাস্তায় বাহির হইয়া একবার নেপাল-রাজের রাজধানী কাঠমাণ্ড সহরের চারিদিক্ দেখিয়া লইলাম। সহরের চারিদিকেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড় মাথা উঁচু করিয়া প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছে। এই পাহাড়ের সীমা অতিক্রম করিয়া আবার দুগ্ধফেননিভ তুষারাচ্ছন্ন পাহাড় আছে। বরফের উপর রৌদ্র-রশ্মি পড়িয়া ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। এখানকার অপূর্ব্ব মনোরম দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। মনে হইল সহরটীর তিন দিকে তুষারাবৃত পাহাড় মনের আনন্দে রৌদ্র-কিরণ উপভোগ করিতেছে। এক কথায় বলিতে গেলে সহরটী যেন একটী পাহাড়ের কৌটা! কিছুদূর অগ্রসর হইয়া "থাপা থলি"র একটী সাধারণ দৃশ্য তুলিয়া লইলাম। রাস্তার এক দিকে প্রকাণ্ড মাঠ, আর এক দিকে বড় বড় প্রাসাদের মত বাটী। সঙ্গে পথ-প্রদর্শক না থাকায় আমরা সোজা রাস্তা ধরিয়া চলিলাম, অর্দ্ধঘণ্টা হইয়া গেল—মনে হইল ভুল পথে চলিয়াছি, সেইজন্য পুনরায় একটী নেপালী পথিককে ডাকঘরের দিক্ ও দূরত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া লইলাম। সেই পথিকটী একটু আধটু বাঙ্গালা বুঝে, সে কিছু দিন কলিকাতায় চাকরি করিয়াছিল। আমাদের বুঝাইয়া বলিল যে, সেইস্থান হইতে প্রায় এক মাইল পথ! আমরা ত শুনিয়াই অবাক্! নেপালের মাইল বোধ হয় মাপে বেশী, নচেৎ তিন কোয়াটার চলিয়াও আমরা অর্দ্ধ মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারিলাম না কেন! যাহা হউক কিছুক্ষণ পরে আমরা পোষ্ট আফিসে পৌছিলাম। মাষ্টারবাবু শুনিলাম—বাঙ্গালী। তিনি স্নান করিতে গিয়াছেন, ঘরে এক জন নেপালী চাকর রহিয়াছে মাত্র। আমরা একটী লোককে জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল চিঠির বাক্সতে ফেলিয়া দিলেই চিঠি যথাস্থানে পৌছিবে। অপূ-দা প্রবীণ লোক তাহার কথায় প্রতিবাদ না করিয়া কেবল বলিলেন, এখানকার মাষ্টার বাবু বাঙ্গালী, আলাপ করিয়া যাই। ইহা ছাড়া আমাদের কিছু পোষ্ট কার্ড খাম কিনিবার আবশ্যকও ছিল। আসল কথা, অপূ-দা বাঙ্গালী পোষ্টমাষ্টার বাবুকে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া চিঠি ডাকবাক্সে ফেলিবেন না। সংবাদ পাইয়া মাষ্টার বাবু তাড়াতাড়ি স্নান শেষ করিয়া আমাদের সহিত দেখা করিলেন। তাঁহার নিকট ব্যাপার শুনিয়া আমরা অবাক্! আমরা যে ডাকঘরে গিয়াছিলাম সেটী ইংরাজদের। ইংরাজ-রাজত্বে যে সকল চিঠি পত্র পাঠান হয় প্রথমে সে সকল নেপালী পোষ্ট আফিসে পোষ্ট করিতে হয়, তাহারা সেই চিঠিগুলি শীলমোহর করিয়া ব্রিটিশ পোষ্ট আফিসে পাঠাইবে, তবে ব্রিটিশ পোষ্ট আফিস সে-গুলি যথাস্থানে পাঠাইতে পারিবে। নেপালে যে সকল ইংরাজ কর্ম্মচারী (British Legation) বাস করেন তাঁহারা সুবিধা মত একেবারেই ইংরাজ পোষ্ট আফিসে

ত্রিপুরেশ্বর-মন্দিরের অপর পার্শ্বের চিত্র

চিঠি দিতে পারেন। অপর কেহ দিলে তাহার জরিমানা হইবে এবং হয় ত চিঠি নাও যাইতে পারে। সেখান হইতে নেপাল পোষ্ট আফিস বেশী দূর নয়। আমরা আবশ্যক মত খাম পোষ্ট কার্ড কিনিয়া লইয়া নেপাল পোষ্ট আফিসে আসিয়া আমাদের চিঠি ডাকবাক্সে দিলাম।

বাটী ফিরিবার সময় বাজার হাট একটু দেখিয়া লইবার বাসনা হইল। বেলা তখন ১০॥০টা হইয়াছে, সন্ধান লইয়া জানিলাম বাজার সেখান হইতে বেশী দূর নয়, রাস্তার শোভা খুব বর্দ্ধিত হইয়াছে। সহরের প্রায় অধিকাংশ বাটীই পাকা—ইটের ও পাথরের আধুনিক ভাবে তৈয়ারী। সহরে সাধারণতঃ মহারাজের অর্থাৎ মন্ত্রীর আত্মীয়বর্গই বসবাস করেন। প্রত্যেক বাটীই প্রাসাদ-বিশেষ! নানারূপ কারুকার্য্যযুক্ত এবং আধুনিক সভ্যজগতের আসবাব-পত্রে সজ্জিত। পুরাতন বাটীগুলির সম্মুখে হয় সিংহাকৃতি (griffin) জানোয়ার বা পুচ্ছধারী ময়ূর অথবা অন্য কোন প্রকার জানোয়ার আছে। এমন কি

জঙ্গ বাহাদুরের—কালমোচনের মন্দির

আন্দাজ এক মাইল। কিছু দূর গিয়া অপূ-দা অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করিতে লাগিলেন বলিয়া তিনি সোজাসুজি গৃহাভিমুখে চলিলেন এবং আমরা তিন জনে সেই প্রখর রৌদ্রে বাজারের দিকে চলিলাম। সহরের প্রধান রাস্তাগুলি বেশ বড় বড় ও সোজা, কিন্তু আশ পাশ দিয়া অনেক ছোট রাস্তা গিয়াছে; সে গুলি যেমন সরু তেমনি অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধময়। রাজ-প্রাসাদের সন্নিকটবর্ত্তী রাস্তা ঘাট বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এই স্থানটী কলিকাতার চৌরঙ্গীর মত বলিয়া মনে হয়। রাস্তার অধিকাংশ মন্দিরের গায়ে ও মাথায় Griffin বসান আছে "কালমোচনে"র চিত্রের দিকে দেখিলেই এ কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারিবেন।

রাস্তা দিয়া আসিতে আসিতে একটী সুন্দর পুষ্করিণী দেখিলাম—খোঁজ লইয়া জানিলাম উহার নাম "রাণী পোখরা"। রাণী পোখরার ধার দিয়া গিয়া একটী চৌমাথায় পড়িলাম। আমরা সোজা যাইয়া বাজারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। রাস্তার দুই দিকেই নানা প্রকারের দোকান—কোথাও মণিহারী, কোথাও দরজীর

খোলা নর্দ্দমা (surface drain)। রাস্তা ও নর্দ্দমা উভয়েরই অবস্থা অতি শোচনীয়। এখানকার লোকগুলি যেমন অপরিষ্কার—রাস্তা-ঘাটও তেমনই অপরিষ্কার। যতই ভিতর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, রাস্তার ভিড় ও দোকান পসারির জমজমা ততই অধিক হইতে লাগিল, ক্রমে আমরা একটী ফাঁকা উঠানের মত স্থানে গিয়া পৌছিলাম। সেই স্থানটাই "চক"—তাহার চারি দিক্ দিয়াই অনেক গুলি রাস্তা গিয়াছে। সেই চকের মধ্যে একটী নেপালী ছোট খাট মন্দিরের মত আছে—চকের অপেক্ষা কিছু বেশী। নেপালে আমাদের এখানকার নোটের দাম কিছু বেশী—দশ টাকার নোট দিলে—তাহারা ১০।০ কখনও কখনও ১০৷৹ টাকা পর্য্যন্ত দেয়।

এইবার বাজারের কথা কিছু বলিব। কলিকাতায় যাঁহারা মনোহর দাসের চক বা সোনাপটী ও তন্নিকটস্থ বাজারে গিয়াছেন তাঁহারা নেপালের বাজারের অনেকটা আভাস পাইবেন। সেই ফাঁকা স্থানটীর চতুর্দ্দিক্ দিয়া ৬।৭টী ছোট ছোট রাস্তা বাহির হইয়াছে—এখানকার বাজারের মত সেই চকের মধ্যে যে যেখানে স্থান পাইয়াছে

থপথালী—কাঠ মুণ্ড
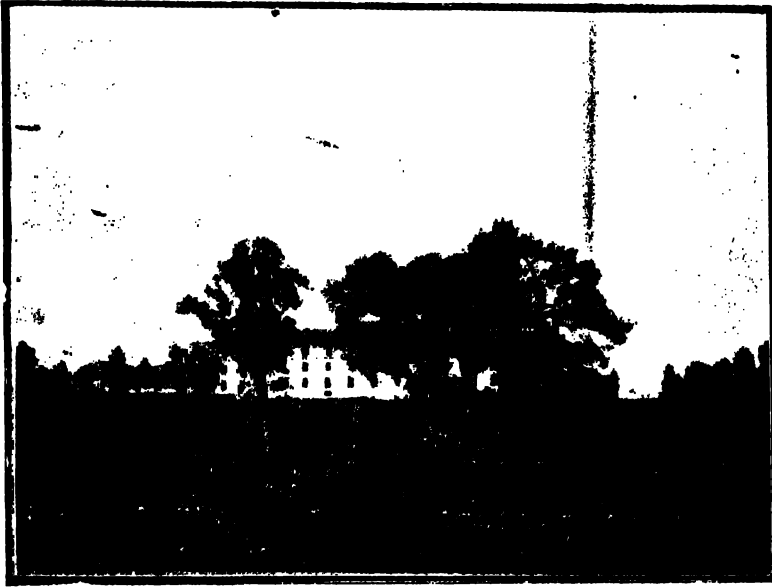
মাঝখানে ৫।৬টী পোদ্দারের দোকান। তাহারা কোম্পানির টাকা অর্থাৎ ইংরাজ রাজত্বের টাকা বদলাইয়া নেপালী টাকা পয়সা ইত্যাদি দেয়। আমরা প্রথমেই গোটা কয়েক টাকা ভাঙ্গাইয়া লইলাম—রূপেয়া, মোহর, সুকী, দুইআনি ও পাতলি বা নেপালী আধ পয়সা, ডবল পয়সা ও পয়সা। পাচটী পাতলীতে একটী ডবল পয়সা। নেপালী রূপেয়া আমাদের বার আনার কিছু উপর এবং মোহর আমাদের আধুলির কিছু উপর। আমাদের ইংরাজ-রাজের নোট এবং টাকা ছাড়া আর কিছুই নেপালে চলে না। নেপালী সোনার মোহরও দুই প্রকার আছে—ছোট ও বড়—পাকা সোনার তৈয়ী—দামও সেই জন্য এখানকার মোহরের শাক-সবজী, ফল-মূল লইয়া বিক্রয় করিতেছে। এখানে শাক-সবজী নানা প্রকারের ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সাহেবদের প্রিয় সবজী ও ফল মূল যথা—শালগাম, গাজর, বীট, স্কোয়াশ, সালাদ প্রভৃতি সমস্তই প্রত্যহ বিক্রয় হয়। কপি, কড়াইশুঁটী, টমাটো প্রভৃতি আমাদের দেশের চেয়ে বেশ বড় বড় বলেই মনে হইল—দামও বেশ সস্তা। সাধারণতঃ আমাদের দেশের প্রায় অধিকাংশ রকমের শাক-সবজী ও ফল-মূল নেপালে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ এখানে এক একটী বিলাতি কুমড়া প্রায় আধ-মণ ত্রিশ সেরের কম নহে। এখানে আলুচা, খোবানী, আকরোট টাটকা বিক্রয় হয়—[illegible]

নেপালের আখরোট অতি নিকৃষ্ট—শাঁস অত্যন্ত কম, সবই যেন খোলায় ভরা।

চকের চতুর্দ্দিক্ দিয়া যে সকল রাস্তা গিয়াছে—এক একটা রাস্তার দুই ধারেই বরাবর দোকান এবং অধিকাংশ দোকান এক প্রকার দ্রব্য লইয়া। ঠিক এখানকার মতই, কোন রাস্তায় কাপড়ের দোকান, কোন রাস্তায় বাসনের দোকান, কোন রাস্তায় হালুইকর ও অন্যান্য খাদ্যের দোকান এই ভাবে রাস্তাগুলি গিয়াছে।
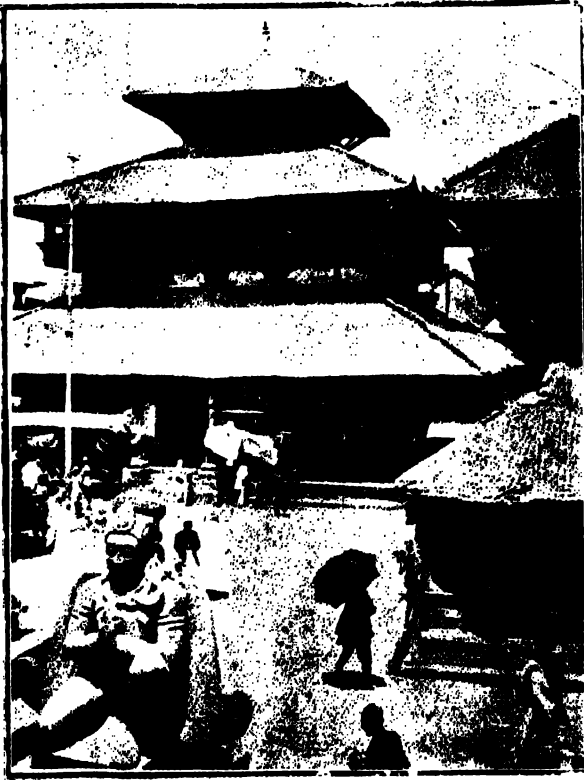
কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ—ইহা হইতে কাঠমুণ্ড নামকরণ হইয়াছে।

কাঠের ও পাথরের কারু-কার্য্য ছাড়া শিল্পের নমুনা আর কিছুই ত বড় একটা দেখিতে পাওয়া গেল না। এই গুলি দেখিতে সুন্দর। পিতলের কাজ না কি পূর্ব্বে খুব ভালই হইত এবং সেইজন্য পুরাতন পিতলের দ্রব্যাদি এখনও অনেক দোকানে বেশী দামে বিক্রয় হয়। এখানকার কারু-কার্য্য যাহা কিছু সমস্তই নেওয়ারীদিগের একচেটিয়া ব্যবসা। শুনিলাম, পূর্ব্বে নেওয়ারীরা পিতলের বাসনের উপর নানারূপ চিত্র-বিচিত্র করিয়া অতি সূক্ষ্ম কারু-কার্য্য করিত। আজকাল উৎসাহের অভাবে এই সকল শিল্প বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

নেপালে এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত হয়—কাগজগুলি অনেকটা ম্যানিলা কাগজের মত, খুব মজবুত। নেপালের রাজকার্য্য সমস্তই নেপালী কাগজে হয়। ওই কাগজ এত মজবুত যে কাগজে বাঁধিয়া ২।৩ সের জিনিস ঝুলাইয়া আনা যায়। বাজারের মাল-পত্র এই কাগজে মুড়িয়াই বিক্রীত হয়।

নেপালে এক প্রকার দড়ির জুতা তৈয়ার হয়, ইহাতে চামড়ার সম্পর্কও নাই। অর্ডার দিলে ইচ্ছামত জিনিস পাওয়া যায়। শুনিলাম নেপালেরই এক জন এই জুতার প্রথম প্রচলন করেন। এই জুতা নেপালের মত শীত-প্রধান দেশে বিশেষ আবশ্যক। শীতকালের জন্য বনাতের জুতা তৈয়ার হয়। এই জুতা পরিয়া সকলে দেবতার স্থানেও যাইতে পারে এবং তাহাতে কেহ বাধা দেয় না। দাম খুব বেশী বলিয়া মনে হইল না।

নেপালী খুকরী দেখিলাম। শুনিয়াছিলাম নেপাল খুকরীর জন্য বিখ্যাত—কিন্তু স্থানীয় বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের নিকট জানিলাম যে আজকাল খুকরী বাজারে বিক্রয়ের জন্য আসে না। বাজারে নানা প্রকার সিংএর কাঠের হ্যাণ্ডেল-ওয়ালা খুকরী, ছুরী প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্য সাজান রহিয়াছে।

নেপালে কম্বল, পশমী গায়ের কাপড় প্রভৃতি নানা প্রকার গরম কাপড় পাওয়া যায়, দাম বেশী বলিয়াই মনে হইল। শুনিলাম অধিকাংশ ভুটানীরা নেপালের বাজারে বেচিতে আসে এবং দোকানদারেরা তাহাদের নিকট কিনিয়া বেচে। নেপালেও পশমের গায়ের কাপড়, গলা-বন্ধ প্রভৃতি তৈয়ার হয় বটে, তবে মাত্রায়ও যেমন কম উৎকর্ষেও তেমনই হীন।

যাহা হউক আমরা তিন জনে বাজারের চারিদিক্ একটু ঘুরিয়া একটা রাস্তা ধরিয়া বাটীর দিকে যাইবার জন্য অগ্রসর হইলাম। তিন জনেই অপরিচিত, পথ-প্রদর্শক কেহ নাই রাস্তা ধরিয়া সোজা চলিতে চলিতে একটী স্থানে আসিলাম। স্থানটীর নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম

"হনুমান ঢোকা"। তাহারই নিকট একটা কাঠের মন্দিরের মত বাড়ী। শুনিলাম ঐ বাড়ীর নাম হইতেই সহরের নাম "কাঠ্‌মাণ্ড" হইয়াছে। ছবিতে কাঠের বাড়ীটা দেখান হইয়াছে। তার উত্তর দিকে একটা পাকা বাড়ী আছে। ইহাকে "হনুমান-ঢোকা"র মন্দির বলে। ইহারও একটা বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

সমাগত ভদ্র লোকদের সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া বৈকালে সকলে মিলিয়া একটু বেড়াইতে গেলাম। আমাদের বাটীর সম্মুখেই সিং-মহল—রাস্তায় বহু লোক সমাগম। দেখিতে দেখিতে এক দল ঘোড়-সওয়ার দূরে আসিতেছে দেখিতে পাইলাম। ঘোড়-সওয়ারের অধিকাংশ লোকই সিং-মহলে প্রবেশ করিল। শুনিলাম তাহার মধ্যে মহারাজের অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীর দুই পুত্র ও তিনটী নাতি আছেন, অপর ঘোড়-সওয়ারেরা তাঁহার সভাসদ, যাহা হউক আমরা আর অপেক্ষা না করিয়া বাঘমতী নদীর ধারে সাঁকোর উপর একটু বেড়াইতে গেলাম।

হনুমান ঢোকার মন্দির

ছবি লইলাম। ছবি তুলিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া একটী নদীর ধারে গিয়া পড়িলাম—বেলা তখন ১২টা বাজিয়াছে রৌদ্রে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে; পথহারা পথ-শ্রান্ত পথিকের মত এ-দিক্‌ ও-দিক্‌ করিয়া যখন কোন কূল-কিনারা করিতে পারিলাম না, তখন দোকানীদের নিকট রাস্তা ঠিক করিয়া লইলাম। অনেক ঘুরিয়া পথ-শ্রান্ত হইয়া আন্দাজ বেলা ১টার সময় বাটী ফিরিলাম। অপূ-দা আমাদের জন্য একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ডাক্তারবাবু ও কালীবাবু আমাদের অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিছু বিশ্রামের পর স্নান-আহার শেষ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। বেলা ৩৷০টা আন্দাজ নেপালের আরও কয় জন

বাঘমতী নদীর পূর্ব্ব তীর—সাঁকো হইতে

সাঁকোটী আধুনিক ইংরাজী ধরণের লোহার তৈয়ারী, বেশ বড় সাঁকো। সাঁকোর উপর হইতে দুই দিকের দৃশ্য মনোহর। নদীতে জল যদিও খুব অল্প কিন্তু বিস্তৃত বলিয়া সুন্দর দেখাইতেছিল। আমরা যে সময়ে সাঁকোর উপর পৌঁছিলাম সেই সময় অস্তগামী সূর্য্য-

দেব তাঁহার শেষ কিরণজাল প্রবাহমান নদীর জলের উপর বিস্তার করিয়া অপূর্ব্ব শোভা উৎপাদন করিতেছেন। সাঁকোর উপর হইতে দুই দিকের দুইখানি ও সাঁকোর একটী ছবি লইলাম। এই সাঁকোটী কাঠমাণ্ড সহরের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকের সীমানা। সহরের দিকের ঘাটগুলি অনেক দূর পর্য্যন্ত বাঁধান। বাঘমতী নদীর ঘাটের উপরই জঙ্গ-বাহাদুরে রাজ-প্রাসাদ। ইনি পূর্ব্বে নেপাল রাজের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। এই স্থানে নদীটী পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে যাইতেছে—উত্তর দিকে কাঠ্‌-মাণ্ড সহর ও সাঁকোর অপর পারে দক্ষিণ দিকে নেপালের পুরাতন রাজধানী পাটন সহর। আমরা কিছুক্ষণ সাঁকোর উপর সহরের ও চতুর্দ্দিকের সুন্দর স্বাভাবিক দৃশ্য উপভোগ করিয়া পুনরায় বাটীর পথে ফিরিলাম। সন্ধ্যার সময় বেশ একটু শীত অনুভব করিতে লাগিলাম। বাটী হইতে গায়ের কাপড় লইয়া এই বার সকলে মিলিয়া অনন্ত-বাবুর বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলাম। পৌছাইয়া দেখিলাম অনেক গুলি নেপালের বাঙ্গালী ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। সকলের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে করিতে আন্দাজ রাত্রি ৮॥০টার মধ্যেই আহারের জন্য সকলেই তাড়া দিতে লাগিলেন। আমরা নেপালে নবাগত মনে মনে ধারণা করিয়া লইলাম, বোধ হয় নেপালে সকলেই রাত্রে একটু সকাল সকাল আহারাদি শেষ করেন। আমাদের অত তাড়াতাড়ি করিবার কোনও রূপ ইচ্ছা না থাকিলেও ভদ্রতা-রক্ষা করিয়া কেহই আর কোন কথা কহিলাম না। গান, বাজনা, তাস প্রভৃতি আমোদ ও প্রমোদও বেশ চলিতে ছিল; যাহা হউক অল্পক্ষণ পরেই আমরা সকলে আহার করিতে গেলাম।

বাঘমতী নদীর পূর্ব্বতীরস্থ জঙ্গবাহাদুরের প্রাসাদ

বাঘমতী নদীর সাঁকো

শুনিলাম অনন্তবাবু নেপালের সমস্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোককেই নিমন্ত্রণ করিয়াছেন কিন্তু নানাকারণে অনেকেই আসিতে পারেন নাই। আহারের আয়োজন খুব জমকাল রকমের হইয়াছিল। আমরা গুরু ভোজন করিয়া আন্দাজ রাত্রি ৯॥০ টার সময় বাটী ফিরিলাম। আহারের পর সকলেই বাটী ফিরিবার জন্য ভয়ানক ব্যস্ত। প্রায় সকলেই বলিতে লাগিলেন, "তোপের সময় হ'ল আর দেরী করলে মুস্কিলে পড়তে হবে।" কলিকাতায় পূর্ব্বে প্রত্যহই রাত্রি ৯॥০

টার সময় তোপ পড়িত, সেই ভাবেই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে কয়টার সময় তোপ পড়ে?" আমাদের গৃহ-স্বামী তখন বলিলেন, "এখানকার তোপের একটু বৈশিষ্ট্য আছে; ইহাছাড়া ঋতু-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তোপ পড়ার সময় ও পরিবর্ত্তন হয় অর্থাৎ শীত, গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে অল্প অল্প করিয়া তোপের সময় 'আগু-পিছু' করা হয়।" কালীবাবু তোপের বৈশিষ্ট্য বাটী ফিরিবার পথে বলিবেন বলিয়া আমাদের সকলকে লইয়া বাটী ফিরিলেন। পথে আসিবার কালে ৯।৪০ মিনিটের সময় একটী তোপের আওয়াজ শুনিলাম। আমরা বাটীতে ফিরিয়াই কালীবাবুকে তোপের ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তোপ পড়িবার পর রাত্রে সহরের মধ্যে আর কাহারও ঘুরিয়া বেড়াইবার উপায় নাই। রাস্তায় কাহাকেও চলাফেরা করিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ পুলিশ ধরিয়া লইয়া যাইবে এবং সারা রাত্র হাজতে পুরিয়া রাখিবে! পর দিন প্রাতে তাহার বিচার হইবে এবং তাহার পর যুক্তিযুক্ত কারণ দর্শাইতে পারিলে 'ছাড়ান' দেওয়া হয়! এই কড়া আইনটী না কি সহরের মধ্যে বিশেষ ভাবেই চালান হয়। রাজ-কর্ম্মচারীদের ভিতর কাহারও যদি রাত্রে রাস্তায় বাহির হইবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে দরবার হইতে pass word (সঙ্কেত বাক্য) জানিয়া আসিতে হয়। প্রত্যহ এক একটী করিয়া সঙ্কেত-বাক্য (pass word) থাকে—সেই কথাটী পুলিশকে বলিলে পুলিশ ছাড়িয়া দেয়। রাত্রে হঠাৎ কাহারও অসুখ করিলে ডাক্তার ডাকা অথবা কোন ঔষধ আনিবার আবশ্যক হইলে বিশেষ ভয়ের কথা। পুলিশের যদি দয়া হয় এবং কথা বিশ্বাস করে—তবেই ছাড়িয়া দিবে নচেৎ ঘরে রোগীও মরিবে এবং যিনি চিকিৎসার জন্য ডাক্তার আনিতে যাইবেন বা ঔষধ আনিতে যাইবেন তিনিও বিনা দোষে হাজত-বাস করিবেন! যাহা হউক আমরা ফিরিবার কালীন কোন পুলিশ কর্ত্তৃক আহূত হই নাই এবং বাটীতে আসিয়া শুনিলাম আমাদের অতিথি-সেবক ডাক্তার বাবু পূর্ব্ব [illegible] সঙ্কেত বাক্যটী জানিয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাঁহাদের [illegible] বাটী তাঁহাদের সকলকেই বাটী ফিরিবার কালে বলিয়া [illegible]ছিলেন। ঐ দিনের সঙ্কেত বাক্য "দুর্গা" ছিল।

২০।১০।২৮ তারিখে আমরা নিমন্ত্রণে গিয়া ডাক্তার চারুবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ষষ্ঠীবাবুর সহিত ঠিক করিয়া আসিয়াছিলাম যে পর দিন প্রাতঃকালেই ৺পশুপতিনাথ দর্শনে যাইব। পর দিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই প্রাতঃ-কৃত্যাদি শেষ করিয়া তাঁহার সহিত ৺পশুপতিনাথ দর্শনে বাহির হইলাম। আমাদের বাটী হইতে ৩৷৩।॰ মাইল পথ—রাস্তা বেশ ভালই। আন্দাজ বেলা ৯৷৷॰ টার সময় আমরা সকলে বাবার স্থানে পৌঁছিলাম। পশুপতিনাথের মন্দিরের কাছাকাছি পৌঁছাইয়াই মনে হইল একটী ছোট খাট সহরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছি। রাস্তা এই স্থানে ক্রমেই নামিয়া গিয়াছে। রাস্তার ধারে যে সকল বাড়ী দেখিলাম প্রায় অধিকাংশই পাকা ইট ও পাথরের তৈয়ারী। সকল পাকা বাটীরই সম্মুখে কাঠের উপর খুব সূক্ষ্ম খোদাইয়ের কারুকার্য্য—এক একটী বাটীর কাঠের কারু-কার্য্য এত সুন্দর যে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিবার মত। এ ভাবের কাঠের উপর এত সুন্দর কারুকার্য্য ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

রাস্তা হইতে মন্দিরের পথ পাথর দিয়া বাঁধান। রাস্তার দুই দিকে পাকা বাড়ী দ্বিতল ও ত্রিতল, এবং মণিহারী, ফল-মূল, ফুল, খাবার প্রভৃতির দোকান। মন্দিরের দ্বারে আমরা জুতা খুলিয়া, কিছু ফুল কিনিয়া বাবার দর্শন-লাভের জন্য মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরের সম্মুখেই উঠানে একটী প্রকাণ্ড স্বর্ণের ষাঁড়। শুনিলাম ষাঁড়টী তামার উপর সোনার পাতে মোড়া। এই প্রকাণ্ড ষাঁড়টী উঠানে ঠিক বাবার মন্দিরের সম্মুখে একটী উচ্চ চত্বরের উপর বসান আছে—মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে প্রথমেই ষাঁড়ের প্রতি নজর পড়ে। মন্দিরও উচ্চ চত্বরের বা মণ্ডপের উপর। নেপালের সকল মন্দিরই দেখিতে বৌদ্ধ মন্দিরের বা বর্ম্মার পাগোডার (Pagoda style) মত। আমরা যখন পৌঁছিলাম মন্দিরের দ্বার বন্ধ ছিল—পাঁচ মিনিট পরেই আবার দ্বার খোলা হইবে। এই অবসরে আমরা একবার মন্দিরের চারিদিক্ ঘুরিয়া দেখিয়া লইলাম। মন্দিরের উপর উপর্য্যুপরি দুইটী থাক চূড়া উঠিয়াছে। মন্দিরের চূড়া স্বর্ণের। চারিদিক্ প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিলাম—মন্দিরের গায়ে এবং চারিদিকে চারিটী রৌপ্য-নির্ম্মিত দরজার গায়ে

স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রচুর আড়ম্বর,—মাঝে মাঝে তামার কার্য্যও আছে। পাথরের টালিতে সংস্কৃতে লেখা "শ্রীপশুপতিচরণশরণশ্চন্দ্রঃ"। মন্দিরের দুই থাক-বিশিষ্ট আবরণ কাষ্ঠের উপর পাত দিয়া মোড়া বলিয়াই মনে হইল। উপরে কাষ্ঠের ফ্রেমে নানারূপ কারুকার্য্য-খচিত। মন্দিরের বারান্দায় দুই জন নেপালী ব্রাহ্মণ এক দিকে ভজন গাহিতেছে অপর দিকে একটী মান্দ্রাজী স্ত্রীলোক স্তোত্র পাঠ করিতেছেন। আমরা দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছি এমন সময়ে হঠাৎ ঘণ্টাধ্বনি হইল—অমনি চারিদিক হইতে অনেক লোক মন্দিরের উপর আসিল। মন্দিরের দ্বার খোলা হইল। আমরা আগ্রহ সহকারে হিন্দুদিগের
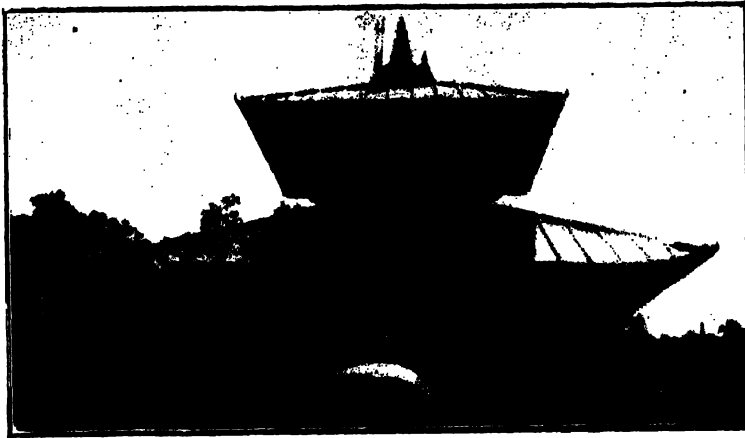
পশুপতিনাথের মন্দির

মহাতীর্থ দেবাদিদেব ৺পশুপতিনাথ দর্শন করিলাম। আমাদের দেশের মত দেবতার গায়ে ফুল, ফল বা দক্ষিণা ছুড়িয়া দিবার প্রথা নাই। ভিড় একটু কমিলে পূজারী আমাদিগকে দেখিয়া যত্নের সহিত দেব-দর্শন করাইলেন। পশুপতিনাথ সুবৃহৎ চতুর্ম্মুখ শিবলিঙ্গ। আমরা উদয়পুর হইতে একলিঙ্গম্ দর্শনে গিয়াছিলাম—পশুপতিনাথের বিগ্রহ দেখিয়া একলিঙ্গম্ বিগ্রহের সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়াই মনে হইল। মন্দিরের ভিতরের অবস্থা অতি সুন্দর। ভিতরে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে, এক দিক্ হইতে ধূপের গন্ধ বাহির হইতেছে। মন্দির-দ্বার খুলিতেই কুঙ্কুম ও চন্দনের গন্ধে চারিদিক আমোদিত করিয়া তুলিল। এখানে মন্দিরের মধ্যে অর্থাৎ বিগ্রহের নিকট কাহারও যাইবার অধিকার নাই। পূজারীর নিকট জানিলাম তিনি এক জন দক্ষিণী ব্রাহ্মণ। কাশীর ৺বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের মেঝেতে যেমন টাকা বিছান আছে এখানেও সেইরূপ আছে। মন্দিরটী চারি বার প্রদক্ষিণ করিয়া পূজারীর নিকট ফুল, বিল্বপত্র, চরণামৃত ইত্যাদি লইলাম। পূজারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, দেবতার ছবি তোলা সরকার হইতে নিষিদ্ধ। ইচ্ছা থাকিলেও ছবি লইতে পারিলাম না। তবে মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই যখন সকলে জুতা খুলিতে ব্যস্ত আমি ইত্যবসরে একটী ছবি তুলিয়া লইয়াছিলাম। এবং তুলিবার পরই পার্শ্বেই একটী সাধু ছিলেন তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে সাবধান করিয়া দিলেন এবং বলিলেন যে যদি কেহ আপনাকে ছবি তুলিতে দেখিতে পায়, তাহা হইলে ক্যামেরা কাড়িয়া লইয়া ভাঙ্গিয়া দিবে এবং আপনাকে রাজদরবারে লইয়া যাইবে। ষাঁড়টী সম্মুখে পড়ায় মন্দিরের ছবিটী ভাল করিয়া তুলিতে পারি নাই। নেপাল ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্ব্বেই আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীমঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ, মহাশয়ের নিকট নেপালসম্বন্ধে অনেক ব্যাপার জানিয়া লইয়াছিলাম এবং তাঁহারই মুখে শুনিয়াছিলাম যে ৺পশুপতিনাথের মন্দিরের অথবা বিগ্রহের ফটো লইবার কাহারও হুকুম নাই। মঞ্জু বাবু ১৯২২ সালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ মহাশয় পণ্ডিত প্রবর মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌-এ, সি-আই-ই,র সহিত নেপালে গিয়া ছিলেন। তখন নেপালের রেল-পথ বা মোটরবাস কিছুই হয় নাই। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি আমার এই ভ্রমণ-কাহিনী লেখার সময় তাঁহার নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি—তিনি কয়েকখানি ছবি আমাকে ব্যবহার করিবার জন্য দিয়াছেন। আমার অপর এক জন বিশিষ্ট বন্ধু শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত এম্‌-এ, বি-এল্ আমার ছবিগুলি বিশেষ যত্ন সহকারে ছাপিয়া দিয়া আমাকে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

মন্দিরের দেওয়ালে বিলাতি টালি (Minton tile),

দিয়া শোভা বাড়াইবার চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা আমার তেমন ভাল লাগিল না। দেবতার স্থানে এই বিলাতী রীতি কেমন বেখাপ্পা লাগিল। ৺পশুপতিনাথই নেপাল রাজের ইষ্ট-দেবতা। মন্দিরের এমনই একটী গাম্ভীর্য্য যে আপনা হইতেই যেন মনে ভক্তির

আর্য্যঘাট

ভাব আনিয়া দেয়। শুনিলাম বাবাকে দুধ, মধু, ঘৃত, চিনি ইত্যাদি এক এক মণ দিয়া প্রতিপূর্ণিমাতে স্নান করান হয়! মন্দির-প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিকে অনেকগুলি ছোট ছোট দেবমন্দির—উত্তরদিকে বাঘমতী নদী—নদীর অপর পারে নাতি-উচ্চ ঘন-বৃক্ষাবৃত পাহাড়। এই স্থান হইতে কিছু পশ্চিম দিকে নদীটী বাঁকিয়া গিয়া কল কল রবে প্রবাহিত হইতেছে। মন্দির প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া বাঘমতীতে নামিবার জন্য সুন্দর বাঁধান ঘাট। নেপালে কাহারও মৃত্যু হইবার সময় হইয়াছে জানিতে পারিলেই মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাহাকে ৺পশুপতিনাথের ঘাটে লইয়া যায় এবং মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে বাঁধান সিঁড়ির উপর নামাইয়া মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার পদদেশ বাঘমতীর জলে স্পর্শ করাইয়া রাখে। স্থানীয় লোকের ধারণা ইহাতে না কি মৃতের শান্তি হয়। মৃত্যু হইলে সিঁড়ির মাঝে মাঝে একটী করিয়া উচ্চ পাথরের গোল চাতাল আছে তাহার উপর রাখিয়া সংকার্য্য শেষ করে। বাঘমতী নদীর তীরস্থ জঙ্গ বাহাদুরের প্রাসাদ-ঘাটের উপর যেরূপ চাতাল আছে ইহা সেইরূপ চাতাল।
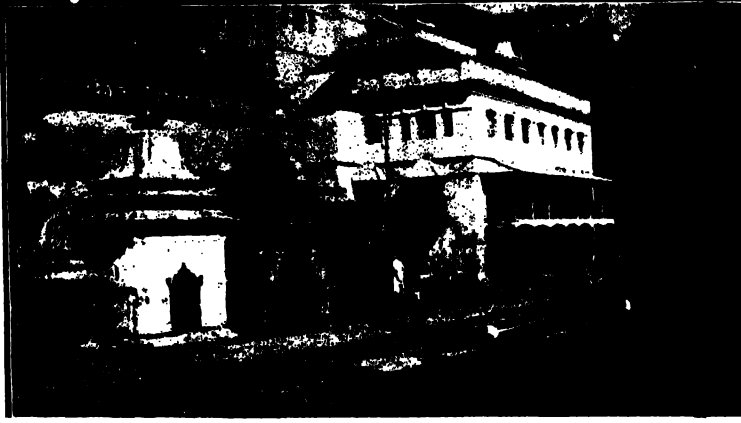
এইবার আমরা ৺পশুপতিনাথের মন্দিরের পূর্ব্বদিক দিয়া গুহ্যকালী পীঠস্থান দেখিবার জন্যে অগ্রসর হইলাম। পূর্ব্বদিকের প্রাঙ্গণের পার্শ্বেই একস্থানে অসংখ্য ছোট ছোট শিবলিঙ্গ সাজান রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম—দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন একটী গোলক-ধাঁধা রহিয়াছে। আবার পাথরের রাস্তায় পড়িয়া একটী সুন্দর ছোট হাল-ফ্যাসানের পাথরের বাঁধান সাঁকো। সাঁকো হইতে বাঘমতী নদীর দুই দিকে অতি

গুহ্যকালীর পথে বাঁধান সিঁড়ি

মনোমোহকর দৃশ্য—এক দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত সাঁকোর নীচে সুদৃশ্য বাঁধান ঘাট অপরদিকে গাছ-পালায় আবৃত জঙ্গলপূর্ণ ছোট পাহাড়। এই স্থানে নদীটী ত খুব সঙ্কীর্ণ, কিন্তু দৃশ্য অতিশয় মনোরম। এখান হইতে আর্য্যঘাটের সুন্দর দৃশ্যের একটী ছবি লইলাম। পুলের অপর পারে গিয়া রাস্তা ক্রমশঃই উচুতে উঠিয়াছে, তবে রাস্তা বরাবর পাথর দিয়া বাঁধান

সিঁড়ি। আমি কিছু দূর উঠিয়া সিঁড়ির পার্শ্বেই একটা পাহাড়ে উঠিলাম—সেখান হইতে আর একটা ৺পশুপতিনাথের মন্দিরের ও তৎসংলগ্ন গৃহাদির ছবি তুলিয়া লইলাম। পাহাড়টার চারিদিকেই জঙ্গল, তবে বেশ পরিষ্কার বলিয়া মনে হইল। অদূরে ২।১টা ছোট মন্দিরও দেখিলাম। সেই স্থান হইতে বাবার মন্দির ও তৎসংলগ্ন বাড়ীগুলির দৃশ্য অতি সুন্দর।

পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া দেখি সঙ্গীরা কিছুদূর উঠিয়া ক্লান্ত হইয়া আমার অপেক্ষায় সিঁড়িতে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। ঐ স্থানটার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের রমণীয়তা এত আমায় ভাল লাগিল যে একখানি ছবি তুলিতে ইচ্ছা
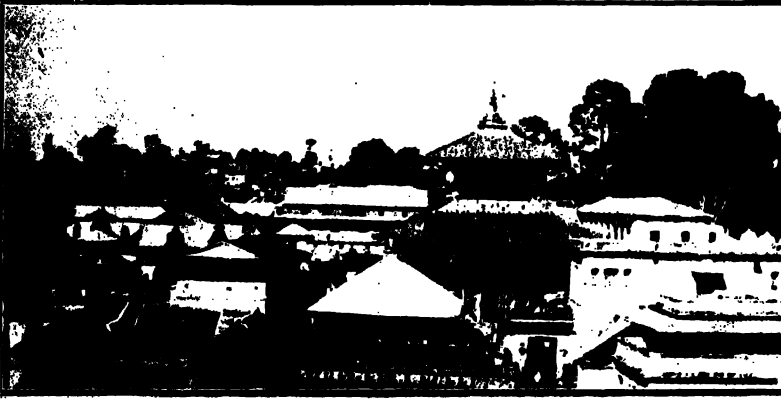
বাঘমতী নদীর অপর পারের পাহাড়ের উপর হইতে পশুপতি নাথের মন্দির ও তৎসংলগ্ন গৃহাদি

হইল। পাহাড়ের উপর ঘন ঘন বন-জঙ্গল। আর সেই বৃক্ষ-লতাবল্লরী শোভিত সিঁড়িতে আমাদের তিন জন বন্ধু ও ষষ্ঠীবাবু বিশ্রাম করিতেছিলেন। ইচ্ছা হইবা মাত্র আমি সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতেই তাঁহাদের একটা ছবি তুলিয়া লইলাম। সিঁড়িগুলি বেশ উঁচু উঠিতে আমাদের সকলকেই যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। সিঁড়ির দুই পার্শ্বই জঙ্গলাকীর্ণ। পূর্ব্বদিকের জঙ্গলটাকে শুনিলাম 'মৃগস্থলী' বলে। কিছু দূর উঠিয়া আবার নামিতে আরম্ভ করিলাম। নামিবার পথের দুইপার্শ্বে ছোট ছোট মন্দির ও সাধুদের আড্ডা। পশুপতিনাথের মন্দিরে যেমন একটু জমজমা দেখিলাম, গুহ্যকালীর প্রাঙ্গণে কেমন একটু শান্ত ভাব। গুহ্যকালী একান্নপীঠের অন্যতম। আমরা সকলে ফুল কিনিয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। চারিদিকেই ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রপাঠ করিতেছেন। মন্দিরের মধ্যে কোন দেবতার মূর্ত্তি নাই—কালীর স্থানটা একটি বৃহৎ চাতাল, সমস্তটাই সোণা রূপা দিয়া বাঁধান। একস্থানে একটা গর্ত্ত আছে—গর্ত্তটা সর্ব্বদাই জলে পূর্ণ থাকে। পূজার ফুল দিলে পূজারী সেই গর্ত্তের মুখ খুলিয়া ফুলগুলি ডুবাইয়া দেয় এবং যে লোক সঙ্গে পাত্র আনে, সেই গর্ত্ত হইতে জল লইয়া যায়; দক্ষিণা পূজারী হাতে হাতেই লন। প্রবাদ যে ঐ গর্ত্ত অতলস্পর্শী এবং পাতাল হইতে জল আসিয়া সর্ব্বদাই গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া রাখে। দেবতার স্থানটী অতি মনোরম—একদিকে পাহাড় ও জঙ্গল, অন্যদিকে বাঘমতী নদী এবং নদীর ধারে একটু উপরেই মার পীঠস্থান বেশ একটু নির্জ্জন স্থানেই অবস্থিত। কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে যেমন বাঁদরের উৎপাত এখানেও সেইরূপ দেখিলাম। চারিদিকেই গাছের উপর অসংখ্য ছোট ছোট বাঁদর রহিয়াছে; বড় জাতের বাঁদর দেখিলাম না। আমরা দেবদর্শনের পর গুহ্যকালীর বাঁধান ঘাটে গাছের ছাওয়ায় একটু বিশ্রামের জন্য বসিলাম। বাঘমতী নদী গুহ্যকালীর স্থানকে বেড় দিয়া পূর্ব্বদিকে বাঁকিয়া ৺পশুপতিনাথের মন্দিরের গা দিয়া কিছু দূর গিয়া আবার দক্ষিণ-বাহিনী হইয়াছে। এই স্থানে নদীটা বেশ প্রশস্ত। আমরা মুখ হাত ধুইয়া বিশ্রাম করিতেছি এমন সময় নদীর অপরপারে কিছু দূরে একটা মন্দিরের চূড়া সকলের নয়ন আকৃষ্ট করিল। ষষ্ঠীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম উহা স্বর্ণবোধ বা বৌদ্ধচৈত্য বা স্তূপ। তখন বেলা ১১৷৷৹টা বাজিয়া গিয়াছে এবং আমরা সকলেই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। এস্থান হইতে বৌদ্ধ-স্তূপ দেড় মাইলের কিছু বেশী। আমরা বিশ্রাম করিতে করিতেই ঠিক করিলাম পর দিন ঐ-স্থানে যাইতে হইবে। ষষ্ঠীবাবু বলিলেন আবার আমাদের এই পথ দিয়াই আসিতে হইবে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ঠিক

হইল তখনই যাওয়াই উচিত,নচেৎ পুনরায় আসিতে হইবে আনাগোনায় প্রায় নয় মাইল পথ অধিক হাঁটিতে হইবে।

এই স্থানে বলিয়া রাখি নেপালে গমনাগমনের জন্ত কলিকাতায় মত যান-বাহনের কোন বিশেষ ব্যবস্থা নাই। এখানের বড়-লোকের বাটীতে ২।১টী করিয়া তাঞ্জাম বা Williams cart রাখেন। দূরে গমনাগমনের জন্ত বড়

বোধনাথের পথ হইতে পাহাড়ের স্বাভাবিক দৃশ্য

ঘরের এই ব্যবস্থা। তাঞ্জাম বা Williams cart এক কথায় বলিতে গেলে ইজি-চেয়ার একটী ফ্রেমে বসান—সম্মুখে ও পিছনে হাতল আছে এবং চারি জন বাহকে উহা বহন করিয়া লইয়া যায়।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সকলেই বেশ সুস্থ হইয়া বোধনাথ বা বুদ্ধচৈত্য দেখিবার জন্ত অগ্রসর হইলাম। অপূ-দা এবার আমাদের যাওয়া না যাওয়া সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না; কেবল অনুসরণ করিলেন মাত্র। সূর্য্যদেব তখন ঠিক মাথার উপর—রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপে আমরা অতি অল্প পথ অতিক্রম করিতে না করিতেই সকলেই ক্রমশঃ ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিলাম। [illegible] রাস্তার দুই পার্শ্ব বিষ্ঠায় পূর্ণ; এই
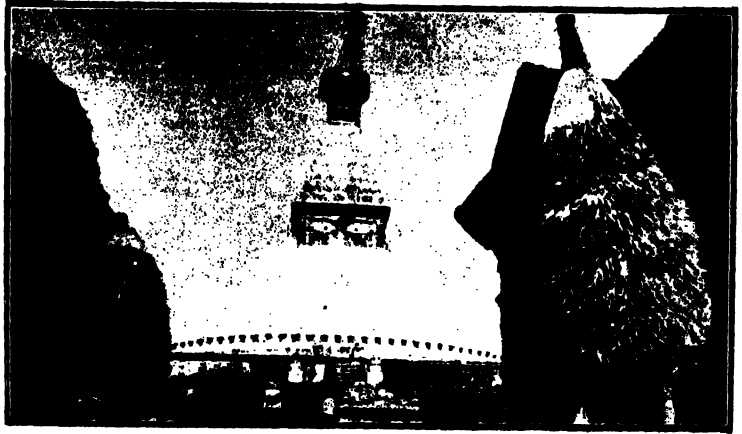
ভীষণ রৌদ্রতাপে দুর্গন্ধময় রাস্তা দিয়া যাইতে কি ভয়ানক যে কষ্ট বোধ হইতেছিল তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত বুঝিবার বা বুঝাইবার নহে। আমাদের মধ্যে অপূ-দা সর্ব্বাপেক্ষা বয়স্ক; এখন এই অবস্থায় তাঁহাকে আর কষ্ট দিয়া অগ্রসর হইব কি না এই রূপ আমরা আলোচনা করিতেছি, অপূ-দা সমস্তই শুনিতেছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তিনি একটী কথাও বলেন নাই। আমরা যখন তাঁহাকে বলিলাম অপূ-দা, চলুন এখান হইতেই আজ বাড়ী ফিরি, তিনি বলিলেন, তোমরা সব Young man, বল কি! এতখানি পথ এগিয়ে এসে আবার ফিরতে হ'বে? ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন—যতই বেলা হ'ক, না-দেখে আর ফেরা হবে না।" আমাদের পথ-প্রদর্শক ষষ্ঠীবাবুও

বোধচৈত্য বা বোধনাথ

আমাদের আশা দিলেন যে আর অল্প পথ ঐরূপ দুর্গন্ধময় এবং পরে ভাল রাস্তা পাওয়া যাইবে। গুহ্যকালীর মন্দির হইতে বুদ্ধচৈত্যের রাস্তা। পথ ভালই, কোথাও বিশেষ উচু নীচু নাই। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া আমরা একটি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। গ্রামের নাম

বোধনাথ বুদ্ধদেবের নামানুসারে হইয়াছে। পথিমধ্যে একটী স্বাভাবিক দৃশ্যের ছবি লইলাম—দূরে দুগ্ধফেননিভ তরঙ্গায়িত পর্ব্বতশৃঙ্গ গুলিতে সূর্য্য রশ্মি পড়িয়া এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে। তুষারাবৃত পর্ব্বতরাজি দ্বিপ্রহরের প্রখর সূর্য্য-কিরণে উৎফুল্ল হইয়া জগৎকে যেন তাহাদের বিচিত্র চাক-চিক্যের অপূর্ব্ব অফুরন্ত শোভা দেখাইতেছিল। যাহাহউক আমরা রৌদ্র মাথায় করিয়া পথশ্রান্ত পথিকের মত ধীরে ধীরে কোন প্রকারে বৌদ্ধ-স্তূপে পৌছিলাম। ইহাই বিখ্যাত স্বর্ণ বৌদ্ধ-স্তূপ।

এই স্তূপটীই নেপালে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। স্তূপটীর চতুর্দ্দিক্ উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে ভিতরে প্রবেশ করিবার পথ আছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া কতকটা ফাঁকা স্থান চতুর্দ্দিকে পড়িয়া আছে। প্রাচীরের গায়ে বাহিরে রাস্তার দিকে সারি সারি ঘুলঘুলি। প্রত্যেক ঘুলঘুলিটী প্রায় আড়াই ফুট লম্বা ও এক ফুট চওড়া এবং প্রত্যেক ঘুলঘুলিতে পাঁচটী করিয়া তামার চোঙ্গ (Cylinder)। প্রত্যেক চোঙ্গটীর মধ্যে লম্বালম্বি ভাবে একটী শলাকা এমন ভাবে বসান আছে যে চোঙ্গগুলিকে ইচ্ছামত ঘুরান যায়। চোঙ্গগুলির উপর উদ্গত অক্ষরে (*embossed*) নেওরীভাষায় বৌদ্ধ বীজমন্ত্র খোদাই করা। শুনিলাম প্রত্যেক তামার চোঙ্গের মধ্যে আবার বৌদ্ধমন্ত্র লেখা একটী করিয়া পুঁথি আছে। এই গুলিকে বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মচক্র (Prayer-wheel) বলে। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী তীর্থ-যাত্রীরা এই চক্রগুলি ঘুরাইয়া যথেষ্ট ধর্ম্ম অর্জ্জন করেন। এই চক্রগুলি যতই না কি ঘুরান যায়, ততই নির্ব্বাণ-লাভের পথ পরিষ্কার হইয়া পড়ে! স্তূপটী একটী গম্বুজের মত দেখিতে। ভিতরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বাহির হইতে 'বোধে'র একটী ছবি লইলাম। আমার ছবিটী ভাল তুলিতে পারি নাই, সেই-জন্য আমার বিশিষ্ট বন্ধুবর অধ্যাপক মঞ্জু বাবুর দেওয়া ছবিটীও দিলাম। ফটক পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেই চারিদিকে কতকটা স্থান খোলা পড়িয়া আছে এবং তাহার পরই স্তূপ। স্তূপের গায়েও পূর্ব্বোক্ত ভাবে চতুর্দ্দিকে তামার চোঙ্গ ; সর্ব্বসমেত ১০৮টী আছে। স্তূপটী দুইটী থাক হইয়া তাহার উপর গম্বুজ এবং গম্বুজের উপর স্বর্ণের চিত্র-বিচিত্র করা চারি-কোণ-বিশিষ্ট চূড়া। ইহার চারি দিকেই বুদ্ধদেবের মুখ ও চক্ষু আঁকা। কিন্তু নাকের স্থানে একটী '?' এই ভাবে জিজ্ঞাসার চিহ্ন। ইহার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। স্থানীয় লোকদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম যে, ইহা বুদ্ধদেবের তৃতীয় জ্ঞান-চক্ষুর প্রতীক। কিন্তু Percival Landon সাহেব
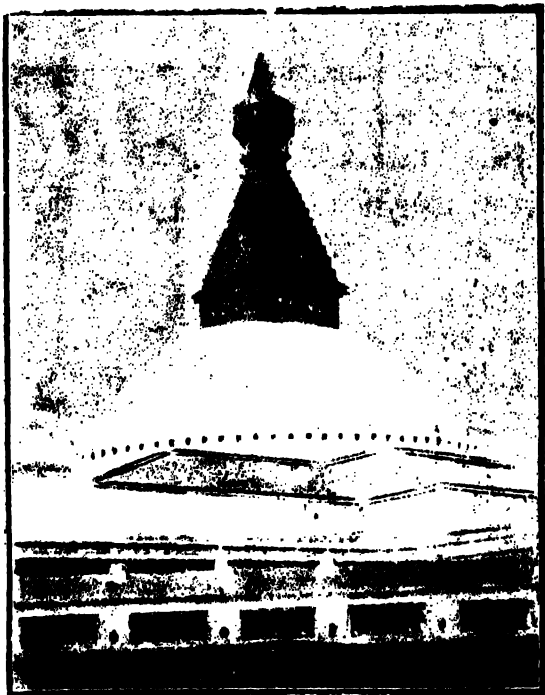
মঞ্জুবাবুর গৃহীত—বোধনাথের চিত্র

তাঁহার Nepal পুস্তকের ১ম ভাগের ২০৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"Scarcely less qnestioning is the "?" "Which Stands where the nose should be. Perhaps the Indian convention, which represented the upper eyelid of the Buddha with a droop at the centre, is responsible for a curious sense of detached contemplation or inquiry in the gaze of these great set pupils that would do credit to the Recording Angel".

চতুষ্কোণ-বিশিষ্ট চূড়ার উপরিভাগ সাধারণ মন্দিরের চূড়ার মতই, তবে ইহা স্বর্ণ-নির্ম্মিত। স্তূপে উঠিবার জন্য চারিদিকেই সিঁড়ি আছে। আমরা সকলে ভিতরে প্রবেশ

করিয়া স্তূপের উপর উঠিলাম এবং কিছুক্ষণ নির্ম্মল স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিয়া শ্রান্তি দূর করিলাম।

বৌদ্ধ-স্তূপের গম্বুজের ঠিক নীচেই চারিদিকে ১০৮টী ঘুলঘুলি আছে এবং প্রত্যেক ঘুলঘুলিতে একটী করিয়া বৌদ্ধ-দেবতা বা পাথরের সিদ্ধাচার্য্যের মূর্ত্তি খোদিত। বৌদ্ধ-সাধকেরা সাধনার ফলে বৌদ্ধ দেব-দেবীর যে মূর্ত্তি কল্পনা-নেত্রে দেখিয়াছেন সেই সেই বর্ণে শিল্পী মূর্ত্তিগুলি অনুরঞ্জিত করিয়াছেন। স্তূপটীর উত্তর, দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে চারিটী দেবতা আছেন। ইহা ছাড়া স্তূপের নীচে বোধের সীমানার মধ্যে অনেক ছোট ছোট পাথরের মূর্ত্তি ও পাথরের উপর নেওয়ারী বা সংস্কৃত অক্ষরে সম্ভবতঃ পালি ভাষায় লেখা ছোট ছোট পাথরের টুকরা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। পশ্চিম দিকের দ্বারের বাহিরে প্রাচীরের গায়েই একটী মন্দির। পুষ্পাচ্ছাদিত দেবতার গায়ে সিন্দুর এত বেশী মাখান যে মূর্ত্তিটী হিন্দু বা বৌদ্ধ দেবতা কিছুই বুঝা গেল না। নেপালের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায় বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবতা পাশাপাশি অবস্থান করিতেছেন। এমন কি কোথাও কোথাও একই মন্দিরে দুই ধর্ম্মের দেবতাই রহিয়াছেন। স্তূপটীর ব্যাস ২০০ হাতের কম নহে। তাহার উপর প্রকাণ্ড গম্বুজ এবং এই গম্বুজের ঠিক মাথার উপর একটী চূড়া-বিশিষ্ট সমচতুষ্কোণ স্তম্ভ। স্তম্ভটীর চারিদিকে মানুষের মুখ-চোখ আঁকা এবং ইহা স্বর্ণাবৃত। স্তম্ভ ও চূড়াটীর উচ্চতা একতলার কম নহে। চূড়াটী নানারূপ কারুকার্য্য-সুশোভিত ছবি দেখিলেই ইহার আয়তন ও উচ্চতা আশা করি বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। স্তূপের উপর হইতে কাঠমাণ্ড সহরটী অতীব সুন্দর দেখাইতেছিল। আমরা স্তূপের উপর হইতে নেপালের চতুর্দ্দিকের অপূর্ব্ব মনোরম শোভা দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে অনেকক্ষণ ধরিয়া উপভোগ করিয়াছিলাম।
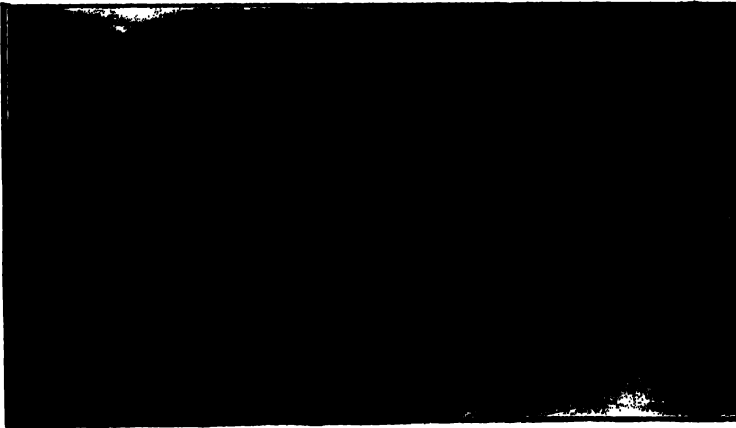
কালীবাবুর বাগানে ডাক্তারবাবুর ছেলে মেয়েরা

সিংহ-দরবারের গাড়ী-বারান্দা

সে দিন আমাদের বাটী ফিরিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। আমাদের বাটীর নিকটেই প্রকাণ্ড ময়দান। ময়দানটী নেপাল-সরকারের সৈন্যদিগের কুচকাওয়াজের (parade-ground) স্থান। নেপালী ভাষায় উহাকে 'তুঁড়িখেল' বলে। আমরা সেই দিন সন্ধ্যার সময় তুঁড়িখেলের নিকট একটু বেড়াইয়া আসিলাম।

পর দিন সকালে ডাক্তারবাবু আমাদিগকে রাজ-প্রাসাদ

দেখাইতে লইয়া যাইবেন ঠিক হইল, সেইজন্য আর দূরে কোথাও বেড়াইতে যাওয়া হইল না। আমরা আহারাদি শেষ করিয়া আন্দাজ বেলা ১০॥০টার সময় ডাক্তারবাবুর সহিত রাজ-প্রাসাদ অর্থাৎ সিংহ দরবার দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। বাহির হইবার পূর্ব্বেই ডাক্তারবাবুর পুত্রকন্যাগণ তাহাদের একটী ছবি তুলিয়া লইবার জন্য আমায় পেড়াপিড়ি করিতে লাগিল। কালীবাবু তাঁহার বাটীর মধ্যে একটী সুন্দর ফুল-বাগান করিয়া রাখিয়াছেন, আশে-পাশে নানা প্রকারের ফলের গাছ। বাগানটী তাঁহার সুরুচি ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের পরিচায়ক। বাগানের মধ্যস্থলে একটী গোলাকার চাতাল। আমি ছেলে-মেয়েদের লইয়া চাতালে দাঁড় করাইয়া একটী ছবি লইয়া রাজ-প্রাসাদ ও সিংহদরবার দেখিবার জন্য বাহির হইলাম।

এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল এখানে রাজ-প্রাসাদ বলিতে নেপালের রাজার বাসস্থান বুঝায় না। নেপালের রাজাকে মহারাজাধিরাজ (His Majesty the King of Nepal)। বলে এবং মহারাজ বলিতে নেপালের প্রধানমন্ত্রী মহারাজ চন্দ্র সমশের জঙ্গ বাহাদুরকে বুঝিতে হইবে (His Highness the Prime Minister of Nepal)। নেপালের প্রধান মন্ত্রীই "সর্ব্বেসর্ব্বা"—ইনিই দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। ধিরাজ মানব রূপে দেবতা-বিশেষ, তিনি সকলের পূজ্য নারায়ণ স্বরূপ, সেই জন্য তিনি ইচ্ছামত বাটীর বাহির হইতে পারেন না। ধিরাজের পৃথক্ একটী প্রকাণ্ড প্রাসাদ আছে। সেখানে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। তাঁহার প্রাসাদের বাহিরে আসিবার ইচ্ছা হইলে, প্রধান মন্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত বাহির হইবার উপায় নাই। ইহাই না কি দেশাচার!

সিংহ-দরবারের সম্মুখেই বহুসংখ্যক সজ্জিত সৈন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে। ভিতরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই বাহির হইতে একবার প্রকাণ্ড তোরণটী দেখিয়া লইলাম।

দরবার-হলের ভিতরের চিত্র

ফটকের দুই পার্শ্বে নেপালী শান্ত্রী-পাহারা দাঁড়াইয়া আছে। তোরণটী নানারূপ কারুকার্য্যে শোভিত ও আকারে প্রকাণ্ড। প্রবেশ-পথের দুই পার্শ্বে-ই আফিস—টাকা-পয়সা ও কাগজ পত্র লইয়া কর্ম্মচারীরা বিশেষ ব্যস্ত। শুনিলাম কর্ম্ম-চারীরা প্রায় সকলেই নেওয়ারী। তোরণ পার হইয়াই প্রশস্ত উঠান এবং উঠানের সম্মুখেই প্রকাণ্ড রাজদরবার। উঠানটীর মাঝখানে একটী লম্বাকৃতি চৌবাচ্ছা এবং চৌবাচ্ছার মধ্যস্থলে একটী সুন্দর ফোয়ারা হইতে সর্ব্বদাই ঝির ঝির করিয়া জল পড়িতেছে। চৌবাচ্ছায় লাল,নীল প্রভৃতি নানা রংএর মাছ ছাড়া আছে। যাঁহারা আগ্রার তাজমহল দেখিয়াছেন তাঁহারা এই চৌবাচ্ছার আকৃতি বেশ বুঝিতে পারিবেন। আমার মনে হয় ইহাও তাহারই অনুকরণে নির্ম্মিত! ফোয়ারা ও চৌবাচ্ছার সম্মুখে শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তর নির্ম্মিত বিশাল প্রাসাদ। প্রাসাদটী চারিতল এবং আকারে কলিকাতার লাটভবনের অন্ততঃ চতুর্গুণ। প্রাসাদের দ্বারে দুই জন দৌবারিক বন্দুক লইয়া পাহারা দিতেছে। আমাদের দেখিয়া এক জন নিকটে-আসিয়া ডাক্তারবাবুকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার নেপালী ভাষায় House Superintendentকে ডাকিয়া দিতে বলিলেন। আমি ইতি মধ্যে দ্বার মণ্ডপ বা গাড়ী বারান্দার (portico) একটী ছবি তুলিয়া লইলাম। ঐ সময়ে আলোর অভাবে ছবিটী ভাল উঠিল না। প্রাসাদ-তত্ত্বাবধায়ক আসিয়া আমাদের সকলকে অভিবাদন করিয়া দরবারে যাইবার দ্বার খুলিয়া দিলেন। প্রাসাদের

প্রত্যেক দ্রব্যই দেখিবার মত। আমরা মার্ব্বেলপ্রস্তরের সিঁড়ি দিয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম। নীচের ঘরটী নানা প্রকার আধুনিক বিলাতি আসবাবে হাল-ফ্যাসানে সজ্জিত। দ্বিতলে উঠিবার সময় সিঁড়ির পার্শ্বেই দেওয়ালে—মহারাজ ও আমাদের সপ্তম এডওয়ার্ড যখন Prince-of-Wales

সিংহ দরবার—সম্মুখের দৃশ্য

ছিলেন সেই সময়ে উভয়ে শীকার করিতে গিয়াছিলেন। সেই শীকারের ছবির তৈল-চিত্র সুন্দর ভাবে আঁকা। দেওয়ালের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ব্যাঘ্র, গণ্ডার প্রভৃতি শীকারের ছবি গুলি অঙ্কিত আছে। এ গুলি তাঁহাদের অসীম সাহসেরও দক্ষতার পরিচায়ক! উপরে উঠিয়া একটী ঘরে প্রবেশ করিলাম। তাহার চতুর্দ্দিকে নানা প্রকারের আরসি সাজান আছে এবং প্রত্যেক আরসিতে আমাদের প্রতিচ্ছবি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দেখাইতেছে। আমাদের ছবির বিকৃতি দেখিয়া আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই। কলিকাতার যে কোন মেলায় যাঁহারা কখন Laughing Gallery দেখিয়াছেন, তাঁহারাই ইহা বেশ বুঝিতে পারিবেন। ইহার পার্শ্বেই একটী ছোট ঘর এবং তাহার পরই দরবার হল। এই ঘরটীতে রাজার দরবার হয় এবং বিশেষ বিশেষ দরবারের সময় ধিরাজ ও মহারাজ দুই জনে দুই দিকে নির্দ্দিষ্ট সুবর্ণ আসনে বসেন। সভাসদদিগের বসিবার আসন ধিরাজ ও মহারাজ বাহাদুরের বসিবার সম্মুখভাগে। তাঁহারা সকলে নিম্নের শয্যার উপর বসিয়া থাকেন। এখানে এইটুকু মাত্র দেশী ধরণ। দরবার হলটী সম্পূর্ণ বিলাতি ধরণে সাজান, কেবল মাত্র মাঝে মাঝে বাঁধান ব্যাঘ্র-চর্ম্ম মেঝের উপর পাতা আছে। আসবাব-পত্র যাহা কিছু সমস্তই বিলাতি এবং বহুমূল্য বলিয়াই মনে হইল। হলের মধ্যস্থলে একটী ইলেক্‌ট্রীক্ আলোর ফোয়ারা বা গাছ আছে—আলোর দুই পার্শ্বের দেওয়ালে আরসির উপর আলোর রশ্মি পড়িয়া ঘরটী না কি অতি সুন্দর দেখায়। ধিরাজ এবং মহারাজের বসিবার স্থানের সম্মুখেই দুইটী মার্ব্বেলপ্রস্তরের আবক্ষ-প্রতিমূর্ত্তি আছে—একটী আমাদের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড ও অপরটী তাঁহার মহিষীর। হলটীর চারিদিকে আসবাবের আধিক্যে যেন একটু "জবড়জঙ্গ" দেখাইতে-

সিংহদরবার-গাড়ীবারান্দার উপরের দৃশ্য
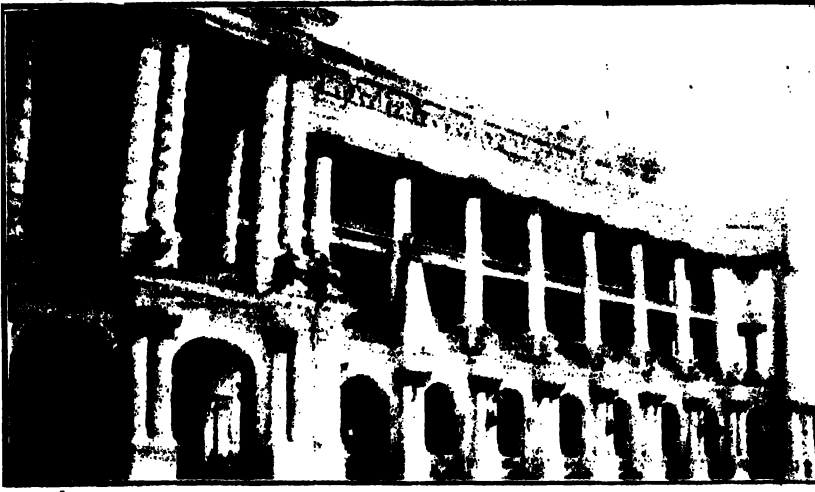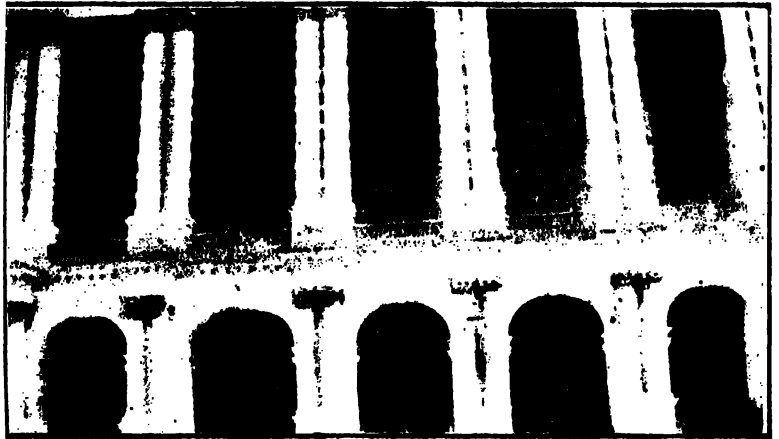
ছিল। যাহাহউক আমি নেপাল রাজের দরবারের একটী ছবি তুলিয়া লইলাম। তুলিবার পর অবশ্য তত্বাবধায়ক হলের ছবি তুলিতে বারণ করিয়াছিলেন। ইহার পার্শ্বেও আবার সাজান ঘর। ঘরের কোণে বাহিরের দিকে বারান্দায় আসিলাম। বারান্দা শ্বেত মার্ব্বেলে মোড়া বলিলেও চলে—মেঝে, থামে, এমন কি এক স্থানে দেওয়ালেও মার্ব্বেল পাথর বসান হইয়াছে। এখানে আসবাবের আতিশয্য না থাকায় আমার বড়ই সুন্দর লাগিতেছিল। মোট-কথায় প্রাসাদের চতুর্দ্দিকেই বিলাতি আসবাবে ভরা এবং তাহার সহিত নানারূপ মৃগয়ার চিহ্ন বর্ত্তমান। বাঘছাল, ভাল্লুকের ছাল, হরিণের ছাল, গণ্ডারের পা, মুখ ইত্যাদি শীকারলব্ধ জিনিস গুলি (trophies) বাটীর সর্ব্বত্রই সাজান আছে।

সিংহদরবার—পূর্ব্বদিকের দৃশ্য

সিংহদরবার—পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিমদিকের সম্মুখভাগের দৃশ্য

আমরা দ্বিতলে দরবার হল পর্য্যন্ত দেখিবার অধিকার পাইয়াছিলাম। অন্য তলে বা অন্যান্য ঘর কি ভাবে সজ্জিত বুঝিতে পারিলাম না এবং নীচে নামিয়া আসিয়া রাজ-প্রাসাদের চতুর্দ্দিক্ দেখিবার জন্য ডাক্তারবাবু একটী গাড়ী আনাইয়া আমাদিগকে লইয়া চলিলেন। প্রাসাদের সীমানা (Compound) এত প্রকাণ্ড যে গাড়ী করিয়া ঘুরিয়া আসিতে আমাদের তিন কোয়ার্টারের বেশী সময় লাগিয়াছিল। সীমানার মধ্যে এক দিকে কতকগুলি বন্য জীব-জন্তু—ব্যাঘ্র ভল্লুক, জিরাফ, হস্তী, উট প্রভৃতি নানাপ্রকারের জন্তু রাখিয়া একটী ছোটখাট চিড়িয়াখানা করা হইয়াছে। প্রাসাদের সীমানার মধ্যেই আরও ছোট ছোট বাড়ী আছে। মহারাজের পুত্র ও পৌত্রদিগের পড়িববার জন্য একটী স্কুলবাটী আছে। প্রাসাদের পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে নানারূপ ফল-ফুলের গাছ দিয়া বাগানটী আধুনিক ফ্যাসেনে সুসজ্জিত। প্রাসাদের পশ্চাৎ দিকে ফল-ফুলের গাছ আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই শাক-সব্জীর চাষ হইতেছে দেখিলাম। প্রাসাদের চতুর্দ্দিক্ দিয়া রাস্তাটী ঢেউ খেলিয়া উঁচু নীচু হইয়া চলিয়াছে। প্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া চারিদিক হইতে চারিটী চিত্র বিভিন্ন চিত্র তুলিলাম। সিংহ-দরজার সম্মুখভাগের চিত্র অতীব মনোরম ও জমকাল। স্তম্ভগুলি 'গথিক' আদর্শ স্তম্ভের মত। বেশ কারুকার্য্য আছে। তক্ষণ-শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন। সিংহদরজার গাড়ীবারান্দার উপরে [illegible]

গুলি নয়ন-মোহকর। এইগুলি যেন বৃক্ষের মত দাঁড়াইয়া আছে। ছোট ব্রততীবৃক্ষের উপর নির্ভর করিয়া ফল-ফুল-সমন্বিত হইয়া শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। বাস্তবিক এগুলি দেখিয়া অনেকক্ষণ নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে হইল উৎসাহ পাইলে আজও ভারতীয় শিল্পী এমন নিখুঁত কারুকার্য্য করিতে পারে যাহা জগতের সমক্ষে গর্ব্বভরে দাঁড়াইয়া বলিতে পারে--জগতের যেখানে যা কিছু তক্ষণ-কার্য্যের শোভন ও সুষ্ঠু নিদর্শন আছে, তাহার তুলনায় ইহা অকিঞ্চিৎকর নয়। তারপর আমরা সিংহ-দরবারের পূর্ব্ব দিকের চিত্র তুলিলাম। ইহার পশ্চাদ্ভাগেই মন্ত্রিবরের আবাস-স্থল। এখানকার কারুকার্য্য অনন্যদুর্ল্লভ। ছোট ব্রাউনি ক্যামেরায় সিংহ দরবারের সমগ্র চিত্র লইবার কোন-রূপ সুবিধা না থাকায় অগত্যা 'মধু অভাবে গুড়ং দদ্যাৎ' এই নীতি অনুসরণ করিয়া সিংহ-দরবারের পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিমদিকের সম্মুখভাগের একটী দৃশ্য তুলিয়া লইলাম। এখানেও শিল্পীর অদ্ভুত পরিকল্পনা ও তক্ষণ-শিল্পের সূক্ষ্মতা ও স্তম্ভগুলির দূরত্বের সমতা বজায় রাখিয়া শিল্পী গৃহ-নির্ম্মাণ-শাস্ত্রের রীতির অনুসরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কারুকার্য্যের আধিক্যবশতঃ এবং প্রাসাদের বিশালত্বের জন্যও এই সূক্ষ্ম কারুকার্য্য তত চমকপ্রদ করিতে পারেন নাই। ইহার কারুকার্য্য সুন্দর হইলেও বিশাল দরবারের ভিতর তেমন মানান-সই হয় নাই বলিয়া আমাদের ধারণা। অবশ্য এ-কথা আমাদের মত অ-শিল্পীর মুখে শোভন না হইলেও যে ভাবটা প্রাণে অনুভব করিয়াছি তাহাই সুধীজন-সমক্ষে ব্যক্ত করিলাম।

সিংহ-দরবার দেখিয়া সে দিনের মত বাড়ী ফিরিলাম।

অসম্পূর্ণ

(গল্প)

[শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এম এ]

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাহার একটা রচনায় পড়িয়াছিলাম (বোধ হয় হ্যাজ্‌লিট্‌-এর) মানুষ মাত্রেই কবি;—যে-কৃষক চাষ করিতে করিতে নবতৃণোদ্গম লক্ষ্য করে ও যে জ্যোতির্ব্বিদ অন্তহীন আকাশে রহস্যান্ধকারে দুর্ভেদ্যতা অতিক্রম করিয়া নূতন তারার জন্ম দেখে—তাহাদের আনন্দ কবিরই আনন্দ। (চ্যাপমেনের 'হোমার' পড়িয়া কীট্‌স্‌-ও এমনি করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিল।) কসরৎ করিয়া কবিতা লিখিবার অভ্যাস না করিলেও আমি এক দিন কবি হইয়া উঠিলাম, যেদিন এই ধূলার জগৎকে আর কঠিন ও কদর্য্য মনে হইল না, প্রতি রুক্ষ নিরানন্দ দিনটী কমলাক্ষীর প্রদশায়ী শতদলের পাপড়ির মত সুকোমল ও সৌরভসিক্ত হইয়া উঠিল,—আমার অস্তিত্ব যেন আকশের মতই অসীমবিস্তৃত,—আমার মন এই আকাশ পারাবারের পার খুঁজিতে যেন দুই ব্যাকুল পাখা প্রসারিত করিয়া দিয়াছে!

এই ভাবটা আমাকে কখন্ আক্রমণ করিল তাহা বুঝিতে তোমাদের নিশ্চয়ই দেরি হইবে না, মানে—আমি যখন ভালবাসিলাম। (ভয় নাই, বিবাহ করিয়াই ভালবাসিলাম) সে একটা আশ্চর্য্য অনুভূতি,—সেই একই হৃদয়াবেগ নিয়া বিধাতাও বোধ হয় রাত্রির অন্ধকারকে এমন সুন্দর করিয়াছেন,—বাসররাত্রে পার্শ্বশয়ানা নববধূটীকে একটি মূর্ত্তিমতী শুভসন্ধ্যাকালীন শঙ্খধ্বনি বলিয়া মনে হইল। মনে হইল, স্নেহ-কে আমি এক মুহূর্ত্তেই এত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি যে, পৃথিবীতে নির্জ্জন বলিতে আমার কাছে আর কোন স্থান নাই,—স্নেহ-কে ছাড়িয়া

আসিলেও আকাশের নীচেকার সমস্ত নিঃশব্দতা একটী লাবণ্য-ললিতা নারীমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আমার সঙ্গে কেবলই কথা কহিতে থাকিবে। Castighone ঠিকই বলিয়াছেন, যে-বিধাতাকে আমরা কখনও দেখি নাই সেই বিধাতাকে আমরা নারীর মধ্যেই দেখিয়াছি।

শতকরা নব্বুই জন বাঙালি ছেলের মতই বি, এ পাশ করিয়া ল' লইয়াছিলাম, কিন্তু এক বৎসর না চুকিতেই মা'র এমন অসুখ হইয়া পড়িল যে, রান্নাঘরের জন্য একটা পাচিকা ও মা'র রোগশয্যাসমীপে একটী নার্সের দরকার হইল। অতএব আপত্তি আর টিঁকিল না, আমার চির-কৌমার্য্যের গৌরবময় উত্তুঙ্গ পর্ব্বতটা নিমেষের মধ্যে গুঁড়া হইয়া গেল; একেবারে বাস্তবতার সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিলাম। সীমাবদ্ধ কুঠুরীর জানালা দিয়া আকাশের যে স্বল্পপরিমিত অংশটুকু একটা বৃহত্তর প্রকাশের ইঙ্গিত করে, তাহারই অনুপাতে জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-গুলিকে বড় করিয়াছিলাম, কিন্তু স্নেহ আসিয়া সেই জানালা বন্ধ করিয়া দিল। সেই ছোট ঘরটাতে স্নেহ একটি স্নেহপ্রদীপ জ্বালিল বটে, কিন্তু আকাশের তারা আর দেখা গেল না।

সেটা আমার পক্ষে কম দুঃখের কথা নহে, কিন্তু শেলির স্বপ্ন ছাড়িয়া যে ফোর্ডের স্বপ্ন দেখিব, মস্তিষ্কে তেমন ভাবাবেগও ছিল না হয় ত। তাই বিনা মূল্যে যাহা কুড়াইয়া পাইয়াছি তাহা লইয়াই জীবনের হাটে আমাকে সওদা করিতে হইবে; কিন্তু বৎসর ফুরাইতে না ফুরাতেই সেই পাথেয়ও ফুরাইয়া গেল। অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে বলিয়াই আকাশ আজিও মর্ত্ত্যবাসীর কাছে একটি সুদূর ইঙ্গিতের মত অনির্ব্বচনীয় সুন্দর রহিয়াছে, এবং এই একই কারণের বিপরীত অর্থে স্নেহ আমার কাছে নিরাবরণ ও নিষ্প্রভ হইয়া গেছে।

কথাটাকে খুব ঘনীভূত করিয়া বলিলাম বটে, কিন্তু ইহার চেয়ে ব্যক্ততর করিলেও কথাটা এমনিই সুবোধ্য থাকিত। বরং অনেক সময় উদাহরণ দিয়া ফেনাইয়া বলিলেই কথার সুস্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ অর্থটার উপলব্ধি হয় না। প্রথম যখন স্নেহ-কে পাইয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল,—যদি পরিতাম ত এই অনন্তকালের ঘড়িটা একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া এই চঞ্চল আনন্দক্ষণটাকেই অবিনশ্বর করিয়া রাখিতাম; এখন মনে হইতেছে যেন একটা আতসবাজির মত এই বৎসরটা একটা রঙের আর্ত্তনাদ করিয়া শূন্যে লীন হইয়া গেল!

ব্যাপারটা আরো সঙিন হইয়া উঠিল যখন শুনিলাম ল'র পাশের লিষ্টে আমার নামের পাশে নীল পেনসিলে একটি চিকে দেওয়া হইয়াছে; ছ'মাস পরে ফের পরীক্ষা দিয়াও সেই চিকে-টা সরাইতে পারিলাম না,- যীশু খৃষ্টের গলায় ক্রশের বোঝা এমনিই দুর্ব্বহ হইয়া উঠিলেও অপমানজনক হয় নাই। সব চেয়ে খারাপ লাগিল যখন শুনিতে পাইলাম আমাদের সংসারের আনাচে-কানাচে এইরূপ কানাঘুষা চলিতেছে যে স্নেহ-র স্নেহাধিক্যের জন্যই আমার এই দুর্গতি হইয়াছে। রাসবিহারী ঘোষকে মনে মনে নমস্কার করিয়া সরিয়া আসিলাম; স্নেহ জিজ্ঞাসা করিল—এখন কি করবে?

একটু রুক্ষ হইয়াই বলিলাম—তোমাকে বিয়ে না করলে এ-প্রশ্ন আমার নিজেকেও করতে হ'ত না, কিন্তু যে খোলা দরজা দিয়ে তুমি এলে তোমারই পদানুসরণ করে' নৈরাশ্য এল, দরিদ্রতা এল—

স্নেহও কঠিন হইতে জানে। কহিল—আমাকে বর্জ্জন করবার মত সৎসাহস যদি তোমার থাকে এবং সেই সঙ্গে যদি দারিদ্র্যমোচন করবার প্রতিজ্ঞার অধিকারী হও, যাও না আমাকে ছেড়ে। আমি হ'লে বাড়ীতে বসে' বসে' সিগরেট পুড়িয়ে আলসেমি করতাম না।

কৌতূহলী হইয়া কহিলাম—কি করতে?

— ভাগ্য তৈরি করতে বেরিয়ে পড়তাম।যে দুঃসাহসে ভর করে' মানুষ নিজের দেহ থেকে অভিজ্ঞতা পেয়ে যন্ত্র গড়েছে সেই সাহসে আমার মন রসিয়ে নিতাম, পরিশ্রমের স্বেদের মধ্যেই যে আনন্দের মূল্য আছে তার তুলনা কোথায়?

স্ত্রীর বক্তৃতায় উৎসাহিত হইয়া বাড়ীর বাহির হইলাম বটে, কিন্তু একটা সামান্য ইস্কুল মাষ্টারি ছাড়া আর কিছুই জুটাইতে পারিলাম না। ফরাসীবিপ্লবের ইতিহাস পড়িতে পড়িতে কবে ভাবিয়াছিলাম যে আমাকে তরবারির পরিবর্ত্তে সামান্য একটা বাঁশের কঞ্চি লইয়া বসিতে হইবে, শেলির চোখ দিয়া যে এমিলিয়া ভিভিয়ানিকে দেখিয়াছিলাম সে আজ শুধু একটা ব্যাকরণের সূত্রে হইয়া

থাকিবে ; বন্দী প্রমিথিয়ুসের দুঃখের সঙ্গে নিজের অকিঞ্চিৎকর দুঃখের তুলনা পর্য্যন্ত চলিবে না ?

তাই সই ; এত সহজে দমিবার পাত্র আমি নই, মাষ্টারি করিতে করিতেই এম-এ-টা পাশ করিয়া লইব (এততেও আমার পাশ করিবার মোহ কাটিল না), চাই কি, তার পরে একটা ভাল চাকুরিও মিলিতে পারে। তাই মনে বল সঞ্চয় করিয়া কাজে নামিয়া গেলাম, স্নেহ-ও সংসারের সর্ব্বত্র তাহার অন্তরমধু পরিবেষণ করিতে লাগিল। দাদা আজ প্রায় পনেরো বৎসর বেকার ভা'বে বসিয়া বসিয়া ভাত গিলিতেছেন, বৌদিদি সন্তানের জনতার মধ্যে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া আছেন, ওয়ার্ডসোয়ার্থের কথাটা ঘুরাইয়া লইলে স্নেহ-ই যেন "The Very pulse of the machine !" কিন্তু মনে হয়, তারপর ? এই এক ঘেয়েমির শ্রান্তি হইতে কোথাও কোনও দিন মুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। স্নেহ তাহার চোখে নিরানন্দতর ভবিষ্যতের আশঙ্কাসূচক একটি সংকেত লইয়া কাছে আসে। বলি—আমাদের সমাজ থেকে একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রথা উঠিয়ে দেওয়া উচিত।

পাছে শুনিতে খারাপ হয় এই ভয়ে স্নেহ প্রথমে কথাটার প্রতিবাদ করে এবং ঐ কথার স্বপক্ষে যত ভাবপ্রবণ যুক্তি আছে সব খাড়া করিতে থাকে, কিন্তু আমার বিদ্রূপপূর্ণ প্রচণ্ড তর্কের ঝড়ে সেই সব খুঁটিগুলি ভাঙ্গিয়া পড়ে। বলি—অনেকগুলি আধ-মরা প্রাণ থেকে একটা তেজী সবল প্রাণ ঢের বেশি কাম্য,—এবং এতগুলি ব্যর্থ প্রাণ টিঁকিয়ে রাখ্‌বার জন্য আমাকে আর তোমাকে তিলে তিলে আত্মবলি দিতে হবে আমি এই যুক্তির রসগ্রাহী নই। রুষিয়ায় হ'লে—

স্নেহ হাসিয়া বলে—ভাগ্যিস্ এটা বাঙ্‌লা দেশ,—যেখানে বুড়ো বাপ-মা'র পদসেবা করে' বৈকুণ্ঠলাভ করবার বিধি আছে, অসমর্থ ও অসুস্থ পরিজনের সাহায্য করে' আত্ম-তৃপ্তি পাবার অধিকার আছে। এই দেশই আমার ভাল, এর সংস্কার, এর প্রথা। আমাকে ঠাট্টা করে' লাভ নেই, তবে তোমার যদি একান্তই ইচ্ছা থাকে, তুমি যেন আস্‌চে জন্মে রুষিয়াতেই গিয়ে জন্ম [illegible] কোরো; আমি এই বাঙলা দেশেরই পথ চিনে আস্‌ব 'খন।

বলিয়া বসিলাম—কিন্তু রুষিয়ার ছেলের সঙ্গে বাঙালি মেয়ের বিয়ে হবে কি করে' ? আস্‌চে জন্মে তোমাদের বাঙলা দেশের আইন কানুন বদ্‌লে যাবে না কি ?

স্নেহ চুপ করিয়া রহিল। কোন জানি মনে হইল স্নেহ আমাকে বিবাহ করিয়া সম্পূর্ণ সুখী হয় নাই,—এই ভাবটা আমার মনে উঠিতে পারে এই সন্দেহ করিয়াই তাড়াতাড়ি কহিল—কিন্তু, আমি পরজন্মে বিশ্বাস করি না, আমি ইহকালে এত ভাল ভাবে আমার কাজ করে যাব, এত নিষ্ঠা ও পবিত্রতার সঙ্গে যে মৃত্যুর পরে আমার নির্ব্বাণ পেতে একটুও দেরি হবে না।

একটা আগন্তুক বিড়ালের আবির্ভাবে রান্নাঘরে কি-একটা উৎপাতের সৃষ্টি হইয়াছে, নীচে হইতে মা চেঁচাইয়া উঠিয়া স্নেহ-কে বাক্যবাণে জর্জ্জর করিতেছেন, (একটু কল্পনা করিলেই তোমরা তা বুঝিতে পারিবে) স্নেহ তাড়াতাড়ি আমার জামা-সেলাই বন্ধ করিয়া ছুটিয়া গেল। উহার চোখে ইহার আগে এমন নিরুৎসাহ অসহায় চাহনি দেখি নাই। উহাকে বাঁচিতে হইবে, কিসের জন্য বাঁচিতে হইবে,—সব চেয়ে বেদনার কথা, উহার মধ্যে একটি তপস্যানিরতা বৈরাগিনী আছে, খাঁচার পাখীর মত খাঁচায় থাকিতে থাকিতে দুই পাখা এখনও পঙ্গু করিতে পারে নাই। পঙ্গুতাপ্রাপ্ত হইলেই স্নেহ বাঁচিয়া যাইত,—তবে ভরসার কথা স্নেহ সেই দিকেই ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। আমিই ত উহার চিকিৎসক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমার বিবাহের সময়-ই গিরীনের সঙ্গে আমার পরিচয় ও সৌহার্দ্দ্য হইয়াছিল,—গিরীন স্নেহ'র দূর সম্পর্কের কি-রকম মামা হয় বোধ হয়। সম্প্রতি সে ষ্টেট্-স্কলারশিপ পাইয়া বিলাত যাইতেছে এবং সেই বিদেশ-যাত্রারই প্রাক্কালে বিনা-খবরে আমাদের বাড়িতে আসিয়া উঠিল। আমি ও স্নেহ উভয়েই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম।

সমস্ত দিন কি হাসি ও খুসির মধ্য দিয়া কাটিল তাহার সবিস্তার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। এইটুকু বলিলেই চলিবে যে আমি আর স্নেহ দুই জনেই মানসিক স্বাস্থ্য পাইয়া সুন্দর হইয়া উঠিয়াছি—গুমটের পর যেন একটু ভিজা হাওয়া আসিল। ঘর বেশি ছিল না বলিয়া

গিরীনকে আমাদেরই ঘরের পার্শ্ববর্ত্তী বারান্দাতে বিছানা করিয়া দেওয়া হইল,—আমাদের ঘরের দরজা ও জানলা-গুলি খোলাই রহিল অবশ্য। স্নেহ যে কখন্ শুইবে তাহার হিসাব নাই, সারাদিন ছেলে ঠেঙাইয়া আসিয়া এখন ঘুমে আমার চোখ ভাঙিয়া পড়িতেছে—তাহারই এক ফাঁকে দেখিলাম স্নেহ মেঝেতে মাদুর পাতিতেছে। মধ্য রাত্রে ঘুম ভাঙিতেই দেখি স্নেহ ঘরে নাই, বারান্দায় গিয়া গিরীনের সঙ্গে স্বাভাবিক অনুচ্চ কণ্ঠে গল্প করিতেছে। সমস্ত দৃশ্যটি মনে মনে কল্পনা করিয়া আমার কি যে ভাল লাগিল তাহা বলিবার নয়। নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা নিয়া গল্প করিয়া করিয়া রাত্রি কাটাইতে আমি স্নেহকে ইহার আগে কোনও দিন অনুমতি দিই নাই বলিয়া আমার অনুতাপ হইতেছিল। উহারা সাহিত্য সম্বন্ধে কথা বলিতেছে :

স্নেহ

তুমি এখন ঘুমবার চেষ্টা কর, কাল ভোর হ'তে না হ'তেই তোমার ট্রেণ,—রাত অনেক হ'য়ে গেল।

গিরীন

তুমি অত্যন্ত ছোট পৃথিবীতে বাস কর, দেখছি তোমাদের এখেনে অন্ধকার হ'লেও পৃথিবীর আর এক পিঠে এখন খাসা দিনের আলো, টাট্‌কা রোদ। তোমরা বুঝি রাতের তারা দেখলেই দিনের সূর্য্যকে ভুলে যাও, একবার বর্ষা নাম্‌লেই আর গ্রীষ্মকে মনে রাখ না,—তোমাদের স্মৃতি এত ক্ষীণ, ভালবাসা এত স্বল্পায়! আচ্ছা, তুমি বুঝি পড়াশুনো আজকাল ছেড়ে দিয়েছ?

স্নেহ

হাঁ, পড়াশুনো! সারাদিন খেটে খেটে ঘুমবার সময় পাই না, আবার পড়ব! ইস্কুলে যখন পড়তাম, তখন মনে আছে ঘরে আলো জেলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছি, আলো নিবিয়ে দিয়ে আকাশের তারার দিকে চেয়ে মনে হয়েছে কবিতা পড়া আমার তখনও শেষ হয় নি।

গিরীন

রাতে কবিতা পড়তে? তুমি বাঙালি-বুদ্ধির বিশেষত্ব বজায় রেখেছ দেখছি, আমি কিন্তু রাত জেগে জ্যোতিষ-শাস্ত্র পড়ি, তার মানে এই কোরো না যে মধ্যাকাশবিহারী তারা দেখে আমার কারো চোখ মনে পড়ে। আচ্ছা, বিলেত গেলে তোমাকে নতুন নতুন বই পাঠাব খ'ন, সময় করে একটু একটু পোড়ো,—ঐ বই গুলিকেই তোমার অচলায়তনের বাতায়ন কোরো। শুনেছ আজকাল বাঙলা দেশে নতুন সাহিত্য নিয়ে একটা গোলমাল চলেছে—

স্নেহ

শুনেছি একটু একটু; 'ভাল করে' পড়িনি। তবে শুন্‌ছি ঐ সাহিত্য সাময়িক উত্তেজনার সাহিত্য, ও টিঁকবে না।

গিরীন

(হাসিয়া) তুমি যে ভারি মুরুব্বির মত কথা বল্‌ছ, যেন কোনো সস্তা সমালোচকের ধার-করা কথা। টেঁকা না টেঁকাটা সাহিত্য-বিচারের একটা টেক্‌নিকাল কথা,—ক্লাসিকাল্ হওয়াই সাহিত্যে অমর হওয়া নয়। ধর পোপ, তুমি বল্‌বে হয় ত উনি বেঁচে নেই, ইতিহাসের পাতায় নাম থাক্‌লে কি হ'বে—কিন্তু আমি বল্‌ব উনি বেঁচে আছেন, ওঁর থেকে আমি রসগ্রহণ করেছি, সেই সংযম, সেই দৃঢ়তা, সেই স্পষ্টতা—

স্নেহ

সস্তা সমালোচক বল্‌ছ কি?—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। তা ছাড়া তুমি কথাটার মানেই বোঝনি।

গিরীন

জানি, তুমি বল্‌বে সাময়িক সমস্যা নিয়ে যে সাহিত্য তার আয়ুষ্কাল সেই সমস্যার স্থায়িত্ব দিয়েই নির্ণীত হবে—স্থানীয় সমস্যা নিয়েও যে উঁচুদরের সাহিত্য হ'তে পারে গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দার মত কিন্তু তাই। কিন্তু সমস্যা আছে বলেই গর্কি বা ওয়েল্‌সের সাহিত্য বাতিল হ'য়ে যাবে এত বড় আস্পর্দ্ধার কথা বর্ত্তমানের কোনো মানুষের মুখেই মানায় না! দেখতে হবে সমস্যার জঞ্জাল ভেদ করে সেটা সত্যিকারের সাহিত্য রচনা হয়েছে কি না। ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শবাদের সমস্যা আছে বলেই 'গোরা' সাহিত্য রচনা হিসেবে অসার্থক এ কথা আমি বলি নে। ধর 'যোগাযোগ'—তার যে সমস্যা সে বিশেষ করে বিংশ-শতাব্দীর,—একটী ক্ষীণা সুকুমার মেয়ে কুমু এক স্থূল মাংসপিণ্ড মধুসূদনকে ভালবাসতে বাধ্য হচ্ছে—হয় ত আমরা দেখব একবিংশ শতাব্দীর সেই আধ্যাত্মিকগুণ-

সম্পন্না কুমু নিজে যেচে স্বয়ম্বরা হচ্ছে, নিজে সানন্দে সন্তানধারণ করছে— তখন কোথায় থাকবে যোগাযোগের সমস্যা? সেই জন্যই কি রবীন্দ্রনাথ সে যুগে back-number হ'য়ে পড়বেন না? তুমি বল্বে, না, কেন না সেই সঙ্কীর্ণ বিষয় বস্তু ছাড়িয়ে ও যোগাযোগের হয় ত একটা চিরন্তন আবেদন আছে। "বিসর্জ্জন" নাটকের পশুবলি সমস্যা ত আমাদের যুগেই লোপ পেতে বসেছে, তার জন্য কি ঐ নাটকের মৃত্যু ঘট্বে? সমস্যা ছাড়া ওতে কি আর কোনো পদার্থ নেই? Similarly, গর্কি *On the Raft* ও *Mother*এর লেখক হ'লেও কিংবা *Willam Chisold* লিখেও ওয়েল্‌স্ তাদের মধ্যেই এমন কিছু সৃষ্টি করেছেন যা হয়ত কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে চল্‌বে। অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ এই ভবিষ্যৎ, মেরিডিথ এককালে জর্জ ইলিয়টকে স্বল্লায়ু সাহিত্যিক বলে' ঠাট্টা ক'রেছিলেন, কিন্তু খবরের কাগজে দেখতে পাই ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে মেরিডিথের শতবার্ষিকীর দিনে লোকই হয় নি। *Return of the Native* বেরুলে *Athenaeum* কাগজ হার্ডিকে কি গাল-টাই দিয়েছিল, কিন্তু কে জানে হার্ডি সম্বন্ধে সেই অবিবেচনাপ্রসূত মতটাই ভবিষ্যতে স্থায়ী হবে কি না।

স্নেহ

পড়ি না পড়ি না ক'রেও সে দিন একটা বই কিনে ছিলাম খবরের কাগজে সমালোচনা পড়ে,—বইটার নাম *All Quiet on the Western front*, তুমি পড়েছ? ধর সেই বইটা,—যুদ্ধ নিয়ে লেখা, তার নিষ্ঠুর বীভৎসতা, গ্লানি আর উৎপীড়ন। টি'ক্‌বে ও? এর আগে যুদ্ধ নিয়ে কাউকে কোন উপন্যাস লিখতে দেখেছ, এমন শ্রান্তিকর বর্ণনা পড়েছ কোথাও?

গিরীন

আগে যুদ্ধ নিয়ে সবিস্তারে এমন জোরালো ও অভিনব উপন্যাস হয়নি বলেই' যে এ উপন্যাস টি'ক্‌বে না এ যুক্তি লজিক্ দিয়ে সাব্যস্ত হবার নয়। তোমার লীগ অব নেশন্‌স্ ম্যালেরিয়া তাড়াতে পার্‌লেও যুদ্ধ তাড়াতে পারবে না। মিলেনিয়াম্ ও ডিস্‌আর্মমেণ্ট—দুইই স্বপ্ন। অতএব মজুর বা কুলির জীবনের সমস্যা সত্ত্বেও কোনো উপন্যাস যদি সত্যিকারের রসসমৃদ্ধি লাভ করে, কে তাকে মারবে শুনি? একমাত্র সে,যে সমস্ত না পড়ে'ই তাড়াতাড়ি বিচার কর্‌তে বস্‌বে।

স্নেহ

(বাধা দিয়া) কিন্তু গল্‌সোয়ার্দির *Forsyte Saga*,—অদ্ভুত কীর্ত্তি! ভিক্টোরীয় যুগ অতিক্রম করে' এসে এই বিংশশতাব্দীতে পা দিয়েও একটি বারো যুদ্ধের নিদারুণ অসহ্য বর্ণনা করেন নি,—খালি যুদ্ধাবসানের পর তার নিরানন্দতা বা বৈফল্যের ইঙ্গিত করেছেন—তাতেই তাঁর সৃষ্টি চিরন্তন ঐশ্বর্য্য-লাভের অধিকারী হয়েছে।

গিরীন

যুগান্তরে *Forsyte Saga*র সে মহিমারও হ্রাস হ'তে পারে, স্নেহ। জনষ্টনের শেক্‌স্‌পীয়ার ও সুইন্‌বার্ণের শেক্‌স্‌পীয়ার কি একই ব্যক্তি? সেই শেক্‌স্‌পীয়ার-ই কি ফের বার্ণার্ড শ'র হাতে পড়ে' রং বদ্‌লান নি? ভিক্টোরীয় যুগে ব্রাউনিঙের কি খ্যাতি ছিল?—বায়রণের খ্যাতি কি? সমস্ত ইউরোপ গ্রাস করে' ছিল না? এলিজাবেথান্ যুগের হ্যাম্‌লেট-নাটকে হয়ত ভূতপ্রেত বা 'নাটকের মধ্যে নাটকের' সার্থকতা ছিল কিন্তু এ যুগে তার মূল্য কোথায়? সারা ইংলণ্ড ঘুরে তুমি একটী ওফিলিয়ার দেখা পাবে? কিন্তু আমাদের এই বাঙলা দেশে সমস্ত মেয়েই কি এক অর্থে ওফিলিয়া নয়?—অভিভাবকের আদেশ মাথায় করে' কি সবাই হেঁট হ'য়ে বলে না 'I shall obey my Lord?' কোনো মেয়ে কি কোনো পুরুষকে বুদ্ধি দিয়ে বোঝে, সহানুভূতি করে?... কিন্তু আর না, দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। এই অন্ধকার-টুকু থাক্‌তে থাক্‌তেই আমি বেরিয়ে পড়ব।

স্নেহ

(ব্যস্ত হইয়া) বল কি, তোমার ট্রেণ ত ভোরে ছাড়বে—এখনই যাবে কি? (মৃদু হাসিয়া) সাহিত্যা-লোচনা কর্‌তে কর্‌তে তুমি দেখতে পাচ্ছি লোচন হারিয়েছ।

গিরীন

কিন্তু ঠিক যাবার মুহূর্ত্তের কয়েকটী মুহূর্ত্ত আগেই যাওয়া ভাল কেন না বিদায় ব্যথা বলে' কোনো জিনিসের বালাই থাকে না। তোমার স্বামীকে জাগিয়ে লাভ নেই, ওঁকে ঘুমতে দাও,—আমিই ব্যাগটা গুছিয়ে নিচ্ছি,। হ্যাঁ,

এতেই হবে। বিলেত থেকে চিঠি লিখলে সময় করে' জবাব দিয়ো কিন্তু। অনেক রাত বকা হয়েছে, ভোরের আলো এসে না পড়তে একটু ঘুমিয়ে নিয়ো, বুঝলে? এই সময় ঐ নির্জ্জন মাঠের পথটা কি চমৎকার লাগে বল ত!

স্নেহ গিরীনকে সদর দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া আসিয়া মশারি তুলিয়া আমারই বিছানায় শুইল। স্নেহ যদি একটা আলো জ্বালিয়া টেবিলের কাছে বসিয়া কিছু পড়িত, তাহা হইলে ছবিটা এমন অসম্পূর্ণ থাকিত না। কিন্তু একটু ঘুমাইয়া না লইলে কাল আবার সংসারের কাজ করিবে কি করিয়া? পুবের দিকে বারান্দা, সেই দিকের দরজাটা খোলাই আছে, মনে হয় স্নেহের চোখে সত্যিই ঘুম আসিতেছে না,—ঐ দরজার দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভোরের আলোর প্রতীক্ষা করিতেছে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্নেহ'র ডায়রি হইতে

"এই সত্যটাকে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া উপলব্ধি করিতে গিয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে আমার রোমাঞ্চ হইতেছে। ঈশ্বর, তোমাকে নমস্কার করি, তোমার এই শুভ আশীর্ব্বাদের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ করিয়ো।

আমার সন্তান-সম্ভাবনা হইয়াছে,—আমি মাতার গৌরবময় মর্য্যাদা লাভ করিতে চলিয়াছি,এত দিনে আমার নিঃসঙ্গতা বুঝি দূর করিলে, ঈশ্বর! আমার ও আমার স্বামীর দৈনন্দিন জীবনে এইবার হইতে একটী সুমধুর সংযম আসিবে, একটী প্রসন্ন নির্ম্মলতা,—আমরা পরস্পরকে নূতন আলোতে চিনিব,—সেই পরিচয়ই আমাদের সত্য পরিচয় হোক!

ভাবিতে কি অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়বোধ হইতেছে, আমার জঠরে যে ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ডটুকু নব প্রাণ লাভের আশায় কম্পিত হইতেছে—সে-ই এক দিন আমারই মত এই আকাশের নীচে দাঁড়াইয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া আকাশকে আলিঙ্গন করিতে চাহিবে, স্তব্ধ রাতে একলা বসিয়া কবিতা পড়িবে, বোধহয় বা ভালবাসিবে! আমার এই আকারহীন অস্তিত্বহীন শিশু কোথা হইতে এই বেগময় চঞ্চল প্রাণ হইয়া আসিয়াছে, ল্যাম্ব ও মেটারলিঙ্কের Dream-Children এরও সুদূরবর্ত্তী রাজ্য হইতে এই অতিথি আমার দেহের অন্ধকারে আসিয়া বাসা বাঁধিল,—বিধাতা, তোমাকে কি করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইব? তুমি আমাকে মুক্তি দিলে!

সংসারের সিংহাসনে এইবার আমার প্রতিষ্ঠা হইবে, এইবার আমি আমার অবিচল সতীত্বের অহঙ্কার করিতে পারিতেছি। আকাশ বিদীর্ণ করিয়া যেমন তারার বুদ্বুদ ফোটে, মাটি হইতে তৃণাঙ্কুর, তেমনি আমার এই মৃন্ময় দেহ হইতে একটী বলিষ্ঠ সন্তানের আবির্ভাব হইবে,—আমার সীমন্তের সিন্দুর আরও গর্ব্বোজ্জ্বল হইয়া উঠুক! স্বামীকে এখনো এই শুভসংবাদটা দেওয়া হয় নাই, মধ্য-রাত্রে উঠিয়া তাঁহার কাণে কাণে এই কথাটি কহিব—আজ রাত্রে সত্যিই ঘুমাইতে ইচ্ছা হইতেছে না। আসন্ন ঝড়ের প্রত্যাশায় আকাশের ব্যাকুলতা কি এমনই অপরিমেয় থাকে?...

কি একটা কাজের তাড়ায় লেখাটা সাঙ্গ না করিয়াই স্নেহকে উঠিয়া পড়িতে হইয়াছিল, খাতাটা তাড়াতাড়িতে বন্ধ ক'রতে ভুলিয়া গিয়াছে। ইত্যবসরে সকাল বেলার টিউশানি সমাধা করিয়া ঘরে ঢুকিয়া একটা খোলা খাতা পড়িয়া আছে দেখিয়া তাহার লিখিতাংশ হইতে চোখ ফিরাইতে পারিলাম না। খবরটা শুনিয়া দস্তুরমত ঘাবড়াইয়া গেলাম,—ইহাকে লইয়া স্নেহ নাচিয়া উঠিয়াছে—উহার মাথা বিগড়াইয়া গিয়াছে না কি? আয়নাতে চাহিয়া দেখিলাম আমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে,—একটা নূতন প্রাণীর শুভপদার্পণের সম্মানে মাহিনা আমার এক পয়সাও বাড়িবে না,—এত বেশি দেরি হইয়া না পড়িলে স্নেহকে সাবধান করিয়া দিতে পারিতাম। বিবাহ ত ইহার জন্যই করিতে চাহি নাই।

স্নেহ ঘরে ঢুকিল। ঠাট্টা করিয়া কহিলাম—খুব যে সাহিত্যিক হয়ে উঠেছ—

স্নেহ সব বুঝিল, কিন্তু একটুও হাসিল না। মধ্যরাত্রে কাণে কাণে শুভসংবাদটা বলিতে পারিল না বলিয়াই হয় ত রাগ করিয়া খাতার পাতাটা টান্ দিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

অদূরবর্ত্তী ভবিষ্যৎ এক চোখে স্নেহে'র দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিয়া অন্য চোখে আমাকে যেন বিদ্রূপ করিতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাস দশেক পরে কলিকাতায় এক ডাক্তার-বন্ধুকে এই চিঠি লিখিতেছি :—

২৯শে আশ্বিন

প্রিয়বরেষু,

আমাদের বিপদের কথা শুনিয়াছ বোধ হয়,—আমার স্ত্রী অকাল প্রসব করিতে গিয়া কয়েক দিন হইল মারা গিয়াছেন, ছেলেটাও ভূমিষ্ঠ হইয়া একবার পৃথিবীর নির্ম্মমতার স্বাদ পাইয়াই চোখ বুজিয়াছে। ভারি নিশ্চিন্ত হইয়া আছি, কিন্তু এই ভাবে একা থাকিবার নিদারুণ উপহাস আমি সহ্য করিতে পারিব না। আমি আবার বিবাহ করিব মনস্থ করিয়াছি। তোমাদের পাড়ায় উনচল্লিশ নম্বর বাড়ীতে যে ভদ্রলোকটি আছেন তাঁহারই শালিকার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আসিয়াছে। মেয়েটী শুনিয়াছি ডায়সেশান স্কুলে পড়ে, গান বাজনাও কিঞ্চিৎ শিখিয়াছে, (আমাদের সংসারে ইহার চল্ নাই, তুমি তাই ইহাতে তাহার পারদর্শিতা দেখিয়া ঝুঁকিয়ো না) কিন্তু চেহারাটি পছন্দ-সই কি না সেই বিষয়ে মত স্থির করিয়ো। মেয়ে মনোনীত হইলে আগামী অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহেই বিবাহের দিন ঠিক করিয়ো,—তোমার উপরই সব ভার দিলাম। আমার পুনরায় বিবাহ করা সম্বন্ধে as a doctor তোমার যে সম্পূর্ণ সায় আছে ইহা আমি আন্দাজ করিয়া লইতে পারি। সব খোঁজ খবর লইয়া শীঘ্রই আমাকে চিঠি লিখিবে, আমি চিঠির আশা করিয়া রহিলাম। বিবাহ না করিয়া তুমি আশা করি ভালই আছ। কিন্তু একবার যাহারা আফিং ধরিয়াছে তাহাদের পক্ষে তাহা ছাড়া অসম্ভব। তোমার কি মনে হয়? ইতি।

রাতের ফুল

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ]

কাননের কোণে ফুলের লতাটি নয়নে দেখেনা কেউ,—
সম্মুখে শুধু লাগে এসে যত সেবা যতনের ঢেউ!
ধনী প্রভুদের অবহেলা সহি' ফুটে তবু তার ফুল;
আপন বর্ণ আপনি সে দেখে,—মনে ভাবে এ কি ভুল!
দিনের দেবতা তপন তাহারে লুকায়ে বুলায় কর,
শূন্য হাওয়ার সঙ্গে তাহার কোনমতে চলে ঘর!

এমনি করিয়া আলসে হেলায় সময় কাটিয়া যায়,
দিনের বেলায় ঘুমায়ে কাটায়, রাতে চোখ মেলে' চায়!
আর যত ফুলে আদরে সকলে করে নিয়ে টানাটানি,
যতখানি যার মূল্য তাহার, মেনে লয় ততখানি;
রজনীর ফুলে কে চাহিবে ভুলে'—মিলেনা এ হেন লোক—
নিশীথ-আঁধারে চাহে চারিধারে দুর্ভাগিনীরই চোখ!

পুষ্পবিলাসী প্রজাপতি আসি' দুলায় না কাছে পাখা,
লুব্ধ ভ্রমর নিদ্রাকাতর পদ্ম-আতর মাখা ;
মৌমাছিদল কলগুঞ্জনে গাহেনাক স্তুতিগান,
নিশীথের ফুলে ফুল-জন্মের লেখা শুধু অপমান !
দেবতার পূজা— তাও জোটেনাক ভাগ্যে তাহার ভুলে'—
প্রভাতেই ফুল তুলে তো পূজারী—রাত্রে কে ফুল তুলে ?

দিন কেটে যায়—একদা কাননে উঠিল ভেরীর রব—
আজি যে রাজার ফুলবাটিকায় বসন্ত উৎসব !
গাছে গাছে নাচে রঙীন কেতন, লতায় লতায় বাতি,
কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে পুষ্পের মাতামাতি ;
পূজা-মণ্ডপে ঝুলিছে খাঁচায় দোয়েল পাপিয়া পিক,
কুল-রমণীর হুলুধ্বনিতে উঠিছে কাঁপিয়া দিক্ ।

দিনের আলোক নিবিবার আগে জ্বলিল রাতের দীপ,
ফুল-বাটিকায় পশে যুবরাজ ভালে চন্দন টীপ ;
পুষ্পকিরীটে সজ্জিত শির, পুষ্পমালিকা গলে,
ঝলমল করে মণি মরকত অঙ্গদে কুণ্ডলে ;
বসন্ত যেন মূর্ত্তি ধরিয়া পূজা লভিবার লাগি'
প্রকৃতির পূজা করিবার ছলে আপনি লয় তা' মাগি' !

পূজা আরম্ভে পুরোহিত তার নাড়িলা পলিত শির,—
কি হইল বলি' শুধা'ল কুমার-কণ্ঠ সুগম্ভীর ।
কহে ব্রাহ্মণ অর্ঘ্যের লাগি' সদ্য কুসুম চাই—
বসন্তযাগে তাজা ফুল ছাড়া অন্য বিধান নাই !
দিবসের বাসি রাত্রিরই মত'—পড়ি' রহে ফুলভার—
রাতে-ফোটা ফুল খুঁজিতে তখনি ছুটে লোক চারিধার ।

বসন্তপূজা-উৎসব যাগ, স্থগিত রহিল সব—
কি হইল বলি' শতমুখে শুধু উঠে হায় হায় রব ।
এ হেন সময় নন্দিতা নামে রাণীর প্রধানা দাসী
কানন-কোণের সেই নিশি-ফুলে সাজিটি সাজায়ে হাসি'
উত্তরিলা আসি মন্দিরতলে—পড়ি' গেল জয় রব—
বিঘ্ন আর হুলুধ্বনিতে শুরু হ'ল উৎসব ।

পূজা অবসানে ফুল্ল বয়ানে ডাকিয়া নন্দিতারে
আনন্দক্ষণ শুধিয়া কুমার উদার পুরস্কারে,
শুধাইল হাসি'—কোথা হ'তে দাসী সদ্য-ফোটা এ ফুলে
মান ও ধর্ম্ম রাখিলে আমার কহ দেখি তাই খুলে';
কানন-কোণের কুসুম-লতার কথাটী শুনিয়া শেষে,
নিশীথ রাত্রে নমিলা কুমার সেই লতামূলে এসে।

চির-অনাদৃত উপেক্ষিত যে, নূতন জীবন ধরি'
প্রভুর প্রসাদে জাগিল প্রভাতে পুলক-শোভাতে ভরি';
কনক-মঞ্চে হ'ল তার ঠাঁই, রজত-তোরণে গাঁথা—
তারি তলদেশে বসন্তদেব তোলে মন্দির-মাথা,

*   *   *   *

চির-বাঞ্ছিত লাঞ্ছিত যারা ধরণীর ধূলিলীন—
দেবতার পদে এমনি আসন পাবে না কি কোন' দিন!

স্পর্শ

(গল্প)

[শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

১

বিশাখা সে-দিন যখন ভিক্ষা করিয়া কুটীরে ফিরিল তখন বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। মধ্যাহ্নের সূর্য্য প্রদীপ্ত গৌরবে মধ্য-আকাশে বিরাজ করিতেছে। সারা প্রকৃতি রৌদ্র-দগ্ধ ও মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষী সব কুলায় ফিরিতেছে। খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি পরস্পর মিলিতে চেষ্টা করিতেছে।

গ্রামের প্রান্ত-সীমায় আম্রবৃক্ষের ছায়ায় ঢাকা এক খানি অত্যন্ত জীর্ণ পর্ণকুটীর। দেখিলে মনে হয় এ খানির আশু সংস্কারের একান্ত প্রয়োজন। নতুবা সে খুব শীঘ্রই মৃত্তিকা-শয়নে তার অস্তিত্ব লোপ করিবে। এই আসন্ন-পতনোন্মুখ কুটীরখানির ভিতর বর্ষার জল অবাধে প্রবেশ করিয়া থাকে।

অন্ধ বৈষ্ণব অন্নদাশঙ্কর অনন্যোপায় হইয়া কেবল দৃষ্টিহীন অশ্রুবিগলিত নয়ন তুলিয়া উপর দিকে তাকায়। বৃষ্টির ধারা তার নয়নে আসিয়া পড়ে, সে ভাবে—উপরের আচ্ছাদন বুঝি সব চলিয়া গিয়াছে! বিশাখা উপায় নাই ভাবিয়া কিছু জানায় না; হয়ত সে দুঃখ বাড়াইয়া ব্যথা দিতে চায় না। হতভাগিনী বোঝে না, নিয়তির নিষ্ঠুর হাত এড়াইয়া কেহ চলিতে পারে না! এর পর ভাবনার কূল কিনারা থাকে না। মন ভাসিয়া চলে—কোথায়? কে জানে? এক একটী গভীর মর্ম্মস্পর্শী অন্তর্ভেদী দীর্ঘশ্বাস তার চিন্তার মাঝে বিরামের কসি টানিয়া দেয়। বেচারা তার অন্তর দিয়া সব বুঝিতে চেষ্টা পায়। বুঝি সীমাশূন্য অন্তরের কোলে অন্ধ অন্নদাশঙ্কর একটী সীমা-রেখা টানিতে গিয়া নিষ্ফল চেষ্টার ব্যর্থতায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়ায়।

তখন তার রুদ্ধ নয়নের সম্মুখে সংসার-যাত্রা-পথের অতীত দৃশ্যগুলি বায়স্কোপের চিত্রের মতই একটীর পর একটী আসিয়া দ্রুত অপসারিত হইয়া যায়—কেবল বর্ত্তমান

উজ্জ্বল হইয়া উঠে। কি ভাবিয়া বৃদ্ধ অন্নদাশঙ্কর মুখখানি ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্রোধে সঙ্কুচিত করিয়া উত্তেজিতভাবে মাথা নাড়িতে থাকে। তার পর আপনা আপনি রূঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠে—"খুন করে ফেলব জানিস!"

বিশাখা ছুটিয়া আসিয়া ডাকে, "বাবা, বাবা, এই যে আমি।"

বৃদ্ধ কন্যার হাত নিজ হাতের মধ্যে আগ্রহে চাপিয়া ধরে। অগ্নিতে জল ঢালিলে, নির্ব্বাপিত অগ্নি হইতে যেমন অনর্গল ধূম নির্গত হইতে থাকে—এক্ষেত্রে বৃদ্ধ স্তব্ধ হইয়া থাকিলেও তাহার শীর্ণ দেহ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাঁপিতে থাকে।

এমনই করিয়া অন্ধ অন্নদাশঙ্কর তাহার একমাত্র অবলম্বন ও বন্ধন কন্যা বিশাখাকে লইয়া ভগবানের নাম গাহিয়া পতনোন্মুখ কুটীরখানির মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বাস করে।

বিশাখা ভিক্ষা করিয়া আনে—রাঁধে; বৃদ্ধ পিতাকে খাওয়াইয়া বিপুল তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করে। পুত্র থাকিলে সে ইহার অধিক আর কি করিতে পারিত? হয়ত বা পারিত? মাঝে মাঝে হঠাৎ এমনই একটী চিন্তা বালিকার অন্তরাকাশে ভাসিয়া ওঠে। সে তখনই জিভ কাটিয়া, দুই হাত জোড় করিয়া সজল নয়নে মাটিতে ঢিপ করিয়া গড় করে। কেন করে? সেই জানে! তারপর অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া পিতার পদতলে গিয়া উপবেশন করে। সে দিনও সে এমনই ভাবে ভারাক্রান্ত-মনে পিতার নিকট গিয়া বসিল।

অন্নদাশঙ্কর ডাকিল, "বিশাখা"

"কেন বাবা।"

"অনেক বেলা হয়েছে—না?"

"বারোটা বেজে গেছে।"

"বটে।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বৃদ্ধ কি যেন ভাবিতে লাগিল; তাহার কপালের মাংসপেশী কুঞ্চিত হইল। কিছুক্ষণ পরে আবার কুঞ্চিত রেখাগুলি মুছিয়া গেল। তাহার লোল মাংসপেশীর উপর কোন কিছুরই চিহ্ন আর দৃষ্ট হইল না। নিবাত নিষ্কম্প সমুদ্রের জলের মত তার হৃদয় অচঞ্চল। তার মূর্ত্তি যেন পাথরের খোদা মূর্ত্তির মত দেখাইল—ভাবনা-চিন্তার রেখা মাত্র তাহাতে দেখা গেল না। পরিপূর্ণ তৃপ্তির আনন্দে উদ্ভাসিত।

বৃদ্ধ সহসা জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কত বাড়ী ঘুরতে হয়েছিল?"

"অনেক বাড়ী ঘুরে একটী গরীব পরিবারের কাছ থেকে ভিক্ষা পেয়েছি বাবা। যা দিয়েছে আমাদের দু-জনার পক্ষে যথেষ্ট হবে, কিন্তু আমার মনে হ'ল তাদের নিজের আহার্য্য বোধ হয় কম হবে?"

"নারায়ণের কৃপায় তাদের বেড়ে উঠ্‌বে—কম্‌তে কি পারে?"

"বাবা বেলা অনেক হয়েছে। এসো তোমাকে নাইয়ে দিয়ে তার পর রান্না চড়াব।"

"তা যেন হ'ল, কিন্তু আমাকে দেখা—কি ভিক্ষা পেয়েছিস। রোজই আমার মনে হয়, হয় ত তুই যা আনিস তাতে করে দু-জনার হয় না। তোর হয় ত কম পড়ে নয় ত একেবারেই হয় না।"

"বাবা অমন কথা কেন যে তোমার মনে হয় বুঝি না!"

"কাউকে এ কথা বুঝিয়ে দিতে হয় না বিশাখা, এক দিন আপনিই না বুঝে পারবি না।"

বিশাখা ভিক্ষার ঝুলিটি পিতার হাতের উপর তুলিয়া দিল।

অন্নদাশঙ্কর আগ্রহভরে ঝুলির ভিতর হাত দিয়া পরিমাণ অনুভব করিল। তার পর একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "বেলা বেড়ে যাচ্ছে—চল স্নান করে নিই।"

২

সে দিন, খুব বেশী দিনের কথা নয়, যখন অন্নদাশঙ্কর কবিরাজী করিত। বাড়ী, বাগান, পুষ্করিণী কি না ছিল তার! ধন-জন, মান-সম্ভ্রম-প্রতিপত্তি, বংশ-মর্য্যাদা, খ্যাতি নদীর বন্যার মতই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। স্ত্রী-পুত্র সব ছিল। কেহ স্বপ্নেও কোন দিন কল্পনা করিতে পারিত না যে দেশ-বিখ্যাত স্বনাম-ধন্য কবিরাজ অন্নদাশঙ্করকে সর্ব্বস্ব হারাইয়া পর্ণকুটীরে ভিক্ষান্নে জীবন-যাপন করিতে হইবে। কালের বিচিত্র গতি!

বিশাখাই ছিল তার দুর্দ্দশার মূল কারণ। তার অসামান্য রূপই তার পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। সে রূপ-বহ্নিতে পুড়িয়া মরিবার জন্য গ্রামের অশিক্ষিত জমিদার করালীকিঙ্কর পতঙ্গের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিল—যখন তার অবৈধ কৌশলগুলি পদে পদে নিষ্ফলতার নির্ম্মম কশাঘাতে ব্যর্থ হইল তখন তাহার আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ, লালসার তীব্র নেশা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। অবশেষে জমিদার হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া অমানুষিক অত্যাচারের ও অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অন্নদাশঙ্করকে গৃহচ্যুত করিল।

অন্নদাশঙ্কর অত্যন্ত জেদী ও খাঁটি লোক। বেচারা জমীদারের অন্যায় আচরণের প্রতিকার সমাজের নিকট হইতে যখন পাইল না, তখন সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া জমীদারের সঙ্গে সে মকদ্দমা লড়িল। গ্রামের সমস্ত লোক অন্নদা-শঙ্করের বিরুদ্ধে অসঙ্কোচে সাক্ষী দিল। কিন্তু তাহাতেও অন্নদাশঙ্কর নিরস্ত হন নাই—হইলেন সেই দিন, যে দিন গ্রামের লোকেরা জমীদারের প্ররোচনায় চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া অবিবাহিতা একমাত্র কন্যা বিশাখার পবিত্র চরিত্রের উপর অযথা কলঙ্কের ছাপ দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিল না। সেই দিনই তাহাদের নীচতা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হইল। তখন তাহারা সকলে মিলিয়া তাহাকে একঘরে করিল। তাহাকে চিকিৎসার জন্য গ্রামের কেহ আর ডাকিল না। দূর গ্রাম হইতে কেহ ডাকিতে আসিলে, তাহাদের নিকট অন্নদাশঙ্করের যথেষ্ট অপবাদ ও নিন্দা করিয়া গ্রামবাসীরা তাহাকে ফিরাইয়া দিতে লাগিল।

ইহাতেও তেজস্বী অন্নদাশঙ্কর কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। তাহার যাহা কিছু পূর্ব্ব-সঞ্চিত ছিল, তাহাও ইতি-পূর্ব্বেই মকদ্দমা লড়িতে গিয়া প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়া-ছিল। এখন আসবাব-পত্রের বিক্রয়লব্ধ অর্থের সাহায্যে সংসার কোন মতে চালাইতে লাগিল।

সে দিন জমীদার করালীকিঙ্কর একগাল হাসিয়া তাহার অন্নদাস শম্ভু বাগ্দীকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কিরে শম্ভু, ভোগের আর বিলম্ব কত? ডান হাতের ব্যবস্থা ত বন্ধ হ'য়ে এল বলে। জিনিস-পত্র যা কিছু ছিল—তা [illegible] ব নন্দীরাম পোদ্দারের দোকানে—আমি সব খবর রাখি বাবা! হো, হো, কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করে জলে বাস—কি বলিস? কেউ কোন দিন পেরেছে কি?"

শম্ভু বাগ্দী পায়ের বুড়া অঙ্গুলীর সাহায্যে মৃত্তিকা-খননের চেষ্টা করিতেছিল, এবং নীরবে মনে মনে সে ভারি চটিয়াছিল। মানুষ যে এতদূর নীচ হইতে পারে মূর্খ বাগ্দী তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তাহার অন্তরের পুঞ্জীভূত ঘৃণা ও ক্রোধ-বহ্নিশিখা মাঝে মাঝে তাহার দৃঢ় ওষ্ঠে দীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। এক একবার তাহার বিদ্রোহী আত্মা বিপুল বিক্রমে পশু-প্রকৃতি জমীদারের উপর লাফাইয়া পড়িবার আগ্রহে যেন দুলিয়া উঠিতেছিল। অমনিই তাহার অনাহার-ক্লিষ্ট ক্ষুধাতুর পুত্র কন্যার শুষ্ক মুখ সহসা কোথা হইতে তাহার নয়ন-সম্মুখে ব্যথাতুর কাতর-দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠিতেই সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া উত্তর করিল,

"হুজুর, আজ দু-দিন কি কষ্টে যে দিন কেটেছে তা বল্‌তে পারি না। এই নিন্ এইটা রেখে আমাকে দুটো টাকা দিতেই হবে।" বলিয়া সে তার শিশু কন্যার-রূপার বোর কাপড়ের ভিতর হইতে কম্পিত হস্তে বাহির করিয়া জমীদারের পায়ের নিকট রাখিল। তার পর সে অত্যন্ত কাতর-দৃষ্টিতে যেন দেখিতে লাগিল, বোর-শূন্য রোদন-নিরত কন্যার সুন্দর মুখ খানি। তার পর আপনা আপনি বলিয়া উঠিল—"ভগবান্ মেরেছে—নইলে আজ······ ··" তাহার দুই চক্ষু দিয়া সংযত অশ্রুর বাঁধ ভাঙ্গিয়া ছুটিল।"

জমীদার মৃদু মধুর হাস্যে জিজ্ঞাসা করিল—"তোদের সাক্ষাৎ দেবতা অন্নদার কাছে গেলি না কেন? সে এমনিই দিয়ে দিত।"

শম্ভু আজ এ তীব্র শ্লেষবাক্য বহু চেষ্টা করিয়াও হজম করিতে পারিল না। সহসা তার মুখ দিয়া বাহির হইল, "সেখানে উপায় থাকলে··· ··" তার পর ফণাহত সর্পের মত মাথা নীচু করিয়া সে সহসা বসিয়া পড়িল।

করালীকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল,—"উপায় যদি কিছু থাকত, তা হ'লে এ পথ মাড়াতে না—কেমন এই ত কথা?"

"আঁজ্ঞে হুজুর।"

বাধা দিয়া জমীদার তীব্রকণ্ঠে উত্তর করিল। "তার

মানে একবার বাগে পেলে, সঞ্চিত ক্রোধ সে দিন মিটিয়ে নেবে সুদে-আসলে, এই ত মতলব ?"

তার পর ডাকিল, "কে আছিস ?"

খানসামা রামহরি জোড়হস্তে আদেশের অপেক্ষায় সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

"নায়েব বাবুকে ডাক।"

নায়েব আসিয়া দাঁড়াইতে করালীকিঙ্কর শম্ভু বাগদীকে নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এর ক' সনের খাজনা বাকী ? আজই আমাকে জানাবে ?"

নায়েব মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল এবং শম্ভুর প্রতি একবার তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

রূপার বোর-চড়ার দিকে নায়েবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া করালী বলিল, "এই বোর বিক্রী করে বাকী খাজনা যতটা উসুল হয় করে নেবে, বুঝলে ?"

শম্ভু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "হুজুর মা বাপ না খেয়ে……"

বাধা দিয়া জমীদার বলিল, "চুপ—না খেয়ে অমন ঢের মানুষ মরে তাতে কি যায় আসে।" করালীকিঙ্কর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া অন্দরে চলিয়া গেল।

৩

আজ প্রায় তিন বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে অন্নদাশঙ্কর দেশ ছাড়িয়া স্ত্রী-পুত্র হারাইয়া অন্ধাবস্থায় প্রায় বিশ ক্রোশ দূরে একটি অজানা গ্রামের প্রান্তে আসিয়া আমবাগানের ছায়ায় কুটীর বাঁধিয়াছে। যে দিন অন্নদাশঙ্করের বাটীতে আগুন লাগে তাহারই দুই দিন পরে দাহের অসহ্য যন্ত্রণায় তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। মুখ বুজিয়া সে ব্যথা সে সহ্য করিল।

এই সময় অন্নদাশঙ্কর কি একটা ঔষধ আবিষ্কার করিতে গিয়া হঠাৎ গলিত ঔষধ যখন পরীক্ষা করিতে ছিলেন, তখন তাহা তাহার চক্ষুতে পড়িয়া যায়, উহাতে একেবারে তার দুই চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল। অসহ্য বেদনা সহ্য করার মধ্যেই যে অপূর্ব্ব শক্তির বিকাশ, তাহার সত্য পরিচয় পরিপূর্ণ গৌরবে তাহার নিকট উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অন্নদাশঙ্কর অসীম ধৈর্য্যের সহিত দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইল।

বৈষ্ণব-পদাবলীর উপর তাহার ছিল অনন্যসাধারণ অনুরাগ। সেই প্রীতি আরও প্রগাঢ় হইয়া উঠিল সেই দিন যে দিন দুই চক্ষু হারাইয়া অন্নদাশঙ্কর তাহার অন্ধের যষ্টি একমাত্র কন্যার হাত ধরিয়া চেনা পথে অচেনার মতই চলা সুরু করিল।

অন্নদাশঙ্কর বয়স্থা অবিবাহিত কন্যা বিশাখাকে লইয়া মহা ভাবনায় পড়িল। দেশে ত গ্রামবাসীদের সহানুভূতিটুকু পর্য্যন্ত পাইল না, এখন ভগবানে একান্ত নির্ভরশীল হইয়া কোন নূতন বাসার অনুসন্ধানে চলিল।

ঐশ্বর্য্যবান্ জমীদার সহসা কোন এক দিন প্রভাতে জাগিয়া যদি দেখেন তাহার জমীদারি নাই, বাড়ী-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি কোন এক অজ্ঞাত কারণে অকস্মাৎ নিলাম হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে তাহার মনে যে দুরন্ত ব্যথা জাগিয়া ওঠে, অন্নদাশঙ্করের মনটাও সেইরূপ বেদনায় নিপীড়িত হইল। বেচারাও ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিল না, কেন এমন হইল। অতীত জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিয়াও কোনরূপ আলোকের সন্ধান পাইল না। আলো-আঁধারের মধ্যে যে দৃষ্টি এত দিন অপ্রতিহত ভাবে তাহাকে সম্পদে-বিপদে পথ দেখাইয়াই আসিয়াছে, সে আজ সহসা ভোরের আলোকে বিশ্বের অন্ধকারের বোঝা তাহার নয়নে ভরিয়া দিল।

অন্নদাশঙ্করের আজীবনের সুপরিচিত পথ মুহূর্ত্তের ভিতর চির-জীবনের মত অন্ধকারাবৃত হইল।

এই অন্ধকারের ভিতর বেচারা শান্তির আলোকের সন্ধান পাইল কীর্ত্তন গাহিয়া। তাই দেশ ছাড়িয়া কীর্ত্তনের মাত্রা তাহার বাড়িয়াই চলিল।

নূতন গ্রামের লোকেরা নবাগত প্রতিবেশীকে দেখিয়া গেল। দু-টা আশা ও আশ্বাসের কথাও বলিতে ভুলিল না। অন্ধের নিকট হইতে কোন দিন যে সাহায্যের প্রতিদান পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব একথাটা স্বার্থপর মানুষের বুঝিতে বাকি রহিল না।

অন্নদাশঙ্কর বাহিরের দৃষ্টি হারাইয়া অন্তরের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সুন্দর আলোক-জ্যোতির সন্ধান পাইল। সে আলোয় উত্তাপ নাই—উজ্জ্বলতা আছে। বাহিরের আলোর অপেক্ষা সে আলো কোটীগুণ বেশী, অথচ চোখে

ব্যথা দেয় না। মধুর আনন্দে ভরা মুক্ত নির্ঝরের মত অবিরাম ঝরিয়া পড়িতেছে।

অন্ধ অন্নদাশঙ্কর খঞ্জনী বাজাইয়া গান গায়—গায়িতে গায়িতে আপনাকে হারাইয়া ফেলে। সে গান শুনিতে কেহ আসে না। খঞ্জনীর আঘাতে আঘাতে গান পর্দ্দায় পর্দ্দায় উঠিতে থাকে। সে গান শোনে শুধু বনের পশু-পক্ষী, তরুলতা আর নদ-নদী। সে গানের রেশ ছুটিয়া বেড়ায় আকাশে-বাতাসে। মাঝে-মাঝে তার মস্তক মাটির উপর লুটিয়া পড়ে। সে দেখিতে পায় না, জানিতে পারে না, তার গান কেহ শুনিতেছে কি না। তখন কার দূরাগত খঞ্জনীর মধুর আওয়াজ তাহার অন্তরাকাশ কাঁপাইয়া ধ্বনিত হইতে থাকে। সে খঞ্জনীর সুরের তরঙ্গে-তরঙ্গে যে গান বাতাসে ভাসিয়া আসে—অন্নদা-শঙ্কর সমস্ত প্রাণ দিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহা শোনে—

"(ওগো) কে তুমি আমায় বল।
অযাচিত ভাবে, ফের পাছে পাছে
ডাকি না তোমারে তবু তুমি আস,
চাহিনা তোমারে তবু ভালবাস—"

শুনিতে শুনিতে অন্নদাশঙ্কর ঘর হইতে হাতড়াইয়া বাহিরের প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়ায়। কাণ খাড়া করিয়া আকণ্ঠ ভরিয়া সে সঙ্গীত-সুধা পান করিতে চায়—ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছা করে—কিন্তু দৃষ্টিহীন নয়ন সে পথে শত্রুতা করে—সেখানেই বসিয়া পড়ে' সে-ও কণ্ঠ মিলাইয়া গায়িতে থাকে :—

"ডাকি না তোমারে তবু তুমি আস,
চাহি না তোমারে তবু ভালবাস।"

সমস্ত আমবাগান সে সুরে ঝঙ্কৃত হইয়া ওঠে। অন্নদা-শঙ্করের দৃষ্টি যেন সহসা কোন্ এক যাদুমন্ত্রে খুলিয়া যায়। ঘৃণায় সে তখনই দৃষ্টি ফিরাইয়া লয়। অন্তরই যে তাহার অন্তরে আলো জ্বালাইয়া দিয়াছে। বাহিরের দৃশ্য এখন তাহার সম্পূর্ণ অসহ্য।

ধীরে ধীরে সঙ্গীত-লহরী নিকট হইতে নিকটতর হইয়া অন্নদাশঙ্করের চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়ে। সে আগ্রহভরে স্নেহ-ধারায় বিশাখাকে আপ্লুত করিয়া দেয়। পরম আনন্দে তাহাকে প্রীতিভরে আপনার নিকট তাহার [illegible] হাত ধরিয়া বসায়। তার পর কন্যার ভিক্ষায় বাহির হইবার পূর্ব্বে তাহার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া কি যেন সে অনুভব করিয়া লয়। বিশাখা এ নূতন পরীক্ষার অর্থ বুঝিতে পারে না।

অন্নদাশঙ্কর তারপর আনন্দে অধীর হইয়া বলিত, "ফেরে সে পাছে পাছে—ভয় কি থাকৃতে পারে!"

"হ্যাঁ বাবা, কবে তিনি আস্‌বেন?"

"সময় হ'লে না এসে পার্‌বেন না—তাঁকে আস্‌তেই হবে। বিশাখা, আমার জন্যে না এলেও তোর জন্যে নিশ্চয় আস্‌বেন—আর বেশী বিলম্ব নেই মনে হচ্ছে।

৪

গ্রামখানি খুব বড় নয়। মাঝা-মাঝি রকমের। অনেকগুলি বড় বড় পুষ্করিণী এবং ছোট বড় কয়েকটী দেবালয়ও আছে। কয়েকখানি বহু প্রাচীন উদ্যান জঙ্গল হইবার আশায় দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। ঘর কয়েক ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাসও এখানে আছে। এই গ্রামের প্রান্ত-সীমায় আমবাগানে অন্ধ অন্নদাশঙ্কর কুটীর বাঁধিয়াছে।

গ্রামের জমীদারবংশ বহু কালের প্রাচীন। নাম ডাকও খুব। জমিদারী বহুদূর বিস্তৃত। জমীদার বিধু-শেখর বাবুর আজ তিন বৎসর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার একমাত্র পুত্র ইন্দ্রনাথ বর্ত্তমান জমীদার। সবে মাত্র এম-এ পাশ করিয়া "ল" পড়িতেছিলেন, কিন্তু পিতার মৃত্যুতে তাহাকে লেখা-পড়া বন্ধ করিয়া জমিদারীর কাজে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে।

ইন্দ্রনাথ আজও বিবাহ করেন নাই। বিবাহ করি-বার কোন সঙ্কল্প তাহার মনে একেবারে আছে কি না, তাহা কেহই বলিতে পারে না। এক বৎসর অতীত হইল তাঁহার জননী পরলোক গমন করিয়াছেন। পুত্রের বিবাহ দিয়া তাঁহাকে সংসারী দেখিয়া যাইবার তাঁহার বড় ইচ্ছাই ছিল, কিন্তু ইন্দ্রনাথ স্নেহময়ী শোকাতুরা মাতার শেষ অনুরোধ যে কি কারণে রক্ষা করিতে পারেন নাই, তাহা মরণ-পথের যাত্রীর নিকট অজানাই রহিয়া গিয়াছিল।

ইন্দ্রনাথ নিজেই জমিদারীর সমস্ত কাজকর্ম্ম দেখিতেন। কোন দিক্ দিয়া যেন প্রজাদিগের প্রতি এতটুকু অন্যায় না হয় সেই দিকে তাঁর তীব্র দৃষ্টি ছিল। [illegible]

মধ্যে ঘরে ঘরে ইন্দ্রনাথের নাম মুখে মুখে ফিরিতেছে। এক বৎসর বৃষ্টির অভাবে ফসল হয় নাই—প্রজাদের দুঃখের সীমা নাই—খাজনা ত মকুফ করিয়া দিলেন, তাহার উপর বাড়ী বাড়ী গিয়া প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া প্রয়োজন মত সাহায্য ঔষধ পথ্যাদি দান করিয়াছেন। রোগীর সেবা ও চিকিৎসার জন্য যথোপযুক্ত সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

গ্রামের বুদ্ধিমান্ মাতব্বরেরা বলাবলি করিতে লাগিলেন "একটা কিছু অভিসন্ধি আছে। তা যাই থাক। এমন করে জমিদারী রক্ষা করতে পারিবে না। লেখাপড়া শিখে কেউ কোন দিন জমিদারী চালাতে পারে না, তা ত হাজার হাজার দেখে এলাম।"

এক জন বলিল, "ওর বাবা বিধুশেখর কি ভয়ানক লোক ছিলেন তা কে না জানে? লোকের সর্ব্বনাশ করে জমিদারী করেছে—তা কখন থাকতে পারে। বিধাতা তা সইবেন কেন? সকাল বেলা নাম করলে সে দিন অন্ন জোটে না।"

এমনই কত অপবাদই এই জমিদার-পরিবারটীর সুনাম সুযোগ ও খ্যাতিকে ভগ্ন-প্রাসাদের অশ্বত্থবৃক্ষের মতই নানা দিক্ দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। এ কথা ইন্দ্রনাথ দেশে আসিয়া বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বড় একটা কাহারও সহিত মিশিতেন না। কাহারও মুখের দিকে চক্ষু তুলিয়া লজ্জায় তাকাইতে সাহস পাইতেন না। কেবলই মনে হইত সারা গ্রামখানির প্রতি অঙ্গ হইতে তাহার পিতার অমানুষিক অত্যাচারের মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা যেন বাহির হইতেছে। গ্রামবাসীর আর্ত্তনাদ আজও যেন গুমরিয়া উঠিতেছে। রোষকষায়িত-লোচনে গ্রামের পীড়িত লোকেরা যেন তাহার উপর প্রতিশোধের প্রত্যাশায় তাকাইতেছে। তাহাদের প্রতিকার-প্রার্থী দৃষ্টি হইতে যেন অগ্নিবর্ষণ হইতেছে।

ইন্দ্রনাথ বসিয়া বসিয়া ভাবে—মানুষের উপর মানুষের কি নিষ্ঠুর অমানুষিক অত্যাচার। বাড়ী, ঘর, বিষয়, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য সমস্তই যেন সেই অত্যাচারের প্রতীক হইয়া তাহাকে আহ্বান করিতেছে। ইহাদের সঙ্গ যেন তাহাকে সর্ব্বক্ষণ অসহিষ্ণু করিয়া তোলে—তাহাদের স্পর্শ যেন তাহার অঙ্গে নিদারুণ জ্বালার সৃষ্টি করে—সংসার-প্রবেশদ্বারে একি অকরুণ চিত্র। ইন্দ্রনাথ অগ্রসর হইবার পথ খুঁজিয়া পান না। সহানুভূতির, সান্ত্বনার কৃপাদৃষ্টি বুঝি মানুষের চোখে ফোটে না। এক একবার মনে করে তাহার কিসের সংসার? কিসের বন্ধন! উত্তরাধিকারী-সূত্রে সে পাইয়াছে দেশের লোকের অভিশাপ আর অপরিমিত ঐশ্বর্য্য। ইহা ছাড়া তাহার পিতা মাতা ত তাহার জন্য অন্য কিছু রাখিয়া যান নাই। এমনই একটা চিন্তা তাহার নয়নসম্মুখে নবীন জীবনের সবুজ পথটির উপর লাল কঙ্করে ভরিয়া দেয়। সে পথে একাকী চলিতে বা জীবন-যাত্রার সঙ্গীকে সমাদর করিয়া ডাকিয়া আনিতে ইন্দ্রনাথের অন্তর অভাবনীয় আশঙ্কায় ব্যথিত হইয়া ওঠে। মনে মনে সে কেবলই ভাবে—ব্যর্থ-জীবন এমনই করিয়া মিছামিছি টানিয়া, পিতার অত্যাচারের ঋণ তাহাকে পরিশোধ করিতে হইবে।

ইন্দ্রনাথ দুঃসহ জীবন, অবশেষে বাগানের কাজে লাগাইয়া দিলেন। এবার তার সঙ্গী হইল—বাগানের তরুণ সবুজ ফুলের গাছগুলি। তাহাদের যত্ন করিতে, ভালবাসিতে, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন রাখিতে তাহার সময়ের টান পড়িতে লাগিল। ধীরে ধীরে তাহারা যখন তাহার নয়নের আনন্দ বৃদ্ধি করিয়া বাড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিল, তখন ইন্দ্রনাথের অন্তরের মধ্যে সৃষ্টির পুলক কানায় কানায় ভরিয়া উঠিতেছিল। প্রাণ দিয়া যখন বেচারা প্রাণের সন্ধান করিল, তখন তার রোপিত বৃক্ষগুলি আনন্দে আবেগে ফলে ফুলে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। ভুবনভরা প্রসন্নতা আজ বন্যার মত অকস্মাৎ আসিয়া ইন্দ্রনাথের শুষ্ক মরু-হৃদয় প্লাবিত করিয়া দিল। তিনি দেখিলেন সংসার, জীবন, প্রেম এসব কেবল কল্পনা নয়—অবাস্তব নয়, ইহাদের সার্থকতার মধ্য দিয়া বিশ্বের নিগূঢ় মন্ত্রটী অন্তরের মধ্যে অনুক্ষণ ধ্বনিত হইতেছে।

ইন্দ্রনাথ বুঝিলেন প্রকৃতির প্রিয় সম্ভাষণকে এড়াইয়া চলা অসম্ভব! দূরে দাঁড়াইয়া আভিজাত্যের গর্ব্বে অভিমান করিলে, তাহা দূর করিবার জন্য কেহ সাড়া দিবে না। ধরা দিলে তবে ধরা যায় এ সত্য সেদিন তাহার নিকট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। তিনি অন্তরে অন্তরে বুঝিলেন আপনাকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধনহীন না করিলে বন্ধন-হারার দেখা পাওয়া যায় না।

ইন্দ্রনাথের তরুলতার সহিত পরিচয় দিন দিন নিবিড় ও মধুর হইয়া উঠিল। সারাক্ষণ তাহাদের লইয়াই তার নিঃসঙ্গ সময় যেমন কাটিতেছিল—মনও তেমন কোমল সমবেদনায় ভরিয়া উঠিতেছিল। বাগানের কাজ সারিয়া বাড়ীর মধ্যে যতটুকু সময় থাকিতেন, তার অধিকাংশই বাগানের দিকে বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাহার নির্ব্বাক্ সঙ্গী-দের প্রতি অনিমিষ নয়নে তাকাইয়া ভাবিতে ভাবিতে কোন এক স্বপ্ন-রাজ্যে চলিয়া যাইতেন। সহসা সেই ভিখারিণী মেয়েটীর খঞ্জনীর শব্দে ও গানের করুণ স্বরে তিনি চমকিয়া উঠিতেন। গান শুনিতে শুনিতে আত্ম-হারা হইয়া পড়িতেন।

কতদিন তার মনে হইয়াছে, কে এই অসামান্য সুন্দরী বালিকা? ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসেন—কোথায় তুমি থাক? এমন গান কে তোমাকে শিখাইল? ভিক্ষা না করিলে কি তোমার একদিনও চলে না? কিন্তু কোন প্রশ্নটাই জিজ্ঞাসা করিবার পথ তাহার নাই। মেয়েটীর দুঃখ কি! তাহার কি আপনার বলিতে কেহ নাই? প্রতিদিন দূর হইতেই ভিক্ষা করিয়া যায়। তাহার বাড়ী পর্য্যন্ত আসে না। কেন আসে না? তার পরই ইন্দ্রনাথের মনের মধ্যে একটা কথা জাগিয়া উঠে,—ঘৃণায় লজ্জায়, মাথা নীচু হইয়া আসে। মেয়েটির দিকে তাকাইতে সাহস হয় না।

ইন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠেন যখন তার অন্তর, তার প্রশ্নের উত্তরে বলে, "এ পাপ অন্ন সে কেন গ্রহণ করিবে"। ঘরের দেওয়ালের টিক্‌টিকিটাও কি সময় বুঝিয়া ঠিক্ ঠিক্ করিয়া ওঠে। ঐ যে ভিক্ষাপাত্র হস্তে দেবী দুয়ারে দাঁড়াইয়া না? এমন একটা অপূর্ব্ব দৃশ্য কল্পনার রাজ্যে ভাসিয়া ওঠে। ইন্দ্রনাথ চিৎকার করিয়া আপনাআপনি বলিয়া উঠেন, "ভুল করেছ ভিখারিণী, ভুল করেছ। তোমাকে দেবার মত এক কণা তণ্ডুলও এ বাড়ীতে নাই—ফিরে যাও।" কৈ সে ত ফিরে যায় না। খঞ্জনী বাজাইয়া কি মধুর কণ্ঠে অশ্রুপ্লাবিত নয়নে শুধু গায়—

"তব প্রেম রীতি সুকোমল অতি
[illegible]ত আর দেখিনে কোথায়,
লও স[illegible]র গোপনে গোপনে
কত যে ভাবনা ভাবহে আমার।"

তারপর সে গান, সে সুর, সে কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে দূর হইতে দূরে বায়ুস্তরে, দিগন্তের কোলে ডুবিয়া যায়। ইন্দ্র-নাথ আত্মবিস্মৃত হইয়া বিশ্ব-সংসারের অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ব্বাক নিস্পন্দ অবস্থায় বসিয়া থাকেন। বুঝি ভাবেন, অমনই করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া গান গাহিয়া পথে পথে বেড়াইতে পারিলে তার জীবন সার্থক হয়—একথা মনে মনে আলোচনা করিতে গিয়া সে এক অজানা অনাস্বাদিত অমৃতের আস্বাদ পায়,—তখনই ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে থাকেন। ইচ্ছা হয়, এখনি সকল বন্ধন, সকল সম্মান ছিন্ন করিয়া ছুটিয়া পথের মধ্যে খঞ্জনী হাতে বাহির হইয়া পড়েন। তখন আবার মনে প্রশ্ন জাগিয়া ওঠে—কেন আজও তাহা পারিলাম না। কে আমার পথে বাধা দিতেছে?—কে আমার সত্যকার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া পরম শত্রুতা করিতেছে?

এক দিন ইন্দ্রনাথ সত্য সত্যই খঞ্জনী কিনিয়া আনি-লেন। সেদিন সারা রাত্রি আর ঘুমাইতে পারিলেন না। মনের মধ্যে কি গান ঝঙ্কার দিয়া উঠিল তিনিই জানেন মাঝে মাঝে অল্প তন্দ্রা আসে আর অমনই তিনিই জাগিয়া, উঠিয়া বসিয়া উন্মাদের মতই খঞ্জনী বাজান। তার পর খঞ্জনী হাতে ছুটিয়া নীচে নামিয়া আসেন—পথে বাহির হইবার পূর্ব্বেই লোকচক্ষুর সম্মুখে লজ্জায় তার পা জড়াইয়া আসে—নিশ্চল হইয়া পড়েন। তখন তার মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সে ত অনেক সোজা, অনেক সহজ। যা তুচ্ছ যা কিছুই নয়, যা দরিদ্রের একচেটিয়া তা যে এত কঠিন—কে জানিত? সেই দিন তিনি বুঝিলেন ধনীর মনের ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব যতই কেন বড় হউক না—দরিদ্রের দৈন্যের মধ্যে যে আত্ম-তৃপ্তি আছে তা আরও বড়।

৬

ভোরের তারা তখনও গগন-প্রাঙ্গনে উজ্জ্বল দিপ্তিতে বিকশিত হইয়া আছে। আলো-অন্ধকারের সন্ধিস্থলে পূর্ব্বাশার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সুবর্ণ রশ্মি-রেখা তখনও ফুটিয়া উঠে নাই। তখনও কুলায়-পাখী পাখা ঝাড়িয়া জাগিয়া সঙ্গীত সুধাধারা বর্ষণ করে নাই। তখনও শিশির-

সিক্ত তৃণদল মুক্তার মালা খুলিয়া ফেলে নাই। তখন পুরাঙ্গনার কিঙ্কিণীর শব্দ গৃহকাজে ঝঙ্কৃত হয় নাই। ঠিক সেই সময় ইন্দ্রনাথ খঞ্জনী লইয়া গৃহ ত্যাগ করিল। পথে বাহির হইয়া সে তার নবজীবনের নূতন গান গাহিল—

"সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কাণের ভিতর দিয়া　　মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ"

স্বপ্নাতুর নরনারীর আঁখি খুলিয়া গেল—শয্যায় শুইয়া শুইয়া তাহার গান শুনিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়া গায়কের স্বর বুঝিতে পারিয়া চমকিয়া উঠিল। সারা গ্রামখানি সে দিন ইন্দ্রনাথ গান গাহিয়া ফিরিলেন। অনেকের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলেন কিন্তু কেহ তাঁহাকে ভিক্ষা দিল না। তিনিও হাত পাতিতে পারিলেন না। সকলেই মনে মনে বলিল, এ একটা নূতন চাল—ইহার ভিতর কোনও ভীষণ মতলব আছে। এত বড় গ্রামের ভিতর একমুঠা তণ্ডুল জমিদার ইন্দ্রনাথের অদৃষ্টে জুটিল না। ইন্দ্রনাথ মনে মনে ভাবিল, যে কথা বলিয়া ভিক্ষা করিতে হয় তাহা নিশ্চয় সে জানে না। সেজন্য লোকে তাহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না। ভিক্ষা পাইবারও উপযুক্ত পাত্র হওয়া প্রয়োজন—তারও শিক্ষা থাকা চাই।

সেই সময় দূরে খঞ্জনীর শব্দ শ্রুত হইল। ভিখারিণী ধীরে ধীরে সুধাসিক্ত করুণকণ্ঠে গান গাহিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইতে ছিল—দূর হইতে ক্রমে গান নিকটতর হইতে লাগিল। আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া সুর ঝঙ্কৃত হইতেছিল—

"কেন বঞ্চিত হব চরণে।
আমি কত আশা করে'　　বসে আছি
পাব জীবনে না হয় মরণে॥"

ইন্দ্রনাথের হাতে খঞ্জনী স্তব্ধ হইয়া গেল। আত্ম-বিস্মৃতের মত শুধু গান শুনিতে লাগিলেন। এক পা আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তাহার হৃদয়ের পরতে পরতে সে সঙ্গীতধারা এক অননুভূত রসের সঞ্চার করিয়া দিল। সমস্ত হৃদয়ে আনন্দের পুলক-শিহরণ হইল। তিনি অনিমিষনয়নে পথের দিকে চাহিয়া আছেন। কিন্তু সে দৃষ্টি লক্ষ্যহারার মত—মনে হয় কোন অলক্ষ্যের পানে ছুটিয়াছে। তার পর পথের উপর ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন।

ভিখারিণী তাহার নিকট আসিয়া তাহার বেশভূষা ও খঞ্জনী দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। যেন পৃথিবীর মানুষ এক রাত্রির মধ্যে স্বর্গের দেবতা হইয়া গিয়াছে! ইনি না গ্রামের বিখ্যাত জমিদার? জমিদার কথাটী মনে করিতে তার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইয়া উঠিল।

বিশাখা মৃদু মধুরকণ্ঠে বলিল—"গান থামালেন কেন? আপনার গান যে আমাকে ডেকে এনেছে?"

স্বপ্নোত্থিতের মত ইন্দ্রনাথ অর্থহীন শূন্য দৃষ্টিতে একবার মাত্র সে আহ্বানে তাকাইল মুখ চোখের ভাবে বোধ হইল তিনি যেন তার পূর্ব্ব-স্মৃতিকে কোন অতল-গর্ভে হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

অসঙ্কোচে বলিলেন, "তুমি আমাকে ভিক্ষা করতে শেখাবে?

"আপনার অভাব।'

"সারা জীবন-ভরা অভাব। ভিক্ষা করে সেই জীবন-ভরা অভাব দূর করতে চাই। পারবে না আমাকে শেখাতে?"

"আপনাকে তিনিই শিখিয়েছেন। নইলে ঘর থেকে বাইরে এলেন কেমন করে।"

"কই হাত পাততে ত পাচ্ছি না?"

"লজ্জা, মান, ভয় ত্যাগ করুন—তাঁর নাম করুন। বদ্ধ-মুষ্টি প্রসারিত হয়ে যাবে। তাঁর নামে দৃষ্টিহীনও দেখতে পায়।"

তার পর ভিখারিণী তার ভিক্ষার ঝুলিটী ইন্দ্রনাথের পায়ের কাছে রাখিয়া, খঞ্জনী বাজাইয়া চলিয়া গেল। ইন্দ্রনাথ নির্ব্বাকবিস্ময়ে শুধু সেদিকে চাহিয়া রহিলেন।

তার পর দিন হইতে জমিদার ইন্দ্রনাথকে কেহ আর খুঁজিয়া পাইল না।

সারা গ্রামখানি বেড়িয়া দিবারাত্রি একটী আকুল কণ্ঠের ব্যাকুল সুর শ্রুত হইত, যাহা তিনি পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছিলেন—

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম……"

অস্ত্রোপচার

(চিত্রে নাটিকা)

[শ্রীনারায়ণচন্দ্র কুশারী]

ভূমিকা—ডাক্তার, নার্স ও রোগী

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

ডাক্তার ও নার্স।

রোগী ?

২য় দৃশ্য

রোগি পরীক্ষা।

রোগ কঠিন !

৩য় দৃশ্য

ব্যবস্থা—ইন্‌জেকশন

৪র্থ দৃশ্য

উপায় কি ?

—অপারেশন

৫ম দৃশ্য

দৃশ্যান্তর। বিষম রোগ।

৬ষ্ঠ দৃশ্য

আগে বিশ্রম্ভালাপ ;

পরে রোগী দেখা !

———

১ম
২য়
৩য়
৪র্থ
৫ম
৬ষ্ঠ
shari
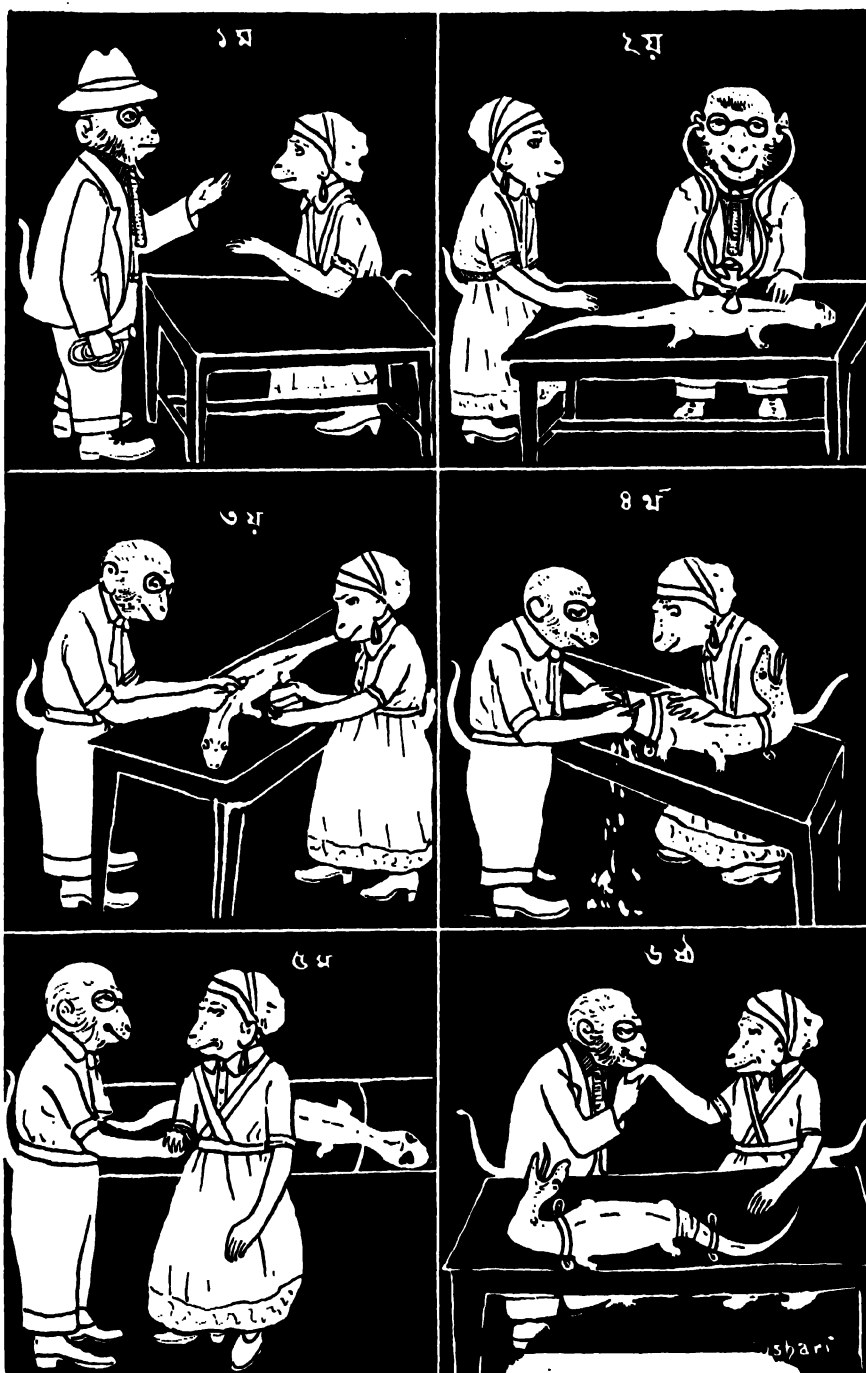
অস্ত্রোপচার

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

লাঙ্গুল-কর্ত্তন।

রোগী বন্ধন দশায়।

২য় দৃশ্য

কৃত্রিম লাঙ্গুল-সংযোগ

৩য় দৃশ্য

আহা হা! সেপ্টিক?

গলা কাটো!

৪র্থ দৃশ্য

কৃত্রিম মস্তক ও কাণ্ড-সংযোগ।

রোগীর কৃষ্ণ-প্রাপ্তি

৫ম দৃশ্য

—হ'লনা—

ব্যাটারী লাগাও!

৬ম দৃশ্য

Success!

রোগীর প্রেতাত্মার কৃত্রিম দেহে পুনরাগমন:

যবনিকা পতন

১ম
২য়
৩য়
৪র্থ
৫ম
৬ষ্ঠ
Kushari

গিরিশ-চিত্র

[শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু]

গিরিশচন্দ্র জীবন-চরিত লেখার বড় পক্ষপাতী ছিলেন না। বলিতেন, যার দরকার হবে, আমার লেখার মধ্যেই সে আমাকে খুঁজে পাবে। কিন্তু দেবতা পূজা না চাহিলেও ভক্ত তাহার প্রীতি-অভিষিক্ত নৈবেদ্য নিবেদন করে। বর্ত্তমান রেখাচিত্র সেই প্রগাঢ় প্রীতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি-নৈবেদ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ [illegible] অবতীর্ণ (খৃঃ ১৮৩৬) হইবার আট বৎসর পরে [illegible] গিরিশচন্দ্র জন্ম-(খৃঃ ১৮৪৪) গ্রহণ করেন। যে দীনবন্ধুর (খৃঃ ১৮৩০) 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিয়া বঙ্গরঙ্গভূমে এই অদ্বিতীয়-অভিনেতার প্রথম প্রতিষ্ঠা, তিনি তখন কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছেন; 'হুতোম'-রচয়িতা কালীপ্রসন্ন সিংহ (খৃঃ ১৮৪১), যিনি "গৈরিশী" ছন্দের পূর্ব্বাভাস দিয়াছিলেন, তিনি তখন তিন বৎসরের শিশু; বঙ্কিম, হেমচন্দ্র (খৃঃ ১৮৩৮) ষষ্ঠ বর্ষীয় বালক; মধুসূদন (খৃঃ ১৮২৪) বিংশতি বর্ষীয় যুবক; গিরিশ যাহাকে তাহার জীবন-দাতা

বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, সেই পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় (খৃঃ ১৮২০) তখন যৌবনের মধ্যাহ্ন-গরিমায়; গুপ্ত কবি (খৃঃ ১৮১১) খ্যাতি যশে প্রবীণ; দাশরথি (খৃঃ ১৮০৪) প্রৌঢ়বয়স্ক।

বাঙলায় তখন আলোক ও অন্ধকারের মধ্যযুগ। একদিকে পুরাতন যুগ অবসিত-প্রায়, অন্য দিকে নূতন যুগের অভ্যুদয়। একদিকে কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, দাশরথি এবং কীর্ত্তন, কথকতা, কবি, হাফ-আখড়াই, যাত্রা, পাচালির, যেমন প্রভাব ও প্রাদুর্ভাব, অন্য দিকে মহাত্মা রামমোহন রায়ের (খৃঃ ১৭৭৪) প্রচেষ্টায় তেমনিই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আদর্শের আবির্ভাব। পতিত ভূমিতে দেখিতে দেখিতে যেমন আগাছা গজাইয়া উঠে, বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে তেমনই ইংরাজী স্কুলের প্রতিষ্ঠা হইতেছিল। পরে যখন ভারতের তদানীন্তন রাজধানী সভ্যতার কেন্দ্র কলিকাতায় ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজ এবং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রামমোহন ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করিলেন, ক্রমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-প্রমুখ আচার্য্যগণের যত্নে ও চেষ্টায় আদি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল, তখন শালগ্রামশিলা অব্যবহার্য্য নুড়ির মত গড়াগড়ি খাইতে লাগিলেন। হিন্দুর সংস্কার আচার বলিয়া আর কিছুই রহিল না। প্রাচী ও প্রতীচীর এই ভাব-সঙ্গম যুগে গিরিশচন্দ্রের জন্ম। সাময়িক আবহাওয়ায় ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাব, প্রতিভাও অতিক্রম করিতে পারে না। এই জন্য তাঁহার রচনায় প্রাচ্যের আলোক ও প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীচ্যের ছায়াপাত হইয়াছে। কিন্তু যেখানে ধর্ম্ম, নীতি বা সমাজের সমস্যা, সেখানে তিনি দ্বিধাহীন দৃঢ়চিত্তে হিন্দুভাব ও সংস্কারের অনুসরণ করিয়াছেন। ইবসেন্-প্রণীত A Doll's House নামক নাটকের নায়িকা 'নোরা' পতি-প্রেমে প্রতারণা পাপে লিপ্ত হইতে কুণ্ঠিতা হয় নাই। কিন্তু "বলিদান" নাটকে স্বামীর তীব্র তাড়না সত্বেও পতিপ্রাণা "জোবি" দৃঢ় কণ্ঠে বলিতেছে, "আমি চুরি কর্‌ব না।

হিন্দুর দাম্পত্য নীতি পতিকে পরম দেবতাজ্ঞানে একনিষ্ঠ প্রীতি-ভক্তি-প্রেমদানের পক্ষপাতী হইলেও ধর্ম্মসঙ্গত আচরণে নারীর ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য বিকাশের বাধা কোথাও নাই। যে অব্যভিচারিণী সেবা ও ভক্তি দেব-বিগ্রহে অর্পিত হয়, স্বামীকে সজীব বিগ্রহজ্ঞানে সেই শ্রদ্ধা-প্রীতি দানই আর্য্যধর্ম্মের অভিমত। হিন্দুর বিবাহ যৌন-সম্মিলন নয়, আত্মার সহিত আত্মার প্রেম-বন্ধন। এই একনিষ্ঠ প্রেমই সতীত্ব এবং এই একনিষ্ঠ সাধনা হইতেই ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি এবং বিশ্ব-প্রেমের বিকাশ হয়। যুগ-পরিবর্ত্তনের পারিপার্শ্বিক এবং বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে এই সনাতন আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়া জাতীয় লক্ষ্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের পরলোক-প্রাপ্তির পর অষ্টাদশ বর্ষমাত্র অতীত হইয়াছে। তাঁহার জীবনী লিখিবার ঠিক সময় এখনও আসে নাই। অতি নিকট হইতে বৃহৎ পদার্থের সম্যক্ ধারণা হয় না। অতি দূরে তাহা ক্ষুদ্র দেখায়। প্রদীপের তলদেশ ছায়াচ্ছন্ন। ন্যূনাধিক চল্লিশ বৎসর কাল আমি সেই ছায়ায় বাস করিয়াছি। এই চল্লিশ বৎসরের ঘনিষ্ঠ সংসর্গে আমার মানসপটে গিরিশচন্দ্রের যে ভাবমূর্ত্তি প্রতিভাত হইয়াছে, আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহারই ছায়াচ্ছবি চিত্রিত করিবার প্রয়াস পাইব। বৃহৎকে ক্ষুদ্রাধারে সন্নিবিষ্ট করিলে তাহার যে দুর্গতি হয়, এ ক্ষেত্রে আমারও সেই আশঙ্কা। তার উপর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্মৃতি-চিত্র সকল সায়াহ্ন-দৃশ্যের ন্যায় ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে। এখন যাহা কিছু আছে, তাহাই পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

নিরপেক্ষ ভাবে গিরিশচন্দ্রের জীবনী লিখিবার কাল এখনও উপস্থিত হয় নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিবার এই উপযুক্ত সময়; কেননা ঐ সকল ঘটনার সত্যাসত্য নিরূপণ করিবার মত লোক এখনও জীবিত আছেন। কালে সে সকল কল্পনার আশ্রয়ে এরূপ বিশাল ও জটিল শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিবে যে গভীর গবেষণা বা প্রখর অনুসন্ধান তখন সত্যের সন্ধান মাত্র পাইবে না।

গিরিশের জীবন কর্ম্মবহুল হইলেও কবির প্রকৃত জীবন ভাবময়। এই সদানন্দময় পুরুষের জীবন-সহচর ছিল দুঃখ। তাঁহার চক্ষুদ্বয় ছিল বিশাল এবং উজ্জ্বল, কিন্তু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে মনে হইত, সে চোখের পিছনে শোক যেন নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। কবির শিক্ষাস্থল বিশ্ববিদ্যালয় নহে, প্রকৃতির পাঠশালা। কিন্তু

প্রকৃতি কঠোর শিক্ষয়িত্রী। দুঃখ-শোক-লাঞ্ছনার বহুল ঘাত-প্রতিঘাত-সংঘর্ষে গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইয়াছিল। ফুল যখন সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া সৌরভ বিস্তার করে, তখন বুঝায় না যে, কত প্রতিকূল শক্তির সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিতে করিতে দিনের পর দিন কঠিন মাটী হইতে রস সঞ্চয় করিয়া সূর্য্যের প্রখর তাপে সে আত্ম-বিকাশ করিয়াছে এবং রস-পিপাসু ভৃঙ্গকে হৃদয় মধু-দান করিতেছে।

পিতার আদরে ও মাতার হতাদরে গিরিশের বাল্য-জীবন গঠিত। বহু বিপরীত ভাবের অপূর্ব্ব সমাবেশে ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে গিরিশের নিজ জীবন ও চরিত্র এক খানি জীবন্ত নাটক ছিল। বিধাতা যেন তাঁহাকে নাট্যকার রূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। "একাধারে এমন ঔদাস্য ও আমোদ-প্রিয়তা, আলস্য ও উদ্যম, ধৈর্য্য ও চাঞ্চল্য, সাহস ও ভয়, গর্ব্ব ও বিনয়, ক্রোধ ও ক্ষমা; এমন দীর্ঘসূত্রতা, বিচারশীলতা ও হঠকারিতা, দম্ভ ও দীনতা, ভাবুকতা, ভাব-প্রবণতা ও বিষয়বুদ্ধির একত্র অধিষ্ঠান; এমন সংশয় ও বিশ্বাস, জড় ও অতীন্দ্রিয়-জড়িত, সদসৎ কর্ত্তৃক সমভাবে চালিত, দেব-দানব আশ্রিত, মমতা ও বৈরাগ্যমিশ্রিত, এমন পুরুষকার ও নির্ভর-পরায়ণ অদ্ভুত প্রকৃতি সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না।" এই সকল বিরোধী গুণের একত্র সন্নিবেশ দেখিয়া কোন এক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, "গিরিশ ঘোষকে যতই দেখ্‌ছি ততই মনে হচ্ছে, চিনতে পারছিনি।" গিরিশ একাধারে মানব ও ভৈরব ছিলেন।

একদিকে গিরিশ যেমন সাহসী ছিলেন, অন্যদিকে তেমনই ভীরু। কোন সময় তিনি এক জন সাঁওতাল্ সঙ্গে সাঁওতাল্ পরগণার একটী পাহাড় দেখিতে যান। সন্ধ্যা হয় হয়, দূরে ব্যাঘ্র-গর্জ্জন শোনা গেল। সাঁওতাল্ বলিল, বাবু, ঘরকে চল্। গিরিশ জিজ্ঞাসিলেন, কাছে কোথাও গুহা আছে? সাঁওতাল গুহা দেখাইয়া বলিল, ওখানে দেও আছে। গিরিশ ভাবিলেন, ভূতকে দুট' মিনতি করে বললে শুনবে, বাঘ কোন কথাই মান্‌বে না। তিনি সেই গুহা মুখে আপনার চাদরখানি পুড়াইয়া ও শুষ্কপত্রে অগ্নি জ্বালাইয়া তাহার ভিতরে রাত্রি যাপন করেন। অন্য-দিকে দেখিয়াছি, তাঁহার এমন রাত ছম্ ছম্ করিতেছে, যে গায় হাত দিয়া কাছে বসিয়া না থাকিলে ঘুমাইতে পারিতেছেন না।

গিরিশের চরিত্রের এই বিপরীত ভাবসমূহ দৃষ্টান্তদ্বারা বিশদভাবে বুঝাইতে হইলে বাজারে প্রচারিত জীবন-চরিত ছাড়া আরও এক খানি জীবন-চরিত লিখিতে হয়। আমি মোটামুটি দুই-চারিটা কথা বলিব। জীবনের নগণ্য আচরণে মানুষ আপনাকে ধরা দেয়, বৃহৎ অনুষ্ঠান সে সতর্ক হইয়া করে। গিরিশচন্দ্রের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে তাঁহার দৈনন্দিন আচরণ ও ব্যবহারের ভিতর দিয়া বুঝিতে হইবে।

কার্য্যের সময় গিরিশ অক্লান্ত, শত হস্তে কাজ করিতেন। কিন্তু অন্যদিকে, চলিত কথায় যাহাকে গেঁতো বলে, তিনি ছিলেন তাহার প্রতিমূর্ত্তি। নাট্যকার ও বাগ্মী শেরিডনের সঙ্গে সমস্বরে বলিতেন—Never to do today what you can put off till to-morrow'—যে কাজ কাল্‌কের জন্য ঠেলে রাখা যায়, আজ তা কদাচ করবে না।

একদিকে গিরিশ ছিলেন যেমন ধৈর্য্যশালী, অন্যদিকে তেমনই ব্যস্তবাগীশ। যে কেহ তাঁহাকে কোন কার্য্যের জন্য সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে অথবা নাট্য-শিক্ষাদানের সময় লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার অবিচলিত ধৈর্য্যের কথা অবগত। বিশেষ নায়ক-নায়িকা, বা প্রতিনায়ক-প্রতি-নায়িকার শিক্ষায়। অন্য ভূমিকায় প্রায়ই অপর ব্যক্তি শিক্ষা দিতেন। পাত্র বা পাত্রী তাঁহার যত্নের দান গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। হতাশে অবসন্ন হইয়া অব্যাহতি চাইতেছে। গিরিশ কিন্তু অজেয় উৎসাহে পুনঃ পুনঃ অভিনয় করিয়া তাহাকে শিক্ষা দিতেছেন, এই দেখ কত সহজ। তুমি কখনও এরূপ অবস্থাগত কাহাকে দেখ নাই? মনে করে দেখ, এরূপ অবস্থায় ঠোঁটের কোণ্ এমনি কুঁচকে যায়। চোখের ভাব এম্‌নি হয়। কপালের শির ফুলে ওঠে। তার কথায় এমনি জড়তা আসে। এমনি করে চলে ইত্যাদি। এমনই ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইতেছে, গিরিশের বিরাম নাই। শরীরের, বিশেষতঃ মুখের মাংস-পেশী, শির—শিরার উপর তাঁহার অনন্যসাধারণ আধিপত্য ছিল। আবার অন্যদিকে, কোন প্রয়োজনীয় সংবাদের জন্য কাহাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন। প্রায়ই দেখা যাইত,

কল্পিত বিলম্বের ব্যগ্রতায় গিরিশ তাঁহার বসিবার কক্ষের সম্মুখস্থ ছাদে দ্রুত-পাদচারণা করিতেছেন, অথবা উত্তেজনায় বাড়ীর মোড়ে গিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আবার রচনায় মনের মত একটা কথা খুঁজিয়া পাইতেছেন না, দিনের পর দিন তাহার জন্য হাওয়ায় ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া আছেন।

আপনার রচনা-সম্বন্ধে এরূপ স্থির-বিশ্বাসী ব্যক্তি প্রায় দেখা যায় না। বলিতেন, যদি রক্ষা করিবার মত এক ছত্রও কেউ লেখে, কাল সেটীকে সযত্নে তুলে রাখ্‌বে। তার জন্য তোমার আর চেষ্টা কর্‌বার দরকার নেই। তিনি বলিয়া যাইতেন, এক জন লিখিত। লেখা শেষ হইলে তিনি মুদ্রাঙ্কনের জন্য বড় ব্যস্ত হইতেন না। ছাপার ভুলের জন্যও তাঁহাকে কখনও চিন্তিত হইতে দেখি নাই। বলিতেন, যিনি সমঝদার, তিনি বুঝিয়া লইবেন। "সীতার বনবাস" নাটকে রাবণ-নিধনের পর শ্রীরামচন্দ্র মন্দোদরীর চিত্র দিতেছেন—

'মন্দোদরী এলায়িত বেণী,
ভুনয়নে প্রবাল নিঝর্র স্রোত,
কাঁদিল রূপসী—"

পুস্তকে ছাপা হইল, 'প্রবল নিঝর্র স্রোত।' এ সম্বন্ধে গিরিশের মনোযোগ আকর্ষণ করিলে বলিলেন, শুদ্ধি-অশুদ্ধি পত্রের প্রয়োজন নেই, লোকে বুঝে নেবে। রচনারম্ভে তাঁহার দীর্ঘ-সূত্রতা দেখিয়া রঙ্গালয়ের সত্বাধিকারিগণ কখন কখন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেন। একবার লেখায় কিন্তু হস্তক্ষেপ করিলে কার্য্য আপনার উত্তেজনায় আপনি অগ্রসর হইত। গিরিশ তখন যেন কোন অলক্ষ্য যন্ত্রীর যন্ত্র-স্বরূপ হইয়া থাকিতেন। বলিতেন ঠিক যেন ঘাড়ে ভূত চাপে।

গিরিশের দর্প ছিল, 'দেব-গুরু-প্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী'। কিন্তু কোন সময় তাঁহার জীবনী লিখিবার প্রস্তাব উত্থাপন করায় অতি দীনভাবে বলিয়াছিলেন—ছি ছি আমার আবার জীবনী! তাঁহার চরিত্র বহুদোষের আধার ছিল বলিয়া যে এরূপ বলিতেন তাহা নহে! দোষগুণ তিনি কিছুই গোপন করিতেন না। বলিতেন—Paint me as I am'—আমি যেমন তেমনই অঙ্কিত কর। দীনতায়-আপনাকে 'নেটো গিরিশ ঘোষ' বলিয়া পরিচয় দিতে তিনি কখন সঙ্কোচ বোধ করিতেন না।

প্রচণ্ড ক্রোধের বশীভূত হইয়া ন্যায়-অন্যায়ে গায়ে হাত তুলিতে গিরিশের কখনই কুণ্ঠা হইত না। কিন্তু অপরাধ যতই গুরুতর, অমার্জ্জনীয় হউক, তাঁহার উদার ক্ষমা-শীলতায় সবই ভাসিয়া যাইত।

যৌবনে পান, তামাক, সুরা, পুরাণ-প্রসঙ্গ, রঙ্গভূমি ও ও অধ্যয়নে গিরিশের বিশেষ আসক্তি ছিল। যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণাশ্রিত গিরিশচন্দ্রকে তাঁহার জীবন-সায়াহ্নে দেখিয়াছেন, তাঁহারা এ চিত্রের সহিত পরিচিত নহেন। জীবনের শেষভাগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসঙ্গ ব্যতীত তাঁহার মুখে অন্য কোন প্রসঙ্গ বড় শুনা যাইত না।

গিরিশচন্দ্রের হৃদয় ছিল অকপট স্নেহময়, আন্তরিকতা ছিল তাঁহার প্রধান গুণ, আর বালকের সারল্য তাঁহার স্বর্গীয় ভূষণ। তাঁহার চিত্ত ছিল যেমন স্বচ্ছ, অন্তর ছিল তেমনই প্রশস্ত, উদার; মনের গোপন কোণে কোথাও চোরকুটুরি ছিল না। তাঁহার দেহে ছিল যেমন মত্ত হস্তীর বল, মনে ছিল তেমনই পুরুষোচিত পৌরুষ। ভোজন-প্রিয় গিরিশচন্দ্রের আহার করিবার অসীম শক্তি ছিল।

গিরিশ প্রথম জীবনে দাসত্ব করিতেন কিন্তু কখন আত্ম-সম্মান বিসর্জ্জন দেন নাই। যে আপিসে (Atkinson Tilton & Co.) তিনি কর্ম্ম করিতেন, সেখানে একবার এক আহেলা-বিলাত আসিয়া নিয়ম জারি করি-লেন, তিনি ঘণ্টা বাজাইলে কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। প্রত্যেক কর্ম্মচারীর জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার ঘণ্টা বাজিত। এইরূপে গিরিশের এক দিন ডাক পড়িল। অন্যান্য কেরাণী ছুটিয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, গিরিশ কিন্তু নড়িলেন না। ঘণ্টাবাদক অবশেষে মহা বিরক্ত হইয়া বড় সাহেবের কাছে নালিশ করিলেন। অ্যাট্‌কিন্‌সন্ গিরিশকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ছোট সাহেব ডেকেছিলেন, তুমি শোননি কেন?

উত্তর—কৈ! ছোট সাহেব ত আমাকে ডাকেন নি!

আহেলা-বিলাত অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন, কি! আমি পুনঃ পুনঃ ঘণ্টা বাজিয়েছি।

মুচ্‌কিয়া মুচ্‌কিয়া হাসিতে হাসিতে বড় সাহেব গিরিশের মুখের দিকে চাহিলেন। গিরিশ বলিলেন,

সাহেব—I am not accustomed to move by the bell—ঘণ্টার আওয়াজের সঙ্গে নড়া-চড়া করা আমার অভ্যাসও নাই, স্বভাবও নয়।

অ্যাট্‌কিন্‌সন্‌ বলিলেন, ঠিক! গিরিশ আমার আপিসের মান রক্ষা করেছে। ভদ্রলোকে ও বেহারাতে যে পার্থক্য আছে, তা গিরিশই বুঝিয়েছে। ওকে পুরস্কার দেওয়া উচিত। ও নিয়ম তুলে দাও।

অত্যধিক আমোদপ্রিয়তাই ছিল গিরিশ-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহারই অসংযত প্রভাবে তিনি কুপথে-সুপথে সমভাবে চালিত হইয়াছেন। কিন্তু যে আমোদ যখনই বিস্বাদ বোধ হইত, মধু পানান্তে ভৃঙ্গ যেমন পুষ্পকে পরিত্যাগ করে, তিনি তখনই তাহাতে ঔদাস্য প্রদর্শন করিতেন। কেবল শেষ-জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশ্রয়ে উচ্চ আমোদের আস্বাদ পাইয়া চেষ্টা সত্ত্বেও হীন আমোদে রত হইতে পারেন নাই। কিন্তু বলিতেন, পরমহংস দেবের সঙ্গতেও যদি আমোদ না পেতুম, আমি যেতে পারতুম না। 'গৃহলক্ষ্মী' নাটকে উপেন্দ্র বলিতেছেন, "উচ্চ আমোদের আস্বাদ না পেয়ে নীচ আমোদে রত হয়েছে। সঙ্গগুণে বুঝেছে, জীবনের সার এই কুৎসিত আমোদ।" এ তিরস্কার গিরিশচন্দ্র নিজেরই প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ এই ঔদাসীন্যবশতঃ তিনি অধোগতি হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। সঙ্কটে, উদ্বেগে, উৎকট দুশ্চিন্তায় এই ঔদাসীন্য হেতুই কখন তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইত না। বলিতেন, আমি সব বাইরে রেখে মশারির ভিতর ঢুকি।

এই নাট্যকবির নিজ জীবনে প্রধানতঃ যে কয়েকটী দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল, সংক্ষেপে তাহারই সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব। প্রথম সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব। যৌবনের প্রারম্ভে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া কোন একটী সম্পত্তি রক্ষা না করায় ঘরে-পরে তাঁহার বিস্তর লাঞ্ছনা ঘটিয়াছিল। পাড়ার লোকে তাঁহাকে বোকা বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল। গিরিশ মনে মনে স্থির করিলেন, বিধিমত মিথ্যার আশ্রয় লইয়া চতুর নাম কিনিব। বাল্যবয়সে কোন অন্যায় কর্ম্ম করিলে মাতার দণ্ড-ভয়েও যিনি কখন মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, অন্যায়রূপে আহত হইয়া অভিমানে ও গর্ব্বে এখন হইতে তিনি প্রয়োজন হইলে সত্য পথ ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু সত্যের প্রতি দৃঢ় ভক্তি ও অনুরাগ কখন তাঁহার হৃদয়কে পরিত্যাগ করে নাই। তাঁহার অন্তরের অনুতাপ সময় সময় তাঁহার রচনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শেষ-জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'গিরিশ সত্য মিথ্যার পার।'

গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় দ্বন্দ্ব সুরার সহিত। এই সর্ব্বনাশীর আকর্ষণ ও মোহিনী প্রভাব তিনি গদ্যে পদ্যে বহুবার বলিয়াছেন। 'প্রফুল্ল' নাটকে যে যোগেশ চরিত্র তিনি অপূর্ব্ব কৃতিত্বের সহিত চিত্রিত করিয়াছেন, তাঁহার সম অবস্থাপন্ন হওয়া তাঁহার পক্ষে কিছুই বিচিত্র ছিল না। কিন্তু এক অদৃশ্য শক্তি তাঁহাকে চিরদিন রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। শেষ-জীবনে গিরিশ বলিতেন, জন্ম হইতে গুরু আমাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। নাস্তিকতার দম্ভে তাহা বুঝিতে পারি নাই।

গিরিশের তৃতীয় দ্বন্দ্ব কল্পনা ও কর্ম্ম-শক্তিতে। কল্পনা কর্ম্ম-শক্তিকে গ্রাস করিয়া কত কবি-জীবন যে ব্যর্থ ও নিষ্ফল করিয়াছে তাহা বলা যায় না। গিরিশ এ দ্বন্দ্বেও জয়ী হইয়াছিলেন।

চতুর্থ দ্বন্দ্ব—সংশয়ে ও প্রত্যয়ে। তাঁহার রচনার স্থানে স্থানে ইহার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

পঞ্চম দ্বন্দ্ব—এক দিকে ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির প্রলোভন, অন্য দিকে উচ্চ প্রকৃতির আকর্ষণ।

ষষ্ঠ দ্বন্দ্ব—হৃদয় ও মস্তিষ্কে। হৃদয় চাহিতেছে ঈশ্বরাশ্রয়, বুদ্ধি বলিতেছে—কেহ কোথাও নাই শূন্য—শূন্য।

যৌবনে গিরিশচন্দ্র ঘোর নাস্তিক ছিলেন। কয়েক জন বন্ধুসহ এক সময় তিনি এক গিরি-গুহায় অবতীর্ণ হন। নামা গেল বেশ, কিন্তু উঠিবার পথ পাওয়া যাইতেছে না। ওদিকে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। গিরিশের বন্ধুগণ বলিলেন, তুই নাস্তিক, তোর জন্য আমরাও মরতে বসেছি। তুই ভগবানের নাম কর! গিরিশ সকলের পীড়াপীড়িতে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিলেন। তার পর একটা সোজা পথ আবিষ্কৃত হইল। গিরিশ উপরে উঠিয়া বলিলেন, যদি কখন ভালবাসায় ভগবানের নাম করতে পারি, তবেই করব, নইলে নয়। অনেক হৃদয়-দ্বন্দ্বের পর তাঁহার ভক্তি, বিশ্বাস দৃঢ় হইলে

বলিয়াছিলেন, এমন পাপ সৃষ্টি হয় নাই, যাহা ঈশ্বরের নামে নির্ম্মূল না হয়, এমন দুঃখও সৃষ্টি হয় নাই, যাহা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হ'লে দূর না হয়। কিন্তু এই আমূল পরিবর্ত্তন হইতে তাঁহাকে কত যে ওলট্-পালট্ খাইতে হইয়াছিল, অন্তর্দ্বন্দ্বে অশ্রুধারে তিনি কত বিনিদ্র রজনী যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা একমাত্র তাঁহার অন্তর্যামীই অবগত।

এই সকল দ্বন্দ্বের অবসান হইয়াছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বকলম দিয়া। এই পুরুষোত্তমের আশ্রয়লাভের (খৃঃ ১৮০৪) পর গিরিশচন্দ্রের সকল নাটকেরই প্লট্ ও চরিত্রের পরিকল্পনা শ্রীপরমহংসদেব ও শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীর আলোকে ও প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত।

মোটামুটী এই কয়েকটী দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ উল্লিখিত হইল। গিরিশের জীবন ছিল দ্বন্দ্বসংঘর্ষময়। নারীজাতির প্রতি অসীম সহানুভূতি তাহার চরিত্রের আর একটী বৈশিষ্ট্য। অথচ বিশ্বাস ছিল 'স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী'।

নিন্দা বা সুখ্যাতিতে গিরিশকে কখনও বিচলিত বা অসাফল্যে হতাশ হইতে দেখি নাই। নিষ্ফলতা বরং তাঁহাকে অধিকতর উৎসাহ প্রদান করিত।

গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিশক্তি ছিল অদ্ভুত রকমের। সাধারণতঃ তিনি যখন যেভাবে থাকিতেন, সকল ভুলিয়া তাহাতেই মগ্ন হইয়া থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার স্মৃতির ছিল অফুরন্ত ভাণ্ডার। তিনি যাহা কিছু দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন বা যে কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, সব স্মৃতির ভাণ্ডারে গচ্ছিত থাকিত এবং প্রয়োজনমত তাঁহাকে যোগাইয়া দিত। এমন কি রচনার সময় আবশ্যক হইলে শৈশবে দৃষ্ট দৃশ্য ও ঘটনা তাঁহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিত।

গিরিশচন্দ্রের হৃদয় ছিল যেমন ভালবাসাময়, প্রকৃতি ছিল তেমনই স্বাধীন, আর স্বভাব ছিল তেমনি মুক্ত। এমন কি বদ্ধ-স্থানে বাস করিতেও তাহার হাঁপ ধরিত। বৃষ্টির ছাটে ঘর ভাসিয়া যাইতেছে, কিন্তু দরজা জানালা বন্ধ করা হইবে না। গিরিশ ঘরের এক কোণে এক খানি লেপ জড়াইয়া বসিয়া আছেন।

একদিকে গিরিশ অত্যন্ত রাশভারি লোক ছিলেন। তিনি গম্ভীরভাব ধারণ করিলে সহসা কেহ তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইতে সাহস করিত না। অন্য দিকে তিনি শিশুর ন্যায় চঞ্চল-প্রকৃতি ছিলেন।

একস্থানে অনেকক্ষণ স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেন না, বিশেষ রচনার সময়। ভাবের উত্তেজনায় প্রায়ই ছাদে বেড়াইতেন। বৈজ্ঞানিক মতে কবি এবং উন্মাদ এক শ্রেণীভুক্ত, ইহাদের স্নায়ুমণ্ডলী সর্ব্বদাই চড়া সুরে বাঁধা থাকে (High strung) গিরিশ ইহার চরম দৃষ্টান্ত ছিলেন। ক্রমান্বয়ে একভাবের আঘাত সহিতে পারিতেন না। এক দিন কতকগুলি দোলন-চাঁপা ফুল গ্লাসে জল দিয়া বোঁটা ভিজাইয়া আমি তাঁহার শয়ন কক্ষে রাখিয়া আসি। ফুলের মৃদু গন্ধে ঘর আমোদিত। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে গিরিশের পক্ষে তাহা দুঃসহ হইয়া উঠিল। ফুলগুলিকে স্থানান্তরে রাখিয়া তবে তিনি ঘুমাইলেন।

নিদ্রার পূর্ব্বে গাত্রসম্বাহন তাঁহার নিত্য অভ্যাস ছিল এবং কেহ ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিলে তিনি ভয়ানক রাগিয়া উঠিতেন। এমন কি কখন কখন তজ্জন্য হাত-পাও চলিত। একবার এক নূতন চাকর তাঁহার গা টিপিতে বসিল। গিরিশ বলিয়া দিলেন, দরজায় খিল দে। কেউ না হঠাৎ খুলে আমার ঘুম ভাঙ্গায়। আমি ঘুমুলে তুই আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাস্। সে ব্যক্তি গা টিপিয়া তাঁহাকে ঘুম পাড়াইল। তার পর বাহির হইবার সময় তাহার হুঁস হইল, তাই ত, দরজায় খিল! সে বহুক্ষণ বাহির হইবার চেষ্টার পর ডাকিল, বাবু, বাবু! হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে গিরিশ উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু হাত-পা চলিবার পূর্ব্বেই চাকর বলিল, বাবু তুমি ত বল্লে, আমি ঘুমুলে চলে যাস। দোরে খিল, আমি বারাই কেমন করে। ঘটনা বা অবস্থার কৌতুকের দিক্‌টা নজরে পড়িতে তাঁহার বেশি বিলম্ব হইল না। গিরিশ মনে মনে হাসিয়া জিজ্ঞাসিলেন, জানলা, নর্দ্দামা দিয়ে বেরুবার চেষ্টা করেছিলি? চাকর বলিল, করিনি! বারাতে লারনু।

গিরিশের কথাবার্ত্তা ছিল যেমন অস্পষ্ট রচনা তেমনই সুস্পষ্ট। অভ্যস্ত না হইলে তিনি কি বলিতেছেন সহজে বুঝা যাইত না। কিন্তু তাঁহার ভাষা যেমন সুমিষ্ট, সুললিত, ভাব তেমনই সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত। প্রেম-প্রসঙ্গ ছিল তাঁহার প্রধান বিষয়। এই প্রেমকে তিনি কত ভাবেই না অঙ্কিত করিয়াছেন! তাঁহার রাবণ লম্পট

হইলেও সীতার প্রেমাকাঙ্ক্ষায় আকুল। দক্ষযজ্ঞে লিখিয়াছেন—"প্রেমডুরি সৃষ্টির বন্ধন।" "প্রেমে কুঞ্চিত হৃদয় বিকসিত হয় (মুকুল-মুঞ্জরা)।" "প্রেম ব্যভিচারীকে দেবতা করে (বলিদান—দুলালচাঁদ)" এই "দুলাল" চরিত্র লইয়া সে সময় বহু তর্ক-বিতর্ক উঠিয়াছিল—পিতার সমক্ষে অসংযত রস-ভাষ প্রয়োগ অস্বাভাবিক, কিন্তু দুলালচাঁদের ভাষায় ত রসিকতা নাই। দুলালের সকল কথাই তাহার বিকৃত স্বভাবের উক্তি। মাতা-পিতার অসম্ভব আদরে সে যেমন চরিত্র সংযত করিতে শিখে নাই, তেমনই জিহ্বাও সংযত করিতে পারিত না। পিতৃচরিত্রের আদর্শে চরিত্র-শৈথিল্য তাহার ধারণায় দোষাবহ নহে। সারল্য ও আন্তরিকতা তাহার নিজস্ব সম্পত্তি। সকল দোষই সে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত।

যে চরিত্রের বীজ দেখেন নাই, গিরিশ সে চরিত্র অঙ্কিত করিতেন না। দুলাল-চরিত্র আমরা দেখিয়াছি, তবে বিরল সন্দেহ নাই। গিরিশ এই চরিত্র বুঝাইবার জন্য কত না কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। দুলালের কেবল প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিকৃত নহে, সে বিকলাঙ্গ—খঞ্জ ও কুব্জ। গিরিশ চরিত্রের নাম করণ করিয়াছেন—দুলাল। কিন্তু পরিণামে প্রেম তাহাকে দিব্য জ্যোতি-র্মণ্ডিত করিয়াছে। প্রেমের জন্য স্বর্গের অপ্সরা মর্ত্তবাসিনী (তপোবল—মেনকা)। প্রেমে তৃতীয় নয়ন প্রস্ফুটিত হয়,—ভূত ভবিষ্যৎ কিছুই অগোচর থাকে না (কালা-পাহাড়—চঞ্চলা, ভ্রান্তি—অন্নদা, শিবাজী—পুতলাবাই)। প্রেমে মোহ দূর হয় (স্বপ্নের ফুল)। গিরিশচন্দ্রের রচনায় বহুস্থলে প্রেমের বিজয়গান শুনা যায়। "প্রেম পরম বস্তু" (মুকুল-মুঞ্জরা ও ভ্রান্তি)।

গিরিশ পৌরাণিক চরিত্রের অদ্বিতীয় চিত্রকর। এ ক্ষেত্রে সময় সময় তিনি যে সকল আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছেন, তন্মধ্যে আমরা একটী মাত্র উল্লেখ করিব—জনায় মাতৃ-চরিত্র। জনা—মাতা। প্রয়োজন হইলে পতিকে পদ-দলিত করিয়া যে মা সন্তানকে বরাভয় প্রদর্শন করে, সেই মা—ভারতের আদর্শ মাতৃমূর্ত্তি—রণরঙ্গিণী জগজ্জননী।

"চন্দ্রা" উপন্যাসে এই মাতৃ-চিত্রের বিভিন্ন বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়—"[illegible]" চরিত্রে। নিজ শিশু সন্তানকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া প্রসূতি পাগল হইয়া যায়। কিন্তু তদবধি তাহার কল্পনা সেই শিশুকে লইয়াই বিভোর হইয়া থাকে। শিশু তাহার কল্পনায় দিনে দিনে বাড়িয়াছে। গিরিশ বলিতেন, কল্পনা সত্যদর্শী। সুদীর্ঘ-কাল পরে পাগলী আপনার পুত্রকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ চিনিল, এই আমার পুত্র! যমরাজ ফিরিয়ে দিয়েছে।

কথায় ছবি আঁকা গিরিশচন্দ্রের রচনার বৈশিষ্ট্য। আমাদের বক্তব্য বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য দু'একটী উদাহরণ দিব। শ্মশানের চিত্র দেখুন—

"তুমি আমি দুইজনে হেরিব শ্মশান
বিভূতি-ভূষিত
ধক্ ধক্ চিতানল ভালে দীপ্তিমান্,
গণ্ডগোল শিবার সঙ্গীত।
(কবিতা)

সাগরের চিত্র—

অনন্ত নীলিমা ব্যাপিত সাগরকায়া,
ঘোর নাদে তরঙ্গের খেলা,
জটাজুট শিরে
নাচিছে ভৈরব যেন ঘোর রণস্থলে।
(সীতার বনবাস)

গিরিশচন্দ্রের গান তাঁহার আর এক বৈশিষ্ট্য। তাহাও এক এক খানি চিত্র—কখনও হৃদয়ের, কখন অন্তর ও বহির্জগতের এবং সকল গুলিই ভাবে-রসে ওতপ্রোত। তাঁহার কোন কোন সঙ্গীতে অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা ধ্বনিত হয়। একটা উদাহরণ—

অলি ব্যাকুল কাঁদিছে গুঞ্জরি লো
নাহি হেরি কুসুম-মুঞ্জরি লো।
চিত চঞ্চল ধাইছে সরোবরে,
গুণ গুণ স্বরে মনোব্যথা কহে সকাতরে,
শূন্য সরোনীর নেহারি লো॥
(সীতার বনবাস)

সীতা নির্ব্বাসিতা হইবার পূর্ব্বে এ সঙ্গীত রামচন্দ্র ও অযোধ্যার ভাবী অবস্থার আভাস।

তাঁহার নাটকের স্থানে স্থানেও এরূপ ব্যঞ্জনা আছে। পাপাচারে উত্তপ্ত-মস্তিষ্ক চণ্ডাশোক সারারাত্রি বিনিদ্র থাকিয়া প্রশ্ন করিতেছেন—[illegible]

দিতেছে—অরুণ উদয় হয়েছে। ইহা অশোকের ভাবী পরিবর্ত্তনের ব্যঞ্জনা।

কঠোর সাধনারত ভগবান্ বুদ্ধদেবকে মিতাচার অবলম্বনের ইঙ্গিত করিতে হইবে। ধর্ম্মের অনুশাসন—যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু" (গীতা ৬—১৭) গিরিশ সুললিত ভাবে এবং ভাষায় এই একই নীতি ব্যক্ত করিয়াছেন —

"আমার এ সাধের বীণে যত্নে গাঁথা তারের হার।
যে যত্ন জানে বাজায় বীণে উঠে সুধা অনিবার॥
তানে মানে বাঁধ্‌লে ডুরি তারে শত ধারে বয় মাধুরী
বাজেনা আল্‌গা তারে টানে ছেঁড়ে কোমল তার।"

আমরা একটা উদাহরণ দিলাম। এই ভাবের বহু সঙ্গীত তিনি রচনা করিয়াছেন।

গিরিশের সঙ্গীতেরও বৈশিষ্ট্য ছিল, এক সাটের কথা ব্যবহার। যে লোকের মুখে সঙ্গীত যোজনা করিতেন, তাহারই ভাষায় গান রচিত হইত। চল্‌তি কথাবার্ত্তার ভাষার সহিত কখনও সাধু ভাষা মিশাইতেন না। যে-ভাবের গান সেই সাটের কথাই ব্যবহার করিতেন। তাঁহার শব্দ-সম্পদ ছিল অফুরন্ত। নিম্নলিখিত প্রকারের ত্রিপদী—প্রতিছত্রে তিনটি করিয়া মিল যথা—

"দেহ পরিচয়, জুড়াও হৃদয়, শুনি প্রেমময় বাণী।"

তিনি অজস্রল বলিয়া যাইতেন। বরং নদীর স্রোতে কখন বাধা পড়ে, কিন্তু তাঁহার মুখে মুখে রচনায় কখন বাধা পড়িতে দেখি নাই। সময় সময় লিপিবদ্ধ করা লেখকের পক্ষে দুষ্কর হইত। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন ও গিরিশচন্দ্রের যে সকল পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেই ভাষা সম্বন্ধে গিরিশের নিজের কৈফিয়ত আছে। অধিকন্তু কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

গিরিশচন্দ্র শেষ-জীবনে শেষ শয্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসঙ্গ লইয়াই থাকিতেন। উঠিতে বসিতে, এক খানি চিঠির খাম খুলিতে "জয় রামকৃষ্ণ" বলিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বকলম দিবার পর ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সহস্র-দল পদ্মের ন্যায় তাঁহার ওই ভাব ফুটিতেছিল। নির্ভর কি, তাহার অবয়বী মূর্ত্তি তাঁহাতেই দেখিয়াছি। গিরিশ বলিতেন নির্ভর সোজা কথা নয়। টিকটিকির মত হাত পা ছেড়ে দিয়ে পড়্‌তে হবে। শেষজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে যেন আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, গুরু যেন সখী। যতদিন না শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন হয়, ততদিন সখীর কাজের বিরাম নাই, সেইরূপ যতদিন না ইষ্টের সহিত সাধকের মিলন হয় ততদিন গুরুর কাজের শেষ নাই। গুরু পরিশেষে ভক্তকে ইষ্টমূর্ত্তির সম্মুখে আনিয়া বলেন, ও শিষ্য ঐ দেখ! বলিয়াই অন্তর্হিত হন। গুরুর সহিত এইরূপ অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদে ব্যাকুল হইয়া গিরিশ প্রশ্ন করেন, গুরু তখন কোথায় যান, মশাই! শ্রীরামকৃষ্ণদেব তদুত্তরে বলেন, গুরু ইষ্টে লয় হন।

গিরিশচন্দ্র লোকান্তরিত (খৃঃ ১৯১২ হইবার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার শেষ-শয্যায় শক্তিজিতপুর বারুইখালী গ্রাম-নিবাসী শ্রী বিষ্ণুচরণ তর্করত্ন মহাশয় তাঁহাকে নিত্য অপরাহ্নে দেবতার স্তবপাঠ করিয়া শুনাইতেন। লোকান্তরিত হইবার প্রায় একপক্ষ পূর্ব্বে গুরুগতপ্রাণ গিরিশ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, আপনি উপনিষদ্ হইতে অরূপ সম্বন্ধে কিছু বলুন। তাহাতে বন্ধুবর কুমুদবন্ধু সেন মহাশয় বলেন, আপনি ও নিত্য (গিরিশ ঈশ্বরীয় মূর্ত্তিকে নিত্য বলিতেন) রূপের কথাই বলে থাকেন, আজ অরূপের কথা বলছেন কেন? গিরিশ বলিলেন, নিত্য রূপ আমি বুঝেছি, ও ও-মায়ার খেলা। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, নিজের স্বরূপ কি। বড় আনন্দ, বড় আনন্দ, মুখে বল্‌তে পারছি না। ইহাই তাঁহার মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বাভাস।

ডোবা দেখে যেমন সাগরের কল্পনা, একটা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্র-প্রদর্শনও তেমনই।—
"অবয়ব রেখা মাত্র রহিল অঙ্কিত।"

জীবনের পরপারে

[শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ]

আমাদের পারিবারিক ঘটনা

সে আজ ৬৭ বৎসরের কথা। তখন আমরা আমাদের পল্লী-ভবন পলুয়া-মাগুরায় (আধুনিক অমৃতবাজারে) বাস করি। তখন আমাদের খুব সুখের সময়। আমার প্রপিতামহ পদ্মলোচন ঘোষ জীবিত। তাঁহার তিন পুত্র বর্ত্তমান। জ্যেষ্ঠপুত্র হরিনারায়ণ যশোরে ওকালতি করেন, উপার্জ্জনও বেশ হয়, বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি বার মাসে তের পার্ব্বণ হইয়া থাকে। গ্রামে অনেকেরই বেশ স্বচ্ছল অবস্থা, সকলেই সুস্থসবল, কারণ তখনও দেশে ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর আবির্ভাব হয় নাই। ঘোষেদের বাড়ীতে প্রত্যহই উৎসব, প্রত্যহই এক শত পাতা পড়ে। হরিনারায়ণ প্রত্যেক শনিবারে বাড়ী আসেন; দুই দিন গান-বাজনায়, তাস-পাশা খেলায়, বেশ আমোদে কাটিয়া যায়।

পদ্মলোচন, এই সুখের সংসারে ছেলে-বৌ, জামাই-মেয়ে, নাতি-নাতনী, আত্মীয় স্বজন লইয়া, বেশ আমোদ আহ্লাদে, দিন কাটাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল,—কয়েক দিনের অসুখে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হরিনারায়ণ ৫৪ বৎসর বয়সে আত্মীয় স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, ভবলীলা সংবরণ করিলেন! সংসারে ও গ্রামে একটা বিষাদের ছায়া পড়িয়া গেল।

আমার পিতামহী অমৃতময়ী ৯ বৎসর বয়সে শ্বশুরালয়ে আসেন, সেই সময় হইতে আর পিত্রালয়ে যান নাই। তাঁহার ৮টি পুত্র, ৩টি কন্যা, ৩টি পুত্রবধূ ও ২।৩টি পৌত্র বর্ত্তমান। এ পর্য্যন্ত তিনি শোকদুঃখের মুখ দেখেন নাই, —এই তাঁহার প্রথম শোক। সর্ব্বগুণান্বিত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্বামীকে হারাইয়া তিনি শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। মাতৃভক্ত সন্তানেরা মায়ের শোকভার লাঘব করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। তাঁহার ৫ম পুত্র হীরালাল ছিলেন মাতৃগতপ্রাণ। পিতার মৃত্যুতে মাতার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল,—তিনি সর্ব্বদা মাতার কাছে থাকিয়া এবং একরূপ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, নানা রকমে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হীরালালের মন ছিল বড় কোমল; গরীব দুঃখীর কষ্ট দেখিয়া তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত; তিনি যথাসাধ্য তাহাদের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিতেন। অনেক সময় বলিতেন, "জীবের দুঃখকষ্ট যদি দূর করতে নাই পারলাম, তবে বেঁচে ফল কি ?"

এ হেন পুত্র পিতার মৃত্যুর ২॥ বৎসর পরে, এই জ্বালাময়ী জগতে আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া, স্নেহময়ী মাতা ও প্রাণাধিক ভাই, ভগিনী ও আত্মীয়বর্গকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া ১৮ বৎসর বয়সে, উদ্বন্ধনে দেহত্যাগ-করেন। এই বিনা মেঘে বজ্রপাতে, দিবানিশির সঙ্গী প্রিয়তম পুত্র হীরালালকে হারাইয়া, সন্তান-বৎসলা মাতার শোকবেগ শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র বসন্ত-কুমারকে বলিলেন,—"বাবা, আমার হীরালাল যখন তার অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দিল, তখন আমার এই ছার জীবন আর রাখব না,—হীরালাল যে পথে গেছে, আমিও সেই পথে যাব'।"

বসন্তকুমার বলিলেন, "অনেক দিনের জন্যও তো আত্মীয়-স্বজন বিদেশে যায়, তাদের জন্য আমরা শোক করি না কেন? কারণ আবার তা'দের পাব ব'লে। সেই রকম, যদি আমরা জানতে পারি, মরণের পর আবার আমাদের নিশ্চয় মিলন হ'বে, তবে আর শোক করব কেন, মা? আর সেরূপ অকাট্য প্রমাণ যদি না পাওয়া যায়, তবে তুমি একা কেন, আমরা সকলেই, হীরেলালের অনুসরণ করব।"

ফলকথা, সে সময় আমেরিকায় পরলোকতত্ত্ব-সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান চলিতেছিল, ইয়ুরোপে ইহার অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছিল; আর আমাদের দেশেও কেহ কেহ ইহার চর্চ্চা করিতেছিলেন। কলিকাতাতেও প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) প্রভৃতি প্রেততত্ত্ব-সম্বন্ধে গ্রন্থাদি পাঠ

ও ইহার অনুশীলন করিতেছেন, এই সংবাদ বসন্তকুমার পাইয়াছিলেন।

তখনই হেমন্তকুমার, শিশিরকুমার ও মতিলালকে লইয়া এই সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে বসিলেন। শেষে সাব্যস্ত হইল, শিশিরকুমার কলিকাতায় গিয়া প্যারীচাঁদ মিত্রের সহিত দেখা করিবেন। সেখানে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধ হয় ভাল, নচেৎ আমেরিকা পর্য্যন্তও তাহাকে যাইতে হইবে।

শিশিরকুমার কলিকাতায় পৌছিয়াই প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন, এবং আলাপ করিয়া বুঝিলেন, সেখানেই তিনি সফলকাম হইতে পারিবেন, আমেরিকা পর্য্যন্ত যাইবার আবশ্যক হইবে না। কলিকাতায় কিছুকাল থাকিয়া, শিশিরকুমার প্যারীচাঁদ মিত্রের সাহায্যে,—কি ভাবে মৃতব্যক্তির আত্মাকে আহ্বান করিতে হয়, কি প্রকারে পর-জগতের সংবাদ পাওয়া যায়, কি করিয়া প্রেতাত্মার সহিত কথাবার্ত্তা চলে, চোখ বুঁজিয়া তাহাদের দেখা যায়, মেসমেরাইজ বা হিপ্নোটাইজ করিবার প্রণালী কি, ইত্যাদি বিষয়গুলি বিশেষভাবে শিখিলেন, এবং শেষে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

আমাদের পারিবারিক চক্র

শিশিরকুমার বাড়ীতে আসিয়াই আমার পিতামহীকে বলিলেন, "মা, হীরেলালের সঙ্গে আজই তোমার সাক্ষাৎ করিয়ে দেব।" তারপর শিশিরকুমার তাঁহার মা ও ভাই বোনদের কাছে সব কথা বলিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই একটা পরিষ্কার ঘরে চক্রে (circleএ) বসিবার জোগাড় করা হইল। সন্ধ্যার পর বসন্তকুমার, হেমন্তকুমার, শিশিরকুমার ও মতিলাল, মা ও দুইটী ভগিনীসহ একটা গোল টেবিলের চারিদিকে বসিলেন। সে ঘরে অপর কাহাকেও আসিতে দেওয়া হইল না, কারণ যাহারা সারকেলে বসিবেন তাহারা সকলে একভাবে ভাবান্বিত না হইলে সেখানে ভাল আত্মা আসিতে পারেন না,—এই কথা শিশিরকুমার জানিয়া আসিয়াছিলেন।

সারকেলে বসিয়া মনঃসংযোগ করিবার জন্য সকলে এক মনে ভগবানের নাম গান করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে শিশিরকুমারের কথমত একাজন উঠিয়া বলিলেন,—"যদি কোন আত্মা এখানে এসে থাকেন, তবে কোন রকমে তাহা জানান।" এই কথা বলিবা মাত্র ঘরের মেঝের উপর, ভয়ানক একটা টোকার শব্দ হইল। শব্দ শুনিয়াই সকলে চম্‌কিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই মনে হইল, এ শব্দ কে করিলে? যাহারা সারকেলে বসিয়াছেন, তাদের মধ্যে কেহই এই শব্দ করিতে পারেন না, কারণ তাহারা সে জায়গা হইতে অনেক দূরে ছিলেন। আর বাহির হইতেও কাহারও সে সময় সেখানে আসিবার সম্ভাবনা ছিল না। তবে কোন আত্মা আসিয়া শব্দ করিলেন না কি? এই কথাই বারংবার সকলের মনে হইতে লাগিল।

প্রকৃতই যদি কোন আত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহাকে আহ্বান করিবার জন্য শিশিরবাবুর নির্দ্দেশ-মত পরস্পরে হাত সংলগ্ন করিয়া, স্থির হইয়া বসিয়া প্রার্থনা-সংগীত গাহিতে লাগিলেন।

মতিলালের উপর আত্মার ভর

এই সময় মতিলালের বোধ হইতে লাগিল, তাঁর সমস্ত দেহ যেন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে আর মনের মধ্যে আবেগের সঞ্চার হইতেছে। ক্রমে তাঁর হাত কাঁপিতে লাগিল। তার পরে তার মনে হইতে লাগিল কেহ যেন তাঁর দেহ ও মন অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে এমন কি তখন তাঁর নিজের কিছু ভাবিবার বা করিবার অবস্থা পর্য্যন্ত ছিল না। ক্রমে তাঁর নিঃশ্বাস গাঢ় হইয়া আসিল, হাত সজোরে কাঁপিতে লাগিল এবং চৈতন্য লোপ পাইয়া গেল। শেষে মনের আবেগ এত প্রবল হইয়া উঠিল যে তিনি ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এই ভাবে কিছুকাল কাটিবার পর কতকটা প্রকৃতস্থ হইয়া মতিলাল বলিলেন,—"আমার বোধ হ'ল, হীরেলাল যেন কাছে এসে, আমার গলা জড়ায়ে, করুণস্বরে কাঁদছে। তার কান্না দেখে, স্থির থাক্‌তে পার্‌লাম না, আমিও কাঁদ্‌তে লাগলাম।" এখানে বলা আবশ্যক যে মতিলাল ও হীরালাল পিঠাপিঠি ছিলেন, কাজেই দুই ভায়ে খুব বেশী [illegible] ও ভালবাসা ছিল। সুতরাং মতিলালের [illegible] হীরালালের আগে আসা স্বাভাবিক।

সে দিন এ[illegible] হইল। কিন্তু এই দিন হইতে প্রত্যহ সারকে[illegible] চলিতে [illegible]গিল. কিন্তু পরের [illegible]

দিন বিশেষ কিছু হইল না। চতুর্থ দিবসে মতিলাল আবার আবিষ্ট হইলেন। এই কয়েক দিনের অভিজ্ঞতার ফলে বেশ বোঝা গেল যে, কোন আত্মা আসিয়া মতিলালের উপর ভর করিয়াছেন। তাঁহার কম্পিত হাতে পেন্সিল দিবা মাত্র কাগজের উপর আঁকাবাঁকা ভাবে দাগ কাটা হইতে লাগিল, শেষে অস্পষ্টভাবে হীরালালের, নাম লেখা হইল। হীরালালের নাম পাঠ করিয়া উপস্থিত সকলের মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল, এবং হীরালালের আত্মা কর্ত্তৃক যে মতিলাল আবিষ্ট হইয়াছেন এই বিশ্বাস সকলেরই মনে দৃঢ় হইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে সকলেই আনন্দাশ্রুতে আপ্লুত হইলেন।

এই সময় মতিলালের হস্তদ্বয়ের বিক্ষেপন আরও বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহার হাত হইতে পেন্সিল পড়িয়া গেল, তাঁহার নিঃশ্বাস আরও জোরে বহিতে লাগিল তিনি সেই আবেশ-অবস্থায় মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আবেগভরে,"মা, মা, আমি, আমি হীরালাল" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, গলার স্বর ঠিক হীরালালের মত! একটু স্থির হইলে হীরালালকে সম্বোধন করিয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করা হইল, এবং একে একে অনেক প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল। হীরালাল বলিলেন, "বাবার কাছে আছি। এ স্থান জড়-জগতের চেয়ে ঢের সুন্দর। ঠিক জড়জগতের মত এখানে আহার-নিদ্রা ইত্যাদি নাই। এখানে কে কি ভাবে কাটায় তাহা পরে বলব।" শেষে বলিলেন, "কোন মানুষের উপর ভর না করলে তোমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে পারি না।"

হেমন্তকুমারের আবেশ-অবস্থা

এই ভাবে সারকেলে বসা চলিতে লাগিল। অপরাপর মৃত আত্মীয় স্বজনের আত্মাও আসিতে লাগিলেন। ক্রমে আমার পিতা হেমন্তকুমার (ইনি মধ্যম ভ্রাতা) মিডিয়ম হইলেন। আবেশ অবস্থায় মতিবাবু অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িতেন, তাঁহার সমস্ত দেহ বিশেষতঃ হস্তদ্বয় এরূপ সবেগে স্পন্দিত হইত যে, তিনি [illegible]ক্ষণ মধ্যে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। কিন্তু হেমন্ত[illegible] সেরূপ হইত না; এমন কি, সে সময় তাঁহার দেহে আবেশের বিশেষ কোন লক্ষণই প্রকা[illegible]নি মতিবাবুর মত সম্পূর্ণ অচেতন হইয়াও পড়িতেন না। তাঁহার হাত অল্প অল্প কাঁপিত, আর তিনি পেন্সিল ধরিয়া ক্ষণমাত্র না থামিয়া অনর্গল লিখিয়া যাইতেন। দেখিলেই বোধ হইত কেহ যেন তাঁহার হাতকে আশ্রয় করিয়া লিখিয়া যাইতেছে। রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক উচ্চ-দরের ধার্ম্মিক ব্যক্তির আত্মার আবির্ভাব তাঁহার উপর হইত, এবং তাঁহারা অনেক মূল্যবান উপদেশপূর্ণ কথা লিখিয়া যাইতেন। সে গুলি অনেক দিন আমাদের বাড়ীতে ছিল, শেষে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক দিন বাবার হাত দিয়া উর্দ্দূ লেখা বাহির হয়, তিনি উর্দ্দূ জানিতেন না। এই লেখা, আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী মিস্ত্রীদেয়াড়া গ্রাম-বাসী মীর হবিবর শোভান নামক এক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের নিকট পাঠান হয়। তিনি ইহার পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছিলেন।

অন্যান্য মিডিয়ম

ক্রমে আমার বড় পিসীমা (স্থিরসৌদামিনী) ও মেজ পিসীমা (নীলকাদম্বিনী) এবং আমাদের বাড়ীর আরও কয়েক জন স্ত্রীলোকের উপর এইরূপ ভর হইতে লাগিল। কাহারও হাত দিয়া লেখা হইত, কেহ কথা কহিতেন, আবার কেহ বা চোখে দেখিতে পাইতেন। এই সার-কেলে কত কবিতা, কত গান, কত ধর্ম্মোপদেশ পরলোক-গত মহাত্মাদের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে কিন্তু তাহা সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আমাদের চক্রে সকল শ্রেণীর আত্মারই আবির্ভাব হইত। সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীর আত্মার ভর হইলে,—হাত-পা ছোড়া, চীৎকার করা, কদর্য্য ভাষায় গালি দেওয়া প্রভৃতি দ্বারা মিডিয়মের কষ্টের একশেষ হইত। ক্বচিৎ কখন হরিনাম শুনিলে প্রেতাত্মা ছাড়িয়া যাইত, কিন্তু অনেক সময় তাহাকে তাড়ান বিশেষ কষ্টসাধ্য হইত। তখন মিডিয়মকে খোলা হাওয়ায় আনিয়া, চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়া, তবে সেই প্রেতের কবল হইতে নিস্তার পাওয়া যাইত। কখন কোন আত্মা আসিয়া আপনার অশান্তির কথা প্রকাশ করিত, কেহ বা অনুতাপানলে দগ্ধ হইত। এরূপ প্রেতাত্মার পাল্লায় পড়িয়াও মিডিয়মের কম কষ্ট হইত না। এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মকথা বলিয়া তি

হরিনাম গান করিয়া, অনেক সময় সেই আত্মাকে শান্তি দেওয়া যাইত! কখন কোন ভক্তের আত্মা ভর করিয়া এরূপ সুমধুর কীর্ত্তন করিতেন যে, সকলেই আত্মহারা হইতেন। কখন বা উচ্চ স্তরের আত্মা আসিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতেন।

কখন কখন এরূপও দেখা গিয়াছে যে কোন আত্মার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মিডিয়মের মুখ দিয়া মৃত ব্যক্তির গলার আওয়াজ, কথার উচ্চারণ, এবং মুখ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হাবভাব এরূপ পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ পাইত যে, হঠাৎ শুনিলে, যেন সেই মৃত ব্যক্তিই কথা বলিতেছে, ইহাই বোধ হইত। কখন কোন অজ্ঞাত ব্যক্তির আত্মা আসিয়া নিজের নাম ধাম বলিয়া গেল। পরে অনুসন্ধান দ্বারা তাহা সত্য বলিয়াই জানা গিয়াছে। তবে এই সকল বিষয় মিডিয়মের উপরই অনেকটা নির্ভর করে। ভাল মিডিয়মেরা মৃত ব্যক্তির আত্মা দ্বারাই পরিষ্কার ভাবে সকল সংবাদ জানাইতে পারেন।

চক্ষু বুজিয়া প্রেতাত্মা দর্শন

শিশির বাবুর এক খুড়তুতো ভগিনী শশিমুখী আমাদের সারকেলে বসিতেন। তাহাকে কখন মেসমেরাইজ করা হয় নাই, কিন্তু তিনি চোখ বুজিয়া নিভৃতস্থানে বসিলেই পরলোকগত আত্মা দেখিতে পাইতেন; এমন কি, তাহাদের সঙ্গে তাঁহার ভাবের আদান-প্রদান হইত। এক দিন আমাদের সারকেলে চোখ বুজিয়া বসিয়া আছে, এমন সময় একটু পরে আমার পিতামহীকে বলিলেন,—"জেঠী মা, এখানে এক জনকে দেখিতেছি, তিনি বলিতেছেন যে, তিনি আপনার বাবা।" তাঁহার চেহারা কিরূপ জিজ্ঞাসা করায় শশিমুখী তাহার যে বর্ণনা করিলেন তাহা ঠিক আমার পিতামহীর পিতার আকৃতির সহিত মিলিয়া গেল, অথচ শশিমুখী জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে কখন দেখেন নাই। এ সত্ত্বেও, সন্দেহ একেবারে দূর করিবার জন্য আমার মাতামহী এরূপ কয়েকটী প্রশ্ন করিলেন যাহা শশিমুখীর জানিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাইয়া আমার পিতামহীর ও অপর সকলের স্বভাবা ও নিতান্ত নির্ব্বোধ ছিলেন; সুতরাং তিনি চোখ বুজিয়া দেখিয়া যাহা বর্ণনা করিতেন তাহাতে কোন-রূপ তঞ্চকতা করিবার ক্ষমতাও তাহার ছিল না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পরে, তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আর এইভাবে দেখিতে পাইতেন না।

শিশিরকুমারের মেস্‌মেরাইজ করিবার ক্ষমতা

শিশিরবাবু নিজে কখন সাধারণ ভাবে মিডিয়ম হন নাই, অর্থাৎ তিনি আবেশ-অবস্থায় কথা কহিতে, লিখিতে বা চোখে দেখিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি মেসমে-রাইজ বা হিপনোটাইজ করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি আমার বড় পিসীমাতা স্থির-সৌদামিনীকে অনেক সময় মেসমেরাইজ করিতেন। ইহাতে তিনি কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা উক্ত পিসীমাতা লিখিত "আমাদের পারিবারিক কাহিনী" হইতে তাঁহার কথাতেই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি লিখিয়াছেন,—

"আমার উপর আত্মার ভর হইত, আবার সেজদাদা (শিশির বাবু) আমাকে মেসমেরাইজ করিতেন। ইহাতে আমার চোখ এরূপ খুলে গিয়েছিল যে, আমি পরলোকের সপ্তম স্তর পর্য্যন্ত বেশ দেখিতে পাইতাম। সেই সকল স্তরে আমি যে সব অপার্থিব ব্যাপার দেখিয়াছি, তাহা সম্যক্‌রূপে বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই, তবে মোটামুটী বলিতেছি।

মেসমেরাইজ করিতে করিতে আমি অচেতন হয়ে পড়িতাম। তখন আমার আত্মা দেহ ছাড়িয়া ক্রমে উর্দ্ধে উঠিত। প্রথমে প্রথম স্তরে যাইতাম। সে কেবল ভূত-প্রেতের আড্ডা। তাহাদের চেহারা এত ভয়ানক যে এখনও মনে হ'লে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এই জড়-জগতে যাহারা নিতান্ত নিকৃষ্ট, একরূপ পশুর ন্যায় বাস করে, মরণের পর তারা এখানে আসে ও সর্ব্বদা শিয়াল-কুকুরের মত কামড়া-কামড়ি করে। বিদ্যাবুদ্ধিহীন ও ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য নিরীহ লোকেরা দ্বিতীয় স্তরে স্থান পায়। দেব-দেবীতে যাহাদের বিশ্বাস আছে ও পরের অনিষ্ট করিবার প্রবৃত্তি নাই, তাহারা তৃতীয় স্তরে স্থান পেয়ে আপনাপন ইষ্টদেবতার পূজা লয়ে মগ্ন থাকে। চতুর্থ

স্তরে উন্নত আত্মাদিগের আবাস-স্থান। এই স্তরের আত্মাসকল আপনাপন উন্নতি অনুসারে ক্রমান্বয়ে অধিক জ্যোতিষ্ক হন।

সর্ব্বোচ্চ স্তর এত সুন্দর, মনোহর ও সুখপ্রদ যে তাহা বর্ণনার বাহিরে। এখানকার সমস্ত জিনিস হইতে নানা-বর্ণের স্নিগ্ধ তেজোরাশী নির্গত হইতেছে, নানাবিধ সুগন্ধে এই স্তর ভরপুর, রাগরাগিণী যেন মূর্ত্তিমন্ত হ'য়ে বিরাজ করছে,—এখানে সবই আনন্দময়, আর সেই আনন্দ সকলে ঢোকে ঢোকে পান করছে। এই বৈষ্ণবদিগের বৃন্দাবন, এখানে একবার আসিলে আর জড়-জগতে যাইতে ইচ্ছা হয় না।"

স্থিরসৌদামিনী ৭ম স্তরে

এই সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল। শিশির-বাবু এক দিন কৌতূহলপরবশ হইয়া তাঁহার উক্ত ভগিনীকে বহুক্ষণ ধরিয়া মেসমেরাইজ করিলেন, ভগিনী গাঢ়নিদ্রাভিভূত হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দামিনী, তুমি কি ঘুমাচ্ছ ?" কোন উত্তর না পাইয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তাহাতেও কোন জবাব না পাইয়া তিনি চিন্তিত হইলেন। তখন ভগিনীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, স্পন্দন নাই! বুকে হাত দিয়াও কোন স্পন্দন পাইলেন না! এরূপ অবস্থায় অধীর হওয়াই স্বাভাবিক। শিশিরকুমার কিন্তু ধীর ও স্থিরভাবে ভগিনীর চৈতন্য-সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ নানাবিধ প্রক্রিয়া করিয়া, তাহার পর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দামিনী, তুমি কি ঘুমাচ্ছ ?"

উত্তর হইল,—"আমি মরেছি।

শিশিরকুমার চম্‌কিয়া উঠিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, —"মরেছ! তুমি বল্‌ছো কি ?"

"হাঁ, আমি মরেছি,—সত্যিই মরেছি। মরণের পর মানুষ যেখানে আসে, আমি সেখানেই এসেছি।"

ভগিনীর এই কথা শুনিয়া শিশিরবাবু ভয় পাইলেন। তিনি তখন নানারূপ অনুনয় বিনয় করিয়া তাহাকে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

ভগিনী উত্তর করিলেন, "আমাকে ফির্‌বার কথা ছাড়া ত আর কিছু না ? এ পরিবর্ত্তন যে প্রার্থনীয় তা কি অস্বীকার কর্‌তে পার ?"

শিশিরকুমার ব্যথিত-হৃদয়ে বলিলেন,—"তুমি যা বল্‌ছো তা সত্যি হ'তে পারে; কিন্তু তুমি কি আমার অবস্থা বুঝ্‌তে পার্‌ছো না? তুমি এই ভাবে চলে গেলে আমার হৃদয় যে একেবারে ভেঙ্গে যাবে। আর, মা'র দশা কি হবে ?"

উত্তরে শিশিরবাবুর ভগিনী বলিলেন, "আমি যেখানে এসেছি এস্থান স্থূল-জগতের চেয়ে সহস্রগুণে মনোহর। এখানে মনে কর্‌লেই যে সে আস্‌তে পারে না, কিন্তু তোমার চেষ্টায় আমি এখানে আস্‌তে পেরেছি। এখন, তুমি আমাকে ফিরে যেতে বল্‌ছো। তুমি আমাকে স্নেহ কর, তবে কেন স্বার্থপরের মত আমাকে আবার ঐ দুঃখময় জগতে টেনে নিয়ে যেতে ব্যস্ত হয়েছ ?"

ভগিনীর কথা শুনিয়া শিশিরবাবু কাঁদিয়া ফেলিলেন। শেষে বিশেষ মিনতি করিয়া বলিলেন, "দেখ দামিনী, তুমি যদি ফিরে না এস তা হলে আমাকে যে ফাঁসি কাঠে ঝুল্‌তে হবে, তা কি তুমি বুঝতে পার্‌ছ না? তোমারও কি এ স্বার্থপরের চেয়েও বেশী কাজ হচ্ছে না ?"

এইভাবে অনেক কথা কাটাকাটির পর শিশিরবাবুর ভগিনীর আত্মা ফিরিয়া আসিতে রাজী হইলেন। তখন ধীরে ধীরে তাঁহার মৃতদেহে জীবন-সঞ্চার হইতে লাগিল এবং ক্রমে তিনি চৈতন্যলাভ করিলেন।

এই ঘটনাটী শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু তাঁহার লিখিত "মহাত্মা শিশিরকুমার" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মতিবাবু ও তাঁহার ভগিনী স্থির-সৌদামিনী অনাথবাবুকে এই ঘটনা বলিয়াছিলেন, এবং শিশিরবাবুর নিকটেও আমরা পূর্ব্বে এই ঘটনা শুনিয়াছিলাম।

শিশিরবাবুর মেসমেরাইজ করা সম্বন্ধে আরও দুইটি ঘটনা বিবৃত করিতেছি। এক দিন শিশির বাবু তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভগিনী লীলাবতীকে হিপ্‌নোটাইজ করিয়া বলিলেন, "তুমি এখান হ'তে রাস্তা দিয়ে বরাবর ডাকঘরে যাও।" একটু পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গিয়াছ ?"

উত্তর হইল,—"হ্যাঁ এসেছি।"

প্রশ্ন। পূর্ব্ব দরজা দিয়ে ঘরে যাও ?

উত্তর। ঢুকিয়াছি।

প্রশ্ন। এখন বল দিকি ঘরে ক খানা টেবল, ক খানা চেয়ার, কটা আলমারী আছে।

উত্তর। ২খানা টেবিল, ৪খানা চেয়ারও ২টা আলমারী।

তাহার পর প্রশ্ন হইল, ঐসকল জিনিস কোথায় কোনখানা আছে, কোন টেবিলের উপর কি কি জিনিস আছে, ঘরে ক'জন লোক আছে ও কোথায় বসিয়া কি করিতেছে? এইরূপ আরও অনেক প্রশ্ন করা হইল ও তাহার যথাযথ উত্তর পাওয়া গেল। তৎক্ষণাৎ শিশির-বাবু প্রভৃতি কয়েক জন লোক ডাক ঘরে গিয়া দেখিলেন যে সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর ঠিক হইয়াছে। এই ডাকঘর আমাদের বাড়ী হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে, নদীর ধারে, বাজারের উত্তরপার্শ্বে ছিল। লীলাবতী তখন বয়স্থা, সুতরাং তাঁহার ডাকঘরে পূর্ব্বে যাইবার সম্ভাবনা ছিল না।

স্থূলশরীর হইতে সূক্ষ্মদেহের বহির্গমন

আর একটী ঘটনা বলিতেছি। আমাদের বাড়ীর কাছে আমাদের একঘর জ্ঞাতি বাস করিতেন। সেই বাড়ীর ১৫।১৬ বৎসরের শশধর ঘোষ নামক একটী ছেলে পুরাতন পীড়ায় ভুগিতেছিল। মধ্যে মধ্যে তাহার মূর্চ্ছাও হইত। এক দিন সে আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসে, এবং সেখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। এ মূর্চ্ছা কিছুতেই ভাঙ্গিল না, বরং অবস্থা ক্রমে খারাপ হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া শিশিরবাবুর মনে এক নূতন তথ্য জানিবার প্রবল ইচ্ছা হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার ভগিনী স্থির-সৌদামিনীকে মেস্‌মেরাইজ করিলেন, এবং শশধরের নিকট গিয়া তাঁহার মৃত্যুর দৃশ্য দেখিতে আদেশ করিলেন। শিশিরবাবুর ভগিনীর আত্মা বাহির হইয়া শশধরের কাছে গিয়া দেখিলেন যে, তাহার মৃত আত্মীয়-স্বজন তাহার কাছে উপস্থিত হইয়া কিসের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ক্রমে শশধরের শরীর হইতে বাষ্প নির্গত হইতে লাগিল, ক্রমে এই বাষ্প ঠিক শশধরের আকার ধারণ করিল। তারপর সেই মৃত আত্মীয়-স্বজনেরা শশধরের বাষ্পীয়াকারের সেই সূক্ষ্ম শরীর-সহ অন্তর্হিত হইয়া গেল।

উল্লিখিত ব্যাপারটী ১৮৭১ সালের অক্টোবরের কয়েক মাস পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। তখন আমার বয়স ১০।১১ বৎসর সুতরাং বেশ স্মরণ আছে। ঐ অক্টোবর মাসে আমরা প্রথম কলিকাতায় আসি।

৬৫ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বাড়ীতে সারকেলে বসা সুরু হয়। সে সময় আমাদের দেশে স্ত্রীলোক তো দূরের কথা, পুরুষদিগের মধ্যেও অতি অল্প লোকেই পরকাল-তত্ত্বের সংবাদ রাখিতেন। আবার সামান্য যে কয়েক জন এই বিষয়ের চর্চ্চা করিতেন তাহারা প্রায় সকলেই সহর-বাসী। তৎকালে কিন্তু পল্লীবাসিনী রমণীদিগের পক্ষে পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন তথ্য অবগত হওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল। সুতরাং আমাদের সারকেলে বা মেস-মেরাইজ দ্বারা যে সকল তথ্য সেই সময় প্রকাশ পাইয়া-ছিল তাহাতে কোনরূপ কপটতা থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ সেই সকল ব্যাপার পরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক-দিগের প্রকাশিত তথ্যের সহিত মিলিয়া যাইতেছে, তখন পরলোকের সংবাদ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

যতীন্দ্রনাথ

[শ্রীচারু চন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল,]

জীবিতাবস্থায় যতীন্দ্রনাথ

বিগত ১৩ই সেপ্টেম্বর শুক্রব [illegible] লাহোর বরষ্টল কারা-কক্ষে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দাস প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আত্মহত্যা ভারত[illegible]র নিকট মহাপাপ। সাময়িক উত্তেজনা বশে বা দুর্ব্বল[illegible] জন্য মানুষ আত্মঘাতী হয়,—চিন্তাশক্তি তখন তাহার লোপ পাইয়া যায়—সদসৎবৃত্তি তখন কার্য্য[illegible] থাকে না। কিন্তু যে মানব অন্যায়ের বি[illegible] স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে দেশের জন্য তিলে তিলে [illegible] মৃত্যুকে [illegible] তাহাকে ত আত্মঘাতী বলিতে পারি না। এরূপ আত্মত্যাগ দধীচির আত্মত্যাগের ন্যায় বরণীয়। রাজনীতির দিক্ দিয়া কোন কথা বলিব না। দক্ষিণ কলিকাতার কংগ্রেস-কমিটির সহকারী সম্পাদক রূপে যতীন্দ্রনাথ কি করিয়াছেন, না করিয়াছেন তাহার হিসাব আমরা রাখি না—স্বরাজ্য-দলের ভিতর কতটুকু দেশের ও দশের কার্য্য তিনি করিয়াছেন সে কথাও আমরা জানি না। কিন্তু এইটুকু বুঝিয়াছি ২৫ বৎসরের যুবক, দেশের ও দশের জন্য [illegible]

করিয়া আত্মাহুতি দি ছেন—স্বার্থের জন্য তিনি প্রাণ-ত্যাগ করেন নাই—লাভ লোকসানের হিসাব তিনি করেন নাই—নাম ও যশের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না—দৃষ্টি ছিল তাঁর জেলে আবদ্ধ রাজবন্দীদের প্রতি সরকারের যে ব্যবহারকে তিনি অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করিতেন তাহার প্রতিকারের দিকে। তিনি ভাবিতেন, সমগ্র জগতের সুসভ্য জাতিদের ভিতর রাজ-বন্দীরা যে ভাবে থাকিতে পায় এদেশে সুসভ্য ইংরাজ জাতির, যাহারা সর্ব্বদাই সভ্যতার বড়াই করিয়া থাকে, তাহাদের নিকট হইতে কেন এই রাজবন্দীর, তেমন যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করিতেন ইহা ভারতীয় রাজবন্দীর ন্যায্য অধিকার। সুসভ্য জগতে সর্ব্বত্রই রাজবন্দীরা এরূপ ব্যবহার পাইয়া থাকে। আর ইহার জন্যই তাঁহার এই আত্মত্যাগ।

আজ যতীন্দ্রনাথের জীবন-দানে একটা মহান্ উচ্চ আদর্শের প্রেরণা দেখিতে পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

আধুনিক যুগে জাতীয়তা একটা সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সে গণ্ডী স্থান, কাল ও ধর্ম্মের সীমানার ভিতর আবদ্ধ। কিন্তু পূর্ব্বসূরীরা এরূপ ভাবে দেখিতেন না—আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এক দিন বলিয়াছিলেন, ভারতকে ছাড়িয়া
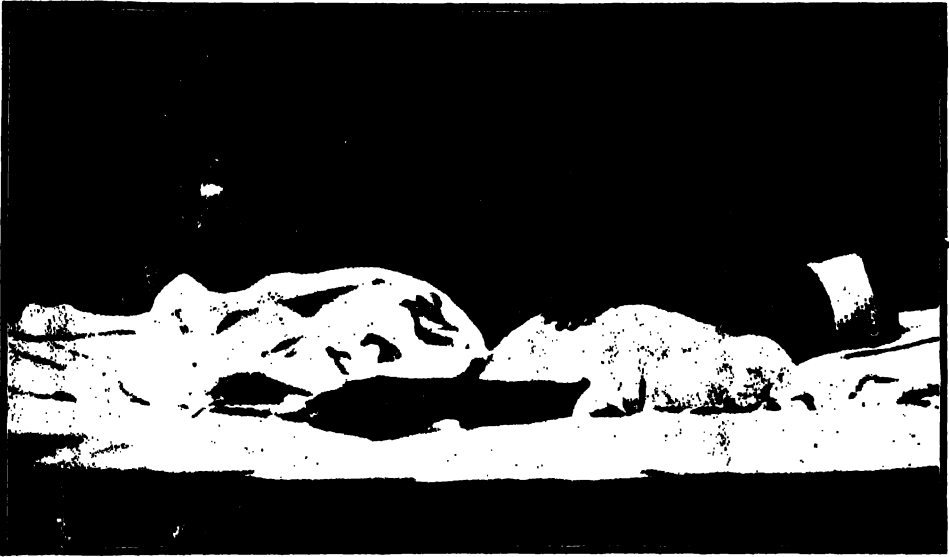
লাহোর জেলের বাহিরে যতীন্দ্রনাথের শব দেহ

থাকিতে পারিবে না ইহাই ছিল তাহার প্রাণের কথা। কথাটা ত এই। গর্হিত ফৌজদারী অপরাধে অপরাধী ইংরাজ যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য জেলে ভোগ করিতে পায় রাজবন্দী হইয়া কেন তাহারা অন্ততঃ সেইরূপও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পাইবে না—তাহারা কি তাহা পাইবার অধিকারী নয়? সংখ্যায় অল্পতার যুক্তি দেখাইয়া, ভাল অবস্থায় থাকার অজুহাতে দেশের লোকের টাকা যদি মুষ্টিমেয় শাস্তি-প্রাপ্ত ইংরাজ বন্দীর জন্য অধিক পরিমাণে ব্যয়িত হইতে পারে, তাহা হইলে দেশের অভিযুক্ত সন্তান যাহাদের দোষ এখনও প্রমাণ হয় নাই—এখনও যাহাদের অভিযোগ বিচারাধীন তাহাদিগকে তাহাদিগেরই প্রদত্ত অর্থ হইতে বাঙ্গালী সুধু আপনার দেশকে ভাল কখনও বাসে নাই—সে আগে ভারতবাসী পরপর বাঙ্গালী। বাস্তবিকই বাঙ্গলার সুসন্তানেরা চিরকালই ভারতকে বঙ্গতার-মাব সেবা করিবার পূর্ব্বে ভারত-মাতার সেবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। আজ যতীন্দ্রনাথ সেই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াই—সুধু প্রতিধ্বনি বলি কেন—তাঁহার অপেক্ষা আরও অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন—"আমি বাঙ্গালী নহি, আমি ভারতীয়।" এইরূপ ভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া ভারতের সেবা করিতে হইবে—ভারতবাসীর সুখ-দুঃখের সহিত যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। ভারতের স্বার্থে ঘা পড়িলে, প্রদেশের স্বার্থ বা নিজের স্বার্থকে বলি

মিছিলের এক দৃশ্য—পুরোভাগে (১) কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত (২) শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় (৩) মিষ্টার জে সি গুপ্ত (৪) ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় (৫) শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু (৬) মোটরে উপবিষ্ট অভিবাদন-রত যতীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ কিরণচন্দ্র দাস।

হাওড়া পুলের নিকট জনতা